জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
১৯৬০

ত্রয়োদশ বর্ষ ঃ জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
(ফেডারেশন হল)
কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়-সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন

জ্ঞান ও বিজ্ঞান
ষাণ্মাসিক লেখক-সূচী
জানুয়ারী হইতে জুন

চিত্র-সূচী

বিবিধ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ

৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

১৯৬০

ত্রয়োদশ বর্ষ ঃ জুলাই—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

(ফেডারেশন হল)

কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর

চিত্র সূচী

বিবিধ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োদশ বর্ষ | জানুয়ারী, ১৯৬০ | প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' আজ ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। যাঁহাদের সহায়তা ও শুভেচ্ছার ফলে পত্রিকার এই অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে, আজ নববর্ষের সূচনায় তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

বর্তমান যুগে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলির তুলনায় আমরা যে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছি, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই অবস্থার আশু প্রতিকারের জন্য জনসাধারণকে বিজ্ঞানানুরাগী করিয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই উদ্দেশ্যেই মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয় জনসাধারণের মধ্যে সহজ কথায় প্রচার করিবার জন্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছে। বিগত বারো বছর যাবৎ ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' তাহার আরব্ধ কার্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। এই প্রচেষ্টায় সে কতখানি সাফল্য অর্জন করিয়াছে, তাহার হিসাব-নিকাশ খতিয়ানের সময় এখনও আসে নাই। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, পত্রিকা সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহ এবং ইহার পাঠক-সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

সঠিক তথ্যাদি সমন্বিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের আলোচনায় সর্বক্ষেত্রেই যে পূর্ব প্রচারিত পন্থা সঠিকভাবে অনুসৃত হইয়াছে, এমন কথা জোর করিয়া বলিতে না পারিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই। বিজ্ঞানের এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলিকে নির্ভুল তথ্যাদি সহ সহজ কথায় জনপ্রিয় করিয়া পরিবেশন করা সহজসাধ্য নহে; তথাপি বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুযায়ী যথাসম্ভব সরল ও সুখবোধ্য করিয়া পরিবেশন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ সহজ কথায় জনপ্রিয় করিয়া প্রকাশ করিবার ক্ষমতা বিশেষভাবে লেখকের দক্ষতার উপরেই নির্ভর করে। বর্তমানে লেখক-সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় বুঝাইয়া বলিবার মত সুদক্ষ লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা, বলা

শক্ত। অথচ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এবং সহজবোধ্য সুষ্ঠু বাচনভঙ্গীর উপরই প্রধানতঃ পত্রিকার জনপ্রিয়তা এবং প্রচার নির্ভর করে। কাহারও কাহারও ধারণা—কবিত্ব করিয়া, গল্প ফাঁদিয়া বা কথোপকথনের মধ্য দিয়াই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে পারা যায়। কিন্তু যথাযথ ক্ষেত্র বিচার না করিয়া যত্রতত্র এরূপ উপায় অবলম্বনের ফলে বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব অনেক ক্ষেত্রেই হ্রাস পাইয়া থাকে। আবার অনেকের ধারণা— চলিত কথায় লিখিলেই প্রবন্ধাদির বক্তব্য সরল ও জনপ্রিয় হইয়া উঠিবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যথেষ্ট অনুশীলন ও দক্ষতার অভাবে এই প্রচেষ্টা ঈপ্সিত ফল লাভে সক্ষম হয় না; অধিকন্তু সংশোধনাদির ব্যাপারে অযথা সময় ব্যয়িত হয়। এতদ্ব্যতীত পত্রিকার মানোন্নয়নের জন্য অনুবাদ বা ছায়াবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধাদির তুলনায় মৌলিক নিবন্ধাদির সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। আমাদের লেখক-লেখিকাদিগকে এই বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। এই প্রসঙ্গে আর একটি নিবেদন এই যে, পাণ্ডুলিপির পরিচ্ছন্নতা ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরের জন্যে অনেক ক্ষেত্রে প্রবন্ধাদির প্রকাশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। পত্রিকার কার্যাদি ত্বরান্বিত ও সুসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল অসুবিধা দুরীকরণে আমাদের লেখক ও লেখিকাদের সহায়তা কামনা করিতেছি।

পত্রিকার উন্নতি বিধানের জন্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য আর একটি বিষয় এই যে, এক মাত্র তথ্যবহুল প্রবন্ধাদি প্রকাশের দ্বারাই এইরূপ একখানি পত্রিকার সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন সম্ভব নহে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন আঙ্গিক সংস্কার এবং উপযুক্ত চিত্রাদির সমাবেশে বক্তব্য বিষয়সমূহ অধিকতর আকর্ষণীয় এবং সুখবোধ্য করিবার যথেষ্ট প্রয়োজনীতা রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যথেষ্ট আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রয়োজন। প্রধানতঃ আর্থিক অসঙ্গতির জন্য দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও পত্রিকাটির ক্রমোন্নয়ন পরিকল্পনা যথোপযুক্ত কার্যকরী হইয়া উঠিতেছে না। আশা করা যায়—জনসাধারণের সহযোগিতা এবং যথোপযুক্ত সরকারী সাহায্য লাভ করিলে পরিকল্পনানুযায়ী পত্রিকার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হইয়া উঠিবে।

মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা*

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে অতীত কাল থেকেই মানুষ ভেবে এসেছে। মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করা যায় কিনা, সে বিষয়ে একদিকে চলেছে ধর্মীয় সাধনা, আর অপরদিকে চলেছে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা। এ সম্বন্ধে আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

শোনা যায়, আমাদের দেশে যোগাভ্যাসকারী সাধুসন্তেরা নাকি ধ্যানসমাহিত অবস্থায় অনেকদিন কোন খাদ্য গ্রহণ না করে কাটিয়ে দিতে পারেন। এমন কি, অনেকে নাকি আবার মাটির নীচে প্রোথিত থেকে দু-এক মাস পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারেন; অথচ মাটির নীচ থেকে তোলবার পর তাদের দেহে নাকি জীবনের কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানেন, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলে জীবনের আর কোন আশাই থাকে না। যোগাভ্যাসকারী যখন সমাধিস্থ হন তখনও তাদের হৃৎপিণ্ড কাজ করে যায়—অবশ্য অতি ধীরে ধীরে।

এমন রোগ আছে, যার আক্রমণে রোগী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এরূপ নিদ্রিতাবস্থা কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে এরূপ রোগীকে মৃতবৎ প্রতীয়মান হলেও তার হৃদ্‌স্পন্দন একেবারে থেমে যায় না।

অবশ্য সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্যে হৃদ্‌স্পন্দন স্তব্ধ হলেই যে মৃত্যু হবে, এমনও নয়। এমন অনেক লোক আছে, যাদের হৃৎপিণ্ড মাঝে মাঝে দু-একবার নিশ্চল হয়ে যায়। মাঝে মাঝে হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হলেও এ-রকম রোগী স্বাভাবিক কাজকর্ম করেও অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে।

কদাচিৎ দেখা যায়, হাসপাতালে বড় রকমের অস্ত্রোপচারের পরে রোগীর রক্ত কালো হয়ে গেছে। রক্ত কালো হয়ে যাবার কারণ হৃদ্‌স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাওয়া এবং রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়া। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস তখন বন্ধ হয়ে গেছে। রোগীর চেহারা মলিন হয়ে পড়েছে—তার নখগুলি অস্বাভাবিক নীল দেখাচ্ছে। মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সর্বাঙ্গে। তখনও কিন্তু চিকিৎসক আশা ছাড়েন না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ওষুধ রোগীর দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়—দরকার হলে বুক চিরে অ্যাড্রিন্যালিন প্রয়োগ করা হয়। হৃৎপিণ্ড সঞ্জীবিত করতে অ্যাড্রিন্যালিন বিশেষ উপযোগী।

তারপর দু-তিন মিনিটের ভিতর রোগীর দেহে আবার জীবনের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মুখের বিবর্ণতা দূর হয়। অতিরিক্ত ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে হৃৎপিণ্ডে গুরুতর প্রতিক্রিয়া হবার ফলে রোগীর সঙ্কটজনক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। তখন শল্য-চিকিৎসককে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করতে হয়। এরূপ অবস্থায় সময় সময় রোগীর বুক চিরে হাত ঢুকিয়ে হৃৎপিণ্ডে ম্যাসাজও করতে হতে পারে। খুব কঠিন ব্যবস্থা সন্দেহ নেই; কিন্তু জীবনের অবস্থা যখন সঙ্কটজনক, তখন চিকিৎসককে শেষ চেষ্টা করতেই হবে।

একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী এক সদ্যমৃতের আঙুল কেটে, সেই কাটা আঙুলের ভিতর দিয়ে বিশেষ একপ্রকার তরল পোষক মাধ্যম প্রবেশ করিয়ে দেন। দেখা গেল, পোষক মাধ্যমের মধ্যে কাটা আঙুলটির কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। এতে প্রমাণিত হলো যে, কাটা আঙুলটি মরে নি। কোন কোন ক্ষেত্রে মৃতদেহেও দাড়ি কিছুটা বাড়তে

দেখা যায়। তার কারণ হচ্ছে, দাড়ি গজাবার কোষগুলি কিছুকাল জীবন্ত থাকতে পারে।

শবদেহে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড (কণ্ঠের নীচে অবস্থিত এই গ্ল্যাণ্ডটির উপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু পরিণতি নির্ভর করে) মৃত্যুর পরেও কিছুকাল জীবন্ত থাকতে পারে।

বিখ্যাত রুশ শারীরতত্ত্ববিদ্ কুলিয়াবকো এক বিস্ময়কর পরীক্ষা করেন। ২৭ ঘণ্টা পূর্বে মৃত্যু ঘটেছে, এমন এক ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড বের করে তার ভিতর দিয়ে একটি বিশেষ তরল পদার্থ ঢোকাতে ও বের করতে থাকেন। অনেকক্ষণ পর দেখা গেল, হৃৎপিণ্ডটি তার স্বাভাবিক স্পন্দন ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে।

আর একটি অভিনব পরীক্ষা করেন দু-জন রুশ বিজ্ঞানী। তাঁরা একটি কুকুরের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে সেটিকে একপ্রকার তরল পোষক বস্তুর মধ্যে রাখেন। তীব্র আলোকপাতে কুকুরটির চোখ বুজে যেত এবং আলোক সরিয়ে নিলে চোখ খুলে যেত। জিহ্বার স্বাদগ্রহণের ক্ষমতা এবং শ্রবণশক্তিও অটুট ছিল।

এই দু-জন বিজ্ঞানী তারপর আর একটি কুকুরের গলার রক্তনালী ছিন্ন করে তার শরীরের সবটুকু রক্ত বের করে ফেলেন। কুকুরের দেহে জীবনের কিছু লক্ষণ লোপ পেয়ে যায় এবং তার হৃদ্স্পন্দনও স্তব্ধ হয়ে পড়ে। কুকুরটি ছয় মিনিটের মত মৃতবৎ পড়ে রইলো এবং তারপর আবার তার শরীরে রক্ত ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। বাইরে থেকে পাম্পের সাহায্যে রক্ত চলাচল অব্যাহত রাখা হলো কুকুরের হৃৎপিণ্ডে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার কুকুরের বুক ওঠা-নামা করতে লাগলো।

আর দু-তিন মিনিট যদি কুকুরটিকে রক্তহীন ও সংজ্ঞালুপ্ত অবস্থায় রাখা হতো তবে কোন বিজ্ঞানীর সাধ্য ছিল না যে, তাকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করে। কারণ রক্ত চলাচল বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলি অতি দ্রুত কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। তখন লুপ্ত কর্মক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। ত্বক, কেশ ও নখের কোষগুলি অবশ্য জীবের মৃত্যুর পরেও কিছুটা সময় জীবন্ত থাকে। হৃদ্যন্ত্রের পেশীর কোষগুলি মৃত্যুর পরে পুরা একদিন কর্মক্ষম থাকতে পারে।

যে কোন ব্যক্তিকেই ছয় মিনিটের মত মৃত রেখে আবার জীবন্ত করা সম্ভব নয়। দীর্ঘ দিন রোগে ভুগে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের একবার মৃত্যুর পর জীবন্ত করা এখনও সম্ভব নয়। মৃত্যুর কবল থেকে জীবনের তীরে ফিরিয়ে আনতে হলে রোগীর হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ এবং তলপেট অবশ্যই সুস্থ থাকা চাই। নতুবা একবার মরে গেলে এক মিনিট পরে চেষ্টা করলেও আবার জীবন্ত করা সম্ভব নয়। অনেক দিনের রোগে কোন অঙ্গ যাদের বিকল হয়ে গেছে, তাদের মৃত্যুর পর ডাক্তারের আর করবার কিছু থাকে না।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় কখনও কখনও এমন মৃত্যু হতে পারে, যেখানে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ ও অটুট থাকে। পূর্বে বলা হয়েছে, শল্য-চিকিৎসার সময় অতিরিক্ত ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে লোকের হঠাৎ মৃত্যু হতে পারে। পথে বাস, ট্রাম বা ট্রেন দুর্ঘটনায় অতিরিক্ত রক্তপাতে অনেক সময় লোকে প্রাণ হারায়। তাদের দেহের সমস্ত অঙ্গ কিন্তু তখনও অটুট থাকে। যুদ্ধে এ রকম আকস্মিক মৃত্যু অনেক হয়। অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুর সঙ্গে মানসিক আঘাত জড়িত থাকে বলে যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের পুনরুজ্জীবিত করবার কাজ অনেক কঠিন। তবুও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এ-ব্যাপারে অনেকটা সাফল্য লাভ করা গেছে। এই রকম আকস্মিক মৃত্যুর পর ডাক্তার অবিলম্বে রোগীর দেহে রক্ত ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসের বন্দোবস্ত করেন। ধীরে ধীরে বুক ধুক্ ধুক্ করতে আরম্ভ করে। অবশেষে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলি আবার

কার্যকরী হয়ে ওঠে। মৃত্যুর অন্ধকার থেকে জীবনের জ্যোতিতে ফিরে আসে রোগীটি।

মৃত্যুকে আমরা দু-ভাগে বিভক্ত করতে পারি। একপ্রকার মৃত্যু হচ্ছে প্রাথমিক মৃত্যু। এ-ক্ষেত্রে মৃতব্যক্তির হৃদ্‌স্পন্দন নেই, নাড়ী থেমে গেছে, সব ইন্দ্রিয়শক্তির অবসান হয়েছে। তা সত্ত্বেও লোকটিকে পুনরুজ্জীবিত করা চলে। কারণ শরীরের কোন অংশ, বিশেষ করে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষসমূহ তখনও কার্যক্ষম রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার মৃত্যু হচ্ছে, অন্তিম বা চরম মৃত্যু। এ-ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির অবস্থা বাইরে থেকে প্রাথমিক মৃত্যুর মত দেখা গেলেও মস্তিষ্কের স্নায়ু-কোষগুলি অকেজো হয়ে যাবার দরুণ জীবন ফিরে পাবার সব আশা লুপ্ত হয়ে গেছে।

আমরা পূর্বে দেখেছি যে, আমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলি প্রাথমিক মৃত্যুর পর অতি সত্বর নষ্ট হয়ে অন্তিম মৃত্যুর পথ সুগম করে দেয়। প্রাথমিক মৃত্যুর মাত্র ছয় মিনিটের মধ্যে মস্তিকের কোষগুলি নষ্ট হয়ে যায়। কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার পর ছয় মিনিটের মধ্যে ডাক্তারের সাহায্য পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

মস্তিষ্কের সব কোষগুলি যে একই সময়ে নষ্ট হয়ে যায় তা নয়। মস্তিষ্কের কতকগুলি কোষ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন নিয়মিত রাখে। এসব কোষ সকলের আগে কাজ ছেড়ে দেয়। এগুলি সবচেয়ে দুর্বল বলেই সবচেয়ে আগে কাজ ছেড়ে দেয়। আত্মরক্ষার তাগিদে এরা সকলের আগে অকেজো হয়ে পড়ে, নতুবা এগুলি আরও সত্বর নষ্ট হয়ে যাবে। মস্তিষ্কের সব কোষগুলি যে একই সময়ে নষ্ট হয় না, তা একটি পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। তিনটি কুকুরের দেহ থেকে রক্ত বের করে নিয়ে যথাক্রমে ৬, ১৬ এবং ২০ মিনিট পরে রক্ত চলাচল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। ৬ মিনিট পরে যে কুকুরের দেহে রক্ত চলাচল সুরু করা হয়, সে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে ওঠে। ১৬ মিনিট পর যে কুকুরটিকে জীবন্ত করা হয়, সে কুকুরটি কোন রকমে দাঁড়াতে এবং হাঁটতে পারতো বটে, কিন্তু খাবারের সামনে এগিয়ে আসা বা নাম ধরে ডাকলে বুঝতে পারবার ক্ষমতা লোপ পায়। ২০ মিনিট পর যে কুকুরটিকে জীবন্ত করা হয়, সেটি শরীরকে চালনা করবার সব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেছে, জীবদেহে এই মস্তিষ্কের কোষগুলি হচ্ছে সর্বশেষ সংযোজন। মাত্র বিশ লক্ষ বছর পূর্বে এদের আবির্ভাব হয়েছে। হয়তো আরও কয়েক লক্ষ বছর পর এগুলি আরও শক্ত ও দৃঢ় হয়ে উঠবে। তখন প্রাথমিক মৃত্যুর পর জীবন ফিরে পাবার সম্ভাবনা আরও নিশ্চিত হয়ে পড়বে। বিজ্ঞান কিন্তু কয়েক লক্ষ বছর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে রাজী নয়। অবিরাম চেষ্টা চলছে, কি করে ছয় মিনিটকে বাড়ানো চলে।

জলে ডুবে মরবার কারণ হচ্ছে, অক্সিজেনের অভাব। দেখা গেছে, কুকুরকে যদি কোন উপায়ে অজ্ঞান করে জলে ডুবানো হয়, তবে তাকে অনেকটা পরেও বাঁচানো যায়।

উচ্চ পর্বত আরোহণের সময় লোকেরা অক্সি-জেনের অভাবে কখনও কখনও সংজ্ঞা হারায়। কিন্তু পূর্বে একটু নেশাগ্রস্ত থাকলে তাদের সংজ্ঞা সহজে লুপ্ত হয় না।

সংজ্ঞালুপ্ত অবস্থায় জীবকোষগুলি বিশেষ গুণসম্পন্ন হয়। মস্তিষ্কের তীব্রতম অনুভূতিশীল স্নায়ুকোষগুলি কাজ ছেড়ে দেয় তখন। এ-সময় কোন দুর্ঘটনা হলে মস্তিষ্কের কোষগুলিতে তার কোন প্রভাব পড়ে না। সুস্থ দেহে কঠিন আঘাত বা বিষক্রিয়ার যে প্রতিক্রিয়া হয়, সংজ্ঞা-লুপ্ত অবস্থায় তার চেয়ে অনেক কম হয়।

প্রাথমিক মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সংজ্ঞালোপ করবার কোন ওষুধ প্রয়োগ করে হয়তো অন্তিম মৃত্যুর আগমন বিলম্বিত, এমন কি রোধ করা চলতে

পারে। এ-রকম ওষুধ নিয়ে পরীক্ষা চলছে আজ সারা বিশ্বব্যাপী এবং অনেকটা আশার আলো ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে।

পথে গুরুতর আহত কয়েকজন লোককে রক্ত দেবার সময় রক্তের সঙ্গে Pentothal sodium নামক ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ওষুধটি মাথার সুকুমার স্নায়ুগুলিকে অনুত্তেজিত রাখবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই ওষুধ প্রয়োগে আহত লোকদের বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল।

নেশাগ্রস্ত লোকের পক্ষে দুর্ঘটনায় আহত হয়েও না মরবার সম্ভাবনা সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক বেশী। কারণ মদের প্রভাবে তার মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলি পূর্বেই কাজ ছেড়ে দিয়ে নিরাপদ রয়েছে; কাজেই দুর্ঘটনার কোন প্রভাব তার মস্তিষ্ককে বিপদসঙ্কুল করে তুলবে না।

অতি তীব্র বিষক্রিয়ায় অর্ধমৃত অবস্থায় এক রোগী এসেছিল হাসপাতালে। তার দেহ শবে পরিণত হতে বাকী ছিল মাত্র তিরিশ মিনিট। চিকিৎসক মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তার মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলিকে কাজ ছাড়া করে রাখবার জন্যে ইথার নামক সংজ্ঞালোপের এক ওষুধ প্রয়োগ করেন। ছয় ঘণ্টা ধরে ইথার প্রয়োগ করা হয়েছিল। রোগী আবার সুস্থ হয়ে উঠলো।

সংজ্ঞালুপ্ত অবস্থায় বিড়ালের উপর পটাসিয়াম সায়ানাইড নামক তীব্র বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল; কিন্তু তাতে কোন কুফল দেখা যায় নি।

আর একটি অভিনব উপায়ে প্রাথমিক ও অন্তিম মৃত্যুর অন্তর্বর্তী কালকে বিলম্বিত করবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। শীতকালে সাপ, ব্যাং প্রভৃতি কয়েকটি জীব অনেক দিন আহার না করে মরার মত পড়ে থাকে। শীতকালে এদের জীবকোষগুলির কাজ অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায় বলে অতি অল্প মাত্রায় অক্সিজেন গ্রহণ করেও এরা জীবনধারণ করতে পারে। এ ব্যাপারটিকে বলা হয় Hibernation বা শীতঘুম। বরফের দেশে অনেক দিনের মৃতদেহ এমন অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে যে, দেখলে মনে হয় মাত্র কিছুক্ষণ আগে বুঝি জীবটি প্রাণ হারিয়েছে। মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হচ্ছে ৯৮° থেকে ৯৮.৫° ফারেনহাইট। দেহের তাপমাত্রা এর চেয়ে বাড়তি হলে আমাদের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি তাপমাত্রা হ্রাস করানো যায়, তবে তার কি প্রতিক্রিয়া হবে দেহের উপর? গবেষকেরা প্রমাণ করেছেন যে, নিম্নতর তাপমাত্রায় দেহের জৈবক্রিয়াগুলি অনেকটা মন্থর হয়ে পড়ে বলে অক্সিজেনের প্রয়োজন অনেকটা হ্রাস পায় এবং মস্তিষ্কের কোষগুলি অল্প অক্সিজেনেও টিকে থাকতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হয়ে পড়ে, নাড়ীর ওঠা-নামা শ্লথ হয়ে যায় এবং দেহের রক্ত চলাচল মন্থর হবার দরুণ রক্ত-ক্ষরণের আশঙ্কা অনেকটা লাঘব হয়। দেহের সুস্থতা অটুট থাকা সত্ত্বেও এর প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের মাত্রা কম হলেও চলে। অবশ্য মানবদেহকে এই অস্বাভাবিক অবস্থায় অনির্দিষ্ট কালের জন্যে রাখা চলে না। তবে কিছুটা সময় যে, আমাদের দেহকে এমন অবস্থায় নিরাপদে রাখা চলে তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

নিম্ন তাপমাত্রার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, যার অধিক নিম্নতর তাপমাত্রায় জীবের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। মনুষ্যেতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এ তাপমাত্রা হচ্ছে ৬৮° থেকে ৭২° ফারেনহাইট। মানুষের পক্ষে এ তাপমাত্রা হচ্ছে ৮২° ফারেনহাইট।

দেখা গেছে, নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োগে প্রাথমিক মৃত্যুর পরেও জন্তুদের মস্তিষ্ক-কোষ ১৮ থেকে ২০ মিনিট পর্যন্ত কার্যক্ষম রাখা চলে। মানুষের ক্ষেত্রে সময়ের মাত্রা কিছুটা কম হলেও ৬ মিনিটকে বাড়িয়ে ১২ মিনিটের মত করা গেছে। জীব-জগতে মানুষের মস্তিষ্ক-কোষ যেমন সবচেয়ে উন্নত, তেমনি সবচেয়ে দুর্বল। সবচেয়ে উন্নত হবার মূল্য তাই মানুষকে দিতে হচ্ছে।

চিকিৎসকেরা ওষুধ দিয়ে রোগীর দেহের তাপ-মাত্রা কমিয়ে দিতে পারেন। অনেক সময় আবার রোগীর দেহের উপর দুটা কম্বল বিছিয়ে ঐ কম্বল দুটার ভিতর দিয়ে শীতল জল প্রবাহিত করা হয়। এ ভাবে শীতল জলের সাহায্যে রোগীর দেহের তাপ-মাত্রাকে ইচ্ছামত কমানো চলে। রোগীর দেহের তাপ-মাত্রা বাড়াতে হলে কম্বল দুটার মধ্য দিয়ে উষ্ণ জল ধীরে ধীরে প্রবাহিত করা হয়।

বিজ্ঞান মৃত্যুকে জয় করতে পারে নি। অন্তিম মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা সে স্বীকার করে। কিন্তু যারা জলে ডুবে, পথের দুর্ঘটনায়, যুদ্ধে, গোলাবারুদের আঘাতে মারা যায়, সে সব নরনারীর অকাল মৃত্যু রোধ করতে বিজ্ঞানীরা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। পৃথিবীর সব উন্নত দেশে বিজ্ঞানের এই মহৎ উদ্যমে বিশ্বজনের আন্তরিক শুভেচ্ছা রয়েছে।
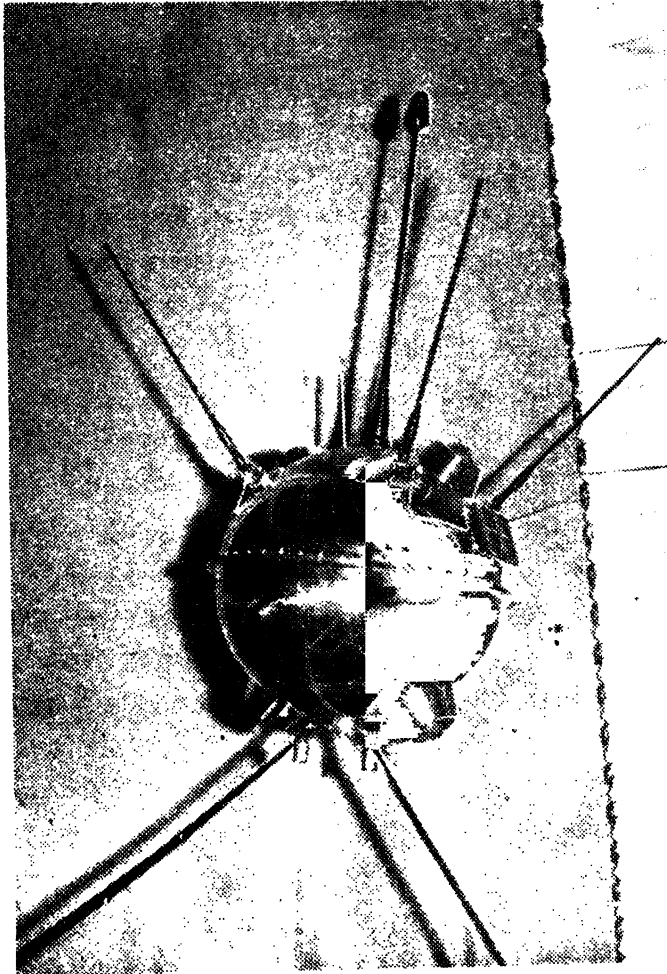
সোভিয়েট কৃত্রিম উপগ্রহ—তৃতীয় লুনিকের দৃশ্য।

নোয়ামুণ্ডির লৌহখনি

শ্রীমিহির বসু

সভ্যতার আদিম যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত লোহার ব্যবহার ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। খুব সম্ভব খৃঃ পূঃ ৬০০ থেকে লোহার ব্যবহার সুরু হয়েছে; আর আজকের দিনে লোহাকে সভ্যতার মেরুদণ্ড বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। কিন্তু এই মূল্যবান ধাতুটির উৎস সন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে—লোহা মৌলিক পদার্থ হিসেবে একমাত্র কোন কোন উল্কাপিণ্ডে অথবা অতি অল্প পরিমাণে কোন কোন পাথরের মধ্যে রয়েছে বটে, কিন্তু তা কাজে লাগাবার মত নয়। বিভিন্ন খনিজের মধ্যে লোহার অস্তিত্ব দেখা যায়, আর তারই মধ্যে কয়েকটি খনিজ, লোহার আকরিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যেমন—হিমাটাইট, ম্যাগ্‌নেটাইট, গোয়েথাইট, সিডেরাইট।

লৌহ-আকরিকে আমাদের দেশ বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। দেশের বর্তমান প্রয়োজন মিটিয়ে অনেকখানিই উদ্বৃত্ত থাকে, তাই এর মধ্যে বিদেশী অর্থ নিয়ে আসবার একটা বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে লৌহখনি অঞ্চলগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিহার ও উড়িষ্যার সিংভূম ও কেওঞ্জর জেলা, বোম্বাইয়ের রতনগিরি, মধ্যভারতের বাইলাদিলা অঞ্চল, মাদ্রাজের সালেম জেলা। এছাড়া মহীশূর, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও বাংলাতেও ছোট-বড় লৌহ-আকরিক সঞ্চিত আছে। তবে উৎপাদনের দিক থেকে দেখলে প্রথমেই স্থান দিতে হয় বিহার ও উড়িষ্যার আকরিক অঞ্চলগুলিকে।

বিহার ও উড়িষ্যার এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে লৌহ-আকরিক (হিমাটাইট) সঞ্চিত রয়েছে। এই অঞ্চলের আকৃতি অনেকটা ঘোড়ার খুরের মত। ছোট-বড় অনেক খনি এখানে রয়েছে; কিন্তু তার মধ্যে সর্বপ্রধান হলো সিংভূমের নোয়ামুণ্ডি লৌহখনি। কেওঞ্জরের জোড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ খনি অঞ্চল; কারণ এখানে পাশাপাশি লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ আকরিক সঞ্চিত রয়েছে, যার ফলে ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ প্ল্যাণ্ট পত্তন করা সম্ভব হয়েছে। বিহার ও উড়িষ্যার সীমারেখায় অবস্থিত কিরিবুরু আকরিক অঞ্চলের নাম করতেই হবে; কারণ এখানেই ভবিষ্যতের বৃহত্তম খনি অঞ্চল গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কিরিবুরু পরিকল্পনা রূপায়িত হলে হয়তো নোয়ামুণ্ডির মর্যাদা তার তুলনায় নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে।

রাজখারসোয়ান-গুয়া (পূর্বতন টাটা-গুয়া) ব্রাঞ্চের উপর নোয়ামুণ্ডি ষ্টেশন, কলকাতা থেকে ২৩৪ মাইল দূরে। এখন এই রেলপথে বিদ্যুতিকরণের কাজ চলছে, অদূর ভবিষ্যতে লৌহ-আকরিকের উৎপাদন ব্যবস্থা তরান্বিত করবার জন্যে। বর্তমানে ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহার করা হচ্ছে, আকরিক বোঝাই মালগাড়ী টানবার জন্যে। ষ্টেশন থেকে একটি মিটার গেজ লাইন (সাইডিং) লৌহখনিটিকে যুক্ত করেছে লৌহ আকরিক পূর্ণ ওয়াগনগুলিকে টেনে আনবার জন্যে। নোয়ামুণ্ডি খনিতে আকরিক-পূর্ণ ছোট ছোট ওয়াগন বা টাব টানবার জন্যে প্রায় ২৫ মাইল দীর্ঘ মিটার গেজ ও ৫½ মাইল ন্যারো গেজ রেলপথ বসানো হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে আবিষ্কৃত হলো নোয়ামুণ্ডির এই প্রাকৃতিক সম্পদ। ১৯২৬ সাল থেকে সুরু হয় খনির কাজ। নোয়ামুণ্ডি আজ এশিয়ার বৃহত্তম লৌহখনি। আধমাইল চওড়া দুটি প্রায় সমান্তরাল দুই মাইল দীর্ঘ নীচু পাহাড়ে এই লৌহ-

আকরিকের খনন-কার্য চলেছে। খনির কাজ এতদিন মানুষ নিজে হাতেই করে আসছিল; বর্তমানে যান্ত্রিক সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে। খনির শ্রমিকেরা প্রায় সকলেই স্থানীয় আদিবাসী। অতি অল্প খরচে এখানে কায়িক শ্রম পাওয়া যায় বলে এতদিন শুধু হ্যাণ্ড মাইনিং, অর্থাৎ হাত দিয়ে খনন-কার্য চলছিল। কিন্তু আজকের উৎপাদন বৃদ্ধির যুগে যান্ত্রিক পদ্ধতিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

খননের কাজ সুরু হয় পাহাড়ের মাথা থেকে। হাতে করে যে কাজ হয় তাতে পাহাড়ের ঢালু অংশে, ৩০′-৪০′ ফুট উঁচু ও প্রায় ১০′ ফুট চওড়া একটি জায়গায় দুজন শ্রমিক—সাধারণতঃ আদিবাসী দম্পতি কাজ করে। এই রকম সারিবদ্ধভাবে কাজ হতে থাকে। ৩০′-৪০′ ফুট কাজের পর খানিকটা সমভূমি ছেড়ে, তার উপর থেকে আবার কাজ হয় পাহাড়ের গা ধরে; অর্থাৎ আকরিক স্তরটিকে সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে কেটে কাজে এগিয়ে যেতে হয়।

যে জায়গায় আকরিক কাটা হচ্ছে, সেখানে দিনের শেষে ড্রিলিং যন্ত্রের সাহায্যে ছিদ্র করা হয়। ছিদ্রের গভীরতা হয় প্রায় ৪ ফুট এবং একটি ছিদ্র থেকে আর একটির দূরত্ব প্রায় ৮ ফুট। এই ছিদ্রে জিলাগ্‌নাইট বা ডিনামাইটের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, যার ফলে কঠিন আকরিকের বেশ খানিকটা অংশ ধ্বসে পড়ে। শ্রমিকেরা এই বড় বড় চাঙ্গড়গুলি শাবল ও গাঁইতির সাহায্যে আলাদা করে ছোট ছোট টুক্‌রায় ভেঙ্গে ফেলে; টুক্‌রাগুলি হয় প্রায় ৪″ ইঞ্চি মাপের। এই আকরিকের টুক্‌রাগুলিকে বোঝাই করা হয় ১২½ ঘনফুট একটি কাঠের বাক্সে। এক বাক্স আকরিকের ওজন প্রায় এক টন। শ্রমিকদের পারিশ্রমিক তাদের আকরিক টুক্‌রা উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। এক বাক্স কঠিন আকরিকের পারিশ্রমিক ১৷৶০, আকরিক অপেক্ষাকৃত নরম হলে ৸৶০। একটি শ্রমিকজুটি দৈনিক ১½ টন থেকে ২ টন আকরিক উৎপন্ন করে।

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যখন খনন-কার্য চালানো হয় তখন প্রায় ত্রিশ ফুট গভীর ছিদ্র সৃষ্টি করা হয়, আর বিস্ফোরণ ঘটানো হয় জিলাগ্‌নাইট অথবা তরল অক্সিজেনের সাহায্যে। বড় বড় চাঙ্গড়গুলিকে উত্তোলক যন্ত্রের সাহায্যে ম্যাকট্রাক নামে বিশেষ-ভাবে তৈরী পরিবহন-আধারে তোলা হয় এবং এই আধারটি আকরিক বয়ে এনে প্রাথমিক চূর্ণ করবার যন্ত্রে ঢেলে দেয়। এখানে বড় বড় চাঙ্গড়গুলিকে ভেঙ্গে ১৬″ থেকে ১৮″ টুক্‌রায় পরিণত করা হয়। তারপর টুক্‌রাগুলি দ্বিতীয় চূর্ণন যন্ত্রে এনে ৪″ মাপে ভাঙ্গা হয়। চূর্ণন যন্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতা আকরিকের মাপের উপর নির্ভর করে। সেখান থেকে বেল্ট-কনভেয়ারের সাহায্যে আকরিকের আধার বা বিন-এ এসে জমা হয় এবং সেখান থেকে মালগাড়ীতে বোঝাই হয়।

বর্তমানে নোয়ামুণ্ডির খনির উৎপাদনের পরিমাণ দিনে প্রায় ৪০০০ টন। হাতে কেটে আকরিক উৎপন্ন হয় বছরে দশ লক্ষ টন। যান্ত্রিক পদ্ধতি ও হাতে-কাটা পদ্ধতি দু-ই এক সঙ্গে উৎপন্ন করে বছরে প্রায় ২৫ লক্ষ টন। নোয়ামুণ্ডির আকরিক সঞ্চয় প্রায় ৬০ কোটি টন।

আকরিকের প্রকৃতি অনুসারে এখানকার আকরিকের শ্রেণীবিভাগ করা যায়; যেমন—বিশুদ্ধ হিমাটাইট অত্যন্ত কঠিন হলে নীরেট আকরিক; স্তরীভূত আকরিক অত্যন্ত পাত্‌লা স্তরের সমন্বয় হলে বলা হয় বিস্কুট আকৃতির আকরিক; কর্দম-প্রস্তর মিশ্রিত আকরিক ও গুঁড়া আকরিক। এই গুঁড়া আকরিক বিশুদ্ধ হিমাটাইটেরই রূপান্তর এবং একে ব্লু-ডাষ্ট বলা হয়। গুঁড়া আকরিক ব্লাষ্ট ফারনেসের উপযোগী নয় বলে তাকে জমাট বাঁধিয়ে কঠিন করবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

বিহার, উড়িষ্যা ও অন্যান্য স্থানের এই লৌহ আকরিক স্তরীভূত হিমাটাইট, কোয়ার্টজাইটেরই

রূপান্তর। কোয়ার্ট্‌জ্‌ যখন অকেলাসিত বা সূক্ষ্ম কেলাসিত রূপে থাকে তখন স্তরীভূত হিমাটাইট জাসপার নামে বর্ণিত হয়। এই পাথরে যে ভাবেই হোক কোয়ার্ট্‌জ্‌-জাতীয় উপাদানের অনুপস্থিতিই তাকে লৌহ-আকরিকের মর্যাদা দেবে; কারণ তখন সেটি বিশুদ্ধ হিমাটাইট।

এমন ধারণা করা যেতে পারে যে, এই পাথর সমুদ্রতলে পললের একটি ছন্দিত রূপ, যেখানে হিমাটাইট ও সিলিকার স্তর একের পর এক বার-বার জমা হয়েছে। খুব সম্ভব সমুদ্রতলের আগ্নেয়োচ্ছ্বাস এই দুটি প্রধান উপাদান জুগিয়েছে। পরবর্তীকালে এই স্তরীভূত পলল তাপ ও চাপে কিছুটা রূপান্তরিত হয়েছে এবং এই রূপান্তরিত শিলা থেকে তারপর যখন সিলিকা দূরীভূত হয়েছে তখন অতি বিশুদ্ধ হিমাটাইট আকরিকের জন্ম হয়েছে এবং স্থানে স্থানে অত্যন্ত মিহি গুঁড়া আকরিকেরও সৃষ্টি হয়েছে।

মহাকাশ-যান চালকের সাজসজ্জা। এই পোষাক পরিধান করিয়া মানুষ স্বয়ং মহাশূন্যে অভিযান করিতে পারিবে বলিয়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

উদ্ভিদ-জীবনে দিনের দৈর্ঘ্যের প্রভাব

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

প্রতি ঋতুতে প্রকৃতির পট পরিবর্তিত হয়; আকাশের রূপ বদলায়, আলো-বাতাস একরূপ থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে গাছ-পালাও রূপ বদলায়। বর্ষজীবী গাছগুলি সব একই সময়ে জন্মায় না; বিভিন্ন প্রকারের গাছপালা বিভিন্ন সময়ে ফুল ও ফল ধারণ করে। শরতে যে ফুল ফোটে, বসন্তে তাদের দেখা যায় না; আবার বসন্তের ফুলও শরতে ফোটে না। দম দেওয়া এলার্ম ক্লকের মত যার যার ঠিক নির্দিষ্ট সময়টিতে গাছে গাছে ফুল-ফল ধরবার এই যে সাড়া হঠাৎ জেগে ওঠে, এ কি শুধু উদ্ভিদের নিজস্ব কোন বিশেষ ক্রিয়া-কৌশলের প্রভাবেই ঘটে? তাই যদি হয় তবে ঋতুবিশেষের আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে এর এমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রকাশ পায় কেন? তবে কি উদ্ভিদের এরূপ পরিবর্তন—আলোক, উত্তাপ, বৃষ্টিপাতরূপে ঋতু ভেদে যে তারতম্য প্রকাশ পায়, তার উপরেই কোনভাবে নির্ভরশীল? এই রকমের প্রশ্নেই প্রথম বিজ্ঞানীদের মনে সাড়া জাগে। প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে এসব প্রশ্নের সমাধানের উদ্দেশ্যে তাঁরা গভীরভাবে গবেষণা সুরু করেন। তার ফলে প্রকাশ পায় যে, সব উদ্ভিদের বেলায় এসব প্রশ্নের উত্তর এক নয়। কোন কোন গাছে গঠনের বিশেষ পর্যায় তাদের স্বকীয় নিয়ন্ত্রণেই সম্পন্ন হয়, পারিপার্শ্বিক কোন প্রভাবের অপেক্ষা রাখে না। আবার অনেক শ্রেণীর উদ্ভিদে ঐরূপ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার আলোক ও উত্তাপের উপর নির্ভর করে; কাজেই ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ প্রকাশ পায়।

উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন ক্রিয়ার সঙ্গে আলোক সংশ্লিষ্ট রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে, আলোক-সংশ্লেষণ ক্রিয়া। এর দ্বারা সূর্যালোকে পাতার মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলের সহযোগে শর্করা-জাতীয় পদার্থ গঠিত হয়। একভাবে এই ক্রিয়ার মাধ্যমে গাছের ফুল ও ফল ধরবার সঙ্গে আলোক সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায়, গাছের যে ডালগুলি আলোর দিকে ঝুঁকে থাকে বা বেশী আলো পায়—তাতেই বেশী ফুল ধরে। এর কারণ, আলোক-সংশ্লেষণের ফলে যে নানাপ্রকার শর্করাজাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়, ফুলের কুঁড়ি গঠনে তাদের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে, বুঝা যায়।

তাছাড়া গাছে ফুল ও ফল ধরবার ব্যাপারে আলোকের অনুরূপ প্রভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক গাছের উপরেই দিবাভাগের দৈর্ঘ্য এক নাটকীয় প্রভাব বিস্তার করে। দিনের পরিমাণ যখন ছোট হয়, কতকগুলি গাছে মাত্র তখনই ফুল ধরে। এগুলিকে বলা হয়—'সর্ট-ডে' বা ছোট দিনের গাছ। আবার কতকগুলি গাছে দিনের ভাগ যখন বড় হয় একমাত্র তখনই ফুল ধরে। ঐগুলি 'লং-ডে' বা লম্বা দিনের গাছরূপে পরিচিত হয়েছে। দিনের দৈর্ঘ্য এভাবে উদ্ভিদবিশেষের গঠন ব্যাপারে যে প্রভাব বিস্তার করে, তারই এক কথায় ইংরেজি নামকরণ হয়েছে—ফটোপিরিয়ডিজম। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে নামটি প্রথম আমদানী করেন বিলাতের বিজ্ঞানী গারনার প্রায় ৪০ বছর আগে। কোন গাছের পক্ষে দিবাভাগের যেরূপ স্থিতি অনুকূল বলে জানা যায়, তাই সে গাছের ফটোপিরিয়ডরূপে পরিচয় লাভ করে।

সব গাছের ফুল ধরবার ব্যাপার যে দিনের দৈর্ঘ্য দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, এমন নয়। অনেক গাছ আছে, যাতে ছোট দিন, লম্বা দিন—এই উভয় অবস্থাতেই ফুল ধরে। কোন কোন জাতের গোলাপ

এইরূপ নিরপেক্ষ শ্রেণীভুক্ত, সারা বছরই তাতে ফুল ধরতে দেখা যায়।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই 'সর্ট-ডে প্ল্যাণ্টের' সংখ্যা অধিক। আমন ধান, ভুট্টা, তুলা, ইক্ষু—এরা সবাই সর্ট-ডে শ্রেণীভুক্ত। শীতপ্রধান দেশে যে সব সর্ট-ডে প্ল্যাণ্ট দেখা যায়—সেগুলিতে শরৎকালে ফুল ধরে। গ্রীষ্মকালে এদের শুধু ডালপালার বৃদ্ধি হয়। শীতপ্রধান দেশে লং-ডে প্ল্যাণ্টের সংখ্যাই বেশী।

শুধু ফুল ধরবার ক্ষেত্রেই নয়—গাছের অনুরূপ গঠনের ব্যাপারও দিনের দৈর্ঘ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। দিন ছোট থাকা অবস্থায় আলু, ডালিয়া প্রভৃতি গাছের কন্দের বৃদ্ধি অধিক হয়। আবার পেঁয়াজের বেলায় অনুরূপ, দিন বড় হলেই তবে পেঁয়াজ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। গাছের বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও দিনের দৈর্ঘ্যের বিশেষ প্রভাব আছে। অনেক গাছ, দিন যখন বড় থাকে তখনই সক্রিয়ভাবে বাড়ে, আর দিন ছোট হলেই তাদের বৃদ্ধি থেমে যায় এবং পাতা বাড়তে আরম্ভ করে। অনেক সময়েই দেখা যায় যে, রাস্তায় বিজলি আলোকের কাছে যে সব গাছ থাকে, অন্য গাছের তুলনায় তাদের পাতা ঝরে পড়তে কিছু বিলম্ব হয়।

ঋতুভেদে তাপমাত্রার যে বৈষম্য ঘটে তাতেও গাছের ফুল ফোটা বা অনুরূপ গঠনের ব্যাপার প্রভাবান্বিত হয়। শৈত্যের প্রভাবেই অনেক গাছে বসন্তকালে ফুল ফোটে। উদ্ভিদের উপর শৈত্যের এই প্রতিক্রিয়ার নামকরণ হয়েছে, ভার্নে-লাইজেসন বা বাসন্তী-করণ। এখানে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। শুধু উল্লেখ করা হলো এজন্যে যে, অনেক গাছে ফুল ধরবার ব্যাপারে এই তাপমাত্রা ও দিনের দৈর্ঘ্য, উভয় অবস্থার প্রভাবই একান্তভাবে প্রয়োজন হয়। এদের কোন একটি অপূর্ণ থাকলে ঐ সব গাছে ফুল ধরে না।

ফটোপিরিয়ডিজম সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের গবেষণায় অনেক তত্ত্ব প্রকাশ পেলেও এখন পর্যন্ত গাছের উপর এর সব রকম প্রতিক্রিয়ারই যে ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে, এমন নয়। তবে গাছে ফুল ধরবার ব্যাপারে এর প্রতিক্রিয়ার কতকগুলি ব্যাপার খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমতঃ সর্ট-ডে প্ল্যাণ্টের কথাই ধরা যাক। এ সব গাছে ফুল ধরবার প্রকৃত কারণ কি? দিনের পরিমাণ হ্রাস, না রাত্রির পরিমাণ বৃদ্ধি? সাধারণ অবস্থায় পর্যবেক্ষণ থেকে এর উত্তর পাওয়া কঠিন। কিন্তু কৃত্রিম আলোর সাহায্যে ইচ্ছামত দিন-রাত্রির পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করে এর উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এখন প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে দিনের পরিমাণ হ্রাস পাবার ফলে নয়—রাত্রির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যেই এসব গাছে ফুল ধরে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সর্ট-ডে'র পরিবর্তে এসব গাছের লং-ডে প্ল্যাণ্ট—রূপেই পরিচয় পাওয়া উচিত ছিল। অনেক জাতের চন্দ্রমল্লিকা গাছে রাত্রির পরিমাণ ৮½-৯ ঘণ্টার বেশী হলেই ফুল ধরতে আরম্ভ করে।

ক্রমাগত অন্ধকারে থেকেও কোন কোন সর্ট-ডে প্ল্যাণ্টে ফুল ধরতে পারে। তবে অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারের পরিবর্তে কিছু সময় আলো পেলে ঐ সব গাছের ফুল ধরবার শক্তি অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ সর্ট-ডে প্ল্যাণ্টে ফুল ধরবার ব্যাপারটি শুধু যে অন্ধকারেরই দান এমন নয়—আলোকের প্রতিক্রিয়াও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। আলোক-সংশ্লেষণ দ্বারা উদ্ভিদ-দেহে শ্বাসক্রিয়া অব্যাহত রাখবার মত যথেষ্ট উপাদান সঞ্চিত হলেই তবে ফুল ধরবার ব্যাপারে অন্ধকারের প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে বলে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া আলোকের অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার কথাও জানা গেছে।

অন্ধকারের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণায় প্রকাশ পায় যে, সর্ট-ডে প্ল্যাণ্টগুলির রাত্রির অন্ধকার যাপনে সামান্যক্ষণের জন্যে ছেদ পড়লেও তাদের অন্ধকারের সাধনা নিষ্ফল হয়। মধ্যরাত্রে

মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যেও ঐ গাছগুলি যদি আলো পায় তাহলেও ঐ গাছে ফুল ধরে না। এরূপ আবার দিনের পরিমাণ খুব মৃদু আলো দিয়েও যদি কিছু বাড়ানো যায়, তাতেও ঐ সব গাছে ফুল ধরতে বাধা পায়। অনেক ক্ষেত্রে এই মৃদু আলোকের তীব্রতা চন্দ্রালোকের দ্বিগুণ হলেই যথেষ্ট হয়। কাজেই ঐরূপ মৃদু আলোকে আলোক-সংশ্লেষণ যতটা হতে পারে, তা অতি নগণ্য। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আলোক-সংশ্লেষণ ব্যতীত আলোকের অন্যরূপ একটি প্রতিক্রিয়াও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। সর্ট-ডে প্ল্যাণ্টে ফুল ধরবার ব্যাপারে এইভাবে আলোকের দুটি বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। অন্ধকারের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হবার পূর্বে তার প্রস্তুতি স্বরূপ একটা ন্যূনতম সময়ের জন্যে যেমন আলোক-সংশ্লেষণের প্রয়োজন, তেমনি আবার অন্ধকারের প্রতিক্রিয়া একবার আরম্ভ হলে সে সময় এই আলোকই আবার তাতে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

ক্ষণিকের আলোকপাতে কি ভাবে অন্ধকারের প্রতিক্রিয়া বিনষ্ট হয়, যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ডাঃ বর্থ-উইক সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করেন। তাঁর গবেষণায় প্রকাশ পায় যে, আলোকের লাল বর্ণালীর প্রতিক্রিয়ার ফলেই এরূপ ঘটে। রাত্রি বেলা সর্ট-ডে প্ল্যাণ্টগুলিতে অল্পক্ষণের জন্যে শুধু লাল আলো দিলেও তাতে তাদের ফুল ধরা ব্যাহত হয়। আলোকের লাল অংশ কোন নীল ও সবুজ মিশ্রিত রঞ্জক পদার্থে শোষিত হয় বলে অনুমিত হয়েছে। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও ঐ বিশেষ পদার্থটি এখন পর্যন্ত বের করা সম্ভব হয় নি।

রাত্রিবেলায় অল্প সময়ের জন্যে লাল রশ্মি প্রয়োগ করলে যেমন সর্ট-ডে প্ল্যাণ্টে ফুল ধরতে বাধা পায়, তেমনি আবার লাল রশ্মি প্রয়োগের পরেই যদি কিছুক্ষণ অতি লাল রশ্মি প্রয়োগ করা হয়, তবে লাল রশ্মি প্রয়োগের প্রভাব কেটে যায়। রাত্রি বেলা কিছুক্ষণ করে অতি লাল রশ্মি প্রয়োগ করলে সর্ট-ডে প্ল্যাণ্টে আরও তাড়াতাড়ি ফুল ধরে।

শুধু সর্ট-ডে প্ল্যাণ্টে ফুল ধরবার ব্যাপারেই নয়, আলোকানুভূতিপরায়ণ কতকগুলি বীজের অঙ্কুরোৎপাদনেও এই লাল ও অতি লাল রশ্মির পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। যে সব বীজ আলোতে রাখলে তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয় বলে জানা আছে, সে ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, আলোকের লাল অংশের প্রভাবেই তা ঘটে। শুধু লাল আলো প্রয়োগ করলেও ঐ বীজগুলি তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয়। লাল আলো দেবার পরেই আবার অতি লাল আলো প্রয়োগ করলে লাল আলোর প্রভাব কেটে যায়, অর্থাৎ বীজের অঙ্কুরোৎপাদনে বাধার সৃষ্টি হয়। এইরূপ বীজের উপর পরপর কয়েকবার লাল ও অতি লাল আলো প্রয়োগ করা হলে, শেষবারে যে আলোটি পড়ে, বীজগুলিতে তারই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। অর্থাৎ শেষবারে লাল আলো পড়লে বীজ তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয়, অতি লাল হলে অঙ্কুরিত হতে অনেক বিলম্ব ঘটে।

এইভাবে গাছে ফুল ধরবার ব্যাপার ও বীজের আলোকানুভূতির মধ্যে যে একটা নিকট সম্বন্ধ রয়েছে, শুধু তাই প্রকাশ পায় নি, কোন কোন বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি যে দিনের দৈর্ঘ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে। যেমন বার্চের বীজ, দিন যখন বড় থাকে একমাত্র তখনই ভালভাবে অঙ্কুরিত হতে পারে। দিন ছোট হয়ে গেলে এই বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয় না।

লং-ডে প্ল্যাণ্টকে অনেকাংশে সর্ট-ডে প্ল্যাণ্টেরই প্রতিবিম্ব বলা যেতে পারে। লং-ডে প্ল্যাণ্টের ফুল ধরবার ব্যাপারে রাত্রির কোন প্রভাবই নেই, একটা ন্যূনতম সময়ের জন্যেও অন্ধকারের প্রয়োজন হয় না। দিবারাত্র সব সময় আলোকে রাখলে ঐ

সব গাছে বরং তাড়াতাড়ি ফুল ধরে। দিন ছোট থাকা অবস্থায় এ-সব গাছে ফুল না ধরবার কারণই হচ্ছে, দীর্ঘ রাত্রের অন্ধকারে তা ব্যাহত হয়। রাত্রিবেলায় যদি অল্প সময়ের জন্যে আলো ফেলেও অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্নতা ভাঙ্গা যায়, তাহলে লং-ডে প্ল্যাণ্টকেও ছোট দিনের অবস্থায় ফুল ধরানো যায়। এ-ক্ষেত্রেও আলোকের লাল রশ্মিটিই কাজ করে। এভাবে শুধু লাল আলো প্রয়োগ করলেও একই ফল প্রকাশ পায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, লং-ডে ও সর্ট-ডে প্ল্যাণ্টে আলোকের প্রতিক্রিয়া বিপরীতধর্মী। এক ক্ষেত্রে যার প্রভাবে ফুল ধরে, অন্য ক্ষেত্রে তাই আবার ফুল ধরা ব্যাহত করে।

উদ্ভিদের ফুল ধারণে আলো-অন্ধকারের প্রতিক্রিয়ার বাইরের রূপ সম্বন্ধেই মাত্র এখন পর্যন্ত কিছু তথ্য প্রকাশ পেয়েছে বলা চলে। প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আর ফুল ধরে না। উদ্ভিদের মধ্যে আরম্ভ হয় তার প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি হয়তো ধাপে ধাপে নানারূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় উদ্ভিদের অভ্যন্তরে। এই প্রস্তুতি কি ভাবে অগ্রসর হয় বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত তা যথাযথভাবে অনুসরণ করে উঠতে পারেন নি। তবে এই প্রস্তুতির কোন এক পর্যায়ে পাতার মধ্যে পুষ্প-গঠনকারী কোন বিশেষ পদার্থের যে উদ্ভব ঘটে, তার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

পত্রবৃন্তের কক্ষস্থিত বর্ধনশীল বিন্দু থেকে পত্র-কুঁড়ি ও পুষ্প-কুঁড়ি, উভয়ই নির্গত হয়। এই বিন্দুগুলি প্রথমে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, অনুকূল অবস্থায় বৃদ্ধি পেয়ে কুঁড়িতে পরিণত হয়। যে সব গাছ ফুল ধারণে দিনের দৈর্ঘ্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় বলে জানা আছে, সে সব ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, শুধু পত্র-ফলকগুলিকে যদি অনুকূল অবস্থায় উন্মুক্ত রাখা যায়, তাহলে কুঁড়ির স্থানটি অন্যরূপ অবস্থায় থাকলেও সেখান থেকে কুঁড়ি বের হয়। এথেকে রাশিয়ান বিজ্ঞানী ক্যাজল্যাকজান সিদ্ধান্ত করেন যে, পাতা থেকে কোন পুষ্প-সৃজনক্ষম হর্মোন সঞ্চালিত হয়ে ঐ স্থানে পুষ্প-কুঁড়ির গঠন সম্ভব করে। তিনি ঐ কল্পিত হর্মোনের নাম দেন ফ্লোরিজেন। এর পরে আমেরিকায় কক-লেবু নামক একটি সর্ট-ডে গাছের উপর এক পরীক্ষার ফল প্রকাশ পাওয়ায় এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। একটি পুষ্পিত ককলেবু গাছের বিচ্ছিন্ন পাতা, লং-ডে অবস্থায় রক্ষিত অপর একটি ককলেবুর গাছে সংযুক্ত করে তাতে ফুল ধরানো সম্ভব হয়। ঐ ভাবে পুষ্পিত গাছের ডাল লং-ডে অবস্থায় রক্ষিত গাছে সংযুক্ত করলেও তাতে ফুল ধরতে দেখা যায়। এরূপ পর্যবেক্ষণের পরে পুষ্প-সৃজনকারী বিশেষ হর্মোনের অস্তিত্ব অস্বীকার করা কঠিন হয়। সংযোজিত পাতা বা ডাল থেকে ঐ পদার্থ সঞ্চালিত হয়ে অপর গাছে ফুল সৃজন করেছে, এক্ষেত্রে এরূপ ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। এর পরে পরীক্ষায় আরও প্রকাশ পায় যে, বিভিন্ন প্রকার গাছের পুষ্প-সৃজনক্ষম হর্মোনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উল্লিখিত উপায়ে একজাতীয় গাছের হর্মোন অন্য জাতীয় গাছে সঞ্চালনের ব্যবস্থা করলেও তাতে ফুল ধরে।

শুধু তত্ত্বের দিক থেকেই নয়—ব্যবহারিক সম্ভাবনার দিক থেকেও এ আবিষ্কারের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পুষ্প-উৎপাদনকারী উক্ত হর্মোন যদি বিশুদ্ধ অবস্থায় উদ্ভিদ থেকে পৃথক করা সম্ভব হয় এবং তার রাসায়নিক প্রকৃতি জানা যায়, তাহলে গাছে ফুল-ফল সৃষ্টি আমাদের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত হবে এবং এতে কৃষিক্ষেত্রেও যুগান্তর আনবে। কিন্তু নানা ভাবে চেষ্টা করেও বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত গাছ থেকে এই হর্মোন বিশ্লিষ্ট করতে সক্ষম হন নি। কৃতকার্যতার অন্তরায় সম্পর্কে নানারূপ সম্ভাব্য মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

এই কল্পিত হর্মোন হয়তো গাছে এত অল্পমাত্রায় থাকে অথবা পদার্থটি এতই ক্ষণস্থায়ী যে, প্রচলিত পদ্ধতি এর নিষ্কাশন ও নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট

উপযোগী নয়, এরূপ সম্ভাবনার কথা কেউ কেউ বলেছেন।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট যে সব হর্মোনের সঙ্গে পরিচয় আছে, সেই যৌগিক পদার্থগুলি বিশেষ জটিল নয়। এজন্যে ফ্লোরিজেনের গঠনও ঐরূপ সরল হবে বলেই অনেকে মনে করেন। আবার কেউ কেউ এই পদার্থটিকে কোন জটিল প্রোটিন বা নিউক্লিওপ্রোটিনরূপেও অনুমান করেছেন। জার্মেনীতে পুষ্পিত ও পুষ্পহীন অবস্থাপ্রাপ্ত জ্যান্থিয়াম গাছের প্রোটিনগুলি যাচাই করে এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেখান থেকে এ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি।

অনেকে আবার ফ্লোরিজেনরূপী কোন স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব হয়তো আদৌ নেই, এরূপ সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। বর্ধক হর্মোন দ্বারাই উদ্ভিদের সর্ববিধ গঠন ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হয় বলেই তাঁদের বিশ্বাস। তাঁদের মতে, পাতার মধ্যে এই বর্ধক হর্মোন একটা বিশেষ মাত্রা লাভ করলেই তবে উদ্ভিদে ফুল ধরে এবং এই বিশেষ মাত্রাটি দিনের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। সর্ট-ডে প্ল্যাণ্টকে যখন লং-ডে অবস্থায় রাখা যায়, তখন বর্ধক হর্মোনের পরিমাণ ঐ বিশেষ মাত্র ছাড়িয়ে বেড়ে যায়। আর লং-ডে প্ল্যাণ্টকে সর্ট-ডে অবস্থায় রাখলে হর্মোনের পরিমাণ ঐ বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত উঠতে পারে না। এই মতের পিছনে যে কোন প্রামাণ্য যুক্তি নেই এমন নয়, তাহলেও বর্তমানে অধিকাংশ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী তা স্বীকার করে নিতে পারেন নি। অক্সিনের উৎপাদন দিনের দৈর্ঘ্যের উপর কতখানি নির্ভর করে তা এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

ফটোপিরিয়ডিজম সম্বন্ধে তত্ত্বানুশীলন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যা সমাধানে সহায়ক হচ্ছে। এখন এটা বিশেষভাবেই উপলব্ধি হয়েছে যে, কোন নতুন গাছ আমদানী করতে হলে যেরূপ মৃত্তিকা ও জলবায়ুতে ঐ গাছ জন্মায় শুধু তা জানলেই যথেষ্ট হয় না, ঐ গাছের উপর দিনের দৈর্ঘ্যের প্রভাব সম্বন্ধেও অবহিত থাকতে হয়, সেরূপ অন্য অবস্থা অনুকূল থাকলেও দিন বড় বা ছোট, শুধু এ কারণেই নতুন স্থানে ঐ গাছ জন্মানো সম্ভব নাও হতে পারে।

একই জাতীয় গাছের মধ্যে নানাপ্রকার পার্থক্য থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, একই জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের গাছ একই সময়ে পরিপক্ক হয় না, আগে পরে পরিপক্কতা লাভ করে। এইরূপ আশু ও বিলম্বিত রকমের শস্যাদিতে দেখা গেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে দিনের দৈর্ঘ্য এই শ্রেণীগত বৈষম্যের কারণ। আউষে আলু গ্রীষ্মকালেও জন্মানো যায়; কারণ তাদের পক্ষে দিনের পরিমাণ বড় হওয়া প্রয়োজন। বিলম্বিত শ্রেণীগুলি শীতকালে জন্মায়। দিনের পরিমাণ ছোট থাকলেই ঐ গুলিতে আলু ধরে। এরূপ যে সব চন্দ্রমল্লিকা গাছে আগে ফুল ধরে তাদের পক্ষে লম্বা দিনের প্রভাব অত্যাবশ্যক। আবার যেগুলিতে দেরীতে ফুল ধরে, দিন ছোট হওয়ার জন্যেই তারা অপেক্ষা করে থাকে। কাজেই বিভিন্ন ঋতুতে শস্যাদি উৎপাদনে দিনের দৈর্ঘ্যের প্রভাব সম্বন্ধে এই শ্রেণীগত বৈষম্যের বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন। শীতকালে যে সব লেটুসের চাষ হয়, গ্রীষ্মকালে সেগুলি লাগালে পাতা বাড়তে পারে না, ছোট অবস্থাতেই কুঁকড়ে তাল পাকিয়ে যায়। কাজেই গ্রীষ্মকালে চাষ করতে হলে, সে সময়ে যে সব শ্রেণীর লেটুস ভালভাবে জন্মায় তাদের ভিতর থেকেই নির্বাচন আবশ্যক, নচেৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অসময়ে ফসল ফলাতে পারলে বাজার দর বেশী পাওয়া যায়। একই শস্যের মধ্যে এরূপ শ্রেণীগত বিশেষত্বের বিষয় যেখানে জানা আছে, সে ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত নির্বাচন দ্বারা বছরের বিভিন্ন সময়েই ঐ ফসল উৎপন্ন হতে পারে।

শৈত্যের প্রভাবে যে বসন্তকালে গাছে ফুল ধরে, এ সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। শস্যাদির

বীজে শৈত্য প্রয়োগ করে বীজ-ভ্রূণের মধ্যেও এই বাসন্তী-করণ বা ভার্নেলাইজেসনের প্রভাব সঞ্চার করা যায়। তার পরে ঐ বীজ থেকে যে গাছ জন্মায় তাতে ফুল ধরতে আর শৈত্য অতিক্রম করতে হয় না। বীজের সুপ্ত অবস্থা অতিক্রম করবার আগেই তাকে জলে ভিজিয়ে এই শৈত্যের অবস্থা প্রয়োগ করা হয়। তারপরে ঐ বীজ শুকিয়ে রেখে যে কোন তাপমাত্রায়ই তা থেকে ফসল উৎপন্ন হতে পারে। পূর্ণ পরিপক্কতা লাভের পূর্বেও বীজকে এভাবে ভার্নেলাইজ করা যায়। এইরূপ একই অবস্থায় বীজ-ভ্রূণের উপর লং-ডে ও সর্ট-ডে গাছের বীজকে তাদের স্ব স্ব ফটোপিরিয়ডে রেখে এই প্রভাব সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। তার পরে ঐ বীজ থেকে ফসল উৎপাদনে আর দিনের পরিমাণের জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না। দিনের পরিমাণ নিরপেক্ষ অবস্থায়ই ঐ বীজ থেকে ফসল উৎপন্ন হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ভার্নেলাই-জেসন ও ফটোপিরিয়ডের প্রক্রিয়া একই সঙ্গে বীজের উপর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ফসল উৎপাদনে অনেক স্থানে এই পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে।

বিভিন্ন উপায়ে উদ্ভিদের ফটোপিরিয়ডিজম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হওয়ায় প্ল্যাণ্টব্রিডারদের কাজেরও খুব সুবিধা হয়েছে। তারা এখন সারা বছরই কাজ চালিয়ে যেতে পারে, কোন বিশেষ ঋতুর জন্যে তাদের আর অপেক্ষা করে থাকতে হয় না। বর্ণসঙ্করের স্বভাব পর্যবেক্ষণের কাজও অনেক সুগম হয়েছে। আশু ফুল ধরাবার ব্যবস্থা দ্বারা বংশানুক্রমিক পর্যবেক্ষণ এখন বছরে একবারের অধিকও চলতে পারে।

খৃষ্টান জগতে সর্বত্রই ক্রিষ্টমাসের সময় ফুলের বাজার চড়া থাকে। অনেক স্থানে এ সময় চন্দ্র-মল্লিকা প্রায় শেষ হয়ে আসে, অথচ এর চাহিদা থাকে খুব বেশী। ঐ রকম অনেক স্থানে এখন ফুল যাতে দেরীতে ধরে, সেরূপ ব্যবস্থা করা হয়। দিন ছোট হয়ে পড়বার ফলেই গাছগুলিতে তাড়াতাড়ি ফুল ধরে। কাজেই ঐ সময় গাছগুলির উপর লং-ডে-র অবস্থা প্রয়োগ করে রাখলে গাছে তখন আর ফুল ধরতে পারে না। তার পরে সময় বুঝে ঐ ব্যবস্থা বন্ধ করলেই গাছে ফুল ধরতে আরম্ভ করে। এটা বিশেষ কষ্টসাধ্য বা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নয়, পূর্বেও এ-সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু মধ্যরাত্রে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে একটি ক্ষীণ আলো জেলে রেখেই এ কাজ সিদ্ধ হয়। তাহলেই সর্ট-ডে-র প্রভাব কেটে গিয়ে গাছগুলিকে লং-ডে-তে রাখার ফল পাওয়া যায়।

এ সব উদাহরণ থেকেই ফটোপিরিয়ডিজমের ব্যবহারিক গুরুত্ব উপলব্ধি হবে। এরপর যদি কোন দিন পুষ্প-গঠনকারী হর্মোনটি বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব হয়, তাহলে এর সম্ভাবনা আরও যে কত বেড়ে যাবে, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

প্লাষ্টিড

শ্রীপ্রতাপরঞ্জন মাইতি

গাছের পাতার রং কেন সবুজ হয় এবং ফুলের রংই বা কেন নানারকমের হয়? এই প্রশ্নের উত্তর উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর নিকট কয়েক শতাব্দী পূর্বেও অজ্ঞাত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে রবার্ট হুক্ অণুবীক্ষণের সাহায্যে উদ্ভিদ-কোষ আবিষ্কার করেন। উদ্ভিদ-কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে সব সময় এক বা একাধিক রকমের প্লাষ্টিডের অবস্থিতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হলো, প্লাষ্টিডগুলি রঞ্জক পদার্থের আধার—যে রঞ্জক পদার্থ প্রকৃতির রাজ্যে বহুবিধ বর্ণ সৃষ্টির জন্যে দায়ী। উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের অভিব্যক্তি ঘটিয়ে তোলাই প্লাষ্টিডের একমাত্র কাজ নয়—চর্বিজাতীয় পদার্থ, প্রোটিন ও শর্করা সংশ্লেষণ করবার ক্ষমতাও এদের মধ্যে বর্তমান।

উদ্ভিদ-জগতে ছত্রাক ও ব্যাক্টেরিয়ার কোষ ব্যতীত যাবতীয় জীবিত কোষেই প্লাষ্টিড বর্তমান—আর প্রাণীর দেহকোষ প্লাষ্টিডবিহীন। এককোষী প্রাণী ইউগ্লেনা হলো এর ব্যতিক্রম—খাদ্য প্রস্তুতের ধারানুযায়ী যাকে বলা যেতে পারে উদ্ভিদ-প্রাণী। ইউগ্লেনার দেহস্থ এণ্ডোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অসংখ্য ডিম্বাকার ক্লোরোপ্লাষ্ট বর্তমান—যাদের মধ্যস্থিত সবুজকণার সাহায্যে ইউগ্লেনা সবুজ উদ্ভিদের মত শর্করার সমধর্মী প্যারামাইলাম প্রস্তুত করতে সক্ষম। প্রাণীদেহের বর্ণ-মেলানিন, মেলানয়েড, ক্যারোটিন, হিমোগ্লোবিন, অক্সি-হিমোগ্লোবিন প্রভৃতি রঞ্জক পদার্থ বা পিগমেণ্টের গুণ, পরিমাণ প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—বিশেষ বিশেষ রোগ, সূর্যরশ্মি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বংশ পরম্পরায় অর্জিত গুণ প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত।

প্লাষ্টিড প্রোটোপ্লাজম-যুক্ত, বিশেষ গুণবিশিষ্ট লিপিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা-বিশেষ। প্লাষ্টিড গোলাকার, ডিম্বাকার, চক্রাকার অথবা ফিতার মত আকৃতিবিশিষ্টও হতে পারে। কোন কোন কোষে একটি মাত্র প্লাষ্টিড থাকে, আবার কোন কোন কোষে কয়েক ডজন থাকাও বিচিত্র নয়। প্লাষ্টিড কখনও নতুন তৈরী হয় না—পূর্বজাত প্লাষ্টিড থেকেই সৃষ্ট হয়। অপরিণত কোষে প্লাষ্টিড বর্ণহীন এবং কেন্দ্রীনের চারপাশে সজ্জিত থাকে। কোষের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীন থেকে দূরে সরে যায় এবং নিজ নিজ বিশিষ্ট বর্ণ ধারণ করে।

বর্ণ ও কার্যভেদে প্লাষ্টিড মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত-(১) লিউকোপ্লাষ্ট, (২) ক্লোরোপ্লাষ্ট ও (৩) ক্রোমোপ্লাষ্ট। লিউকোপ্লাষ্ট বর্ণহীন প্লাষ্টিড—সাধারণতঃ সূর্যরশ্মিতে অপ্রকাশিত যৌনকোষ, মূল ও ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের সঞ্চয়ন-কোষে বর্তমান থাকে। লিউকোপ্লাষ্ট দ্বিবিধ—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। শেষোক্ত প্রকার অ্যামাইলোপ্লাষ্ট নামে পরিচিত এবং শর্করা-সংগঠক। এদের কাজ হলো সংরক্ষণের জন্যে দ্রবণীয় শর্করা থেকে অদ্রবণীয় শর্করার দানা তৈরী করা। ক্ষুদ্রাকৃতি লিউকোপ্লাষ্ট ক্রমে অ্যামাইলোপ্লাষ্টে পরিণত হয় অথবা অবস্থানুযায়ী ক্লোরোপ্লাষ্ট বা ক্রোমোপ্লাষ্টে রূপান্তরিত হতে পারে।

ক্লোরোপ্লাষ্ট হলো সবুজ প্লাষ্টিড—সূর্যালোকে প্রকাশিত উদ্ভিদাঙ্গে বর্তমান। আলোকের অভাবে ক্লোরোপ্লাষ্ট লিউকোপ্লাষ্টে পরিণত হয়। কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুত করা এবং দ্রবণীয় শর্করা থেকে অদ্রবণীয় শর্করার দানা তৈরী করা ক্লোরো-প্লাষ্টের কাজ। উদ্ভিদের সবুজ পদার্থ ক্লোরো

প্লাষ্টস্থিত ক্লোরোফিল রক্তের লাল পদার্থ হিমো-গ্লোবিনস্থিত হিমাটিনের সমধর্মী। ক্লোরোফিলের বিশেষ কাজ হলো শর্করা উৎপাদনের জন্যে সৌর-শক্তি আহরণ করা। ক্লোরোফিলের মধ্যে চারটি পিগমেণ্ট অর্থাৎ রঞ্জক পদার্থ বর্তমান।

যথা—(১) নীলাভ-সবুজ আল্‌ফা-ক্লোরোফিল (C_{55} H_{72} O_5 N_4 Mg), (২) পীতাভ সবুজ বিটা-ক্লোরোফিল (C_{55} H_{70} O_6 N_4 Mg), (৩) কমলা-লাল ক্যারোটিন (C_{40} H_{56}) এবং (৪) পীতাভ জ্যান্থোফিল (C_{40} H_{56} O_2)।

ক্রোমোপ্লাষ্ট সবুজ ব্যতীত অন্য বর্ণের প্লাষ্টিড, যাদের বর্ণ নানাপ্রকার পিগমেণ্টের বর্তমানে পীতাভ থেকে লাল পর্যন্ত বিস্তৃত, যাবতীয় ক্রোমোপ্লাষ্টে ক্লোরোফিল বর্তমান। এ-ছাড়াও অবস্থাবিশেষে (১) ক্যারোটিন (কমলা-লাল), (২) লাইকোপিন (লাল), (৩) জ্যান্থোফিল (পীতাভ), (৪) ফাইকো সায়ানিন (নীল), (৫) সিজোফাইসিন, ফাইকো-ইরিথ্রিন (লাল), (৬) ফাইকোফিন (বাদামী), (৭) ফিউকো জ্যান্থিন (সোনালী-বাদামী, (৮) ডায়াটোমিন (সোনালী-বাদামী), (৯) ফাইকো-ইরিথ্রিন (লাল) প্রভৃতির এক বা একাধিক পিগমেণ্টের বর্তমানে উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাঙ্গ অনুরূপ বর্ণ ধারণ করে এবং প্রকৃতির শোভা বর্ধন করে। ক্রোমোপ্লাষ্ট সাধারণতঃ ফুলের পাপড়ি, ফল, গাজরের মূল প্রভৃতি অংশে বর্তমান থাকে।

একথা সুনিশ্চিত যে, উদ্ভিদরাজ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলে রয়েছে লিউকোপ্লাষ্ট, ক্লোরোপ্লাষ্ট ও ক্রোমোপ্লাষ্ট—এই তিন প্রকার প্লাষ্টিড ও এদের অন্তর্ভুক্ত পিগমেণ্টসমূহ। উদ্ভিদদেহে প্লাষ্টিডের নিয়মানুগ বিভাগ ও সমাবেশ উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রয়োজনীয় বর্ণে রঞ্জিত করে তোলে। একথা সত্য যে, প্লাষ্টিড ও তার বর্ণ নির্দিষ্ট হলেও উভয়েই সূর্যালোক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কেবলমাত্র সূর্যালোকের বর্তমানে ক্লোরোপ্লাষ্টের পক্ষে সবুজ বর্ণ ধারণ করে ক্লোরোপ্লাষ্ট হিসাবে থাকা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, অপরিণত টোম্যা-টোর-কোষের লিউকোপ্লাষ্ট টোম্যাটো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে ক্লোরোপ্লাষ্টে রূপান্তরিত হয় এবং পরিপক্ক অবস্থায় এহেন ক্লোরোপ্লাষ্ট ক্রোমোপ্লাষ্টে পরিণত হয়।

গাছের পাতা খাদ্য তৈরীর কারখানা বিশেষ—প্রধান প্রধান উপকরণ হলো পাতার গায়ের ছিদ্র-পথে আগত কার্বন ডাইঅক্সাইড, সূর্যালোকের মাধ্যমে গৃহীত সৌরশক্তি, ক্লোরোপ্লাষ্টের মধ্যস্থিত ক্লোরোফিল আর অন্তস্থ জল। ক্লোরোফিল (সবুজকণা) প্রচুর পরিমাণে বর্তমান থাকায় পাতাগুলি সবুজ দেখায়। আর ফুলগুলি? ফুল উদ্ভিদের উল্লেখযোগ্য অতি প্রয়োজনীয় অংশ—যার মধ্যে থাকে পাঁপড়ির দ্বারা আবৃত প্রজনন যন্ত্র। যৌন উপায়ে বংশবিস্তারের জন্যে পরাগ-সংযোগ একান্ত প্রয়োজন—যা ঘটে কীট-পতঙ্গের মাধ্যমে। কীট-পতঙ্গ বা অন্যান্য প্রাণীদের আকর্ষণ করবার কাজ হলো পাপড়ির—তাদের মনভুলানো বিচিত্র রূপের দ্বারা। একাজে সাহায্য করে ক্রোমো-প্লাষ্ট ও তার পিগমেণ্ট। আর এর অভাব ঘটলে পরাগমিলনের সহায়ক কীট-পতঙ্গদের আকর্ষণ কর-বার জন্যে পরিবেশন করতে হয় সুমিষ্ট রস ও সুগন্ধ। এভাবে রূপ, রস, গন্ধের ডালি দিয়ে চলে কীট-পতঙ্গের আরাধনা। তাই ফুল বহুরূপী।

উদ্ভিদের জীবনে প্লাষ্টিডের দান অতুলনীয়। ক্লোরোপ্লাষ্ট খাদ্য তৈরী, লিউকোপ্লাষ্ট শর্করা সংগঠন ও সংরক্ষণ এবং ক্রোমোপ্লাষ্ট উদ্ভিদের বংশরক্ষার কাজে নিয়োজিত। এভাবে উদ্ভিদ প্লাষ্টিডের সহায়তায় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা, বসতি-বিস্তারের দ্বারা সুকৌশলে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

রক্তের সূক্ষ্ম সঞ্চালন

শ্রীজয়া রায়

শরীরের রক্তবাহী বিধান বলতে সাধারণতঃ হৃদ্‌যন্ত্র, ধমনী ও শিরাগুলিকে বোঝায়। কিন্তু যে সূক্ষ্ম জালক শ্রেণীর ভিতর দিয়ে রক্ত ধমনী থেকে শিরায় প্রবাহিত হয়, তার কথা মনে রাখি না। প্রাণীদেহের বিভিন্ন তন্তু ও কোষের জন্যে আবশ্যকীয় খাদ্যোপাদান পৌঁছে দেওয়া এবং সেগুলির ভিতর থেকে অনাবশ্যক বা বর্জনীয় পদার্থ সরিয়ে আনবার কাজ এই সূক্ষ্ম জালক তন্তুর ভিতর দিয়েই সম্পন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ এদের সহযোগিতার ফলেই এই কোষগুলি জীবিত থাকে এবং নিজস্ব করণীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে। এই ব্যাপারে হৃৎপিণ্ড ও বৃহৎ রক্তনালীগুলি রক্ত পরিবহনের কাজ করে মাত্র।

হৃদ্‌যন্ত্রই রক্ত সঞ্চালন বিধানের কেন্দ্রস্বরূপ। এর দক্ষিণ পার্শ্বের দুটি প্রকোষ্ঠের সবল পেশীগুলি রক্ত পাম্প করে ফুস্‌ফুসে চালিত করে। সেখানে বায়ুর অক্সিজেন গ্যাসের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটবার পর রক্ত হৃদ্‌যন্ত্রের বামদিকের প্রকোষ্ঠ দুটিতে যায়। সেখান থেকে সুষুম্না নাড়ীর ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর ধমনীর সাহায্যে রক্ত শরীরের সর্বাংশে প্রবেশ করে। সবচেয়ে সূক্ষ্ম ধমনীগুলিকে আর্টেরিওল বলা হয়। এগুলি এতই সূক্ষ্ম যে, খালিচোখে দেখা যায় না। এখান থেকে রক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জালক শ্রেণীতে প্রবেশ করে এবং সর্বশেষে হৃদ্‌যন্ত্রের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে পৌঁছে।

শরীরের প্রত্যেক তন্তুর ভিতরে এই জালকগুলি এমন নিবিড়ভাবে ছড়িয়ে আছে যে, যে কোন কোষ থেকে এদের এক একটির দূরত্ব ১/২০০ ইঞ্চির বেশী নয়। জালকগুলির ব্যাস ১/২৫০০ ইঞ্চির বেশী নয়। ১ সি. সি. (কিউবিক সেন্টিমিটার বা প্রায় ১৪ ফোঁটা) রক্তের পক্ষে একটি জালকের মধ্য দিয়ে যেতে প্রায় ৭ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু জালকগুলির সংখ্যা এত বেশী যে, হৃদ্‌যন্ত্র একটি প্রাপ্তবয়স্কের শরীরের সবটুকু রক্তকে (৫ লিটার বা প্রায় ৫ সের) কয়েক মিনিটের মধ্যে একবার সারাদেহে ঘুরিয়ে আনতে পারে। সবগুলি জালক লম্বালম্বিভাবে জোড়া দিলে তার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ হাজার মাইল হবে। সুতরাং মোট আয়তন বা দৈর্ঘ্যের দিক থেকে জালক-তন্তুকে দেহের সর্ববৃহৎ তন্ত্র বলা যায়। এর মোট আয়তন যকৃতের প্রায় দ্বিগুণ।

জালকের সবগুলি একসঙ্গে খোলা থাকলে শরীরের সবটুকু রক্তই তার মধ্যে ধরে যেত, অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড, বৃহত্তর শিরা ও ধমনীগুলি একেবারে খালি হয়ে যেত। কিন্তু নানা কারণে তা ঘটে না। বিভিন্ন তন্তুর প্রয়োজন অনুসারে তার মধ্যে সঞ্চালিত রক্তের পরিমাণ কম-বেশী হয়। কিন্তু সে জন্যে কোন তন্তু বা রক্ত-সঞ্চালন ব্যবস্থার কার্যকারিতায় মোটামুটি কোন তারতম্য ঘটে না।

অনেক বছর আগে ইংল্যাণ্ডের রাজবৈদ্য উইলিয়াম হার্ভি প্রথমে দেখান যে, রক্ত ক্রমাগতই ধমনী থেকে শিরার মধ্যে সঞ্চালিত হচ্ছে। এই আবিষ্কারের ৩৩ বছর পরে ইটালীয় শারীরতত্ত্ববিদ ম্যালফ্যাগি তাঁর নিজের উদ্ভাবিত সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখান যে, কতকগুলি সূক্ষ্ম নালীর ভিতর দিয়ে রক্তের এই চলাচল ঘটে। কেশের চেয়ে সূক্ষ্ম বলে তিনি এদের ক্যাপিলারি নাম দেন। তার পরে বহু বিজ্ঞানী অণুবীক্ষণের সাহায্যে এদের অস্তিত্ব প্রমাণিত করেন এবং দেখান যে,

ধমনী, শিরা ও জালক তন্ত্র মিলে রক্ত সঞ্চালনের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

জালকগুলি এমন সূক্ষ্মভাবে বিন্যস্ত যে, তাদের কোন অংশ শরীরের বাইরে এনে তার কার্য-প্রণালী দেখা সম্ভব নয়। কোষ ও অন্যান্য তন্তুর মধ্যে নিবিড়ভাবে অবস্থিতিই এর কারণ। তবে বিশেষ বিশেষ প্রাণীর শরীরে জীবিত অবস্থায়ও এদের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। ইঁদুরকে কৃত্রিম উপায়ে সংজ্ঞাহীন করে তার পেটের বাইরের চামড়া কেটে ভিতরের পাতলা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির একটি ক্ষুদ্র অংশ অণুবীক্ষণের নীচে রেখে রক্তের সঞ্চালন প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।

জালকের নল কতকগুলি চ্যাপ্টা কোষের সমবায়ে তৈরী। এদের দেয়াল ১/১০,০০০ ইঞ্চি মাত্র পুরু। এই তন্তুকে এণ্ডোথিলিয়াম বলে। শুধু জালকের দেয়ালে নয়, যাবতীয় রক্তবাহী নালীর ভিতরের দেয়ালই এই এণ্ডোথিলিয়াম দিয়ে তৈরী।

তবে বৃহৎ রক্তবাহী নালীগুলিতে এণ্ডোথিলি-য়ামের বাইরে অন্য সূত্রাকার তন্তু এবং মাংসপেশী জড়ানো থাকে। তার ফলে এদের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। এই মাংসপেশীগুলি হাত-পায়ের সাধারণ পেশীর মত নয়। এদের সরল মাংসপেশী বলে। এগুলি ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয় এবং সেই সঙ্কোচন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। এই পেশীকোষগুলি লম্বা এবং তাদের দুই প্রান্ত সরু। এগুলি স্প্রিং-এর মত নলটিকে জড়িয়ে থাকে। একটি মাত্র পেশীকোষই সবচেয়ে ক্ষুদ্র রক্তনালীকে এক বা একাধিকবার জড়িয়ে থাকতে পারে। এদের সঙ্কোচনে জালকনালীর ব্যাস কমে ও প্রসারণে বাড়ে। জালকনালীর চারদিকে পেশীকোষ থাকে না বটে, কিন্তু তাদেরও ব্যাস কম-বেশী হতে পারে। জীবিত শরীরে জালকের ভিতরে রক্তের সঞ্চালন সব সময়েই একদিকে ঘটে না, পরস্পরের বিপরীত দিকেও ঘটতে পারে। পেশীর অবর্তমানেও জালকের ব্যাস কি ভাবে কম-বেশী হয়, তা কতকটা রহস্যজনক।

ফরাসী শারীরতত্ত্ববিদ্ রুজে, জালকের চারদিকে জড়ানো বহু কোণ-বিশিষ্ট একপ্রকার কোষ লক্ষ্য করেন। তাঁর মতে, এগুলি অপরিণত পেশীকোষ মাত্র। হল্যাণ্ডের বিশিষ্ট শারীরতত্ত্ববিদ্ ক্রোগও ১৯২০ সালে এই জাতীয় কোষের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করেন।

গত কয়েক বছরে অণুবীক্ষণের নীচে বিভিন্ন কোষের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের (মাইক্রো-সার্জারী) নানা কৌশল আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এই-সব তন্তু ও কোষের ক্রিয়া লক্ষ্য করবার সুবিধা হয়েছে। দেখা গেছে যে, এণ্ডোথিলিয়াম কোষ নিজে বা বাইরের রুজে কোষ সঙ্কুচিত হয়ে রক্ত-সঞ্চালনের বেগ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। অতি সূক্ষ্ম পিপেটের সাহায্যে কণিকামাত্র অ্যাড্রিন্যালিন জালকের নালীতে ঢুকিয়ে দিলে আর্টেরিওলের মত জালক নালীও সঙ্কুচিত হয়। নিপুণ পরীক্ষায় জানা গেছে যে, আর্টেরিওলের চারদিকে যে মাংসপেশীর আবেষ্টনী থাকে, তা জালকে প্রবেশের আগে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে বটে; কিন্তু ঠিক এই দুই রকম রকম তন্তুর সংযোগস্থলে এই আবেষ্টনী অঙ্গুরীর আকার ধারণ করে সহজেই রক্ত-সঞ্চালন নিয়মিত করতে পারে। এই বিশেষ অংশটিকে Precapillary sphincter বলে। ভ্রূণ অবস্থায় রক্তসঞ্চালন তন্ত্রের ক্রমবিকাশের সময় দেখা যায় যে, প্রথমে সমস্ত বিধানটিই এণ্ডোথিলিয়ামে তৈরী নালীর আকারে থাকে এবং অপরিণত রক্ত তার ভিতর দিয়ে এলোমেলোভাবে চলাচল করে। ক্রমে সেই বিধানের বৃহৎ নালীগুলি প্রথমে রুজে কোষের উপরে পেশীকোষের আস্তরণে ঢাকা পড়ে। প্রাপ্তবয়স্কের শরীরে এই পরিবর্তনের নানা অবস্থা বিধানের নানা অংশে দেখা যায়। এই দিক থেকে বলা যায় যে, জালক তন্ত্র সঞ্চালন-বিধানের অপূর্ণাঙ্গ বা অপরিণত অবস্থা। এই কারণেই এর বৃদ্ধির ক্ষমতা অসাধারণ। আঘাতের পরে সুস্থ হওয়ার শক্তিও এর বেশী। Sphincterগুলি কখনও খুলে,

কখনও বন্ধ হয়ে আর এক অংশে রক্তস্রোত প্রবাহিত করায়; অথবা কোন তন্তুতে রক্ত চলাচল কিছু কালের জন্যে বন্ধ করে দেয়।

এই বিধানের বিভিন্ন অংশের গঠন-প্রণালীও তন্তু অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণতঃ হাত-পায়ের যে পেশীগুলি আমাদের ইচ্ছাধীন তাদের কোষকে অণুবীক্ষণে রেখাঙ্কিত দেখায়। এদের প্রকৃতি, তাড়াতাড়ি সঙ্কুচিত হওয়া এবং তাড়াতাড়ি প্রসারিত হওয়া। সঙ্কোচনের সময় এদের মধ্যে রক্ত চলাচল বিশ্রামের অবস্থার তুলনায় দশগুণ বাড়ে। এই কারণে এদের মধ্যে জালকের সংখ্যাও অন্য তন্তুর তুলনায় ২০।৩০ গুণ বেশী। অপর পক্ষে রস-গ্রন্থিগুলিতে রক্ত মন্থর গতিতে প্রবাহিত হয় এবং এর মধ্যে জালকের সংখ্যাও কম থাকে। আবার বাইরের শীতাতপ ও আঘাত থেকে ত্বক শরীরকে রক্ষা করে বলে তার মধ্যে এমন ব্যবস্থা থাকে যে, রক্ত জালকের সহায়তা ছাড়াও ধমনী থেকে সরাসরি শিরার মধ্যে চলে যেতে পারে। এর ফলে শরীরের তাপরক্ষা সহজ হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক তন্তুর মধ্যে জালকের গঠন ও অবস্থান তার প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। বৃহত্তর রক্তনালী ও জালক নালীর মধ্যে রক্তের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা একরকমের নয়। বৃহত্তর রক্তনালীগুলিতে সাধারণতঃ দুই ভাবে এই কাজ সম্পন্ন হয়—(১) স্নায়ু বিধানের শাসনে এবং (২) হর্মোনের শাসনে। এই দুই ব্যবস্থার ফলে আবশ্যকমত এদের সঙ্কোচন ও প্রসারণ ঘটে এবং পেশীগুলি সামান্য সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে। এই অবস্থাকে tonic condition বলে। এর ফলে পেশীর স্থিতিস্থাপকতা সর্বদাই কার্যকরী থাকে বলে হৃদ্‌যন্ত্র ও বৃহৎ ধমনীগুলির কাজ সহজ হয়। এই সব ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে মস্তিষ্কে বিশেষ নিয়ামক কেন্দ্র আছে, যা বৃহৎ রক্ত-নালীতে অবস্থিত ক্ষুদ্রতর নিয়ামক কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সহযোগিতায় কাজ করে।

জালক তন্তুতে স্নায়ুঘটিত নিয়ন্ত্রণ তেমন প্রবল নয়। এই বিধানে পেশীগুলির সঙ্গে স্নায়ুর যোগ নেই বললেই হয়। রক্ত-নালীগুলি আবার যে সব তন্তুর ভিতর দিয়ে চলে, তাদের রসে সর্বদাই সিক্ত থাকে। রক্ত এবং এই রসে অবস্থিত কতকগুলি রাসায়নিক বস্তুও এই নিয়ন্ত্রণের কাজে সহায়তা করে। এই সব বস্তুর সংখ্যা এবং কার্যপ্রণালী বিস্তৃত ভাবে জানা যায় নি।

অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির বাইরের দিক থেকে নিঃসৃত কয়েকটি শক্তিশালী উত্তেজক বস্তু কর্টিকোষ্টেরয়েড রক্ত ও তন্তুতে জল এবং লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। আবার চিকিৎসায় এগুলির ব্যবহারে আর্থ্রাইটিস রোগে যথেষ্ট উপকার পাওয়া গেছে। শরীরে এদের অভাব বা কমতি হলে রক্ত-নালীগুলির টনিক অবস্থা হ্রাস পায় এবং রক্ত-চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। আর একটি রাসায়নিক পদার্থের জালক বিধানের উপর শক্তিশালী ক্রিয়া আছে। এটি অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির মধ্যের অংশে তৈরী হয়। এই পর্যায়ের আর একটি রাসায়নিক নর-অ্যাড্রিন্যালিনও এই কাজে সাহায্য করে। এটির কিছু অংশ অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থিতে ও কিছু অংশ মাংসপেশীতে পেশী ও স্নায়ুর সন্ধিস্থলে নিঃসৃত হয়। হৃদ্‌যন্ত্রে করোনারী ধমনী ছাড়া অন্য সব ধমনীর উপরেই এই দুটির ক্রিয়া আছে। আবার পেশী ও স্নায়ুর সন্ধিস্থলে আর একটি রাসায়নিক বস্তু অ্যাসিটাইল কোলিনও নিঃসৃত হয়। এর ক্রিয়া অ্যাড্রিন্যালিনের ঠিক বিপরীত। এর প্রভাবে পেশীকোষগুলি প্রসারিত হয়।

অনেক বিজ্ঞানীর মতে, অ্যাড্রিন্যালিন ও অ্যাসিটাইল কোলিনের পরস্পর বিরোধী ক্রিয়ার ফলেই ক্ষুদ্র রক্ত-নালীগুলির রক্তস্রোত নিয়ন্ত্রিত হয়। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী সোয়াই-ফাসের মতে, এই ব্যাপারটি এত সরলভাবে ঘটে না। তাঁর মতে, প্রধানতঃ এই দুটি বস্তুর সহযোগেই এই ক্রিয়া নিষ্পন্ন হলেও তন্তু ও কোষে উৎপন্ন আরও

কয়েকটি বস্তুর প্রভাবও অগ্রাহ্য করা যায় না। বিভিন্ন তন্তু থেকে নিষ্কাশিত কয়েকটি বস্তু যে ক্ষুদ্র রক্ত-নালীকে প্রসারিত করে, তা আগেই জানা গেছে। প্রধানতঃ কোষগুলির ক্রিয়া যখন দ্রুত চলতে থাকে, তখনই এই বস্তুগুলির উদ্ভব হয়। Precapillary sphincter-গুলির কাছাকাছি স্থানে এই জাতীয় পদার্থ জমা হলে তাদের অঙ্গুরী-পেশী বা Sphincter-এর ক্রিয়া মন্থর হয়ে পড়ে। তার ফলে রক্তের চলাচল বাড়তে থাকে এবং আশেপাশে তন্তুগুলির ক্ষয়-ক্ষতি দূর হয়ে তাদের পুষ্টি পুনঃপ্রবর্তিত হয়। তন্তুর পোষণ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই অঙ্গুরী-প্রসারণ ক্রিয়া চলতে থাকে। তন্তুগুলিও রক্তের স্রোতে আবশ্যকীয় পোষক বস্তু পাওয়ার পর আর তার পূর্বোক্ত উত্তেজক বস্তু নিঃসরণ করে না। তখন অঙ্গুরীর পেশীগুলি ধীরে ধীরে তাদের সঙ্কোচনের অবস্থা ফিরে পায় এবং জালকের মধ্যে রক্তের গতি মন্দীভূত হয়ে পড়ে। আর্টেরিওলের পেশী-কোষগুলি এই সব রাসায়নিক উত্তেজক বস্তুর বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। একটি বৃহত্তর রক্ত-নালীর সঙ্কোচনের জন্যে যে পরিমাণ উত্তেজক পদার্থের দরকার, তার $\frac{১}{১০০০}$ ভাগেই আর্টেরিওলের সঙ্কোচন ঘটায়। আগে যে সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের কথা বলা হয়েছে, তার ফলে জানা গেছে যে, জীবিত ইঁদুরের শরীরে এক মিলিগ্র্যামের দশলক্ষ ভাগের এক ভাগ অ্যাড্রিন্যালিন জালকে সূক্ষ্ম পিপেটের সাহায্যে প্রয়োগ করলে প্রথমে জালকের অঙ্গুরীগুলি বন্ধ হয়ে যায়। তার পরে সেই সঙ্কোচন আর্টেরিওলের উপরে ক্ষুদ্র শিরা-গুলিতে বিস্তৃত হয়। আবার অ্যাসিটাইল কোলিন প্রয়োগে ঠিক এর বিপরীত ফল দেখা যায়। যে পরিমাণ উত্তেজক বস্তু এই কাজ করে, বৃহত্তর রক্ত-নালীগুলির উপর তার ক্রিয়া নেই।

মাংসপেশীর টনিক কণ্ডিসন সম্ভবতঃ স্নায়ুপ্রান্ত থেকে নিঃসৃত নর-অ্যাড্রিন্যালিন এবং রক্তে প্রবাহিত অ্যাড্রিন্যালিন—এই দুইয়ের ক্রিয়ায় রক্ষিত হয়। এছাড়া তন্তুতে অবস্থিত অক্সিজেন-নিরোধক কতকগুলি সালফ্‌হাইড্রিল জৈব বস্তুতেও এই ব্যাপারের প্রভাব আছে। এগুলি উপস্থিত থাকলে অ্যাড্রিন্যালিন ও নর-অ্যাড্রিন্যালিনের সঙ্গে অক্সি-জেনের যোগ কম হয়। সুতরাং এই বস্তুগুলি নষ্ট না হওয়ায় তাদের ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয়।

মনে রাখা দরকার যে, স্নায়ুর দ্বারা প্রভাবিত বৃহৎ রক্ত-নালীগুলিও নিজেদের সঙ্কোচন-প্রসারণে শরীরের এক অংশ বা তন্তু থেকে রক্ত আর এক অংশে চালিত করতে সহায়তা করে; অর্থাৎ বৃহৎ রক্ত-নালীগুলি স্নায়ুর দ্বারা এবং ক্ষুদ্র নালীগুলি রাসায়নিক উত্তেজক পদার্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে উভয়ে মিলে বিভিন্ন তন্তুতে রক্তের চাহিদা মেটায়। সাধারণ অবস্থায় নিষ্ক্রিয় তন্তুতে রক্তের পরিমাণ কম থাকে এবং সক্রিয় তন্তুতে বেশী থাকে। প্রবল আঘাত বা প্রবল সংক্রামক রোগে বিভিন্ন তন্তুর রক্তের চাহিদা মেটান কঠিন হয়ে পড়ে। তখনই স্নায়ু-শাসনে অ্যাড্রিন্যালিন নিঃসরণের ফলে জালকের অঙ্গুরীগুলি বন্ধ করবার চেষ্টা বিফল হয় এবং তাতেও আক্রান্ত তন্তু থেকে নিঃসৃত প্রসারক বস্তু উদ্ভবের ফলে জালকে রক্তের প্রবাহ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বৃহত্তর নালীগুলি কতকটা রক্তশূন্য হয়ে পড়বার ফলে সঞ্চালন ক্রিয়া চালানো এমন কঠিন হয়ে পড়ে যে, রোগী বা আহত ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়।

কুমেরুর দেশে

শ্রীদেবেশ চক্রবর্তী

অ্যাণ্টার্কটিকা মহাদেশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অল্প দিনের। যদিও লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অন্য ছয়টি মহাদেশের সঙ্গে পৃথিবী-পৃষ্ঠে অবস্থান করছে, তবু অ্যাণ্টার্কটিকায় মানুষের পদার্পণ ঘটেছে সর্বশেষে। এমন কি দু-শ' বছর পূর্বেও এই মহাদেশটির অস্তিত্বের কথা অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করতো না। অ্যাণ্টার্কটিকার অস্তিত্ব তখনও কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় লোকের কল্পনাতেই ছিল।

ইউরোপের রেনেশাঁর সঙ্গে অ্যাণ্টার্কটিকার আবিষ্কারের কাহিনী বিশেষভাবে জড়িত। রেনেশাঁর আগমনে সারা ইউরোপে এক নতুন উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। কুসংস্কারের গণ্ডী ভেঙ্গে ইউরোপবাসী বেরিয়ে পড়েছিল দিকে দিকে, নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায়। এই সময়েই ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের একদিন ইংল্যাণ্ডের প্লীমাউথ বন্দর থেকে ক্যাপ্টেন জেম্‌স্‌ কুক্‌ দুটি জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। উদ্দেশ্য—পৃথিবীর দক্ষিণপ্রান্তে যাবেন, অ্যাণ্টার্কটিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সব সন্দেহের নিরসন করবেন। কুকের এই ঐতিহাসিক সমুদ্রযাত্রায় ব্যবহৃত জাহাজ দুটির নাম 'অ্যাডভেনচার' ও 'রিজলিউট'।

দক্ষিণ মেরু বা কুমেরুর অবস্থান ৯০° ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশে। এর উত্তরে ৬৬ ডিগ্রি ৩৬ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড বা মোটামুটি ৬৬½ ডিগ্রি অক্ষাংশকে বলা হয় কুমেরুবৃত্ত। যাত্রা করবার প্রায় ছয় মাস পরে ১৭৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে কুক কুমেরুবৃত্ত অতিক্রম করেন। কুকের জাহাজ ৬৭° ডিগ্রির কিছু দক্ষিণে গিয়ে আর অগ্রসর হতে পারে নি। সেখান থেকেই সমুদ্রের উপরিভাগের জল জমে বরফ হয়েছিল। প্রবল ঝড় এবং ভাসমান বরফস্তূপের সঙ্গে সংঘর্ষের ভয়ে কুক সেখান থেকে জাহাজ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হন। কয়েক মাস পরের দ্বিতীয় চেষ্টায় ৭১° ডিগ্রি পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দেশে ফিরে এসে কুক তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন। তুষারের পুরু স্তর ও ভাসমান হিমশৈল ছাড়া কোন স্থলভাগ তাঁর দৃষ্টিপথে আসে নি। জীব বলতে কেবল বিরাটকায় তিমি, পেঙ্গুইন এবং ধূসর রঙের আলবাট্রস্‌ পাখী। প্রবল শীত ও তুষার-ঝড় এখানকার একমাত্র ঘটনা। স্বাভাবিক তাপমাত্রা 0°—ফলে সমুদ্রের জল জমে আছে।

ক্যাপটেন কুকের অভিযান থেকে ইউরোপবাসীদের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হলো—দক্ষিণে কোন মহাদেশ বোধ হয় নেই। যদিও বা থাকে, তার অবস্থান আরো অনেক দক্ষিণে। কুকের ব্যর্থতায় ফলে ইউরোপে অ্যাণ্টার্কটিকা সম্বন্ধে উৎসাহে ভাঁটা পড়লো। অ্যাণ্টার্কটিকার কথা লোকে ধীরে ধীরে ভুলে গেল। পর্যটকদের মনেও আর কুমেরু অভিযানের কথা স্থান পেল না। সিল ও তিমির প্রাচুর্যের কথা শুনে শুধু মৎস্য-শিকারীরা অ্যাণ্টার্কটিকা সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে উঠলো। কুকের প্রায় ৬০।৭০ বছর পরে সিল ও তিমি-শিকারীরা দলে দলে ছুটলো দক্ষিণ প্রান্তের দিকে। দক্ষিণ আমেরিকার জর্জিয়া দ্বীপে ঘাঁটি করে তারা ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে কুমেরু মহাসাগরে মাছ শিকার করতে যেত। এসব সিল ও তিমি-শিকারীদের চোখেই অ্যাণ্টার্কটিকার স্থলভাগের কোন কোন অংশ ধরা পড়ে। কিন্তু এরা মহাদেশের কতখানি আবিষ্কার করতে পেরেছিল, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নি।

মৎস্য শিকারীদের পরে অ্যাণ্টার্কটিকা আবার দীর্ঘদিন বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে রইলো। রবার্ট ফ্যাল্‌কন স্কট নামে একজন ইংল্যাণ্ডবাসী এখানে প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ অভিযান করেন। ক্যাপ্টেন স্কটের দলের একজন সভ্য ছিলেন আর্নেষ্ট শ্যাকল্‌টন। মালপত্র টেনে নিয়ে যাবার জন্যে স্কট নিয়ে গেলেন হস্‌কি কুকুর। এই কুকুরগুলি নরওয়ে থেকে আনা এবং খুব শীতসহিষ্ণু। তুষারের উপর দিয়ে স্লেজগাড়ী টেনে নিতে এরা সুপটু। স্কটের দলের সভ্যদের পরিধানে ছিল শীতরোধক পুরু চামড়ার পোষাক। দলের অনেকেই পূর্বে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে আল্পস্ পর্বত ও গ্রীনল্যাণ্ড সফর করে এসেছিলেন।

স্কটের জাহাজ নোঙর করেছিল অ্যাণ্টার্কটিকার উপকূলের নিকটে একটি ভাসমান বিস্তৃত তুষারশৈলের উপরে। এই তুষারশৈলের অন্য প্রান্ত স্থলভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিল। স্কট তুষারাবৃত স্থলভাগের উপর শিবির স্থাপন করেন। সব খাদ্রব্যাদি এনে রাখা হলো এখানে। অ্যাণ্টার্কটিকায় ছয় মাস দিন, ছয় মাস রাত্রি। রাত্রি নেমে আসবার পূর্ব পর্যন্ত দলের লোকেরা বরফের উপর স্কী করা অভ্যাস করেন; কারণ পথে কুকুরগুলি অচল হয়ে পড়লে স্কী ছাড়া আর চলবার উপায় নেই।

সুদীর্ঘ রাত্রির অবসান ঘটলে স্কটের দল রওনা হলো—লক্ষ্য স্থল দক্ষিণ মেরু। মেরুবিন্দু শিবির থেকে প্রায় ৮০০ মাইল দূরে। অবিরাম পথচলার আর শেষ হয় না। শীত ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে কুকুরগুলি এক এক করে মারা গেল। তার উপর হলো খাদ্যাভাব। মৃত কুকুরগুলিকে খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এদিকে কৌটার বাসি খাদ্য খাওয়ার কুফলও দেখা দিল। স্কার্ভিরোগে আক্রান্ত হলেন দলের প্রত্যেকেই। দাঁতের মাড়ি, পায়ের তলা ফুলে উঠলো রোগের লক্ষণরূপে। দলের মধ্যে বিশেষ করে শ্যাকল্টন সম্পূর্ণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সঙ্গীরা তাঁকে কাঁধে নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। কয়েক শত মাইল অগ্রগতির পর অর্ধমৃত অবস্থায় ক্যাপটেন স্কট ও তাঁর অনুচরেরা শিবিরে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন এবং সেখান থেকে যাত্রা করেন সোজা ইংল্যাণ্ডের দিকে।

দেশে ফিরে এসে শ্যাকল্‌টন ভুলতে পারেন নি যে, তাঁর অসুস্থতার জন্যে অভিযানের অগ্রগতি অনেকখানি ব্যাহত হয়েছিল। তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে তাঁর প্রায় পাঁচ বছর লাগলো। ১৯০৭ সালের শেষভাগে শ্যাকল্‌টন নিজে আবার যাত্রা করেন অ্যাণ্টার্কটিকা অভিমুখে। বরফের উপর গাড়ী টানবার জন্যে হস্‌কি কুকুরের পরিবর্তে মাঞ্চুরিয়ার টাট্টু ঘোড়া নেওয়া হলো।

একটি মালভূমির উপরে দক্ষিণ মেরু অবস্থিত। পৃথিবীর বহু বৃহৎ হিমবাহের লীলাভূমি হলো এই কুমেরু মালভূমি। দক্ষিণ মেরু যাওয়ার পথ গেছে এসব হিমবাহের উপর দিয়ে। আজকাল যে হিমবাহটি বেয়ার্ডমোর হিমবাহ নামে বিখ্যাত হয়েছে, সেটি আবিষ্কার করেন শ্যাকল্‌টন তাঁর এই অভিযানের সময় (ডিসেম্বর, ১৯০৮)। বেয়ার্ডমোর নামে একজন ইংরেজ তাঁর মেরু-অভিযানের ব্যয় বহন করেন বলে স্যাকল্‌টন এই হিমবাহের সঙ্গে ঐ নাম যুক্ত করে দেন।

কিন্তু মেরুবিজয় বোধ হয় শ্যাকল্‌টনের অদৃষ্টে লেখা ছিল না। টাট্টু ঘোড়াগুলি শীতে ও পরিশ্রমে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। এই ঘোড়াগুলির পা সহজেই বরফের ভিতর ঢুকে যেত। যাত্রাপথের বেয়ার্ডমোর হিমবাহ ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। বরফের পাত্‌লা স্তর দিয়ে ঢাকা গভীর গর্ত ও ফাটল ছিল সর্বত্র। কয়েকটি ঘোড়া পা পিছলে গর্তে পড়ে গেল। দলের কেউ কেউ পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন। মেরুজয়ের সব আশা বিলুপ্ত হলো। কুমেরুর তিনশত মাইল দূরে থাকতেই শ্যাকল্টন

ফিরে চললেন শিবিরের দিকে। কুমেরুর অপরাজিত আখ্যা অক্ষুণ্ণ রইলো।

এদিকে ইংল্যাণ্ডে ক্যাপ্টেন স্কট আবার প্রস্তুত হলেন নতুন করে অভিযানের জন্যে। এবার তাঁর সঙ্গী হলেন ডাঃ উইলসন, ইভান্স এবং বাওয়ার্স। কিন্তু স্কটের অজ্ঞাতে নরওয়ের অ্যামুণ্ডসেন কিছু পূর্বেই কুমেরু অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। যাত্রার দিনেও স্কট অ্যামুণ্ডসেনের প্রচেষ্টার কথা বিন্দুবিসর্গ জানতেন না।

অভিযাত্রী হিসাবে অ্যামুণ্ডসেন ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ। যাত্রার সবকিছু ব্যবস্থা তিনি নিজের হাতে করেছিলেন। সাজসরঞ্জাম ও খাদ্যের কোন অভাব যাতে না হয়, সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। ভাগ্যও ছিল তাঁর অনুকূল। অ্যান্টার্কটিকার অন্যান্য পর্যটকদের মত তাঁকে খাদ্যাভাব ও ক্রমাগত তুষার-ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় নি। ঐ সময়ে আবহাওয়া ছিল আশ্চর্য রকমের শান্ত।

১৯১১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর অপরাহ্ন তিনটার সময় অ্যামুণ্ডসেন দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ করেন। দক্ষিণ মেরুর উপরে নরওয়ের পতাকা উত্তোলন করা হলো। বিজয়-গর্বে অ্যামুণ্ডসেন দেশে ফিরে গেলেন। প্রায় এক মাস পরে ক্যাপ্টেন স্কটের দলও দক্ষিণ মেরুতে উপনীত হন এবং নরওয়ের পতাকা দেখে স্কট বুঝতে পারেন, বিজয়ের গৌরব তাঁর প্রাপ্য নয়; অ্যামুণ্ডসেন তাঁর পূর্বেই সফল হয়েছিলেন। এই ভাগ্য সঙ্কটে একমাত্র সান্ত্বনা ছিল এই যে, অ্যামুণ্ডসেন মেরুর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে পারেন নি। স্কট উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে অবস্থান নিরূপণ করেন। কিন্তু অ্যামুণ্ডসেনের গৌরব তাতে ম্লান হলো না। অ্যামুণ্ডসেন মেরুবিন্দুকে ঘিরে এক বিশাল বৃত্তের চারধারে নরওয়ের পতাকা স্থাপন করে রেখেছিলেন। ঐ বৃত্তের ব্যাস ছিল কয়েক মাইল।

১৯ শে জানুয়ারী স্কট দলবলসহ শিবিরের দিকে ফিরতি যাত্রা সুরু করেন। দলের সবাইর মনে হতাশা। আট শত মাইল পথ পার হতে হবে। অসহ্য হিম আর অবিরাম তুষার-ঝড় পথের সর্বত্র। বার বার যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়। খাদ্যের সঞ্চয়ও ফুরিয়ে আসে। প্রবল শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে হলে গরম পানীয়ের প্রয়োজন। কিন্তু জল গরম করবার জন্যে পেট্রলও অবশিষ্ট নেই। স্কটের অন্যতম সহকারী ইভান্স উন্মাদ হয়ে গেলেন, কিন্তু তবুও পথ-চলার শেষ হয় না। কয়েকদিন পরে ইভান্সের মৃত্যু হয়। বেয়ার্ডমোর হিমবাহের তুষার আস্তরণের মধ্যে গর্ত কেটে ইভান্সকে সমাহিত করা হয়।

দলের অন্যান্য লোকের ভাগ্যও অনুরূপ ছিল না। মূল শিবির থেকে ১১ মাইল দূরে তাঁরা এক ভয়াবহ তুষার-ঝড়ের সম্মুখীন হন। এই ঝড় কয়েকদিন স্থায়ী হয়। ফলে তাঁরা আর অগ্রসর হতে পারেন না। সেখানেই অনশনে স্কট ও তাঁর সঙ্গীরা তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করেন। প্রায় আট মাস পরে শিবির থেকে উদ্ধারকারীদল ঐ স্থানে আসে। অত্যধিক হিমে মৃতদেহগুলি তখনও অবিকৃত অবস্থায় ছিল।

মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত স্কট তাঁর ডায়েরী লিখেছেন। এই বিয়োগান্ত পরিণামের পূর্বের ইতিহাস এই রোজনামচায় লিখিত আছে। স্কটের পরে একে একে আরো অনেক পর্যটক অ্যান্টার্কটিকায় আসেন। ডাঃ মওসনের নাম এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। অ্যান্টার্কটিকা অভিযানে সর্বপ্রথম বিমান ব্যবহার করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীর অ্যাডমিরাল বার্ড। ১৯১২ সালে তিনি কুমেরুর মালভূমির উপর দিয়ে বিমানে উড়ে যান। দ্বিতীয় বারেও বার্ড কুমেরুর উপর দিয়ে উড়ে যেতে সক্ষম হন।

বার্ডের পরে অ্যান্টার্কটিকায় বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে বহু অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ফলে অ্যান্টার্কটিকার ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু এবং আয়তন সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে অনেক জ্ঞানলাভ করা

সম্ভব হয়েছে। জানা গেছে, এই মহাদেশের আয়তন পঞ্চাশ লক্ষ বর্গ মাইলের বেশী—ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়ার মিলিত আয়তনের প্রায় সমান। মহাদেশটি মোটামুটি বৃত্তাকার। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে সাড়ে দশ হাজার ফুট বা প্রায় দু-মাইল উঁচু। মহাদেশের সমগ্র উপকূলকে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত। এগুলি ভেদ করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়।

অ্যাণ্টার্কটিকার সব মালভূমি, সমভূমি, পাহাড়-পর্বত তুষারাবৃত। কুমেরু—ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরু একটি বিশাল মালভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত। কুমেরুর মালভূমির উপরে বরফের যে স্তর রয়েছে, তা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট পুরু। নিউইয়র্কের ১০২-তলা বাড়ীর মত চারখানি বাড়ী এই তুষার স্তূপের নীচে অনায়াসে ঢেকে রাখা যায়।

পৃথিবীর বহু বৃহৎ হিমবাহের অবস্থিতিও এই কুমেরুর মালভূমিতে। দক্ষিণ মেরুতে যাবার পথ গেছে এসব হিমবাহের উপর দিয়ে। বিখ্যাত বেয়ার্ডমোর হিমবাহটি আবিষ্কার করেন মেরু-পর্যটক স্যাকল্টন ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। হিমবাহটির প্রস্থ কোন স্থানে চৌদ্দ মাইলেরও বেশী। অগুণ্তি ফাটল ও গহ্বর এই হিমবাহের উপর দিয়ে পথটিকে বিপজ্জনক করে রেখেছে। দ্বিতীয় অভিযানের সময় স্কটকেও এই হিমবাহ অতিক্রম করতে হয়েছিল। তাঁর সহকর্মী ইভান্সের কবর দেওয়া হয়েছিল এই হিমবাহেরই একটি গর্তে।

অ্যাণ্টার্কটিকার স্কেলটন হিমবাহও বিখ্যাত। এসব হিমবাহ স্থির হয়ে থাকে না। ধীরে ধীরে ঢালু সমুদ্রোপকূলের দিকে নেমে যেতে থাকে। এজন্যে কয়েকটি হিমবাহের সম্মুখভাগ উপকূল অতিক্রম করে সমুদ্রে ভেসে আছে। হিমবাহগুলির জলে ভাসমান অংশের বৈজ্ঞানিক নাম শেলফ্ আইস বা শেলফ্ ব্যারিয়ার। ফ্লিকনার, স্যাকল্টন ও রস্—এই তিনটি শেলফ্ ব্যারিয়ারের নাম উল্লেখযোগ্য। আয়তনে বৃহত্তম রস্ শেলফ্ ব্যারিয়ার, ফ্রান্সের সমান। পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য ৬০০ মাইলেরও বেশী—এর ৪০০ মাইল সমুদ্রবক্ষে। এর তুষারের স্তর ৬০০ ফুটের মত পুরু। এই ৬০০ ফুটের মধ্যে ৫০০ ফুট জলের তলায় থাকে। অ্যামুণ্ডসেন, স্কট, বার্ড এঁরা প্রত্যেকেই রস্ ব্যারিয়ারের উপরে শিবির স্থাপন করেছিলেন।

শৈত্যের দিক থেকে সাইবেরিয়ার ভারখয়-আনস্কও অ্যাণ্টার্কটিকার কাছে হার মানে। থার্মোমিটারের পারা এখানে শূন্য ডিগ্রির উপরে খুব কমই আসে। -৫০° বা -৬০° স্বাভাবিক তাপাঙ্ক। মেরু অঞ্চলে উষ্ণতা -৮৫° পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। স্বল্পকাল স্থায়ী গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২০° ডিগ্রির কাছাকাছি থাকে। সুমেরুর মত কুমেরুতেও ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি।

সাম্প্রতিক কালে অ্যাণ্টার্কটিকায় যে সব অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে, তার মধ্যে ডাঃ ফুক্‌সের অভিযান নানা কারণে খ্যাতিলাভ করেছে। এত ব্যাপক অভিযান কুমেরু অঞ্চলে এই সর্বপ্রথম। এই অভিযানে ট্যাঙ্ক বুলডোজার প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়েছিল। দলের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছে বেতার। অভিযানের উদ্যোক্তা ছিল বৃটিশ কমনওয়েলথের কয়েকটি দেশ। দক্ষিণ আফ্রিকা, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড অভিযানের ব্যয় বহন করে। দলের লোক-সংখ্যা ছিল বারো জন। বৃটেনের ভিভিয়ান ফুক্‌স্ ছিলেন দলের নেতা। অভিযানের নামকরণ হয়েছিল—কমনওয়েলথ ট্র্যান্স-অ্যাণ্টার্কটিক এক্সপিডিসন।

ফুক্‌সের পরিকল্পনা অনুযায়ী দলটির যাত্রা আরম্ভ হয় অ্যাণ্টার্কটিকার পূর্বপ্রান্তে, স্যাকল্টন ঘাঁটি থেকে। স্থির ছিল, এই দল দক্ষিণ মেরু অতিক্রম করে মহাদেশের বিপরীত প্রান্তে স্কট-ঘাঁটিতে পৌঁছে যাত্রা সমাপ্ত করবেন। এদিকে আর একটি ছোট দল একই সময়ে স্কট-ঘাঁটি থেকে রওনা হয়ে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যাবে। পথে আগামী দলটির

জন্যে এঁরা কয়েকটি শিবির স্থাপন করে যাবেন। এই দ্বিতীয় দলের নেতা ছিলেন এভারেষ্ট-বিজয়ী হিলারি।

ডাঃ ফুক্সের পরিচালনায় মূল দলটির যাত্রার সূচনা হয় ১৯৫৭ সালের ২৪শে নভেম্বর। পথ যথারীতি তুষারাবৃত এবং বন্ধুর। ঝড়, তুষারপাত, কুজ্ঝটিকা নিত্যসঙ্গী। একবার দলের একটি মানুষ বোঝাই ট্যাঙ্ক অল্পের জন্যে গহ্বরে পতনের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। কয়েকবার যাত্রা স্থগিত রইল তুষার-ঝড়ের জন্যে। কিন্তু ফুক্সের উৎসাহ অদম্য। মানুষের প্রবল উৎসাহ ও দৃঢ় সংকল্পের কাছে কুমেরু আবার হার মানলো। ১৯৫৮ সালের ১৯শে জানুয়ারী অভিযাত্রীরা দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ করেন। দক্ষিণ মেরুতে আমেরিকার গবেষণা কেন্দ্র অ্যামুণ্ডসেন-স্কট ষ্টেশন। আমেরিকানরা বিপুল অভ্যর্থনা জানালো। হিলারিও দলবল নিয়ে ফুক্সের জন্যে এখানে অপেক্ষা করছিলেন।

দক্ষিণ মেরু থেকে ফুক্স্ আবার যাত্রা করেন পশ্চিম উপকূলের স্কট-ঘাঁটির উদ্দেশ্যে। তাঁর অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হয় মার্চের দুই তারিখে। স্কট-ঘাঁটিতে অনাড়ম্বর উৎসবের মাধ্যমে ফুক্স্ ও তাঁর দলকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। ইংল্যাণ্ড থেকে রাণী এলিজাবেথের অভিনন্দন এসে পৌঁছলো। রাণী তাঁর বাণীতে বললেন—আপনাদের সুকঠিন এবং রোমাঞ্চকর অভিযানের পরিসমাপ্তিতে আমার স্বামী এবং আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে এবং দলের প্রত্যেক সভ্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই মহৎ প্রচেষ্টায় আপনাদের সফলতার ফলে জ্ঞানের ভাণ্ডারে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটলো।

এই অভিযানে ফুক্স্ ২১৫৮ মাইল পথ অতিক্রম করেন। থেরন পর্বতমালা, টাচডাউন পাহাড়, স্যাকল্টন পর্বতশ্রেণী এই অভিযানের ফলেই আবিষ্কৃত হয়। উপরিউক্ত নামগুলিও ফুক্সেরই প্রদত্ত। ফুক্সের পর্যটনের পরও অ্যাণ্টার্কটিকার অধিকাংশ স্থান মানুষের অগম্য রয়ে গেছে। বহু পাহাড়-পর্বত, আগ্নেয়গিরি এখনও মহাদেশের নানা স্থানে আত্মগোপন করে আছে। যে কয়টির সঙ্গে আমাদের সম্প্রতি পরিচয় ঘটেছে, তার মধ্যে ফেদার ও নেওয়াল পর্বতের নাম করা যেতে পারে। মেরুর তিনশত মাইল দক্ষিণে রয়েছে কুইন-মাউদ পর্বতশ্রেণী। একটি দুর্গম অঞ্চলে কয়েক সারি পাহাড়ের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। এদের নামকরণ হয়েছে কুইন-আলেকজান্দ্রা।

অ্যাণ্টার্কটিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অসহ্য শীত। কোন প্রাণীর পক্ষে জীবনধারণ করা বিশেষ কষ্টকর। গ্রীষ্মকালে কয়েক জাতের পাখী উড়ে আসে এখানে। তার মধ্যে বৈচিত্র্যে পেঙ্গুইনই পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই পাখীগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে বসে থাকে। এম্পারার উপসাগরের নিকটে প্রায় কুড়ি হাজার রাজ-পেঙ্গুইন একসঙ্গে দেখা গেছে।

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বর্ষের সূচনা থেকে আরম্ভ করে বহু বিজ্ঞানী এখন পর্যন্ত অ্যাণ্টার্কটিকায় গবেষণা-কার্যে রত আছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র এই মহাদেশে বৈজ্ঞানিকদল প্রেরণ করেছে। মেরু-জ্যোতি, জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এই সব গবেষণার লক্ষ্য।

মার্কিন গবেষণা কেন্দ্রটি দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত। রাশিয়ার প্রধান কেন্দ্র মেরুর নিকটে মিরনিতে। কিছুদিন পূর্বে মিরনির নিকটে হেসওয়েল দ্বীপে সোভিয়েট বিজ্ঞানী এক অদ্ভুত ধরণের হিমশৈল আবিষ্কার করেছেন। এগুলির নাম রাখা হয়েছে সুরেলা হিমশৈল।

হিমশৈলগুলির গায়ে বড় বড় ফাঁপা গহ্বর আছে। গহ্বরগুলি দিয়ে বেগে বায়ু প্রবেশ করবার ফলে একপ্রকার সুমিষ্ট শব্দের সৃষ্টি হয়। বিখ্যাত মৃত্যু-উপত্যকাও রাশিয়ার বিজ্ঞানীদেরই আবিষ্কার।

অ্যাণ্টার্কটিকার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। এই মহাদেশ কোন্ রাষ্ট্রের অধিকারে থাকবে, সে নিয়ে বর্তমানে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বৃটেন, নরওয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, আর্জেন্টিনা, চিলি প্রভৃতি রাষ্ট্র এই মহাদেশের বিভিন্ন অংশের মালিকানা দাবী করছে।

বিজ্ঞান ও সংস্কার

শ্রীনির্মলচন্দ্র দে

বর্তমান জগতে বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে জীবনের সঙ্গতি রক্ষা করে চলবার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। যে দেশ এই প্রবাহের বিরুদ্ধতা করবে, সে দেশকে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে নির্বীর্য হয়ে কালক্রমে অধঃপাতে যেতে হবে। প্রাচীন গৌরবের মোহে বর্তমান দুর্গতিতে স্বস্তিলাভ সম্ভব নয়।

জগৎ স্থির থাকছে না। সব দেশেই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সম্পদ লাভের অভিযান চলছে। এই অভিযানের সহায় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অভিনব তত্ত্ব ও তথ্যাদি এবং প্রাচীন সংস্কৃতি যা এই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সহায়ক। কিন্তু প্রাচীন সব কিছু আঁকড়ে থাকলে প্রগতি সম্ভব নয়। বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ এমন অনেক দৃঢ়মূল সংস্কার আছে, যাতে বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অবৈজ্ঞানিক সংস্কার বিসর্জন না দিলে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না।

অতীত যুগের অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ত্যাগ করে বিজ্ঞানের অগ্রগতি-প্রসূত শিল্প-বিপ্লবকে সাগ্রহে গ্রহণ করতে হবে। নতুন জগতে কল-কারখানা, বিবিধ শিল্পকলা ও কারিগরি বিদ্যায় বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে শিল্পপ্রধান জটিল সভ্যতা গড়ে উঠেছে। প্রাচীন সরল গ্রামীণ সভ্যতায় প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়। প্রাচীন সংস্কৃতির যা কিছু মহৎ ও উদার, তার সঙ্গে এই নতুন শিল্প-যুগের বিরোধ নেই। এই দুইয়ের সমন্বয় সম্ভব। শিল্প-সভ্যতায় নতুন নতুন আবিষ্কারে জগতের বাহ্যিক সম্পদ বৃদ্ধি করছে। মানুষের জীবনযাত্রা সংগ্রাম-বহুল ও কঠিন হয়ে পড়ছে; কিন্তু সুনীতি ও সদাচার বিসর্জনের কোন অর্থ হয় না। দুর্নীতিই জগতে অশান্তি উৎপত্তির কারণ। স্বার্থ-কুটিল দ্বন্দ্বের সঙ্গে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সম্পর্ক নেই।

জ্যোতিষী ও গণৎকারেরা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ সংস্কার বদ্ধমূল করে দেশের জনসাধারণের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ফলিত জ্যোতিষের মধ্যে যেখানে মিল আছে, সেইটুকুই গ্রহণীয়। সময় বা তিথি নিরূপণ বা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় নির্ণয়—উভয়ই এক নিয়মে চলে। কিন্তু যেখানে মিল নেই সেখানে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে হবে। ফলিত জ্যোতিষের মতে—সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, সূর্য পৃথিবীর গ্রহ। বিজ্ঞান বলে পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমণ করছে, পৃথিবী সূর্যের গ্রহ। জ্যোতিষ ও পুরাণ বলে রাহু ও কেতু নামে আর দুটি অদৃশ্য গ্রহ আছে, বিজ্ঞানে তার অস্তিত্ব নেই। এই মতে, পুরাণোক্ত রাহুর গ্রাস থেকে সূর্য চন্দ্রের গ্রহণ ঘটে। ঐ সময়ে পৃথিবী অশুচি হয়। এটা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কথা। বিজ্ঞান বলে—যখন চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্যের অন্তর্বর্তী হয়, তখন চন্দ্রের দ্বারা সূর্য ঢাকা পড়াতে সূর্য-গ্রহণ হয়। ইহা দৈব ঘটনা নয়, নৈসর্গিক ঘটনা। এই সময়ে কোন অশুভ ব্যাপার হয় না, যার জন্যে আহার বন্ধ এবং গঙ্গা-স্নানে পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক সত্য এই যে, চন্দ্র-পৃষ্ঠে যখন পৃথিবীর ছায়া পড়ে তখন চন্দ্রগ্রহণ রূপ প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে। এরূপ ধূমকেতুর আগমন কোন অতিপ্রাকৃত অশুভ ঘটনা নয়। পৌরাণিক কাহিনীতে রূপকের ভাষায় শিক্ষা থাকতে পারে, কিন্তু প্রাকৃত ঘটনার বিবরণ নেই।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে—গ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে

বিরাট প্রভেদ। নক্ষত্রের আকার সূর্যের আকারের সহস্র সহস্র বা লক্ষ লক্ষ গুণ বড়। সূর্য ও নক্ষত্র এক পর্যায়ের বিরাট অগ্নিপিণ্ড। গ্রহের উপরিভাগ শীতল ও কঠিন। গ্রহ সূর্যকে পরিক্রমণ করছে, যেমন চন্দ্র উপগ্রহ পৃথিবীকে পরিক্রমণ করছে। চন্দ্রের আলোক সূর্যের প্রতিফলিত আলোকমাত্র, তার নিজের আলো নেই।

জ্যোতিষীদের মতে—মানুষের জীবনের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের শুভ বা অশুভ বিশেষ প্রভাব আছে। বিজ্ঞান বলে—বিশেষ প্রভাব নেই। মানুষের ভাগ্য মানুষ নিজে গড়ে, তার পরিবেশও গড়ে। Man is the architect of his fate. যাবতীয় শিক্ষা-দীক্ষার মূলেই মানুষের নিজের দায়িত্ব। বিধাতা মানুষের সাধনার সহায়। God helps those who help themselves. দৈব মানুষের ভাগ্যের উপর এমন কোন অশুভ ক্রিয়া করে না, যাকে গণৎকারের শান্তিস্বস্ত্যয়ন নিরস্ত বা পরাভূত করবে। প্রকৃতি অন্য দেশে যেমন ক্রিয়া করে, এই গণৎকারের দেশেও তাই করে। এদের শিক্ষায় ভারত বীর্যহীন হয়েছে। দৈব গণনা বা ওরেকলের উপর নির্ভরতা গ্রীক সভ্যতার পতনের অন্যতম কারণ। রোমান সভ্যতার পতনের মধ্যেও এই ক্রিয়া ছিল। এই দৈববাদের প্রতিবাদও এদেশে হয়েছে "পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীম, দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি—নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ"—এই কথা লোকে শোনে না বলেই এ-দেশ বীর্যহীন। এই দৈবজ্ঞ বিড়ম্বিত বাংলা দেশ একদিন স্বাধীনতা হারিয়েছিল। বখ্‌তিয়ার খিলিজি ১৮ জন সওয়ার নিয়ে এই বিশাল বাংলা দেশ জয় করে। তখন বাংলায় রাজা লক্ষ্মণসেন গণৎকারের পরামর্শে বিনা যুদ্ধে পলায়ন করেন। বাংলার এই কলঙ্কের মূল হলো জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী।

প্রাচীন সংস্কার এই—পাঁচটি মৌলিক বস্তু দিয়ে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানের শিক্ষা—জগতের মৌলিক বস্তু প্রাচীন গ্রীক মতের ৪-ও নয় এবং প্রাচীন হিন্দু মতের ৫-ও নয়। ৯২টি স্থায়ী মৌলিক পদার্থের সমবায়ে এই জগতের উৎপত্তি। প্রাচীন মতে—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই হলো পঞ্চভূত। বিজ্ঞানের মতে—ক্ষিতি বা মৃত্তিকা কোন মৌলিক পদার্থ নয়। মাটির মধ্যে জল, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম ও অন্যান্য বহু পদার্থ মিশ্রিত আছে। অপ্‌ বা জল হলো হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের মিলনে উদ্ভূত যৌগিক পদার্থ। তেজ বা অগ্নি ও আলোক শক্তিবিশেষ, বস্তু নয়। সেরূপ তড়িৎ, চুম্বকত্ব, তেজস্ক্রিয়া, শব্দ প্রভৃতি শক্তিবিশেষ। বিবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে শক্তির রূপান্তর ঘটানো যায়। কল-কারখানা, মোটর, এঞ্জিন প্রভৃতিতে অহরহ এই রূপান্তর ঘটছে। তাপ-শক্তি থেকে যান্ত্রিক-শক্তি, তড়িৎ-চুম্বক থেকে আলোক বা গতি-শক্তি বা শব্দ-শক্তি অথবা এক থেকে অন্যের বিপরীত ক্রিয়া—টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও, রেডার ইত্যাদিতেও তা ঘটছে। মরুৎ বা বায়ুতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ভাসমান অদৃশ্য জল-কণিকা ও অল্প পরিমাণ অন্য কতকগুলি গ্যাসও আছে। ব্যোম বা আকাশ শূন্য মাত্র, কোন পদার্থ নয়। সুতরাং বিজ্ঞানের মতে—পঞ্চভূতের কোনটিই মূল পদার্থ নয়।

শব্দ কোন বস্তু নয়, বায়ুর কম্পন মাত্র। যেখানে বায়ু নেই, সেখানে শব্দ হয় না। রূপ হলো, বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকের স্পর্শে চক্ষের অনুভূতি, বস্তু নয়। গন্ধও বায়ু-বাহিত বস্তুর সূক্ষ্ম-কণিকা—নাসিকা-রন্ধ্রের-ঝিল্লিতে স্পর্শের অনুভূতি। স্পর্শও স্পষ্টতঃ চর্ম-প্রান্তে অবস্থিত দেহ-গ্রন্থির স্পর্শের অনুভূতি। সবই স্পর্শজাত অনুভূতি।

বস্তুর ত্রিবিধ আকার—তার একান্ত স্বরূপ নয়। কঠিন, বায়বীয় ও তরল—এই ত্রিবিধ

আকার পরস্পরে পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব। তাপ ও চাপ প্রয়োগে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন হয়। বরফ, জল ও বাষ্প—জলের এই তিন অবস্থা হয় তাপের তারতম্যে। বায়ু, অক্সিজেন ইত্যাদিকেও তরল ও কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। কঠিন ধাতুকেও তরল বা বায়বীয় অবস্থায় আনা যায়। বস্তুর যেমন রূপান্তরণ সম্ভব শক্তিরও সেরূপ রূপান্তরণ সম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞানের আর এক আবিষ্কার হলো স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা, যাতে বস্তুবিশেষেরশক্তি ক্ষয়িত হয়ে নতুন বস্তু হচ্ছে ও বস্তুর এই ক্ষয় তেজস্ক্রিয় শক্তিরূপে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এই তেজস্ক্রিয়া অবলম্বনে বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরমাণুর কেন্দ্র ভেঙ্গে নতুন বস্তু তৈরী করতে গিয়ে বিপুল শক্তির উৎস আবিষ্কৃত হয়েছে। স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়ার ফলে ইউরেনিয়াম শেষ পর্যন্ত সীসায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

পরমাণুর মধ্যে আছে দৃঢ়বদ্ধ কেন্দ্রক। কেন্দ্রক এক বা একাধিক প্রোটন (ধন তড়িৎ-কণিকা) ও নিউট্রন (তড়িৎ-শূন্য কণিকা) দ্বারা গঠিত। কেন্দ্রকের চতুর্দিকে বিভিন্ন দূরত্বে পরিক্রমণ করছে এক বা একাধিক ঋণ তড়িৎ-কণিকা বা ইলেকট্রন। ইলেকট্রন বেষ্টনীযুক্ত এই পরমাণু এতই সূক্ষ্ম যে, শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও তার অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। অতি আধুনিক ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণে তার রেখাপাতযুক্ত আলোক-চিত্র গ্রহণ সম্ভব হয়েছে। বস্তুর সাধারণ অবস্থায় পরমাণু-কেন্দ্রক আর বেষ্টনীর ইলেকট্রনের মধ্যে বিপরীতধর্মী সমপরিমাণ তড়িতাবেশ থাকায় পরমাণুর সাম্যভাব বজায় থাকে। পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ এই কেন্দ্রকের ভাঙনের ফলে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয়। পরমাণু-বোমায় এই শক্তিই ধ্বংসলীলা ঘটায়।

প্রাচীন বিশ্বাস—জীব চার প্রকারের ; যেমন—জরায়ুজ, অণ্ডজ, ভেষজ ও স্বেদজ। এই শেষোক্ত প্রকার জীবের উৎপত্তির ব্যাপার সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোন সন্ধান পায় নি। স্বেদ বা ঘাম থেকে পোকা-মাকড়ের জন্ম—এটা বৈজ্ঞানিক সত্য নয়, প্রাচীন সংস্কার মাত্র। বিজ্ঞান দৃশ্য জীব ছাড়াও বহু অদৃশ্য জীবের সন্ধান পেয়েছে। আণুবীক্ষণিক বহু জীব আছে তাদের বৃদ্ধি বিভাজনজনিত অথবা বীজরেণুজনিত। আকাশ, বাতাস, জল, মাটিতে বহু জীবাণু আছে ; তাদের কতক মানুষ বা উদ্ভিদের মিত্র, কতক বা শত্রু। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কলেরা, কালাজ্বর ইত্যাদি রোগের মূল—এই জীবাণুর দেহের মধ্যে সংক্রমণ ও অতিদ্রুত বংশবৃদ্ধি। এই জীবাণু অণুবীক্ষণে দৃশ্য। আবার অতি সূক্ষ্ম কতকগুলি জীবাণু আছে যা নিউমোনিয়া, সর্দি ইত্যাদি রোগের উৎপাদক। এদের অস্তিত্ব ও বিলোপের ফল দেখা যায় ; কিন্তু এই জীবাণু অণুবীক্ষণে দেখা যায় না।

জলের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। সহর বা গ্রামের নিকটস্থ নদীর জল নানাভাবে দূষিত হয়ে অপেয় হয়। নদীর উৎস স্থলে হয়তো সব নদীর জলই অল্পাধিক বিশুদ্ধ থাকে। বিজ্ঞান অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূষিত জলে জীবনের ক্ষতিকর জিনিষের অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে ; কিন্তু প্রাচীন সংস্কারবশে মানুষ সেই দূষিত গঙ্গাজল পবিত্রজ্ঞানে পান করে' কলেরা, টাইফয়েড বিস্তার করছে।

বিজ্ঞানের সহায়তায় নবযুগে উন্নত জীবন লাভ করতে হলে প্রমাণ ও যুক্তির আলোকে অন্ধসংস্কার ছাড়তে হবে ; অন্যথায় নবজীবনের জয়যাত্রা সম্ভব নয়।

সঞ্চয়ন

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা

এই সম্পর্কে রব ম্যান্সফিল্ড লিখেছেন—১৯৪৭ সালে ভারত কমনওয়েলথের স্বাধীন সদস্য হিসাবে পূর্ণ মর্যাদা লাভ করায় ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ভারত-বৃটিশ সহযোগিতা লক্ষিত হতে থাকে। আজ ভারতে বৃটেনের লগ্নীকৃত মূলধনের পরিমাণ হলো প্রায় ৫২০,০০০,০০০ পাউণ্ড; ১০ বছর পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ এবং ভারতে লগ্নীকৃত সমগ্র বৈদেশিক মূলধনের শতকরা ৮০·২ ভাগ। এই ভারত-বৃটিশ সহযোগিতা আজ অন্যদিকেও অন্যরূপে লক্ষিত হচ্ছে।

এই নতুন রূপের একটি বড় রকমের দৃষ্টান্ত হলো—ইণ্ডিয়ান ষ্টীল ওয়ার্কস কনষ্ট্রাকশন কোম্পানী (ইস্কন) নামে বৃটেনের একটি ফার্মগোষ্ঠী—১০০,০০০,০০০ পাউণ্ডের নতুন ইস্পাত কারখানা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত দুর্গাপুরে ভারত গভর্ণমেণ্টের জন্যে নির্মাণ করেছেন।

দুর্গাপুরের কারখানায় যে দিন ১ নং কোক চুল্লীর উদ্বোধন এবং কারখানায় প্রাণ সঞ্চারিত হয়, সেটি ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন সন্দেহ নেই। এখান থেকে উৎপন্ন কোক ব্যবহৃত হবে ১ নং ব্লাষ্ট ফার্নেসে। এই ফার্নেসটি এই বছরের শেষে অবিশুদ্ধ লৌহ (পিগ আয়রন) উৎপাদন আরম্ভ করবে।

ব্লাষ্ট ফার্নেস এলাকা ও মেল্টিং সপ কুলিং টাউনের দৃশ্য।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ইস্কন ফার্মগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রায় সবারই ভারত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে। দুর্গাপুরের তিনটি কোক ওভেন ব্যাটারী যাঁরা নির্মাণ করেছেন, সেই সাইমন-কার্ভস ইতিপূর্বে ভারতে অনেক কাজ করেছেন। গত অর্ধ

শতাব্দী বা তারও বেশী সময় ধরে তাঁরা কোক চুল্লী নির্মাণ করে এসেছেন। ভারতে তাদের প্রথম কোক চুল্লী নির্মিত হয় ১৯০৮ সালে—ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের জন্যে তাঁরা এই চুল্লী প্রথম নির্মাণ করেন। ১৯২০ সাল থেকে তাঁরা ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর জন্যে কোক চুল্লী নির্মাণের কাজ করে এসেছেন এবং ১৯৩০ সাল থেকে টাটা আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর জন্যে কোক চুল্লী নির্মাণের কাজ করেছেন।

ব্যবস্থা এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে, বিভিন্ন বিভাগের নির্মাণ-কার্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভাগগুলি স্বতন্ত্রভাবে কাজ আরম্ভ করতে পারবে।

দুর্গাপুরে এখন কাজ করছে মোট ৩০,০০০ লোক। এর মধ্যে মাত্র ৩৫০ জন বৃটিশ। কারিগর এবং তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যেও বৃটিশের সংখ্যা কম; ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারেরাই এই ইস্পাত কারখানা নির্মাণের কাজে বড় রকমের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন
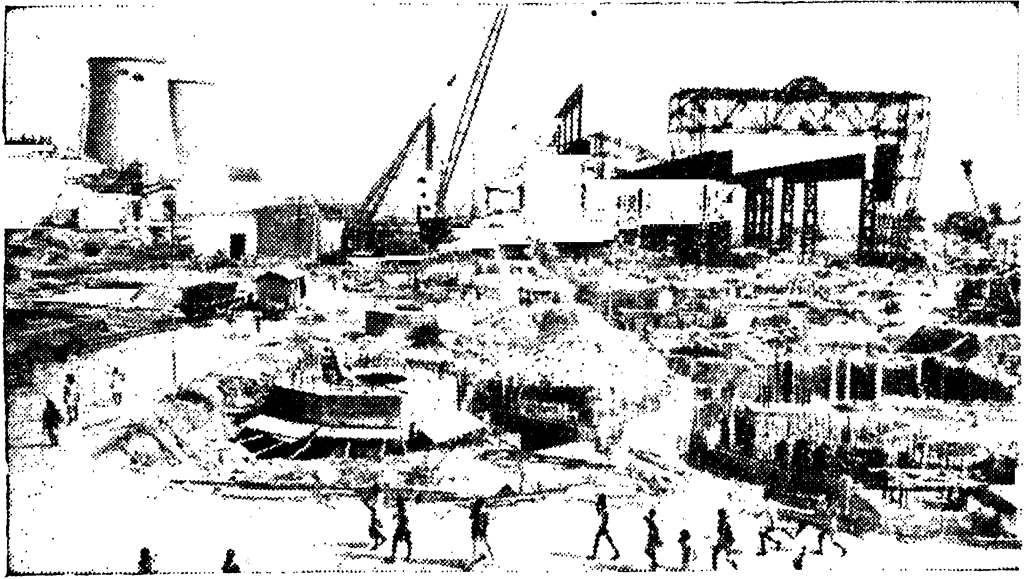
মেল্টিং সপ এলাকায় ভিত্তি নির্মাণের কাজ চলছে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে ভারতের বিরাট সম্প্রসারণ পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হলে সরকারী এবং বেসরকারী শিল্পে (ভিলাইয়ের সোভিয়েট-নির্মিত কারখানা এবং রৌরকেল্লার জার্মান কারখানা সহ) উৎপন্ন ভারতীয় অবিশুদ্ধ লৌহের শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী অবিশুদ্ধ লৌহ উৎপাদনের জন্যে দায়ী হবে সাইমন-কার্ভস কোক চুল্লীগুলি।

দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা নির্মাণের কাজ ১৯৬১ সালে সম্পূর্ণ হবার কথা; কিন্তু তার নির্মাণ

এবং এভাবে তাঁরা একটা দুর্লভ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করেছেন।

কারখানা পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ করলে বছরে তার ১০০৬,০০০ টন ইনগট ইস্পাত উৎপাদন করবার ক্ষমতা হবে। তার বিভিন্ন বিভাগ এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে, যাতে এই সব বিভাগ প্রয়োজনমত সম্প্রসারিত হতে পারে। সম্প্রসারিত বিভাগগুলির উৎপাদন ক্ষমতা হবে বছরে প্রায় ২,৫০০,০০০ টন ইনগট। তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত কর্মচারীর সংখ্যা হবে প্রায় ৬৫০ এবং অন্যান্য

কর্মীর সংখ্যা হবে প্রায় ১০,০০০ জন। কলম্বো প্ল্যানের কারিগরী সহযোগিতা ব্যবস্থাধীনে বৃটেন এই তত্ত্বাবধান এবং পরিচালন সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্যে ৩৫০ জন ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারকে বৃটেনে শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দিয়েছে। এ-সম্পর্কে বৃটেনই সব অর্থ ব্যয় করছে।

১নং ব্লাষ্ট ফার্নেস লৌহ উৎপাদনের কাজ আরম্ভ হলে কারখানার প্রথম পর্যায়ের কাজ, অর্থাৎ লৌহ উৎপাদনের ব্যবস্থা শেষ হবে। ১৯৬০ সালের মে মাসে প্রথম তিনটি ইস্পাত-গলানো ওভেন বা চুল্লীগুলির প্রথম কাজ হলো ব্লাস্ট ফার্নেসের জন্যে কোক উৎপাদন করা। কিন্তু কয়লা কার্বোনাইজ করবার সময় বহু রকমের মূল্যবান উপজাত পদার্থ উৎপন্ন হয়; যেমন—বেন্‌জিন, টোলুইন, আলকাত্‌রা, অ্যামোনিয়াম সালফেট ইত্যাদি। এই উপজাত পদার্থগুলির প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র মূল্য আছে এবং সেগুলি শ্রমশিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে ব্যবহৃত হতে পারবে।

দুর্গাপুরের কোকিং কারখানা নির্মাণের জন্যে
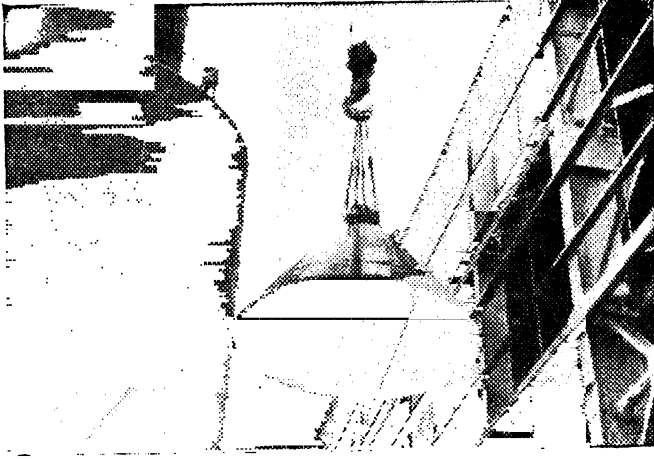
২৫ টন ওজনের একটি বৃহৎ ঘণ্টা ১নং ব্লাষ্ট ফার্নেসের উপরে তোলা হচ্ছে।

চুল্লী কাজ আরম্ভ করলে অতিরিক্ত লৌহ উৎপাদন ক্ষমতা লাভ করা যাবে এবং এই পর্যায়ে ইস্পাত বিলেট উৎপাদনের কাজ আরম্ভ করবে এবং ১৯৬১ সালের মাঝামাঝি সমগ্র কারখানায় উৎপাদনের কাজ আরম্ভ হবে।

এ-পর্যন্ত মূল কারখানার কথাই বলা হলো, কিন্তু প্রত্যেক বিভাগের আছে বহু আনুসঙ্গিক বিভাগ; যেমন কোল্ হ্যাণ্ডলিং, স্টকিং, ওয়াশিং এবং কোক চুল্লী এলাকায় অবস্থিত উপজাত পদার্থের কারখানা। ব্লাস্ট ফার্নেস এলাকায় অবস্থিত ওর হ্যাণ্ডলিং, লাইম ও ডলোমাইট কারখানা; বিদ্যুৎ, বাষ্প, জল সরবরাহ প্রভৃতি ব্যবস্থা।

ইস্কনকে কি পরিমাণ কাজ করতে হয়েছে তা বুঝতে হলে জানা দরকার, কি পরিমাণ মালমশলা এই কাজে লেগেছে। এই কাজে লেগেছে প্রায় ২০০,০০০ টন কংক্রিট, ১৫,০০০ টন ইস্পাত এবং ৪০,০০০ টনের বেশী তাপ-প্রতিরোধক ইট।

ভারতীয় এবং বৃটিশ সবাই সমানভাবে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা নিয়ে গর্ব বোধ করতে পারে। কারণ এই কারখানা নির্মাণে ভারত গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বৃটেনের একটি ফার্মগোষ্ঠী, ৩১০ জন বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ার, ছয়টি বৃটিশ ব্যাঙ্ক (ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দেয় ১১,৫০০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ) এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট (সরকারী ঋণের পরিমাণ ১৫,০০০,০০০ পাউণ্ড)

যে সহযোগিতা করেন তা খুবই দুর্লভ সন্দেহ নেই। ভারত গভর্ণমেন্টকে এই কাজে সাহায্য করছে ভারতের হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেড এবং বহু সহস্র ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার, কনট্রাক্টর এবং শ্রমিক।

উৎকৃষ্টতর সব্জী উৎপাদনের প্রয়াস

এই সম্পর্কে জন ক্লুস লিখেছেন—বৃটেনে নানা ধরণের সব্জীর চাহিদা একটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বৃটেনের জাতীয় সব্জী গবেষণা কেন্দ্র আজ এই সব্জীর রকম ও গুণ বৃদ্ধির জন্যে সচেষ্ট না হয়ে পারে নি। প্রতিষ্ঠানটি এ-সম্পর্কে পরীক্ষা চালিয়েছে তাঁর ওয়ারউইকশায়ারের অন্তর্গত ওয়েলসবোর্ণের ২৮০ একর জমিতে এবং তার অ্যাসেক্সের অন্তর্গত প্যাগ্‌লপামের শাখা কেন্দ্রটিতে।

গবেষণা কেন্দ্রটি মাত্র ১০ বছর পূর্বে ওয়েল্‌স্‌-বোর্ণে প্রতিষ্ঠিত হয়; তার নতুন লেবরেটরিটিও সম্প্রতি খোলা হয়। এখানে প্রত্যহ পরীক্ষা চলেছে, প্রত্যেক রকমের সব্জীর গুণাগুণ এবং রোগ-প্রতিরোধকতা নিয়ে।

কেন্দ্রটিকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করে রাখবার চেষ্টা হয়েছে। এর চার পাশে কোথাও কোন বাগান করতে দেওয়া হয় নি, যাতে ফুলের রেণুর মিশ্রণের ফলে সব্জীর গুণাগুণ পরীক্ষায় কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয়।

ওয়েল্‌স্‌বোর্ণের অনুসন্ধানের কাজ চলছে তার আটটি গবেষণা বিভাগে। এই সব বিভাগে সব্জীর গুণাগুণ বৃদ্ধির যেমন চেষ্টা চলেছে তেমনই চলেছে সেচ, কীট-পতঙ্গ দমন, রোগ ও আগাছা উচ্ছেদ প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণা।

এই কেন্দ্রের কাজকর্মের ফলাফল এখনই বিচার করা সম্ভব নয়, আমাদের সে জন্যে হয়তো আরও কিছু দিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে। একথাও সত্য যে, জাতীয় সব্জী গবেষণা কেন্দ্র যে ধরণের মৌলিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন, সেগুলি তাড়াহুড়া করে শেষ করা সম্ভব নয়। উদাহরণ-স্বরূপ একটা কথা বলা যেতে পারে যে, তারা অ্যাস-প্যারাগাস বীজে এমন একটা গুণ সঞ্চারিত করতে চাইছেন, যার ফলে কেবল পুং-উদ্ভিদেরই সৃষ্টি হবে। পুং-অ্যাসপ্যারাগাসের বীজ উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না। এর ফলে গাছগুলি কেবল ডালপালা বিস্তার করেই যায়; কাজেই পরিমাণের দিক দিয়ে এই উদ্ভিদের চাষ, ব্যবসায়ীদের পক্ষে লাভজনক হবে। অ্যাস্‌প্যারাগাস এখনও বৃটিশ গৃহিণীদের কাছে একটা মূল্যবান খাদ্য বলে গণ্য। সে জন্যে এর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে গৃহিণীরা যে খুশী হবেন, তাতে আর সন্দেহ নেই।

ওয়েল্‌স্‌বোর্ণে ফুলকপি নিয়েও একটা পরীক্ষা চলেছে। এই পরীক্ষা প্রথম চলে অধুনালুপ্ত কেম্ব্রি-জের গবেষণাগারে। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো ফুলকপির মধ্যে এমন একটি গুণ সঞ্চারিত করা, যার ফলে এখনকার তুলনায় বাজারে অনেক তাড়াতাড়ি ফুলকপি বের করা সম্ভব হবে।

বর্ণসঙ্কর পিঁয়াজ উৎপাদনের চেষ্টাও ওয়েল্‌স্‌বোর্ণে চলেছে—যুক্তরাষ্ট্রে যা সাফল্যের সঙ্গে উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এতে মোট পিঁয়াজ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। মটর উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণাও এদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণার ফলে মটরশুঁটির পরিপক্কতার সময় অনেকটা এগিয়ে আসবে এবং তার সঙ্গে মটরের গুণও অনেক বৃদ্ধি পাবে।

কেন্দ্রের রাসায়নিক বিভাগটি জৈব ও অজৈব উভয় প্রকার সারের উৎপাদিকাশক্তি সম্পর্কে দীর্ঘ মেয়াদী একটা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছে।

কেন্দ্রটিতে জৈব সার, যথা—গোবর ইত্যাদির গুরুত্ব প্রমাণিত হয়েছে। স্পষ্টই দেখা গেছে,

যেখানে গোবর, পচাপাতা, অস্থিচূর্ণ ইত্যাদির ব্যবহার বন্ধ রাখা হয়েছে, সেখানে মাটির উৎপাদিকা শক্তি অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

উদ্ভিদ-শারীরতত্ত্ব বিভাগে আগাছা অপসারণের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা স্পষ্ট বোঝা গেছে। লাল বীটের চারা বের করবার ১৪ দিন পরে তাকে আগাছা-মুক্ত করে দেখা গেছে, একর প্রতি তার উৎপাদনের পরিমাণ হয়েছে প্রায় ১০ টন, অথচ ২৮ দিন পরে আগাছা-মুক্ত করবার ফলে তার উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে একর প্রতি আট টনেরও কম। পিঁয়াজের চারা বের হবার ৩১ দিন পরে তাকে আগাছা-মুক্ত করে দেখা গেছে, একর প্রতি তার উৎপাদনের পরিমাণ হয়েছে আট টন, অথচ আরও ৩০ দিন দেরী করে আগাছা-মুক্ত করবার ফলে তার উৎপাদনের পরিমাণ হয়েছে তার অর্ধেকেরও কম।

ওয়েল্‌স্‌বোর্ণের সেচ রীতির একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এক এক রকমের সব্জীর জন্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকমের সেচের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

কেন্দ্রের কীট-পতঙ্গ বিভাগে বাঁধাকপি নষ্টকারী পতঙ্গ দমন সম্পর্কে একটা উল্লেখযোগ্য কাজ হতে পেরেছে। এই সব পতঙ্গের দেহে যে পোকা (maggots) হয় তা বাঁধাকপির গোড়া নষ্ট করে তাদের বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়। সাধারণতঃ এই সব পোকার অধিকাংশই মাটির মধ্যে অবস্থিত তাদের প্রাকৃতিক শত্রুর হাতে ধ্বংস হয়। অধুনা এ-সম্পর্কে নানারকম কীটঘ্ন ভেষজ ব্যবহৃত হচ্ছে। ওয়েল্‌স্‌বোর্ণের পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, এই সব রাসায়নিক ভেষজ সযত্নে ব্যবহার করতে হবে। তা না হলে এই ভেষজ অনেক সময় পোকার প্রাকৃতিক শত্রুকে ধ্বংস করে ফেলে এবং তার ফলে পতঙ্গের ক্ষতি করবার শক্তি হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধিই পায়।

গাজর-মক্ষিকা সম্পর্কেও এই ধরণের পরীক্ষা চলছে। এই মক্ষিকাগুলি কেবল গাজর নয়, শাল-গমেরও শিকড় নষ্ট করে। গবেষণা-কর্মীগণ এখন দেখছেন, কীটঘ্ন ভেষজ ব্যবহারের ফলে সব্জীর স্বাদ বা সুগন্ধ নষ্ট হচ্ছে কি না।

ওয়েল্‌স্‌বোর্ণ কেন্দ্র বিশ্বের বিভিন্ন অংশের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। এর গবেষণা-কর্মীরা দূর দূর দেশে গিয়ে দেখছেন— অন্যেরা কি করছে। তাঁরা সেখানে প্রয়োজন হলে যেমন অন্যদের উপদেশ দিচ্ছেন, তেমনই আবার গ্রহণ করছেন তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ ফল।

হাঁপানি

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

হাঁপানি রোগ আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। কোলের শিশু থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু-পথযাত্রী বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আর এ রোগ যে কত যন্ত্রণাদায়ক তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। হাঁপানি রোগে আক্রান্ত রোগীরা স্বভাবতঃই শ্বাসকষ্টে ভোগেন। শ্বাসকার্য কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই শ্বাসনালীর কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া হাঁপানি রোগ ফুসে ঢুকে গেছে। শ্বাসনালীর বিভক্ত দুটি অংশের নাম ব্রঙ্কাস। ডানদিকের ফুস্ফুসে যে ব্রঙ্কাসটি প্রবেশ করে, তার নাম ডান ব্রঙ্কাস এবং বাঁ-দিকের ফুস্ফুসে যেটি যায়, তার নাম বাম-ব্রঙ্কাস। (চিত্র দ্রষ্টব্য) ব্রঙ্কাস দুটি ফুস্ফুসের মধ্যে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। ব্রঙ্কাসের সবচেয়ে ছোট প্রশাখাকে বলা হয় ব্রঙ্কিওল বা ক্লোমশাখা। শেষ ব্রঙ্কিওলটির ব্যাস মাত্র ০.২ মিলিমিটার। এগুলিকে
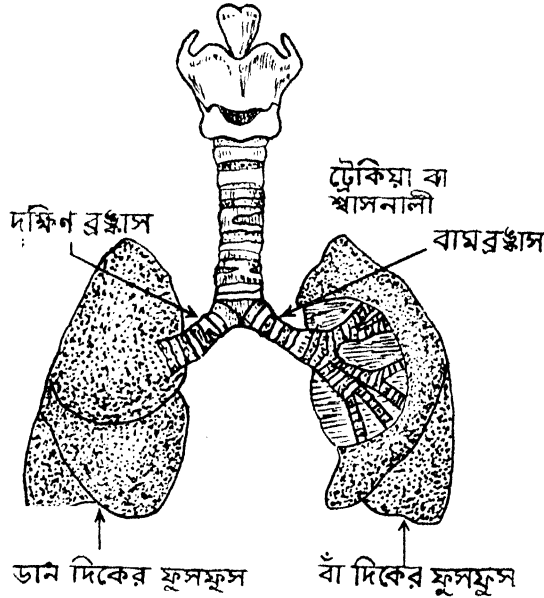
সম্পর্কে বিশদ আলোচনার পূর্বে শ্বাসনালী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কিছু কার্টিলেজ বা নরম হাড় এবং কিছুটা মেম্ব্রেন দিয়ে শ্বাসনালী তৈরী হয়েছে। এটি দৈর্ঘ্যে দশ থেকে এগারো সেন্টিমিটার লম্বা হয়ে থাকে। এর অন্য নাম হচ্ছে ট্র্যাকিয়া। বক্ষপিঞ্জরের মধ্যে এই নলটি দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে দু-পাশের দুটি ফুস্-বলা হয় রেস্পিরেটরি ব্রঙ্কিওল। এই ব্রঙ্কিওল ফুস্ফুসের শ্বাসকার্যের সহায়ক। রেস্পিরেটরি ব্রঙ্কিওল আবার প্রায় এগারো ভাগে বিভক্ত হয়। এদের বলা হয় অ্যালভিওলার ডাক্ট। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আমরা নাক দিয়ে যে বাতাস গ্রহণ করি তা শ্বাসনালী দিয়ে ক্রমে ক্রমে ফুস্ফুসে পৌঁছায়।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। শ্বাসত্যাগের সময় যদি কষ্ট হয় তাহলে সেই অবস্থাকেই সাধারণতঃ হাঁপানি বা হাঁপ-ধরা বলা হয়ে থাকে। মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত ভেগাস নামে একটি স্নায়ু শ্বাস-নালী এবং হৃৎপিণ্ড উভয়কেই চেতনা সরবরাহ করে। হাঁপানি রোগীদের ভেগাস স্নায়ু কোন কারণে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কাশির সৃষ্টি করে। ফলে দীর্ঘ সময় কাশবার পর ব্রঙ্কাস থেকে নির্গত লালা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। তার জন্যে রোগী আর শ্বাস ফেলতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে বুক ধড়ফড় করতে থাকে। আঙ্গুলের ডগা অনেক সময় নীলাভ হয়ে যায়।

হাঁপানির সময় ব্রঙ্কিওলের মাংসপেশীতে অক্সিজেন গ্যাসের খুবই স্বল্পতা ঘটে; তাছাড়া ব্রঙ্কিওলের মিউকাস মেমব্রেন ফুলে উঠে বাতাস যাবার পথ প্রায় বন্ধ করে দেয়। এর ফলে অ্যালভিওলগুলিতে খুব কম হাওয়া ঢোকে; এমন কি, অনেক সময় অক্সিজেন প্রবেশ করতেই পারে না। কার্বন ডাইঅক্সাইডের আধিক্য এবং অক্সি-জেনের স্বল্পতার ফলে রক্তধমনীতে অধিক পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইডের আধিক্যের জন্যে ঠোঁট, হাত-পায়ের আঙ্গুল, নাকের ডগা নীলাভ হয়ে যেতে পারে। অক্সিজেনের অভাব শ্বাসকেন্দ্রকে সাময়িকভাবে কর্মহীন করে ফেলে। এর জন্যেই ভীষণ শ্বাসকষ্ট সুরু হয়। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ উভয় সময়েই কষ্ট অনুভূত হয়; কিন্তু ব্রঙ্কিওলগুলির ধর্ম হচ্ছে প্রশ্বাসের সময় সঙ্কুচিত হওয়া এবং নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় প্রসারিত হওয়া।

শ্বাসকার্যের সহায়ক সব মাংসপেশীগুলি সঙ্কুচিত হওয়াতে শ্বাসত্যাগের সময় খুবই জোর লাগে। সে জন্যেই এ সময় তীব্র শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয়। প্রশ্বাসকার্যের সহায়ক মাংসপেশীগুলি বুকের উপরে খুব জোর চাপ দেয় এবং পেটের মাংসপেশীগুলিও সঙ্কুচিত হয়ে ফুস্ফুসের মধ্য থেকে প্রশ্বাসবায়ু বের করে দিতে সচেষ্ট হয়। ফলে ফুসফুসের মধ্যে অত্যধিক চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপাধিক্যের জন্যে সঙ্কুচিত ব্রঙ্কিওল দিয়ে জোর করে অবরুদ্ধ বায়ু বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করে। বেরোবার সময় হিস্ হিস্ শব্দ হয়ে থাকে। সেই শব্দ বাইরে এলে ঘস্ ঘস্ শব্দের মত শোনায়। জোর করে এই শ্বাসকার্য সৃষ্টি হবার দরুণ ফুস্ফুসের সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্রিয়া ব্যাহত হয়। প্রশ্বাসকার্য স্বাভাবিক ভাবে না হবার জন্যে ফুস্ফুস এই সময় প্রায় সর্বক্ষণ সর্বোচ্চ প্রসারিত অবস্থায় থাকে।

হাঁপানি রোগ যে খুবই জটিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কত সামান্য কারণ থেকে হাঁপানি রোগের উৎপত্তি হতে পারে তা শুনলে অবাক হতে হয়। হাঁপানি রোগকে বংশগত রোগ বলা চলতে পারে, অর্থাৎ বংশপরম্পরায় এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

সাধারণতঃ পঁচিশ বছর বয়সের আগেই এই রোগের প্রথম আক্রমণ সুরু হয়। স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষেরা প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যায় এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে বলে হিসেব পাওয়া গেছে।

বংশানুক্রমে হাঁপানি রোগ আসতে পারে, একথা আগেই বলা হয়েছে। বংশে কারো মৃগী বা মূর্চ্ছা রোগ থাকলে তাদের সন্তান পরম্পরায় ঐ রোগের সঙ্গে সঙ্গে হাঁপানি রোগেরও আক্রমণ হয়ে থাকে। বংশে যদি কোন লোক কোন বিশেষ ধরণের আমিষ খাদ্য (যেমন ডিম, মাংস, চিংড়িমাছ ইত্যাদি) খেলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন, যাকে চিকিৎসাশাস্ত্রে বলা হয় Hyper sensitiveness to certain proteins, তাহলে এই ধারা তার সন্তান-সন্ততিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং এ থেকে হাঁপানি রোগ জন্ম নিতে পারে।

এসব ছাড়া বাত, সিফিলিস, ফুস্ফুসের যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ থাকলে হাঁপানি রোগ হয়। আব-হাওয়া এবং বাসস্থানের উপরও এই রোগ অনেকাংশে নির্ভর করে। এমন অনেক লোক আছে যারা

কেবলমাত্র শুষ্ক আবহাওয়াতে ভাল থাকে। আবার এর বিপরীত-ধর্মী লোকও আছে। এদের যদি পরস্পর বিরোধী স্থানে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে এরা হাঁপানিতে ভোগে।

নাকের ভিতরের কোন স্থানে যদি জন্মগত অথবা অন্য কোন কারণে বৈকল্য আসে, তাহলে হাঁপানি রোগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। রোগগ্রস্ত টনসিল থেকেও সহজেই হাঁপানি রোগ হতে পারে।

ইউরোপের ডাঃ ফ্রীম্যান, ডাঃ কোক্, ডাঃ ব্রে এবং আমেরিকার ডাঃ ওয়াকার দীর্ঘদিন গবেষণার পর সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, যত হাঁপানিরোগ দেখা যায়, তার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগই অ্যালার্জির জন্যে। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মাঠের ধূলা, চাল বা গম ঝাড়ানির পর যে ধূলা বেরোয় সেই ধূলা, ঘাসফুলের রেণু নাকে গেলে অনেকের হাঁপানি সুরু হয়। অনেকে আবার বিশেষ ধরণের ফুল, ঘোড়া, বিড়াল, খরগোস, গিনিপিগ, হরিণ, কুকুর, বানর—এমন কি অন্যলোকের মাথার চুল দেখা মাত্রই হাঁপাতে সুরু করে। এমন কি, এগুলির নাম শুনলেও অনেক সময় এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের গা-হাত-পায়ে চুলকানি সুরু হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয়। অনেকের আবার বিশেষ ধরণের ওষুধ (ইপিক্যাকিউনা ইত্যাদি) খেলে হাঁপানি রোগের সূত্রপাত হয়।

পেটের গণ্ডগোলের জন্যেও হাঁপানি রোগ হতে পারে। যে সব স্ত্রীলোকের ওভারি অথবা জরায়ুর কোন রোগ আছে, তারা সহজেই হাঁপানিতে আক্রান্ত হয়। যারা আমবাত বা একজিমাতে ভোগে তাদেরও ঐ থেকে হাঁপানি হয়। এ-ছাড়া যারা সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে বা যারা অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ তারাও স্নায়বিক দৌর্বল্যের জন্যে হাঁপানি রোগের কবলে পড়ে। প্রকার-ভেদে হাঁপানীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে; যেমন—

(১) Bronchial asthma, (২) Cardiac asthma, (৩) Renal asthma, (৪) Hay asthma, (৫) Asthmatic dyspnoea for pulmonary tuberculosis, (৬) Allergic asthma.

প্রথম প্রকারের হাঁপানি শীতের সময় হয়ে থাকে। শীতের সময় সাধারণতঃ লোকেরা ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। ব্রঙ্কাইটিস থেকে প্রথম প্রকারের হাঁপানি রোগ সৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় প্রকারের হাঁপানির মূল কারণ হৃদ্‌রোগ। এ-ধরণের হাঁপানি রাত্রিবেলাতেই হয়ে থাকে। অন্য সব রকমের হাঁপানি যে কোন সময় হতে পারে। এতক্ষণ হাঁপানি রোগের নানা কারণ নিয়ে আলোচনা করা হলো। এবারে রোগের উপসর্গ ও চিকিৎসা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

হাঁপানি সুরু হলে রোগী শ্বাসকষ্টের জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে, বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না। সর্বদাই জানলার কাছে বসে এক একবার বুক চেপে ধরে, কখনও বা গলা টেনে লম্বা করে শ্বাস ফেলতে চেষ্টা করে। চোখে-মুখে ফুটে ওঠে ভীতির চিহ্ন। ঘড় ঘড় শব্দে শ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকে। রাত্রি-বেলা হাঁপানি রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ (রোগের তীব্রতার সময়) বহুদূর থেকেও শোনা যায়। বারে বারে মুখ খুলে রোগী শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ করবার চেষ্টা করে। মুখ পাণ্ডুর এবং ঠোঁট কালচে হয়ে যায়। গায়ের চামড়া ভিজে যায় আর ঘাম ঝরতে থাকে। এ-রকম অবস্থা বেশ কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত চলতে পারে। যদি সে সময়ে উপযুক্ত ওষুধ দিয়ে রোগের তীব্রতা প্রশমিত না করা হয় তাহলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে, হাঁপানি রোগে আক্রান্ত রোগীদের মুখে সব সময়েই দুর্ভাবনার চিহ্ন থাকে আর তাদের মধ্যে অনেকের

কাঁধ বেশ সোজা আর ঘাড় খুব লম্বা এবং সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে।

শ্বাসকষ্টের জন্যেই এ-রকম হয়ে থাকে। এসব সত্ত্বেও হাঁপানি রোগীরা স্বাভাবিকভাবে জীবনের অন্যান্য কর্তব্য করে থাকে। বিভিন্ন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে, অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থার সময়েও হাঁপানি রোগী মারা যায় নি। জীবনী-শক্তি নাকি এদের অত্যন্ত বেশী। হয়তো এ-ধারণা সর্বক্ষেত্রেই ঠিক নয়।

হাঁপানির আক্রমণ যখন খুব তীব্র হয় তখন অ্যাড্রিন্যালিন ইনজেকসন দিলে সত্বর উপশম হয়। ¾ গ্রেন মাত্রার এফিড্রিন হাইড্রোক্লোরাইডের বড়ি বাজারে বিক্রয় হয়। এর এক বড়ি খেলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে হাঁপানির তীব্রতা কমে যায়। এর সঙ্গে অ্যামিনোফাইলিন জাতীয় ওষুধ খেলে বা ইনজেকশন নিলে আরো বেশী উপকার পাওয়া যায়।

অনেকের ক্ষেত্রে যেসব খাবার হাঁপানির তীব্রতা সৃষ্টি করে এরূপ কোন খাদ্য কখনই খাওয়া উচিত নয়। পেট পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। প্রত্যহ কমলালেবুর রস সেবন হাঁপানি রোগীর পক্ষে বেশ উপকারী। বেশী পরিশ্রমের কাজ বা উত্তেজনা-পূর্ণ কাজ করা উচিত নয়। স্বাস্থ্য ভাল রাখবার দিকে সর্বদাই সচেষ্ট হতে হবে। যাদের ধুলাবালি নাকে গেলে হাঁপানি হয়, তাদের ওসব এড়িয়ে চলা ভাল। মিল বা ফ্যাক্টরীর কাছে বাস করা উচিত নয়। অ্যালার্জিঘটিত হাঁপানি রোগে Antistine, Avil, Anthison জাতীয় ওষুধ খাওয়া চলতে পারে।

এসব ছাড়াও হাঁপানি রোগের বহু প্রতিষেধক আছে। যে কোন ধরণের ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। রোগীর অজ্ঞতার ফলে রোগ প্রায় ক্ষেত্রেই বিপথগামী হয়। আমাদের দেশে ঝাড়-ফুক ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক উপায়ে হাঁপানি সারাবার চেষ্টা করা হয়। এতে রোগ কখনো ভাল হয় না, বরং খারাপের দিকে যায়।

প্রত্যেক মাতা-পিতার উচিত, তাদের কোন সন্তান হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হওয়ামাত্র চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা। সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলে রোগ একেবারে সেরে যেতে পারে। নচেৎ ঐ সন্তান থেকে হাঁপানি রোগ বংশানুক্রমে ছড়িয়ে পড়ে' তার অধস্তন সন্তান-সন্ততির জীবন বিষময় করে তুলবে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৭তম অধিবেশনের
মূল সভাপতি ও শাখা-সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৭তম অধিবেশন গত ৩রা জানুয়ারী বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু এই অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়াছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন ১৯১৪ সালে স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া এবার ৪৭ বর্ষকাল পূর্ণ করিয়াছে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ১৯৬০ সালের ৩রা হইতে ৯ই জানুয়ারী পর্যন্ত বোম্বাই-এ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৭তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বিজ্ঞানের সাধনা এবং অগ্রগতির জন্য বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স-এর অনুরূপ উদ্দেশ্য এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া দুইজন রসায়নবিদ্ অধ্যাপক পি. এস. ম্যাকমেহন এবং সার জে. এল, সাইমনসেন নিজেদের মধ্যে এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে ভারতে বিজ্ঞান চর্চার প্রসারের জন্য এবং প্রতি বৎসর ভারতে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা করেন। ইঁহারাই ভারতের অন্যতম প্রখ্যাত মনীষী আশুতোষ মুখোপাধ্যাকে এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতির পদে বরণ করেন।

১৯১৪ সালে ১৫-১৭ই জানুয়ারী কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তখন এই কংগ্রেসে ছয়টি শাখা ছিল। যথা—রসায়নবিদ্যা; পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা এবং শারীরবিদ্যা।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সহিত এশিয়াটিক সোসাইটির যোগাযোগ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃপক্ষে বিজ্ঞান কংগ্রেস এশিয়াটিক সোসাইটি হইতেই জন্মলাভ করে। ১৯১১ সালে অধ্যাপক পি. এস. ম্যাকমেহন এবং সার জে. এল. সাইমনসেন ভারতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের নিকট এক স্মারক-লিপি প্রচার করিয়া বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনের অনুরূপ একটি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার বিষয় ব্যক্ত করেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটি সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ও সাহায্য দান করেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেকার সকল সভা-সমিতি এশিয়াটিক সোসাইটির ভবনেই অনুষ্ঠিত হয় এবং সোসাইটি কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি বার্ষিক বিবরণীর আকারে প্রকাশ করিতে সম্মত হন।

ভারতে বিজ্ঞানের উন্নতির প্রয়াসে কংগ্রেসের জুবিলী সম্মেলনের সময়ই প্রথম বিদেশ হইতে বিজ্ঞানীরা এদেশে পদার্পণ করেন। দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা শক্তিশালী করা এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সহিত অন্যান্য দেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের যোগাযোগের ব্যবস্থার জন্য তাঁহাদের আমন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা ১৯৪৭ সাল হইতে আরম্ভ হয়।

অ্যাসোসিয়েশনটি বর্তমানে একটি কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত। এই কাউন্সিল-এ রহিয়াছেন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ। ইহার বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী ১৩টি পৃথক শাখায় ভাগ করা হইয়াছে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সোসাইটির উপর

চাপ পড়ায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উপর গুরুত্ব-পূর্ণ অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। এই দায়িত্ব হইল বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান অর্জন এবং দেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে তাহার প্রয়োগ। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা হইতেছে এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ আলোচনার জন্য গড়ে প্রায় তিন হাজারেরও অধিক বিজ্ঞানী সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মিলিত হইতেছেন। এতদ্ব্যতীত বিদেশ হইতেও বহু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করিতেছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সদর দপ্তর বর্তমানে ইহার নিজস্ব ভবন, ৬৪ দিলখুসা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭—এই ঠিকানায় অবস্থিত।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত এবং উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক পি. পারিজা বিজ্ঞান কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে পৌরোহিত্য করিয়াছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অনেক বিজ্ঞানী বোম্বাই-এ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। সমিতি কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া বিভিন্ন দেশ হইতে প্রতিনিধিসহ বিজ্ঞানীরা এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষায়তন হইতে অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পারিজা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ পারিজা ১৮৯১ সালের ১লা এপ্রিল উড়িষ্যা রাজ্যের কটক জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে, পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। তদানীন্তন বিহার-উড়িষ্যার সরকারী বৃত্তি লইয়া ১৯১৪ সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি ১৯১৬ সালের পরীক্ষায় প্রকৃতি-বিজ্ঞান ট্রাইপস্ (প্রথম ভাগ) লাভ করেন। তার দুই বৎসর পরে তিনি উদ্ভিদবিদ্যায় ট্রাইপস্ (দ্বিতীয় ভাগ) লাভ করেন। তিনি তখন কেম্ব্রিজ ক্রাইষ্ট কলেজের স্কলার নির্বাচিত হন। এই সম্মান ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে আজ পর্যন্ত আর কেহই পান নাই। উদ্ভিদবিদ্যায় দুই বৎসর
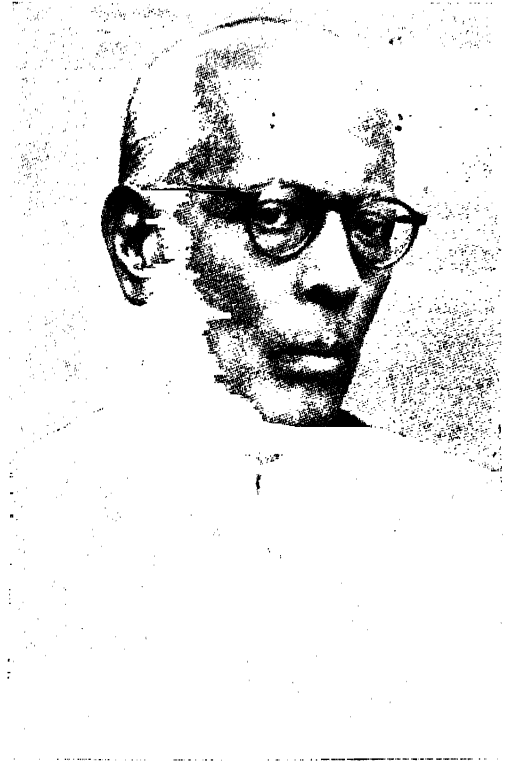
অধ্যাপক পি. পারিজা

গবেষণা করিবার জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ফ্র্যাঙ্ক স্মার্ট বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

গ্রেট বৃটেনের খাদ্য তদন্ত বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া ১৯২০ সালে তিনি ফল সংরক্ষণ সম্বন্ধে এক বৎসর গবেষণা করেন। পরের বৎসর তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯৩৩ সালে তিনি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের

ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন এবং প্রথম নির্বাচিত ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে ১৯৪৪ হইতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ঐ পদে অবস্থান করেন। সেই সঙ্গে ১৯৪৫ সালে এক বৎসরের জন্য উড়িষ্যার কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর এবং ১৯৪৬ সালে এক বৎসরের জন্য ভারতীয় ভূতত্ত্ব শিক্ষা কমিটির চেয়ারম্যানও নিযুক্ত হন।

১৯৫৫ সাল হইতে তিনি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সলার আছেন।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে ১৯৪৪ এবং ১৯৪৯ সালে তাঁহাকে ডি এস্-সি ডিগ্রি দিয়া সম্মানিত করে। ১৯৫৫ সালে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন।

ডাঃ ডি গাঙ্গুলী

মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি

মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ ডি. গাঙ্গুলী। বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত

ডাঃ ডি. গাঙ্গুলী

ফরিদপুর জেলার খালিয়া গ্রামে ১৯০৩ সালে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পদার্থ-বিজ্ঞানের স্নাতক শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় তদানীন্তন বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক অধ্যাপক গিরীন্দ্রশেখর বসুর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আসিয়া মনোবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের বিভাগ খোলা হইলে ১৯৩৮ সালে তিনি সেই বিভাগে যোগ দেন। তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারত সরকারের যুদ্ধ দপ্তরে মনস্তত্ত্বের পরামর্শদাতা নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি পি. এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ডাঃ গাঙ্গুলী বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কোষাধ্যক্ষ।

অধ্যাপক এ. কে. ভট্টাচার্য

রসায়ন শাখার সভাপতি

অধ্যাপক এ. কে. ভট্টাচার্যের জন্ম উত্তর প্রদেশে। জন্মাবধি তিনি উত্তর প্রদেশ নিবাসী। এলাহাবাদের অ্যাংলো-বেঙ্গলী উচ্চ বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা সুরু

অধ্যাপক এ. কে. ভট্টাচার্য

হয়। তিনি ১৯২৪ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উত্তর প্রদেশ সরকার হইতে গবেষণার জন্য বৃত্তিলাভ করেন। রসায়নের কয়েকটি শাখায়

সফল গবেষণার জন্য এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ১৯৩৯ সালে ডি. এস-সি উপাধি দান করে। ১৯৪৩ সালে তিনি আগ্রা কলেজের রসায়ন বিভাগের রীডার নিযুক্ত হন এবং ১৯৫২ সালে উক্ত বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। রসায়নশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণা পরিচালনা করিয়া এবং কতকগুলি মৌলিক সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের ইঙ্গিত দিয়া স্বদেশে ও বিদেশে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

ডাঃ ভি. এস. তুবে

ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখার সভাপতি

উত্তর প্রদেশের এটোয়া জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯০০ সালের মার্চ মাসে ডাঃ ভি. এস. তুবের জন্ম হয়। তিনি গোয়ালিয়রে লেখাপড়া সুরু করেন এবং তথাকার ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে বি.

ডাঃ ভি. এস. তুবে

এস্-সি পাশ করিবার পর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ১৯২৪ সালে ভূতত্ত্বে এম. এস-সি ডিগ্রি লাভ করিয়া তিনি সেখানেই দুই বৎসর গবেষণার কাজ করেন। ১৯২৬ সালে গিরনার পাহাড় সম্বন্ধে তাঁহার উল্লেখযোগ্য গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়। সেই বৎসরই তিনি ইংল্যাণ্ডে আসিয়া লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯২৮ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি প্রস্তরাদির রেডিও-অ্যাক্‌টিভিটি সম্পর্কে গবেষণার জন্য ভিয়েনায় আসেন। সেখান হইতে বার্লিনে গমন করেন। বার্লিনে তিনি প্রস্তরের হিলিয়ামের পরিমাণ সম্পর্কে গবেষণা করেন। এখানে তিনি হিলিয়াম পদ্ধতিতে পর্বতের বয়স নির্ধারণের এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৯৩০ সালে ভারতে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি গোয়ালিয়র স্টেটে খনি ও ভূতত্ত্বের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। সেই পদে ইস্তফা দিয়া ১৯৩২ সালে তিনি বিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিভাগে যোগদান করেন।

ডাঃ সি. আর. রাও

পরিসংখ্যান শাখার সভাপতি

শ্রীকল্যামপুদি রাধাকৃষ্ণ রাও ১৯২০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিতে এম. এ. ডিগ্রি লাভ

ডাঃ সি. আর. রাও

করেন। তিনি পরিসংখ্যানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ উপাধি এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন।

তিনি পি. এইচ-ডি (ক্যাণ্টাব) এবং এফ-এন-আই। বর্তমানে কলিকাতার ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক এবং উহার তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক গবেষণা বিভাগের প্রধান। ১৯৫৮ সালে তিনি ইউ. এস. এ-র ম্যাথেমেটিক্যাল স্ট্যাটিষ্টিক্স ইনষ্টিটিউটের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫১ সালে তিনি আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ভারত ও ভারতের বাহিরে বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে তিনি সংযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে তিনি কেম্ব্রিজের ডাকওয়ার্থ লেবরেটরীতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ১৯৫৩-'৫৪ সালে ইউ. এস. এ-র ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের গাণিতিক পরিসংখ্যান শাখায় গবেষণারত পরিদর্শক অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন।

ডাঃ এস. কে. পাণ্ডে
উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি

মধ্যপ্রদেশের রায়বেরেলী জেলায় ১৮৯৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ডাঃ এস. কে. পাণ্ডের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা প্রধানতঃ সকলেই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন; কেবল তাঁহার পিতা যোগ দিয়াছিলেন চাকুরিতে। তিনি শিক্ষাবিভাগে চাকুরি করিতেন। পূর্বপুরুষগণের প্রভাব-বশতঃই হয়তো ডাঃ পাণ্ডের মনে কিশোর বয়স হইতেই বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। বনজ গাছপালা হইতেই আয়ুর্বেদীয় ঔষধ তৈয়ার হয়। ডাঃ পাণ্ডে শৈশব হইতেই সে সকল দেখিতেন এবং নূতন নূতন গাছপালা সম্পর্কে তাঁহার মনে খুবই কৌতূহল হইত। সেই কৌতূহলই তাঁহাকে তরুণ বয়সে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করে। ১৯১৯ সালে লক্ষ্ণৌ-এর ক্যানিং কলেজ হইতে তিনি উদ্ভিদবিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট হন। খ্যাতনামা উদ্ভিদবিদ্যাবিদ অধ্যাপক এস. আর. কাশ্যপ তখন ছিলেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা শাখার অধ্যক্ষ। তাঁহার ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া ডাঃ পাণ্ডে স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভের জন্য পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। মনস্বী বিজ্ঞানী অধ্যাপক বীরবল সাহনীও তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই ছিলেন। এই দুই জন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ পাণ্ডের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে প্রভূত সাহায্য করিয়া-

ডাঃ এস. কে. পাণ্ডে

ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই ডাঃ পাণ্ডে ইউফোরবিয়ার (একরকম চারা গাছ, যার ডাল ভাঙলে দুধের মত রস বাহির হয়) ছত্রাক-সংক্রমণ সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করিয়া বিজ্ঞানীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেই হইতেই তিনি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের বিশেষ শাখায় নিবিষ্ট মনে গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। ১৯২৩ সালে তিনি ডিমনষ্ট্রেটর প্রফেসর হিসাবে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ক্রমে ক্রমে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখার অধ্যক্ষ হন। ৩৬ বৎসর কাল উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার পর ১৯৫৯ সালের প্রথম ভাগে অবসর গ্রহণ করেন।

ডাঃ এইচ. ডি. শ্রীবাস্তব

প্রাণী ও কীটপতঙ্গ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি

১৯০৮ সালে সীতারামপুরে ডাঃ হরদয়াল শ্রীবাস্তবের জন্ম হয়। ১৯৩৩ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাণিবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর এম. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁহার গবেষণার বিষয়

ডাঃ এইচ. ডি. শ্রীবাস্তব

ছিল কৃমিতত্ত্ব (Helminthology)। মানুষ ও পশুর শরীরে এই পরজীবী কৃমি সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণার জন্য তিনি ঐ বৎসরই "লেডী টাটা মেমোরিয়াল রিসার্চ স্কলারশিপ" পান। তাঁহার গবেষণার জন্য ১৯৩৮ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. এস-সি ডিগ্রি দিয়া সম্মানিত করে।

ডাঃ এ. আর. নটরাজন

চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও পশু-চিকিৎসা শাখার সভাপতি

১৯১৭ সালের ৯ই জুলাই মাদ্রাজের ম্যাঙ্গালোর জেলায় ডাঃ এ. আর. নটরাজন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা এবং গণিতে ১৯৩৬ সালে বি. এস-সি পাশ করেন এবং মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে এম-বি-বি-এস কোর্সে ভর্তি হন। ১৯৪১ সালে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সেনা বিভাগে আই. এম. এস-র

ডাঃ এ. আর. নটরাজন

চাকুরি গ্রহণ করেন। যুদ্ধের সময় বার্মা ফ্রন্টে আহত হইবার ফলে তিনি উক্ত চাকরি ছাড়িয়া দিয়া মাদ্রাজ মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগদান করেন।

অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন

ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা শাখার সভাপতি

ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা শাখার সভাপতি শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন এ. আর. এস. এম. (লণ্ডন) এফ. আর. আই. সি. (লণ্ডন) ও এম. আই. ই. (ইণ্ডিয়া) ১৮৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

রসায়নশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে ১৯১৪ সালে শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন বি. এস-সি পাশ করেন। তিনি উড্রো বৃত্তি, রায় শ্রীনাথ পালবাহাদুর স্বর্ণপদক এবং রায় অমৃতনাথ মিত্র বাহাদুর পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অজৈব রসায়নে এম. এস-সি উপাধি লাভ করেন। রাসবিহারী ঘোষ গবেষণা-বৃত্তি লইয়া তিনি রসায়ন-শাস্ত্রের কয়েকটি শাখায় ১৯১৬ হইতে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত গবেষণা করেন এবং জে. এন. টাটা বৃত্তি লইয়া

১৯২২ সালে ধাতু-বিদ্যায় উচ্চতর গবেষণার জন্য লণ্ডনে যান। ১৯২২ হইতে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ডর্মন লঙ কোম্পানীতে শিক্ষানবিশ হিসাবে গবেষণার কাজ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে যোগদান করিয়া কয়েক

অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন

বৎসর পর্যন্ত ধাতুবিজ্ঞান ও রসায়ন বিভাগের প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৫ সালে তিনি বি-ই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ঐ পদে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত কাজ করিবার পর অবসর গ্রহণ করেন। অধ্যাপক সেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য এবং বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

অধ্যাপক ভি. গণপতি. আয়ার
গণিত শাখার সভাপতি

শ্রী ভি. গণপতি আয়ার ১৯০৬ সালের ১০ই নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে গণিত শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রি অর্জন করিবার পর রিসার্চ স্কলার এবং রিসার্চ ফেলো হিসাবে ডাঃ বৈদ্যনাথ স্বামী এবং অধ্যাপক আনন্দ রাও-এর অধীনে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বৎসর গবেষণা করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস-সি ডিগ্রি পান। আজ ২৫ বৎসর যাবৎ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের সকল শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে ২৭ বৎসর

অধ্যাপক ভি. গণপতি. আয়ার

যাবৎ গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় দুরূহ গবেষণার কাজ চালাইতেছেন। বর্তমানে তিনি আন্না-মালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং ইণ্ডিয়ান ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটির (১৯৫৭-'৫৯ পর্যন্ত) সভাপতি ছিলেন।

ডাঃ এ. রায়
শারীরতত্ত্ব শাখার সভাপতি

ডাঃ রায় ১৯১৮ সালে আসামের ধুবড়িতে জন্ম-গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে এম. এস-সি পাশ করিয়া ডাঃ রায় স্যার জে. সি. বোস রিসার্চ স্কলারশিপ লইয়া বোস ইনষ্টিটিউটে যোগ-দান করেন। পরে "লেডী টাটা স্কলারশিপ" পাইয়া কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে গবেষণায় ব্যাপৃত হন। 'চর্বি হজম' বিষয়ে তাঁহার গবেষণা অচিরেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। উক্ত গবেষণার সময়েই তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন।

১৯৪৩ সালে তিনি বিদেশে যান এবং লণ্ডনের সেণ্ট টমাস মেডিক্যাল স্কুল ও ইউনিভার্সিটি কলেজে 'শরীরে দুগ্ধ উৎপাদন ও শরীর গঠনে হর্মোনের প্রভাব' সম্বন্ধে গবেষণা করেন। বৃটিশ এগ্রিকাল-চারেল রিসার্চ কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত এক বৃত্তি

ডাঃ এ. রায়

পাইয়া তিনি কিছুকাল ডেয়ারি সম্পর্কিত রিসার্চ ইনষ্টিটিউটেও গবেষণা করেন। ১৯৪৮ সালে ডাঃ রায় ইণ্ডিয়ান ভেটারিনারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে (মথুরা) যোগ দেন। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি তথায় শারীরতত্ত্ব ও জৈব-রসায়নের অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ন্যাফিল্ড ফাউণ্ডেশনের ফেলো হিসাবে ডাঃ রায় ১৯৫৩-৫৪ সালে কেম্ব্রিজে ছিলেন।

ডাঃ এস. পার্থসারথি

পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি

বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র মুস পদক-প্রাপ্ত ডি. এস-সি ডাঃ এস. পার্থসারথি একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন পদার্থবিদ্যাবিদ। তিনি পদার্থ-বিদ্যার শ্রবণাতীত শব্দ-তরঙ্গ বিষয়ের একজন বিশেষ কৃতী গবেষক। তিনি কিছুকাল স্থিতর তরল দ্রব্য এবং বাষ্পের মধ্যে আলোর বিচ্ছুরণ রহস্য সম্পর্কে গবেষণা করিয়াছেন। তার পরেই তিনি শ্রবণাতীত শব্দ-তরঙ্গের এক নতুন দিক লইয়া গবেষণা সুরু করেন। বিভিন্ন তরল পদার্থের মধ্যে শ্রবণাতীত শব্দ-তরঙ্গের গতিবেগ সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা চালাইয়া তিনি বিভিন্ন তরল পদার্থের মধ্যে শব্দ-তরঙ্গের গতি এবং রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধে কতকগুলি চমকপ্রদ নূতন নিয়ম উদ্ভাবন করেন। তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেন যে, শ্রবণাতীত শব্দ-তরঙ্গের ক্ষেত্রে আলো-কে এক অভিনব উপায়ে প্রতিফলিত করা যায়। শব্দ ও আলোক-তরঙ্গের এই বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্রের তিনিই প্রথম প্রবর্তক এবং আজ পর্যন্ত তিনিই প্রধান।

শব্দ-তরঙ্গ ও রাসায়নিক দ্রব নিয়া বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার পর সম্প্রতি তিনি শ্রবণাতীত শব্দ-তরঙ্গের ক্ষেত্রে এক নূতন চিন্তা ধারার সূত্রপাত করিয়াছেন। তার নাম দিয়াছেন—থারমোসোনিক্স। এই নতুন গবেষণায় তিনি তাপ ও শব্দ-তরঙ্গে সমতুল্যতা লক্ষ্য করিয়াছেন। শব্দ-তরঙ্গ-শোষণ, তার বহন ও পরিচালনযোগ্যতা, বাহক-পরিচালক মাধ্যমের তরঙ্গ-বিস্তার ক্ষমতা প্রভৃতি নির্ণয়ে এই আবিষ্কারের যোগ্যতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ রসায়নশাস্ত্রের অনেক সমস্যার সমাধানে এই আবিষ্কার প্রয়োগ করা সম্ভব হইবে। তিনি কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইনডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর প্রথম এবং একমাত্র টেক্‌নিক্যাল সেক্রেটারী। আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ এই দায়িত্ব লইয়া তিনি শল্য-নির্মাণের ইস্পাত, বক্সাইট ম্যাগ্নেটাইট হইতে টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড নিষ্কাশন, দৃষ্টি বিভ্রমকারী অবলোহিত, রং এবং এই রকমের আরো অনেক জিনিষ উৎপাদনের পথ সুগম করিয়া শিল্পের অনেক সমস্যার সমাধান করিয়াছেন।

অ্যাটম বোমাবিধ্বস্ত হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমার প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনার

জন্য যে আন্তর্জাতিক কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, তিনি সেই কমিশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। ইউনেসকোর ১৯৫২ সালের সাধারণ সম্মেলনেও তিনি ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন।

ডাঃ বি. এন. সিং

কৃষি-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি

ডাঃ বৈজনাথ সিং ১৯১৪ সালের ৩১শে জুলাই বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এস-সি পাশ করিয়া তিনি অধ্যাপক জে. বি. গ্যাটেনবীর কাছে যান। তাঁর অধীনে প্রোটোজোয়ার সাইটোপ্লাজম

ডাঃ বি. এন্. সিং

প্রভৃতি সম্বন্ধে সাইটোলোজীর গবেষণা করিয়া ১৯৩৮ সালে ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি উপাধি অর্জন করেন। সেখান হইতে বার্লিন ডাহ্‌লেমে কাইজার উইলহেলম্ ইনষ্টিটিউটে আসেন। এখানে কিছুদিন গবেষণার কাজ করিবার পর তিনি ইংল্যাণ্ডে আসেন এবং একটানা ১৪ বৎসর, অর্থাৎ ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত রথহ্যামষ্টেড পরীক্ষাগারে মৃত্তিকার আণুবীক্ষণিক জীবাণু এবং অ্যামিবা প্রভৃতি লইয়া কাজ করেন। তিনি যথাক্রমে ১৯৪০ ও ১৯৪৭ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি ও ডি. এস-সি উপাধি লাভ করেন। ১৯৫১ সালের কিছুকাল প্যারিসের পাস্তর ইনষ্টিটিউটে মাইক্রোম্যানিপুলেসনের কাজ শিক্ষা করেন। অতঃপর ইউরোপের বিভিন্ন ইনষ্টিটিউট ঘুরিয়া ১৯৫২ সালে লক্ষ্ণৌ-এর ড্রাগ রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর পদে যোগদান করেন।

ডাঃ এম. এল. চক্রবর্তী

নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখার সভাপতি

ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে ১৯০২ সালে ডাঃ এম. এল. চক্রবর্তীর জন্ম হয়। একজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি তাঁহার শিক্ষাকালব্যাপী বহু বৃত্তি এবং সম্মান অর্জন করিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য
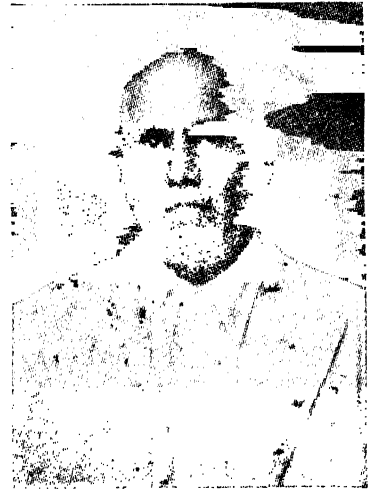
ডাঃ এম. এল. চক্রবর্তী

তাঁহার খুবই আগ্রহ ছিল। নৃতত্ত্বের এম. এস-সি ডিগ্রি পাওয়ার 'পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. বি. পাশ করেন তারপর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি. এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৪৭ সালে। সে

বৎসরই তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে শারীরতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং আংশিক সময়ের অধ্যাপক হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে নৃতত্ব বিভাগে নিয়োগ করে। ১৯৩৯ সালে জার্মেনীতে তাঁহার শারীরতত্ত্বের এক বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয় প্রকাশিত হয় এবং তাহারই স্বীকৃতি হিসাবে এই নিয়োগ হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "মহারাজা দ্বারভাঙ্গা রিসার্চ স্কলারশিপ" দিয়া সম্মানিত করে। বাংলার ১৯৪৩-'৪৫ এর দুর্ভিক্ষের সময়ে উপবাস ও অপুষ্টিকরতা সম্পর্কে তাঁর শারীরতাত্ত্বিক গবেষণা বিদেশে প্রভূত আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত ১৯৪৭ সালের ফিজিওলজিক্যাল কংগ্রেসেও তিনি আমন্ত্রণ পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে অন্যান্য সম্মানের সঙ্গে "স্যার আশুতোষ গোল্ড মেডেল" দিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিল। তিনি বহু আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত আছেন এবং বহু বৈদেশিক বিজ্ঞান-পত্রিকায় মৌলিক প্রবন্ধাদি লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

প্রবন্ধের ব্লকগুলি 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত। —স

পুস্তক পরিচয়

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত. বি. এস. সি. প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি; ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২; পৃষ্ঠা সংখ্যা—৮০। মূল্য—এক টাকা পঁচিশ নয়া-পয়সা।

পুণ্যশ্লোক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনচরিতের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল এবং শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত সেই প্রয়োজন মিটিয়েছেন। এককালে ডাঃ সরকার বাংলাদেশের চিকিৎসক ও বিদ্বদ্মণ্ডলীর মধ্যে আলোড়ন এনেছিলেন। শুধু চিকিৎসকরূপেই নন, বিভিন্ন দিকে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা দেশবাসীকে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল। প্রথম শ্রেণীর অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসক হয়েও কিভাবে তিনি হোমিওপ্যাথির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সম্মিলিত অ্যালোপ্যাথদের আক্রমণের বিরুদ্ধে কিভাবে সংগ্রাম করে তিনি তাঁর নবজ্ঞাত মতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার এক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আলোচ্য গ্রন্থে সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে সৃষ্ট ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা ও তার ক্রমপরিণতির কথা, তাঁর অদ্ভুত চরিত্রের কথা, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার দ্বারা দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ের ইতিহাস এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শের কাহিনী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ডাঃ সরকারের জীবনপঞ্জী, তাঁর পুস্তক ও প্রবন্ধের বিবরণী এ গ্রন্থের আরো একটি আকর্ষণ। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। প্রচ্ছদ সুরুচিপূর্ণ। অ.

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নব অবদান—আর্মেনগার্ড ইবার্ল; প্রকাশক—শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি; ৯, মহাত্মা গান্ধী রোড—কলিকাতা-৯। মূল্য—১.৫০।

সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধিও ক্রমশঃ জটিলতর আকার নিয়েছে। কিন্তু রোগের কাছে বিজ্ঞান হার মানে নি। মানুষ রোগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোগ নিরাময়ের নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করেছে।

'চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নব অবদান'—এই শিরোনামার মধ্যেই গ্রন্থটির বক্তব্য বিষয় নিহিত আছে। পেনিসিলিন, সালফা ড্রাগ, ভিটামিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, ভ্যাক্সিন, কর্টিজোন ইত্যাদি বারোটি বিভিন্ন যুগান্তকারী ভেষজের আবিষ্কারকের কাহিনী

অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। আবিষ্কারকের কাহিনী যে কোন অংশেই রোমাঞ্চকর উপন্যাসের চেয়ে কম হৃদয়গ্রাহী নয়, তারও প্রমাণ পাওয়া গেল এই গ্রন্থে। আলোচ্য পুস্তকের মধ্য দিয়ে পাঠক আধুনিক ব্যাধি, আধুনিক ভেষজ এবং বিশ্বের বহু প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।

এতৎসত্ত্বেও গ্রন্থটিতে কতকগুলি দোষত্রুটি রয়ে গেছে। সর্বত্র সতর্কতার সঙ্গে অনুবাদ করা হয় নি—স্থানে স্থানে অধিকতর সাবলীলতার প্রয়োজন ছিল। মাঝে মাঝে মুদ্রণপ্রমাদ দৃষ্টিকটু। বাঁধাই ভাল। প্রচ্ছদ সুরুচিপূর্ণ। আমরা এ-জাতীয় পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। অ.

জলের রূপকথা—ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ ডি. এস-সি.; প্রকাশক-শিশুসাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড; ৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য—এক টাকা মাত্র।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে জল সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যাদি পরিবেশন করা হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া জল সম্বন্ধে পাঠকেরা অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন। কিন্তু পুস্তকখানি ত্রুটিমুক্ত নহে। সাধুভাষায় লিখিত হইলেও স্থানে স্থানে চলিত ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অনেক স্থলেই ভাষার প্রাঞ্জলতার অভাব সুস্পষ্ট। জীব-জগতের অভিব্যক্তি ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে প্রসঙ্গতঃ যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে সাধারণ পাঠকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে। কোন কোন তথ্যাদি সম্বন্ধে অধিকতর সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। যেমন—একস্থলে আছে, 'ডেড-সী' নামে আরবদেশে একটি হ্রদ আছে। এই সকল ত্রুটি মুক্ত হইলে পুস্তকখানি অধিকতর আকর্ষণীয় হইত।

মহাকাশ জয়ের রূপকথা—শ্রীঅজিত বসু; প্রকাশক—শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ; ৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯; পৃঃ—১০০; মূল্য—একটাকা মাত্র।

বিগত ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েট রাশিয়া তিন-পর্যায়ের রকেটের সাহায্যে স্পুটনিক-১ নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করিতে সক্ষম হয়। এই কৃত্রিম উপগ্রহটির ওজন ছিল প্রায় সোয়া দুই মণ। স্পুটনিক সমেত রকেটটির দৈর্ঘ্য ছিল বাহাত্তর ফুটেরও বেশী। গড়ে প্রায় পাঁচশত ছিয়াশি মাইল দূরে থাকিয়া এই উপগ্রহটি ঘণ্টায় আঠার হাজার মাইল বেগে প্রায় দেড় ঘণ্টায় পৃথিবীকে একবার ঘুরিয়া আসিত। মোট ১৪০০ বার পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া ৯২ দিন পরে স্পুটনিক পৃথিবীর ঘন বায়ু স্তরে প্রবেশ করিয়া ধ্বংস হইয়া যায়। মহাকাশে উপগ্রহ স্থাপনে রাশিয়ার এই বিস্ময়কর সাফল্যে পৃথিবীর সর্বত্র এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। মহাকাশ, রকেট ও আমাদের প্রতিবেশী জ্যোতিষ্কগুলি বিষয় জানিবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ পাইতে থাকে। এই কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনেক পুস্তক, পুস্তিকা ও নিবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতেও এই সকল বিষয়েই আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তকখানিতে মহাকাশের রূপ, সৌরজগৎ, মহাকাশ যাত্রাপথে বাধা, বায়ুমণ্ডল, মাধ্যাকর্ষণ, মহাশূন্য ষ্টেশন, মহাশূন্য-যাত্রার রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় সহজ, সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বইখানি পড়িয়া অনেকেই এই সকল বিষয় মোটামুটি বুঝিতে পারিবেন। পুস্তক-খানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। শিশু সাহিত্য সংসদের এই পর্যায়ের পুস্তকগুলিকে 'রূপকথা' বলা হইয়াছে কেন—বুঝা গেল না।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী—১৯৬০

১৩শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা
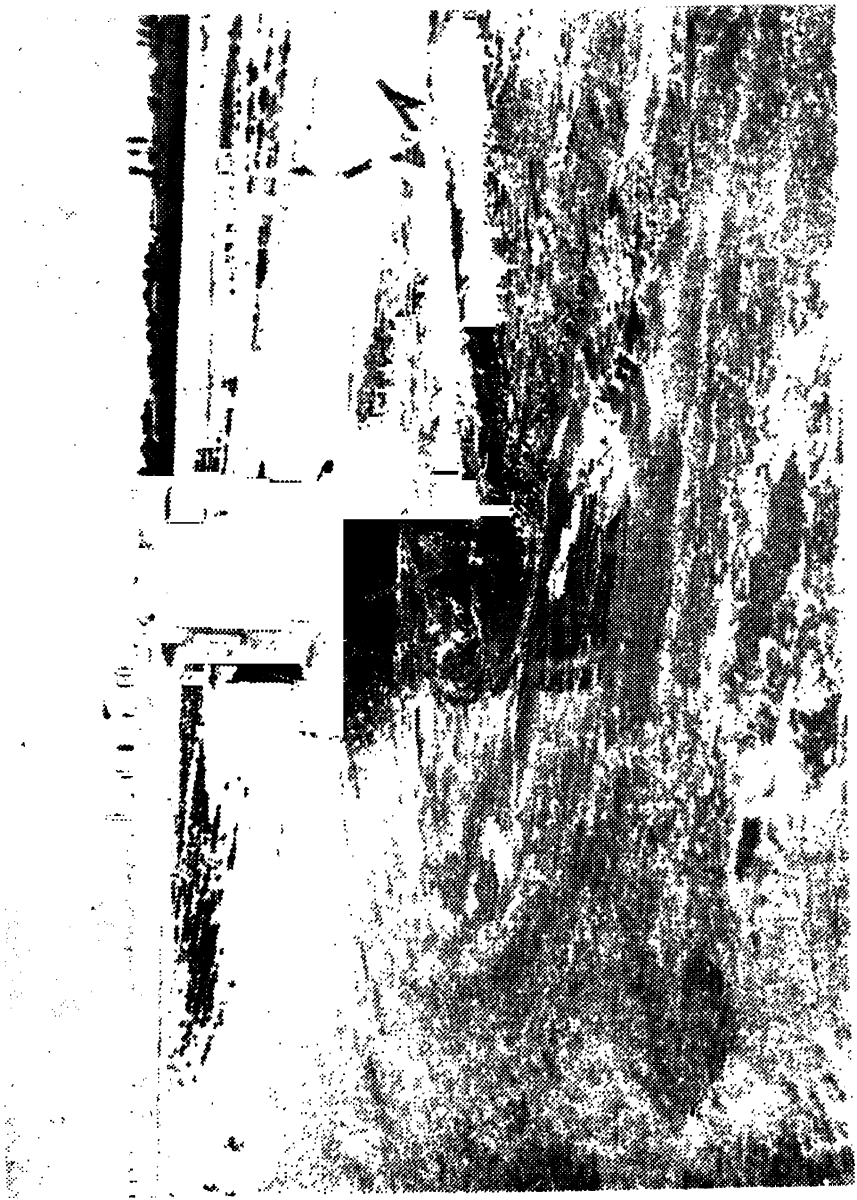
সোভিয়েট রাশিয়ায় যন্ত্রের সাহায্যে জলাভূমি সমতল করিয়া ধানের বীজ বপনের উপযোগী করা হইতেছে।

চারকোল

চারকোল শব্দটির সঙ্গে আমাদের অনেকেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। বিজ্ঞানের বই, বিশেষ করে রসায়ন-বিজ্ঞান পড়তে গেলে কথাটি অনেক সময়েই চোখে পড়ে। আর দৈনন্দিন জীবনেও ঐ বস্তুটি আমদের নেহাৎ অপরিচিত নয়। যেমন ধর, অনেকের বাড়ীতেই কাঠের উনুনে রান্না হয়। পাড়াগাঁয়ে তো ঘরে ঘরেই কাঠের উনুন! রান্নার পর কাঠের উনুনের তলায় কয়লার মত একরকম বস্তু দেখতে পাবে। কাঠের অসম্পূর্ণ দহনের ফলে ঐ বস্তুটির সৃষ্টি হয়। এরই নাম চারকোল। তবে এ এক বিশেষ ধরণের চারকোল, নাম উড চারকোল। চলিত বাংলায় বলতে গেলে বলতে হয় কাঠকয়লা।

হ্যাঁ, চারকোল বলতে মোটামুটিভাবে কয়লাকেই বোঝায়। তবে অবিশুদ্ধ কয়লা। এর মূল উপাদান হলো কার্বন, অর্থাৎ অঙ্গার।

চারকোল আবার নানা রকমের। যেমন, উড-চারকোল বা কাঠকয়লা, বোন-চারকোল বা হাড়কয়লা এবং ব্লাড-চারকোল বা রক্ত থেকে পাওয়া কয়লা। এ ছাড়াও চিনি এবং নারকেলের শক্ত মালা থেকে চারকোল তৈরী হয়। তাদের নাম আলাদা। যেমন চিনি থেকে তৈরী কয়লার নাম সুগার-চারকোল। নারকেলের খোলা বা মালা থেকে তৈরী কয়লার নামটা একটু জটিল। ওর নাম অ্যাকটিভেটেড চারকোল। অ্যাকটিভেটেড নামটা এসেছে ইংরেজী শব্দ 'অ্যাকটিভ' থেকে। অ্যাকটিভ মানে সক্রিয়। তাই অ্যাকটিভেটেড চারকোলকে বাংলায় আমরা সক্রিয় কয়লা বলতে পারি। যাহোক, এখন একে একে বলি বিভিন্ন ধরণের চারকোলের কথা।

উড-চারকোল—আগেকার দিনে মাটি দিয়ে ভালভাবে ঢাকা কাঠের স্তূপের তলায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হতো। তাতে স্তূপের কাঠ ধীরে ধীরে পুড়ে যেত এবং পাওয়া যেত কাঠকয়লা। কিন্তু এভাবে কাঠকয়লা তৈরী করা উচিত নয়। কারণ কাঠ পোড়াবার সময় উড গ্যাস নামে একটি দাহ্য গ্যাস পাওয়া যায়; আর পাওয়া যায় একটি উদ্বায়ী তরল পদার্থ। এই তরল পদার্থ থেকে আবার নানারকম রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। কাজেই এভাবে কাঠ পোড়ানো মানেই উড গ্যাস ও তরল পদার্থটুকু অযথা নষ্ট করা।

এই অপচয় বন্ধ করবার জন্যে আজকাল অন্যভাবে কাঠকয়লা তৈরী করা হয়। নতুন পদ্ধতিতে প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্ত লোহার পাত্রে কাঠকে শুষ্ক অবস্থায় পাতিত করা হয়। পাতনের সময় লোহার পাত্রটিকে বায়ুশূন্য রাখা হয়।

এই পাতনের ফলে পাওয়া যায় উড গ্যাস। বিবিধ কাজে এ গ্যাসের ব্যবহার

আছে। পাতনের সময় যে তরল পদার্থ পাওয়া যায়, তার নাম পাইরোলিগ্‌নিয়াম অ্যাসিড। এই অ্যাসিডে আছে অ্যাসেটিক অ্যাসিড, মিথাইল অ্যালকোহল ও অ্যাসিটোন। পাতন সম্পূর্ণ হলে লোহার পাত্রে যে কঠিন পদার্থ পড়ে থাকতে দেখা যায়, তারই নাম উড চারকোল। আমাদের দেশের মহীশূর রাজ্যের ভদ্রাবতীতে কাঠকে এমনিভাবে পাতিত করবার একটি কারখানা এখনও চালু আছে।

উড চারকোল ছিদ্রবহুল কালো রঙের পদার্থ। জ্বালানী হিসাবে এর ব্যবহার আছে। ফিল্টার বেড ও বারুদ তৈরীতেও উড-চারকোল প্রয়োজন হয়। ছিদ্রবহুল বলে এ কয়লা সহজেই তরল ও বায়বীয় পদার্থ শুষে নিতে পারে। আর এই গুণটি থাকবার দরুণ অনেক স্থানে, বিশেষ করে অনেক হাসপাতালে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু শোধন করবার কাজে উড চারকোল ব্যবহৃত হয়। অনেক রঙীন তরল পদার্থকে রং মুক্ত করবার জন্যেও উড-চারকোলের ব্যবহার আছে।

বোন-চারকোল—ইংরেজী বোন শব্দের অর্থ হাড়। হাড় থেকে যে কয়লা পাওয়া যায়, তারই নাম বোন-চারকোল।

বোন-চারকোল তৈরী করবার জন্যে চর্বিমুক্ত হাড় একটি লোহার পাত্রে রেখে অন্তর্ধূম পাতন প্রক্রিয়ায় পাতিত করা হয়। পাতনের সময় ক্ষারযুক্ত একটি পদার্থ পাওয়া যায়। সেই তরল পদার্থের মূল উপাদান হলো অ্যামোনিয়া। আর পাওয়া যায় একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ। তার নাম বোন-অয়েল। বোন অয়েল-এর প্রধান উপাদান হলো পাইরিডিন। লোহার পাত্রের মধ্যে যে কালো পদার্থটি পাতনের পর পড়ে থাকে, তারই নাম বোন-চারকোল। এর অপর নাম অ্যানিম্যাল চারকোল।

চিনি পরিষ্কার করা, অর্থাৎ তার ময়লা রং দূর করবার কাজেই প্রধানতঃ বোন-চারকোলের ব্যবহার হয়। ময়লা চিনির দ্রব বোন-চারকোলের ভিতর দিয়ে চুইয়ে ফিল্টার করে নিলে চিনি ধবধবে সাদা হয়। জলে গোলা অ্যাসিড কুইনাইন সালফেট-এর স্বাদ তিক্ত। বোন-চারকোলের মধ্যে দিয়ে ঐ দ্রবকে চুইয়ে ফিল্টার করে নিলে তার তিক্ত স্বাদ দূর হয়।

বোন-চারকোলের মত একই ধরণের প্রক্রিয়ায় রক্ত থেকে পাওয়া যায় ব্লাড-চারকোল। রসায়নবিদ্যায় এরও নানান ব্যবহার আছে।

সুগার-চারকোল—চিনি থেকে চারকোল, অর্থাৎ সুগার-চারকোল পেতে হলে চারদিক ঢাকা একটি পাত্রে খাঁটি চিনি নিয়ে তাকে উত্তপ্ত করতে হবে। উত্তপ্ত করবার সময় একরকম গ্যাস বেরুতে দেখা যাবে। গ্যাস বেরুনো বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পাত্রের মধ্যেকার চিনিতে তাপ দিতে হবে। তারপর চারকোলে পরিবর্তিত ঐ চিনিকে একটি গ্রাফাইটের নলের মধ্যে পুরে ক্লোরিন গ্যাসের সান্নিধ্যে ১০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে উত্তপ্ত করতে হবে। পরে ঐ চারকোলকে জলে ধুয়ে হাইড্রোজেন গ্যাসের সান্নিধ্যে

রেখে শুকিয়ে নিতে হবে। তবেই পাওয়া যাবে, সুগার-চারকোল। সুগার-চারকোল হচ্ছে একেবারে খাঁটি অঙ্গার বা কার্বন।

অ্যাকটিভেটেড চারকোল—নারকেলের শক্ত খোলা বায়ুর সংস্পর্শে না রেখে প্রচণ্ড তাপ দিলে তা সক্রিয় এক বিশেষ ধরণের চারকোলে রূপান্তরিত হয়। এরই নাম অ্যাকটিভেটেড চারকোল।

প্রধানতঃ গ্যাস-মুখোস তৈরীর কাজেই এই চারকোল ব্যবহৃত হয়। বিষাক্ত গ্যাসপূর্ণ বায়ু গ্যাস-মুখোসের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর বিষমুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুতে পরিণত হয়। এই বিষ-মুক্তির কাজে অ্যাকটিভেটেড চারকোলের অবদান অনেকটা। বলা বাহুল্য, গ্যাস-মুখোসের মধ্যে অ্যাকটিভেটেড চারকোলের একটি পুরু স্তর থাকে। অবশ্য আরও অনেক রাসায়নিক দ্রব্য থাকে মুখোসের ভিতরে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, রসায়ন-বিজ্ঞানে চারকোল জিনিষটার বিবিধ ব্যবহার রয়েছে। বড় হয়ে বিভিন্ন ধরণের চারকোল সম্বন্ধে তোমরা আরও অনেক তথ্য জানতে পারবে।

শ্রীঅমরনাথ রায়

বিচিত্র মাছ

অন্ধকারে পোষাক বুনে তার দ্বারা সারারাত্রি নিজের দেহ ঢেকে রেখে ভোর বেলায় তা ছিঁড়ে ফেলে দেয়—এক জাতের বিচিত্র সামুদ্রিক মাছ। এরা প্যারট ফিস বা তোতামাছ নামে পরিচিত।

মাছের পোষাক বোনবার কথা শুনে তোমাদের অনেকেই হয়তো অবাক হয়ে যাবে। ভাবছো মাছের আবার পোষাক থাকে নাকি? তাও আবার নিজের বোনা! অবশ্য এদের পোষাক আমাদের পোষাকের সঙ্গে মিলবে না। এদের পোষাক হলো—চট্‌চটে আঠালো পদার্থের একটি বিচিত্র আবরণ। এই আবরণ এরা নিজেরাই বুনে তৈরী করে। রাত্রি ছাড়া অন্য কোন সময় এরা বোনার কাজ আরম্ভ করে না। আবরণটা তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা দিয়ে সম্পূর্ণ দেহটাকে ঢেকে ফেলে। আবার ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে আবরণটা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। এভাবেই এরা সারাজীবন পোষাক অর্থাৎ আবরণ তৈরী করে থাকে।

সারাদিন এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে' এরা খাদ্য সংগ্রহ করে; কিন্তু সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের তলদেশে চলে যায় এবং নৈশ-পোষাক বোনবার কাজ আরম্ভ

করে। বোনবার সময় এরা উদরদেশের পাখ্না এবং লেজের প্রান্তভাগে আলতো-ভাবে ভর দিয়ে স্থিরভাবে অবস্থান করে।

মাকড়সার জাল বোনবার কৌশল অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবে। এদের জাল বোনবার কৌশলও অনেকটা মাকড়সার মত। এদের ঠোঁট থেকে কতকগুলি লম্বা লম্বা সূক্ষ্ম সূতার মত পদার্থ নির্গত হয়। এই সূতাগুলিই হচ্ছে এদের পোষাকের উপকরণ। শারীরিক গতির সাহায্যে এরা অদ্ভুত কায়দায় চট্পট্ মাকড়সার জালের মত একটা আবরণ তৈরী করে খুব তাড়াতাড়ি সারা শরীরটা ঢেকে ফেলে। কেবল শ্বাসকার্য চালাবার জন্যে আবরণের যে অংশ দিয়ে মুখটা ঢেকে রাখে, সেটাকে একটু ঢিলা করে দেয়। ফলে, ঢিলা অংশটা ঝুলতে থাকে আর তার মাঝখানে থাকে একটা ছিদ্র। শ্বাসকার্যের সঙ্গে সঙ্গে ঢিলা অংশটা একবার চুপ্সে যায় আবার ফুলে ওঠে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে এরা যে জল ত্যাগ করে, সেটা বেরিয়ে যাবার জন্যে আবরণটায় আর একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। এভাবে এদের কান্কোর মধ্য দিয়ে জলধারা প্রবাহিত হতে থাকে। ফলে আবরণের মধ্যে বদ্ধ থাকলেও এদের শ্বাসকার্যের কোন অসুবিধা হয় না।

এদের আবরণটা প্রথমে পাত্লা ও স্বচ্ছ থাকে; কাজেই সেই অবস্থায় সেটাকে সহজেই দেখা যায়। তারপর আবরণটা কিছুক্ষণের মধ্যেই মোটা হয়ে যায়। তখন মাছটাকে আর দেখা যায় না; সেটা আবরণের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে থাকে। এ অবস্থায় আবরণটাকে একপ্রকার চট্চটে আঠালো পদার্থের একটা ডেলার মত দেখায়।

সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা হলো—বিজ্ঞানীরা বহু চেষ্টা করেও এদের আবরণ নির্মাণ-কৌশল এযাবৎ দেখতে সক্ষম হন নি। পরীক্ষাগারে পুষেও বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছেন—এদের বিস্ময়কর বয়ন-কৌশল দেখবার জন্যে; কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে—কোন আলোর অনুভূতি টের পেলেই এরা বয়ন-কার্য বন্ধ করে দেয়।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এরা আবরণ ভেদ করে বাইরে এসে ঘোরাফেরা করতে থাকে। আবরণটাকে ভেদ করতে এদের বেশ একটু কসরৎ করতে হয়। পরীক্ষাগারে পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, আবরণী ভেদ করবার সময় এরা শরীরটাকে পাক দিতে দিতে আবরণের সামনে ও ভিতরে পিছনের দিকে ঠেলতে থাকে। কিছুক্ষণ এভাবে কসরৎ করবার পর আবরণের দুই দিক ভেদ করে হঠাৎ মুখের সাহায্যে সেটাকে সজোরে ছিঁড়ে ফেলে বাইরে চলে আসে। এদের এই কাজ চলে সারাজীবন ধরে।

সব জাতের তোতামাছ বা প্যারট ফিসই যে এরূপ আবরণ তৈরী করে—তা নয়। অন্ততঃ এদের মধ্যে একটি জাতের সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা একেবারেই এই আবরণ তৈরী করে না। আবার এদের মধ্যে কোন কোন জাতের মাছ দিনের বেলাতেই আঠালো আবরণ তৈরী করে শরীরটাকে ঘিরে রাখে। অবশ্য এ-সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না।

অন্ধকারের মধ্যে এদের এই আবরণ বোনা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নানা মত প্রকাশ করেছেন। কারো কারো মতে—এদের শরীরে একটা স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আছে, যা চোখ থেকে স্নায়ুতন্ত্র এবং শেষে শ্লৈষ্মিক কোষ পর্যন্ত প্রসারিত। অন্য একটা মত হচ্ছে—সমুদ্রের তলদেশে অক্সিজেনের পরিমাণ খুবই কম এবং অক্সিজেনের স্বল্পতার ফলেই এদের শ্লৈষ্মিক কোষগুলি উত্তেজিত হয়।

কি উদ্দেশ্যে এরা এই অভিনব নৈশ-পোষাক পরিধান করে? এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। তবে মেরীল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ হোয়ার্ডউইন বলেছেন যে, সম্ভবতঃ এরা নিশাচর শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এই অভিনব নৈশ-পোষাক পরিধান করে। এ ছাড়াও তিনি অনুমান করেন—রাত্রিতে সমুদ্রের কর্দমে যাতে এদের শরীরটা ঢেকে না যায়, সে জন্যেই এরা এই বিচিত্র পোষাক পরিধান করে থাকে। ডাঃ উইন ১৯৫৪ সালে বাহামার লার্ণার সামুদ্রিক গবেষণাগারে এই বিচিত্র মাছ সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা করেছিলেন।

অ্যারিষ্টটল এগুলিকে রোমন্থনকারী মাছ বলে অভিহিত করেছিলেন। আসলে কিন্তু এরা খাদ্যবস্তু রোমন্থন করে না। এরা খাদ্যবস্তু চিবিয়ে উদরসাৎ করে। প্রবাল এদের প্রিয় খাদ্য। বিখ্যাত ফরাসী ডুবুরী ও মোনাকোর সামুদ্রিক গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন কাউষ্টিন একবার লোহিত সাগরে এদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান-কার্য চালান। তিনি বলেছেন—এই মাছগুলি সুগঠিত এবং এক গজেরও বেশী লম্বা হয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে পরেই এরা প্রবাল-স্তূপের গায়ে মুখ দিয়ে ঠোকরাতে থাকে এবং দাঁত দিয়ে কড়মড় করে চিবিয়ে খাদ্য উদরসাৎ করে। তিনি হিসাব করে বলেছেন যে, এরা প্রত্যেকে প্রতি বছর প্রায় দশ টন প্রবাল উদরসাৎ করতে পারে।

তোতাপাখীর দাঁতের গঠন এবং ঠোঁটের সঙ্গে এদের দাঁত ও ঠোঁটের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায় এই মাছের নাম তোতামাছ বা প্যারট ফিস হয়ে থাকবে। এদের দাঁত ও ঠোঁট খুবই শক্তিশালী এবং দাঁতগুলি পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ।

এরা সাধারণতঃ কঠিন খাদ্য উদরসাৎ করে থাকে। শিলা, প্রবাল-স্তূপ, শ্যাওলা প্রভৃতির মধ্যে এরা সাধারণতঃ খাদ্যের সন্ধানে বিচরণ করে এবং তীক্ষ্ণ দাঁতের সাহায্যে ঠুক্‌রে ঠুকরে খাদ্যদ্রব্য উদরসাৎ করে। অনেক সময় এরা প্রবালের মধ্য থেকে পলিপ নামক প্রাণী শিকার করে আহার করে। দাঁতের সাহায্যে এরা প্রবাল এবং অন্যান্য কঠিন সামুদ্রিক পদার্থ অনায়াসে চূর্ণ করতে পারে।

এযাবৎ বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জাতের প্রায় আশীটি প্যারট মাছের সন্ধান পেয়েছেন। পৃথিবীর অনেক দেশেই এদের কম বা বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। তবে বাহামা, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল অঞ্চলেই এদের

অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। এরা কখনো কখনো দলবদ্ধভাবে বিচরণ করলেও প্রায়ই এককভাবে ঘুরে বেড়ায়।

যখন নীলাভ সমুদ্রের তলদেশে ছুটাছুটি করে তখন শরীরের রঙের জন্যে এদের খুব সুন্দর দেখায়। অধিকাংশ জাতের মাছের দেহে সাধারণতঃ তিনটি রঙের ডোরাকাটা দাগ দেখা যায়। ডোরাকাটা দাগগুলি সবুজ, লাল, পাটল, নীল ও হলুদ প্রভৃতি রঙের হয়ে থাকে। দূর থেকে দেখলে অনেকটা রামধনুর মত মনে হয়। শৈশবের তুলনায় পরিণত বয়সে এদের দেহ-বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। স্ত্রী-মাছের তুলনায় পুরুষ মাছই পরিণত বয়সে বেশী উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে। কয়েক জাতের স্ত্রী-মাছের গায়ের রং বাদামী ও ধূসর হয়ে থাকে এবং তাদের দেহে আর অন্য কোন রং দেখা যায় না। দেহের বর্ণ-বৈচিত্র্যের জন্যে এদের সঠিক শ্রেণীবিভাগ করা খুবই কঠিন।

তোতামাছ বা প্যারট ফিস সম্বন্ধে আরও নতুন তথ্য সংগ্রহের জন্যে বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করছেন। আশা করা যায়—অনুসন্ধান-কার্যের ফলে এদের সম্বন্ধে আরও অজ্ঞাত তথ্যাদি জানা সম্ভব হবে।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

জানবার কথা

১। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত হ্রদগুলি মোট ৯৫,০০০ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে আছে

১নং চিত্র

হ্রদগুলির এই আয়তন চেকোশ্লোভাকিয়ার আয়তনের প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি। পৃথিবীতে এই হ্রদগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে স্বাদু জল সঞ্চিত আছে। এর

মধ্যে একটি হ্রদ আটলান্টিক মহাসাগরের কাছাকাছি হলেও—উভয়ের মধ্যে দূরত্বটা কিছু কম নয়—প্রায় ৫২৩ মাইল। এত দূরত্ব সত্ত্বেও এই হ্রদের কাছেই পৃথিবীর কয়েকটি বৃহত্তম বন্দর অবস্থিত।

২। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় এবং স্থায়ী ভাসমান সেতু ওয়াশিংটনের সীয়াটল্-এ অবস্থিত। ২৫টি কংক্রিটের ফাঁপা নৌকাকৃতি (pontoon) খিলানের উপর সেতুটি স্থাপিত। প্রতিটি খিলানের ওজন ৪৫০০ টন। সেতুটি ৬৫৬৬ ফুট লম্বা
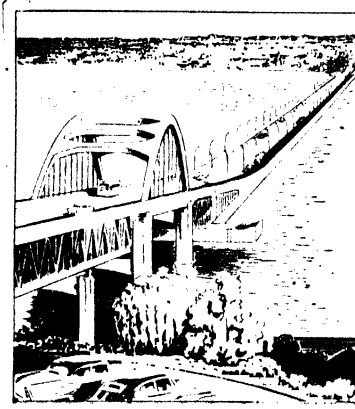
২নং চিত্র

এবং ওয়াশিংটন হ্রদের এক পাড় থেকে অপর পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। এই হ্রদের জলের গভীরতা হচ্ছে ২১০ ফুট। এই ধরণের আর একটি ভাসমান সেতু টাসমেনিয়ায় অবস্থিত। এছাড়া পৃথিবীতে এই ধরণের সেতু বোধ হয় আর কোথাও নেই।

৩। হেলিকপ্টারের কথা আজ আর কারো অজানা নেই। হেলিকপ্টার
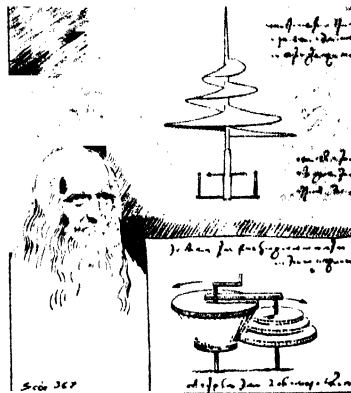
৩নং চিত্র

আধুনিক আকাশযান হলেও মানুষ এ-ধরণের যন্ত্র নির্মাণের চিন্তা বহুদিন আগেই করেছিল। প্রায় ৫০০ বছর আগে বিখ্যাত ইটালীয় পণ্ডিত লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি

(ইনি একাধারে ছিলেন শিল্পী, বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ্) হেলিকপ্টারের নক্সা তৈরী করেন। তাঁর পরিকল্পিত হেলিকপ্টারে একটি এয়ার-স্ক্রু শয়ানভাবে স্থাপিত ছিল। মোটর ঘোরবার ফলেই আকাশযানটি শূন্যে উড়তে সক্ষম হতো। আধুনিক গাড়ীতে গিয়ার বদল করে যেরূপ বিভিন্ন গতিবেগ দেওয়া হয়—লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি বহু বছর পূর্বেই সেই পদ্ধতি উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছিলেন।

৪। বিখ্যাত নায়েগ্রা জলপ্রপাতের কথা তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে। বহু লোক এই নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখতে যায়। অধিক রাত্রে বা শীতকালে যখন দর্শকের সংখ্যা খুব কম থাকে—তখন এই প্রপাতের জলস্রোত আংশিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কি ভাবে এই কাজ করা হয়? উপর থেকে যে জলের ধারা নীচে

৪নং চিত্র

নেমে আসে, তাকে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্য পথে পরিচালিত করে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের যন্ত্রাদি চালানো হয়।
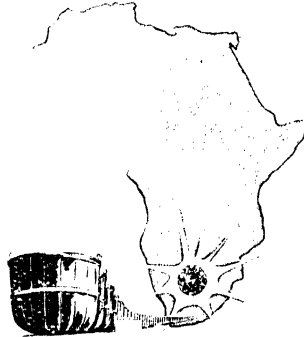
৫নং চিত্র

৫। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ হীরক পাওয়া যায় আফ্রিকায়।

একটা হিসাবে জানা যায়—প্রতি ১০০ ক্যারেট হীরকের প্রায় ৯৭ ভাগই আফ্রিকার খনি থেকে পাওয়া যায়। বাদ বাকী পাওয়া যায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের হীরক খনি থেকে। বর্তমানে পৃথিবীর বার্ষিক হীরক উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে, প্রায় ২৩ মিলিয়ন ক্যারেট। এই পরিমাণ হীরকের দ্বারা প্রায় ৭৫টি বুসেল পরিমাপের ঝুড়ি ভর্তি করা সম্ভব।

৬। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা গবেষণার ফলে স্থির করেছেন—মহাশূন্যে পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী (অবশ্য চাঁদকে বাদ দিলে) শুক্রগ্রহ অবিরত তাপ-শক্তির মত বেতার-তরঙ্গ পাঠাচ্ছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সীসার গলনাঙ্কের চেয়ে এই

৬নং চিত্র

গ্রহের তাপমাত্রা বেশী। এই তাপমাত্রায় গ্রহটিতে জল এবং জীবের অস্তিত্ব সম্ভব নয় বলেই মনে হয়।
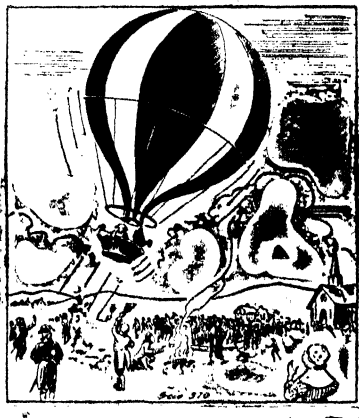
৭নং চিত্র

৭। ১৭৮৩ সালে ফ্রান্সের মণ্টগল্‌ফিয়ার ভ্রাতৃদ্বয় উত্তপ্ত বাতাস ভর্তি করে

১৫০০ ফুট উঁচুতে একটি বেলুন উঠিয়েছিলেন। ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুই এবং তাঁর পারিষদবর্গকে দেখাবার জন্যেই এই বেলুন আকাশে ওড়ানো হয়েছিল। এই বেলুনের আরোহী ছিল একটি মোরগ, একটি ভেড়া ও একটি পাতিহাঁস। বেলুনটি প্রায় আট মিনিট আকাশে ছিল। তারপর নীচে নেমে আসে। আরোহী প্রাণীগুলির সবাই সুস্থ ছিল। কেবল ভেড়ার লাথির আঘাতে একটি ডানা ভেঙে যাবার ফলে মোরগটি কিছুটা আহত হয়েছিল।

৮। কোন রাষ্ট্র যাতে অন্য রাষ্ট্রে সহসা আক্রমণ চালাতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে এক রাষ্ট্রের বিমানকে অন্য রাষ্ট্রের উপর দিয়ে অবাধে যাবার সুযোগ দেবার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করবার প্রধান উপায় হলো, বিমান থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ফটো গ্রহণ। এই প্রস্তাব অনুযায়ী পৃথিবীর দুটি বৃহৎ
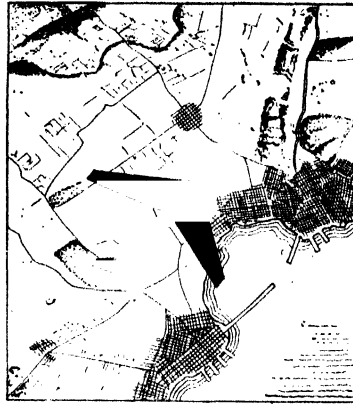
৮নং চিত্র

শক্তি—যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার বিমান থেকে উভয় রাষ্ট্রের ফটো তোলা হবে। সম্প্রতি টেক্সাসের ৪৫০০০ ফুট উপর থেকে ফটো তুলে যুক্তরাষ্ট্রে এই পরিকল্পনার কার্যকারিতা প্রদর্শিত হয়েছে। ম্যাগ্নিফাইয়িং গ্লাসের সাহায্যে এই আলোক-চিত্রের একটিতে সবুজ ঘাসের উপর একটা কাপ ও দুটা গল্‌ফ বলের ছবি পরিষ্কার দেখা যায়।

৯। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে—আকাশের সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত অ্যানড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জকে খালি চোখে দেখা সম্ভব। আলোর গতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল এবং পৃথিবীতে এই নক্ষত্রপুঞ্জের আলো পৌঁছাতে প্রায় দুই মিলিয়ন বছর সময় লাগে। কয়েক দশক আগে পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অ্যানড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জকে নীহারিকা বলেই জানতেন। এটাকে তাঁরা একটা উজ্জ্বল গ্যাসীয় পদার্থের সমষ্টি বলে মনে করতেন। পরে ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ

করে জানা গেছে যে, ঐ কুয়াশার মত পদার্থটি বিভিন্ন নক্ষত্রের সমষ্টি মাত্র। আমাদের

৯নং চিত্র

ছায়াপথের বাইরে এই নক্ষত্রপুঞ্জই হলো মানুষের চোখে-দেখা দূরতম নক্ষত্র হিসাবে প্রথম আবিষ্কার।

১০। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যক্তিগতভাবে বা জাতিগতভাবে বিভিন্ন অদ্ভুত বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এগুলিকে অনেকে কুসংস্কার বলে মনে করেন। পূর্বের তুলনায় কম হলেও এখনও পৃথিবীর অনেক দেশে এরূপ অদ্ভুত বিশ্বাস প্রচলিত আছে। মধ্যযুগে ফ্রান্সের সেণ্ট ভেরান-এর অন্তর্গত আলপাইন নামক গ্রামের লোকেরা বিশ্বাস

১০নং চিত্র

করতো যে, শয়তান বাড়ীর নব্বই ডিগ্রি কোণে লুকিয়ে থাকে। যে সব নাতি-বৃহৎ কাঠের বা পাকা বাড়ী তারা ব্যবহার করতো—সে সব বাড়ীর প্রায় কোথাও সমকোণ দেখতে পাওয়া যেত না।

১১। চাঁদ ছাড়া, রাত্রির আকাশে শুক্রগ্রহকে খুবই উজ্জ্বল দেখা যায়।

শুক্রগ্রহের ঔজ্জ্বল্য এতই বেশী যে, আকাশের অন্য সব গ্রহ-নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য এর কাছে ম্লান হয়ে যায়। শুক্রগ্রহের এই ঔজ্জ্বল্যের জন্যে পৃথিবীতে যে কোন বস্তুর অস্পষ্ট ছায়া পড়ে। অনেক সময় দুপুর বেলায়ও শুক্রগ্রহকে দেখা সম্ভব হয়েছে। এই উজ্জ্বল

১১নং চিত্র

গ্রহকে পর্যবেক্ষণ করবার সময় বিজ্ঞানীরা উড়ন্ত পিরিচ সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্যাদি জানতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানা গেছে।

১২। ক্যালিফোর্নিয়ার ৭১ বছরের বৃদ্ধা মিসেস জেডি বাঙ্কার সম্প্রতি এক বিমান-চালনায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি একটি এফ-১০০এফ সুপার স্যাবার জেট বিমান চালিয়ে দু-বার শব্দের সীমা অতিক্রম করেছেন। মিসেস বাঙ্কার

১২নং চিত্র

যখন এই বিমান চালান, যদিও তখন অন্য আর একজন বিমান-চালক 'কণ্ট্রোলের' ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তথাপি মিসেস বাঙ্কারই তাঁর ৬৫তম জন্ম-দিবসে বিমান-চালনার ব্যক্তিগত নিজস্ব লাইসেন্স পেয়েছিলেন।

বিবিধ

আদিম মানবের গুহা-চিত্রাবলী

পাঁচজন ঐতিহাসিকের একটি দল সম্প্রতি সাগর জেলায় (ভূপাল) একটি পাহাড়ের গুহাগাত্রে খোদাই-করা আদিম মানবের চিত্রাবলী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই চিত্রাবলীর বিভিন্ন সারিতে আছে—মানুষ, জীবজন্তু, শিকারের দৃশ্য ও বাদ্যকর দলের রেখাচিত্র।

ঐতিহাসিকদের এই দলে ছিলেন—রাজ্য অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিভাগের পরিসংখ্যান অফিসার শ্রীবেদানন্দ, পুনার ডেকান কলেজের স্নাতকোত্তর গবেষণা মন্দিরের অন্যতম অধ্যক্ষ ডাঃ এইচ. ডি. সাঙ্কালিয়া, সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রী কে. ডি. বাজপেয়ী এবং সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ পাঠক ও শ্রীসুধাকর পাণ্ডে।

শ্রীবেদানন্দ বলেন যে, এই চিত্রাবলী হইতে সাগর জেলার দক্ষিণাংশে আদিম মানবগোষ্ঠীর সুপ্রাচীন ইতিহাস ও তাহাদের কার্যের নিদর্শনের সন্ধান-সূত্র পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, এই আবিষ্কৃত চিত্রাবলীর বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করা হইবে। কারণ এইগুলি ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার রচনার পক্ষে বহুমূল্য উপাদান।

তৃণভোজী সামুদ্রিক জীব

মণ্ডপম (রামনাদ উপকূল)—গত ডিসেম্বর মাসে এখানে যে প্রাণিতত্ত্ব প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে ভারত মহাসাগরের ডুগং নামক একটি অতিকায় তৃণভোজী সামুদ্রিক জীবও দেখা গিয়াছে।

মানুষের হস্তে বন্দী অবস্থায় আজ পৃথিবীর আর কোথাও ডুগং নাই; কোন কোন অঞ্চলে এই প্রাণীটি মারমেড নামেও পরিচিত।

অতিকায় নরকঙ্কাল

গারো পাহাড়ের হেড কোয়ার্টার্স তুরায় যে স্থানটিতে নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সেখানে এগার ফুট দীর্ঘ একটি নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, এই নরকঙ্কালের এক একটি আঙ্গুল স্বাভাবিক আকৃতির মানুষের বাহুর সমান।

মৃত্তিকার চার ফুট নিম্নে উহা শায়িত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

জলের সাড়ে তিন মাইল নীচে গমন

যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীর ইলেকট্রনিক্স্ গবেষণাগার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ডাঃ এণ্ড্রিয়াস বি. রেখনিৎসার ও অধ্যাপক জ্যাকস পিকার্ড, গুয়ামের (সান্টিয়েগো-ক্যালিফোর্নিয়া) অদূরে তাঁহাদের ত্রিয়েস্তে নামক ব্যাথিস্কাফ-যোগে জলের ১৮৬০০ ফুট (সাড়ে তিন মাইল) নীচে নামিয়া নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। তাঁহারা প্রশান্ত মহাসাগরে মারিয়াগ ট্রেঞ্চ নামক স্থানে পূর্ববর্তী রেকর্ড অপেক্ষা পাঁচ হাজার ফুট অধিক নীচে গিয়াছেন।

ব্যাথিস্কাফ-এর ওজন ৭৫ টন। উহা ১৯৫২ সালে ইতালীতে অধ্যাপক পিকার্ড এবং তাঁহার পিতা সুইজারল্যাণ্ডবাসী অধ্যাপক অগাস্তে পিকার্ড কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে।

কৃত্রিম হীরক উৎপাদন

সেনেকটাডি (নিউইয়র্ক)—এতদিন নিরাপত্তামূলক সরকারী নিষেধাজ্ঞাধীন এখানকার জেনারেল ইলেকট্রিক গবেষণাগারটি সম্প্রতি নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কৃত্রিম হীরক উৎপাদনের কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য নির্মিত ইহাই প্রথম কৃত্রিম

হীরক। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাস হইতে শিল্পে ব্যবহারের জন্য এই হীরক বিক্রীত হইতেছে। এইরূপ দাবী করা হইয়াছে যে, বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহা স্বাভাবিক হীরক হইতে শ্রেষ্ঠ।

পৃথিবীর কঠিনতম খনিজ দ্রব্য প্রাকৃতিক হীরক হইল ভূগর্ভের প্রচণ্ড তাপ ও চাপে দানা-বাঁধা বিশুদ্ধ অঙ্গার। বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে এরূপ কোন যন্ত্র নাই যাহা এককভাবে হীরক উৎপাদনের জন্য এইরূপ তাপ ও চাপ সৃষ্টি করিতে পারে। সেই জন্য প্রথমে একপ্রকার গলিত ধাতব ক্যাটালিষ্ট (যে দ্রব্য আপনাকে পরিবর্তিত না করিয়া অপর বস্তুর মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়) ব্যবহার করা হয়। উহা অঙ্গার ও বর্ধমান হীরক দানার মধ্যে পাত্‌লা আবরণের ন্যায় কাজ করে। ইহার পর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টিকারী যন্ত্র (প্রতি বর্গইঞ্চির উপর ১৮ লক্ষ পাউণ্ড পর্যন্ত) এবং উচ্চ তাপ উৎপাদক যন্ত্র (৪ হাজার ৪০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত) অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে।

মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব

মস্কো বেতারে প্রকাশ, মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে বলিয়া সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা মনে করেন। সেখানকার প্রাকৃতিক অবস্থা জীবনধারণের উপযোগী।

অন্যান্য গ্রহেও প্রাণের অস্তিত্ব আছে

সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের অন্যতম অধ্যাপক গাব্রিল তিখভ বলিয়াছেন যে, অন্যান্য গ্রহেও প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে অনুকূল অবস্থা রহিয়াছে।

৮৪ বৎসর বয়স্ক অধ্যাপক তিখভ কাজাক বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর গ্রহ-উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান। তিনি বলেন যে, অক্সিজেন না থাকিলেও প্রাণের প্রকাশে কোন বাধা নাই। পৃথিবীতে যখন প্রাণের আবির্ভাব হয় তখন অক্সিজেন ছিল না।

সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী 'টাস' অধ্যাপক তিখভকে 'গ্রহ-উদ্ভিদবিদ্যার' প্রবর্তক হিসাবে উল্লেখ করিয়াছে। অধ্যাপক তিখভ বলেন যে, তাঁহার বিভাগ প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে যে, মঙ্গলে দৃষ্ট উদ্ভিদ ও পৃথিবীর বিভিন্ন আবহাওয়ায় উৎপন্ন উদ্ভিদের মধ্যে দৃশ্যতঃ সাদৃশ্য আছে।

শুক্রগ্রহ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর আবহাওয়া যেরূপ ছিল, শুক্রগ্রহের আবহাওয়াও সেরূপ এবং ১৬০ হইতে ১৭৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপের মধ্যেও প্রাণিদেহ বাঁচিতে পারে।

তিনি বলেন, প্রচণ্ড চাপ ও তাপ, তীব্রতম অ্যাসিড, সূর্যালোক ও বাতাস-বর্জিত আবহাওয়ার মধ্যেও জৈবকণিকা বাঁচিতে পারে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, মঙ্গল ও শুক্রগ্রহে এবং সম্ভবতঃ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহেও জৈবকণিকার অস্তিত্ব আছে।

নূতন সূর্যের বন্দনা

হারওয়েল পারমাণবিক গবেষণা সংস্থার ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্যার জন কক্‌ক্রফ্‌ট্‌ এম্পায়ার ক্লাবে (টরোন্টো) এক বক্তৃতায় বলেন, হারওয়েলে বিজ্ঞানীরা এমন একটি নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টায় রহিয়াছেন, যাহার দ্বারা বিচ্ছিন্ন পরমাণুর পুনর্মিলন ঘটাইয়া অনন্তকাল মানুষকে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হইবে।

তিনি বলেন, যন্ত্রাগারে আমরা ক্ষুদ্রাকৃতি কৃত্রিম সূর্য গড়িয়া তুলিতে চাই। যে পদ্ধতিতে সূর্যদেহে পরমাণুর মিলন ঘটিতেছে, কৃত্রিম সূর্যেও তাহাই ঘটিবে এবং পৃথিবীতে যতদিন মানুষ জীবিত থাকিবে, ততদিনই তাহাকে তাপ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

// জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োদশ বর্ষ | ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০ | দ্বিতীয় সংখ্যা

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের উৎপত্তি

শ্রীশচীন্দুলাল দে

বিংশ শতাব্দীর আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানিতে হইলে আমাদের সপ্তদশ শতাব্দীর নিউটনের যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে। নিউটনেরও পূর্বের সময় হইতে গতি (একক সময়ে কোন বস্তু স্পেসে যতদূর যায়) সম্বন্ধে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিতে থাকে। তখনকার বিজ্ঞানীরা সকল প্রকার গতিকেই কোন না কোন বস্তুর আপেক্ষিকতায় স্থানচ্যুতি বলিয়া নির্দেশিত করেন বটে, কিন্তু যে বস্তুর আপেক্ষিকতায় স্থানচ্যুতি ঘটিতেছে, সেই বস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন মত পোষণ করিতেন। নিউটন বলিয়াছিলেন যে, কোন বস্তুর এক নিরপেক্ষ স্থান হইতে অপর নিরপেক্ষ স্থানে সরল পথে যাওয়ার নামই উক্ত বস্তুর নিরপেক্ষ গতি। নিরপেক্ষ স্থান বলিতে কি বুঝায়, তাহা কিন্তু নিউটন পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। একথা তিনি বলিয়াছিলেন যে, কোন বস্তুর সরল গতি অপর কোন পার্থিব বস্তুর আপেক্ষিকতায় গতি ছাড়া আর কিছুই নহে।

গতি সম্বন্ধে বলিতে গেলে সময়ের প্রবাহ কথাটি আপনা-আপনিই আসে। নিউটনের মতবাদ অনুসারে সময় নিরপেক্ষ এবং সেহেতু একটি মাত্র সময়-ক্রমই সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হইবে; অর্থাৎ আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে বলা যায় যে, বাহ্যিক কোন কিছুর দ্বারাই সময় প্রভাবান্বিত হয় না।

'নিরপেক্ষ গতি' কথাটি বিজ্ঞানীদের নিকট এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন বস্তুর নিরপেক্ষ গতি সেই বস্তুর এক নিরপেক্ষ স্থান হইতে অপর নিরপেক্ষ স্থানে গমন ছাড়া আর কিছুই নহে। কাজেই কোন বস্তুর নিরপেক্ষ গতি জানিতে হইলে আমাদের নিরপেক্ষ স্থানের সন্ধান করিতে হইবে, অর্থাৎ আমরা যদি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন বস্তু খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি যাহা নিরপেক্ষ স্থির অবস্থায় (absolute rest) আছে, তাহা হইলে উক্ত বস্তুর আপেক্ষিকতায় অন্য সকল বস্তুরই গতি হইবে নিরপেক্ষ।

১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে হয়গেনস্ আলোর তরঙ্গবাদ প্রচার করেন। যেহেতু আলো তরঙ্গবিশেষ, সেহেতু তরঙ্গাকারে আলোর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে একটি মাধ্যমের প্রয়োজন

অপরিহার্য। কারণ, কোন মাধ্যম ব্যতীত তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে পারে না। এই মাধ্যমটি কি হইতে পারে? গণনা করিয়া দেখান যায় যে, এই মাধ্যমটি এমন এক পদার্থ, যাহার স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশী কিন্তু ঘনত্ব খুবই কম। অবশ্য এরূপ কোন পদার্থের অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত আমাদের জানা নাই। হয়গেনস্ এই মাধ্যমটির নাম দেন ইথার (এই ইথারের সহিত কিন্তু রাসায়নিক ইথারের কোন সম্বন্ধ নাই) এবং এই ইথার সর্বত্র বিগুমান—এমন কি, সকল পদার্থের ভিতরেও বিগুমান।

এই ইথার বস্তুটি বিজ্ঞানীদের মনে এক নূতন আশার সঞ্চার করিল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, যেহেতু ইথার সর্বত্র বিগুমান সেহেতু ইহা স্থির না গতিশীল, তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। এই ইথার যদি গতিহীন হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, এই ইথারই ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র পদার্থ, যাহা নিরপেক্ষ স্থির অবস্থায় আছে এবং এই ইথারের আপেক্ষিকতায় অন্যান্য সকল গতিশীল বস্তুর গতি আপেক্ষিক। আমরা জানি, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে নিজের কক্ষপথে ৩×১০⁶ সেন্টি-মিটার গতিতে ঘুরিতেছে। এখন উক্ত ইথার যদি পৃথিবীর গতি সত্ত্বেও স্থির থাকে, অর্থাৎ আমরা যদি ভাবি—পৃথিবী এই স্থির ইথারের মধ্য দিয়া ৩×১০⁶ সেন্টিমিটার গতিতে ঘুরিতেছে, তাহা হইলে আলোক সঙ্কেতের দ্বারা আমরা ইথারের আপেক্ষিকতায় পৃথিবীর নিরপেক্ষ গতি বাহির করিতে পারি এবং পৃথিবীতে অবস্থিত কোন দর্শক আলোর গতির মানের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারে। কিন্তু যদি ধরিয়া লই যে, পৃথিবী ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে ইথারকে সম্পূর্ণরূপে ইহার সহিত টানিয়া লইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ ইথারের আপেক্ষিকতায় পৃথিবীর গতি শূন্য, তাহা হইলে পৃথিবীতে অবস্থিত উক্ত দর্শকও আলোর গতির মানের পরিবর্তন লক্ষ্য করিবে না। কারণ পৃথিবীর গতি ও ইথারের গতি সমান। এই ক্ষেত্রে ইথারের আপেক্ষিকতায় পৃথিবীর নিরপেক্ষ গতি বাহির করা সম্ভব নহে। ইথার স্থির হইয়া আছে, না ইথার পৃথিবীর সহিত সমান গতিতে ঘুরিতেছে, সেই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানী উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন।

অনেক বিজ্ঞানী বলিলেন যে, ইথার পৃথিবীর সহিত সমান গতিতে (অর্থাৎ ইথার যে বস্তুর সংস্পর্শে থাকিবে সেই বস্তুর সহিত সমান গতিতে) ঘুরিতেছে। আমরা যদি ইহাই সত্য বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে আমরা ডপ্‌লার এফেক্ট বা 'অ্যাবারেসন্ অফ লাইট'-এর কারণ নির্ণয় করিতে পারি না। ফ্রেনেল ও ফিজো নামে দুইজন বিজ্ঞানী বলিলেন যে, কোন গতিশীল বস্তু ইথারকে আংশিকভাবে ইহার সহিত টানিয়া লইয়া যায়। লোরেঞ্জ কিন্তু বলিলেন যে, ইথার সবসময়েই স্থির হইয়া আছে এবং গতিশীল বস্তুনিচয় এই স্থির ইথারের মধ্য দিয়া যাইতেছে। তিনি আরও দেখাইলেন যে, ফ্রেনেল ও ফিজোর তত্ত্ব ভ্রমাত্মক। ইথার যদি স্থির হইয়াই থাকে তাহা হইলে ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আলোকের পরীক্ষা দ্বারা আমরা ইথারের আপেক্ষিকতায় উক্ত বস্তুর নিরপেক্ষ গতি বাহির করিতে সক্ষম হইব। উপরিউক্ত তথ্যের সত্যাসত্য প্রমাণ করিবার জন্য মাইকেলসন ও মর্লি অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষায় ব্যাপৃত হইলেন।

আমরা জানি যে, পৃথিবী ৩×১০⁶ সেন্টিমিটার গতিতে সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে এবং আমরা পূর্বেই ইথার নামক সর্বব্যাপী বস্তুটির কথা বলিয়াছি। এখন কথা হইতেছে যে, লোরেঞ্জের তত্ত্ব অনুসারে আমরা যদি ধরিয়া লই যে, ইথার স্থির এবং পৃথিবী এই স্থির ইথারের মধ্য দিয়া ৩×১০⁶ সেন্টিমিটার গতিতে ঘুরিতেছে, তাহা হইলে কোন সূক্ষ্ম আলোকের পরীক্ষার দ্বারা আমরা ইথারের আপেক্ষিকতায় পৃথিবীর নিরপেক্ষ গতি নির্ণয় করিতে সক্ষম হইব।

আমরা পৃথিবীর গতির দিকে একটি আলোক-রশ্মি পৃথিবী-পৃষ্ঠে অবস্থিত কোন দর্শকের নিকট

পাঠাইয়া সেই আলোর গতির মান নির্ণয় করিলাম এবং আলোর গতিপথ বিপরীতদিকে করিয়া (অর্থাৎ পৃথিবী যে দিকে ঘুরিতেছে তাহার ঠিক উল্টা দিকে) ঐ আলোক-রশ্মি উক্ত দর্শকের নিকট পাঠাইয়া অনুরূপ ব্যবস্থায় আলোর গতির মান নির্ণয় করিলাম। প্রথম ক্ষেত্রে দর্শকের নিকট পৌছাইতে আলোর বেশী সময় লাগিবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কম সময় লাগিবে। মাইকেলসন ও মর্লি সূক্ষ্ম পরীক্ষা দ্বারা এই দুই সময়ের পার্থক্য নির্ণয় করিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা গাণিতিক গণনায় যতখানি সময়ের পার্থক্য আশা করিয়াছিলেন, পরীক্ষালব্ধ ফল হইতে তাহার অনেক পার্থক্য দেখা গেল। পরীক্ষাটি তাঁহারা এরূপ সূক্ষ্মভাবে করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পরীক্ষালব্ধ ফল হইতে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—পৃথিবীতে বসিয়া ইথারের আপেক্ষিকতায় পৃথিবীর নিরপেক্ষ গতি নির্ণয় করা অসম্ভব এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, ইথার স্থির হইয়া নাই, অর্থাৎ ইথার পৃথিবীর সহিত আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ঘুরিতেছে। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, উপরিউক্ত কোন অনুমানই পরীক্ষালব্ধ কোন না কোন ফলকে ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম। তাহা হইলে প্রশ্ন দাঁড়ায় এইরূপ – যদি ইথার স্থির হইয়াও নাই বা ইথারের গতিও নাই তাহা হইলে ইথার কি অবস্থায় আছে? ইথার বলিয়া কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছুই নাই? যেহেতু আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, আলো তরঙ্গ-বিশেষ, সেহেতু ইথার আছে কি নাই, এই প্রশ্নটিও আমাদের কাছে অবান্তর। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষালব্ধ ফলকে আমরা ব্যাখ্যা করিতে পারি যদি আমরা ধরিয়া লই যে, পৃথিবীর গতির দিকে তাঁহাদের যন্ত্রের দৈর্ঘ্য ইথারের আপেক্ষিকতায় পৃথিবীর গতির দরুণ ছোট হইয়া গিয়াছে। 'গতির দরুণ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন' কথাটি বিজ্ঞানীদের নিকট এক অবাস্তব অনুমান বলিয়া বোধ হইল। যাহা হউক, নিরপেক্ষ গতির প্রথমটির সমাধান করা গেল না।

পূর্বেই আমরা গতির দরুণ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের কথা বলিয়াছি। লোরেঞ্জ গাণিতিক উপায়ে গতির দরুণ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন। তিনি কতকগুলি সমীকরণ উদ্ভাবন করেন, যেগুলি উক্ত পরিবর্তন সহজেই ব্যাখ্যা করে। এই সমীকরণগুলি 'Lorentz Transformation' বা লোরেঞ্জ বিবর্তন নামে খ্যাত। তিনি বলিলেন যে, যে বস্তু ইথারে স্থির অবস্থায় আছে এবং যে বস্তু ইথারের আপেক্ষিকতায় গতিশীল, সেই দুই বস্তুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম বস্তুর ভিতর দিয়া কোন ইথার বায়ু প্রবাহিত হইতেছে না, কিন্তু দ্বিতীয় বস্তুর ভিতর দিয়া ইথার বায়ু প্রবাহিত হইতেছে এবং এই প্রবাহের গতি ইথারের আপেক্ষতায় উক্ত বস্তুর গতির সহিত সমান। তিনি বলিলেন যে, প্রথম বস্তুর সময় t ও দ্বিতীয় বস্তুর সময় t' ইথার বায়ুর জন্য কখনও সমান হইতে পারে না। প্রথম বস্তুর কোন ঘটনা যদি আমরা x, y, z co-ordinates দ্বারা এবং সময় t দ্বারা চিহ্নিত করি এবং আমরা যদি ধরিয়া লই যে, দ্বিতীয় বস্তু x-এর দিকে u গতিতে যাইতেছে তাহা হইলে উক্ত একই ঘটনা দ্বিতীয় বস্তুতে x', y' z' ও t' দ্বারা চিহ্নিত হইবে। যদি আমরা মানিতে রাজি থাকি যে, একই নিয়ম সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য, তাহা হইলে লোরেঞ্জের মতানুসারে x, y, z, t এবং x', y', z' ও t'-এর মধ্যে সম্বন্ধ হইবে নিম্নরূপ:

$$x^1 = \frac{x - u t}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}; \quad y' = y; \; z' = z \text{ এবং}$$

$$t^1 = \frac{t - u x/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

এখানে c হইতেছে ইথারে আলোর গতির মান এবং c-এর মান উভয় ক্ষেত্রেই সমান। লোরেঞ্জ

বলিলেন যে, গতির দরুণ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন বোধ হয় পদার্থের একটি সাধারণ ধর্ম।

যদিও লোরেঞ্জ, মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষালব্ধ ফলের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইলেন, তথাপি বিজ্ঞানীরা লোরেঞ্জের মতবাদ মানিয়া লইতে রাজী হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন—একটি মাত্র পরীক্ষালব্ধ ফলের ব্যাখ্যা করিতে পারে, এইরূপ কোন নীতি, নীতি হইতেই পারে না।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই মনে হয় যে, বোধ হয় গোড়াতেই কোন গুরুতর গলদ রহিয়া গিয়াছে, যাহার দরুণ আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছি না। এই 'গোড়ায় গলদ' কথাটি আইনষ্টাইনের মনে প্রথম উদিত হয়। এই গোড়ায় গলদ দূর করিবার জন্য তিনি ইথারের প্রশ্নটি সম্পূর্ণরূপে চাপা দিয়া দিলেন।

১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন এক নূতন মতবাদ প্রচার করেন, যাহা "আপেক্ষিকতা তত্ত্ব" নামে বিশ্ববিখ্যাত। এই মতবাদ অনুসারে 'ইথারের আপেক্ষিকতায় কোন বস্তুর গতি' কথাটি অর্থহীন। এক বস্তুর আপেক্ষিকতায় অন্য এক বস্তুর গতির কথাটিরই কেবল প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আইনষ্টাইন এইভাবে আমাদের বহু পরিচিত নিরপেক্ষ গতি কথাটিকে বাতিল করিয়া দিলেন এবং তাঁহার নূতন মতবাদ অনুসারে সমস্ত পরীক্ষালব্ধ ফলের ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্পেস ও সময়ের নূতন ধারণা দিলেন।

লোরেঞ্জের মতে, যে বস্তুটি ইথারে স্থির হইয়া আছে, তাহার সময়ই প্রকৃতির নিজস্ব সময় এবং ইথারের আপেক্ষিকতায় গতিশীল এক রকেটের সময় হইতেছে উহার স্থানীয় সময়। আমাদের এই পৃথিবীকে যদি একটি গতিশীল রকেট ভাবি (এইরূপ ভাবিবার যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে) তাহা হইলে আমাদের সময় এই পৃথিবীর স্থানীয় সময় না হইয়া পারে না। আমরা বলি যে, সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে প্রায় আট মিনিট সময় লাগে। এই সময় কিন্তু পৃথিবীর স্থানীয় সময়। ইহা হইতে স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে যে, আমাদের এই স্থানীয় সময়কে আমরা কখনও প্রকৃতির 'প্রকৃত সময়' বলিতে পারি না বা আমাদের বলিবার অধিকারও নাই।

আইনষ্টাইন বলিলেন, আমাদের সময়কে অপর কোন সময় অপেক্ষা নিকৃষ্ট ভাবিবার কারণ কি থাকিতে পারে? যদি একই প্রাকৃতিক নিয়ম সর্বস্থানে ও সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হয় তাহা হইলে বিভিন্ন গতিসম্পন্ন রকেটগুলির (অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি) স্থানীয় সময় অবশ্যই বিভিন্ন হইবে; কিন্তু এই সময় হইতে শ্রেষ্ঠতর কোন প্রকৃত সময় থাকিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। যদি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন বস্তু থাকে যাহা নিরপেক্ষ স্থির অবস্থায় আছে, তাহা হইলে উক্ত বস্তুর সময়ই 'প্রকৃত সময়'; কিন্তু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন্ বস্তু নিরপেক্ষ স্থির অবস্থায় আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব এবং 'প্রকৃত সময়' এই কথাটিও অর্থহীন।

উপরিউক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই আইনষ্টাইন বলিলেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃত সময় বলিয়া কিছুই নাই, সকল সময়ই 'স্থানীয় সময়'। অনুরূপ ভাবে নিরপেক্ষ স্পেস বলিয়াও কিছুই নাই, অর্থাৎ স্পেস ও সময় উভয়ই আপেক্ষিক। আমরা বলিতে পারি প্রকৃতিই এমন যে, নিরপেক্ষ গতি কোন উপায়েই বাহির করা সম্ভব নহে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, পৃথিবীর গতির দরুণ আলোকের গতির মানের পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ আলোকের গতির মান একটি ধ্রুবক। আইনষ্টাইনের মতানুসারে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই কথাগুলি আপেক্ষিক এবং নিরপেক্ষ; সময়, স্পেস ও গতির ধারণা অর্থহীন।

সাহারা

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

ভ্রমণকারীর বিভীষিকাময় স্বপ্নের দেশ, আরব বেদুইনের লীলাভূমি, দুস্তর, দুর্গম, দুর্জ্ঞেয় সাহারা! প্রকৃতি বহু স্থানে মানুষকে বিনা বাধায় তার মর্ম-স্থলের বাতায়ন খুলে দিয়েছে। আবার কোথাও বা চিরদুর্গমতার অন্তরালে মহাবিস্ময় স্তব্ধীভূত করে রেখেছে, যার অন্দরের একটা গবাক্ষের সন্ধান করতে শত শত দুঃসাহসিককে জীবনদান করতে হয়েছে। মানুষ কিন্তু চির-দুর্বার। প্রকৃতির বাধা যেখানে যতই ভীষণতর হয়েছে, মানুষের বুকের রক্ত ততই উদ্দাম হয়ে উঠেছে; পৃথিবীর বুকে অজেয় সে কিছুই রাখবে না। তাই রুদ্র-পিঙ্গল মরু সাহারার মরীচিকার মায়ায় কত ভ্রমণকারীর শেষ নিঃশ্বাস উত্তপ্ত মরুবায়ুর সঙ্গে মিশে গেছে! সাহারাকে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কোনদিকেই আড়াআড়ি পার হওয়ার কল্পনা করতে অতিবড় দুর্দান্ত মরুদস্যু আরব-তুয়ারেগেরও বুক কেঁপে উঠে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীর কাছে প্রকৃতি তার এই রহস্যের দরজা রুদ্ধ রাখতে পারবে না; ইতিমধ্যেই তার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেছে। এই প্রবন্ধে সাহারার প্রাকৃতিক অবস্থা, অধিবাসীদের জীবনধারা এবং খনিজ সম্ভাবনার কথা আলোচনা করবো।

পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি সাহারা। আয়তন ১৬ লক্ষ বর্গমাইল, ভারতের আয়তনের চেয়েও কিছুটা বড়, উত্তর আফ্রিকার প্রায় সারাটা বুক জুড়ে আছে। একে ঘিরে রয়েছে উত্তরে অ্যাটলাস পর্বত-মালা, দক্ষিণে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি রাজ্য, বৃটিশ পশ্চিম আফ্রিকা ও ফরাসী বিষুবরৈখিক সুদান। এর পূর্বদিকে আটলান্টিক মহাসাগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর—মাঝে কেবলমাত্র মিশরের নীল নদের উপত্যকার এক টুক্‌রা অংশ তার স্নেহাঞ্চলের ছায়ায় সাহারার উষ্ণ নিঃশ্বাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। নীল নদের পূর্বদিকে নিউবীয় মরুভূমি এবং পশ্চিমদিকের লিবীয় মরুভূমিও সাহারারই অংশবিশেষ। সাহারার উত্তরে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং দক্ষিণে তৃণময় সাভানা অঞ্চলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। এর উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত বিশাল তিবেস্তি শৈলশ্রেণী চলে গেছে। এটা আসলে একটা উচ্চ মালভূমি।

সাহারা রাজনৈতিক রাষ্ট্র নয়, একটা প্রাকৃতিক অঞ্চল। রাজনৈতিক বিভাগ করলে দেখা যায়, এর মধ্যে পড়েছে স্পেনের অধিকৃত মরক্কো ও রাইও-ডি-ওরো, ফরাসী শাসিত আলজিরিয়া মোরাটোনিয়া, ফরাসী সুদান, টিউ-নিসিয়া, নাইজার উপনিবেশ ও চাড হ্রদ অঞ্চল, বৃটিশ অধিকারভুক্ত ইঙ্গ-মিশরীয় সুদান, স্বাধীন লিবিয়া এবং স্বাধীন মিশরের নীল উপত্যকা ব্যতীত পূর্ব ও পশ্চিমাংশ।

ভূতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা, সাহারা এককালে সমুদ্রের তলায় ছিল এবং তার মধ্যে সম্ভবতঃ কয়েকটা আগ্নেয়গিরিও ছিল। প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে সমুদ্রের তলদেশের ভূ-বিক্ষোভের ফলে এখানে স্থলভাগ জেগে ওঠে; কিন্তু তখনই যে এটা একেবারে মরুভূমি হয়ে জেগে উঠেছিল তা মনে করবার কারণ নেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এখানে যে শস্যশালী জনপদ ছিল তা মনে করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সাহারার বুকে এমন অনেক জন্তুর জীবাশ্ম বা ফসিল পাওয়া গেছে, যারা তৃণ, অরণ্য ও জলাভূমিতে বাস করতে অভ্যস্ত। ১৯৫৬ সালে অঁরি লোৎ নামে এক ফরাসী পুরাতত্ত্ববিদ্ তাশিলি অঞ্চলের পর্বতগাত্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্র-

কলা আবিষ্কার করেছেন তার মধ্যে আছে হস্তী, জলহস্তী, জিরাফ ও অষ্ট্রিচ পাখীর ছবি। এথেকে মনে হয়, ঐ সব জন্তু এককালে এই অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যায় বিচরণ করতো। তখন নিশ্চয় এর মধ্য দিয়ে কয়েকটা নদী প্রবাহিত ছিল এবং খাল, বিল, জলাশয় ও সুউচ্চ বৃক্ষপূর্ণ বনভূমিও ছিল। খৃষ্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে এখানে অর্ধসভ্য কোন জাতি গবাদি জন্তুর সাহায্যে কৃষিকার্যের দ্বারা জীবনধারণ করতো। ঘোড়ার আমদানী হয় আরও দু হাজার বছর পরে সম্ভবতঃ আরব থেকে। উটের ব্যবহার হয় আরও অনেক পরে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে। সাহারার বুকে যে এককালে খাল, নদী, নালা ছিল তা বোঝা যায়—এর মধ্যে এখনও মাঝে মাঝে যে ছোট ছোট নালা, ডোবা ও প্রস্রবণ আছে তা থেকে। এদের বলা হয় ওয়াদি। এদের মধ্যে সামান্য পরিমাণ জল সঞ্চিত থাকে এবং বছরে ক্বচিৎ কখনো যে এক-আধ পশলা বৃষ্টি হয়, সেই জল এগুলির মধ্যে সঞ্চিত হয়। আবার মাঝে মাঝে কতকগুলি বাহ্যতঃ শুষ্ক উপত্যকা দেখা যায়; এগুলিকেও ওয়াদি বলে। এগুলির তলদেশ খনন করলে জল পাওয়া যায়। তাছাড়া মৃত্তিকার বহু নিম্নে যে জলের স্তর আছে, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। আলজিরিয়ার দক্ষিণে ফরাসীরা কতকগুলি আর্টেজিয়ান কূপ খনন করেছে। এথেকে বোঝা যায়, সাহারার সব অংশটাই একবারে মরুভূমি হয়ে যায় নি। এর কোন কোন অঞ্চলে প্রথমে মরুভূমি দেখা দেয়, তারপর মরুর দুরন্ত ক্ষুধা একে একে সব গ্রাস করেছে। আজও এর অবসান হয় নি।

সাহারা অঞ্চল মরুভূমি হলো কেন? বিজ্ঞানীরা এর নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন—পৃথিবীর উপরিভাগকে কয়েকটি চাপ বলয়ে ভাগ করা হয়েছে। ক্রান্তীয় অঞ্চলে যে চাপ বলয় বিদ্যমান, তার নাম দেওয়া হয়েছে উচ্চচাপের শান্ত বলয়। নিরক্ষ প্রদেশে বায়ু উষ্ণ হয়ে উপরে উঠে যায় এবং অতি উচ্চস্তর দিয়ে কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তির দিকে প্রবাহিত হয়। ক্রান্তি-অঞ্চলে এসে এই বায়ু শীতল ও ভারী হয়ে নীচে নেমে আসে। আবার মেরু অঞ্চল থেকে একটা বায়ু-প্রবাহ এদিকে এসে পড়ে। তাই ক্রান্তি-অঞ্চল দুটিতে (২৫°-৩৫° অক্ষাংশের মধ্যে) বায়ুর চাপ অত্যন্ত বেশী। এখানে বায়ু ক্রমাগত উপর থেকে নীচের দিকে নামে। ভূপৃষ্ঠের উপর বায়ুর প্রবাহ নেই বললেই চলে। কাজেই এই অঞ্চলে কোন বায়ু-প্রবাহ কোন স্থান থেকে জলীয় বাষ্প বয়ে আনতে পারে না। এখন দেখা যাক, সাহারা অঞ্চলের অবস্থা কি? সাহারা পড়েছে কর্কটীয় উচ্চচাপের শান্ত বলয়ের মধ্যে; কর্কটক্রান্তি সাহারার ঠিক মাঝ দিয়ে চলে গেছে। উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু এই অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যায় বটে, কিন্তু এই বায়ু-প্রবাহ এশিয়ার বিশাল ভূভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে এবং এর গতিপথে কোন বৃহৎ জলাশয় নেই বলে এই বায়ু একেবারে শুষ্ক। আবার এই বায়ু যত উষ্ণতর বিষুব অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় ততই অধিকতর শুষ্ক হতে থাকে। শেষে চীনের গোবি মরুভূমি ও আরবের মরুভূমি পার হওয়ার পর এর রসদ শূন্যের কোঠায় পৌছে। অন্য দিকে ভারত মহাসাগর ও গিনি উপসাগর থেকে গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ু-প্রবাহ সাহারার দিকে আসতে চেষ্টা করে। তখন দু দিকের উপকূলে উচ্চ পর্বত ও মালভূমিতে বাধা পায়। তাতে এই বায়ুর জলকণা উপকূল ও তৎসন্নিহিত স্থানে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। এই সব পর্বত পার হয়ে যে বায়ু সাহারার মধ্যে প্রবেশ করে তা একেবারে শুষ্ক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতি সব দিক থেকে তার বৃষ্টিবিন্দুর দ্বার রুদ্ধ করে সাহারাকে একেবারে নিঃস্ব করে রেখেছে।

সাহারার কোথাও যে একেবারে বৃষ্টি হয় না, ঠিক এ-কথা বলা যায় না; কারণ কোন কোন স্থানে বছরে, কোথাও বা কয়েক বছরে এক-আধ পশলা বৃষ্টি হয়, আবার কোথাও বা বছরের

পর বছর ধরে এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ে না। এখানে দিনে প্রচণ্ড উত্তাপ, রাতে তীব্র শীত। দিন-রাত্রির মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্য অত্যধিক। কোথাও দ্বিপ্রহরে তাপ ১৩০° ফা. পর্যন্ত ওঠে, আবার রাতে পারদস্তম্ভ হিমাঙ্কের নীচে নেমে যায়। নীল নদের অববাহিকায় অবস্থিত মিশরের কায়রো শহরের গড় তাপ জানুয়ারী মাসে ৫৫° ফাঃ এবং জুলাই-অগাষ্ট মাসে ৮২° ফাঃ। মে থেকে অগাষ্ট পর্যন্ত বারিপাত একেবারে হয় না। সারা বছরের মোট বৃষ্টিপাত ১·৩'' মাত্র। আসওয়ান শহরের জানুয়ারীর গড় তাপ ৬০° ফাঃ, জুলাইতে ৯৩° ফাঃ। এখানে সারা বছরের বৃষ্টি-পাতের অঙ্ক শূন্য ছাড়ায় না। এ দুটি শহর প্রকৃত মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত নয়, কিন্তু এদের উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ থেকে প্রকৃত মরুভূমির অভ্যন্তরের অবস্থা অনুমান করা যেতে পারে। সেখানের আবহাওয়ার অবস্থা একেবারে চরম।

সাহারার অধিকাংশ ভূভাগ বালুকাপূর্ণ ধূসর-ভূমি, কিয়দংশ পর্বতসঙ্কুল এবং কিয়দংশ প্রস্তর-ময়। প্রস্তরময় অঞ্চলকে বলে হামাদা এবং বালুকাময় অঞ্চলকে বলে এয়ার্গ। এখানের বালুকা-রাশি ঠিক সমতল হয়ে পড়ে নেই; মরু-বায়ুর তাড়নায় সারি সারি বালিয়াড়ি জেগে ওঠে। বালিয়াড়িগুলি বায়ু-প্রবাহের উপর নির্ভরশীল বলে নিয়তই স্থান পরিবর্তন করে। এরূপ বালির পাহাড় ৫০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। দুটি বালিয়াড়ির মাঝে বিশাল গভীর উপত্যকার সৃষ্টি হয়। এই বিপুল বালুকারাশি হাজার হাজার বছর ধরে পাথর ও পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণিত হয়ে তৈরী হয়েছে। উষ্ণতার চরম পার্থক্যের ফলে এবং উষ্ণ মরু-বায়ুর সংঘর্ষে পাথর নিয়ত চূর্ণিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে প্রায় সর্বদাই একটা প্রবাহ চলে, যার ফলে বায়ুতে বালুকাকণা ভেসে বেড়ায় এবং স্থানান্তরিত হয়। এখানে কয়েক প্রকার স্থানীয় বায়ু-প্রবাহ দেখা যায়। সাহারার উত্তর ভাগে সিরক্কো বায়ু ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির উপর দিয়ে বয়ে যায়। দক্ষিণদিকে হার্মাটান বায়ু সুদান ও গিনি উপকূলের দিকে প্রবাহিত হয়। মিশরের উপর খামসিন নামে একপ্রকার বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। মরুভূমির বুকে দিনে প্রায়ই ঘূর্ণীবাত্যার সৃষ্টি হয়। এতে অনেক সময় বালুকারাশি পাক খেয়ে উপরে উঠে যায় এবং বালুকাস্তম্ভের সৃষ্টি করে। এর মধ্যে পড়লে আর রক্ষা থাকে না। আমাদের কাছে মরীচিকা কথাটা প্রবাদ, সাহিত্য ও কাব্য আশ্রয় করে রয়েছে; কিন্তু মরুভূমির পথিকের নিকট এ এক মর্মান্তিক বাস্তব পরিহাস। মরুভূমির বুকে দিনের বেলায় বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে উত্তাপের সঙ্গে ঘনত্বেরও পার্থক্য ঘটে। তখন বারবার প্রতিসরণ ও প্রতিফলনের দরুণ কোন দূরস্থিত মরূদ্যানের প্রতিবিম্ব বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ফুটে ওঠে। এরই নাম মরীচিকা। এর কবলে পড়ে বহু ভ্রমণকারীকে জীবন হারাতে হয়েছে।

সাহারার এরূপ ভয়ানক শুষ্ক আবহাওয়ায় উদ্ভিজ্জ সংস্থান যে অতি শোচনীয় হবে, সেকথা বলাই বাহুল্য। তথাপি সমগ্র সাহারা একেবারে উদ্ভিদহীন নয়। এখানে যে সব গাছ জন্মায় তারা প্রচণ্ড উত্তাপ ও শুষ্কতার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। মাটির নীচের জল মাঝে মাঝে উপরে উঠে এসে নালা, ডোবা বা প্রস্রবণের সৃষ্টি করেছে, আর তার চারদিকে কিছুটা জায়গা জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে মরূদ্যান। এই সব মরূদ্যানে প্রধানতঃ পামজাতীয় গাছ, বিশেষ করে খেজুর গাছ প্রচুর জন্মায়। মরূদ্যানকে আশ্রয় করে যে সব অধি-বাসীরা বাস করে তারা জলসেচ করে শস্য ও ফল উৎপাদন করে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে যব, গম, ভুট্টা, কমলালেবু, লেবু, ডুমুর, বেদানা, তরমুজ ও জলপাই প্রধান। তবে এসব স্থানের প্রধান ফসল খেজুর। খেজুরই মরুবাসীর প্রধান খাদ্য। তাছাড়া মরু অঞ্চলে কণ্টকবহুল কয়েক প্রকার গুল্মজাতীয় গাছ জন্মায়। শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার

জন্যে এরা এই রকমের উপায় অবলম্বন করে। প্রায়ই এদের পাতা থাকে না, কখনও বা খুব ছোট ছোট পাতা হয়। পাতার পরিবর্তে কাণ্ড থেকে কাঁটা বেরোয়। এর ফলে প্রস্বেদন-ক্রিয়া এক রকম বন্ধ হয়েই যায়। পাতার খাদ্য-গ্রহণ পর্ব কাণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়; তাই কাণ্ড হয় চ্যাপ্টা, সবুজ ও শাঁসালো। এর ভিতর অভাবের সময়ের জন্যে জল ও খাদ্য সঞ্চিত থাকে। তাছাড়া প্রস্বেদন বন্ধ করবার জন্যে কাণ্ড থেকে মোম জাতীয় আঠালো একরকম পদার্থ বের হয়ে পাতা ও কাণ্ডকে আবৃত করে রাখে। এই সব উদ্ভিদের শিকড়গুলি খুব বেশী লম্বা হয়, যাতে বহু নীচে জল পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে। আবার সংগৃহীত সামান্য জল সঞ্চিত করে রাখবার জন্যে শিকড়গুলি মোটা শাঁস-যুক্ত হয়ে থাকে। মরুভূমির সব উদ্ভিদই খর্বকায়, কিন্তু এরা অত্যন্ত শক্ত ও পত্রহীন বলে মরু-ঝড়ের হাত থেকে সহজেই আত্মরক্ষা করতে পারে।

মরুভূমির জীবজন্তুর মধ্যে উটই প্রধান। এদের পায়ের পাতা খুব চওড়া ও নরম গদীযুক্ত; কাজেই বালির মধ্যে পা ডুবে যায় না। উটের পেটের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ রকমের থলি আছে; তাতে একবার জলপান করে অনেকটা জল সঞ্চয় করে নেয়। উটের পিঠের কুঁজটির মধ্যে যথেষ্ট চর্বি জমা থাকে। অভাবের সময় এই সঞ্চিত জল ও চর্বি পানীয় ও খাদ্যরূপে দেহসাৎ করে। এই জন্যে উট অনেক দিন জলপান ও খাদ্য গ্রহণ না করেও বেঁচে থাকতে পারে। মরূদ্যানগুলিতে উট ছাড়া গরু, ঘোড়া ও মেষ প্রতিপালিত হয়। এ-ছাড়া বন্য খরগোশ, হরিণ, হায়না, শিয়াল, দু-এক রকমের পাখী ও বিষধর সাপ বাস করে। এসব সাপকে স্যাণ্ড ভাইপার বলা হয়। এরা বালির মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে এবং হঠাৎ বালি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। এয়োদি ও আজ্জর অঞ্চলের জলা-ভূমিতে কিছু কিছু মাছ ও কুমীর দেখা যায়। অষ্ট্রিচ বা উট পাখী খাস মরুভূমির বাসিন্দা নয়—এরা থাকে মরু-সংলগ্ন তৃণভূমি অঞ্চলে। মরুভূমির অধিকাংশ পশুর গায়ের রং ধূসর বা পাটকিলে। এদের গায়ের রং বালির রঙের সঙ্গে মিশে যায় বলে আত্মরক্ষার সুবিধা হয়।

এমন বিশাল সাহারা, অথচ তার লোকসংখ্যা মাত্র বিশ লক্ষ। সাহারার অধিবাসীরা বর্ণসংকর; তবে এদের মধ্যে আরব ও বার্বার রক্তেরই প্রাধান্য রয়েছে। দক্ষিণের মরূদ্যান অঞ্চলগুলিতে অল্প সংখ্যক নিগ্রো বাস করে এবং মরুর বুকে অতি অল্পসংখ্যক তুয়েরাগ ও টিবাস বাস করে। তুয়েরাগরা (আমাদের দেশে এরা তুরাগ নামে অভিহিত) একরকম উপকথার মানুষ হয়ে আছে। নৃশংসতা ও ভীষণতার উপমা দিতে আমরা তুরাগ-দস্যুর উদাহরণ দিই। এরা থাকে মরুভূমির অতি দুর্গম অংশে। এরা যাযাবর এবং দুর্দান্ত দস্যু। হিংস্রতায় এদের জুড়ি নাকি পৃথিবীতে নেই। অতি দুর্ধর্ষ আরব-বেদুইনেরাও এদের নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করে শিউরে উঠে এবং পারতপক্ষে এদের সম্মুখে না পড়তে চেষ্টা করে। কিন্তু দু-এক জন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী বহু পরিশ্রমে এদের ঘাঁটিতে গিয়ে এদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের মতে, এরা আসলে ভয়ানক ভীরু ও লাজুক। এদের পুরুষেরা বাইরে সর্বদাই একটা পর্দার মত কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে। এই মুখোসের অন্তরাল থেকে এরা ভীষণ নিষ্ঠুরতার কাজ করে; কিন্তু একবার এদের এই মুখোস খুলে দিলে এরা স্ত্রীলোকের মত লজ্জায় মুখ নামিয়ে নেয়—তখন এদের শৌর্যবীর্য সব উবে যায়।

মরুভূমির অধিবাসীরা দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণী যাযাবর, এদের বলা হয় বেদুইন। এরা জাতিতে আরব। বংশগত দস্যুতাই এদের প্রধান অবলম্বন। তবে এদের অনেকে পশুপালন করে এবং পশুজাত দ্রব্যাদির বিনিময়ে মরূদ্যানবাসীদের শস্যাদি সংগ্রহ করে। এরা কখনও স্থায়ীভাবে বাস করে না; তাঁবুতে অস্থায়ী বাসগৃহ নির্মাণ করে। জল পাওয়া

যেতে পারে, এমন কোন মরূদ্যান বেছে নিয়ে এরা তার আশেপাশে কিছুদিন বাস করে। তারপর হঠাৎ একদিন তাঁবু গুটিয়ে সপরিবারে উটের পিঠে চড়ে নূতন স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। জলের সন্ধান পেলেই সেখানে নেমে পড়ে এবং কিছুদিন কাটিয়ে দেয়। পথভ্রান্ত ভ্রমণকারী বা ব্যবসায়ীদের লুণ্ঠন করা এদের পেশা। নরহত্যা এদের কাছে পশুহত্যা অপেক্ষা নিষ্ঠুর নয়। এদের তাঁবুগুলি চামড়ায় তৈরী, কখনও বা শুকনো ঘাস বা ঝোপ দিয়ে তৈরী করা হয়। তাঁবুগুলি খুব হাল্কা, যাতে সহজে গুটিয়ে সরে পড়া যায়।

এদের অন্য এক শ্রেণী আবার মরূদ্যানগুলিতে স্থায়ীভাবে বাস করে এবং খেজুরের চাষ ও পশুপালন করে' জীবিকানির্বাহ করে। এরা কোথাও কোথাও বড় বড় পাথরের দেয়াল দেওয়া ঘর তৈরী করে। এদের বাসস্থানগুলি সুদৃঢ় এবং শত্রুর পক্ষে দুর্ভেদ্য। এরা ভেড়া, ছাগল, গাধা, ঘোড়া এবং উট প্রতিপালন করে। তাদের মাংস ও দুধ এদের আহার যোগায়। এরা কূয়া থেকে জলসেচ করে' যব, গম, ভূট্টা, ডুমুর ও জলপাই প্রভৃতি চাষ করে। জল তোলবার জন্যে ঘোড়া বা উটের সাহায্য নেওয়া হয়। তাশিলি ও হোগ্গার অঞ্চল জলপাইয়ের চাষের জন্যে বিখ্যাত। এত বড় সাহারার সমগ্র আবাদী জমি একত্রিত করলে আমাদের পশ্চিম-বঙ্গের একটা ছোট জেলার মত হবে। মরুভূমি অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্পদ বলতে তাদের পালিত জীবজন্তুই বোঝায়। কিন্তু এদের পশুগুলি মাঝে মাঝে অনাহারে মারা পড়ে বা দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। সুতরাং এরা যে মোটেই সম্পদশালী নয়, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। খাদ্যের অভাবে এরা প্রায়ই কষ্ট পায়। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়লে আরবেরা নিকট বা দূরবর্তী অঞ্চলে হানা দেয়, যেখানে খাদ্য পাওয়া যেতে পারে। কয়েক জন মিলে উট ও ঘোড়া নিয়ে মরুভূমির বুকে পাড়ি দেয়। এভাবে এরা দু'শো মাইল পর্যন্ত যেতে পারে। তারপর বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের তাঁবু দেখলে সেখানে নেমে পড়ে এবং রাত্রি পর্যন্ত লুকিয়ে অপেক্ষা করে। গভীর রাত্রে তাঁবুর বাসিন্দারা ঘুমিয়ে পড়লে তাঁবুতে প্রবেশ করে খাদ্য লুট করে সরে পড়ে। লুট করে ফিরে এসে এরা কিছুদিন আলস্যে এবং স্ফূর্তি করে কাটিয়ে দেয়।

মরুবাসীদের পোষাক ঢিলাঢালা ধরণের। উষ্ণ মরু-বায়ু থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এরা প্রায় সর্বশরীর ঢেকে রাখে। মাথায় বড় রুমালের মত একটা কাপড় বেঁধে রাখে; তার প্রান্তভাগ কাঁধের উপর ঝুলে পড়ে। গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢিলা এক-রকমের পোষাক পরে, ভিতরে পরে পাজামা। দিনের বেলায় মরুভূমিতে ভ্রমণ করতে হলে মুখের উপর পাত্‌লা একরকম কাপড়ের পর্দা ঝুলিয়ে দেয়। এর ভিতর দিয়ে বাইরেটা মোটামুটি দেখা যায় এবং চোখ-ধাঁধানো আলো ও গরম বায়ুর ঝলক থেকে চোখ ও মুখ রক্ষা পায়। এরূপ পোষাক কেবল যে দিনের প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে রক্ষা করে তাই নয়, রাত্রের দুরন্ত শীত থেকেও বাঁচায়।

পাশ্চাত্য জাতিদের কাছে এই সব মরুবাসীরা অত্যন্ত ঘৃণ্য জাতি বলে পরিগণিত হয়েছে। তারা এদের চোর, ছ্যাঁচড় প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছে। 'নিম্নশ্রেণীর আরব' কথাটি এদের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয় এবং ইংরেজীতে কথাটি বিশেষ ঘৃণাসূচক। কিন্তু এই দস্যু ও তস্করদের মধ্যেও কয়েকটি উন্নত মানবীয় গুণের সমাবেশ দেখা যায়। এরা ভয় কাকে বলে জানে না এবং ভয়ানক বেপরোয়া স্বভাবের, কোন বাধাকেই গ্রাহ্য করে না। এদিকে আবার খুব বিশ্বাসী এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে প্রাণ দিয়েও প্রতিজ্ঞা পালন করে। এদের অতিথিপরায়ণতা তো প্রবাদ ও সাহিত্যের মধ্যে স্থান পেয়েছে। এদের এক জনের যতক্ষণ খাদ্য থাকে ততক্ষণ তার প্রতিবেশী ভাগ পাবেই। ভয়ানক শত্রুও এদের শিবিরে নির্ভয়ে আতিথ্য লাভ করতে পারে, তবে সে আতিথ্য একরাত্রি

মাত্র স্থায়ী। রাত্রির অবসানে শত্রুতা আবার জেগে ওঠে। আবরদের ধারণা, ভগবান পৃথিবীতে ধন-সম্পদ ও খাদ্য দিয়েছন মানুষের সকলের ব্যবহারের জন্যে। সেটা যার হাতে পড়ুক না কেন, সব তার একার নয়, প্রয়োজন হলে সে অন্যকেও ভাগ দিতে বাধ্য। সাহারার এই যাযাবর জাতিগুলি ক্ষয়িষ্ণু। এদের জন্মের হার কম, মৃত্যুর হার বেশী। কঠোর পরিশ্রম করে এদের বাঁচতে হয়। তাই তুন্দ্রা অঞ্চলের মত এই দেশকেও কষ্টের দেশ বলা হয়।

আগেই বলা হয়েছে, মিশরের নীল নদের উপত্যকা অঞ্চল সাহারার গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। এটা সম্ভব হয়েছে নীল নদের জন্যে। প্রতি বছর নীলের বন্যায় যে পলি জমে তাতে মিশর প্রচুর পরিমাণে যব, গম, ভুট্টা, কার্পাস, ধান ও অন্যান্য শস্য এবং নানাপ্রকার ফল উৎপাদন করে। তাই মিশর মরুভূমির মধ্যে থেকেও বহু প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর একটি সম্পদশালী সুসভ্য দেশে পরিণত হয়েছে। মিশর শুধু 'নীলের দান' নয়, তার স্নেহের দুলাল।

ভূতত্ত্ববিদেরা কিন্তু সাহারার মাটিকে অনুর্বর বলেন না। তাঁদের মতে, সাহারার মাটি যথেষ্ট উর্বর, অভাব শুধু জলের। জল আছে মাটির অনেক নীচে; একে উপরে নিয়ে আসাই সমস্যা। জল পেলে সাহারাকে যে শস্যসম্পদশালী করে তোলা যেতে পারে, তার প্রমাণ দিয়েছে ফরাসীরা আল-জিরিয়ার দক্ষিণে কয়েকটা আর্টেজিয়ান কূপ খনন করে। এর সাহায্যে এই অঞ্চলে চাষ-আবাদের কাজ যথেষ্ট এগিয়ে চলেছে।

ইংরেজেরা পৃথিবীর কোথায় না রাজনৈতিক অধিকার বিস্তৃত করেছিল, কিন্তু সাহারা মরুভূমি বলে কোন দিনই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। ১৮৯০ সালে ফরাসীরা সাহারা দখল করে, এক রকম অবহেলাভরেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এতে বাধা তো দেয়ই নি বরং একটু অবজ্ঞার হাসি হেসেছিল; কারণ তখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকের চোখে সাহারার বুকে শুধু বালি ছাড়া আর কিছুই নেই। ফরাসীরাও বহুকাল সাহারার দিকে মোটেই নজর দেয় নি। ১৯২৭ সালে মঁসিয়ে কনরাদ কিলিয়ন নামে এক ফরাসী ভূতত্ত্ববিদ নিজের খেয়ালে সাহারার বুকে ভ্রমণ করে বেড়াতেন। তখন তিনি নানারূপ পরীক্ষা ও জরিপ করে সাহারার বুকে পেট্রোল ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের সম্ভাবনা দেখে-ছিলেন। কিন্তু ফরাসী সরকার তাঁর কথায় কর্ণপাত করে নি। অবশেষে ব্যর্থকাম এই বৈজ্ঞানিক উন্মাদ অবস্থায় আত্মহত্যা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ফরাসী সরকার সাহারার দিকে নজর দেয় এবং সরকারী ব্যয়ে বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করে। তাদের চেষ্টার ফলে আজ জানতে পারা গেছে, সাহারা খনিজ সম্পদে একেবারে ভরপুর। এর উর্বর বুকের নীচে লুকিয়ে আছে আধুনিক সভ্যতার শোণিতপ্রবাহরূপী মহামূল্য পেট্রোল, আরও আছে কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ও তাম্র প্রভৃতি। তাই তাই আজ কেবল ফরাসী সরকার নয়, অন্যান্য ইউরোপীয় ও আমেরিকান বণিকদের দৃষ্টি সাহারার দিকে ধাবিত হয়েছে। কিন্তু সাহারার অধিকাংশই ফরাসীদের অধিকারে। তাই এর প্রধান লভ্যাংশ তাদেরই প্রাপ্য হবে। সম্প্রতি আলজিরিয়ার দক্ষিণে কয়েক স্থানে পাম্প বসিয়ে পেট্রোল তোলবার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।

সাহারা আজ আর অবহেলিত নেই, এক মহা অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে। অজানার সন্ধানে, দুর্গমতার বিরুদ্ধে অপরাজেয় মানুষ চিরকাল ধরে যে অভিযান চালিয়ে এসেছে, তারই এক বিস্ময়কর সাফল্য আজ সাহারার বুকে সংঘটিত হতে চলেছে। কিন্তু এই সাফল্য এখনও অতি সামান্যই। কে জানে, হয়তো একদিন সাহারার নিষ্প্রাণ ঊষরতা বিজ্ঞানের শাসনে মাথা

নত করে তার অন্তরের গুপ্ত ঐশ্বর্য উদ্ধার করে দেবে। তাতে যে কেবল বণিকেরই লাভের সম্পদ থাকবে তা নয়, মানুষের ক্ষুধার অন্ন জুগিয়ে সাহারা একদিন অন্নপূর্ণার আসনে অধিষ্ঠিত হবে। আর সেদিন বিজ্ঞানের মহিমা তার চন্দ্রলোক যাত্রার গৌরবকেও ছাড়িয়ে যাবে।

ইস্পাত শিল্প

শ্রীসুধাময় বন্দোপাধ্যায়

ইস্পাতশিল্পে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত জিনিষগুলি ব্যবহৃত হয়—

১। দুর্গল বা অগ্নিতাপসহ পদার্থ।

২। জ্বালানী।

৩। পিগ-লৌহ (ঠাণ্ডা এবং গলন্ত)।

৪। ইস্পাতের ছাট।

৫। খনিজ লৌহ-পাথর এবং লৌহ-মরিচা।

৬। চুনাপাথর এবং চুন।

৭। ফ্লোরস্পার।

৮। অ্যালুমিনিয়াম, ফেরোম্যাঙ্গানীজ, ফেরো-সিলিকন, ফেরোফস্, কয়লার গুঁড়া।

৯। জল।

১০। বিশেষ ধরণের ইস্পাত প্রস্তুতের জন্য তামা, নিকেল, ক্রোমিয়াম, মলিবডিনাম, টাংষ্টেন ও গন্ধক।

এই সকল ছাড়া অক্সিজেন, অধিক চাপের বাষ্প এবং বাতাসেরও প্রয়োজন হয়।

এই সকল জিনিষ যাহাতে সুলভে এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার।

দুর্গল বা অগ্নিসহ পদার্থ (Refractory materials)—ইস্পাত প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল উপকরণের প্রয়োজন হয় তন্মধ্যে অগ্নিসহ পদার্থ অন্যতম। শুধু ইস্পাত-শিল্প কেন, যে কোন শিল্পে, যেখানেই অত্যধিক তাপের কাজ হয় সেখানেই ইস্পাত-নির্মিত কাঠামোর ভিতরের দিক দুর্গল পদার্থের দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয়। কাঠামো ছাড়াও দুর্গল পদার্থের দ্বারা ছাদের খিলান প্রস্তুত করা হয়। চুল্লী, বাল্‌তি, কন্‌ভারটার, চিম্‌নী, পাইপ ইত্যাদিতে অগ্নিসহ ইটের ব্যবহার হয়।

দুর্গল পদার্থের কতকগুলি গুণ থাকা দরকার; যেমন—

১। প্রয়োজনীয় তাপ অপেক্ষা বেশী তাপ-সহন ক্ষমতা।

২। রাসায়নিক ক্রিয়া প্রতিরোধক শক্তি।

৩। অত্যধিক তাপ, ঘর্ষণ অথবা চাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা।

৪। তাপের তারতম্যেও নিজস্ব গুণ বা আকৃতি অপরিবর্তিত থাকা।

৫। দাম খুব বেশী না হওয়া।

বিভিন্ন দুর্গল পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া প্রতিরোধ করিবার শক্তি বিভিন্ন রকম। অম্লাত্মক, ক্ষারীয় এবং প্রশমিত (neutral)—এই তিন জাতীয় দুর্গল পদার্থ আছে।

অম্লাত্মক দুর্গল পদার্থ—বালি, ফায়ার-ক্লে, গ্যানিষ্টার নামক একপ্রকার পাথর।

ক্ষারীয়—ম্যাগ্নেসাইট, ডলোমাইট।

প্রশমিত ক্রোমাইট, গ্র্যাফাইট ইত্যাদি।

খাঁটি সিলিকার গলনাঙ্ক হইল ১৮৩০° সে.

খাঁটি ম্যাগ্নেসাইটের গলনাঙ্ক—২৮০০° সে.; কাজেই দেখা যায়, প্রত্যেক দুর্গল পদার্থের গলনাঙ্ক ইস্পাতের গলনাঙ্ক ১৫৫০° সে. অপেক্ষা অনেক বেশী। এই সকল অগ্নিসহ পদার্থের দ্বারা নানা আকারের

ইট প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু চুনের গলনাঙ্ক বেশী হইলেও ইহার দ্বারা ইট প্রস্তুত করা যায় না। কারণ ইহা জল শোষণ করিয়া আকৃতি নষ্ট করিয়া ফেলে। মটরদানার মত আকারে এবং গুঁড়া করিয়াও ইহাদের ব্যবহার করা হয়। ডলোমাইট (কাঁচা), একবার বা দুইবার পোড়াইয়া মটরদানার মত ব্যবহার করা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় খাঁটি দুর্গল পদার্থ খুব কমই পাওয়া যায়। অম্লজাতীয় পদার্থে কিছু ক্ষার এবং ক্ষারজাতীয় পদার্থে কিছু অম্ল থাকেই এবং তাহার প্রয়োজনও হয়। অনেক সময় স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত দুর্গল পদার্থের গলনাঙ্কও অনেক বেশী বলিয়া অন্য পদার্থ মিশাইয়া গলনাঙ্ক কমাইতে হয়। ওপেন-হার্থ চুল্লীতে ১৬৫০° সে.-এর বেশী তাপ উঠানো হয় না, অথচ ওপেন-হার্থের তল এবং পার্শ্বদেশ (অর্থাৎ ইস্পাত যে স্থানের সংস্পর্শে আসে) ম্যাগ্নেসাইট বা ডলোমাইট দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়—যাহাদের গলনাঙ্ক ১৬৫০° সে.-এর অনেক বেশী। কাজেই মটরদানার আকারের ম্যাগ্নেসাইটের সহিত ইস্পাতের ক্ষারীয় গাদের গুঁড়া অথবা লৌহমরিচা কিছু পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। ১৬৫০° সে.-এ গাদ মিশ্রিত মটরদানার মত আকৃতিবিশিষ্ট ম্যাগ্নে-সাইট প্রায় গলিয়া একটি অখণ্ড কঠিন আস্তরণের সৃষ্টি করে। ইট প্রস্তুত করিতেও এইরূপ সামান্য কিছু খাদের আবশ্যক হয়। যে জিনিষের ইট প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার খাঁটি দানাগুলিকে ধরিয়া রাখিয়া বিশেষ আকৃতি দিবার জন্য কিছু খাদ থাকা দরকার। অন্যান্য কারণে বিশেষ বিশেষ জিনিষ প্রয়োজনমত মিশাইতেও হয়। ইটের উপরিভাগ মসৃণ হওয়া আবশ্যক। বিভিন্ন রকমের ইটের বিশেষ কয়েক প্রকার গুণ থাকে। প্রকারভেদে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার ইট ব্যবহৃত হয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হইল।

ফায়ার-ক্লে ইট—তাপের তারতম্য হইলেও ইহার আকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু ইহার রাসায়নিক ক্রিয়া প্রতিরোধ করিবার শক্তি কম। এই জন্য যেখানে কেবলমাত্র তাপসহন ক্ষমতাযুক্ত পদার্থের আস্তরণ প্রয়োজন এবং তাপের তারতম্যে আকৃতির পরিবর্তন হইবে না, সেইখানেই কেবল ইহার ব্যবহার হয়। ইহা অন্যান্য ইটের অপেক্ষা সস্তাও বটে। সেই জন্য যে বাল্তিতে লোহা বা ইস্পাত ঢালাই হয় বা যে সকল চুল্লীতে শুধু গরম করা হয় তাহাদের ভিতরের অংশ ইহার দ্বারা তৈয়ার হয়। তাহা ছাড়া গরম গ্যাস বা ষ্টীমের পাইপ, চিম্নী, চেকার, নালি ইত্যাদির মধ্যের আস্তরণ এই রকমের ইটের দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহা একপ্রকার অম্লাত্মক ইট।

সিলিকা ইট—ইহাও একপ্রকার অম্লাত্মক ইট। বেশ হাল্কা হইলেও ইহার বিশেষ গুণ এই যে, অত্যধিক তাপে ওজন বহন করিবার ক্ষমতা অন্যান্য জাতীয় ইট অপেক্ষা বেশী। এই বিশেষ গুণের জন্য খিলান, ছাদ প্রভৃতি এই ইটের দ্বারা প্রস্তুত হয়। সিলিকা ইট উত্তপ্ত হইতে আরম্ভ হইলে তিনটি বিশেষ তাপে ইহার বিপর্যয় ঘটে। ইহার কারণ এই যে, সিলিকা ইটের মধ্যে তিন প্রকার কেলাসিত সিলিকা বিদ্যমান—কোয়ার্ট্জ্, ট্রিডিমাইট এবং ক্রিষ্টোবেলাইট। ট্রিডিমাইট—১১৭° সে. হইতে ১৬৩° সে.-এ, ক্রিষ্টোবেলাইট—২০০° সে. হইতে ২৭৫° সে.-এ এবং কোয়ার্ট্জ্—৫৭৩° সে.-এ কেলাসের পরিবর্তন হয়। তখন ইহাদের আয়তন হঠাৎ বাড়িয়া যায়। এই হঠাৎ বাড়িবার জন্য টুক্রাবিশেষ ইট হইতে খসিয়া পড়ে। ইহাকে Spalling বলা হয়। এই জন্য বেসিক ওপেন হার্থের ছাদ সিলিকা ইটের বলিয়া ইহাকে ১০০° সে. হইতে ৬০০° সে. পর্যন্ত খুব আস্তে আস্তে গরম করিতে হয়। যতদিন ওপেন-হার্থে ইস্পাত তৈয়ার হয়, ততদিন কোন অবস্থায় ছাদের তাপ ৬০০° সে.-এর নীচে নামে না। কাজেই ওপেন-হার্থে একবার গরম হইয়া গেলে আর Spalling-এর ভয় থাকে না। কিন্তু হঠাৎ উত্তপ্ত হইলে ইহা

হইতে অংশবিশেষ টুক্‌রা হইয়া খসিয়া পড়ে। এই জন্য প্রথমে ইহাকে আস্তে আস্তে গরম করিতে হয়। অত্যধিক তাপে ইহা সামান্য বাড়িয়া যায় বলিয়া অ্যাসিড কন্‌ভার্টারে ব্যবহৃত হয় না। গ্যানিষ্টার নামক পাথর উহাতে ব্যবহৃত হয়।

ম্যাগ্নেসাইট ইট—ইহা ক্ষারীয় ইট। কাজেই ক্ষারীয় ধাতুমলের রাসায়নিক ক্রিয়া প্রতিরোধক ক্ষমতা খুব বেশী। ইহার গলনাঙ্ক অত্যন্ত অধিক বলিয়া ইহা বেসিক ওপেন-হার্থের তলায় বা পার্শ্বদেশে ব্যবহৃত হয়। ইহার দাম খুব বেশী বলিয়া অনেক সময় ওপেন-হার্থের দেওয়াল ইহার দ্বারা তৈয়ার করা হয় না। ইহা বেশ ভারী। অত্যধিক তাপে ওজন বহন করিবার ক্ষমতা কম বলিয়া বেসিক ওপেন-হার্থের ছাদ অম্লাত্মক সিলিকা ইটের দ্বারা নির্মিত হয়। কিন্তু বিদেশে বিশেষ কাঠামো তৈয়ার করিয়া এই ইটের দ্বারা বেসিক ওপেন-হার্থের ছাদও তৈয়ার করা হয়। ইহার গলনাঙ্ক অনেক বেশী বলিয়া ক্ষয়-ক্ষতি খুবই কম এবং উচ্চতাপে অন্যান্য প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনাও কম।

ক্রোম ইট—ইহা প্রশমিত ইট। অম্লাত্মক এবং ক্ষারীয়। অত্যধিক তাপে যাহাতে রাসায়নিক ক্রিয়া না হইতে পারে সেই জন্য দুই প্রকার ইটের মাঝখানে ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। ইহা বেশ ভারী এবং দামী।

ইট	গলনাঙ্ক	SiO_2	FeO Fe_2O_3	Al_2O_3	CaO + Mgo	K_2O Na_2O	TiO_2	Cr_2O_3
ফায়ার ক্লে	১৫০০° সে. —১৭০০° সে.	৬২%	২'৫	৩৩'০	১'৫	০'৩	১'০	×
সিলিকা	১৭০০° সে.	৯৬%	০'৭	১'০	২'০	০'২	×	×
ম্যাগনেসাইট	২১৫০° সে.	০'৫	৪'০	১'০	৬'০ ৮৫'০	০'৩	×	×
ক্রোম	২০৫০° সে.	৯'০	২২'০	১২'০	১২'০	×	×	৪৪'০

এই চারপ্রকার ইটের মধ্যেও প্রকারভেদ আছে। বিশেষ ভাল এবং সাধারণ। ইহা নানা আকারের হয়—এক একটি দেখিতে অদ্ভুত আকারের হইয়া থাকে। এই চারপ্রকার ছাড়াও ক্রোম, ম্যাগ্নেসাইট মিশ্রিত অ্যাস্‌বেস্‌টস্ এবং গ্র্যাফাইটের ইট বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়।

আমাদের দেশে কুমারধোবী, বার্ণপুর, বেল-পাহাড় প্রভৃতি স্থানে এই সকল ইটের কারখানা আছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

কৌলিন্যের জন্যে কিনা বলা যায় না, তবে একটা আকর্ষণীয় চমকের জন্যে তো বটেই—ইদানীং একটা রেওয়াজ হয়েছে—ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিজ্ঞান-বহির্ভূত শাস্ত্রগুলির আলোচনাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার ও মনন করবার চেষ্টা করা যাচ্ছে। এদের মধ্যে কয়েকটি শাস্ত্রকে তো আবার বিজ্ঞান নামের তকমা এঁটে দিয়ে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, অর্থ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করা হচ্ছে। নিছক যে সুষ্ঠু গৃহস্থালী পরিচালন ব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে গার্হস্থ্য বিষয়ক শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে, তাকে পর্যন্ত গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের জমকালো পোষাক পরিয়ে জৌলুষ বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। এতে হয়তো বিজ্ঞানে উৎসাহী অনেকেরই নাসিকা কুঞ্চিত হবে এই ভেবে যে, বিজ্ঞান-বহির্ভূত শাস্ত্রের সঙ্গে বিজ্ঞান কথাটার প্রয়োগ সমীচীন নয়। এভাবে 'বিজ্ঞান' কথাটি প্রয়োগের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বৃথা তর্কজাল সৃষ্টি না করেও বলা যায় যে, এসব প্রচেষ্টার মধ্যে একটা সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সার্বজনীনতা, নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা ধীরে ধীরে স্বকীয় মহিমায় জ্ঞানরাজ্যের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

অজ্ঞান তিমিরের যবনিকা অপসারণের মূলে জিজ্ঞাসার প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা মানুষকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে আসছে, যাতে সে জ্ঞানের আলোকতীর্থে অবতীর্ণ হতে পারে। এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অনুসন্ধান বা পরীক্ষাকার্যের ছাড়পত্র নিয়ে পর্যবেক্ষণের সহায়তায় বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণার সময়সাপেক্ষ ও দীর্ঘ দুরূহ পথ অতিক্রম করে সত্যের সিংহদ্বারে প্রবেশ লাভ করতে পারে। এভাবে জিজ্ঞাসায় অনুপ্রাণিত পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদির ধৈর্যসহকারে পর্যবেক্ষণ থেকে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলা যায়।

বিশেষ একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানের বিষয় উদাহরণস্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। জলের স্বরূপ কি—বিচার করতে হবে। বিজ্ঞান-জগতের পূর্বসূরিদের ধারণা ছিল যে, জল একটি মৌলিক পদার্থ। হিন্দুদের পঞ্চভূত বা মৌলিক পদার্থের মধ্যে একটি ছিল জল এবং গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটল যে মূল চারটি উপাদান কল্পনা করেছিলেন, জল ছিল সেগুলির অন্যতম। কালক্রমে গবেষণার ফলে এই ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে। বৃটিশ বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিস প্রমাণ করেন, জল মৌলিক পদার্থ নয় বরং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুটি বিভিন্ন বায়বীয় পদার্থের সমন্বয়ে এই তরল পদার্থের উদ্ভব ঘটে।

বিশেষভাবে নির্মিত কাচপাত্রের মধ্যে সামান্য অম্লসংযুক্ত জল রেখে তাতে প্ল্যাটিনাম ধাতুর দুটি বিদ্যুৎ-দ্বার প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হলো। জল সাধারণতঃ বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে না; সে জন্যে তাতে সামান্য অম্ল সংযোগ করা হয়। জলপূর্ণ পরীক্ষানল বিদ্যুৎ-দ্বার দুটির উপর এমনভাবে স্থাপিত করা হয় যাতে বিদ্যুৎ-দ্বার দুটি পরীক্ষানলের জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে এবং কাচপাত্র ও পরীক্ষানলের মধ্যেকার জলের যোগাযোগ ঘটতে পারে। এখন বিদ্যুৎ-দ্বারের পথে কিছুক্ষণ বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত করালে দেখা যাবে, পরীক্ষানলের মধ্যেকার জল ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে

এবং সেখানে বায়বীয় পদার্থের আবির্ভাব হচ্ছে। কিন্তু সঞ্চিত বায়বীয় পদার্থের আয়তনের পরিমাণ দুটি পরীক্ষানলের মধ্যে সমমাত্রায় ঘটে নি—একটির আয়তন অন্যটির অপেক্ষা দ্বিগুণ বেশী। পরীক্ষার ফলে দেখা যাবে, দুই আয়তন-বিশিষ্ট বায়বীয় পদার্থটি হাইড্রোজেন এবং অন্যটি অক্সিজেন।

পৃথিবীর যে কোন স্থানের জল নেওয়া হোক না কেন, তাদের পৃথক পৃথক বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ করা হলে প্রতি ক্ষেত্রেই দুই আয়তন পরিমাণ হাইড্রোজেন ও এক আয়তন পরিমাণ অক্সিজেন পাওয়া যায়। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সম্মিলনে জলের উদ্ভব—এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হবার জন্যে বিজ্ঞানী এবার বিপরীত পন্থার আশ্রয় নিলেন। বিশেষভাবে নির্মিত একটি কাচপাত্রের মধ্যে দুই আয়তন পরিমাণ হাইড্রোজেন ও এক আয়তন পরিমাণ অক্সিজেন মিশ্রিত করে তাতে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটালে দেখা যাবে যে, প্রতিক্ষেত্রে এবং প্রতিবারেই জলের উদ্ভব হচ্ছে এবং উদ্বৃত্ত হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন পরিত্যক্ত হয়েছে। কাজেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে যে, দুই আয়তন পরিমাণ হাইড্রোজেন ও এক আয়তন অক্সিজেন সম্মিলিত হলে জলের উদ্ভব হয় এবং জল একটি যৌগিক পদার্থ, যেহেতু জলের বিশ্লেষণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামে দুটি মৌলিক পদার্থের আবির্ভাব ঘটে। এই তত্ত্বটি সার্বজনীন ও পৃথিবীতে স্থান-কাল-নিরপেক্ষ একটি চরম সত্য—এ-পর্যন্ত যার কোন ত্রুটি ধরা সম্ভব হয় নি। জলের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে যে কর্ম-পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, একেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী-প্রসূত বলা হয়।

এই কার্য-পদ্ধতির স্বরূপ বিচার করলে দেখা যাবে যে, এটি সময়-সাপেক্ষ এবং এই পরীক্ষাকার্যটি পরিচালনায় খুবই যত্ন ও ধৈর্যের প্রয়োজন; নতুবা দ্রুতগতিতে খেয়াল-খুশিমত যথেচ্ছভাবে পরীক্ষা পরিচালিত করলে প্রকৃত তথ্য আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। পূর্বকল্পিত ধারণা বা সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টি প্রয়োগে পরীক্ষার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করবার পর যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার; যাতে নিঃসন্দেহ হতে পারা যায় যে, সব দিকে ও সবস্থানে এবং সম্ভব হলে সর্বকালে সিদ্ধান্তটি নির্ভুল বিবেচিত হবে। তার মানে এই নয় যে, যদি কখনও কোন বিজ্ঞানী অপেক্ষাকৃত অধিক যুক্তিপূর্ণ পরীক্ষার ফলে প্রমাণ করেন যে, এই সিদ্ধান্তটি আর নির্ভুল নয়, তবে নতুন সিদ্ধান্তকে আমরা গ্রহণ করব না; যেহেতু আমাদের পূর্বের সিদ্ধান্তটি বহুকাল সত্য বলে বিবেচিত হওয়ার ফলে বিশ্বাস বা সংস্কারে পরিণত হয়েছে। এখানেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল নিহিত ও চরম লক্ষণ প্রকট। বিজ্ঞানীর মন সর্বদাই সব রকম সংস্কারমুক্ত এবং কেবলমাত্র যৌক্তিকতায় আস্থাশীল এবং সত্য ভিন্ন অন্য সব কিছুতেই অনাসক্ত। গবেষণার ফলে যখনই প্রমাণিত হলো যে, পরমাণু মোটেই অবিভাজ্য ও অবিভেদ্য নয়, বরং পরমাণু তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন কণিকার সমবায়ে গঠিত—তখন এই সত্যটিকে গ্রহণ করতে বিজ্ঞানীর কোনই দ্বিধা রইল না। উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিজ্ঞানী পারমাণবিক গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন—নিউট্রিনো, মেসন, পজিট্রন ও আধুনিকতম অ্যান্টি-প্রোটন প্রভৃতি কণিকার শুভাগমনকে স্বাগত জানাচ্ছে। চরম সত্যের সন্ধান পেতে হলে জ্ঞান-রাজ্যের কত যে অফুরন্ত দেউড়ি ডিঙিয়ে যেতে হয় তা কে বলতে পারে! সে জন্যেই বিজ্ঞানীর সংস্কারমুক্ত মন নিয়তই নবতর সত্যের জন্যে উন্মুক্ত রাখতে হয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই এ-যুগের দার্শনিক মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসঙ্গে বলেছেন, বিশ্বব্যাপার অনুধাবনে যাবতীয় ব্যক্তিগত রুচি, আশা ও স্বার্থ পরিহার করাটাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সার বস্তু। সংস্কার-মুক্ত নিরপেক্ষতাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর চরম লক্ষণ। মানবিক যাবতীয় ব্যাপার সংস্কার-

বর্জিত নিরপেক্ষভাবে বিচার বিবেচনা করলে সাধারণতঃ যে দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হয়, এখানে তাকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলা হয়েছে। অশেষ ধৈর্য সহকারে পর্যবেক্ষণ ও তার ফলাফল অকপট-ভাবে উল্লেখ করা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দুটি বিশেষ প্রয়োজনীয় আনুসঙ্গিক, যার অভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুশীলন অসম্পূর্ণ থাকে। কেন না, ধীর পর্যবেক্ষণ ও তার ফলাফল অকপটভাবে উল্লেখের ফলে শুধু যে মননশীলতাই বর্ধিত হয় তা নয়, বরং বুদ্ধির স্থিরতা ঘটে এবং পরিশুদ্ধ জ্ঞানের উন্মেষ হয়।

ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিজ্ঞান-বহির্ভূত শাস্ত্রগুলিতে এ-পর্যন্ত যত নীতি, তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত লাভ করা গেছে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে গবেষণাগারে সেগুলিকে যাচাই করবার সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই, সে কথা সত্য; কিন্তু নিরপেক্ষ ও সংস্কারমুক্ত উদার মনের বিস্তৃত পটভূমিতে সে সব নীতি, তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তগুলিকে গভীর ধৈর্যসহকারে যাচাই করে নেওয়া অবশ্যই সম্ভব। সুতরাং ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রেও জ্ঞান আহরণের জন্যে এবং আহৃত নীতি ও সিদ্ধান্তগুলিকে যাচাই করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে একটি মূল্যবান অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কার্যতঃ অসীম ধৈর্যসহকারে পর্যবেক্ষণ এবং তার ফলাফল অকপট-ভাবে উল্লেখ করা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর এই দুটি আনুসঙ্গিকের উপর গভীর আস্থা স্থাপন করে ঐ সব শাস্ত্রগুলিতে জ্ঞান-আহরণের চেষ্টা হচ্ছে এবং আহৃত জ্ঞানকে যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষতার কষ্টিপাথরে যাচাই করবার পর কোন নীতি বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগ্রহ লক্ষিত হচ্ছে। তাই ইতিহাসে টয়েনবী, রাষ্ট্রনীতিশাস্ত্রে লাস্কি বা সমাজনীতি শাস্ত্রের শিক্ষাক্ষেত্রে মণ্টেসারীর মত উজ্জ্বল ও প্রখর প্রতিভার আবির্ভাবে ঐ সব ও অন্যান্য বিজ্ঞান-বহির্ভূত শাস্ত্রগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচিত হওয়ার একটা বিশেষ ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এই ঝোঁক সুস্থ মনের পরিচায়ক এবং তারই আগ্রহাতিশয্যে বিজ্ঞান-বহির্ভূত শাস্ত্রগুলির সঙ্গে বিজ্ঞান কথাটির সংযোগ সাধিত হচ্ছে বলে মনে হয়।

ভাবুক সমাজের মধ্যে কলা ও বিজ্ঞানের পুরা-তন সংস্কার-জীর্ণ অবাঞ্ছিত শ্রেণীবৈষম্যের যে বৈরী-ভাব মাথা তুলে এখনও দাঁড়িয়ে আছে, এভাবে বিজ্ঞান-বহির্ভূত শাস্ত্রগুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সুচারু অনুশীলনের ফলে তা আচরেই লোপ পাবে বলে আশা করা যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অমূলক দ্বন্দ্বের অবসানে মানুষের সামনে একটি বিরাট ও বিপুল জ্ঞান-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এবং সেই অখণ্ড জ্ঞান-সাম্রাজ্যের উদার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে মানব-প্রগতি, তথা সভ্যতার বিজয়াভিযান অবলোকন করা খুবই সহজ বলে মনে হবে।

অ্যাসিটিলিন

অ্যাসিটিলিন বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি, কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমষ্টি। এর অণুগুলি কার্বন ও হাইড্রোজেনের পরমাণু দ্বারা গঠিত। অ্যাসিটিলিনের কার্বন পরমাণুর সংযুক্তির অসম্পৃক্ততার জন্যে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে এর বহুবিধ রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং তার ফলে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই ভাবে উদ্ভূত রাসায়নিক দ্রব্যগুলির মধ্যে অনেকগুলি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাই অ্যাসিটিলিন শ্রেণীর অন্যান্য হাইড্রোকার্বন-গুলি খুব প্রয়োজনীয় না হলেও উক্ত শ্রেণীর অন্যতম অ্যাসিটিলিন গ্যাসের (C_2H_2) ব্যবহার অত্যন্ত বিস্তৃত। কতকগুলি মূল্যবান দ্রব্যের সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই অ্যাসিটিলিন গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। অ্যাসিটিলিনের কার্বন পর-মাণুর তিনটি করে সংযুক্তি। অসম্পৃক্ত বলে হ্যালোজেন, হ্যালোজেন অ্যাসিড, হাইড্রোজেন প্রভৃতির সঙ্গে অ্যাসিটিলিনের অনেকগুলি অতিরিক্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। অসম্পৃক্ততার জন্যে এর পলিমেরিজেশনও হয়, অর্থাৎ অনেকগুলি অ্যাসিটিলিন অণু একত্রিত হয়ে বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট বৃহত্তর অণু সৃষ্টি করে।

এড্‌মণ্ড ডেভি ১৮৩৬ সালে প্রথমতঃ অ্যাসি-টিলিন গ্যাস আবিষ্কার করেন। পটাসিয়াম ধাতু তৈরী করবার সময় পরিত্যক্ত অবিশুদ্ধ তলানিতে জল দিয়ে ডেভি এই গ্যাস তৈরী করেছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন বাইকারবুরেট অব হাই-ড্রোজেন। বিজ্ঞানী বার্থেলো ১৮৬০ সালে এর নাম দিলেন অ্যাসিটিলিন। তিনিই প্রথম এই গ্যাসের ধর্ম ও উপাদান বের করেন। বছর দুই পর উহ্‌লার নামে এক বৈজ্ঞানিক দেখান যে, ক্যালসিয়াম কার্বাইড (CaC_2) ও জলের বিক্রিয়ার দ্বারা এই গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব। ১৮৯২ সালে বৈজ্ঞানিক উইল্‌সন CaC_2 প্রথম বৈদ্যুতিক চুল্লীতে প্রস্তুত করেন। আজকাল অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপাদন করা হয় ক্যালসিয়াম কার্বাইডের সঙ্গে জলের রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা।

$$CaC_2 + 2H_2O = Ca(OH)_2 + C_2H_2$$
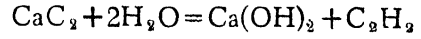
ক্যালসিয়াম কার্বাইড + জল = ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড + অ্যাসিটিলিন গ্যাস। ক্যালসিয়াম কার্বাইড হচ্ছে একপ্রকার কঠিন ধূসর বর্ণের পাথর। চুনের (ক্যালসিয়াম অক্সাইড) সঙ্গে কার্বনকে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ২৫০০°সে.–৩০০০°সে. উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে কঠিন কার্বাইড উৎপন্ন হয়। সামান্যতম জলের সংস্পর্শে এসেই এই কঠিন কার্বাইড থেকে অ্যাসিটিলিন গ্যাস বের হতে থাকে ও কঠিন কার্বাইড ভেঙ্গে ক্যালসিয়াম হাইড্র-ক্সাইডের পাউডারে বিশ্লিষ্ট হয়। এই কার্বাইড থেকে উৎপন্ন অ্যাসিটিলিন বিশুদ্ধ নয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত। কিন্তু বিশুদ্ধ অ্যাসিটিলিন গন্ধহীন। সোডিয়াম (Na), লিথিয়াম (Li), বেরিয়াম (Ba), প্রভৃতি ধাতুর কার্বাইড থেকেও অনুরূপভাবে জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় অ্যাসিটিলিন পাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে অ্যাসিটিলিন পাওয়া যায় লিথিয়াম কার্বাইড ($LiCa_2$) থেকে। কার্বাইড থেকে উৎপন্ন অ্যাসিটিলিন গ্যাসের দুর্গন্ধের প্রধান কারণ হচ্ছে হাইড্রোজেন সাল-ফাইড (H_2S), অ্যামোনিয়া (NH_3) প্রভৃতি গ্যাসের অবস্থিতি। এ ছাড়াও কার্বন মনোক্সাইড (CO), নাইট্রোজেন (N_2), অক্সিজেন (O_2) সামান্য মাত্রায় থাকে। অবিশুদ্ধ খাদ হিসাবে কার্বাইডে পাওয়া যায় ক্যালসিয়াম সালফাইড

(CaS), ক্যালসিয়াম নাইট্রাইড ($CaNO_2$), ক্যালসিয়াম ফস্‌ফাইড (Ca_3PO_3) প্রভৃতি পদার্থ। রাসায়নিক ও শারীরিক দিক থেকে অ্যাসিটিলনের এই খাদগুলি অনিষ্টকর। জল দিয়ে ধুয়ে দিলে অনেকগুলি দূরীভূত হয়ে যায়। এই গ্যাসকে বিশুদ্ধ করবার জন্যে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা হয়।

১। উদ্ভূত গ্যাসকে হাইড্রোক্লোরিক ও মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশ্রিত দ্রবণের মধ্য দিয়ে চালিত করা।

২। উদ্ভূত গ্যাসকে অ্যাসিড মিশ্রিত কপার সালফেট দ্রবণ, অ্যাসটিক সোডা বা সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত ক্রোমিক অ্যাসিড, ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চালিত করা।

উপরিউক্ত পদ্ধতি ছাড়া অন্য উপায়েও অ্যাসিটিলিন তৈরী করা হয়। হাইড্রোজেনের মধ্যে কার্বন-ইলেকট্রোডের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে তড়িৎ-প্রভা সৃষ্টি করলে ১০% অ্যাসিটিলিন উৎপন্ন হয়। কষ্টিক পটাসের (KOH) সাহায্যে ১-২-ডাইক্লোরোইথেন (CH_2Cl-CH_2Cl) ও ১-১-ডাইক্লোরোইথেন (CH_3CHCl_2) থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) অপসারণ দ্বারা অ্যাসিটিলিন উৎপন্ন হয়। অসম্পৃক্ত ডাই-কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড ও তার লবণকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করেও অ্যাসিটিলিন উৎপাদন করা হয়। খুব বেশী উত্তাপে কম অক্সিজেনে মিথেনকে (CH_4) আংশিক দহন করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মেনীতে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিটিলিন উৎপাদন করা হয়েছিল। এই উপায়ে উৎপন্ন হয় প্রায় ৩০% অ্যাসিটিলিন গ্যাস। বায়ুস্থিত গ্যাসে যেসব গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায় আজকাল তাদের উত্তাপ প্রয়োগে বিভাজিত (Pyrolysis) করে অ্যাসিটিলিন উৎপাদন করা হচ্ছে।

অ্যাসিটিলিনের ঘনত্ব ১৩ ও আণবিক ওজন-২৬। বিশুদ্ধ অ্যাসিটিলিন বর্ণহীন ও গন্ধহীন গ্যাস। এই গ্যাস সামান্য পরিমাণে বিষাক্ত; তবে বাতাসে ৪০% থাকলে শ্বাসরোধ ঘটে। অ্যাসিটিলিন গ্যাস বায়ুতে কৃষ্ণবর্ণ ধূম নির্গত করে খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলে। দহনের উত্তাপে অ্যাসিটিলিন আংশিক ভাবে ভেঙে কার্বন-কণিকায় পরিণত হয় ও জ্বলবার সময় কার্বন-কণিকাগুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলে বলে অ্যাসিটিলিন গ্যাস আজও আলোকবর্তিকাতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বায়ু ও অ্যাসিটিলিনের মিশ্রণ খুবই বিস্ফোরক। বায়ুতে ৬% পর্যন্ত অ্যাসিটিলিন থাকলেই এই মিশ্রণ বিস্ফোরক হবে। ৫%-এর নীচে ও ৮%-এর উপরে থাকলে সাধারণতঃ বিস্ফোরণের সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু অক্সিজেন অ্যাসিটিলিনের মিশ্রণ আরও বিস্ফোরক। অ্যাসিটিলিন তরল ও কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায়। তরল বায়ুতে অ্যাসিটিলিন জমে গিয়ে দানাদার কঠিন পদার্থ হয়ে যায় এবং তখন তাকে মোমবাতির মত জ্বালানো চলে। এর গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক খুবই কাছাকাছি; তাই কঠিন অ্যাসিটিলিন সাধারণ উত্তাপে তরল অ্যাসটিলিনে পরিণত না হয়েই বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হতে থাকে। অ্যাসিটিলিনের শতকরা এক আয়তন ১৫°সে. উষ্ণতায় জলে দ্রবণীয়। এই দ্রাব্যতা চাপ ও অধিক ঠাণ্ডায় বাড়ে। অ্যাসিটিলিন জলের সঙ্গে কঠিন দানাদার পদার্থ (C_2H_2, $6H_2O$) গঠন করে ও বিভিন্ন জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় দানাদার পদার্থ তৈরী করে। বেঞ্জিন (C_6H_6) ও ক্লোরোফর্ম ($CHCl_3$) নিজেদের আয়তনের চারগুণ অ্যাসিটিলিন গ্যাস ১৮° সে. উষ্ণতায় শোষণ করতে পারে। অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও অ্যালকোহলও প্রায় নিজেদের আয়তনের ৬ গুণ অ্যাসিটিলিন গ্যাস শোষণ করে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী শোষণ করে অ্যাসিটোন। সাধারণ চাপে ১৫° সে. উষ্ণতায় অ্যাসিটোন প্রায় ২৫ গুণ, ১২ গুণ পরিমিত বায়ুর চাপে প্রায় ৩০০ গুণ এবং-৮০° সে. তাপমাত্রায় প্রায় ২০০০ গুণেরও

বেশী অ্যাসিটিলিন শোষণ করতে পারে। গ্যাসীয় অ্যাসিটিলিনকে তরল করে ইস্পাতের পিপায় ভর্তি করে রাখা অসুবিধাজনক। কারণ তাপগ্রাহী যৌগিক বলে তরল অবস্থায় অ্যাসিটিলিনের বিস্ফোরণের সম্ভাবনা আছে। যে কোন আঘাত বা তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে তরল অ্যাসিটিলিন আলোক ও উত্তাপ সহ বিস্ফোরিত হয়ে যায় এবং কার্বন ও হাইড্রোজেনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আলোকবর্তিকার জন্যে এক সময়ে যখন তরল অ্যাসিটিলিন ব্যবহার করা হতো, তখন উক্ত কারণে বহু দুর্ঘটনা ঘটে। তাই তখন প্রায় সব দেশেই অ্যাসিটিলিনকে তরল করা বা তরল অ্যাসিটিলিন রাখা নিষিদ্ধ হয়েছিল। বিস্ফোরণ এড়াবার জন্যে ইস্পাতের পিপায় অ্যাসিটোন, অ্যাসবেষ্টস এবং অন্যান্য যেসব সচ্ছিদ্র পদার্থ তরল অ্যাসিটিলিন শোষণ করতে পারে, তাদের মধ্যে ভর্তি করে রাখা হয়। এভাবে পিপায় রক্ষিত অ্যাসিটিলিনের সাহায্যে কোন কোন যানবাহনে এখনও আলোর ব্যবস্থা করা হয় এবং অক্সিজেনের সঙ্গে ব্যবহার করে অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখার কাজ হয়ে থাকে। বার্থেলো প্রথমে মনে করেছিলেন যে, অ্যাসিটিলিন গ্যাস কোল গ্যাসের ন্যায় ব্যবহৃত হবে, কিন্তু তা হলো না। তারপর দ্রাবক হিসাবে ব্যবহারের জন্যে ক্লোরিন-ঘটিত জৈব যৌগিক উৎপাদনের চেষ্টা করা হলো; কিন্তু দেখা গেল, অ্যাসিটিলিন থেকে অ্যালডিহাইড প্রস্তুত করা সম্ভব। তখন শিল্পের দিক দিয়ে অ্যাসিটিলিনের মূল্য বেড়ে গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে অ্যাসিটিলিন থেকে কৃত্রিম প্লাষ্টিক ও রবার তৈরীর প্রারম্ভিক দ্রব্যসমূহ তৈরী করবার দিকে বৈজ্ঞানিকদের ঝোঁক গেল। একদিকে ভিনাইল ইথার তৈরী করে তাথেকে পলিমেরাইজ করে বিভিন্ন প্লাষ্টিক ও অন্যদিকে অ্যাসিটিলিন থেকে ভিনাইল অ্যাসিটিলিন তৈরী করে তাথেকে পলিমেরাইজ করে ক্লোরোপ্রিন, আইসোপ্রিন, ডিউপ্রিন প্রভৃতি কৃত্রিম রবার তৈরীর চেষ্টা সফল হলো। এই অ্যাসিটিলিন থেকে যত রকমের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ তৈরী হচ্ছে, তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:—
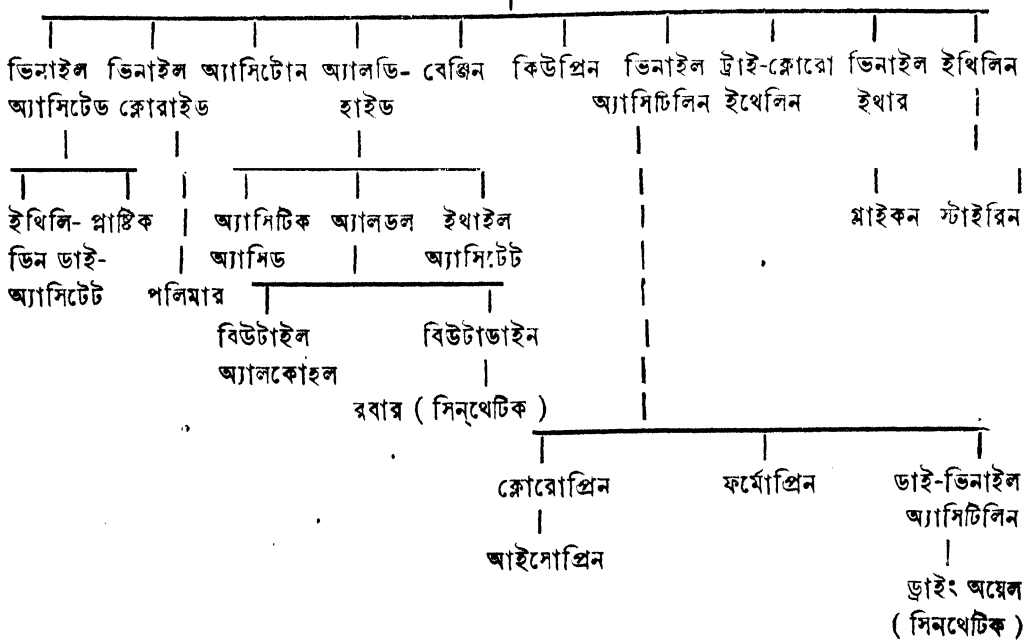
লোহিত তপ্ত লোহার চোঙের মধ্য দিয়ে অ্যাসিলিটিন গ্যাস চালিত করলে পরিমেরিজেশনের ফলে বেঞ্জিন (C_6H_6) তৈরী হয়। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডমুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইড ও অ্যাজমেলিক ক্লোরাইড দ্রবণে অ্যাসিটিলিন চালনা করে ভিনাইল অ্যাসিটিলিন ($CH_2=CH\text{-}C\equiv CH$) ও ডাই-ভিনাইল অ্যাসিটিলিন ($CH_2=CH\text{-}C\equiv C\text{-}CH=CH_2$) উৎপাদন করা হয়। কৃত্রিম উপায়ে রবার প্রস্তুতিতে এই দুটি অ্যাসিটিলিনের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। অ্যাসিটিলিন থেকে অ্যালডিহাইড তৈরী করা হয়। প্রথমতঃ সন্ত উত্তপ্ত কাঠ-কয়লাতে অ্যাসিটিলিন শোষণ করে নেওয়া হয়। তারপর আবদ্ধ পাত্রে এই কাঠ-কয়লাকে জলে রেখে উত্তপ্ত করলে প্রথমে ভিনাইল অ্যালকোহল ও পরে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয়। এই ক্রিয়াকে মারকিউরিক অক্সাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণের দ্বারা প্রভাবিত করে শিল্প ব্যবস্থায় প্রচুর পরিমাণে অ্যালডিহাইড পাওয়া যায়। প্রভাবক পারদঘটিত লবণের মধ্য দিয়ে প্রায় ৫০°সে. তাপ মাত্রায় সালফিউরিক অ্যাসিডে রক্ষিত মারকিউরিক অক্সাইডের দ্রবণের মধ্য দিয়ে অ্যাসিটিলিন চালনা করা হয়। এভাবে উৎপন্ন অ্যালডিহাইডকে ম্যাঙ্গানিজ অ্যাসিটেটের সংস্পর্শে বায়ুর সাহায্যে জারিত করে অ্যাসিটিক অ্যাসিড (CH_3COOH) পাওয়া যায়। এই অ্যালডিহাইড থেকে অ্যাসিটোন, অ্যালডল, অ্যাসিটেট, অ্যালকোহল ইত্যাদি পাওয়া যায় বলে অ্যালডিহাইড উৎপাদনের জন্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিটিলিন ব্যবহার করা হচ্ছে। কৃত্রিম রবার ও প্লাষ্টিক হিসাবে যে ভিনাইল রেজিন-সমূহ ব্যবহৃত হয়, সেগুলিও অ্যাসিটিলিন থেকে পাওয়া যায়। মার্কারিঘটিত লবণ বা অ্যাসিটল সালফিউরিক অ্যাসিডের (৮০%) প্রভাবের দ্বারা অ্যাসিটিক অ্যাসিড সহযোগে অ্যাসিটিলিন থেকে ভিনাইল অ্যাসিটেট তৈরী হয়। কৃত্রিম রবার ও প্লাষ্টিক শিল্পে ব্যবহৃত ভিনাইল রেজিন উৎপন্ন হয় ভিনাইল অ্যাসিটেট থেকে। অ্যাসিটিলিনের ক্লোরিনঘটিত যৌগিকসমূহ দ্রাবকের কাজ করে। অ্যাসিটিলিনের শিল্পে বাইপ্রোডাক্ট হিসাবে যে হেক্সা-ক্লোরো-ইথেন পাওয়া যায়, সেগুলি সহজে উর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ায় দানাদার পদার্থে পরিণত হয়। অ্যামোনিয়া মিশ্রিত তাম্র বা রৌপ্যঘটিত দ্রবণে অ্যাসিটিলিন চালনা করলে কপার অ্যাসিটিলাইড (C_2Cu_2 রক্তিমাভ) ও সিলভার অ্যাসিটিলাইড (C_2Ag_2, সাদা) উৎপন্ন হয়। শুষ্ক অবস্থায় এরা সামান্য স্পর্শেই বিস্ফোরিত হয়। অনেক সময় বিস্ফোরক হিসাবেও যুদ্ধের কাজে লাগে। যুদ্ধে ব্যবহৃত লিউইসাইট তৈরী করা হয়েছে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের (Al_3Cl) উপস্থিতিতে অ্যাসিটিলিন ও আর্সেনিক-ট্রাই-ক্লোরাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা।

রাসায়নিক দিক ছাড়াও অ্যাসিটিলিনের ব্যবহার হচ্ছে কলকারখানা, গৃহস্থালি ও চিকিৎসায়। কলকাতার ফুটপাথে রাতেরবেলায় হকারদের কাছে অথবা ছোটখাটো দোকানে যে গ্যাসবাতি দেখা যায় তা আর কিছুই নয়—অ্যাসিটিলিন গ্যাসের আলো। গ্যাসবাতির নীচের অংশে বদ্ধ কৌটায় ক্যালসিয়াম কার্বাইড (CaC_2) থাকে ও কৌটার চারদিকে জল রাখবার ব্যবস্থা আছে। এই জল চুইয়ে কার্বাইডের সংস্পর্শে এসে অ্যাসিটিলিন গ্যাস নির্গত হয় এবং জালিয়ে দিলে বার্ণারের মুখে উজ্জ্বলভাবে জলতে থাকে। অ্যাসিটিলিনের বেশী ব্যবহার হচ্ছে অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখায়। এই শিখার সাহায্যে ৩৫০° সে. পর্যন্ত তাপ পাওয়া সম্ভব। বড় বড় ধাতব শিল্পের কারখানায় অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখার সাহায্যে ধাতব দ্রব্যাদি জোড়া লাগানো হয়। সম্পূর্ণ দহনের জন্যে প্রতি দু-আয়তন অ্যাসিটিলিনের জন্যে ৫ আয়তন অক্সিজেন দরকার।

$$2Ca_2H_2+5O_2=4CO_2+2H_2O.$$
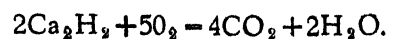
কিন্তু অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখায় সমপরিমাণ

অ্যাসিটিলিন ও অক্সিজেন লওয়া হয়। বাকী অক্সিজেন দহনকালে বায়ুমণ্ডল থেকে পাওয়া যায়। তারপর গুরুত্বের দিক দিয়ে অক্সি-অ্যাসিটিলিন কাটিং-এর কথা বলা যেতে পারে। ভারী ভারী ধাতু নির্মিত পাত এই শিখার সাহায্যে কাটা হয়। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির উপরিভাগে কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম, টাংষ্টেন, মলিবডিনাম ধাতুর শক্ত আবরণ দেওয়ার সময় অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখার সাহায্য নেওয়া হয়। আজকাল কোথাও কোথাও মোটরের অন্তর্দহন যন্ত্রে পেট্রোলিয়ামের পরিবর্তে অ্যাসিটিলিনের ব্যবহার হচ্ছে। অ্যাসিটিলিনের নিদ্রাকর্ষক গুণ আছে বলে নারসাইলিন নামে অত্যন্ত বিশুদ্ধ অ্যাসিটিলিন ওষুধরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রভাবক রেণী-নিকেলের সাহায্যে অ্যাসিটিলিন যৌগিককে আংশিক হাইড্রোজেন-যুক্ত করে যৌন-হর্মোন উৎপাদন করা হচ্ছে।

ন. ভ.

সঞ্চয়ন

মহাকর্ষের রহস্য সন্ধানে

গাছের ডালের সঙ্গে আট্‌কানো আপেল ফলটির বোঁটা আল্‌গা হয়ে গেল, আর আপেলটিও সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল। কেন এ-রকমটা হলো? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আইজাক নিউটন বিশ্বপ্রকৃতির এক গুরুতর রহস্যের সন্ধান পান। নিউটনই প্রথম বলেন—প্রত্যেকটি পদার্থ একদিকে যেমন পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে এক অদৃশ্য শক্তির টানে আকৃষ্ট হচ্ছে, তেমনি আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি বস্তু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করছে।

পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যে আকর্ষণ, তাকে বলা হয় অভিকর্ষ বা গ্র্যাভিটি। আর বিশ্বচরাচরের প্রত্যেকটি গ্রহ-তারকার, প্রত্যেকটি জড়পদার্থের পারস্পরিক আকর্ষণকে বলা হয়, মহাকর্ষ বা ইউনিভার্স্যাল গ্র্যাভিটেশন—যাকে আগে বলা হতো মাধ্যাকর্ষণ। নিউটন এই অভিকর্ষ ও মহাকর্ষের নিয়ম নির্দেশ করেন এইভাবে—দুটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে তাদের দুটি ভারকেন্দ্র-বিন্দুর সরল সংযোগ রেখা বরাবর। এই আকর্ষণের বল (ফোর্স) হবে—সেই দুটি বস্তুর ভরের (মাস্) গুণফলের সমানুপাতিক (প্রোপোরশন্তাল) এবং তাদের দূরত্বের বর্গফলের বিষমানুপাতিক (ইন্‌ভার্স লি প্রোপোরশন্তাল)।

এই নিয়ম আবিষ্কার নিউটনের এক বিরাট কীর্তি, যার জন্যে তিনি বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু পদার্থের এই পারস্পরিক আকর্ষণের রহস্যটা কি? কেন তারা একে অন্যকে এইভাবে আকর্ষণ করে? এ-সম্পর্কে আজীবন অনুশীলন করেও নিউটন কোন উত্তর পান নি। শুধু নিউটন নন, তাঁর পরে আড়াই-শ' বছর ধরে কোন বিজ্ঞানী এই রহস্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হন নি। নিউটনের পর মহাকর্ষ-তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রথম মৌলিক এবং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতা তত্ত্বের দ্বারা। আইনষ্টাইনও মহাকর্ষের কারণটি ঠিক ব্যাখ্যা করেন নি—তাঁর থিওরি মহাকর্ষের প্রকৃতিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছে এবং আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের অতি জটিল কার্যকারণ সম্বন্ধের সঙ্গে মহাকর্ষের একটা সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

আইনষ্টাইনের থিওরি অনুযায়ী—ক্রমবর্ধমান বেগে (অ্যাক্‌সিলারেশন) ধাবমান কোন জড়পদার্থ থেকে এক ধরণের মহাকর্ষ-তরঙ্গ (গ্র্যাভিটেশন্তাল ওয়েভ্‌স্) প্রবাহিত হতে থাকে। যে বস্তুর গতি অবিরাম বেড়ে চলেছে, সেই বস্তু থেকে প্রবাহমান

এই যে অদৃশ্য তরঙ্গ, এই তরঙ্গের প্রকৃতি আলোক-তরঙ্গ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বা অন্য যে কোন তরঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পদার্থ-বিজ্ঞানে এ-পর্যন্ত জানা কোন তরঙ্গের সঙ্গে এই মহাকর্ষ-তরঙ্গের কোন মিল নেই। সূর্যের চারদিকে ঘুরছে যেসব গ্রহ, কিংবা গ্রহকে প্রতিনিয়ত পরিক্রমা করছে যেসব উপগ্রহ, তাদের কেন্দ্রাভিমুখী (সেন্ট্রিপিট্যাল) গতির ত্বরণ বা অ্যাক্সিলারেশন আছে। তাই সৌরমণ্ডল থেকে মহাকর্ষ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে থাকে। এই মহাকর্ষ-তরঙ্গের এনার্জি অর্থাৎ শক্তি আছে। যে-পদার্থ থেকে এই তরঙ্গ প্রবাহিত হয় তাকেই এই এনার্জি সরবরাহ করতে হয়। অতএব এর জন্যে সেই পদার্থটির ভর নিশ্চয়ই কমে যাচ্ছে এবং তার ফলে তার ভার বা ওয়েটও কমছে।

বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের মতই অভিকর্ষ-মহাকর্ষেরও ক্ষেত্র বা গ্র্যাভিটেশন্যাল ফিল্ড আছে। আইনষ্টাইনের মতে, এই বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র বা ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ফিল্ড আর গ্র্যাভিটেশন্যাল ফিল্ড পরস্পরের উপরে ক্রিয়াশীল। কিন্তু আপেক্ষিকতা তত্ত্বের দ্বারা এই উভয় ক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি।

ইদানীং কোন কোন পদার্থ-বিজ্ঞানী মনে করছেন যে, মহাকর্ষ-তত্ত্বের বেলায় যদি কোয়াণ্টাম মিকানিক্সের প্রত্যয়গুলিকে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে মহাকর্ষের রহস্য অনেকখানি উদ্ঘাটিত হতে পারে। আলোকের যেমন কণিকাসমষ্টি বা কোয়াণ্টাম কল্পনা করা হয়, তেমনি 'মহাকর্ষের পরমাণু' বা 'গ্র্যাভিটন'-এর ধারণাকেও এই বিজ্ঞানীরা এ-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করছেন। তাঁরা মনে করেন, এই গ্র্যাভিটনই হলো পদার্থের ভারের (ওয়েট) মূল কারণ। সুতরাং যে বস্তুর গ্র্যাভিটন নেই, তার উপরে মহাকর্ষ বা অভিকর্ষেরও কোন প্রভাব নেই; অর্থাৎ প্রচলিত পদার্থ-বিজ্ঞানে যেমন আকর্ষণ থেকেই বস্তু ভার অর্জন করে বলে ধরা হয়, এ-ক্ষেত্রে সেটা ভাবা হচ্ছে বিপরীত দিক থেকে—গ্র্যাভিটন আছে বলেই বস্তুর ভার আছে এবং তার ফলেই তা মহাকর্ষ-তরঙ্গ বিকিরণ করে।

সোভিয়েট বিজ্ঞানী দ্মিত্রি ইভানান্‌কো সম্প্রতি একটি নতুন প্রকল্প (হাইপোথেসিস) উপস্থিত করেছেন—দুটি গ্র্যাভিটন যদি পরস্পরকে ধাক্কা দেয়, তাহলে তারা একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রনের জন্ম দিতে পারে এবং এই ইলেকট্রন ও পজিট্রন দুটি আবার নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে আরও কতকগুলি গ্র্যাভিটন সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারটা ঘটাতে হলে এনার্জি অর্থাৎ শক্তির একটা বিপুল পরিমাণকে সংহত করা দরকার। পৃথিবীর পরিবেশে কৃত্রিম উপায়ে এই প্রক্রিয়া ঘটানো এখনও দীর্ঘকাল সম্ভব হবে না। তবে সূর্যের দেহাভ্যন্তরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসমূহের সম্যক অনুশীলনের ফলে হয়তো গ্র্যাভিটনের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের বিষয় জানা সম্ভব হবে এবং আরও জানা যাবে, যদি অস্তিত্ব থাকে তবে এরা ইলেকট্রন-পজিট্রনের মত মৌলিক পদার্থ-কণিকায় (বেসিক ম্যাটার) রূপান্তরিত হয় কিনা।

কিন্তু এই গ্র্যাভিটন মতবাদেরর ভবিষ্যৎ যাই হোক না কেন, সম্প্রতি সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎ-মহাকর্ষ ক্ষেত্র (ইলেকট্রো-গ্র্যাভিটেশন্যাল ফিল্ড) নিয়ে বাস্তব গবেষণার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী হয়েছেন। কারণ, এই বিদ্যুৎ-মহাকর্ষ ক্ষেত্রের কার্য-কারণ সম্বন্ধে জানা গেলে পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে গ্রহান্তরে যাওয়াটা মানুষের পক্ষে ঢের সহজসাধ্য হয়ে উঠবে। এমন উপাদান দিয়ে স্পেস্ শিপ বা মহাব্যোম-যান তৈরী করা সম্ভব হবে, যে উপাদানে তথাকথিত গ্র্যাভিটন নেই অথবা খুব কম পরিমাপে আছে—যার ফলে সেই মহাব্যোম-যানের উপর পৃথিবীর টান বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

ইলেকট্রো-গ্র্যাভিটেশন্যাল শক্তির কার্য-কারণগুলি মোটেই অনুমানমূলক নয়। সে জন্যেই এ-ক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে শীঘ্রই যথাযথ ফল পাওয়া যাবে বলে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

ব্রঙ্কাইটিস সম্পর্কে দু-একটি কথা

ব্রঙ্কাইটিস সম্পর্কে ডাঃ উইলিয়াম টমসন লিখেছেন—ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের কারণ এবং চিকিৎসা সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডে যে ব্যাপক গবেষণা চলেছে, তার একটা বড় রকমের কারণ আছে। যক্ষ্মা এবং ফুসফুসের ক্যান্সার একত্রে যে পরিমাণ লোকের মৃত্যু ঘটায়, ব্রঙ্কাইটিস তার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক লোকের মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে।

অসুস্থ ভাতা, চিকিৎসা এবং উৎপাদন হ্রাসের দিক দিয়ে ইংল্যাণ্ডের যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, তার পরিমাণ হলো বছরে ৬০,০০০,০০০ পাউণ্ড। গবেষণার কারণও হলো এই। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা হয়তো কখনও সম্ভব হবে না; কিন্তু ভেষজের সাহায্যে এই রোগের তীব্রতা দমনের চেষ্টা প্রতি বছরই চলতে থাকবে।

এই রোগের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায় দূরবর্তী অঞ্চলে; যেমন—সিংহল, ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া এবং জাপান প্রভৃতি দেশে। এ-থেকে মনে হয়, জলবায়ুই এই রোগের একমাত্র কারণ নয়। ইংল্যাণ্ডের আশেপাশের দেশগুলির আবহাওয়ার অবস্থা একরকমের হলেও ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের তীব্রতা অনেক কম। তাছাড়া এসব দেশে খুব কম লোকই এই রোগে ভোগে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডেনমার্কের লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র পাঁচ বা সাতজন এই রোগে আক্রান্ত হয়, অথচ বৃটেনে এই রোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা হলো লক্ষের মধ্যে ৬৩ জন।

এ-থেকে বোঝা যায়, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের একটা বড় রকমের কারণ হলো দূষিত বায়ু—দূষিত আবহাওয়া। কথাটা যে সত্য তার প্রমাণ এই যে, ইংল্যাণ্ডের সহরগুলিতে ৬৩ জন লোক এই রোগে আক্রান্ত হলে গ্রামাঞ্চলে আক্রান্ত হয় মাত্র ৪২ জন।

ইংল্যাণ্ডের শ্রমশিল্পের এলাকাগুলির আবহাওয়া কিরূপ দূষিত তা একটা কথা থেকেই বোঝা যাবে—প্রতি বছর এই সব এলাকায় কয়লা এবং তেল থেকে ২,০০০,০০০ টন ধোঁয়া এবং ৫,০০০,০০০ টন গন্ধকযুক্ত বাষ্প বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। এই ধোঁয়া এবং বাষ্পের পরিমাণ যদি কম করা যায়, তাহলে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের আক্রমণও অনেক কম হবে। গভর্ণমেণ্ট এ-সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। পার্লামেণ্ট সম্প্রতি 'ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট' নামে একটি আইন পাশ হয়েছে, যার ফলাফল হয়তো আমরা শীঘ্রই বুঝতে পারবো। সে জন্যে মনে হয়, যে সব দেশ দ্রুত শিল্পায়নে উদ্যোগী হয়েছে, তাদের পক্ষে এখন উচিত হবে নূতন শ্রমশিল্পগুলি যাতে এই মারাত্মক ধোঁয়া এবং বাষ্পের দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ুকে দূষিত না করে—প্রথম থেকে তার দিকে দৃষ্টি রাখা।

আরও একটা কথা হলো এই যে, শৈশব এবং কৈশোরে সর্দি-কাশির উপযুক্ত চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। সর্দি-কাশির ব্যাপারটা সাধারণত সকলেই অবহেলা করতে চায়; কিন্তু তার ফলে ফুসফুসের একটা স্থায়ী ক্ষতি হয় এবং এই ক্ষতির ফলেই পরবর্তী জীবনে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস দেখা দেয়।

এই ধরণের প্রতিষেধক ব্যবস্থা ছাড়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান পর্যন্ত ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস সারাবার কোন ব্যবস্থাই করতে পারে নি। তবে যে কাশি কষ্টের সবচেয়ে বড় কারণ, নানাভাবে সেই কাশির কিছুটা উপশম করবার চেষ্টা হয়েছে। এই কাশির জন্যে দায়ী দুটি জিনিষ। একটি হলো ঘন শ্লেষ্মা যা কণ্ঠনালীর পথ রুদ্ধ করে। অপরটির হলো, কণ্ঠনালীর পেশীগুলির আক্ষেপ বা স্প্যাজম্ যা কণ্ঠনালীকে যথাযথ কাজ করতে দেয় না। তার ফলে

অতিরিক্ত শ্লেষ্মা, যা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের জন্যে ফুস্‌ফুসে এসে জমে, সেগুলি বেরিয়ে আসার পথ পায় না।

এই শ্লেষ্মা তরল করবার জন্যে এবং পেশীসমূহের আক্ষেপ হ্রাস করবার উদ্দেশ্যে কয়েক রকমের ভেষজ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু যেখানে গেলে এই ভেষজগুলি কাজ করবে (একেবারে ফুস্‌ফুসের গভীরে) সেখানে তা প্রবেশ করানো কঠিন। একটি ভেষজ প্রস্তুতকারক বৃটিশ কোম্পানী (বেঙ্গার্স লেবরেটরিজ লিমিটেড) সেগুলি থেকে তুটি ভেষজ এমন ভাবে প্রস্তুত করেছেন, যাতে সেগুলিকে সরাসরি ফুস্‌ফুসে প্রেরণ করা সম্ভব হয়। কোম্পানীর গবেষণা-কর্মীরা এই তুটি ভেষজ —chymotrypsin ও isoprenaline—অতি সূক্ষ্মরূপে প্রস্তুত করতে পেরেছেন; এত সূক্ষ্ম যে, এর প্রতিটি কণা প্রসাধনে ব্যবহৃত পাউডারের কণার চেয়েও ৫০০ গুণ ছোট।

সেই সঙ্গে তাঁরা ডিস্‌পার্জার নামে একটি বিশেষ ধরণের ইন্‌হেলার বা শ্বাসগ্রহণ যন্ত্র নির্মাণ করেছেন। যন্ত্রটি ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে কণা নিক্ষেপ করতে পারে। একে পকেটে বহন করা যায় এবং রোগী তা নিজের ঘরে বসে সহজেই ব্যবহার করতে পারে। এই যন্ত্রটিই ভেষজ তুটিকে সরাসরি ফুস্‌ফুসে প্রেরণ করতে সাহায্য করে।

গত শীতকালে এই নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ হয়; পরীক্ষার ফলে জানা গেছে, প্রতি দশজন রোগীর মধ্যে অন্ততঃ সাতজন আরাম বোধ করে।

অবশ্য এই নতুন পদ্ধতি রোগ নিরাময়ের কোন পথের সন্ধান দেয় নি। তবে স্পষ্টই বোঝা গেছে, যে চিকিৎসা এখন চলছে তা অনেক সহজ হবে, রোগের কষ্ট যদি এই ভাবে উপশম করা যায়। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের রোগীর এই কষ্টই সবচেয়ে বড় কথা। যাহোক, গবেষণা-কর্মীদের এখন লক্ষ্য হলো, রোগ প্রতিরোধের উপায় সন্ধান করা।

জাতির স্বাস্থ্য-গঠনে অধিক পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজন

এই সম্পর্কে ডাঃ রাধা করনাদ লিখিয়াছেন—বর্তমানে ভারতবাসীর স্বাস্থ্য, বিশেষতঃ শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টির অভাবে খুবই খারাপ। ইহার কারণ অনেক; যথা—জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার অভাব; পরিমাণ ও উৎকর্ষ, উভয় দিক দিয়া দেশের খাদ্যের ঘাট্‌তি; প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধি; ভেজাল দেওয়ার জন্য খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতা হ্রাস। যাহা হউক, আমরা ক্রমশঃ খাদ্যের পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিতেছি।

বর্তমানে খাদ্যের পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে যে নূতন তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, যে খাদ্যদ্রব্য এবং জনগণের স্বাস্থ্য ও তাহার গঠন, তাহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধক শক্তি ও দীর্ঘজীবনের মধ্যে একটা নিশ্চিত সম্পর্ক রহিয়াছে। বর্তমান সময়ে আমাদের দৈনন্দিন কাজের উপযোগী শক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালোরি পাইবার মত পর্যাপ্ত তণ্ডুলজাতীয় দ্রব্য এদেশে উৎপন্ন হয় না। এক সময়ে আমরা এইসব দ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলাম। তখন এদেশে শাকসব্‌জি, ফল ও তুধের অভাব ছিল না। আমাদের জীবন-ধারণের পূর্ববর্তী মাসে কি ফিরিয়া যাওয়ার সময় নাই? কেন আমরা স্বাস্থ্যবান ও সবল জাতি গঠনের পরিকল্পনা করিব না এবং কেন আমরা আশা করিব না যে, এদেশে পুনরায় প্রচুর দুগ্ধ ও মধু পাওয়া যাইবে? চীনদেশে একটি প্রবাদ আছে —যদি তুমি এক বৎসরের জন্য পরিকল্পনা করিতে চাও, তবে ধান রোপণ কর; যদি তুমি দশ বৎসরের জন্য পরিকল্পনা করিতে চাও, তবে বৃক্ষ রোপণ

কর, আর যদি একশত বৎসরের জন্য পরিকল্পনা করিতে চাও তবে মানুষ রোপণ কর। কাজেই সুস্থ-সবল নরনারীর জাতি গঠন করিতে হইলে খাদ্যোন্নয়নের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে।

আমরা প্রত্যেকে নানাভাবে খাদ্যের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করিতে পারি এবং শুধু আমাদের প্রধান খাদ্যের নয়, আমাদের স্বাস্থ্য গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় রোগ-প্রতিরোধক খাদ্যেরও ঘাটতি পূরণ করিতে পারি। আমাদের নূতন ভূমিসংস্কার ব্যবস্থায় সহযোগিতা, চাষের আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন এবং উত্তম সার ও বীজ ব্যবহার করিয়া অধিক খাদ্যোৎপাদন করা প্রয়োজন। এদেশে আমাদের প্রয়োজনীয় তণ্ডুলজাতীয় দ্রব্য, দুধ, শাক-সব্জি, ফল ও অন্যান্য রোগ-প্রতিরোধক খাদ্য উৎপাদনকে জরুরী মনে করিয়া খাদ্যের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা উচিত।

রোগ-প্রতিরোধক আহার্য বস্তু ছাড়া আমাদের খাদ্য সম্পূর্ণ হয় না। উত্তম স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সুসমঞ্জস খাদ্যের পক্ষে যে সকল আহার্য বস্তুর প্রয়োজন, সেগুলির মধ্যে তণ্ডুলজাতীয় দ্রব্য অন্যতম। অন্যান্য আহার্য বস্তু হইল বিভিন্ন প্রকার ডাল, দুধ, ডিম, মুরগী প্রভৃতি প্রোটিন জাতীয় দ্রব্য এবং ভিটামিন (খাদ্যপ্রাণ) ও খনিজ দ্রব্যযুক্ত টাট্কা সব্জি ও জল।

জনগণের, বিশেষতঃ শিশু ও গর্ভবতী নারীদের মধ্যে অপুষ্টিজনিত নানাপ্রকার রোগ দেখা যায়। খাদ্যে "ক" খাদ্যপ্রাণের অভাবের দরুণ সাধারণতঃ রাতকানা ও চোখের অন্যান্য কয়েকটি রোগের আক্রমণ ঘটে। এই সকল রোগের জন্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তি কম আলোতে বা অন্ধকারে ঠিকমত দেখিতে পায় না। 'ক' খাদ্যপ্রাণ ব্যবহারের পর তাহারা পুনরায় স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পায়।

টাট্কা সবুজ পত্রযুক্ত সব্জি প্রভৃতি অধিক ক্যারোটিনযুক্ত, খাদ্যে 'ক' খাদ্যপ্রাণ বেশী পরিমাণে থাকে। হলদে ও কমলা লেবুর রঙের সব্জি এবং ফলেও 'ক' খাদ্যপ্রাণ থাকে। এই সকল দ্রব্য হইল কুমড়া, টোম্যাটো, গাজর, পেঁপে, আম, কুল, ডিমের কুসুম, হাঙ্গরের যকৃতের তৈল প্রভৃতি। সবুজ ঘাসে পুষ্ট গাভীর দুধ প্রভৃতি জৈব খাদ্যে স্বভাবজ 'ক' খাদ্যপ্রাণ থাকে।

শরীরে 'খ' খাদ্যপ্রাণ হ্রাস পাওয়ার খুব স্পষ্ট লক্ষণ হইল—মুখ ও জিহ্বায় ঘা, মুখের কোণ ক্ষয় হইয়া যাওয়া—যাহা খ-১ ও খ-২ খাদ্যপ্রাণের অভাবযুক্ত কলে-ছাঁটা চাউলভোজী শিশুদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় এবং তাছাড়াও শুষ্ক ও অমসৃণ ত্বক। দুধ, টাট্কা সব্জি, ফল প্রভৃতি রোগ-প্রতিরোধক খাদ্য বাদ দিয়া কলে-ছাঁটা চাউল, অতিমাত্রায় পরিষ্কৃত ময়দা প্রভৃতি খাদ্য খাইবার ফলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

আমরা সভ্য হইয়া সব্জি ও ফলের খোসা খুব বেশী পরিমাণে বাদ দিই। তাহার ফলে ফলের পাশে যে খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ দ্রব্য থাকে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। খাদ্যের 'খ' খাদ্যপ্রাণ রক্ষার সর্বোত্তম উপায় হইল, খুব বেশী না ছাঁটা চাউল বা আতপ চাউল যতটা সম্ভব কম জলে জলীয় বাষ্পের সাহায্যে রান্না করা। গৃহিণীদের এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, সবুজ আহার্য বস্তু যতটা সম্ভব কম জলে বা বাষ্পে সিদ্ধ বা রান্না করিতে হইবে। রন্ধন পাত্র ঢাকা থাকিবে। তাহাতে 'খ' ও 'গ' খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হইবে না। বেকিং সোডা ব্যবহার করিলে সবুজ সব্জির সব খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হইয়া যায়। সকল সময়ে গোলআলুর খোসা না ছাড়াইয়া রান্না করাই সমীচীন।

'গ' খাদ্যপ্রাণ ঘাট্তির একটা খুব সাধারণ লক্ষণ হইল, মাড়ী হইতে রক্ত পড়া—যাহা স্কার্ভি নামে পরিচিত। 'গ' খাদ্যপ্রাণের ঘাট্তি পূরণের জন্য খাদ্যের সহিত টাট্কা ফল ও পত্রযুক্ত সব্জি খাওয়া দরকার। ভারতে যে আমলা ফল পাওয়া যায় তাহাতে খুব বেশী পরিমাণে 'গ' খাদ্যপ্রাণ

থাকে এবং উহার মূল্যও খুব কম। লবণযুক্ত আমলায় 'গ' ভিটামিন অক্ষুণ্ণ থাকে। মরশুমের সময় কমলা লেবু, বাতাবী লেবু প্রভৃতি ফল কাহারও পক্ষে কিছু কিছু খাওয়া অসম্ভব নয়। দৈনন্দিন খাদ্যের সহিত স্যালাড খাওয়ার ব্যবস্থা রাখিলে 'গ' খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটিবে না। স্যালাড নানারকমের হইতে পারে। গাজর, বাঁধাকপি, টোম্যাটো, শশা, বীট, মূলা ও লেটুস শাক মিশাইয়া স্যালাড তৈয়ারী করা যায়। শশা বা মূলার টুক্‌রা দৈ-এর সঙ্গে মিশাইয়াও স্যালাড তৈয়ারী হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, দৈনিক স্যালাড গ্রহণ করিলে ডাক্তার ডাকিতে হয় না, অর্থাৎ রোগ আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

খাদ্যে 'ঘ' খাদ্যপ্রাণের ঘাট্‌তি ঘটিলে, বিশেষতঃ শিশুদের মধ্যে রিকেট (অস্থি-র অপুষ্টিজনিত শীর্ণতা) দেখা দেয়। হাড় পুষ্ট হয় না, বিকৃত হয়। 'ঘ' খাদ্যপ্রাণ গ্রহণ করিলে এই শীর্ণতা দূর হয়। মাছের যকৃতের তেল ও ডিমের হল্‌দে অংশে 'ঘ' খাদ্যপ্রাণ থাকে। 'ঘ' খাদ্যপ্রাণ পাইবার সবচেয়ে কম দামী জিনিষ হইল সূর্যালোক। যে সকল শিশু অন্ধকার ঘরে বাস করে এবং যাহাদের খাদ্যে 'ঘ' খাদ্যপ্রাণ ও ক্যালসিয়ামের অভাব থাকে, তাহাদের রিকেট দেখা যায়। কড্‌লিভার অয়েল ও প্রাতঃকালীন সূর্যকিরণের আল্‌ট্রাভায়োলেট রশ্মি গায়ে লাগাইলে 'ঘ' খাদ্যপ্রাণের ঘাট্‌তি অনেকটা পূরণ হয়। গর্ভবতী নারী ক্যালসিয়াম এবং 'ক' ও 'খ' খাদ্যপ্রাণযুক্ত আহার্য-বস্তুর সহিত সুসমঞ্জস খাদ্যগ্রহণ করিলে শিশুর স্বাস্থ্য ভাল হয়।

এই দেশের শিশুদের মধ্যে যে সব প্রধান ব্যাধি দেখা যায়, তন্মধ্যে অন্যতম হইল প্রোটিনের ঘাট্‌তিজনিত অপুষ্টি। এই রোগের প্রথম লক্ষণগুলি হইল দুর্বলতা, ওজন হ্রাস, ত্বকের অমসৃণতা এবং চুলের বর্ণ লোপ। এই রোগের প্রতিকারের জন্য রোগীকে সহজপাচ্য খাদ্যের মধ্য দিয়া প্রোটিন দিতে হইবে। মাখন-তোলা দুধ তাহাদের পক্ষে উত্তম।

ইহা সত্য যে, অপুষ্ট শিশুর জননীর মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য কিনিবার সামর্থ্য নাই। দুধের ঘাট্‌তির সময় শিশুদিগকে সুজি, কাঞ্জি ও মাখন-তোলা দুধের গুঁড়া দিয়া প্রস্তুত দুধ খাওয়ান যাইতে পারে। তাহাদিগকে অর্ধসিদ্ধ ডিম ও অঙ্কুরযুক্ত ডাল খাইতে দিলেও ক্ষতি হইবে না। উপকূল অঞ্চলে মাছ হইতে সস্তায় প্রোটিন পাওয়া যায়। মহীশূরের খাদ্য গবেষণাগারে অনেক রকম শিশু-খাদ্য তৈয়ার করা হইতেছে।

দুই হইতে পাঁচ বৎসরের শিশুদের মধ্যে প্রোটিনের ঘাট্‌তিজনিত অপুষ্টি দেখা যায়। ইহাদিগকে সব্‌জিজাত প্রোটিন খাইতে দিলে উপকার হইবে। স্নেহপদার্থবিহীন চীনাবাদামের গুঁড়া, সিদ্ধ বাংলা ছোলা প্রভৃতি কাঁচা উপকরণ হইতে এক রকমের কমদামী প্রোটিন পরিপূরক প্রতি আউন্স তিন নয়া পয়সা মূল্যে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রোটিনের ঘাট্‌তি অন্ততঃ কিছুটা পূরণ হইতে পারে। ইহা ভারতীয়দের রুচি ও অভ্যাসের উপযোগী। দৈনন্দিন আহার্যের সঙ্গে ইহা ব্যবহার করা যায়।

বেশী পরিমাণ পুষ্টি পাইতে হইলে এদেশে যে সমস্ত আহার্য-দ্রব্য পাওয়া যায়, সেগুলির সদ্ব্যবহার করিতে হইবে এবং এমনভাবে সেগুলিকে রান্না করিতে হইবে, যাহাতে সেই সকল দ্রব্যের উৎকর্ষ নষ্ট হইয়া না যায়।

এদেশের শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে এবং শিশু-মৃত্যুর হার কমাইতে হইলে আমাদিগকে একই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারসমূহ স্বাস্থ্যোন্নয়ন-কেন্দ্র এবং প্রসূতি ও শিশুকল্যাণ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পল্লী ও সহরাঞ্চলে চিকিৎসার সুবিধার জন্য কয়েকটি পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করিতেছেন।

এই কেন্দ্রগুলি ভাবীকালে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

এই সকল কেন্দ্রে শুধু যে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইবে তাহা নহে, জননীদিগকে (যাহারা সাধারণতঃ অজ্ঞ) স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হইবে। চার্ট, বক্তৃতা, ল্যাণ্টার্ণ স্লাইড প্রভৃতির সাহায্যে রোগ প্রতিরোধের উপায়, শিশুদিগকে খাওয়াইবার পদ্ধতি নির্দেশ, কোন্ কোন্ জিনিষে প্রোটিন ও খাদ্যপ্রাণ থাকে এবং শিশুদের পুষ্টি-রক্ষার পক্ষে সেগুলির কতখানি মূল্য—এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

শিশু ও প্রসূতি যাহাতে পুষ্টির অভাবজনিত রোগের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে কিছুটা সুবিধা দিবার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারসমূহ কয়েকটি সুব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। শিশু ও প্রসূতি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে স্কুলে যাইবার বয়স ও তদপেক্ষা কম বয়সের শিশু, গর্ভবতী নারী ও সন্তানবতী নারীদিগকে মাখন-তোলা দুধ, সব্জিজাত প্রোটিন, মাল্টি ভিটামিন বটিকা, লৌহ ও ক্যালসিয়ামঘটিত খাদ্য এবং ঔষধ বণ্টন করা হয়। এই সকল উপায় ছাড়া অন্য কোনভাবে পুষ্টির অভাব পূরণের উপায় নাই।

যাহারা সহজে রোগাক্রান্ত হয়, তাহাদের মধ্যে শিশুদের সংখ্যাই বেশী। সেই জন্য যতটা সম্ভব ব্যাপক অঞ্চলের বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। এই জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারদের তৈয়ারী খাদ্য-তালিকার সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকার মধ্যে সবুজ ও হলদে রঙের সব্জি (গাজর ইত্যাদি), পেঁপে, কলা, পেয়ারা প্রভৃতি ফল এবং মাছ, দুধ, ডিম প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া সেগুলি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে মধ্যাহ্ন-কালীন আহারের সময় পরিবেশন করিলে তাহারা সুসমঞ্জস খাদ্য পাইবে। ইহাতে ছাত্রগণ খাদ্য-পুষ্টি সম্পর্কে শিক্ষা পাইবে এবং তাহাদের মধ্যে আহারকালীন ভব্যতা ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস সৃষ্টি হইবে।

পরিপূরক খাদ্য সরবরাহের কর্মসূচী দেশের মধ্যে সম্প্রসারিত করিতে হইলে বিভিন্ন রাজ্যের পুষ্টিরক্ষা সম্পর্কিত বিভাগের সম্প্রসারণ করিতে হইবে। উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করিয়া জোর প্রচারকার্য চালাইতে হইবে। কিভাবে খাদ্যপ্রাণ নষ্ট না করিয়া আহার্য বস্তু রান্না করিতে হয়, তাহা দেখাইতে হইবে। শিল্প ও পল্লী অঞ্চল, বিভিন্ন শিক্ষালয় ও ছাত্রাবাসে প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া সুসমঞ্জস খাদ্য প্রস্তুতের সূত্রগুলি, নির্দোষিতা রক্ষা প্রণালী প্রভৃতি বিষয় জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে।

নাই, অথচ আছে

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ

যদি আপনাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে, আপনার পকেটে টাকা আছে? যদি থাকে, তাহা হইলে আপনি বলিবেন, আছে। যদি না থাকে, তাহা হইলে আপনি বলিবেন, নাই। আবার যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, আপনার দাদা বাড়ী আছেন? যদি থাকেন তাহা হইলে আপনি বলিবেন, আছেন। না থাকিলে বলিবেন—না, নাই। কোন কিছু হয় আছে, না হয় নাই। কিন্তু এমন ব্যাপারও হয়, যেখানে ঠিক এমনি করিয়া আছে বা নাই বলা যায় না। কথাটা একটু বিস্তৃতভাবে বলাই ভাল।

আমরা জানি 1, 2, 3, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{7}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt{7}$, প্রভৃতি নানাপ্রকার সংখ্যা আছে। এই সংখ্যাগুলির বর্গ, অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলির যে কোনটিকে যদি সেই সংখ্যা দিয়া গুণ করা যায়, তাহা হইলে সেই গুণফল একটি ধন (positive) সংখ্যা হইবে। আবার $-1, -2, -\frac{5}{7}$, প্রভৃতি ঋণ (negative) সংখ্যার বর্গও এক একটি ধন সংখ্যা। সুতরাং এমন কোন সংখ্যা নাই, যাহার বর্গ ঋণ। অথচ এইরূপ সংখ্যা না হইলে আমাদের চলে না। নাই, অথচ না হইলে চলে না—কথাটা একটু বিসদৃশ মনে হইতেছে না? কাজেই এই সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা প্রয়োজন।

এক শ্রেণীর সংখ্যা আছে, যেগুলিকে সংখ্যাযুগ্ম (number-pair) বলে। এগুলি জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহৃত হয়। ইয়ারিং, জুতা প্রভৃতি যেমন জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহৃত হয়, তেমনি এই সংখ্যাগুলিও জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহৃত হয়। যেমন, (1, 2), (4, −3), (3, −√3), (0, −4) ইত্যাদি। সাধারণভাবে এইগুলিকে (a, b), (c, d), (x, y) ইত্যাদি রূপে লেখা যাইতে পারে।

সাধারণ সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ সম্বন্ধে যেমন নিয়ম আছে, তেমনি এই সকল সংখ্যাযুগ্মেরও যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। নিয়মগুলি এই—

যোগ : $(a, b)+(c, d) = (a+c, b+d)$

বিয়োগ : $(a, b)-(c, d) = (a-c, b-d)$

গুণ : $(a, b)\times(c, d) = (ac-bd, ad+bc)$

ভাগ : $(a, b)\div(c, d) = \left(\frac{ac+bd}{c^2+d^2}, \frac{bc-ad}{c^2+d^2}\right)$

প্রকৃতপক্ষে দুইটি নিয়ম হইলেই চলে। কারণ, বিয়োগের নিয়ম যোগের নিয়ম হইতে পাওয়া যায় এবং ভাগের নিয়ম গুণের নিয়ম হইতেই পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত সংখ্যাযুগ্মকে একটু অন্য প্রকারেও লেখা হইয়া থাকে। যেমন (a, b)-এর পরিবর্তে a+ib। এখানে i একটি কল্পিত সংখ্যা। এতদনুসারে উক্ত নিয়মগুলি নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশ করা যায়—

$$(a+ib)+(c+id) = (a+c)+i\,(b+d)$$

$$(a+ib)-(c+id) = (a-c)+i\,(b-d)$$

$$(a+ib)\times(c+id) = (ac-bd)+i\,(ad+bc)$$

$$(a+ib)\div(c+id) = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + i\,\frac{bc-ad}{c^2+d^2}$$

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, একটি সংখ্যাযুগ্মকে দুই পাশে ব্রাকেট দিয়া এবং মধ্যে একটি কমা দিয়া (a,b)—এইরূপে যেমন লেখা যায়, তেমনি ইহাকে a+ib—এইরূপেও লেখা যায়। আরো একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, (a,b) সংখ্যাযুগ্ম এবং (b,a) সংখ্যাযুগ্ম এক নহে। সংখ্যাযুগ্মের সংখ্যা দুইটিকে উল্টা করিয়া লেখা যায় না। (a,b) এবং (b,a) সংখ্যাযুগ্ম দুইটি পৃথক। এই সংখ্যাযুগ্মকে জটিল

সংখ্যা (Complex number) নামেও অভিহিত করা হয়।

এখন এই জটিল সংখ্যা সহযোগে একটি সামান্য গুণের আঁক কষা যাক। উদাহরণস্বরূপ মনে করা যাক,

$$a=0, b=1, c=0, d=1.$$

তাহা হইলে $(a+ib) \times (c+id)$

$$=(ac-bd)+i(ad+bc)$$

হইতে $(o+i) \times (o+i)=(o-i)+i.o.$

এখন, শূণ্যগুলিকে বাদ দিলে,

$$i \times i=-1$$

অথবা $i^2=-1$

সুতরাং যে কল্পিত সংখ্যাটি সংখ্যাযুগের সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ i, সে সংখ্যাটি এমন যে, তাহার বর্গ হইতেছে একটি ঋণ সংখ্যা -1. i-কে কল্পিত (imaginary) সংখ্যা বলা হয়।

কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এমন কোন সংখ্যা নাই যার বর্গ ঋণ সংখ্যা। তাহা হইলে বলিতে হয় i নাই। কিন্তু i না হইলে যে আমাদের চলে না। গণিত হইতে i বাদ দিলে জগতের সমস্ত উচ্চ গণিত ধূলায় মিশিয়া যাইবে, সমস্ত বিজ্ঞান নস্যাৎ হইয়া যাইবে। কল চলিবে না, আলো জ্বলিবে না, ট্রেন চলিবে না, এরোপ্লেন উড়িবে না, জাহাজ চলিবে না।

এখন আপনারা কি বলেন? i নামক উক্ত প্রকার একটি সংখ্যা আছে, না, নাই? গণিতে বলে, নাই; অথচ আছে।

ধূলিকণা

শ্রীনিখিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

যতই ঘষুন আর যতই মুছুন—ঘটিবাটি, টেবিল-চেয়ার থেকে বাক্স-প্যাটরা, জামাকাপড় ইত্যাদি সব কিছুর উপরেই ধূলির আস্তরণ। রেহাই নেই ধূলিকণার আক্রমণ থেকে।

পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় বস্তুই ধূলিকণায় রূপান্তরিত হয়। তখন কোন্‌টি যে কোন্ বস্তু থেকে উদ্ভূত তা সহজে ধরবার উপায় থাকে না। তবে এগুলি সবই বিরক্তিকর; বিশেষতঃ কয়েক রকমের ধূলিকণা খুবই ক্ষতিকর। কাঠের কল, আটা-ময়দার কল, কয়লাখনি প্রভৃতি স্থানে ঐ সব পদার্থের সূক্ষ্ম কণিকাগুলি জমা হতে পারলে সামান্য একটু অগ্নিকণার সংস্পর্শে সর্ববিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হতে পারে। জ্বলন সুরু হলেই এই ধূলিকণাগুলি অতি দ্রুত সেখানকার বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটায়।

মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করতে ধূলিকণার মত অপ্রতিরোধ্য শত্রু আর নেই। খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের ফুস্‌ফুসে ধাতব পদার্থের ধূলি সঞ্চিত হয়ে সিলিকোসিস্ এবং সূতাকলের শ্রমিকদের ফাইব্রোসিস্ নামক দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি করে। ধূলিকণাবাহী বায়ু নানারকম রোগের জীবাণু ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। রোগী থুথু ফেললো পথের উপর—তাতে থাকে লক্ষ লক্ষ জীবাণু। পায়ে পায়ে মাড়িয়ে গেল—ধূলিমিশ্রিত হলো, সূর্যতাপে শুষ্ক হয়ে হাল্‌কা হলো। বায়ু নিয়ে চললো উড়িয়ে—দিগ্বিজয়ে বের হলো জীবাণু। নিশ্বাসে বা কথা বলবার ফাঁকে কখন যে তারা প্রবেশ করে বসবে, কে জানে! ফুস্‌ফুসে এই ভাবে মলমূত্র, আবর্জনা থেকে জাত জীবাণু লোকালয় সন্নিহিত বায়ুমণ্ডলকে প্রতিনিয়তই দূষিত করছে।

ধূলিকণা কেবল যে অনিষ্টসাধনই করে, তা নয়। ধূলিকণা আছে বলেই আকাশ নীল। ধূলিকণা আছে বলেই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আকাশে এত মনোরম বর্ণ বৈচিত্র্য। ধূলিকণা আছে বলেই বৃষ্টি-ধারা নেমে আসে ভূ-পৃষ্ঠে। কারণ বায়ুবাহিত জলীয় বাষ্প যাদের আশ্রয় করে জমে ওঠে, তারা প্রধানতঃ ধূলিকণা, সমুদ্র-তরঙ্গজাত লবণ-কণিকা আর তড়িৎগর্ভ অণু-পরমাণু।

ধূলার বড় বড় কণাগুলি খালি চোখে দেখা যায়। কিন্তু উর্ধ্বাকাশে বায়ুমণ্ডলে যে কণাগুলি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, সেগুলি এত ক্ষুদ্র যে, অণু-বীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া ধরা পড়ে না। একটি অন্ধকার ঘরে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে সূর্যালোক প্রবেশ করলে বড় কণাগুলির বিচিত্র খেলা প্রত্যক্ষ করা যায়। সেগুলি অনবরত হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় এবং পরস্পরকে ধাক্কা দেয়। আর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে বড় বড় কণাগুলি নিকটস্থ বস্তুর উপর জমা হয়ে থাকে।

ধূলিকণার পরিমাণ সব জায়গায় সমান নয়। সমুদ্র বা উঁচু পাহাড় অঞ্চলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থানে ধূলিকণার সংখ্যা যত, ভূপৃষ্ঠের সমতল অঞ্চলে ঐ সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশী। শিল্পাঞ্চল বা বড় বড় সহরের এক ঘনসেণ্টিমিটার স্থানে ৫,০০০,০০০ বা তারও বেশী ধূলিকণা পাওয়া যায়। কাজেই কলকারখানার চিম্‌নী থেকে যে কি বিপুল পরিমাণ ধূলিকণা বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

ধূলিকণাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়—(১) উল্কাপিণ্ডের ক্ষয়জাত কণা, (২) সমুদ্র থেকে লবণ-কণা, (৩) আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত কণা এবং (৪) মাটির কণা।

(১) অন্ধকার রাতে হাউইয়ের মত তারা ছুটতে দেখা যায়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল প্রতিদিনই এরূপ লক্ষ লক্ষ উল্কার দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু বাতাসের সঙ্গে প্রবল ঘর্ষণে উল্কার দেহ গ্যাস ও ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যায়। এ-পর্যন্ত যে কয়টি বৃহৎ আকৃতির উল্কা পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করেছে, সেগুলি সবাই পৃথিবীর অতি বিরলবসতি অঞ্চলেই পড়েছে। বড় সহর অঞ্চলে পড়লে কি ভীষণ ধ্বংসকাণ্ডই না সংঘটিত হতো! এদের গতিপথ এতই অনিয়মিত যে, কখন এবং কোথায় এসে পড়বে, তা আগে থেকে ঠিক করে কিছুই বলা যায় না। তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে, এদের অধিকাংশই পৃথিবী-পৃষ্ঠে পৌঁছাবার আগেই বায়ুমণ্ডলের বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

উল্কাপিণ্ডের ক্ষয়জাত ধূলিকণার পরিমাণ বার্ষিক ১০০০,০০০ টন। পৃথিবীর বয়সকে এই সংখ্যার দ্বারা গুণ করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তা কল্পনাকেও হার মানায়। পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে এই জাতীয় একটি মতবাদও আছে। আমাদের এই সূর্যেরই এক পূর্বপুরুষ ধ্বংস হয়ে যাবার পর তার দেহের ধূলিকণা সঞ্চিত হয়েই নাকি আমাদের এই পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছিল।

(২) প্রবল বায়ু সমুদ্র থেকে লবণ কণা বহন করে আনে। সমুদ্র থেকে বহু দূর-দূরান্তেও ধূলি-কণার সঙ্গে লবণ-কণিকার অস্তিত্ব দেখা যায়। তবে সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলেই লবণ-কণার পরিমাণ বেশী। অনেকেরই সমুদ্রতীরে ভ্রমণের অভি-জ্ঞতা আছে। ঠোঁট লবণাক্ত হয় এবং গাত্রবর্ণ ঘোর হয়ে যায়। সেখানে কম্পিত দীপশিখা থেকে হলুদ আভা বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায়—যা লবণ-কণার ক্ষারীয় অংশের দহনকার্যের ফল।

(৩) আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে উৎক্ষিপ্ত পদার্থসমূহ পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে বহু উপরে উঠে যায়। সেখানকার তীব্র বায়ুপ্রবাহ ধূলিকণাগুলিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। মোটা দানা-গুলি আগ্নেয়গিরির চতুর্দিকে পতিত হয়ে মোচাকৃতি পাহাড়ের সৃষ্টি করে। কিন্তু সূক্ষ্ম কণাগুলি দীর্ঘকাল বায়ুমণ্ডলে ভেসে বহু দূর দেশে নীত হয়।

১৮৮৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয়ার অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে বিপুল পরিমাণ ধূলিরাশি ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, সেগুলি পৃথিবীকে কয়েকবার আবর্তন করবার পর ক্রমশঃ ধরাশায়ী হয়। ঘটনার পনেরো দিনের মধ্যে গোটা পৃথিবী ধূলির আস্তরণে আবৃত হয়ে পড়েছিল। এই ধূলির আস্তরণ সম্পূর্ণভাবে কেটে যেতে সময় লেগেছিল প্রায় তিন বছর। উদ্গীরণের চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে দশ মাইলব্যাপী অঞ্চলে ধূলি জমেছিল প্রায় পঞ্চাশ ইঞ্চি। এমন কি, আটশত মাইল দূরবর্তী স্থানেও দুই ইঞ্চি পরিমাণ ধূলি জমেছিল। উত্তর আমেরিকার ওক্লাহোমা ও কান্সাস অঞ্চলে আগ্নেয়গিরির ধূলি জমে আছে প্রায় কুড়ি ফুট ঘন হয়ে। অথচ আশ্চর্য এই যে, এই অঞ্চলের একশত মাইলের মধ্যেও কোন আগ্নেয়গিরি এখনও নেই, পূর্বেও ছিল না।

(৪) ছোট ছোট পদার্থকে প্রবহমান বাতাসের ধাক্কায় গড়িয়ে যেতে দেখা যায়। মরুভূমি অঞ্চলে প্রবল বায়ুতাড়িত বালির পাহাড়ের অনবরত ভাঙ্গা-গড়া চলছে। এই অঞ্চলের বালির দানাগুলি বড় বড়। কাজেই বাতাসের উচ্চস্তরে এদের ঠাঁই নেই। সূক্ষ্ম কণাগুলিই বায়ুস্তরে দীর্ঘকাল ভেসে বেড়াতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত ধূলিকণা উচ্চ স্তরের বায়ুস্রোতে পৌঁছাতে না পারে ততক্ষণ তাদের পৃথিবী পরিক্রমার সুযোগ নেই। ভূপৃষ্ঠের বায়ুবলয়ে বায়ুর গতি বিভিন্ন রকমের। ধূলিকণার গতিও তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং মাটির বুকে ফিরে আসবার সুযোগ থাকে বেশী।

বায়ুবেগে কোথাকার ধূলা যে কোথায় যায়—সে এক বিচিত্র কাণ্ড! ১৯১৮ সালের এক সকাল বেলায় দেখা গেল, মিচিগান হ্রদের পশ্চিমে উইচ্কন্সিনের সর্বত্র লাল ধূলির একটি পুরু আস্তরণ বিছিয়ে আছে। হিসাবে লক্ষ লক্ষ টনের ব্যাপার! এসেছে উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত মেক্সিকো অঞ্চল থেকে। ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে সাহারা মরুভূমির ধূলি প্রায়ই এসে থাকে। গত তিন হাজার বছরে এই ধূলির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি পুরু। ইটালির লোম্বার্তি ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মাঝে মাঝে যে রক্তরাঙা বৃষ্টিপাত হয় তা সাহারার লাল ধূলির দ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাকে। আর শীতকালে ঐ সব অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে যে রক্ত-তুষার দৃষ্ট হয়, তাহার কারণও ঐ লাল ধূলি।

সমুদ্রগামী জাহাজেও অনেক সময় ধূলিপাত দৃষ্ট হয়। সুউচ্চ পর্বতের তুষার-ক্ষেত্রেও ধূলির আক্রমণ দেখা যায়। যার ফলে জমাট তুষারের গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্তের সৃষ্টি হয়। চীনদেশের বিখ্যাত লোয়েস বারে বারে ধূলি জমেই সৃষ্টি হয়েছে। হাজার হাজার ফুট তার গভীরতা। গোবী মরুভূমির ধূলিই এই লোয়েস সৃষ্টির কারণ। আর গোবী হয়ে দাঁড়িয়েছে তৃণ-গুল্মহীন প্রস্তর, কঙ্করময় বিশাল প্রান্তর। এক কালের উর্বর গোবীর আজ চিহ্নটুকুও বর্তমান নেই। চীনদেশের উর্বর ভূভাগের বৃহৎ অংশই বায়ুবাহিত ধূলি থেকে সৃষ্ট হয়েছে। হোয়াংহো নদী ও পীতসাগর সাক্ষ্য দেয় যে, সে সব অঞ্চলের মৃত্তিকা দৃঢ়সংবদ্ধ নয়। এর ফলে জলধারা প্রায়শঃই গতিপথ পরিবর্তন করে থাকে।

লোয়েস গঠনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে কোন স্তরবিন্যাস নেই। ধূলির এক-একটা আস্তরণ যেমন জমেছে, তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে বৃষ্টি ও তুষার। কাজেই স্তরবিন্যাসের বিলুপ্তি ঘটেছে। এই মৃত্তিকা বেশ শুষ্ক ও গরম। তাই এই অঞ্চলের অনেক গরীব লোক গুহা তৈরী করে এখানে বাস করে।

ধূলিকণা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এমন স্থান নেই যেখানে অপর স্থানের ধূলিকণার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। পর্যটক হিসাবে ধূলিকণার সমকক্ষ মিলে না। অবশ্য কয়েক শ্রেণীর পাখীর কথা বলা যায়, যারা এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে চলে যায়। হাজার হাজার মাইল বিস্তীর্ণ মহাসাগরও তাদের প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু ব্যাপকতায় ধূলিকণা

অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যদি প্রয়োজনীয়তার কথা ধরা যায়, সেদিক থেকেও ধূলিকণার কৃতিত্ব কম নয়।

যে জগতে ধূলিও নেই বায়ুমণ্ডলও নেই, সেখানে তারাগুলি জ্বলজ্বল করতো সারা দিন, সারা রাত। আকাশ হতো মসীকৃষ্ণ। ধূলিকণায় সূর্যরশ্মি প্রতিহত ও পুনঃ পুনঃ প্রতিফলিত হয়। তার ফলেই আকাশ আমাদের নিকট উজ্জ্বল নীল বলে প্রতিভাত হয়। সূর্যরশ্মি সাতটি রঙে বিশ্লিষ্ট হয়। বিভিন্ন রঙের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিভিন্ন প্রকারের। সূর্যের তাপ, লাল ও পীত রশ্মি ধূলিকণাময় বায়ুস্তর ভেদ করে পৃথিবীতে চলে আসে। কিন্তু ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের নীল রশ্মি ধূলিকণা দ্বারা প্রতিহত হয়ে ঊর্ধ্বাকাশে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে।

দিগ্‌বলয়ের নিকট আলোক-রশ্মির পৃথকীকরণ কাজটি আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। কারণ দর্শক ও দিগ্‌বলয়ের মধ্যবর্তী এই অঞ্চলটিতেই ধূলিকণার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। তাই রক্তলাল, লাল ও গোলাপী আভাগুলিই দর্শকের নিকট অধিক পরিমাণে উপস্থিত হয়। এই কারণেই সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময়ে এত বর্ণ বৈচিত্র্য দেখা যায়। ধূলিকণার পরিমাণ যত বেশী, রঙের খেলাও তত মনোরম। সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের যত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে—তার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ ও অদ্ভুত বিবরণগুলি ক্রাকাতোয়ার অগ্ন্যুৎপাতের পরে লিখিত।

ধূলিকণা না থাকলে আকাশের রং অন্য রকম তো হতোই, অধিকন্তু আলোক রশ্মির সব কয়টি রংই বিনা বাধায় পৃথিবীতে নেমে আসতো। তৃণগুল্ম, বৃক্ষ লতাপাতার উপরে তার প্রভাবের ফলে এই শোভাময় পৃথিবীর রূপ সম্পূর্ণ বদ্‌লে যেত। মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর চক্ষুষ্মান প্রাণীদের পক্ষে এই আলো সহ্য করা অসম্ভব হতো। যে সব পেশী ও সূক্ষ্ম তন্তুর কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে চোখ কার্যক্ষম থাকে সেগুলি শুকিয়ে যেত। সুতরাং সৃষ্টিকর্তার কারখানায় নতুন রকমের চোখ সৃষ্টি না হলে এই জগতে বাস করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতো।

সূর্য অস্ত যাবার পরে কোমল, নমনীয় আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—গোধূলি। পৃথিবীর যে অঞ্চলে সূর্য যত ধীরে ধীরে ডুবে যায়, সে অঞ্চলের গোধূলি তত দীর্ঘস্থায়ী হয়। বিষুব অঞ্চলে গোধূলি কয়েক মিনিটের ব্যাপার। কিন্তু ৪০°/৫০° উত্তর অক্ষাংশে গোধূলি এক ঘণ্টারও বেশী সময় স্থায়ী হয়। ক্রমে ক্রমে বিলীয়মান এই আবছা আলো সম্ভব হতো না—ধূলিকণা ছাড়া।

এবারে ধূলিকণার প্রধান কাজটির কথা বলছি। ধূলিকণাকে আশ্রয় করেই জলীয় বাষ্প বৃষ্টির ফোঁটায় পরিণত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, ঊর্ধ্বাকাশে জলীয় বাষ্প জলকণায় পরিণত হয়ে মেঘ সৃষ্টি করতে পারতো না—যদি ধূলিকণা প্রতিটি জলবিন্দুর শাঁসরূপে কাজ না করতো। ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণার আস্তরণ আছে বলেই মেঘ সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে; অন্যথায় পৃথিবী জলসিঞ্চিত হতো কেবল মাত্র শিশিরের সাহায্যে।

যদি মেঘ না হতো, বৃষ্টি না হতো তাহলে কল্পনা করা যায় না—নদীনালার অবস্থা কি দাঁড়াতো। যে সব ভূতাত্ত্বিক কার্যপ্রণালী নদীর বালি-মাটি-কর্দম বহন ও সঞ্চয়নের উপর নির্ভর করে—তা হয়ে দাঁড়াতো ভিন্ন রকমের।

অনবরত শিশির পাতের পরিবেশে পৃথিবীর রূপ বদ্‌লে যেত। পাহাড়ের ক্ষয় হতো দ্রুততর—বৃক্ষলতাদি হতো অন্য রকমের। পৃথিবীর যাবতীয় জৈব বস্তুর মধ্যে পচন-কার্য সম্যক প্রসারিত হতো। মানুষের পরম শত্রু রোগ-জীবাণুর হতো একাধিপত্য।

ধূলিকণা যে বাস্তবিকই জলবিন্দু সৃষ্টি করতে শাঁসরূপে কাজ করে, আধুনিক কালে অধ্যাপক ব্যানক্রফট তা সরাসরি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন। তড়িতাবিষ্ট বালিকণা নিয়ে একখানি উড়োজাহাজ কুয়াশা-প্রাচীরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ইতস্তত

বালিকণা ছড়িয়ে গেল। কুয়াশার সূক্ষ্ম জলকণাগুলি ধূলিকণা দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে দ্রুত জমে গেল—বড় বড় ফোঁটায় পরিণত হয়ে বৃষ্টির আকারে ভূপতিত হলো, কুয়াশা কেটে গেল।

ঊর্ধ্বাকাশে মেঘের আকারে জলকণা ধরে রাখাই ধূলিকণার শ্রেষ্ঠ অবদান। এই জলীয় বাষ্পপূর্ণ মেঘখণ্ডগুলি সূর্যের তাপ ও তার রাসায়নিক কার্যকারিতা সংহত করে দিনের বেলায়। আর রাতের বেলায় পৃথিবীর তাপ বিকিরণ প্রক্রিয়াকেও সংযত করে। মরুভূমি অঞ্চলে দিবারাত্রির তাপাঙ্কের চরম বৈষম্যের মূল কারণই হলো—ঐ অঞ্চলের ঊর্ধ্বাকাশে জলীয় বাষ্পপূর্ণ মেঘের অভাব।

উপসংহারে নিঃসংশয়ে এই কথা বলা চলে যে, ধূলিকণা পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দেহপুষ্টির ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

ভৌমজল

শ্রীসুরথনাথ সরকার

এ কথা সকলেরই হয়তো জানা আছে যে, পৃথিবীর উপরিভাগের তিন-চতুর্থাংশ জায়গা জুড়েই জল রয়েছে। তাই জলের ভাণ্ডার অফুরন্ত এবং জল সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই—একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যদি বলি—এত জল থাকা সত্ত্বেও জলের অভাব মোটেই ঘোচে নি বরং চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ায় মানুষকে অনবরত এ-সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে হচ্ছে, তাহলে অদ্ভুত মনে হবে না কি? ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও কিন্তু সত্য। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চাহিদা মেটাবার মত ব্যবহারোপযোগী জলের জন্য হাহাকার প্রায় সব সময়েই লেগে আছে। কোন জায়গায় হয়তো জল পাওয়া গেল প্রচুর, কিন্তু নানা কারণে সেই জল ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে উঠতে পারে। যেমন, জলে যদি লবণের মাত্রা বেশী পরিমাণে থাকে তাহলে সেই জল পানীয় কিংবা সেচকার্যে ব্যবহার করা চলে না। আবার যে জলে লৌহ বর্তমান তাকে শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না। এ-রকম আরো অনেক সমস্যার বিষয়ই ভেবে দেখবার আছে।

পৃথিবীতে জল ছড়িয়ে আছে নানাভাবে—(১) বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে, যা ভূপৃষ্ঠে জল ও বরফ-রূপে দেখা দেয়; (২) সেই জল বয়ে যায় নদী-নালার মাধ্যমে সাগরের দিকে; (৩) আর আছে ভূস্তরের জল। প্রথমোক্ত জলের উপর মানুষের কোন হাত নেই। বিজ্ঞান এখনও কৃত্রিম উপায়ে বারিপাতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করতে পারে নি; তাই এখানে প্রকৃতির করুণার উপরই আজও সবাইকে নির্ভর করতে হচ্ছে। কিন্তু উপযুক্ত পরিকল্পনা, তথা নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থায় নদী-নালা ও ভৌমজলের ব্যবহার করতে পারলে জনসাধারণের চাহিদা যে অনেকাংশেই মেটানো সম্ভব তাতে সন্দেহ নেই। আমরা এখানে শেষোক্ত ভৌমজলের কথাই আলোচনা করবো। অন্য কথা বলবার আগে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভৌমজল কতটা প্রয়োজনীয় তার একটা মোটামুটি হিসাব নেওয়া যাক। ১৯৩১ সালে জার্মেনীতে ৭৭৪টি শহরে জনসাধারণের ব্যবহার্য জলের পরিমাণ সম্বন্ধে যে হিসাব করা হয়েছিল তা থেকে দেখা যায়, নদী-নালা প্রভৃতির জল শতকরা ১১'৪ ভাগ এবং ভৌমজল শতকরা ৮৭'৬ ভাগ ব্যবহৃত হয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জল সরবরাহের শতকরা ৬০ ভাগই ভৌমজলের সাহায্যে করা হয়ে থাকে।

লণ্ডন শহরেও শতকরা ২০ ভাগ জল মাটির নীচ থেকেই সংগ্রহ করা হয়। নদীবহুল ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এ-রকম কোন হিসাব না পাওয়া গেলেও দেখা যায়, পানীয় প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জলের কথা বাদ দিলেও অন্ততঃ কয়েক কোটি একর জমিতে ভৌম-জলের সাহায্যে সেচকার্য করা হয়ে থাকে। এ-থেকেই বুঝা যাবে, আমাদের জীবনযাত্রার পক্ষে ভৌমজলের গুরুত্ব কতখানি।

ভৌমজল অর্থাৎ মাটির নীচ থেকে যে জল পাওয়া যায়, তা থাকে লোকলোচনের অন্তরালে এবং সব জায়গায় পাওয়াও সহজ নয় বলেই একে ঘিরে আছে এক রহস্য। এই জল কোথা থেকে আসে, কোথায় চলে যায়, এর পরিমাণই বা কি, গতিশীল না স্থাণু? আবার গতিশীল হলে গতি-বেগই বা কত ইত্যাদি বিষয়ে কৌতূহল জাগ্রত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কখনও কোথায় দেখা দেয় ঝিরঝিরে ধারায়, কোথাও বেরিয়ে আসে ফোয়ারা রূপে, কোথাও বা স্বচ্ছ শীতল সুপেয় জল, আবার কোথাও উষ্ণ কিংবা ধাতব পদার্থ মিশ্রিত হয়ে বর্তমান—এরই বা কারণ কি? এসব জটিল প্রশ্ন মানুষের মনে দেখা দিয়েছে দীর্ঘকাল ধরে এবং তাদের সমাধানকল্পে সৃষ্টি হয়েছে অনেক উদ্ভট তত্ত্বের; কিন্তু সব প্রশ্নের সদুত্তর আজও মিলে নি। আগেকার দিনে অবশ্য জল-সমস্যা নিয়ে লোকে খুব মাথা ঘামায় নি। তখন জলের চাহিদা ছিল অনেক কম—তাই ভাবনারও তেমন কিছু ছিল না। বিশেষ করে আর্দ্রতা-প্রধান অঞ্চলের অধিবাসীদের ভৌম-জলের দিকে দৃষ্টি দেবার খুব কারণ ছিল না। বাতাসের মতই জলও সহজলভ্য, এই ধারণা ছিল তাদের কাছে একরূপ স্বতঃসিদ্ধের মত। কিন্তু শুষ্ক (arid) ও অর্ধশুষ্ক অঞ্চলের লোকের পক্ষে এ কথা খাটে না। যাতে সহজে জল পাওয়া যেতে পারে, এই আশায় এ রকম স্থানের লোকেরা যতটা সম্ভব নদীর কাছাকাছি জায়গায় ঘরবাড়ী তৈরীর প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবেই জলের চাহিদা বেড়ে চলেছে এবং লোকের মনেও ভবিষ্যতে জলাভাবের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই দেখা যায়, মরুভূমির বালুকারাশির মধ্যেও জল সন্ধানের বিরাম নেই। হাজার হাজার ফুট মাটির নীচে মানুষ জলের সন্ধান করে ফিরছে। সভ্যতার উন্মেষের সময় থেকেই বোধ হয় ভৌমজল সম্বন্ধে মানুষের কিছুটা ধারণা ছিল, যদিও তথ্যাদি সম্পর্কে কোন নিশ্চিত জ্ঞান ছিল কিনা সন্দেহ। কূপ থেকে যে জল পাওয়া সম্ভব, সে কথা মানুষ জানতো বহুকাল থেকেই—যার প্রচুর উদাহরণ রয়েছে বাইবেলে। Book of Genesis-এর ২৬ অধ্যায়ে এই বিষয়ে অনেক কাহিনীরই উল্লেখ আছে। আরবের মরুভূমিতে ইহুদীরা জলকষ্টে পীড়িত হয়ে মুশার কাছে ধর্ণা দিয়েছিল বলে শোনা যায়। মুশা তাঁর বিখ্যাত দণ্ডের সাহায্যে প্রস্রবণ সৃষ্টি করে তাদের জলকষ্ট দূর করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। রোম নগরী লোকেরাও যে ভৌমজলের কথা জানতো, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে এ-বিষয়ে যে সঠিক কোন জ্ঞান দানাবেঁধে ওঠে নি, সে কথা সহজেই বলা চলে। ভৌমজলের উৎপত্তি নিয়েও মতবাদের লড়াই কম হয় নি। যেমন, কেউ কেউ পৃথিবী-পৃষ্ঠের বক্রতার দোহাই দিয়ে প্রস্রবণের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু উপরের দিকে, অর্থাৎ আকাশের দিকে তাকাবার কথা তখনও কারো মনে হয় নি। বৃষ্টির জলই যে প্রস্রবণের মূলে, এ-কথা কেউ ভাবেন নি। গ্রীক দার্শনিকেরা মনে করতেন—সাগর থেকেই ঝর্ণা পায় তার জল এবং সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে ভূগর্ভের পথে। বৃষ্টির কথা তাদের মনে না জাগবার কারণ—তাঁদের ধারণা ছিল, বৃষ্টিপাত থেকে যে জল পাওয়া যায় তার পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। তাছাড়া ভূ-পৃষ্ঠের প্রকৃতি সম্পর্কেও তাঁদের ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট। তাঁরা মনে করতেন—এটা এমন এক অপ্রবেশ্য আবরণ দিয়ে তৈরী, যার ভিতর দিয়ে

মোটেই জল চলাচল করতে পারে না। অবশেষে নিছক গতানুগতিক চিন্তাধারার গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে কয়েকজন বিজ্ঞানী এ-সম্বন্ধে হাতে-কলমে মাপজোকের কাজে লেগে গেলেন। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে তাঁরা প্রমাণ করেন যে, ভৌমজলের গোড়ার কথা হলো বৃষ্টি। ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভূ-বিদ্যা বিষয়ক গবেষণাই ভৌমজলের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে বিশেষ সাহায্য করেছে। ভূতত্ত্ব-বিদ্‌দের মতে, ভূত্বক কঠিন পাথর বা শিলা দিয়ে গঠিত। এই শিলাস্তর প্রায় ৪০ মাইল গভীর। শিলা বলতে অবশ্য পাথর ও মাটি সবই বুঝায়। শিলার মধ্যে কতক হচ্ছে ছিদ্রযুক্ত, আবার কতক একেবারে ছিদ্রবিহীন ও অপ্রবেশ্য। ছিদ্রবহুল শিলার ভিতর দিয়ে সহজেই জল যেতে পারে। ছিদ্রগুলি আকারে যেমন বড় হয়, তেমনি এমন ছোটও হতে পারে যে, তাদের অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখাও অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক ছিদ্র হয়তো শিলার সৃষ্টি থেকেই বর্তমান থাকে; আবার কতকগুলি শিলায় ফাটল ধরা কিংবা রাসায়নিক দ্রবণের ক্রিয়ার ফলে নতুন করেও ছিদ্র তৈরী হয়ে থাকে।

প্রাচীন যুগের লোকেরা মনে করতো—প্রস্রবণ হচ্ছে ভগবানের দান। বিশেষ করে, কোন কোন প্রস্রবণের জল ব্যবহারের ফলে অনেক সময় অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ পেতো বলে তার চার-ধারে দেবালয় প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। আজও সে ধারা যে অব্যাহত আছে, তাও অস্বীকার করা যায় না। আমাদের দেশে কয়েক বছর আগেও 'পানি-বাবার' কথা শোনা গিয়েছিল—যিনি ভারত-সরকারকে ভূগর্ভস্থ জলের সন্ধানকার্যে সাহায্য করেছিলেন। এই সব পানি-বাবা যে ক্ষেত্রবিশেষে সাফল্য লাভ করেন তা অস্বীকার করা চলে না; তবে তাঁদের তথাকথিত বিস্ময়কর কৃতিত্বের মূলে জল সম্বন্ধে কতকগুলি বাস্তব ধারণা ও কিছুটা কাকতালীয় যোগাযোগ ছাড়া আর কোন কিছু আছে কিনা, বলা কঠিন। যাহোক, বিজ্ঞানীদের পক্ষে অত সহজে এই রকম চমকপ্রদ সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। কার্যক্ষেত্রে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তারই ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিককে সিদ্ধান্ত করতে হয়, কোন্ জায়গায় জল পাওয়ার সম্ভাবনা কতখানি আছে।

এবার আসল কথায় ফিরে এসে ভৌমজলের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। মাটি ছেড়ে আমরা তাকাই এবার আকাশের দিকে, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে। এ-কথা সবারই জানা আছে যে, সমুদ্রই হলো সব রকম জলের উৎস, আর সূর্য হলো যাবতীয় শক্তির মূলে। সূর্যের তাপে জল বাষ্পাকারে উঠে যায় বায়ুমণ্ডলে। এই বাষ্পের পরিমাণও বিরাট। পৃথিবীতে সারা বছর ধরে যে বারিপাত হয় তা গড়ে ৪০ ইঞ্চির মত এবং তার পরিমাণ প্রায় ৩৫০০০ ঘনমাইলের সমান। প্রাকৃতিক কারণে এই বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে জল ও বরফে পরিণত হয়। পাহাড়ের বরফ-গলা জল ও বৃষ্টির জল মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে এসে পড়ে নদী-নালায় এবং চলে যায় সাগরের দিকে। কিছুটা জল চুঁইয়ে চলে যায় মাটির নীচে। তারই একটা অংশ খুব ধীরে ধীরে নেমে আসে নদীর বুকে। খরার সময় নদীর জল যখন কমে যায় তখন এই ভৌমবারি-প্রবাহ-ই নদীকে বাঁচিয়ে রাখে। বাদবাকী জল চলে যায় আরও গভীরে, ভূগর্ভের অনেক নীচে। দীর্ঘকাল পরে তা বেরিয়ে আসে প্রস্রবণরূপে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এভাবে প্রকৃতির বুকে চলছে চক্রাকারে এক আবর্তনের পালা, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় হাইড্রো-লজিক সাইকেল বা বারিচক্র। ভৌমজলকেও মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) সম্পৃক্ত অঞ্চল—যেখান থেকে কূপ, প্রস্রবণ প্রভৃতি জল পেয়ে থাকে এবং জল-নিকাশ, সেচকার্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে জল ব্যবহার করা হয়। (২) এর উপরকার দিকে যেখানে জল থাকে তাকে বলে

কৈশিকাঞ্চল—যা মাটিকে আর্দ্র করে রাখে এবং গাছপালার জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সম্পৃক্ত অঞ্চলের জলের সীমারেখাকে বলা হয় জলসীমা; অর্থাৎ জলসীমাই হচ্ছে ভৌমজলের বিভাজক রেখা। ভৌমজলের গতিবেগ সাধারণতঃ খুবই সামান্য, শম্বুকগতিতে চলে। কিন্তু তা হলেও অভিকর্ষ ও কৈশিক আকর্ষণের ফলে সেই জল শত শত মাইল পথ বয়ে যায়।

তারপরেই যে প্রশ্ন ওঠে, তা হলো—মাটির নীচে জল কোথায়, কি ভাবে থাকে? তার উত্তরে বলা যায়, শিলার গঠন প্রকৃতির সঙ্গে জলস্তরের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মৃত্তিকার যে স্তরে বালি ও কাঁকর বর্তমান, সেখানে প্রচুর পরিমাণে জল থাকবারই কথা। এরপরেই অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে জল পাওয়া যায় সূক্ষ্ম বালুকার স্তরে। কর্দম বা শেলস্তরে মোটেই জল থাকে না। কেলাসিত শিলায় ৩০০ ফুটের মধ্যেই জল পাওয়া যায়। পলল শিলার ক্ষেত্রে ৫।৬ হাজার ফুট নীচেও জল পাওয়া যায়। ভৌমজলের পরিমাণ কতটুকু, এ নিয়েও হিসাব করা হয়েছে। মনে হতে পারে, আকাশের অগণিত তারা গণনা করবার মতই এ এক অবাস্তব বিলাস; কিন্তু আসলে তা নয়। আগে লোকের অবশ্য ধারণা ছিল, মাটির নীচে লুকিয়ে আছে অক্ষয় জলভাণ্ডার। সে ধারণা যে ভুল, তা এখন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। শিলার সচ্ছিদ্রতা এবং তার গভীরতা ধরে নিয়ে সেখানে যে পরিমাণ জল থাকতে পারে, তার হিসাব থেকে দেখা গেছে যে, তার সাহায্যে ভূগোলকের উপর দু-শ' থেকে ছ-শ' ফুট গভারতাবিশিষ্ট জলের আচ্ছাদন দেওয়া যেতে পারে।

এর পরেই আসে ভৌমজল সমীক্ষার কথা। জল-সমীক্ষার উদ্দেশ্য হলো, কোন্ জায়গা থেকে কি পরিমাণ জল পাওয়া যেতে পারে তা নিরূপণ করা। জলের পরিমাণ জানবার পর জলের গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখতে হবে, ঐ জল অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল কিনা। যে কোন জায়গায় জল পেলেই হবে না, ঐ জলের পরিমাণ বা জলস্তরের গভীরতার বিষয়ও জানতে হবে। আরও দেখতে হবে, ঐ জল তুলতে যে খরচ পড়বে তা অন্যান্য উপায়ে জল সংগ্রহের চেয়ে লাভজনক কিনা। এই সঙ্গে জল সংরক্ষণের কথাটাও ভাবতে হবে বৈকি! কারণ জলের অনাবশ্যক অপচয় কিংবা বেহিসাবী খরচ হলে হয়তো গোটা পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। ব্যাপারটা আরও একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। কোন জায়গায় জল পাওয়া গেল; সেখানকার জল টেনে তুলে নিলে তার চারদিক থেকে জল এসে সেই জায়গা আবার ভর্তি হতে সুরু করবে। এই জল যতক্ষণ না এসে পড়বে, ততক্ষণ আর জল পাওয়ার আশা নেই। তাই এমন ভাবে জল টেনে তুলতে হবে তা যেন চারদিক থেকে চুঁইয়ে আসবার মাত্রাকে ছাড়িয়ে না যায়। এইকারণেই খুব সতর্ক পরীক্ষার প্রয়োজন। কি ভাবে সে সব পরীক্ষা করা হয়, তা এই স্বল্প পরিসর স্থানে বলা সম্ভব নয়। জল তুলে আনবার জন্যে সচরাচর কূপ এবং নলকূপই খনন করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও দেখা যায়, ভূগর্ভের খানিকটা দূরেই কোন এক নির্দিষ্ট দিকে জল বয়ে যাচ্ছে। এরূপ ক্ষেত্রে মাটির নীচে বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরী করে জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর সেখান থেকেই জল তুলে নেওয়া হয়। জার্মেনী, ব্রেজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে এ-রকম ভূ-নিম্নস্থ জলাধারের ব্যবস্থা আছে।

ভৌমজলের কথা বলতে গেলে প্রস্রবণ ও আর্টিজিয়ান কূপের কথা অনিবার্যরূপেই এসে পড়ে। তাই সে বিষয়েও আলোচনা প্রয়োজন।

(ক) প্রস্রবণ—আগেই বলা হয়েছে, ভূস্তরে প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য দু-রকমের শিলা বর্তমান। প্রবেশ্য স্তরের মধ্য দিয়ে জল অপ্রবেশ্য স্তরে পৌঁছে এবং নীচের দিকে আর যেতে না পেরে

তার গা বেয়েই চলতে সুরু করে। এভাবে চলবার সময় উপরে বেরিয়ে আসবার পথ পেলেই আবার বেরিয়ে আসে এবং তাকেই বলে প্রস্রবণ। প্রস্রবণ নানা রকমের হয়ে থাকে। কোনটি হয়তো ঝিরঝির করে ক্ষীণ ধারায় বয়ে যায়। অনেক সময় তাতে জলের পরিমাণ এত কম থাকে যে, বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো বাষ্প হয়ে উবে যায়। শিলার গঠন অনুযায়ী প্রস্রবণের আকৃতি-প্রকৃতির তারতম্য ঘটে থাকে। যেমন—যেখানে চুনাপাথর কিংবা জিপসাম বর্তমান, সেখানে প্রস্রবণ আকারে বড় হয়। প্রস্রবণের জল সাধারণতঃ স্বচ্ছ হয়ে থাকে; তবে ভাসমান ছোট ছোট কণিকা থাকায় অনেক সময় নীলাভও দেখায়। আর্টিজিয়ান প্রস্রবণের প্রবাহের মাত্রায় সাধারণতঃ তারতম্য দেখা যায় না; কিন্তু অন্যান্য প্রস্রবণের ক্ষেত্রে প্রবাহের মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। যে প্রস্রবণের জলে লৌহ, চুন প্রভৃতি দ্রবীভূত থাকে, তাকে বলে খনিজ প্রস্রবণ। এই রকম প্রস্রবণের জল অনেক সময় ওষুধ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। ইংল্যাণ্ডে হ্যারোগেট, বাথ প্রভৃতি জায়গায় এই রকম প্রস্রবণ আছে। ভূগর্ভের খুব নীচে প্রস্রবণ থাকলে স্থানীয় উষ্ণতার জন্যে জলও গরম হয়ে পড়ে। তাকে তখন বলা হয় উষ্ণ প্রস্রবণ। আমাদের দেশে পশ্চিম বঙ্গে বক্রেশ্বর, বিহারের সীতাকুণ্ড, হিমালয়ের পাদদেশে বদ্রীনারায়ণ প্রভৃতি স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। উষ্ণ প্রস্রবণের গরম জলের সঙ্গে যখন বাষ্প বেরিয়ে আসে তখন তাকে বলে গাইসার। আমেরিকার ইয়্যালোষ্টোন পার্কে ওল্ড ফেথফুল নামে যে গাইসার আছে, তার অত্যুষ্ণ বাষ্পবারি প্রতি ঘণ্টা অন্তর প্রায় এক-শ' ফুট উপরে উঠে থাকে।

(খ) আর্টিজিয়ান কূপ—এগুলি আসলে এক ধরণের কৃত্রিম প্রস্রবণ। ফ্রান্সের আর্তয় শহরে সর্ব-প্রথম এই রকম কূপ খনন করা হয়েছিল বলে এদের এই নাম দেওয়া হয়েছে; যদিও অনেক জায়গাতেই পরে এই রকম কূপ খনন করা হয়েছে। কেমন করে এই কূপ তৈরী হয় তা দেখা যাক।

ধরা যাক, ভূগর্ভে দুটি অপ্রবেশ্য স্তরের মাঝখানে একটা প্রবেশ্য স্তর রয়েছে। এই মধ্যবর্তী স্তরটি যদি ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত অনাবৃত থাকে, তাহলে বৃষ্টির জল ঐ স্তরকে সম্পৃক্ত করে সেখানে ক্রমশঃ জমা হবে। এখন উপরকার অপ্রবেশ্য স্তরটিতে ছিদ্র করা হলে, সেই ছিদ্রপথে ঐ জল আপনা-আপনিই উপরে উঠে আসবে। জল উপরে উঠে আসবার কারণ অবশ্য বারির চাপ (Hydrostatic pressure)। আর্টিজিয়ান কূপ যেমন অগভীর হয়, তেমনি মাটির খুব নীচেও থাকে। বার্লিন এবং মিসৌরীতে চার হাজার ফুট গভীরতায় আর্টিজিয়ান কূপ রয়েছে। ইংল্যাণ্ডে অথরস নামক জায়গায় ১৫৮৫ ফুট নীচে এই রকমের কূপ আছে। এইপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অনেক দেশেই আর্টিজিয়ান কূপের সাহায্যে প্রভূত পরিমাণে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রেট ডাকোটা আর্টিজিয়ান অববাহিকার আয়তন প্রায় ১৫০০০ বর্গমাইল। এখান থেকে যে জল পাওয়া যায় তা দু-শ' ফুট উপরে উঠে আসে। প্যারিসের পাশিওয়েল নামক কূপ ১৯২৩ ফুট গভীর, ১৮ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট এবং ৫৪ ফুট উঁচু। এ থেকে প্রতি মিনিটে চার হাজার গ্যালন জল সরবরাহ হয়ে থাকে। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে আর্টিজিয়ান কূপের গুরুত্ব খুবই বেশী। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার আর্টিজিয়ান অঞ্চল প্রায় ৬,৬০,০০০ বর্গ-মাইল ব্যাপী বর্তমান এবং সেখানে তিন হাজারেরও বেশী আর্টিজিয়ান কূপ রয়েছে।

সর্বশেষে ভৌমজলের ব্যবহার ও গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু না বললে বর্তমান প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভৌমজল পানীয় হিসাবে, সেচকার্যে ও শিল্পক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অবশ্য জলের ধর্ম ও গুণাগুণের উপর সেটা বিশেষভাবে নির্ভর করে। মনে রাখা দরকার যে, ভৌমজল রাসায়নিক-ভাবে কখনও পুরাপুরি বিশুদ্ধ নয়। বৃষ্টির জলে মিশে

থাকে বায়ুমণ্ডলের ধুলাবালি; আবার মাটির ভিতর দিয়ে চলবার সময় আরও নানারকম দ্রবীভূত পদার্থ মিশে যায়। শিলা বিশ্লিষ্ট হয়ে নানাবিধ লবণ সৃষ্টি করে; যেমন—সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি। তাছাড়া সীসা, লিথিয়াম, গন্ধক, আর্সেনিক প্রভৃতিও অনেক সময় থাকে। তবে প্রাকৃতিক ফিল্টারের মাধ্যমে প্রবাহিত হওয়ায় ভৌমজল সাধারণতঃ বীজাণুমুক্ত হয়ে থাকে। এই জল শীতকালে কিছুটা গরম, আবার গ্রীষ্মকালে বেশ ঠাণ্ডা হয় বলে গৃহ-কার্যে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আজকাল শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ কার্যের ব্যাপক প্রসার হেতু দিন দিনই ভৌমজলের ব্যবহার বেড়ে চলেছে। এই জলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেট প্রভৃতি থাকায় অনেক সময়েই খরজল হয়ে থাকে এবং তাকে কোমল জলে পরিবর্তিত করে নেবারও প্রয়োজন হয়।

রকেটের ইতিকথা

শ্রীদীপক বসু

প্রকৃতিকে জয় করে নিজের বশে আনা মানুষের চিরকালের আকাঙ্খা। অতি দুর্গম অরণ্য, চির তুষারাবৃত মেরুপ্রদেশ, সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ, গভীর উত্তাল সমুদ্র, তপ্ত বালুকাময় মরুভূমি, সুনীল অম্বর—সবই একে একে মানুষের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। এবার তাই মানুষের দৃষ্টি পড়েছে অসীম মহাশূন্যের প্রতি—যা কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিকের কল্পনা আর সাধারণ মানুষের উপহাসের সামগ্রী ছিল, আজ তা হয়েছে বাস্তব সত্য। আজ একথা স্বীকার করতে আর কেউ আপত্তি করবে না যে, অদূর ভবিষ্যতে মহাশূন্য মানুষের পদানত হবে। যাঁদের অসামান্য জ্ঞান আর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই অসম্ভব সম্ভব হতে চলেছে, বিংশ শতাব্দীর সেই সব মনীষিদের সমস্ত জগৎ জানাচ্ছে তাদের আন্তরিক অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা।

কিন্তু একটি কথা আজ কোনক্রমেই ভুলে গেলে চলবে না যে, আজকের এসব ঘটনার অনেক আগে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় যখন প্রথম বিমান আকাশে উড়িয়ে-ছিলেন তারও আগে, রবার্ট ফুলটনের ষ্টীমবোট আর জেম্‌স্ ওয়াটের ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কারেরও অনেক আগে—স্যার আইজাক নিউটন কৃত্রিম উপগ্রহের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। আজ থেকে প্রায় তিন-শ' বছর আগে প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা নামক গ্রন্থে কোন বস্তুকে কি অবস্থায় এবং কিভাবে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে নিক্ষেপ করা যায়—সেই সংক্রান্ত সব রকম সমস্যাই তিনি অঙ্ক কষে ও ছবি এঁকে দেখিয়েছিলেন।

রকেটের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, রকেটের ইতিহাস বারুদ আবিষ্কারের সঙ্গে রহস্যজনকভাবে জড়িত। বারুদের সঙ্গে সঙ্গে রকেটও চীনদেশেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়ে-ছিল। চীনারা যুদ্ধের সময় এই সব রকেট ব্যবহার করতো। তখন এদের নাম ছিল 'উড়ন্ত অগ্নি'। চীনদেশ থেকে ভারতবাসীরা রকেটের কথা জানতে পারে এবং ভারতবর্ষেও তখন রকেটের প্রচলন হয়। প্রধানতঃ যুদ্ধের কাজেই এদেশে তখন রকেট ব্যবহার করা হতো। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মহীশূরে টিপু সুলতানের অধীনে ভারতীয় সৈন্যেরা রকেট ব্যবহার করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই রকেট ইংরেজবাহিনীকে প্রথম দিকে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করেছিল।

ভারতবাসীরা যে একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে রকেট ব্যবহার করতো, সে কথা আজ অনেকেই বিস্মৃত হয়েছে।

যুদ্ধবিদ্যায় একটা বিশেষত্ব আছে। যে পক্ষ বিপক্ষ দলের কোন বিশেষ অস্ত্রের জন্যে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেই পক্ষ সেই অস্ত্রকে নিজেদের আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করে। টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যেরা রকেটের ব্যবহার দেখে এতই চমৎকৃত হয়েছিল যে, ১৮০১ সালে উইলিয়াম কংগ্রেভ নামক জনৈক ইংরেজ অফিসার নিজে তখনকার প্রচলিত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রকেট নির্মাণের ভার গ্রহণ করেন। তাঁরই চেষ্টায় ইংরেজরা পরবর্তীকালে বিদেশের কয়েকটি যুদ্ধে সফলতার সঙ্গে রকেট ব্যবহার করে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তখন থেকে দেড়শ' বছর পরে আবার সেই দক্ষিণ ভারতের মহীশূরেই আধুনিক কালের রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালের ৩রা নভেম্বর মহীশূরে ইণ্ডিয়ান অ্যাষ্ট্রোনটিক্যাল সোসাইটির পক্ষ থেকে দুই অংশ সমন্বিত একটি রকেট ৩৫০০ ফুট পর্যন্ত উর্ধ্বে উঠেছিল। এছাড়া অবশ্য পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও রকেট উৎক্ষেপ করা হয়েছে।

এদিকে চীনাদের কাছ থেকে আরবেরাও রকেটের কথা জানতে পারে। আরবদের কাছ থেকেই রকেট ব্যবহারের কথা ইউরোপ ছড়িয়ে পড়ে। কারণ আরবেরা বিভিন্ন ইউরোপীয় যুদ্ধে রকেট ব্যবহার করেছিল। এভাবে রেনেসাঁর সময়ে পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যদেশেই রকেটের কথা প্রচারিত হয়।

যদিও রকেট প্রধানতঃ যুদ্ধের কাজেই ব্যবহৃত হতো তথাপি তার অন্যান্য ব্যবহারও হতে দেখা গেছে; যেমন—রকেট-চালিত গাড়ী, বরফের উপর চলবার জন্যে এক ধরণের নৌকা ইত্যাদি। এছাড়া রকেটের আরও অভিনব ব্যবহার ছিল; যেমন, এক স্থান থেকে অপর স্থানে ডাক বহন করে নিয়ে যাওয়া, সমুদ্রের উপকূলবর্তী কোন বিপন্ন জলযানে রকেটের সাহায্যে দড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আরোহীদের জীবন রক্ষা করা ইত্যাদি। এসব কাজে জার্মানরাই সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী ছিলেন। জার্মানদের তৈরী ছোট ছোট রকেট এত শক্তিশালী ছিল যে, তখনকার দিনের দৈনন্দিন জীবনযাপনের পক্ষে সেগুলি অপরিহার্য বিবেচিত হতো—বিশেষ করে ডাক বহন করবার ব্যাপারে। তখন আজকের মত সুবিধাজনক কোন যানবাহন তৈরী হয় নি। সুউচ্চ পর্বত বা দুর্গম অরণ্যে ডাক পাঠাবার জন্যে রকেটই ছিল জার্মানদের একমাত্র সহায়।

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক পর্যায়ের রকেটের উন্নতির গৌরব জার্মানদেরই প্রাপ্য। জার্মেনীর পিনেমুণ্ডের রকেট প্রতিষ্ঠানই ছিল এ-বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞেরা এসে এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথমে ছোট ছোট রকেট তৈরী করে তাঁরা পরীক্ষা করতে থাকেন, ক্রমে আকার বড় করা হয়। এভাবে এখানেই প্রথম তৈরী হয় বর্তমানে সুপরিচিত ভি-টু রকেট। জার্মেনীর ভি-টু রকেটের ইতিহাসে যুগান্তর এনে দিয়েছে। ১৯৪৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ভি-টু রকেট ১০২ মাইল উপরে উঠেছিল। ১৯৪৬ সালের ১০ই মে একটি রকেট উঠেছিল ১৩৭ মাইল। ১৯৪৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী একটি জার্মান ভি-টু-এর অগ্রভাগে একটি আমেরিকান ডবলিউ-এ-সি কর্পোর‍্যাল জুড়ে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। ভি-টু-এর যাত্রা যেখানে শেষ, কর্পোর‍্যালের যাত্রা সেখানে থেকে সুরু। এভাবে ২৫০ মাইল উপরে ওঠা সম্ভব হলো। ক্রমে পৃথিবীর সব সভ্য দেশগুলিতে রকেটের গবেষণা সুরু হয়ে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নানা রকম রাজনৈতিক কারণে জার্মেনীর রকেট প্রতিষ্ঠান বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু জার্মান বিজ্ঞানীরা মহাশূন্য বিজয়ের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারই চেষ্টা চলতে থাকে সারা পৃথিবীতে।

যদিও বহুকাল আগে থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রকেট অর্থাৎ হাউই ব্যবহৃত হতো, কিন্তু মহাকাশগামী রকেটের প্রকৃত তথ্য কেউ জানতো না। রকেটের বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রথম ব্যাখ্যা করা হলো যখন স্যার আইজাক নিউটন বস্তুর গতি সম্বন্ধে তাঁর যুগান্তকারী মতবাদ প্রচার করেন। আজ আমরা সবাই জানি যে, যে কারণে দেওয়ালীর দিনে হাউই শোঁ করে আকাশে উঠে যায়, সেই কারণেই রকেটও পায় তার ঊর্ধ্বগতি। হাউই-এর বারুদে আগুন লাগলে ভিতরে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস একটা ছিদ্র দিয়ে প্রচণ্ড বেগে নীচের দিকে বেরিয়ে আসতে থাকে। তারই প্রতিক্রিয়ায় হাউই ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যায়। রকেটের ব্যাপারও এমনি; তবে মহাশূন্যগামী রকেটের আকৃতি হাউইয়ের চেয়ে অনেক বড় হয়, আর তার জ্বালানীও অনেক বেশী শক্তিশালী।

হাউইয়ের জ্বালানী কঠিন পদার্থে তৈরী। আগেকার দিনের রকেটও তাই ছিল। কিন্তু বর্তমানে তরল পদার্থের জ্বালানীই বেশী ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন— নাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রাজিন, অ্যালকোহল, গ্যাসোলিন ইত্যাদি। অবশ্য রাশিয়ানরা তাঁদের স্পুটনিকের জন্যে কি প্রকার জ্বালানী ব্যবহার করেছিলেন তা জানা যায় নি। এখন সমস্যা হলো এই যে, যে কোন প্রকার জ্বালানীরই জ্বলবার সময় অক্সিজেন দরকার। সাধারণ কঠিন জ্বালানী এবং কোন কোন তরল জ্বালানীর ভিতরেই অক্সিজেন থাকে। তাদের জ্বলতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু অধিকাংশ তরল জ্বালানীরই জ্বলবার সময় আলাদা অক্সিজেন দরকার হয়। এই অক্সিজেন সাধারণতঃ তরল অক্সিজেনরূপেই সরবরাহ করা হয়। কাজেই তরল জ্বালানী-চালিত রকেটের মধ্যে দুটি তরল পদার্থ থাকে—একটি প্রকৃত জ্বালানী ও অপরটি তরল অক্সিজেন।

উচ্চ চাপের সাহায্যে তরল জ্বালানী ও অক্সিজেন মোটরের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় এবং সেখানে বিস্ফোরণ ঘটে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এই জাতীয় রকেটের দেয়ালগুলি অত্যধিক চাপ সহ্য করবার মত বিশেষভাবে তৈরী হওয়া দরকার। এতে সুবিধা এই যে, তরল পদার্থগুলি মূল রকেট-মোটরের বাইরে রাখা সম্ভব। তাছাড়া সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটার কাজ সুরু করা বা বন্ধ করা খুবই সুবিধাজনক। এরোবি, ডবলিউ-এ-সি কর্পোর‍্যাল এবং অন্যান্য ছোট ছোট রকেট এইরূপ উচ্চ চাপের দ্বারা চালিত এবং তরল পদার্থ সমন্বিত; কিন্তু ভি-টু, ভাইকিং ইত্যাদি বড় বড় রকেটের ব্যবস্থা ভিন্ন রকম। এখানে ট্যাঙ্ক থেকে জ্বালানী রকেট-মোটরে পাঠাবার জন্যে বাষ্পীয় টারবাইন-চালিত পাম্পের সাহায্য নেওয়া হয়। এই বাষ্প উৎপন্ন করা হয় হাইড্রোজেন পারক্সাইড থেকে। এখানে উচ্চ চাপের কোন ব্যাপার নেই বলে রকেটের দেয়াল পাতলা করা যেতে পারে। ফলে, সেই অনুপাতে বেশী জ্বালানী ব্যবহার করা যায়।

রকেট নির্মাণের আর একটি বড় সমস্যা হলো, কি দিয়ে এর দেয়াল তৈরী হবে। কারণ, জ্বালানী যখন পূর্ণোদ্যমে জ্বলতে থাকে, তখন মোটরের ভিতর যে পরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টি হয় তা কল্পনাতীত। একমাত্র পারমাণবিক বোমা ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ক্ষেত্রে বোধ হয় এত উত্তাপ সৃষ্টি হয় না। যে কোন বস্তুই মুহূর্তে গলে যাবে। এই ভীষণ উত্তাপের হাত থেকে রকেটকে বাঁচাবার জন্যে জার্মানরা এক অভিনব ব্যবস্থা করেছিলেন। রকেটের মোটরকে দুই দেয়ালবিশিষ্ট করা হলো এবং দেয়ালের মধ্যে যে অল্প পরিমাণ ফাঁক থাকে, তারই ভিতর দিয়ে তরল জ্বালানী মোটরের ভিতর প্রবেশ করাবার আগে একবার ঘুরিয়ে নেবার ব্যবস্থা হলো। যাতে এই সময়ে উত্তাপের একটি বৃহৎ অংশ জ্বালানী নিজেই গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে রকেটের দেয়ালের অত উত্তপ্ত হবার

সম্ভাবনা দূর হলো। এই ব্যবস্থা এত কার্যকরী হয়েছিল যে, প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় কোন লোক সহজেই মোটরের উপর হাত রাখতে পারে। মাত্র এক ইঞ্চি ভিতরে তখন কয়েক হাজার ডিগ্রি উত্তাপের লেলিহান শিখা গর্জন করছে।

সমস্যার শেষ এখানেই নয়। রকেট যখন প্রথম মাটি ছেড়ে উপরে উঠতে সুরু করে' বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে যায়, তখন কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বেগবান বাতাসের ঝাপ্‌টায় রকেটের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যেতে চায়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে গিম্বল ব্যবস্থা ও জাইরোস্কোপের সাহায্য নেওয়া হয়। গিম্বল সমন্বিত মোটর ও জাইরোস্কোপ একযোগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রকেটকে তার গতিপথে ঠিক রাখে। আধুনিক কালে আরও শক্তিশালী নানারকম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের সাহায্যে রকেটকে তার গতিপথে চালাতে আর কোন অসুবিধাই হয় না।

১৯০৩ সালে কিটিহক নামক স্থানে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় যখন ছোট্ট একটি বাক্সের মত বস্তুকে প্রথম আকাশে উড়িয়েছিলেন, তখন কে জানতো যে, মাত্র অর্ধশতাব্দী কাল অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বায়ুমণ্ডল ও মহাকাশ মানুষের অধিকারে আসবে? আজ একটা নয়, মানুষের তৈরী একাধিক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে বিচরণ করছে এবং মানুষের তৈরী গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করছে। পৃথিবী থেকে প্রেরিত পতাকাবাহী রকেট চন্দ্রে অবতরণ করে মানুষের জয় ঘোষণা করেছে। একাধিক জীবজন্তু সুস্থদেহে মহাশূন্য থেকে ফিরে এসেছে। রাশিয়ার লাইকা ও আমেরিকার এব্‌ল্‌ নিজেদের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছে যে, মানুষের পক্ষে মহাশূন্য ভ্রমণে অসুবিধা নেই।

ক্লোরেলা

শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের পরীক্ষাগারে একটি গাঢ় সবুজ রঙের পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করছেন। কালে হয়তো তা পারমাণবিক শক্তির চেয়েও অধিকতর প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে।

এই বিস্ময়কর পদার্থটি একজাতীয় অতি ক্ষুদ্র শ্যাওলা ছাড়া আর কিছুই নয়। সৃষ্টির প্রথম যুগে এই ধরণের একজাতীয় এককোষী জীবেই প্রথম প্রাণের সাড়া জেগেছিল। এই শ্যাওলাই ক্লোরেলা নামে পরিচিত।

এই শ্যাওলা মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এতে প্রোটিন, শর্করা ও স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং ভিটামিন, অর্থাৎ জীবনধারণের উপযোগী প্রায় সব রকমের উপাদানই আছে। সবচেয়ে সুবিধার কথা হলো, এই শ্যাওলা উষর মরু থেকে বিশাল সমুদ্র পর্যন্ত যে কোন স্থানে যে কোন পরিমাণে জন্মানো যায়। এর চাষও বিশেষ ব্যয়সাধ্য নয়। জল, আলো এবং অল্পদামী কিছু রাসায়নিক পদার্থই এর চাষের পক্ষে যথেষ্ট। বৈজ্ঞানিকেরা হিসবে করে দেখেছেন যে, আরো ১০০ বছর পরে যখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় ৭০০ কোটি হবে, তখন সব লোকের খাদ্য সংস্থানের

জন্যে পৃথিবীর স্থলভাগের মাত্র শতকরা ১৯ ভাগে এই শ্যাওলার চাষই যথেষ্ট হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অল্প কিছুদিন পূর্বে গবেষণাগারের পরীক্ষা থেকে এই ক্ষুদ্র শ্যাওলার বিপুল সম্ভাবনার কথা জানা যায়। পরবর্তীকালে দ্রুতগতিতে এই বিষয়ে উন্নতি হতে থাকে। এই নতুন শ্যাওলা আবিষ্কারের ফলে মানুষের মহাশূন্যে অভিযানের কাজ অনেকটা সহজসাধ্য হবে বলে আশা করা যায়। পৃথিবীতে প্রাণীদের শ্বাসকার্যের ফলে অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে। উদ্ভিদ কার্বন ডাইঅক্সাইডের কার্বন আত্মসাৎ করে' অক্সিজেনের সাম্য রক্ষা করে। মহাশূন্য-যানের বদ্ধ কামরায় এই শ্যাওলার দ্বারা যাত্রীদলের অক্সিজেন সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হবে।

পারমাণবিক শক্তি-চালিত সাবমেরিন পৃথিবীর আবহাওয়ার উপর নির্ভর না করে অনির্দিষ্ট কাল জলের তলায় অবস্থান করতে পারে। তবে যাত্রীদের খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহের একটা সমস্যা থেকে যায়। যুক্তরাজ্যের নৌ-বাহিনীর নির্দেশে কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে যে, এই শ্যাওলার সাহায্যে সাবমেরিনের বদ্ধ কক্ষ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড দূর করে অক্সিজেন সাম্য রক্ষা করা যায় কিনা।

জনসংখ্যা প্রপীড়িত কোন কোন দেশে প্রোটিনজাতীয় খাদ্য হিসাবে ক্লোরেলা ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। থাইল্যাণ্ড প্রতি বছর তার দেশের সন্নিহিত সমুদ্র থেকে শ্যাওলা ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী সহ প্রায় ৫০০০ টন প্ল্যাঙ্কটন সংগ্রহ করে। জাপান ও ইস্রাইলে এই উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলকভাবে যন্ত্রাদি স্থাপন করা হচ্ছে। জাপানীরা এই শ্যাওলা থেকে ভবিষ্যতের খাদ্য তৈরীর উপায় খুঁজছে।

উদ্ভিদ-জগতের সবচেয়ে প্রাচীন এই শ্যাওলা মূল ও কাণ্ডবিহীন। এদের অধিকাংশ প্রজাতি জলে ভাসমান অবস্থায় থাকে।

বর্তমান যুগের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকারী এই শ্যাওলা এতই ক্ষুদ্র যে, খালি চোখে প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। এদের প্রায় হাজারটি শ্যাওলা একটি সূচের ডগায় রাখা যায়। এরা হ্রদ, সমুদ্র ও পুকুরের জলে—এমন কি, মাটিতেও (এখানে বায়ুমণ্ডল থেকে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে থাকে) যথেচ্ছ বিচরণ করে। চিংড়ি, ঝিনুক, কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র মাছ ও জলজ প্রাণী এই শ্যাওলাকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে।

প্রতিটি ক্ষুদ্র শ্যাওলার কোষ নিজে একটি অদ্ভুত খাদ্যভাণ্ডার বিশেষ। এরা নিজেদের কোষ-প্রাচীর দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইড শুষে নেয় এবং প্রতিটি কোষ থেকে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও অন্যান্য অজৈব পদার্থ গ্রহণ করে। তারপর দেহস্থিত ক্লোরোফিলের সাহায্যে সূর্যালোককে শক্তি হিসাবে ব্যবহার করে প্রোটিন, শর্করা ও স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং অন্যান্য খাদ্য তৈরী করে।

স্বল্পপরিসর স্থানে অতি তীব্র আলোক-রশ্মি প্রয়োগ করে এই শ্যাওলা থেকে সুষ্ঠুভাবে কাজ পাওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর দ্বারা তীব্র আলোক-রশ্মি উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবিত হয়েছে। শ্যাওলা মেশানো ঘন জল পাম্পের সাহায্যে এক দিক থেকে অন্য দিকে চালিত হয় এবং তার উপর অবিরাম তীব্র আলোকপাতের ফলে দ্রুতগতিতে সালোক-সংশ্লেষণের কাজ চলে। এভাবে এই শ্যাওলার সাহায্যে বদ্ধ বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড দূরীভূত হয়ে তা থেকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।

বিবর্তনের দিক থেকে এই শ্যাওলা এত নিম্নস্তরের যে, এদের বংশবৃদ্ধির জন্যে কোন বীজের দরকার হয় না। সাধারণতঃ কোষ-বিভাজনের পদ্ধতিতেই এদের নতুন কোষের সৃষ্টি হয়। নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় এই কোষ-বিভাজন দিনে দু-বার পর্যন্ত দেখা গেছে।

বৈজ্ঞানিকেরা কৃত্রিম উপায়ে এদের বংশ-বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে থাকেন। বংশবৃদ্ধির জন্যে পরিমিত সূর্যালোকের বন্দোবস্ত করে প্রথমে অল্প পরিমাণ শ্যাওলা জলপূর্ণ চাষের পাত্রে রাখা হয়। জলের নলের সাহায্যে পুষ্টিকর দ্রব্য ও কার্বন ডাই-অক্সাইড সরবরাহ করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে চাষের পাত্র শ্যাওলায় ভরে ওঠে। একই পাত্রে ক্রমান্বয়ে চাষ চলতে পারে।

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, এই শ্যাওলা থেকে সকলের রুচিমাফিক খাদ্য তৈরী করা সম্ভব হবে। এভাবে চাষ করবার উপযুক্ত কয়েক হাজার প্রজাতির শ্যাওলা আছে। ক্লোরেলা যেসব খাদ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতেই সব্জির স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া গেছে। অন্যান্য টাট্‌কা সব্জির মত সহজে নষ্ট হয়ে যায় বলে এদের সাধারণতঃ শুকিয়ে গুঁড়া করে রাখা হয় এবং এভাবে এরা অনেক দিন পর্যন্ত অবিকৃত থাকে। অবশ্য এই চূর্ণের স্বাদ টাট্‌কা শ্যাওলা থেকে কিছু ভিন্ন রকমের।

ক্লোরেলা নিয়ে খাওয়ার পরীক্ষাও কিছু কিছু হয়েছে। জাপানে একটি চা-চক্রে জাপানী বৈজ্ঞানিকের পত্নী মিসেস হিরোসী ডামিয়া শ্যাওলার তৈরী রুটি, সুপ, আইসক্রীম পরিবেশন করে-ছিলেন এবং সেখানে কার্নেগী ইন্‌স্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকেরা উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ তামিয়ার মতে, রুটিতে ক্লোরেলা পাউডার ব্যবহারে এর প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ২০ থেকে ৭৫ ভাগ বেড়ে যায় এবং তাছাড়া ভিটামিন-এ ও সি যথেষ্ট পাওয়া যায়, যা সাধারণ রুটিতে থাকে না।

তবে খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্যে প্রচুর পরিমাণ শ্যাওলার দরকার এবং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ব্যয় যাতে কম হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। এ-জন্যে বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে এই শ্যাওলার ব্যবহার সম্বন্ধে পরীক্ষা চলছে। এতে সাফল্য লাভ করা গেলে ইস্রাইল প্রভৃতি মরুভূমির দেশে এক টুক্‌রা গোচারণ ভূমি ছাড়াও গবাদি পশুপালন অনেকটা সহজ হবে।

প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ এই শ্যাওলা থেকে বর্তমান পৃথিবীর অনেক সমস্যারই সমাধান হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

ভূমিকম্প পৃথিবীকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। একটি ছোট ভূমিকম্পের শক্তি সহস্র পরমাণু বোমার চেয়েও বেশী। এরূপ অনুমান করা হয় যে, ১৯৫০ সালের অগাষ্ট মাসে আসামে যে ভূমিকম্প হয়েছিল, সেটি ছিল এক লক্ষ পরমাণু বোমার ন্যায় শক্তিশালী। এরূপ আলোড়নের ফলে যে তরঙ্গের উদ্ভব হয়, তা পৃথিবীর অভ্যন্তরে সর্বত্র পরিভ্রমণ করে—এমন কি, অন্তস্তল পর্যন্ত। এসব তরঙ্গের চলবার পথ সোজা কিংবা বাঁকা হবে, তা নিয়ন্ত্রিত হয় পৃথিবীর অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্তরের গঠন অনুযায়ী। কাজেই ভূকম্প-তরঙ্গ যে সব স্থান দিয়ে চলে, তারা সে সব স্থানের রহস্য-সূত্র বহন করে। ভূমিকম্প-নির্দেশক ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন যন্ত্রে যে সব তরঙ্গের রৈখিক চিত্র অঙ্কিত হয়,

তাদের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্বন্ধে আজগুবি কল্পনা না করে বৈজ্ঞানিক পরিমাপ ও যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয়েছে, ভূমিকম্প-বিজ্ঞানের জন্যেই। অধিকন্তু ভূপৃষ্ঠের প্রস্তর সম্বন্ধে ভূ-বিজ্ঞানের নির্ধারণ গবেষণাগারে প্রস্তরের উপর উচ্চচাপে নানাপ্রকার পরীক্ষা এবং জ্যোতির্বিদ্যার কয়েকটি পর্যবেক্ষণ—ভূগর্ভের নানাপ্রকার অবস্থা সম্বন্ধে তত্ত্ব নির্ণয় করতে সহায়ক হয়েছে; যেমন—ভূগর্ভ স্তরে স্তরে গঠিত, তাদের স্বরূপ ও উপাদান, চাপের পরিমাণ প্রভৃতি। বস্তুতঃ এভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরের অবস্থা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

ভূকম্প-তরঙ্গ প্রধানতঃ তিন প্রকারের—(১) মুখ্য তরঙ্গ—শব্দ-তরঙ্গের ন্যায় এরা সঙ্কোচন-প্রসারণধর্মী; (২) গৌণ তরঙ্গ—আলোক-তরঙ্গের ন্যায় এরা গতিপথের সমকোণে চলে; (৩) পৃষ্ঠতরঙ্গ—এরা ভূত্বকের কুড়ি মাইলের মধ্যে চলাফেরা করে। গৌণ তরঙ্গ, মুখ্য তরঙ্গের তিন ভাগের দু-ভাগ বেগে চলে। মুখ্য তরঙ্গ কঠিন ও তরল, উভয় প্রকার পদার্থের ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করে; কিন্তু গৌণ তরঙ্গ কেবল কঠিন পদার্থ দিয়েই চলে। পৃথিবীর গভীরতা অনুযায়ী উভয় তরঙ্গের গতিবেগই পরিবর্তিত হয়। ১৮০০ মাইল গভীরে মুখ্য তরঙ্গ চলে প্রতি সেকেণ্ডে ৮½ মাইল বেগে এবং এটিই এই তরঙ্গের সর্বোচ্চ গতিবেগ। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের নিকটস্থ প্রস্তরে এই তরঙ্গের গতিবেগ হয় প্রতিসেকেণ্ডে তিন মাইল। বেগের এই পরিবর্তনের জন্যেই তরঙ্গের চলবার পথ হয় সাধারণতঃ উর্ধ্বমুখী। দুটি স্তরের সীমান্তে এলে তরঙ্গ প্রতিফলিত কিংবা প্রতিসরিত হতে পারে। ভূত্বক পর্যন্ত এসে তরঙ্গ আবার নীচের দিকে প্রতিফলিত হয়। দুটি স্তরের সীমান্তে একটি মুখ্য কিংবা একটি গৌণ তরঙ্গ থেকে মুখ্য ও গৌণ, উভয় প্রকার তরঙ্গেরই উদ্ভব হতে পারে। কাজেই কোন একটি ভূমিকম্প সম্বন্ধে যন্ত্রের লিখন থেকে কয়েকটি অবস্থার স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়, যাতে তরঙ্গসমূহের ভ্রমণ-পথের বিবরণ ও তাদের আকারের পরিবর্তন বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়।

এসব প্রমাণ থেকে জানা গেছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে একটি অন্তস্তল আছে, যার সীমা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১৮০০ মাইল গভীরে। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হলো প্রায় ৩৯৬০ মাইল। কাজেই অন্তস্তলের ব্যাসার্ধ হবে ২১৬০ মাইল। পৃথিবীর অন্তস্তল হলো তরল। গৌণ তরঙ্গ এর ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করে না।

মুখ্য ও গৌণ তরঙ্গসমূহ ভ্রমণ-পথের বিভিন্ন স্থানে কিরূপ বেগে চলে, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা সময়ের তালিকা করেছেন। এই সময়-তালিকাগুলি পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের মানচিত্র প্রস্তুত করবার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। এসব তালিকা থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্থানের মুখ্য ও গৌণ তরঙ্গসমূহের গতিবেগ নির্ণয় করা যায়। গভীরতার সঙ্গে গতিবেগের পরিবর্তন অনুধাবন করে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের বিভিন্ন স্তর এবং তাদের সীমানার মানচিত্র তৈরী করা সম্ভব হয়।

১৯০৯ সালে ক্রোশিয়ার ভূমিকম্প-বিজ্ঞানী এ. মোহোরোভিসিক বলকানের একটি ভূমিকম্পের লিখন পর্যালোচনা করে আবিষ্কার করেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের কুড়ি মাইল নীচে একটি বিচ্ছেদ বা সীমা আছে। আবিষ্কারকের নামানুসারে এই সীমানা "মোহোরোভিসিক বিচ্ছেদ" নামে অভিহিত হয়। মোহোরোভিসিক বিচ্ছেদের উপরিস্থিত অঞ্চলকেই ভূ-ত্বক বা কঠিন আবরণ বলে। অবশ্য প্রচলিত অর্থেই এরূপ বলা হয়। কারণ, এখন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ভূ-ত্বকের নীচের পদার্থ আরও বেশী কঠিন। ভূ-ত্বক ও অন্তস্তলের মধ্যবর্তী স্তরকে ম্যাণ্টল্ বা আবরণ বলে। কারণ এই স্তরটি অন্তস্তলকে আবৃত করে রেখেছে। এই স্তরটি কঠিন উপাদানে গঠিত। মুখ্য ও গৌণ, উভয়

তরঙ্গই ম্যাণ্টলের ভিতরে সর্বত্র পরিভ্রমণ করতে পারে। কিন্তু ভূ-ত্বকে উভয় তরঙ্গই আরও মন্থর গতিতে গমন করে এবং গতিও পরিবর্তনশীল। এই অনিয়মিত গতিবেগের জন্যে ভূ-ত্বকের সঠিক মানচিত্র তৈরী করা খুবই কষ্টকর। তা হলেও নানাপ্রকার তরঙ্গ, যেমন—পৃষ্ঠ-তরঙ্গ, ভূমিকম্পের নিকটবর্তী যন্ত্রে গৃহীত মুখ্য ও গৌণ তরঙ্গ, ডিনামাইট, পরমাণু বোমা প্রভৃতি বিস্ফোরকের সাহায্যে উৎপন্ন তরঙ্গ ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে এই সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট চেষ্টা হচ্ছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করা হয়েছে যে, ভূ-ত্বক মহাদেশের চেয়ে মহাসাগরের নীচে অনেক পাতলা।

এরূপ প্রমাণ পাওয়া গেছে যে; অন্তস্তলটি এক রকমের নয়, অন্ততঃ দ্বিবিধ। এদের বলা হয়—বহিরন্তস্তল ও মধ্যান্তস্তল। বাহরন্তস্তলের চেয়ে মধ্যান্তস্তলের ভিতর দিয়েই মুখ্য তরঙ্গ অধিকতর বেগে চলে। মধ্যান্তস্তলের ব্যাসার্ধ হবে প্রায় ৮০০ মাইল। কাজেই বহিরন্তস্তলের প্রসার হবে প্রায় ১৩০০ মাইল।

ঘনাঙ্ক অনুসারে পৃথিবীকে মোটামুটি সাতটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে—ভূ-ত্বক, ম্যাণ্টলের তিনটি স্তর (ম্যাণ্টলও তিনটি স্তরে বিভক্ত হয়েছে)। অন্তস্তলের দুটি স্তর এবং দুটি অন্তস্তলের মধ্যবর্তী আর একটি ৮০ মাইল প্রস্থ-বিশিষ্ট স্তর, যেখান দিয়ে ভ্রমণ করবার সময় মুখ্য তরঙ্গের গতিবেগ অনেক কমে যায়। গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ঘনত্ব ক্রমেই বেশী হয়েছে। ভূ-ত্বকের তলদেশের ঘনত্ব হলো, প্রতি ঘনসেণ্টিমিটারে ৫½ গ্র্যাম। কিন্তু অন্তস্তলের উপরিভাগে হঠাৎ অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়ে ৯½ গ্র্যাম হয়েছে। তারপর বহিরন্তস্তলের তলদেশের পরিমাণ হয়েছে ক্রমে ১১½ গ্র্যাম। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের ঘনাঙ্ক হবে ১৪½ থেকে ১৮ গ্র্যামের মধ্যে।

ভূগর্ভের যত নীচে যাওয়া যায়, চাপও তদনুসারে ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। প্রশান্ত মহাসাগরের নীচে চাপ হবে প্রায় ৮০০ অ্যাট্‌মোস্ফিয়ার। ২০০ মাইল গভীরে ম্যাণ্টলের মধ্যে চাপ হবে প্রায় ১০০,০০০ অ্যাট্‌মোস্ফিয়ার এবং এটিই গবেষণাগারে উৎপন্ন সর্বাধিক চাপ। ম্যাণ্টলের তলদেশে ১৮০০ মাইল গভীরে চাপের পরিমাণ হবে প্রায় ১৩ লক্ষ অ্যাট্‌মোস্ফিয়ার। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের চাপ হবে প্রায় ৪০ লক্ষ অ্যাট্‌মোস্ফিয়ার।

গভীরতা অনুযায়ী ম্যাণ্টলের উপাদানের দৃঢ়তা ক্রমেই বেশী হয়। ম্যাণ্টলের তলদেশে বস্তুর দৃঢ়তা হবে ইস্পাতের চেয়েও চারগুণ বেশী। তার নীচে, বহিরন্তস্তলে কোন দৃঢ়তা নেই; কারণ এই অঞ্চলের পদার্থ হলো তরল। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, মধ্যান্তস্তলটি হয়তো কঠিন। বোধ হয় এই জন্যে বহিরন্তস্তলের চেয়ে মধ্যান্তস্তল দিয়ে মুখ্য তরঙ্গ অধিকতর বেগে চলে। হিসাব করে দেখা গেছে, মধ্যান্তস্তল অঞ্চলের দৃঢ়তা ইস্পাতের দ্বিগুণ।

মহাদেশের নীচে ভূ-ত্বক দুটি স্তরে গঠিত—উচ্চস্তরে সিলিকন-অ্যালুমিনিয়াম এবং নিম্নস্তরে ম্যাগ্নেসিয়াম-লোহা সমন্বিত প্রস্তর আছে। এদের যথাক্রমে বলা হয় গ্র্যানিট ও বেসাল্ট। মহাসমুদ্রের তলায় অনেক স্থানেই গ্র্যানিটজাতীয় প্রস্তর আছে বলে মনে হয় না। অনেকদিন হলো প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, অধিকাংশ ম্যাণ্টলই ম্যাগ্নেসিয়াম-আয়রন-সিলিকেট সমন্বিত প্রস্তরজাতীয় উপাদানে গঠিত। ম্যাণ্টলের নীচের দিকে হয়তো সিলিকা, ম্যাগ্নেসিয়া ও আয়রন অক্সাইডের কয়েকটি স্তর রয়েছে। অন্তস্তলের বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক প্রকার মত আছে। বহু কাল হলো নির্ধারণ করা হয়েছে যে, অন্তস্তল প্রধানতঃ লোহা কিংবা নিকেল-লোহা দিয়ে গঠিত। উল্কাপিণ্ড বিশ্লেষণ করে এই মত সমর্থিত হয়েছে। কারণ এরূপ ধারণা আছে যে, উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর ন্যায় কোন গ্রহের ভগ্নাংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমানে এরূপ মত

পোষণ করা হয় যে, বহিরস্তস্তর গঠিত হয়েছে মৌলিক লোহা এবং খুব কম ভরের অন্য কোন পদার্থ দিয়ে। মধ্যাস্তস্তলে রয়েছে লোহা ও নিকেলের সঙ্গে আরও কয়েকটি অধিকতর ঘন বস্তু।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে চাপের চেয়ে তাপমাত্রা নির্ধারণ করা অধিকতর অনিশ্চিত। গভীর খনিতে অবতরণ করলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার হবে প্রতি মাইলে ৩০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। পৃথিবীর অন্তস্তল পর্যন্ত তাপমাত্রা যদি এই হারে বৃদ্ধি পেত, তাহলে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা হতো ১০০,০০০° ডিগ্রীরও উর্ধ্বে। প্রকৃত পক্ষে, বৃদ্ধির হার এর চেয়ে অনেক কম। বর্তমানের নির্ধারণ অনুযায়ী কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা ২০০০° থেকে ৬৫০০° ডিগ্রীর বেশী হবে না। পৃথিবীর গভীরে চাপের চেয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার অনেক কম।
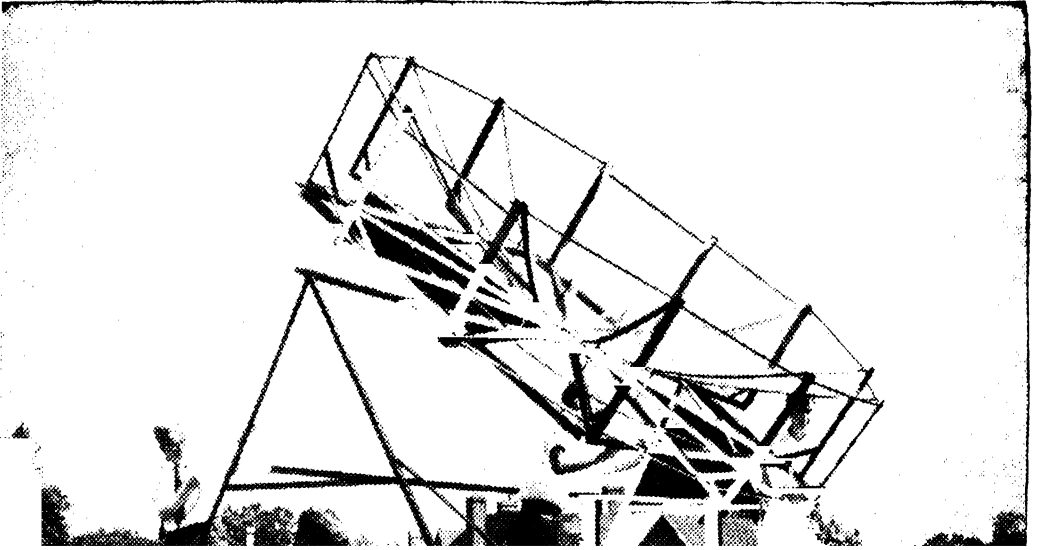
কেণ্টের (বৃটেন) ডার্টফোর্ড স্কুলের ছাত্রগণ এই রেডিও-টেলিস্কোপটি তৈরী করেছে। এই টেলিস্কোপের সাহায্যে সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক তথ্যও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী—১৯৬০

১৩শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা
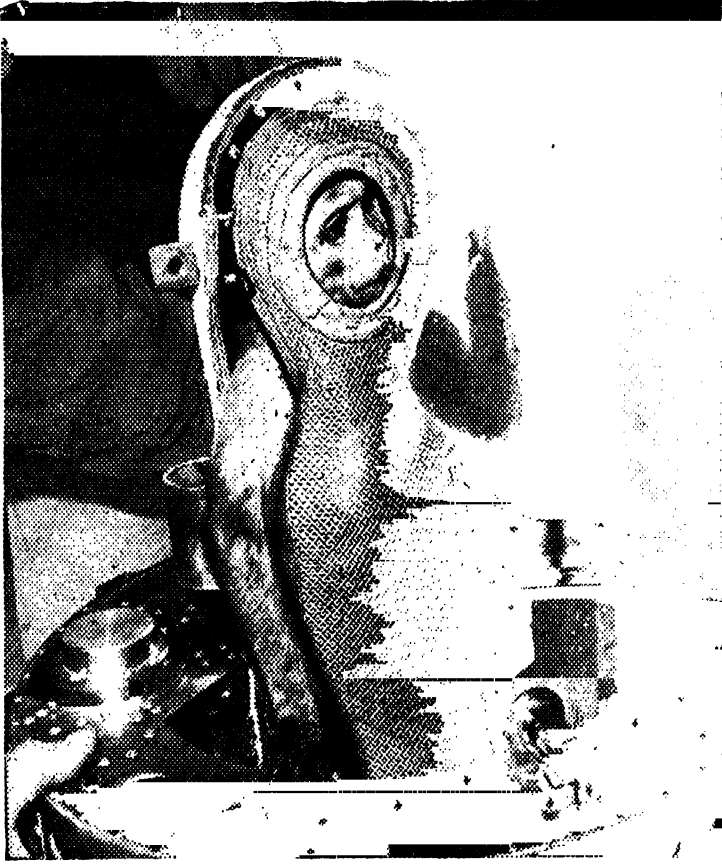
মহাকাশ-যাত্রী মর্কট

ঊর্ধ্বাকাশে প্রাণীদেহের উপর কিরূপ শারীরতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার অন্তর্গত ওয়ালপ্ স্টেশন হইতে ছোট্ট একটি জো-রকেটের অগ্রভাগে স্থাপিত ক্যাপসুলের মধ্যে অদ্ভুত পরিচ্ছদে ভূষিত সাড়ে তিন সের ওজনের এই রিসাস মর্কটটিকে ২০০ মাইল ঊর্ধ্বে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ঊর্ধ্বাকাশে ১৩ মিনিট স্থায়ী এই মহাকাশ যাত্রার রেকর্ডসমূহ পরীক্ষা করা হইতেছে।

জীবাণুর কথা

প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে, ১৬৭৬ সালে হল্যাণ্ডবাসী লিউয়েন্‌হোয়েক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কার করেন যে, মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে এমন এক শ্রেণীর জীব বাস করে, যাদের আয়তন অতি ক্ষুদ্র—এক ইঞ্চির পঁচিশ শত ভাগের এক ভাগেরও কম। তিনি প্রমাণ করেন যে, এক ফোঁটা জলে এ-রকমের লক্ষাধিক জীব বাস করতে পারে। তাদের নাম দেওয়া হলো জীবাণু বা বীজাণু। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও কয়েক জাতের জীবাণু মানুষের অনিষ্ট সাধনে পটু, আবার কয়েক জাতীয় জীবাণুর উপকার করবার ক্ষমতা অসাধারণ।

আজ আমরা পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু অনিষ্টকারী বীজাণু যদি যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, তার ফলও হবে ভয়াবহ। অবশ্য গত মহাযুদ্ধে চুক্তি করে বীজাণুর ব্যবহার রোধ করা হয়েছিল। এই শ্রেণীর বীজাণুর সংস্পর্শে নানারকম রোগের সৃষ্টি হয়। সামান্য ফোড়া, পেটের অসুখ বা ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে ভয়াবহ যক্ষ্মারোগ পর্যন্ত বীজাণু-সংক্রমণেরই ফল। বিজ্ঞানের প্রসার এই অদৃশ্য জীবাণু সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহে আমাদের সাহায্য করেছে। এখন আমরা জানি—কি উপায়ে এসব জীবাণুর হাত থেকে বহুলাংশে রক্ষা পাওয়া যায় এবং কোন্ কোন্ জীবাণুকে কি উপায়ে মানুষের উপকার সাধনে নিয়োগ করা যায়।

বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসরণ করে হয় নি। এড্‌ওয়ার্ড জেনার ১৭৯৬ সালে যখন আবিষ্কার করেন—গো-বসন্ত আসল বসন্তের প্রতিরোধক, তখন জীবাণু কি এবং মানবদেহে তাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই জেনারের ছিল না। বাতাসে বিষাক্ত, ক্ষতিকর জীবাণুর অস্তিত্বের কথা বৈজ্ঞানিকেরা এক সময়ে বিশ্বাসই করতেন না।

১৮৬০ সালে ফ্রান্সের মদ্য ব্যবসায়ীরা খুবই বিপদে পড়েন, কারণ তাঁদের মদ সবই নষ্ট হয়ে যেত। লুই পাস্তুর তখন গবেষণা করে প্রতিপন্ন করেন যে, মদ নষ্ট হয়ে যাবার একমাত্র কারণ হলো দূষিত বায়ুর সংস্পর্শ। সেকালের অনেক বৈজ্ঞানিক তাঁর কথা বিশ্বাস করেন নি। অথচ পাস্তুরের উদ্ভাবিত পন্থা অবলম্বন করে মদ্য-ব্যবসায়ীরা আশ্চর্য সুফল পেলেন। তখন পাস্তুরকে মেনে নিলেন লিষ্টার। তিনি ছিলেন ডাক্তার। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পূর্বে তিনি গরম জলে ফুটিয়ে ব্যবহার করতে থাকেন। অস্ত্রোপচারের পর মৃত্যুর হার পূর্বে ছিল অনেক বেশী। এই উপায় অবলম্বনের ফলে তা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেল।

লিউয়েন্‌হোয়েক জীবাণুর জন্ম-রহস্যের বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে

তিনি নিরীক্ষণ করেন যে, জীবাণুর সূক্ষ্ম দেহে একটি মাত্র কোষ থাকে। গঠন-বৈচিত্র্যানুযায়ী তিনি জীবাণুদের শ্রেণীবিভাগ করেন। বৃত্তাকার, ডিম্বাকার, কাঠি ও স্ক্রু-র মত আকারের নানা রকম জীবাণু পর্যবেক্ষণ করে তিনি এসব ক্ষুদ্রায়তন জীবের ক্ষমতা, কতক্ষণ তারা বাঁচতে পারে, তাদের আহার্য কি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে কি না—ইত্যাদি বিষয়গুলি জানবার জন্যে সচেষ্ট হন। এদের মধ্যে শুধু প্রকারভেদই নয়, স্বভাবগত পার্থক্যও যথেষ্ট। অক্সিজেনের অভাবে প্রাণী তো দূরের কথা, গাছপালার পক্ষেও বাঁচা অসম্ভব নয়। অক্সিজেনের অভাবে এক শ্রেণীর জীবাণুর কোনই ক্ষতি হয় না। জীবাণুগুলি এককোষী হলেও তাদের বংশবৃদ্ধির হার অতি দ্রুত। অনুকূল অবস্থায় কয়েক জাতের জীবাণু ২০ মিনিটের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক হয়ে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। একটি ভেঙে দুটি হয় এবং সে দুটি প্রত্যেকেই আবার দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। এভাবে তারা বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। সংখ্যায় ক্রমশঃ এরা এত বৃদ্ধি পায় যে, বেঁচে থাকলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত পৃথিবীটা ভরে ফেলতে পারে; কিন্তু তা হয় না। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় নিয়ে যেমন মানুষের জীবন, এদের জন্যেও সেই একই ব্যবস্থা। অপরিমিত সংখ্যা-বৃদ্ধির দরুণ দেহপুষ্টির উপাদানের অভাব ঘটলে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যায়।

সব জীবাণুর ধর্মই এক নয়। আগেই বলা হয়েছে—প্রকারভেদে এদের স্বভাবের পার্থক্য দেখা যায়। এক শ্রেণীর জীবাণুর প্রতিকূল অবস্থা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা আছে প্রয়োজনমত শরীরের অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জন করে এরা কেবলমাত্র জৈবপঙ্ককে বর্মাবৃত করে আত্মরক্ষা করে। অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হলে, বর্ম ভেদ করে এরা পুনরায় পূর্ব অবয়ব গ্রহণ করে। এই শ্রেণীর জীবাণু বিনষ্ট করা সহজসাধ্য নয়। যক্ষ্মা-জীবাণু এই জাতীয়; কাজেই এদের ধ্বংস করাও আয়াসসাধ্য ব্যাপার।

মানুষের জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজন উপযুক্ত খাদ্য ও আবহাওয়া। উচ্চ তাপমাত্রা বা প্রচণ্ড শৈত্যে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন। জীবাণুদের পক্ষেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। আর্দ্রতা এরা বেশী পছন্দ করে। শর্করা এবং যাবতীয় লবণজাতীয় খাদ্য (যৌগিক পদার্থ) এদের প্রিয় খাদ্য। তাছাড়া ভিটামিনের প্রয়োজনও তাদের আছে। এসব খাদ্যের দ্বারা পুষ্ট হয়ে এরা গ্যাস, রং, ধাতব্যাম্ল ও নানারকম বিষ উৎপাদনে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিশিতে চাট্‌নী রাখলে কিছুদিন পরে ভিতরের গ্যাসের চাপে শিশির ছিপি উড়ে যেতে পারে। গোময় থেকে জীবাণুর সাহায্যে গ্যাস উৎপাদন করে আলো জ্বালানো বা রান্নার কাজ করাও আজকাল সম্ভব হয়েছে। আমরা যে ভিনিগার ব্যবহার করি, আখের রস থেকে জীবাণুর সাহায্যেই তা প্রস্তুত হয়। সকালের ঠাণ্ডা দুধ বিকালে নষ্ট হয়ে যায়—এও জীবাণুর কাজ; কিন্তু দুধ যদি দিনে ২।১ বার গরম করে কিংবা রেফ্রিজারেটরে রাখা যায়, তা হলে আর নষ্ট হয় না। খুব বেশী ঠাণ্ডায়

(৫° সেন্টিগ্রেডের নীচে) বা বেশী তাপমাত্রায় (৭০°-৮০° সেন্টিগ্রেড) বেশীর ভাগ জীবাণু বাঁচে না। এজন্যে খাদ্যদ্রব্য, মাছ, মাংস, ডিম, আলু প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্যে ঠাণ্ডা কুঠুরীতে রাখা হয়। দুধ যাতে বীজাণুর সংস্পর্শে দূষিত না হয়, তার জন্যে ৭০°-৮০° সেন্টিগ্রেডে গরম করে রাখা হয়। পাস্তুরের উদ্ভাবিত বলে তাঁর নাম অনুসারে এই অবস্থাকে বলা হয় পাস্তুরাইজেসন। এরূপে জ্বাল দেওয়ার ফলে দুধে কোন সংক্রামক রোগের বীজাণু থাকলে সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি ঠিক এই কারণেই গরম জলে ফুটিয়ে নেওয়া হয়। একে ষ্টেরিলাইজেসন বলা হয়; যেমন—তুলা, ব্যাণ্ডেজ বা ইন্‌জেক্‌শনের সূচ প্রভৃতি বিশোধিত করা হয় উত্তাপের সাহায্যে।

যে শ্রেণীর জীবাণুর প্রাণধারণের জন্যে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না, সেই শ্রেণীর জীবাণু থেকে নানারকম বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই কারণে টিনের খাবার ব্যবহার করে অনেক সময় শোচনীয় ব্যাপার ঘটে।

রোগ-সংক্রামক জীবাণুধ্বংসের নানা উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। উত্তাপের সাহায্য তো নেওয়া হয়ই, তাছাড়া অতিবেগুনী রশ্মি-বিকিরণ পদ্ধতি এবং নানারকম ওষুধও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বায়ু এবং পানীয় জল নির্দোষ করবার জন্যে লাইসল, ডেটল ইত্যাদির ব্যবহার হয়। পচনশীল খাদ্যদ্রব্য রক্ষা করবার জন্যে ব্যবহৃত হয় বীজাণু ধ্বংসকারী রাসায়নিক দ্রব্য। পেনিসিলিনজাতীয় ওষুধে মানুষের শরীরে বীজাণু-কৃত রোগ উপশমে যথেষ্ট সাহায্য হয়েছে। কিন্তু মানুষ যেমন বীজাণু ধ্বংসকারী উপায় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, বীজাণুও তেমনি এসব ওষুধের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে থাকে। তাই শক্তিশালী অ্যান্টিবায়টিক্সের প্রতিক্রিয়াও জীবাণুদের ক্রমশঃ সহ্য হয়ে যায়; তখন আর ঐ সব ওষুধে ফল পাওয়া যায় না। এই কারণে ঐসব ওষুধের অতিরিক্ত ব্যবহার ক্ষতিকারক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

পুষ্প মুখোপাধ্যায়

অ্যাম্বারগ্রীজ

তিমি মাছের কথা তোমাদের অজানা নেই। তিমি, মাছ বলে পরিচিত হলেও আসলে কিন্তু এরা স্তন্যপায়ী প্রাণী। এই তিমি মাছের দেহ থেকে মূল্যবান একপ্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। এই পদার্থটির নাম অ্যাম্বারগ্রীজ। স্পার্ম-হোয়েল নামক তিমির অন্ত্র থেকেই অ্যাম্বারগ্রীজ নিঃসৃত হয়। বাংলায় এই পদার্থটিকে অম্বর বলা যেতে পারে।

যে সব অঞ্চলে সাধারণতঃ অ্যাম্বারগ্রীজ পাওয়া যায়—সেখানকার অধিবাসীদের অনেকেই এই বস্তুটি পাবার আশায় প্রতিদিন সমুদ্রের তীরে যায়। সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে যে সব বস্তু তীরে এসে পড়ে—তাথেকে কতকগুলিকে (যেমন—মৃত মৎস্যের টুক্‌রা, রাবার ইত্যাদি) অ্যাম্বারগ্রীজ মনে করে অনেকেই কুড়িয়ে নিয়ে মহানন্দে ফিরে আসে। আনন্দের কারণ হলো—অ্যাম্বারগ্রীজ বিক্রয় করে তারা রাতারাতি বড়লোক হতে পারবে। কিন্তু অধিকাংশেরই এই আশা পূর্ণ হয় না।

অ্যাম্বারগ্রীজ সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল নতুন নয়। প্রাচ্যের প্রাচীন পুঁথি-পুস্তকে এর উল্লেখ আছে। এর উৎপত্তি সম্পর্কে সে যুগেও মানুষের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। অনেকের ধারণা ছিল—এই মূল্যবান পদার্থটি তিমির দেহে উৎপন্ন হয় না। পাখী, সিল, কুমীর, মৌমাছি প্রভৃতির দেহে অ্যাম্বারগ্রীজ উৎপন্ন হয় এবং তিমি ঐ সব প্রাণীকে গিলে ফেলে বলেই শেষ পর্যন্ত তিমির দেহ থেকে এই বস্তুটি পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে সন্দেহাতীতভাবে জানা গেছে—অ্যাম্বারগ্রীজ সোজাসুজি তিমির অন্ত্রেই উৎপন্ন হয়ে থাকে।

তিমির অন্ত্র থেকে অ্যাম্বারগ্রীজ নিঃসৃত হবার পর প্রথমে দেখায় যেন কালো রঙের প্রকাণ্ড এক তাল আঠালো পদার্থ জলের উপর ভাসছে। সাধারণতঃ সেগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে যায় এবং সহজে অ্যাম্বারগ্রীজ বলে চেনা যায় না। অ্যাম্বার-গ্রীজ থেকে প্রথমে একটা তীব্র দুর্গন্ধ নির্গত হতে থাকে; কিন্তু ক্রমশঃ দুর্গন্ধ এবং কালো রঙের গাঢ়তা কমে আসে। খুব পুরনো অ্যাম্বাগ্রীজের রং খড়ি-মাটির মত সাদা এবং সেগুলি খুবই মূল্যবান। অ্যাম্বারগ্রীজ থেকে দুর্গন্ধ ক্রমশঃ কমে যাবার পর আঁশ্‌টে গন্ধ পাওয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত এক রকম সুগন্ধ নির্গত হতে থাকে।

অ্যাম্বে্রইন (ambrein) নামক একপ্রকার পদার্থ অ্যাম্বারগ্রীজের প্রধান উপাদান। এগুলি বেশ শক্ত এবং সাদা রঙের সরু ও লম্বা সূচের মত দেখায়। ঘষ্‌লে এগুলির মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ভ্যানাডিয়াম বা তামা সহযোগে সূর্যালোক, বাতাস

এবং সমুদ্রের জলের প্রভাবে অ্যাম্বেইন অ্যাম্বারগ্রীজে রূপান্তরিত হয়। অ্যাম্বেইন কয়েক জাতের স্কুইডের দেহে থাকে। তিমি এই স্কুইডগুলিকে খাদ্য হিসাবে উদরস্থ করে।

প্রসাধনের দ্রব্যাদিতে অ্যাম্বারগ্রীজ আজকাল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পূর্বে কিন্তু এছাড়াও খাদ্য, পানীয়, ওষুধ, তামাক ইত্যাদিতে অ্যাম্বারগ্রীজের ব্যবহার ছিল। কোন কোন দেশে অ্যাম্বারগ্রীজ জলাতঙ্ক, মৃগী, পাথরী, স্নায়ুদৌর্বল্য, হাঁপানি প্রভৃতি রোগের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এছাড়া আগে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, অ্যাম্বারগ্রীজের ভূত তাড়াবার ক্ষমতা আছে। কোন কোন দেশের অধিবাসীরা অ্যাম্বারগ্রীজ দিয়ে একরকম বড়ি তৈরী করে দাঁতে চিবাতো। মজার কথা হলো এই যে, চর্বণ করা সত্ত্বেও নাকি ঐ বড়িগুলি আকারে ছোট হতো না।

প্রায় হাজার বছর আগেও আফ্রিকায় অ্যাম্বারগ্রীজের ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং সেগুলি খুব মূল্যবান বলে বিবেচিত হতো। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীনারা হাতীর দাঁত, সোনা এবং অ্যাম্বারগ্রীজ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে অভিযান চালাতো। তারা অ্যাম্বারগ্রীজের নাম দিয়েছিল লাং-ইয়েন বা ড্রাগনের থুথু। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সার জন কার্ডিন পারস্যে বিভিন্ন মিষ্ট ও প্রসাধন দ্রব্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে কস্তুরী ও অ্যাম্বারগ্রীজ ব্যবহারের কথা লিখেছিলেন।

বর্তমানে অবশ্য অ্যাম্বারগ্রীজের বহুবিধ ব্যবহারের কথা শোনা যায় না। এখন এটি কেবলমাত্র দামী প্রসাধন সামগ্রীতে ব্যবহৃত হয়। অ্যাম্বারগ্রীজ ব্যবহারের ফলে প্রসাধন সামগ্রী খুব সামান্যই সুগন্ধযুক্ত হয়। কিন্তু এর প্রধান গুণই হলো—অন্যান্য যেসব দামী সুগন্ধি উপকরণের দ্বারা গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাদের সুগন্ধ বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখে। তাছাড়া অ্যাম্বারগ্রীজ ব্যবহারের ফলে গন্ধদ্রব্যসমূহ মখমলের মত মোলায়েম হয়। দেখা গেছে—অ্যাম্বারগ্রীজবিহীন গন্ধদ্রব্যের সুগন্ধ অল্প কয়েকদিন মাত্র স্থায়ী হয়।

সুইস ও জার্মেনীর রসায়ন-বিজ্ঞানীরা ত্রিশ বছর গবেষণার পর কৃত্রিম অ্যাম্বেইন তৈরী করতে সক্ষম হন এবং বাজারে এগুলি অ্যাম্বোপার ও গ্রীজঅ্যাম্বল নামে পরিচিত। এই কৃত্রিম অ্যাম্বারগ্রীজ উৎকৃষ্ট জাতের আসল অ্যাম্বারগ্রীজের দামের তুলনায় খুবই সস্তা। ফলে এখন কম দামের প্রসাধন সামগ্রীতে কৃত্রিম অ্যাম্বারগ্রীজ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে এবং এর ফলে আসল অ্যাম্বারগ্রীজের দামও কমে গেছে।

অ্যাম্বারগ্রীজের ভাসমান তালগুলি ছোট-বড় নানারকমের হয়ে থাকে। ১৯৫৩ বিরাট সালে ডাঃ রবার্ট ক্লার্ক নামক তিমি-বিশেষজ্ঞ একজন ইংরেজ ৯২৬ পাউণ্ড ওজনের একটি অ্যাম্বারগ্রীজের ডেলার সন্ধান পেয়েছিলেন। সেটি দৈর্ঘ্যে ছিল ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৩০ ইঞ্চি। অ্যানটার্কটিকা মহাদেশে ধৃত একটি ৪৯ ফুট লম্বা পুরুষ তিমির

অন্ত্র থেকে এটি পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য আরও বড় অ্যাম্বারগ্রীজের কথাও শোনা গেছে। ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৮০ সালে ৯৮২ পাউণ্ড ওজনের এক তাল অ্যাম্বারগ্রীজের সন্ধান পেয়েছিল। জানা গেছে—এ পর্যন্ত এটাই নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বৃহদাকৃতির অ্যাম্বারগ্রীজ। সাধারণতঃ এথেকে কম ওজনের অ্যাম্বারগ্রীজই বেশী পাওয়া গেছে। ১৮২ পাউণ্ড ওজনের একটি অ্যাম্বারগ্রীজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী থেকে কিনেছিলেন থাইডোরের রাজা। ২৮০ ও ৩৫০ পাউণ্ড ওজনের তুটি অ্যাম্বারগ্রীজ পাওয়া গিয়েছিল যথাক্রমে নিউজীল্যাণ্ড ও নরওয়েতে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই অ্যাম্বারগ্রীজ পাওয়া যায়। তবে বাহামা, ব্রেজিল, আফ্রিকা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, পেরু, ম্যাডাগাস্কার, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মলাক্কাস প্রভৃতি অঞ্চলে তিমির সংখ্যাধিক্য থাকায় সেখানে অ্যাম্বারগ্রীজ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

শ্রীনীহাররঞ্জন ভট্টাচার্য

মহাশূন্যে অভিযান

(কথায় ও চিত্রে)

১। মহাশূন্য—মানুষ বহুকাল থেকেই পৃথিবী ছেড়ে মহাশূন্যের পথে গ্রহান্তর যাবার স্বপ্ন দেখে আসছে। বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষের এই স্বপ্ন আজ দ্রুত বাস্তবে

১নং চিত্র

রূপায়িত হতে চলছে। মহাশূন্য অভিযানে সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করলে মানুষ নানাভাবে উপকৃত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—মহাশূন্য অভিযানের ফলে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক

তথ্যাদির সাহায্যে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতিবিধান সম্ভব। তাছাড়া পৃথিবীব্যাপী বেতার ও টেলিভিসন ব্যবস্থার উন্নতিবিধানের সম্ভাবনাও আছে।

২। মহাশূন্যের ইতিহাস—গ্যালিলিও কর্তৃক দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবনের আগে মহাশূন্য সম্বন্ধে মানুষের অতি সামান্যই জ্ঞান ছিল। সুতরাং মহাশূন্য সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নেরই সমাধান সে খুঁজে পায় নি। ১৬১০ সালে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কিছু প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পান। এর ফলে মহাশূন্য সম্বন্ধে মানুষের জানবার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়।

২নং চিত্র

ইতিহাসের সূচনা থেকে মানুষ স্বর্গের কল্পনা করেছে এবং সেখানে ভ্রমণের স্বপ্ন দেখেছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত টলেমী এবং চীন, আরব ও অন্যান্য দেশের পণ্ডিতেরা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন।

৩নং চিত্র

৩। মহাশূন্য অভিযানের বর্তমান স্তর—খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীক পণ্ডিত

লুকিয়ান প্রথম মহাশূন্য ভ্রমণের এক কল্পিত কাহিনী রচনা করেন। তাঁর এই কাহিনীতে বলেছিলেন—ঝড়ের বেগে খুব দ্রুত ঘুরতে ঘুরতে একটা জাহাজ চাঁদে গিয়ে পড়েছিল। আঠারো-শ' বছরের পর লুকিয়ানের কল্পনা আজ বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার পথে। মানুষ মহাশূন্যে রকেট পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। এই রকেটের সহায়তায় সে মহাশূন্য সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেছে। বর্তমানে মানুষ নিজেকেই মহাশূন্যে পাঠাবার তোড়জোড় করছে।

৪। রকেট—মহাশূন্য অভিযানের বর্তমান চাবিকাঠি, অর্থাৎ প্রধান বাহক হচ্ছে রকেট। মানুষ বহু শতাব্দী আগে থেকেই এই রকেটের অতিক্ষুদ্র আদিম সংস্করণের কথা জানতো এবং ব্যবহারও করতো। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়—১২৩২ খৃষ্টাব্দের

৪নং চিত্র

আগে থেকেই চীন দেশে উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে রকেট বা হাউই আকাশে ছোঁড়া হতো। আজও অনেক উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে হাউই ছোঁড়া হয়। অবশ্য প্রথম যুগের সেই রকেট উন্নত ধরণের ছিল না। সেগুলি মাত্র কয়েক-শ' ফুট উপরে উঠতে পারতো—তাও আবার কোন্ দিকে যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

৫। রকেটের উন্নতি—এশিয়া থেকেই ইউরোপে রকেটের প্রচলন হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সার উইলিয়াম কনগ্রেভ নামক একজন ইংরেজ প্রচলিত রকেটের উন্নতিসাধন করেন। এর ফলে রকেট এক মাইলেরও বেশী উপরে উঠতে সক্ষম হতো। কিন্তু তখনও রকেটকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নি। প্রথম যুগের সব রকেটেই জ্বালানী

হিসাবে বারুদ ব্যবহৃত হতো। কঠিন জ্বালানী ব্যবহারে অসুবিধা হতো অনেক।
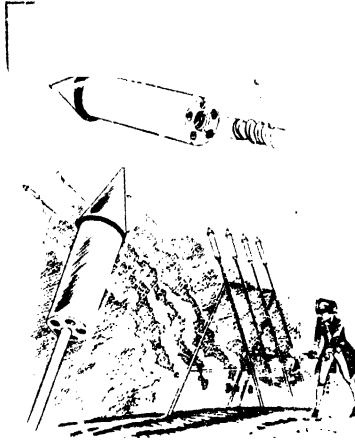
৫নং চিত্র

প্রধান অসুবিধা ছিল—রকেটের বারুদ অনেক সময় সমানভাবে পুড়তো না।

৬। ডাঃ গডার্ড—১৯০০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ রবার্ট এইচ. গডার্ডের গবেষণার ফলে রকেটের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তাঁকে আধুনিক রকেটের জনক বলা যায় এবং তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করেই আধুনিক রকেট নির্মিত হয়েছে। তিনি রকেটে কঠিন জ্বালানীর পরিবর্তে তরল জ্বালানী ব্যবহার করেন। ডাঃ গডার্ড

৬নং চিত্র

ছিলেন কলেজের শিক্ষক। তিনি তাঁর বেতন থেকেই এই গবেষণার ব্যয় নির্বাহ করতেন এবং সে জন্যে তাঁকে আর্থিক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে অনেক। তবু

তিনি দমেন নি। কারণ মহাশূন্য অভিযান এবং রকেট সম্পর্কে গবেষণার গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

৭। রকেট-পরিচালনের তথ্য—তখনকার দিনে ব্যাপক ধারণা প্রচলিত ছিল যে, রকেট থেকে নির্গত গ্যাস বায়ুস্তরে ধাক্কা দিয়ে তাকে সামনের দিকে ঠেলে দেয় এবং এর ফলেই রকেট গতিবেগ লাভ করে। কিন্তু ডাঃ গডার্ডের গবেষণার ফলে এই ধারণা
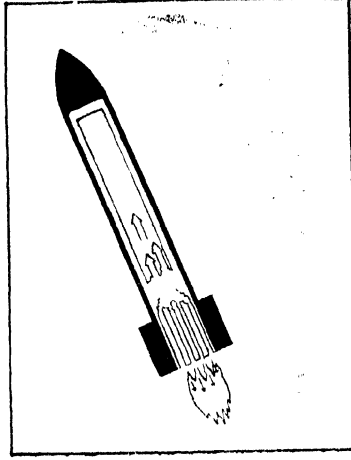
৭নং চিত্র

ভুল প্রমাণিত হয়। ডাঃ গডার্ড পরীক্ষা করে দেখালেন যে, রকেটের অভ্যন্তরে গ্যাসের চাপই রকেটকে সামনের দিকে ঠেলে দেয় এবং এই ধাক্কার ফলে রকেট গতিবেগ লাভ করে। কিন্তু ডাঃ গডার্ডের আবিষ্কার কয়েক বছর পর্যন্ত সমর্থন পায় নি।
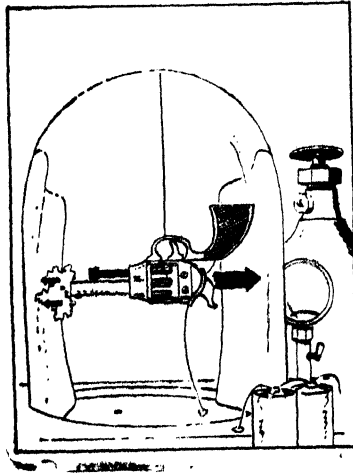
৮নং চিত্র

৮। আবহাওয়া—ডাঃ গডার্ড বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে রকেট

যে গতিবেগ পাবে তার তুলনায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে সে বেশী গতিবেগ লাভ করবে। কারণ সেখানে রকেট কোন বাধার সম্মুখীন হবে না। বায়ুশূন্য বেলজারের মধ্যে পিস্তল থেকে ফাঁকা কার্তুজ ছুঁড়ে তিনি তাঁর ধারণার সত্যতা প্রমাণিত করেন।

৯। তরল জ্বালানী-চালিত রকেট—১৯২৬ সালে ডাঃ গডার্ড প্রথম তরল জ্বালানী-চালিত রকেট উৎক্ষেপণ করেন। রকেটটি মাত্র ১৮৪ ফুট উপরে উঠেছিল। ডাঃ গডার্ডের পরীক্ষা-পদ্ধতি সাফল্যলাভ করলো। তিনি তরল অক্সিজেন ও গ্যাসোলিন

৯নং চিত্র

জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন (এই জ্বালানী আজও রকেট পরিচালনায় ব্যবহৃত হয়)। তিনি জাইরোস্কোপের সাহায্যে রকেটের নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে মূলতঃ এই পদ্ধতিতেই রকেটকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

১০নং চিত্র

১০। জীবনরক্ষক-রকেট—সম্প্রতি রকেটের সাহায্যে মহাশূন্য অভিযানে যে

বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সেই সাফল্যের ইতিহাস একদিনে রচিত হয় নি। প্রথম যুগে যে রকেট প্রচলিত ছিল তা মানুষের বহু প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হতো। তার উপর ভিত্তি করেই আধুনিক রকেটের এই বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। বহু বছর ধরে এই রকেট সামরিক এবং নৌ-বিভাগে সঙ্কেত প্রেরণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া বিপন্ন জাহাজের সাহায্যার্থে রকেটের সাহায্যে দড়ি নিক্ষেপ করে বহু জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

১১। জ্যাটো (J.A.T.O.)—আধুনিক কালে রকেটের আর একটি নাটকীয় এবং খুব কার্যকরী প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হচ্ছে J.A.T.O. (Jet-assisted take-off)। এই পদ্ধতিতে খুব ভারী মালবাহী বিমানে ছোট ছোট রকেট সংযুক্ত থাকে। স্বাভাবিক ভাবে
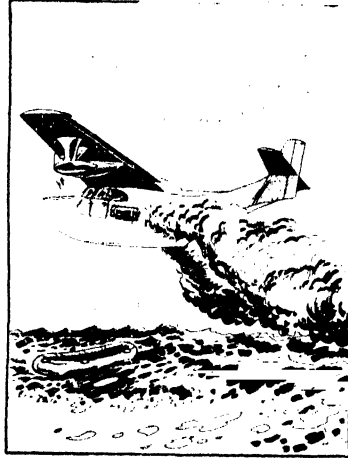
১১নং চিত্র

একটা বিমানের পক্ষে আকাশে উঠতে বিমান বন্দরে যতটা জায়গা লাগে তার তুলনায় কম জায়গাতেই ভারী মালবাহী বিমানগুলি রকেটের সাহায্যে উপরে উঠতে সক্ষম হয়। যেসব জায়গায় বিমান ওঠা-নামা-র সুবিধা নেই—সেখানে জরুরী অবস্থায় এই রকেটসংযুক্ত বিমান খুব কাজ দিতে পারে।

১২। অন্যান্য কাজে রকেট—চাকাহীন একপ্রকার যানের গতিবৃদ্ধিতে রকেটের ব্যবহার খুবই প্রয়োজনীয়। দ্রুতবেগে বিমান চালনা এবং মহাশূন্য পরিভ্রমণ সংক্রান্ত বিশেষ পরীক্ষায় এই চাকাহীন গাড়ীর প্রয়োজন হয়। রকেটের সাহায্যে পাহাড়ের উপর দিয়ে ডাক পাঠানো হয়। স্থলপথে ডাক যেতে যে সময় লাগে—তার

তুলনায় এতে অনেক কম সময় লাগে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখনও কোন কোন
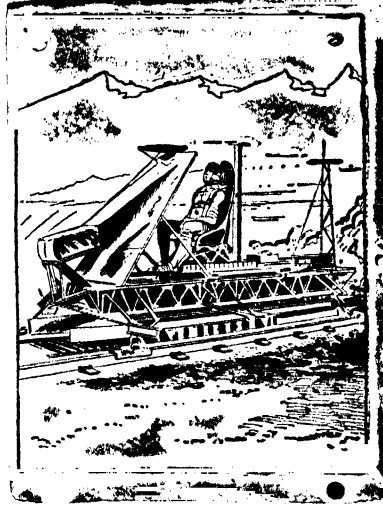
১২নং চিত্র

উৎসব উপলক্ষে আকাশে রকেট ছাড়া হয়।

১৩। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসূচী—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই যুক্তরাষ্ট্র রকেট সম্পর্কিত গবেষণার একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করেন। এই পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো—মানব-জাতির মঙ্গলবিধান। এই পরীক্ষায় সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি পৃথিবীর সর্বত্র

১৩নং চিত্র

প্রচারিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের যে সব কৃতী বিজ্ঞানী এই পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ জেমস্ এ. ভ্যান অ্যালেন, ডাঃ উইলিয়াম এইচ. পিকারিং এবং ডাঃ ওয়ার্ণার ভন ব্রাউনের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৪। বহু-পর্যায়ী রকেট—১৯৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা গবেষণার ফলে স্থির করেন যে, মহাশূন্য অভিযানের জন্যে বহু-পর্যায়ী বা অতিরিক্ত জ্বালানী-চালিত রকেটের

প্রয়োজন। ১৯৪৯ সালে মহাশূন্যে প্রথম একাধিক-পর্যায়ী রকেট প্রেরণ করা হয় এবং

১৪নং চিত্র

রকেটটি উর্ধ্বাকাশে ২৫০ মাইল পর্যন্ত উঠে যায়। বর্তমানে মহাশূন্য সংক্রান্ত পরীক্ষায় এবং মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণে চার বা তারও অধিক পর্যায়ের রকেট ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৫। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষ—বহু-পর্যায়ী রকেটের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম উপগ্রহ বা কৃত্রিম চাঁদ ১৯৫৮ সালে মহাশূন্যে পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ কক্ষে প্রেরিত হয়েছিল। এই পরীক্ষা-কার্যটি আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষের কর্মসূচীর অন্তর্গত
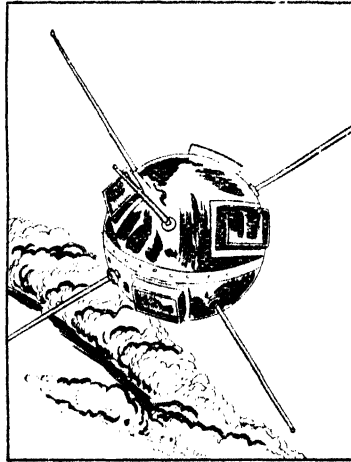
১৫নং চিত্র

ছিল। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষের কার্যাবলী আঠারো মাস ধরে চলেছিল। পৃথিবীর ৬৬টি দেশের বিজ্ঞানীরা পৃথিবী, সমুদ্র, আবহাওয়া, সূর্য ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণা করে অনেক নতুন তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

বিবিধ

সাধারণ আগাছার অসাধারণ গুণ

রাস্তার ধারে, নালার পাড়ে যেখানে-সেখানে শিয়ালকাঁটা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সার হিসাবে উহার উপকারিতার কথা কৃষকদের সম্পূর্ণ অজানা না থাকিলেও উহার প্রকৃত মূল্য পুরাপুরি জানা ছিল না। বস্তুতঃ ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মায় বলিয়া উহার সম্বন্ধে লোকের খারাপ ধারণাই ছিল।

লক্ষ্ণৌয়ের জাতীয় বোটানিক্যাল গার্ডেনে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই আগাছার নানারকম মাটির ক্ষার নষ্ট করিবার আশ্চর্য ক্ষমতা রহিয়াছে। নোনা মাটিতে চাষ সম্ভব নহে; কিন্তু এই আবিষ্কারের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু অনুর্বর জমির সংস্কার করা সম্ভব হইবে।

সার হিসাবে শিয়ালকাঁটা ব্যবহারের পদ্ধতি খুবই সহজ। প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া শুষ্ক করিবার পর উহা গুঁড়া করিয়া সেচের জলের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয়।

লক্ষ্ণৌয়ের নিকটে বাম্বরায় জাতীয় বোটানিক্যাল গার্ডেনের কর্মীদল শিয়ালকাঁটা ব্যবহার করিয়া প্রায় ৬৫০ একর নোনা মাটির সংস্কার করিয়াছেন। ইহার ফলে এই জমিতে উল্লেখযোগ্যভাবে শস্যোৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। একর প্রতি ১৫ মণ ধান উৎপন্ন হইয়াছে। এই রাজ্যে গড়ে একর প্রতি ১০ মণ ধান উৎপন্ন হয়।

বাম্বরায় কাজ এখনও শেষ হয় নাই। শিয়ালকাঁটা ব্যবহারের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণাগারে এখনও পরীক্ষা চলিতেছে।

তামাক বীজের তেল হইতে বনস্পতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়ন বিভাগে গবেষণার ফলে বনস্পতি প্রস্তুতের জন্য তামাক বীজের তেল ব্যবহার করা সম্ভব বলিয়া জানা গিয়াছে।

পাশ্চাত্যে তামাক বীজের তেল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও কোন ক্ষতি হয় নাই। ভারতে তামাক বীজের তেল প্রলেপের জন্য সামান্য পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং অধিকাংশ তেলই বিদেশে রপ্তানী করা হয়। বর্তমানে যে পরিমাণে তামাকের চাষ হয় তাহাতে মনে হয় যে, প্রতি বৎসর ১৯ হাজার টন তামাক বীজের তেল আমাদের দেশে পাওয়া যায়।

জার্ণ্যাল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইনডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর গত নভেম্বর মাসের সংখ্যায় তামাক বীজের তেল পরিশোধন ও উহাতে হাইড্রোজেন প্রয়োগের পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে।

আগাছা নিয়ন্ত্রণে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার

নয়াদিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণাগারের কৃষিতত্ত্ব বিভাগে গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, বাথুপিয়াজি, হিরণখুরি, পিতপাপর, পোহলি, কৃষেননিল প্রভৃতি তণ্ডুলজাতীয় শস্যের সঙ্গে যে আগাছা জন্মায় তাহা ৪-ডাইক্লোরোফোক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড দিয়া নষ্ট করা যায়।

আগাছার জন্য শস্যের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। তণ্ডুলজাতীয় শস্যের ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ ৫ হইতে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত হইয়া থাকে। সাধারণভাবে হিসাব করিলেও বৎসরে মোট উৎপন্ন গমের দশ শতাংশ নষ্ট হওয়ার অর্থ ৮ লক্ষ টন, অর্থাৎ ৩১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার গমের অপচয়।

মিশ্র চাষের সুফল

পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহীশূরে সম্প্রতি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মিশ্র চাষের ফলে যথেষ্ট আর্থিক লাভ হইতে পারে।

পাঞ্জাবে মিশ্র চাষ বেশ লাভজনক। এখানে সাধারণতঃ তুলা ও চীনাবাদাম এক সঙ্গে চাষ করা হয়। গত বৎসর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে তুলার ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। কিন্তু চীনাবাদামের চাষ ভাল হয় বলিয়া কৃষকদের ক্ষতি হয় নাই।

অন্ধ্রপ্রদেশের গুণ্টুর জেলায় তুলার সঙ্গে লঙ্কা ও চীনাবাদামের চাষ করিয়া একর প্রতি ২১ টাকা হইতে ৯৩ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত লাভ হইয়াছে।

মহীশূরের ধারওয়ারে শুধু লক্ষ্মী তুলা চাষ না করিয়া মিশ্র চাষ করিবার ফলে বেশী লাভ হইয়াছে।

কাশ্মীরে জিপ্‌সাম খনির সন্ধান

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা কাশ্মীরে জিপ্‌সামের খনির সন্ধান পাইয়াছে। বরমুলা জেলায় ঝিলাম নদীর উত্তর দিকস্থ পার্বত্য অঞ্চলে যে স্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ৯১·৭৫ শতাংশ জিপ্‌সাম রহিয়াছে।

এই স্তরের ১০০ ফুট গভীর পর্যন্ত মোট ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ১০ হাজার টন জিপ্‌সাম পাওয়া যাইবে।

পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট ও প্লাষ্টার অব প্যারিস প্রস্তুত করিবার জন্য এই জিপ্‌সাম ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কম খরচে উইণ্ড-মিল

ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা এবং গৃহে জল সরবরাহের জন্য কম খরচে উইণ্ড-মিল নির্মাণের পদ্ধতি ব্যাঙ্গা-লোরের অ্যারোনটিক্যাল গবেষণাগারে উদ্ভাবন করা হইয়াছে। এই উইণ্ড-মিল নির্মাণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ আমাদের দেশে পাওয়া যায়। এই উইণ্ড-মিল প্রস্তুতের সময় ভারতের বিভিন্ন অংশে হাওয়ার গতি-প্রকৃতির কথা বিবেচনা করা হইয়াছে।

উইণ্ড-মিলের নক্সাটি খুবই সরল এবং উহা নির্মাণ ও মেরামত সহজেই করা যায়। একটি উইণ্ড-মিল নির্মাণ করিতে আনুমানিক প্রায় ২৫০০ টাকার প্রয়োজন হইবে। প্রথম দফায় ২০০টি উইণ্ড-মিল প্রস্তুত করিয়া দেশের বিভিন্ন সংস্থানে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ধাতুর খাদ ব্যবহারের পদ্ধতি উদ্ভাবন

রুড়কীয় কেন্দ্রীয় গবেষণাগার ব্লাষ্ট ফার্ণেস হইতে প্রাপ্ত ধাতুর খাদ কাজে লাগাইবার পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছে। এক টন কাঁচা লোহা প্রস্তুত করিলে আধ টন খাদ পাওয়া যায়।

এই খাদ জলে ভাল করিয়া ভিজাইবার পরে উহার সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ চূন ও বালি মিশাইয়া গাঁথুনি ও প্লাষ্টারের কাজে ব্যবহার করা হয়। সমুদ্রের জলেও উহা মিশ্রিত করা যায় এবং ভূগর্ভে ভিত্তি নির্মাণে উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মহাশূন্যে দীর্ঘকাল বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা

একটি ক্ষুদ্রাকৃতি পারমাণবিক চুল্লী বা রিয়্যাক্টর সাফল্যের সহিত চালু করা হইয়াছে বলিয়া যুক্ত-রাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনার জন. এ. ম্যাককোন ঘোষণা করিয়াছেন। মহাশূন্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিদ্যুৎ-শক্তির সরবরাহ অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যেই এই পারমাণবিক চুল্লীর পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ওয়াশিংটনের মার্কিন রকেট সমিতিতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ ম্যাককোন উক্ত ঘোষণা করেন।

রিয়্যাক্টরটির ওজন প্রায় ২০০ পাউণ্ড এবং উহার আকার ৫ গ্যালন তরল পদার্থ ধরিতে পারে, এরূপ একটি পাত্রের অনুরূপ। এই চুল্লীটি চালু করা

হইলে একটি ক্ষুদ্র টার্বো-ইলেকট্রিক জেনারেটরে শক্তি উৎপাদনের জন্য তাপ সরবরাহ করে।

গত ৯ই অক্টোবর (১৯৫৯) সর্বপ্রথম এই রিয়্যাক্টরটির পরীক্ষা সুরু হয় এবং তিন দিনের অধিক কাল ক্রমাগত পরীক্ষাকার্য চালানো হয়। পুরা তিন কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকল্পে জেনারেটরটির যে পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন, রিয়্যাক্টরটি তাহা কমপক্ষে এক বৎসরকাল পর্যন্ত সরবরাহ করিতে সক্ষম।

মহাশূন্য-যানে বার্তা-প্রেরক ও দূরত্ব পরিমাপক যন্ত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য এই রিয়্যাক্টরটি ব্যবহৃত হইবে। ইহা ষ্টোরেজ ব্যাটারী অপেক্ষা উন্নততর; কারণ ইহা দীর্ঘকাল কার্যকরী থাকে। বর্তমানে কৃত্রিম উপগ্রহের অনেকগুলিতেই সৌরশক্তি-চালিত ব্যাটারী ব্যবহার করা হইতেছে। কিন্তু মহাশূন্যে যেখানে সূর্য হইতে বিকিরণ অত্যন্ত ক্ষীণ হয়, সেখানে যন্ত্রস্থিত সৌরকোষগুলি কাজ করিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রেও নবাবিষ্কৃত রিয়্যাক্টর বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহে সক্ষম।

দুধের জন্য তামাটে বোতল

কোপেনহাগেনের একটি কারখানায় দুধের জন্য চিরকালের পরিষ্কার বোতলের পরিবর্তে তামাটে রঙের বোতল নির্মিত হইতেছে। ডেনিশ বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সাধারণ কাচের উপর সূর্যের আলোর প্রভাবে দুধের 'গ' খাদ্যপ্রাণ ৭৫ শতাংশ হ্রাস পায়। কিন্তু তামাটে বোতলে 'গ' খাদ্যপ্রাণ এই ভাবে হ্রাস পাইবে না; মাত্র ১'৩ শতাংশ কমিতে পারে।

উষ্ণ আবহাওয়ায় কার্যক্ষমতার পরীক্ষা

লিভারপুলের স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ একদল চিকিৎসক একটি "ঔষধ কক্ষ" তৈয়ার করিয়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় আবহাওয়ায় কার্যক্ষমতা সংক্রান্ত সমস্যাবলী পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

কক্ষের দেওয়ালগুলি তাপ-অপরিচালক। একটি বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে সাধারণ ঘরোয়া কনভেকটর হিটার হইতে উত্তপ্ত বাতাস কক্ষের মধ্যে সঞ্চালিত করা হয় এবং ঘণ্টায় তিনবার করিয়া তাহা পরিবর্তন করা হয়। আর্দ্রতার প্রয়োজনীয় মাত্রা বজায় রাখা হয় একটি বৈদ্যুতিক ইমার্শন হিটার হইতে উদ্গত বাষ্পের সাহায্যে। কক্ষের মধ্যে একটি বিদ্যুৎ-চালিত ট্রেডমিল আছে। ট্রেডমিলটি মানুষকে সর্বদা হাঁটিয়া চলিতে বাধ্য করে।

কৃত্রিম আবহাওয়া প্রাকৃতিক আবহাওয়া হইতে ভিন্ন হইলেও চিকিৎসকগণ মনে করেন, ইহা তাঁহাদের পরীক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাঁহারা ইচ্ছামত আবহাওয়া, অর্থাৎ বাতাসের গতি, তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

তিন জন চিকিৎসক এই পরীক্ষায় গিনিপিগের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। ট্রেডমিলের উপর অবস্থান কালে তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে নাড়ীর স্পন্দন এবং উত্তাপ পরিমাপের কয়েক রকম ব্যবস্থা রাখেন। ট্রেডমিলের উপর এই ভাবে ১০০° উত্তাপের মধ্যে কিছুক্ষণ চলিবার পর ঘর্মের দরুণ কি পর্যন্ত জ্ঞান হারাইয়াছেন তাহা দেখিবার জন্য তাঁহাদিগকে সরাইয়া আনা হয়। প্রতিদিন তিন হইতে চার ঘণ্টা তাঁহারা এই ভাবে উষ্ণ কক্ষে গিনিপিগের কাজ করিয়া থাকেন।

অন্ধের চশমা

মস্কোর বেতার সংবাদে ঘোষণা করা হইয়াছে—জনৈক সোভিয়েট বিজ্ঞানী মানুষের দেহচর্মের উপর আলোকের প্রতিক্রিয়াকে ভিত্তি করিয়া অন্ধদের জন্য একরকম চশমা প্রস্তুত করিয়াছেন।

কপালে এই চশমা পরিয়া অন্ধেরা সূর্যালোকে প্রতিটি জিনিষই দেখিতে পাইবে। আলোক সম্পর্কে দেহের সংবেদনশীলতার মাত্রা বাড়াইবার জন্য আরও পরীক্ষা চালানো হইতেছে।

ভারতীয় অধ্যাপকের সম্মান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দাস সম্প্রতি ফরাসী গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অফিসার দে লা'অর্ডার দে লা স্যান্তে পাব্লিক (Officer de l'order de la sante publique) উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ইতিপূর্বে এদেশের আর কেহ এই বিশেষ সম্মান লাভ করেন নাই। যৌগিক ক্রিয়াকলাপের সময় মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গের পরিবর্তন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন এবং ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, সুইজারল্যাণ্ড হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি কয়েকবার ইউরোপ গিয়াছেন। ১৯১৫ সালে ফ্রান্সে এক আন্তর্জাতিক সভার অধিবেশনে ডাঃ দাস তাঁহার গবেষণার ফলাফল উপস্থিত করিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। তৎপূর্বে তিনি আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তিনি ইতিপূর্বে ইউনেসকো হইতে 'ব্রেইন রিসার্চ এক্সপার্ট' আখ্যাও লাভ করিয়াছেন। ১৯৫৫ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বরোদা অধিবেশনে তিনি শারীরতত্ত্ব শাখার সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ দাস আচার্য জগদীশচন্দ্রের একজন প্রাক্তন শিষ্য এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের একজন পুরাতন সভ্য।

চন্দ্রের নূতন মানচিত্র

ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক জেনেক কোপাল জানাইয়াছেন যে, এক বৎসরের মধ্যে বৃটেন, ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্র যুক্তভাবে চন্দ্রের ১০৫,০০০,০০০ স্কেলের একটি নূতন মানচিত্র প্রস্তুত করিবে। তিনি বলিয়াছেন, কয়েক বৎসরের মধ্যে একটি ১ : ১,০০০,০০০ স্কেলের মানচিত্রও এই সঙ্গে প্রস্তুত করা হইবে।

এই কাজে যাহারা অংশ গ্রহণ করিবে, তাহাদের মধ্যে আছে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগ, ফরাসী পেরিনিসের অবজারভেটরি এবং যুক্তরাষ্ট্র বিমান-বাহিনীর এয়ার রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কমাণ্ড-এর কেম্ব্রিজ গবেষণা কেন্দ্র।

অধ্যাপক কোপাল ম্যাসাচুসেট্সের কেম্ব্রিজ গবেষণা কেন্দ্রের সহিত আলোচনার পর সম্প্রতি ম্যাঞ্চেস্টারে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এই সম্পর্কে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জেমস্ রিং কর্তৃক উদ্ভাবিত স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত ক্যামেরা ব্যবহার করা হইবে। অধ্যাপক কোপাল এবং তাঁহার সহকর্মীগণ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব লইবেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে মানচিত্র প্রস্তুতের কাজ হইবে কেম্ব্রিজ গবেষণা কেন্দ্রে।

১৯৫৮ সালের বসন্ত কালে কেম্ব্রিজ গবেষণা কেন্দ্র এবং ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আলোচনার পর চন্দ্রের মানচিত্র প্রস্তুত সংক্রান্ত কাজকর্ম আরম্ভ হয়। অধ্যাপক কোপাল এই আন্তর্জাতিক কার্য পরিচালনা করিতেছেন। তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বিগত যুদ্ধের পূর্বে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কোর্সে শিক্ষালাভ করেন। নয় বৎসর পূর্বে তিনি ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপক কোপাল আমেরিকার নাগরিক।

দশ লক্ষ বৎসর পূর্বে

সোভিয়েট সংবাদ-প্রতিষ্ঠান টাস জানাইতেছে, জর্জিয়ান বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর পক্ষ হইতে প্রেরিত অভিযাত্রী দল পূর্ব-জর্জিয়ায় প্রায় দশ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার একটি হস্তীর-কঙ্কাল খুঁজিয়া পাইয়াছে। কঙ্কালটি প্রায় ১৫ ফুট লম্বা—উহার ওজন দুই টনের সামান্য কিছু বেশী।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরণের হস্তী প্রায় ১০ লক্ষ বৎসর পূর্বে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই ধরণের কঙ্কাল পৃথিবীতে মাত্র দুইটি রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি আছে প্যারিস যাদুঘরে এবং অপরটি আছে লেনিনগ্রাড যাদুঘরে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োদশ বর্ষ | মার্চ, ১৯৬০ | তৃতীয় সংখ্যা

পরমাণু-বিভাজন

শ্রীসরোজকুমার দে

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিস্ময়কর আবিষ্কার পরমাণু-বিভাজন। প্রকৃতিকে জয় করবার জন্যে মানুষের অক্লান্ত সাধনা সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে বর্তমান যুগে। অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর অভ্যন্তরে যে প্রচণ্ড শক্তি সুপ্তাবস্থায় নিহিত রয়েছে—তাকে আয়ত্তে আনবার জন্যে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে আজ মানুষ করায়ত্ত করেছে এবং সে শক্তিকে বর্তমানে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

পরমাণু-বিভাজনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে পদার্থের কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার বিষয় কিছু বলা দরকার। বিজ্ঞানী স্যাডউইক আল্ফা কণিকার সংঘাতে বেরিলিয়াম ধাতু থেকে নির্গত নিউট্রন নামক মৌলিক কণিকা আবিষ্কার করেন। অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে আল্ফা কণিকার সংঘাতের ফলাফল সম্পর্কিত গবেষণাকালীন ১৯৩৪ সালে প্রখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী-দম্পতি ফ্রেডারিক জোলিও ও আইরিন কুরি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন। অ্যালুমিনিয়াম ধাতুকে আল্ফা কণিকার দ্বারা আঘাত করবর সময়ে নিউট্রন নির্গত হওয়া ছাড়া আরও একটি নতুন বৈশিষ্ট্য তাঁদের নজরে পড়ে। আল্ফা কণিকার উৎস সরিয়ে নিয়ে যাবার পরেও বেশ কিছু সময়ব্যাপী সংঘাত-প্রাপ্ত ধাতু থেকে পজিট্রন নামক মৌলিক কণিকা নির্গত হতে থাকে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আল্ফা কণিকার সঙ্গে সংঘাতের ফলে অ্যালুমিনিয়াম তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস আইসোটোপে পরিণত হয়। এই তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস থেকে পজিট্রন নির্গত হয় এবং পরে সেটি স্থায়ী সিলিকনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। জোলিও ও আইরিন কুরি এভাবে ম্যাগ্নেসিয়াম ও বোরন নামক ধাতুকে আল্ফা কণিকার সংঘাতের দরুণ যথাক্রমে তেজস্ক্রিয় সিলিকন ও নাইট্রোজেন আইসোটোপে পরিণত হতে দেখেন এবং সেগুলি আবার পজিট্রন নির্গত করে স্থায়ী অ্যালুমিনিয়াম ও কার্বনে রূপান্তরিত হয়।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের পরেই ১৯৩৪ সালের মাঝামাঝি প্রখ্যাত ইটালীয় পদার্থ-বিজ্ঞানী এন্‌রিকো ফের্মি আল্ফা কণিকার পরিবর্তে নিউট্রন কণিকার দ্বারা পদার্থের কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করা

যায় কিনা, সে সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁর চিন্তার সূত্র হলো—কেন্দ্রক ও আল্‌ফা কণিকার মধ্যে প্রচণ্ড বিকর্ষণ-শক্তি বর্তমান থাকবার দরুণ আল্‌ফা কণিকাকে কোন পরমাণুর কেন্দ্রক ভেদ করতে গেলে অধিক শক্তিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত আল্‌ফা কণিকা সাধারণতঃ হাল্কা মৌলিক পদার্থ, অর্থাৎ যাদের কেন্দ্রকের চার্জ বা আধান অল্প, তাদের রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম। কিন্তু নিউট্রন হলো বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ; সে জন্যে এই কণিকা প্রায় সব রকম হাল্‌কা বা ভারী মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রক সহজেই ভেদ করতে পারে। ফের্মি ৬০টিরও অধিক মৌলিক পদার্থকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করে লক্ষ্য করেন যে, প্রায় ৪০টি ক্ষেত্রে তারা কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করে এবং সেই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইলেকট্রন এবং কখনও কখনও পজিট্রন নির্গত হয়। ফের্মি আরও দেখেন যে, নিউট্রন শোষণের ফলে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সৃষ্টি কয়েক প্রকারে ঘটে থাকে। হাল্কা পরমাণু কেন্দ্রক নিউট্রন শোষণ করে তেজস্ক্রিয় আই-সোটোপে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ আল্‌ফা কণিকা বা প্রোটন নির্গত করে। যেমন—অ্যালুমিনিয়াম-কেন্দ্রক নিউট্রন শোষণ করে' তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম আইসোটোপে পরিণত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্‌ফা কণিকা নির্গত হতে থাকে। ফস্‌ফরাস-কেন্দ্রকও একই ভাবে তেজস্ক্রিয় সিলিকন আইসোটোপে পরিণত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রোটন নির্গত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভারী পরমাণুর কেন্দ্রক আল্‌ফা কণিকা বা প্রোটনের মত কোন মৌলিক-কণিকা নির্গত না করেও কেবলমাত্র নিউট্রন শোষণ করে' একই ধাতুর তেজস্ক্রিয় আইসোটোপে পরিণত হয়। যেমন—আয়োডিন-কেন্দ্রক নিউট্রন শোষণ করে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন আইসোটোপে পরিণত হয়ে থাকে।

নিউট্রন শোষণের ফলে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সৃষ্টি হবার সময় আল্‌ফা বা প্রোটন কণিকা নির্গত হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে নিউট্রনের শক্তির উপর। নিউট্রনের শক্তি যত কম হবে তত হাল্কা পরমাণু-কেন্দ্রক তেজস্ক্রিয় আইসোটোপে পরিণত হবার সময় আল্‌ফা কণিকা বা প্রোটন নির্গত হবে। যদি খুব শক্তিশালী নিউট্রনের সাহায্যে ভারী পরমাণু-কেন্দ্রককে আঘাত করা যায় তাহলে সে-ক্ষেত্রেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সৃষ্টি হবার সময় আল্‌ফা বা প্রোটন কণিকা নির্গত হতে দেখা যায়। অতএব নিউট্রনের শক্তির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রকারের হাল্কা বা ভারী পরমাণু-কেন্দ্রকে কৃত্রিমভাবে তেজস্ক্রিয়তা সঞ্চারিত হয় এবং অতি ধীরগতিসম্পন্ন নিউট্রনও কেন্দ্রক ভেদ করে তাকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপে পরিণত করতে সক্ষম হয়।

কিভাবে নিউট্রনকে ধীরগতিসম্পন্ন বা থারম্যাল নিউট্রনে (এক ইলেকট্রন ভোল্টেরও কম শক্তি-বিশিষ্ট) পরিণত করা যায়, ফের্মি সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে লাগলেন। একটি নিউট্রন কোন পরমাণু-কেন্দ্রকের সঙ্গে একবার মাত্র সংঘর্ষের ফলেই কেন্দ্রক কর্তৃক শোষিত হয় না—কয়েকটি কেন্দ্রকের সঙ্গে পর পর সংঘর্ষ হবার পর তবে একটি কেন্দ্রক কর্তৃক শোষিত হয়। অতএব যদি প্রাথমিক অবস্থায় একটি বেশ শক্তিশালী নিউট্রন ব্যবহার করা হয় তাহলে প্রতি সংঘর্ষের দরুণ নিউট্রনটি তার গতি-বেগজনিত কিছু কিছু শক্তি এক একটি কেন্দ্রকে প্রয়োগ করবার ফলে নিউট্রনটির শক্তি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে এবং কয়েকটি সংঘর্ষের পর বেশ হ্রাস পেয়ে যায়। ফের্মি পরীক্ষান্তে দেখেন যে, হাইড্রোজেন-কেন্দ্রক বা প্রোটনের সঙ্গে প্রতি সংঘর্ষে নিউট্রনের শক্তি বেশ হ্রাস পায়। দেখা গেছে, প্রোটনের সঙ্গে প্রতি সংঘর্ষে গড়ে নিউট্রনের শক্তি $\frac{১}{২.৭১৮}$ বা $\frac{১}{৩}$ অংশ পড়ে থাকে; অর্থাৎ কয়েকটি সংঘর্ষের পর সেটি থারম্যাল নিউট্রনে পরিণত হয়।

থারম্যাল নিউট্রনের সঙ্গে বিভিন্ন পরমাণু-কেন্দ্রকের সংঘর্ষের ফলাফল পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ফের্মি বেরিলিয়াম ধাতুকে আল্‌ফা কণিকা দ্বারা আঘাত করে' প্রথমে কয়েক মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিবিশিষ্ট নিউট্রন উৎপন্ন করেন। এই নিউট্রন উৎসের চতুর্দিকে কয়েক সেন্টিমিটার পুরু প্যারাফিন বা জলের স্তর দ্বারা আবৃত করে তার বহির্ভাগে পরীক্ষণীয় বস্তুটি এমনভাবে স্থাপন করা হয়, যাতে প্যারাফিনের হাইড্রোজেন-কেন্দ্রকের সঙ্গে কয়েকটি সংঘর্ষের পর শক্তিশালী নিউট্রন থারম্যাল নিউট্রনে পরিণত হয়ে উপরিউক্ত বস্তুতে এসে পৌঁছাতে পারে।

এভাবে উৎপন্ন থারম্যাল নিউট্রনের দ্বারা নানারকম পরীক্ষার পর ফের্মি দেখেন যে, থারম্যাল নিউট্রন কেন্দ্রক কর্তৃক কেবলমাত্র শোষিত হয়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সৃষ্টি করে এবং এ-ক্ষেত্রে তিনি কোন আল্‌ফা কণিকা বা প্রোটন নির্গত হতে দেখেন নি। উপরন্তু অধিক গতিজনিত শক্তিসম্পন্ন নিউট্রন অপেক্ষা থারম্যাল নিউট্রন কৃত্রিমভাবে তেজস্ক্রিয়তা সঞ্চারে অধিক ফলপ্রসূ।

এরপর ফের্মির গবেষণার বিষয় হলো, থারম্যাল নিউট্রন সব রকম মৌলিক পদার্থে তেজস্ক্রিয়তা সঞ্চারে সক্ষম কিনা। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি দেখেন—বোরন, ইরিডিয়াম, ক্যাড্‌মিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি বস্তু খুব বেশী পরিমাণ থারম্যাল নিউট্রন শোষণ করলেও তাদের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা সঞ্চারিত হয় না বরং তার পরিবর্তে সেগুলি স্থায়ী আইসোটোপে পরিণত হয়। এজন্যে বোরন এবং বিশেষতঃ ক্যাড্‌মিয়াম ব্যবহারিক ক্ষেত্রে থারম্যাল নিউট্রনের ফিল্টার বা শোষক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিটারশ্মি বিকিরণ করলে বা তা থেকে ইলেকট্রন নির্গত হলে তার পারমাণবিক সংখ্যা এক করে বৃদ্ধি পায়। অতএব নিউট্রনের দ্বারা সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে যদি ইলেকট্রন নির্গত হয় ('বিটা-ডিকে' যাকে বলা হয়) তাহলে তার পারমাণবিক সংখ্যাও এক করে বৃদ্ধি পাবে। এরূপ চিন্তার বশবর্তী হয়ে ফের্মির আশা হলো যে, যদি পিরিয়ডিক টেবল বা পর্যায়-সারণীর সর্বশেষ মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ামকে (পারমাণবিক সংখ্যা ৯২) নিউট্রনের দ্বারা আঘাত করা যায়, তাহলে ইউরেনিয়াম থেকে বিটারশ্মি বিকিরণের ফলে পদার্থটির পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩ পারমাণবিক সংখ্যাযুক্ত এক নতুন মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে—প্রাকৃতিক অবস্থায় যার অস্তিত্বের সন্ধান তখনও অজ্ঞাত বা সাধারণ অবস্থায় পাওয়া সম্ভব হয় নি।

ফের্মি ও তাঁর গবেষণা-কর্মীরা ইউরেনিয়ামকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিউট্রনের দ্বারা আঘাত করে লক্ষ্য করেন যে, ইউরেনিয়ামটি বিভিন্ন প্রকারের তেজস্ক্রিয়তা প্রদর্শন করছে এবং যথাক্রমে ১০ সেকেণ্ড, ৪০ সেকেণ্ড, ১৩ মিনিট ও ৯০ মিনিট —প্রধানতঃ এই চার প্রকার তাদের হাফ-লাইফ বা অর্ধ-আয়ুষ্কাল। এছাড়া আরও কয়েকটি অর্ধ-আয়ুষ্কালযুক্ত তেজস্ক্রিয়তার আভাসও পাওয়া গেল। এখন প্রাকৃতিক অবস্থায় ইউরেনিয়াম—২৩৪, ২৩৫ ও ২৩৮—এই তিন প্রকার ইউরেনিয়াম আইসোটোপের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তখন ধারণা করা হলো, উপরিউক্ত চার প্রকার তেজস্ক্রিয়তার মধ্যে একটি সম্ভবতঃ কোন নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের দরুণ প্রদর্শিত হচ্ছে। বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষার পর দেখা গেল, এই নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থের সঙ্গে ইউরেনিয়াম বা তার নিকটস্থ মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক ধর্মের কোন মিল নেই। সুতরাং একে ৯৩ পারমাণবিক সংখ্যাযুক্ত মৌলিক পদার্থ বলে ধারণা করা হলো এবং তখনও পর্যন্ত 'অ্যাক্টিনিয়াম সিরিজ' আবিষ্কৃত না হওয়ায় ফের্মি স্থির করেন যে, এই নতুন মৌলিক পদার্থটি ম্যাঙ্গানিজের সঙ্গে পিরিয়ডিক টেবলের একই স্তম্ভে অবস্থান করবে।

ফের্মির এই অভিনব আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতে এক বিস্ময়ের সঞ্চার করে। মানুষ ট্র্যান্স-ইউরেনিয়াম এলিমেণ্টস্ বা ইউরেনিয়ামপারের মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করতে সক্ষম—এই প্রত্যাশায় তখন বিভিন্ন পদার্থ ও রসায়ন-বিজ্ঞানীরা এ-বিষয়ে আরও উন্নত ধরণের গবেষণায় ব্যাপৃত হলেন। অটো হ্যান্, মাইটনার, ষ্ট্র্যাস্ম্যান প্রমুখ জার্মান বিজ্ঞানীরা গবেষণাকালে দেখলেন যে, বিষয়টি ফের্মির নিকট যত সহজ বলে মনে হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তত সহজ নয়, বরং অত্যন্ত জটিল এক ব্যাপার। তাঁরা ইউরেনিয়ামকে দ্রুত ও মন্থর গতি-সম্পন্ন নিউট্রনের দ্বারা বিভিন্ন সময়ব্যাপী আঘাত করে এবং বহু জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লক্ষ্য করেন যে, পূর্বোক্ত চার প্রকার তেজস্ক্রিয়তার পরিবর্তে ইউরেনিয়াম থেকে মোটমাট নয় প্রকার তেজস্ক্রিয়তা প্রদর্শিত হচ্ছে। এইরূপে ৯৭ পার-মাণবিক সংখ্যাযুক্ত মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এরপরও এ-সম্বন্ধে এমন কয়েকটি জটিল প্রশ্ন বিজ্ঞানীদের মনে উদয় হয়, তখনও পর্যন্ত যার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি।

এসব জটিলতার সঠিক সমাধানের জন্যে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হন। এই সময়ে জোলিও কুরি ও স্যাভিচ নামক দুই বিজ্ঞানী নিউট্রনের সংঘাতে ইউরেনিয়ামে ৩'৫ ঘণ্টা অর্ধ-আয়ুষ্কাল-বিশিষ্ট এক নতুন তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পান, যার রাসায়নিক ধর্ম ল্যান্থেনাম ধাতুর মত। যেহেতু ল্যান্থেনাম ও অ্যাকৃটিনিয়াম পিরিয়ডিক টেবলে একই স্তম্ভে অবস্থিত, সেহেতু তাঁদের ধারণা হলো উপরিউক্ত তেজস্ক্রিয়তা প্রদর্শিত হচ্ছে তেজস্ক্রিয় অ্যাকটিনিয়াম আইসোটোপের দরুণ। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, এই ৩'৫ ঘণ্টা তেজস্ক্রিয়তাবিশিষ্ট পদার্থকে রাসায়নিক বিশ্লেষণের সাহায্যে অ্যাকৃটিনিয়াম থেকে পৃথক করা যায়, কিন্তু ল্যান্থেনাম থেকে পৃথক করা যায় না। এই থেকে স্থির করা যায়, উপরিউক্ত তেজস্ক্রিয়তা অ্যাকৃটিনিয়াম আইসোটোপের দরুণ নয়, ল্যান্থে-নাম আইসোটোপের দরুণ প্রদর্শিত হয়েছে।

এখানেই পরমাণু-বিভাজনের সূচনা বলা যায়। কিন্তু কুরি ও স্যাভিচ তাঁদের আবিষ্কারের সঠিক মর্ম নির্ধারণ করতে পারেন নি। অটো হ্যান্ ও ষ্ট্র্যাস্ম্যান পুনরায় কুরি ও স্যাভিচের পরীক্ষাটি সম্পন্ন করেন। তাঁরা কিছুদিনের মধ্যেই পরীক্ষণীয় ইউরেনিয়াম দ্রবণে ল্যান্থেনামের সমধর্মী তেজস্ক্রিয়তা ছাড়াও বেরিয়ামের সমধর্মী এক তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পান, যেটি পরে আবার তেজস্ক্রিয় ল্যান্থেনামে পরিণত হয়। বেরিয়াম পিরিয়ডিক টেবলে রেডিয়ামের সঙ্গে একই স্তম্ভে অবস্থিত। অতএব হ্যান্ ও ষ্ট্র্যাসম্যান প্রথমে ভ্রম-বশতঃ তাকে তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম আইসোটোপ বলেই ধারণা করেছিলেন। কিন্তু পরে বহু রাসায়-নিক পরীক্ষার পর তাঁরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উপরিউক্ত তেজস্ক্রিয়তা রেডিয়ামের নয়—বেরিয়ামের দরুণ। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে—ইউরেনিয়াম কর্তৃক নিউট্রন শোষণের দরুণ যে বিটা-রশ্মি নির্গত হয়, তার ফলে কিভাবে পিরিয়-ডিক টেবলের মাঝামাঝি অবস্থিত বেরিয়াম ও ল্যান্থেনামের ন্যায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সৃষ্টি হতে পারে? নিউট্রন শোষণ করে ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রক কোন এক কারণে ভেঙে গিয়ে বেরিয়ামে পরিণত হয়—হ্যান ও ষ্ট্র্যাসম্যান্ এই ব্যাখ্যা প্রচার করেন।

সত্যই যে ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকের বিভাজন হয় তা কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হলো। আয়োনিজেসন চেম্বার সংযুক্ত অসিলোস্কোপ, উইলসন মেঘ-প্রকোষ্ঠ প্রভৃতির সাহায্যে ইউরেনিয়ামের বিভাজন ক্রিয়া বাস্তব অবস্থায় প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হলো। এখন বিজ্ঞানীদের প্রধান গবেষণার বিষয় হলো—ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকের বিভাজন কি কারণে হয় এবং তার ফলাফল কি? জার্মান মহিলা বিজ্ঞানী

লাইজ মাইটনার এই বিষয়ের মোটামুটি সন্তোষজনক সমাধানে সক্ষম হন। তিনি বলেন যে, ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রক নিউট্রন শোষণ করে উত্তেজিত হয় এবং সাধারণ অবস্থায় যা ঘটে থাকে, অর্থাৎ বিটা-রশ্মি বা আল্‌ফা কণিকা নির্গমন—এ-ক্ষেত্রে তা হয় না। তার পরিবর্তে ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকের আধান ও ভর ভাগ হয়ে দুটি প্রায় সমান হাল্‌কা কেন্দ্রকে পরিণত হয়। বিজ্ঞানী হ্যান্‌ ও ষ্ট্র্যাসম্যান কর্তৃক প্রাপ্ত বেরিয়াম ও ল্যান্থেনাম আইসোটোপ-ইউরেনিয়ামেরই এরূপ দুটি বিভক্ত অংশ। কিছুদিনের মধ্যেই ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকের বিভাজিত অংশে ইট্রিয়াম, ষ্ট্রন্‌সিয়াম, ব্রোমিন, রুবিডিয়াম, মলিবডিনাম, অ্যান্টিমনি, টেলুরিয়াম, আয়োডিন, সিজিয়াম ও অন্যান্য মৌলিক পদার্থের আইটোপের সন্ধান পাওয়া গেল। এগুলি প্রত্যেকটি পিরিয়ডিক টেবলের মাঝামাঝি স্থানে সন্নিবিষ্ট। এই থেকে বোঝা যায়, ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রক বিভিন্ন রকমের অংশে বিভাজিত হয়ে থাকে।

পরমাণু-কেন্দ্রক বিভাজনের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানী ফ্রেঙ্কেল, বোর ও হুইলার উন্নত ধরণের গবেষণা করেন। তাঁরা একটি পরমাণু-কেন্দ্রককে লিকুইড ড্রপ বা তরল পদার্থের একটি ফোঁটারূপে কল্পনা করেন। একটি জলের ফোঁটা সারফেস্‌ টেনসন বা পৃষ্ঠ-টান শক্তির বলে তার গোলাকার আকৃতি বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এখন যদি ফোঁটাটিকে তড়িৎযুক্ত করা যায়, তাহলে সমজাতীয় তড়িতাধানের জন্যে তার বিভিন্ন স্থানে বিকর্ষণ-শক্তির উদ্ভব হয়। তড়িতাধানের পরিমাণ যথেষ্ট বেশী হলে ফোঁটাটির দুটি অংশে বিকর্ষণ-শক্তি এত বৃদ্ধি পাবে, যা পৃষ্ঠ-টানের শক্তি অপেক্ষা অধিক হবে এবং তখন ফোঁটাটির আকৃতি ক্রমে ক্রমে বিকৃত হয়ে শেষ পর্যন্ত দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একই রকম প্রক্রিয়ার কথা ভারী কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। কোন পরমাণু-কেন্দ্রকের প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে পৃষ্ঠ-টানজনিত আকর্ষণ শক্তির ন্যায় কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র সীমার শক্তি এবং প্রোটন কণিকাগুলির মধ্যে তড়িৎজনিত বিকর্ষণ শক্তি কাজ করে। আকর্ষণ শক্তি যদি বিকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা বেশী হয়, তাহলে কেন্দ্রকটি স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। ভারী কেন্দ্রকের ভর ও আধান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎজনিত বিকর্ষণ শক্তিও বৃদ্ধি পায় এবং একটি অবস্থায় সেটি কেন্দ্রীয় আকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা অধিক হয়। তখন কেন্দ্রকটি অস্থায়ী হয়ে পড়ে। এইরূপ কেন্দ্রককে কোন প্রকারে উত্তেজিত করলে সেটি দুটি বা বেশী অংশে বিভাজিত হয়ে পড়ে। দেখা গেছে, কোন কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা ১০০ এর বেশী হলে সেটি খুবই অস্থায়ী হয়ে পড়ে।

কোন উপযুক্ত পরমাণু-কেন্দ্রককে সাধারণতঃ নিউট্রন যুক্ত করে বিভাজিত করা হয়। এর ফলে উৎপন্ন মিশ্র কেন্দ্রকে (যেমন; ইউ-২৩৫ + নিউট্রন → ইউ-২৩৬) নিউট্রনটি তার বন্ধন-শক্তি ও বেগজনিত শক্তি প্রয়োগ করে উত্তেজিত করে। এই শক্তিকে বলে উদ্দীপন শক্তি। কেন্দ্রকে যুগ্ম ও বিযুগ্ম সংখ্যক নিউট্রন থাকলে বন্ধন শক্তি হয় যথাক্রমে প্রায় ৬'৪ মি. ই. ভো. ও ৫'৪ মি. ই. ভো.। আবার প্রত্যেক পরমাণু কেন্দ্রকের এক এক প্রকার শক্তির প্রয়োজন হয় (একে বলা হয় অ্যাক্টিভেসন এনার্জি), যার সাহায্যে স্ব স্ব কেন্দ্রককে তার সন্ধি-স্থলে উপনীত করা হলে কেন্দ্রকটি আপনা থেকেই বিভাজিত হয়ে পড়ে। এখন উপরিউক্ত এক্সাইটেসন এনার্জি বা উদ্দীপন শক্তি যদি অ্যাক্টিভেসন এনার্জি অপেক্ষা বেশী হয় তাহলে পরমাণু-কেন্দ্রক নিউট্রন ধারণের ফলে বিভাজিত হয়ে থাকে। এখন কেন্দ্রকের দুটি বিভাজিত অংশের প্রত্যেকটিতে কেন্দ্রীয় আকর্ষণ-শক্তি, বিকর্ষণ-শক্তি অপেক্ষা বেশী হয় এবং মোট শক্তিও পূর্বাপেক্ষা কম হয়। সুতরাং বিভাজন প্রক্রিয়ায়

যে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয় তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকের প্রতিটি বিভাজনে প্রায় ২০০ মি. ই. ভো. শক্তি উৎপন্ন হয়। এই প্রচণ্ড শক্তি কেন্দ্রকের বিভাজিত অংশগুলিকে প্রচুর বেগজনিত শক্তি জোগায়, যার ফলে তারা প্রায় ২.২ সেণ্টিমিটার পুরু বাতাস ভেদ করে যেতে পারে; এমন কি, কোন পাত্‌লা বস্তুকেও ভেদ করতে সক্ষম হয়। আবার বিভাজিত অংশগুলি প্রত্যেকেই তেজস্ক্রিয় হবার ফলে স্থায়ী অবস্থায় পরিণত হবার সময় তাথেকে শক্তিশালী ইলেকট্রন নির্গত হয়। বিশেষভাবে প্রস্তুত আয়োনিজেসন চেম্বারের সাহায্যে পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিভাজিত অংশ দুটি আশেপাশের বাতাসকে আল্‌ফা কণিকা বা ইলেকট্রন অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী আয়নিত করে। আয়নিকরণের পরিমাণ নির্ধারণ করে বিভাজিত অংশের শক্তির মাত্রা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ইউরেনিয়ামের বিভাজিত অংশে পিরিয়ডিক টেবলের মাঝামাঝি অবস্থিত প্রায় প্রত্যেক মৌলিক পদার্থেরই আইসোটোপের অস্তিত্ব আছে। পরীক্ষান্তে প্রমাণিত হয়েছে, ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর বিভাজিত অংশ দুটির ভর-সংখ্যা সাধারণতঃ ৯০ থেকে ১০০ এবং ১৩৫ থেকে ১৪৫-এর মধ্যে অবস্থান করে; অর্থাৎ ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রক বিভাজিত হয় একটি হাল্‌কা ও একটি ভারী কেন্দ্রকে—দুটি সমান অংশে বিভাজিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। কখনও কখনও দুটির স্থলে তিনটি—এমন কি, চারটি অংশেও ইউরেনিয়াম কেন্দ্রককে বিভাজিত হতে দেখা গেছে।

ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকের বিভাজনে উৎপন্ন প্রচুর পরিমাণ শক্তিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার বিষয়ে বিজ্ঞানীরা খুবই আশান্বিত হয়ে ওঠেন। ১৯১৯ সালে সর্বপ্রথম পরমাণু-কেন্দ্রকের কৃত্রিম রূপান্তরের ক্ষেত্রে শক্তি উৎপন্ন হতে দেখা যায়; কিন্তু তাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নি; কারণ কৃত্রিম রূপান্তর কোন ক্রমিক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয় না। কিছুদিনের মধ্যেই এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে পরমাণু-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা হয়। সে আবিষ্কার হলো, বিভাজন-প্রক্রিয়ায় সেকেণ্ডারী নিউট্রন উৎপাদন।

পরমাণু-কেন্দ্রকের গঠন সম্বন্ধে জানা আছে যে, কেন্দ্রক প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। ভারী কেন্দ্রকের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে নিউট্রনের সংখ্যা প্রোটন অপেক্ষা বেশী। যেমন—ইউ-২৩৮ কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা যেখানে ৯২, সেখানে নিউট্রনের সংখ্যা ১৪৬, অর্থাৎ নিউট্রন ও প্রোটনের সংখ্যার অনুপাত ১.৬। কিন্তু পিরিয়ডিক টেবলের মাঝামাঝি অবস্থিত মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে আনুপাতিক সংখ্যা কম। যেমন—ব্রোমিনের প্রোটনের সংখ্যা যেখানে ৩৫, সেখানে নিউট্রনের সংখ্যা ৪৫, অর্থাৎ প্রতি প্রোটনে ১.৩ সংখ্যক নিউট্রন। এই দুটি দৃষ্টান্তের তুলনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকের বিভাজিত অংশে নিউট্রনের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেশী থাকবে। কোন কেন্দ্রকে যদি নিউট্রনের সংখ্যা বাড়তি থাকে, তাহলে একটি নিউট্রন একটি প্রোটনে পরিণত হয় এবং কেন্দ্রকের সন্নিকটে একটি মুক্ত ইলেকট্রনের আবির্ভাব হয়—যাকে বলে 'বিটা-ডিকে'। এভাবে ইউরেনিয়ামের বিভাজিত প্রতিটি অংশ বেশ কয়েকটি বিটা রূপান্তরের পর স্থায়ী আইসোটোপে পরিণত হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সবগুলি বাড়তি নিউট্রনই প্রোটনে পরিণত হয় না। বিভাজন-ক্রিয়ার সময় কিছু নিউট্রন মুক্তাবস্থায় কেন্দ্রক থেকে বহির্গত হয়ে যায়—সেগুলিকে বলা হয় সেকেণ্ডারী নিউট্রন।

ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রক বিভাজিত হয় বিভিন্ন রকম অংশে। সেজন্যে বিভাজন-প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সংখ্যক সেকেণ্ডারী নিউট্রন উৎপন্ন হয়।

বহু পরীক্ষার ফলে জানা গেছে, থারম্যাল নিউট্রনের দ্বারা ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর কেন্দ্রকের প্রতিটি বিভাজনে গড়ে ২.৫±০.১ সংখ্যক সেকেণ্ডারী নিউট্রন উৎপন্ন হয়। প্লুটোনিয়াম-২৩৯-এর কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা গড়ে ৩.০±০.১। অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি বিভাজনে গড়ে ১ সংখ্যকের বেশী সেকেণ্ডারী নিউট্রন উৎপন্ন হয়। তাছাড়া কেন্দ্রকের বিভাজনে আরও একটি বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। ইউরেনিয়ামকে নিউট্রনের দ্বারা আঘাত করে নিউট্রনের উৎস সরিয়ে নিয়ে যাবার পরেও বেশ কিছু সময়ব্যাপী সেকেণ্ডারী নিউট্রন উৎপন্ন হতে থাকে। এদের বলা হয় 'ডিলেড' বা বিলম্বিত নিউট্রন। ইউরেনিয়ামের বিভাজিত অংশের তেজস্ক্রিয় রূপান্তরের সময় এই বিলম্বিত নিউট্রন উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ইউরেনিয়াম ধাতু সাধারণতঃ ইউ-২৩৮, ইউ-২৩৫ ও ইউ-২৩৪—এই তিন প্রকার আইসোটোপের সংমিশ্রণে গঠিত। এসব ইউরেনিয়াম আইসোটোপের উপর বিভিন্ন পরিমাণে শক্তিসম্পন্ন, অর্থাৎ দ্রুতগতিসম্পন্ন বা থারম্যাল নিউট্রন প্রয়োগ করে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ইউ-২৩৫-এর কেন্দ্রককে ফাষ্ট ও থার্ম্যাল—উভয় প্রকার নিউট্রনই বিভাজিত করতে সক্ষম। কিন্তু ইউ-২৩৮কে কেবলমাত্র ১ মি. ই. ভো.-এর অধিক শক্তিসম্পন্ন নিউট্রনই বিভাজিত করতে পারে। ১ মি. ই. ভো.-এর কম শক্তিসম্পন্ন নিউট্রন ইউ-২৩৮-এর কেন্দ্রক কর্তৃক শোষিত হয়ে ইউ-২৩৯ আইসোটোপে পরিণত হয় এবং সেটি আবার বিটা রূপান্তরের ফলে নেপচুনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম নামক ট্র্যান্সইউরেনিয়াম এলিমেণ্টস্ বা ইউরেনিয়াম-পারের মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে ইউ-২৩৫ বা ইউ-২৩৮-এর কেন্দ্রক বিভাজিত হয় না—এরা একটি করে নিউট্রন ধারণ করবার ফলে যে ইউ-২৩৬ বা ইউ-২৩৯-এর কেন্দ্রক উৎপন্ন হয়, তাদেরই বিভাজন হয়ে থাকে।

ইউরেনিয়াম ব্যতীত থোরিয়াম, আয়োনিয়াম, প্রোট্যাকটিনিয়ামকেও ১ মি. ই. ভো.-এর কিছু অধিক শক্তিবিশিষ্ট নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে বিভাজিত হয় (থারম্যাল নিউট্রন দ্বারা এদের বিভাজন করা যায় নি)। প্লুটোনিয়াম-২৩৯ এবং ইউ-২৩৩কে (থোরিয়াম-২৩২-এর সঙ্গে নিউট্রন সংঘাতে উৎপন্ন হয়) থারম্যাল নিউট্রনের দ্বারা বিভাজিত করা যায়। উপরন্তু নিউট্রন ছাড়াও ৮ মি. ই. ভো.-এর অধিক শক্তিবিশিষ্ট ডয়টেরন দ্বারাও কেন্দ্রকের বিভাজন সম্ভব। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বিস্‌মাথ, লেড, ট্যালিয়াম, ট্যাণ্টালাম, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতিকে ৪০০ মি. ই. ভো. শক্তিসম্পন্ন আল্‌ফা কণিকা বা ২০০ মি. ই. ভো. শক্তিবিশিষ্ট ডয়টেরনের সাহায্যে বিভাজিত করা যায়। ফ্লেরভ ও পিট্রজ্যাক নামক রাশিয়ান বিজ্ঞানীদ্বয় দেখিয়েছেন যে, ইউ-২৩৫-এর কেন্দ্রকের স্বতঃবিভাজনও হয়ে থাকে, তবে সংখ্যায় অতি অল্প। ইউ-২৩৫-এর স্বতঃবিভাজনের অর্ধ-আয়ুষ্কালের পরিমাণ প্রায় $১০^{১৪}$ থেকে $১০^{১৫}$ বছর। ইউ-২৩৪ এবং ইউ-২৩৮-এর কেন্দ্রকেরও স্বতঃবিভাজন হয়ে থাকে, যাদের অর্ধ-আয়ুষ্কাল যথাক্রমে প্রায় $১০^{১২}$—$১০^{১৩}$ এবং $১০^{১৭}$ বছর।

ইউরেনিয়ামের প্রতি কেন্দ্রকের বিভাজন-প্রক্রিয়ায় প্রায় ২০০ মি. ই. ভো. শক্তি উৎপাদন এবং সঙ্গে সঙ্গে ১ সংখ্যকের অধিক সেকেণ্ডারী নিউট্রন সৃষ্টি, পরমাণু-বিজ্ঞানীদের সম্মুখে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনারূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। নিউট্রনের দ্বারা ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকের বিভাজনে সৃষ্ট মাধ্যমিক নিউট্রনকে আবার বিভাজনের কাজে লাগাতে পারলে চেন্ রিয়্যাকসন বা পারম্পরিক শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া সৃষ্টি করা সম্ভব হতে পারে। যেমন, একটি ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকের বিভাজনে যদি দুটি সেকেণ্ডারী নিউট্রন উৎপন্ন হয় এবং সেই দুটি নিউট্রনের

প্রত্যেকটি আবার একটি করে ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকের বিভাজন ঘটায়, তাহলে প্রতিটি ক্ষেত্রে আরও দুটি করে সেকেণ্ডারী নিউট্রন উৎপন্ন হবে। এই চারটি নিউট্রনের সাহায্যে একইভাবে আরও আটটি নিউট্রন উৎপন্ন হবে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে নিউট্রনের সংখ্যা ও বিভাজনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। একে বলা হয় নিউক্লিয়ার চেন্-রিয়্যাকসন বা কেন্দ্রকের পারম্পরিক শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উপরিউক্ত প্রক্রিয়াটি এত সহজে সম্পন্ন হয় না। প্রথমতঃ সবগুলি নিউট্রনই ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রক ভেদ করে তাদের বিভাজন ঘটায় না। ইউ-২৩৮ কেবলমাত্র ১ মি. ই. ভো. অপেক্ষা অধিক শক্তির নিউট্রনের দ্বারা বিভাজিত হয়। এর কম শক্তিসম্পন্ন হলে নিউট্রনটি ইউ-২৩৮ কর্তৃক শোষিত হয়ে ট্র্যান্সইউরেনিয়াম এলিমেণ্টে পরিণত হয়। উপরন্তু ইউ-২৩৫-এর শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ থারম্যাল নিউট্রনের দ্বারা বিভাজিত হয়; বাকী অংশের তেজস্ক্রিয় রূপান্তরের ফলে সেকেণ্ডারী নিউট্রন উৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, বিভাজন-প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন সবগুলি সেকেণ্ডারী নিউট্রনই ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকের বিভাজন ঘটাতে পারে না। একটি কেন্দ্রক কর্তৃক নিউট্রন শোষণের সম্ভাবনা নিউট্রনের শক্তির উপর নির্ভর করে। নিউট্রনের শক্তি যত বেশী হয়, সম্ভাবনাও তত কম হয়। একটি নিউট্রন কোন কেন্দ্রক কর্তৃক শোষিত হবার পূর্বে সেই বস্তুর মধ্য দিয়ে অনেকখানি স্তর ভেদ করে যেতে পারে। উপরন্তু যদি ইউরেনিয়াম কোন একটি নির্দিষ্ট পরিমিত স্থানে রাখা থাকে, তাহলে কিছু সংখ্যক নিউট্রন সেখান থেকে বহির্গত হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ, ইউরেনিয়াম ধাতু সম্পূর্ণ খাঁটি অবস্থায় পাওয়া দুষ্কর—কিছু না কিছু অন্যান্য পদার্থ এর সঙ্গে খাদ বা 'ইমপিউরিটিস' হিসাবে সংমিশ্রিত থাকে। এসব খাদ থারম্যাল নিউট্রনকে খুব বেশী পরিমাণে শোষণ করে নেয় বলে নিউট্রনের অনেকটা অংশই বিভাজনের কাজে লাগতে পারে না।

সাধারণ ইউরেনিয়ামে ইউ-২৩৫, ইউ-২৩৮ ও ইউ-২৩৪ আইসোটোপ যথাক্রমে শতকরা ০'৭১৫, ৯৯'২৮০ ও ০'০০৫ ভাগ থাকে। ইউ-২৩৫-এর কেন্দ্রকের বিভাজনে থারম্যাল নিউট্রন বেশী কার্যকরী এবং পারম্পরিক শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ায় তার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সেজন্যে অন্যান্য পদার্থ কর্তৃক অযথা থারম্যাল নিউট্রন শোষিত হওয়া অনুচিত। আবার দ্রুত গতিসম্পন্ন নিউট্রনকে বিভাজন-প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করবার পূর্বে সেগুলিকে থারম্যাল নিউট্রনে পরিণত করা প্রয়োজন। যে বস্তুর মাধ্যমে ফাষ্ট নিউট্রনকে থারম্যাল নিউট্রনে পরিণত করা হয়, তাকে বলা হয় মডারেটর। গবেষণা করে দেখা গেছে, কম ভর-সংখ্যাযুক্ত মৌলিক পদার্থ, অর্থাৎ হাল্কা কেন্দ্রকবিশিষ্ট বস্তু মডারেটরের কাজে উপযুক্ত। কারণ তারা নিউট্রনকে শোষণ না করে ফাষ্ট নিউট্রনের শক্তি স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অবস্থায় কমিয়ে দেয়। হাইড্রোজেন, ভারী হাইড্রোজেন (ডয়টেরন), কার্বন, অক্সিজেন প্রভৃতির ঐ সব গুণ থাকায় জল, গ্র্যাফাইট, প্যারাফিন ইত্যাদিকে মডারেটর হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মডারেটরের মাধ্যমে ফাষ্ট নিউট্রন থারম্যাল অবস্থায় পরিণত হয়ে ইউ-২৩৫-এর কেন্দ্রকের বিভাজন ঘটাতে সক্ষম হয়। এর ফলে যে সব সেকেণ্ডারী নিউট্রন উৎপন্ন হয়, সেগুলি আবার এভাবে বিভাজন-প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে পারম্পরিক শৃঙ্খল-প্রক্রিয়াটি অনেক জটিল। সবগুলি ফাষ্ট নিউট্রনই থারম্যাল নিউট্রনে পরিণত হয় না—তাদের মধ্যে কিছু নিউট্রন ইউ-২৩৮ কর্তৃক শোষিত হয়, কিছু শোষিত হয় বিভিন্ন খাদ কর্তৃক এবং কিছু অংশ ইউরেনিয়াম থেকে বহির্গত হয়ে যায়। আবার সব থারম্যাল নিউট্রনই ইউ-২৩৫-এর কেন্দ্রকে প্রবেশ করে সেগুলিকে বিভাজিত করে না—তাদের

কিছু অংশও ইউ-২৩৮ বা বিভিন্ন খাদ (মডারেটর সহ) কর্তৃক শোষিত হয়।

ধরা যাক, সর্বপ্রথম একটি ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকের বিভাজনে n-সংখ্যক ফাষ্ট নিউট্রন উৎপন্ন হলো। সেগুলি থারম্যাল নিউট্রনে পরিণত হবার সময় তাদের কিছু শোষিত হওয়ার পর ধরা যাক, p অংশ নিউট্রন পড়ে থাকে, অর্থাৎ np-সংখ্যক নিউট্রন থারম্যাল নিউট্রনে পরিণত হয়। সুতরাং n (1-p) সংখ্যক নিউট্রন কোন কাজে লাগলো না বলা যেতে পারে। আবার যেহেতু থারম্যাল নিউট্রনেরও কিছু অংশ অযথা ব্যয়িত হয়, সেহেতু ধরা যাক, তার মাত্র k অংশ বিভাজন প্রক্রিয়ায় সক্ষম, অর্থাৎ মোট npk-সংখ্যক থারম্যাল নিউট্রন পরমাণু-বিভাজনে অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, n-সংখ্যক নিউট্রনের মধ্যে npk-সংখ্যক নিউট্রন ইউ-২৩৫-এর কেন্দ্রকের বিভাজন ঘটাতে সক্ষম হয়। এখন npk যদি ১ অপেক্ষা সংখ্যায় বেশী হয়, তাহলে প্রতিটি বিভাজনের পর বিভাজনে সক্ষম নিউট্রনের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। এই npk-কে বলা হয় 'মালটিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর' এবং যদি npk>১—এই সর্ত সর্বদা বজায় থাকে, তাহলে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সম্ভব, নচেৎ ১-এর চেয়ে কম হলে সম্ভব হবে না।

সুতরাং পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াকে বাস্তবে পরিণত করতে গেলে n, p, k-এর প্রত্যেকটি সংখ্যাকে যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, যাতে npk মালটিপ্লিকেশন ফ্যাক্টরটি ১-এর চেয়ে সর্বদা বেশী থাকে। এখন একটি ইউ-২৩৫ কেন্দ্রকের বিভাজনের ফলে উৎপন্ন নিউট্রনের n-সংখ্যা নির্দিষ্ট—এই সংখ্যা পরিবর্তন করবার কোন উপায় নেই। কিন্তু p সংখ্যাটি বৃদ্ধি করা সম্ভব, যদি যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি ইউরেনিয়াম ও মডারেটর ব্যবহার করা হয়। এ-ক্ষেত্রে মডারেশনের সময় কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক নিউট্রন ইউ-২৩৮-এর কেন্দ্রক কর্তৃক শোষিত হবে এবং কিছু বহির্গত হয়ে চলে যাবে। ইউ-২৩৮ কর্তৃক নিউট্রন শোষণের হার হ্রাস করা সম্ভব। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, বিভিন্ন শক্তি-সম্পন্ন নিউট্রন ইউ-২৩৮-এর কেন্দ্রক কর্তৃক বিভিন্ন-ভাবে শোষিত হয়। ৫ ই. ভো.-এর নিকটস্থ শক্তি-বিশিষ্ট নিউট্রনকে ইউ-২৩৮-এর কেন্দ্রক সর্বাপেক্ষা বেশী শোষণ করে—একে বলা হয় রেজোন্যান্স অ্যাবসর্পসন। ৫ ই. ভো-এর কম এবং ১০০০ ই. ভো.-এর অধিক শক্তিসম্পন্ন নিউট্রনকে ইউ-২৩৮-এর কেন্দ্রক খুব কমই শোষণ করে। সুতরাং ইউ-২৩৮-এর কেন্দ্রক কর্তৃক নিউট্রন শোষণের হার কমানো যেতে পারে, যদি নিউট্রনের গতি-জনিত শক্তি হ্রাস পাওয়ার কালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের ৫ থেকে ১০০০ ই. ভো.-এর মধ্যের অংশটুকু চালিত করা যায়। এই কারণে অ্যাটমিক পাইল বা পরমাণু-চুল্লীর মধ্যে ইউ-রেনিয়াম ও মডারেটর একটির পর অপরটি—এভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্লকে সজ্জিত থাকে। এই ব্যবস্থার ফলে ফাষ্ট নিউট্রন ইউরেনিয়ামে প্রবেশ করবার কিছু আগেই ৫ ই. ভো-এর কম শক্তিতে পরিণত হয় এবং তারপর ইউ-২৩৫ এর কেন্দ্রক ভেদ করে তার বিভাজন ঘটাতে সক্ষম হয়। p সংখ্যাটিকে আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে, যদি ইউরেনিয়াম আধারের আকার বৃদ্ধি করা যায়। কারণ, ইউরেনিয়ামের পরিমাণ যত বেশী হবে তত কম সংখ্যক নিউট্রন বহির্গত হবে। উপরন্তু ইউরেনিয়াম আধারের চারদিকে রিফ্লেক্টর বা প্রতিফলক দ্বারা আবৃত করা থাকলে কিছু সংখ্যক নিউট্রন প্রতিফলিত হয়ে ইউরেনিয়াম আধারের মধ্যে ফিরে এসে পারস্পরিক শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া অংশ গ্রহণ করতে পারে।

অপর সংখ্যা k, অর্থাৎ যে সব থারম্যাল নিউট্রন ইউ-২৩৫-এর কেন্দ্রকের বিভাজনে অংশ গ্রহণ করে, তাদের সংখ্যা-বৃদ্ধি করাও সম্ভব। এজন্যে ইউরেনিয়াম, মডারেটর প্রভৃতি থেকে যথা-

সম্ভব অন্যান্য পদার্থের খাদ—বিশেষতঃ ক্যাডিমিয়াম, বোরন ইত্যাদি দূর করা প্রয়োজন—যেহেতু এরা থারম্যাল নিউট্রনকে খুব বেশী পরিমাণে শোষণ করে নেয়। তাছাড়া এমন মডারেটর ব্যবহার করা উচিত, যা থারম্যাল নিউট্রনকে শোষণ করে না অথবা খুবই কম করে। দেখা গেছে, হেভি হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম, গ্র্যাফাইট এবং বেরিলিয়াম প্রভৃতি মডারেটর হিসাবে খুবই উপযুক্ত। এই ভাবে p ও k-সংখ্যার বৃদ্ধি দ্বারা মালটিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর npk কে ১-এর চেয়ে বেশী রাখা সম্ভব।

পারম্পরিক শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ইউ-রেনিয়াম-কেন্দ্রকের বিভাজনে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাকে প্রধানতঃ দু-ভাবে কাজে লাগানো হয়—মানব-কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর বা পাইল বা পরমাণু-চুল্লী এবং ধ্বংসের উদ্দেশ্যে পার-মাণবিক অস্ত্র। পরমাণু-চুল্লী ও পারমাণবিক বোমার মধ্যে মূল পার্থক্য হলো—প্রথম ক্ষেত্রে পারম্পরিক শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়াটি মডারেটরের সাহায্য গ্রহণ করে ধীর ও নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরিচালিত হয় এবং প্রধানতঃ থারম্যাল নিউট্রনই এই প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে শক্তি উৎপাদন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সংঘটিত হয়। সেজন্যে এ-ক্ষেত্রে কোন মডারেটর ব্যবহৃত হয় না। তাছাড়া শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়াটিও ফাষ্ট নিউট্রনের দ্বারা পরিচালিত হয়।

বিজ্ঞানী এন্‌রিকো ফের্মি সর্বপ্রথম অ্যাটমিক রিয়্যাক্টরের বাস্তব রূপদানের পরিকল্পনা করেন। রিয়্যাক্টর নির্মাণের প্রাথমিক অবস্থায় বহু অসুবিধা দেখা দেয়। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও গবেষণার ফলে বর্তমানে সাফল্যজনকভাবে রিয়্যাক্টর নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বপ্রথম শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিকাগো পাইলের' উদ্বোধন করা হয়। এই পাইলে প্রায় ৬ টন ইউরেনিয়াম ধাতু ও মডারেটর হিসাবে গ্র্যাফাইট ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই রিয়্যাক্টরে ইউরেনিয়াম থেকে উৎপন্ন তাপ কাজে লাগানোর কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। তবুও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে পারম্পরিক প্রতিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব, এই পাইলের সক্রিয়তাই তার নিদর্শন। এরপর ১৯৪৩ সালে আরও উন্নত ধরণের 'ক্লিনটন পাইল' নির্মাণ করা হয়, প্রধানতঃ প্লুটো-নিয়াম-২৩৯ তৈরী করবার জন্যে। এই পাইলে ইউরেনিয়াম ধাতুকে গ্যাস-টাইট অ্যালুমিনিয়াম দ্বারা আবৃত ছোট ছোট সিলিণ্ডারের আকারে ব্যবহার করা হয় এবং সেগুলিকে সুবিধামত পাইলের মধ্যে প্রবেশ করানো বা বের করে আনবার ব্যবস্থা থাকে। উপরন্তু এয়ার-কুলিং-এর ব্যবস্থা ও পাইলের চতুর্দিকে কংক্রিটের আবরণ দেওয়া থাকে। নিউট্রনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে বোরন ষ্টীল রড ব্যবহার করা হয়। ১৯৪৫ সালে ক্লিনটন পাইলের আরও উন্নত সংস্করণ হানফোর্ড পাইল নির্মাণ করা হয়। এ-ক্ষেত্রে বাতাসের পরিবর্তে জলের দ্বারা ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

একটা রিয়্যাক্টর সাধারণতঃ ইউরেনিয়াম ও মডারেটর দ্বারা পরিপূর্ণ এবং তার চারদিকে নিউট্রনের প্রতিফলক হিসাবে একটা আবরণ দেওয়া থাকে। পরমাণু-বিভাজনের সময় রিয়্যাক্টর থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন নিউট্রন ও গামারশ্মি নির্গত হয়। এসব রশ্মির ক্ষতিকর বিকিরণের প্রভাব থেকে রক্ষা করবার জন্যে প্রতিফলকের চারদিকে জল ও কংক্রিটের বেশ পুরু আবরণ দেওয়া থাকে। যেহেতু তল ও আয়তন যথাক্রমে ব্যাসার্ধের বর্গফল ও ঘনফল অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়, সেহেতু রিয়্যাক্টরের আকার বৃদ্ধি করলে ইউরেনিয়ামের তল ও আয়তনের অনুপাত হ্রাস পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিউট্রন বহির্গমনের সংখ্যাও সেই হারে হ্রাস পায়। সুতরাং রিয়্যাক্টরের আকৃতির একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকে, যার নীচে

পারম্পরিক শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া সম্ভব নয়। একে বলা হয় ক্রিটিক্যাল সাইজ। রিয়্যাক্টরের চতুর্দিকে আবৃত থারম্যাল নিউট্রনের প্রতিফলক কিছু সংখ্যক নিউট্রন প্রতিফলিত করে ক্রিটিক্যাল সাইজ কমাতে সাহায্য করে।

এখন পারম্পরিক শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়াকে যদি নিয়ন্ত্রণে রাখবার কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে ইউরেনিয়াম অত্যন্ত তাড়াতাড়ি নিঃশেষিত হয়ে যাবে। যেহেতু কেন্দ্রক-বিভাজনের সংখ্যা-বৃদ্ধি নিউট্রনের সংখ্যা-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে, সেহেতু শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়াকে সুবিধামত পরিচালিত করবার জন্যে থারম্যাল নিউট্রনের উপযুক্ত শোষক হিসাবে ক্যাডমিয়াম ও বোরন-নির্মিত রড্ ব্যবহার করা হয়। এর ফলে পারম্পরিক শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করা যায় এবং প্রয়োজনানুযায়ী প্রতিক্রিয়া একদম বন্ধ করাও যেতে পারে। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর ক্যাড্মিয়াম বা বোরন ধাতু-নির্মিত রড্ রিয়্যাক্টরে ব্যবহৃত হয়। এক শ্রেণীর রড্ অ্যাম্প্লি-ফায়ার সংযুক্ত একটি আয়নিজেসন চেম্বারের সঙ্গে সূক্ষ্ম যান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে এমনভাবে যুক্ত থাকে, যাতে তারা স্বয়ংক্রিয় পন্থায় রিয়্যাক্টরে প্রবেশ করতে বা বাহির হতে পারে। পারম্পরিক শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়ার পরিমাণ অনুযায়ী পাইলে যে বিকিরণ উৎপন্ন হয় তার ফলে আয়নিজেসন চেম্বারে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। অতএব পারম্পরিক শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী হলে বিদ্যুৎ-প্রবাহও বৃদ্ধি পায় এবং তখনই স্বয়ংক্রিয় পন্থায় শোষক রড্গুলি রিয়্যাক্টরে প্রবেশ করে ও পারম্পরিক শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া প্রয়োজনীয় মানে ফিরে না আসা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে। আর এক শ্রেণীর বৃহদাকার রড্ থাকে, যাদের প্রয়োজনানুযায়ী রিয়্যাক্টরে প্রবেশ করিয়ে পারম্পরিক শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়াকে একদম বন্ধ করা যায়।

বর্তমানে ইউ. এস. এ., ইংল্যাণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া, ক্যানাডা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে পরমাণুর শক্তিকে মানব-কল্যাণে নিয়োগ করবার জন্যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার ষ্টেশন নির্মিত হয়েছে। এই সব স্থানে থারম্যাল পাওয়ার ষ্টেশনের ন্যায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। উপরন্তু নানাবিধ কাজে ব্যবহারের জন্যে বিভিন্ন প্রকার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদন করা হয়ে থাকে। নিউক্লিয়ার পাওয়ার ষ্টেশন এমনভাবে নির্মিত হয়, যাতে বহুদিনব্যাপী সেখানে বিদ্যুৎ-উৎপাদন করা যায়। সেজন্যে রিয়্যাক্টরে গোড়া থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে ইউরেনিয়াম ইত্যাদি কেন্দ্রক-ইন্ধন সন্নিবিষ্ট করা হয়। কিন্তু অনেক দিন ব্যবহারের পর বিভাজনের দরুণ ইন্ধন ক্রমে ক্রমে শেষ হতে থাকে এবং বিভাজিত অংশ, অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় ধাতুমলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই তেজস্ক্রিয় ধাতুমল অত্যন্ত বেশী পরিমাণে থারম্যাল নিউট্রন শোষণ করে। এর ফলে মালটি-প্লিকেশন ফ্যাক্টর npk হ্রাস পায়। যাতে npk ১ সংখ্যা অপেক্ষা কম না হয়, সেজন্যে আগে থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে ইউরেনিয়াম (যাতে প্রায় শতকরা ৫ ভাগ ইউ-২৩৫ থাকে) রিয়্যাক্টরে সন্নিবিষ্ট করে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের হার নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই কার্যে বোরন-কার্বাইড নির্মিত কতকগুলি রড্কে (যারা থারম্যাল নিউটন শোষকের কাজ করে) আগে থেকে রিয়্যাক্টরের মধ্যে প্রবেশ করানো থাকে। বিভাজনের ফলে ইউ-২৩৫-এর পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকলে একে একে রড্গুলি তুলে নেওয়া হয় এবং তখন তেজস্ক্রিয় ধাতুমল থারম্যাল নিউট্রন শোষকের কাজ করে ও npk>১ এই সর্তও বজায় থাকে। একটা রিয়্যাক্টর সাধারণতঃ দুই থেকে আড়াই মাস কাল সন্নিবিষ্ট ইউরেনিয়ামের দ্বারা চলতে পারে। তারপর ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম রড্গুলি তুলে নিয়ে আবার নতুন রড় রিয়্যাক্টরে ব্যবহৃত হয়।

এখন রিয়্যাক্টরে বিভাজনে উৎপন্ন প্রচণ্ড শক্তি বিভাজিত অংশ, নিউট্রন, ইলেকট্রন ও গামা-কোয়ান্টার দ্বারা পরিবাহিত হয়। এদের গতি

মন্দীভূত হলে সেই শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়। এর ফলে রিয়্যাক্টরের মধ্যে তাপ বৃদ্ধি পায়। এই তাপ ঠাণ্ডা করবার জন্যে অতি উচ্চচাপে নিয়োজিত জলকে দুটি এককেন্দ্রীক ষ্টেন্‌লেস ষ্টিল টিউবের মধ্য দিয়ে এমন ভাবে ক্রমাগত পরিবাহিত করা হয়, যাতে ইউরেনিয়াম সরাসরি জলের সংস্পর্শ না আসে; কারণ জলের সংস্পর্শে ইউরেনিয়ামের অবক্ষয় (Corrosion) খুবই বেশী। এই উত্তপ্ত উচ্চচাপের জল হিট্-এক্সচেঞ্জার বা তাপ-বিনিময়-কারকের মধ্যে প্রবেশ করে আর একটি সারকিটে পরিবাহিত জলকে উত্তপ্ত করে উচ্চ চাপের বাষ্পে পরিণত করে। এই বাষ্প জেনারেটর সংযুক্ত টারবাইনকে পরিচালিত করে' বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। নিউক্লিয়ার পাওয়ার ষ্টেশনে রিয়্যাক্টর-সংক্রান্ত সব কিছু কাজ অতি সূক্ষ্ম স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্পন্ন করা হয়। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সে স্থানের সব কর্মী ও গবেষকদের রক্ষা করবার জন্যে সব রকম সুব্যবস্থাও থাকে।

খুব অল্প পরিমাণ কেন্দ্রক-ইন্ধনে প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। এক টন ইউ-২৩৫ প্রায় ২,০০০,০০০ টন কয়লার সমান শক্তি উৎপাদনে সক্ষম। তাছাড়া প্রয়োজনানুযায়ী ইন্ধনও ব্যবহার করা যায়; কোন গ্রাইণ্ডিং মিল্, বিরাট ষ্টোর হাউস, এমন কি— কয়লার ন্যায় অক্সিজেনের কোন প্রয়োজন এ-ক্ষেত্রে হয় না। আবার রিয়্যাক্টরে বিভাজন কালে বিভাজনে সক্ষম নতুন কেন্দ্রক-ইন্ধন সৃষ্টির সম্ভাবনা উৎসাহের সঞ্চার করেছে। সাধারণ ইউরেনিয়ামে যে ইউ-২৩৮ আইসোটোপ থাকে, সেগুলি থারম্যাল নিউট্রনের দ্বারা বিভাজিত হয় না; কিন্তু প্লুটোনিয়াম-২৩৯ আইসোটোপে পরিণত হয়। সেগুলি থারম্যাল নিউট্রনের দ্বারা বিভাজিত হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে যেমন একপ্রকার কেন্দ্রক-ইন্ধন হ্রাস পায়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আর এক প্রকার নতুন ইন্ধন উৎপন্ন হয়। এখন যদি প্রতি ইউ-২৩৫ পরমাণু-কেন্দ্রকের বিভাজনে এক অপেক্ষা বেশী প্লুটোনিয়াম-২৩৯ পরমাণু উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ব্রিডিং রেসিও বা প্রজনন অনুপাত যদি ১ অপেক্ষা বেশী করা যায়, তাহলে যত সংখ্যক ইউ-২৩৫ পরমাণু বিভাজিত হবে, তার চেয়ে বেশী সংখ্যক প্লুটোনিয়াম-২৩৯ পরমাণুর সৃষ্টি হবে। এর ফলে বাড়তি কেন্দ্রক-ইন্ধন উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

রিয়্যাক্টরের সাহায্যে কেবল যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় তা নয়, প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপেরও সৃষ্টি হয়। পূর্বে সাইক্লোট্রন নামক ত্বরক-যন্ত্রের সাহায্যে ডয়টেরন বা আল্‌ফা-কণিকাকে শক্তিশালী করে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের উপর প্রয়োগ করে রেডিও আইসোটোপ প্রস্তুত করা হতো। কিন্তু নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে যে প্রচুর পরিমাণ নিউট্রন উৎপন্ন হয়, তার কিছু অংশ পারম্পরিক শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়ার কাজে লাগে, আর বাকী অংশকে রেডিও আইসোটোপ প্রস্তুতের কাজে ব্যবহার করা যায়। রিয়্যাক্টরে বিশেষ ধরণের চ্যানেল বা পথ থাকে যে স্থান থেকে বিভিন্ন বস্তুর উপর বিভিন্ন পদার্থ থেকে নির্গত নিউট্রন প্রয়োগ করা যায়। বিভিন্ন রেডিও আইসোটোপ বর্তমান কালে ট্রেসার এলিমেণ্টরূপে কৃষি-বিজ্ঞান, ভেষজ-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, মেটালার্জি, রসায়ন-বিজ্ঞান ও নানাপ্রকার শিল্পের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরের আয়তন ও ওজন যথাসম্ভব কম করে বিভিন্ন যান-বাহনে 'পাওয়ার-ইঞ্জিন' হিসাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। আমেরিকা 'নটিলাস' ও 'সি-উল্‌ফ্' নামক দুটি পরমাণু শক্তি-চালিত সাবমেরিন নির্মাণ করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া মেরু-প্রদেশে গমনাগমনের উদ্দেশ্যে একটি বিরাট 'আইস্-ব্রেকার' নির্মাণ করেছে এবং সেই জাহাজ কোন বন্দরে উপস্থিত না হয়েও ক্রমান্বয়ে বৎসরাধিককাল চলাচলে সক্ষম।" পরমাণু শক্তি-

চালিত উড়োজাহাজ, মোটর, রেলওয়ে ইঞ্জিন ইত্যাদি নির্মাণের চেষ্টাও চলেছে।

পারমাণবিক অস্ত্রের মাধ্যমে পরমাণু-বিভাজন ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। পরমাণু বোমায় কোন মডারেটর না রেখে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইউ-২৩৫ ব্যবহার করা হয় এবং পারস্পরিক শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া ফাষ্ট নিউট্রন দ্বারা সংঘটিত হয়। তাছাড়া প্লুটোনিয়াম-২৩৯-ও ব্যবহার করা হয়। পরমাণু বোমার কয়েকটি ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম খণ্ড (প্রতিটি ক্রিটিক্যাল সাইজ অপেক্ষা আকারে ছোট, যার ফলে খণ্ডগুলি পারস্পরিক শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়ায় সক্ষম হয় না) এমন ভাবে সাজানো থাকে যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী অত্যন্ত তাড়াতাড়ি তাদের একত্রিত করা যায়। একত্রিত খণ্ডটি ক্রিটিক্যাল সাইজ অপেক্ষা আকারে বড় হওয়ায় পারস্পরিক শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়। বিস্ফোরণের সময় প্রচুর পরিমাণে নিউট্রন, গামা-রশ্মি, ইন্‌ফ্রা-রেড ও আলট্রাভায়োলেট রশ্মি বিকিরিত হয়। বিস্ফোরণের পর আশেপাশে বিস্ফোরিত অংশগুলি থেকে অত্যন্ত ক্ষতিকর গামা-রশ্মি, বিটা-রশ্মি ও আল্‌ফা-কণিকা নির্গত হয়ে থাকে।

বর্তমান কালে পরমাণু-বিভাজনকে ধ্বংসের কাজে নিয়োগ না করে যাতে মানব-কল্যাণ ও শান্তির উদ্দেশ্যে পুরাপুরি নিয়োজিত করা যায়, তার জন্যে পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ আগ্রহশীল হয়েছে। পরমাণুর অসীম শক্তিকে যে সমাজ-কল্যাণে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা সম্ভব, সে বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় এই কাজে অধিকতর সাফল্য লাভের ফলে মানব-সভ্যতা অগ্রগতির পথে অনেকখানি অগ্রসর হবে।

হাম্ফ্রি ডেভি

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা। ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত ছোট্ট একটি শহর, নাম পেন্‌জান্স। এখানে প্রায়ই দেখা যেত, ছোট্ট একটি ছেলে তার বন্ধুদের কাছে গল্প বলছে, আর তারা সবাই অবাক হয়ে শুনছে সেই গল্প। ছেলেটি তার মা ও দিদিমার কাছে যে সব মজার গল্প শোনে, তাই আবার সুন্দর করে গুছিয়ে বলে তার বন্ধুদের কাছে। বাস্তবিক তার গল্প বলার এমন অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে, তার শ্রোতার কখনও অভাব হতো না। তার গল্পের পুঁজি কখনও শেষ হতো না, কারণ বানিয়ে গল্প বলবার ক্ষমতাও ছিল তার অসীম। পরবর্তীকালে এঁকেই দেখা যেত, লণ্ডনের বিখ্যাত রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশনের সভাগৃহে বক্তৃতা করছেন, আর লণ্ডনের সব গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে শুনছেন তাঁর প্রাঞ্জল অথচ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা। শ্রোতার সংখ্যা কখনও কখনও হাজার ছাড়িয়ে যেত। বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলি সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করে বলবার সহজাত ক্ষমতাই ছিল তাঁর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। শুধু তাই নয়, একজন নির্ভীক অথচ নিপুণ আবিষ্কারক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই বিজ্ঞানীর নাম হাম্ফ্রি ডেভি।

হাম্ফ্রি ডেভির জন্ম হয় ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর। পিতা রবার্ট ডেভি, মাতা গ্রেস মিলেট। ডেভির পিতা সামান্য ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন।

তাতেই কোনমতে ডেভি পরিবারের দিন চলে যেত। তিনি কাঠ-খোদাই শিল্পে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু একাজ তিনি করতেন অবসর বিনোদনের জন্যে, জীবিকা অর্জনের জন্যে নয়।

ডেভির বয়স যখন মাত্র ষোল বছর, তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। এই সময় তাঁর মাতার বয়স ছিল মাত্র চৌত্রিশ বছর। কতকগুলি খনিজ-সংস্থায় বেহিসেবী লগ্নীর ফলে ডেভির পিতা ১,৩০০ পাউণ্ড (প্রায় ২০,০০০ টাকা) ঋণ রেখে যান। এরূপ ভাগ্যবিপর্যয় হওয়া সত্বেও ডেভির মাতা ভেঙে পড়েন নি, নিপুণ হাতে সংসারের হাল ধরেন। সম্পত্তির আয় বার্ষিক ১৫০ পাউণ্ড (প্রায় ২,৫০০ টাকা)। তবুও স্থির করলেন, যেমন করে হোক, ঋণ পরিশোধ করতেই হবে। একজন ফরাসী মহিলার সঙ্গে মিলে একটি টুপির দোকান দিলেন। দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম করে দুটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ের সুশিক্ষার ব্যবস্থা তো করলেনই, উপরন্তু অল্পকালেব মধ্যেই পরলোকগত স্বামীর ঋণের সব টাকা পরিশোধ করে দিলেন। এমন আদর্শ জননী না হলে কি এমন আদর্শ সন্তান হয়!

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ডেভি পেন্‌জান্স থেকে ট্রুরো যান এবং রেভারেণ্ড কারডিউর অধীনে শিক্ষা সমাপন করেন। তিনি অবশ্য ডেভির মধ্যে বিশেষ কোন প্রতিভার সন্ধান পান নি। তাই পরবর্তী কালে মন্তব্য করেন—আমি তাঁর (ডেভির) মধ্যে এমন ধীশক্তির সন্ধান পাই নি, যার সাহায্যে তিনি পরবর্তীকালে এতটা প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। নিজের বাল্যকাল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ডেভি লিখেছেন—বাল্যকালে আমি অনেকখানি স্বাধীনতা পেয়েছি, বিশেষ কোন শিক্ষা-পরিকল্পনায় আমাকে জুড়ে দেওয়া হয় নি, এটা আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি।····· আমি যা হয়েছি, তা আমি নিজেই গড়েছি।

ডেভি স্বভাবতঃ কবি ছিলেন। মাত্র সতেরো বছর-বয়সেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "The Sons of Genius" প্রকাশিত হয়। তার পরের বছরেই প্রকাশিত হয় "On the Mount's Bay" এবং "St. Michael's Mount"। তাঁর জীবনস্মৃতির স্থানে স্থানে অনেক কবিতা-কুসুম ছড়ানো রয়েছে। অবশ্য সেগুলি সংগ্রহ করে মালা গাঁথবার অবকাশ কারও হয় নি। পাঠকের অবগতির জন্যে এখানে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি স্তবক উদ্ধৃত করা হলো।

"Like the tumultuous billows of the sea
Succeed the generations of mankind;
Some in oblivious silence pass away,
And leave no vestige of their lives behind.

"Others, like those proud waves which beat the shore,
A loud and momentary murmur raise;
But soon their transient glories are no more,
No future ages echo with their praise.

"Like yon proud rock, amidst the sea of time,
Superior, scorning all the billows' rage,
The living sons of genius stand sublime,
The immortal children of another age."

পদ্য এবং গদ্য সবরকম লেখাতেই তাঁর কল্পনা-প্রবণ ও অনুসন্ধিৎসু মনের সন্ধান পাওয়া যায়। কবি কোলরিজ বলেছেন—তিনি যদি প্রথম শ্রেণীর রসায়নবিদ্ না হতেন, তা হলে সে-যুগের একজন প্রথম শ্রেণীর কবি হতে পারতেন। আর সাউদি বলেছেন—কবি হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সবগুলি উপাদানই তাঁর মধ্যে ছিল, অভাব ছিল শুধু কলা-কৌশলের।

পাঁচটি সন্তানের মধ্যে হাম্ফ্রি-ই ছিলেন সকলের বড়। কাজেই পিতার মৃত্যুর পর তিনি নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হলেন। বুঝলেন, সংসারের গুরু দায়িত্ব বহন করবার জন্যে তাঁকেই মায়ের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাই জন বিংহ্যাম বর্লেজ নামক একজন সার্জনের ডিসপেন্সারিতে শিক্ষানবীশরূপে চাকুরী গ্রহণ করেন ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী। এখানে তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং অবসর পেলেই মনোযোগ সহকারে অঙ্ক ও রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন; তবে রসায়ন-শাস্ত্রই তাঁর বেশী প্রিয় ছিল। প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে তিনি নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। এজন্যে তার ছোট গবেষণাগারটি মাঝে মাঝে বিস্ফোরণের ফলে প্রকম্পিত হয়ে উঠতো। আশে-পাশে যাঁরা বাস করতেন, তাঁরা সব সময়েই সশঙ্কিত থাকতেন, না জানি কখন বিস্ফোরণের ফলে হাওয়ায় উড়ে যান। এজন্যে বর্লেজ মাঝে মাঝে তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করতেন। তাঁর জ্ঞানার্জনের স্পৃহা লক্ষ্য করে তাঁকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন এবং কিছুটা প্রশ্রয়ও দিতেন। ঠাট্টা করে তাঁকে কখনও কখনও "The philosopher", আবার কখনও কখনও "Sir Humphry" বলে ডাকতেন।

এই সময় বৃস্টলে ডাঃ বেডোস একটি নার্সিং-হোম প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার নাম দেন নিউম্যাটিক ইন্‌ষ্টিটিউশন। এখানে নানাপ্রকার গ্যাসের সাহায্যে রোগ নিরাময় সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখানে ডেভি সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টরূপে কার্য-ভার গ্রহণ করেন, ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর।

এখানে এসে ডেভি অনেক মৌলিক গবেষণার সুযোগ পান। তাঁর সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা হলো নাইট্রাস অক্সাইড নিয়ে। তখন কোন কোন ডাক্তারের ধারণা ছিল যে, এই গ্যাস বিষাক্ত। কিন্তু ডেভি তা বিশ্বাস করতেন না। একদিন তিনি এই গ্যাস শুঁকে দেখলেন। কয়েক মিনিট ধরে এই গ্যাস্ শুঁকে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। সংজ্ঞা-হীন অবস্থায় তিনি মনোরম স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। জ্ঞান হবার পর তিনি ক্রমাগতই হাসতে লাগলেন। এজন্যে এই গ্যাসের নাম দেওয়া হলো হাস্যোৎপাদক গ্যাস। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ডেভি বললেন—যেহেতু অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করবার ফলে নাইট্রাস অক্সাইড বেদনা নাশ করতে পারে, সেহেতু মনে হয়, যেসব অপারেশনের সময় অধিক রক্তপাতের সম্ভাবনা নেই, সে-সব ক্ষেত্রে এই গ্যাস ব্যবহার করা সুবিধা-জনক হবে। তাঁর ধারণা একদিন সত্য বলে প্রমাণিত হয় এবং চেতনাহরণের উদ্দেশ্যে নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসের ব্যবহার প্রচলিত হয়। বলা বাহুল্য, বড় বড় হাসপাতালগুলিতে আজও এই গ্যাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ডেভি নতুন নতুন গ্যাস নিয়ে প্রথমেই নিজের উপর পরীক্ষা করতেন। কিন্তু এ-কাজে অনেক বিপদ ছিল। লোহিত-তপ্ত কয়লার ভিতর দিয়ে জলীয় বাষ্প পরিচালনা করলে একপ্রকার গ্যাস পাওয়া যায়, তার নাম জল-গ্যাস। একদিন এই গ্যাস শুঁকে ডেভি অচেতন হয়ে পড়েন; কারণ জল-গ্যাসে থাকে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস, যা জীবদেহের পক্ষে মারাত্মক বিষ। সৌভাগ্য-বশতঃ সেবারে অনেক কষ্টে তাঁর চেতনা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, এমন অবিবেচনার কাজ আর কখনও করবেন না।

বৃস্টলে অবস্থান কালে বিভিন্ন গ্যাস নিয়ে তিনি যে-সব গবেষণা করেন, তার বিবরণ প্রকাশ করেন বিভিন্ন প্রবন্ধে। এর ফলে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশনে যোগদান করেন অধ্যাপকরূপে, ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ। তেইশ বছর বয়স্ক একজন যুবকের পক্ষে এ এক দুর্লভ সুযোগ। কারণ, এখানে এসেই তাঁর প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ হয়।

এখানে আসবার অল্পদিন পরেই তিনি সোডিয়াম

ও পটাসিয়াম নামে দুটি নতুন ধাতু আবিষ্কার করেন। বাস্তবিক, এই হলো ডেভির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার।

সোডার সঙ্গে কলিচুনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে পাওয়া যায় কষ্টিক সোডা। তেমনি পটাস থেকে পাওয়া যায় কষ্টিক পটাশ। সাধারণভাবে এদের বলা হয় বিদাহী ক্ষার (Caustic alkalis)। বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, এগুলি বিভিন্ন ধাতুঘটিত যৌগিক পদার্থ। কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এদের বিযুক্ত করে ধাতু-নিষ্কাশনের চেষ্টা এযাবৎ ব্যর্থ হয়েছে।

অল্পদিন আগেই ইটালীয় বিজ্ঞানী ভোল্টা বৈদ্যুতিক ব্যাটারী আবিষ্কার করেন। তাই তখন প্রধান প্রধান সব লেবরেটরীতেই ব্যাটারী একটি অপরিহার্য সরঞ্জাম বলে পরিগণিত হতো। ডেভি ভাবলেন, ব্যাটারীর সাহায্যে হয়তো কষ্টিক পটাস ও কষ্টিক সোডা থেকে অজ্ঞাত ধাতু দুটি পৃথক করা সম্ভব হবে। এজন্যে প্রথমে তিনি কষ্টিক পটাস এবং কষ্টিক সোডার জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পরিচালিত করেন। যদিও সতেজে বিক্রিয়া সম্পন্ন হলো, তথাপি দেখা গেল, এই প্রক্রিয়ায় শুধু জল বিশ্লেষিত হয়েছে, দ্রাব অবিকৃত রয়েছে। কাজেই এর পর তিনি প্ল্যাটিনাম মুচির মধ্যে খানিকটা নির্জল পটাস নিয়ে উত্তাপের সাহায্যে গালিয়ে ফেলেন এবং তার ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পরিচালনা করেন। এর ফলে এক আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। দেখা গেল, যতক্ষণ প্রবাহ চলতে থাকে ততক্ষণ ঋণ-প্রান্তে একপ্রকার সহজদাহ্য পদার্থ নির্গত হয় বলে সেখানে তীব্র আলোকশিখা দেখা যায়। এই ঘটনা সম্পর্কে হোমিয়ার্ড লিখেছেন—পরীক্ষার ফল পর্যবেক্ষণ করে ডেভি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েন। আমরা শুনেছি, যখন তিনি দেখলেন—পটাসিয়ামের এক-একটি দানা পটাসের উপরকার স্তর ভেদ করে এসে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠছে, তখন তিনি আর আনন্দ ধরে রাখতে পারলেন না—আনন্দের আতিশয্যে সত্য সত্যই ঘরের মধ্যে নৃত্য করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর নিজেকে সংযত করে পুনরায় পরীক্ষায় ব্যাপৃত হলেন।

কষ্টিক সোডা নিয়ে পরীক্ষা করেও তিনি অনুরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে তিনি নিশ্চিতরূপেই বুঝলেন যে, এই প্রক্রিয়ায় অজ্ঞাত ধাতু দুটি আবিষ্কৃত হয়েছে। ডেভি এদের নাম দিলেন যথাক্রমে পটাসিয়াম ও সোডিয়াম।

এরপর ডেভি ক্লোরিন সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তার মৌলিকত্ব প্রমাণ করেন। ক্লোরিনের বিরঞ্জন-ক্ষমতাও তিনিই আবিষ্কার করেন। আইয়োডিনের প্রকৃতি ও ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং আর্ক-ল্যাম্প প্রস্তুত করেন। তাছাড়া কৃষিকার্যের উন্নতিকল্পেও তিনি অনেক উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছিলেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে চৌত্রিশ বছর বয়সে তিনি একজন ধনী ব্যবসায়ীর বিধবা পত্নীর পাণিগ্রহণ করেন। এ-সম্পর্কে ভাইকে লেখেন—শ্রীমতী অ্যাপ্রীস্ আমাকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছেন। এই অনুষ্ঠান যখন সম্পন্ন হবে তখন আমি রাজা, রাজপুত্র কিংবা শাসনকর্তা কাউকেই ঈর্ষা করবো না।

বিবাহের দু-দিন আগেই তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। ডাঃ বর্জে যা একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন, তাই শেষ পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয়।

বিবাহের কিছুকাল পরেই তিনি সস্ত্রীক কন্টিনেন্টে (ইংল্যাণ্ড ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য দেশে) বেড়াবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে মাইকেল ফ্যারাডেকে নিয়ে গেলেন সহকারী-রূপে। তাঁর খ্যাতি তখন স্বদেশের সীমা ছাড়িয়ে সব সভ্যদেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই যখন যে দেশে গেছেন, সেখানেই বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছেন। এই সময়েই তিনি ফ্রান্সের

অ্যাম্পিয়ার এবং ইটালীর ভোল্টার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হন।

এর কয়েক বছর আগেকার কথা। বিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য দানের কথা স্মরণ করে "ইনষ্টিটিউট অব ফ্রান্স" স্বর্ণ পদক দিয়ে ডেভিকে সম্মানিত করে। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স—এই দুটি দেশ তখন বৈরীভাবাপন্ন ছিল। তাই ডেভির কোন কোন বন্ধু তাঁকে এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করবার উপদেশ দেন। কিন্তু ডেভি বললেন—দুটি দেশ বা দুটি সরকার পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে, কিন্তু আমরা বিজ্ঞানীরা তা কখনই করবো না। প্রায় দেড়-শ' বছর আগে বিজ্ঞানীদের সামনে তিনি যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, তার কোন তুলনা নেই।

বিদেশ ভ্রমণ সেরে দেশে ফিরে ডেভি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ এজন্যে তাঁকে আজও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

কয়লা খনিতে মাঝে মাঝে একরকম গ্যাস সৃষ্টি হয়; তার নাম মার্স-গ্যাস (Marsh-gas)। এই গ্যাসে হঠাৎ আগুন লাগলে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটে এবং তাতে শত শত লোক মারা যায়। কত হতভাগ্য খনি-শ্রমিক যে এভাবে প্রাণ হারায়, তার হিসেব পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ যেরূপ দুর্ঘটনা ঘটে, তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্ঘটনা ঘটলো ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে। তাই এই রকম অগ্নিকাণ্ড বন্ধ করবার সঙ্কল্প নিয়ে বিলেতে একটা কমিটি বসে। সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হাম্ফ্রি ডেভির উপর এর প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন করবার ভার পড়ে। তিনি অবিলম্বে নিউক্যাসলে গিয়ে বিভিন্ন খনি থেকে এই গ্যাসের নমুনা সংগ্রহ করেন। তারপর লেবরেটরীতে বসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করেন। তিনি লক্ষ্য করেন, একটি দীপশিখাকে যদি তারের জালি দিয়ে ঘিরে রাখা যায়, তবে তার ভিতর দিয়ে দীপশিখাটিকে প্রজ্জ্বলিত রাখবার জন্যে প্রয়োজনীয় বায়ু অনায়াসে যেতে পারে, কিন্তু এই অবস্থায় দীপশিখাটি সোজাসুজি বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পারে না বলে তার সঙ্গে দাহ্য গ্যাস থাকলেও তা প্রজ্জ্বলিত হয় না। পরীক্ষার ফলাফল দেখে তিনি একটি দীপ প্রস্তুত করেন এবং তাতে চিম্‌নির বদলে তামার একটা জাল ঘিরে দেন। এই দীপ নিয়ে নির্ভয়ে কয়লার খনিতে চলাফেরা করা সম্ভব হলো, গ্যাসে আগুন লাগবার কোন ভয় রইলো না। তাই এর নাম দেওয়া হলো ডেভির নিরাপদ দীপ (Davy's Safety Lamp)। এভাবে শত শত খনি-শ্রমিকের জীবন রক্ষা হলো। বিজ্ঞানীর নতুন নামকরণ হলো—খনি শ্রমিকের বন্ধু।

ডেভির এক বন্ধু 'নিরাপদ দীপের' পেটেণ্ট নেবার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন —"না, আমার হিতৈষী বন্ধু, এমন কথা আমি কখনও ভাবি নি। আমি প্রধানতঃ মানব জাতির সেবা করবার উদ্দেশ্যেই এটা নির্মাণ করেছি। তাতে যদি সাফল্য লাভ করে থাকি তবে তাই হবে আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, এর ফলে আমার গাড়ীর সামনে হয়তো চারটি ঘোড়া জুড়তে পারবো; কিন্তু স্যার হাম্ফ্রি চার ঘোড়ার গাড়ী চড়েন, একথা শুনে আমার কি লাভ হবে? এথেকেই তাঁর মহানুভবতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কি, এ-সম্পর্কে তাঁকে একবার প্রশ্ন করা হলো। তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—মাইকেল ফ্যারাডে। ফ্যারাডে প্রথম জীবনে সামান্য দপ্তরীর কাজ করতেন। বিজ্ঞান সাধনায় তাঁর একান্ত আগ্রহ লক্ষ্য করে এবং তাঁর মধ্যে এক দুর্লভ প্রতিভার সন্ধান পেয়ে ডেভি তাঁকে নিজের সহকারী নিযুক্ত করেন। বলা বাহুল্য, ডেভির সাহায্যপুষ্ট হয়েছিলেন বলেই ফ্যারাডের পক্ষে অতি সাধারণ অবস্থা থেকে যশের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করা সম্ভব হয়েছিল।

স্যার যোসেফ ব্যাঙ্ক্‌স্‌-এর মৃত্যুর পরে ডেভি রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং কার্যভার গ্রহণ করেন ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর। তখন তাঁর বয়স মাত্র বিয়াল্লিশ বছর। ইতিপূর্বে স্যার আইজাক নিউটন এই আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। স্যার হাম্ফ্রি ডেভিও অনুরূপ মর্যাদার সঙ্গে এই আসন অলঙ্কৃত করেন, প্রায় ছ-বছর ধরে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুণ তাঁকে এই কার্যভার পরিত্যাগ করতে হয় মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে।

ডেভি মাছ ধরতে এবং শিকার করতে খুব ভালবাসতেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের একদিন শিকারে বেরিয়েছেন, হঠাৎ সেখানে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। আরোগ্য লাভ করবার পর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় তিনি ছোট ভাইয়ের সঙ্গে 'কন্টিনেন্ট'-এর স্বাস্থ্যকর স্থানগুলির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ডেভির ছোট ভাই ছিলেন ডাক্তার। তখনও রেলগাড়ী আবিষ্কৃত হয় নি; তাই দেশ-ভ্রমণ ছিল খুবই কষ্টকর। ফ্রান্সে পৌঁছে তাঁরা একটি 'পোষ্ট-চেইজ' (হাল্‌কা ঘোড়ার গাড়ী) কিনেন এবং তাতে চড়েই নানা জায়গায় বেড়াতে লাগলেন। হাওয়া বদল করবার ফলে এবং পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করায় ধীরে ধীরে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে থাকে এবং বিপদ কেটে যাওয়ায় পর কর্মস্থলে ফিরে আসেন।

ডেভির মত একজন নিরলস এবং প্রতিভা-সম্পন্ন বিজ্ঞানীর পক্ষে এইরূপ অসহায় এবং নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করা ছিল অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তাই তখন তিনি বাড়ীতে যেসব চিঠিপত্র লিখেছেন, সেগুলি অত্যন্ত করুণ এবং মর্মস্পর্শী। একটি চিঠিতে তিনি লেখেন—লণ্ডন সমাজে পুনরায় প্রবেশের চেষ্টা না করে এই নির্জন পরিবেশে প্রকৃতির ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে সময় কাটানোই আমার পক্ষে ভাল। কারণ, সেখানে অতীতের স্মৃতি সব সময়ই মনে করিয়ে দেয়, আমি কি ছিলাম; আর আমার শারীরিক অক্ষমতা আমাকে শিক্ষা দেয়, অতীতের কিরূপ ছায়ায় আমি পরিণত হয়েছি।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রোম নগরীতে অবস্থানকালে তিনি পুনরায় পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। সংবাদ পেয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে তাঁর স্ত্রী ছুটে এলেন। তাঁর ভাই তখন মাল্টায় সৈন্যদলের চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ডেভি তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন—আমি নিয়মিত রক্ত-মোক্ষণ, সেক প্রভৃতি নির্মম শৃঙ্খলার অধীন হয়ে রয়েছি, কিন্তু দুর্বলতা বেড়েই চলেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই আমার নশ্বর অস্তিত্বের অবসান হবে। আমার অস্থি রেখে যাব এই রোম নগরীতে। পুনশ্চ দিয়ে জানালেন—আমায় প্রিয় জন্‌, আমি মরতে বসেছি, যত তাড়াতাড়ি পার চলে এস।

সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁর ভাই রওনা হলেন এবং রোমে পৌঁছালেন ১০ই মার্চ। তিনি এসেই অগ্রজের চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দু-জনেই যেন নতুন করে আশার আলো দেখতে পেলেন। ধীরে ধীরে ডেভির অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। সুস্থ বোধ করলে তাঁকে মাঝে মাঝে তাঁর প্রিয় গ্রন্থ আরব্য-উপন্যাসের গল্প পড়ে শোনানো হতো। কোন কোন দিন তাঁকে গাড়ী করে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হতো। তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে ২৫শে এপ্রিল সকলে রোম পরিত্যাগ করে ২৮শে মে জেনেভায় উপস্থিত হন।

জেনেভায় পৌঁছেই তাঁর পরম বন্ধু ও সহকর্মী ডাঃ টমাস ইয়ং-এর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। রোজকার মতই টেবিলে বসে আহার সমাপন করে রাত্রি ৯টায় শয়ন করতে গেলেন। কিন্তু রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় তাঁর জীবন দীপ নির্বাপিত হয়ে গেল। তখন তাঁর বয়স মাত্র একান্ন বছর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছাত্রবৃন্দ এবং

ইংরেজ বন্ধুদের উপস্থিতিতে জেনেভাতেই তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। কারণ, তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল—যেখানে তাঁর মৃত্যু হবে, সেখানেই যেন তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়। ইংল্যাণ্ডের ওয়েষ্ট মিনস্টার অ্যাবিতে একটি মর্মর স্মৃতিফলক এবং কৈশোরের লীলাভূমি পেনজান্সে একটি প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে এই মহান বিজ্ঞানীর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

মরুভূমির প্রাণী

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মানুষ চায় পরিবেশকে আপনার ইচ্ছানুযায়ী বদলে নিতে। জীবজন্তু এবং গাছপালার ক্ষেত্রে কিন্তু পরিবেশ পরিবর্তন করবার চেয়ে মানিয়ে নেবার ভাবটাই প্রবলতর। জীবজন্তু ও গাছপালা পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে প্রকৃতিরই অংশ হয়ে বেঁচে থাকতে চায়। মরুভূমিতে যে সব উদ্ভিদ ও জন্তুজানোয়ার রয়েছে তাদের মধ্যে দেখা যায়, পরিবেশের উপযোগী হবার এক আন্তরিক প্রয়াস।

মরুভূমিতে গ্রীষ্মকালে দিনের তাপমাত্রা দেড়-শ' ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে; রাত্রিতে আবার পঞ্চাশ ডিগ্রী ফারেনহাইটে নেবে আসে। তাপমাত্রার এত অধিক পার্থক্য যে কোন জীবের পক্ষেই অসহ্য। দিনের বেলায় মরুবাসী জীবের অধিকাংশই গর্তের ভিতরে থাকে। যেসব জীব মরুভূমিতে মাটির উপরে থাকে, তারা দিনে কোন ছায়াঘেরা স্থানে বিশ্রাম করে। তবুও রৌদ্রের দাপট সহ্য করতে হয় বলে এমন উদ্ভিদই তাদের উদরস্থ করতে হয়, যাতে জলের অংশ খুব বেশী।

মরুভূমির জীবজন্তু জলসমন্বিত অঞ্চলের জীবজন্তু অপেক্ষা আকৃতি-প্রকৃতিতে পৃথক নয়। তবে মরু অঞ্চলের জন্তুজানোয়ার অনেকদিন জলপান না করে বেঁচে থাকতে পারে। এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মরু অঞ্চলের নানারকমের ইঁদুর; যেমন—ক্ষুদ্রকায় ক্যাঙ্গারু ইঁদুর, কাঠ-ইঁদুর প্রভৃতি। মরুবাসী কাঠবিড়ালীও অনেককাল জলের অভাবে টিকে থাকতে পারে। উদ্ভিদের মত সূর্যকিরণ কাজে লাগিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না কোন জীব, বরং মরুভূমির প্রচণ্ড তাপে প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়। এজন্যে মরুবাসী অনেক জীব মাটির অভ্যন্তরে বসবাস করে এবং সূর্যাস্তের পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তারা কেবল বাইরে থাকে। এভাবে তারা প্রখর উত্তাপ থেকে আত্মরক্ষা করে; কারণ এতে দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় জলের সবটা উবে না গিয়ে কিছুটা সঞ্চিত থাকে।

দেহের জলীয় অংশ কেবল উবে যেতে না দিলেই চলে না, মাঝে মাঝে ঐ জল বদ্‌লানোও দরকার। আমরা জলপান করে দেহের জলের চাহিদা মিটাই। প্রয়োজনীয় জল খাদ্য থেকে উৎপাদন করা আমাদের দেহের ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু মরুভূমিতে এমন প্রাণী আছে যারা জলশূন্য শুষ্ক বীজ খেয়ে মাসের পর মাস কাটিয়ে দিতে পারে, অথচ তাদের দেহে জলীয় অংশের কমতি পড়ে না। এসব প্রাণী নিজেদের দেহে খাদ্য থেকে জল উৎপাদন করতে পারে। মনে রাখা দরকার যে, প্রয়োজনীয় জল উৎপাদন কেবল কতিপয় মরুবাসী জীবেরই একচেটিয়া অধিকার নয়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, গবেষণাগারে পশুদের যখন দিনের পর দিন শুষ্ক খাদ্য দেওয়া হয়, তখন তারা নিজেদের দেহে জল তৈরী করে।

মরুভূমির প্রাণী বলতে সর্বপ্রথম আমাদের উটের

কথা মনে হয়। উটকে বলা হয় 'মরুভূমির জাহাজ'। পৃথিবীতে উটের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল উত্তর আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে। আজও সেখানে প্রাচীন কালের উটের ফসিল বা জীবাশ্ম পাওয়া যায়। ক্রমে ক্রমে উট আফ্রিকা ও এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উট কিছুকাল থাকলেও পরে বিলুপ্ত হয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকায় উট পরিবর্তিত হয় লামাজাতীয় প্রাণীতে। অধুনা উট দেখতে পাওয়া যায় সাহারা, আরব ও ভারতের মরুভূমিতে। এই উটের একটি কুঁজ। দুটি কুঁজওয়ালা উট দেখা যায় গোবি মরুভূমিতে। দু-কুঁজওয়ালা উটের দেহ লম্বা লোমে আবৃত, উচ্চতায় সাধারণ উটের চেয়ে কিছুটা ছোট। উট এখন এশিয়া ও আফ্রিকার প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। ইদানীং কিছু সংখ্যক উট অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এরা শেষ পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে কিনা বলা শক্ত। বিলুপ্তির আশঙ্কার কারণ এই যে, ইতিপূর্বে কয়েকটি উট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এরিজোনা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের মরুভূমিতে আমদানী করা হয়েছিল; কিন্তু আজ তাদের কোন বংশধর মার্কিন মরুভূমিতে দেখা যায় না।

উটের সঙ্গে মরুবাসী মানুষের সম্পর্ক অনেক হাজার বছরের পুরনো। বন্য উট আজকাল আর দেখতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর প্রায় সব উট আজ মানুষের সম্পত্তির অংশ। কিন্তু তাই বলে গরু, ভেড়া, কুকুর, ছাগলের মত উটের স্বভাব পরিবর্তিত হয় নি। কুকুরকে মানুষ নানারকম কাজের উপযোগী করে তুলতে পারে; মানুষের আদেশ ইঙ্গিত কুকুর বুঝতে পারে। কিন্তু সারা জীবনে উটকে মানুষ বড় জোর হাঁটু গেড়ে বসতে শিখাতে পারে। অনেকের মতে, এ ব্যাপারটি হচ্ছে বুদ্ধিহীনতার উদাহরণ। উট খেয়ালী জন্তু এবং সময়ে সময়ে খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। কিন্তু সেজন্যে মরুবাসীরা উটকে নির্বোধ, একগুঁয়ে জন্তু বলে মানতে রাজী নয়। তারা জানে, মরুভূমির বুকে যখন বালির ঝড় ওঠে তখন এই 'নির্বোধ' জন্তুটি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে এবং নাক-চোখ বন্ধ করে নিশ্চল হয়ে থাকে। এ ভাবে সে যে কেবল নিজেকে রক্ষা করে, তা নয়, আরোহীদেরও প্রাণরক্ষা করে।

উট দেখতে মোটেই সুন্দর নয়। কিন্তু পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার সর্বশরীর মরুভূমির উপযোগী হয়েই গড়ে উঠেছে। পায়ের তলায় মাংসপিণ্ড আছে বলে মরুভূমির বালিতে উটের পা ডুবে যায় না; কাজেই বালির উপর দিয়ে সহজেই যাতায়াত করতে পারে। উটের হাঁটুর কাছেও মাংসপিণ্ড আছে; সেজন্যে বালির উপর হাঁটু গেড়ে বসবার সময় বালির সঙ্গে ঘর্ষণজনিত যন্ত্রণা অনুভব করে না। উটের চোখের পাতা বালির আক্রমণ প্রতিহত করে। বালির ঝড় উঠলে উটের নাক বুজে যায়, আবার আকাশ পরিষ্কার হলে খুলে যায়। উটের ঠোঁট দুটি মরুভূমির কণ্টকিত তরুগুল্ম আহার করবার উপযোগী। আর যা কিছু উদরস্থ করুক না কেন, সব কিছুই সে হজম করতে পারে। উটের পাকস্থলীর হজম-শক্তি যে কোন প্রাণীরই ঈর্ষার বস্তু। উটের তিনটি পাকস্থলী আছে। তিনটি পাকস্থলী থাকবার ফলে উটের পক্ষে মরুভূমিতে বিচরণ করা অনেক সহজ হয়েছে। উটের পিঠের কুঁজটি স্নেহজাতীয় পদার্থে পরিপূর্ণ। উষর মরুতে যখন দিনের পর দিন কোন খাদ্য মিলে না, তখন এই কুঁজটি স্নেহজাতীয় পদার্থ সরবরাহ করে' উটের কর্মশক্তি অটুট রাখে। সঞ্চিত স্নেহজাতীয় পদার্থ নিঃশেষিত হয়ে গেলে কুঁজের আকারও হ্রাস পায়। কুঁজের আকার দেখে মরুবাসীরা বুঝতে পারে, উটটি মরুপথে যাত্রা করবার উপযোগী কিনা।

মরুপথে যাত্রার পূর্বে উটকে প্রচুর জলপান করানো হয়। এজন্যে সময় সময় উটকে লবণ খাওয়ানো হয়। তার ফলে জল পিপাসা বৃদ্ধি পেয়ে

থাকে এবং উট প্রচুর জল সংগ্রহ করে নিতে পারে। তপ্ত মরুভূমিতে যখন জল দুর্লভ হয়ে পড়ে তখন এই সঞ্চিত জল তার তৃষ্ণা নিবারণ করে। সময় সময় মরুযাত্রী পথ হারিয়ে ফেলে এবং জলাভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। এরূপ অবস্থায় তারা উটকে মেরে ঐ জল সংগ্রহ করে প্রাণ বাঁচায়।

উটের মাংস মরুবাসীর উপাদেয় খাদ্য। উটের দুধ মরুবাসীর নিত্যকার পানীয়। উটের দুধ অত্যন্ত ঘন, তাই চা বা কফি তৈরীর উপযোগী নয়। দু-কুঁজওয়ালা উটের লোমে গোবি মরুভূমির লোকেরা পোষাক তৈরী করে। উট মারা গেলে তার চামড়ায় তাঁবু, পোষাক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরী হয়।

সাধারণতঃ একটি উট প্রায় সাত মণ বোঝা বইতে পারে। একদিনে একটি উট গড়ে ২৫ মাইল চলতে পারে। তিন দিন কোন খাদ্য বা জলগ্রহণ না করে উট মরুভূমির উপর দিয়ে চলতে সক্ষম। উটের চলবার একটি বিশেষ ভঙ্গী আছে। প্রথমে ডান দিকের পা দুটি, তারপর বাঁ দিকের পা দুটি একসঙ্গে চলে। এভাবে চলবার ফলে আরোহীদের মনে হয়, তারা যেন নৌকায় বসে হেলে-দুলে চলেছে। অভ্যাস না থাকলে জাহাজের আরোহীদের মত বমনোদ্রেক হবার কথা।

উট একবারে একটি বাচ্চা প্রসব করে। জন্মাবার সময় বাচ্চার উচ্চতা থাকে প্রায় তিন ফুটের মত। বাচ্চা প্রথম দিন ঠিকমত হাঁটতে পারে না; দ্বিতীয় দিনে কিন্তু মায়ের সঙ্গে ঘুরতে আরম্ভ করে। মা এক বছর ধরে বাচ্চাকে চোখে চোখে রাখে। মরুপথে চলবার সময় বাচ্চাটাকে যদি মায়ের পিঠের উপর রাখা হয়, তাহলে বাচ্চা বুঝি পিছনে রয়ে গেল মনে করে সে ভয়ানক রেগে যায় এবং কিছুতেই আর অগ্রসর হতে চায় না। সেজন্যে বাচ্চাটাকে পিঠে নিয়ে অন্য একটি উট তার আগে আগে চলে, মা যাতে সব সময় তার সন্তানকে দেখতে পায়। বর্তমান পৃথিবীতে উটের সংখ্যা হবে প্রায় চল্লিশ লক্ষের মত।

আজকাল সুবিশাল সাহারা মরুভূমি আকাশ-পথে দূরপাল্লার জেট বিমানে একবারে অতিক্রম করা যায়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। কিন্তু মরু-বাসীর দৈনন্দিন জীবনে উটের সাহচর্য প্রাচীন-কালের মতই আজও অপরিহার্যই রয়ে গেছে।

মরুভূমিতে কাঠবিড়ালী দেখতে পাওয়া যায় সাধারণতঃ মরূদ্যানের নিকটবর্তী অঞ্চলে। কাঠ-বিড়ালীর ছোট ছোট কান, বড় বড় সুন্দর চোখ, গায়ে সাদা-কালো ডোরা কাটা। কাঠবিড়ালী আকারে ছোট; কিন্তু এমন সতর্ক, ক্ষিপ্রগতি ও কর্মপটু জীব কমই আছে। কোথায় এতটুকু খাবার আছে, তার সন্ধান জানে কাঠবিড়ালী; সেই খাবার সংগ্রহ না করা পর্যন্ত তার চেষ্টার বিরাম নেই। অধিকাংশ কাঠবিড়ালী বৃক্ষ-কোটরে বাস করে। এক শ্রেণীর কাঠবিড়ালী মাটির নীচে গর্তেও থাকে। কাঠবিড়ালীর প্রিয় খাদ্য হচ্ছে—বাদাম, ফল, বীজ এবং কচি ক্যাক্টাস প্রভৃতি। দেখা গেছে কাঠবিড়ালী অনেক কাল, এমন কি কয়েক বছর পর্যন্ত জলপান না করেই কাটিয়ে দিতে পারে। মাটির নীচে কাঠবিড়ালীর গর্তের চারদিকে সুড়ঙ্গ থাকে। ঐ সব সুড়ঙ্গ-পথে সে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। কারণ তার উপর হামলা করবার জন্যে সাপ, খেঁকশিয়াল, গিলা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়েই থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ডাঃ ভরহিস গ্রীষ্মের উষ্ণ মধ্যাহ্নে কাঠবিড়ালীর গর্তের তাপমাত্রা মেপে দেখেছিলেন যে, সেখানকার তাপমাত্রা ৭৭° ফারেনহাইট থেকে ৭২° ফারেনহাইটের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আমাদের সুপরিচিত টিকটিকিও মরুভূমিতে দেখা যায়। টিকটিকি অধিক তাপ সহ্য করতে পারে না। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে কোন ঝোপের আড়ালে, পাথরের তলায় বা মাটির নীচে লুকিয়ে

থাকে। লোক দেখলে রাগতভাবে লেজ নেড়ে দূরে চলে যায়।

এক শ্রেণীর টিকটিকির গায়ে এবং মাথায় কাঁটা দেখা যায়। এরা অতি নিরীহ জীব। অতিমাত্রায় উত্তেজিত হলে এদের চোখ থেকে রক্ত নিঃসৃত হতে দেখা যায়। ছোট ছোট টিকটিকি অনায়াসে সাপের পেটে চলে যেতে পারে; তা ছাড়া অন্যান্য জীবজন্তু কর্তৃক আক্রমণের ভয়ও আছে। অনেক সময় পাখীর কবলে পড়েও টিকটিকিকে প্রাণ হারাতে হয়। আত্মরক্ষার জন্যে টিকটিকি তার লেজটি বাড়িয়ে দেয়। টিকটিকির লেজ তার দেহ থেকে সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তখন তার পালিয়ে যাবার বেশ সুযোগ ঘটে। অবশ্য সব সময় এ-রকম ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয় না। মরুভূমিতে শিংওয়ালা একরকম ব্যাং দেখা যায়। এরা নামে ও আকারে ব্যাঙের কাছাকাছি হলেও আসলে কিন্তু টিকটিকির সমগোত্রীয়। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে কোন শীতল ছায়াতলে সে টিকটিকির মত আত্মগোপন করে থাকে। তার দেহ চ্যাপ্টা ও গোলাকার, দেহের চারদিকে শিঙের মত কাঁটা থাকে শিংওয়ালা ব্যাঙের ভ্রু-চোখের কোণে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দেখা যায়। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে এই জীবটি রক্ত ছিটিয়ে আক্রমণকারীকে ভয় দেখাতে চায়, যাতে তার পলায়নের সুবিধা হয়। শিং-ওয়ালা ব্যাঙের গায়ের রং বালির মত, অতএব মরু-ভূমিতে এরা সহজে চোখে পড়ে না। এদের মাথার উপরিভাগে একটি দাগ দেখতে পাওয়া যায়। কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের মতে, এক সময়ে এদের পূর্বপুরুষ ছিল অতিকায় সরীসৃপ এবং সে সরীসৃপের চোখ ছিল তিনটি। এদের মাথার দাগ নাকি সেই তৃতীয় নেত্রের স্মৃতির জের টেনে চলেছে। শিংওয়ালা ব্যাঙের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে পিঁপড়ে। কোন খাদ্য গ্রহণ না করে সে অনেক দিন বাঁচতে পারে।

মরুভূমির অতিশয় বিপজ্জনক জীব হচ্ছে বৃশ্চিক, অর্থাৎ কাঁকড়া-বিছা। মরুভূমির বালির মধ্যে অসংখ্য কাঁকড়া-বিছা লুকিয়ে থাকে। অসতর্ক মুহূর্তে হুল ফুটিয়ে দিলে ছোটদের প্রাণহানি পর্যন্ত হতে পারে। কাঁকড়া-বিছা নিশাচর জীব। মরুবাসী হলেও জলপানে এদের বেশ আসক্তি আছে। তাপমাত্রা ৯০° ফারেনহাইটের উপরে উঠলেই কাঁকড়া-বিছা ঠাণ্ডা জায়গা, গর্ত, বাড়ীর ফাটল অথবা আবর্জনার স্তূপে আশ্রয় গ্রহণ করে। কাঁকড়া-বিছা দৈর্ঘ্যে পাঁচ ইঞ্চিরও বেশী হতে পারে।

এরা নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গ শিকার করে' জীবনধারণ করে। বড় কাঁকড়া-বিছা ছোটগুলিকে উদরস্থ করে; এমন কি মা তার বাচ্চাদেরও উদরসাৎ করতে ইতস্ততঃ করে না। শীতকালে সাপ, ব্যাং প্রভৃতির মত কাঁকড়া-বিছাও কোন গর্তে বা বাড়ীর ফাটলে নির্জীবের মত পড়ে থাকে কয়েক মাস ধরে। কাঁকড়া, চিংড়ির মত এরাও খোল পরিবর্তন করে ক্রমশঃ বড় হয়ে থাকে।

পৃথিবীর স্থলচর জীবের বিবর্তনের ইতিহাসে বৃশ্চিক এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভূপৃষ্ঠের সব জায়গা জুড়ে ছিল জলের বিস্তার। সেই জলের তলে ধীরে ধীরে বিভিন্ন জীবের উদ্ভব হলো। আস্তে আস্তে জল নেমে গিয়ে ডাঙ্গা দেখা দিল। বিবর্তনের ফলে যেসব প্রাণী জল ছেড়ে ডাঙ্গায় এসে উপস্থিত হয়েছিল, কাঁকড়া-বিছাই ছিল বোধ হয় তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। প্রায় তিরিশ কোটি বছর পূর্বের এই কাহিনী। তখন ডাঙ্গায় গাছপালা ছিল না বললেই চলে—সব জায়গায় ছিল মরুভূমির রাজত্ব। আজও কাঁকড়া বিছা সেই মরুভূমিতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় মরুভূমিতে বৃশ্চিকের দর্শন মিলে।

বাচ্চাগুলি মায়ের পিঠে চড়ে বসে থাকে কিছুটা বড় হলে অবশ্য নিজের পায়েই দাঁড়ায়। অধিকাংশ সময় কাঁকড়া-বিছা কোন পরিত্যক্ত

কোণে লুকিয়ে থাকে—কখন কখন জুতার মধ্যেও কাঁকড়া-বিছা চুপ করে বসে থাকে।

মরুভূমিতে ব্যাঙাচির জীবনধারণ খুবই আশ্চর্য-জনক। মরুভূমির শুষ্ক বালির নীচে গর্তের মধ্যে তারা পড়ে থাকে মাসের পর মাস। তারপর একদিন যখন বৃষ্টি হয়ে ছোট ছোট অগভীর পুকুরের সৃষ্টি হয় তখন জলের ছোঁয়ায় তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং ঊষর মরুভূমি তাদের কর্মচাঞ্চল্যে সজীব হয়ে ওঠে। দেখা যায়, শত শত ব্যাঙাচি আনন্দে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। দু-চার দিন পরে সব ব্যাঙাচি অদৃশ্য হয়ে যায় প্রায় এক বছরের মত।

ব্যাঙাচি জলচর জীব—পরে তাদের শ্বাসযন্ত্র স্থলচর জীবের মত বাতাস গ্রহণ করবার উপযোগী হয়। মরুভূমিতে তাদের এই দৈহিক রূপান্তর অতি দ্রুত ঘটে থাকে। জন্মের পর প্রায় দিন সাতেকের মধ্যেই পা দেখা দেয়। দিন দুই পরেই পা কর্মক্ষম হয়ে ওঠে এবং তারপর দু-দিনের মধ্যেই ব্যাং জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে আসে। সাধারণ অবস্থায় জল থেকে ডাঙ্গায় যেতে ব্যাঙের মাসখানেক বা আরও বেশী সময় লেগে যায়; কিন্তু মরুভূমিতে সময়ের প্রয়োজন হয় মাত্র দশ-পনেরো দিনের মত।

মরুভূমিতে নানা জাতের ব্যাং দেখা যায়। কারোর চোখের মণি বৃত্তাভাসের মত, কারোর বা গোল। কোনটার পিছনের পায়ে কালো একটা অংশ থাকে, যার সাহায্যে সে কোন বস্তুকে আঁকড়ে ধরতে পারে। এ-রকম চিহ্ন দেখে বলা যায়, কোন্ ব্যাং কোন্ শ্রেণীর। মরুভূমিতে বড় কোলাব্যাং দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কথা। মাঝারি আকারের ব্যাং দু-চারটি দেখা যায়—অধিকাংশই খুব ছোট ছোট।

কয়েক জাতের ব্যাং সারা বছর কোন জলাশয় বা কূপের কাছাকাছি বাস করে। মরুভূমিতে তারা বাস করে কোন ক্ষীণ জলধারার নিকটে অথবা মানুষের গড়া কোন কূপের কাছাকাছি।

মরুভূমিতে টিকটিকির মত গিলা মনষ্টার নামক দু-ফুট লম্বা এক জাতের প্রাণী দেখা যায়। এই প্রাণীদের গতি অত্যন্ত মন্থর বলে পশু ও মানুষের আক্রমণে এদের অস্তিত্ব আজ বিলুপ্তির পথে। এরিজোনা মরুভূমিতে টিকটিকি জাতীয় এই গিলা সংরক্ষিত প্রাণীর অন্তর্গত।

গতি মন্থর হলেও গিলা অন্য প্রাণীকে অতি দ্রুত আক্রমণে সক্ষম। এদের বিষ আছে। সাপের মত তীব্র বিষ খাঁজকাটা দাঁত দিয়ে অন্যের দেহে ছড়িয়ে দিতে পারে। দাঁত খাঁজকাটা বলে একবার কাউকে ধরলে তার নিস্তার পাওয়া খুবই কঠিন।

শীতকালে গিলা মনষ্টার গর্তের ভিতর নির্জীবের মত পড়ে থাকে—তখন তার লেজে সঞ্চিত চর্বি থেকে দেহের পুষ্টি সাধিত হয়। শীত সুরু হবার আগে গিলা খুব করে খেয়ে নেয়। সেই বাড়তি খাদ্য চর্বি হিসাবে লেজে সঞ্চিত হয়ে থাকে। গিলা মনষ্টার কাঠবিড়ালী, টিকটিকি, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণী উদরস্থ করে—পাখী ও সাপের ডিম তাদের অতি প্রিয় খাদ্য। গিলা বড় পেটুক। বন্দী অবস্থায়ও সামান্য খাবারের লোভে এরা নিজের দুরবস্থার কথা ভুলে যায়।

মরুভূমির তরুশোভিত অঞ্চলে খরগোসও দেখা যায়। গ্রীষ্মের তপ্ত মধ্যাহ্নে পিপাসার্ত খরগোস জলের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় তাদের স্বাভাবিক সচকিত ও প্রখর দৃষ্টি মেলে। একটু জল যদি কোথাও পাওয়া যায় তবে একবার চারদিক তাকিয়ে খরগোস তার পিপাসা মিটিয়ে নেয়।

মরুভূমির আর একটি নিরীহ প্রাণী হচ্ছে হরিণ। মরূদ্যানের জলাশয়ের নিকট হরিণ বাস করে। গ্রীষ্মকালে জলের অভাব ঘটলে হরিণ কণ্টকাবৃত ক্যাক্টাস ও অন্যান্য লতাগুল্ম উদরস্থ করে জলের পিপাসা মেটায়। গাছের কাঁটা হরিণের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। তা সত্ত্বেও চারদিকে যখন

খাদ্যের অভাব ঘটে তখন হরিণকে বাধ্য হয়ে বিপদ বরণ করে নিতে হয়।

মরুবাসীরা গরু, ভেড়া, ঘোড়া প্রভৃতি পশু-পালন করে। গরু একেবারে জল ব্যতীত প্রায় তিন চার মাস কাটিয়ে দিতে পারে। গরু, ভেড়া সাধারণতঃ সব রকমের ক্যাক্টাসই খেতে পারে। ক্যাক্টাসের কাঁটায় গরুর নরম ঠোঁট থেকে রক্ত পড়ে, কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় এই কষ্টকে মেনে নিতেই হয়। ঘোড়া কিন্তু তিন দিনের বেশী জল না খেয়ে থাকতে পারে না। তার কারণ, ঘোড়ার নাক ও ঠোঁট কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, তাছাড়া মরুভূমিতে কাঁটা গাছের প্রাদুর্ভাবই বেশী। মরুবাসীরা ঘোড়া পালন করে তাদের আত্মরক্ষার তাগিদে। কারণ, ঘোড়া অতি দ্রুত দৌড়াতে পারে। ঘোড়ার দৃষ্টি সম্বন্ধে মরুবাসীর বিশেষ শ্রদ্ধা দেখা যায়। জীবজগতে ঘোড়ার চোখ নাকি সবচেয়ে বড়, আর সে চোখের দৃষ্টিও নাকি খুব প্রখর ও সুদূর-সন্ধানী।

মরুভূমিতে সিংহ দেখতে পাওয়া যায় সাধারণতঃ পাহাড়ের কাছে। পাহাড়ের গুহা সিংহের আবাস স্থল। ঝরণার জল তার পিপাসা মেটায়। সিংহের খাদ্য হচ্ছে হরিণের মাংস। পিছন থেকে সন্তর্পণে এসে অতর্কিতে সিংহ ঝাপিয়ে পড়ে হতভাগ্য হরিণের উপর। অনেক সময় আবার হরিণের পথের পাশে সে লুকিয়ে থাকে। গরু, ঘোড়াও সিংহের ভোজ্য দ্রব্যের অন্তর্গত। মরু-সিংহের পাগুলি সুগঠিত এবং গায়ের রং ধূসর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মরু অঞ্চলে চিতাবাঘের মত দেখতে জগুয়ার নামক একপ্রকার হিংস্র জানোয়ার আছে। জগুয়ার লম্বায় প্রায় পাঁচ হাতের মত হয়। তাদের গায়ে কালো কালো ছোপ থাকে। হরিণের মাংস তাদের প্রিয় খাদ্য।

মরুভূমিতে সজারু দেখতে পাওয়া যায় সাধারণতঃ পাহাড়ের নিকটে। সজারুর গায়ের কাঁটা তার আত্মরক্ষার অস্ত্র। গাছের বাকল খেয়ে সজারু জীবন ধারণ করে। কোন জন্তু আক্রমণ করলে সজারু আক্রমণকারীকে কাঁটা ফুটিয়ে পর্যুদস্ত করে।

মরুভূমিতে কচ্ছপও দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ আমরা যে প্রকার কচ্ছপ দেখে থাকি, মরুভূমির কচ্ছপ তার চেয়ে পৃথক। এই কচ্ছপ দেখলে মনে হয়, অতি পুরাকালের এক প্রাণী। দুপুরে কড়া রোদের সময় তারা কোন ছায়ার তলায় ঘুমিয়ে থাকে। শীতকালের বেশীর ভাগ সময়ই তাদের নিদ্রায় কেটে যায়।

এই কচ্ছপ কিন্তু নিরামিষাশী। শাকসব্জী থেকে তাদের প্রয়োজনীয় জল আহরণ করে। কচ্ছপের দেহের উপরকার শক্ত আবরণের তলায় জল সঞ্চয়ের জন্যে বড় থলি আছে। অনাবৃষ্টির সময় ঐ সঞ্চিত জল তাদের পিপাসা মেটায়। কেউ কেউ মনে করেন, জল পান না করে দিন কাটাবার ব্যাপারে কচ্ছপ উটের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

কাঠ-ইঁদুর আমেরিকার এক আদিম জন্তু। মরুভূমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে এদের জুড়ি বিরল। এই ইঁদুর কীট-পতঙ্গ খায়। পাকা মেস্কুইট বীজ এদের প্রিয় খাদ্য। ক্যাক্টাসের শিকড় নষ্ট করতে এই প্রাণীগুলি অদ্বিতীয়। বালির অভ্যন্তরে অনেক সুড়ঙ্গ কেটে দিনের বেলায় সেখানে অবস্থান করে। সূর্যাস্তের পর এবং রাত্রিতে এর অবাধ বিচরণ আরম্ভ হয়। কাঠ-ইঁদুর অতিশয় পরিচ্ছন্ন জীব। আমাদের পরিচিত রোগবাহক ধূসর বর্ণের ইঁদুরের সঙ্গে তার কোন তুলনা চলে না। কাঠ-ইঁদুরের গর্তের মধ্যে হলঘর, শয্যাঘর, ভাড়ার ঘর, এমন কি স্নানঘর পর্যন্ত থাকে।

কাঠ-ইঁদুর দেখতে বেশ সুন্দর। এদের মাংসের লোভে হানা দেয় নানা জীবজন্তু। সাপ এদের গর্তে প্রবেশ করে। পেঁচা রাত্রিতে এদের আক্রমণ করে। মানুষও বালি খুঁড়ে এদের ধরবার চেষ্টা করে। কাঠ-ইঁদুরের এক অদ্ভুত স্বভাব হচ্ছে, এরা

যদি কিছু গ্রহণ করে তবে তার পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়ে যায়।

মরুভূমির এক বিস্ময়কর প্রাণী হচ্ছে ক্যাঙ্গারু-ইঁদুর। পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন মরুভূমিতে এই ইঁদুর দেখা যেত। পূর্ব কাজাকস্থানের জাইসান মরুভূমিতে জারবোয়া নামে ইঁদুর বর্তমানে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মরুভূমিগুলিতে এই ক্যাঙ্গারু-ইঁদুর অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

প্রাণীতত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে ক্যাঙ্গারু-ইঁদুর আসলে ইঁদুর নয়, পৃথক এক শ্রেণীর জীব। তার মুখের দু-পাটিতে বিশটি দাঁত, সাধারণ ইঁদুরের ষোলটি। ক্যাঙ্গারু-ইঁদুরের দেহের লোম ঘন এবং রেশমের মত কমনীয়, রং বাদামী। এদের দেহের সবচেয়ে লক্ষণীয় অংশ হচ্ছে এদের লেজ। লেজটি দেহের প্রায় দেড়গুণ। লেজের প্রান্তে এক গোছা লোম থাকে।

ক্যাঙ্গারু-ইঁদুর নাকি কখনও জলপান করে না। পরীক্ষাগারে এই জলপান করানো সম্ভব হলেও মরুভূমিতে এদের জলপান করতে আজ পর্যন্ত কেউ দেখে নি। কাজেই মরুভূমির সবচেয়ে বড় অসুবিধা ক্যাঙ্গারু-ইঁদুরকে ভোগ করতে হয় না।

ক্যাঙ্গারু-ইঁদুর ছোট, বড় নানারকমের হয়। সবচেয়ে ছোট আকারের ক্যাঙ্গারু-ইঁদুরের দেহ চার ইঞ্চি লম্বা, লেজটি ছয় ইঞ্চির মত। এরা মাটির তলায় গর্ত করে বাস করে। সময় সময় খরগোস, কাঠবিড়ালী প্রভৃতির গর্তেও এদের আশ্রয় নিতে দেখা যায়।

অষ্ট্রেলিয়ায় এক জাতের ক্যাঙ্গারু-ইঁদুর দেখা যায়। ক্যাঙ্গারুর মত এই ইঁদুরের বাচ্চা বহন করবার থলি আছে। অন্য শ্রেণীর ক্যাঙ্গারু-ইঁদুরের দেহে এরূপ থলি দেখা যায় না। তবুও ক্যাঙ্গারুর সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় দুটি ব্যাপারে—একটি হচ্ছে সুদীর্ঘ লেজ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে, লেজের উপরে বসে সামনের দু-পা দিয়ে বক্সিং করা। ক্যাঙ্গারুর মত পিছনের পা-দুটার উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে চলতে পারে ক্যাঙ্গারু-ইঁদুর। দু-পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে চলা ক্যাঙ্গারু-ইঁদুরের স্বভাব। এই স্বভাবের সঙ্গে মরুভূমির পরিবেশের বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে। ক্যাঙ্গারু-ইঁদুর সাধারণতঃ ধীরে ধীরে হেঁটে চলে। কিন্তু ভয়ের কোন কারণ ঘটলেই পিছনের পা-দুটা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকে। লাফিয়ে কোন্ দিকে যাবে তা আগে থেকে বোঝবার উপায় নেই। মনে হয়, হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে এদের এই অদ্ভুত লম্ফ দেবার শক্তির উদ্ভব হয়েছে। লাফ দেবার সময় দিক পরিবর্তনের ব্যাপারে তার লম্বা লেজ নৌকার হালের মত কাজ করে। ক্যাঙ্গারু ইঁদুরের ঝগড়ার বাতিক বড় বেশী। দুটা এক সঙ্গে থাকলেই তারা বক্সিং সুরু করে দেয়। ধস্তাধস্তি থেকে কামড়াকামড়ির পালা সুরু হয়। ঝগড়াটে হলেও খুব ছোট ক্যাঙ্গারু-ইঁদুর বেশ পোষ মানে। ক্যাঙ্গারু-ইঁদুর দেহের মধ্যে প্রয়োজনীয় জল সংরক্ষণ করে নতুবা তাকে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে, অতি সামান্য জল বাইরে থেকে নিয়ে কি করে দেহের জলের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। অনেক গবেষণার পর দেখা গেছে যে, ক্যাঙ্গারু-ইঁদুরের ঘাম নেই বললেই চলে। খুব গরম পড়লে মুখে সামান্য ঘাম দেখা যায়। তাছাড়া রাত্রে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় তারা চলাফেরা করে। এসব কারণে দেহ থেকে জলের অপচয় খুবই কম হয়। তাছাড়া ক্যাঙ্গারু-ইঁদুর প্রয়োজনীয় জল শর্করাপ্রধান শুষ্ক খাদ্য থেকে নিজের দেহে প্রস্তুত করে নেয়। প্রোটিন থেকে ক্যাঙ্গারু-ইঁদুর কিন্তু জল তৈরী করতে পারে না। ক্যাঙ্গারু-ইঁদুরের বৃক্কের বিশেষ গঠনই দেহে জল উৎপাদনে সহায়তা করে।

মরুভূমিতে সাপও দেখা যায়। সাপের রং চারদিকের পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য

আত্মগোপনের এই ব্যবস্থা অনেক প্রাণীই অবলম্বন করেছে। শীতকালে সাপ গুহার মধ্যে মৃতের মত পড়ে থাকে এবং শীতের শেষে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। উষ্ণ অবহাওয়ায় গাছের ছায়ায়, ঝোপঝাড়ে তারা লুকিয়ে থাকে।

মরু অঞ্চলে র‍্যাটেল সাপও দেখা যায়। এ সাপ পাঁচ হাতের মত লম্বা হতে পারে। এদের ডিম হয় না, একেবারেই বাচ্চা প্রসব করে। র‍্যাটেল সাপের বিষ ভয়ানক উগ্র। স্বভাবতঃ এরা বিনা কারণে কাউকে দংশন করে না। কিন্তু যদি কোন কারণে আহত হয় তবে প্রতিশোধ নেবার জন্যে অত্যন্ত হিংস্র হয়ে ওঠে। র‍্যাটেল সাপ উত্তেজিত হলে অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে নিজেই দংশন করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এরা ইঁদুর, টিকটিকি প্রভৃতি খেয়ে জীবনধারণ করে। সুযোগ পেলে এরা কাঠবিড়ালী ও পাখী গিলে ফেলে। র‍্যাটেল সাপের মাংস মরুভূমির জীবজন্তু—এমন কি, মানুষেরও প্রিয় খাদ্য।

হুইপ সাপ নামে পরিচিত আর এক জাতের সাপ মরুভূমিতে দেখা যায়। এদের পেটের দিকটা গোলাপী রঙের। মরুভূমিতে যত সাপ আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত চলতে পারে এই সাপ। হুইপ সাপের বিষ নেই। শিকারের চারদিকে এরা কুণ্ডলী পাকিয়ে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে বধ করে। এই সাপ গাছে উঠতে পারে, আবার তাড়াতাড়ি বালির মধ্যে লুকিয়েও যেতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মরুভূমিতে কোর‍্যাল নামে একপ্রকার সাপ দেখতে পাওয়া যায়। কোর‍্যাল সাপের বিষ খুবই মারাত্মক; কিন্তু সচরাচর কাউকে তারা আক্রমণ করে না। কোর‍্যাল সাপের সারা গায়ে লাল ও কালো ডোরার মাঝে মাঝে ফিকে হলদে রঙের ছোট ছোট ডোরা-কাটা।

মরুভূমির উষর প্রান্তরে নানারকম জীবের বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায়। প্রতিটি জীব মরুভূমির শুষ্ক পরিবেশের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছে। অন্যের অনুকরণে কেউ যেমন নিজেকে হারিয়ে ফেলে নি, পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে কেউ তেমনি নিশ্চিন্ত হয়েও থাকে নি। মরুর শব্দহীন অঞ্চলকে এরা মুখরিত করেছে। মোটের উপর তারা মরুভূমির পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে তাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

বেতার-যন্ত্রে শব্দের স্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি

শ্রীদীপ্তিকুমার সেন

বেতারের ক্ষুদ্র তরঙ্গের (Short wave) অনুষ্ঠান শোনবার সময় মাঝে মাঝে সবাইকে একটা অসুবিধায় পড়তে হয়। সেটা হলো বেতার-যন্ত্র থেকে যে শব্দ পাওয়া যায়, তার হ্রাস-বৃদ্ধি। কখনও শব্দ বেশ জোরে শোনা যায়, তার পর কমতে কমতে শব্দ কখনও এত কমে যায় যে, কিছুই প্রায় শোনা যায় না। আবার শব্দ বাড়তে বাড়তে বেশ জোরে হতে থাকে। শব্দের তীব্রতার এই রকম তারতম্যকে ইংরেজীতে 'ফেডিং' বলা হয়। শব্দের এই হ্রাস-বৃদ্ধি অনেক সময়েই সুষ্ঠুভাবে বেতার-অনুষ্ঠান উপভোগে বাধার সৃষ্টি করে। এই হ্রাস-বৃদ্ধি বা ফেডিং কত রকমের হয় এবং কি কি কারণে হয়, তাই হলো বর্তমান আলোচ্য বিষয়।

হ্রস্ব বেতার-তরঙ্গ আমাদের কাছে সাধারণতঃ সোজা এসে পৌঁছায় না। বেতার-অনুষ্ঠান প্রচার-কেন্দ্র থেকে ট্র্যান্সমিটার বা প্রেরক-যন্ত্র মারফৎ বেতার-তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে; কোনও

তরঙ্গ ভূ-পৃষ্ঠের সমন্তারালে চলতে থাকে, কোনও তরঙ্গ উঠে যায় আকাশের দিকে। প্রথমোক্ত তরঙ্গের পাল্লা কিন্তু বেশীদূর নয়—মাত্র কয়েক মাইল। তারপর এই তরঙ্গ এত ক্ষীণ হয়ে পড়ে যে, বেতার-গ্রাহক যন্ত্রে এই তরঙ্গ সাড়া জাগাতে পারে না। দ্বিতীয় রকমের তরঙ্গ আকাশের দিকে উঠে গেলেও তাকে ফিরে আসতে হয় এই পৃথিবীর বুকে—ঠিক যেমন করে আলোক-রশ্মি ফিরে আসে আয়নার বুক থেকে প্রতিফলিত হয়ে। আকাশের খুব উঁচু স্তরে এই যে 'অদৃশ্য দর্পণ'—যার গায়ে প্রতিফলিত হয়ে বেতার-তরঙ্গ ফিরে আসে পৃথিবীর বুকে—তার নাম আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নায়িত বায়ুমণ্ডল, অথবা সংক্ষেপে আয়নমণ্ডল। আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে বেতার-তরঙ্গ ফিরে আসতে পারে বলেই দার্জিলিং-এ বসে আমরা কলকাতা বা রেডিও সিলোনের অনুষ্ঠান শুনতে পাই; কলকাতায় বসে শুনতে পাই লণ্ডন, মস্কো অথবা ভয়েস অব আমেরিকার বেতার সংবাদ।

এই আয়নমণ্ডল সারা পৃথিবীকে আবৃত করে রেখেছে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যত উপরে ওঠা যায় ততই বাতাসের ঘনত্ব কমতে থাকে। প্রথমে ট্রপোস্ফিয়ার বা ক্ষুব্ধস্তর, তার উপরে ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বা স্তব্ধস্তর, আরও উপরে অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের উপরে চল্লিশ থেকে আড়াইশো মাইল দূর পর্যন্ত রয়েছে পর পর চারটি আয়নমণ্ডলের স্তর, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে ডি, ই, এফ (১) ও এফ (২)। এই স্তরগুলি আয়নে পরিপূর্ণ। সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি বাতাসের এই সব স্তরের মধ্য দিয়ে আসবার সময় বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণু-গুলিকে ভেঙে দেয়। ভেঙে দেওয়ার ফলে কোনও পরমাণু ধন-বিদ্যুৎ-সম্পন্ন, আবার কোনও পরমাণু ঋণ-বিদ্যুৎ-সম্পন্ন হয়ে পড়ে। এই তড়িতান্বিত পরমাণুকেই বলা হয় আয়ন। নীচের স্তরে, অর্থাৎ ট্রপোস্ফিয়ার ও ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে আয়ন প্রায় নেই বললেই চলে—কারণ সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি যখন এই স্তরে এসে পৌঁছায় তখন তা এতই ক্ষীণ হয়ে পড়ে যে, পরমাণু ভেঙে বাতাসকে আয়নায়িত করতে পারে না।

আয়নমণ্ডলের সবচেয়ে নীচের ডি-স্তরটি, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০ মাইল উপরে। রাত্রে এই আয়ন-স্তরটি লুপ্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ সাধারণ বায়ুস্তরে পরিণত হয়। বেতার-তরঙ্গকে শোষণ করে তার শক্তি হানি করাটাই ডি-স্তরের মুখ্য কাজ। বলা বাহুল্য, সে হিসাবে এই স্তরটি বেতার-অনুষ্ঠান শ্রবণের অনুকূল নয়। রাত্রে এই স্তরটি না থাকায় আমরা বেতার-অনুষ্ঠান অনেক পরিষ্কারভাবে শুনতে পাই।

এর উপরের ই-স্তরটি এবং তার উপরে এফ (১) স্তর—ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যথাক্রমে ৭০ ও ১২০ মাইল উচ্চতায় আছে। তারও উপরে আছে এফ (২) স্তর। তবে এই স্তরটি খুব ওঠা-নামা করে—ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কখনও ১৫০ মাইল, কখনও বা ২৫০ মাইল উচ্চতায় থাকে এই এফ (২) স্তর। সময়-বিশেষে এই এফ (১) এবং এফ (২) স্তর দুটি পরস্পর মিশে একটি স্তরও হয়ে যায়।

বেতার-তরঙ্গ উপরে উঠতে উঠতে কখনও ই, কখনও এফ (১), আবার কখনও এফ (২) স্তরে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। কোন্ তরঙ্গ কোন্ স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসবে, সেটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সেই বেতার-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও আয়নমণ্ডলের স্তরগুলির ইলেকট্রনের ঘনত্বের উপর। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যত উপরের দিকে যাওয়া যাবে, ততই আয়নস্তরগুলির ইলেকট্রনের ঘনত্ব বাড়তে থাকবে; অর্থাৎ ডি-এর চেয়ে ই-তে ইলেকট্রনের ঘনত্ব বেশী, তার চেয়ে বেশী এফ (১)-এ এবং আরও বেশী এফ (২)-এ। বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যত কম হবে, ততই সে ঘন ইলেকট্রনের স্তর ভেদ করতে পারবে। অতএব যে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যত কম হবে, সে তত উপরে উঠতে পারবে। অর্থাৎ যে তরঙ্গ ই-

স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসবে, তার চেয়ে কম দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ই-স্তর ভেদ করে চলে যাবে ও এফ (১) স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসবে। আরও কম দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ এফ (১) স্তর ভেদ করে উঠে এফ (২) স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসবে। এ-রকম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কমতে কমতে আমরা এমন এক তরঙ্গে এসে পৌঁছাব, যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এত কম হবে যে, সে এফ (২) স্তরকেও ভেদ করে বেরিয়ে যাবে—পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। এই শেষোক্ত অতি-হ্রস্ব বেতার-তরঙ্গ ভূ-পৃষ্ঠের দুই জায়গার মধ্যে বেতার-সংযোগের পক্ষে উপযোগী নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আয়নমণ্ডলের দ্বারা বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলনের জন্যেই পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে দূরবর্তী জায়গার মধ্যে বেতার সংযোগ সম্ভব হয়েছে।

বেতার-তরঙ্গ যখন প্রেরক-যন্ত্র থেকে নির্গত হয়ে আয়নমণ্ডলে প্রবেশ করতে থাকে তখন পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র তাকে দু-ভাগে বিশ্লিষ্ট করে দেয়—এর একটি অর্ডিনারী কম্পোন্যান্ট বা সাধারণ তরঙ্গ, আর একটি এক্সট্রা-অর্ডিনারী কম্পোন্যান্ট বা অসাধারণ তরঙ্গ। এই দুটি তরঙ্গ একই পথ বেয়ে চলে। তবে এরা একই আয়নস্তর থেকে প্রতিফলিত হয় না। অসাধারণ তরঙ্গটি অপেক্ষাকৃত নীচু স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসে, সাধারণ তরঙ্গটি সেই স্তর ভেদ করে একটু উপরে উঠে যায় এবং তারপর প্রতিফলিত হয়ে আসে। এরিয়েল এবং বেতার-গ্রাহক যন্ত্রের দ্বারা আমরা এই দুটি তরঙ্গকে যুগপৎ গ্রহণ করি। বেতার-যন্ত্রের শব্দের তীব্রতা, এই দুই তরঙ্গের সমবায়ের ফল। এই সমবায় বা মিলন কখনও শব্দের পরিমাণে আধিক্য, কখনও বা স্বল্পতা ঘটায়। অর্থাৎ এই দুই তরঙ্গের মিলনের ফলে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হবে, তার জোর যে এই দুই তরঙ্গের জোরের যোগফলের সমান হতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। বিয়োগফলের সমান হওয়াও কখনও কখনও সম্ভব। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। জলের ঢেউ বয়ে চলেছে। এক বিশেষ মুহূর্তে সেই ঢেউকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তার কোনও জায়গা উঁচু, কোনও জায়গা নীচু; অর্থাৎ কোনও জায়গায় জলকণাগুলি অকম্পিত জলকণার চেয়ে উঁচুতে, আবার কোনও জায়গায় আছে নীচুতে। ঢেউ যখন এগিয়ে চলে তখন প্রতিটি জলকণাই পর্যায়ক্রমে উপরে-নীচে উঠা-নামা করে। দুটি ঢেউ যদি দু-দিক থেকে এসে একই জায়গায় মিলিত হয়, তবে একটি বিশেষ জলকণার উপর এই দুটি ঢেউয়ের মিলিত প্রভাব নানারকমের হতে পারে। যদি দুটি ঢেউই কণাটিকে উপরে ঠেলে তুলতে বা নীচে নামাতে চেষ্টা করে, তবে কণাটি আগের বারের চেয়ে বেশী উঁচুতে উঠবে বা বেশী নীচুতে নামবে। কিন্তু যদি একটি ঢেউ কণাটিকে উপরে তুলতে এবং আর একটি ঢেউ নীচে নামাতে চেষ্টা করে তবে ফল হবে শূন্য—অর্থাৎ কণাটি উপরেও উঠবে না, নীচেও নামবে না—অকম্পিত অবস্থায় থাকবে; অর্থাৎ এক ঢেউয়ের কার্যকারিতা অন্য ঢেউ নষ্ট করে দেবে।

সাধারণ ও অসাধারণ বেতার-তরঙ্গ অথবা অন্য যে কোনও দুটি বেতার-তরঙ্গ যখন একসঙ্গে বেতার-যন্ত্রে ধরা হয়, তখন তাদের ব্যবহারও হয় ঠিক ওই জলের ঢেউয়েরই মত, অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, আবার কখনও তারা পরস্পরের বিরুদ্ধতা করে। ফলে, প্রথম ক্ষেত্রে আমরা বেতার-যন্ত্রে শব্দের আধিক্য ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্বল্পতা লক্ষ্য করি। প্রথমটি হয়, যখন তরঙ্গ-দুটির 'ফেজ' বা আন্দোলনের আপেক্ষিক অবস্থা একমুখী হয়; দ্বিতীয়টি হয়, যখন তাদের ফেজ হয় বিপরীত। অতএব দেখা যাচ্ছে, যদি এই দুটি তরঙ্গের আন্দোলনের আপেক্ষিক অবস্থা ক্রমাগত বদলাতে থাকে, তবে আমরা বেতার-যন্ত্রে পর্যায়ক্রমে শব্দের আধিক্য ও স্বল্পতা, আবার আধিক্য ও স্বল্পতা

—এ-রকম লক্ষ্য করবো। শব্দের এই রকম হ্রাস-বৃদ্ধিকেই বলা হয় ফেডিং।

বেতার-তরঙ্গের তীব্রতার এই হ্রাস-বৃদ্ধি দুই রকমের হতে দেখা যায়; যথা—সময়ানুক্রমিক বা সময়ের অনুবর্তনে নিয়মিতভাবে আবৃত অর্থাৎ পিরিয়ডিক এবং অনির্দিষ্ট বা নিয়মবহির্ভূত। সময়ের সঙ্গে তরঙ্গ-শক্তির যে নিয়মিত হ্রাস-বৃদ্ধি, তাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(ক) ম্যাগ্নেটো-আয়নিক হ্রাস-বৃদ্ধি; (খ) ডপ্‌লার এফেক্ট-জনিত হ্রাস-বৃদ্ধি। এবার তাদের সম্বন্ধে আলাদাভাবে আলোচনা করবো।

(ক) ম্যাগ্নেটো-আয়নিক ফেডিং, অর্থাৎ চৌম্বক-আয়নিক হ্রাস-বৃদ্ধি—বেতার-তরঙ্গের এই ধরণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে দুই কি তিনবার, কখনও কখনও আরও দ্রুত। এই ধরণের নিয়মিত ফেডিং লক্ষ্য করা যায় সাধারণতঃ সন্ধ্যাবেলায় অথবা খুব ভোরের দিকে; অর্থাৎ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ে। সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের অতিবেগুনী আলোর পরিমাণের ক্রমবর্ধনের জন্যে আয়নমণ্ডলে ইলেকট্রনের পরিমাণ ক্রমশঃ বেড়ে যেতে থাকে; আবার সূর্যাস্তের সময় সূর্যের অতিবেগুনী আলোর পরিমাণ ক্রমশঃ কমে আসে বলে আয়নমণ্ডলে ইলেকট্রনের পরিমাণ ক্রমশঃ কমে যেতে থাকে। ফলে ভোরবেলা ও সন্ধ্যার সময় একটি বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ আয়নমণ্ডলের ঠিক যে জায়গা থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসছে, তার উচ্চতা ঠিক থাকে না। সকালে ইলেকট্রনের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্যে বেতার-তরঙ্গ নিম্ন থেকে নিম্নতর স্তরে প্রতিফলিত হতে থাকে। সন্ধ্যার সময় ইলেকট্রনের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাবার ফলে বেতার-তরঙ্গ উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে প্রতিফলিত হয়ে আসে। ফলে, বেতার-প্রেরক যন্ত্র থেকে আয়নমণ্ডল হয়ে বেতার-গ্রাহক যন্ত্রে আসতে বেতার-তরঙ্গের যে পথটা অতিক্রম করতে হয়, তার দৈর্ঘ্যে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটে। কাজেই সাধারণ ও অসাধারণ—এই দুই তরঙ্গের আন্দোলনের আপেক্ষিক অবস্থার যে প্রভেদ, তাও ক্রমাগত বাড়তে অথবা কমতে থাকে। অতএব সময়ের আবর্তনের সঙ্গে কখনও তরঙ্গ দুটির ফেজ একমুখী হয় এবং কিছুক্ষণ পরে হয় বিপরীত; আবার সেই একই সময়ের ব্যবধানে হয় একমুখী। বেতার-যন্ত্রে তারই বহিঃপ্রকাশস্বরূপ আমরা পাই—যথাক্রমে শব্দের আধিক্যও স্বল্পতা।

(খ) ডপ্‌লার-এফেক্টজনিত ফেডিং—কোনও চলমান উৎস থেকে যখন কোনও নিরবচ্ছিন্ন শব্দ নির্গত হয়, তখন কোনও স্থির অর্থাৎ গতিহীন শ্রোতার কাছে সেই শব্দটির যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয়। শব্দের উৎসটি যদি স্থির শ্রোতার দিকে অগ্রসর হয়, তবে সেই শব্দের তীক্ষ্ণতা (Pitch) বেড়ে যায় বলে মনে হয়। আবার উৎসটি যদি ক্রমশঃ শ্রোতার কাছ থেকে দূরে চলে যায়, তবে শব্দের তীক্ষ্ণতা কমে যাচ্ছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে শব্দটি ক্রমশঃ সরু এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মোটা হয়ে আসছে বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ ধাবমান ট্রেনের হুইসিলের কথা বলা যেতে পারে। উৎসের গতির সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এই যে পরিবর্তন—এরই নাম ডপ্‌লার-এফেক্ট।

বেতার-তরঙ্গের বেলায়ও এই ডপ্‌লার এফেক্ট কার্যকরী। একটি বেতার-তরঙ্গ, প্রেরক-যন্ত্র থেকে গ্রাহক-যন্ত্রে নানাভাবে পৌঁছাতে পারে। প্রেরক-যন্ত্র থেকে ই-স্তরে প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে এসে পৌঁছানো; প্রেরক-যন্ত্র থেকে ই-স্তরে প্রতিফলিত তরঙ্গ আবার ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হবার পর উপর দিকে গিয়ে ই-স্তরে দ্বিতীয়বার প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে এসে পৌঁছানো; প্রেরক-যন্ত্র থেকে এফ (১) স্তরে প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে এসে পৌঁছানো ইত্যাদি নানারকম পন্থায় সম্ভব হতে পারে। এদের মধ্যে যে কোনও দুটি তরঙ্গ নিয়ে বিচার করা যাক।

ধরা যাক, প্রথম ও দ্বিতীয় তরঙ্গটি—যারা যথাক্রমে একবার ও দুবার বিশেষ আয়নস্তরে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে। যদি এই আয়নস্তরটি উপর দিকে উঠতে বা নীচের দিকে নামতে থাকে, তবে এই দুটি তরঙ্গের উপরেই ডপ্‌লার-এফেক্ট কার্যকরী হবে; অর্থাৎ এই দুটি তরঙ্গেরই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে, অর্থাৎ কমতে বা বাড়তে থাকবে। কিন্তু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এই ক্রমবিবর্তন দুই তরঙ্গের বেলায় দু-রকম হবে। তার কারণ, তরঙ্গ দুটি (একটি একবার প্রতিফলিত ও আর একটি দুবার প্রতিফলিত হয়ে আসবার জন্যে) বিভিন্ন দিক থেকে গ্রাহক-যন্ত্রে এসে পৌছাবে। তরঙ্গ দুটির একটি যদি ই-স্তর ও আর একটি এফ-স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসে, তাহলেও তাদের উপর ডপ্‌লার প্রতিক্রিয়ার জন্যে দুটির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হবে। কাজেই তরঙ্গ-প্রচারের সময় এই দুটি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এক হলেও বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে এসে পৌছাবার সময় দুটির মধ্যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সামান্য ব্যতিক্রম ঘটে। এর ফলে তাদের সম্মিলিত প্রভাবে যে তরঙ্গটি উৎপন্ন হয় তার শক্তি বা তীব্রতার নিয়মিত হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এই ধরণের হ্রাস-বৃদ্ধিকে বলা হয় 'বীটস্'। মনে রাখতে হবে, এই ধরণের ফেডিং-এর মূল কারণ আয়নস্তরের উর্ধ্ব বা অধোগতি। আয়নস্তরের এই উর্ধ্বগতি বা অধোগতির কারণ—কখনও প্রাকৃতিক জোয়ার-ভাঁটা, কখনও বা উল্কাপাত।

(গ) উপরে যে দু-রকম ফেডিং-এর কথা বলা হলো তার কারণ, দুটি বিভিন্ন বেতার-তরঙ্গের পারস্পরিক অবস্থা ও বোঝাপড়া। আলাদা একটি বেতার-তরঙ্গ এককভাবেও এই বেতার-তরঙ্গের তীব্রতার নিয়মিত হ্রাস-বৃদ্ধি সৃষ্টি করতে পারে। আয়নমণ্ডলের তলার দিকটা, অর্থাৎ পৃথিবীর দিকে যে পিঠটা রয়েছে, সেটা সব সময় ঠিক মসৃণ হয় না—কখনও হয় বন্ধুর, কখনও বা আয়নমণ্ডলের নীচের দিকে খুব ঘন আয়নের পিণ্ডের মত থাকে। এই দুয়েরই ফল মুখ্যতঃ একই রকম হয়। লেন্সের মধ্য দিয়ে আসবার সময় আলো যেমন ঘনীভূত হয়ে এক জায়গায় পড়ে, বেতার-তরঙ্গ আয়নমণ্ডলের বন্ধুর অধস্তল বা ঘন আয়নপিণ্ডের মধ্য দিয়ে নীচের দিকে আসবার সময় অনেকটা সেই রকম ব্যাপার ঘটে। কোনও এক স্থানে বেতার-তরঙ্গ ঘনীভূত হয়ে পড়ে—ফলে বেতার-যন্ত্রে শব্দের তীব্রতা অনুভূত হয়। বাতাসে মেঘ যেমন ভেসে চলে—আয়নমণ্ডল ও আয়নপিণ্ডগুলিও সেই রকম ভূ-পৃষ্ঠের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ক্রমাগত সরে যেতে থাকে। কাজেই একটি বিশেষ স্থানে হয়তো কোনও এক সময় বেতার-তরঙ্গ ঘনীভূত হয়ে তীব্রতার সৃষ্টি করছে, আবার একটু পরেই—যখন আয়নস্তর ও আয়নপিণ্ড সরে যাচ্ছে, তখন—বেতার-তরঙ্গের পরিমাণে ঘাটতি পড়ে বেতার-যন্ত্রে শব্দ হ্রাস পাচ্ছে। বলা বাহুল্য, আয়নস্তরের বন্ধুরতা বা আয়নপিণ্ড-গুলি নিয়মানুসারে সাজানো থাকে না বলে এই ধরণের ফেডিং, (ক) এবং (খ) ধরণের ফেডিং-এর মত অতটা নিয়মিত হয় না।

উপরিউক্ত তিন রকম সময়ানুক্রমিক বা পিরিয়-ডিক ফেডিং ছাড়া আরও এক ধরণের ফেডিং সচরাচর লক্ষ্য করা যায়—তার পৌনঃপুনিকতার কোনও নির্দিষ্ট কালক্রম নেই, অর্থাৎ এই হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়মবহির্ভূত—যেন যদৃচ্ছ। অনেক কারণে এই ধরণের ফেডিং হতে পারে। প্রেরক-যন্ত্র থেকে গ্রাহক-যন্ত্র পর্যন্ত বেতার-তরঙ্গের দুটি বিভিন্ন গতিপথের কথা আগেই বলা হয়েছে—একটি ভূ-পৃষ্ঠচারী আর একটি আকাশচারী, অর্থাৎ আয়ন-মণ্ডলে প্রতিফলিত। ভূ-পৃষ্ঠ বরাবর যে তরঙ্গ তার আন্দোলন বা আবর্তনে বিশেষ পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আয়নমণ্ডলে আয়নের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি, ইলেকট্রনের সঙ্গে অন্যান্য আয়নের সংঘর্ষে সংখ্যার পরিবর্তন, আকাশচারী বেতার-তরঙ্গের দিক-পরিবর্তন, আয়নমণ্ডলের অধস্তলের বন্ধুরতা ইত্যাদির

জন্যে আকাশচারী বেতার-তরঙ্গের চারদিকে ছিড়িয়ে-পড়া—ইত্যাদি কারণে আকাশচারী বেতার-তরঙ্গের আন্দোলনের ফেজ-এ অনবরত যদৃচ্ছ পরিবর্তন ঘটতে পারে। অতএব এই ভূ-পৃষ্ঠচারী ও আকাশচারী বেতার-তরঙ্গের ফলস্বরূপ বেতার-যন্ত্রে শব্দ কখনও তীব্র হয়, কখনও বা স্তিমিত হয়ে আসে। যেহেতু এই দুটি তরঙ্গের মধ্যে একটির ফেজ বদলায় না এবং আর একটির ফেজ-এ যদৃচ্ছ পরিবর্তন ঘটে, সেহেতু এদের মিলনে বেতার-যন্ত্রে শব্দের যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে, তার দোলন হবে অনির্দিষ্ট বা নিয়ম-বহির্ভূত।

তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ—যেমন চৌম্বক-ঝড় ইত্যাদি কারণে বেতার-যন্ত্রে শব্দ হ্রাস পায় বা লুপ্তও হয়ে যায়। তবে সে ঘটনাগুলি দৈনন্দিন ব্যাপার নয় বলে এখানে তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বেতার-তরঙ্গের তীব্রতার এই স্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে কলকাতা, বেনারস, অন্ধ্র প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চলছে। কিন্তু বেতার অনুষ্ঠান উপভোগের বিঘ্নকারী এই ফেডিং-কে কি করে বন্ধ করা বা কমানো যায়—সে সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত বিশেষ কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে বলে জানা নেই। তবে শব্দের এই স্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধির জন্যে বেতার-যন্ত্রকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

ভারতের সর্বপ্রথম বিজ্ঞান মন্দির

শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ

কলকাতা মহানগরীর কলেজ ষ্ট্রীট ও বৌবাজারের সঙ্গমস্থলে অজস্র যান-বাহনের অফুরন্ত কোলাহলের মধ্যে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কাল্টিভেসন অব সায়েন্স, অর্থাৎ ভারতীয় বিজ্ঞান সভার সৌধটি অবস্থিত ছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে ওই বিজ্ঞানাগারের বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সৌধটির শান্ত, সমাহিত ভাব পথচারীর চিত্তাকর্ষণ করতো। এক সময়ে এই ভবনের বক্তৃতাগারের বহির্ভাগ ও প্রবেশ পথ দর্শকদের মনে দেব-মন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দিত।

কিঞ্চিদধিক আশী বছর আগে ভারতের সুসন্তান ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের মনে যে মহৎ আকাঙ্খার বীজ অঙ্কুরিত হয়, কালক্রমে সেটি বাস্তব ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞান সভা (Indian Association for the Cultivation of Science নামে এক বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়ে ওঠে। ডাঃ সরকার চিকিৎসা-বিদ্যাবিশারদ হলেও তিনি ছিলেন পদার্থ-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা যাতে বিনাড়ম্বরে মৌলিক গবেষণার সাহায্যে জাতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন এবং দেশবাসীরা ইউরোপীয়ানদের অধীনে চিরদিন মিস্ত্রি বা কারিগররূপে না থেকে জড়-বিজ্ঞানের তথ্যসমূহ আয়ত্ত করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এই বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

১৮৬৯ সালে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ভারত-বাসীর বিজ্ঞান-চর্চার পথ সুগম করবার উদ্দেশ্যে স্থির করেছিলেন যে, লণ্ডনের Royal Institution ও British Association for the Advancement of Science—এই দুই সংস্থার কার্য-প্রণালী অনুযায়ী এই জাতীয় বিজ্ঞানসভার কাজ পরিচালিত হবে। এখানে মৌলিক গবেষণার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে এবং বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর সাহায্যে জনসাধারণকে বিজ্ঞানানুশীলনে আকৃষ্ট করবার ব্যবস্থা

থাকবে। তাঁর ঐ অনুষ্ঠানপত্রের মূল প্রস্তাবটি তখনকার বিভিন্ন সাময়িক সংবাদ-পত্র কর্তৃক সমর্থিত হয় এবং ডাঃ সরকারের সম্পাদিত Calcutta Journal of Medicine নামক পত্রিকায় সেটি প্রকাশিত হয়। তখনকার ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতেন না এবং সেই সময়ে ১৮৭৫ সালে প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে আমোদ-প্রমোদের জন্যে এক রাত্রিতে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার আতস বাজী পোড়াতেও কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু যুবরাজের ভারতে আগমনের

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

জন্ম—২রা নভেম্বর, ১৮৩৩ মৃত্যু—২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪

সুবিখ্যাত সংবাদপত্র হিন্দু-পেট্রিয়ট এর সাফল্য কামনায় প্রচার করতে থাকে।

১৮৬৯ থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত ডাঃ সরকার তাঁর অভীপ্সিত বিজ্ঞানাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় যে, তখনকার রাজা ও ধনী ব্যক্তিরা পোষা কুকুর-বিড়ালের বিয়েতে অজস্র টাকা স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ এই বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত হবে—এরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সাহায্য দানে অনুপ্রাণিত করতে পারা যায় নি।

যাহোক, ডাক্তার সরকার অদম্য উৎসাহ ও পরিশ্রমে ১৮৭৫ সালের মধ্যেই পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের রে. ফাদার লাফোঁ প্রথম থেকেই এই কাজে ডাঃ

সরকারকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ডাঃ সরকারকে বলেছিলেন—আপনি আপনার পাশ্চাত্য বন্ধুদের কাছে সাহায্য পাবেন, এতে সন্দেহ নেই এবং আমি যতটুকু সময় পাব, সবই খুসী মনে আপনার কাজে ব্যয় করবো। কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই যে, একে ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতে হবে।

বাংলার তদানীন্তন গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল ডাঃ সরকারের ঐ পরিকল্পনায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই সমিতির কাজ যাতে শীঘ্রই আরম্ভ হয়, সেজন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র দেন। পত্রের বিষয়বস্তু নিম্নে উদ্ধৃত হলো—

"The Lieutenant Governor continues to feel much interest in the progress of the Society as constituting a spontaneous and unaided effort on the part of the natives themselves to promote the spread of practical science among the people of Bengal. The Government indeed sympathizes with any aspirations which the natives may have in this respect and will itself do what it can in this direction. Better and more efficacious still, however, will be the exertions which educated native gentlemen like. Yourself and others may put forth of their own free will for the improvement of their countrymen in scientific knowledge." 3rd May, 1875.

সুখের বিষয় এই যে, বিগত শতকের ভারতের বিখ্যাত কর্মবীর ও মনীষিবৃন্দ, যেমন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বসু, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ সর্বপ্রথমে ডাঃ সরকারকে সাহায্যদানে অগ্রসর হন।

১৮৭৬ সালে তখনকার গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত ৩০,০০০৲ টাকায় বিজ্ঞান মন্দির নির্মাণের জন্যে কলকাতার বহুবাজার ও কলেজ ষ্ট্রীটের সঙ্গমস্থলে জমি ক্রয় এবং কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের রাজোচিত বদান্যতায় পরীক্ষাগারের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি এবং সাজসরঞ্জাম ক্রয় করা হয়। ঐ বছরেই বিজ্ঞানাগারের উদ্বোধনী সভা হয় এবং তাতে স্যার রিচার্ড টেম্পল সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশন সুদীর্ঘ বক্তৃতা ও অনাবশ্যক আড়ম্বর-শূন্য হলেও ডাঃ সরকারের কতকগুলি শিক্ষাপ্রদ গবেষণার বিষয় প্রদর্শিত হয়েছিল।

১৮৮০ সালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ডাঃ সরকারের অক্লান্ত চেষ্টায় আশী হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। কিন্তু যে মহৎ উদ্দেশ্যে এই অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল, তার পক্ষে ঐ টাকা নিতান্তই অল্প ছিল। এরপর ১৮৮২ সালের মধ্যে বিজ্ঞান-সভার কর্তৃপক্ষ আরও এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। ঐ সময়ে স্থির হয় যে, বড়লাট লর্ড রিপনকে বিজ্ঞান-মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

১৮৮২ সালের ১৩ই মার্চ, অপরাহ্ন ৫-৩০ টার সময় বড়লাট লর্ড রিপন ২১০, বহুবাজার ষ্ট্রীটের বিজ্ঞান ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

দু-বছর পরে ১৮৮৪ সালে আর একবার লর্ড রিপন বিজ্ঞান-মন্দিরে এসেছিলেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, ডাক্তার সরকার তাঁর বক্তৃতায় লণ্ডনের রয়াল ইনষ্টিটিউশনের উল্লেখ করে দুঃখের সঙ্গে বলেছেন—উক্ত প্রতিষ্ঠানের ন্যায় আমাদের বিজ্ঞান-সভা এখনও কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করতে পারে নি। কিন্তু আমার মনে হয়, লণ্ডনের রয়াল ইনষ্টিটিউশনের মত এই প্রতিষ্ঠানের কোন কাজ আমরা হয়তো না দেখে যেতেও পারি, তথাপি উচ্চ আদর্শ ক্ষুণ্ণ না করে ধৈর্য

ধরে এর উন্নতি-সাধনে অগ্রসর হতে হবে এবং হয়তো এমন একদিন আসবে যখন আমাদের পুত্র-পৌত্রেরা এই বিজ্ঞান-সভাকে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে দেখবে।

গবেষণার জন্যে বিজ্ঞান-সভার একটি প্রধান ব্যবহারিক পরীক্ষা-গৃহের অভাব ছিল। এই গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে তিনি দেশের শিক্ষিত ধনী ব্যক্তিদের নিকট সাহায্যের জন্যে আবেদন করেন। ভিজিয়ানাগ্রামের দানশীল মহারাজা ঐ আবেদনে প্রধান পরীক্ষাগার নির্মাণের ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হন। এই প্রধান পরীক্ষাগার তাঁরই বদান্যতায় ৪০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠার জন্যে সে সময়ে ব্যক্তিগত দান হিসাবে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজাই সবচেয়ে বেশী টাকা সাহায্য করেন। দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত নব-নির্মিত অট্টালিকা 'ভিজিয়ানাগ্রাম পরীক্ষাগার' নামে অভিহিত করা হয়।

এই ভারতীয় বিজ্ঞান-সভা ক্রমশঃ বিজ্ঞান আলোচনার প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণের উপযোগী বক্তৃতা এবং প্রদর্শনী নিয়মিতভাবে চলতে থাকে। বক্তাদের মধ্যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ চুনীলাল বসু, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ফাদার ডি. পেনেরান্দা, ফাদার লাফোঁ প্রমুখ স্মরণীয় ব্যক্তিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

তখনকার দিনে কলকাতার কলেজগুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষার কোন আয়োজন না থাকায় ঐ বিজ্ঞানসভা ভবনে নামমাত্র বেতন নিয়ে ছাত্রদের বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হতো। ডাঃ সরকার প্রতি বছর বার্ষিক অধিবেশনে বিজ্ঞান মন্দিরের উন্নতি-কল্পে জনসাধারণের সহানুভূতি ও আর্থিক সাহায্যের জন্যে আবেদন জানাতেন। এরপর অবশ্য ১৯০২ সালের অধিবেশনে ডাঃ সরকার বিজ্ঞান মন্দিরের আর্থিক উন্নতির জন্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন; কারণ তখন বিভিন্ন ন্যস্ত সম্পত্তি থেকে সাহায্য প্রাপ্তির ফলে অর্থকৃচ্ছতা দূর হয়েছিল এবং জাতীয় জীবনে বিজ্ঞান মন্দির এক বিশেষ স্থান অধিকারে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু মহেন্দ্রলালের মূল আদর্শ তখনও বাস্তবে পরিণত হয় নি, কারণ তখনও বিজ্ঞান মন্দির কোনও মৌলিক গবেষণা বা আবিষ্কারে বিশেষভাবে অগ্রসর হতে সক্ষম হয় নি। দু-বছর পরে ১৯০৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ডাঃ সরকার বিজ্ঞান মন্দিরকে জাতীয় সম্পত্তিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে' ইহলোক ত্যাগ করেন।

ভারতবর্ষের এই সর্বপ্রথম বিজ্ঞান মন্দির একজন বাঙালী মনীষীর সারাজীবনের পরিশ্রমের ফল। ১৮৭০ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত ডাক্তার সরকার যে সব বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন, তাথেকে জানা যায় যে, তিনি সে যুগের কত বড় চিন্তাশীল ও সংগঠক ছিলেন এবং মৌলিক গবেষণায় বিজ্ঞান মন্দির বিজ্ঞান-জগতে কিরূপ স্থান অধিকার করবে, তা তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন। গোড়া থেকেই ডাঃ সরকারের ইচ্ছা ছিল যে, মৌলিক গবেষণায় এই বিজ্ঞান মন্দির যেন জগতের অন্যান্য দেশের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে এবং সে মৌলিক গবেষণা যেন মানুষের উপকারে লাগে। তাঁর এই আশা একদিন পূর্ণ হয়েছিল।

১৯০৮ সালে অধ্যাপক সি. ভি. রামন ভারতীয় বিজ্ঞান সভায় যোগদানের ফলে এর নতুন প্রাণ-সঞ্চার হয়। সে সময়ে ডাঃ সরকারের পুত্র ডাঃ অমৃতলাল সরকার বিজ্ঞান-সভার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তিনি অধ্যাপক রামনের গবেষণার কাজে সর্বপ্রকার সহায়তা করেন এবং ঐ সময় থেকেই বিজ্ঞান সভা বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে অধ্যাপক রামন প্রধানতঃ শব্দতত্ত্ব এবং বিশেষভাবে ভারতীয় সঙ্গীত যন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করেন। কিন্তু পরে তিনি দৃষ্টি-বিজ্ঞান এবং বিক্ষিপ্ত আলোক-রশ্মি সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। ১৯২৮ সালে ডাঃ রামন

আলোক-রশ্মি সম্বন্ধে এক যুগান্তকারী আবিষ্কারে সক্ষম হন। তাঁর এই আবিষ্কারকেই ইউরোপের সুধীবৃন্দ 'রামন-এফেক্ট' নামে অভিহিত করেছেন। এই আবিষ্কারের জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

তারপর ডাঃ কৃষ্ণান এই পরীক্ষাগারে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। অধ্যাপক রামন এই বিজ্ঞান-সভাকে সুপ্রতিষ্ঠা করবার জন্যে বহু অর্থ সংগ্রহ করে বিজ্ঞানাগারের অর্থভাণ্ডার পরিপুষ্ট করেছেন। রায় বাহাদুর বিহারীলাল মিত্র ঐ সময়ে এক লক্ষ টাকা দান করে অর্থ-ভাণ্ডারের কলেবর বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে এই বিজ্ঞান মন্দির আর বহু-বাজারের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নয়, যাদবপুরে স্থানান্তরিত হয়েছে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দ্বাদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে রামমোহন লাইব্রেরী হলে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানানুরাগী সুধীজনের উপস্থিতিতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দ্বাদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলিকাতার পৌর-প্রধান শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অথিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীশিবদাস ঘোষাল কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীতের পর কর্মসচিব শ্রীমৃগাঙ্কশেখর সিংহ পরিষদের বার্ষিক কর্ম-বিবরণী পাঠ করেন। তিনি বলেন, দেশের জনসাধারণের মধ্যে একটা সাধারণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন ও যুগোপযোগী বিজ্ঞান-চেতনার বিকাশ সাধন করাই পরিষদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিগত ১২ বৎসর যাবৎ পরিষদ নানাপ্রকার কর্ম-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে পরিকল্পনানুযায়ী সকল কাজের আশানুরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতেছে না। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার হইতে যে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। পরিশেষে পরিষদের নিজস্ব গৃহ-নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়া কর্মসচিব বলেন, পরিষদের কাজকর্মের পরিধি ক্রমশঃই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। ভাড়া করা দুইটি মাত্র কক্ষে পরিষদের কার্য-পরিচালনা এখন বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। স্থানাভাবই এখন পরিষদের অন্যতম বিশেষ সমস্যা। এখন পরিষদের নিজস্ব গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন, যাহাতে আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী বক্তৃতা-গৃহ, পাঠাগার, সংগ্রহশালা প্রভৃতি স্থাপন করা যায়। গত দুই বৎসর যাবৎ আবেদন জানাইয়া ও নানাভাবে চেষ্টা করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট হইতে একখণ্ড জমি পাওয়ার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল না। সম্প্রতি পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রচেষ্টায় কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নিকট হইতে সুবিধাজনক সর্তে মধ্য কলিকাতায় একখণ্ড জমি পাওয়া গিয়াছে। পরিষদের গৃহ নির্মাণের জন্য সভাপতি অধ্যাপক বসু দেশের জনসাধারণ ও বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তিগণের নিকট ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহের একটি আবেদন জানাইয়াছেন। এই আবেদনে যথাসাধ্য সাড়া দিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেছি।

কর্মসচিবের বিবরণী পাঠের পর পরিষদ-সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভাষণ দিতে উঠিয়া পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়-

তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন, আমরা নিজেদের একটা বাড়ী নির্মাণ করিতে চাহিতেছি, প্রধানতঃ দুইটি কারণে। প্রথমতঃ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার জন্য পুস্তক প্রকাশ ও পাঠাগার পরিচালনা করা, দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীরা যে সকল মডেল ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে, সেগুলিকে পরিষদের সংগ্রহশালায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, যাহাতে মেণ্ট ট্রাষ্টের কাছে জমির জন্য আবেদন করিয়াছিলাম। তাঁহারা একখণ্ড জমি দিতে রাজী হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, স্কুল-কলেজ ট্রাষ্টের কাছে যে সুবিধা পায়, আমরা তাহা পাই নাই। তবে আশা আছে, সকলের কাছে আমরা সাহায্য পাইব। আজকের দিনে দেশের উন্নতির জন্য যে সকল কাজ করা হইতেছে, সরকার তাহাতে সাহায্য করিতেছেন। কাজেই
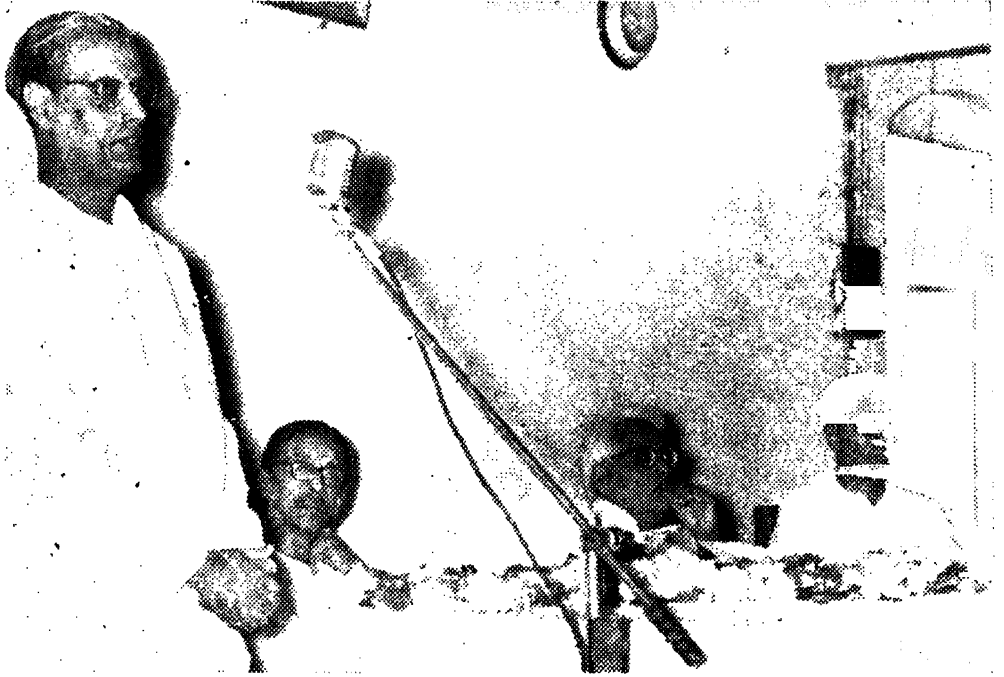
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দ্বাদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসে খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ভাষণ দিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন মেয়র শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং কর্মসচিব শ্রীমৃগাঙ্কশেখর সিংহ।

তাহাদের হাতের কাজের দক্ষতার পরিচয় জনসাধারণ পাইতে পারে। ইহার ফলে জনসাধারণ ও ছেলেমেয়েদের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহের সৃষ্টি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ কর্পোরেশনের কাছে আমরা একখণ্ড জমি পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলাম। আমাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সম্প্রতি ইমপ্রুভ- আমরা যদি ৫০ হাজার টাকা তুলিতে পারি, তাহা হইলে সরকারের নিকট হইতেও সমপরিমাণ টাকা পাইব বলিয়া আশা করি।

পরিশেষে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা সম্পর্কে এক শ্রেণীর লোকের সংশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক বসু দৃঢ়ভাবে বলেন, সহজ সরল মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের কথা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া

দিতে না পারিলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি কখনই সম্ভব হইবে না। আমার এক বন্ধু বলিয়াছেন, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা সেইদিনই সার্থক হইবে—যেদিন তোমরা বাংলা ভাষায় মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে পারিবে। এই চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করিয়াছি। আমরা চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর একটি বিশেষ সংখ্যায় মৌলিক গবেষণার বিষয় নিবন্ধাদি প্রকাশ করিতে পারি। এই জন্য গবেষক-কর্মী ও গবেষক-ছাত্রদের কাছে নিবন্ধাদির জন্য আবেদন জানাইতেছি।

প্রধান অতিথি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় তাঁহার ভাষণে সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সাহিত্যিকের চোখ-কান বিজ্ঞানীর চোখ-কানের মত নহে। সাহিত্যিকের দৃষ্টি হৃদয়ের অনুভূতির দিকে। সাহিত্যিকেরা ভাবপ্রবণ। অন্যদিকে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি সত্যসন্ধানী, সেখানে ভাবপ্রবণতার স্থান নাই। কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া মানুষ চলিতে পারে না এবং সাহিত্যিকেরাও আজ বিজ্ঞান সম্পর্কে উদাসীন থাকিতে পারেন না। বিশ্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সকল মানুষেরই একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার। বর্তমানে সাধারণ মানুষের মনেও একটা বৈজ্ঞানিক বিষয় উপলব্ধির স্পৃহা দেখা যাইতেছে। এই জন্য বিজ্ঞান-চর্চার প্রয়োজনীয়তা আজ বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। আজকের দিনে মানুষ যাহা অনুভব করিতেছে, সেই দিকটা এড়াইয়া সাহিত্যিকেরা চলিতে পারেন না। কাজেই বিজ্ঞানীদের মত সাহিত্যিকদেরও আজ চিন্তা করিতে হইবে।

সভাপতি শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে সহজ সরল ভাষায় সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের কথা প্রচারের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনে পরিষদের কর্ম-প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করিয়া তিনি বলেন, বিজ্ঞান পরিষদ একটি জাতীয় কর্তব্যই সাধন করিতেছেন। ইহার জন্য পরিষদকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা জাতীয় সরকারের কর্তব্য ; কারণ এই বিষয়ে সরকারের মৌলিক দায়িত্ব রহিয়াছে।

অনুষ্ঠানের শেষে ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল পরিষদের পক্ষ হইতে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সঞ্চয়ন

এশিয়ার কল্যাণে পরমাণু-শক্তি

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশেই শান্তির কাজে পরমাণু-শক্তির প্রয়োগ সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এ-বিষয়ে অগ্রণী হয়েছে ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্ম ও ফিলিপাইনস্। এসব দেশের জাতীয় উন্নয়ন স্থচীতে পরমাণু-শক্তি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। কলম্বো পরিকল্পনাভুক্ত অধিকতর উন্নত দেশগুলি এই প্রচেষ্টায় সাজসরঞ্জাম ও শিক্ষার ব্যবস্থাদি করে সাহায্য করছে।

শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সহযোগিতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো ভারতের পরমাণু-রিয়্যাক্টরটি। ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা (১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার) মূল্যের এই রিয়্যাক্টর স্থাপনে ক্যানাডা সরকার সাহায্য করছে।

আগামী বছর এই রিয়্যাক্টরে উৎপাদন স্বরু হবে। তখন এটি হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আইসোটোপ-উৎপাদক যন্ত্রগুলির অন্যতম। এতে পুরাপুরি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরী হবে। ক্যানাডার অন্টেরিওর চক রিভারে এন. আর. এক্স রিয়্যাক্টরের নক্সা অনুসারে ভারতের রিয়্যাক্টরটি তৈরী হয়েছে। তবে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল এবং বহু লোক অধ্যুষিত সহরের নিকটবর্তী স্থানে ব্যবহারের উপযোগী করবার জন্যে বেশ কিছু রদ-বদল করা হয়েছে।

ভারত ও ক্যানাডা সরকারের যুক্ত প্রচেষ্টায় এই রিয়্যাক্টরটি স্থাপিত হচ্ছে। এজন্যে ক্যানাডা সরকার দিচ্ছেন ৭৫ লক্ষ ডলার। এই রিয়্যাক্টরের জন্যে প্রয়োজন হবে ২০ টন ভারী-জল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু-শক্তি কমিশন থেকে ঐ পরিমাণ ভারী-জল ক্রয় করা হয়েছে। এই কাজ স্বরু হবার পর ভারতের পরমাণু-শক্তি বিভাগের ২৭ জন কর্মচারী ক্যানাডার চক রিভারস্থিত ৪০ হাজার কিলোওয়াট শক্তিবিশিষ্ট এন. আর. এক্স রিয়্যাক্টরে ব্যাপক শিক্ষালাভ করেছেন।

এই রিয়্যাক্টর স্থাপনের ফলে ভারতের পরমাণু-শক্তি উৎপাদন কার্যস্থচীতে গবেষণার বিরাট স্থযোগ পাওয়া যাবে। পরমাণু-শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, জীবতত্ত্ব ও ধাতুবিদ্যা বিষয়ক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা করবার জন্যেই রিয়্যাক্টরটির বিশেষ নক্সা রচনা করা হয়েছে। চিকিৎসা, কৃষি ও শিল্পে ব্যবহারের জন্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদনের ক্ষমতা এই রিয়্যাক্টরের আছে।

দু-বছর আগে বম্বের কাছে ট্রম্বেতে পরমাণু-শক্তি সংস্থার উদ্বোধন করা হয়েছে। এখানে পরমাণু-শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করা হয়। বর্তমানে এখানে আট-শ'-এর বেশী ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগর শ্রেণীর কর্মী কাজ করছেন। শিক্ষাপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরদের যাতে অভাব না হয়, সেজন্যে সংস্থা দু-বছর আগে একটি শিক্ষা-স্থচী গ্রহণ করেন। এই কার্যস্থচী অনুসারে প্রতি বছর ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আড়াই-শ' তরুণ গ্রাজুয়েট ও ইঞ্জিনীয়ার নেওয়া হয় এবং তাদের এক বছর শিক্ষা দেওয়া হয়। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ইলেকট্রনিক্সের টুকরা অংশ এখন ট্রম্বেতে তৈরী হচ্ছে। এর ফলে এই বিশেষ ক্ষেত্রে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে এবং বহু টাকার বৈদেশিক মুদ্রায় সাশ্রয় হচ্ছে।

ট্রম্বেতে আছে ভারতের প্রথম রিয়্যাক্টর 'অপ্সরা', রেডিও-কেমিষ্ট্রির গবেষণাগার এবং থোরিয়াম প্রসেসিং কারখানা। তাছাড়া ভারত ও

ক্যানাডা সরকারের যুক্ত প্রচেষ্টায় 'জারলিনা' রিয়্যাক্টর বসাবার কাজ শেষ হয়ে এসেছে। ইউ-রেনিয়াম ধাতুর কারখানা, জ্বালানী, মডারেটর এবং প্রসেসিং কারখানা নির্মাণের কাজও সমাপ্ত-প্রায়।

ভারতের প্রথম পরমাণু-রিয়্যাক্টর 'অপ্সরার' কাজ সুরু হয়েছে ১৯৫৬ সালের অগাষ্ট মাসে। এর সাহায্যে বহু ক্ষেত্রে গবেষণা চালানো হচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে এশিয়ায় এটিই হলো প্রথম রিয়্যাক্টর। এর নক্সা রচনা ও স্থাপন করবার পুরাপুরি দায়িত্ব ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ারগণই গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় শিল্প সব কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ জুগিয়েছে। তবে জ্বালানীর উপকরণ আমদানী করতে হয়েছে বাইরে থেকে। কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে যুক্ত-রাজ্যের পরমাণু-শক্তি কর্তৃপক্ষ এই উপকরণ সরবরাহ করেছেন। চুড়ান্ত নক্সা গ্রহণের পর রিয়্যাক্টরটি তৈরী করতে মাত্র এক বছর সময় লেগেছিল।

এই ছোট রিয়্যাক্টরটির জন্যে খরচ হয়েছে ৩৫ লক্ষ টাকা (২ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড)। এই রিয়্যাক্টরে উৎপন্ন আইসোটোপ ইতিমধ্যেই ভারতীয় কৃষি, চিকিৎসা ও শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণও এই আইসো-টোপ ব্যবহার করছেন। রিয়্যাক্টর সম্বন্ধে কর্ম-চারীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা 'অপ্সরা'র জন্যে সম্ভব হয়েছে। এতদ্ব্যতীত পদার্থবিদ্যা, ইঞ্জিনীয়ারিং ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার সুযোগও পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় রিয়্যাক্টর 'জারলিনা' তৈরী করা হচ্ছে। নতুন রিয়্যাক্টর নির্মাণের নক্সা রচনায় 'জারলিনা' সাহায্য করবে।

উচ্চ তেজস্ক্রিয় দ্রব্যাদি কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা এই গবেষণাগারে শিক্ষা দেওয়া হয়। ট্রম্বের পরমাণু-শক্তি সংস্থার সবগুলি বিভাগের কর্মীই এখানে শিক্ষালাভ করে থাকেন। কলম্বো পরি-কল্পনা অনুসারে যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডাঃ ওয়েল্চ্ এই গবেষণাগারের কাজ চালাতে সাহায্য করছেন। গবেষণাগার স্থাপনের কাজ তত্ত্বাবধান করেন যুক্তরাজ্যের হারওয়েলের পরমাণু-শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক জি. আর. হল।

চার বছর হলো থোরিয়ামের কারখানাটি স্থাপিত হয়েছে। পরমাণু-শক্তি উৎপাদনের জন্যে প্রয়ো-জনীয় দুটি প্রধান কাঁচামাল—থোরিয়াম ও ইউরে-নিয়াম এই কারখানাতেই উৎপন্ন হয়। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ারগণই এই কারখানা স্থাপন করেন। এটি বিশ্বের থোরিয়াম নাইট্রেট উৎ-পাদনের বৃহত্তম কারখানাগুলির অন্যতম। এশিয়ার গ্যাস-ম্যান্টল শিল্পের চাহিদা পুরাপুরি মিটিয়েও ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে এই কারখানায় তৈরী জিনিষপত্র রপ্তানী হয়েছে। কারখানায় উৎপন্ন জিনিষের কিছু অংশ জমা রাখা হয় ভবিষ্যতে পরমাণু-শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগাবার জন্যে।

পরমাণু-শক্তি উৎপাদনের দিক থেকে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে যথষ্ট পরিমাণ ইউরে-নিয়াম উৎপাদন অপরিহার্য। সেজন্যে ট্রম্বেতে একটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এই কার-খানায় ইউরেনিয়ামের খনিজ পিণ্ডকে রিয়্যাক্টরে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হয়। ব্যাপক হারে পরমাণু-শক্তি উৎপাদনের জন্যে বড় ইউ-রেনিয়াম কারখানায় নক্সা রচনা ও নির্মাণ সম্বন্ধে এই কারখানা থেকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করা গেছে। পরমাণু-রিয়্যাক্টরে জ্বালানী একটি বিশেষ-রূপে দিতে হয়। সাধারণতঃ ম্যাগ্নেসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম মিশ্রিত পদার্থে নির্মিত পাত্রে ইউরেনিয়াম ভর্তি করে দেওয়া হয়। ইউরেনিয়াম কারখানায় তৈরী ধাতু এজন্যে ব্যবহার করা হবে।

পাকিস্তান সরকার শান্তির জন্যে পরমাণু-শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিশদ পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে

পরমাণু-শক্তি কমিটি গঠন করেছে। সিংহলে পরমাণু-শক্তি সংক্রান্ত কার্যকরী কারিগরদলের সুপারিশ অনুসারে জাতীয় পরিকল্পনা রচনা পরিষদ একটি কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি পরমাণু-শক্তি উৎপাদনের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থের সন্ধান ও নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মান রচনা, রিয়্যাক্টর নির্মাণ ও পরিচালনা এবং সর্ব পর্যায়ের বিজ্ঞান-কর্মীদের শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা রচনা সম্বন্ধে পরিষদকে পরামর্শ দিবে।

ব্রহ্মদেশের সরকার আন্তর্জাতিক পরমাণু-শক্তি সংস্থার সদস্য। তারা তিন বছর আগে ব্রহ্মদেশে একটি পরমাণু-শক্তি উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। এই কেন্দ্র ও পারমাণবিক তেজস্ক্রিয় গবেষণাগার নির্মাণের কাজ চলছে। এই গবেষণাগারে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহারের প্রধান পরীক্ষা-কেন্দ্র হবে এবং কৃষি, চিকিৎসা ও শিল্পে আইসোটোপ প্রয়োগের পদ্ধতি এখানে শেখানো হবে। তাছাড়া পরমাণু-শক্তি উৎপাদন-কেন্দ্রের অন্যান্য কাজও এখানে চালানো হবে।

ব্রহ্মদেশে খনিজ পদার্থ সন্ধানের উপর পরমাণু-শক্তি উৎপাদন-কেন্দ্র বিশেষ জোর দিয়ে থাকে। ইউরেনিয়াম সন্ধানের জন্যে অনেক ভূতাত্ত্বিক এই কেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন। এ-বিষয়ে ব্রহ্মের অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক সংস্থার সঙ্গে একযোগে কাজ করা হচ্ছে। শিক্ষার জন্যে কর্মীদের বিদেশে পাঠানো হয়েছে। ব্রহ্মদেশে কর্মীরা এই প্রথম ইউরেনিয়াম বিশ্লেষণ আরম্ভ করেছেন। ফিলিপাইন ও থাইল্যাণ্ডে দুটি মাঝারি ধরণের রিয়্যাক্টর দেওয়ায় ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া জনৈক মার্কিন উপদেষ্টা ইন্দোনেশিয়ায় গাসার মিঙ্গুতে গবেষণাগার নির্মাণে সাহায্য করছেন। দুজন বিশেষজ্ঞ পাকিস্থানে কাজ করছেন।

এল. ডি. পদ্ধতিতে ইস্পাত উৎপাদন

এই সম্পর্কে এম. গণপতি লিখেছেন—আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে বিখ্যাত ভোয়েষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থির করে—তাদের লিন্জ্-এ (অষ্ট্রিয়া) অবস্থিত ইস্পাত-কারখানায় উৎপাদন ২ লক্ষ টন থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টন করা হবে। কিন্তু সমস্যা হলো ইস্পাত উৎপাদন নিয়ে। কম লোহা ব্যবহার করে কিভাবে ভাল ইস্পাত তৈরী করা যায়—কারখানা সম্প্রসারণের পক্ষে সেই হলো প্রধান সমস্যা।

ইতিপূর্বে ওপেন হার্থ ফার্নেসে অক্সিজেন প্রবাহিত করে দেখা গেছে—ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর ফলে ফার্নেসের দেয়াল ও ছাদ দ্রুত ক্ষয়ে যায়। কাজেই পদ্ধতিটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে।

এরও কিছু আগে ১৯৩৬-৩৯ সালে মিঃ এল. লেলেপ, মিঃ সি. ডি. সোমার্জ ও মিঃ আর্থার ডুরের স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করে দেখেন যে, গলানো কাঁচা লোহার উপর অতি দ্রুতগতিতে অক্সিজেন প্রবাহিত করলে অঙ্গারীভবন অত্যন্ত ত্বরান্বিত হয়।

মিঃ ডুরের ভোয়েষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ইস্পাত উৎপাদনের কাজে এই পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে অনুরোধ জানান।

প্রথমে ২ টনের এবং পরে ১৫ টনের কনভার্টারে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফল এত উৎসাহজনক হয় যে, ভোয়েষ্ট প্রতিষ্ঠান তখনই এই পদ্ধতি অবলম্বনে ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত করে। এদের কারখানায় প্রথম কনভার্টার চালু হয় ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে এবং এই পদ্ধতির আবিষ্কর্তাদের নাম অনুসারে

এর নাম রাখা হয় এল. ডি. কনভার্টার। এর পর থেকে ক্রমান্বয়ে এই নতুন পদ্ধতির উন্নতি হতে থাকে। পরবর্তী পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে, অত্যন্ত নমনীয় ইস্পাত থেকে ১ শতাংশ কার্বন-সম্পন্ন ইস্পাত এই পদ্ধতিতে উৎপাদন করা সম্ভব। আজ পর্যন্ত ১৬টি বিভিন্ন কেন্দ্রে মোট ৮৭ লক্ষ ৮০ হাজার টন ইস্পাত উৎপাদনক্ষম ৩৪টি কনভার্টার স্থাপিত হয়েছে। আরও ৪৩টি স্থাপন করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন স্থানে নতুন ৬৬টি কনভার্টার স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

যে পাত্রে গলানো কাঁচা লোহা থেকে ইস্পাত তৈরী করা হয় সেটি বেসেমার কনভার্টারের মতই, তবে নীচের দিকটা গোলাকার হলেও উপরের দিক সরু হয়ে গেছে অনেকটা বকযন্ত্রের মত। এতে তাপ বিকিরণ কম হয়। এর ভিতরের দেয়াল ম্যাগ্‌নেসাইট ও ডলোমাইটের ইট দিয়ে তৈরী। তলদেশ ও পাত্রের যে অংশে রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, সেখানে অতিরিক্ত কয়েকটি স্তর তাপ-নিরোধক ইট বসানো থাকে। একটি স্বতন্ত্র যন্ত্রের মাধ্যমে অক্সিজেনের ধারা পাত্রের অক্ষ বরাবর প্রবাহিত করা হয়।

প্রথমে কনভার্টার একটু হেলিয়ে হাল্‌কা টুক্‌রা লোহা দিয়ে তার উপরে আবার ভারী টুক্‌রা লোহা দেওয়া হয়। এর পরে গলানো কাঁচা লোহা ঢেলে পাত্রটিকে পূর্বাবস্থায় স্থাপন করা হয়। এখন অক্সিজেন প্রবাহিত করবার যন্ত্রটি নীচু করে অক্ষ বরাবর ভিতরে নামিয়ে দেওয়া হয় এবং লৌহতল থেকে প্রায় এক মিটার উঁচুতে রেখে ৮ থেকে ১০ বায়ুমণ্ডলের চাপে প্রবল বেগে (ঘণ্টায় ৭০০০ এন. সি. এম) অক্সিজেন প্রবাহিত করা হয়। খাদ নিষ্কাশন ও তাপ-নিয়ন্ত্রণের জন্যে মাঝে মাঝে চুন দেওয়া হয়।

এর ফলে প্রবল রাসায়নিক ক্রিয়া সুরু হয়। তাপমাত্রা প্রায় ২৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ওঠে এবং ধাতুর কার্বনের ভাগ রাসায়নিক ক্রিয়ায় দ্রুত মুক্ত হয়ে যায়। শোধিত ধাতু ভারী বলে ধীরে ধীরে নীচে নেমে যায়, আর নীচের হাল্কা ধাতু উপরে উঠে আসে। এই ভাবে সম্পূর্ণ ধাতু শোধিত না হওয়া পর্যন্ত পাত্রের মধ্যে গলিত ধাতুর প্রবল আবর্তন চলতে থাকে।

দীর্ঘকাল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ৩০ টনের কনভার্টারে একবার ধাতু পুরাপুরি পরিশোধন করতে সময় লাগে প্রায় ৩৫ মিনিট। ওপেন হার্থ পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতিতে লৌহকে অতি দ্রুত কার্বন-মুক্ত করা যায়। পরিশোধিত ইস্পাতে অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাসের পরিমাণও খুব কম থাকে। ৯৮.৪ শতাংশ বিশুদ্ধ অক্সিজেন ব্যবহার করলে পরিশোধিত ইস্পাতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ থাকে মাত্র হাজার করা ৪ ভাগ। ফস্‌ফরাস ও গন্ধকের পরিমাণও থাকে নগণ্য।

এল. ডি. পদ্ধতিতে উৎপন্ন ইস্পাতে কার্বনের ভাগ খুব কম থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, কনভার্টারে রাসায়নিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে' এই পদ্ধতিতে অধিক কার্বনসম্পন্ন ইস্পাত তৈরী করা সম্ভব। তাছাড়া এভাবে তৈরী ইস্পাতে সীসা, দস্তা প্রভৃতি ক্ষতিকারক ধাতু থাকে না।

অন্যান্য পদ্ধতিতে উৎপন্ন ইস্পাত অপেক্ষা এল. ডি. পদ্ধতিতে উৎপন্ন ধাতু থেকে ইস্পাতের দ্রব্যাদি, কারখানায় চাদর প্রভৃতি নির্মাণ করা অনেক সহজ ও সুবিধাজনক। এতে খরচও কম পড়ে। এই সব কারণে ভারতের কারখানায় এই পদ্ধতিতেই অধিক পরিমাণে ইস্পাত উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। কনভার্টারের আকার ও গঠনে জটিলতা কিছু নেই। জায়গা লাগে কম আর এতে অতি অল্প সংখ্যক দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হয়। অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এতে মূলধনও কম লাগে।

এর আরও একটা বড় সুবিধা এই যে, কনভার্টারের রাসায়নিক ক্রিয়া থেকে স্বতঃই তাপ

উৎপন্ন হয় বলে বাইরে থেকে খুব কম তাপ সরবরাহ করলেই চলে। এতে জ্বালানীর খরচাও খুব কম হয়। এখানে এক টন ইস্পাত তৈরী করতে লাগে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ইউনিট তাপ, আর ওপেন হার্থ পদ্ধতিতে লাগে প্রায় ১০ লক্ষ থেকে ১২লক্ষ ইউনিট তাপ। প্রক্রিয়ার সময় বাইরে ছিট্‌কে পড়ে' খুব কম ধাতুই নষ্ট হয়। আবার উত্থিত অগ্নিশিখার রং দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, প্রক্রিয়া কত দূর অগ্রসর হলো। এর পরিচালনার পদ্ধতি খুব সহজ—প্রয়োজন বোধে নিয়ন্ত্রণ করা চলে এবং অতি দ্রুতগতিতে, অর্থাৎ মিনিটে প্রায় ১ টন করে ইস্পাত উৎপন্ন হয়। পাত্রের তলদেশে তাপ কম থাকে বলে খুব কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবু প্রয়োজন হলে কনভার্টার ঠাণ্ডা করে ক্ষতিগ্রস্ত ডলোমাইট ইট বা অন্য কোন অংশ সরিয়ে প্রয়োজনীয় মেরামত করে আবার কাজ চালু করতে তিন থেকে চার দিন লাগে। ওপেন হার্থ পদ্ধতির তুলনায় এর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ লাগে মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ।

রাউরকেল্লায় ৪০ টন উৎপাদনক্ষম তিনটি এল. ডি. কনভার্টার এবং ৮০ টন উৎপাদনক্ষম চারটি ওপেন হার্থ ফার্নেস থাকবে। এগুলির দ্বারা বছরে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত তৈরী করা যাবে। এক সঙ্গে ছুটি কনভার্টার চালু থাকবে এবং ভবিষ্যতে আরও ছুটি কনভার্টার ও একটি ওপেন হার্থ ফার্নেস স্থাপন করবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

যাতে এল. ডি. কনভার্টারগুলি কম খরচে চালানো যায়, সেজন্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করা হয়েছে। এর সঙ্গে আছে তাপ-মাপক যন্ত্র, ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে যে জল-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়, তার পরিমাপক ও নিয়ন্ত্রক যন্ত্র। কনভার্টারের জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন নিকটবর্তী স্বতন্ত্র একটি কারখানায় তৈরী করা হবে। তাছাড়া বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন তৈরী করে তাথেকে নাইট্রো-লাইমস্টোন সার প্রস্তুত করা হবে। যখন কনভার্টারে কাজ হবে না তখন অক্সিজেন তরল করে বাজারে বিক্রয় করা হবে।

এই কারখানার চুন ও ডলোমাইট ভাটি ইস্পাত-গলানো বিভাগ ও ডলোমাইট ইট তৈরীর কারখানার জন্যে ভস্মীভূত চুন ও ভস্মীকৃত ডলোমাইট জোগাবে। ওপেন হার্থ ফার্নেস ও এল. ডি. কনভার্টার পরিশোধনের জন্যে ভস্মীকৃত চুন ব্যবহার করা হয়। ওপেন হার্থ ফার্নেস, এল. ডি. কনভার্টার ছাড়াও এল. ডি. কনভার্টারের আস্তরণের জন্যে প্রয়োজনীয় ডলোমাইট-আলকাত্‌রার ইট তৈরী করতেও ভস্মীভূত ডলোমাইট লাগে। চুনের ভাটি জ্বালাবার জন্যে ব্লাষ্ট ফার্নেসের গ্যাস ও ডলোমাইট ভাটি জ্বালাবার জন্যে কোক চুল্লীর গ্যাস বা মিশ্র গ্যাসের প্রয়োজন হয়। প্রতি দিন ১২০ টন ভস্মীকৃত চুন উৎপাদনের ক্ষমতাবিশিষ্ট তিনটি চুন ভাটি ও প্রতি ৫০ টন ভস্মীকৃত ডলোমাইট উৎপাদনের ক্ষমতাবিশিষ্ট ছুটি ডলোমাইট চুল্লী স্থাপন করা হচ্ছে।

এল. ডি. কনভার্টারের আস্তরণের জন্যে প্রয়োজনীয় আলকাত্‌রা-ডলোমাইটের ইট এই কারখানায় তৈরী হয়। ভস্মীকৃত ডলোমাইট গুঁড়া করে আকার ও গুণ অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন বাক্সে রাখা হয়। পরে বাষ্পের সাহায্যে সেগুলিকে গরম করা হয়। এগুলির সঙ্গে ব্যবহৃত ডলোমাইট ও আলকাত্‌রা হিসাবমত মেশানো হয়। পরে ব্রিক প্রেসের সাহায্যে সেগুলি থেকে ইট তৈরী করা হয়। আট ঘণ্টার শিফ্‌টে প্রেস থেকে ৫০ টন করে ইট তৈরী করা সম্ভব। আলকাত্‌রা-ডলোমাইটের ইটগুলি ইস্পাত গলাবার বিভাগে পাঠাবার আগে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে জমা রাখা হয়।

১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসের পর থেকে ভারতে সামান্যভাবে ইস্পাত তৈরী হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ গত বছর ১৬ই এপ্রিল প্রথম ওপেন হার্থ ফার্নেস প্রজ্জ্বলিত করেন। সরকারী উদ্যোগে প্রথম ইস্পাত প্রস্তুত করা

হলো ২৯শে এপ্রিল। পরে অগাষ্ট মাসে দ্বিতীয় চুল্লীটি জ্বালানো হয়। এবার এল. ডি. কনভার্টার চালু করবার অপেক্ষায় আমরা আছি। ওপেন হার্থ ফার্নেস, মিক্সার ও তিনটি এল. ডি. কনভার্টার সমেত ইস্পাত গলানো বিভাগের নির্মাণ কার্য শেষ হয়েছে। অক্সিজেন কারখানার প্রথম ইউনিটে অক্সিজেন উৎপাদন আরম্ভ হলেই প্রথম কনভার্টারটি চালু হবে। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইউনিটে অক্সিজেন উৎপাদন সুরু হলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কনভার্টারও কার্যকরী করা হবে।

এল. ডি. কনভার্টারে ব্যাপকভাবে ইস্পাত উৎপাদন সুরু হলে ব্লুমিং মিল ও স্ল্যাবিং মিলেও কাজ আরম্ভ হবে। রোলিং মিলের ভবন নির্মাণ শেষ হয়েছে।

দেশী ও বিদেশী কণ্ট্রাক্টর ও আমাদের পরিকল্পনানুযায়ী নিযুক্ত কারিগর ও কর্মীদের দক্ষ শ্রমিক অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলেই কারখানা নির্মাণের এই বিরাট কাজ শেষ হয়েছে। ইস্পাত কারখানার অন্যান্য বিভাগের নির্মাণ-কার্যও নির্দিষ্ট সময় অনুসারে শেষ হচ্ছে। আশা করা যায়, ১৯৬১ সালের গোড়ার দিকেই ইস্পাত কারখানায় পুরাপুরি উৎপাদন সুরু হবে।

রক্তের উচ্চ চাপের চিকিৎসায় নতুন ভেষজ

আজ বিশ্বের সর্বত্র রক্তের উচ্চ চাপের চিকিৎসায় একটি নতুন যৌগিক পদার্থের ব্যবহার সম্পর্কে পরীক্ষা চলেছে। এ-পর্যন্ত পরীক্ষার যে ফলাফল পাওয়া গেছে, তাথেকে বোঝা গেছে যে, এই যৌগিক পদার্থটি চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

এই যৌগিক পদার্থটি হলো "ডারেনথিন" শ্রেণীর ব্রেটিলিয়াম টসিলেট। এর সুবিধা হলো এই যে, এটি সমগ্র স্নায়ুচক্রের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে' প্রয়োজনমত স্নায়ুচক্রের কোন একটি বিশেষ অংশের উপর কাজ করতে পারে। এই কাজ, রক্তের উচ্চ চাপের চিকিৎসায় এ-যাবৎ যে সব ভেষজ ব্যবহৃত হয়ে এসেছে তা দিয়ে সম্ভব হয় নি।

লণ্ডনের কাছে বেকেনহামের ওয়েলকাম রিসার্চ লেবরেটরীতে ব্যাপক গবেষণার পর এই পদার্থটি আবিষ্কৃত হয়। এই লেবরেটরীরই ডিরেক্টর সার হেনরী ডেল ১৯০৪ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত যে গবেষণা চালান, তারই ফলে একদিন জানা যায়—স্নায়বিক কম্পন রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে সঞ্চারিত হয়। এই আবিষ্কারের জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সার হেনরী ডেল ১৯১০ সালে ওয়েলকাম রিসার্চ লেবরেটরী ত্যাগ করেন।

নানা অবস্থা এবং রোগের জন্যে রক্তের উচ্চ চাপ ঘটে থাকে। এমন অনেকে আছেন যাদের রক্তের উচ্চ চাপের কোন কারণ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। এটা সম্ভবতঃ এক রকমের রোগ; আবার এমনও হতে পারে যে, রক্তের চাপের বিভিন্ন স্তর রয়েছে; যেমন মানুষের সমাজে রয়েছে দীর্ঘাকৃতি এবং খর্বাকৃতির লোক।

যে সব অবস্থা আয়ুক্ষয়ের কারণ হয়, সেই সব অবস্থাকে যদি 'রোগ' বলা হয় তাহলে রক্তের উচ্চ চাপও একটা রোগ এবং এই রোগের চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।

১৫ বছর পূর্বে অনেকে মনে করতেন, রক্তের উচ্চ চাপের প্রয়োজন আছে এবং সেই চাপ হ্রাস করলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস পাবে, যা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। যাহোক, ভেষজ কিংবা অপারেশনের সাহায্যে যখন

রক্তের চাপ হ্রাস করা হয় তখন রোগী যে কেবল কষ্টকর অবস্থা থেকেই মুক্তি পায় তা নয়, তার পরমায়ু বৃদ্ধি পায় এবং তার পরে জীবন-ধারণ অনেক সহজ হয়।

এ-পর্যন্ত এ-সম্পর্কে যে সব ভেষজ ব্যবহৃত হয়েছে, তা হলো তথাকথিত গ্যাংলিয়ন ব্লকিং এজেণ্ট যা সিম্প্যাথেটিক সিষ্টেম বা সমবেদনা-জনক স্নায়ুমণ্ডল রুদ্ধ করে রক্তের চাপ হ্রাস করতে সাহায্য করে; কিন্তু তা সেই সঙ্গে প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুমণ্ডল রুদ্ধ করে প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করে। এই ধরণের চিকিৎসায় রোগী এবং চিকিৎসক উভয়েরই ধৈর্যের প্রয়োজন। অনেকে হয়তো এই ধৈর্য দেখাতে পারেন, কিন্তু তার জন্যে তাঁদের যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়।

সেজন্যে এমন একটা পদার্থের সন্ধান চলে, যা কেবল সমবেদনাজনক স্নায়ুমণ্ডল রুদ্ধ করবে এবং কোনরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে রোগ উপশমে সহায়তা করবে। এই সন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত হয় ডারেনথিন, যা রক্তচাপের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটা উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার।

আর এক দিকেও এই নতুন যৌগিক পদার্থের কিছুটা মূল্য রয়েছে বলে মনে হয়। রোগীর দেহের রক্তের উচ্চ চাপ যদি একেবারে প্রথম অবস্থায় হ্রাস করা সম্ভব হয়, বিশেষভাবে যখন রক্তের উচ্চ চাপের কোন লক্ষণ দেহে প্রকাশ পায় নি, তাহলে হৃৎপিণ্ড এবং রক্তপ্রবাহের উপর চাপ অনেক কমে যায় এবং তার ফলে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা কমে গিয়ে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়। এখনও অবশ্য এর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তার কারণ হলো এমন কোন ভেষজ এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নি, যা বিনা প্রতিক্রিয়ায় সুফল প্রদর্শন করতে পারে। প্রথম অবস্থায় রক্তের চাপ হ্রাস করবার সঙ্গে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থির করতে হয়তো আরও কয়েক বছর কেটে যাবে।

যাহোক, এই নতুন ভেষজ এখন রক্তের উচ্চ চাপ প্রতিরোধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে।

"সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্য্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ-বহন করিতে পারে না, দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্ম্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ—১৯৬০

১৩শ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

আহত রোগীর জন্যে আরামদায়ক শয্যা।

ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্‌-এর হাসপাতালগুলির জন্যে এই রকম নতুন ধরণের শয্যা তৈরী হয়েছে। বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে এই শয্যাকে অতি সহজে যে কোন অবস্থায় পরিবর্তন করা যেতে পারে। গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত রোগী যেভাবে শুয়ে থাকলে আরাম বোধ করে, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় শয্যার বিভিন্ন অংশকে অতি সহজে সেরূপভাবে পরিবর্তন করে দেওয়া যায়। পরিবর্তনের সময় রোগীর একটুও নড়াচড়া করতে হয় না। উইসকনসিনের এক হাসপাতালে এই অভিনব শয্যার কার্যকারিতা দেখানো হচ্ছে।

পেন্‌সিল ও কালির আত্মকথা

নিরালায় একাকী বসে কখন থেকে তুমি একমনে কী যে আকাশ-পাতাল ভাবছো—কবি! কিন্তু তোমার মনের ভাব যদি উবে যায়, ভাষা যদি শুকিয়ে যায়, কাগজে আঁচড় যদি না পড়ে, আমার ওপর রাগ করো না যেন! হলামই বা আমি সাত ইঞ্চি লম্বা, আমার সীসে পঁয়তিরিশ মাইল লম্বা দাগ দেওয়া যায়—পঁয়তাল্লিশ হাজার শব্দ লেখা যায়, তা বোধ হয় জান না! তোমার কথা না যোগাতে পারে, কিন্তু আমার সীস দিয়ে লিখেই সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন আমেরিকার লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ইউজীন ওনিল। বিজ্ঞানী টমাস এডিসন আজকের দৈনন্দিন জীবনের দরকারী কত না বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী আমার সীস দিয়েই লিখে গেছেন। গ্রামোফোন, সিনেমা, তুমি যে ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের নীচে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছো—এ সবের আবিষ্কারের কাহিনী আমার সীস দিয়েই তিনি লিখেছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কন আমার সীস দিয়েই তাঁর বিখ্যাত ঘোষণা-বাণী লিখেছিলেন। শুধু কি তাই! নেপোলিয়ন বোনাপার্টির উৎসাহেই আমি আজ এত উন্নত, এত সূক্ষ্ম, এত পরিণত। এ কথা বোধ হয় জান না কবি! তাহলে বলি শোন আমার আত্মকথা।

দুঃখের কথা কি বলবো! গোড়াতেই তোমরা আমার ভুল নাম দিয়ে বসে আছ। তোমরা যে সীস বল, আসলে কি আমি সীসা দিয়ে তৈরী? আদবেই না। আমি তৈরী হয়েছি বিশুদ্ধ কার্বন দিয়ে। পেন্‌সিল যে আমায় বল, সে কথাটা এসেছে ল্যাটিন পেন্‌সিলিয়াম থেকে, মানে ছোট্ট লেজ। আদি যুগে আমি ছিলাম শূকরের লোম বা অন্য পশুর লোমের তৈরী সূক্ষ্ম তুলি। তাই থেকে পেন্‌সিল বা ছোট্ট লেজ নামটা আজও আমার ঘুচলো না।

সীসা ধাতুটি আবিষ্কার করেছে মানুষ হাজার কয়েক বছর আগে। গ্রীক ও রোমানরা দাগ কাটবার জন্যে এই ধাতুটি ব্যবহার করতো। তাই হয়তো তোমরা সীস বল। যাক ছ'শো বছর আগে, যে গ্র্যাফাইট পাথরের কার্বন থেকে আমার রূপ, সেই গ্র্যাফাইটের প্রচলন হয়। আমার এখন যে কাঠের পোষাক দেখছ, বহুদিন ধরে তা ছিল না। শুধু পাথরটারই ব্যবহার হতো। জান তো পাথর কি শক্ত, তাই তার দাগও নরম হতো না।

১৫৬৪ সালে ইংল্যাণ্ডে কাম্বারল্যাণ্ডের কাছে প্রচণ্ড ঝড়ে প্রকাণ্ড একটা ওক গাছ উল্‌টে পড়লো। কথায় বলে, কারুর পৌষ মাস, কারুর সর্বনাশ। ওক গাছের সর্বনাশ হলেও আমার কিন্তু বরাত খুললো। ওক গাছটা উপ্‌ড়ে পড়তে সেখান থেকে বেরুলো

খাঁটি গ্র্যাফাইট পাথরের প্রকাণ্ড স্তূপ। তাই তুলে তুলে রাখাল ছেলেরা ভেড়ার গায়ে দাগ দিয়ে চিহ্ন রাখতো। লোভী ব্যবসাদারদেরও নজর পড়লো। তারাও সেই গ্র্যাফাইট লম্বা লম্বা করে কেটে লেখবার জন্যে বাজারে বেচতো। প্রচুর বিক্রী হতে লাগলো। বিদেশেও যেতে সুরু করলো। বিদেশে এই পেন্‌সিলের প্রচুর রপ্তানী দেখে রাজা দ্বিতীয় জর্জ বিদেশে গ্র্যাফাইট পাথরের রপ্তানীই বন্ধ করে দিলেন।

গ্র্যাফাইট পাথর দিয়ে লেখার মুশ্‌কিল হলো—পাথরে অন্য পদার্থ থাকবার দরুণ দাগ মোটেই নরম হতো না। দাগ ইচ্ছামত নরম বা মোলায়েম করতে হলে পাথর থেকে কার্বন ছাড়া অন্য পদার্থ বাদ দিতে হয়। তা করতে গেলে পাথর গুঁড়া করতে হয়। কিন্তু গুঁড়াকে লেখবার উপযোগী করে নিয়ে আবার জমাট বাঁধানো যাবে কি করে? মহা সমস্যা!

জার্মেনীর ক্যাস্‌পার ফেবার এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। গুঁড়া গ্র্যাফাইট থেকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বাদ দিয়ে গন্ধক অ্যান্টিমনি আর রেজিন দিয়ে ক্যাস্‌পার ফেবার কাজ-চলা গোছের পেন্‌সিল তৈরী করেন। এমনিই চলছিল। তারপর…

নেপোলিয়ন ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসলেন। ফলে ইংল্যাণ্ড থেকে যে চলনসই গোছের (অন্ততঃ নিজের দেশ ফ্রান্সের তৈরীর চেয়ে ভাল) পেন্‌সিল আসতো, তা আসা বন্ধ হলো। নিজের দেশের খারাপ গ্র্যাফাইট পেন্‌সিলে তাঁর মন উঠলো না। নেপোলিয়ন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী নিকোলাস কোঁতেকে ডেকে কাজের দায়িত্ব দিলেন।

১৭৯৫ সালে কোঁতে একটা উপায় বের করেন। গ্র্যাফাইট পাথরের খুব সূক্ষ্ম গুঁড়ার সঙ্গে একরকম মাটি মিশিয়ে নিলেন। তারপর চীনামাটির বাসন যেমন উনুনে পুড়িয়ে শক্ত করা হয়, সেই রকম গ্র্যাফাইট গুঁড়া ও মাটির মিশেলকেও উনুনে পুড়িয়ে বেশ শক্ত সীস পেলেন। পরে জার্মেনীর বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতির অনেক উন্নতি করেন। তখনও কিন্তু আমার কাঠের পোষাক হয় নি। আমাকে কাঠের পোষাক পরালেন আমেরিকার আসবাব-নির্মাতা উইলিয়াম মন্‌রো। আমেরিকায় তিনিই প্রথম পেন্‌সিল তৈরী করেন। ১৮১২ সালের যুদ্ধের জন্যে আমেরিকায় তখন পেন্‌সিলের চালান আসা বন্ধ হয়ে গেছে। মন্‌রো নিজেই কাঠ-পরাবার যন্ত্র তৈরী করে ফেললেন। একটা পেন্‌সিল ফাটিয়ে দেখেছ নিশ্চয়ই—আধখানা করে কাঠ, মাঝে সীস বসাবার খাঁজ-কাটা—লম্বা এই দু-টুক্‌রা কাঠকেই আঠা দিয়ে জুড়ে আমার বাইরের কাঠের পোষাক তৈরী হলো।

যাহোক আমায় সামান্য পেন্‌সিল বলে অবহেলা করা তোমার উচিত নয়! প্রায় চল্লিশটা বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয়ে এক-শ’ পঁচিশবার কারিগরির পর তবে আমার জন্ম! আমার জাতভাই আছে তিন-শ’ সত্তর রকমের। মানুষের কত রকম কাজেই না এদের

ডাক পড়ে। তোমার কবিতা লেখা ছাড়াও, একমাত্র শিল্পীর ছবি আঁকবার জন্মেই চাই কত রকমের পেন্‌সিল। তাছাড়া ধর, দর্জির জন্মে, কসাইয়ের জন্মে, এমন কি—অপারেশন করবার সময়ে দাগ দেবার জন্মেও আমার কোন না কোন জাতভাইকে চাই। তোমার মত কাব্যচর্চা না করে যাঁরা ইঞ্জিনিয়ার বা পরিকল্পনা করেন, কি মানচিত্র তৈরী করেন, তাঁরা আমার কদর অনেক বেশী বোঝেন। আর একটু যদি তলিয়ে দেখ তাহলে বুঝবে, এই সভ্যতাটাই অচল হয়ে পড়বে আমাকে বাদ দিলে।

এবার কালির কথা শোন। পেন্‌সিলের কথাবার্তায় রাগ করে এবার আমায় নিয়ে পড়লে! বেশ তো দোয়াতের মধ্যে আরামে ছিলাম, এখন আমায় দিয়ে সাদা কাগজটা কালি করতে চাও? তা ভাল! আমি কিন্তু তোমায় সত্যিই সাহায্য করতে চাই। কারণ আমি তো সেদিনের ছোক্‌রা পেন্‌সিলের মত বাচাল নই! আজকের সভ্যতায় আমার মত মহামহিম কালির যে কি গুরুত্ব আর মর্যাদা, সে আর নিজমুখে কি বলবো! আমি হলাম আসল বনেদী। হরফ যত বনেদী, প্রায় সেই রকম বনেদী বলেই ধরে নিতে পার। কাগজ আবিষ্কার হবার অনেক আগেই যে আমি পৃথিবীতে এসেছি, সে তুমি নিশ্চয়ই জানো। আড়াই হাজার বছর আগেও মিশরবাসীরা কালির ব্যবহার করেছে। চীন আর ভারতেও কালির ব্যবহার প্রায় ঐ সময় থেকে চলে আসছে। তবে কি জান, সে কালির সঙ্গে আজ তুমি যে কালিতে লেখ, তার কিছু তফাৎ আছে। সে সময়ে কালি যে কি ভাবে তৈরী হতো তা অবশ্য একালের গবেষকেরাও সঠিক বলতে পারেন নি। সে কালির মধ্যে থাকতো কার্বন (যে কার্বনের বড়াই একটু আগেই পেন্‌সিল করে গেল, সেই কার্বন), জল আর আঠাজাতীয় পদার্থ। সম্ভবতঃ এই কার্বন তৈরী করা হতো প্রদীপের ভুষা পরিয়ে, যে ভাবে মা-ঠাকুমারা আজকে কাজললতায় ভুষা পরিয়ে নেন। বাংলায় কালি নামটা এসেছে তো ঐ সংস্কৃত 'কজ্জলম' অর্থাৎ 'কাজল' কথাটা থেকে। প্রাচীন কালি ছিল রসায়ন-বিজ্ঞানের ভাষায় একটি সংমিশ্রণ, যেমন এখন ছাপাখানার কালি তৈরী হয়। কিন্তু এখনকার কালি হয় বিজ্ঞানের ভাষায় রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ। অ্যাসিড, অ্যালকালি বা ক্লোরিন দিয়ে, আধুনিক কালির স্থায়িত্ব নষ্ট করা যেতে পারে। কিন্তু সেকালের কালির স্থায়িত্ব আধুনিক কালি-ওস্তাদদের কাছেও বিস্ময়ের বিষয়। কালির স্থায়িত্ব নষ্ট করবার জন্মে ক্লোরিন হলো এক নম্বরের শত্রু। আধুনিক কাগজ তৈরীর পদ্ধতিতে ক্লোরিন না হলে চলে না। কাগজেও ক্লোরিন থেকে যায় বলে কালের করালে কালির কালিমা ম্লান হয়ে যায়, কাগজও পাঁপড়-ভাজার মত মচ্‌মচে হয়ে যায়। ছাপার কালি অবশ্য একালের লেখার কালির মত অত সহজে ফ্যাকাসে হয় না।

সে কালের কালি তৈরীর ব্যাপারে এক গবেষক বলেছেন যে, কোন কোন ফলের বিচি কাঠকয়লার মত পুড়িয়ে কার্বন করে নিয়ে তাকে গোমূত্রের সঙ্গে ফুটিয়ে

নেওয়া হতো। এটা অবশ্য ভারতীয় পদ্ধতি ছিল। কিন্তু রোমানদের পদ্ধতি ছিল একেবারে ভিন্ন রকমের।

ভূমধ্যসাগর থেকে ওরা কাট্‌ল্‌-ফিস বা স্কুইড নামে (সিপিয়া অফিসিন্যালিস) একরকম জলজ প্রাণী ধরতো। এদের থলি থেকে রস বের করে তাথেকে কালি তৈরী করা হতো। কালির জগতে সিপিয়া নামের খুব প্রতিপত্তি—সিপিয়া নামটা এসেছে সিপিয়া অফিসিন্যালিস নাম থেকে। এই জলজ প্রাণীদের থলে থেকে যে রস বের হয় তা এত ঘন যে, এক হাজার গ্যালনের চৌবাচ্চার পরিষ্কার স্বচ্ছ জল একটা কাট্‌ল্‌-ফিস কয়েক মুহূর্তে কালির মত কালো করে দিতে পারে।

আজকালকার কাগজ—সে লেখবারই হোক কি ছাপবারই হোক, দু-তিন-শ' বছরের বেশী টিকবে কিনা সন্দেহ—একথা বড় বড় কাগজ-ওস্তাদেরাই বলছেন। কারণ কাগজ তৈরী করায় কাগজ-কালির শত্রু ক্লোরিনের ব্যবহার। তাই বহু শতাব্দী ধরে নথি করে রাখবার কাগজ আজকাল বিশেষ ব্যবস্থায় ক্লোরিন বাদ দিয়ে তৈরী করা হয়। প্রাচীনকালের ভূর্জপত্র বা প্রাচীনকালের কাগজে যে নথি করা হতো তাতে ক্লোরিন থাকতো না, আর কালি তৈরী হতো ভূষা থেকে, তাই সে সব নথিপত্র আজও বেশ ভাল আছে। কালিতে কার্বন থাকলে তা যে খুব টেঁকসই হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজকালকার সাধারণ লেখবার কালিতে কার্বন থাকে না ঠিকই, কিন্তু শিল্পীরা ছবি আঁকবার জন্যে যে চায়না-কালি ব্যবহার করে, তার মধ্যে প্রায় সবটাই থাকে কার্বন এবং সেই জন্যে তার স্থায়িত্ব হয় দীর্ঘ দিন ধরে। শিল্পীরা এ কালির কদর বোঝেন, আর চীনে ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে এর উৎপাদন হয় পৃথিবীর সেরা। তাই আর সব রাসায়নিক পদার্থের ব্যাপারে অন্যরকম হলেও, ইউরোপ-আমেরিকার শিল্পীরা চীন বা এশিয়ার অন্যান্য দেশের তৈরী চায়না-কালি পেলে অন্য কোন কালি নিতেই চাইবেন না।

তুমি যদি কালির স্থায়িত্ব না চাও তবে সে ব্যবস্থাও করে দিতে পারি। কিছুই নয়, শুধু টাট্‌কা দুধে লিখে যাবে। কেউ কিছু বুঝতেও পারবে না। পড়বার সময়ে শুধু কাগজটা একটু গরম করে নিলেই হলো। লেখা বেশ পড়তে পারা যাবে। এই কৌশলটা কিন্তু বহুদিনের।

শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ

মেরুজ্যোতি ও বায়ুপ্রভা

মেরুজ্যোতি ও বায়ুপ্রভা—এ কথা দুটির মধ্যে প্রথম কথাটিই তোমাদের কাছে বেশী পরিচিত বলে বোধ হয়। মেরুজ্যোতির ইংরেজী প্রতিশব্দ Aurora কথাটিও হয়তো কারো কারো জানা থাকতে পারে। কিন্তু বায়ুপ্রভা বা Airglow কথাটি সে তুলনায় তোমাদের অনেকের কাছেই বোধ হয় বেশ অচেনা লাগছে। এই মেরুজ্যোতি ও বায়ুপ্রভা সম্বন্ধেই তোমাদের কাছে কিছু বলছি। প্রথমে মেরুজ্যোতির কথা শোন।

প্রাচীনকাল থেকেই মেরু অঞ্চলের আকাশের গায়ে মানুষ এক বিচিত্র ধরণের জ্যোতির আবির্ভাব লক্ষ্য করে আসছে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটলের নাম তোমরা শুনে থাকবে! এঁর রচিত একটি গ্রন্থে মেরুজ্যোতির উল্লেখ দেখা যায়। সে আজ প্রায় ২৩০০ বছর আগেকার কথা। মেরুজ্যোতির উৎস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নিয়মিত গবেষণা সুরু হয়েছে কিন্তু এর অনেক পরে, আজ থেকে মাত্র দু'শ বছর আগে। এর কারণ অবশ্য সহজেই অনুমান করতে পারা যায়। পুরাকালে পৃথিবীর যে সব অঞ্চলে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে উন্নত ধরণের চর্চা হয়েছে, তার কোন অঞ্চলেই মেরুজ্যোতি আকাশের গায়ে দেখতে পাওয়া যায় না। সেই কারণেই বোধ হয় পৃথিবীর এই সব অঞ্চলের জ্যোতির্বিদেরা মেরুজ্যোতি সম্বন্ধে গবেষণায় বিশেষ উৎসাহ দেখান নি।

আকাশের গায়ে মেরুজ্যোতির চেহারা যে কত রকমের হতে পারে, তা বলে শেষ করা যায় না। কোন কোন মেরুজ্যোতির প্রভা অতি ক্ষীণ, আকারও অতি ক্ষুদ্র। আবার কোন কোনটির ঔজ্জ্বল্য অতি তীব্র, বিস্তার প্রায় সারা আকাশব্যাপী। ঝলমলে সিল্কের পর্দা আকাশের গায়ে ধরলে যে রকম দেখতে হয়, এক ধরণের মেরুজ্যোতি দেখতে ঠিক সেই রকম। এগুলির নীচের দিকের ঔজ্জ্বল্য বেশী এবং উপরের দিকের জ্যোতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে হতে আকাশের গায়ে মিলিয়ে যায়। আর এক ধরণের মেরুজ্যোতি আকারে গম্বুজের মত। একটি শীর্ষবিন্দু থেকে ঘনসন্নিবিষ্ট উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি চারদিকে ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ে' এই ধরণের মেরুজ্যোতি সৃষ্টি করে। এরা যখন আকাশপথে উপর থেকে নীচের দিকে নেমে আসে, তখন তা দেখে মনে হয় আলোর একটি তাঁবু যেন কেউ আকাশ থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

রামধনু যেমন আকাশের গায়ে স্থির হয়ে থাকে, মেরুজ্যোতি কিন্তু মোটেই সে রকম নয়। আকাশে এদের অধিকাংশই চলাফেরা করে বেড়ায়, আর সে চলাফেরার ভঙ্গীতে বৈচিত্র্য কত! বাস্তবিক মেরুজ্যোতির বিচিত্র আকার ও চলাফেরার অপূর্ব ভঙ্গী দেখে পুরাকালের মানুষের মনে এদের সম্বন্ধে কত না বিচিত্র কল্পনার উদ্রেক

হতো। আকাশের গায়ে মেরুজ্যোতির ওঠা-নামা দেখে কেউ ভাবতো বুঝি দেব-দেবীরা মহানন্দে নাচানাচি সুরু করেছেন, আবার কেউ ভাবতো বুঝি বা অশ্বারোহী দুই সৈন্যদলের মধ্যে আকাশে লড়াই চলেছে। ইউরোপের অংশবিশেষে তো মেরুজ্যোতির আবির্ভাবকে দেশের আসন্ন অমঙ্গলের প্রতীক বলেই গণ্য করা হতো।

মেরুজ্যোতির চেহারার কথা বলতে গিয়ে এদের রঙের কথা না বললে অনেক কিছুই বলা হলো না। সাধারণতঃ এদের রং হচ্ছে সাদার উপর হল্‌দে আভা—তাছাড়া লাল, নীল, ধূসর, বেগুনী ইত্যাদি তো আছেই। তবে যে ধরণের পর্দার মত মেরু-জ্যোতির কথা আগে বলেছি, তার অধিকাংশেরই নীচের দিকের রং উজ্জ্বল গোলাপী, আর উপরে দেখা যায় সবুজের ছোঁয়াচ। এই ধরণের মেরুজ্যোতি যখন আকাশপথে চলতে সুরু করে, তখন দেখে মনে হয় বিরাট একটি পতাকা যেন আকাশের গায়ে রঙের বাহার খুলে উড়ে বেড়াচ্ছে।

আগেই বলেছি, মেরুজ্যোতি পৃথিবীর সব অঞ্চলে দেখা যায় না। বিষুবরেখা থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে এগুবার সঙ্গে সঙ্গে মেরুজ্যোতির আবির্ভাব হতে থাকে; কিন্তু উত্তর গোলার্ধে ৮১° অক্ষাংশের পর তাদের সংখ্যা কমতে সুরু করে। গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তর পশ্চিম উপকূল ঘিরে মোটামুটি উপবৃত্তাকার একটি অঞ্চলে মেরু-জ্যোতির আবির্ভাব সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়। গ্রীনল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশ ছাড়া সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত, হুডসন উপসাগর, ল্যাব্রাডোর প্রভৃতি অঞ্চল এই উপবৃত্তের উপর পড়ে। মেরুজ্যোতি আকাশে কত উঁচুতে দেখা যায় তা নিয়েও পরীক্ষা করা হয়েছে। জানা গেছে যে, মোটামুটি ৬০ থেকে ১৫০ মাইলের মধ্যেই মেরুজ্যোতির আবির্ভাব হয়ে থাকে; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় ৬০০ মাইল উঁচুতেও মেরুজ্যোতি দেখা গেছে।

মেরুজ্যোতির প্রকৃত উৎস কি, সে সম্বন্ধে গবেষণার এখনও কোন নিষ্পত্তি হয় নি। বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন ধরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু কোনটিই এ-পর্যন্ত চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করতে পারে নি। তবে এ-কথাটা মোটামুটি ঠিক যে, তড়িৎঘটিত কোন কারণের ফলেই মেরুজ্যোতির উদ্ভব হয়ে থাকে। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে চমৎকার একটি প্রমাণের উল্লেখ আছে। মেরু অঞ্চলগামী একটি বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীদল একবার লক্ষ্য করেন যে, আকাশে মেরুজ্যোতির গতির সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে রক্ষিত একটি চুম্বক-শলাকার বিক্ষেপের কোন একটা সম্পর্ক আছে। তাঁরা দেখলেন—মেরুজ্যোতির অবস্থান অনুযায়ী চুম্বক-শলাকাটি কখনও পূর্বে, কখনও বা পশ্চিমে বিক্ষিপ্ত হয়। বেশ কয়েকটি মেরু-জ্যোতির গতিপথ পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা চুম্বক-শলাকার সেই একই রকম ব্যবহার লক্ষ্য করেন।

বড় হলে তোমরা শিখবে যে, একটা তারের মধ্য দিয়ে যখন তড়িৎ-প্রবাহ

চলতে থাকে, তখন সেই তারের চতুর্দিকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এই কারণেই তড়িদ্বাহী তারের সংস্পর্শে এলে চুম্বক-শলাকার বিক্ষেপ ঘটে এবং বিক্ষেপের দিক ও পরিমাণ নির্ভর করে তড়িৎ-প্রবাহের দিক ও পরিমাণের উপর। ঐ অভিযাত্রী-দলের বৈজ্ঞানিকেরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেন যে, আকাশে মেরুজ্যোতির পরিবর্তে কোন তড়িৎ-প্রবাহ চালু থাকলে চুম্বক-শলাকার যে রকম বিক্ষেপ ঘটবার কথা, তাঁদের চুম্বক-শলাকাটিও ঠিক সেভাবে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। এই ঘটনা থেকেই তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে, মেরুজ্যোতির পিছনে তড়িৎঘটিত কোন কারণ নিহিত আছে।

তড়িৎঘটিত এই কারণটি বুঝতে হলে কিন্তু তড়িৎ-শক্তি সম্বন্ধে গোড়ার দু-একটি কথা তোমাদের জানা দরকার। যে তড়িৎ-প্রবাহ প্রয়োগে ঘরবাড়ী, কলকারখানা আলোকিত হচ্ছে—টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে দূরদূরান্তে মুহূর্তের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যাচ্ছে, আসলে তা অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র তড়িৎ-কণার প্রবাহ মাত্র। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, সূর্য থেকে অবিরত অনেকটা এই ধরণের তড়িৎ-কণা প্রতি সেকেণ্ডে হাজার হাজার মাইল বেগে চারদিকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। সৌরকলঙ্কের সময় মেরুজ্যোতির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত এই তড়িৎ-কণার সংখ্যাও খুবই বেড়ে যায়। পৃথিবী-পৃষ্ঠের কাছে এই তড়িৎ-কণাগুলির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অণু-পরমাণুগুলি তড়িতায়িত হয়ে পড়ে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, বায়ুশূন্য নলে খুব অল্প চাপে গ্যাস ভর্তি করে তড়িৎ-শক্তি প্রয়োগ করলে নলের ভিতরের গ্যাস থেকে এক রকম জ্যোতি নির্গত হয়—যার রং নির্ভর করে নলের ভিতরের গ্যাসের প্রকৃতির উপর। বর্ণালী-বিশ্লেষণ যন্ত্রে এই জ্যোতি পরীক্ষা করলে নলের ভিতরের প্রতিটি গ্যাসের বিভিন্ন এক একটি নির্দিষ্ট রেখা লক্ষ্য করা যায়। মেরু-জ্যোতিকেও এভাবে পরীক্ষা করে এই ধরণের রেখা পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা তাই অনুমান করেন যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় অণু-পরমাণু থেকে পূর্বোক্ত বায়ুশূন্য নলের পদ্ধতিতেই জ্যোতি নির্গত হয়ে মেরুজ্যোতির সৃষ্টি করে।

এখন একটি প্রশ্ন তোমাদের মনে জাগতে পারে যে, বছরের সব সময় ও পৃথিবীর সব জায়গায় মেরুজ্যোতি দেখতে পাওয়া যায় না কেন? একটু আগেই যা বলেছি, তাথেকে প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর পাওয়া শক্ত নয়। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে এবং সূর্য ও পৃথিবী উভয়েই নিজ নিজ মেরুদণ্ডের উপর অবিরত ঘুরছে। এই ফলে সূর্য থেকে উৎক্ষিপ্ত তড়িৎ-কণাগুলি অনেক সময়ই পৃথিবীর দিকে না এসে মহাশূন্যের অন্য কোন দিকে চলে যায়। এই কারণেই মেরুজ্যোতি বছরের সব সময় দেখতে পাওয়া যায় না।

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটির জন্যে চুম্বক সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার। চুম্বকের একটি ধর্ম এই যে, পৃথিবীর যে কোন জায়গায় সব সময় সে উত্তর-দক্ষিণ দিক

নির্দেশ করে। এই ঘটনাটিকে বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করেন এই ভাবে—পৃথিবী নিজেই উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি বিরাট চুম্বক এবং এই বিরাট চুম্বকের আবেশেই পৃথিবীর অন্যান্য সব চুম্বক উপরিউক্ত ধর্মটি লাভ করে। মেরু অঞ্চলের কাছেই এই চুম্বকের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। ফলে সূর্য থেকে উৎক্ষিপ্ত তড়িৎ-কণাগুলি এই চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে মেরু অঞ্চলের দিকেই অধিক পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হয় এবং সেজন্যেই মেরুজ্যোতি পৃথিবীর মেরু অঞ্চলেই বেশী দেখা যায়।

এবার বায়ুপ্রভা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে বক্তব্য শেষ করবো। বায়ুপ্রভা জিনিষটি পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চলেই দেখা যায়। তবে খালি চোখে নয়—ফটোগ্রাফী বা বর্ণালী-বিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্যেই রাতের আকাশে বায়ুপ্রভার অস্তিত্ব জানা যায়। মেরু-জ্যোতির মত বায়ুপ্রভাও নানা রঙের হতে পারে। তবে বায়ুপ্রভার উৎপত্তির কারণ সূর্য থেকে উৎক্ষিপ্ত কোন তড়িৎ-কণা নয়—সূর্যরশ্মি নিজেই এর জন্যে দায়ী। দিনের বেলায় সূর্যরশ্মির প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় অণু-পরমাণুগুলির কিছু অস্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। যেমন ধর, একটি গ্যাসীয় অণু ভেঙ্গে দুটি পরমাণুর সৃষ্টি হতে পারে। এর বিপরীত প্রক্রিয়া, অর্থাৎ দুটি পরমাণু মিলে অণু গঠনের কাজও চলতে থাকে। দিনের বেলায় প্রথমোক্ত প্রক্রিয়াটি বেশী কার্যকরী থাকে, কিন্তু রাতের বেলায় সূর্যের অনুপস্থিতির জন্যে দ্বিতীয় ধরণের প্রাক্রিয়াটিই বেশী চালু থাকে। দিনে যে শক্তি প্রয়োগের ফলে অণু থেকে পরমাণু তৈরী হয়েছিল, রাতে পরমাণু থেকে অণু গঠনের সময় সেই শক্তিই আবার ফিরে পাওয়া যায় আলোক রূপে। বায়ুপ্রভা সৃষ্টির মোটামুটি এই হলো কারণ।*

শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ

* কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে।

মহাশূন্যে অভিযান

(কথায় ও চিত্রে)

১৬। অ্যাটলাস—যুক্তরাষ্ট্র যেসব কৃত্রিম চাঁদ মহাশূন্যে প্রেরণ করেছে, তার মধ্যে অ্যাটলাস অন্যতম। এই সবাক কৃত্রিম চাঁদটির ওজন ছিল সাড়ে চার টনেরও বেশী। এটি মহাশূন্য থেকে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বড়দিনের শান্তির বাণী পৃথিবীতে

প্রেরণ করেছিল। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, এই কৃত্রিম চাঁদের দ্বারা পৃথিবীব্যাপী
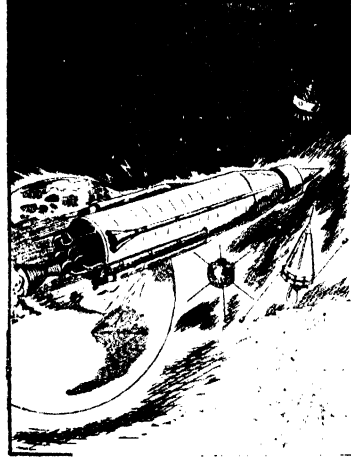
১৬নং চিত্র

সংবাদ প্রেরণ এবং টেলিভিসন ব্যবস্থার প্রসারণ সম্ভব হবে।

১৭। ভ্যানগার্ড-২—এর পর যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যানগার্ড-২ নামক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে প্রেরণ করা হয়। এই উপগ্রহের সাহায্যে আবহাওয়া সম্পর্কে অনেক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন—এর ফলে পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পর্কে প্রায় নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হবে। মেঘের উপর সূর্যরশ্মির প্রতিফলন, পৃথিবীর

১৭নং চিত্র

উপরিভাগ সম্পর্কে নতুন তথ্যাদি এই ভ্যানগার্ড-২ উপগ্রহের সাহায্যে সংগৃহীত হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেঘ ও পৃথিবীর সূর্যালোকিত উপরিভাগের শতকরা ২৫ ভাগেরও বেশী

অংশের অবস্থা এই উপগ্রহ থেকে ছবির সাহায্যে সংগৃহীত হতে পারে এবং সেই ছবির সারি একত্র করলে ৩০০ মাইল লম্বা হবে।

১৮। আবহাওয়া—বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, যদি আবহাওয়া সম্পর্কে শতকরা দশ ভাগও ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়—তাহলে পৃথিবীর বাণিজ্য ও কৃষি ব্যবস্থার বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করা সম্ভব হবে। কেউ কেউ এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে, মানুষের
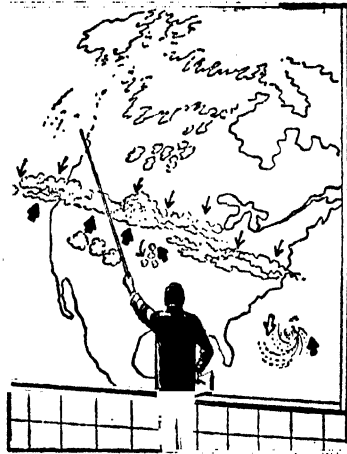
১৮নং চিত্র

প্রয়োজন অনুযায়ী আবহাওয়ার পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হবে, পতিত জমিকেও উর্বর করে তোলা অসম্ভব হবে না।
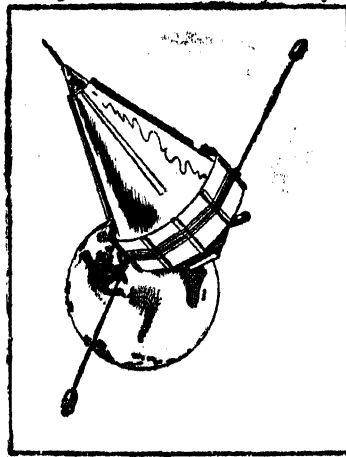
১৯নং চিত্র

১৯ সৌর-উপগ্রহ—দুটি সন্ধানী রকেট মহাশূন্যে ৬৫,০০০ মাইলেরও বেশী উর্ধ্বে

পাঠাবার পর যুক্তরাষ্ট্র 'পায়োনিয়ার-৪' নামক কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাশূন্যে প্রেরণ করে। এটিকে বলা হয় সৌর-উপগ্রহ। সৌরকক্ষে প্রবেশ করবার পূর্বে এই উপগ্রহটি ৩০০,০০০ মাইল পরিভ্রমণ করেছিল এবং মহাশূন্যের ৪০৬,৬২০ মাইল দূর থেকে পৃথিবীতে বেতার-সঙ্কেতও প্রেরিত হয়েছিল।

২০। পরিক্রমা-কক্ষ—পায়োনিয়ার-৪ মহাশূন্যকে জয় করে এবং সূর্যের চারদিকের কক্ষপথে বরাবর পরিভ্রমণ করতে থাকবে। পায়োনিয়ার-৪ সূর্যের চারদিকে ৯১,৭৪৪,০০০ থেকে ১০৫,৮২৯,০০০ মাইল পথ ৩৯২ দিনে একবার পরিভ্রমণ করে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের
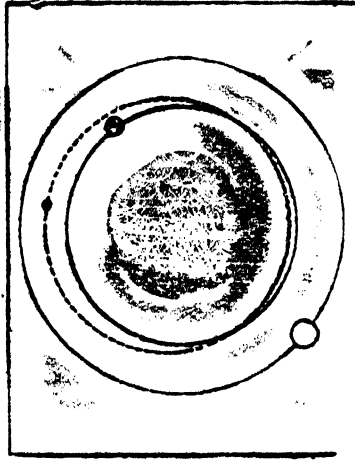
২০নং চিত্র

টান এড়াবার জন্যে পায়োনিয়ার-৪ ঘণ্টায় ২৪,৮৯৯ মাইল গতি অর্জন করেছিল। ছবিতে কর্তিত রেখার বৃত্তটি হচ্ছে সূর্যের চারদিকে পায়োনিয়ার-৪-এর পরিভ্রমণের কক্ষপথ।
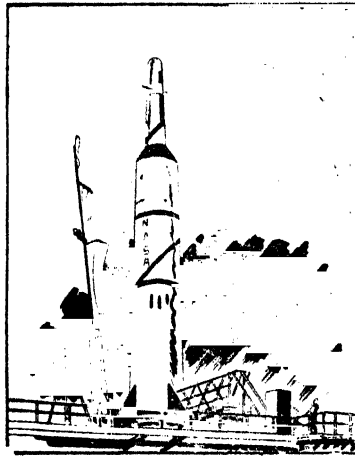
২১নং চিত্র

২১। ন্যাসা (NASA)—যুক্তরাষ্ট্র মহাশূন্যে কৃত্রিম চাঁদ প্রেরণ এবং রকেট

সম্পর্কে গবেষণা চালাবার জন্যে একটি কর্মসূচী তৈরী করেছে এবং সেই কর্মসূচী তদারকের জন্যে একটি সংস্থা গঠন করেছে। সংস্থাটিকে সংক্ষেপে বলা হয় NASA. (National Aeronautics and Space Administration)।

২২। মহাশূন্যে অভিযানের সমস্যা—মহাশূন্যে অভিযান করবার সময়ে কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। এই অসুবিধাগুলি দূর করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন। প্রধান অসুবিধা হচ্ছে—মহাশূন্যে বাতাসের অভাব। সেজন্যে মহাশূন্য-

২২নং চিত্র

যাত্রীকে নিজের সঙ্গেই বাঁচবার উপযোগী পরিবেশ তৈরী করে নিয়ে যেতে হবে। কেমন করে মহাশূন্য-যাত্রীকে বাতাস, খাদ্য এবং জল প্রভৃতি সরবরাহ করা যায় এবং প্রচণ্ড তাপ, ঠাণ্ডা ও ব্যোমরশ্মির বিকিরণ থেকে বাঁচানো যায়—সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন।

২৩নং চিত্র

২৩। মাধ্যাকর্ষণ—মহাশূন্যে আকর্ষণ শক্তির প্রভাব নেই বলে মহাশূন্য-যাত্রীকে

সেখানে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। ওজনশূন্য অবস্থায় সে মহাশূন্যে ভাসতে থাকবে; এমন কি, মহাকাশ-যানের ভিতরেও কেবল সে নিজেই নয়, তার খাবারও ভাসতে থাকবে। সেজন্যে একটা নলের মধ্য দিয়ে জোর করে যাত্রীটির মুখে খাবার ঠেলে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাশূন্যে বাতাস বা কোন কিছুর চাপ না থাকায় যাত্রীর দেহ হঠাৎ ফেটে চৌচির হয়ে যেতে পারে। এজন্যে মহাশূন্য যাত্রীর বিশেষ পোষাকের প্রয়োজন। তাছাড়া মহাশূন্য-যানকে ইচ্ছামত পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করাও একটা মস্ত বড় সমস্যা।

২৪। চাঁদ—চাঁদে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব কম হওয়ায় (পৃথিবীর তুলনায় $\frac{১}{৬}$ ভাগ) মহাশূন্য-যাত্রী সেখানে অনায়াসে ৩০ ফুট উঁচুতে লাফিয়ে উঠতে পারবে। চাঁদে বাতাসও নেই, জলও নেই। বাতাসের অভাবে চাঁদে কোন শব্দ শোনাও সম্ভব হবে না। চাঁদে

২৪নং চিত্র

দিনে খুবই গরম; আবার রাত্রিতে খুবই ঠাণ্ডা। দিনের বেলায় চাঁদে শূন্য ডিগ্রি (ফারেনহাইট) থেকে উপরে ২০০ ডিগ্রি বা তারও বেশী এবং রাত্রিতে শূন্য ডিগ্রির নীচে ২৫০ ডিগ্রি বা তারও বেশী তাপমাত্রার তারতম্য দেখা যায়।

২৫। মহাশূন্যে প্ল্যাটফর্ম—বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর আবহমণ্ডলের বাইরে মহাশূন্যে প্ল্যাটফর্ম স্থাপনের পরিকল্পনা করেছেন। এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হলে—মহাশূন্য অভিযান আরও সহজসাধ্য হবে বলে তাঁদের বিশ্বাস। এই প্ল্যাটফর্ম থেকে মানুষ মহাশূন্যের পথে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যেতে পারবে। পৃথিবী থেকে রকেটের সাহায্যে মহাশূন্য-যান ও প্ল্যাটফর্মের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে মহাশূন্যে প্রেরণ করা হবে। মহাশূন্যে

বায়ুমণ্ডল ও আকর্ষণ-শক্তি না থাকায় সেখানকার প্ল্যাটফর্ম থেকে পৃথিবীর তুলনায় খুব

২৫নং চিত্র

সহজেই মহাশূন্যযান যাত্রা আরম্ভ করতে পারবে।

২৬। প্ল্যাটফর্মের সুবিধা—মহাশূন্য-যান প্রেরণের সুবিধা ছাড়াও প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে অন্যান্য সুবিধা আছে। সেখানকার পর্যবেক্ষণাগার থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে উন্নততর গবেষণার সুবিধা হবে এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এই সম্পর্কে গবেষণায়
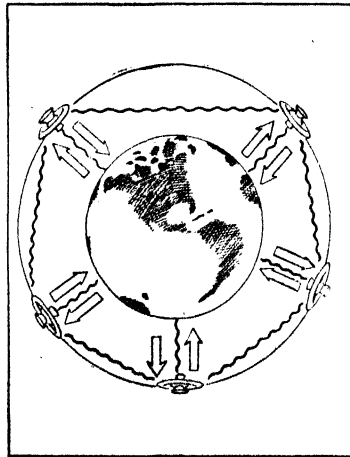
২৬নং চিত্র

যে বাধার সৃষ্টি করে—তা এড়ানো যাবে। সেখানে বেতার, টেলিভিসন ও আবহাওয়া সম্পর্কিত গবেষণার কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে এবং বেতার ও টেলিভিসন কেন্দ্র স্থাপন করে পৃথিবীব্যাপী বার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা সহজসাধ্য হবে।

২৭। মহাশূন্য-যান—মহাশূন্যে বায়ুমণ্ডল ও আকর্ষণ-শক্তি না থাকায় সেখানে মহাশূন্য-যানের পরিভ্রমণের পক্ষে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না এবং জলযানের মত মহাশূন্য-যানে যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না। কেবল বায়ুমণ্ডল সমন্বিত অন্যান্য গ্রহ বা

২৭নং চিত্র

পৃথিবীতে যাতে নিরাপদে অবতরণ করতে পারে, সে রকম যান্ত্রিক ব্যবস্থা রাখা হবে। এগুলি যাতে খুব উত্তপ্ত না হতে পারে, সেজন্যে তার গতি কমাবার ব্যবস্থাও থাকবে; কেন না পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহের বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে খুব বেশী উত্তপ্ত হলে সেটি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

২৮। মহাশূন্য-যানের গতি—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ও বায়ুমণ্ডলের প্রভাব
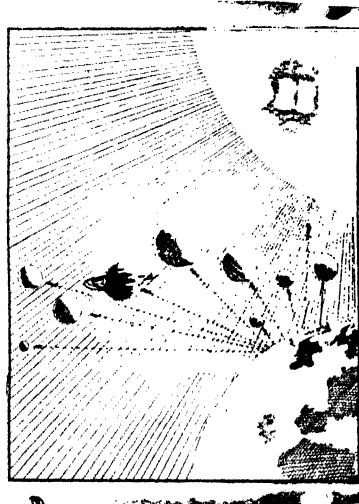
২৮নং চিত্র

এড়াবার জন্যে মহাশূন্য-যানকে ঘণ্টায় অন্ততঃ ২৪,৬৮৮ মাইল বেগে ছুটতে হবে। একবার আকর্ষণের প্রভাবমুক্ত হবার পর মহাশূন্য-যানের গতিবেগ ঘণ্টায় চার থেকে পাঁচ

হাজার মাইলের মধ্যে হলেই চলবে। এই বেগে এগিয়ে গেলে মহাশূন্য-যান পঞ্চাশ ঘণ্টায় চাঁদে, ২৯০ দিনে মঙ্গলগ্রহে এবং ২১৫ দিনে শুক্রগ্রহে পৌঁছুতে পারবে।

২৯। নতুন তথ্য—বিজ্ঞানীদের অনেকেই অনুমান করেন যে, মঙ্গল ও অন্যান্য গ্রহে লাইকেনের মত শ্যাওলা জাতীয় আদি জীবনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আবার কারো কারো মতে, সেখানে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবেরও অবস্থিতি সম্ভব। গ্রহান্তরে
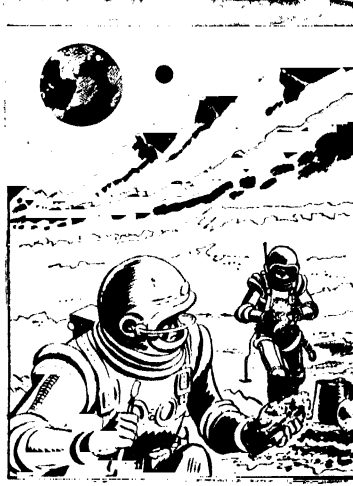
২৯নং চিত্র

পৌঁছানো সম্ভব হলে ইলেকট্রনিক রোবট বা যন্ত্র-মানবের সাহায্যেই প্রথম অনুসন্ধানের কাজ পরিচালিত হবে। এই যন্ত্র-মানবের উপর তাপ, রশ্মি-বিকিরণ ও বায়ুমণ্ডল কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। কোন কোন যন্ত্র-মানব এখন প্রায় মানুষের মতই দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে।

৩০নং চিত্র

৩০। গ্রহ-জগৎ—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন

ও প্লুটো—এই গ্রহগুলি সৌর-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানীরা গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে অভিযানের যে পরিকল্পনা করেছেন, তা একদিন বাস্তবে রূপায়িত হবে বলে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁরা মনে করেন—প্রথমে শুক্রগ্রহে অভিযান করাই সুবিধাজনক এবং মঙ্গল-গ্রহে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের খোঁজ পাওয়া যাবে। মহাশূন্যের যে নতুন যুগের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, তা কেবল শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেই মানবজাতির উন্নতিসাধনে সক্ষম হবে।

বিবিধ

সমুদ্রের তরঙ্গ হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন

সমুদ্রের তরঙ্গ যখন প্রবল বেগে তীরের উপর আছ্‌ড়াইয়া পড়ে তখন তাহাকে কাজে লাগানো যায় কি না, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা বহুদিন হইতেই ভাবিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ারগণ সমুদ্র-তরঙ্গের এই শক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার জন্য এক অভিনব টার্বাইন নির্মাণ করিয়াছেন। পরীক্ষামূলকভাবে এই 'সী-ওয়েভ টার্বাইনে'র বিপুল কার্যকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। সমুদ্রোপকূলে এক বিশেষ ব্যবস্থাধীনে রক্ষিত এই টার্বাইন, প্রত্যেকটি তরঙ্গ আসিয়া আছ্‌ড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকে এবং উহার সহিত সংযুক্ত একটি জেনারেটর হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

কিন্তু ইহা হইতেও আরও সহজ ও কার্যকরী একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন নিখিল-সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য বেস্তসিয়ন বুল। তিনি ১৯৪৫ সালে আবিষ্কার করেন যে "সেগ্নেটো-ইলেকট্রিকস" নামক এক জাতীয় পদার্থ আছে, যেগুলির উপরে কোন কিছুর আঘাত লাগিলে বা চাপ পড়িলে তাহা হইতে বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়। বিজ্ঞানী বুল-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী, আজভ সমুদ্রের উপকূলে একটি নির্বাচিত স্থানে এই সেগ্নেটোইলেকট্রিক পদার্থ দিয়া নির্মিত কতকগুলি বৃহৎ আকারের টালি বিছাইয়া রাখা হয়। এই টালিগুলির উপরে ঢেউ ভাঙ্গিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় তাহার দ্বারা সরাসরি কয়েকটি শক্তিশালী সার্চ লাইট জ্বালাইয়া রাখা সম্ভব হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রে জেনারেটরের প্রয়োজন হয় নাই।

সম্প্রতি সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বুল-এর এই পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য পরিকল্পনা রচনার কাজে রত আছেন।

রোগীর দেহের তাপ নির্ণয়ের জন্য নূতন ধরণের থার্মোমিটার

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ফিজিক্স ইউনিটের ডাঃ ডি. সি. সিম্পসন এমন এক ধরণের ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার উদ্ভাবন করিয়াছেন, যাহা হাসপাতালের নার্সদের এক সঙ্গে ওয়ার্ডের সকল রোগীর দেহের তাপ নির্ণয়ের কাজে সাহায্য করিতে পারিবে। ১৯৫০ সালে হৃৎপিণ্ডের ডীপ-ফ্রীজ সার্জিক্যাল অপারেশনের সময় দেহেয় তাপ গ্রহণের জন্য তিনি যে যন্ত্রটি নির্মাণ করেন, তাহা হইতে এই নূতন তাপমান যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়।

এই যন্ত্রটি নির্মাণ করিতে প্রায় ২০ পাউণ্ড মূল্যের যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। ইহা ইলেকট্রনিক ট্র্যানজিস্টর এবং একটি ক্ষুদ্র ব্যাটারীর সাহায্যে চালিত হয়। ইহাতে আছে একটি মিটার, একটি সুইচ এবং অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর থার্মিষ্টার বা প্রোব। এই প্রোব বা শলাকা বহু সংখ্যায় মিটারের সহিত যুক্ত হইতে পারে, যাহার ফলে

হাসপাতালে প্রত্যেক বেডের সহিত সংযুক্ত বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে প্রত্যেক রোগীর দেহের তাপ একই সঙ্গে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই সরঞ্জাম উদ্ভাবিত হইবার পর নার্সকে আর প্রত্যেক রোগীর কাছে গিয়া রোগীর দেহের তাপ সংগ্রহের প্রয়োজন হইবে না; নিজের ঘরে বসিয়া সে কেবল সুইচ টিপিয়া এই কাজ করিতে পারিবে।

মেডিক্যাল ফিজিক্স ইউনিটের প্রধান ডাঃ জে. আর. গ্রীনিং বলেন—এই নূতন যন্ত্রটি দেহের রোগগ্রস্ত স্থান নির্ণয়ের কাজেও ব্যবহৃত হইতে পারিবে। দেহের রোগগ্রস্ত অংশ সাধারণতঃ রক্ত-প্রবাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে; এই ব্যাঘাত সৃষ্টির ফলে দেহের তাপ হ্রাস পায়। ডাঃ গ্রীনিং বলেন, অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর এই শলাকাটি রোগগ্রস্ত স্থান নির্ণয়ের কাজে বিশেষ কার্যকরী হইবে।

নক্ষত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের অভিনব পন্থা

আমেরিকার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডাঃ হার্বার্ট ফ্রিডম্যান জানাইয়াছেন যে, পৃথিবীর ৮৮ মাইল ঊর্ধ্ব হইতে দূরবীক্ষণের সাহায্যে নক্ষত্রগুলিকে দেখিবার ও তাহাদের চিত্র পৃথিবীতে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হওয়ায় বহু নূতন নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে রকেটের সাহায্যে একটি দূরবীক্ষণ মহাশূন্যে প্রেরিত হয় এবং ইহার নীচের ৪ ইঞ্চি লেন্সের উপর নক্ষত্রগুলির প্রতিবিম্ব পড়ে। ইহা পুনরায় একটি ইলেকট্রিক আই বা বৈদ্যুতিক চোখে প্রতিবিম্বিত হয়। এই চোখটি আবার এই প্রতিবিম্বকে বেতারযোগে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া থাকে।

পৃথিবীর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া একটি ঘন পরিমণ্ডল রহিয়াছে বলিয়া পৃথিবী হইতে দূরবীক্ষণের সাহায্যেও নক্ষত্রগুলি পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয় না অথবা অতিবেগুনী রশ্মি ধরা পড়ে না। অতিবেগুনী রশ্মি আকাশ-পরিমণ্ডলে সম্পূর্ণ মিশিয়া থাকে। পৃথিবীর ৬০ মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত ইহাকে কোন রকমেই দেখিবার উপায় নাই।

অত্যুচ্চ তাপমাত্রার কোন কোন নূতন নক্ষত্রের শক্তির শতকরা ৯৫ ভাগ পর্যন্ত অতিবেগুনী আলোরূপে বিকিরিত হইয়া থাকে। এই জন্যই বিজ্ঞানীরা ইহাদের ঔজ্জ্বল্য পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছে। এই সকল নক্ষত্রের বয়স, গঠন, ভর ও পরমায়ু এই ঔজ্জ্বল্য হইতেই জানা যায়।

আমেরিকার নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যাণ্ডস্ হইতে দূরবীক্ষণ সহ এই রকেটটি মহাশূন্যে প্রেরিত হয়।

পরিত্যক্ত ম্যাঙ্গানীজ খনিজ পিণ্ড হইতে মূল্যবান রাসায়নিক উৎপাদন

জামশেদপুরের জাতীয় ধাতু গবেষণাগার ম্যাঙ্গানীজ খনিজ পিণ্ডের ছাঁট হইতে ম্যাঙ্গানীজ ডাইঅক্সাইড তৈরীর পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছে। ভারতে প্রতি বৎসর দশ লক্ষ টনেরও বেশী ম্যাঙ্গানীজ খনিজ পিণ্ড অকেজো বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। উক্ত গবেষণাগারে আবিষ্কৃত পদ্ধতির সাহায্যে এই অপচয় বন্ধ করা সম্ভব হইবে।

উক্ত ম্যাঙ্গানীজ খনিজ পিণ্ডে ৩৯.৫ শতাংশ ম্যাঙ্গানীজ ডাইঅক্সাইড থাকে। উহা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ব্যাটারীতে ব্যবহারযোগ্য ম্যাঙ্গানীজ ডাইঅক্সাইড তৈরী করা সম্ভব এবং উহা টর্চের ব্যাটারী ও অন্যান্য রসায়ন-শিল্পে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ম্যাঙ্গানীজ খনিজ পিণ্ড হইতে ম্যাঙ্গানীজ ডাইঅক্সাইড তৈরীর পদ্ধতিটি সংক্ষেপে শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের 'রিসার্চ ইণ্ডাষ্ট্রি' পত্রিকার গত ডিসেম্বর মাসের সংখ্যায় বিবৃত হইয়াছে।

সাধারণ সর্দির বিরুদ্ধে সংগ্রাম

সাধারণ সর্দির প্রতিরোধ সম্পর্কে বৃটিশ

বিজ্ঞানীগণ বহুকালের চেষ্টার পর একটা উল্লেখযোগ্য কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের লেবরেটরিতে সর্দির ভাইরাস উৎপাদন করিতে পারিয়াছেন।

বিজ্ঞানীরা এই পর্যন্ত লণ্ডনের অন্তর্গত মিল্-হিল্-এর মেডিক্যাল গবেষণা কেন্দ্রে সর্দিতে আক্রান্ত রোগীদের লইয়াই গবেষণার কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। এক্ষণে তাঁহারা লেবেরেটরিতে উৎপন্ন ভাইরাস লইয়া এই কাজ করিতেছেন। তাঁহারা এই সঙ্গে 'মানুষ-গিনিপিগ' লইয়া টীকা প্রস্তত সম্পর্কেও কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ সি. এইচ. এণ্ড্রুজ বলেন যে, কবে এবং কিভাবে এই সাধারণ সর্দি সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হইবে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারা যায় না। তবে ইহা ঠিক যে, বহুকাল পরে সর্দির মূলে আজ আঘাত হানা সম্ভব হইয়াছে।

শুক্রগ্রহে প্রাণের আবির্ভাব

পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব যেভাবে ঘটিয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে শুক্রগ্রহে—সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক বারাবাশোভ অন্ততঃ তাহাই মনে করেন। তিনি বলেন, এতদিন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, শুক্রগ্রহ নিস্প্রাণ ও জীবন-স্পন্দনহীন। সেখানকার নিঃস্তব্ধতার কথা চিন্তা করিয়া পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেন।

কিন্তু সাম্প্রতিক আবিষ্কারে জানা গিয়াছে যে, সেখানে জীবনের সবেমাত্র আবির্ভাব ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। পৃথিবীর সমুদ্রের আদিমতম প্রোটোপ্লাজম, না অন্য কিছু, এই জীবনের সূত্রপাত করিতেছে, তাহা এখনও বলা যায় না। কিন্তু অনুমান করা যাইতে পারে যে, শুক্রগ্রহ আজ সেই অবস্থায় পৌছিয়াছে, যাহা কোটি কোটি বৎসর পূর্বে কার্বনিফেরাস যুগে পৃথিবীও অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে।

বৃহস্পতি-গ্রহের চতুর্দিকে তেজস্ক্রিয় বলয়ের অস্তিত্ব

পৃথিবীর চতুর্দিকে যে তেজস্ক্রিয় বলয় রহিয়াছে, তাহার তুলনায় একশত গুণ মারাত্মক বলয় বৃহস্পতি-গ্রহটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে—আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাড্ভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স নামক সংস্থার বার্ষিক অধিবেশনে মার্কিন জ্যোতির্বিদ ডাঃ ফ্রাঙ্ক ডি. ড্রেক এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বৃহস্পতি-গ্রহের চৌম্বক ক্ষেত্র যে শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় অঞ্চল সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইহা দ্বারা যে গ্রহটি পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, তাহা ঐ গ্রহ হইতে আগত রেডিও-তরঙ্গ পর্যালোচনা করিয়া জানা গিয়াছে।

পৃথিবীর চতুর্দিকে যে তেজস্ক্রিয় বলয় রহিয়াছে, মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ প্রথম পায়োনিয়ারের সাহায্যেই তাহার প্রথমে সন্ধান পাওয়া যায়। এই বলয় অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন দ্বারা গঠিত। ইহাদের অধিকাংশই সূর্য হইতে উদ্ভূত হইয়া পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে আসিয়া আটকাইয়া পড়িতেছে।

ডাঃ ড্রেক এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন যে, বৃহস্পতি-গ্রহের ব্যাস পৃথিবীর তুলনায় দশগুণ বৃহত্তর। ইহার চৌম্বক ক্ষেত্রও পৃথিবীর তুলনায় ঐ পরিমাণ বৃহৎ। বৃহদাকৃতির দরুণ ইহার তেজস্ক্রিয় বলয়ের ঘনত্বের পরিমাণ পৃথিবীর তুলনায় একশত গুণ অধিক হইবে।

মঙ্গলগ্রহে রকেট অভিযান

মস্কোর স্টার্নবার্গ জ্যোতিবিজ্ঞান গবেষণাগারের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মার্তিনোভ মস্কো বেতারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, কোন্ পথে মঙ্গলগ্রহে রকেট পৌছানো সম্ভব হইবে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই তাহা স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। মহাকাশচারী মানুষকে কি অবস্থার মধ্যে মঙ্গলগ্রহে

কাটাইতে হইবে, তাহাও পর্যালোচনা করা হইয়াছে। মঙ্গলগ্রহের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম—সেখানকার বিষুবীয় অঞ্চলে দিবাভাগের তাপমাত্রা সর্বাধিক—৬৮° ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং রাত্রিকালের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রী হইতে ৩০° ডিগ্রী কম।

মস্কো প্ল্যানেটোরিয়ামের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজির্কিন বলেন, রাশিয়ার নবনির্মিত রকেটের দুইটি মুখ্য লক্ষ্যস্থল হইতেছে, মঙ্গল ও শুক্রগ্রহ। কিন্তু যে রকেটের সহায়তায় চন্দ্রের বিপরীত দিকের ফটো তোলা হইয়াছে, তাহার সহায়তায় মঙ্গলগ্রহের আকাশে পৌঁছাইতে হইলে ৯ মাসেরও বেশী সময় লাগিবে। সেই জন্যই নূতন ধরণের এমন রকেট নির্মাণ করা দরকার যাহা বহু গুণ বেশী গতিবেগ সঞ্চার করিতে সক্ষম হইবে।

মহাকাশে ভ্রমণ এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নহে

সোভিয়েট মহাকাশ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক দবরোনাভভ মস্কো বেতার হইতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, এমন একটি কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ করা সম্ভব যাহা বেতার-নিয়ন্ত্রিত অতি শক্তিশালী টেলিস্কোপ লইয়া ছুটিয়া চলিবে এবং দূরবর্তী মঙ্গল ও শুক্র গ্রহের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবে।

তিনি আরও বলেন, পুরাপুরি স্বয়ংক্রিয় এমন রকেট নির্মাণ করাও সম্ভব, যাহা চন্দ্রলোকে নিজের পছন্দমত স্থানে অবতরণ করিবে এবং চন্দ্রের সমীপবর্তী হইবার কালে উহার নিজস্ব মোটর চালু করিবে। ইহার ফলে চন্দ্রলোকে মানুষের অবতরণ সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে।

তাঁহার মতে, মানুষের মহাকাশে ভ্রমণ এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নহে এবং ইহার জন্য তাড়াহুড়া করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। মহাকাশে স্বয়ংক্রিয় রকেটের গতিবিধির ফলে যখন নিরাপত্তার পুরাপুরি আশ্বাস পাওয়া যাইবে, তখনই গ্রহান্তরে ভ্রমণ আরম্ভ হইতে পারে, তাহার পূর্বে নহে।

ভ্রমসংশোধন—গত ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় (১৯৫৯) প্রকাশিত 'আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের উৎপত্তি' প্রবন্ধের নিম্নোক্ত সংশোধন হইবে :—

৬৮নং পৃষ্ঠায় একেবারে শেষে নিরপেক্ষ শব্দের পর ; চিহ্ন বসিবে না—নিরপেক্ষ সময় হইবে। -স-

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের ৮নং ফরম অনুযায়ী বিবৃতি :—

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা - বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

২। প্রকাশের কাল—মাসিক

৩। মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৪। প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৫। সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারতীয়, ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, (বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান) ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

আমি, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

তারিখ—৯-৩-৬০ প্রকাশক—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

# জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োদশ বর্ষ | এপ্রিল, ১৯৬০ | চতুর্থ সংখ্যা

গেঁটে-বাত

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

গেঁটে-বাতের নাম সবাই শুনেছেন। নামটিই এই রোগের বিশেষ প্রকৃতির পরিচায়ক। গাঁট বা অস্থি-সন্ধি ফুলে যায় বলে এই রোগের এরূপ নাম দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের চেয়ে ইংল্যাণ্ড এবং জার্মেনীতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। তাই বলে জাতিবিশেষে এই রোগের আক্রমণ কম বা বেশী হয় না। তবে সাধারণতঃ দেখা গেছে—উষ্ণমণ্ডলের অধিবাসীদের চেয়ে নাতি-শীতোষ্ণমণ্ডলের অধিবাসীরা এই রোগে বেশী ভুগে থাকে। এই রোগ বংশগত বললে ভুল হবে না; কারণ প্রায় শতকরা আশীভাগ রোগীর পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে জানা গেছে যে, তাদের পূর্বপুরুষেরাও এই রোগে ভুগেছে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমের ইতিহাসও আছে। বংশধারার প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, বংশপরম্পরায় এই রোগ যে সংক্রামিত হবেই, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে দেখা গেছে যে, পিতা বা মাতার এই রোগ থাকলে তাদের সন্তানেরা সহজেই এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। অধস্তন বংশধরদের ক্ষেত্রে অনেক সময় এই রোগ তাদের দেহের মধ্যে সুপ্তাবস্থায় থাকে। হঠাৎ কোন অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হলে রোগ আত্মপ্রকাশ করে।

গেঁটে-বাত মধ্যজীবনের রোগ, অর্থাৎ ৩০ থেকে ৫০ বছর বয়স্ক লোকেরা সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত হয়। তবে তরুণেরাও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। যাদের পরিবারে বংশানুক্রমিক গেঁটে-বাতের ইতিহাস আছে—তাদের ছেলেরা অনেকে কিশোর বয়সে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও আছে। পরিসংখ্যানের হিসাবে জানা গেছে যে, স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষেরাই এই রোগে অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হয়।

গেঁটে-বাত কেন হয় তা জানবার জন্যে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। অস্থি-সন্ধি বা গাঁটে সোডিয়াম বাইইউরেট নামে ইউরিক অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন এক জাতীয় লবণ সঞ্চিত হয়ে এই জাতীয় বাত-রোগের সৃষ্টি করে। নানাবিধ পরীক্ষার ফলে স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, ইউরিক অ্যাসিড গেঁটে-বাত সৃষ্টির অন্যতম মূল কারণ। ১৮৪৮ সালে এ. বি. গ্যারোড সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম বহু গেঁটে-বাতগ্রস্ত লোকের রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করে

দেখিয়েছেন যে, তাদের রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ অস্বাভাবিক। আজ এই সিদ্ধান্তকে সহজ বলে মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু এক সময়ে, বিশেষভাবে গ্যারোডের পরীক্ষার আগে এই রোগ-উৎপাদক বস্তুটির কথা চিকিৎসকেরা প্রায় জানতেন না বললেই চলে। কাজেই এই রোগের সঠিক চিকিৎসা সম্ভব হতো না।

স্বাস্থ্যবান লোকের প্রস্রাবের সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিড বের হয়। দেহের মধ্যে দুটি বিভিন্ন ধরণের খাদ্যবস্তু থেকে এই অ্যাসিড তৈরী হয়। মাছ, মাংস, মিষ্টি রুটি, চা, কফি, মদ প্রভৃতি খাদ্য এবং ভাত, রুটি প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ থেকে ইউরিক অ্যাসিড তৈরী হয়ে থাকে।

মাছ, মাংস প্রভৃতি আমিষ খাদ্য এবং চা, কফি প্রভৃতি খাদ্য-তালিকা থেকে বাদ দিলে দেহে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ কমে যায়। আর প্রাণীজ আমিষ জাতীয় খাদ্য একেবারে বন্ধ করে দিলে এই অ্যাসিডের পরিমাণ আরও বেশী হ্রাস পায়। প্রতি ১০০ সি. সি. রক্তে ১ থেকে ৩ মিলিগ্র্যাম পর্যন্ত ইউরিক অ্যাসিড থাকে। ১০ ষ্টোন ৩ পাঃ ওজনের কোন সুস্থ লোকের রক্তে সর্বসমেত ৫০ থেকে ১৫০ মিলিগ্র্যাম ইউরিক অ্যাসিড থাকে।

গেঁটে-বাতগ্রস্ত লোকের রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। রোগ সুরু হবার আগে থেকেই একটু একটু করে এর পরিমাণ বাড়তে থাকে। ইউরিক অ্যাসিড সোডিয়াম বাইইউরেট লবণে পরিণত হয়ে গাঁটে জমা হতে থাকে। সাধারণতঃ কার্টিলেজ হাড়ের উপরে এই লবণের একটা স্তর পড়ে যায়। অপেক্ষাকৃত জটিল ক্ষেত্রে রোগীর হাড় ক্ষয়ে গিয়ে কেবলমাত্র সোডিয়াম বাইইউরেট লবণের শক্ত স্তর পড়ে। এই লবণ ক্রমে ক্রমে লিগামেণ্ট, টেণ্ডন ইত্যাদি ভেদ করে ফেলে।

বাইইউরেট লবণ কার্টিলেজ হাড় এবং কিড্‌নীর মধ্যেও প্রচুর মাত্রায় সঞ্চিত হয়ে থাকে। এর ফলে ইউরেমিয়া নামে কিড্‌নীর এক শক্ত ও প্রাণহানিকর রোগ দেখা দেয়। অবস্থাভেদে গেঁটে-বাতকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা—(১) অ্যাকিউট গাউট, (২) ক্রনিক গাউট, (৩) ইররেগুলার গাউট। এই তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীর গেঁটে-বাত সম্পর্কে আলোচনা করবো।

(১) অ্যাকিউট গাউট—এই শ্রেণীর বাত-রোগের প্রথম আক্রমণ রাত্রি বেলায় হয়। আক্রমণ আকস্মিক এবং তীব্র। তবে প্রথম আক্রমণের বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই রোগী অজীর্ণতা, হাতে ব্যাথা ইত্যাদি উপসর্গের কথা বলে থাকে। মানসিক সুস্থতা ব্যাহত হয়। রাত্রে হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে যায়। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের তলা থেকে যন্ত্রণা সুরু হয়। ধীরে ধীরে জলুনী আরম্ভ হয়ে আঙ্গুলটি কাঁপতে থাকে এবং ক্রমশঃ শক্ত হয়ে যায়। দেহের উত্তাপ বাড়ে। আক্রমণের মুখে উত্তাপ ১০১° ফাঃ থেকে ১০২° ফাঃ পর্যন্ত ওঠে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রোগী ঘামতে থাকে এবং শেষে ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে রোগী দেখতে পায়—আঙ্গুল ফুলে গেছে, সেই স্থানের চামড়া চকচকে লাল হয়েছে, আর সব গাঁটে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। দিনের বেলায় যন্ত্রণার তীব্রতা কম থাকে, কিন্তু রাত হবার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা এবং অস্থিরতা বাড়তে থাকে। তার সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, বিকার, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এই ধরণের অবস্থা বেশ কয়েক দিন থাকতে পারে, আবার দিন দুয়েকের মধ্যে সেরে যেতেও পারে। রোগ কমবার মুখে রোগগ্রস্ত অস্থি-সন্ধির স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে সুরু করলেও ফোলা থাকে। তাছাড়া একটু টিপ্‌লেই ঐ সব জায়গায় গর্ত হয়ে যায়। এই শ্রেণীর বাতরোগে পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে, আর তাহলেই অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। পেটের গোলমাল তীব্রভাবে দেখা দিলে মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়। শরৎ এবং

বসন্ত ঋতু এই শ্রেণীর বাত রোগের আক্রমণ-কাল।

(২) ক্রনিক গাউট—কয়েকবার বাতের আক্রমণ হলে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে অস্থি-সন্ধি সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয় না। অস্থি-সন্ধির লিগামেণ্ট, ক্যাপসুল, কার্টিলেজ এবং হাড়ে সোডিয়াম বাইইউরেট লবণ সঞ্চিত হতে থাকে। এর ফলে স্থানীয় এলাকা ফুলে গিয়ে অনেকটা তোবড়ানোর মত এঁকেবেঁকে যায়। রোগ বৃদ্ধির মুখে বাইইউরেট লবণের স্তরের উপরকার চামড়া ফেটে যায় এবং খড়ির মত সাদা বাইইউরেট লবণ বেরিয়ে আসে। ঐ ঘা সেরে যাওয়া খুব শক্ত। এসব ছাড়াও রোগী অজীর্ণতা, উচ্চ-রক্তচাপ এবং রক্ত-ধমনীর নানাপ্রকার রোগে ভুগতে থাকে।

(৩) ইররেগুলার গাউট—এই শ্রেণীর গেঁটে-বাতের আক্রমণের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। আগেকার দিনে একজিমা, অজীর্ণতা, হৃৎপিণ্ডের অসুস্থতা, মাথাধরা, স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রভৃতি সব কিছুকেই বাতরোগের উপসর্গ বলে মনে করা হতো। গেঁটে-বাতগ্রস্ত রোগীর প্রস্রাবে নানা ধরণের পাথর পাওয়া যেতে পারে। এই রোগ থেকে বহু গুরুতর চক্ষুরোগের সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে গ্লুকোমা একটি। এতক্ষণ গেঁটে-বাতের নানা উপসর্গ নিয়ে আলোচনা করা হলো। এবারে চিকিৎসার কথা সংক্ষেপে বলছি।

চিকিৎসার প্রথম কথা হচ্ছে, পরিমিত এবং সুনির্দিষ্ট আহার গ্রহণ। উচ্চমানের বা প্রথম শ্রেণীর প্রাণীজ আমিষ খাদ্য যতদূর কম খাওয়া যায় ততই মঙ্গল। কারণ আমিষ খাদ্য থেকে ইউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয়। কালোজাম বা ঐ জাতীয় ফল খাওয়া উচিত নয়। কারণ এর মধ্যে অক্সালেট লবণ প্রচুর পরিমাণে থাকায় কিডনীতে অক্সালেট পাথর তৈরী হতে পারে।

রোগীর কোন ধরণের মদ খাওয়া অভ্যাস থাকলে তাকে ঐ অভ্যাস চিরতরে ছাড়তে হবে। খনিজ জল, যেমন—ঝর্ণার জল বা পাহাড়ে এলাকার কূপের জল গেঁটে-বাতের রোগীর পক্ষে খুব উপকারী। উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। এ-প্রসঙ্গে সীতাকুণ্ড, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখযোগ্য।

তীব্র যন্ত্রণার সময় Lotio Plumbi C̄ Opio নামে একজাতীয় তরল ওষুধে তুলা ভিজিয়ে গাঁটের উপর মুড়ে বেঁধে রাখতে হয়। তাছাড়া সে সময় পা অথবা হাত—যেখানকার গাঁটে ব্যথা হয়—সে জায়গা উঁচু বালিশের উপর রাখতে হয়। এ-সময়ে ক্যালোমেল জোলাপ নেবার পর কলসি-চিনের বড়ি খেলে উপকার পাওয়া যায়। এতে ফুলো কমে। যন্ত্রণা কমবার জন্যে এর সঙ্গে Sodium Salicylate এবং অন্যান্য ক্ষারজাতীয় ওষুধ মিশিয়ে মিক্সচার খেতে দেওয়া হয়। এসব ছাড়া আরও বহু চিকিৎসার পদ্ধতি আছে। ইলেকট্রিক-চিকিৎসা পদ্ধতিতে বেশ সুফল পাওয়া গেছে। যাহোক, সর্বক্ষেত্রে রোগ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুচিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে অবিলম্বে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা উচিত। তা না হলে রোগীর নিজের জীবন অকেজো তো হবেই এবং ঐ সঙ্গে একজন থেকে 'বেতো রোগীর বংশ' সৃষ্টি হয়ে সন্তান-সন্ততিদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলবে।

উদ্ভিদ-রোগে রাসায়নিক চিকিৎসা

শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী

মানুষ ও পশুপাখীর দেহে যেমন নানাপ্রকার ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি আণুবীক্ষণিক জীব আশ্রয় গ্রহণ করে' রোগ সৃষ্টি করে, উদ্ভিদ-দেহও সেরূপ বিভিন্ন জীবাণুর আশ্রয় গ্রহণের ফলে বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। তবে অধিকাংশ সংক্রামক ব্যাধির জন্যে দায়ী বোধ হয় ছত্রাক। ছত্রাক-ঘটিত রোগের আক্রমণে বিভিন্ন শস্যের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণীত না হলেও নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভিদ-রোগের ফলে আয়ার্ল্যাণ্ডের আলুর দুর্ভিক্ষ বর্তমান যুগের একটি স্মরণীয় ঘটনা। ১৮৪৫ সালের গ্রীষ্মকাল অত্যন্ত স্যাঁতসেতে ও ঠাণ্ডা হওয়ায় আলুতে একপ্রকার ছত্রাকজনিত রোগ দেখা দেয়। পরবর্তী বছরে রোগাক্রান্ত আলুর বীজ বপন করায় ফসল পুরাপুরি নষ্ট হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ লোকের একমাত্র খাদ্য বিনষ্ট হওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং মোট ৮ লক্ষ দেশবাসীর মধ্যে এক লক্ষ অনাহারে ও রোগে মারা যায়। এমন কি, আজকালও কৃষিতে উন্নত বিভিন্ন দেশে ছত্রাক ইত্যাদির আক্রমণে শতকরা দশভাগ শস্য বিনষ্ট হয়। অনগ্রসর দেশের পক্ষে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশী।

ভারতবর্ষে গমের রাষ্ট্ রোগে বার্ষিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪৯০ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সালের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের আংশিক কারণ হলো ধানের Helmenthosporium রোগ।

বর্তমানে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে এবং ক্রমবর্ধমান খাদ্য-সমস্যা সমাধানে উদ্ভিদের রোগ-নিয়ন্ত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। শস্যাবর্তন, রোগ-বীজাণুমুক্ত বীজ বপন প্রভৃতি ছত্রাকজনিত শস্যক্ষতি নিবারণের উপায়। আবার উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা ছত্রাকের আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম নতুন জাতের গাছপালা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন এবং একাজে অনেকটা সাফল্যও লাভ করেছেন। তবে এই সব রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো দীর্ঘ স্থায়ী হয় না।

ছত্রাক-ঘটিত রোগ নিয়ন্ত্রণে বীজ, জমি অথবা উদ্ভিদে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগই বোধ হয় প্রকৃষ্ট পন্থা। সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্যে পাতায় 'স্প্রে' করে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ছত্রাক-ঘটিত রোগে উদ্ভিদ-তন্তুর বিনাশের প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলিকে সাধারণতঃ দু-ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর বিনাশের প্রকৃতি স্থানীয়, অর্থাৎ সংক্রমণ ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়। অপর শ্রেণীর ধ্বংসাত্মক শক্তি সংক্রামিত স্থান থেকে দূরে প্রকাশ পায়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে 'স্প্রে' প্রভৃতির দ্বারা ছত্রাকের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ছত্রাক উদ্ভিদের কলাতন্ত্রের গভীরে প্রবেশ করে; সে জন্যে 'স্প্রে' করে এদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে উদ্ভিদকে ছত্রাক সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে, এরূপ ছত্রাক-নাশক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয় এবং ছত্রাকের বীজরেণু বা স্পোর পাতায় সংক্রামিত হওয়ার পূর্বেই এগুলি ব্যবহার করা দরকার। তবে দেখতে হবে, এই সব ছত্রাক-নাশক দ্রব্যাদি যেন উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়।

বৈষম্যমূলক গুণসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার সহজসাধ্য নয়; কারণ এতে যে সব ছত্রাক বিনষ্ট হবে, তারাও একপ্রকার উদ্ভিদ। তবে তফাৎ এই যে, তারা পরজীবী হিসাবে অন্য

উদ্ভিদের উপর জন্মায়। এসব অসুবিধা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি বৈষম্যমূলক ছত্রাক-নাশক দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং উদ্ভিদের উপর সামান্য বিষক্রিয়া থাকলেও ছত্রাক-রোগ দমনে এদের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। বৈষম্যমূলক ছত্রাক-নাশক হিসাবে তুঁতে ও চুন থেকে তৈরী বোর্দ্ মিক্‌চারের নাম উল্লেখযোগ্য। আলুর ব্লাইট রোগ, আপেলের স্ক্যাব রোগ, আঙ্গুরের ডাউনি মিলডিউ রোগ ও অন্যান্য অনেক রোগ দমনে সাফল্যের সঙ্গে এর ব্যবহার হচ্ছে।

কিন্তু এ-প্রকার ছত্রাক-নাশকও ভাস্‌কিউলার কলাতন্ত্রের ছত্রাক-আক্রমণ ও মৃত্তিকাজাত ছত্রাক-আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে না। আবার এসব ছত্রাক-নাশক ব্যবহারে উদ্ভিদের পাতা ইত্যাদি যেসব অংশের উপর তা স্প্রে করা হয়েছে, কেবল মাত্র সে সব অংশই রোগাক্রমণ থেকে রেহাই পায়; অন্যান্য অংশ এবং যা থেকে জলসিঞ্চন ইত্যাদি দ্বারা রাসায়নিক পদার্থ অপসারিত হয়েছে, তা সহজেই ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এসব অসুবিধা দূর করবার জন্যে এমন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা দরকার, যা উদ্ভিদের কলাতন্ত্রের মধ্যে থেকে ছত্রাক-সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে।

প্রকৃত প্রস্তাবে উদ্ভিদের রাসায়নিক চিকিৎসার বিষয় নতুন কিছু নয়। প্রায় ৩০ বছর আগে লেখা Müller-এর Die-innere Therapic der Pflanzen বইতে এ-রকম অনেক পরীক্ষার কথা লেখা আছে। তবে রাসায়নিক চিকিৎসার দ্বারা উদ্ভিদ-রোগ উপশমের কোন প্রকৃষ্ট পন্থা আজও আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু সালফা ওষুধসমূহ ও নানাপ্রকার অ্যান্টিবায়োটিক্স মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর চিকিৎসায় যুগান্তর এনেছে। জীব-জন্তুর সঙ্গে উদ্ভিদের একটা বড় প্রভেদ হচ্ছে—তাদের জীবদেহের মত রক্ত-সঞ্চালন প্রক্রিয়া নেই। এজন্যে মূল অথবা পাতায় কোন রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করলে, তা উদ্ভিদের সর্বদেহে ছড়িয়ে পড়তে অনেকটা সময় লাগে। এই অসুবিধা সত্ত্বেও রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে উদ্ভিদের রোগ-নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে এবং এ-উদ্দেশ্যে অনেক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এভাবে উদ্ভিদ-রোগের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখনও সম্ভব হয় নি।

সিস্‌টেমিক ছত্রাক-নাশক হিসাবে অনেক রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে উদ্ভিদ-হর্মোন জাতীয় পদার্থও ব্যবহৃত হয়েছে। এদের মধ্যে ২-৪ ডাই-ক্লোরোফেনক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড অথবা সংক্ষেপে ২-৪ ডি, খুব অল্পমাত্রায় উদ্ভিদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কিন্তু সিস্‌টেমিক ছত্রাক-নাশক হিসাবে এর বিশেষ কোন মূল্য নেই।

সিস্‌টেমিক ছত্রাক-নাশক নিয়ে পরীক্ষায় শিম ও টমেটো চারার শিকড়ে ৫-১৪ দিন পর্যন্ত খুব সামান্য পরিমাণে এই সব বস্তু প্রয়োগ করবার পর সেগুলিকে রোগ-উৎপাদনকারী ছত্রাকের সম্মুখে অনাবৃত রাখা হয়েছে। পরে পরীক্ষাধীন ও সাধারণ গাছের পাতার ছত্রাক-আক্রান্ত স্থানের সংখ্যা গণনা করে দেখা গেছে যে, কয়েক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ফলে পরীক্ষাধীন গাছে সাধারণ গাছের তুলনায় ছত্রাক-আক্রান্ত স্থানের সংখ্যা খুবই কম। আল্‌ফা প্রোপিয়নিক অ্যাসিড ব্যবহারের ফলে পরীক্ষাধীন গাছে সাধারণ গাছের তুলনায় ছত্রাক-আক্রান্ত স্থানের সংখ্যা শতকরা ৩৩ ভাগ কম দেখা গেছে।

এসব রাসায়নিক পদার্থ যদি উদ্ভিদের কলাতন্ত্রে ছত্রাক-নাশক হিসাবে কাজ করে থাকে, তবে প্রত্যক্ষ ছত্রাক-নাশক হিসাবেও সেগুলি কার্যকরী হবে। কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষিত ফল থেকে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে আসা যায় না। মনে হয়, উদ্ভিদের কলাতন্ত্রে এন্‌জাইমের ক্রিয়ার ফলে এসব রাসায়নিক থেকে ছত্রাক-নাশক পদার্থ উৎপন্ন হয়ে থাকে, অথবা এসব রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভিদের বৃদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করায় উদ্ভিদ রোগ-

প্রতিষেধক ক্ষমতা লাভ করে। কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভিদ-কলাতন্ত্রের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন সাধন করতে পারে এবং হয়তো বা এদের সান্নিধ্যে কোষের সাইটোপ্লাজমের প্রোটিনেরও আংশিক পরিবর্তন ঘটে। এই প্রোটিনের সামান্য পরিবর্তন সম্ভবতঃ উদ্ভিদের ছত্রাক-আক্রমণ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, উদ্ভিদের শিকড়ে কোন রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করবার ফলে যখন ছত্রাক-আক্রমণ প্রতিরোধক ক্ষমতা জন্মায়, তা উক্ত রাসায়নিকের প্রত্যক্ষ কার্যের ফল নাও হতে পারে। আবার কিছু সংখ্যক জৈব অণু উদ্ভিদের কলাতন্ত্রে সহজে পরিবাহিত হতে পারে এবং এদের সিস্টেমিক ছত্রাক-নাশক ক্ষমতাও দেখা যায়। Penicillium girseofulvum থেকে তৈরী girseoful vin নামক অ্যান্টিবায়োটিক এ-রকমের একটি পদার্থ।

বিভিন্ন রাসায়নিকের ছত্রাক-নাশক গুণাবলী নিয়ে গবেষণাগারেও নানাপ্রকার পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষায় ঐ সব রাসায়নিক পদার্থগুলি বিভিন্ন মাত্রায় অ্যাগারখণ্ডের উপর রেখে তা টমেটো পাতার বোঁটায় রাখা হয়েছে। এই বোঁটা aspergilus স্পোর দ্বারা সংক্রামিত অ্যাগার প্লেটে রাখা হয়। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে দেখা গেছে যে, টমেটোর বোঁটার চারদিকে ছত্রাকের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে। এ থেকে ঐ স্থানে উক্ত রাসায়নিকের সিস্টেমিক ছত্রাক-নাশক গুণ প্রকাশ পায়। অ্যাগার প্লেটে সরাসরিভাবে রাসায়নিক পদার্থ সমন্বিত অ্যাগারখণ্ড স্থাপনে উক্ত রাসায়নিকের প্রত্যক্ষ ছত্রাক-নাশক ক্ষমতার কথা জানতে পারা যায়। উপরিউক্ত পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, বিভিন্ন রাসায়নিকের সিস্টেমিক ছত্রাক-নাশক গুণাবলী প্রত্যক্ষ ছত্রাক-নাশক গুণাবলী থেকে বেশী। অবশ্য এর বিপরীত ফলও কোন কোন ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। এ থেকে মনে হয়, ঐ সব রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভিদ-দেহে অধিক ছত্রাক-নাশক ক্ষমতা-সম্পন্ন রাসায়নিকে পরিবর্তিত হয়।

এখানে উদ্ভিদের স্বাভাবিক রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতার কথা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উদ্ভিদ-রোগ সৃষ্টিতে বিভিন্ন ছত্রাকের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কোন ছত্রাক হয়তো একটি নির্দিষ্ট উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি করতে পারে, আবার কোন ছত্রাক হয়তো নানাপ্রকার উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। প্রকৃতিতে বিভিন্ন উদ্ভিদে যে রোগাক্রমণ প্রতিরোধক ক্ষমতা দেখা যায়, তা অধিকাংশ ছত্রাক ইত্যাদির আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে।

এসব প্রতিরোধ কোন কোন সময় উদ্ভিদের অঙ্গসাংস্থানিক অভিযোজনের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে; যেমন—পাতার উপরের মোমের আবরণ অথবা রোম। কোন কোন স্থলে আক্রমণকারী ছত্রাক-নিঃসৃত এনজাইম দ্বারা আশ্রিত গাছের সেলুলোজ অথবা পেক্টিনের বিনাশের ফলে ছত্রাক-সংক্রমণের পথ প্রশস্ত হয়। কোন কোন স্থলে ছত্রাক-আক্রমণের বিরুদ্ধে উদ্ভিদ-তন্তুতে একপ্রকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা সৃষ্ট হতে দেখা যায়। ছত্রাক-আক্রান্ত স্থান ঘিরে একটি অপ্রবেশ্য প্রাচীরের সৃষ্টি হয়। আবার উদ্ভিদে বিশেষ রাসায়নিকের উপস্থিতির উপরও স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্ভর করে। কয়েক প্রকার পরজীবী ছত্রাক আশ্রয়দাতা উদ্ভিদে বিশেষ প্রকার পুষ্টিকর দ্রব্যের অভাবে বাড়তে পারে না।

উদ্ভিদের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্যে কোষাভ্যন্তরস্থ রাসায়নিক পদার্থও কাজ করে থাকে। জীবদেহের কোষ প্রোটোপ্লাজম দ্বারা পূর্ণ থাকে। উদ্ভিদ-কোষের মধ্যস্থলে থাকে ভ্যাকুয়োল এবং তাতে থাকে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রবণ। এ-সব রাসায়নিক-দ্রবণ ছত্রাক আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে।

উদ্ভিদের রাসায়নিক প্রতিরোধ-ক্ষমতার মধ্যে

পেঁয়াজের smudge প্রতিরোধক্ষম Protocatecnuic acid, বিভিন্ন গমের রাষ্ট্ প্রতিষেধক ফেনোলিক পদার্থ, ফ্লাক্স-এর ফিউজেরিয়াম, উইল্ট প্রতিষেধক linamarine প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। আবার রাই, ভূট্টা ও গম থেকে বিভিন্ন ছত্রাক-নাশক পদার্থ পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি শিমের কাণ্ড ও শিকড়ে ছত্রাক-নাশক গুণসম্পন্ন একটি রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ-থেকে মনে হয়, উদ্ভিদের রোগ-প্রতিষেধতক্ষমতা তার দেহস্থিত রাসায়নিক পদার্থের জন্যেই হয়ে থাকে। শিমে আবিষ্কৃত অ্যান্টিবায়োটিক পৃথক করা সম্ভব হলে তা অন্য উদ্ভিদে ছত্রাক-নাশক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

এসব ছাড়া রাসায়নিক চিকিৎসার দ্বারা উদ্ভিদের রোগ নিরাময়ে ভবিষ্যতে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হবে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গবেষণাগারে যে সব গবেষণা চলছে তা থেকে ভবিষ্যতে উদ্ভিদ-রোগ নিরাময়ের সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করা যায়।

জেনেটিক্সের জন্ম

শ্রীঅরুণপ্রকাশ চৌধুরী

১৮৩২ সালের কথা।

অষ্ট্রিয়ার ছোট্ট একটি গ্রামের দরিদ্র চাষী তার ফলের বাগানে বসে গাছের কলম তৈরী করছিলেন। পাশেই ছিল তার দশ বছরের বালক পুত্র।

ছেলে জিজ্ঞেস করলো—বাবা, এক্ষুণি তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে, আমরা বেশীক্ষণ কাজ করতে পারবো না। আরও আগে কাজ আরম্ভ করলে না কেন?

বাবা উত্তর দিলেন—সে আমার অদৃষ্ট; যে চাষীকে জমিদারের ক্ষেতে কাজ করতে হয়, তার নিজের কাজ করবার সময় কোথায়?

ছেলে আবার প্রশ্ন করলো—কেন তোমাকে জমিদারের ক্ষেতে কাজ করতে হয় বাবা? ওদের ক্ষেতের ফসল তো তুমি পাও না!

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাবা উত্তর দেন—কেন, তা তো বলতে পারি নে, তবে এ-ভাবেই বছরের পর বছর চলে এসেছে এবং তা-ই চলবে। তুমি বড় হয়ে উঠলে হয়তো তোমাদের সময় আর এভাবে খাটতে হবে না। যাক-গে, এখন এক কাজ কর দেখি—আজ আপেলের যে জোড়গুলি এনে রেখেছি, সেগুলি নিয়ে এসো তো। আমাদের ঐ বড় আপেল গাছটায় ভাল ফল ধরছে না। ঐ ভাল জাতের জোড়গুলি দিয়ে আপেল গাছটায় কলম বাঁধতে হবে।

ছেলে জোড়গুলি এনে দিয়ে বললো—জান বাবা, আজ স্কুলে আমাদের মাষ্টার মশাই বললেন যে, ভাল জাতের জোড় দিয়ে যদি খুব খারাপ গাছের উপরে কলম বেঁধে দেওয়া হয়, তাহলেও ঐ জোড় থেকে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। এটা কি করে হয়, তা ঠিক বুঝতে পারলুম না।

আমিও ঠিক বুঝি নি, কিন্তু এটা খুবই খাঁটি কথা। গাছ যেখান থেকেই তার খাদ্য আহরণ করুক না কেন, তার জাত যদি ভাল হয়, তাহলে ভাল ফল পাওয়া যাবেই। মানুষের বেলায়ও তাই। বাপ-মা যদি ভাল হন তবে তাদের অবস্থা ভাল না হলেও, ছেলে ভাল হবে-ই।

এরপর বহুদিন কেটে গেল, কিন্তু ঐ কথা কয়টি ছেলেটির মনে গেঁথে রইলো।

১৯ বছর পরে দেখা গেল, ঐ বালকই অষ্ট্রিয়ার ব্রীণ (আধুনিক Brno, চেকোশ্লোভাকিয়া) শহরের অগাষ্টিনিয়ান গির্জার ফাদার গ্রেগর মেণ্ডেল নামে পরিচিত হয়েছেন। দয়ায়, দাক্ষিণ্যে সাধারণ লোকের কাছে তিনি পরম শ্রদ্ধার পাত্র। সত্যিকার মানবদরদীর মত, যীশু-খৃষ্টের খাঁটি শিষ্যের মত তিনি কেবল খৃষ্টধর্ম প্রচারই করেন নি, নিজের জীবনে তা পালনও উত্তর খুঁজছিলেন। তপস্বীর মতই মেণ্ডেল তখন এক নতুন জগতে ডুবে গেলেন। ব্রীণ পলিটেক্‌-নিক্যাল ইনষ্টিটিউটের তরুণ অধ্যাপক গুষ্টাফ ফন্‌ নীস্‌ল্‌ ফাদার মেণ্ডেলের ঐ নতুন জগতের সন্ধান পেয়ে একদিন তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং ব্রীণ সোসাইটি অব ন্যাচার‍্যাল সায়েন্স প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বহুক্ষণ ধরে দু-জনে অনেক আলাপ-আলোচনা করেন। কথা প্রসঙ্গে চার্লস্‌ ডারউইনের বিবর্তন-বাদ নিয়ে আলোচনা উঠলো। ডারউইনের বিবর্তন-বাদ নিয়ে তখন তুমুল হৈচৈ

গ্রেগর মেণ্ডেল

করেছেন। ১৮৫১ সালে মঠের কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে মেণ্ডেলকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্যে পাঠান। দু-বছর পরে তিনি বিজ্ঞান-শিক্ষক হিসেবে ব্রীণ শহরে ফিরে আসেন। ক্যাথলিক ধর্মযাজক এবং শিক্ষক-জীবনের বাইরে সবার অগোচরে তিনি তখন ধীরে ধীরে জীব-বিজ্ঞানের এক অজ্ঞাত জগতে প্রবেশ করছিলেন। বহু রকমের মটরশুঁটি সংগ্রহ করে গির্জার প্রাঙ্গণে ছোট্ট একটি বাগানে সেগুলি লাগিয়ে মেণ্ডেল তাঁর বাল্যকালের সেই প্রশ্নের সুরু হয়েছে। ডারউইনের মতবাদের মূলকথা হলো—(১) প্রকৃতির সর্বত্রই সৃষ্টির বৈচিত্র্য বিরাজমান, (২) প্রকৃতিতে যখন সৃষ্টির অতি-বৃদ্ধি দেখা দেয়, তখনই সুরু হয় জীবন-সংগ্রাম এবং এই জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমেরা টিঁকে থাকে, দুর্বলেরা নির্মূল হয়ে যায়, (৩) এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের সঙ্গে আর এক ধরণের সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ফলে (যাকে mutation বা পরিব্যক্তি বলা হয়) প্রজাতির উৎপত্তি ঘটে। এ-সম্পর্কে মেণ্ডেলের মতবাদ শুনে নীস্‌ল্‌ আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান। মেণ্ডেলের

মতে, সৃষ্টির গোড়ায় ও প্রজাতির উৎপত্তির মূলে রয়েছে স্বাভাবিক বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির প্রক্রিয়া, প্রাকৃতিক নির্বাচন নয়। ডারউইনের মত জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তির মতবাদের প্রতি অখ্যাত মেণ্ডেলের মতবাদের এই চ্যালেঞ্জে নীসল্ প্রতিবাদ না করে পারলেন না। আত্মগতভাবে মেণ্ডেল বললেন—জানি না আমি ভ্রান্ত কিনা। হয়তো আমার সন্তানেরাই একদিন এই সত্যানুসন্ধানের প্রকৃত উত্তর দেবে। একজন অকৃতদার ক্যাথলিক ধর্মযাজকের মুখ থেকে এই কথা শুনে নীসল্ স্তম্ভিত হলেন। মৃদু হাস্যে ফাদার গ্রেগর দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—আমার সঙ্গে আসুন।

ফাদার গ্রেগরকে অনুসরণ করে নীসল্ গির্জার প্রাঙ্গণে রৌদ্রোদ্ভাসিত ছোট্ট একটি বাগানে এসে দাঁড়ালেন। ঐ বাগানের মটরশুঁটির গাছগুলিকে দেখিয়ে মেণ্ডেল সহাস্যে বললেন—এরাই সব আমার শিশুপুত্র! এদের বিভিন্ন জাতের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে মিলন ঘটিয়ে বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করে আমি নতুন জাত সৃষ্টির চেষ্টা করছি। অনাদিকাল থেকেই প্রকৃতিতেও এই প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই চলে আসছে। আমার বিশ্বাস, সৃষ্টির এই দাবাখেলার উপরেই পরবর্তী বংশের ইতিবৃত্ত রচিত হচ্ছে এবং এরই ফলে সৃষ্টির বিবর্তন ঘটছে।

অধিকতর বিস্ময়ে নীসল্ বললেন—সে কি! আপনি ক্যাথলিক ধর্মযাজক হয়ে জন্মান্তরবাদের কথা বলছেন?

অবিচলভাবে মেণ্ডেল উত্তর দিলেন—যা সত্য তা প্রকাশ করাকে আমি পাপ বলে মনে করি না।

১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রোণ সোসাইটি অব ন্যাচার্যাল সায়েন্সের প্রায় ৪০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সাধারণ এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ফাদার গ্রেগর জোহান মেণ্ডেল উদ্ভিদের বর্ণসঙ্কর সমীক্ষা নামক গবেষণামূলক এক প্রবন্ধে তাঁর আট বছর ব্যাপী সুদীর্ঘ সাধনার ফল প্রকাশ করেন। বংশগতির ধারাকে সুনির্দিষ্ট গাণিতিক ভিত্তিতে প্রকাশ করতে দেখে সমবেত সকলেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে যান। সোসাইটির পরবর্তী (মার্চ) অধিবেশনে ফাদার মেণ্ডেল তাঁর পূর্ববর্তী বক্তৃতার বিস্তৃততর গাণিতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। গণিতের জন্যেই হোক বা নতুন ধরণের মতবাদের জন্যেই হোক, শ্রোতারা সসম্মানে শোনলেন বটে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কেউ কোনও রকম আলোচনা বা প্রশ্নাদি করে এ-সম্বন্ধে কোন রকম ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন না। কিছুদিন পরে তিনি তাঁর পূর্বতন শিক্ষক ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্ল ন্যাগেলির কাছে ঐ প্রবন্ধটি পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে পাঠালেন। কিন্তু তিনি তখন অন্য সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, তাই তাঁর ছাত্রের গবেষণার মর্ম তিনিও উপলব্ধি করতে পারেন নি।

এরপর মেণ্ডেল তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বের নির্ভুলতা যাচাই করবার জন্যে অন্যান্য উদ্ভিদ এবং মৌমাছি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু গির্জার শাসনতান্ত্রিক কাজে ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়বার ফলে সেদিকে আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর তিনি গির্জার উপর রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ১৮৮৩ সালে এই নিরলস সত্যানুসন্ধানী ধর্মযাজক ফাদার মেণ্ডেল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই অগাষ্টিনিয়ান গির্জারই এক প্রান্তে অনাড়ম্বরে তাঁর নশ্বর দেহ সমাধিস্থ হলো। কোনও জ্ঞানী-গুণী কিংবা ভি-আই-পি তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত হন নি। উপস্থিত ছিল শুধু সেই মূক দরিদ্র জনগণ, যারা তাঁকে আত্মার পরমাত্মীয় বলে শ্রদ্ধা করতো এবং প্রভু যীশুখৃষ্টের সেবায় যারা তাঁকে একনিষ্ঠ ও অবিচল দেখে এসেছে। কিন্তু কি এক প্রতিভাধর সেদিন জগৎ থেকে বিদায় নিলেন, তা কেউই তখন জানতে পারে নি!

আরও ষোল বছর পরে, ১৯০০ সালে জগৎ এই সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান পেল। তিনটি বিভিন্ন দেশের তিনজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী নিজেদের চেষ্টায় অনেক খোঁজাখুঁজির পর ব্রীণ সোসাইটির পুরাতন কাগজপত্র ঘেঁটে মেণ্ডেলের সেই অপূর্ব গবেষণার বিষয় আবিষ্কার করেন এবং বিজ্ঞানীদের জানালেন। এঁরা হলেন,—হল্যাণ্ডের ডি ভ্রীজ, অষ্ট্রিয়ার শারমাক এবং জার্মেনীর করেন্‌স্। মেণ্ডেলের গবেষণালব্ধ ফল ও সেই প্রবন্ধটি তখন তাবৎ সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সকলেই গ্রেগর জোহান মেণ্ডেলকে এই নতুন শাস্ত্র জেনেটিক্সের জনক বলে স্বীকার করে পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন।

জেনটিক্সের মূল উপজীব্য হচ্ছে, বংশগতি এবং পিতাপুত্রের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্পর্কিত জ্ঞান। বংশগতির ধারা অনুসরণ ও উপলব্ধির জন্যে মেণ্ডেল খুবই সরল এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। সাঙ্ঘাতিক রকমের একটা কিছু করে হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি দিয়ে জগৎকে চম্‌কে দেবার চেষ্টা তিনি আদৌ করেন নি। তখনকার বেশীর ভাগ বৈজ্ঞানিকই ডারউইনের বিবর্তন বাদের প্রথম ধাক্কা সামলাতে ব্যস্ত ছিলেন। যাঁরা উদ্ভিদের বর্ণসঙ্কর উৎপাদনে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের লক্ষ্য ছিল—সাধারণ আলুকে বৃহদাকারের আলু, সাধারণ প্লামকে বৃহদাকারের প্লাম, কণ্টকাকীর্ণ ক্যাক্‌টাসকে কণ্টক-বিহীন বা ঐ ধরণের আরও কিছু করবার দিকে। এই রকম অবস্থার মধ্যে একনিষ্ঠভাবে গির্জা-প্রাঙ্গণের নিভৃত উদ্যানে মেণ্ডেল ক্রমান্বয়ে আট বছর ধরে বিভিন্ন জাতের মটরশুঁটির মধ্যে মিলন ঘটিয়ে বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করেছেন, অসীম ধৈর্যে প্রতিটি গাছের হিসেব রেখেছেন এবং বিভিন্ন জাতের লক্ষণগুলি কিভাবে বংশ-পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়, তাই এক এক করে লক্ষ্য করেছেন। আপাততঃ এটুকু বলে রাখি, মেণ্ডেলের পরীক্ষায় নির্ভুলভাবে দেখা গেল যে, উদ্ভিদ-জগতের কোনও জাতের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি (যেমন বীজের আকার, প্রথম পাতার রং, ফুলের রং ইত্যাদি) প্রকট কিংবা প্রচ্ছন্ন থাকে। বর্ণসঙ্কর উৎপাদনে করে ঐ লক্ষণগুলিকে অবিকৃত অবস্থায় বিচ্ছিন্ন বা বিশ্লিষ্ট করা যেতে পারে এবং এই বিশ্লেষণ-কার্য এক সুনির্দিষ্ট গাণিতিক নিয়মে ঘটে থাকে। আবার এই বর্ণসঙ্কর উৎপাদনের দ্বারাই বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন লক্ষণগুলিকে এক জাতের মধ্যে সঞ্চারিত করা যেতে পারে। জেনেটিক্সের এই মূল নীতিকে ভিত্তি করে গত ষাট বছরে জীববিদ্যা, বিশেষতঃ উদ্ভিদ ও পশু-প্রজনন পদ্ধতি অনেক এগিয়ে গেছে। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার তুলনায় জেনেটিক্স শাস্ত্র বয়সে নিতান্তই শিশু, কিন্তু এর প্রয়োগ পদ্ধতি ও ব্যবহারিক উপযোগিতার কথা বিচার করলে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই শাস্ত্র তার শৈশব অতিক্রম করে গেছে। দুনিয়ার ক্রমবর্ধমান জনগণের মুখে ক্ষুধায় অন্ন তুলে দিতে হলে এরই সহায়তায় উদ্ভিদ-প্রজনন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং এরই ব্যাপক ও সুষ্ঠু প্রয়োগের দ্বারা আমাদের প্রয়োজনকে নিয়মিত করতে হবে।

মেণ্ডেল তাঁর সুদীর্ঘ গবেষণার ফল অনাদৃত দেখে জীবন-সায়াহ্নে গভীর হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেও তিনি আশা করেছিলেন—Meine Zeit wird schon Kommen—অর্থাৎ নিশ্চয় আমার সুদিন শীঘ্রই আসবে। সত্যদ্রষ্টা এই সাধকের আশা নিষ্ফল হয় নি। আজ জীববিদ্যার এক বৃহৎ অংশ মেণ্ডেলের আবিষ্কৃত তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। মেণ্ডেলের মানস-কন্যা জেনেটিক্সে মৌলিক অবদানের জন্যে তিনজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক ১৯৫৮ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এঁরা হলেন, ডাঃ জর্জ বীড্‌ল্‌, ডাঃ এড্‌ওয়ার্ড ট্যাটাম্ এবং ডাঃ জে. লীডারবার্গ। ১৮৮৪ সালের অনাদৃত জেনেটিক্স শাস্ত্র আজ অগ্রগতির উন্নত সোপানে আরোহণ করেছে।

ভিটামিন-আধিক্য

শ্রীসতী রায়

ভিটামিন কি—সে কথা আজ প্রায় সবাই জানে! প্রচুর পরিমাণে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করা সত্ত্বেও এই ভিটামিন, অর্থাৎ খাদ্যপ্রাণের অভাবে শারীরিক সুস্থতা ব্যাহত হয়—এ কথা আজ কারো অজানা নেই। শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্যে ভিটামিন অপরিহার্য মনে করে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন গ্রহণ করবারও কোন সার্থকতা নেই। তাছাড়া কোন কিছুরই আতিশয্য ভাল নয়। বাংলা প্রবাদে আছে—অতি বাড় বেড়োনা ঝড়ে পড়ে যাবে, অতি ছোট হয়ো না ছাগলে মুড়াবে। এই প্রবাদটি সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ। অত্যধিক মাত্রায় কোন কোন ভিটামিন গ্রহণে উপকারের পরিবর্তে অপকারই ঘটে থাকে। ভিটামিনের অভাব যেমন স্বাস্থ্য নষ্ট করে, ভিটামিনের আধিক্যও তেমনি শরীরের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভিটামিনের আধিক্য হলে যে লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, ভিটামিনের অভাবজনিত লক্ষণগুলি তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ভিটামিন-এ—বাড়ন্ত প্রাণীকে বারবার বেশী পরিমাণে ভিটামিন-এ ব্যবহার করিয়ে তার ফলাফল নিরূপণ করা হয়েছে। এভাবে পরীক্ষিত ইঁদুরের দেহের অস্থিসমূহ ভঙ্গপ্রবণ হয়ে পড়ে। উলবার মনে করেন যে, এর ফলে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির গতি অনেক দ্রুততর হয় এবং দশ-পনেরো দিনের মধ্যে এক বছরের মত বৃদ্ধি সম্ভব হতে পারে। এর ফলে স্কার্ভির মত রক্তক্ষরণ, অস্থির-বহিরাংশের বৃদ্ধি, অস্থি ফেঁপে যাওয়া, পেশীর দৌর্বল্য ও ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়। বেশী দিন ধরে অতি মাত্রায় ভিটামিন ব্যবহারে গা-বমি, চক্ষুরোগ, ছাল উঠা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

ভিটামিন-এ-আধিক্য দু রকমের—(১) একিউট ও (২) ক্রনিক। (১) অধিক মাত্রায় ভিটামিন-এ ব্যবহারে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে একিউট ভিটামিন-আধিক্যের আবির্ভাব ঘটে। এতে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে নিম্নাংশ অবশ হয়ে যায়। শরীরের পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। লোহিত কণিকার স্বল্পতার জন্যে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী থেকে রক্তপাত হয় এবং তার ফলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

(২) ক্রনিক। একিউট ভিটামিন-এ-আধিক্যে যে মাত্রা ব্যবহার করা হয় তার চেয়ে কম ভিটামিন-এ দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহারের ফলে ক্রনিক ভিটামিন-এ-আধিক্যের সৃষ্টি হয়। এতে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

শরীরের ঠিকমত বৃদ্ধি হয় না এবং ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়। এর ফলে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে অনিচ্ছা এবং শেষে রক্তাল্পতা ঘটে। চর্মের লোম উঠে যায়। শরীরের কোন স্থানে খুব বেশী পরিমাণে ভিটামিন-এ প্রয়োগ করলে সে স্থানের লোম বা চুল উঠে যায়। যে তন্তু দিয়ে শিং প্রভৃতি তৈরী হয় তাদের মধ্যে স্নেহজাতীয় পদার্থের অভাব ও অশক্ত কোষের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়ে এই ভিটামিন-আধিক্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে। অনেকটা রিকেটগ্রস্তদের মত অস্থিগুলি ভঙ্গপ্রবণ হয়ে পড়ে। এতে অস্টিওব্লাস্ট সেলের কর্মক্ষমতা কমে যায়, নয় তো দন্ত-গহ্বরে ক্যালসিয়াম জমা হয়। ওডোনটো-ব্লাস্ট ভেঙ্গে যায়, দাঁতের আকৃতি পরিবর্তিত হয় এবং ডেন্টিনের অংশ ক্ষয়ে যায়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ছিঁড়ে গিয়ে রক্তপাত হয়ে থাকে।

পরীক্ষাকল্পে যে সব প্রাণী ব্যবহার করা হয়,

তাদের মধ্যে ভিটামিন-এ-আধিক্যের ফলে আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ দেখা দেয়। এর ফলে বয়স্ক প্রাণীদের মধ্যে চামড়ার নীচে ও মাংসপেশীর মধ্যে রক্তক্ষরণ এবং অল্পবয়স্ক প্রাণীদের মধ্যে সাধারণতঃ অস্থিভঙ্গ দেখা যায়। ভিটামিন-এ-আধিক্যের জন্যে প্রোথ্রম্বীন-কাল বর্ধিত হয়। যকৃতের রেটিকিউলো-এণ্ডোথিলিয়্যাল বা কুকার সেলের মধ্যে স্নেহজাতীয় পদার্থ জমা হয়। রক্তপাতের ফলে রক্তাল্পতা—এরিথ্রোব্লাষ্টিক রক্তাল্পতা দেখা দেয়। শিশুদের মধ্যে এই ক্রনিক ভিটামিন-এ-আধিক্যের ফলে রক্তরসে ভিটামিন-এ ও ফস্‌ফেটেজ জারকের পরিমাণ বেড়ে যায়। পরিণত বয়স্ক লোকেরা যদি প্রত্যহ ছয় লাখ আন্তর্জাতিক ইউনিট গ্রহণ করে, তাহলে ভিটামিন-এ-আধিক্য দেখা দেয়।

গলগ্রন্থির কর্মক্ষমতা যখন ব্যাহত হয় তখন ভিটামিন-এ-আধিক্যের উৎপত্তি হয়। তখন পিটুইটারী থেকে থাইরয়েড উত্তেজক হর্মোন নিঃসরণের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং গলগ্রন্থির ওজন কমে যায়। এই গ্রন্থির প্রোটিনযুক্ত আয়োডিনের পরিমাণও হ্রাস পায়।

থিয়ামিন বা ভিটামিন বি-১—অধিক পরিমাণে থিয়ামিন দেওয়া হলে প্রাণীর শরীরে থাইরোটক্সিকোসিস্-এর মত লক্ষণ প্রকাশ পায়; যেমন—স্নায়বিক দুর্বলতা, ট্যাকিকার্ডিয়া, প্রভূত ঘাম, অবিরাম সঙ্কোচন, গা-বমি বমি করা, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি। অ্যানাফিল্যাক্‌টিক শকের মত অধিক মাত্রায় থিয়ামিন গ্রহণেও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে দেখা গেছে। শিরার ভিতর দিয়ে অধিক মাত্রায় ভিটামিন-বি-১ যখন শরীরে প্রবেশ করানো হয়, তখন অধিক অনুভূতিশীল মানুষের হৃদয়ের ক্রিয়া চিরকালের মত শুব্ধ হয়ে যায়। অথবা অতিরিক্ত অ্যাসিটাইল কোলিন নিঃসরণই এর একমাত্র কারণ বলে প্রতীয়মান হয়।

রাইবোফ্ল্যাভিন বা ভিটামিন বি-২—এটি হচ্ছে এমন একটি ভিটামিন, যা অধিক মাত্রায় গ্রহণেও কোন কুফল নেই।

নিকোটিনিক অ্যাসিড—নিকোটিনিক অ্যাসিড অধিক ব্যবহারের ফলে কোন কোন সময় খুব অপকার হয়। অবশ্য সব প্রাণীর দেহেই যে এর প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, তা নয়। নিকোটিনিক অ্যাসিডের প্রভাবে রক্তবাহী নালীসমূহ বহুক্ষণ প্রসারিত হয়ে থাকে।

ফোলিক অ্যাসিড—ফোলিক অ্যাসিডের বহুল ব্যবহারে কিড্‌নী-টিউবিউল নষ্ট হয়ে যায়। এক থেকে পাঁচ মিলিগ্র্যাম ফোলিক অ্যাসিড গিনি-পিগকে দিলে কিড্‌নী-টিউবিউলে ফোলিক অ্যাসিড জমা হয় এবং সেখানকায় অ্যালকালাইন ফস্‌ফেটেজের পরিমাণ হ্রাস করে। পুরুষদের মধ্যেই এই কুফল বেশী পরিমাণে দেখা যায়। ক্রমাগত অতিরিক্ত ফোলিক অ্যাসিড ব্যবহার করে গেলে লিউকেমিয়া হয়। অ্যামিনোপ্‌টেরিন ফোলিক অ্যাসিডের বিপরীত কাজ করে। এর ব্যবহারে উপরিউক্ত রোগটির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিড—কুড়ি মিলিগ্র্যাম প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিড রোজ ব্যবহার করলে এই ভিটামিন-আধিক্য দেখা দেয়। এই ভিটামিন-আধিক্যের জন্যে অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না; ফলে মুখমণ্ডলে শোথ বা ইডিমার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এর কারণই হচ্ছে, অ্যাড্রিন্যালের কাজ ঠিকমত না হওয়ার ফলে শরীরে জলের পরিমাণও যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত না হওয়া। এতে নানারকম পেটের গোলযোগও দেখা দেয়।

ভিটামিন-সি—এতদিন পর্যন্ত এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে, ভিটামিন-সি বা অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড অতিরিক্ত গ্রহণে কোন অপকার হয় না। এখন জানা গেছে যে, অতিরিক্ত ভিটামিন-সি ব্যবহারের ফলে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। খুব সম্ভব অধিক মাত্রায় স্টেরয়েড

হর্মোন সংশ্লেষণের জন্তেই এটি ঘটে। কারণ, এও প্রমাণিত হয়েছে যে, ভিটামিন-সি দেওয়া হলে অ্যাড্রিন্যাল কর্টেক্সের সুডানোফিলিক গ্র্যানিউলের সংখ্যা হ্রাস পায়।

ভিটামিন-ডি—অধিক মাত্রায় ভিটামিন-ডি ব্যবহার করলে শিশুদেহের যথেষ্ট ক্ষতি হয়—এ তথ্য অনেককাল আগে থেকে জানা গেছে। খুব বেশী পরিমাণে ক্যালসিফেরল যদি শিশু বা বয়স্কদের দেওয়া হয়, তাহলে শরীরে অস্থি-র ক্যালসিয়াম বিযুক্তি, অস্থি-র ভঙ্গপ্রবণতা ও অবিরাম সঙ্কোচনশীলতা দেখা দেয়। রক্তরসের ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শরীরের নানাস্থানে ক্যালসিয়াম জমা হয়। নরম তন্তু কঠিন হয় ও কিড্‌নীতে ক্যালসিয়াম জমে পাথরীর সৃষ্টি করে। কিড্‌নীর স্বাভাবিকতা নষ্ট করে নানারকম রোগের উৎপত্তি ঘটায়। অধিক পরিমাণে ভিটামিন-ডি ব্যবহারে অনেক সময় বেসাল মেটাবলিক রেট কমে যায়। সম্ভবতঃ গলগ্রন্থির সঙ্গে ভিটামিন-ডি-এর একটা সম্পর্ক আছে। তাছাড়া ভিটামিন-ডি-আধিক্যের ফলে গা-বমি বমি করে এবং অনেক সময় মৃত্যুও ডেকে আনে।

ভিটামিন-ই—ভিটামিন-ই-আধিক্যের ফলে খুব বেশী অপকার না হলেও কখনও কখনও বেশ বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ভিটামিন-কে-১ ও ভিটামিন-কে-২ সাধারণতঃ খুব বেশী পরিমাণে ব্যবহার অনিষ্টকর নয়; কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ন্যাপ্‌থোকুইনোন ও ন্যাপ্‌থোহাইড্রোকুইনোন নামক বস্তুগুলি অধিক মাত্রায় ব্যবহারে অনেক সময় কুলক্ষণ প্রকাশ পায়; যেমন—গা-বমি বমি করা, পরফাইরিনিউরিয়া ও তঞ্চনকাল বৃদ্ধি ইত্যাদি।

ভিটামিন-বি-১২—কোন এক সমালোচনায় ভিটামিন-বি-১২ সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। দেখা গেছে—স্কুলের ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ মাত্রায় ভিটামিন-বি-১২ না দেওয়া সত্ত্বেও তাদের দেহের বৃদ্ধির গতি ব্যাহত হয় না। তাই অধিক মাত্রায় ভিটামিন-বি-১২ ব্যবহারে বিপদের আশঙ্কা থাকতে পারে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ফুড অ্যাণ্ড নিউট্রিসন বোর্ড অব দি ন্যাশন্যাল রিসার্চ কাউন্সিল থেকে ও অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে যে সব ভিটামিন গ্রহণের পরিমাপ ধার্য করা হয়েছে, সেই মাত্রায় ভিটামিন গ্রহণ করাই উচিত। উপকারী ও অপরিহার্য বলে অতিরিক্ত মাত্রায় ভিটামিন গ্রহণ করে নিরর্থক বিপদকে ডেকে না আনাই বাঞ্ছনীয়।

ভারতের শক্তি-সমস্যা

শ্রীশচীনাথ মিত্র

লোকসংখ্যার অনুপাতে শক্তিব্যয়ের পরিমাণ থেকেই কোন্ দেশ কত উন্নত তা বুঝতে পারা যায়। পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তিব্যয়ের জন্যে চাই শক্তির পর্যাপ্ত উৎসের সন্ধান এবং তার ব্যবহার। ভারতের লোকসংখ্যার অনুপাতে শক্তিব্যয়ের পরিমাণ পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির তুলনায় খুবই কম। তাই ভারতের অগ্রগতির মাপকাঠী হলো, শক্তি উৎপাদন ও তার ব্যয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বন্যারোধ ও কৃষির উন্নতির সঙ্গে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে এই লক্ষ্যই স্থান পেয়েছে। এখন দেখা যাক, এই শক্তির সমগ্র উৎস কি কি এবং ভারতেই বা সেই সব উৎসের মোট পরিমাণ কত?

শক্তির উৎসকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ ইন্ধন; যেমন—খনিজ তেল, কয়লা, কাঠ ইত্যাদি—যে সব পদার্থের মধ্যে শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎস ক্রিয়াশীল; যেমন—প্রবহমান বায়ু, জল, জলের ঢেউ, সৌরতাপ, আগ্নেয়গিরির তাপ ইত্যাদি। তাছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর শক্তির উৎস, যা বর্তমানে পৃথিবীর প্রগতি ও সভ্যতায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, সেটি হচ্ছে পারমাণবিক খনিজ পদার্থ। এদের মধ্যে তেল (খনিজ), কয়লা, জল ও পারমাণবিক খনিজই শক্তির প্রধান উৎস। আর বাতাস, জল, সমুদ্র-তরঙ্গ, আগ্নেয়গিরির তাপ এবং সৌরতাপকে অনুপূরক উৎস হিসেবে ধরা হয়। ভারতে শক্তির এসব প্রধান প্রধান উৎসগুলিকে আয়ত্তে আনয়ন এবং তাদের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমে ধরা যাক, কয়লার কথা। আজ পর্যন্তও পৃথিবীর বৃহৎ-শিল্পে কয়লা একক স্থান অধিকার করে আছে। পারমাণবিক যুগ এসেও কয়লার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ কমাতে পারে নি। লোহা গলাতে ব্লাষ্ট ফার্ণেসে মেটালার্জিক্যাল কয়লা ছাড়া অন্য কিছুতেই কাজ চলে না। অন্য দেশে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ইলেকট্রো-মেটালার্জির প্রথায় লোহা উৎপাদন করা যেতে পারে; কিন্তু ভারতে বহুল পরিমাণে পিগ্ আয়রন তৈরী করবার জন্যে কয়লা আরও অনেককাল পর্যন্ত অপরিহার্য হয়ে থাকবে।

লৌহ-সম্পদে ভারত পৃথিবীতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আকরের পরিমাণ প্রায় ২০,০০০ লক্ষ টন। কিন্তু মেটালার্জিক্যাল কয়লার পরিমাণ সেই তুলনায় খুবই কম। ১৯৪৬ সালে মহীন্দ্র কমিটি এই ধরণের কয়লার পরিমাণ ৭,০০০ থেকে ৭,৫০০ লক্ষ টন বলে অনুমান করেছেন। ১৯৫০ সালে কৃষ্ণান কমিটি এর পরিমাণ ১১,০০০ লক্ষ টন বলে অনুমান করেন। বর্তমান খরচের হারের প্রগতি দেখে অনেকে অনুমান করেন যে, ভারতে মেটালার্জিক্যাল কয়লার মেয়াদ আর মোটে একশ' বছর। এর মধ্যে যদি রপ্তানী হয়, তাহলে ঐ সময় আরও কম হবে।

স্বাধীনতার আগে বেসরকারী মালিকেরা কয়লা সংরক্ষণের দিকে নজর না দিয়ে লাভের দিকেই নজর বেশী রাখবার ফলে জাতীয় সম্পদের অনেক ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। তার জন্যে অনেক খনি আজ ধ্বংসের পথে। এসব খনি রক্ষার জন্যে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ন পদ্ধতি চালু করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। জাতীয় সরকার ইতি-মধ্যেই পেগিং-এর ব্যবস্থায় এই বিশেষ শ্রেণীর

কয়লা উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করেছে। কয়লা উত্তোলনে যাতে কোনও অব্যবস্থা বা ক্ষতি না হয়, সেদিকে সরকার লক্ষ্য রেখেছে। এতে উত্তোলনের ব্যয় কিছু বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু জাতীয় সম্পদ অব্যবস্থার ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় কয়লা সদ্ব্যবহারের জন্যে জাতীয়করণের প্রস্তাব অনেকবার করা হয়েছে, কিন্তু পুরাপুরি কার্যকরী হয় নি।

ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ক্রমবিস্তৃতির ফলে মেটালার্জিক্যাল কয়লার চাহিদা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সে জন্যে যাতে বেশী ছাইযুক্ত কোকিং কয়লাকে পরিস্রুত করে মেটালার্জিক্যাল কয়লায় পরিণত করা যায়, তার জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে। ভারতে কয়েকটি শোধনাগার কাজ সুরু করেছে। এখানে প্রতি বছর ২২ লক্ষ টন কয়লা শোধন করা সম্ভব হবে।

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে কয়লার মোট উত্তোলন ৬০০ লক্ষ টন হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে। এসব কয়লাই ব্যবহারের পূর্বে প্রথমে মোটামুটি ব্যবহারযোগ্য করে নেওয়া হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে কেবল মাত্র নিম্নশ্রেণীর কয়লা (যা ভারতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে) ব্যবহার করা কর্তব্য। আধুনিক ডিজাইনের বয়লারে উন্নত ধরণের মিকানিক্যাল ষ্টোকিং, ড্রাফট ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়োগ করে নিম্নশ্রেণীর কয়লা ব্যবহার করা যেতে পারে। তাতে উন্নতশ্রেণীর কয়লার অপব্যবহার রোধ করা সম্ভব হবে।

এখন আসা যাক, খনিজ তেলের কথায়। কয়লার মত খনিজ তেলও বর্তমানে এক অপরিহার্য বস্তু। শুধু শক্তি উৎপাদনের জন্যেই নয়, বহুবিধ বাই-প্রোডাক্ট অর্থাৎ উপজাত পদার্থ সৃষ্টিতেও কয়লা ও তেল অতুলনীয়। কোন কোন খনিজ পদার্থ থেকে পারমাণবিক শক্তি পাওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু কোন রাসায়নিক বা উপজাত পদার্থ পাওয়া যায় না।

ভারতে খনিজ তেলের পরিমাণ অপর্যাপ্ত। এই জন্যে জাতীয় সরকার বিদেশীয় বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় তৈল অনুসন্ধানের কাজ ব্যাপকভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন, যাতে নতুন উৎস আবিষ্কারের দ্বারা ভারতের তৈল-সম্পদ আরও অধিক পরিমাণে আহরণ করা যেতে পারে।

১৯৫৬ সালে ভারতে উত্তোলিত তেলের মোট পরিমাণ ছিল ৩'৫ লক্ষ টন এবং ঐ বছরে মোট ব্যয় ছিল ৪৫ লক্ষ টন। সুতরাং তেলের চাহিদা উত্তোলনের দশগুণেরও বেশী। এই চাহিদা মেটাবার জন্যে ভারত সরকারের অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস ডিভিসন, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী, আসাম অয়েল কোম্পানী তৈল অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

আসামের ডিগবয়ই ভারতের প্রধান চালু তৈলক্ষেত্র। এরই কাছে নাহারকাটিয়া, হুগরিজান ও মোরানের তৈলক্ষেত্র। আসাম উপত্যকায় ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান চাহিদার প্রায় ৫৬% অপরিস্রুত তেল আসাম থেকেই পাওয়া যাবে। নাহারকাটিয়ায় আনুমানিক যত তেল সঞ্চিত আছে, তা থেকে বছরে প্রায় ২৫ লক্ষ টন অপরিস্রুত তেল ও প্রতিদিন প্রায় ৪'৫ কোটি ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণ করা সম্ভব হবে। এই গ্যাস গৃহস্থালী ও অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী একটি উৎকৃষ্ট জ্বালানী। সুতরাং এর দ্বারা প্রতি বছর বেশ কয়েক লক্ষ টন কয়লা বেঁচে যাবে।

ভারতে প্রচ্ছন্ন জলশক্তির উৎসের অভাব নেই। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই প্রচ্ছন্ন জলশক্তিকে জাতীয় উন্নতির কাজে নিয়োজিত করবার জন্যে সাফল্যজনকভাবে চেষ্টা চলছে। শিল্প ও গৃহস্থালীর জন্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ এই জলশক্তি থেকে সংগ্রহ করা হবে। বর্তমানে

ভারতে বিভিন্ন প্রয়োজনে যে শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে তার মোট পরিমাণ হলো ৩৪ লক্ষ কিলোওয়াট। ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা ৬৮ লক্ষ, অর্থাৎ দ্বিগুণ দাঁড়াবে। ১৯৫৬ সালে ভারতে মাথাপিছু শক্তি ব্যয় হতো ২৫ কিলোওয়াট। বিদ্যুৎ শক্তির বহুল প্রচলনের ফলে এই ব্যয় ১৯৬০ সালে ৩০ কিলোওয়াট এবং ১৯৭০ সালে ৬০ কিলোওয়াট দাঁড়াবে বলে আশা করা হয়। এই মোট শক্তির এক-তৃতীয়াংশ জলশক্তি থেকে ও দুই-তৃতীয়াংশ তাপশক্তি থেকে আহরণ করা হবে। ভারতে জল-বিদ্যুৎ সম্পদ মোট ৩০ লক্ষ কিলোওয়াটের বেশী বলে ধরা হয়। পরিকল্পনা অনুসারে এই জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে জলশক্তিকে প্রায় অফুরন্ত বলা যেতে পারে। এই কারণে জল-শক্তির সন্ধান ও ব্যবহার ভারতের উন্নতির পরি-কল্পনায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ও অন্যান্য রেডিও-অ্যাক্টিভ খনিজ সম্পদ ভারতে নিতান্ত কম নয়। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে ডাঃ ডি. এন. ওয়াদিয়া ও পি. কে. ঘোষ বলেছেন যে, ভারতের থোরিয়াম (১·৮ লক্ষ টন) ও ইউরেনিয়াম (১৪,০০০ টন) সম্পদের মোট শক্তি ৬০,০০০ কোটি টন কয়লার শক্তির সমান। সুতরাং তাঁদের মতে, এই দুই প্রকার খনিজের পূর্ণ 'ফিসন'-এর দ্বারা ভারতের সমগ্র কয়লার মোট শক্তির ১৫ গুণ অধিক শক্তি পাওয়া যাবে। কোন কোন পদার্থবিদের মতে, এক টন ইউরেনিয়াম ২৫ লক্ষ টন কয়লার সমতুল্য ভারতের সুপ্ত পারমাণবিক শক্তির পূর্ণ প্রয়োগে তার বিদ্যুৎশক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো যেতে পারে। কিন্তু এই থোরিয়াম পূর্ণরূপে ভাঙ্গা যাবে কিনা, সে বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করছেন। আমেরিকার বিজ্ঞানী এফ. বি. ওল্ডলুম বলেছেন যে, যদি উড়ন্ত নিউট্রন আইসোটোপ ইউ ২৩৮-এর পরমাণুকে আঘাত করে তবে তারা সেই পরমাণুতে শোষিত হয় এবং ওই আইসোটোপ ভাঙ্গে না বা তাতে 'ফিসন' হয় না; শুধু তাদের মধ্য প্লুটোনিয়াম নামে এক নতুন মৌলের সৃষ্টি করে। কিন্তু প্লুটোনিয়াম ভাঙ্গনশীল। সে জন্যে ইউ-আইসোটোপ ২৩৫-এর মতই শক্তি উৎপাদনে সক্ষম। জন কক্রফ্টের মতে, এক টন ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর ফিসন হলে ৩×১০⁶ টন কয়লার মোট তাপের সমান তাপ বিকিরণ করতে পারে। ভারতে রিয়্যাক্টর স্থাপন করে পারমাণবিক শক্তিকে জাতীয় উন্নতির কাজে নিয়োজিত করবার চেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টা দ্রুত সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মূক-বধির মনোজীবনের সমস্যা

শ্রীমতী কল্যাণী মজুমদার

সাধারণভাবে আমরা জানি যে, মূক-বধির মানেই বোবা-কালা বা হাবা-কালা। এরা কানে শুনতে পায় না, কথাও বলতে পারে না; শুধু অঙ্গভঙ্গী করে কোন মতে মনের ভাব বোঝাবার চেষ্টা করে। এরা যে আমাদের শ্রবণক্ষম সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়, আমাদের মত দৈনন্দিন জীবনে লেখা-পড়া শেখবার ক্ষেত্রে অথবা কাজকর্মের ব্যাপারে কোন রকমেই যে আমাদের সমকক্ষ নয়, একথা আমরা জানি। কিন্তু আমরা জানি না যে, মূক-বধিরেরা কি কি কাজ করতে পারে; জানি না, মূক-বধিরের মনোজীবনের বিকাশ কেমন? আমরা ভেবে দেখি না যে, শ্রবণক্ষম সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মূক-বধিরদের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ কি?

মূক-বধিরের মনোজীবন নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে ধরা পড়েছে যে, এই ইন্দ্রিয়-বৈকল্যের প্রভাব এদের মনোজীবনে কতখানি এবং উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিবেশ সৃষ্টি করবার ফলে এদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ কেমন ভাবে উন্মুক্ত হতে পারে। শ্রবণক্ষম মানুষের সহানুভূতি, আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষার সহযোগিতা ও কাজকর্ম করে দক্ষতা প্রমাণ করবার ব্যাপক ক্ষেত্র মূক-বধিরের মনোজীবনে যে কি পরিমাণ নিরাপত্তার সৃষ্টি করে, অভীক্ষামূলক অনুসন্ধান না হলে এসব বিষয় অজ্ঞাত থেকে যেত। ওদেশে মূক-বধিরদের জন্যে শৈশবকাল থেকেই নানাভাবে দৈহিক পরীক্ষা, বিদ্যালয়ের পরিবেশে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিক্ষাদান, বিদ্যালয়ে পড়বার সুবিধা এবং হাতের কাজ শেখাবার পরে বাইরের কর্মক্ষেত্রে কাজ করবার প্রচুর সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। এই কারণেই তারা মূক-বধিরের মনোজীবনের মূল সমস্যার অনেকখানি সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলেই ওদের সমাজ-কল্যাণের ক্ষেত্র আরও ব্যাপক এবং কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের ধারা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তার সাহায্যে মূক-বধিরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

১। অশিক্ষিত বধিরদের স্বভাব বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ তারা বিষাদগ্রস্ত, সন্দেহপ্রবণ, বিশ্বাসহীন, নির্দয়, স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণ, দায়িত্ব-জ্ঞানহীন ও ক্ষতিকারী হয়ে থাকে।

২। মূক-বধির ও শ্রবণক্ষমের মধ্যে মূল পার্থক্য—

সাধারণভাবে বলতে গেলে মূক-বধির শিশু মনের দিক থেকে খুব সুস্থ ও স্বাভাবিক হতে পারে না। এক ধরণের মানসিক অস্বাভাবিকতা এদের মধ্যে থাকেই। জৈবিক ভারসাম্য রক্ষণে এরা খুব বেশী সক্ষম নয়। স্বাভাবিক মানুষের মত এদেরও মনোজগতের বিভিন্ন চাহিদা বর্তমান। আশা ও ভয় আনন্দ ও ভালোবাসা, কর্মক্ষেত্রে সুনামের বাসনা, উন্নত ভোগবিলাসের কামনা— এদের মধ্যে খুবই তীব্র।

৩। পরিবেশ এবং ব্যক্তিত্ব—সাধারণতঃ যে সব মূক-বধির স্কুলে ভর্তি হবার পূর্বে বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন বা অভিভাবকদের কাছ থেকে নির্দয় ব্যবহার ও অবহেলা পায়, তারা প্রথম থেকেই মনের দিক দিয়ে অনেকখানি বিপর্যস্ত বোধ করে এবং নিজেদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। তাদের মধ্যে অসামাজিক হবার প্রবৃত্তি দেখা

দেয় এবং ক্রমশঃ নানা ধরণের গূঢ়ৈষণা ও হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে এদের যোগ দিতে ডাকা হয় না বলে এদের মধ্যে এক ধরণের লজ্জা, আক্রোশ, ভয় প্রভৃতির উদ্ভব হয়; ফলে এরা সামাজিক আদব-কায়দা শিখতে পারে না এবং প্রয়োজনমত নিজেকে সব অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে শেখে না। স্কুলের আওতায় মূক-বধির শিশু অনেক নিরাপত্তা বোধ করে এবং মনে মনে এক ধরণের আশ্রয় খুঁজে পায়। আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রতি এদের অনুরক্তি বেশী। ক্ষেত্রবিশেষে বাড়ীর প্রতি যে টান কম, এ-ও লক্ষ্য করা যায়।

৪। ব্যক্তিগত দিক—আবেগপ্রবণতার দিক থেকে মূক-বধির শিশুর বিকাশ, স্বাভাবিক শিশুর তুলনায় কিছুটা কম। এরা বেশী স্পর্শকাতর, বেশী নিষ্ঠুর এবং বেশী আত্মকেন্দ্রিক। হীনমন্যতার কারণে এরা নিজেদের নিয়ে বড় বেশী বিব্রত থাকে। সহজে এরা রেগে যায়, এদের সন্দেহবাতিক তীব্র, সব সময়ে এক ধরণের ভয় ও অবিশ্বাসের জন্যে এরা কষ্ট পায়। এদের মধ্যে উন্মায়ু ও বাতুলতা—এই দুটির পরিচয় বেশ পাওয়া যায়।

৫। সামাজিক দিক—শ্রবণক্ষম সমাজের তুলনায় এরা অনেক বেশী অসামাজিক। আবার বধিরতা ও মৌনতার কারণে সবাইর কাছে এরা আরও অপ্রস্তুত বোধ করে এবং তাথেকে মুক্তি পাবার জন্যে সময় সময় বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এদের মধ্যে বন্ধুত্ব, প্রেম, প্রীতি ও স্নেহ বিরল নয়, বরং অতিমাত্রায় উচ্ছ্বাসপ্রবণ বলেই ভক্তি ও ভালবাসার আধিক্য প্রকাশ পায়। এরা নিজেদের মধ্যে খেলাধূলা থেকে সুরু করে উৎসব, আমোদ এবং উন্নত চিন্তার ক্ষেত্রেও দলগত-ভাবে কিংবা স্বতন্ত্রভাবে বেশ মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারে। নিজেদের ক্ষমতার বিকাশ দেখাতে ভালবাসে এবং প্রশংসা পেলে বড়রাও মাঝে মাঝে শিশুর মত খুশী হয়ে ওঠে। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নানাধরণের অনুরাগের সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। ঘরোয়া জীবনের প্রতি এদের আগ্রহ বড় কম নয়।

আমাদের দেশে মূক-বধির সম্বন্ধে তেমন কোন অভীক্ষামূলক অনুসন্ধান করা হয় নি। তবে সম্প্রতি এদেশে এদের নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা সুরু হয়েছে—মনোবিদ্ বা শিক্ষাবিদেরা কিছু কিছু কাজ করবার চেষ্টা করছেন। পশ্চিম-বঙ্গে মূক-বধিরদের জন্যে এখনও কোন রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় নেই—কলকাতার মূক-বধির বিদ্যালয় এক বহু পুরাতন ঐতিহ্যের দাবী রাখে।

এদেশে মূক-বধিরের সংখ্যা ২ লাখের উপর এবং তাদের মধ্যে মাত্র ২০০০-এর মত ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ পায়। মূক-বধিরদের শিক্ষাদানের জন্যে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের যে বিশেষ ধরণের শিক্ষার প্রয়োজন, এখানে তেমন কোন উন্নত কেন্দ্র এখনও খোলা হয় নি। মূক-বধির মনোজীবন ও তার নানাবিধ সমস্যা যে এদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ওয়াকিবহাল থাকা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। স্বাভাবিক শ্রবণক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কৈশোর জীবনের সমস্যা তাদের মনের উপর যখন গভীর প্রভাব বিস্তার করে, তখন মূক-বধির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এ-জাতীয় আরও গলদ আনবার সম্ভাবনা তো অনেক বেশী হওয়াই স্বাভাবিক!

মূক-বধিরের বুদ্ধির মান শ্রবণক্ষমের তুলনায় ৩।৪ বছর পিছিয়ে থাকেই। ভাষাভিত্তিক ক্ষেত্র অপেক্ষা হাতের কাজের পর্যায়ে এরা বেশী দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। আবেগপ্রবণতার ব্যাপারে এরা অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর। শ্রবণক্ষম মানুষের প্রতি এদের তেমন আস্থা নেই। ব্যক্তিগত জীবনে এরা সবাই সশঙ্কিত। সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এরা বেশীমাত্রায় অস্থির ও আত্মকেন্দ্রিক। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন

না করলে এদের শিক্ষা দেওয়া খুবই কঠিন। এদের মানসিক গঠনের পক্ষে শুধু সহানুভূতি নয়, মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও মানসিক সংশোধনাগারের প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবেই অধিক। মূক-বধির মনোজীবনের সমস্যা যে প্রকারান্তরে শ্রবণক্ষম সমাজের সমস্যাবিশেষ, এ ধরণের চিন্তা প্রগতিশীল যুগের পক্ষে অপরিহার্য। এই কারণেই সরকারী ও বেসরকারী—উভয় পক্ষের সহযোগিতা আজকের দিনে একান্ত প্রয়োজন।

বিপরীত-ধর্মী বস্তুকণা

শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, ছায়াপথের সমন্বয়ে যে ব্রহ্মাণ্ডে আমরা বাস করি, সেখানকার যাবতীয় বস্তুই পরমাণুর দ্বারা গঠিত। এই পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন সৌরজগতেরই অনুরূপ, অর্থাৎ সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন গ্রহসমূহ আবর্তিত হয়, তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রে আছে ধন-বিদ্যুতাবিষ্ট একটি নিউক্লিয়াস এবং তার চারধারে ঘুরছে ঋণ-বিদ্যুতাবিষ্ট ইলেকট্রনের দল। নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীন আবার প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। প্রোটনের ভর ইলেকট্রনের ভরের তুলনায় প্রায় দু-হাজার গুণ বেশী, কিন্তু তার বিদ্যুতাধান ইলেকট্রনের বিদ্যুতাধানের সমান (যদিও তা বিপরীত-ধর্মী)। নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভরের সমান, কিন্তু তার কোন বিদ্যুতাধান নেই, অর্থাৎ নিউট্রন নিস্তড়িৎ কণিকা।

ইলেকট্রনের তুলনায় প্রোটন প্রায় দু-হাজার গুণ ভারী হলেও তার বিদ্যুতাধান যে ইলেকট্রনের বিদ্যুতাধানের সমান, এ-রহস্য উদ্ঘাটন করতে বিজ্ঞানীদের দীর্ঘকাল লেগেছে। আর একটি রহস্য হচ্ছে—ধনাত্মক নিউক্লিয়াস ও ঋণাত্মক ইলেকট্রন দিয়েই কেবল জাগতিক বস্তুসমূহ গঠিত কেন, বিপরীত ধরণের পরমাণুর (যার কেন্দ্রে থাকবে ঋণাত্মক নিউক্লিয়াস এবং বাইরে থাকবে ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা) হদিস কেন পাওয়া যায় না?

কিন্তু দীর্ঘকাল থেকেই বিজ্ঞানীরা তত্ত্বগতভাবে 'অ্যান্টি-পার্টিকল' বা বিপরীত-ধর্মী বস্তুকণার অস্তিত্ব অনুমান করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এই বস্তুকণা হবে আমাদের পরিচিত বস্তুকণার বিপরীত-ধর্মী। এই বিপরীত-ধর্মী বস্তুকণার কেন্দ্রে থাকবে অ্যান্টি-প্রোটন (যার বিদ্যুতাধান হবে ঋণাত্মক) ও অ্যান্টি-নিউট্রন (যার চৌম্বক ও অন্যান্য ধর্ম হবে আমাদের পরিচিত নিউট্রনের বিপরীত) এবং কেন্দ্রের বাইরে থাকবে অ্যান্টি-ইলেকট্রন (যার বিদ্যুতাধান হবে ধনাত্মক)।

ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি ক্ষুদ্র কণাগুলির গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, এরা বলবিদ্যার প্রাচীন নিয়ম মেনে চলে না। এদের জন্যে নতুন কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার প্রবর্তন করেন ত্য ব্রগলী, শ্রডিংগার, হাইসেনবার্গ, পাউলি, ডিরাক প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। ইলেকট্রনের গতি-সংক্রান্ত তাত্ত্বিক গবেষণা করে ডিরাক ১৯৩০ সালে ইলেকট্রনের অনুরূপ আর একটি কণার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। ১৯৩২ সালে ক্যালিফোর্ণিয়ায় ডাঃ কার্ল অ্যাণ্ডারসন মহা-জাগতিক রশ্মির মধ্যে ডিরাক কর্তৃক ঘোষিত এই কণাটির সন্ধান পান এবং তার চলবার পথের ফটোগ্রাফ নিতেও সক্ষম হন। এই আবিষ্কারের জন্যে অ্যাণ্ডারসনকে ১৯৩৬ সালে পদার্থবিদ্যায়

নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়)। অ্যাণ্ডারসন কর্তৃক আবিষ্কৃত এই নতুন কণাটির নামকরণ করা হয় পজিট্রন। এটি ধনবিদ্যুৎ সমন্বিত এবং এর ভর ও বিদ্যুতাধান ইলেকট্রনের বিদ্যুতাধানের সমান। কাজেই পজিট্রনকে ইলেকট্রনের বিপরীত ধর্মী কণা বা অ্যান্টি-ইলেকট্রন বলা যেতে পারে। প্রত্যাশিত বিপরীত ধর্মী বস্তুকণার মধ্যে প্রথম কণার সন্ধান ধ্বংস করে তাথেকে যেমন শক্তি আহরণ করা যায়, তেমনি শক্তির বিনাশে ইলেকট্রন-পজিট্রনের জন্ম হওয়াও সম্ভব। এক জোড়া স্থির ইলেকট্রন-পজিট্রনের বিনাশে প্রায় ১০ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট (এক ভোল্ট সেলে নেগেটিভ প্রান্ত থেকে একটি ইলেকট্রন পজিটিভ প্রান্তে যেতে যে পরিমাণ শক্তি অর্জন করে তাকে বলা হয় এক ইলেকট্রন-ভোল্ট)

ডাঃ ওয়েন চেম্বারলেন

এ-ভাবে পাওয়া গেল। পরবর্তীকালের গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চ শক্তিসম্পন্ন গামারশ্মি বা তড়িতান্বিত কণা জড়পদার্থের ভিতর দিয়ে চলবার সময় ইলেকট্রন ও পজিট্রন যমজের জন্ম দেয়।

আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্বে দেখিয়েছেন, জড় ও শক্তি আসলে একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ এবং তাদের একটি অপরটিতে রূপান্তরিত হতে পারে। ইলেকট্রন-পজিট্রনের জড়সত্তা সম্পূর্ণরূপে শক্তি উৎপন্ন হয়। বিপরীত পক্ষে অন্ততঃ ১০ লক্ষ ই. ভো. শক্তি বিলুপ্ত না হলে এক জোড়া ইলেকট্রন-পজিট্রনের জন্ম হতে পারে না। ১০ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্টের চেয়ে বেশী শক্তি উৎপাদনক্ষম যন্ত্র তৈরী করে বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে ইলেকট্রন-পজিট্রন যমজ সৃষ্টি করেছেন।

ইলেকট্রনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ডিরাক যে তত্ত্বের অবতারণা করেন, তার সঙ্গে প্রোটনের গতি-প্রকৃতি সম্পূর্ণ মেলে না। বস্তুতঃ প্রোটনের সব

কয়টি ধর্মের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, এমন কোন তত্ত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্তও দিতে পারেন নি। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁরা একমত হন যে, ইলেকট্রনের মত প্রোটনেরও একটি বিপরীত-ধর্মী কণা আছে। এর ভর ও বিদ্যুতাধান হবে প্রোটনের সমান, কিন্তু কণাটি হবে ঋণবিদ্যুৎ-বিশিষ্ট। এর নাম দেওয়া হয় অ্যান্টি-প্রোটন।

ইতিমধ্যে গবেষণাগারে যন্ত্রের সাহায্যে কেন্দ্রীনের কণিকাগুলিকে আরও উচ্চ শক্তিসম্পন্ন করে মেসন কণারও (যার ভর ইলেকট্রন ও প্রোটনের মাঝামাঝি) বিপরীত-ধর্মী কণা অ্যান্টি-মেসনের সন্ধান পাওয়া গেল। ঋণাত্মক দু-প্রকার মেসনের বিপরীত, ধনাত্মক দুটি মেসনও পাওয়া গেছে। মহাজাগতিক ক্ষেত্রে ঋণাত্মক মেসনগুলি পরমাণু-কেন্দ্রীনে ধনাত্মক প্রোটনগুলিকে ধরে রাখবার শক্তি জোগায়। অনুরূপভাবে আমরা অনুমান করতে পারি, আমাদের পরিচিত বস্তুজগতের বিপরীত জগতে (যাকে আমরা বলতে পারি অ্যান্টি-ম্যাটার) ধনাত্মক মেসনগুলি কেন্দ্রীনের ঋণাত্মক প্রোটনগুলিকে প্রচণ্ড শক্তিতে পরস্পর বিকর্ষণে (দুটি সমধর্মী বিদ্যুৎ-কণা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে) বিরত করবে।

অ্যান্টি-ইলেকট্রন ও অ্যান্টি-মেসনের সন্ধান পাবার পর উচ্চ ভরবিশিষ্ট অ্যান্টি-প্রোটনের অস্তিত্ব সন্ধানের চেষ্টা জোরালো হয়ে উঠলো। বিজ্ঞানীরা প্রথমে মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে অ্যান্টি-প্রোটনের সন্ধান করেছিলেন। কিন্তু মহাজাগতিক রশ্মির নানাবিধ জটিলতা এবং নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় কাজ করবার সুযোগের অভাবে তাঁদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নি। এ-বিষয়ে দীর্ঘকাল গবেষণার পর ১৯৫৫ সালে ক্যালিফোর্ণিয়ার বার্কলে রেডিয়েশন লেবরেটরীতে ডাঃ এমিলিও সেগ্রে এবং ডাঃ ওয়েন চেম্বারলেন বীভাট্রন যন্ত্রের সাহায্যে অ্যান্টি-প্রোটনের অস্তিত্বের সন্ধান দিলেন।

বীভাট্রনের সাহায্যে একটি প্রোটনকে ৬২০ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন করা সম্ভব। এর ফলে বীভাট্রনের সহায়তায় প্রোটন-অ্যান্টি-প্রোটন যমজ সৃষ্টি করবার মত পর্যাপ্ত শক্তিসম্পন্ন প্রোটনের ঝাঁক পাওয়া গেল। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, অন্যান্য কণাসমূহের মধ্য থেকে অ্যান্টি-প্রোটনকে কিভাবে পৃথক করে তার অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ দেওয়া যায়? এই প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান করেছেন সেগ্রে ও চেম্বারলেন এবং তাঁদের এই কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে ১৯৫৯ সালে পদার্থ-বিদ্যায় দু-জনকে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

সেগ্রে ও চেম্বারলেন যে উপায়ে অ্যান্টি-প্রোটনকে পৃথক করবার দুরূহ সমস্যা সমাধান করেছেন, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। বীভাট্রন থেকে পাওয়া ৬২০ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি-সম্পন্ন প্রোটনের ঝাঁকটির পথে একটি তামার টুক্‌রা রাখা হয়। তামার পরমাণু কেন্দ্রে অবস্থিত কণাগুলির কারো কারো সঙ্গে আঘাতকারী প্রোটন-দলের ঘটে প্রচণ্ড সংঘাত। তার ফলে কোন কোন দ্বৈত সংঘাতে প্রায় ১৮০ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি বিলুপ্ত হয়ে তার স্থলে একজোড়া প্রোটন-অ্যান্টি-প্রোটন জন্ম নেয়। কিন্তু এখানেই সমস্যার শেষ নয়, একটি অন্তরায় আছে। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন প্রোটনগুলি তামার টুক্‌রাকে আঘাত করবার ফলে আর একপ্রকার কণা বিপুল সংখ্যায় উৎপন্ন হয়। এদের বলা হয় পাই-মেসন। ইলেকট্রনের তুলনায় এরা ২৭৫ গুণ ভারী। তামার টুক্‌রা থেকে বেরিয়ে আসবার পর বীভাট্রনের নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র ছাড়া আরও দুটি চুম্বকের সাহায্যে ঋণাত্মক কণাগুলিকে পৃথক করে নিয়ে সিন্টিলেশন কাউন্টার নামে একটি যন্ত্রের উপর ফোকাস করে ফেলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই যন্ত্রে তাদের উপস্থিতি ধরা পড়ে। সিন্টিলেশন কাউন্টার থেকে বেরিয়ে কণাগুলি আবার দুটি চুম্বকের সাহায্যে ফোকাসড্‌ হয়ে বেঁকে গিয়ে

দ্বিতীয় একটি সিন্টিলেশন কাউন্টারের উপর পড়ে। তখন দ্বিতীয় সিন্টিলেশন কাউন্টারে তাদের উপস্থিতির চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় কাউন্টারে সাধারণতঃ কয়েকটি অ্যান্টি-প্রোটন এবং তার সঙ্গে প্রায় ৫০ হাজার গুণ বেশী পাই-মেসন ভারী, তখন তার গতিবেগ পাই-মেসনের চেয়ে কম হবে। হিসাব করে দেখা গেছে, প্রথম কাউন্টার থেকে দ্বিতীয় কাউন্টারের মধ্যবর্তী ৪০ ফুট পথ অতিক্রম করতে অ্যান্টি-প্রোটনের লাগে এক সেকেণ্ডের ড়্-কোটি ভাগের একভাগ সময়; আর

ডাঃ এমিলিও সেগ্রে

(ঋণবিদ্যুৎ-বিশিষ্ট) আসতে পারে। শুধু তা-ই নয়, এই পথের মধ্যে যে কোন একটি অ্যান্টি-প্রোটনের ভর ও বেগের গুণফল অন্য যে কোন পাই মেসনের অনুরূপ গুণফলের সঙ্গে সমান। অ্যান্টি-প্রোটনের ভর যখন পাই-মেসনের তুলনায় পাই-মেসনের লাগে তার চেয়ে কিছু কম সময়। সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন কণার প্রথম থেকে দ্বিতীয় কাউন্টারে যেতে কতক্ষণ সময় লাগছে, তা পরিমাপ করে বলে দেওয়া যায় যে, সেটি পাই-মেসন, না অ্যান্টি-প্রোটন। সেগ্রে ও চেম্বারলেন তাঁদের

প্রথম পরীক্ষায় এভাবে ৬০টি অ্যান্টি-প্রোটনের উপস্থিতি ধরতে পেরেছিলেন।

অ্যান্টি-প্রোটনের অস্তিত্ব সম্পর্কে আরও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়ার জন্যে সেগ্রে ও চেম্বারলেন দ্বিতীয় সিন্টিলেশন কাউন্টারের পরে ছুটি সেরেনকফ কাউন্টার পর পর বসিয়েছিলেন। এদের প্রথমটিতে ঘণ্টায় ১৪৬৯৪০ মাইলের চেয়ে বেশী গতিসম্পন্ন তড়িতাবিষ্ট কণাই কেবল তাদের উপস্থিতি জানাতে পারে। আর দ্বিতীয়টিতে ঘণ্টায় ১৩১৫০০ মাইল থেকে ১৪৫০৮০ মাইল পর্যন্ত গতিসম্পন্ন যে কোন কণার উপস্থিতি ধরা যায়। দ্বিতীয় সিন্টিলেশন কাউন্টার পার হয়ে এসে দ্রুত গতিসম্পন্ন পাই-মেসনগুলি কেবল প্রথম সেরেনকফ কাউন্টারে এবং অপেক্ষাকৃত ধীর গতিসম্পন্ন অ্যান্টি-প্রোটনগুলি কেবল দ্বিতীয় সেরেনকফ কাউন্টারে এসে ধরা পড়বে। প্রথম সেরেনকফ কাউন্টারে যদি কোন কণার সাড়া না পাওয়া যায়, অথচ দ্বিতীয়টিতে সাড়া পাওয়া যায়, তাহলে বোঝা যাবে সেটি হচ্ছে অ্যান্টি-প্রোটন।

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রোটন ও অ্যান্টি-প্রোটন যদি মিলিত হয় তাহলে পরস্পরকে বিনাশ করবে এবং তার ফলে অন্ততঃ ১৮০ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি মুক্তি পাবে। এই শক্তির পরিমাপ করেও অ্যান্টি-প্রোটনের অস্তিত্বের দৃঢ় প্রমাণ দেওয়া যায়। বীভাট্রন যন্ত্রে বসানো তামার টুক্‌রাটি থেকে যে ঋণাত্মক কণাগুলি পাওয়া যায়, সেগ্রে ও চেম্বারলেন তাদের পথে বিশেষ এক ধরণের ফটোগ্রাফিক প্লেট (যা রূপা ও ব্রোমিনের রাসায়নিক মিশ্রণ দিয়ে তৈরী) বসিয়ে এক্সপোজার দেন। এক্সপোজার দেওয়ার পর প্লেটগুলি বীক্ষণাগারে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্লেটের ভিতর দিয়ে চলবার কালে একটি অ্যান্টি-প্রোটন হঠাৎ এক জায়গায় রূপা অথবা ব্রোমিন পরমাণুর কেন্দ্রে বন্দী হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে ১৫।২০টি বিভিন্ন ধরণের কণা বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে গেছে। এই বিক্ষিপ্ত কণাগুলির চলবার পথ ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর তারকা চিহ্নের আকারে ধরা পড়ে। বিশেষ উপায়ে বিজ্ঞানীরা এই কণাগুলির শক্তির পরিমাপ করে দেখলেন, অ্যান্টি-প্রোটনের একার পক্ষে এতটা শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব নয়। রূপা অথবা ব্রোমিন পরমাণুর কেন্দ্রীনে একটি প্রোটন এবং বন্দী অ্যান্টি-প্রোটনের যুগপত্তার বিলোপেই এরূপ শক্তি পাওয়া সম্ভব। ফটো-প্লেটের তারকা চিহ্ন তাহলে প্রোটেন-অ্যান্টিপ্রোটেনের বিলোপই সূচিত করে, অর্থাৎ প্লেটে প্রবেশকারী কণাটি যে অ্যান্টি-প্রোটন, তার স্বপক্ষেই দৃঢ় প্রমাণ দেয়।

সেগ্রে ও চেম্বারলেনের অ্যান্টি-প্রোটন আবিষ্কার বস্তুজগতে অ্যান্টি-ম্যাটারের অস্তিত্বের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহলে বর্তমানে চিন্তার সৃষ্টি করেছে। এক শ্রেণীর বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আমাদের ছায়াপথের বাইরে এমন কোন ছায়াপথ থাকতে পারে, যেখানে জড়পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রে অ্যান্টি-প্রোটনই রাজত্ব করছে, আর তার বাইরে ঘুরছে পজিট্রনের দল। এই ছায়াপথের জড়পদার্থগুলি হবে আমাদের পরিচিত জড়পদার্থের বিপরীত, অর্থাৎ তাদের বলা যেতে পারে অ্যান্টি-ম্যাটার। এই ছায়াপথ থেকে যদি কোন অ্যান্টি-ম্যাটার এসে আমাদের পরিচিত জড়পদার্থের উপর পড়ে তাহলে প্রোটন, অ্যান্টি-প্রোটন এবং ইলেকট্রন, পজিট্রন কাছাকাছি আসবার দরুণ তারা পরস্পরকে ধ্বংস করে প্রচণ্ড শক্তির জন্ম দেবে, অর্থাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সৃষ্টি করবে। এ-রকম কোন বিস্ফোরণের সংবাদ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখনও পান নি। কাজেই অ্যান্টি-ম্যাটারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে এখনও কিছু বলা সম্ভব নয়।

যাদু-বর্গ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

ম্যাজিক স্কোয়ার বা যাদু-বর্গ প্রাচীন কাল হইতেই গণিতজ্ঞদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। সাধারণ লোকেরও এই সম্পর্কে কৌতূহল বড় কম নয়! অনেকের বিশ্বাস, যাদু-বর্গের অলৌকিক শক্তি আছে। ভারতবর্ষে ধাতু বা পাথরের উপর যাদু চতুষ্কোণ খোদাই করিয়া মাদুলীর মত ধারণ করিবার প্রথা আছে। পূর্বকালে জ্যোতিষীদের ধারণা ছিল যে, এই সমস্ত ঘর-পূরণের সঙ্গে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগ বর্তমান। সচরাচর সমস্ত যাদু-বর্গের সংখ্যাগুলি উপর হইতে নীচে, পাশাপাশি কিম্বা কোণাকুণি যোগ করিলে যোগফল সব সময় একরকম হয়। ইম্যানুয়েল সস্কোপিউলাস নামক একজন গ্রীক গণিতজ্ঞ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে যাদু-বর্গ সম্পর্কে সর্বপ্রথম স্বীয় মতামত লিপিবদ্ধ করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রষ্ট নামীয় এক ইংরেজ ভদ্রলোক নাসিকে অবস্থানকালে এদেশের যাদু-বর্গ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ১৯৫৭ সালে কেম্ব্রিজ হইতে মুদ্রিত কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এখন এখানে কয়েক প্রকার চিত্তাকর্ষক যাদু-বর্গের নিদর্শন দেওয়া হইতেছে।

১। সংস্কৃত ভাষায় চার অঙ্কের এই ঘর-পূরণটি

১৫	১০	৩	৬
৪	৫	১৬	৯
১৪	১১	২	৭
১	৮	১৩	১২

৩৪

১নং চিত্র

গোয়ালিয়ার দুর্গের দ্বারদেশে উৎকীর্ণ ছিল। ইহার যোগফল ৩৪।

২। তিন অঙ্কের এই যাদু-চৌকা মুদীর দোকানে দেওয়ালের গায়ে প্রায়ই অঙ্কিত থাকিতে দেখা যায়। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ইহা

৮	১	৬
৩	৫	৭
৪	৯	২

১৫

২নং চিত্র

সৌভাগ্যসূচক। ইহার যোগফল ১৫।

৩। এইবার যে যাদু-বর্গ দেওয়া হইবে, উহাতে দুই রকম ঘর-পূরণ আছে। সমগ্র যাদু-বর্গের যোগফল ৬৫; উহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র বর্গের যোগফল ৩৯।

২৩	১	২	২০	১৯
২২	১৬	৯	১৪	৪
৫	১১	১৩	১৫	২১
৮	১২	১৭	১০	১৮
৭	২৫	২৪	৬	৩

৬৫ ও ৩৯

৩নং চিত্র

৮×	২৫৬	×২
৪ ×	১৬	×৬৪
১২৮×	১	×৩২

৪০৯৬

৪নং চিত্র

৪। ৪নং চিত্রে প্রদর্শিত ম্যাজিক স্কোয়ারের গুণফল সবদিক হইতে ৪০৯৬।

৫। নিম্নের যাদু-চতুষ্কোণটির সংখ্যাগুলির

৯৬	১১	৮৯	৬৮
৮৮	৬৯	৯১	১৬
৬১	৮৬	১৮	৯৯
১৯	৯৮	৬৬	৮১

২৬৪

৫নং চিত্র

যোগফল ২৬৪। উল্টাইয়া দেখিলেও একই ব্যাপার।

৬। নীচেকার সংখ্যাগুলি ত্রিভুজের আকারে সজ্জিত, প্রতি পাশের সংখ্যাগুলির যোগফল ২০

৬নং চিত্র

৭নং চিত্র

৭। উপরে একটি যাদু-চক্র দেওয়া হইল। আটটি বৃত্ত লইয়া গঠিত এই যাদু-চক্রের মাঝখানে আছে ১২। উহার সহিত এই চক্রের ব্যাসার্ধ বা পরিধির সংখ্যাগুলি যোগ দিলে ৩৬০ হয়। কথিত আছে, ইহার আবিষ্কারক সুপ্রসিদ্ধ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

৮। এইবার একটি যাদু-তারকা দেওয়া হইল।
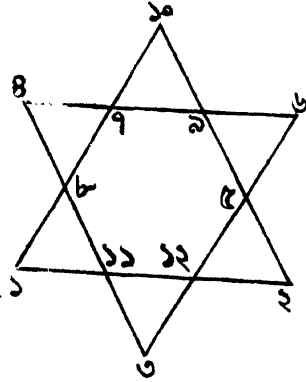
৮নং চিত্র

প্রতি সারির সংখ্যাগুলির যোগফল ২৬; আবার শীর্ষস্থ সবগুলি সংখ্যা যোগ দিলেও হয় ২৬।

৯। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় ৩২-এর ম্যাজিক স্কোয়ার দেওয়া আছে। পঞ্জিকাকারের মতে,

১	৮	৯	১৪
১১	১২	৩	৬
৭	২	১৫	৮
১৩	১০	৫	৪

৩২

৯নং চিত্র

বত্রিশের ঘর-পূরণের সহিত নিম্নলিখিত এই মন্ত্র অশ্বত্থ পত্রে লিখিয়া প্রসূতির কেশের সহিত বাঁধিয়া দিলে কোনরূপ কষ্ট হয় না—

চন্দ্র নেত্র সমুদ্র বাণ,
পৃষ্ঠে নব করি বুঝহ সন্ধান।
যাহা কর অঙ্ক তাহা কর আধা,
কুম্ভ পদে ভাগ সমাধা।

সর্বশেষে বিযোড় সংখ্যার যাদু-বর্গ গঠনের কৌশল প্রকাশ করিয়া এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই প্রণালীর আবিষ্কারক ডি লা লুবিয়ার। তিনি ১৬৮৭ সালে ফরাসী নৃপতি চতুর্দশ লুইয়ের শ্যামদেশস্থ রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং সেই দেশে অবস্থান কালে এই নিয়মের বিষয় অবগত হন। প্রথমে ১ সংখ্যাটি উপরের সারির মাঝের ঘরে স্থাপন করা হয়। অতঃপর ২ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য সংখ্যাগুলি যথাক্রমে পরপর কোণাকুণিভাবে উপরের দিকে দক্ষিণ পার্শ্বে লেখা হইয়া থাকে। কেবল (১) উপরের সারি পৌঁছাইয়া গেলে পরের সংখ্যাটি একেবারে তলার লাইনে লেখা হয়, যেন উহা ঠিক উপরের সারির নীচেই আছে। (২) যখন ডানদিকের শেষ স্তম্ভে আসিয়া যায়, তখন পরের সংখ্যাটি বামদিকের স্তম্ভে লিখিত হয়, যেন উহাই দক্ষিণ স্তম্ভের পরে বর্তমান। (৩) যখন দেখা যায়, কোন ঘর আগেই পুরণ হইয়া গিয়াছে অথবা যখন উপরের দিকে দক্ষিণ সারির শেষ প্রান্তে উপনীত হয়, তখন এই সংখ্যাক্রম ঠিক

১৭	২৪	১	৮	১৫	
২৩	৫	৭	১৪	১৬	
৪	৬	১৩	২০	২২	৬৫
১০	১২	১৯	২১	৩	
১১	১৮	২৫	২	৯	

১০নং চিত্র

নীচেকার ঘরে লিখিতে আরম্ভ করিয়া আবার উপরের দিকে কোণাকুণি উঠিতে হয়। ১০নং নক্সায় প্রদর্শিত ঘর-পূরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বিষয়টি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

i-এর কথা

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ

১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' একটি প্রবন্ধ গণিতের একপ্রকার সংখ্যাযুগ্মের কথা বলিয়াছিলাম। ঐ সংখ্যাযুগ্মের অথবা জটিল সংখ্যার (number pair or complex number) যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের নিয়ম এরূপ যে, তাহা হইতে i নামক একটি সংখ্যা পাওয়া যায় যাহার বর্গ একটি ঋণ-সংখ্যা, -1। এই সংখ্যাটিকে কল্পিত-সংখ্যা (imaginary number) বলা হয়।

এই i-সংখ্যাটির আরো একটি সহজ ব্যাখ্যা আছে। তাহাই এখন বলিতেছি।

যে সংখ্যার শুধু মান (magnitude) আছে, তাহাকে স্কেলার (Scalar) সংখ্যা বলে। যেমন, ১, ২, ½, ·৭ ইত্যাদি। আর একপ্রকার সংখ্যা আছে যাহার মান ব্যতীত তাহার 'দিক'ও না জানিলে সংখ্যাটি ঠিক জানা হয় না। যেমন ১ মাইল পথ। এই পথটি কোন্ দিকে—পূর্বে, না পশ্চিমে, না আর কোন দিকে, তাহা না জানিলে শুধু এই পথের দৈর্ঘ্য জানিলে ইহার স্পষ্ট পরিচয় হয় না। ক স্থানটি খ হইতে এক মাইল দূরে বলিলে, ক-এর অবস্থিতি কোথায়, তাহা বুঝা যাইবে না। কিন্তু যদি বলা যায়, ক স্থানটি খ হইতে দক্ষিণ দিকে ১ মাইল দূরে, তাহা হইলে এই এক মাইল দূরের স্থানটিতে পৌছান যাইবে। এই দিক-সম্মত সংখ্যাকে ভেক্টর (vector) বলে। একটি সরল রেখা যদি আঁকা যায়, তবে তাহার মান এবং দিক (magnitude and direction) দুই-ই আঁকিতে হয়। সেই জন্য ভেক্টর সংখ্যাকে একটি সরল রেখা দিয়া লেখাই সুবিধা। যেমন, ১নং চিত্রে প্রদর্শিত রেখা।

এই রেখার প্রত্যেকটি কত লম্বা এবং কোন্ দিকে টানা হইয়াছে, তাহা জানিলেই তবে এই ভেক্টর-গুলিকে জানা যাইবে।

কোন রেখার দিক নির্ণয় করিতে হইলে একটি নির্দিষ্ট এবং জ্ঞাত দিক হইতে মাপিয়া এই রেখা এবং নির্দিষ্ট রেখার মধ্যে কৌণিক ব্যবধান কত তাহা জানিতে হইবে। যেমন, ২নং চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে—

১নং চিত্র

যদি x'ox এবং y'oy দুইটি লম্বভাবে ছেদকারী সরল রেখা জানা থাকে, তাহা হইলে OA এই রেখাটির দৈর্ঘ্য এবং Aox এই কোণ জানিলে OA এই ভেক্টরটিকে সম্পূর্ণ জানা যায়।

এখন মনে করা যাক, op একটি ভেক্টর। ইহার মান x. এই ভেক্টরটিকে (o-এর অবস্থান ঠিক রাখিয়া) oQ—এই স্থানে আনা গেল। অর্থাৎ, op-কে এক সমকোণ ঘুরাইয়া oQ এই ভেক্টর

পাওয়া গেল। কোন ভেক্টরকে তাহার 'মান' ঠিক রাখিয়া তাহার 'দিক' যদি এক সমকোণ ঘুরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই নূতন ভেক্টরটিকে i x বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ i দিয়া গুণ করিবার অর্থ, ভেক্টরটিকে এক সমকোণ ঘুরাইয়া দেওয়া। সুতরাং $oQ = ix$.
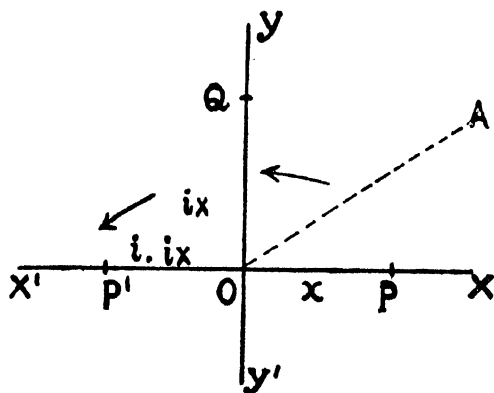
২নং চিত্র

oQ-কে ঠিক এমনি করিয়া আবার এক সমকোণ ঘুরাইয়া আনিলে op^1 হইবে। সুতরাং $op^1 = i\,(ix) = i^2x$.

কিন্তু op^1 এবং op ঠিক একই রেখা, কিন্তু বিপরীত দিকে। সুতরাং $op^1 = -op = (-1)\,op = (-)x$.

অতএব দেখা যাইতেছে যে, op^1-কে যেমন i^2x লেখা যায়, তেমনি উহাকে $(-1)x$ ও লেখা যায়।

অতএব $i^2 = -1$, অথবা $i = \sqrt{-1}$.

সুতরাং এই i, অর্থাৎ সেই কল্পিত সংখ্যা, যাহার বর্গ একটি ঋণ সংখ্যা, এমন একটি সংখ্যা যাহার দ্বারা কোন ভেক্টরকে গুণ করিলে ভেক্টরটিকে এক সমকোণ ঘুরাইয়া দেওয়া হয়।

সঞ্চয়ন

স্বয়ংক্রিয় অনুবাদক যন্ত্র

মস্কোয় একটি প্রতিষ্ঠান আছে যার নাম—ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড টেক্‌নিক্যাল ইনফরমেশন। সারা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে যত রকমের বৈজ্ঞানিক আর টেক্‌নিক্যাল পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার প্রত্যেকটির কয়েক কপি করে এখানে আসে। তাছাড়া প্রতিদিন বিদেশ থেকে আসে প্রায় ৫০০ সাময়িক পত্রিকা আর বই। ৫০টি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত এসব বই আর পত্রিকা আসে ৮৫টি দেশ থেকে। মস্কোর এই ইনষ্টিটিউটে দেড় হাজার অনুবাদক কাজ করেন। তাছাড়া এই ইনষ্টিটিউটের সঙ্গে উপদেষ্টা, পরামর্শ-দাতা এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তথ্য সরবরাহকারী হিসাবে যুক্ত আছেন ১৩ হাজার ব্যক্তি, যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানে আছেন আরও কয়েক শত সম্পাদক ও পর্যালোচক। এই যে দেড় হাজার অনুবাদক প্রতিদিন এখানে কাজ করেন, তাঁদের শ্রম লাঘবের জন্যে কি যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া সম্ভব নয়? যন্ত্রের মারফৎ অনুবাদের কাজ চলবে—এমন একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বহু দিন থেকেই চেষ্টা করছেন।

নিখিল-সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের অধীনে ইনষ্টিটিউট অব প্রিসিশন মিকানিক্স অ্যাণ্ড কম্প্যুটিং টেক্‌নিক' নামে একটি গবেষণা-প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো সূক্ষ্ম মাপজোক আর গণনার কাজ চালাবার জন্যে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরী করা এবং সে সম্পর্কে গবেষণা করা। এখানকার এক দল কর্মী ১৯৫৫ সালে "বেসম্" (বি. ই. এস. এম.) নামে এক নতুন ধরণের ইলেকট্রনিক কম্পিউটর যন্ত্র পরীক্ষামূলক-ভাবে নির্মাণ করেন। এই যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় যে কোন ইংরেজী রচনাকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করতে সক্ষম।

ইংরেজী ভাষায় শব্দের মোট সংখ্যা হলো প্রায় ৪ লক্ষ। এগুলির মধ্যে সাধারণতঃ সাহিত্য, সংবাদপত্র, বক্তৃতা এবং কথাবার্তায় সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় প্রায় ৫ হাজার শব্দ। বৈজ্ঞানিক টেক্‌নিক্যাল বিষয় সংক্রান্ত রচনা ও আলোচনায় যে সব শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাদের সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও অনেক কম।

১৯৫৫ সালের এই বেসম্ যন্ত্রের যান্ত্রিক শব্দের সংখ্যা হলো—ইংরেজী শব্দ ৯৫২টি, আর রুশ শব্দ ১,৯৭২টি। এই যন্ত্রটি গণিত সংক্রান্ত কতকগুলি অপেক্ষাকৃত সহজ রচনা, "দি টাইমস্" নামক সংবাদপত্রের কতকগুলি সংবাদ ও প্রবন্ধ এবং ডিকেন্সের "ডেভিড কপারফিল্ড" উপন্যাসের কতক-গুলি অধ্যায় রুশ ভাষায় অনুবাদ করতে সক্ষম হয়।

এই যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অনুবাদের কাজ কি ভাবে চলে? ইংরেজী আর রুশ ভাষার অনুরূপ অক্ষরগুলির জন্যে একটি করে অঙ্ক (ডিজিট) থাকে; যেমন—'এ' হলো ১৬, 'বি' ০৬, 'সি' ১৩, ইত্যাদি। শব্দগুলির জন্যে থাকে এক-একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা কোড। যন্ত্রটির 'স্মৃতি-কোঠায়' একটি ইংরেজী-রুশ 'যান্ত্রিক অভিধান'-এর ব্যবস্থা আছে। এই যান্ত্রিক অভিধানের ইংরেজী অংশের প্রত্যেকটি শব্দের যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে, রুশ অংশের প্রতিশব্দগুলির জন্যেও সেই একই সাঙ্কেতিক চিহ্ন নির্দিষ্ট আছে। একটি ইংরেজী শব্দের বিভিন্ন অক্ষরের ডিজিটগুলির মোট যোগ-

ফল সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দটির কোড পাওয়া গেল। এই ইংরেজী শব্দের কোড ওই যান্ত্রিক অভিধানের বিশেষ ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হলো তার রুশ শব্দটির কোড-এ। অক্ষরের সমন্বয়ে যেমন শব্দ, তেমনি শব্দের সমন্বয়ে বাক্য। যে প্রক্রিয়ায় ইংরেজী শব্দের রুশ প্রতিশব্দ হচ্ছে, সেরূপ কিন্তু আরও জটিল প্রক্রিয়াতেই ইংরেজী বাক্যের রুশ বাক্যানুবাদ হচ্ছে। প্রতিটি শব্দের জন্যে সময় লাগছে এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

একটি বিশেষ ইংরেজী শব্দের একাধিক অর্থ-বোধক রুশ প্রতিশব্দ থাকতে পারে। এ-ক্ষেত্রে সঠিক রুশ শব্দটি নির্বাচন করা এক গুরুতর সমস্যা। অন্যান্য সমস্যার মধ্যে আছে—বাক্যাংশ বা ফ্রেজ ও ইডিয়মের সঠিক রুশ বাক্যাংশ আর বাগ্‌বিন্যাস নির্ণয় করা; এক ভাষার কালার্থ আর লিঙ্গার্থ অন্য ভাষায় নির্ণয় করা; এক ভাষার শব্দবিন্যাস অন্য ভাষায় ভিন্নতর শব্দবিন্যাসে রূপান্তরিত করা ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে গত তিন-চার বছরে এই সব সমস্যারও সুষ্ঠু সমাধান হয়েছে এবং এই অনুবাদক যন্ত্র সেই সঙ্গে ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে উঠেছে। বর্তমানে এই স্বয়ংক্রিয় অনুবাদক যন্ত্রের ক্রিয়াকৌশল এতই জটিল যে, ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যাঁরা খুব পারদর্শী, তাঁরা ব্যতীত আর কারুর পক্ষে এর কার্যপ্রণালী বুঝে ওঠা সম্ভব নয়।

ইদানীং নিখিল-সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের বিভিন্ন বিভাগে প্রায়ই এই যন্ত্রের সাহায্যে অনুবাদের কাজ চালানো হচ্ছে। বর্তমানে ইংরেজী, জার্মান, চীনা আর জাপানী—এই কয়টি ভাষা থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে। হাঙ্গেরীয় আর ফরাসী ভাষা থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করবার যন্ত্র নির্মাণের কাজও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। ইংরেজী থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করবার 'বেস্‌ম্‌' যন্ত্রটি বর্তমানে এত উন্নত হয়েছে যে, এখন এর 'যান্ত্রিক অভিধান'-এর ইংরেজী শব্দ-সংখ্যা হলো ২,৩০০। ১৯৫৫ সালে নির্মিত প্রথম 'বেস্‌ম্‌' যন্ত্রটিতে ইংরেজী শব্দের সংখ্যা ছিল ৯৫২।

এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে অনুবাদ ক্রিয়ার ভিত্তি হিসাবে আজ এক নতুন বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। এই যান্ত্রিক অনুবাদের বিজ্ঞানকে বলা হয়—ম্যাথেম্যাটিক্যাল লিঙ্গুইষ্টিক্‌স্‌ বা গাণিতিক ভাষাশাস্ত্র—যে শাস্ত্রের মূল কাজটি হলো, মানুষের ভাষাকে অঙ্কে রূপান্তরিত করা।

ইদানীং যখন সোভিয়েট দেশে মোট ছয়টি ভাষায় স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক অনুবাদের কাজ চলেছে, তখন ব্যাপক হারে এই যন্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ারেরা ব্যাপক হারে এই অনুবাদক যন্ত্র উৎপাদনের পরিকল্পনা রচনা করেছেন।

এই সঙ্গে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আজকাল স্বয়ংক্রিয় পাঠ-যন্ত্রও নানাস্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই যন্ত্র রুশ ভাষায় লেখা যে কোন বই পড়ে শোনাতে পারে। এর ফলে সবচেয়ে লাভবান হয়েছে অন্ধ ব্যক্তিরা। অবশ্য এই পাঠ-যন্ত্র যে বইটা পড়ে শোনাবে, সেই বইটার আকার একটু বিশেষ ধরণের হওয়া দরকার।

সোভিয়েট দেশের কতকগুলি ছাপাখানায় ইতিমধ্যেই স্বয়ংক্রিয় প্রুফ সংশোধনের যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। এই যন্ত্র বর্তমানে প্রতি মিনিটে ১২০টি হরফের (গড়পড়তা ৩০টি শব্দের) প্রুফ সংশোধন করতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে যাতে এই যন্ত্র প্রতি মিনিটে ৬০০ হরফের প্রুফ সংশোধন করতে পারে, সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা তার ব্যবস্থা করছেন।

ভারতবন্ধু ভ্লাদিমির হফ্‌কিন

ভারতের বন্ধু ভ্লাদিমির হফ্‌কিনের জন্মশত-বার্ষিকী ১৯৬০ সালের ১৬ই মার্চ উদযাপিত হয়। এই রুশ বীজাণু-তত্ত্ববিদ্‌ প্রায় বিশ বছর একটানা (মাঝখানে বার কয়েক স্বল্পকালীন বহির্গমনের কথা বাদ দিলে) ভারতবর্ষে কাটাইয়াছেন, ১৮৯৩ হইতে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘ কাল তিনি প্লেগ ও কলেরার ন্যায় সাংঘাতিক ব্যাধির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। একটা মোটামুটি হিসাব অনুসারে তাঁহার উদ্ভাবিত প্লেগের টিকা ৪ কোটি নরনারীর জীবন রক্ষা করিয়াছে।

হফ্‌কিন জন্মগ্রহণ করেন রাশিয়ায়। তাঁহার পাঠ্যজীবনও কাটে রাশিয়ায়। ওডেসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত জীব-বিজ্ঞানী ইলিয়া মেচ্‌নিকফ প্রমুখ সেই সময়ের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা। বিগত শতকের নবম দশকের শেষের দিকে মেচ্‌নিকফ প্যারিসে যান বিখ্যাত পাস্তুর ইনষ্টিটিউটে কাজ করবার জন্য। কিছুকাল পরে হফ্‌কিন তাঁহার অধ্যাপকের অনুগমন করেন। হফ্‌কিন তখন সংক্রামক ব্যাধিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইতে-ছিলেন। সেই সময় প্যারিসে যুবক হফ্‌কিন যে চারিত্রিক গুণের পরিচয় দেন, পরবর্তীকালে সেই গুণের ভূয়সী প্রশংসা করেন তাঁহার ভারতীয় বন্ধুরা। সেই গুণটি এই যে, তিনি কখনও অর্থের লোভে বা ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজ করিতেন না। পাস্তুর ইনষ্টিটিউটে তিনি সামান্য বেতন পাইতেন; কিন্তু দারিদ্র্য তাঁহাকে সাধনার পথ হইতে এক তিলও বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

এই রুশ বিজ্ঞানী কলেরা নিবারণের টিকা বাহির করিবার জন্য অক্লান্ত গবেষণা চালাইয়া যাইতে থাকেন। সেই সময় পূর্ব ভারতে, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে, কলেরায় বহু লোক প্রাণ হারাইত। হফ্‌কিনের কলেরার টিকা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তৎকালীন বৃটিশ উপনিবেশের জনসাধারণকে টিকা দিবার জন্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হইলেন। ভারতবর্ষে যাইবার আগেই তিনি এই নূতন উদ্ভাবিত টিকা দুই বার তাঁহার নিজের উপর এবং তাঁহার তিনজন রুশ বন্ধুর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

হফ্‌কিন ভারতে প্রথম পদার্পণ করেন ১৮৯৩ সালে। কলিকাতায় পৌঁছিবার পরে তিনি শহরে শহরে এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া হাজার হাজার লোককে কলেরার টিকা দিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কলেরার টিকা আসামের চা-বাগানগুলির হাজার হাজার শ্রমিক ও পাঞ্জাবের অগণিত কৃষকের জীবন রক্ষা করিয়াছে।

ঐ সময়ে বহু অজ্ঞ লোক, ভারতের জনগণের জন্য হফ্‌কিন যে কি আশীর্বাদ বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। এমন গোঁড়া লোকও ছিল, যাহারা এই বিজ্ঞানীকে হত্যা করিবার হুমকি পর্যন্ত দেখাইয়াছে। ঐ সব ভীতি-প্রদর্শনে তিনি কখনও কর্ণপাত করেন নাই এবং সঙ্গে কোন দেহরক্ষী রাখেন নাই। ভারতের গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে অব্যাহত গতিতে তাঁহার সেই দীর্ঘ ও কঠিন সেবাব্রত চলিতে লাগিল। অবশেষে একদিন তিনি ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িলেন এবং ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। তখন তাঁহার ব্রত ভারতে অসমাপ্ত রহিয়াছে বলিয়াই তিনি মনে করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—আমার শক্তিসামর্থ্য ফিরিয়া পাইলে আবার আমি কলেরা ব্যাধির সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিব।

১৮৯৬ সালে বোম্বাই শহরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব

ঘটে। ঐ বছরেরই শরৎ কালে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা এক শত ছাড়াইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। বোম্বাই শহরের অধিবাসীরা তখন মহা বিপদের মধ্যে। সেই সময় হফ্‌কিন ভারতে ফিরিয়া আসিয়া বোম্বাই-এর সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল কলেজের একটি ছোট্ট লেবরেটরিতে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তিন জন ভারতীয় সহকারীকে লইয়া তিনি তাঁহার কলেরার টিকার মতই ফলপ্রসূ প্লেগের টিকা উদ্ভাবনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ঐ ছোট্ট লেবরেটরির মধ্যে রাতদিন কাজ চলিতে থাকে। ১৮৯৭ সালের ১০ই জানুয়ারী হফ্‌কিন জন্তু-জানোয়ারের উপর তাঁহার এই টিকা পরখ করিবার পরে প্রথমে নিজেরই দেহে বেশ ভারী এক মাত্রা প্রবেশ করাইয়া দেন।

হফ্‌কিন জানিতেন যে, তিনি প্লেগে আক্রান্ত হইলে তাঁহাকে কেহ বাঁচাইতে পারিবে না। এই প্লেগের বিরুদ্ধে তখন পর্যন্ত বিজ্ঞানের কোন রক্ষা-কবচই ছিল না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ প্রতীক্ষমান ভারতবাসীর কথা ভাবিয়া হফ্‌কিন ঐ সাংঘাতিক ঝুঁকি লইলেন। চব্বিশ ঘণ্টাকাল তাঁহার দেহের অভ্যন্তরে সংক্রমণের তোলপাড় চলিল। দেহের উত্তাপ অসম্ভব বাড়িয়া গেল, হৃৎস্পন্দন হইতে লাগিল এলোমেলো। এই অবস্থায়ও হফ্‌কিন কিন্তু লেবরেটরি ত্যাগ করিলেন না। প্রবল জ্বর ও অসম্ভব দুর্বলতা সত্বেও তিনি গবেষণার কাজ চালাইয়া যাইতে থাকেন। এমন কি, ঐ দিনই নূতন হাসপাতাল খুলিবার প্রশ্ন লইয়া আলোচনার জন্য আহূত এক সভায় তিনি বক্তৃতাও করেন। দ্বিতীয় দিন এই বীজাণু-বিজ্ঞানী টের পাইলেন আক্রমণের ধাক্কা মন্দীভূত হইতে সুরু করিয়াছে। ইহার অর্থ—পৃথিবীতে প্লেগের প্রথম টিকা সাফল্য-মণ্ডিত হইল। তখন হইতে মানুষ সর্বপ্রথম ঐ সাংঘাতিক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ছাড়িয়া আক্রমণকারীর পর্যায়ে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইল।

বোম্বাই-এর ডাক্তার ও বুদ্ধিজীবীরা হফ্‌-কিনের এই সৎসাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বহু কলেজের অধ্যাপক, চিকিৎসক ও শিক্ষিত ভারতীয় এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনের উপর জন-সাধারণের আস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লেবরেটরিতে হফ্‌কিনের প্লেগের টিকা লইতে আসিতেন।

ভ্লাদিমির হফ্‌কিন তাঁহার এই নূতন প্লেগের টিকা লইয়া আবার ভারতের শহর ও গ্রাম পরি-ক্রমায় বাহির হইলেন। বহু স্থানে তিনি নিজের হাতেই লোকজনকে টিকা দিয়াছেন। একমাত্র বোম্বাই শহরেই তিনি ১২ হাজার মুসলমান নাগরিককে টিকা দিয়াছিলেন। কলিকাতা ও করাচীতে বহু সহস্র নরনারী এই প্লেগের টিকা নেন। প্লেগ সম্পর্কে নিযুক্ত এক বিশেষ ভারতীয় কমিশন এই ব্যাপক টিকাদানের ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, টিকা-লওয়া লোকদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা টিকা না-লওয়া লোকদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যার পনেরো ভাগের এক ভাগ মাত্র। উক্ত কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে ভ্লাদিমির হফ্‌কিনের এই সব কাজকে ভারতে রোগ-প্রতিষেধক ঔষধের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলিয়া মন্তব্য করেন।

হফ্‌কিনের কাজের গুরুত্ব কিন্তু সব লোকেই সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ১৯০২ সালে পাঞ্জাবে ব্যাপকভাবে টিকা দেওয়ার কালে লোক-জনের অসাবধানতাবশতঃ টিকার শিশির মধ্যে টিটেনাসের বীজাণু প্রবেশ করে। মালকোওয়ালা গ্রামের জন কয়েক লোক এই ভুলের জন্য প্রাণ হারায়।

কে বা কাহারা এই ভুলের জন্য দায়ী তাহা বহু কাল অপরিজ্ঞাত ছিল। তৎকালে অনেকেই কিন্তু মালকোওয়ালা গ্রামের ঐ দুর্ভাগ্যের সুযোগ লইয়া হফ্‌কিনের নিন্দাবাদ করেন। পৃথিবীর বিশিষ্ট জীবাণু-বিজ্ঞানীদের অনেকেই এই ব্যাপারে হফ্‌-কিনের কোন দোষ নাই বলিয়া মত প্রকাশ

করেন। তৎসত্ত্বেও তাঁহাকে লেবরেটরির কর্ণধারের পদ হইতে অপসারিত করা হয়। হফ্‌কিন তাঁহার প্রিয় ভারত ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হন। এই ঘটনার পাঁচ বছর পরে ভারত সরকার অনুসন্ধানের কাজ শেষ করিবার পর হফ্‌কিনকে জানান যে, তিনি অভিযোগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছেন। অধিকন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট হফ্‌কিনের কাছে মার্জনা চাহিয়া ভারতের যে কোন জীব-বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের ভার গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানান। ভ্লাদিমির হফ্‌কিন তখন ক্যালকাটা বায়োলজিক্যাল লেবরেটরির প্রধান পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার ঠিকানায় আসিয়া পৌঁছিতে থাকে অসংখ্য অভিনন্দন বাণী। তাঁহার সহকর্মীরা এবং ভারতের জনসাধারণ বিপুল উৎসাহে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে।

হফ্‌কিনের সমসাময়িক ব্যক্তিরা তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার একজন ভারতীয় জীবনীকার লিখিয়াছেন—তিনি ছিলেন নম্র প্রকৃতির লোক। সহকর্মীদের প্রতি ছিল তাঁর প্রভূত প্রীতি। কর্মকর্তা হিসাবে তিনি ছিলেন দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। আপদবিপদে তিনি ছিলেন দরদী বন্ধু।

১৯২৫ সালে ৬৫ বৎসর বয়স্ক এই বিজ্ঞানী যখন শুনিলেন যে, তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত লেবরেটরির নাম হফ্‌কিন ইনষ্টিটিউট রাখা হইয়াছে, তখন বোম্বাইয়ের কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তিনি লিখিয়া জানাইলেন—আমার জীবনের একটা বড় অধ্যায় কাটাইয়াছি বোম্বাইতে গবেষণার কাজে। ঐ দিনগুলির সহিত জড়িত বহুবিধ স্মৃতি আমার মনে আসিয়া ভীড় করিয়াছে।

ত্রিশ বৎসর আগে ভ্লাদিমির হফ্‌কিনের মৃত্যু হয় ৭০ বৎসর বয়সে। ভারতবর্ষ ও রাশিয়ার লোকের মনে তাঁহার স্মৃতি চিরদিন অম্লান থাকিবে।

পঞ্চম পায়োনিয়ার

এস. এস. রাণা আমেরিকার পঞ্চম পায়োনিয়ার সম্বন্ধে আমেরিকান রিপোর্টারে লিখেছেন—১১ই মার্চ, ১৯৬০ সাল। প্রবাল ছড়ানো কেপ ক্যানাভেরালের বালুকাময় সমুদ্রতীরে সবেমাত্র প্রভাতের আলো এসে পড়েছে। ৯০ ফুট উঁচু প্রকাণ্ড রকেটটি দাঁড়িয়ে রয়েছে নিশ্চলভাবে, ২৬ ইঞ্চি ব্যাসের বৃত্তাকার কৃত্রিম গ্রহটিকে নিয়ে। পরীক্ষাভূমি থেকে মহাশূন্যে যাত্রা করবার সময় এগিয়ে আসছে প্রতি সেকেণ্ডে। নয়, আট, সাত, ছয়, পাঁচ · ···শেষ মুহূর্ত উপস্থিত। প্রচণ্ড বজ্রনির্ঘোষ। দেখতে পাওয়া গেল, জলন্ত উল্কার মত একটা জিনিষ শূন্যপথে ছুটে চলেছে বিদ্যুৎ-গতিতে। রকেটের গতিবেগ ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। পৃথিবীর কক্ষপথ ধরে ছুটে চললো সে সূর্য প্রদক্ষিণ করতে। যুক্তরাষ্ট্র তার '৫ম পায়োনিয়ারকে' মহাশূন্যে পাঠালো।

সুদূর মহাশূন্যের অজানা তথ্য সংগ্রহার্থে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কৃত্রিম গ্রহরূপে পঞ্চম পায়োনিয়ারকে সাফল্যের সঙ্গে পাঠানো হলো। এটা হলো, এই বিষয়ে তাদের দ্বিতীয় সাফল্য। মহাশূন্য জয়ে মানুষের সফল প্রয়াস। মানুষ অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে এ-থেকে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে পৃথিবীর কক্ষপথ ধরে সূর্যকে কৃত্রিম গ্রহরূপে এই পঞ্চম পায়োনিয়ারই সর্বপ্রথম প্রদক্ষিণ করছে। শুক্রগ্রহের কক্ষপথের কয়েক লক্ষ মাইলের ভিতর দিয়ে সে চলেছে। পৃথিবী

এবং মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথের ভিতরে থেকে যে দুটি কৃত্রিম গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করেছে, তার একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ৪র্থ পায়োনিয়ার এবং অপরটি সোভিয়েট রাশিয়ার লুনিক।

'ন্যাশনাল এরোনটিক্স্ অ্যাণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' আর 'এয়ারফোর্স ব্যালিষ্টিক মিজাইল ডিভিশন' যুক্তরাষ্ট্রের এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মিলিত হাজার ৭৪৪ মাইল বেগে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এই গতিবেগ ক্রমশঃ কমে গিয়ে ৫ হাজার ৪৫৪ মাইলের মত গিয়ে দাঁড়াবে এবং সূর্যের আকর্ষণ শক্তির বলে আরও ভিতরে গিয়ে পড়লে গতিবেগ আবার বেড়ে যাবে—বিজ্ঞানীরা এইরূপ অনুমান করছেন।

বিজ্ঞানীদের হিসাবমত এই কৃত্রিম গ্রহটি
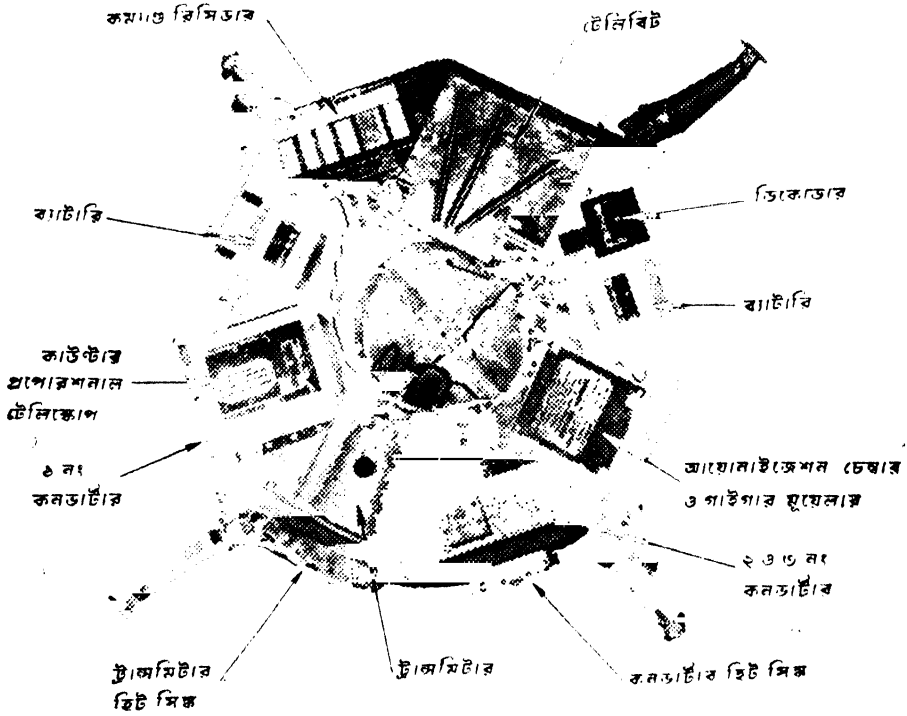
পঞ্চম পায়োনিয়ারে স্থাপিত যন্ত্রপাতি।

প্রচেষ্টায় পঞ্চম পায়োনিয়ারকে মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছে।

থর-এব্‌ল রকেটের সাহায্যে নিক্ষিপ্ত এই পঞ্চম পায়োনিয়ার নামক কৃত্রিম গ্রহটির চরম গতিবেগ দাঁড়িয়েছিল ঘণ্টায় ২৪ হাজার ৮৬৯ মাইল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব ছাড়িয়ে যাবার পর গতিবেগ কমে গিয়ে দাঁড়ায় ঘণ্টায় ৭ হাজার ৬৬৯ মাইল।

৫ম পায়োনিয়ার এখন পৃথিবী থেকে ৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৯৪ মাইল দূরের পথ দিয়ে ঘণ্টায় ৫ মাস পাঁচেকের মধ্যে সূর্যের নিকটতম কক্ষপথে গিয়ে উপস্থিত হবে। সেই সময়ে সূর্য থেকে এটি ৭ লক্ষ মাইল দূরে থাকবে; অর্থাৎ শুক্রগ্রহের কক্ষপথ থেকে প্রায় ১০ লক্ষ মাইল দূরে।

গোলাকৃতি এই কৃত্রিম গ্রহটির ব্যাস ২৬ ইঞ্চি। এর চারদিকে চারটি 'প্যাডল' বা পাখনার মত বেরিয়ে আছে। গ্রহটির ওজন ৯৪.৮ পাউণ্ড। এই পঞ্চম পায়োনিয়ার মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের কাছে যে সব তথ্য সংগ্রহ করে পাঠাবে, তা হচ্ছে—(১) তেজ-বিকিরণ সংক্রান্ত,

(২) মহাশূন্যের চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কিত, (৩) মহাশূন্যে বিচরণশীল প্লাজ্মা মেঘের গ্যাসীয় রূপের ক্রিয়াকলাপ, (৪) মহাশূন্যে ধাবমান অতি ক্ষুদ্র উল্কারাশির কার্যকলাপ এবং (৫) সূর্যমণ্ডলের জ্বলন্ত শিখার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়-সমূহ।

পঞ্চম পায়োনিয়ারের আধারটি অ্যালুমিনিয়ামে তৈরী। সৌরতেজে পরিচালিত ব্যাটারীর সাহায্যে দুটি ট্র্যান্সমিটার এর মধ্যে কাজ করবে। ছোট যন্ত্রটি ৫ ওয়াট এবং বড়টি ১৫০ ওয়াট শক্তিবিশিষ্ট। গত ১৩ই মার্চ ছোট যন্ত্রটি ৪ লক্ষ ১২ হাজার মাইল দূর থেকে পৃথিবীতে তথ্যাদি সরবরাহ করেছে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ পায়োনিয়ার ৪ লক্ষ ৭ হাজার মাইল দূর থেকে পৃথিবীতে তথ্যাদি সরবরাহ করেছে।

পাঁচ ওয়াট শক্তিবিশিষ্ট ছোট ট্র্যান্সমিটার থেকে যখন আর কোনও সঙ্কেত শোনা যাবে না, তখন ১৫০ ওয়াটের বড় যন্ত্রটিকে চালু করা হবে। এটি পাঁচ কোটি মাইল দূর থেকেও পৃথিবীতে তথ্য সরবরাহ করতে পারবে। এমন ক্ষমতাশালী ট্র্যান্স-মিটার ইতিপূর্বে সুদূর মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছে বলে জানা নেই।

কৃত্রিম গ্রহটি দূরতম সীমানা ছাড়িয়ে যাবার পরেও সৌরতেজে চালিত ব্যাটারীর সাহায্যে ঐ ট্র্যান্সমিটারের কাজ চলতে থাকবে। কয়েক মাসের মধ্যেই কৃত্রিম গ্রহটি ৫ কোটি মাইল দূরে গিয়ে উপস্থিত হবে।
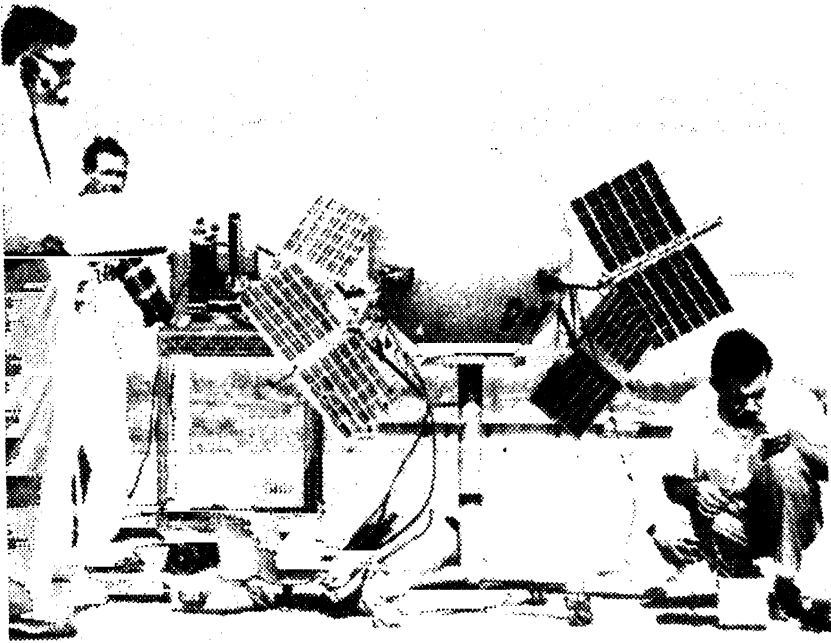
পৃথিবী থেকে মহাকাশে পাঠাবার পূর্বে পঞ্চম পায়োনিয়ারের একটি মডেলের উপর বসানো সোলার সেল প্যাডেল হুইল পরীক্ষা করা হচ্ছে।

পঞ্চম পায়োনিয়ার এই সুদূর মহাশূন্যে যখন আলোর গতিবেগে, অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে ছুটতে থাকবে, তখন ঐ

১৫০ ওয়াটের ট্র্যান্সমিটার থেকে পাঠানো সঙ্কেত পৃথিবীতে এসে পৌছুতে লাগবে প্রায় সাড়ে চার মিনিট মাত্র।

মহাশূন্যের সুদূর সীমানা থেকে পৃথিবীতে সঙ্কেত প্রেরণের অদ্ভুত সাফল্য ছাড়া এই শক্তিশালী ট্র্যান্সমিটারটির সাহায্যে আরও একটা কাজ হবে। এ-বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকই একমত যে, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হচ্ছে, কম-বেশী ৯ কোটি ৩১ লক্ষ মাইল। সূক্ষ্ম হিসাবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এটা ৫০ হাজার মাইল কম কিম্বা বেশী হতে পারে। লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি মাইলের মধ্যে এই কয়েক হাজার মাইলের কম-বেশীতে বিশেষ কিছু হয়তো যায়-আসে না। কিন্তু ভবিষ্যতে মহাশূন্য পরিভ্রমণের ক্ষেত্রে হিসাবটা আরও নিখুঁত হওয়া দরকার।

সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকে বলা হয় অ্যাষ্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের একক। মহাশূন্য পরিভ্রমণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা এই এককের ভিত্তিতেই গণনাদি করে থাকেন। সুতরাং এই পঞ্চম পায়োনিয়ার মহাশূন্যের অতি দূর সীমানা থেকে পৃথিবীতে সঙ্কেত পাঠাতে সক্ষম হওয়ায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের দূরত্ব নিরূপণ আরও নিখুঁত হবে বলে আশা করা যায়।

যে চারটি প্যাড্‌ল হুইল এই কৃত্রিম গ্রহটির গায়ে লাগানো আছে, সেগুলির প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে, যথাক্রমে ১৮ এবং ১৪ ইঞ্চি।

যে থর-এব্‌ল রকেটের সাহায্যে এই পঞ্চম পায়োনিয়ার মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, সেই রকেটের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের যন্ত্রপাতির সাহায্যেই কৃত্রিম গ্রহটি তার যাত্রাপথের প্রথম দিকটায় পরিচালিত হয়েছে।

আলো এবং ছায়ার তাপ শোষণ ও বিকিরণের বিশেষ ক্ষমতাকে কৃত্রিম গ্রহটির মধ্যে তাপ নিয়ন্ত্রণের কাজে লাগানো হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে কৃত্রিম গ্রহটির গায়ে বিশেষ ধরণে রং লাগানো হয়েছে।

মহাশূন্যে এই কৃত্রিম গ্রহটির এমন কোনও বৃহৎ বস্তুর কাছাকাছি আসবার সম্ভাবনা নেই, যার ফটোগ্রাফ নেওয়া যেতে পারে। এজন্যে এর প্যাডল হুইলে টেলিভিশনের মত প্রতিচিত্রণের কোনও যন্ত্র লাগানো হয় নি, যা পূর্বেকার প্যাডল-হুইলে লাগানো হয়েছিল।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবিত পাঁচ পাউণ্ড ওজনের শক্তিশালী রেডিয়েশন কাউণ্টার পঞ্চম পায়োনিয়ারে রাখা হয়েছে মহাশূন্যের প্রচণ্ড শক্তিশালী বিকিরণ, বিশেষভাবে সৌর-বিকিরণ পরিমাপের উদ্দেশ্যে। এর ফলাফল সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এখনও কিছুই অনুমান করতে পারেন নি।

আরগন গ্যাস পরিপূর্ণ ছয়টি সিলিণ্ডার রাখা হয়েছে কৃত্রিম গ্রহটির মধ্যে, যাদের প্রত্যেকটির আয়তন হবে দুই বর্গইঞ্চির মত। এর আগে এক্সপ্লোরার নামক কৃত্রিম গ্রহের এই রকম সিলিণ্ডার রাখা হয়েছিল। তার ফলে পৃথিবীর বিরাট তেজ-বিকিরণ বলয়ের কাছাকাছি আর একটি শক্তিশালী বিকিরণ বলয় আবিষ্কৃত হয়।

চার বর্গইঞ্চি পরিমিত একটি বাক্সের মধ্যে রাখা হয়েছে একটি গ্যাস পরিপূর্ণ আয়ন-চেম্বার এবং একটি গাইগার-মূলার কাউণ্টার। এদের মোট ওজন হবে প্রায় দুই পাউণ্ড। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই যন্ত্রগুলি দেওয়া হয়েছে। মহাশূন্যে বিকিরিত শক্তি বা তেজের বিশেষ রূপটি ধরা পড়বে এই আয়ন চেম্বারের সাহায্যে এবং মহাশূন্যে ধাবমান ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা নির্ণয়ে সাহায্য করবে ঐ গাইগার-মূলার কাউণ্টার।

মাইক্রো-মিটিয়োরাইট বা সূক্ষ্ম উল্কাচূর্ণের সংঘাতের সংখ্যা-নিরূপণ যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে এয়ার ফোর্স কেম্বিজ রিসার্চ সেণ্টার থেকে। ৫নং

কৃত্রিম গ্রহটিতে এই যন্ত্রটিও রাখা হয়েছে। মহাশূন্যে যে সূক্ষ্ম উল্কাচূর্ণের আঘাত কৃত্রিম গ্রহটির গায়ে এসে লাগবে, তার সংখ্যা নির্ণীত হবে এই হয়েছে কৃত্রিম গ্রহটির মধ্যে। এটির ওজন এক পাউণ্ড। লস্ এঞ্জেলস্ স্পেস টেক্‌নোলজি লেবরেটরি থেকে এই যন্ত্রটি তৈরী হয়েছে।
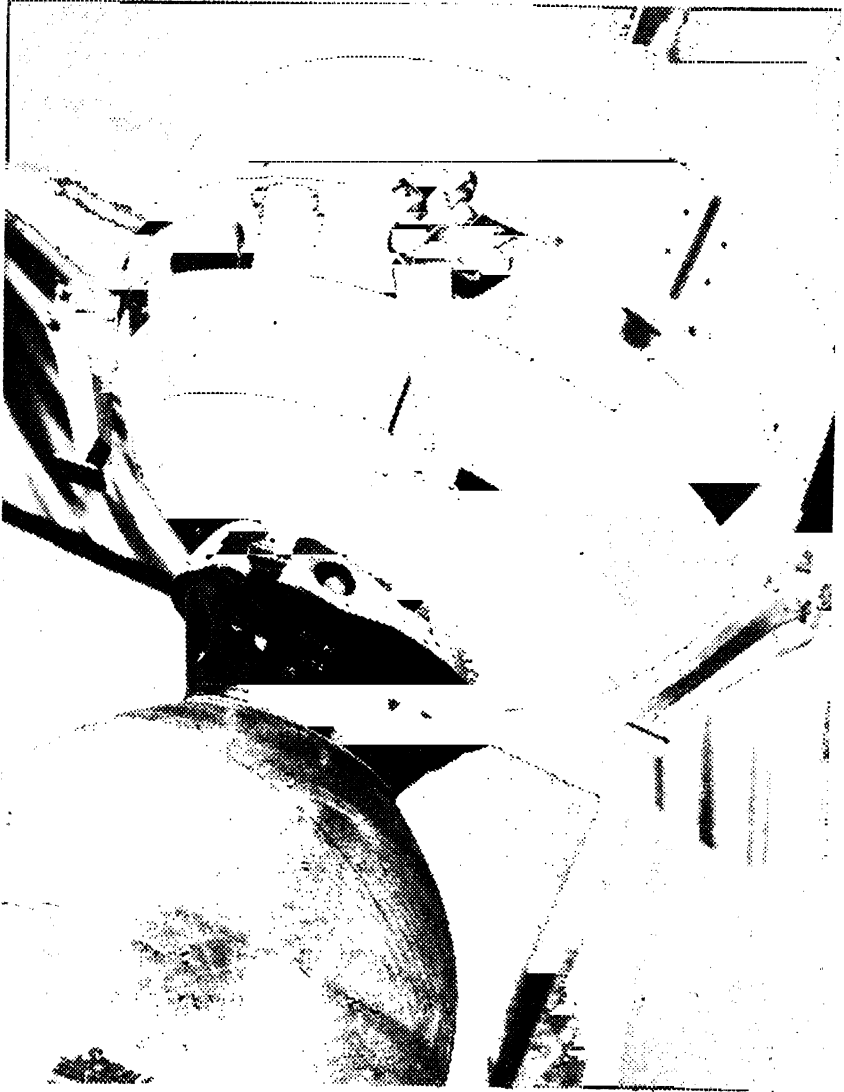
তৃতীয় পর্যায়ের রকেটে সন্নিবেশিত করবার সময় পঞ্চম পায়োনিয়ারের দৃশ্য।

যন্ত্রটির সাহায্যে। এর ওজন হচ্ছে এক পাউণ্ডেরও কম।

মহাশূন্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি এবং গতিপথ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে একটি ম্যাগ্নেটোমিটারও রাখা

আট আউন্স ওজনের একটি ফটো-ইলেকট্রিক সেল কৃত্রিম গ্রহটিতে রাখা হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাস্‌পেক্ট ইণ্ডিকেটর। এটিও তৈরী করেছেন লস্ এঞ্জেলসের স্পেস টেক্‌নোলজি

লেবরেটরির বিজ্ঞানীরা। এই যন্ত্রটি যখন সোজা-সুজি সূর্যের দিকে মুখ ফেরাবে, তখন এর সাহায্যে বিশেষ ধরণের বৈদ্যুতিক স্ফুরণ ধরা পড়বে।

এসব ছাড়া আরও কতকগুলি যন্ত্রপাতিও রাখা হয়েছে পঞ্চম পায়োনীয়ারের মধ্যে। তাদের সাহায্যে মহাশূন্যের নানাবিধ তথ্যাদি পৃথিবীতে পাঠাবার পথ সুগম হতে পারবে।

পাঁচ ওয়াটের একটি আলট্রা-হাই ফ্রিকোয়েন্সির ট্র্যান্সমিটারকে প্রয়োজন অনুযায়ী ১৫০ ওয়াট ট্র্যান্সমিটারের অ্যাম্প্লিফায়ারে পরিবর্তিত করা যাবে। ট্র্যান্সমিটারগুলি সঙ্কেত পাঠাবে ৩৭৮ মেগা-সাইকেলে।

কৃত্রিম গ্রহটির সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ভূ-সমীক্ষা বছর পরিকল্পনার অন্তর্গত কর্মকেন্দ্রগুলিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে, তাঁদের সংগৃহীত যে কোনও তথ্য যেন "ইণ্টার-ন্যাশন্যাল স্পেশ এজেন্সী" নামক প্রতিষ্ঠানকে পাঠানো হয়।

ডাঃ গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

শ্রীরবীন্দ্রমোহন দত্ত

বিগত ২১শে নভেম্বর (১৯৫৯) সকাল ৯টায় ডাঃ গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলার (বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তান) অন্তর্গত গোপালনগরে ১৮৯৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ডাঃ মজুমদারের জন্ম হয়। পাবনা জেলার অন্যতম বিত্তশালী জমিদার স্বর্গতঃ কালীচরণ মজুমদার মহাশয়ের তিনি তৃতীয় পুত্র। ভাইবোন মিলিয়ে তাঁরা ছিলেন নয় জন—অর্থাৎ ছয় ভাই ও তিন বোন। ১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর, ১৯১৪ সালে গিরিজাবাবু প্রেসিডেন্সী-কলেজের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগের অন্যতম শিক্ষক-রূপে নিযুক্ত হন। ১৯১৫ সালে তিনি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে এম. এস্-সি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন এবং পরের বছর বি. এ পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৭ সালে তিনি আবার আইনের পরীক্ষাতেও স্নাতক উপাধি (বি. এল) লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। ১৯১৯ সালের ১৯-এ নভেম্বর তিনি শ্রীমতী সুধা দেবী, বি-এ'র সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। দুই কন্যা ও তিন পুত্র রেখে সুধা দেবী স্বামীর অনেক আগেই স্বর্গারোহণ করেন।

শুধু নিজের প্রতিভা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের গুণেই গিরিজাবাবু ক্রমশঃ বঙ্গীয় শিক্ষা-কৃত্যকের অধীন প্রেসিডেন্সী কলেজে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৯২৮ সাল থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অন্যতম শিক্ষকরূপেও অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৪-৫৫ সালে তিনি আবার উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিভাগে অবৈতনিক বক্তা নিযুক্ত হন। ইডেন হিন্দু-ছাত্রাবাসের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে তিনি কাজ করেন ১৯১৪ সাল থেকে এবং ১৯২৫ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন উক্ত ছাত্রাবাসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। স্ত্রীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি চলে আসেন ছাত্রাবাস পরিচালনার কাজ ছেড়ে। ১৯৩৮ সালে অধ্যাপক মজুমদার শিক্ষার উদ্দেশ্যে অবকাশ লাভ করে ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করেন।

সেখানে তিনি লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদের আঙ্গিক গঠন সম্পর্কে গবেষণার কাজ করেন স্বর্গত: অধ্যাপক জে. এইচ. প্রিস্ট্‌লির অধীনে। উক্ত গবেষণায় সাফল্য লাভ করে তিনি পি-এইচ্‌. ডি ডিগ্রি পান ১৯৩০ সালে। ১৯৪৯ সালে ডাঃ মজুমদার সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার আবার তাঁকে শিক্ষকতার কাজে আহ্বান করেন এবং দার্জিলিঙের সরকারী মহাবিদ্যালয়ে তাঁকে নিযুক্ত করা হয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের (অনার্স) অধ্যাপকরূপে। দু-বছর পর তিনি আবার চলে যান ঢাকায়। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও শারীরবিদ্যা বিভাগের প্রধানরূপে কাজ করেন। পাকিস্তানে থাকবার সময় তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন অব কোর্সেস্‌-এর সভাপতিরূপে যেমন কাজ করেন, তেমনি আবার ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে বিজ্ঞান-সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে গঠিত পাকিস্তান-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে শারীরবিদ্যা শাখারও সভাপতিত্ব করেন। সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ দেন, তার শিরোনামা ছিল—"The punetum vegetationis" (wolff)। সেই ভাষণে তিনি এক দিকে যেমন তাঁর আলোচ্য বিষয় প্রাঞ্জলরূপে বুঝিয়ে দেন, অন্য দিকে তেমনি Hofmeister-এর mantle-core তত্ত্বও সমর্থন করেন। ১৯৪৫ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৩২-তম অধিবেশনে ডাঃ মজুমদার উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখার পৌরোহিত্য করেন। তাঁর সেবারকার অভিভাষণের নাম ছিল 'Some aspects of anatomy in modern

ডাঃ গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

research"। এরও কয়েক বছর আগে তিনি নিখিল ভারত প্রাচ্য বিষয়ক সম্মেলনের কারিগরী-বিজ্ঞান শাখারও সভাপতিত্ব করেন। পাণ্ডিত্য ও শিক্ষাভিজ্ঞতার জন্যেই তিনি ১৯৪৫ সালে ব্যাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমী এবং ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়া-এর ফেলো নির্বাচিত হন। তাছাড়া ডাঃ মজুমদার দীর্ঘকাল যাদবপুরের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি ক্যালটিভেশন অব্ সায়েন্স-এর সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। 'ভারতীয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সমিতিরও তিনি ছিলেন আজীবন সদস্য (১৯২৯ সাল থেকে), কোষাধ্যক্ষ (১৯৩৪ সাল), প্রধান সম্পাদক (১৯৪৮-৪৯ সাল), সভাপতি (১৯৪৯ সাল) এবং সহ-সভাপতি (১৯৫০)। তাছাড়া, তিনি কলকাতার ভারতীয় বিজ্ঞান সংবাদ সমিতিরও একজন সদস্য ছিলেন এবং উক্ত সমিতির সম্পাদনাবিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক বহু প্রবন্ধাদি সম্পাদনা করেন। বটানিক্যাল সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই (১৯৩৫ সাল) তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন তার আজীবন সদস্য (১৯৫২ সাল থেকে), কোষাধ্যক্ষ (১৯৩৫-৩৯ সাল), সহ সভাপতি (১৯৪০-৪৬ সাল) এবং সভাপতি (১৯৪৭-৪৮ সাল)। ডাঃ মজুমদার ভারতীয় সংগ্রহশালার অন্যতম ট্রাষ্টির পদেও নিযুক্ত হন (১৯৫০-৫১ সালে) এবং এশিয়াটিক সোসাইটির জীবতত্ত্ব-বিষয়ক সচিব (Biological Secretary) ও ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স অব ইণ্ডিয়ার প্রকাশন শাখার যুগ্ম-সম্পাদকরূপেও কাজ করেন। জগদ্বন্ধু ইনষ্টিটিউশন, মুরলীধর গার্লস্ স্কুল ও কলেজ প্রভৃতি বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-পর্ষৎ এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের তিনি সদস্য ছিলেন।

পরীক্ষক, প্রশ্নকর্তা, মডারেটর ও শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন কমিটির সদস্যরূপেও তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাছাড়া, ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস্-সি ও পি-এইচ. ডি ডিগ্রির পরীক্ষকরূপেও তিনি কাজ করেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু পত্র-পত্রিকায় ডক্টর মজুমদারের অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় তিনি উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকখানি প্রাথমিক পুস্তক রচনা করেছেনন। ছোটদের জন্যে তিনি বাংলাভাষায় যে-সব বিজ্ঞান-পুস্তক, বিশেষ করে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের পুস্তক রচনা করে গেছেন, সেগুলি সবারই অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করেছে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান পাঠকের কাছে কত সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর লেখা 'উদ্ভিদ জীবন' গ্রন্থ। বইখানি প্রকাশ করেছে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ১৯৫৫ সালে। বাংলা ভাষার মাধ্যমে ছোটদের কাছে বৈজ্ঞানিক-বিষয়, বিশেষ করে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানকে চিত্তাকর্ষক করে তোলবার কাজে তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রণী। সংস্কৃত ও পালিভাষায় বিশেষ দখল থাকায় ডাঃ মজুমদার তাঁর বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় সেই দুই ভাষার গ্রন্থ থেকে নজির দেখিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যে, প্রাচীন ভারতেও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অনুশীলন করা হতো। বনস্পতি শীর্ষক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করে ১৯২৫ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রিফিথ স্মারক পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁর লেখা 'উপবন-বিনোদ' বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। উদ্যান-কর্ষণ বিদ্যা সম্পর্কে এটি তাঁর একটি উল্লেখ-যোগ্য রচনা। ১৯৩৮ সালে তাঁর লেখা আর একখানি বই প্রকাশিত হয়, তার নাম—Some Aspects of Indian Civilisation। 'Archives International Historie des Sciences' (Vol 14, 100-33, 1951) নামক

পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখা "The History of Botany and allied Sciences in ancient India"-ই (খৃঃ পূঃ ২০০০-১০০ খৃঃ অব্দ) প্রমাণ করে দেয় যে, উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা ছিল কত গভীর! ১৯৫০ সালে UNESCO-র উদ্যোগে দিল্লীতে বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে যে আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের ইতিহাস শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেটিও বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। ১৯৫৭ সালে তিনি "National Institute of Sciences of India"-র পক্ষ থেকে "Progress of Science in India, Section-VI Botany"-ও সম্পাদনা করেন। স্বর্গত ডক্টর বি. এম. বড়ুয়া ও তিনি যুগ্ম-ভাবে ১৯৩৩ সালে ক্যালকাটা রিভিউ-পত্রিকায় "Flying machines in ancient India" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাথেকেই আমরা জানতে পারি যে, অতি প্রাচীন যুগেও ভারতে উড়োজাহাজের প্রচলন ছিল এবং সেদিক থেকে বিশেষ উন্নতিও ঘটেছিল। এসব ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপক ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ তথ্যানুসন্ধান, এ-বিষয়ে তাঁর দেশপ্রীতির গভীরতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর অনন্যসাধারণ গবেষণার জন্যে এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে ১৯৫৫-সালে 'পি-ক্রল-স্মারক পদক' উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। তিনি স্বদেশী যুগ থেকেই দেশী জিনিষ ব্যবহার করতেন। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের ইংরেজী শব্দাবলীর বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে একখানি বই লেখবার জন্যে ১৯৩৬ সালে স্বর্গতঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা-কমিটির অন্যতম সদস্য নিযুক্ত করেন। শ্যামাপ্রসাদ সে সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধের লেখকেরও সে সময় অধ্যাপক মজুমদারের কাজে সহযোগিতা করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। অনেক পরিশ্রমের পর উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিষয়ক যেসব প্রতিশব্দ সংগৃহীত হয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সেগুলি একখানি পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐ পুস্তিকা যে একখানি উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন "National Institute of Sciences of India"-র সহ-সভাপতি।

পুরনো বই সংগ্রহ ও বাগান করবার দিকে একটা ঝোঁক ছিল ডাঃ মজুমদারের। কিন্তু প্রধান ঝোঁক ছিল বই পড়া এবং গবেষণার কাজে। জীবনের শেষের দিকে একজন অবসরপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক হিসাবেই তিনি যাতে উদ্ভিদের বিষয়ে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যেতে পারেন, সে জন্যে "Council of Scientific and Industrial Research" তাঁকে আর্থিক সাহায্যও করেছে। যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন নি, তাঁদের পক্ষে হয়তো তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিমাপ করা সহজসাধ্য হবে না। কিন্তু যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরাই ডাঃ মজুমদারের এসব গুণাবলীর কথা স্বীকার করবেন। সৌজন্যের প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি; আন্তরিকতাপূর্ণ অমায়িক ব্যবহারের মধ্য দিয়েই তিনি সকলের চিত্ত জয় করে গেছেন।

পৃথিবীর বুকে জনবসতি

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

পৃথিবী তার বুকে প্রায় সর্বত্রই মানুষকে ঘর বাঁধবার সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। বিষুব অঞ্চলের দুঃসহ উত্তাপ ও আর্দ্রতা, মেরু অঞ্চলের হাড়-কাঁপানো ও রক্ত-জমানো শীত, মরু অঞ্চলের অগ্নিবর্ষী বালুকারাশি, পার্বত্য প্রদেশের বন্ধুরতা ও দুর্গমতা—কোন কিছুই মানুষের বসতি বিস্তারে বাঁধা দিতে পারে নি। কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গাই যে মানুষকে সমান আদরে বুকে টেনে নিয়েছে, তা নয়; কোথাও সে স্নেহময়ী মাতা, কোথাও বা নিষ্ঠুর বিমাতার মত।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, নীল, ইয়াংসির উর্বর অববাহিকায় অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ অল্লায়াসে উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছে। ইউরোপ ও এশিয়ার নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের দেশগুলিতে মানব-সভ্যতা চরম বিকাশ লাভ করেছে। অন্যদিকে তুন্দ্রা অঞ্চলের দুরন্ত শীত ও শস্যসম্পদের রিক্ততা এবং আফ্রিকার বিষুব অঞ্চলের আর্দ্র উষ্ণতার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ মানুষকে আদিম বর্বরতা থেকে মুক্তি দেয় নি। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের মরুপ্রায় অনুর্বর অঞ্চলের মাউরী প্রভৃতি আদিম জাতি এবং ব্রহ্মদেশের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের কয়েকটি উপজাতির মত হতভাগ্য মানব সম্প্রদায় বোধ হয় পৃথিবীতে বিরল। এই প্রবন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে লোক বসতি, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির উপর যে সব প্রভাব বিস্তার করেছে, সে সম্বন্ধেই আলোচনা করবো।

ভূ-বিজ্ঞানীরা লোকবসতির উপর পরিবেশের প্রভাবের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন—(১) আবহাওয়া, (২) কয়লা ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের অস্তিত্ব, (৩) পৃথিবীর প্রধান বাণিজ্য-পথগুলির আকর্ষণ এবং (৪) রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিপর্যয়।

আবহাওয়ার প্রভাব—মানুষের সুষম জীবন-যাত্রার দুটি প্রধান উপকরণ হলো, খাদ্যদ্রব্য এবং উত্তম পানীয় জলের প্রাচুর্য। এই দুটি আবার নির্ভর করে আবহাওয়ার উপর। সুতরাং লোক-বসতির ঘনত্বের কথা চিন্তা করতে গেলেই প্রথমে স্থানীয় আবহাওয়ার কথা চিন্তা করতে হয়। প্রাচীন কালে আর্যদের স্বদেশ ত্যাগ এবং ভারত, পারস্য ও ইউরোপে প্রবেশের প্রধান কারণের মধ্যে প্রতিকুল আবহাওয়া এবং ভূমির অনুর্বরতা-হেতু খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতাই প্রধান। উত্তর ভারতের সুসমঞ্জস আবহাওয়া এবং নদীবিধৌত মৃত্তিকার অকৃপণ উর্বরতা কেবল আর্যদের নয়, পৃথিবীর বহু জাতিকে এখানে বসতি স্থাপনে প্রলোভিত করেছে। এরা হয়তো বিজেতারূপেই এদেশে এসেছে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই রক্তপাত ও লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে এদেশের শান্তশিষ্ট অধিবাসীদে সঙ্গে মিশে গেছে। তাই অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতের মাটি এক মহাসভ্যতার লীলা-ভূমিতে পরিণত হয়েছে। গ্রেট বৃটেনের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত সর্বাধিক লোকবসতিপূর্ণ ছিল। এই অংশের কেণ্ট প্রদেশকে ইংল্যাণ্ডের উদ্যান নাম দেওয়া হয়েছে। সমগ্র বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে এখানের আবহাওয়া অতি মনোরম ও জমির উর্বরতা অতি উচ্চস্তরের। অতি প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীর যে সব দেশ সভ্যতার শীর্ষদেশে আরোহণ করেছে, তাদের উন্নতির মধ্যে প্রধান কারণ হলো, অনুকূল আবহাওয়া এবং ভূমির অকৃপণ দান। অন্যদিকে অনুকুল আবহাওয়া প্রতিকূল হলে, নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হলে কি ভাবে উন্নত সভ্যতার ধ্বংস হতে

পারে, তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রাগার্য দ্রাবিড় সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। এই দুটি প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংসের কারণ এখন পর্যন্ত গবেষণার বিষয়ীভূত হলেও আবহাওয়ার পরিবর্তন ও সিন্ধুনদের প্লাবন বা গতিপথ পরিবর্তনই প্রধান কারণরূপে উল্লেখ করা হয়। মধ্যএশিয়ার খোটান অঞ্চলের কয়েকটি সমৃদ্ধিশালী নগরীর বালুকাশয্যার কারণ যে মরুভূমির প্রসারিত বাহুর আলিঙ্গন, এতে কোনই সন্দেহ নেই। প্রাচীন কালে উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো ও পেরু অঞ্চলে যে দুটি উন্নত সভ্যতার পত্তন হয়েছিল, ইতিহাসে তার প্রচুর সাক্ষ্য রয়েছে। মধ্য-আমেরিকার মায়া সভ্যতা ও পেরুর ইন্‌কা সভ্যতার কথা গবেষণার বিষয়ীভূত হয়েছে। ঐতিহাসিকরা বলেন, এ-দুটি সভ্যতা যেমন গড়ে উঠেছিল অনুকূল আবহাওয়া আর ভূট্টা ও আলু-জাতীয় শস্যসম্পদের আশ্রয়ে, তেমনই পরিবর্তিত আবহাওয়ার কবলে পড়ে এক সময়ে আবার সভ্যতার ধূলিশয্যা রচনা করেছিল।

পৃথিবীর বিষুব অঞ্চলের আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র। এই উষ্ণতা ও আর্দ্রতা অবশ্য সর্বত্র সমান নয়। সমুদ্রের সান্নিধ্য, উচ্চ পর্বতের অবস্থান, শীতল সমুদ্র-স্রোত এবং শীতল-শুষ্ক বায়ু-প্রবাহের দরুণ বিষুব অঞ্চলের উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বহু স্থানে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু সাধারণতঃ অত্যধিক উষ্ণতা ও আর্দ্রতার ফলে দুর্গম অরণ্যের সৃষ্টি করেছে। একই কারণে এসব অঞ্চলের জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকা অঞ্চল এবং দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন নদীর অববাহিকা অঞ্চলে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দুর্গম অরণ্য অবস্থিত। এসব অঞ্চলের লোকসংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং এখানকার আদিম অধিবাসীরা এখনও সভ্যতার সংস্পর্শে আসে নি। আবার মরু-অঞ্চলে বৃষ্টির অভাবে বৃক্ষলতাদি জন্মে না বলে অধিবাসীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং তারাও ঘরবাড়ী না বেঁধে যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করেছে। মরুসন্নিহিত অল্প বৃষ্টির তৃণ-অঞ্চলগুলির অধিবাসীরাও হয়েছে যাযাবর। উত্তর আমেরিকার প্রেইরি ও রাশিয়ার ষ্টেপিস তৃণ-ভূমিতে লোকবসতি অতি বিরল। অন্যদিকে পৃথিবীর মৌসুমী অঞ্চলগুলি ভূমিকে শস্যশ্যামলা করে তোলে। এজন্যেই মৌসুমী-অঞ্চলগুলি চিরকাল পৃথিবীর ঘনতম লোকবসতিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। ভারত, চীন, ইন্দোচীন, জাপান, ব্রহ্ম, সিংহল, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—এই মৌসুমী অঞ্চলগুলিই হলো পৃথিবীর শস্য-ভাণ্ডার। মৌসুমী অঞ্চল ছাড়িয়ে বৃষ্টিপাত হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে শস্যসম্পদেরও হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটেছে।

পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সমুদ্র-সন্নিহিত উপকূল ভাগই মনুষ্য-বাসের উপযোগী শ্রেষ্ঠ অঞ্চল। এসব স্থানের আবহাওয়া আদর্শ। অনধিক বৃষ্টিপাত, সামুদ্রিক জলবায়ুর সুষম উত্তাপ এবং শতভগ্ন উপকূল বেষ্টনের পরিবেশে এসব অঞ্চলের আহার, বিহার ও বাসস্থলের আরামের সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যেরও পরাকাষ্ঠা সাধিত হয়েছে। উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের আধিক্য, আলস্য ও জড়তা আনয়ন করে; আবার শীতের প্রখরতা ও শুষ্কতা দেহ ও মনের খর্বতা সাধন করে। মরুদেশের শুষ্ক উত্তপ্ত আবহাওয়া দুর্ধর্ষতা ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে জীবনের স্থায়িত্ব এবং বৈষয়িক উন্নতি সম্বন্ধে নির্মম ঔদাসীন্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এই দুটি জিনিষ অপূর্ব সামঞ্জস্য লাভ করেছে বলে এখানের অধিবাসীরা হয়েছে দীর্ঘ ও সবলকায় এবং শৌর্য-বীর্য ও উন্নত মানবিক গুণের অধিকারী।

কয়লা ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের প্রভাব—আধুনিক সভ্যতার প্রধান ধারক হলো শিল্প এবং শিল্পের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে কয়লা। খনি আবিষ্কারের পর মানুষ প্রথমতঃ শ্রমিকরূপে খাদ্য-অঞ্চল থেকে খনি-অঞ্চলে এসে ভীড় করেছে; তারপর শিল্প গড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বশ্রেণীর মানুষ এসে

স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। আর্থিক উন্নতিশীল দেশগুলিতে দেখা যায়, কয়লা খনি-অঞ্চলের চার দিকে শিল্প-কারখানাগুলি স্থাপিত হয়েছে। অনুন্নত দেশগুলিতে শিল্প গড়ে ওঠবার সুবিধা না থাকলেও কেবল কয়লা তোলা ও রপ্তানীর জন্যে প্রচুর লোক-সমাবেশ হয়েছে। অবশ্য এরূপ জন-সমাবেশ একমাত্র শিল্প গড়ে ওঠবার উপরেই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। কয়লা খনিগুলি বিশেষভাবে গড়ে তুলেছে লৌহ-শিল্প। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে জামসেদপুর, টাটানগরের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা। ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান এই লৌহ-নগরী গড়ে উঠেছে নিকটবর্তী ছোটনাগপুর পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত নোয়ামণ্ডি কেওঞ্জর, বাদামপাহাড় ও গরুমহিষানীর লৌহ-আকর এবং রাণীগঞ্জ, আসান-সোল ও ঝরিয়ার কয়লা খনির আশ্রয়ে। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের ভিলাই, উড়িষ্যার রৌরকেল্লা এবং পশ্চিম বঙ্গের কুলটি, বার্ণপুর ও দুর্গাপুরের লৌহ-নগরীগুলি মাথা তুলে উঠছে নিকটবর্তী লৌহ-আকর ও কয়লা খনির আশ্রয়ে। পূর্বে এসব স্থান ছিল একরূপ অনুর্বর ও পরিত্যক্ত অঞ্চল। বর্তমানে এসব স্থানে অভূতপূর্ব জন-সমাবেশ হচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এগুলি যে পরিপূর্ণ শিল্প-নগরীতে পরিণত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কয়লা আবিষ্কারের ফলেই ষ্টীম ইঞ্জিনের ব্যবহার ব্যাপক হয়েছে এবং বাষ্পশক্তির দরুণই পৃথিবীর শিল্পসমৃদ্ধি গঠিত হয়েছে। বিশাল শস্যক্ষেত্র বা পশুচারণ ক্ষেত্র কলকারখানাকে স্থান ছেড়ে দিয়েছে। কারখানাকে কেন্দ্র করে ধারে ধারে স্বয়ংসম্পূর্ণ সহর গড়ে উঠেছে। পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ অনুর্বর অথবা অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল থেকে দূরবর্তী হলে এসব শিল্প-নগরীর অধিবাসীদের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দূর থেকে আনিয়ে নেবার বন্দোবস্ত করতে হয়েছে। এজন্যে এবং উৎপন্ন মাল রপ্তানীর জন্যে সুবিধামত রেল-পথ, ষ্টীমার-পথ বা আকাশ-পথ স্থাপন করা হয়েছে। ক্রমশঃ শিক্ষা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়ে এরা পূর্ণগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্রই লোকবসতি, কয়লাখনি ও শিল্পাঞ্চলের মানচিত্রের মধ্যে সর্বত্রই এক আশ্চর্য সঙ্গতি দেখা যায়।

অন্যান্য খনিজ দ্রব্য; যেমন—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ও টিনের খনিগুলিতেও প্রচুর জনসমাবেশ ঘটেছে। খনি অঞ্চলগুলিতে এমনও দেখা গেছে যে, অনেক সময় বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক অবস্থা অগ্রাহ্য করে জনবসতি বিস্তার লাভ করেছে। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো, অষ্ট্রেলিয়ার কুলগাড়ি স্বর্ণখনি। এখানের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা প্রায় মরুঅঞ্চলের মত এবং সেখানে জল নিয়ে আসতে হয়েছে ৩০০ মাইল দূরবর্তী সমুদ্রের উপকূল থেকে। নিউ সাউথ-ওয়েলসের ব্রোকেনহিল প্রদেশও একরূপ মরুসদৃশ অঞ্চল। এখানে কৃষিকার্য একরূপ অসম্ভব; কিন্তু এখানকার রৌপ্য ও সীসক খনির আকর্ষণে জন-বসতি গড়ে উঠেছে। ক্যানাডার ক্লোনডাইক স্বর্ণখনি অঞ্চলের প্রচণ্ড শীত ও বিরুদ্ধ আবহাওয়া উপেক্ষা করেও একসময়ে প্রচুর জনবসতি গড়ে উঠেছিল।

অবশ্য এসব খনি অঞ্চলের আবহাওয়া যদি মনুষ্যবাসের অনুকূল না হয়, তাহলে জনবসতি স্থায়ী হতে পারে না; খনিজ পদার্থ শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জনবসতি ভেঙ্গে পড়ে। আবার অনুকূল আবহাওয়ায় শস্যসম্পদের সম্ভাবনা থাকলে খনিজ পদার্থ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার পরেও লোকে কৃষিকার্য ও পশুপালন করে থেকে যেতে পারে। অষ্ট্রেলিয়ার উন্নতির মূলে এরূপ প্রভাব বিদ্যমান। এখানের সোনা ও অন্যান্য খনির কাজে আকৃষ্ট হয়ে প্রথমে নানাদেশ থেকে খনির শ্রমিকেরা এসে ভীড় করেছিল। তারপর খনিজ পদার্থ নিঃশেষিত হয়ে যাবার পরেও তারা কৃষিকার্য ও পশুপালন জীবিকারূপে বেছে নিয়েছে। এজন্যে অষ্ট্রেলিয়া প্রথমে খনি-শিল্পের দেশ বলে গণ্য হলেও, এখন

প্রধানতঃ কৃষি, পশুপালন, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, পশম ও মাংস সরবরাহের দেশে পরিণত হয়েছে। উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশেও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, খনিজ পদার্থের সরবরাহ কখনও চিরস্থায়ী হতে পারে না। সুতরাং কেবলমাত্র খনিজ সম্পদ অবলম্বন করে কোন দেশের শ্রীবৃদ্ধির সাধিত হতে পারে না। উন্নত কৃষি ব্যবস্থাই দেশের উন্নতির প্রধান অবলম্বন এবং সেই সঙ্গে খনিজ সম্পদ যুক্ত হলে চরম সার্থকতা লাভ করে।

পৃথিবীর প্রধান বাণিজ্য-পথগুলির আকর্ষণ—অতি প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর বৃহৎ বাণিজ্য-পথগুলির পাশে পাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে বৃহৎ বৃহৎ নগর ও বন্দর গড়ে উঠেছে এবং পৃথিবীর সর্বস্থান থেকে লোক আকর্ষণ করেছে। এসব স্থানের জনসন্নিবেশ প্রায়ই স্থায়ী হয় বটে, কিন্তু বাণিজ্য-পথগুলি চিরকাল একভাবে থাকে নি। সুবিধাজনক নতুন পথের আবিষ্কার, স্থলপথের পরিবর্তে জল-পথের উদ্ভাবন—ইত্যাদি কারণে অনেক প্রাচীন সংস্কৃতি-কেন্দ্র ও জনসংহতি নষ্ট হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতের সঙ্গে তিব্বত, চীন ও কোরিয়ার স্থলপথে বাণিজ্য চলতো। এই বাণিজ্য-পথের দু-পাশে বড় বড় সমৃদ্ধিশালী নগর ও জনপদ গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন পরিব্রাজক ও ভ্রমণকারী-দের বর্ণনায় এর উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী কালে নানাকারণে এসব পথ পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে এসব জনপদের সমৃদ্ধি ও লোকবসতি ভেঙ্গে পড়েছিল। মধ্য-এশিয়ার খোটানের বালুকারাশির মধ্যে একটি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিসম্পন্ন জনপদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীন সমরখন্দ নগরীর ঐশ্বর্যও আজ ধূলিরাশিতে মিলিয়ে গেছে। এদের ধ্বংসের কারণ প্রথমতঃ বাণিজ্য-পথের পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়তঃ আবহাওয়ার পরিবর্তন। ভারত ও চীনের সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকার বাণিজ্য-পথও কয়েকবার পরিবর্তিত হয়েছে। তার ফলে পথের দু-পাশের জনসংহতি নষ্ট হয়েছে। প্রাচীন বাণিজ্য পথগুলি অধিকাংশই স্থলভাগের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। এসব পথে বণিকেরা দলবেঁধে ঘোড়া বা উটের পিঠে চলতো। তাদের বলা হতো ক্যারাভ্যান। পরবর্তী কালে জাহাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে নতুন নতুন জলপথ আবিষ্কারের দুর্দম নেশা জেগে ওঠে। তার ফলে প্রধানতঃ কয়েকটি ইউরোপীয় জাতি নতুন সুবিধা-জনক জলপথ আবিষ্কার করে। ভাস্কো ডি গামার ভারতের জলপথ আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের সঙ্গে ভারতের স্থলপথে বাণিজ্য শোচনীয়রূপে ব্যাহত হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে যে পথে এই বাণিজ্য চলতো, তার দু-পাশের সহরগুলিও দুরবস্থায় পতিত হয়েছিল। আবার এমনও দেখা যায় যে, ক্যারাভ্যানের পথগুলি পরবর্তী কালে রেলপথ বা মোটর পথের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে; কিন্তু তার ফলে ক্যারাভানের পথের দু-ধারে গড়ে-ওঠা সহর-গুলির বিশেষ ক্ষতি হয় নি। কারণ রেল বা মোটর-পথগুলি সাধারণতঃ ক্যারাভ্যানের পথ ধরেই করা হয়েছে। ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে উরাল পর্বতের গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে যে প্রাচীন ক্যারা-ভ্যান-পথটি ছিল, তা সুয়েজ খাল খননের ফলে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ট্র্যান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে প্রবর্তনের ফলে কয়েকটি প্রাচীন ক্যারা-ভ্যান-পথের দু-ধারের সহরগুলির অবনতি না হয়ে বরং উন্নতিই হয়েছে। আবার পানামা খাল খননের ফলে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের জনবসতি অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে এবং উপকূলের বন্দর-গুলিরও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছে।

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিপর্যয়—পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, কোন দেশের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় পটভূমিকা পরিবর্তিত হওয়ার ফলে তার জনসংখ্যারও বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে। বাইবেলে

উল্লেখ আছে যে, মিশর থেকে ইজরাইলের অধিবাসীরা যে তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে দলে দলে যাত্রা করেছিল, তার কারণ রাজনৈতিক মতভেদ ও ধর্মীয় অত্যাচার। এর ফলে প্যালেষ্টাইনে ইহুদী-রাজত্ব গড়ে ওঠে। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে একদল 'পিলগ্রিম ফাদার' ধর্মীয় অত্যাচারে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে উত্তর আমেরিকায় উপস্থিত হয় এবং সেখানে একটি উপনিবেশ গড়ে তোলে। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজনৈতিক অত্যাচারের ফলে একদল ইটালীয়ান ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এর ফলে লিওঁর বৃহৎ রেশম-শিল্পটি মিলানের দক্ষ শিল্পীদের দ্বারা গড়ে ওঠে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক গণ্ডগোলের জন্যে ক্যাথলিক ফ্রান্স থেকে প্রোটেষ্ট্যাণ্টরা ইংল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় পালিয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তারা সরকারী সহযোগিতায় স্পিটাফিল্ড ও নরউইচের রেশম-শিল্প গড়ে তোলে। দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ-শাসনে অসন্তুষ্ট হয়ে বুয়র কৃষকেরা কেপ কলোনি থেকে অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট ও ট্র্যান্সভালে চলে যায়। এই দুটি অঞ্চল এখন আফ্রিকার মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। আয়র্ল্যাণ্ডে ইংরেজদের স্বার্থপর শাসন ও শোষণের ফলে জনসংখ্যার উপর যে কঠোর আঘাত পড়েছিল, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেণ্টে একটি আইন পাশ হয়। তার ফলে আইরিশ প্রজারা তাদের ভোটাধিকার হারায় এবং জমির খাজনার হারও অত্যধিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এভাবে অত্যাচারিত ও শোষিত আইরিশরা অনাহারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে দলে দলে দেশত্যাগ করে 'নতুন পৃথিবী'তে চলে যায়। এর ফলে আয়র্ল্যাণ্ডের জনসংখ্যা প্রায় ৫৫ লক্ষ হ্রাস পায়। এখন আয়র্ল্যাণ্ডের চেয়ে আমেরিকাতেই আইরিশদের অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। ১৯৩৮-৩৯ সালে হিটলারের অত্যাচারে জার্মেনীতে ইহুদী জাতি প্রায় নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। এই রাজনৈতিক অন্ধতার ফলে জার্মেনী আইনষ্টাইনের মত বৈজ্ঞানিককেও হারিয়েছিল।

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিপর্যয় আমাদের পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের জনসংখ্যা ও সংস্কৃতির উপরে যে নির্মম আঘাত হেনেছে, ইতিহাসে তার নজির নেই বললেই হয়। মিথ্যা ধর্মোন্মাদনা ও অলীক রাজনৈতিক মতবাদ ভারতের হিন্দু-মুসলমানের পৃথক জাতীয়তা স্বীকার করে কেবল যে এদের মধ্যে অতলস্পর্শী ব্যবধান গড়ে তুলেছে—তাই নয়, দুটি সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক কোটি ছিন্নমূল হিন্দু উদ্বাস্তু এসে উপস্থিত হয়েছে। তার ধাক্কা সামলে উঠতে পশ্চিমবঙ্গকে আরও বহু বছর হিম্‌সিম্ খেতে হবে। অন্যদিকে এর একটা শুভ সম্ভাবনার ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়েছে। এই সব উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেবার জন্যে জনবিরল পরিত্যক্ত আন্দামান ও দণ্ডকারণ্যে নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের বহু অনাবাদী জমিও উন্নত কৃষি-সম্ভাবনার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে। পূর্ববঙ্গ একটা প্রাচীন সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতিকে হারিয়েছে বটে এবং যদিও পশ্চিম বঙ্গ অত্যধিক জনবৃদ্ধির ফলে দারুণ খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয়েছে, তবুও অদূর ভবিষ্যতে যে এই সঙ্কট কেটে যাবে এবং পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সংহত হিন্দু-সংস্কৃতি একটি বিশিষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল—১৯৬০

১৩শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

ময়ূর-ফিজ্যাণ্ট

ময়ূর-ফিজ্যাণ্ট জাতের মধ্যে এই নেংরকর্‌ন্‌ ফিজ্যাণ্টই সবচেয়ে সুদৃশ্য। এদের শারীরিক গঠন এতই সুসমঞ্জস এবং মনোমুগ্ধকর যে, একবার নজরে পড়লে চোখ ফেরানো যায় না। বোর্নিয়ো এবং ফিলিপাইনসের মধ্যবর্তী একমাত্র প্যালাওয়ান দ্বীপেই এই অপূর্ব-গঠন পাখীগুলিকে দেখা যায়।

কয়ারফড়িং

কয়ারফড়িং তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। সাধারণতঃ ফড়িং বলতে আমরা যাদের বুঝি, তাদের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য নেই। এদের সম্বন্ধেই আজ তোমাদের দু-চার কথা বলছি।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই কয়ারফড়িং পৃথিবীতে বিচরণ করছে। এদের অত্যাচারের ফলে মানুষকে বাব বার দুর্ভিক্ষ ও অনাহারের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারণ এরা শস্যাদির মারাত্মক শত্রু। এদের অত্যাচার যে কি ভীষণ—তা একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারা যাবে। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে কয়ারফড়িঙের আক্রমণে যে শস্যাদি বিনষ্ট হয়েছিল—তার মূল্য ছিল গড়ে প্রতি বছরে ৩১ মিলিয়ন ডলারেরও বেশী।

এ-পর্যন্ত প্রায় দু'শো বিভিন্ন জাতের কয়ারফড়িঙের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে কয়েক জাতের কয়ারফড়িং শস্যাদির মারাত্মক শত্রু। এরা সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে ডিম পাড়ে। এদের ডিম পাড়বার সময়ে সুব্যবস্থার জন্যে খুব ব্যস্ত থাকতে হয়। আগে থেকে স্ত্রী-কয়ারফড়িং ডিম পাড়বার একটা জায়গা স্থির করে রাখে। এরা গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে। গর্ত খোঁড়বার জন্যে স্ত্রী-কয়ারফড়িঙের দেহের প্রান্তভাগে কয়েকটা তীক্ষ্ণ ফলকের মত পদার্থ আছে। ডিমগুলি তলপেটের শেষে অবস্থিত একটা আধারের মধ্যে থাকে। গর্ত খোঁড়া শেষ হলে এরা শরীরের প্রান্তভাগ গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে আধারসমেত ডিম পেড়ে যায়। এই ডিম্বাধারে ৭০-৭৫টা ডিম থাকে। কোন কোন জাতের স্ত্রী-কয়ারফড়িংকে এক সঙ্গে এ-রকম ২১টা ডিম্বাধার গর্তে স্থাপন করতে দেখা গেছে। অবশ্য কোন কোন জাতের স্ত্রী-কয়ারফড়িং-এর চেয়ে অনেক বেশী ডিম এক সঙ্গে পেড়ে থাকে। ডিম পাড়া শেষ হলে এরা নিজের দেহনিঃসৃত একপ্রকার চট্‌চটে আঠালো পদার্থের প্রলেপ দেবার পর মাটি দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়—যাতে শত্রু ডিমের খোঁজ না পায়।

ডিমের আকৃতি চা'লের দানার মত এবং সেগুলি সাদা, কালো, বাদামী প্রভৃতি ডিম বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। কয়ারফড়িঙের বাচ্চা কয়েক দিনের মধ্যে ডিম ফুটে পূর্ণাকৃতি নিয়ে বেরোয়। অবশ্য তখনও তাদের ডানা গজায় না।

ডিম ফুটে বেরোবার সময় বাচ্চাগুলি সেলোফেনের মত পর্দায় আচ্ছাদিত থাকে। কিছু সময়ের মধ্যেই তারা পর্দা ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তখন তাদের দেখায় ঠিক পূর্ণাবয়বের ফড়িঙের মত। তারপর এরা কয়েকবার খোলস পরিবর্তন করে' পরিণত ফড়িঙের রূপ ধারণ করে। সাধারণতঃ ৪০ থেকে ৬০

দিনের মধ্যে পাঁচবার খোলস পরিবর্তন করে এরা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। পরিণত আকৃতি ধারণ করবার পর এরা শরীরটাকে শুকিয়ে নেবার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে—তারপর এদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহে প্রবৃত্ত হয়।

এদের চোয়াল খুব শক্ত এবং ধারালো। এক জোড়া বড় ও এক জোড়া ছোট ডানা আছে। এই ডানার সাহায্যে ঝাঁক বেঁধে এরা বহুদূর উড়ে যেতে পারে, কিন্তু একক অবস্থায় এরা বেশীদূর উড়ে যায় না, প্রায়ই হেঁটে অথবা লাফিয়ে বেড়ায়। পিছনের শক্তিশালী পা দুটির সাহায্যে এরা অনেকদূর পর্যন্ত লাফাতে পারে।

এদের লাফাবার ক্ষমতা সত্যই বিস্ময়কর। মানুষের মাংসপেশী যদি এদের মাংসপেশীর মত শক্তিশালী হতো তবে সে অনায়াসে এক লাফে ৭০ ফুট পর্যন্ত উঁচুতে উঠতে অথবা সোজাসুজি ১০০ ফুট অতিক্রম করতে পারতো। প্রতি গ্র্যাম ওজনে মানুষের মাংসপেশীতে ২০০ গ্র্যাম শক্তি উৎপন্ন হয়ঃ কিন্তু ফয়ারফড়িঙের প্রতি গ্র্যাম ওজনে ২০,০০০ গ্র্যাম শক্তি উৎপন্ন হয়।

মজার কথা হচ্ছে, ওড়বার সময় দেহের উপর এদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সেজন্যে অনেক সময় এদের চীৎভাবে উপর থেকে মাটিতে নামতে দেখা যায়। অবশ্য এতে তাদের দেহে কোন আঘাত লাগে না।

অতি প্রাচীনকালে মানুষ মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা এদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে বৃথাই চেষ্টা করতো। তারপর ক্রমশঃ বিজ্ঞানের দৌলতে নানারকম শক্তিশালী কীটঘ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব কীটঘ্ন ব্যবহারের ফলে এদের প্রবল আক্রমণ রোধ করা এখন অনেকটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এদের একেবারে ধ্বংস করা আজ পর্যন্তও সম্ভব হয় নি।

এরা না খায় এমন কোন জিনিষ নেই। এমন কি, আমিষ পর্যন্ত বাদ দেয় না। তবে নানারকম শস্যই এদের প্রিয় খাদ্য। এরা শস্যের গোড়া থেকে শিকড় পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। শস্যক্ষেত্রের এমন ক্ষতি করে যে, সেখানে কয়েক বছর পর্যন্ত শস্য উৎপাদন করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় এরা দুর্বল কিংবা মৃত জাতভাইকে পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। সময় সময় ঘুমন্ত মানুষ বা জন্তুজানোয়ারের মাংস ঠুক্‌রে খায়। শস্যাদির ক্ষতি করা ছাড়াও এরা অন্যান্য জিনিষেরও ক্ষতি করে থাকে; যেমন—বই বাঁধবার এবং কাপড়ের গাঁটের সুতা খেয়ে ফেলে, কাপড়চোপড় কেটে ফেলে।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এরা পঙ্গপাল (locust) নামে পরিচিত। এরা ঝাঁক বেঁধে মাইলের পর মাইল জুড়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে উড়ে যায়। যাবার পথে কোন কোন স্থানে অবতরণ করে এবং যেখানে অবতরণ করে, সেখানে মাটি ছাড়া গাছপালার পাতা বা শস্যক্ষেত্রের কোন চিহ্নই থাকে না। এর ফলে পঙ্গপাল কর্তৃক আক্রান্ত দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। পূর্বেই বলা হয়েছে এরা বেশী দূর পর্যন্ত ওড়ে না। বিজ্ঞানীদের মতে, সংখ্যাবৃদ্ধি হলেই এরা দলবদ্ধভাবে দেশান্তরে অভিযান সুরু করে।

খুব গরমের সময় কয়েকটা কয়ারফড়িং উড়তে উড়তে এক জায়গায় সমবেত হয়। দেখাদেখি অন্যান্যেরাও উত্তেজিত হয়ে ওঠে ওড়বার জন্যে। সংখ্যায় খুব বেশী না হলেও তারা তখন দলবেঁধে উড়তে সুরু করে। তারপরে কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ সব অঞ্চলের কয়ারফড়িং উড়ন্ত ঝাঁকের সঙ্গে যোগ দেয় নতুন দেশে অভিযানের জন্যে। এভাবে পঙ্গপালের ঝাঁক ক্রমশঃ এরূপ বিশাল আকার ধারণ করে যে, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আকাশ-বাতাস ছেয়ে ফেলে এবং যেখানে অবতরণ করে, দুই-একদিনের মধ্যেই সে জায়গার গাছপালা ও শস্যাদি ধ্বংস করে তাকে মরুভূমিতে পরিণত করে' আবার উড়ে যেতে থাকে। সংখ্যাধিক্যের জন্যে এদের অভিযান ঘটলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি—তা কেউই নির্ণয় করতে পারেন নি।

এরা ঝাঁকে ঝাঁকে কয়েক হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ে এক দিনে অন্ততঃ ২৫ থেকে ৫০ মাইল পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। ১৯৩৮ সালে এক ঝাঁক পঙ্গপাল দক্ষিণ ডাকোটার উপর দিয়ে মনটানা পর্যন্ত প্রায় ৫০০ মাইল দূরত্ব ৩ সপ্তাহে অতিক্রম করেছিল।

গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশসমূহে এমন কয়েক জাতের কয়ারফড়িং দেখা যায়, যারা ছোট ছোট পাখী ও অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় প্রাণীদেরও আক্রমণ করতে ইতস্ততঃ করে না।

অবশ্য এদেরও শত্রুর অভাব নেই। কয়েক জাতের গুবরে পোকা, মাকড়সা, ইঁদুর জাতীয় বিভিন্ন প্রাণী, পাখী প্রভৃতি এদের প্রধান শত্রু। পৃথিবীর কোন কোন দেশে পঙ্গপাল উপাদেয় খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শ্রীশান্তি চক্রবর্তী

লোহা

ভূত্বকে যে সব ধাতব পদার্থ পাওয়া যায়, তার মধ্যে লোহার স্থান দ্বিতীয়। যদিও অ্যালুমিনিয়ামের ন্যায় অত পর্যাপ্ত নয়, তথাপি খনিজ পদার্থ থেকে লোহা অধিকতর সহজ উপায়ে নিষ্কাশন করা যায়; কাজেই খরচ কম লাগে। যাবতীয় ধাতুর মধ্যে লোহাই সবচেয়ে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পৃথিবীর যত গভীরে যাওয়া যায়, লোহার পরিমাণও তত বাড়তে থাকে। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল বোধ হয় বহুল পরিমাণে তরল লোহায় গঠিত। যদি সমগ্র পৃথিবীর দেহ (কেবল ভূত্বক নয়) পরীক্ষা করা যায়, তাহলে তার মোট ভারের শতাংশের প্রায় চল্লিশ ভাগই হবে লোহা।

মহাশূন্য থেকেও পৃথিবীতে লোহা সঞ্চিত হয়। অসংখ্য কঠিন পদার্থ ঝাঁকে ঝাঁকে সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। এদের মধ্যে কোনটি পাহাড়ের চেয়েও বড়,

আবার কোনটি ধূলিকণার চেয়েও ক্ষুদ্র। এরূপ লক্ষ লক্ষ পদার্থ প্রতিদিন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে অধিকাংশ পদার্থই প্রজ্জ্বলিত বা বাষ্পীভূত হয়ে যায়। বৃহদাকারের কোন কোনটি বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে। এগুলিকেই বলা হয় উল্কা। উল্কাপিণ্ডের শতাংশের নব্বই ভাগই লোহা।

পেশী-তন্তুতে লোহা একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। আমাদের রক্তের পক্ষেও লোহা অত্যাবশ্যক। রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে একপ্রকার লাল রঙের পদার্থ আছে, যাকে বলে হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিন ফুস্‌ফুস থেকে শরীরের প্রতিটি অংশে অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যায়। প্রতি হিমোগ্লোবিন-অণুতে আছে চারটি লোহার পরমাণু। প্রকৃত পক্ষে লোহার পরমাণুগুলিই অক্সিজেন বহন করে। হিমোগ্লোবিনের গুণাবলী এবং কর্মতৎপরতা নির্ভর করে উপযুক্ত পরিমাণ লোহা সরবরাহের উপর। মানুষের শরীরে এক আউন্সের দশ ভাগের এক ভাগ লোহা আছে। শরীরে লোহার পরিমাণ কম হলে রক্তাল্পতা রোগ হয়। এরূপ রোগীকে লোহঘটিত পদার্থের বড়ি খাওয়ানো হয়।

লোহা নিষ্কাশন করবার প্রধান খনিজ পদার্থ হলো—কমলা রঙের হিমাটাইট। লোহার সঙ্গে অক্সিজেনের সমন্বয় হলে এই পদার্থটি উৎপন্ন হয়। একটি হিমাটাইট-অণুতে আছে দুটি লোহা এবং তিনটি অক্সিজেন পরমাণু। অনেক জায়গায় যে রঙীন পাহাড় দেখা যায়, তার মূলে আছে এই পদার্থটি। কালো ম্যাগ্‌নেটাইটের খনি থেকেও লোহা পাওয়া যায়। ম্যাগ্‌নেটাইটের অণুতে আছে তিনটি লোহা ও চারটি অক্সিজেনের পরমাণু। এই সব খনিজ পদার্থে সিলিকেটের ময়লাও থাকে।

খনিজ পদার্থ থেকে লোহা নিষ্কাশন করতে হলে সিলিকেটের ময়লা এবং যৌগিক পদার্থের অক্সিজেন দূরীভূত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে খনিজ পদার্থ, কোক কয়লা ও চুনা-পাথরের মিশ্রণ ব্লাস্ট-ফার্ণেসে বোঝাই করবার পর মিশ্রণের ভিতর দিয়ে উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত করে কোক প্রজ্জ্বলিত করা হয়। চুল্লীর দ্রব্যগুলি যথেষ্ট গরম হয়ে লাল হয়ে গেলে কোকের কার্বন-পরমাণু খনিজ পদার্থের অক্সিজেন-পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয় এবং লোহার পরমাণু মুক্ত করে। এভাবে মুক্ত লোহা দ্রবীভূত হয়ে চুল্লীর তলায় জমা হয়। ইতিমধ্যে খনিজ পদার্থের সিলিকেট চুনা-পাথরের সমন্বয়ে খাদ বা ধাতুমলে পরিণত হয় এবং চুল্লীর তলায় নেমে এসে তরল লোহার উপর ভাসতে থাকে। মাঝে মাঝে তলা থেকে তরল লোহা ও ধাতুমল বের করে দেওয়া হয় এবং চুল্লীর মুখে খনিজ পদার্থ, কোক ও চুনা-পাথর পুনরায় বোঝাই করা হয়। এভাবে গলন-ক্রিয়া অবিরাম চলতে থাকে। কেবল চুল্লী মেরামতের দরকার হলে গলন-ক্রিয়া বন্ধ থাকে।

চুল্লী থেকে প্রাপ্ত তরল লোহা ছাঁচে ঢেলে জমাটবাঁধানো হয়। একেই বলে কাস্ট্ আয়রন বা ঢালাই লোহা। ঢালাই লোহাতে অনেক ভেজাল থাকে। তার মধ্যে প্রধান হলো কার্বন—যা কোক থেকে এসে লোহার মধ্যে প্রবেশ করে। কার্বনের ময়লা হবে শতাংশের প্রায় দুই থেকে সাড়ে চার ভাগ। তাছাড়া সিলিকন (শতাংশের প্রায় আড়াই ভাগ), খানিকটা ফস্‌ফরাস, গন্ধক ও অন্যান্য পদার্থের ভেজালও আছে। সব রকম লোহার মধ্যে ঢালাই লোহাই সবচেয়ে সস্তা। কিন্তু এই শ্রেণীর লোহা খুবই ভঙ্গুর; হঠাৎ আঘাত পেলে ভেঙ্গে যেতে পারে। যদি আরও খনিজ পদার্থ এবং চুনা-পাথর মিশিয়ে ঢালাই লোহাকে উত্তপ্ত করা হয়—তাহলে আরও ভেজাল দূরীভূত হয়ে প্রায় বিশুদ্ধ লোহা পাওয়া যায়। একে বলে রট্ আয়রন বা পেটা লোহা। এরূপ লোহা খানিকটা নমনীয় হলেও খুব দৃঢ় হয় এবং হঠাৎ আঘাত পেলেও ভাঙ্গে না।

ঢালাই ও পেটা লোহার মাঝামাঝি গুণসম্পন্ন লোহাই খুব কার্যোপযোগী। এই শ্রেণীর লোহাকে বলে ষ্টীল বা ইস্পাত। এতে কার্বনের ভেজাল থাকে প্রায় ০'১৫ থেকে ১'৫ ভাগ। ইস্পাতের একটি সুবিধা এই যে, একে পান দিলে, অর্থাৎ খুব উত্তপ্ত করে ঠাণ্ডা জলে নিমজ্জিত করলে অভীষ্ট কাঠিন্য সঞ্চার করা যায়। ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, টাংষ্টেন, মলিবডিনাম, ভ্যানাডিয়াম, সিলিকন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ বিভিন্ন পরিমাণে লোহাতে যোগ করে তাদের ক্ষয় ও মরিচা প্রতিরোধক শক্তি, কাঠিন্য, দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন বহু রকমের ইস্পাত তৈরী হয়। পেটা লোহা ও ইস্পাত তৈরীর জন্যে বিভিন্ন প্রকার চুল্লী ব্যবহৃত হয়।

লোহার একটি অসুবিধা এই যে, এটি অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়। এই মিলন খুব দ্রুত অথবা মন্থর গতিতে হতে পারে। লোহার গুঁড়া উত্তপ্ত করলে সহজেই অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হবে এবং যথেষ্ট তাপ নির্গত হয়ে প্রজ্বলিত লোহার ফুল্‌কি ছিট্‌কে বেরুতে থাকবে। তুবড়িতে লোহাচুর ব্যবহার করা হয়। জলসমন্বিত অক্সিজেনের সঙ্গে লোহা খুব ধীরে ধীরে মিলিত হয়। এই মিলন-ক্রিয়াকে বলে মরচে ধরা। এভাবে লোহা ক্ষয় পেতে থাকে। এজন্যে গৃহাদি নির্মাণে লোহার গায়ে লাল রং দেওয়া হয়—যাতে মরচে না পড়ে।

লোহার আর একটি বিশেষত্ব হলো, এটি চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং একে চুম্বকে পরিণত করা যায়। আমাদের পৃথিবী একটি চুম্বকের ন্যায় ব্যবহার করে। এই তথ্যেরই সদ্ব্যবহার করা হয়েছে দিক-নির্ণয়ের যন্ত্র নির্মাণে। কম্পাসে চৌম্বকধর্মী একটি ইস্পাতের কাঁটা থাকে, যা সহজভাবে ঘুরতে পারে। কাঁটাটি সব সময়ই পৃথিবীর চৌম্বক মেরুদ্বয়ের দিকে, অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে থাকে।

১৯৫৭ সালে লোহা উৎপাদনের পরিমাণ:

	লৌহপিণ্ড ও সঙ্কর ধাতু (টন)	ইস্পাত (টন)
সকল দেশের মোট	২৩০,০৩৭,৪৭৯	৩২০,২৭১,০৬৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৭৯,৩৩৮,৯১২	১১২,৭১৪,৯৯৬
রাশিয়া	৪০,১১৯,৩১১	৫৬,২১৭,৩০০
জার্মেনী	২২,০৭৫,৭৬২	৩০,২৫৪,৮২৮
গ্রেট বৃটেন	১৫,৯৯৮,০৮০	২৪,৩০৪,০০০
ফ্রান্স	১৩,১৬৫,৮৭১	১৫,৪২৭,৭৯১
জাপান	৭,৮০৯,৭৯৬	১৩,৮০৭,৪১০
চীন	৫,৫০০,০০০	৫,৩৫০,০০০
ভারত	২,১১৫,৩১৪	১,৯০২,৫৭০

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

তেজস্ক্রিয় পদার্থ কি?

আজকাল তেজস্ক্রিয় কথাটি হয়তো তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে! কিন্তু তেজস্ক্রিয় বলতে কি বুঝায়, তোমাদের অনেকেরই বোধ হয় জানা নেই। সেই কথাই আজকে তোমাদের কিছু বলবো।

ফরাসী দেশের বৈজ্ঞানিক বেকারেল তাঁর গবেষণাগারে একদিন দেখতে পেলেন যে, কালো কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর যদি ইউরেনিয়াম ধাতু অন্ধকারের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখা যায়, তাহলে সেই ধাতুখণ্ডের দ্বারা প্লেটে দাগ পড়ে যায়। ইউরেনিয়াম ধাতুর সবগুলি যৌগিকের মধ্যেই এই বিশেষ ধর্ম দেখা যায়। এটা ইউরেনিয়াম ধাতু থেকে নির্গত একপ্রকার বিকিরণের ফলেই হয়ে থাকে। যে সব পদার্থ থেকে এই প্রকার বিকিরণ নির্গত হয়, সেগুলিকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলে এবং এই বিকিরণের ব্যাপারটিকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়তা।

এর কিছুকাল পরে ম্যাডাম কুরি এবং মসিয়ে কুরি রেডিয়াম নামক ধাতু আবিষ্কার করেন। এই ধাতুটির মধ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিশেষত্বগুলির অস্তিত্ব খুব বেশী রকমই দেখতে পাওয়া যায়।

তারপর অধ্যাপক রাদারফোর্ড প্রমাণ করেন যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের এই বিকিরণ তিন প্রকারের হয়ে থাকে। তাদের নাম যথাক্রমে—(১) আল্‌ফা রশ্মি (২) বিটা রশ্মি

(৩) গামা রশ্মি। প্রত্যেকটি বিভিন্ন রশ্মির ধর্মের প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়। এদের মধ্যে গামা রশ্মির সঙ্গে রঞ্জেন রশ্মির ধর্মের কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

এখানে তোমাদের সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা হলো। তোমরা যখন বড় হয়ে পড়াশুনা করবে, তখন সব বিস্তৃতভাবে জানতে পারবে। তবে এইটুকু জেনে রাখ, কতকগুলি ধাতু আছে, যার ভিতর থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি আপনা-আপনি বিকিরিত হয়ে থাকে। আবার কতকগুলি পদার্থ আছে যাদের অতি সহজেই কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থে পরিণত করা যায়।

কণা চৌধুরী

ক্রিষ্টোফার কলম্বাস

(কথায় ও চিত্রে)

১। সান সালভাডোর—১৪৯২ সালের ১২ই অক্টোবর সকাল বেলায় একদল লোক ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপে অবতরণ করে নতজানু হয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ জানায়। এই দলে ছিলেন ক্রিষ্টোফার কলম্বাস এবং তাঁর সঙ্গী নাবিকগণ।

১নং চিত্র

তাঁরা তখন সবেমাত্র প্রথম, তখনকার দিনে অজানা আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এসেছে এবং আবিষ্কার করেছে—নতুন এক পৃথিবী—যা পরে উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা নামে পরিচিত হয়েছে।

২। ক্রিষ্টোফার কলম্বাস—১৪৫১ সালে ইটালীর জেনোয়া নগরীতে কলম্বাস জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং সমুদ্র সম্বন্ধে তাঁর ছিল অগাধ

জ্ঞান। সমুদ্র-পথে যুগান্তকারী অভিযানের জন্যে তিনি বছরের পর বছর প্রস্তুতি চালিয়েছিলেন। কলম্বাসের একটা দৃঢ় ধারণা ছিল যে, তাঁর সেই যুগান্তকারী অভিযানের ফলে ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে যাতায়াতের একটা নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে—

২নং চিত্র

যার দূরত্ব হবে আগের পথের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু কলম্বাস তাঁর প্রকৃত আবিষ্কারের গুরুত্ব বেশ কিছু সময় পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারেন নি।

৩। কলম্বাসের যৌবন—কলম্বাসের পরিবারের লোকেরা (পশমের) তাঁত বুনে সংসার চালাতো। কলম্বাসও ছেলেবেলা থেকেই তাঁতে কাজ করতো। কিন্তু আসলে

৩নং চিত্র

তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, সে নাবিক হবে। জেনোয়া (ইটালীর উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত) হলো ইটালীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। জেনোয়ার বহু যুবকই জাহাজে কাজ

নিয়ে সমুদ্র-পথে বহু দূর পর্যন্ত যাতায়াত করতো। এটা ছিল তাদের জীবিকার্জনের একটি প্রধান উপায়।

৪। কলম্বাসের নাবিক জীবন—মাত্র কুড়ি বছর বয়সে কলম্বাস নাবিকের কাজ গ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকে নাবিক হবার যে ইচ্ছা তিনি পোষণ করতেন—তা বাস্তবে পরিণত হলো। প্রথমে তিনি ইটালীর উপকূলে চলাচলকারী একটি ছোট্ট

৪নং চিত্র

জাহাজে কাজ নেন। এ কাজে তাঁর দক্ষতার ফলে শীঘ্রই তিনি বড় জাহাজে কাজ পেলেন। এসব জাহাজ ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে স্পেন ও পর্তুগাল দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে যাতায়াত করতো।

৫। পর্তুগাল—১৪৭৬ সালে কলম্বাস (তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৫) সমুদ্র-যাত্রাকে নিরাপদ করবার জন্যে পর্তুগালে সমুদ্র-পথের নক্সা (মানচিত্র) তৈরী করবার একটি

৫নং চিত্র

প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন ; কারণ কিছুদিন আগে পর্তুগালের উপকূলে একটি জাহাজ

দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত হয়েছিল। এর ফলে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। সে সময়ে আটলান্টিক মহাসাগর ছিল মানুষের সম্পূর্ণ অজানা। পর্তুগাল আটলান্টিক ছুঁয়েই অবস্থিত। কলম্বাসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই অজানা মহাসমুদ্র পেরিয়ে যেতে পারলেই ভারতবর্ষ বা প্রাচ্যে যাবার স্বল্প দূরত্বের জলপথ পাওয়া যাবে। তিনি সেই জলপথ আবিষ্কারের তোড়জোড় আরম্ভ করলেন।

৬। কলম্বাসের বিবাহ—৩০ বছর বয়সে কলম্বাস বিবাহ করেন। শীঘ্রই তাঁর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ক্যাপ্টেনের পদে তিনি উন্নীত হন এবং নক্সা ও মানচিত্র প্রস্তুতে তাঁর দক্ষতা খ্যাতি লাভ করে। তাঁর সাংসারিক সুখ-সম্পদের কিছুমাত্র

৬নং চিত্র

অভাব ছিল না। তবুও তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি সর্বদা অজ্ঞাত সমুদ্র-পথ আবিষ্কারের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন।

৭। স্বপ্ন—কলম্বাস সর্বদাই ভারত ও প্রাচ্যে যাবার স্বল্প দূরত্বের পথ
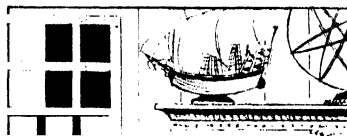
৭নং চিত্র

আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখতেন। এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে তিনি সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকতেন। জলপথ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য, মানচিত্র, নক্সা প্রভৃতি দেখে তিনি তাঁর জলপথ অভিযানের একটি নক্সা তৈরী করেন। এই ব্যাপারে তাঁর ভাই বার্থোলোমিউ তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কলম্বাসের এই নক্সা তৈরী এবং অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহে প্রায় আট বছর সময় লেগেছিল।

৮। স্পেন—চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরী করবার পর কলম্বাস এই ব্যাপারে সাহায্য লাভের আশায় স্পেনের রাজা ফার্ডিনাণ্ড এবং রাণী ইসাবেলার সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। সাক্ষাৎ মিললো। তিনি রাজা ও রাণীকে তাঁর পরিকল্পনার কথা সবিস্তারে বুঝিয়ে বললেন এবং এই অভিযানের জন্যে তাঁদের কাছে সাহায্যও চাইলেন। যাহোক,

৮নং চিত্র

অনেক চেষ্টার পর কলম্বাস তাঁদের কাছ থেকে এই ব্যাপারে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পন। কিন্তু এই সাহায্য দানের একটা সর্ত ছিল—কলম্বাস এই অভিযানের ফলে যে সব নতুন জায়গা আবিষ্কার করবেন, সেগুলি স্পেন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৯। অভিযান—১৪৯২ সালের ৩রা অগাষ্ট কলম্বাসের ঐতিহাসিক অভিযান আরম্ভ হয়। তাঁর দলে এক-শ'-এর কিছু কম লোক ছিল। তিনটি ছোট জাহাজে কলম্বাস তাঁর দলবল নিয়ে স্পেনের প্যালোস বন্দর থেকে অভিযান আরম্ভ করেন। অভিযানের প্রথম গন্তব্যস্থল হলো ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ। তাঁর তিনটি জাহাজের নাম ছিল সান্তা মেরিয়া, পিণ্টা ও নিনা। এর মধ্যে সান্তা মেরিয়া দৈর্ঘ্যে ছিল ৯০ ফুট, আর

অপর দুটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৭০ ফুট। কলম্বাসের এই অভিযানের সময় কম্পাসই ছিল

৯নং চিত্র

দিক-নির্ণয়ের একমাত্র যন্ত্র।

১০। ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ—কলম্বাসের ক্ষুদ্র নৌবহর নয় দিন পরে ১২-ই অগাষ্ট ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছায়। এখান থেকে তাঁরা ভবিষ্যতের জন্যে আরো রসদ বোঝাই করে নেয়। এখানে আসবার সময় পিন্টা জাহাজের যে হালটা ভেঙ্গে গিয়েছিল, সেটাকে সারাই করা হলো। এখান থেকেই তারা আসল অভিযানের চূড়ান্ত
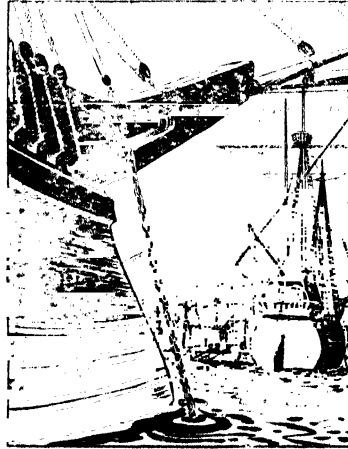
১০নং চিত্র

প্রস্তুতির কাজ শেষ করে নেয়। জাহাজ ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ থেকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে তারা জলপথের যে অংশে উপস্থিত হয়—সেখানে এর পূর্বে আর কোন জাহাজ পৌঁছায় নি। সে সময়ে সব জাহাজের পশ্চিম দিকে চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল ছিল ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ।

১১। অজ্ঞাত জলপথ—ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ ক্রমশঃই তাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। চতুর্দিকে কেবল জল আর জল। আসলে তখন তারা অজানা সমুদ্রে পৌঁছে গিয়েছিল। তবুও তারা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তাদের কাছে এমন কোন নক্সা বা মানচিত্র ছিল না, যার দ্বারা এ-ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। সোজা

১১নং চিত্র

পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া তাদের আর কিছু করণীয় ছিল না। পুনরায় জমি না দেখা পর্যন্ত তাদের পশ্চিম দিকে যাত্রা চলতে থাকে। কিন্তু দলের অনেক নাবিক এবং কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী পুনরায় জমি দেখবার আশা পোষণ করতেন না।

১২। বিক্ষোভ—তিন সপ্তাহ ধরে পশ্চিম দিকে তাঁদের যাত্রা চলতে থাকে। বাতাস ও আবহাওয়া তাদের যাত্রার অনুকূল ছিল। কিন্তু নাবিকেরা আশঙ্কা করতে লাগলো—হয়তো তারা আর দেশে ফিরতে পারবে না—এই অজানা সমুদ্রেই মৃত্যু বরণ

১২নং চিত্র

করতে হবে। তাছাড়া তারা এর আগে একটানা এতদিন সমুদ্রবক্ষে থাকে নি। তারা শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলো। তারা কলম্বাসের কাছে দাবী জানালো

ফিরে যাবার জন্যে। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল—সম্মুখে কোন জমির দেখা পাওয়া যাবে না। কলম্বাস কোন প্রকারে তাদের শান্ত করলেন।

১৩। ভূয়া জমি—সমুদ্রবক্ষে প্রায় এক মাস তাদের কেটে গেল। তাদের অভিযানের বিরাম নেই। একদিন হঠাৎ নাবিকেরা একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলো—জমি! জমি! কলম্বাসেরও মনে হলো—সত্যিই জমি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ভুল ভেঙ্গে গেল। যেটাকে তারা জমি মনে করেছিল—সেটা একখণ্ড

১৩নং চিত্র

মেঘ ছাড়া আর কিছুই নয়। নাবিকেরা আবার বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। তারা কলম্বাসকে চরম-পত্র দিল যে, তিন দিনের মধ্যে জমির দেখা না পেলে তাঁকে ফিরে যেতে বাধ্য করা হবে।

১৪। জমি দেখা গেল—অবশেষে ১৪৯২ সালের ১১ই অক্টোবর জমি দেখা গেল।

১৪নং চিত্র

সবাই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। ১২ই অক্টোবর কলম্বাস ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী জমিতে

অবতরণ করেন। সেটি ছিল একটি দ্বীপ। সর্ত অনুসারে দ্বীপটি স্পেন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষিত হলো। দ্বীপটির নাম দেওয়া হলো সান সালভাডর। কলম্বাসের কিন্তু বিশ্বাস ছিল যে, দ্বীপটি ভারতেরই অংশ এবং কলম্বাসের সেই ভুলের জন্যেই সেই দ্বীপপুঞ্জ আজও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত।

১৫। কলম্বাসের অবদান—কলম্বাস কর্তৃক সান সালভাডর দ্বীপ আবিষ্কারের অভিযান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। অবশ্য তিনি যে উদ্দেশ্যে অভিযান করেছিলেন—
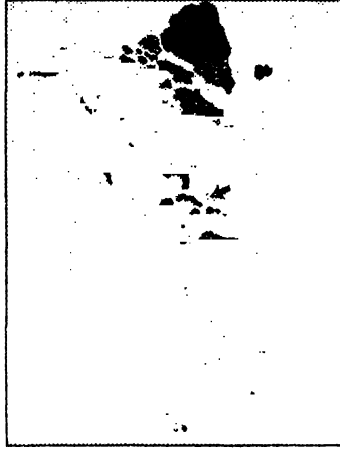
১৫নং চিত্র

তা সফল হয় নি। কিন্তু তাঁর এই রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী পরবর্তী সমুদ্র-অভিযাত্রীদের যথেষ্ট প্রেরণা জুগিয়েছিল। তাঁর অভিযানের ফলেই উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল ভূভাগ আবিষ্কৃত হয়।

শোক-সংবাদ

পরলোকে রস-সাহিত্যিক রাজশেখর বসু

গত ২৭শে এপ্রিল, বুধবার প্রখ্যাত রস-সাহিত্যিক রাজশেখর বসু তাঁহার ৭২, বকুলবাগান রোডে বাড়ীতে পরলোক গমন করেন।

"১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রাজশেখর বসু বর্ধমানের ব্রাহ্মণ-পাড়া নামক গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করিবার পর তিনি আইন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে তিনি রাসায়নিক হিসাবে চাকুরী জীবন সুরু করেন এবং নিজের কর্ম-দক্ষতার ফলে এই রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

অসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও কেবলমাত্র জীবনের উত্তরভাগে আসিয়া 'পরশুরাম' ছদ্মনামে রসরচনায় মনোনিবেশ করেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে প্রথম

মহাযুদ্ধের সময়ের অসাধু ব্যবসায়ীদের ব্যঙ্গ করিয়া তিনি তাঁহার প্রথম রচনা 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' প্রকাশ করেন। অনতিকালের মধ্যেই তাঁহার এই রচনা সাহিত্যিক সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করে। ইহার পরে তাঁহার বিভিন্ন রসরচনা—'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন' প্রভৃতি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়া একের পর এক বাহির

রাজশেখর বসু

হইতে থাকে। তাঁহার প্রত্যেকটি রচনাতেই উইট ও হিউমারের অপূর্ব সংমিশ্রণে পাঠকের মনে অনাবিল হাস্যরসের উদ্রেক করে। শুধু নিরর্থক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নয়, সমাজের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তিনি তীব্র কশাঘাত করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার এই বিস্ময়কর সাহিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। নিত্য নূতন শব্দ যোজনা করিয়া তিনি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কলিত অভিধান 'চলন্তিকা' বাংলা ভাষার একটি অমূল্য সংযোজন। ১৯০৫ সাল হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করিয়াছেন।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সাহিত্যসাধনা করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি যে কেবল অনন্যসাধারণ কৌতুক-রসই পরিবেশন করিয়া আসিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার স্বকীয় মনন ও পাণ্ডিত্যের পরিচয়স্বরূপ "লঘু-গুরু," "বিচিন্তা" প্রভৃতি মৌলিক প্রবন্ধাদির গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন।

মাত্র একমাস পূর্বে (মার্চ) তিনি ৮১ বৎসর

বয়সে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিদানে সম্মানিত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৫৫ সালে তাঁহাকে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পরশুরাম বিরচিত রচনাবলী—গল্প-গ্রন্থ, গড্ডলিকা, হনুমানের স্বপ্ন, কজ্জলী, গল্প-কল্প, ধুস্তুরি মায়া, কৃষ্ণকলি, নীল তারা, আনন্দীবাঈ, চমৎকুমারী। প্রবন্ধ গ্রন্থ—লঘু-গুরু, বিচিন্তা, চলচ্চিন্তা। অনুবাদ গ্রন্থ—রামায়ন, মহাভারত, হিতোপদেশের গল্প। শিল্প গ্রন্থ—কুটির-শিল্প, ভারতের খনিজ। অভিধান—চলন্তিকা।"

তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য ছিলেন। লোকরঞ্জক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতামালা প্রদানের ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি বিজ্ঞান পরিষদে ৬০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিবিধ

গেঁটে-বাতের গবেষণায় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি ইউনিট

লণ্ডনের এম্পায়ার রিউম্যাটিজম্ কাউন্সিল সম্প্রতি সেণ্ট টমাস হস্পিটাল মেডিক্যাল স্কুলে একটি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি ইউনিট প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছেন।

কাউন্সিল বলেন, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের অভাবে গেঁটে-বাত (Arthritis) ও সাধারণ বাত সম্পর্কে গবেষণায় অসুবিধা দেখা দিয়াছে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই ১২,০০০ হইতে ১৫,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে এই ধরণের একটি ইউনিট প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হইয়াছে।

এই ইউনিটটি তরুণাস্থি ও অন্যান্য তন্তু সম্পর্কে গবেষণা চালাইবে। ইহা বৃটেনের অন্যান্য বাত রোগের গবেষণা-কর্মীদের ব্যবহারেও লাগিতে পারিবে।

ইউনিটটি তরুণাস্থির নমুনাগুলিকে ১৫,০০০ গুণ বর্ধিত করিয়া দেখিতে পারিবে। এই পর্যন্ত যে সমস্ত উপকরণ লইয়া কাজ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে তরুণাস্থিগুলিকে মাত্র ১,০০০ গুণ বড় করিয়া দেখা যাইতে পারে।

মানুষের রঙের অনুভূতি

বোষ্টনের দুইজন বিজ্ঞানী পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মাত্র দুইটি রং হইতে বিচ্ছুরিত আলোকের প্রত্যেকটি, মানুষের এক একটি চোখে প্রবেশ করিয়া যাবতীয় রঙের অনুভূতি ঘটায়।

রং সম্পর্কে মানুষের চাক্ষুষ অনুভূতির তিনশত বৎসরের প্রাচীন সূত্র এই যে, চোখের মধ্যে রং সম্পর্কে সংবেদনশীল তিন রকমের কোষ রহিয়াছে।

এই তিন রকম কোষের মধ্যে একটি লাল, একটি নীল ও একটি সবুজ আলো সম্পর্কে সংবেদনশীল। সাধারণতঃ ধারণা—লাল, সবুজ ও নীল আলো যে অনুপাতে চোখের কোষে আসিয়া পতিত হয়, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই মানুষের বিভিন্ন রঙের অনুভূতি জন্মায়।

মার্কিন বিজ্ঞানীদ্বয় ডাঃ নরম্যান গেশউইণ্ড এবং ডাঃ জন আর. সেগ্যাল নামক এই দুই জন মার্কিন বিজ্ঞানী দুইটি সাদা ও কালো ফিল্মের উপর একটি দৃশ্যের আলোক-চিত্র গ্রহণ করেন। আলোক-চিত্র দুইটি একই; তবে পার্থক্য এই যে, একটি তোলা হয় লাল ফিল্টারের সাহায্যে এবং অপরটি তোলা হয় সবুজ ফিল্টারের সাহায্যে। লাল ফিল্টারের মধ্য দিয়া তোলা ফিল্মটিকে আর একটি লাল ফিল্টারের পিছনে লাগাইয়া বাঁ-চোখের সামনে রাখা হয়। দ্বিতীয় ফিল্মটির পিছনে আর একটি সবুজ ফিল্টার লাগাইয়া ডান চোখের সামনে স্থাপন করা হয়। এইভাবে দৃষ্ট বস্তুর মধ্যে লাল, সবুজ ও গৃহীত দৃশ্যটির সকল মূল রং সহ মানুষের চক্ষুগ্রাহ্য সর্বপ্রকার রং-ই পরিদৃষ্ট হয়।

ডাঃ গেশউইণ্ড ও ডাঃ সেগ্যাল বলেন, তাঁহারা তাঁহাদের পরীক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে এই তথ্যটিই প্রকাশ করিতে চাহেন যে, রং সম্পর্কে মানুষের অনুভূতি মস্তিষ্কের কতকগুলি ক্রিয়ার উপর যতখানি নির্ভর করে, চোখের উপর ততখানি নির্ভর করে না।

বিজ্ঞপ্তি

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

এতদ্দ্বারা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার পঞ্চম বার্ষিক প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত শাখা দুইটির অন্তর্গত যে কোন বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া সহজ ভাষায় জটিলতা-বর্জিত জনপ্রিয় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে ঃ—

(ক) জড়-বিজ্ঞান (Physical Science)

রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান ইত্যাদি।

(খ) জীব-বিজ্ঞান (Biological Science)

উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইত্যাদি।

উক্ত শাখাদ্বয়ের প্রত্যেকটির জন্য বিভিন্ন বিষয়ক উৎকৃষ্ট তিনটি প্রবন্ধের লেখক-গণের প্রত্যেককে ৫০৲ (পঞ্চাশ) টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। উভয় শাখায় মোট পুরস্কারের সংখ্যা হইবে ছয়টি। প্রবন্ধের গুণাগুণ বিচারে পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত পরীক্ষকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত **কোন প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে না**; কোন প্রবন্ধ প্রকাশের যোগ্য বিবেচিত হইলে পরিষদ যথাসময়ে তাহা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লেখককে জানানো দুঃসাধ্য—পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম আগামী সেপ্টেম্বর '৬০ মাসের মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হইবে।

আগামী ৩০শে জুন'৬০ তারিখের মধ্যে সকল প্রবন্ধ পরিষদের কার্যালয়ে (কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, ফেডারেশন হল। কলিকাতা-৯) পৌঁছান চাই। প্রবন্ধ **কালি দিয়া কাগজের এক পিঠে** পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে—প্রবন্ধের সঙ্গে ছবি থাকিলে তাহা 'চাইনিজ ইঙ্কে' আঁকা ভাল ছবি হওয়া দরকার। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের আয়তন হাতে-লেখা অর্ধ ফুলস্ক্যাপ (১৩″×৮″) ৮ (আট) পৃষ্ঠার অধিক বা (ছয়) পৃষ্ঠার কম না হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের গায়ে কোন নাম ঠিকানা থাকিবে না—**পৃথক কাগজে** লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা দিতে হইবে। প্রবন্ধের শীর্ষে **প্রতিযোগিতার জন্য** এই কথাটি লিখিতে হইবে।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—**শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য**

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োদশ বর্ষ | মে, ১৯৬০ | পঞ্চম সংখ্যা

ইস্পাত-শিল্পে জ্বালানী

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

যে সব পদার্থ অক্সিজেন সংযোগে উত্তাপের সৃষ্টি করিয়া শিল্পকার্যে সাহায্য করে তাহাকে জ্বালানী বলে। ইস্পাত-শিল্পে সাধারণতঃ প্রডিউসার গ্যাস ব্যবহৃত হয়। আলকাত্‌রা বা এক প্রকার তেল তরল জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের সহিত কোক ওভেন গ্যাস এবং মারুৎ-চুল্লীর গ্যাস কিছু পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। আমেরিকায় এক প্রকার খনিজ প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়; সেখানে তাহাও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রডিউসার গ্যাস—মর্গ্যান ফার্নেস নামক এক-প্রকার বিশেষ চুল্লীতে কয়লা হইতে বিশেষভাবে এই গ্যাস প্রস্তুত হয়ে থাকে। ইহাতে কয়লার কার্বনকে কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত করা হয়। যখন চুল্লীতে কয়লা জ্বলিতে থাকে তখন বাষ্প এবং বাতাস বিশেষ অনুপাতে (১:৮) প্রবেশ করাইলে কয়লার কার্বন জ্বলিয়া যে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়, তাহা বাষ্পের দ্বারা কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত হয় এবং হাইড্রোজেন গ্যাস পাওয়া যায়। এই দুইটি গ্যাস ছাড়া কয়লায় কিছু পরিমাণ উদ্বায়ী গ্যাসও থাকে। এই সব গ্যাস অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া ওপেন হার্থ ফার্নেসে জ্বলে। ইহা ছাড়া কিছু পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেনও থাকে।

কোক ওভেন গ্যাস—কয়লাকে বাতাসের সংস্পর্শে আসিতে না দিয়া কোক ওভেন নামক বিশেষ চুল্লীতে গরম করিলে এই গ্যাস পাওয়া যায়। ইহাতে কয়লার উদ্বায়ী গ্যাস থাকে। এই গ্যাস এককভাবে ওপেন হার্থ ফার্নেসে জ্বালান হয় না; প্রডিউসার গ্যাস অথবা মারুৎ-চুল্লীর গ্যাসের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা হয়।

মারুৎ-চুল্লীর গ্যাসও এক প্রকার জ্বালানী। এই দুই প্রকার গ্যাসই প্রথমে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। একই চাপে অনবরত পাইবার উদ্দেশ্যে এই দুই প্রকার গ্যাস রাখিবার জন্য গ্যাস ধারণক্ষম বিরাট ঘরের প্রয়োজন।

পেট্রোলিয়াম তেল এবং আলকাত্‌রা, এই দুই প্রকার তরল জ্বালানী ওপেন হার্থে ব্যবহার করা হয়। এই তরল জ্বালানীর সান্দ্রতা এমন হওয়া উচিত যাহাতে ইহারা সহজভাবে চলিতে পারে। সেই জন্য ইহাদিগকে ৬৫°সে. হইতে ৯৫°সে. পর্যন্ত

গরম করিয়া পাম্পের সাহায্যে ওপেন. হার্থের বার্ণার পর্যন্ত পাঠানো হয়। তরল জ্বালানী জ্বালাইতে উচ্চ তাপ (২০০°সে.—৩০০°সে.) এবং উচ্চ চাপবিশিষ্ট (১৫০—২০০ পাউণ্ড প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে) বাষ্পের সাহায্য লইতে হয়। সাধারণ ষ্টোভে পাম্প করিয়া উচ্চ চাপের বাতাস যেমন কেরোসিনকে গ্যাসে পরিণত করিতে সাহায্য করে, তেমনি বাষ্প ও তরল জ্বালানীকে গ্যাসে পরিণত করে। সে জন্য ওপেন হার্থের দুই পাশে দুইটি বার্ণার থাকে। বার্ণারের মধ্য দিয়া তরল জ্বালানী বাষ্পের সাহায্যে গ্যাসের আকারে বহির্গত হইয়া বাতাসের সংস্পর্শে জ্বলিতে থাকে।

কোক ওভেন গ্যাস এবং মারুৎ-চুল্লীর গ্যাস এই সঙ্গে ব্যবহার করিবার জন্য বার্ণারের ভিতর দিয়া তরল জ্বালানী যাইবার রাস্তার নীচে ভিন্ন রাস্তা আছে। জ্বলিবার জন্য অক্সিজেন ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে বার্ণারে অন্য একটি রাস্তাও আছে। বার্ণারটি যাহাতে জ্বলিয়া না যায়, সেই জন্য ইহাকে জলের দ্বারা ঠাণ্ডা রাখা হয়।

	CO_2	CO	CH_4	$C_n H_n$	H_2	H_2O	B. Th. u. প্রতি ঘনফুটে
প্রডিউসার	৪.৬	২৪.৫	৩.১	১.২	৯.৬	৩.৩	১৫৬
কোক ওভেন	১.৮	৫.৬	২৮.১	৪.০	৫৩.৭	২.৩	৫১০
প্রাকৃতিক	০.২	—	৮৫.০	১১.০	—	০.৯	১০১০
মারুৎ-চুল্লী এবং কোক ওভেন (৬৫+৩২ ভাগ) মিশ্রিত গ্যাস	৮.৮	১৮.৩	৯.৩	৩.১	১৯.২	১.৪	২৪০

	C	H_2	N_2	O_2	S	H_2O	B. Th. U. প্রতি পাউণ্ডে
টার বা আলকাত্‌রা	৮৯.০	৫.৩	১.৩	১.৭	০.৫	২.২	১৫,৬০০
তেল	৮৭.২	১১.২	০.৪	০.৬	০.৬	—	১৮,৪০০

বাতাস এবং জ্বালানী পূর্বে গরম করিয়া লইলে শিখার তাপ খুব বেশী হয়। তরল জ্বালানী পূর্বে গরম করা হয় না, কিন্তু গ্যাসীয় জ্বালানীকে পূর্বে গরম করা হয়। সেই জন্য জ্বালানীর তারতম্য অনুসারে ওপেন হার্থ ফার্নেসও বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। যে সকল চুল্লীতে তরল জ্বালানী ব্যবহৃত হয়, তাহাতে নীচের দিকে দুই পাশে দুইটি করিয়া ঘর থাকে। এই দুইটি ঘর ফায়ার-ক্লে ইটের দ্বারা জাফ্রিকাটার মত এমনভাবে সজ্জিত থাকে যাতে তাহার ভিতর দিয়া অনায়াসে বাতাস যাইতে পারে। ইটগুলি পূর্বাহ্ণে গরম করিলে বাতাস যাইবার সময় ইট হইতে তাপ গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত হয়। এই ঘরকে চলিত ভাষায় জালি বলে। গ্যাসীয় জ্বালানী হইলে দুই পাশে দুইটি করিয়া ঘর থাকে, যাহার একটিতে বাতাস ও অন্যটিতে গ্যাস গরম করা যায়।

ডান দিকের জালি হইতে গরম হইয়া ওপেন হার্থ চুল্লীতে জ্বলিয়া অব্যবহার্য গ্যাস বাঁ-দিকের জালির মধ্য দিয়া চিম্‌নি হইতে বাহির হইয়া যায়। এইভাবে ১৫-২০ মিনিট জ্বলিবার পর অব্যবহার্য গরম গ্যাস যাইবার সময় বাঁ-দিকের জালির ইটগুলিকে গরম করে। ১৫-২০ মিনিট বাদে বাঁ-দিক হইতে জ্বালানী ও বাতাস ব্যবহার করা হয়। তাহাতে জালির ইটগুলি আবার গ্যাস ও বাতাসকে গরম করে এবং ডান দিকের জালির ইটগুলি গরম হইতে থাকে। সাধারণতঃ কোক ওভেন গ্যাস এবং প্রাকৃতিক গ্যাসকে জালির মধ্য দিয়া প্রেরণ করা হয় না। কারণ ৭৫০° সে. উত্তাপে কার্বন ও হাইড্রোজেন সংযুক্ত গ্যাস বিভাজিত হইয়া যায়। তাহাতে তাপ কম হয় এবং অন্যান্য অসুবিধাও দেখা দেয়।

কাজেই দেখা যায় যে, তরল জ্বালানী ব্যবহার করিলে নীচের দিকে দুই প্রান্তে দুইটি জালি থাকে ; কিন্তু প্রডিউসার গ্যাস ব্যবহার করিলে দুই প্রান্তে চারটি জালি থাকে। তেমনি তরল জ্বালানীর ক্ষেত্রে চুল্লীতে বাতাস ঢুকিবার জন্য দুই প্রান্তে দুইটি রাস্তা থাকে যাহাকে পোর্ট বলে। কিন্তু প্রডিউসার গ্যাস ব্যবহার করিলে দুই প্রান্তে থাকে চারটি রাস্তা।

তরল জ্বালানীতে বার্ণারের ব্যাস ৫"-৬" ইঞ্চি হইয়া থাকে ; কিন্তু গ্যাসের পোর্ট ২'-৩' ফুট হইয়া ক্রমশঃ শেষ প্রান্তে ৫'-৬' ফুট চওড়া হইয়া থাকে। সেই জন্য জ্বালানী জ্বলিবার পর অব্যবহার্য গ্যাস বাহির হইয়া যাইবার বাধা তরল জ্বালানীতে কম। গ্যাসের পোর্ট এবং বার্ণার, যাহাই ব্যবহৃত হউক না কেন, তাহাদিগকে নীচের দিকে চাপা রাখা হয়। বাতাসের পোর্ট, গ্যাসের পোর্ট বা বার্ণারকে এমনভাবে ঘিরিয়া রাখে এবং এমনভাবে নীচের দিকে চাপা থাকে যাহাতে চুল্লীর ছাদ হইতে বেশ নীচের দিকে জ্বালানী জ্বলিতে পারে। তরল জ্বালানীকে গ্যাসের আকারে পরিবর্তিত করিবার জন্য অনেকে অন্য কোন জ্বালানী গ্যাস বা বাতাসও ব্যবহার করে। ইহাতে তাপ অনেক বেশী পাওয়া যায়, কিন্তু খরচ অনেক বেশী। বার্ণারকে ইচ্ছামত সামান্য এদিক-ওদিক ঘুরান যায় এবং শিখা সুবিধামত যে কোন দিকে নেওয়া যায়।

প্রডিউসার গ্যাসের সহিত কোক ওভেন গ্যাস মিশাইয়া শিখার তাপ বৃদ্ধি করা হয়। প্রডিউসার গ্যাসের শিখা দীপ্তিমান এবং বেশ লম্বাটে ধরণের হয়ে থাকে। ওপেন হার্থ ফার্নেসে এইরূপ শিখারই প্রয়োজন বেশী।

শুধু কোক ওভেন গ্যাসের শিখা দীপ্তিমান নয় এবং শিখাও ছোট—চুল্লীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পৌছায় না। এই কারণে কোক ওভেন গ্যাসের শিখার তাপ বেশী হইলেও শুধু ইহা দ্বারা ওপেন হার্থ চলে না। গ্যাস দ্বারা চালিত ওপেন হার্থ ফার্নেস সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া গ্যাস যাইবার রাস্তা পরিষ্কার করা দরকার এবং এই জন্য গ্যাস-প্রস্তুতকারকদের উপর নির্ভর করিতে হয়। তরল জ্বালানী ব্যবহারে এই সকল অসুবিধা নাই। তরল জ্বালানীতে বাষ্প কমাইয়া শিখা বড় এবং বাষ্প বাড়াইয়া শিখা ছোট করা যায়।

জ্বালানী প্রজ্জ্বলিত করিতে কতটা বাতাসের প্রয়োজন, তাহা জানিতে হইলে জ্বালানীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ দরকার। কার্বন, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোকার্বন, হাইড্রোজেন, সালফার প্রভৃতি কত আছে, তাহা জানিলে জ্বলিতে কতটা অক্সিজেন এবং কতটা বাতাসের প্রয়োজন তাহা জানা যায়। সাধারণতঃ ১০ হইতে ২০ ভাগ বেশী বাতাস লওয়া হয়। কারণ ওপেন হার্থ ফার্নেসের শিখায় সর্বদা কিছু পরিমাণ অক্সিজেন থাকা দরকার, তবে তাহা যেন শতকরা ২ ভাগের বেশী না হয়।

অব্যবহার্য গ্যাস—জ্বলিবার পরে যাহা বাহির হয়

গ্যাস	CO_2	O_2	H_2O	N_2	শতকরা ১০ ভাগ বেশী বাতাস লইলে ১০০ ঘনফুট জ্বালানীতে
প্রডিউসার	১৫'৫	১'২	১০'৪	৭২'৯	২২১ ঘনফুট বাতাস
কোক ওভেন	৭'৩	১'৬	২১'৭	৬৯'৪	৫৯২ " "
প্রাকৃতিক	৮'৯	১'৭	১৭'৯	৭১'৫	১২১০ " "
ৎ-চুল্লীর+কোক ওভেন (৬৫ : ৩৫) তরল	১২'৫	১'৪	১৫'৯	৭০'২	৩১৩ " "
টার (Tar)	১৪'৯	১'৭	৯'৮	৭৩'৫	শতকরা ১০ ভাগ বেশী বাতাস লইলে ১ পাউণ্ড জ্বালানীতে ১৪'৪ পাউণ্ড বাতাস
তেল	১২'৫	১'৭	১৪'০	৭১'৮	১৬'৭

ওপেন হার্থ ফার্নেসে বাতাস লইবার উপায় দুই প্রকার। একটি স্বাভাবিক টানে। রাস্তাটি বাতাসের জালির পরে ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া চুল্লীতে ঢোকে। উত্তপ্ত চিম্‌নীর টানে জ্বালানী জ্বলিবার ফলে যে গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহা বাহির হইয়া গেলে যে শূন্য স্থানের সৃষ্টি হয় তাহা পূরণ করিবার জন্য উত্তপ্ত বাতাসের ঊর্ধ্বমুখী গতি, জালি হইতে চুল্লীতে যাইবার অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা বাতাসকে স্বাভাবিকভাবে টানিয়া চুল্লীতে নেয়। বাতাস ঢুকিবার একটি মুখ আছে এবং তাহাতে আছে একটি ঢাকনী। ঢাকনী দ্বারা মুখের পরিমাণ বাড়াইয়া কমাইয়া বাতাস কম-বেশী করা হয়। গ্যাস ও উপরিউক্ত কারণ ছাড়া মর্গ্যান চুল্লীর চাপেও ওপেন হার্থ ফার্নেসে ঢোকে।

কিন্তু এভাবে বাতাসকে সর্বদা আয়ত্তে রাখা যায় না। সেই জন্য বাতাসকে একটি বড় পাখার সাহায্যে জালির মধ্যে প্রেরণ করা হয়। এই ব্যবস্থায় বাতাস বাড়াইবার বা কমাইবার উপায় আছে এবং কতটা বেশী বা কম করা হইল, তাহাও জানা যায়। এই দুই রকম ব্যবস্থাই আছে; কারণ, কোন কারণে পাখা বন্ধ হইলে যেন চুল্লী অন্য ব্যবস্থায় চলিতে পারে। বাতাসের নাইট্রোজেন আমাদের কোন কাজে আসে না। সেই জন্য বাতাসের পরিমাণ কম করিয়া বার্ণার বা পোর্টের মধ্য দিয়া এমনভাবে অক্সিজেন প্রেরণ করা হয়, যাহাতে অক্সিজেন জ্বালানীর সঙ্গে চুল্লীতে মিশিয়া জ্বলিতে সাহায্য করিতে পারে। ইহাতে তাপও বেশী পাওয়া যায়। ইস্পাত ঢালাইয়ের সময় সাধারণতঃ বাতাসের পরিমাণ কম করা হয়।

ইস্পাত-শিল্পে জ্বালানী ছাড়া রাসায়নিক ক্রিয়া হইতেও তাপ সঞ্চার হয়। লৌহের মধ্যে যে সিলিকন, ম্যাঙ্গানীজ, ফস্‌ফরাস, কার্বন আছে তাহা জারিত হইয়াও তাপ উৎপন্ন করিয়া থাকে। এইগুলি অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া ইহাদের অক্সাইড উৎপন্ন করে এবং তাপও সঞ্চারিত হইয়া থাকে। লৌহকে এই দুই পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় উত্তাপে গরম করিয়া ইস্পাত তৈয়ার করা হয়।
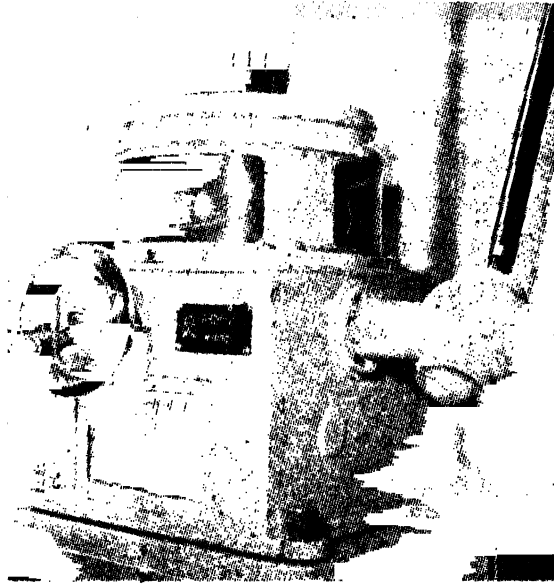
রাশিয়ায় নির্মিত টেলিস্কোপিক ক্যামেরার সাহায্যে আকাশের জ্যোতিষ্কগুলির ছবি তুলিবার সময় যাহাতে ছবিগুলি অস্পষ্ট ও ঝাপ্‌সা না হয়, সেইজন্য দূরবীক্ষণে এই ঘড়িকল থাকে। এই কলটি দূরবীক্ষণের আহ্নিক গতির সঙ্গে তাল রাখিয়া ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ করে।

ফ্লোরোকার্বন

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

প্রায় দশ বছর হলো এক শ্রেণীর অভিনব রাসায়নিক দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি হলো ফ্লোরোকার্বন। শিল্প-বিজ্ঞানে এগুলি ক্রমশঃই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করছে। আধুনিক রসায়নে এগুলি এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। প্রয়োজনীয়তার দিক থেকেও এদের মধ্যে অনেক-গুলিই যথেষ্ট মূল্যবান। প্রকৃতির রাজ্যে এদের সন্ধান পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্ববর্তীদেরও এই দ্রব্যগুলি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। এই পদার্থগুলি হলো আধুনিক রাসায়নিক শিল্প-বিজ্ঞানের অভিনব অবদান।

ফ্লোরোকার্বনগুলি হলো হাইড্রোকার্বনের রাসা-য়নিক সগোত্র। হাইড্রোকার্বনগুলিই আধুনিক সভ্যতাকে জ্বালানী সরবরাহ করবার জন্যে দায়ী। হাইড্রোকার্বনগুলি হলো কার্বন ও হাইড্রোজেন সহযোগে উৎপন্ন নানারকম আকারের অণুসমন্বিত যৌগিক পদার্থ। অপর পক্ষে, ফ্লোরোকার্বনগুলি হলো কার্বন ও ফ্লোরিন সহযোগে উৎপন্ন বিভিন্ন আকারের অণুসমন্বিত যৌগিক পদার্থ। ফ্লোরো-কার্বনের গঠন হাইড্রোকার্বনের ন্যায় একই রকমের; কেবল ফ্লোরিন হাইড্রোজেনের স্থান অধিকার করেছে। কাজেই হাইড্রোকার্বনের সঙ্গে ফ্লোরো-কার্বনের খানিকটা বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বিক্রিয়া, স্থায়িত্ব এবং অন্যান্য প্রধান রাসায়নিক গুণাবলীতে উভয় শ্রেণীর পদার্থের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

হাইড্রোজেন ও ফ্লোরিনের গুণাবলীর পার্থক্যই উপরিউক্ত দুই শ্রেণীর যৌগিক পদার্থের গুণাবলীর পার্থক্যের জন্যে প্রধানতঃ দায়ী। যাবতীয় মৌলিক পদার্থকেই সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) কতকগুলি সহজেই অক্সিজেন কিংবা অ্যাসিডের সঙ্গে ক্রিয়া করে ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে এবং (২) কতকগুলি সহজেই হাই-ড্রোজেনের সঙ্গে ক্রিয়া করে। হাইড্রোজেন ও কার্বনের স্থান প্রথম শ্রেণীতে। এরা অক্সিজেনের সঙ্গে সহজেই প্রজ্জ্বলিত হয় এবং যথাক্রমে জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। এই শ্রেণীর মৌলিক পদার্থ হলো ধনাত্মক। অপর পক্ষে, ফ্লোরিনের স্থান দ্বিতীয় শ্রেণীতে। এটি হলো ঋণাত্মক—হাইড্রোজেনের সঙ্গে খুবই বিক্রিয়াশীল। অক্সিজেন এবং ফ্লোরিনও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। ফ্লোরিন হলো সর্বাধিক ঋণাত্মক এবং অতিশয় বিক্রিয়াশীল। এটি কাঠ, কাগজ, কাপড় ও ঐরূপ অন্যান্য বস্তু এবং অধিকাংশ ধাতুতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। জল, কাচ, চীনামাটির বাসন এবং অধিকাংশ প্রস্তরের সঙ্গে ফ্লোরিনের বিক্রিয়া হয়। স্পষ্টতঃ কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন অথবা ফ্লোরিনের সমন্বয়ে যে দুই শ্রেণীর পদার্থের উদ্ভব হয়, তাদের মধ্যে অবশ্যই যথেষ্ট পার্থক্য থাকবে। স্বভাবতঃই দুটি ধনাত্মক পদার্থ, হাইড্রোজেন ও কার্বনের সমন্বয়ে উৎপন্ন হয় দাহ্য পদার্থ। অপর পক্ষে, অতিশয় ঋণাত্মক ফ্লোরিনের সঙ্গে ধনাত্মক কার্বনের সমন্বয়ে গঠিত হয় যথেষ্ট স্থায়ী পদার্থ, যাদের বিশ্লিষ্ট করা দুঃসাধ্য। কাজেই কার্বন ও ফ্লোরিনের সমন্বয়ে উৎপন্ন ফ্লোরোকার্বনের অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে সহজে বিক্রিয়া হয় না।

ফ্লোরোকার্বনের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পূর্বে অনুরূপ গঠন সমন্বিত হাইড্রোকার্বনের কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। দৃশ্যমান অধিকাংশ বস্তুই হাইড্রোকার্বনে গঠিত;

যেমন—গ্যাসোলিন, কয়লা, লুব্রিকেটিং তেল, রবার প্রভৃতি। অধিকন্তু অক্সিজেন, গন্ধক, নাইট্রোজেন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে হাইড্রোকার্বন থেকে ছোট-বড় অণু সমন্বিত অনেক জৈব পদার্থের উদ্ভব হয়; যেমন—অ্যালকোহল, ঈথার, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, কাঠ, কাগজ, পশম, রেশম, তুলা, নাইলন, রঞ্জক দ্রব্য, যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য, অধিকাংশ ভেষজ প্রভৃতি। এ-থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, হাইড্রোকার্বন এবং তাথেকে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ দুটি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়—(১) জ্বালানীতে (খাদ্য সমেত), এবং (২) গৃহাদি নির্মাণের মালমসলায়। পদার্থগুলির দাহ্যতার জন্যেই সেগুলিকে প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা যায়। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়, কার্বন পরমাণুর গঠনের জন্যে। কিন্তু দাহ্যতা (অগ্নিতে দ্রুত প্রজ্জ্বলনের হিসাবেই হোক, অথবা ধীরে ধীরে ক্ষয় ও পচনের হিসাবেই হোক) গৃহাদি নির্মাণের দ্রব্যসামগ্রীর পক্ষে বাঞ্ছনীয় গুণ নয়। এরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই হবে ফ্লোরোকার্বনের মহৎ উপকারিতা। ফ্লোরোকার্বন হবে গৃহাদি নির্মাণের আদর্শ উপকরণ। কারণ, এসব পদার্থে কার্বনের গঠনের বিশেষত্বের সঙ্গে আছে চরম রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তার সুবিধা।

ফ্লোরোকার্বন জ্বলে না, মরিচা ধরে না, ছাতা পড়ে না বা ক্ষয় পায় না। কীট-পতঙ্গ কিংবা ছত্রাক প্রভৃতি এসব দ্রব্য থেকে কোন পুষ্টিকর খাদ্য আহরণ করতে পারে না। ফ্লোরোকার্বন দিয়ে এরূপ রঞ্জক পদার্থ, লুব্রিক্যাণ্ট, প্লাষ্টিক, রবার, কাপড় বোনবার সুতা, তেল এবং দ্রাবক তৈরী করা যায়, যেগুলি আগুনে দগ্ধ হবে না বা জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হবে না। ফ্লোরোকার্বনে তৈরী গৃহের আসবাবপত্র, পর্দা এবং অন্যান্য সাজসজ্জা আগুনে দগ্ধ হবার আশঙ্কা নেই।

ফ্লোরোকার্বন থেকে উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহারে মোটর গাড়ীর উন্নতি হতে পারে। ফ্লোরোকার্বন-লুব্রিক্যাণ্ট কখনও পরিবর্তন করবার দরকার হবে না। শীতল করবার ব্যবস্থায় তরল ফ্লোরোকার্বন ব্যবহার করলে রেডিয়েটরে মরিচা ধরবে না। গাড়ীর জীবনকাল পর্যন্ত টায়ার টিকে থাকবে; কারণ এরূপ দ্রব্য অক্সিজেনের দ্বারা আক্রান্ত হলেও ক্ষয় পাবে না। বসবার আসন অদাহ্য বস্ত্রদ্বারা ঢাকা থাকবে। এরূপ বস্ত্র ফ্লোরোকার্বন সমন্বিত উজ্জ্বল ও স্থায়ী রঞ্জক দ্রব্যের দ্বারা রং করা হবে। গাড়ীর গদী প্রভৃতি সরঞ্জাম অদাহ্য ফ্লোরোকার্বনে তৈরী হবে। তা সত্ত্বেও গাড়ীতে যদি কোন প্রকারে আগুন লাগে, তাহলে রেডিয়েটরের তরল ফ্লোরোকার্বন দিয়ে অগ্নি নির্বাপিত করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ব্যবহৃত ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌সন ইঞ্জিনের পরিবর্তে গাড়ীতে উচ্চ তাপে স্থায়ী ফ্লোরোকার্বনের বাষ্প-চালিত উচ্চ তাপমাত্রার টার্বাইন ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণ প্রয়োজনে সেগুলি উৎকৃষ্টতর লুব্রিক্যাণ্টের কাজ করবে। তাছাড়া যেখানে সাধারণ তেল ও চর্বি মোটেই ব্যবহার করা যায় না, সেখানেও সেগুলি কার্যকরী হবে। কারণ ফ্লোরোকার্বন অক্সিজেনের কার্যকারিতা প্রতিরোধ করতে পারে। কাজেই বিশুদ্ধ অক্সিজেন, হাইড্রোজেন পেরক্সাইড, নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতির বর্তমানে এই জাতীয় লুব্রিক্যাণ্টের গুণ সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকবে।

ফ্লোরোকার্বন হলো উৎকৃষ্ট অন্তরক। সেগুলি বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রতিরোধ করে এবং উচ্চ ভোল্টের বিদ্যুৎ-প্রবাহে বিশ্লিষ্ট হয় না। দোলায়মান বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র থেকে সেগুলি কম শক্তিই শোষণ করে। এজন্যে টেলিভিশনের তারের কঠিন অন্তরক হিসাবে, মোটর ও জেনারেটরের তারে ট্র্যান্স-ফর্মার ও কন্‌ডেন্সারের তরল অন্তরক হিসাবে এবং উচ্চ ভোল্টের টিউবের বায়বীয় পদার্থ হিসাবে এদের ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নিজেদের অণু কিংবা অন্য কোন পদার্থের অণুর প্রতি ফ্লোরোকার্বনের কোন আকর্ষণ নেই।

কঠিন ফ্লোরোকার্বনের গায়ে কোন পদার্থ লেগে থাকে না। ফ্লোরোকার্বন-প্লাষ্টিককে জোড়া লাগাতে পারে, এরূপ আঠা পাওয়া খুবই মুস্কিল; এমন কি, ভিজা ময়দার তালও এরূপ প্লাষ্টিকের গায়ে লাগে না। কাজেই কাপড় কিংবা কাগজে এই জাতীয় প্লাষ্টিকের প্রলেপ দিলে তারা তেল কিংবা জলে ভিজবে না; সহজেই তাদের পরিষ্কার করা যাবে।

পরিষ্কারক দ্রব্য হিসাবে সাবান এবং সংশ্লেষিত হাইড্রোকার্বনের চেয়ে ফ্লোরোকার্বন হবে অধিকতর ক্ষমতাশালী। অধিকন্তু যেখানে উগ্র রাসায়নিক পদার্থ অন্যান্য পরিষ্কারক দ্রব্যের গুণ নষ্ট করে দেয়, সেখানেও রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তার জন্যে ফ্লোরোকার্বন সহজেই ব্যবহার করা চলবে।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে সব ফ্লোরোকার্বনের প্রচলন হয়েছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই হলো পলিমার বা সগোত্রীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু সহযোগে গঠিত বৃহত্তর অণু সমন্বিত পদার্থ। কিন্তু বৃহৎ অণু সগোত্রীয় ক্ষুদ্র অণুর ন্যায় তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে না। এরূপ অবস্থায় পুনরায় ক্ষুদ্র অণুতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বৃহৎ অণু যাতে ক্ষুদ্র অণুতে বিযুক্ত হয়ে না যায়, সেরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারলে অধিকতর উন্নত শ্রেণীর ফ্লোরো-কার্বনজাত প্লাষ্টিক, রেজিন, তেল, রবার প্রভৃতি পাওয়া সম্ভব হবে।

ফ্লোরোকার্বন এবং তাথেকে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ হাইড্রোকার্বনের চেয়েও রসায়নের বৃহত্তর শাখা অধিকার করবে। ফ্লোরোকার্বনের রাজ্য জৈব রসায়নের সীমার বাইরে। এদের রাসায়নিক গুণাবলী, সংশ্লেষণ করবার প্রণালী এবং অন্যান্য বিশেষত্ব সম্পূর্ণ আলাদা। ফ্লোরোকার্বন থেকে উৎপন্ন অক্সাইড, নাইট্রাইট, ব্রোমাইড, আয়োডাইড প্রভৃতির গুণাবলী অনুরূপ জৈব পদার্থের গুণাবলীর চেয়ে একেবারে ভিন্ন রকমের; যেমন—হাইড্রো-কার্বন পেরক্সাইড অত্যন্ত বিস্ফোরক পদার্থ, অপর পক্ষে, ফ্লোরোকার্বন পেরক্সাইড মোটেই এরূপ নয়। তাহলেও ফ্লোরোকার্বনের অণুর গঠনও জৈব পদার্থের অণুর গঠনে এরূপ সাদৃশ্য বিদ্যমান যে, তাদের নামকরণে জৈব রসায়নের প্রচলিত পরি-ভাষাই ব্যবহার করা চলে। তবে ফ্লোরো-কার্বনকে জৈব পদার্থ থেকে পৃথক করবার জন্যে জৈব নাম শেষ হওয়ার পূর্বে কেবল "ফর" শব্দটি সন্নিবিষ্ট করা হয়; যেমন—হাইড্রোকার্বন মিথেন (CH_4)-এর ফ্লোরোকার্বন দোসর হলো মিথ্‌ফরেন (CF_4); তেমনি—ইথ্‌ফরেন (C_2F_6), অক্ট্‌-ফরেন (C_8F_{18}), মিথফরাইল অক্সাইড $(CF_3)_2O$, মিথ্‌ফরাইল পেরক্সাইড $(CF_3)_2O_2$, ফ্লোরক্সি মিথ্‌ফরেন (CF_3OF), বিউটাইরফরিক অ্যাসিড (C_3F_7 CO_2H)।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফ্লোরো-কার্বনের সঙ্গে অনুরূপ হাইড্রোকার্বনের কয়েকটি ভৌত গুণাবলীতে সাদৃশ্য থাকলেও অন্যান্য স্থলে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। দুই শ্রেণীর অনুরূপ দুটি পদার্থ, হাইড্রোকার্বন পেণ্টেন (C_5H_{12}) এবং ফ্লোরোকার্বন পেণ্টফরেন (C_5F_{12})-এর ভৌত গুণাবলীর তুলনামূলক বিচার করা হচ্ছে। উভয়ের অণুতে একই সংখ্যক পরমাণু এবং একই প্রকার কার্বনের কাঠামো রয়েছে। উভয় পদার্থই স্বচ্ছ ও তরল এবং এদের স্ফুটনাঙ্ক প্রায় একই। শূন্য ডিগ্রী ফারেনহাইটের প্রায় ২০০ ডিগ্রী নীচে উভয়েই জমাট বাঁধে। তাদের সান্দ্রতাও প্রায় সমান। তাদের সমান সংখ্যক অণুকে তরল থেকে বায়বীয় অবস্থায় পরিবর্তিত করতে হলে প্রায় একই পরিমাণ উত্তাপের দরকার হয়। উভয়েই জলে অদ্রাব্য এবং বিদ্যুৎ-অপরিবাহী।

এসব সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও একটি পদার্থকে অন্যটি থেকে সহজেই পৃথক করা যায়। যদি একরকম দুটি শিশির একটিতে খানিকটা পেণ্ট-ফরেন এবং অন্যটিতে একই পরিমাণ পেণ্টেন থাকে, তাহলে দুটির পার্থক্য বুঝতে কোন অসুবিধা হয়

না। পেণ্টেনের চেয়ে পেণ্টফরেনের শিশি ওজনে ভারী হবে; কারণ, পেণ্টফরেনের অণু পেণ্টেনের অণুর চেয়ে প্রায় চার গুণ ভারী। পেণ্টেন যে সব স্থানে শিশির কাচ স্পর্শ করে, সে সব স্থানে কাচের গা বেয়ে খানিকটা উপরে উঠে যায়। পেণ্টেনের অণুর কাচের অণুর প্রতি আকর্ষণের জন্যেই এরূপ সম্ভব হয়। এজন্যে শিশির মধ্যস্থিত পেণ্টেনের উপরিভাগ হয় খানিকটা বাঁকা। কিন্তু অন্য অণুর প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকবার ফলে অপর শিশিতে পেণ্টফরেনের উপরিভাগ থাকে একেবারে সমতল। শিশি দুটির মুখ খুললে পেণ্টফরেনের কোন গন্ধ পাওয়া যায় না; কিন্তু পেণ্টেনের বিশেষ গন্ধ থাকে। পেণ্টেন সহজেই প্রজ্জ্বলিত হয়; কিন্তু পেণ্টফরেন প্রজ্জ্বলিত হয় না, বরং এটি দিয়ে অগ্নি নির্বাপিত করা যায়।

জৈব রসায়নের ক্ষেত্রে যত রকম পদার্থ সংশ্লেষণ করা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশী করা সম্ভব হয় ফ্লোরোকার্বনের সাহায্যে, তাদের অত্যধিক স্থায়িত্বের জন্যে। ইতিমধ্যে অনেক পদার্থ তৈরী হয়েছে। ফ্লোরোকার্বন কার্বক্সাইলিক অ্যাসিডসমূহ সংশ্লেষণ করা হয়েছে। এগুলি অত্যন্ত বিক্রিয়াশীল উগ্র অ্যাসিড। এগুলি থেকে ব্রোমাইড, আয়োডাইড, অ্যালডিহাইড, ওলিফিন প্রভৃতি সংশ্লেষণ করা যায়। এরাই হবে আরও অনেক রকম পদার্থের মূল উপাদান। অধিকন্তু আংশিক ফ্লোরোকার্বন ও আংশিক জৈব অণু সমন্বিত পদার্থ তৈরী করা যায়। কাজেই ভবিষ্যতে আরও অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়া সম্ভব হবে।

রসায়নের ক্ষেত্রে ফ্লোরোকার্বনের ন্যায় এরূপ মূল্যবান পদার্থের এত বিলম্বে আবিষ্কার খুবই আশ্চর্যজনক। রসায়নের অন্যান্য শাখায় যে শিল্প-বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তার চেয়েও বিশেষ জ্ঞান দরকার হয় ফ্লোরোকার্বন সংশ্লেষণের ব্যাপারে। সম্প্রতি এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। পূর্বে গবেষকেরা বায়বীয় ফ্লোরিনের সঙ্গে কার্বন মিলিয়ে কার্বন-ফ্লোরিন সমন্বিত পদার্থ তৈরীর চেষ্টা করেছেন, ঠিক যে ভাবে কার্বন ও অক্সিজেন সহযোগে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায় বড় জোর মিথ্‌ফরেন পাওয়া যেত; কিন্তু গবেষণা সাধারণতঃ বিস্ফোরণে পর্যবসিত হতো। প্রায় কুড়ি বছর পূর্বে পেনসিলভেনিয়া রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ফ্লোরিন লেবরেটরির গবেষকেরা দেখলেন যে, উপযুক্ত অনুঘটকের সাহায্যে বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এভাবে তাঁরা কতকগুলি অভিনব দ্রব্য উৎপাদন করেন। স্বভাবতঃই এদের নামকরণ করা হয় ফ্লোরোকার্বন।

আবিষ্কারটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে পরমাণু বোমার কল্পনা নিয়ে কাজ করবার সময় রসায়নবিদেরা এরূপ একটি দ্রব্যের আবশ্যকতা অনুভব করছিলেন, যা ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইডের সঙ্গে মিশ্রিত হবে, কিন্তু তাতে কোন বিক্রিয়া হবে না। দ্রব্যটিকে যথেষ্ট স্থায়ী হতে হবে এবং তার স্ফুটনাঙ্ক ও আণবিক ভর ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইডের কাছাকাছি হওয়া চাই। একমাত্র ফ্লোরোকার্বনই এসব সর্ত পূরণ করতে পারে। ফ্লোরিন লেবরেটরিতে উপযুক্ত স্ফুটনাঙ্কবিশিষ্ট দুই ঘনসেন্টিমিটার পরিমিত ফ্লোরোকার্বন তৈরী করা হয়। এই দ্রব্যটির অধিকাংশই ছিল হেপ্টফরেন। ১৯৪১ সালে নমুনাটি পরীক্ষার জন্যে সরবরাহ করা হয়। পরমাণু বোমার জন্যে নিযুক্ত কর্মীরা দেখলেন, দ্রব্যটি বিক্রিয়াশীল ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইডের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। কাজেই এই নবজাত ফ্লোরোকার্বনকে সামরিক দ্রব্য হিসাবে গণ্য করা হলো। সামরিক নিরাপত্তার জন্যে এর নাম হলো জোস্ স্টাফ।

প্রাথমিক কৃতকার্যতার পর লুব্রিক্যাণ্ট, রবার, গ্যাসকেটের উপকরণ, ভালভের প্যাকিং প্রভৃতির জন্যে বিভিন্ন ভৌতগুণসম্পন্ন নানাপ্রকার ফ্লোরো-

কার্বনের চাহিদা এলো—বিশেষতঃ ওকরিজের ব্যাপন-কারখানার জন্যে, যেখানে ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড নানা প্রতিবন্ধ ও পাইপের ভিতর দিয়ে চালানো হচ্ছিল ইউরেনিয়াম-২৩৫-কে পৃথক করবার জন্যে। সারা দেশের রসায়নবিদেরা এই দুরূহ গবেষণায় নিযুক্ত হয়ে অতঃপর যে সফলকাম হয়েছিলেন, ওকরিজের ব্যাপন-কারখানা থেকেই তার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

এই কাজের জন্যে ফ্লোরোকার্বন বিশ্লেষণের কলাকৌশল সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হলো। কিন্তু যুদ্ধের সময় ফ্লোরোকার্বন তৈরীর প্রক্রিয়াগুলি ছিল বহু ব্যয়সাপেক্ষ; কাজেই সাধারণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার পক্ষে অনুপোযোগী। ফ্লোরোকার্বনের উপকারিতা প্রমাণিত হলো বটে, কিন্তু মহার্ঘতার দরুণ সেগুলিকে সাধারণ কাজে ব্যবহার করবার কোন উৎসাহ পাওয়া গেল না। অনুঘটক প্রক্রিয়ার আর একটা দোষ হলো এই যে, ঈপ্সিত পদার্থের পরিবর্তে কয়েকটি ফ্লোরোকার্বনের মিশ্রণ উৎপন্ন হয়।

যুদ্ধের পর তড়িৎ-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ফ্লোরোকার্বন উৎপন্ন হয় কম তাপমাত্রায়; মৌলিক আকারে ফ্লোরিন ব্যবহার করবার দরকার হয় না। কম দামের মূল উপাদান—হাইড্রোজেন, ফ্লোরাইড ও জৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকে একবারে বাঞ্ছিত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। একটি লোহার পাত্রে নিকেলের পাতের তড়িৎ-দ্বার খাড়াভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, স্টোরেজ ব্যাটারীর মত। হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড ও জৈব পদার্থের মিশ্রণের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ পরিচালনা করলে ফ্লোরাইডের ফ্লোরিন জৈব পদার্থের হাইড্রোজেনের স্থান অধিকার করে এবং ফ্লোরোকার্বন উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড ও জৈব পদার্থ থেকে হাইড্রোজেন নির্গত হয়ে যায়। তড়িৎ-দ্বার বহুকাল স্থায়ী হয়। এক ঘনফুট তড়িৎ-দ্বার দৈনিক ২৫ থেকে ৩০ পাউণ্ড পর্যন্ত ফ্লোরোকার্বন উৎপাদন করতে পারে। অন্যান্য প্রক্রিয়ার তুলনায় এই প্রক্রিয়ায় উৎপাদন-ব্যয় অনেক কম।

কার্বনের ন্যায় ফ্লোরিনও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ফ্লোরিনঘটিত খনিজ পদার্থ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। অবশ্য ফ্লোরিনের প্রধান খনিজ পদার্থ হলো ফ্লোরস্পার বা ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড।
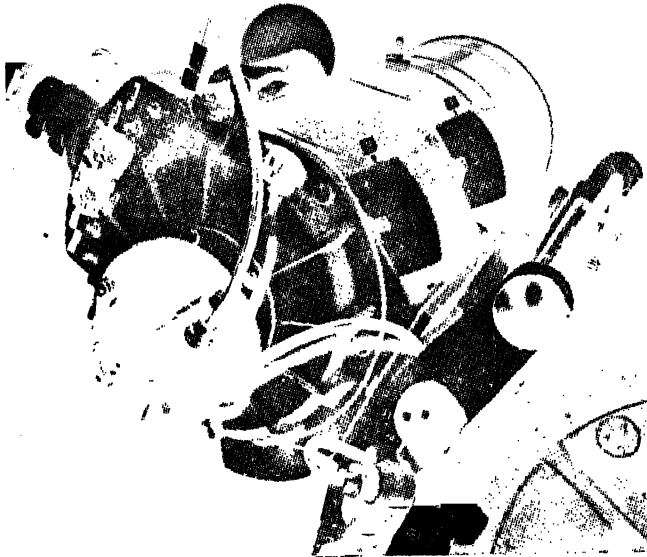
রাশিয়ায় নির্মিত অভিনব টেলিস্কোপিক ক্যামেরার ভিতরের যন্ত্রপাতির দৃশ্য।

ইডিয়ট

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

'ইডিয়ট' কথাটা আমাদের অতি পরিচিত। কাউকে গালাগাল দেবার সময় প্রারম্ভিক কথাই হচ্ছে—ইডিয়ট। যদিও গালাগাল হিসেবেই আমরা কথাটা ব্যবহার করে থাকি, তথাপিও এটা নিছক গালাগাল নয়। এর যে একটা বিশেষ মানে আছে, তাও আমরা তলিয়ে দেখি না। যদি তলিয়ে দেখতাম, তাহলে হয়তো যেখানে-সেখানে কথাটা ব্যবহার করতাম না। ইডিয়ট শব্দের অর্থ হচ্ছে, বোকা বা মূর্খ। মূর্খ মানে এ নয় যে, লেখাপড়া জানে না। মস্তিষ্ক পরিপূর্ণভাবে বিকশিত না হবার ফলে যার বুদ্ধিবৃত্তির মান খুব নীচু, তাকেই এই আখ্যা দেওয়া উচিত। সংজ্ঞাটিকে আরো প্রাঞ্জল করা যাক। জন্ম থেকে অথবা শিশুকাল থেকে যে সব লোকের মানসিক বিকাশ পরিপূর্ণতা লাভ করে নি, তারা অতি সাধারণ বিপদ থেকেও নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। চিকিৎসা-শাস্ত্র বা মনোবিজ্ঞানের মতে, এটিই হচ্ছে ইডিয়ট শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা। মানসিক বিকাশের নিম্নতম সোপান হচ্ছে 'বোকামি'। বোকাদের মানসিক বৃত্তি যে পরিস্ফুট হয় না, সেটা তাদের ছোট বয়স থেকেই টের পাওয়া যায়। বোকাদের দৈহিক খুঁৎ থাকা খুবই স্বাভাবিক; যেমন—তারা সাধারণতঃ নুলো বা হাবা হয়ে থাকে। তাদের কোন কোন অঙ্গের অসাড়তা এবং প্রায়ই ফিটের রোগ হতে দেখা যায়। এরা অনেক দেরীতে হাঁটতে শিখে এবং কথা বলতেও শিখে দেরীতে। দেরীতে হলেও এই দুটি কাজের কোনটিই এরা স্বাভাবিক-ভাবে করতে পারে না এবং ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, জড়ানো-ভাবে কথা বলে। কথা বলবার সময় মুখ দিয়ে লালা বেরিয়ে আসে। এরা নিজেরা কোন কাজ করতে পারে না। যদি নিজের হাতে খায় তাহলে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে এবং গোগ্রাসে খাবার গিলতে থাকে। এরা নিজে থেকে হাত-পা জল দিয়ে ধোয় না, কাপড় পড়তে পারে না। কাপড়ে মলমূত্র ত্যাগ করে' বিশ্রী কাণ্ড করে বসে। এদের কথাবার্তা, হাব-ভাব সুস্থলোকের বিরক্তি উৎপাদন করে। বেশীর ভাগ বোকাদের প্রজনন ক্ষমতা থাকে না; তাছাড়া তারা সহজেই যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে—অর্থাৎ যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধ করবার সামান্যতম ক্ষমতাও তাদের নেই।

বোকা কথাটির সঙ্গে আরো দুটি কথা এসে পড়ে। তার একটি হচ্ছে অপদার্থ, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Imbecile এবং অপরটি হচ্ছে দুর্বলচিত্ত বা Feeble-minded। এই দুটি শব্দ ইডিয়ট কথাটির শুধু সমগোত্রীয় নয়, কার্যতঃও তাই। সে জন্যে এই দুটি মানসিক অবস্থার সম্বন্ধে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

অপদার্থতা বোকামির কাছাকাছি অবস্থা। এদেরও মানসিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না, তবে বোকাদের চেয়ে এদের মনের অবস্থা কিছু উন্নত পর্যায়ের। তাহলেও এরা সম্পূর্ণরূপে কোন কাজ করতে পারে না। তবে বোকাদের সঙ্গে এদের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এরা সাধারণ বিপদ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে; যেমন—আগুন লাগলে সেখান থেকে পালিয়ে আসা উচিত, নচেৎ বিপদ ঘটতে পারে—এ বোধটি তাদের আছে; কিন্তু বোকাদের নেই।

তাহলেও এরা চাকুরী করে নিজেদের জীবিকা অর্জন করতে সম্পূর্ণ অপারগ। তবে খুব সহজ

ধরণের কাজ যে এরা করতে পারে না, তা নয়। এরা নিজেদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে, সামান্য অক্ষরজ্ঞানও হয়; কিন্তু যুক্ত-অক্ষর হলেই এরা হাবুডুবু খায়। এদেরও দৈহিক অপটুতা থাকে। এদের যে ব্যক্তিত্ব-বোধের উদ্ভব হয় তার পরিচয় পাওয়া গেছে। অনেকে বেশ নিরীহ এবং দয়ালু গোছের লোক হয়, অনেকে আবার খুব রুক্ষ এবং প্রবঞ্চক হয়ে থাকে। চরিত্রের এই বিশেষত্বগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—সুস্থ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকলে এদের শতকরা ৯২ ভাগ ভদ্রভাবে জীবন যাপন করে।

দুর্বলচিত্ত লোকেরা যদিও বোকা বা অপদার্থের স্তর থেকে অনেক উন্নত, তথাপি তাদের নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সর্বদা সতর্ক প্রহরার প্রয়োজন। আমেরিকায় এদের বলা হয় "Moron"। এদের দৈহিক পঙ্গুত্ব থাকে না বললেই চলে এবং এদের বিদ্যাবুদ্ধির মানও মানসিক সুস্থতা প্রযুক্ত কোন অশিক্ষিত বালকের তুলনায় নীচু নয়। তবে কোন কাজ এরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারে না। কোন নির্দিষ্ট স্থানে বা কাজে এরা নিজেদের নিয়মিতভাবে ব্যাপৃত রাখতে পারে না। কিছুদিন বাদে বাদেই এরা কর্ম বা কর্মস্থল পরিবর্তনের চেষ্টা করে। এদের বিচার-শক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানের মাত্রা নিম্নস্তরের। এদের মধ্যে তীব্র অপরাধ-প্রবণতা লক্ষিত হয়। দেখা গেছে, যৌনাপরাধ এবং খুন-জখম ইত্যাদি এরা অনায়াসে করতে পারে।

এদের মানসিক বয়সের পরিমাণ নির্ণয় করবার জন্যে নানারকমের পরীক্ষা আছে। তাদের মধ্যে ষ্ট্যানফোর্ড-বিনেটের পরীক্ষা-পদ্ধতি সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়। তারপর একপ্রকার গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে পরীক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তির পরিমাপ নির্ণয় করা হয়। সমীকরণটি এস্থলে দেওয়া গেল।

$$\text{বুদ্ধিবৃত্তির পরিমাপ} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} \times \frac{১০০}{১}$$

এবার সরলীকরণের দ্বারা ফল যদি কুড়ির কম হয়, তাহলে ধরা হয় যে, লোকটি বোকা। ২০ থেকে ৫০ এর মধ্যে হলে অপদার্থ এবং ৫০ থেকে ৭০-এর মধ্যে হলে দুর্বলচিত্ত। মানুষ কেন বোকা হয়—তার অনেক কারণ আছে বৈকি! প্রথমতঃ বলা যেতে পারে যে, বোকামি বংশানুক্রমিক রোগ। দ্বিতীয়তঃ, কোন অসুস্থতার ফলস্বরূপ বোকামি এসে থাকে।

শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন কোন কারণে মস্তকে আঘাত লাগলে শিশুর মস্তিষ্কের কোমল স্নায়ুতন্তুগুলি আঘাতের ফলে বিকল হবার সম্ভাবনা। আঘাত গুরুতর হলে শিশুটি 'বোকা' হতে পারে।

তাছাড়া মেনিঙ্গো-এনসেফালাইটিস, হাইড্রো-সেফালাস, সেরিব্র্যাল সিফিলিস প্রভৃতি রোগে মানসিক পঙ্গুত্ব আসে। কোন বিষাক্ত দ্রব্য মস্তিষ্কে প্রবেশ করালে অথবা কোন হর্মোনের ক্ষরণ অপ্রচুর হলে মানসিক বিকলতা দেখা দেয়। যারা কালা বা নুলো, তাদের মনের মধ্যে বিশেষ ইন্দ্রিয়হানির জন্যে আত্মধিক্কৃতির ভাব থাকে। এই মানসিক বিকৃতি থেকে ক্রমশঃ তারা বোকাতে পরিণত হয়।

থাইরয়েড গ্রন্থির কর্মহীনতার জন্যে 'ক্রেটিনিজম' নামে একরকম রোগ দেখা দেয়। এই রোগে আক্রান্ত রোগীর কল্পনা-শক্তি ও প্রজনন-শক্তি একেবারে হ্রাস পায়; এমন কি, এরা কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। এই রোগে রোগীর চোখে-মুখে ফুটে ওঠে বোকা-হাবার স্পষ্ট চিহ্ন। এদের দেহ পুরিপুষ্ট হয় না এবং সাধারণতঃ বেঁটে হয়। মাথা বড় থাকে, ঠোঁট পুরু এবং নীচের দিকে ঝুলে পড়ে। জিভ্ মুখের ভিতর থেকে বাইরে ঝুলে থাকে। গায়ের চামড়া শুষ্ক, বিরল কেশ, আধবোজা চোখ এবং চোখের পাতা ফোলা থাকে। এরা সাধারণতঃ নিবিরোধ প্রকৃতির হয়। তাই এদের চিকিৎসা

করতে বা এদের নিয়ে বাস করতে বেশী বেগ পেতে হয় না।

অনেক স্কুলে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির পরিমাপ নিয়ে তাদের মানসিক বিকাশের উপর কটাক্ষপাত করা হয়ে থাকে। ষ্ট্যানফোর্ড-বিনেটের পরীক্ষা-পদ্ধতি যে সব সময় নির্ভুল হবে, এমন কোন কথা নেই। অনেক শিশুকে দেখা গেছে, যারা বাল্যকালে স্বল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন বলে চিহ্নিত হয়েছিল, তারা বড় হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে এবং যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ পদে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছে। কারুর বুদ্ধির পরিমাপ নিয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে পরীক্ষককে সেই বিশেষ লোকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা জানতে হবে। অসুস্থ পরিবেশে মানসিক বিকাশ ঘটতে বাধা পায়। তাই অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, পারিপার্শ্বিক এবং সাংসারিক অবস্থার উন্নতি হলে বহু বোকা লোকও চালাক হয়ে উঠেছে।

সর্বশেষে আর এক ধরণের বোকামির কথা বলে আলোচনা শেষ করবো। এই শ্রেণীর বোকামিকে বলা হয় Amaurotic Family Idiocy। এই রোগ একই পরিবারে এক সঙ্গে বহু লোকের হতে পারে। এদের বুদ্ধি অতি নিম্ন স্তরের। এদের হাত-পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় এবং চোখের স্নায়ু ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে গিয়ে অন্ধত্ব আনে। দেহে ক্রমশঃই দুর্বলতা আসে। কোন কাজকর্ম করবার ইচ্ছা থাকে না। রোগাক্রমণের বছর দুয়েকের মধ্যেই রোগী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

বোকামি অথবা ঐ ধরণের কোন রোগাক্রান্ত মানুষ সমাজের অভিশাপ। এদের সুস্থ করে তোলবার জন্যে ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য সভ্যদেশে নানা রকমের কলোনী তৈরী করে উপযুক্ত চিকিৎসকের অধীনে রাখবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশেও এই রকমের চেষ্টার প্রয়োজন।
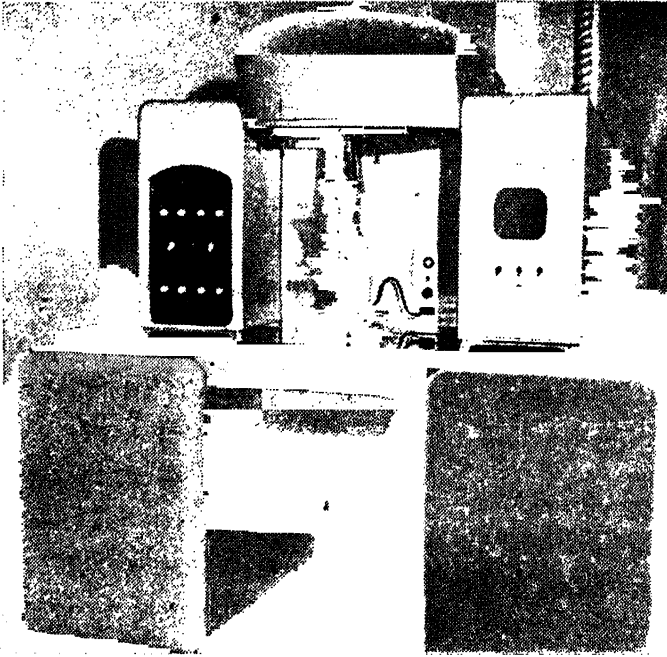
সোভিয়েট রাশিয়ায় নির্মিত নতুন ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এই যন্ত্র টেলিভিসন যন্ত্রের সহকারী। ইহার বীক্ষণ কাচের পরিবর্ধন শক্তির মান ৭০ হইতে ২৭০০ গুণ পর্যন্ত। এই অণুবীক্ষণের চোখ লাগাইয়া টেলিভিসনের পর্দায় দৃষ্টিপাত করিলে পর্দার ছবি ২১০ গুণ হইতে ৮১০০ গুণ পর্যন্ত বড় দেখাইবে।

অ্যালফ্রেড নোবেল ও নোবেল-পুরস্কার

শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাহাড়ের রুক্ষ স্তর ভেদ করে নেমে আসে সুশীতল জলধারা। সেই জল সেই স্থানেরই শুধু তৃষ্ণা দূর করে না, তার প্রবাহ সমগ্র দেশকে সরস ও সমৃদ্ধ করে তোলে। অ্যালফ্রেড নোবেল ছিলেন সুইডেনের একজন কঠোর বাস্তববাদী ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞান-সাধক। তাঁর কাজ-কারবার ছিল মারাত্মক বিস্ফোরক ও আগুনে জিনিষ নিয়ে; কিন্তু তাঁর কীর্তি চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো বিজ্ঞান, সাহিত্য ও বিশ্ব-শান্তির প্রতি গভীর মর্যাদাবোধের ভিতর দিয়ে। বাকুর বিপুল তৈল-সম্পদ এবং বিস্ফোরকের কারখানা থেকে অপরিমিত অর্থ তিনি উপার্জন করেছেন; কিন্তু সে ঐশ্বর্য তিনি উৎসর্গ করে গেছেন বিশ্বের লোক-কল্যাণের জন্যে।

অ্যালফ্রেড নোবেলের জন্ম হয় ষ্টকহোলমে ১৮৩৩ সালের ২১শে অক্টোবর। তিনি ছিলেন ইম্যানুয়েল নোবেলের চারটি সন্তানের মধ্যে তৃতীয়। শিশু-কালে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। যখন তাঁর বয়স নয় বছর, তখন তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে রাশিয়ায় নিয়ে যান। সেন্টপিটারস্‌বার্গে (এখন লেনিনগ্রাড) তাঁর পিতার রাইফেল, টর্পেডো, মাইন প্রভৃতি যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরীর কারখানা ছিল। সেখানে অ্যালফ্রেড শিক্ষানবিশী আরম্ভ করেন। সেই সময় থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা যায় এবং তিনি বলিষ্ঠ ও কর্মঠ হয়ে ওঠেন। ১৬ থেকে ২১ বছর তাঁর শিক্ষাকাল; কিন্তু উচ্চ-বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষালাভ হয় নি। এই সময়ে জার্মেনী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নানাস্থানে তিনি ভ্রমণ করেন এবং নিজের চেষ্টায় রসায়ন ও ইঞ্জিনিয়ারিং-বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। পরে ১৮৫৯ সালে পিতামাতার সঙ্গে ষ্টকহোলমে ফিরে এসে বিস্ফোরক পদার্থ তৈরীর গবেষণায় মন দেন।

তখনকার দিনে পার্বত্য অঞ্চলে রাস্তা ও রেলপথ নির্মাণ করতে হলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে পাথর কেটে তা তৈরী করতে হতো। এরূপ প্রচেষ্টা ছিল যেমন দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ, তেমনি বহু আয়াসসাধ্য ও ক্লান্তিকর। পাহাড় উড়িয়ে দেবার জন্যে তখন জানা ছিল একমাত্র বারুদ ফাটানো। কিন্তু বারুদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, সর্বক্ষেত্রে তা কাজে লাগানো যেত না। আর একটি বিস্ফোরকের ব্যবহারও তখন জানা ছিল। সেটি হলো নাইট্রো-গ্লিসারিন। কিন্তু তা ব্যবহার করা নিরাপদ ছিল না।

এসব অসুবিধার কথা বিবেচনা করে নোবেল নাইট্রোগ্লিসারিন নিয়ে পরীক্ষা সুরু করেন। কিন্তু প্রাথমিক চেষ্টায় যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল, তার ফল হয়েছিল মর্মান্তিক। একটি ভয়ানক বিস্ফোরণে পাঁচ ব্যক্তি নিহত হয়; তাঁর কনিষ্ঠ ভাই এমিল তাঁদের অন্যতম। সেই সঙ্গে তাঁর লেবরেটরীর একটি অংশ উড়ে যায়। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর সরকারী হুকুমে তাঁর পরীক্ষার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। নোবেল কিন্তু তাতে নিরুৎসাহ হন নি। তাঁর অন্তরের প্রবল প্রেরণা তাঁকে টেনে নিয়ে গেলো, অজানা রাজ্যের দুঃসাহসিকতার পথে। তিনি একটি নৌকা ভাড়া করেন এবং তার ভিতরে লেবরেটরী সাজিয়ে আবার পরীক্ষার কাজ সুরু করে দিলেন। সহর থেকে দুই মাইল দূরে ম্যালার হ্রদের মধ্যস্থলে তাঁর নৌকা নোঙর করা হলো। অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে চালিত

জীবন-মরণ সাধনা কখনও ব্যর্থ হয় না। তাঁর কঠোর তপস্যায় বিজ্ঞান-লক্ষ্মী প্রসন্ন হয়ে অবশেষে ধরা দিলেন। নোবেল ১৮৬২ সালে নাইট্রো-গ্লিসারিনের সঙ্গে কিসেল্‌গার সংমিশ্রণে তৈরী করলেন ডিনামাইট নামক এক ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থ। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ইতিহাসে যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্যে এই বছরটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ডিনামাইট আবিষ্কারের ফলে মানব-সভ্যতার অগ্রগতির পথে নতুন দিগন্ত খুলে গেল, শ্রমিক নিযুক্ত ছিল এবং এই ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থোপার্জন করেছিলেন।

অ্যালফ্রেড নোবেলকে বলা হতো 'ডিনামাইট রাজ'। কিন্তু তাঁর রাণী ছিল না, অর্থাৎ তিনি ছিলেন অকৃতদার। সারা জীবনে কাজই ছিল তাঁর একমাত্র অবলম্বন। তথাপি লেবরেটরীতে যখন তিনি বিশ্রাম নিতেন তখন কাব্য রচনার খেয়াল তাঁকে পেয়ে বসতো। তাঁর আদর্শ কবি ছিলেন শেলী। তাঁরই অনুকরণে কবিতা লিখে

অ্যালফ্রেড নোবেল

জন্ম—১৮৩৩ সাল, ২১শে অক্টোবর মৃত্যু—১৮৯৬ সাল, ১০ই ডিসেম্বর।

রাস্তাঘাট নির্মাণের কলাকৌশলে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হলো। বর্তমান পারমাণবিক যুগে যে সব বিস্ময়কর বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী হচ্ছে, নোবেলের এই আবিষ্কারকে তাদের অগ্রদূত বলা যায়।

১৮৮৫ সালে তিনি ব্যালিষ্টাইট নামে আর একটি উন্নততর বিস্ফোরক উদ্ভাবন করেন। ধূম-বিহীন বিস্ফোরক পদার্থের মধ্যে এইটি হলো সর্বপ্রথম। জীবনের শেষ দশ বছরে নোবেলের বিস্ফোরক পদার্থ তৈরীর কারখানায় প্রায় ১২০০০ তিনি অন্তরে তৃপ্তিলাভ করতেন। বিজ্ঞান-লক্ষ্মী ও কাব্য-লক্ষ্মী উভয়েরই স্থান তাঁর হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৮৯৬ সালে ১০ই ডিসেম্বর ইটালীর অন্তঃপাতী সানরেমোতে ৬৩ বছর বয়সে তাঁর ইহলীলা সাঙ্গ হয়। মৃত্যুকালে তিনি যে সম্পত্তি রেখে যান তার মূল্য হলো ৩০০ লক্ষ টাকা। এই অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থ দিয়ে তিনি একটি পুরস্কার-ভাণ্ডার স্থাপন করেন, যার সুদ থেকে প্রতি বছর পাঁচটি পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে। চারটি পুরস্কার

দেওয়া হবে সেই চার ব্যক্তিকে, যাঁরা পূর্ববর্তী বছরে পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন, শারীরবৃত্ত কিংবা চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্ষেত্রকে উল্লেখযোগ্য গবেষণার দানে সমৃদ্ধ করেছেন এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁর আদর্শমূলক বিশেষ কোন মৌলিক রচনার দান আছে। পঞ্চম পুরস্কারের তিনি নাম দিয়েছিলেন শান্তি পুরস্কার। এই পুরস্কার তাঁকেই দেওয়া হবে, বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও শান্তি সংস্থা-সমূহের সংগঠন কার্যে যাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক। প্রত্যেকটি পুরস্কারের মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। ১৯০১ সাল থেকে এই সব পুরস্কার দেওয়া আরম্ভ হয়।

পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নের ক্ষেত্রে পুরস্কারের যোগ্যতম ব্যক্তির নির্বাচনের ভার নোবেল অর্পণ করেছিলেন, সুইডেনের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর উপর। সেই অ্যাকাডেমী থেকে নিযুক্ত পাঁচজন অধ্যাপকের এক কমিটির দ্বারা যোগ্যতম ব্যক্তি নির্বাচনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হয়। চিকিৎসা সম্পর্কিত পুরস্কারের জন্যে যোগ্যতম ব্যক্তি নির্বাচিত হন ষ্টকহোলমের ক্যারোলিন ইন্‌ষ্টিটিউটের দ্বারা। আর সাহিত্য ক্ষেত্রের যোগ্যতম ব্যক্তি সম্বন্ধে রায় দেবার ভার অর্পণ করা হয়, সুইডেনের সাহিত্য অ্যাকাডেমী এবং ফ্রান্স ও স্পেনের অ্যাকাডেমীর উপর। আর শান্তি পুরস্কারের জন্যে স্থির করা হয়, নরওয়ে পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত পাঁচজনের এক কমিটির দ্বারা।

যাঁদের উপর এই নির্বাচনের ভার রয়েছে, তাঁরা সবাই যে জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁদের দক্ষতা ও সাধুতার পরিচয় দিতে হবে। সাহিত্যের পুরস্কার সম্বন্ধে বিচার করবার দায়িত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, পৃথিবীতে যত ভাষা আছে, তাথেকে রচিত উৎকৃষ্ট সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে (যদিও অনুবাদ পূর্ণাঙ্গ হয় না) নোবেল পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্যে আসে। সে এমন এক বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ, যা সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

এসব ব্যবস্থা যে খুবই পাকা, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বে অভিযোগ ও প্রতিবাদ আসে যে, পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এমন ব্যক্তিকে যিনি তাঁর বিশেষ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন। নোবেলের কিন্তু এই উদ্দেশ্য ছিল বলে জানা যায় যে, যে সব উদীয়মান অথচ সঙ্গতিহীন ব্যক্তির মধ্যে প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যাবে, তাঁদেরই এই পুরস্কার দিয়ে সাহায্য করা হবে।

১৯০৭ সালে যখন রুড্‌ইয়ার্ড কিপলিংকে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, তখন বৃটিশ মহলে মহা বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। মেরেডিথ্ ও হার্ডি বেঁচে থাকতে স্বল্পখ্যাত কিপলিং হলেন কিনা সর্বপ্রথম ইংরেজ সাহিত্যিক, যাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হলো! সেই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে এ. জি. গার্ডিনার লিখেছিলেন—সাহিত্যের জহুরীরা পড়ে থাকলো, আর সাহিত্যের কামারকে দেওয়া হলো সম্মান!

বাস্তবিক সেক্সপীয়র, দান্তে কিংবা রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভাধরদের আবির্ভাব বছরে বছরে ঘটে না। বহু যুগব্যাপী সাধনার ফলেই তা ঘটে থাকে। তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় না যে, নির্বাচনে যোগ্যতর ব্যক্তি অনেক সময়ে বাদ পড়ে গেছেন। যেমন, মহাত্মা গান্ধী। অহিংসা ও শান্তির মূর্তিমান বিগ্রহ বলা যায় তাঁকে। তিনি বিশ্বে প্রেম ও সৌভ্রাত্রের বাণী প্রচার করবার জন্যে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। তবু তাঁকে এই পুরস্কারের সম্মান দিয়ে আদর্শের মর্যাদা রক্ষা করা হয় নি।

এ-পর্যন্ত যত গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ৬৮ বছর বয়স্ক রুশ সাহিত্যিক বোরিশ প্যাষ্টারনাক ও তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'ডক্টর ঝিভাগো'কে নিয়ে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, সে রকমটি আর

কখনও দেখা যায় নি। তিনিই হলেন দ্বিতীয় রুশ সাহিত্যিক, যাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম রুশ সাহিত্যিক হলেন আইভান বুনিন। ১৯৩৩ সালে ফ্রান্সে নিঃসঙ্গ অবস্থায় অবস্থানকালে তিনি এই পুরস্কার লাভ করেন।

গেল বছরে (১৯৫৯) সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন সাহিত্য-জগতে স্বল্প পরিচিত ৫৮ বছর বয়স্ক সিসিলীয় কবি সাল্‌ভাটোর কোয়াসি মোদো। তিনি হলেন মিলান মিউজিক অ্যাকাডেমীর একজন শিক্ষক। নোবেল কমিটি এই উদীয়মান প্রতিভাকে স্বীকৃতি দান করে' ইটালীয় সাহিত্যকে দ্বিতীয়বার গৌরবান্বিত করলেন। ২৫ বছর আগে ১৯৩৪ সালে আর একজন ইটালীয় লেখক এই পুরস্কার পেয়ে ইতালীয় সাহিত্যকে জগতের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তিনি হলেন লুইজি পিরান দেল্লো।

পূর্বেই বলা হয়েছে, নোবেল পুরস্কার প্রথম চালু হয় ১৯০১ সাল থেকে। সেই বছরে এক্স-রে সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে রণ্টগেনকে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। একমাত্র ম্যাডাম কুরীর ভাগ্যেই দু-বার এই পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য ঘটেছে। প্রথমবারের পদার্থ-বিজ্ঞানে ১৯০৩ সালে তাঁর স্বামী এবং হেন্‌রি ব্যাকারেলের সঙ্গে সম্মিলিত গবেষণার অংশীদাররূপে তিনি এই পুরস্কার লাভ করেন। আবার আট বছর পরে রেডিয়াম সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত গবেষণার জন্যে তাঁকে রসায়নের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

ভারত এ-পর্যন্ত দু-বার নোবেল পুরস্কার লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই হলেন সর্বপ্রথম ভারতীয়, যাঁকে এই পুরস্কারে সম্মানিত করে ভারতকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করা হয়েছে। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্য গ্রন্থের জন্যে রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। নোবেল পুরস্কার লাভ করে দ্বিতীয়বার যিনি ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, তিনি হলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার সি. ভি. রামন। ১৯৩০ সালে পদার্থ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত মৌলিক গবেষণার জন্যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

গুণের বিচারেই নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা বিচার করা হয়ে থাকে। এখানে জাতি, ধর্ম বা বর্ণের কোন বিচার করা হয় না। প্রথম ৫০ বছর জার্মেনী বেশীর ভাগ নোবেল পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছে; তারপরে আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং বৃটেন। সাহিত্যের পুরস্কার এ-পর্যন্ত ফ্রান্সই সবচেয়ে বেশী পেয়েছে। পৃথিবীর ২২টি বিভিন্ন দেশ এই সম্মানের অধিকারী হয়েছে। তার মধ্যে নিগ্রো ও অন্যান্য অবহেলিত জাতিও আছে।

নোবেল পুরস্কার দেওয়ার নিয়ম হলো এই যে, যদি ভারপ্রাপ্ত কমিটির মধ্যে মতের মিল না হয়, তাহলে সে বছর সেই পুরস্কার দেওয়া হয় না। দেখা যায়, শান্তি পুরস্কার দেওয়া অনেক বছরই বন্ধ রাখা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া শান্তি পুরস্কার প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হিসাবেও দেওয়া হয়েছে। যেমন, যুদ্ধের সময় দু-বার এই পুরস্কার আন্তর্জাতিক রেডক্রশ কমিটিকে দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক নোবেল পুরস্কার বিজয়ীকে তাঁর মৌলিক রচনা বা গবেষণার বিবরণ সম্বলিত একখানি সুদৃশ্য পত্র উপহার দেওয়া হয় এবং তার সঙ্গে দেওয়া হয় ১০ আউন্স ওজনের একখানি স্বর্ণ পদক ও প্রায় ১২০০০ পাউণ্ডের একখানি চেক। কোন বাধা না থাকলে পুরস্কার প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে তাঁর রচনা সম্বন্ধে একটা ভাষণ দিতে হয়। প্রতি বছর ১০ই ডিসেম্বর নোবেলের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। সুইডেনের রাজা এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন। সন্ধ্যায় নোবেল-পুরস্কার সংস্থা কর্তৃক এক ভোজ সভার আয়োজন করা হয়

এবং সম্মানীয় অতিথিগণ অ্যালফ্রেড নোবেলের পুণ্যকীর্তি স্মরণ করে শ্রদ্ধাপ্লুতচিত্তে পান-ভোজনে যোগদান করে থাকেন।

অ্যালফ্রেড নোবেলের নশ্বর দেহ কবে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে—কিন্তু তিনি যে কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে গেছেন, তার ফল যুগে যুগে সারা বিশ্বে প্রসারিত হয়ে চলেছে। সেই যজ্ঞের ফলশ্রুতিরূপে আমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের ব্যক্তিত্ব ও সাধনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করছি। নোবেল ছিলেন একাধারে বিজ্ঞান-সাধক, কর্মী এবং মানব-প্রেমিক। তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কবির কথার প্রতিধ্বনি করে বলা যায়—

'এ সংসারে জেলে গেলে যে নব আলোক,
জয় হোক, তারি জয় হোক।'

সোভিয়েট রাশিয়ায় নির্মিত প্রতিফলক বীক্ষণ কাচ সন্নিবিষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নতুন সংস্করণ।

মানব-দেহে খনিজ পদার্থ

শ্রীসন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

বুদ্ধিবলে মানুষ পৃথিবীর অফুরন্ত খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার অধিকার করেছে। সে আহরণ করেছে নতুন নতুন সম্পদ এবং কাজে লাগিয়েছে সেই বিশাল সম্পদকে। কিন্তু অনেকেরই জানা নেই যে, মানুষের শরীর গঠনেও অনেকগুলি খনিজ পদার্থ অপরিহার্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের দেহে অন্ততঃ কুড়িটি বিভিন্ন প্রকারের খনিজ পদার্থ বর্তমান। এর মধ্যে প্রায় পনেরোটি অতি প্রয়োজনীয় এবং বাকীগুলির প্রয়োজন সামান্য। মানব-দেহের এই খনিজ সম্পদের মোট পরিমাণ প্রায় ৩ সেরের কাছাকাছি। এর মূল্য এক টাকার বেশী নয়।

আজ পর্যন্ত যে সব খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব মানুষের দেহে আছে বলে জানা গেছে, তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে—ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস, লোহা, আয়োডিন, কোবাল্ট, দস্তা, গন্ধক, সিলিকন, পটাসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, ক্লোরিন, ফ্লোরিন, তামা, সোডিয়াম, আর্সেনিক, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি।

এই সব খনিজ পদার্থের প্রত্যেকটিরই মানব-দেহের অভ্যন্তরে নিজস্ব এক একটা কাজ আছে। এদের যে কোন একটির অভাবেই মানব-দেহের অভ্যন্তরে গোলযোগ সুরু হতে পারে; এমন কি, এরা ফলে মৃত্যু ঘটাও আশ্চর্য নয়। প্রথমেই ধরা যাক, ক্যালসিয়ামের কথা। মানুষের জীবনধারণে এর প্রয়োজনীয়তা অসামান্য। এই খনিজ দ্রব্যটি হৃৎপিণ্ডকে সক্রিয় রাখে। এর অভাব ঘটলে ফুস্‌ফুসের কাজ প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়, যার ফলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। মানব-দেহে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ প্রায় দেড় সেরের মত। এর বেশীর ভাগই আছে হাড় এবং দাঁতের মধ্যে। মাংসপেশী আর স্নায়ুকেও ক্যালসিয়াম শক্ত রাখে।

প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম মানুষের প্রয়োজন। তাই দৈনিক এমন খাদ্য গ্রহণ করা দরকার, যাতে ক্যালসিয়াম আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দুধই হচ্ছে ক্যালসিয়াম গ্রহণের শ্রেষ্ঠ উপায় অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্য, যেমন ডিম, আলু, মাছ ইত্যাদির মধ্যেও ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। কিন্তু দুধের মধ্যেকার ক্যালসিয়াম দেহ সহজেই গ্রহণ করতে পারে। তাই রোজ প্রচুর দুধ পান করা প্রয়োজন। ক্যালসিয়ামের পরেই যে খনিজ পদার্থটি বেশী পরিমাণে দেহে পাওয়া যায়, সেটি হচ্ছে ফস্‌ফরাস। ক্যালসিয়াম আর ফস্‌ফরাস উভয়েই হাড় গঠনে সাহায্য করে এবং শক্ত রাখে। দাঁতকেও কর্মক্ষম রাখে। মানুষের দেহের ভার পড়ে পায়ের উপর। এই পায়ের হাড় প্রায় দু' মণ ভার সহজে বহন করতে পারে। ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসই মানব-শরীরকে দৃঢ় রাখে। দেহে প্রায় এক সের ফস্‌ফরাস থাকে। মাছের মধ্যে প্রচুর ফস্‌ফরাস পাওয়া যায়।

একটি আলপিনের মাথায় যতটুকু ধরে, দেহের ভিতরে আয়োডিনের পরিমাণ মাত্র ততটুকু। অথচ এর অভাব ঘটলে শরীরের বৃদ্ধি কমে যায় এবং বুদ্ধিও লোপ পায়। আয়োডিনের অভাবে নানারকম রোগ দেখা দেয়। তার মধ্যে গলগণ্ড অন্যতম। নানারকম জলজ উদ্ভিদ আর শাক-সব্জীর মধ্যেই আমরা আয়োডিন পাই। দেহ-গঠনে আর একটি প্রয়োজনীয় খনিজ হচ্ছে—লোহা। এর পরিমাণ অতি সামান্য হলেও এর কাজ খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। সারা দেহে একটি মাত্র নয়া পয়সার ওজনের সমান লোহা পাওয়া যেতে পারে। এর কাজ হচ্ছে, লাল রক্তকণিকা সৃষ্টি করা। এরই সাহায্যে দেহের ভিতরে অক্সিজেন চলাচল করে। এর অভাবে তাই মৃত্যু অবধারিত।

মানব-দেহের শিরা-উপশিরাগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় ষাট হাজার মাইল। লাল রক্তকণিকাগুলি সারাক্ষণ এই পথে চলাচল করে এবং তার ফলে বিনষ্ট হতে থাকে। তাই নতুন করে সেই স্থান পূরণ করবার জন্যে লোহার প্রয়োজন হয়। লোহাই নতুন রক্তকণিকা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের মধ্য দিয়েই আমরা লোহা সংগ্রহ করি। লোহার অভাবেই রক্তহীনতা রোগ দেখা দেয় এবং শরীর অসম্ভব দুর্বল হয়ে পড়ে। যে সব খাদ্যের মধ্যে লোহা পাওয়া যায়, সেগুলি হলো—ডিম, বাঁধাকপি, গুড়, ওট, মেটুলি ইত্যাদি।

তামার প্রয়োজনও মানব-দেহে খুব বেশী নয়। শরীরে এর পরিমাণ অতি সামান্য। সাধারণতঃ তামা লৌহকে রক্তকণিকা তৈরী করতে সাহায্য করে। মানুষের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে অনেকগুলির মধ্যেই তামা আছে; তাই সহজে এর অভাব ঘটে না।

এগুলি ছাড়া যে সব খনিজ দ্রব্য মানব-দেহ গঠনে প্রয়োজন, তার মধ্যে সোডিয়াম আর ক্লোরিন আমরা নুনের মধ্যে পাই। রক্তকণিকাগুলিকে সতেজ রাখতে এরা সাহায্য করে থাকে। অন্যান্য পদার্থের মধ্যে সিলিকন, দস্তা প্রভৃতি অল্প পরিমাণে মানব-দেহে থাকে। এদের প্রত্যেকটির কার্যকারিতা এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নি। অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম মানুষের মস্তিষ্কে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। জানা গেছে, অ্যালুমিনিয়ামই আমাদের মস্তিষ্ক চালনায় সাহায্য করে।

ম্যাগ্‌নেসিয়াম খাদ্যপ্রাণকে শক্তিতে পরিণত করে। গন্ধক আমাদের চুল আর নখ সুস্থ-সবল রাখে। ব্রোমিন আমাদের নিদ্রার সহায়তা করে। কোবাল্ট রক্ত-চলাচলে সাহায্য করে। সিলিকন চর্মের মসৃণতা রক্ষা করে। ফ্লোরিন দাঁতের ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়। আর্সেনিক কেশ-বৃদ্ধির সহায়তা করে। এই খনিজ পদার্থগুলি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের মধ্য দিয়েই আমাদের শরীরে প্রবেশ করে।

মোট কথা, এই সব পদার্থগুলিই আমাদের দেহের প্রধান শক্তি। খাদ্যপ্রাণের মতই এদের কাজ। আমরা প্রত্যেকে যদি দৈনিক খাদ্য-তালিকা ঠিকমত তৈরী করি, তাহলে নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল সুস্থ-সবল হয়ে বেঁচে থাকতে পারবো। কারণ খাদ্যের মধ্য দিয়েই আমরা এসব খনিজ পদার্থ এবং খাদ্যপ্রাণ গ্রহণ করে থাকি।

বিচিত্র জীব

রেডিওল্যারিয়া

পৃথিবীর জীব-জগতের বৈচিত্র্যের কথা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, সরীসৃপ, মাছ প্রভৃতির কথা বাদ দিলেও একমাত্র অদৃশ্য জীব-জগতের জাতিবৈচিত্র্যের সংখ্যা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও সাধারণতঃ পরিচিত বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেকেরই একটা মোটামুটি ধারণা থাকে। কোন ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা গেলে, সেই ব্যতিক্রমই আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সাধারণ দৃষ্টিতে অদৃশ্য, আণুবীক্ষণিক জীবের মধ্যে এ-রকমের কত যে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য দেখা যায়, তার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা এরূপ কয়েকটি অদৃশ্য এবং দৃশ্য জীবের কথা আলোচনা করবো।

আমাদের দেশের পুকুর, খাল-বিল, নদী-নালায় অসংখ্য রকমের আণুবীক্ষণিক জীব দেখা যায়। মাইক্রস্কোপের নীচে এক ফোঁটা ময়লা জল পরীক্ষা করলে এরূপ কত যে অদ্ভুত আকৃতির জীবের সন্ধান মিলে, তার ইয়ত্তা নেই। তাদের দৈহিক গঠন, এবং জীবনযাত্রা প্রণালী এতই বিচিত্র এবং অদ্ভুত

কলসীর মত আকৃতির রেডিওল্যারিয়া

যে, আমাদের পরিচিত কীট-পতঙ্গ বা পশু-পক্ষী প্রভৃতি কোন জীবের সঙ্গেই কিছু মাত্র মিল দেখা যায় না। বদ্ধ পুকুর বা নালা-নর্দমার জলে রেডিওল্যারিয়া নামে একশ্রেণীর আণুবীক্ষণিক প্রাণী প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলিকে দেখায় ঠিক ছবিতে আঁকা সূর্যের মত, এক-একটা গোল বস্তুর চতুর্দিকে যেন সূর্যরশ্মির মত কতকগুলি সরল রেখা আলপিনের বিন্দুর চেয়ে বড় নয়। এরা বেশী নড়াচড়া করে না, এক জায়গায় অনেকক্ষণ স্থির-ভাবে অবস্থান করে। সমুদ্র-জলে অদ্ভুত আকৃতির বিভিন্ন জাতীয় রেডিওল্যারিয়ার শরীরে বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ দেখা যায়। সমুদ্র-জলের বিভিন্ন জাতীয় অনেক রেডিওল্যারিয়ার শরীর থেকেই রক্তিমাভ এবং নীলাভ স্নিগ্ধ আলো বিকিরিত
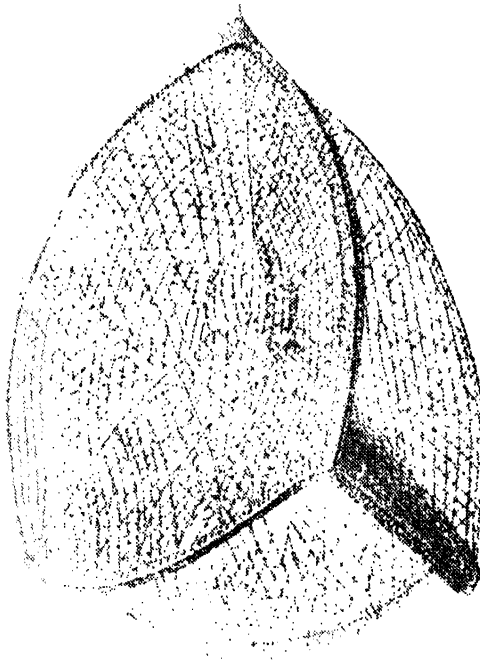
মুকুটাকৃতির রেডিওল্যারিয়া

টেনে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সাগর, মহাসাগর ও অন্যান্য জলাশয়ে বিচিত্র আকৃতির বিভিন্ন জাতীয় কত রকমের যে রেডিওল্যারিয়া রয়েছে, তার হিসাব আজও পাওয়া যায় নি। আমাদের দেশের জলাশয়েও বিভিন্ন জাতীয় রকমারি রেডিওল্যারিয়া সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। এদের দৈহিক পরিমাপ একটা হয়ে থাকে। এস্থলে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর থেকে সংগৃহীত কলসী ও মুকুটের মত দুটি রেডিওল্যারিয়ার বহুগুণ বর্ধিত আকারের ছবি দেওয়া হলো। এথেকেই এদের অদ্ভুত আকৃতি এবং বিস্ময়কর কারুকার্যের সম্বন্ধে ধারণা সম্ভব হবে।

বিচিত্র তারামাছ

অগভীর সমুদ্র-জলে নিমজ্জিত শিলাখণ্ডের আশেপাশে বা তাদের ফাটলের মধ্যে বিভিন্ন জাতের অসংখ্য তারামাছ দেখা যায়। তারামাছের সাধারণতঃ পাঁচটি করে আঙ্গুল বা উপাঙ্গ থাকে। এজন্যে চলিত কথায় এদের 'পাঁচ আঙ্গুলে' বলা হয়। অবশ্য পাঁচটির অনেক বেশী আঙ্গুল বা শুঁড়ওয়ালা বিভিন্ন জাতের তারামাছের সংখ্যাও কম নয়। মাছ নামে পরিচিত হলেও এরা কিন্তু মোটেই মাছ নয় বা কোন রকমে মাছের সঙ্গে সম্পর্কিতও নয়। আকৃতি-প্রকৃতিতে পরস্পর থেকে বিভিন্ন যে সব তারামাছের সন্ধান পাওয়া গেছে, কমপক্ষে তাদের সংখ্যাও কয়েক শত হবে। আঙ্গুল বা শুঁড়ের মত উপাঙ্গের সাহায্যেই এরা বালির উপর বা জলের মধ্যে চলাফেরা করে। শক্ত খোলায় আবৃত কয়েক জাতের মাছ খেতেই এরা বেশী পছন্দ করে; তবে কাঁকড়া, চিংড়ি এবং ঝিনুকই এরা প্রচুর পরিমাণে উদরস্থ করে। এস্থলে বিরাট আকৃতির একটি তারামাছের ছবি দেওয়া

প্রশান্ত মহাসাগরের বৃহদাকৃতির তারামাছ

হলো। এদের দেহের উপরিভাগে যে সব গোল গোল সাদা দাগ দেখা যাচ্ছে, সেগুলি মাছের আঁশের মত কতকগুলি শক্ত প্লেট মাত্র। ইউনাইটেড ষ্টেটসের সন্নিহিত প্রশান্ত মহাসাগরে এই ভীষণদর্শন প্রাণীগুলিকে দেখা যায়। এই তারামাছগুলির শরীরের ব্যাস আড়াই ফুটেরও বেশী হয়ে থাকে।

টিকটিকি ও গিলা মন্‌ষ্টার

অষ্ট্রেলিয়ার ঝালরওয়ালা টিকটিকি

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে টিকটিকির মত অনেক রকমের প্রাণী দেখা যায়। তার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার ঝালরওয়ালা টিকটিকিই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী কৌতূহলোদ্দীপক। শত্রুকে ভয় দেখাবার জন্যে

এরা গলার চতুর্দিকে ঝুলানো পর্দাটাকে ছত্রাকারে মেলে ধরে এবং মুখটাকে হাঁ করে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে। কিন্তু শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে না পারলে এরা মানুষের মত দু-পায়ে খাড়া হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে থাকে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বেশ একটা সামঞ্জস্য থাকায় এদের বেশ সুদৃশ্যই মনে হয়।

আমাদের দেশেও টিকটিকির মত বিভিন্ন জাতীয় অনেক রকমের প্রাণী দেখা যায়। কয়েক রকমের টিকটিকি সুদৃশ্যও বটে। কিন্তু নিউ মেক্সিকো এবং অ্যারিজোনার গিলা মনষ্টার নামে টিকটিকি জাতীয় একশ্রেণীর প্রাণীর আকৃতি যেমন বিরক্তিকর, তেমনই ভীতি-উৎপাদক। এরা প্রায় দু-ফুটের মত লম্বা হয়ে থাকে। গিলা মনষ্টারের ছবিটি দেখলেই কেমন যেন বিরক্তিকর মনে হবে। নীচের দিক ছাড়া এদের শরীরের উপরের দিকটা আঁচিলের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য গুটিকায় আবৃত এবং তার উপর আবার এলোমেলোভাবে কালো আর কমলা রঙের ডোরা-কাটা। সাপের মত এদেরও বিষ দাঁত আছে। কাউকে কামড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বিষ ঢেলে দেয়। এদের বিষে ছোট ছোট প্রাণী তো বটেই, মানুষেরও

নিউ মেক্সিকোর গিলা মনষ্টার

মৃত্যু ঘটে। গিলা মনষ্টারের চেহারা যেমন ভীষণ, দৃষ্টিও তেমনই ক্রুর। এরা যে হিংস্র প্রাণী, সেটা এদের গাত্রবর্ণ ও চোখের দৃষ্টি থেকেই বোঝা যায়। গিলা সারাদিন গাছপালার শিকড়ের নীচে লুকিয়ে থাকে এবং সন্ধ্যার পর আহারান্বেষণে ঘুরে বেড়ায়। সাপ, ব্যাং ইত্যাদি প্রাণীরা যেমন সারা শীতকালটা শীতঘুমে কাটিয়ে দেয়, এরাও তেমনি গরমের সময়টা গ্রীষ্মঘুমে কাটায়।

আমাদের দেশে সজারু নামে এক রকমের অদ্ভুত ...ী দেখা যায়। এরা নিশাচর প্রাণী; মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে বাসা বাঁধে এবং সারাদিন সেখানে ঘুমিয়ে কাটায়। রাত্রিবেলায় আহারের সন্ধানে বের হয়। সজারু নিরামিষাশী প্রাণী; প্রধানতঃ ফল-মূল খেয়েই জীবনধারণ করে। চেহারাটা কতকটা শূকরের মত। তবে শূকরের সঙ্গে বংশগত বা জাতিগতভাবে কোনই সম্পর্ক নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সজারুর আকৃতিগত কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। আমাদের দেশের পরিণত বয়স্ক

সজারু দু-ফুট বা আড়াই ফুটের বেশী উঁচু হয় না। সজারুর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এদের মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পিঠের দিকটা সাদা-কালোয় বিচিত্রিত তীক্ষ্মমুখ লম্বা লম্বা কাঁটায় আবৃত। কাঁটাগুলি ৫-৬ ইঞ্চিরও বেশী লম্বা হয়। সাপ যেমন লেজের প্রান্তভাগে পর পর সজ্জিত কয়েকটি অস্থিখণ্ডের সাহায্যে খট্‌খট্‌ শব্দ করে' শত্রুকে সতর্ক করে দেয়, এরাও বোধ হয় সেরূপ কোন উদ্দেশ্যেই নলের ঝুমঝুমি ব্যবহার করে। সূচীমুখ লম্বা কাঁটাগুলিই এদের আত্মরক্ষার এক-

এক জাতীয় বৃহদাকৃতির সজারু
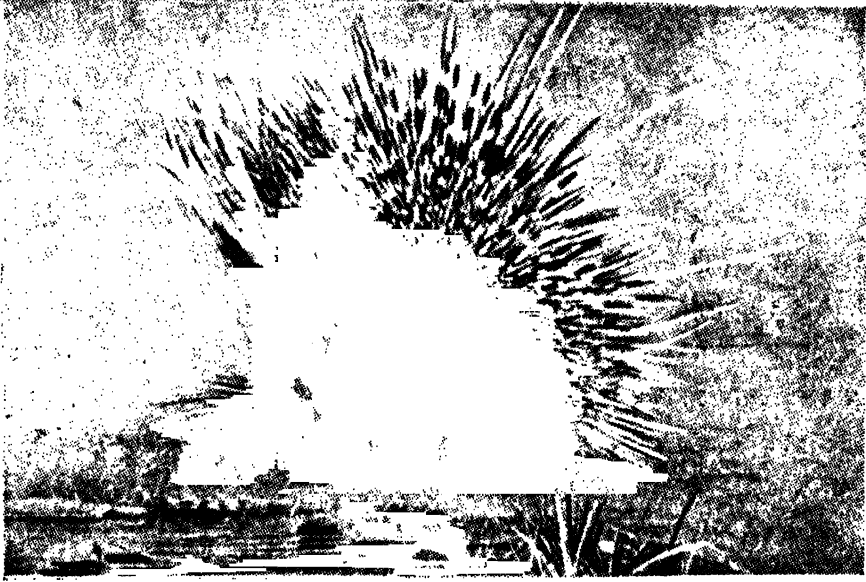
কাঁটার গোড়া ও মাথার দিকটা সরু এবং মধ্যের অংশ অনেকটা মোটা। লেজের প্রান্তভাগে একদিক খোলা নলের মত একগোছা ফাঁপা তোবড়ানো পদার্থ দেখা যায়। চলবার সময় লেজের এই নলের গোছায় ঝুমঝুমির মত শব্দ হয়। র‍্যাটেল মাত্র অস্ত্র। উত্তেজিত হলেই এই কাঁটাগুলি খাঁড়া হয়ে ওঠে। তখন শিকারী কুকুরের মত নির্ভীক জন্তুও এদের স্পর্শ করতে সাহস পায় না, নিরাপদ দূরত্বে থেকে একমাত্র চীৎকার করা ছাড়া তারা আর কিছুই করতে পারে না। —গ—

সর্দি ও তার প্রতিকার

শ্রীজয়া রায়

সর্দি কি এবং কি কারণে হয়, তা আর বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই। কারণ সর্দি কম হয়—এমন লোকের দেখা পাওয়া গেলেও, সর্দি একেবারে হয় না—এমন লোক নেই বললেই চলে। সর্দির সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় যে, নাক বা গলার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে রক্তাধিক্যের জন্যে যে শ্লেষ্মা নির্গত হয়ে থাকে, তার নামই সর্দি।

নানা কারণেই সর্দি হতে পারে। তবে হঠাৎ তাপ পরিবর্তনের ফলে অথবা বায়ু-বাহিত কোন জীবাণু শ্বাসযন্ত্রে পৌছালে যদি প্রদাহের সৃষ্টি হয়, তাহলে সর্দি হতে পারে। গরম ঘরে সব সময় থাকলে বা অতিরিক্ত জামা কাপড় পরে থাকলে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্ম, বায়ুর তাপ পরিবর্তন সম্বন্ধে বেশী সচেতন হয়ে পড়ে। তাছাড়া কোনও কারণে স্বাস্থ্যভঙ্গ হলে বা রোগ-প্রতিরোধক শক্তি হ্রাস পেলেও সর্দি হতে পারে। এতদ্ব্যতীত ধূলাময়লাও অনেকাংশে এই রোগের জন্য দায়ী। সর্দি কোন কোন সময়ে অন্য রোগের লক্ষণ হিসাবে দেখা দেয় বলে কি কারণে হচ্ছে, সব সময় সেটা ধরা পড়ে না; যেমন—মাম্পস্, নিউমোনিয়া, হাম, বসন্ত ইত্যাদি রোগের আগে সর্দি হয়। তবে অধিকাংশ সময়েই এই রোগ জীবাণু-সংক্রমণের ফলে হয়ে থাকে। কখনও কখনও আবার যথার্থ কারণ জানা না গেলে এলার্জির কথা বলা হয়।

সর্দি হলে প্রথমে নাকের ভিতরকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ফুলে লাল হয়ে ওঠে এবং নোনা জল ঝরতে থাকে। সর্দি হলেই কপাল ও চোখ ব্যথা করে। তার কারণ প্রদাহ ঐ সব জায়গায় (Frontal sinus) ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যে মধ্যে হাঁচি হয়। ক্রমে ফোলা কমে আসে এবং শ্লেষ্মা গাঢ় হয়ে যায়। কখনও গলার দিকে প্রদাহ ছড়িয়ে পড়ে এবং কাশি আরম্ভ হয়। কখনও কখনও সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যথা এবং জ্বর হয়। উপযুক্ত যত্ন নিলেও রোগ সম্পূর্ণরূপে সারতে ৭।৮ দিন লাগে।

অনেকে ঠাট্টা করে বলেন যে, এখনও সর্দির ওযুধ তৈরী হয় নি। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি সর্দির আনুসঙ্গিক রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে সত্যিই ওযুধ আবিষ্কৃত হয়েছে; কিন্তু সর্দি সারাবার মত ওযুধ এখনও তৈরী হয় নি। তার কারণ সর্দি বেশ জটিল রোগ এবং তার প্রকৃতি সব সময়েই বদ্‌লে যায়। ভেষজ-বিজ্ঞানীরা এর ওযুধ তৈরী করতে যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। বাজারে যদিও সর্দির প্রতিষেধক হিসাবে বিভিন্ন কোম্পানীর নানারকমের ওযুধ চলছে, কিন্তু সেগুলি অধিকাংশ সময়ে কার্যকরী হয় না। তাছাড়া প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র বানরেরই মানুষের মত একই কারণে সর্দি হয়। সে জন্যে গবেষণারও যথেষ্ট অসুবিধা আছে।

এক বিশেষ ধরণের ভাইরাস বা বিষবীজই সর্দি সৃষ্টি করে। এই বিষবীজ নানা জাতির ও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এ-পর্যন্ত বহু রকমের সর্দির বিষ-বীজের সন্ধান পাওয়া গেছে। পরীক্ষায় জানা গেছে যে, যে সব রোগোৎপত্তির মূলে বিষবীজ রয়েছে, সেগুলিকে আয়ত্তে আনা সহজ নয়। বিষবীজের প্রকৃতিকে করিৎকর্মা লোকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। করিৎকর্মা লোক যেমন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে, এরাও তাই করে। তাছাড়া এরা খুব তাড়াতাড়ি তাদের প্রকৃতি বদ্‌লে ফেলতে পারে। কোনও রকম বাধা বা প্রতিষেধকের সম্মুখীন হলেই

বিষবীজ তার দেহ, আকৃতি ও স্বভাবের পরিবর্তন ঘটায়। অবস্থা প্রতিকূল হলেই সে কখনও স্ফটিকের মত স্বচ্ছ এবং শক্ত, আবার কখনও জেলির মত নরম হয়ে যায়। বিষবীজের এই পরিবর্তনশীল প্রকৃতিকে ইংরেজীতে mutation বা পরিব্যক্তি বলে। দেহের ভিতরে ভাইরাস যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থানুযায়ী ওষুধ প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, বিষবীজগুলি অবস্থার পরিবর্তন করে ফেলে। তখন আর সেই ওষুধ কাজে লাগে না। তাছাড়া বিষবীজঘটিত রোগে রোগ-প্রতিরোধ শক্তিও বেশী দিন স্থায়ী হয় না। একবার সর্দি হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই আবারও হতে পারে। একই ঋতুতে পাঁচ বার সর্দি হলে বিভিন্ন ধরণের বিষবীজ তার কারণ হতে পারে। এসব কারণে সর্দির জন্যে একটি মাত্র প্রতিষেধক ওষুধ তৈরী করা কঠিন।

বড় বড় ওষুধ তৈরীর প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্রেরা কেউ কেউ বলছেন ২, থেকে ৫, আবার কেউ বলছেন, ১০ বা ১৫ বছরের মধ্যে বাজারে সর্দি সারাবার ওষুধ ছাড়া যাবে। যাঁরা এই ওষুধ তৈরী করবে, তাদের কাজ হলো প্রথমে দেখা যে, সর্দি বা শ্বাসযন্ত্রের অন্যান্য রোগ কোন্ কোন্ বিষবীজের দ্বারা উৎপন্ন হয়। তাই দেখে সর্দির ওষুধের বা টিকার মধ্যে যতগুলি সম্ভব অ্যান্টিজেন প্রয়োগ করা। অ্যান্টিজেনের কাজ হলো, দেহের মধ্যে রোগ-প্রতিরোধক অ্যান্টিবডি তৈরী করা। কোন কোন প্রতিষ্ঠান একই টিকার মধ্যে ১৫-২০টি পর্যন্ত অ্যান্টিজেন ব্যবহার করেছে; কিন্তু তাতেও ঝঞ্ঝাটের শেষ নেই। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দিয়েই অ্যান্টিজেন তৈরী। তাদের একটির গুণাগুণ অপরটির ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তাছাড়া শরীরে যে অনুপাতে টিকার ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, সেই অনুপাতে অ্যান্টিবডি তৈরী হয় না। পূর্বে যে সব অ্যান্টিবডি তৈরী হয়েছে, সেগুলি থেকেই আবার তাদের প্রতিষেধক অ্যান্টিবডি তৈরী হতে পারে।

সে জন্যে টিকা প্রস্তুতকারকদের প্রধান কাজ হলো, প্রথমে বিষবীজের ষ্ট্রেন (জাতি) খুঁজে বের করে তার পরিমাণ বাড়িয়ে ভাইরাসের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে অথচ অ্যান্টিবডি তৈরীর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে টিকা তৈরী করা।

সর্দির বিষবীজগবেষণাগারে বানরের বৃক্কের তন্তুতে বৃদ্ধি করা হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার বিষবীজ নিষিক্ত ডিমে বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু সর্দির বিষবীজের পরীক্ষা নিষিক্ত ডিমের উপর কার্যকরী হয় না। বিষবীজের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে অ্যান্টিবডি তৈরীর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে ফরম্যাল ডিহাইড, অতিবেগুনী আলো, তাপ ইত্যাদি মিলিয়ে ব্যবহার করা হয়।

গত কয়েক বছর ধরে সর্দির প্রতিষেধকের টিকা তৈরী করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। ১৯৫৩ সালে জন্স হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কর্মীরা সর্দির একটি বিষবীজের সন্ধান পেয়েছিলেন। শিশুদের শ্বাসপথের উপর দিকে এই বিষবীজের সংক্রমণ ঘটে। তাঁরা এর নাম দেন জে. এইচ. ভাইরাস। ১৯৫৭ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উইনষ্টন প্রাইস জানান যে, জে. এইচ. ভাইরাসের টিকা বের করে ৪০০টি রোগীর উপর পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, শতকরা ৮০টি ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য স্থানে এই টিকা প্রয়োগে তত সুফল পাওয়া যায় নি।

১৯৫৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেট লেক্‌সের নৌ-শিক্ষা কেন্দ্রে দু-জন বিজ্ঞানী সর্দির নতুন বিষবীজের সন্ধান পান। এই বিষবীজটির জে. এইচ. ভাইরাসের সঙ্গে মিল ছিল। ১৯৫৮ সালে জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থা পার্ক ডেভিস প্রতিষ্ঠানকে বাজারে বিক্রয়ের জন্যে সর্দির একরকম ওষুধ দিয়েছিলেন। এই ওষুধ শ্বাসপথের জটিল ধরণের সংক্রমণের ক্ষেত্রে কাজ দেবে বলে তাঁরা জানিয়েছিলেন। ৫,০০০ সৈন্যকে এই ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে শতকরা ৫০-৭০ জন আরোগ্য লাভ করে।

পরে এই ওষুধ অন্যান্য সামরিক বিভাগে ব্যবহার করে যথেষ্ট উপকার পাওয়া গিয়েছিল। সাধারণ লোকের উপর প্রয়োগ করে তেমন সুফল পাওয়া যায় নি। কারণ, দেখা গেছে—জীবনযাপন প্রণালীর পার্থক্য থাকায় সাধারণ লোকের তুলনায় বিষবীজ সংক্রান্ত রোগ সৈনিকদের মধ্যেই বেশী হয়।

জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষকেরা আরও কতকগুলি বিষবীজের সন্ধান পেয়েছেন। এগুলি শিশুদের শ্বাসপথে আক্রমণ চালায়। আজকাল সর্দি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন, তাঁরা বিজ্ঞানের দিক দিয়ে কিছু কিছু সুবিধা পেয়েছেন। জীব-জন্তুর বিশেষ বিশেষ তন্তু যন্ত্রের সঙ্গে গবেষণাগারে রেখে তার উপর বিষবীজের পরীক্ষা হয় (Tissue Culture)। এই কাজে আজকাল Synthetic nutrients ও অ্যান্টিবায়োটিক্স ব্যবহৃত হচ্ছে। অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের ফলে তন্তুতে রোগ-জীবাণু সংক্রমণের ভয় থাকে না।

তাছাড়া বিজ্ঞানীরা ফ্লোরেসেণ্ট অ্যান্টিবডি প্রস্তুতের পদ্ধতিও এই কাজে লাগিয়েছেন। রক্তের জলীয় অংশে যে অ্যান্টিবডিগুলি পাওয়া যায়, তাঁরা তাতে একরকম চকচকে রাসায়নিক রং ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এই রঙীন অ্যান্টিবডিগুলি সূচিকা-যোগে পুনরায় তন্তুতে প্রয়োগ করা হয় এবং অনুরূপ অ্যান্টিজেনের সঙ্গে সেগুলি যুক্ত হয়ে থাকে। এই রঙীন অ্যান্টিবডিগুলি এভাবে অদৃশ্য অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি জানিয়ে দেয়।

এই রকম নানা কৌশলের সাহায্যে দেশ-বিদেশে সর্দির টিকা তৈরীর চেষ্টা চলছে। অ্যান্টিজেন গাঢ়তর করে তোলবার এবং বিষবীজ ভালভাবে চেনবার নানা উপায়ও আবিষ্কৃত হয়েছে।

সর্দির জন্যেই নানারকম জটিল রোগ হয় বলে এই রোগ হওয়া মাত্রই সাবধান হতে হবে। টিকা তৈরী করবার চেষ্টা চললেও এ-বিষয়ে অবহেলা করা উচিত নয়। সহরবাসীরা খোলা হাওয়া বিশেষ পায় না। তবুও যতদূর সম্ভব খোলা হাওয়া গায়ে লাগাতে হবে এবং উপযুক্ত পরিশ্রম করতে হবে। সর্দির ভয়ে বেশী জামাকাপড় ব্যবহার করা ঠিক নয়। তাতে গায়ের চামড়া তাপ-পরিবর্তন সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে যায় ও অল্পেতেই সর্দি হয়। সর্দি আরম্ভ হবার আগে নাকে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়। কপালে বেদনার সৃষ্টি হলেই সাবধান হওয়া উচিত। রোগটি খুব ছোঁয়াচে বলেই আরও সাবধান হতে হবে। নইলে একজন লোক থেকে এই রোগ পরিবারের সবার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়তে পারে।

সর্দি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিকার করতে হলে রাত্রে শোবার আগে গরম জলে পা ডুবিয়ে ও শুকনো করে মুছে শু'লে বেশ উপকার পাওয়া যায়। সর্দির প্রথম অবস্থায় লঘু-পথ্য গ্রহণ করে ঘণ্টা তিনেক অন্তর অন্তর অ্যাসপাইরিন খেলেও উপকার পাওয়া যায়। জ্বর ভাব হলে একটু কুইনাইনও খাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া চিকিৎসকদের দ্বারা নির্দেশিত কতকগুলি মিক্‌চারও সর্দির পক্ষে খুব উপকারী। সর্দি একেবারে না সারলেও উপশমে নানারকম উপায় আছে। শিশু ও অল্পবয়স্কদের সর্দি হলে অনেক সময় গলা ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী লাল হয়ে ফুলে ওঠে এবং কষ্ট দেয়। এই অবস্থায় অ্যাকোনাইট প্রয়োগে বেশ উপকার হয়। নুনজল ও আরও নানারকম কুলকুচার ব্যবস্থা আছে। সেগুলিও সর্দি বেশ উপশম করতে পারে। মোট কথা, উপযুক্ত যত্ন নিলে ৭।৮ দিনে একেবারে সেরে যেতে পারে। অবহেলায় রোগটি পুরনো হয়ে যায়, পরে স্বরযন্ত্র ও ক্লোমনালী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে।

সঞ্চয়ন

বিকলাঙ্গদের নবজীবনের আশ্বাস

এই সম্পর্কে এলিজাবেথ গিলজিন লিখেছেন—এক্স-রে করে দেখা গেল, কিশোর ডেভিডের বাঁ-পায়ের জঙ্ঘাস্থিতে একটি টিউমার হয়েছে। রেডিওলজিষ্ট এই পর্যন্ত বলতে পারেন যে, টিউমারটির উপর ও নীচের হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। অর্থোপিডিক সার্জন টিউমারটির বায়োপ্‌সি করবার সিদ্ধান্ত করেন। ডেভিডকে ওষুধের সাহায্যে অচেতন করে জায়গাটি ছুরি দিয়ে চিরে টিউমার থেকে বিকৃত হাড়ের কয়েকটি সূক্ষ্ম খণ্ড সংগ্রহ করা হলো এবং সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখবার জন্যে প্যাথোলজিক্যাল লেবরেটরীতে পাঠানো হলো। ইতিমধ্যে ডেভিডের পা প্লাষ্টার অব প্যারিসে মুড়ে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে সার্জন প্যাথোলজিষ্টের রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

যথাসময়ে রিপোর্ট এল। সার্জন পড়ে দেখলেন, টিউমারটি দ্রুত বাড়ছে বটে, কিন্তু এখনও ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট হয়ে ওঠে নি। ডেভিডকে আবার আনানো হলো এবং আবার এক্স-রে করে দেখা গেল যে, টিউমারটি আরও বড় হয়েছে এবং পায়ের হাড়ের অনেকখানি নষ্ট করে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি অস্ত্রোপচার না করলে আর চলবে না।

কিন্তু তখন এক সমস্যা দেখা দিল। অপারেশন সফল করতে হলে বিকৃত হাড়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কেটে বাদ দিতে হবে। তার ফলে পায়ের হাড়ে বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে যাবে এবং সেই ফাঁক পূরণ না করলে ডেভিডের পক্ষে আর হাঁটা-চলা সম্ভব হবে না। টিবিয়া হাড়ে হয়েছে টিউমার। সার্জন তার সন্নিহিত ফেবুলা হাড় চিরে ফেললেন এবং অতি সাবধানে তার অর্ধেক টিবিয়াতে বসিয়ে ফাঁক পূরণের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাতেও ফাঁক সবটা পূরণ হলো না, খানিকটা বাকী রয়ে গেল।

অস্থি-ব্যাঙ্কে খবর পাঠানো হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক থেকে গ্র্যাফ্‌টের হাড় এসে গেল। গ্র্যাফ্‌টটিকে গরম লবণ জলে ভিজিয়ে রাখা হলো। সার্জন হাড়ের ফাঁকটি মেপে দেখলেন, গ্র্যাফ্‌ট থেকে মাপমত একটি টুক্‌রা কেটে নিয়ে যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন। গ্র্যাফ্‌টটি যাতে স্থানচ্যুত না হয়, তার জন্যে পা আবার কঠিন প্লাষ্টার অব প্যারিসের খাপে মুড়ে দেওয়া হলো। প্রকৃতি কিন্তু এই বাইরের অস্থিখণ্ডটিকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করবে না। এটি বেশ কিছুকাল স্বস্থানে থাকলেই তার চারদিকে সুস্থ হাড় গজাবে এবং অবশেষে নতুন হাড়ের তন্তুগুলি যথেষ্ট পুরু ও মজবুত হয়ে উঠবে। গ্র্যাফ্‌ট-করা অস্থিখণ্ডটির আর কোন প্রয়োজন থাকবে না।

ডেভিডের ভাগ্য ভাল; কারণ যে হাসপাতালে তার অপারেশন করা হয়, সেখানে একটি অস্থি-ব্যাঙ্ক ছিল। এই হাসপাতালে কোন সার্জনের কোন হাড়ের প্রয়োজন হলেই তিনি ব্যাঙ্ককে জানিয়ে দেন—অমুক তারিখে অমুক আকারের ও অমুক ধরণের হাড়ের প্রয়োজন হবে এবং ব্যাঙ্কও যথাসময়ে তা সরবরাহ করে।

বর্তমানে গ্র্যাফ্‌টের অস্থিগুলিকে ঠাণ্ডায় জমিয়ে রেফ্রিজারেটরে রাখা হয়। পাঁজরার হাড়গুলি সহজেই পাওয়া যায়; কারণ যে সব ক্ষেত্রে বুকে অপারেশন করে পাঁজরার হাড় কেটে বাদ দেওয়া হয়, সেগুলি ফেলে না দিয়ে ব্যাঙ্কে মজুত রাখা হয়। কিন্তু যে হাসপাতালে অস্থি-ব্যাঙ্ক নেই,

সেখানে অবিলম্বে হাড় পাওয়ার কিছুটা অসুবিধা হয়। ছোট ছোট ঠাণ্ডা বাক্সে করে হাড় পাঠিয়ে এখন এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

সরবরাহের তুলনায় গ্র্যাফ্‌টের হাড়ের চাহিদা বর্তমানে অনেক বেশী। যে সব হাসপাতালে অস্থি-ব্যাঙ্ক নেই, সেখানে নানাভাবে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। যে হাসপাতালে হয়তো একজনের বুকে অপারেশন করতে হবে এবং আর একজনের গ্র্যাফ্‌ট হাড়ের দরকার, তাহলে সেখানে একদিনেই দু-জনের অপারেশন করা হয়, যাতে একজনের বুকের হাড় নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের দেহে তা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এটা সব সময় সম্ভব হয় না। যদি এক এক অঞ্চলে এক একটি অস্থি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করা যায় এবং সে সব ব্যাঙ্কে যথেষ্ট ঠাণ্ডা বাক্স রাখা যায়, তাহলে সেখান থেকে সেই অঞ্চলের সব হাসপাতালের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হতে পারে।

গ্র্যাফ্‌ট-অস্থির সাহায্যে খোঁড়া অথবা পক্ষাঘাত বা পোলিও রোগাক্রান্ত শিশুদের পা নতুন করে গড়ে দেওয়া যায় কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা ও গবেষণা চালানো হচ্ছে। এর জন্যে প্রচুর গ্রাফ্‌টের অস্থি-র প্রয়োজন হবে।

কোন দিন হয়তো বৃটেনে এমন আইন প্রণয়ন করা হবে, যাতে দুর্ঘটনায় নিহত তরুণ ব্যক্তিদের অস্থি ব্যাঙ্কে মজুত করা যাবে এবং সেই অস্থি-র সাহায্যে অন্য কেউ হাঁটা-চলা করবার ক্ষমতা লাভ করতে পারবে।

নূতন অ্যাণ্টিবায়োটিক—সেফালোস্পোরিন

এই সম্পর্কে ওল্‌গা ইলনার লিখেছেন—বৃটেনে এখন এক নতুন জাতের অ্যাণ্টিবায়োটিক প্রস্তুত করা হচ্ছে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে সেফালোস্পোরিন্স। ডাক্তারদের বিশ্বাস যে, যেখানে পেনিসিলিন ব্যর্থ হয়েছে সেখানে, সেফালোস্পোরিন কাজ করতে পারে।

সেফালোস্পোরিন সম্পর্কে যে গবেষণা চালানো হচ্ছে, সে সম্পর্কে মেডিক্যাল জার্ন্যাল ইত্যাদির বাইরে বিশেষ কিছু লেখা হয় নি। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় গবেষণা উন্নয়ন কর্পোরেশন তাঁদের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাতেই জনসাধারণকে প্রথম এই নতুন আবিষ্কারের খবর জানানো হয়। গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে গঠিত ও গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে পরিচালিত এই কর্পোরেশনের কাজ হলো, বৃটিশ বৈজ্ঞানিকদের নতুন কিছু উদ্ভাবনের চেষ্টায় সহায়তা করা। সেফালোস্পোরিন সম্পর্কে গবেষণার কাজ এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যেই চালানো হচ্ছে।

বৃটেনের অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল গবেষণা পরিষদের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা যুক্তভাবে এই গবেষণা চালাচ্ছেন। পেনিসিলিন আবিষ্কারের কৃতিত্বের ভাগী সার হাওয়ার্ড ফ্লোরিও এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছেন। সার্ভিনিয়ার এক হ্রদের নদর্মা-দূষিত জলে অধ্যাপক ব্রোজু সর্বপ্রথম সেফালোস্পোরিনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। অধ্যাপক ব্রোজু এই পদার্থটির মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পান; কিন্তু বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরাই প্রথম এর অদ্ভুত জীবাণু-নাশক ক্ষমতা আবিষ্কার করেন এবং এই সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা আরম্ভ করে দেন।

এই পদার্থটি থেকে যে সব অ্যাণ্টিবায়োটিক পৃথক করা হয়েছে, তাদের মধ্যে সেফালোস্পোরিন সি-এর সঙ্গে পেনিসিলিনের অনেক মিল আছে। তবে এর রাসায়নিক গঠন ও অন্য কতকগুলি ধর্ম পেনিসিলিন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

এর সবচেয়ে বড় গুণ হলো এই যে, পেনিসিলিনেজ নামে পরিচিত যে এনজাইম পেনিসিলিনের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়, তা সেফালোস্পোরিনের কোন ক্ষতি করতে পারে না। এর অর্থ হলো এই যে, যে সব রোগে, যেমন ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণুর আক্রমণজনিত রোগে, পেনিসিলিন যেখানে কোন কাজ করতে পারে না, সেফালোস্পোরিন সেখানে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়।

মহাসাগরের রহস্য-সন্ধানে সমুদ্র-বিজ্ঞানী

মহাশূন্যের মত মহাসাগরও মানুষের কাছে রহস্যময় বটে; তবে মহাসাগর মহাশূন্যের চেয়ে অনেক বেশী অজানা। কারণ এর অতল তলের সন্ধান মানুষ আজও পায় নি।

তবে এজন্যে মানুষের চেষ্টার বিরাম নেই। সমুদ্রের গভীরে বিপুল জলের চাপ থেকে মানুষ আজ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছে, ট্রিয়েষ্টি ব্যাথিসক্যাফ নামে অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করে। এটি গ্রীক শব্দ; এর অর্থ—গভীর জলের নৌকা।

এই নৌকার সাহায্যেই সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা গত ২৩শে জানুয়ারী পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের মেরিয়ানাস ট্রেঞ্চ অঞ্চলে ৭'১৫ মাইল পর্যন্ত গভীরে যেতে পেরেছিলেন। এই যন্ত্রটিকে বলা যেতে পারে সাগর-তলার বেলুন।

৭'১৫ মাইলেরও নীচে এই যান্ত্রিক বাহনটিকে প্রতি বর্গইঞ্চিতে ১৬৮৮৩ পাউণ্ড চাপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে এজন্যে এর ভিতরে যে দু-জন বিজ্ঞানী ছিলেন, তাঁদের পক্ষে কোন রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয় নি।

ঐ পর্যন্ত পৌছুতে বিজ্ঞানীদের প্রায় পাঁচ ঘণ্টা লেগেছিল। ঐ জলে কোন কালে মানুষের পাদস্পর্শ ঘটে নি। সমুদ্রের অতি গভীরে তাঁরা প্রায় একঘণ্টা ছিলেন। সেখান থেকে ফিরে আসতে তাঁদের লেগেছিল ৩ ঘণ্টা ১৭ মিনিট।

অধ্যাপক অগাষ্ট পিকার্ড সুইজারল্যাণ্ডের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। ইনিই এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন। এরই সাহায্যে অধ্যাপকের পুত্র জেকস পিকার্ড এবং লেঃ ডোনাল্ড ওয়াল্‌স্‌ প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত গুয়ামের ২১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ৪৬ বার সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে রেকর্ড স্থাপন করেন। এই জায়গাটির নাম মেরিয়ানাস ট্রেঞ্চ—সবগুলি সমুদ্রের মধ্যে এটাই গভীরতম। এর গভীরতা হিমালয় পর্বতের গৌরীশৃঙ্গের উচ্চতা থেকেও অধিক। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে হিমালয়ের উচ্চতা মাত্র ২৯ হাজার ২৮ ফুট।

সমুদ্রের যে সব অঞ্চল সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন তথ্যই সংগৃহীত হয় নি, যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনী সে সব অঞ্চল সম্পর্কে এই যন্ত্রের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন।

তাঁরা প্রশান্ত মহাসাগর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দু'বছরের জন্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের ১৫ই নভেম্বর প্রথম পিকার্ড ও ডাঃ অ্যানড্রিয়াস আর. রেকনিৎসার সমুদ্রের তলদেশের তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। তাঁরা সমুদ্রের ১৮৬০০ ফুট পর্যন্ত নীচে নেমেছিলেন। মার্কিন নৌ-বাহিনীর ইলেক্‌ট্রনিক লেবরেটরীর অন্যতম গবেষক, সমুদ্র-বিজ্ঞানী ডাঃ রেকনিৎসারের উপর গভীর সমুদ্রের বাহন এই যন্ত্রটির সাহায্যে গবেষণা করবার ভার দেওয়া হয়।

তারপর গত ৮ই জানুয়ারী লেঃ ওয়াল্‌স্‌ ও পিকার্ড মেরিয়ানাস ট্রেঞ্চের ২৪ হাজার ফুট পর্যন্ত নীচে অবতরণ করে রেকর্ড স্থাপন করেন। ২৩শে জানুয়ারী আবার তাঁরা সমুদ্রগর্ভে ৭ মাইল পর্যন্ত গমন করেন।

সাগর-জলে সূর্যালোকের অনুপ্রবেশ, সমুদ্রগর্ভের দৃশ্য, স্বাভাবিক তাপ, চাপ, সাগর-তলের অবস্থা নিরূপণ এবং সামুদ্রিক জীবজন্তু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এসব পরীক্ষার কাজ চালানো হচ্ছে।

১৯৫৭ সালেই প্রথম ব্যাথিক্যাফের সাহায্যে এসব তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হয়। ১৯৫৮ সালে ২১শে জুন থেকে ২৫শে অক্টোবরের মধ্যে ভূমধ্য-সাগরের নেপল্‌স্ এর উপকূলবর্তী স্থানে ২৬ বার তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়। বিজ্ঞানীরা তখন সাগরের দু-মাইল নীচ অবধি গিয়েছিলেন।

৭০ টনের ব্যাথিসক্যাফ ট্রিয়েষ্টি নামে এই যন্ত্রটি ১৮৫৮ সালে অধ্যাপক অগাষ্টি পিকার্ডের নিকট থেকে মার্কিন নৌ-বাহিনী কিনে নেন। তবে এই ব্যাথিসক্যাফ পরিকল্পনা মার্কিন, ফরাসী বেলজিয়ান, ইটালিয়ান এবং সুইস বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত চেষ্টায় গৃহীত হয়েছে।

পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই রয়েছে সমুদ্র ও জল। কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে বিচার করলে মনে হয়, সমুদ্র সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ! কিন্তু এই জ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ প্রচুর পরিমাণে ফসল ফলায়, অল্প খরচে এক-স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে। সমুদ্র আবহাওয়ার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আক্র-মণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সমুদ্র বিশেষ সহায়ক বলে মনে করা হয়ে থাকে।

কিন্তু আজ জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে, যান্ত্রিক সভ্যতার জটিলতা বাড়ছে। প্রাণ ও পৃথিবী সৃষ্টির উৎস সন্ধানে মানুষ আজ কৌতুহলী হয়েছে, এজন্যেই তারা সমুদ্র সম্পর্কেও বিশেষভাবে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছে।

সমুদ্রতলে নিহিত রয়েছে প্রাণ-রহস্যের চাবি-কাঠি—লক্ষ লক্ষ বছরের পৃথিবীর ইতিহাস চাপা পড়ে গেছে সমুদ্রের তলায়। সেখানেও হাজার হাজার ফুট উঁচু পাহাড় রয়েছে, রয়েছে নদীর খর-স্রোতধারা—কত রকমের প্রাণী।

ডাঃ রেকনিৎসার বলেন—আজ আমরা চাঁদের উপরিভাগ সম্পর্কে যতটুকু জানি—ততটুকুও সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে জানি না।

ভূ-পৃষ্ঠে জল ও স্থলভাগের বিন্যাস

শ্রীরমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বিশাল জল-রাশির দ্বারা বেষ্টিত। অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ জুড়ে আছে স্থলভাগ। আমাদের পৃথিবী যদি একটি সমসত্ত্ব ঘনবস্তু হতো, তাহলে জল ও স্থলভাগের বিন্যাসে এরূপ অসামঞ্জস্য দেখা যেত না এবং ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্রই সমপরিমাণ জলের একটা আস্তরণ থাকতো। কিন্তু পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা দেখি, জল ও স্থলভাগের অনিয়মিত আপেক্ষিক অবস্থান। তাছাড়া আরও লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে—

(১) উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ এবং দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগের আধিক্য;

(২) উত্তর মেরুর জলভাগে এবং দক্ষিণ মেরুর স্থলভাগে অবস্থিতি;

(৩) মহাদেশ ও মহাসাগরগুলির ত্রিকোণ আকৃতি;

(৪) মহাদেশগুলি দক্ষিণভাগে এবং মহাসাগরগুলি উত্তরভাগে ক্রমশঃ অপ্রশস্ত ও সংকীর্ণ হয়ে গেছে ;

(৫) জল ও স্থলের প্রতিপাদ সম্বন্ধ। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, স্থলভাগের প্রতিপাদ স্থান জলভাগ।

জল ও স্থলভাগের এসব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মহলে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা চলতে লাগলো। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে লোথিয়ান গ্রিন চতুস্তলকীয় প্রকল্পের প্রচার করেন। সমক্ষেত্রফল-চতুস্তলকটিকে খাড়াভাবে স্থাপন করলে ভূ-পৃষ্ঠে জল ও স্থলের আপেক্ষিক অবস্থানের মোটামুটি অনুকৃতি দৃষ্ট হয় (চিত্র ১)।

এই প্রকল্পের আলোচনায় প্রথমেই লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রশান্ত মহাসাগর অন্যান্য মহাসাগরগুলি অপেক্ষা অনেক বড়। সুতরাং চতুস্তলকের চারটি তলের মধ্যে একটি তলের আকৃতি অবশিষ্ট তলগুলি অপেক্ষা বড় হওয়া দরকার। কিন্তু এটা একেবারেই অসম্ভব; কারণ চতুস্তলকের চারটি তল হচ্ছে চারিটি সমান সমবাহু ত্রিভুজ।

১নং চিত্র
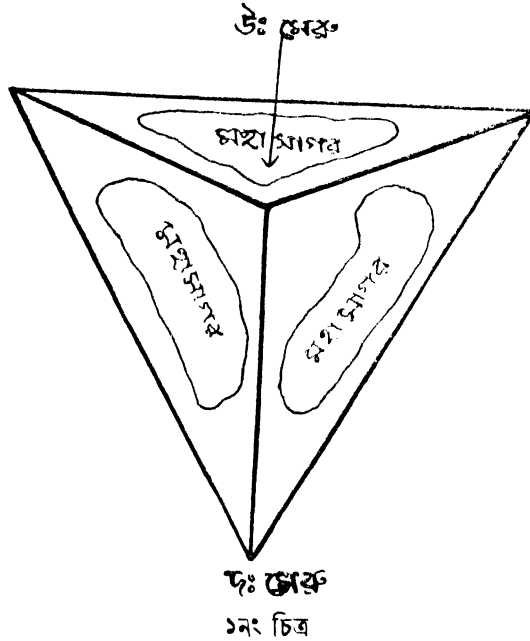
বিশিষ্ট বিভিন্ন ঘন বস্তুর মধ্যে চতুস্তলকের আয়তন সবচেয়ে কম এবং গোলকের আয়তন সবচেয়ে বেশী। গ্রিনের মতে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ ক্রমশঃ শীতল ও সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে এর আকার গোলক থেকে চতুস্তলকে পরিণত হয়। চতুস্তলকের আকৃতিবিশিষ্ট পৃথিবীতে চারটি তল অধিকার করে আছে জলভাগ (প্রশান্ত, আটলান্টিক, ভারত ও উত্তর মহাসাগর) এবং কৌণিক বিন্দু ও প্রান্তভাগগুলিতে আছে স্থলভাগ। যে কোন একটি কৌণিক বিন্দুকে দক্ষিণ মেরু কল্পনা করে তার উপর তাছাড়া স্থলভাগ সিয়াল দ্বারা গঠিত (অপেক্ষাকৃত হাল্কা গ্রানিট জাতীয় শিলা দ্বারা গঠিত স্তরকে বলা হয় সিয়াল; কারণ সিলিকা ও অ্যালুমিনিয়াম এর প্রধান উপাদান) এবং মহাসাগরের তলদেশ সিমা দিয়ে তৈরী (অপেক্ষাকৃত ভারী ব্যাসাল্ট জাতীয় শিলা দ্বারা গঠিত স্তরকে সিমা বলা হয়; কারণ এর প্রধান উপাদান হচ্ছে সিলিকা ও ম্যাগ্নেসিয়াম)। মহাসাগরের তলদেশে সিয়াল পাওয়া যায় না, কেন সে বিষয়ে এই প্রকল্পে কোন আলোচনা করা হয় নি। আরও

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, পৃথিবীর ন্যায় বিশাল আয়তন ও ভরবিশিষ্ট ঘূর্ণায়মান চতুস্তলক হবে একটি দুস্থিত বস্তু এবং কালক্রমে এই ঘূর্ণায়মান চতুস্তলক একটি সুস্থিত গোলকে পরিণত হবে। কাজেই ভূ-গোলকের চতুস্তলকীয় রূপ পরিগ্রহ করা সম্ভব কিনা সে, বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

এরপর ওয়েগ্‌নার প্রচার করেন যে, নিম্নস্থিত সিমা-র মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হওয়ার ফলেই মহাদেশগুলিকে আমরা এদের বর্তমান আপেক্ষিক অবস্থানে দেখছি। তিনি দেখলেন যে, আটলান্টিক মহাসাগরের উভয় দিকের ভূখণ্ডে শিলা-রাশির ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস, গঠন ও মধ্যস্থিত জীবাশ্ম প্রভৃতির বিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তাছাড়া এই দুটি বিপরীত ভূভাগের তটরেখা সহজেই পরস্পরের সঙ্গে খাপ খায়। এসব তথ্য থেকে ওয়েগ্‌নার বললেন যে, কার্বনিফেরাস যুগে (প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে) বিভিন্ন মহাদেশগুলি পরস্পর নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল। উত্তরার্ধের মহাদেশগুলি (ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকা) মিলে লউরেসিয়া নামে এক বিস্তৃত ভূভাগ ছিল। সেরূপ দক্ষিণার্ধের মহাদেশগুলি (দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া) মিলে গণ্ডোয়ানা নামে এক বিশাল ভূখণ্ড রচনা করেছিল। এই দুটি ভূভাগের মধ্যে ছিল টেথিস নামে এক সাগর। ওয়েগনার উত্তর ও দক্ষিণের এই মিলিত ভূখণ্ড দুটির নাম দিয়েছিলেন—প্যানগিয়া। ক্রমে প্যানগিয়া বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং খণ্ডিত অংশগুলি বিষুবরেখা ও পশ্চিমদিকে অনুভূমিকভাবে সঞ্চালিত হয়।

মেরুদেশ অপেক্ষা বিষুবরেখায় আকর্ষণ শক্তির টান বেশী। ওয়েগ্‌নারের মতে, আকর্ষণের এই বৈষম্যের দরুণ ভূখণ্ডগুলি বিষুবরেখার দিকে সঞ্চালিত হয়। ভূখণ্ডগুলির উপর চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের বৈষম্যই এদের পশ্চিমদিকে সঞ্চালনের কারণ। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের তারতম্যের জন্যে ভূখণ্ডগুলির সঞ্চালিত হওয়া সম্ভব কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং অনেকের মতে, ভূখণ্ডগুলির সঞ্চালনের জন্যে আমাদের জানা কোন প্রকার বলই যথেষ্ট নয়।

পরিশেষে আর্থার হোম্‌স্ জল ও স্থলভাগের অসম বিন্যাসের ব্যাখ্যা দিলেন তাঁর 'পরিচলন-প্রবাহ প্রকল্পে'। তরল ও গ্যাসীয় পদার্থসমূহ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ তাপ-পরিবাহী। এদের মধ্যে দিয়ে পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ প্রবাহিত হয়ে থাকে। এসব পদার্থকে উত্তপ্ত করলে তাদের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা উচ্চ তাপমণ্ডল থেকে নিম্ন তাপমণ্ডলের দিকে সঞ্চালিত হয় এবং এভাবে উচ্চ তাপ-বলয় থেকে নিম্ন তাপ-বলয়ের দিকে একটি প্রবাহের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডল গলিত ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরী এবং উপরিভাগে আছে কঠিন ভূ-ত্বক। ভূ-কেন্দ্র ও ভূ-ত্বকের মধ্যবর্তী স্থানে আছে সান্দ্র সিলিকেটে তৈরী একটি বলয়। সিলিকেট ক্ষীণ তাপ-পরিবাহী। এই সান্দ্র মণ্ডলের মধ্যে দিয়ে পরিচলন-প্রবাহের দ্বারা তাপ প্রবাহিত হয়ে থাকে। পরিচলন প্রবাহ এই বলয়ের নিম্নভাগ (উচ্চ তাপযুক্ত স্থান) থেকে উপরিভাগের (নিম্ন তাপযুক্ত স্থান) দিকে প্রবাহিত হয়। এর ফলে সিয়াল দ্বারা গঠিত ভূভাগের উপর একটা টান অনুভূত হয় এবং সিয়াল বিভিন্ন খণ্ডে ভেঙে পড়ে। যে সব স্থানে এরূপ দুটি নিকটবর্তী পরিচলন-প্রবাহ মিলিত হয়, সে সব স্থানে এই প্রবাহ কর্তৃক আনীত খণ্ডগুলি সংগৃহীত হয়। এভাবে পরিচলন-প্রবাহের মিলনস্থলে সিয়াল খণ্ডের সমাবেশে মহাদেশগুলির সৃষ্টি হয়েছে এবং মধ্যবর্তী স্থানগুলি থেকে সিয়ালের অপসারণের ফলে সিমা-র দ্বারা গঠিত মহাসাগরের তলদেশ তৈরী হয়েছে। এই প্রকল্পের সাহায্যে সিয়াল ও সিমা-র আপেক্ষিক অবস্থান সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ভূ-পৃষ্ঠে জল ও স্থলভাগের বিন্যাস আলোচনায় এই প্রকল্পই এখন সর্ববাদীসম্মত।

শিশুর আবেগ

শ্রীমতী গায়ত্রী মুখার্জী

শিশু পৃথিবীতে এসে প্রথম এক মাস ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়; কারণ সে এখানে আসবার আগে দশ মাস দশ দিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। তাই জড় বস্তুর জাড্যগুণের মত তার মোহের ঘোর কাটাতে একটু সময় লাগে। শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত পদার্থের গতি বা স্থিতির যেমন কোন পরিবর্তন সম্ভব হয় না, শিশুকেও তেমনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংঘাত থেকেই ঘুমের ঘোর কাটাতে হয়। প্রথম অবস্থায় শিশুর জাগরণের সময় তার চাউনির মধ্যে থাকে উদাস ভাব। সাধারণতঃ শিশুর জাগ্রত অবস্থা ও খোস-মেজাজের সময়ে চাউনির মধ্যে এই উদাস ভাবটি পরিলক্ষিত হয়। যখন সে ক্ষুধার্ত হয় বা অন্য কোন অস্বস্তি বোধ করে তখন সে কাঁদে, তার সমস্ত শরীর রক্তিমাভ হয়ে ওঠে, হাত-পা মোচ্‌ড়াতে বা ছুড়তে থাকে। যেই কোলে নেওয়া হয়, অমনি যেন যাদুমন্ত্রের ছোঁয়া লেগে তার কান্না থেমে যায় এবং অস্থির ভাবটা কমে গিয়ে শান্ত হয়ে আসে। সদ্যজাত শিশুর আবেগ প্রকাশ পায় হাসি ও কান্নার মাধ্যমে। তারপর দিন দিন যত সে বড় হতে থাকে, আবেগ ও অনুভূতি ততই স্পষ্ট হতে থাকে।

দু-মাস বয়স থেকে শিশু হাসে, যখন কোন লোক তার দিকে এগিয়ে আসে। সে চায় লোক-জন তার কাছে থাকুক এবং খেলা করুক। বয়স বেড়ে ছ-মাসের কাছাকাছি গেলে দেখা যায়, শিশু আর অচেনা-অজানা লোক দেখে খুসী হয় না। মুখখানা যেন কালো মেঘের মত হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে চোখ থেকে নেমে আসে জলের ধারা। সবারই যে চোখ থেকে জল পড়ে তা নয়; তবে মুখে একটা থম্‌থমে ভাব থাকে। এরপরই অন্যান্য আবেগগুলি, যেমন—ক্রোধ, ভয়, ঘৃণা, ক্লেশ, আত্মাভিমান, ভালবাসা ইত্যাদি শিশুর মধ্যে দেখা যায়।

সাত মাস থেকে সে খেলা করতে ভালবাসে এবং খুব খুসী হয়ে জোরে জোরে হাসে। নয় মাস বয়সে দেখা যায়, খেলনা বা বালিশ দিলে সে আবার সেটা ফিরিয়ে দেয় এবং এই দেওয়া-নেওয়া খেলায় তার খুব আনন্দ হয়। এই সময় সে যখন যা চায়, সেটা না দেওয়া হলে তার অসন্তুষ্টির ভাবটা ধরা পড়ে। কোন জিনিষ লুকিয়ে রেখে তাকে খুঁজাতে বললে সে খুব খুসী হয় এবং সে খেলাই সে বারবার করে যেতে চায়। বড়রা বিরক্তি বোধ করে, শিশুরা কিন্তু বিরক্ত হয় না। শিশুকে কোন জায়গায় আটকে রাখলে তার অসন্তুষ্টির ভাব দেখা যায় এবং সেই জায়গা থেকে তাকে যদি সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে কান্নাকাটি করে।

প্রায় এক বছর বয়স থেকে সে আদর পেতে চায় এবং আদর করে জড়িয়ে ধরে চুমু দেয় তার ভিজে ভিজে মুখে এবং খুব খুসী হয়ে ওঠে। গান শুনে গান করতে চায় এবং শিশুসুলভ কবিতা, যাতে সুর আছে সেগুলি শুনতে ভালবাসে এবং শোনালে খুব আনন্দ পায়। একঘেয়ে সুর বা কাজ পরিণত বয়স্ক মানুষের বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে, কিন্তু শিশু তাতেই আনন্দে উল্লাসিত হয়ে ওঠে। ক্ষুধা, ব্যথা এবং কর্কশ শব্দের মধ্য থেকে আবেগ গড়ে ওঠে। হঠাৎ যদি শিশুকে নাড়া দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে, শিশু ভয় পেয়ে হাত দুটো উপরে উঠিয়ে দিচ্ছে।

শিশুর জীবন সুরু হয় কান্নার মধ্য দিয়ে।

কান্নাই শিশুর একমাত্র অভিব্যক্তি, যা দিয়ে সে তার প্রায় সব রকম আবেগই প্রকাশ করে; যেমন—ক্ষুধা, ব্যথা ও অসন্তোষ। শিশু নিজের অসুবিধা বুঝাতে পারে না বলে কাঁদে। সুতরাং কান্নাটাই হলো লক্ষণ এবং এরই মারফতে আমরা জানতে পারি, শিশুটি কেন কাঁদছে এবং মূল কারণটি ধরা পড়বে—তার পেট ব্যথা করছে, না অন্য কিছু হয়েছে। দিনের পর দিন যদি শিশুকে লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে, শিশুর কান্না একটা সামঞ্জস্য রেখে কি রকম ভাবে কমে যায় আর তার বদলে নানারকম আবেগ ও অনুভূতির সৃষ্টি হয়। শিশু যখন প্রথম কাঁদে তখন তার চোখে জল দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার পরে শিশুর চোখের কোণে জল আসে, শিশু ফুঁপিয়ে কাঁদে ও নানারকম শারীরিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়।

শিশুর ক্রোধও দেখা যায়, যখন সে অল্প কয়েক দিনের থাকে। কিন্তু তখন আমরা তাকে ক্রোধ না বলে, বলি শিশু মেজাজ দেখাচ্ছে। এই মেজাজই পরে ক্রোধের রূপ নেয়। ক্রোধের সময় শিশু তার হাত-পা ছোঁড়ে এবং শরীরটাকে বাঁকিয়ে ফেলে। ১৫-১৬ মাসে সে নিজেকে বয়স্কদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে চায়। ১৮ মাসে সে কাঁদে, লাফায় এবং মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। ক্রুদ্ধ হলে সে অস্থির হয়ে ওঠে আর তখন তাকে সংযত করা খুবই মুস্কিল হয়।

২১ মাস বয়সে ক্রোধ প্রকাশ পায় একটু অন্য রকম রূপ নিয়ে। বয়স্কদের কাছে হয়তো তার ক্রোধের কারণটা কিছুই নয়, কিন্তু শিশু তাকেই কারণ করে গড়ে তোলে; যেমন—শুতে যাবার আগে কতকগুলি ধারাবাহিক কাজ করতে হয়। তার যদি কোন একটা কাজ বাদ দেওয়া হয় তাহলে দেখা যায়, শিশু ক্রুদ্ধ হয়েছে—হয় সে বাধা দেয়, নয় তো চীৎকার করে।

দুই বা আড়াই বছরের শিশুদের মধ্যে সাধারণতঃ ক্রোধ তখনই দেখা যায়, যখন তাকে কোন কাজে বাধা দেওয়া হয় অথবা তার জিনিষ যদি কেউ নিয়ে যায়। জিনিষ ছুঁড়ে ফেলে বা নষ্ট করে ক্রোধ প্রকাশ করে। কেউ খেলনা কেড়ে নিয়ে ফিরিয়ে না দিলে শিশু মেরে, কামড়ে জোর করে সেটা নিয়ে আসে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, পরহস্তগত জিনিষ উদ্ধারে শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার কমে আসে এবং ভাষার সাহায্যে ক্রোধ প্রকাশ করে। যেমন, ক্রুদ্ধ হলে কোন কোন শিশু বলে—তোমায় মেরে ফেলবো বা কেটে ফেলবো ইত্যাদি।

শিশু এই সংসারে আসে পরনির্ভরশীল হয়ে, তাই তার অনুভূতি ও আবেগের অংশগুলি তার মায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। জীবনে মায়ের এই অবদানের তুলনা নেই। মায়ের স্নেহ-ভালবাসা নিয়ন্ত্রণের উপর শিশুর আবেগ ও অনুভূতি গড়ে ওঠা নির্ভর করে। মানুষ ভালবাসতে চায় এবং সে অন্যকে ভালবাসে। তেমনি শিশুও তার মাকে ভালবাসে এবং সে চায় তার মা-ও যেন তাকে ভালবাসে। ভালবাসা না পেলে এবং ভালবাসতে না পারলে শিশুর মধ্যে ক্রোধ, দুঃখ, ঘৃণা ও ভয় ধীরে ধীরে বিকৃত হয়ে ক্রমবিকশিত হতে থাকে। বড় হয়ে যখন বিদ্যালয়ে যায়, তখন সে আশা করে, শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীরা তার মায়ের মত স্নেহ করবে এবং তারাও তাদের মায়ের মত ভালবাসবে। এই সময়ে স্নেহ-ভালবাসার অভাবে অনেক শিশুই পূর্ণতর মানসিক জীবন ভোগ করতে পারে না। শিশুর মানসিক বৃত্তি বা উৎকর্ষ বিধানের ব্যবস্থা করতে না পারলে সমাজের ভার বাড়িয়ে তোলা হয়। তবে কি শিশুকে আদর দিয়ে মাথায় তুলে রাখা হবে? না, তাও নয়। কারণ অতিরিক্ত স্নেহ, ভালবাসা পেলেও শিশুরা বিকৃত হয়ে যায়। তারা উচ্ছৃঙ্খল ও স্বার্থপর হয়ে ওঠে এবং অপরকে উৎপীড়ন করতে ভালবাসে। স্নেহ-ভালবাসা যতটুকু পেলে সে স্বাভাবিক অবস্থায় পূর্ণতার দিকে এগিয়ে

যেতে পারে তার দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

মায়ের অনুভূতি ও প্রকাশ-ভঙ্গীর উপর শিশুর অনুভূতি ও আবেগ গড়ে ওঠে। ধরা যাক—শিশু পড়ে গেছে, কিংবা সে হাসতে যাচ্ছিল, কিন্তু মায়ের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে তার হাসি মিলিয়ে গেল এবং কান্নার সুর উঠলো। হয়তো সকলেই একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন যে, শিশু একা একা খেলা করে এবং খেলা করতে গিয়ে ব্লেড দিয়ে হাত কেটে বা গরম জিনিষ ধরে হাত পুড়িয়ে ফেলেও শিশু কাঁদে না। কিন্তু কোন লোকের সামনে যদি আঘাত পায় তাহলেই কাঁদে। এর অর্থ হলো, সামনের লোকের উদ্বিগ্ন মুখের ভাব শিশুকে উতালা করে দেয় এবং তার ফলেই সে কাঁদে। অতি শৈশবে মা একটু জোরে কথা বললেই শিশুকে কাঁদতে দেখা যায়। যখন তার খুব অস্বস্তি বোধ হয় তখন মায়ের ধীর-স্থির-শান্ত হাসিমাখা মুখখানি দেখতে পেলে সেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং উল্লসিত হয়ে ওঠে।

আবেগ মানুষের অন্তরের অবস্থা এবং অনুভূতি প্রকাশিত হয় আবেগের মাধ্যমে। আবেগের সময় মানুষের যুক্তি ও বিচার লোপ পায়। কোন একটা কথা শুনে হঠাৎ রেগে যাওয়া বা লজ্জা পাওয়া ইত্যাদি আবেগের উৎস হলো কোন একটা কারণ। কারণ যে সব সময়েই একটা বাস্তব বা প্রত্যক্ষ বিষয় হবে, তার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম দেখতে পাওয়া যায় না। সহজাত প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে অনুভূতি এবং তারই অভিব্যক্তি হলো আবেগ। আবেগ জড়িয়ে থাকে সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে; যেমন—বাছুরের গায়ে হাত দিতে গেলেই গরু ঢুঁ মারতে আসে। এখানে সহজাত প্রবৃত্তি মাতৃস্নেহ হলো তার আবেগ, প্রকাশিত হলো ঢুঁ মারায়।

শিশুর দেহ ও মনের উপর আবেগের (ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি) যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। আগে এই সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই কম ছিল। মনোবিজ্ঞানের মতে, আমরা যদি শিশুর আবেগ সুসংযতভাবে চালিত না করি, তাহলে শিশুর ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

চন্দ্রে যন্ত্রপাতি প্রেরণের ব্যবস্থা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগামী দুই বৎসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির একটি প্যাকেট চন্দ্রে প্রেরণ করিবার বিষয় স্থির করিয়াছে। জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা ফোর্ড মোটর কোম্পানীর উপর যন্ত্রপাতি সমন্বিত তিনশত পাউণ্ডের এই প্যাকেটটি নির্মাণের ভার দিয়াছেন। তিন-পর্যায়ী রকেটের সাহায্যে বিরাট মহাশূন্য-যান এই প্যাকেটটিকে চন্দ্র উপগ্রহে পৌঁছাইয়া দিবে।

মহাশূন্য-যানটি যখন চন্দ্র উপগ্রহ হইতে ২০ বা ২৫ মাইল দূরে থাকিবে, তখন ব্যাঙের ছাতা বা প্যারাসুটের মত খুলিয়া এই প্যাকেটটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। যান্ত্রিক উপায়ে ইহার গতি হ্রাস করিবার ব্যবস্থাও ইহাতে থাকিবে। ছাতাটি তখন ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে ধাবিত হইবে।

চন্দ্র-পৃষ্ঠে পতন ও ধাক্কা লাগিবার ফলে যন্ত্রপাতি যাহাতে বিকল না হয় বা ভাঙ্গিয়া না যায়, সেইভাবে ইহাদের সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থাও থাকিবে।

যন্ত্রপাতির মধ্যে সিস্মোমিটার, টেম্পারেচার রেকর্ডিং অ্যাপারেটাস এবং রেডিও ট্রান্সমিটার

প্রভৃতি থাকিবে। রেডিও ট্র্যান্সমিটারটি এক মাস অথবা তাহারও বেশী সময় চালু থাকিবে।

মহাশূন্য-যানটি ঘণ্টায় ৫ হাজার মাইলের অধিক বেগে ৬০ হইতে ৭০ ঘণ্টার মধ্যে অ্যাটলাস এজেন-বি নামে রকেটের সাহায্যে চন্দ্র-পৃষ্ঠে উপনীত হইবে।

শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপ

বর্তমানে যে সকল রেডিও টেলিস্কোপ আছে, সেগুলির তুলনায় ২৫ গুণ বৃহত্তর এবং বহুগুণ শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপ নির্মাণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের রেডিও অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল অবজারভেটরীর ডিরেক্টর ডাঃ অটো স্ট্রুভ এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহাতে ১০ কোটি ডলার ব্যয়িত হইবে এবং তারকুণ্ডলীর মত ইহার অ্যান্টিনার ব্যাস হইবে দুই হাজার ফুট। গ্রহ-তারকা সম্পর্কে অতীতে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইত, তাহার তুলনায় বহু পরিমাণে অধিক ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ইহার দ্বারা সংগৃহীত হইবে।

গ্রহলোকে প্রাণীর অস্তিত্ব

বিজ্ঞানীরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অগণিত গ্রহ-তারকার মধ্যে কোন কোনটিতে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা খুবই সম্ভব বলিয়া অনুমান করিতেছেন। ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়ার গ্রীন ব্যাঙ্ক অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল অবজারভেটরীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ৮৫ ফুট ব্যাসের একটি রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে পৃথিবীর নিকটবর্তী দুইটি তারকায় বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্ধান লইতেছেন। কিন্তু ঐ তারকা হইতে কোন বেতার-তরঙ্গের পক্ষে সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে ভ্রমণ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিতে দশ বছর লাগিবে। অর্থাৎ ১৯৫০ সালে যে বেতার-তরঙ্গ ঐ তারকা হইতে প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহা ১৯৬০ সালে পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিবে।

শুক্রগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব

১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাসে যন্ত্রপাতি সমন্বিত মনুষ্যবাহী একটি বেলুন মহাশূন্যে প্রেরিত হয়। এই বেলুনটি পৃথিবী হইতে পনেরো মাইল উর্ধ্বে উত্থিত হয়। ইহার সাহায্যে সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা গিয়াছে যে, ভূপৃষ্ঠ হইতে ৭ মাইল উর্ধ্বে ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প রহিয়াছে, শুক্রগ্রহে তাহার প্রায় চতুর্গুণ জলীয় বাষ্প আছে। এই জন্যই বিজ্ঞানীরা সেখানে প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বলিয়া অনুমান করিতেছেন। আমেরিকার অপ্‌টিক্যাল সোসাইটির অধিবেশনে ডাঃ জন ষ্ট্রং এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

অভিনব টাইপরাইটার

মানুষের মুখের দশটি কথা উচ্চারিত হওয়া মাত্র সাড়া দেয়, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে এই রকম একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। যন্ত্রটির নাম ফোনেটিক টাইপ-রাইটার। নিউজার্সির, প্রিন্সটনের আর. সি. এ লেবরেটরির ডাঃ হ্যারি এম. অলসেন এই যন্ত্র সম্পর্কে বলিয়াছেন—এমন দিন শীঘ্রই আসিতেছে যখন, আমরা যেমন মানুষকে হুকুম করিয়া কাজ করাই, যন্ত্রকেও তেমনি হুকুম দিয়া কাজ করাইতে পারিব। হিসাবপত্রের ব্যাপারে এই যন্ত্রটি বিশেষ কাজে লাগিতে পারে।

বেতারযোগে মিনিটে ৪৮০০টি শব্দ প্রেরণের ব্যবস্থা

ন্যাশন্যাল ব্যুরো অব ষ্ট্যাণ্ডার্ডস জানাইতেছে যে, বেতারবার্তা প্রেরণের একটি অভিনব পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। বর্তমানে টেলিটাইপ যোগে যে গতিতে বার্তা প্রেরণ করা হইয়া থাকে, তাহার তুলনায় ৮০ গুণের অধিক দ্রুতগতিতে বার্তা প্রেরণ করা যাইবে। এই পন্থায় প্রতি মিনিটে ৪৮০০ শব্দ প্রেরণ করা সম্ভব হইবে।

পরমাণু হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন

কমনওয়েলথ এসিডন কোম্পানীর আর্থিক সাহায্যে শিকাগোর ড্রেসডেন নিউক্লিয়ার পাওয়ার ষ্টেশন বা পরমাণু হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্রটি নির্মিত হইয়াছে। এই কেন্দ্র হইতে শিকাগো অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। পরমাণু হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ইহাই পৃথিবীর প্রথম বেসরকারী কারখানা। ইহাতে বর্তমানে ৬৩০০০ কিলোওয়াট এবং বৎসরের শেষ দিকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইবে এবং ইহাই হইবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের বৃহত্তম কারখানা।

পরমাণু শক্তি-চালিত মার্কিন জাহাজ ট্রিটনের বিশ্ব-পরিক্রমা

নিউ লণ্ডন, কানেটিকাট—আমেরিকার পরমাণু শক্তি-চালিত সাবমেরিন ট্রিটন ১৮৩ জন নাবিক সহ ৮৪ দিনে সমুদ্রের তলদেশ দিয়া পৃথিবী পরিক্রমা করিয়া সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। এই জন্য ইহাকে ৪১,৫১৯ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ট্রিটন তাহার এই ঐতিহাসিক অভিযানে বাহির হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫১৯-২১) সমুদ্রের উপর দিয়া ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাজেলান প্রথম পৃথিবী পরিক্রমা করিয়া রেকর্ড স্থাপন করেন—স্পেনের ক্যাদিজে আজও তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ রহিয়াছে। যে পথ দিয়া তিনি গিয়াছিলেন, সেই পথেই ট্রিটন আটলান্টিক, প্রশান্ত, ভারত এবং মেরুসাগর হইয়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

৪৪৭'৫ ফুট দীর্ঘ ৫৩৫০ টনের ডুবো-জাহাজটি আমেরিকার ৩৭টি পরমাণু-শক্তি-চালিত ডুবো-জাহাজের অন্যতম। ১৯৫৮ সালের ১৯শে অগাষ্ট এই জাহাজটিকে জলে ভাসানো হয়।

শুক্রগ্রহ পর্যবেক্ষণে বেতার-দূরবীক্ষণ

মহাশূন্যের রহস্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে উল্লেখযোগ্য গবেষণায় ব্যাপৃত হয়েছে, শিকাগোতে মার্কিন বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির সভার এক রিপোর্টে তার মোটামুটি বিবরণ জানা গেছে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বেতার দূরবীক্ষণের সাহায্যে এই সর্বপ্রথম শুক্রগ্রহের উপরিভাগ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠদেশ পর্যবেক্ষণের কাজে বেতার-দূরবীক্ষণ অপরিহার্য। সাধারণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রে শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হয় না; কারণ এই গ্রহটি সবসময়েই ঘন মেঘের পর্দায় আবৃত থাকে। শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠদেশে বেতার তরঙ্গমালার সৃষ্টি হয়। অবশ্য এই ঘন মেঘাবরণ ভেদ করে বেতার তরঙ্গমালা গ্রহটির তাপমাত্রা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক তথ্যাদি সরবরাহ করতে পারে। এই সব বেতার তরঙ্গ যেসব সঙ্কেত-বার্তা প্রকাশ করে, সম্প্রতি তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। মহাকাশের গ্রহসমূহ ও বহুদূরবর্তী নক্ষত্রাদি থেকে যে বেতার-তরঙ্গ উত্থিত হচ্ছে, সেগুলি ধরবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন বেতার গ্রাহক-যন্ত্র নির্মাণ করা হয়েছে। এই বেতার গ্রাহক-যন্ত্রের সাহায্যেই দূরাগত বেতার-তরঙ্গের ব্যাখ্যা সম্ভব হয়েছে।

৮৫ ফুট বেতার-দূরবীক্ষণের সাহায্যে শুক্রগ্রহ সম্পর্কে যে পর্যবেক্ষণ চালানো হয়েছে, তাকে শুক্রগ্রহের কঠিন পৃষ্ঠদেশে প্রথম দৃষ্টিপাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বেতার-দূরবীক্ষণটি রয়েছে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার গ্রীন ব্যাঙ্কে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান মানমন্দিরে। এই দূরবীক্ষণের সাহায্যেই মার্কিন

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম শুক্রগ্রহের উপরিভাগ পর্যবেক্ষণ করেন। ওয়াশিংটনে মার্কিন নৌ-গবেষণাগার এই পর্যবেক্ষণ কার্যে সহায়তা করেছে।

বেতার-দূরবীক্ষণের সাহায্যে পর্যবেক্ষণের কাজ সুরু হয়েছে তিন বছর পূর্বে। শুক্রগ্রহ থেকে যেসব বেতার-তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ঐ তিন বছর গ্রহটির উপরিভাগের তাপমাত্রা ৫৮৫° ডিগ্রী ফারেনহাইটের (৩০৭° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) কাছাকাছি রয়েছে।

এ-থেকেই জানা গেছে যে, শুক্রগ্রহে বর্তমানে যে আবহাওয়া রয়েছে, তা মানুষের জীবনধারণের পক্ষে অনুকূল নয় এবং এরূপ আবহাওয়ায় মানুষের জীবনধারণ অসম্ভব বলেই মনে হয়। শিকাগো সম্মেলনে সমবেত বিজ্ঞানীরা এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

এই তথ্য আবিষ্কারের ফলে এখন বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, আমাদের সৌরমণ্ডলে পৃথিবীকে বাদ দিলে মঙ্গলই সম্ভবতঃ একমাত্র গ্রহ, যেখানে অন্ততঃ আদিম জীবনের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

১৯৬১ সালের প্রথম দিকে শুক্রগ্রহ পৃথিবীর নিকটবর্তী হবে। সে সময়ে পূর্বাপেক্ষা শতগুণ শক্তিশালী রেডার যন্ত্রের সাহায্যে শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠদেশ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে এবং নতুন তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৪০ ফুটের আর একটি দূরবীক্ষণ নির্মাণের কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায়, ১৯৬১ সালের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা এটির সাহায্যে কাজ আরম্ভ করতে পারবেন। এই সুবৃহৎ দূরবীক্ষণটি মহাকাশে বহুদূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণে সহায়তা করবে।
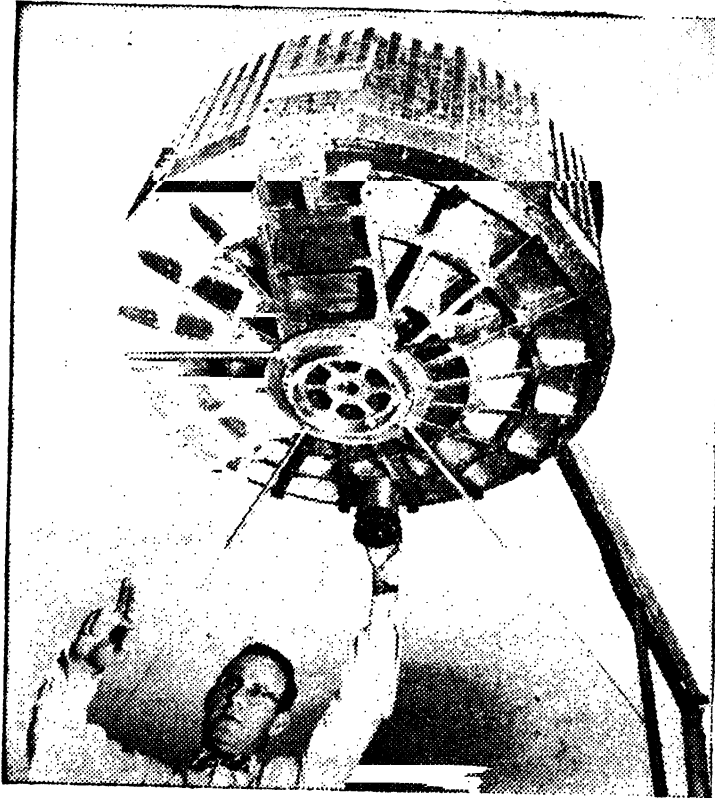
যুক্তরাষ্ট্রের দুই ক্যামেরা বিশিষ্ট কৃত্রিম উপগ্রহ টাইরোস-১। এই উপগ্রহের সাহায্যে ঊর্ধ্বাকাশের আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায়। কৃত্রিম উপগ্রহস্থিত একটি ক্যামেরার লেন্সে ছবি গৃহীত হইয়া ভূ-পৃষ্ঠস্থ কেন্দ্রে প্রেরিত হয়।

বিজ্ঞান শিক্ষক সম্মেলন

গত ৩০শে এপ্রিল ও ১লা মে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সারস্বত সঙ্ঘের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ভবনে দু-দিনব্যাপী বিজ্ঞান শিক্ষকদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং সভাপতিত্ব করেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন পরিচালক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা ও সহরতলীর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষকগণ সম্মেলনে যোগদান করেন।

প্রথম দিনের অধিবেশন

প্রথম দিন সভার প্রারম্ভে বিজ্ঞান পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ও প্রখ্যাত রস-সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর পরলোকগমনে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী নীরবে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর সারস্বত সঙ্ঘের সঙ্ঘ-সচিব শ্রীমহাদেব দত্ত এই বিজ্ঞান শিক্ষক সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থার দোষত্রুটি ও তার উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে আলোচনার জন্যেই এই সম্মেলন আহূত হয়েছে।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েরা কি ভাবে এত তাড়াতাড়ি বিজ্ঞান শিক্ষা করে এবং আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরাই বা কেন তা পারে না, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা দরকার। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যাতে তাড়াতাড়ি বিজ্ঞান শিখতে পারে, তার একটা পথ বের করতে হবে। আমি মনে করি, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করলে এটা সম্ভব হবে। উচ্চস্তরে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যাপারে আমরা এ-পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিভাষা তৈরী করতে পারি নি। কিন্তু পরিভাষার অপেক্ষায় বসে না থেকে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক শব্দগুলিকে বাংলা ভাষায় বেমালুম হজম করে নিতে হবে। আমি একবার রুশ দূতাবাসে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি করে আপনাদের দেশে এত তাড়াতাড়ি বিজ্ঞানের প্রসার হলো? উত্তরে তাঁরা বলেছিলেন, আমরা মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি এবং এ-ব্যাপারে বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি সরাসরি গ্রহণ করেছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এর ফলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রুশ দেশ আজ কতদূরে অগ্রসর হয়েছে। আমাদেরও এভাবে অগ্রসর হতে হবে।

পরিশেষে বিজ্ঞান শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক বসু বলেন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে গিয়ে আপনারা কতটা সফল হয়েছেন এবং কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত ও সুপারিশ পরিষদকে জানাবার জন্যে অনুরোধ করছি। আপনাদের কাছ থেকে প্রস্তাব পেলে আমরা এ-বিষয়ে সরকার ও মধ্যশিক্ষা পর্ষৎকে জানাতে পারবো।

ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহ তাঁর ভাষণে বলেন, দেশের ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান-অনুরাগী করে গড়ে তুলতে হবে—গল্পের মাধ্যমেই হোক বা অন্য কোন উপায়েই হোক। স্কুলের ছেলেমেয়েরা নিজের চোখে দেখে এবং হাতেকলমে কাজ করে বিজ্ঞান শিক্ষা করুক। এজন্যে পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানের কোন পাঠ্যপুস্তক না থাকলেই ভাল। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের দ্বারা

ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান শিক্ষা করলে তাদের পর্যবেক্ষণ-শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের মন বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠবে।

ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী বলেন, আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা হচ্ছে, গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালবার মত। ফলে মুখস্থ বিদ্যার দ্বারা পরীক্ষায় পাশ করা যাচ্ছে বটে, কিন্তু সত্যকার বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি গড়ে উঠছে না। শুধু বই পড়ে বিজ্ঞান শিক্ষা করা যায় না, তার জন্যে প্রয়োজন অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণ।

ডাঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায় বলেন, ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার বীজ নিহিত রয়েছে, তার অঙ্কুরোদ্গমের জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। অবস্থাবিশেষে তাদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার বীজ ঢুকিয়ে দিয়ে তার বিকাশের আবহাওয়া সৃষ্টি করে দিতে হবে। এজন্যে পাঠ্য বিষয় কমিয়ে দিয়ে হাতেকলমে কাজ করবার উপর জোর দিতে হবে।

এ-ছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত কয়েক জন শিক্ষকও তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁদের প্রায় সকলেরই মতে, একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যক্রম দীর্ঘ ও কঠিন হয়েছে এবং অধিকাংশ স্কুলে পরীক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই।

সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, আমাদের অসভ্য বর্বর না বলে ভদ্রভাষায় অনুন্নত দেশ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে আমরা তা নই। বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা ও সংস্কৃতিতে আমাদের নিজস্ব একটা ঐতিহ্য আছে, তা ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে অন্যের উপর নির্ভর করতে হবে না। তথাকথিত যে সকল বিদেশী বিশেষজ্ঞকে সরকার এদেশে আনিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকে তৃতীয় শ্রেণীর। আমাদের দেশে এখন স্কুলের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে; কিন্তু কি ভাবে অগ্রসর হবে, সেটাই হচ্ছে আসল কথা। বিজ্ঞান শিক্ষায় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা দরকার, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা খুবই প্রয়োজন এবং গ্রামের আবহাওয়ার মধ্যে তা বেশ ভালভাবেই হতে পারে। ছেলেমেয়েদের ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে হবে, তাহলে তাদের বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ বাড়বে। প্রত্যেক স্কুলে যদি একটা মিউজিয়াম রাখা হয়, তাহলে খুবই ভাল হবে। সেখানে ছেলেমেয়েরা নিজেদের পর্যবেক্ষণের জিনিষ সংগ্রহ করে রাখবে। আর একটা কথা, ছেলেমেয়েদের মন থেকে অঙ্ক-ভীতি দূর করতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষায় অঙ্ক অপরিহার্য এবং অনুশীলন করলে সকলেই অঙ্ক শিখতে পারে।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় আরও বলেন, ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদেরও শিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এক বা দু-বছর অন্তর রিফ্রেসার কোর্স প্রবর্তন করলে ভাল হয়।

পরিশেষে তিনি বলেন, বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিক্ষকেরা যেসব অসুবিধা ও অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হন, সে সম্বন্ধে তাঁরা বিজ্ঞান পরিষদকে জানাতে পারেন। শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বিজ্ঞান পরিষদ একটা স্থায়ী কমিটি গঠন করুন, যাতে এসব প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান করা যায়।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের সূচনায় অধ্যাপক বসু বলেন, গতকাল যে আলোচনা হয়েছিল তা থেকে একটা জিনিষ বোঝা যাচ্ছে, পরীক্ষা-ভীতি দূর করতে না পারলে বিজ্ঞান শিক্ষা এগুবে না। এ-প্রসঙ্গে আইনষ্টাইনের একটা কথা আমার মনে পড়ে। তিনি তাঁর জীবন কাহিনীতে এক জায়গায় বলেছেন—পরীক্ষার বাইরে বিজ্ঞান বিষয়ে আমার মন মেতে থাকতো, পরীক্ষাকে উপেক্ষা করেই আমি বিশ্বজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের

চাবিকাঠি পেয়েছিলাম। আমাদের দেশকে যদি আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে পরীক্ষার জন্যে সর্বশক্তি ক্ষয় না করে প্রকৃত জ্ঞান আহরণের দিকে নজর দিতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জগতের ইতিহাস শিখতে হবে, নানা দেশের বিজ্ঞানীদের জীবনী পড়ানো উচিত, সাধারণ জ্ঞানও শেখানো উচিত। আমাদের এই আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত—আমি যে জিনিষটা বুঝেছি, সেটা অপরকে বাংলা ভাষায় যেন বুঝিয়ে দিতে পারি।

ডাঃ সতীশরঞ্জন খাস্তগীর বিজ্ঞান শিক্ষায় পরিভাষা প্রসঙ্গে বলেন, বিজ্ঞানের কথাগুলিকে আমরা দুটা ভাগে ভাগ করতে পারি—বস্তুবাচক ও গুণবাচক। বস্তুবাচক শব্দগুলির যথাসম্ভব আন্তর্জাতিক পরিভাষা গ্রহণ করাই ভাল, তবে গুণবাচক শব্দগুলির যতদূর সম্ভব বাংলা পরিভাষা করে নিতে হবে। অবশ্য পরিভাষা সম্বন্ধে একটা নিয়ম মেনে চলা উচিত। বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের পক্ষে একটা প্রধান অন্তরায়, উপযুক্ত পুস্তকের অভাব। উপযুক্ত বই না হলে বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা অগ্রসর হবে না। এ-বিষয়ে পরিষদকে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, পরীক্ষার চাপ যতদিন থাকবে ততদিন বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হবে না। উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার যে পাঠ্যক্রম রচিত হয়েছে তাতে অসঙ্গতি রয়ে গেছে, যার ফলে ছাত্রদের পরবর্তীকালে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গেলে শিক্ষকদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। শিক্ষকেরা অনেক সময় বুঝতে পারেন না—যাদের তাঁরা পড়াচ্ছেন তাদের গ্রহণ করবার ক্ষমতা কতখানি। সেটা ভালভাবে উপলব্ধি করে তাঁদের শিক্ষা দিতে হবে।

ডাঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায় উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন, পর্ষৎ নির্দেশ দিয়েছেন, বিজ্ঞান শিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু বর্তমানে অনার্স গ্র্যাজুয়েট পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণে ডিষ্টিংশনপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদের যদি এ-বিষয়ে সুযোগ দেওয়া হয়, তবে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব পূরণ হতে পারে।

সম্মেলনে উপস্থাপিত ও সমর্থিত অভিমত

(১) সুষ্ঠু সাবলীল পরিভাষা প্রণয়ন ও ব্যবহার করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি সরাসরি গ্রহণ করা উচিত। ছাত্র ও শিক্ষকদের নিত্য আলোচনার ভাষা এবং কারিগরদের (টেকনিশিয়ান) ভাব বিনিময়ের ভাষা হইতে পরিভাষা গড়িয়া তুলিতে হইবে। দুরূহ পরিভাষা যতদূর সম্ভব পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।

(২) বর্তমানে বিজ্ঞান-শিক্ষা, পুস্তকের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল। ছাত্রছাত্রীরা পুস্তক হইতে তথ্যাদি আহরণ করিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং তাহার ফলে নিজেদের সহজাত বৈজ্ঞানিক মনোভাব নষ্ট করিয়া ফেলে। পুস্তকের উপর গুরুত্ব কমাইয়া ছাত্রছাত্রীদের নিজের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মন গঠন করিতে হইবে।

(৩) শিক্ষাক্ষেত্র হইতে বর্তমান পদ্ধতিতে পরীক্ষার প্রভাব যথাসম্ভব হ্রাস করিতে হইবে। বর্তমান পদ্ধতিতে পরীক্ষার দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তার ক্ষমতা বিচার করা যায় না, পরন্তু উহা বৈজ্ঞানিক মন গঠনে বাধা সৃষ্টি করে।

(৪) বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি হইতেছে এবং উন্নতির সহিত মূল দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হইতেছে। সুতরাং বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান সংস্থাগুলির পক্ষ হইতে নিয়মিত বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা এবং বিজ্ঞান

শিক্ষকদের অল্প সময়ে শিক্ষণের নিয়মিত ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

(৫) নূতনভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার (উপরিউক্ত সুপারিশ অনুযায়ী) উপযুক্ত পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতে হইবে, সম্ভব হইলে বিশেষজ্ঞদের কমিটি কর্তৃক এই বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ ও পুস্তক রচনা করা কর্তব্য।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা, কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সারস্বত সংঘের একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। বর্তমানে এই বিষয়ে কার্যাদি চালাইবার জন্য একটি অস্থায়ী কমিটি (১৫ জন) গঠিত হউক। কমিটিতে আছেন—

(১) অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, (২) ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহ, (৩) ডাঃ সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, (৪) ডাঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়, (৫) ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, (৬) অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, (৭) শ্রীমহাদেব দত্ত, (৮) শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, (৯) শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, (১০) শ্রীরাধিকামোহন বাগচী, (১১) শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি। পরে আরও চারজন শিক্ষক প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইবে।
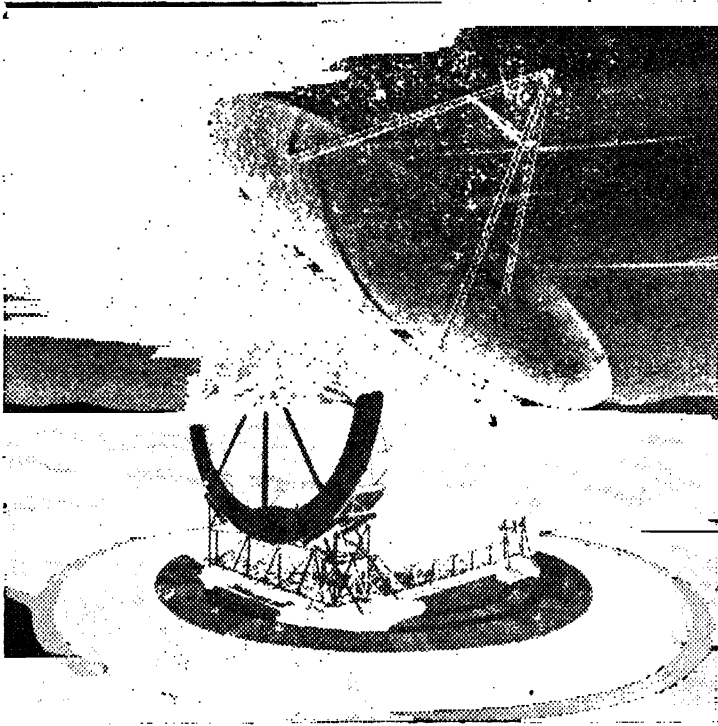
পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সক্রিয় রেডিও টেলিস্কোপের নক্সা। এই টেলিস্কোপটি যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভার্জিনিয়ার অন্তর্গত সুগার গ্রুভের কাছে নৌ-বিভাগের গবেষণার জন্য নির্মাণ করা হইতেছে। এই টেলিস্কোপের দ্বারা ৩৮ বিলিয়ন আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে আগত বেতার সঙ্কেত সংগ্রহ করা যাইবে। সমস্ত যন্ত্রপাতি সহ এই টেলিস্কোপটির ওজন প্রায় ২০,০০০ টন। ৬০০ ফুট ব্যাসের ইহার একটি প্রতিফলক ডিস থাকিবে। ৫৫ তলা বাড়ী অপেক্ষাও ইহা উচ্চতায় বেশী হইবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে—১৯৬০

১৩শ বর্ষ ঃ ৫ম সংখ্যা

সোভিয়েট রাশিয়ায় নির্মিত 'নেভা' নামক নূতন ধরণের ক্যামেরা। সখের ছবি, শিক্ষা ও গবেষণামূলক ছবি এই ক্যামেরার সাহায্যে তোলা যায়। ইহার ফ্রেমের মাপ ৩.৫৫ × ৪.৯ মিলিমিটার। প্রতি সেকেণ্ডে এই ক্যামেরায় ৮, ১৬, ২৪ ও ৪৮ খানা ছবি তোলা যায়; অর্থাৎ ইহার সাটারের চারিটি বেগ আছে। ইহার বীক্ষণ কাচের মান হইল এফ-১.৯ × ১২.৫ মিলিমিটার। ক্যামেরাটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, আলোকরশ্মির প্রভাবে উহা নিজে নিজেই সাটারের নির্দিষ্ট চারিটি বেগের যে কোন একটিতে চিত্রগ্রহণের সময় আলোক প্রবেশের ছিদ্র প্রয়োজনমত ছোট-বড় করিতে পারে।
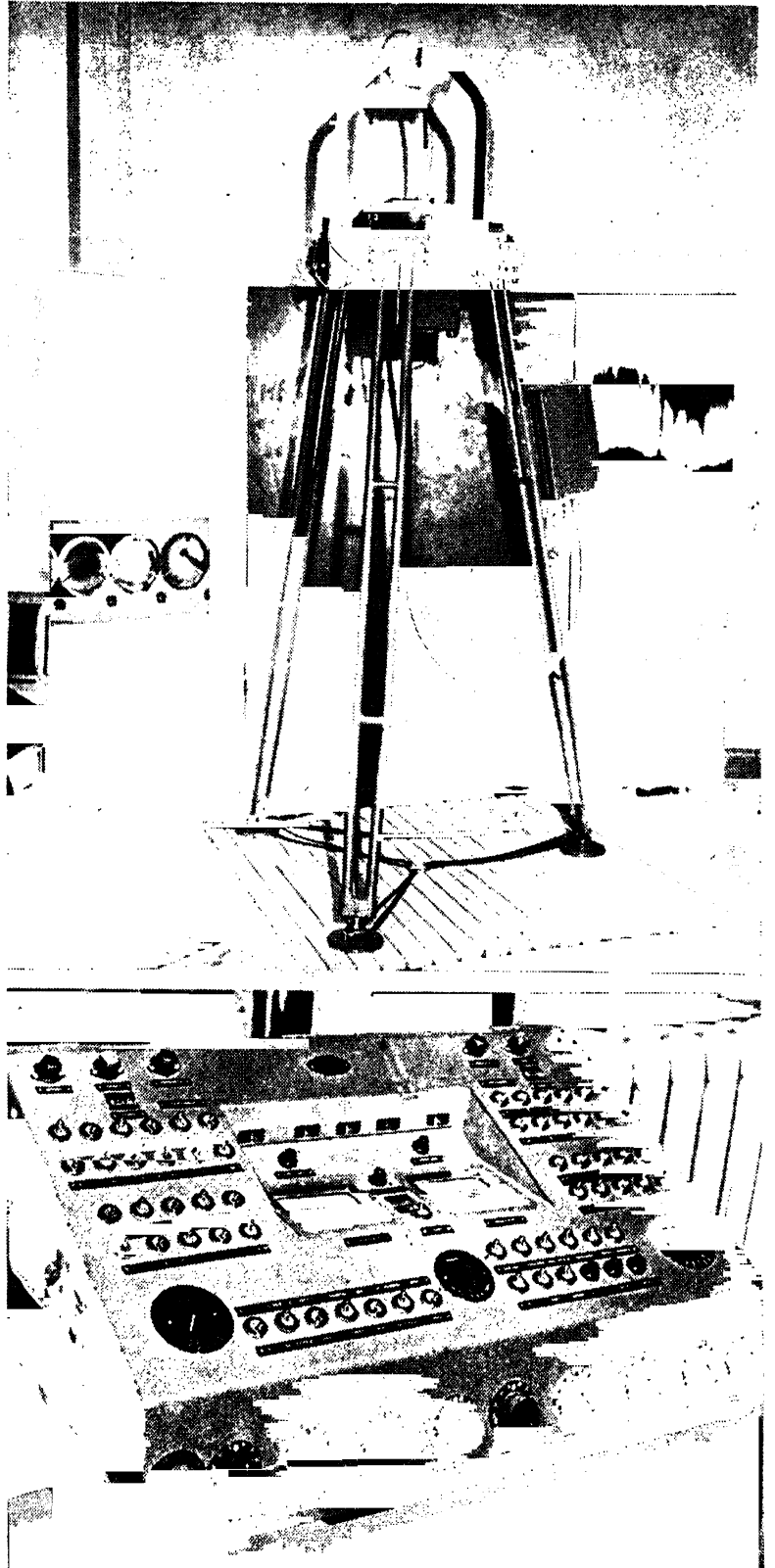
মেঘ-ঝড়-বৃষ্টি

মেঘ-ঝড়-বৃষ্টির দিন এসে গেল বলে। বৈশাখ মাসই তুরন্ত কালবৈশাখীর আবির্ভাবের সময়। কালবৈশাখী বিদায় নিলে আকাশে দেখা দেয় বর্ষার ঘন কালো মেঘ। তখন চারদিকে জল আর জল। মনে হবে, গোটা আকাশটাই যেন ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

বছরের পর বছর যাবে ঘুরে। সেই সঙ্গে মেঘ-ঝড়-বৃষ্টিও পৃথিবীর বুকে একবার আসবে, তু'দিন খেলা করবে, আবার যাবে চলে। এমনি ভাবে যাতায়াত করে বলেই ওদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অতি নিবিড়। তাই ওরা কে, কোথা থেকে আসে, কি করে, কোথায় যায়—এ সব আমাদের জানা দরকার।

মেঘ এলো কোথা থেকে? পৃথিবীর উপরে আমরা মেঘকে ঘুরে বেড়াতে দেখি। মেঘের জন্ম হয় পৃথিবীর বুকে। এই যে পৃথিবী, যেখানে আমরা বাস করি, তার সবটাই স্থল নয়। জলের ভাগটাই বেশী। এখানে তিন ভাগ জল আর একভাগ স্থল।

আকাশের ঐ যে সূর্য সারাদিন ধরে আলো দিচ্ছে—ওরই তাপে পৃথিবীর জল বাষ্পে পরিণত হচ্ছে। বাষ্প তোমাদের অপরিচিত নয়। উনুনের উপর কেট্‌লীতে যখন চায়ের জল ফোটে, তখন কেট্‌লীর মুখ থেকে যে সাদা ধোঁয়া বেরোয়, সেটাই হলো বাষ্প, অর্থাৎ জলীয় বাষ্প।

পৃথিবীর বুকে আছে সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল ও পুকুর। সূর্যের তাপ পেয়ে এদের জল দিনের বেলায় বাষ্পে পরিণত হচ্ছে—আর মিশে যাচ্ছে বাতাসের সঙ্গে। জলীয় বাষ্প বাতাসের চেয়ে হাল্কা। কাজেই যে বাতাসে জলীয় বাষ্পের ভাগ বেশী, সে বাতাসও তত হাল্কা। হাল্কা জিনিষ উপরে ওঠে—এ তো তোমরা জানই। কাজেই জলীয় বাষ্পে ভরা বাতাস তাড়াতাড়ি উপরে উঠে যায়। বাতাসে আবার মিশে থাকে অজস্র ধূলিকণা। জলীয় বাষ্পকণাগুলি তাদের ওপর ভর করে আকাশে উড়ে বেড়ায়। এমনিভাবে বাতাসে ভাসমান জলীয় বাষ্পকণাগুলিকেই আমরা বলি মেঘ।

আকাশে কত রকমের মেঘ থাকে? আকাশের দিকে লক্ষ্য কর। দেখবে, বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রং ও বিভিন্ন আকারের মেঘ আনাগোনা করছে। কোনটা সাদা, কোনটা কালো—কোনটা পাখীর পালকের মত, কোনটা বা স্তূপীকৃত তুলার মত। বিভিন্ন আকারের মেঘের নামও বিভিন্ন।

(ক) অলক মেঘ: এ মেঘ দেখতে অনেকটা পাখীর পালকের মত। রং সাদা। সূর্য ওঠবার সময় এবং অস্ত যাবার সময় যে লাল আভাযুক্ত আলো দেখা যায়, তার ছোঁওয়া লেগে এ মেঘ আকাশে এক অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। অলক মেঘ

ভূমি থেকে কমপক্ষে পাঁচ-ছ' মাইল উঁচুতে থাকে। অলক মেঘ থেকে কখনও বৃষ্টি হয় না।

(খ) স্তর মেঘঃ শরৎ এবং শীতের রাতে আকাশের দিকে তাকাও। দেখবে সাদা রঙের মেঘ আকাশের গায়ে কে যেন স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখেছে! সূর্য অস্ত যাবার পর, অর্থাৎ সন্ধ্যার আকাশে ওদের সাক্ষাৎ মিলবে। তবে ভোরে, সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা কিন্তু মিলিয়ে যায়। অলক মেঘের মত স্তর মেঘের দল আকাশের অত উঁচুতে থাকে না।

স্তূপ মেঘঃ তুলার স্তূপ দেখেছ? তুলার স্তূপের মত দেখতে এক রকমের মেঘ দেখতে পাবে গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালের আকাশে। এদেরই নাম স্তূপ মেঘ। গ্রীষ্ম-কালে বিকালের দিকে কখনও কখনও এরূপ মেঘ থেকে বৃষ্টি হতে দেখা যায়।

বাদল মেঘঃ বাদল মেঘ বাদলা দিনের বা বর্ষাকালের মেঘ। ঘন কালো এর রং। আকাশের অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে। ভূমি থেকে বেশী উপরে থাকে না। এই মেঘ জলে ভরা। বর্ষার আকাশ থেকে ধারা বর্ষণ করে ওরাই। বড় ভাল লাগে, আকাশে এই বাদলা দিনের কালো মেঘের আনাগোনা দেখতে।

মেঘ থেকে বৃষ্টি কি ভাবে হয়? মেঘের কথা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির কথাও মনে পড়ে যায়। কারণ মেঘ থেকেই তো বৃষ্টি হয়। কিন্তু সব মেঘ থেকেই যে বৃষ্টি হবে, এমন কোন কথা নেই। যেমন অলক মেঘ। এই মেঘ থেকে কখনও বৃষ্টি হয় না— একথা একটু আগেই বলেছি। তোমরা হয়তো এখন ভাবছ যে, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় কি ভাবে? শোন তবে বলি সে কথা।

মেঘে থাকে জলীয় বাষ্পকণা। এই বাষ্পকণা ধূলিকণার উপর ভর করে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। মেঘ থেকে বৃষ্টি হতে হলে দুটি জিনিষ দরকার। প্রথমতঃ মেঘের জলীয় বাষ্পকণার আকৃতি, বাহক ধূলিকণার চেয়ে বড় হওয়া চাই। সমান বা ছোট হলে চলবে না। দ্বিতীয়তঃ ঐ জলীয় বাষ্পকণা যথেষ্ট শীতল হওয়া দরকার। কিন্তু শীতল হবে কি করে?

তোমরা হয়তো জান যে, যতই উপরে যাওয়া যায় ততই ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। কারণ উপরের আবহাওয়া নীচের আবহাওয়ার চেয়ে ঠাণ্ডা। কলকাতা থেকে দার্জিলিং সহর অনেক উঁচুতে। হাজার ছয়েক ফুট উঁচুতে। দার্জিলিং-এ গিয়ে দেখ, সেটা কলকাতা থেকে কত ঠাণ্ডা জায়গা। মেঘের বেলায়ও তাই। মেঘ যত উঁচুতে ওঠে, ততই ঠাণ্ডা হয়। বেশী ঠাণ্ডা হলেই মেঘের মধ্যেকার জলীয় বাষ্পকণাগুলি জলে পরিণত হয়। জলকণা ভারী বলে তখন আর সে বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে না, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে নীচে নেমে আসে। একেই আমরা বলি বৃষ্টি।

মেঘের নাম শুনলে যেমন বৃষ্টির কথা মনে পড়ে, তেমনি ঝড়ের কথাও মনে পড়ে'

যায়। কারণ অনেক সময় দেখবে, আকাশে মেঘের আবির্ভাব হলো, আর তার পরেই ঝড়—প্রচণ্ড ঝড়। চারদিকে প্রলয় কাণ্ড স্থুরু হয়ে গেল। ঘরের চাল গেল উড়ে, গাছপালা গেল ভেঙ্গে—সহরে টেলিফোনের তার গেল ছিঁড়ে। কালবৈশাখীর ঝড়ের এমনি রুদ্রমূর্তি তোমরা তো প্রতি বছরই দেখে থাক। যাহোক—ঝড় কেন হয়, তাই এবার বলি।

ঝড় কেন হয়? একটা প্রবাদ বাক্য আছে, শুনেছ বোধ হয়—

আগুন জ্বলে যেখানে,
ঝড় বয়ে যায় সেখানে।

কোথাও আগুন লাগলে বাতাস সেদিকে জোরে ছুটতে থাকে। এর কারণ কি? কারণ বাতাস গরম হলেই হাল্কা হয়, আর হাল্কা হলেই উপরে উঠে যায়। যে বাতাস উপরে উঠে গেল, তার স্থান তো আর শূন্য থাকতে পারে না। তাই সেই শূন্য স্থান পূরণের জন্যে ভারী ও ঠাণ্ডা বাতাস সেদিকে ছুটে আসে। গরম বাতাসের উপরে উঠে যাওয়া এবং সেদিকে ঠাণ্ডা বাতাসের জোরে ছুটে আসা—এরই ফলে ঝড়ের সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীতে নিয়ত এরূপ ব্যাপার ঘটছে। দিনের বেলায় সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ভূ-পৃষ্ঠের কোন অংশ হয়তো খুব বেশী উত্তপ্ত হলো। সেখানকার বাতাস হাল্কা হয়ে উপরে উঠে গেল। শূন্য স্থান পূরণের জন্যে আশেপাশে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবল বেগে ছুটে এলো। তারই ফলে সৃষ্টি হলো ঝড়ের।

শ্রীঅমরনাথ রায়

টুয়াটারা

ঘরের দেয়ালে, আনাচে-কানাচে যেসব টিকটিকি দেখা যায়, সেগুলি একজাতের সরীসৃপ। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী আবির্ভূত হয়েছিল কোটি কোটি বছর পূর্বে এবং এক সময়ে বহু যুগ পর্যন্ত বিচিত্র আকৃতির বিভিন্ন জাতীয় সরীসৃপেরাই পৃথিবীর বুকে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এদের মধ্যে অনেকেই নানা কারণে পৃথিবীর বুক থেকে লোপ পেয়ে গেছে অনেক কাল আগে। অনেকে আবার বংশধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। এখন তোমাদের এ-রকম একটি প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের বর্তমান বংশধরের কথা বলছি। এই সরীসৃপের নাম হলো টুয়াটারা।

সরীসৃপের মধ্যে টুয়াটারা রিনকোসেফালিয়া গোষ্ঠীভুক্ত। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সরীসৃপেরা ২০০,০০০,০০০ বছর পূর্বে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একমাত্র

টুয়াটারা আজও পৃথিবীতে বেঁচে আছে। নিউজিল্যাণ্ড ব্যতীত পৃথিবী আর কোথায়ও এদের দেখা যায় না—তাও অতি অল্প সংখ্যায়। টুয়াটারা আজও যে পৃথিবীতে তাদের বংশধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে, বিজ্ঞানীরা সে জন্যে তাকে জীবজগতের একটা বিস্ময় বলে অভিহিত করেছেন। কারণ টুয়াটারার পূর্বপুরুষেরা হলো ডাইনোসরের সমসাময়িক। এদের আজও বেঁচে থাকবার কারণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা—পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকে এরা লোপ পেয়ে গেলেও অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে এদের মধ্যেই কেউ কেউ কোন প্রকারে সেখানকার শীতল ও বৃষ্টিবহুল আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে ছিল। এ-জন্যেই একমাত্র ঐ সব অঞ্চলে, বিশেষ করে নিউজিল্যাণ্ডেই এদের দেখা যায়।
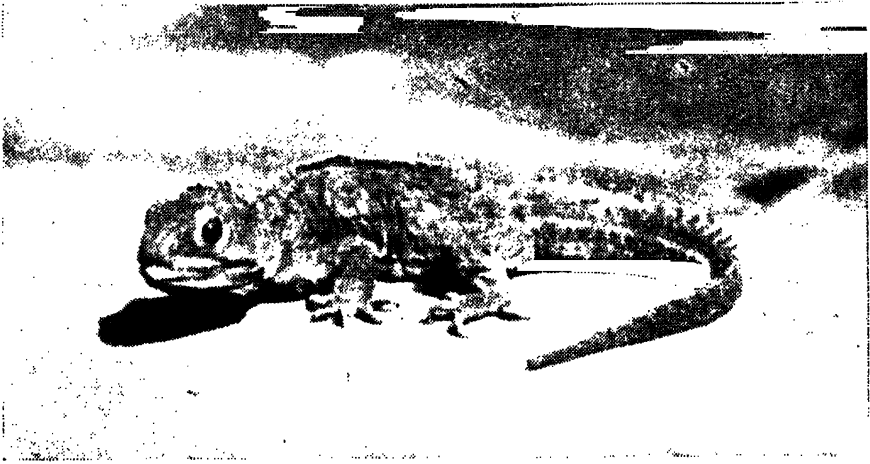
টুয়াটারা

এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে পাখী ও অন্যান্য সরীসৃপের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। টুয়াটারার শরীরের লক্ষণীয় অংশ হলো—তাদের চোখ। চোখ দুটা রয়েছে মাথার উপরের এক রকম আঁশ দিয়ে ঢাকা। নিউজিল্যাণ্ডের উত্তর অক্‌ল্যাণ্ড উপদ্বীপে একটা টুয়াটারা পাওয়া গেছে। লম্বায় সেটা ১১ ইঞ্চি এবং ওজনে ২ পাউণ্ড। শূকরের অত্যাচারে বহু টুয়াটারা মারা গেছে। এখনও যে অল্পসংখ্যক টুয়াটারা বেঁচে আছে, তাদের সংরক্ষণের জন্যে নিউজিল্যাণ্ড সরকার বিশেষ বন্দোবস্ত করেছেন। বহু দেশ থেকে নিউজিল্যাণ্ড সরকারকে টুয়াটারা পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করেছে। কিন্তু নিউজিল্যাণ্ড সরকার একমাত্র অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানসমূহে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের জন্যে টুয়াটারা পাঠাবার অনুমতি দিয়েছে।

টুয়াটারা শামুক, মাছি, ঝিঁঝিঁপোকা, গুবরেপোকা প্রভৃতি শিকার করে উদরসাৎ করে। শিকার ধরবার সময় এরা ব্যাঙের মত শব্দ করে। এরা সাধারণতঃ

আল্‌সে প্রকৃতির—সহজে নড়াচড়া করতে চায় না। সারা দিন-রাত্রিতে দুটা কি তিনটা শিকার ধরতে পারলেই এদের ভোজনপর্ব সমাধা হয়। তাহলেও এরা যে একেবারেই তাড়াতাড়ি চলাফেরা করতে পারে না, তা নয়—প্রয়োজন হলে খুব দ্রুত ছুটতেও পারে। তবে সাধারণতঃ এরা তাড়াতাড়ি চলাফেরা পছন্দ করে না; অধিকাংশ সময়েই নির্জীব অবস্থায় থাকে। তখন অনেক সময় এদের শ্বাসক্রিয়ার কোন লক্ষণ পর্যন্ত দেখা যায় না।

স্ত্রী-টুয়াটারা সামনের পা দিয়ে সুড়ঙ্গের মত গর্ত তৈরী করে তার মধ্যে ১০।১২টা ডিম পাড়ে। তারপর সেগুলিকে নরম বালি ও পাতা দিয়ে ঢেকে রাখে। ডিমগুলি পাটকিলে রঙের এবং লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চি। সাধারণতঃ এক বছর বাদে ডিম ফুটে বাচ্চাগুলি বেরিয়ে আসে। বাচ্চাদের মাথার উপর একটা তীক্ষ্ণ ফলা থাকে। তার সাহায্যেই বাচ্চারা ডিমের খোলা ফাটিয়ে ফেলে।

সরীসৃপদের মধ্য টুয়াটারাই সর্বাপেক্ষা শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী। সাপ, টিকটিকি প্রভৃতি অধিকাংশ সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীরা সাধারণতঃ ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত শারীরিক উষ্ণতা সহ্য করতে সক্ষম। কোন কোন টিকটিকি আবার ১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট উষ্ণতায়ও কর্মক্ষম থাকে। কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, ৫২ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত শারীরিক উষ্ণতায় টুয়াটারা বেশ কর্মক্ষম থাকে। এদের শারীরিক উষ্ণতা অনেক সময় ৫৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠতে দেখা যায় এবং এটা হলো এদের সর্বোচ্চ শারীরিক উষ্ণতা। আবার ৪৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট শারীরিক উষ্ণতায়ও এদের বেশ কর্মক্ষম দেখা যায়।

শ্রীনীহাররঞ্জন ভট্টাচার্য

জানবার কথা

১। মাছ কি আমাদের মত যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে? উত্তরে তোমরা নিশ্চয়ই বলবে—হ্যাঁ পারে। বিজ্ঞানীরা কিন্তু অন্য কথা বলেন। মাছের স্নায়বিক

১নং চিত্র

ব্যবস্থা উন্নত নয় বলে বড়শী বিঁধলে বা জালে আটকালে তারা সম্ভবতঃ অসুবিধা বোধ করে। কিন্তু যন্ত্রণা অনুভব করবার শক্তি তাদের নেই।

২। শোঁয়াপোকার সঙ্গে তোমরা সবাই পরিচিত। বেশ বড় বড় চোখ থাকা

২নং চিত্র

সত্ত্বেও এরা কাছের জিনিষ দেখতে পায় না। ঘ্রাণের সাহায্যেই এরা খাদ্যের সন্ধান করে। পরীক্ষার ফলে আমাদের ধারণা হয়েছে যে, চোখ থাকলেও শোঁয়াপোকা অবস্থায় সেগুলি কার্যকরী হয় না।

৩। পেনিসিলিনের কথা আজ আর কারো অজানা নেই। অনেক ব্যাধি এখন এই পেনিসিলিন প্রয়োগে নিরাময় হচ্ছে। কয়েক জাতের জীবাণু ধ্বংসে পেনিসিলিনের ক্ষমতা খুবই বিস্ময়কর। এই পেনিসিলিন কিন্তু ১৯২৮ সালে আকস্মিক একটি ঘটনার ফলেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। পেনিসিলিয়াম নোটাটাম নামক একজাতীয় ছত্রাকের বীজরেণু দৈবাৎ কোন রকমে এসে গবেষণাগারে মারাত্মক ষ্ট্যাফাইলোকক্কাসের কালচার

৩নং চিত্র

প্লেটে এসে পড়ে। ডাঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং তখন গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পাত্রটা পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখেন যে, ছত্রাকটির চতুর্দিকের জীবাণুগুলি মরে গেছে। এই ঘটনার ফলেই তাঁর গবেষণা নতুন পথে চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়।

৪। উইটওয়াটারস্‌র‍্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রেমণ্ড এ. ডার্ট আফ্রিকার

৪নং চিত্র

জোহানেস্‌বার্গ থেকে প্রেরিত এক সংবাদে বলেছেন যে, মানুষ আজ পর্যন্ত তার বুদ্ধি

খাটিয়ে অনেক রকম বিস্ময়কর যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছে; কিন্তু অতি প্রাচীন কালে আপেলের শাঁস বের করবার জন্যে মানুষ যে যন্ত্রটি (যন্ত্রটি এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়) উদ্ভাবন করেছিল সেটিই হচ্ছে সবচেয়ে পুরনো। ডাঃ ডার্ট আরও বলেছেন যে, এই ধরণের যন্ত্র মানুষ আড়াই লক্ষ বছর যাবৎ ব্যবহার করে আসছে।

৫। যুক্তরাষ্ট্রের সিলভ্যানিয়া লাইটিং প্রোডাক্টস নামক কোম্পানী এক ধরণের বিস্ময়কর ইনক্যাণ্ডেসেণ্ট বাতি উদ্ভাবন করেছে। এই বাতিগুলি এতই ক্ষুদ্র যে, অনায়াসে একটি রিপুকর্মের সূচের চোখের মধ্য দিয়ে গলে যেতে পারে। বাতিগুলির
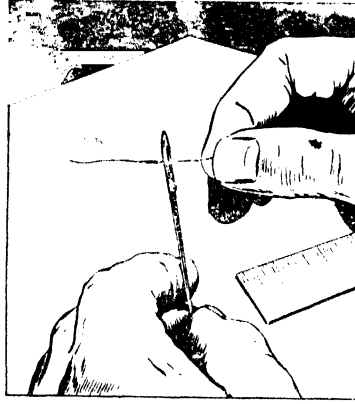
৫নং চিত্র

দৈর্ঘ্য এবং ব্যাস হচ্ছে যথাক্রমে ০.১২৫ ইঞ্চি এবং ০.০৪ ইঞ্চি। এই বাতিগুলি কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়।

৬। উষ্ণতার তারতম্যে মানুষের মানসিক ক্ষমতার পরিবর্তন সম্বন্ধে গবেষণার

৬নং চিত্র

ফলে দেখা গেছে যে, শূন্য ডিগ্রির (ফারেনহাইট) নীচে প্রতি ডিগ্রি উষ্ণতা হ্রাসে মানসিক ক্ষমতা শতকরা গড়ে দু-ভাগ কমে যায়।

৭। পৃথিবীর কোন না কোন অঞ্চলে প্রতিদিন ঝড়-বৃষ্টি লেগেই আছে।
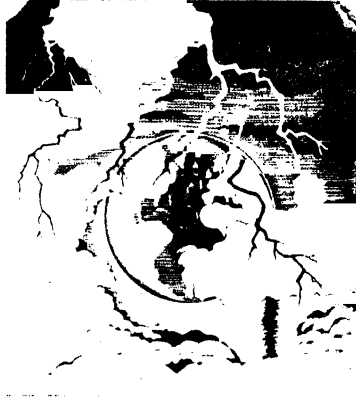
৭নং চিত্র

বিজ্ঞানীরা এই সম্পর্কে একটা হিসাব করেছেন। তাতে দেখা যায়—২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী-ব্যাপী প্রায় ২০০,০০০ বজ্রপাত সহ ঝড়-বৃষ্টি হয়ে থাকে।

৮। প্রাণীদের মধ্যে স্তন্যপায়ীরা মানসিক শক্তিতে সবচেয়ে উন্নত। প্রকৃতিতত্ত্ব-বিদ্‌দের মতে, মানসিক শক্তিতে স্তন্যপায়ীদের পরেই পাখীদের স্থান। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেও স্তন্যপায়ীদের তুলনায় এদের মানসিক শক্তি খুবই কম। পাখীদের

৮নং চিত্র

মধ্যে আবার দাঁড়কাক, কাক, টিয়া, চড়ুই ও টিটমাউস প্রভৃতির শিক্ষা গ্রহণ করবার ক্ষমতা বেশী দেখা যায়, অর্থাৎ কোন কিছু শেখালে এরা তা শিখতে পারে। পাখীদের মধ্যে প্যাঁচা জ্ঞানী বলে পরিচিত হলেও তার কিন্তু কোন কিছু শেখবার ক্ষমতা নেই।

৯। যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগানের অন্তর্গত ইণ্ডিয়ান নদীর কাছে অবস্থিত ক্যাথলিক ধর্মমন্দিরে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ক্রুশ নির্মিত হয়েছে। কাটেরী নামক এক

ইণ্ডিয়ান কুমারীর প্রেরণায় এই ক্রুশের নির্মাণ কার্য সুরু হয়। ৩০০ বছর আগে কাটেরীর মৃত্যু হয়। ক্রুশটি ৫৫ ফুট উঁচু এবং ক্রুশবিদ্ধ যীশু খৃষ্টের প্রতিমূর্তিটি ৩১ ফুট

৯নং চিত্র

লম্বা। কাটেরীর জীবনাদর্শে মুগ্ধ হয়ে ক্যাথলিক নন, এমন এক ব্যক্তি এই ক্রুশটি নির্মাণের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করেন।

১০। বিকিরিত উত্তাপের সাহায্যে শীতপ্রধান দেশে ঘরবাড়ী গরম রাখবার ব্যবস্থা করা হয়। কোন অট্টালিকার মধ্যে উত্তাপ পরিচলনের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক অবদান বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদ্ধতি

১০নং চিত্র

মোটেই আধুনিক নয়। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যেও উত্তাপ বিকিরণের ব্যবস্থায় ঘরবাড়ী গরম রাখা হতো। তবে বর্তমান পদ্ধতি আগের তুলনায় অনেক উন্নত।

১১। ইটালীর পাসট্টুরো গ্রামের গ্রিগ্‌নোন পর্বতের ৭৮০০ ফুট উন্নত শীর্ষে মিলান অ্যালপাইন ক্লাব একটা স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক

হেলিকপ্টার এই স্মৃতিসৌধটি নির্মাণের মালমশলা পাহাড়ের উপর পৌঁছে দিচ্ছে।

১১নং চিত্র

এত উঁচুতে হেলিকপ্টারের সাহায্যে মালমশলা বহন করে নিয়ে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ব্যাপার সত্যই উল্লেখযোগ্য।

১২। বাড়ীঘর সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সবাই পছন্দ করে। নানাভাবে মানুষ বাড়ীঘর পরিষ্কার রাখে। কিন্তু ভারত মহাসাগরের সিচেলেস দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা তাদের ঘরের মেঝে অদ্ভুত কায়দায় পালিশ করে। অর্ধেক নারকেলের

১২নং চিত্র

মালার উপর একটি পায়ে ভর করে তারা স্কেটিং-এর কায়দায় বার বার মেঝের উপর পিছলে যেতে থাকে। এর ফলে নারকেল থেকে তেল নির্গত হয়ে ঘরের কাঠের মেঝেকে খুব চক্‌চকে করে তোলে।

১৩। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতির মাংসভোজী প্রাণী হলো এক জাতের বাদামী রঙের ভালুক। এই ভালুক অবশ্য পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায় না, একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা রাজ্যেই এদের বাস। এরা কাটমাই ভালুক নামে পরিচিত। সাধারণতঃ একটা

পূর্ণবয়স্ক পুরুষ কাটমাই ভালুকের ওজন ১৫০০ পাউণ্ডের মত এবং সাধারণতঃ নয় ফুট লম্বা হয়। একটা পূর্ণবয়স্ক বাঘ বা সিংহের তুলনায় এরা প্রায় তিন গুণ বড় হয়ে থাকে। বিশাল দেহ এবং প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হলেও এদের স্বভাব মোটেই উগ্র নয়। খুব কাছাকাছি না গেলে বিপদের বড় একটা আশঙ্কা থাকে না। গ্রীষ্মকালে

১৩নং চিত্র

এদের প্রিয় খাদ্য হলো স্যামন মাছ। খরস্রোতা নদী থেকে এরা স্যামন মাছ শিকার করে' উদরসাৎ করে। বিশাল শরীরের ভারে এদের গতি মন্থর হলেও কাজের সময় কিন্তু এরা খুব ক্ষিপ্রতার পরিচয় দেয়। সব সময় এরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে। গা চুলকালে বা শরীরের ময়লা পরিষ্কার করবার জন্যে এরা প্রথমে নরম মাটি বা বালির উপর একটা নির্দিষ্ট স্থানে বসে পড়ে এবং সেই অবস্থায় চারদিকে ঘুরতে থাকে। এর ফলে দু-এক মিনিটের মধ্যেই এক ফুট বা তারও বেশী গভীর একটা বৃত্তাকার গর্ত তৈরী হয়ে যায়।

১৪নং চিত্র

১৪। পৃথিবীর প্রথম ঘড়ি নির্মিত হয়েছিল ৯৯০ খৃষ্টাব্দে। অরিল্যাকের

গারবার্ট নামক একজন ফরাসী ধর্মযাজক এই ঘড়িটি নির্মাণ করেছিলেন। ইনিই পরে দ্বিতীয় পোপ সিলভেষ্টার-২ নামে পরিচিত হন। ঘড়িটি অবশ্য একেবারে নিখুঁত ছিল না। কিন্তু এই ঘড়ি উদ্ভাবনের পূর্বে যে সব পদ্ধতিতে সময় নির্ণীত হতো—সে সবের তুলনায় এই ঘড়িটি ছিল খুবই উন্নত। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও গারবার্টের ঘড়ির নির্মাণ-কৌশল জানা সম্ভব হয় নি। সে জন্যে ঘড়িটা যেমন দেখাতো, সেভাবেই উপরের ছবিটি আঁকা হয়েছে।

১৫। গাংচিল সাধারণতঃ ঝিনুক, শামুক প্রভৃতি কঠিন খোলাবৃত প্রাণী শিকার করে আহার করে। কিন্তু এরা ঠোঁটের সাহায্যে শক্ত খোলা ভাঙতে পারে না। সে জন্যে এরা একটা অদ্ভুত কৌশলে তাদের শক্ত খোলা ভেঙে থাকে। গাংচিল ছোঁ-

১৫নং চিত্র

মেরে ঐ সব প্রাণী ঠোঁটে করে খুব উঁচুতে উঠে যায়। তারপর সেগুলিকে সেতু, পাকা রাস্তা বা কোন শক্ত জায়গার উপর ফেলে দেয়। অত উঁচু থেকে পড়বার ফলে শক্ত খোলা ভেঙে যায়। তখন এরা নীচে নেমে গিয়ে তাদের ভিতরের নরম মাংস কুঁরে খায়।

বিবিধ

ফুস্‌ফুসের ক্যান্সারের সঙ্গে ধূমপানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক

ফুসফুসের ক্যান্সারের সঙ্গে ধূমপানের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের বিষয়ে ভারতে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যাহারা ধূমপান করে না, তাহাদের অপেক্ষা ধূমপায়ীদের এই রোগ হইবার সম্ভাবনা বেশী এবং সিগারেটের সংখ্যার উপর এই বিপদের মাত্রা নির্ভর করে।

আমাদের দেশে ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার মারাত্মকরূপে দেখা দেয় নাই। ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে ৩৬,৫০৫ জন রোগীকে পরীক্ষা করিয়া মাত্র ৫২১ জনের ফুস্‌ফুসে ক্যান্সার দেখা যায়।

বোম্বাই-এর ভারতীয় ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে ১৩৬০জন রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, তামাক চিবাইয়া খাইলে ও ধূমপাম করিলে জিভের পিছন দিকে এবং ফ্যারিংক্সের উপরের দিকে ক্যান্সার হয় এবং শুধু মাত্র ধূমপান করিলে অন্ননালীর ঊর্ধ্বভাগে ও ফ্যারিংক্সের সংলগ্ন অংশে ক্যান্সার হয়। সম্ভবতঃ ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার ঠিকমত ধরা পড়ে না অথবা উহা ফুস্‌ফুসের বা সংলগ্ন অঙ্গের অন্য রোগ বলিয়া মনে করা হয়।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ ও অন্ধ্র প্রদেশের ৩০ বৎসরের অধিক বয়স্ক ৩৪ হাজার সুস্থ লোককে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ধূমপান ও তামাক খাওয়ার ফলে ক্যান্সার হইবার পূর্বেকার অবস্থার সৃষ্টি হয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলে কয়েক স্থানের লোকেরা সিগারেটের জলন্ত দিকটা মুখের মধ্যে দিয়া ধূমপান করে বলিয়া সাধারণতঃ তাহাদের মুখে ক্যান্সার হইয়া থাকে।

ভারতে প্রধানতঃ সহরাঞ্চলেই সিগারেটের প্রচলন আছে। পল্লী অঞ্চলে হুকা, ছিলিম বা বিড়ি চলে। হুকা ও ছিলিমে ধূমপান করিলে ধূম জল কিংবা ভিজা কাপড়ের টুক্‌রায় পরিশোধিত হইয়া যায় এবং উহার অনিষ্টকর দ্রব্য মুখে বা শ্বাস-নালীতে প্রবেশ করিতে পারে না। বিড়ির ধূমপান করিলে ধূমের অনিষ্টকর দ্রব্যগুলি সম্ভবতঃ ফুস্‌ফুসে যায় না এবং জিভের পিছনে ও কণ্ঠের ঊর্ধ্বদিকে জমা হয়।

ধূমপান করিলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এবং গলা জ্বালা, কাশি, ক্ষুধার অভাব ও ব্রঙ্কাইটিস হয়। সময়ে সময়ে ব্রঙ্কাইটিস হইতে ফুস্‌ফুসের গুরুতর রোগের উদ্ভব হয়।

গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ফুস্‌ফুসের ক্যান্সারের সঙ্গে খুব বেশী ধূমপানের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৬ সালে ২৫ হাজার লোক ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং প্রতি বৎসর দুই হাজার করিয়া এই সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। পুরুষ ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে ১১'৪ শতাংশ এবং স্ত্রী রোগীদের মধ্যে ২'১ শতাংশকে ফুস্‌ফুসের ক্যান্সারে ভুগিতে দেখা যায়।

আমেরিকার ক্যান্সার সোসাইটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যাহারা প্রতিদিন অধিক সংখ্যক সিগারেট সেবন করে, তাহাদের শ্বাসনালীতে ক্যান্সার রোগ অধূমপায়ীদের তুলনায় বেশী হয়।

ইলেকট্রনিক ফুস্‌ফুস্

প্রায় ৩,০০০ রোগীর উপর সাত বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা চালাইবার পর চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি নূতন ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রনিক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই যন্ত্রটি হইল বার্নেট ভেন্টিলেটর বা ইলেকট্রনিক ফুস্‌ফুস। ইহা স্বাভাবিক

শ্বাসযন্ত্রের সব কিছু কাজ করিতে পারে এবং অপারেশনের সময় অ্যানেস্থেটিষ্টকে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার অতিরিক্ত সুবিধা দিতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের সুবিধা দেওয়াই এই যন্ত্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভেণ্টিলেটরটি নির্মাণ করিয়াছেন হার্টফোর্ড-শায়ারের অন্তর্গত বার্নেটের ডবলিউ. ওয়াটসন অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড। এই যন্ত্রটি সহজে বহন করা যায়। ইহার ওজন মাত্র ৫৬ পাউণ্ড। ভেণ্টিলেটরটির মধ্যে যে ব্যাটারী রহিয়াছে তাহাও একটানা ২০ ঘণ্টা ধরিয়া কাজ করিতে পারে; মধ্যপথে ইহাকে পুনরায় চার্জ করিয়া লইবার প্রয়োজন হয় না।

সিন্থেটিক পেনিসিলিন

আমেরিকার ব্রিষ্টল লেবরেটরিজের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ আমেশ আর. মেনস্তি জানাইতেছেন যে, পনেরো বৎসরের গবেষণার ফলে সিনসিলিন নামে সিন্থেটিক পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেক সময় পেনিসিলিন ব্যবহারের ফলে রোগীর দেহে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং প্রতিরোধক শক্তি জন্মাইবার ফলে রোগ-বীজাণুও ধ্বংস হয় না। এই সকল ক্ষেত্রে সিনসিলিন প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা প্রয়োগে রোগীর দেহে কোন রকম প্রতিক্রিয়া হয় না। এই পর্যন্ত পাঁচ শতেরও বেশী বিভিন্ন ধরণের সিন্থেটিক পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৬০ প্রকার সিনসিলিন, রোগের চিকিৎসায় পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ আর্নেস্ট বি. চেন এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, আমার মনে হয়, পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে এই নূতন আবিষ্কারের ফলে আমরা সম্পূর্ণ এক নূতন যুগে প্রবেশ করিয়াছি।

মরফিন হইতে অধিকতর শক্তিশালী বেদনা-উপশমকারী ভেষজ

ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব অ্যারথ্রাইটিজ অ্যাণ্ড মেটাবলিক ডিজিজেস্' নামে গেঁটে-বাত এবং জীবদেহের রাসায়নিক রূপান্তর সম্পর্কে গবেষণামূলক মার্কিন জাতীয় সংস্থার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডাঃ এভারেট মে এবং ডাঃ ন্যাথান বি এডি-ফেনাজুইন (Phenazooine) নামে বেদনা উপ-শমকারী একটি নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা আফিমজাত নিদ্রা-উদ্রেককারী পদার্থ মরফিন হইতেও অধিকতর শক্তিশালী এবং নিরাপদে ব্যবহার করা যাইতে পারে বলিয়া এই সংস্থা জানাইয়াছে। ইহা বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের সমবায়ে গঠিত। এই জন্য আফিমের প্রয়োজন হয় না।

ডাঃ মে ও ডাঃ এডি এই নূতন ঔষধের পেটেণ্ট লইলেও ইহার এতদ্‌সংক্রান্ত পূর্ণ অধিকার তাঁহারা যুক্তরাষ্ট্র সরকারকেই দিয়া গিয়াছেন।

এই নূতন ঔষধের সুযোগ-সুবিধা বিশ্বের সকলেই যাহাতে পাইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে যে সকল পদার্থের সমবায়ে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে জার্ণ্যাল অব অর্গ্যানিক কেমিষ্ট্রি নামে সাময়িক পত্রিকার দুইটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মাধ্যমে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রবন্ধের নির্দেশ অনুযায়ী আমেরিকার বাহিরের যে কোন দেশে তাহাদের নিজ নিজ আইনকানুন অনুসারে এই ঔষধ উৎপাদন করা যাইতে পারে। ইহার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার হইতে কোন লাইসেন্স লইতে হইবে না, অথবা এই জন্য কোন অর্থও যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে দিতে হইবে না। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরের কোন দেশে এই ঔষধটি প্রস্তুত করা হইলে তাহা যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করা যাইবে না। যুক্তরাষ্ট্রে এই ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য ছয়টি কোম্পানীকে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে।

১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে এই ঔষধ আবি-ষ্কারের কথা প্রথম ঘোষণা করা হয়। ঐ বৎসরে তিন হাজারেরও অধিক রোগীর উপর এই ঔষধটি

প্রয়োগ করিয়া ইহা যে মরফিন হইতেও অধিকতর কার্যকরী হইয়া থাকে, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

জীবাণু-ধ্বংসী নাসিকার ক্রীম

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সব বিশ্রী রকমের জীবাণুর সংস্পর্শে আসি, ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস তাদের অন্যতম। এই জীবাণুর আক্রমণে আমাদের ফোঁড়া, কার্বাঙ্কল, অঞ্জনী, এমন কি—সাংঘাতিক ধরণের নিউমোনিয়া পর্যন্ত হয়ে থাকে। পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর আমরা ভেবেছিলাম যে, অবশেষে ষ্ট্যাফাইলোকক্কাসের হাত থেকে বুঝি চিরতরে নিস্তার পাওয়া গেল। কিন্তু শীঘ্রই আমাদের ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হলো; কারণ, কিছুদিন পরেই দেখা গেল, পেনিসিলিন আর এদের কিছু করতে পারে না।

ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণুগুলি সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে এবং অনেক সুস্থ লোকেরও হাতে, চামড়ায় ও নাকের মধ্যে অধিষ্ঠান করে। ক্ষতস্থান ও নবজাত শিশুদের এরা বিশেষভাবে পছন্দ করে। এই কারণে ডাক্তার ও নার্সদের মত সুস্থলোকের দেহেও এরা বাসা বাঁধে থাকে। হাসপাতালে যাদের অপারেশন হয়েছে বা প্রসূতিসদনে যে সব নূতন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তাদের দেহেও সহজেই এই জীবাণু সংক্রামিত হতে পারে।

বৃটেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দপ্তর ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্যে একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করেন। তদন্তের ফলে প্রকাশ পায় যে, ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস নাকের মধ্যেই সবচেয়ে নিরাপদে অবস্থান ও বংশবৃদ্ধি করতে পারে। সুতরাং সংক্রমণ নিবারণের একটি খুব কার্যকরী উপায় হলো হাসপাতাল ও প্রসূতিসদনের রোগীদের এবং যারা তাদের সংস্পর্শে আসে তাদেরও নাকের মধ্যকার জীবাণুর ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করা।

এই জীবাণু ধ্বংস করবার জন্যে বৃটিশ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা ন্যাসেপ্টিন বলে একরকম ক্রীম তৈরী করেছে এবং পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, এই ক্রীম প্রতিদিন নাকে দু-বার করে লাগালে ষ্ট্যাফাইলোকক্কাসের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা যায় এবং অন্য দেহে এর সংক্রমণও নিবারণ করা যায়। এই ক্রীমের মধ্যে ক্লোরেক্সিডাইন ও নিওমাইসিন নামক দু-রকম জীবাণু-ধ্বংসী ভেষজ আছে যা ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণুকে সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ করতে পারে। যে সব লোক ফোঁড়া ও অঞ্জনীতে ভোগে তারা যদি নিয়মিতভাবে তাদের নাকে এই ক্রীম লাগায়, তাহলে তারাও এসব কষ্টকর রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে।

থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন নিয়ন্ত্রণের উপায়

পরমাণু-সংযোজনের ফলে যে প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে, মার্কিন বিজ্ঞানীদের ধারণা, তাঁহারা এই প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছেন।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জেম্স্ এল. টাক নামে জনৈক পদার্থ-বিজ্ঞানী মার্কিন কংগ্রেসের সাব-কমিটির অধিবেশনে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, আমরা থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন বা তাপীয় পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিব বলিয়াই বিশ্বাস করি। পরমাণু সংযোজনের ফলে এই প্রতিক্রিয়া ডিম্বাকারে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় দেখা দেয়। ইহার ব্যাস দুই সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ সময় ইহার স্থায়িত্বকাল।

হাইড্রোজেন বোমায় এই তাপীয় পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া (Thermo-nuclear Reaction) ঘটিয়া থাকে। সেখানে এই প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এই ধরণের বোমায় হাইড্রোজেন পরমাণুর সংযোজনের ফলে বিপুল শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। পারমাণবিক বোমায় প্লুটোনিয়ামের সংযোজনের ফলে যে পরিমাণ

শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার তুলনায় অনেক বেশী শক্তি হাইড্রোজেন পরমাণুর সংযোজনের ফলে উদ্ভূত হইয়া থাকে। হাইড্রোজেন পরমাণুর সংযোজন সৌরশক্তিরও উৎস।

এই প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত উপায়ে সৃষ্টি করা সম্ভব হইলে পৃথিবীতে যে শক্তির প্রয়োজন হইবে, তাহা কোটি বৎসর ধরিয়া এই পদ্ধতিতেই পূরণ করা যাইবে এবং ইহার ইন্ধন হাইড্রোজেন পরমাণু, সমুদ্র-জল হইতেই পাওয়া যাইবে।

ডাঃ টাক এই প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, সিলা (Scylla) নামে একটি যন্ত্রের সাহায্যে এই প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে।

অভিনব যন্ত্র-মানব

তেজস্ক্রিয়তা, খনিতে গ্যাস বিস্ফোরণ, খনি দুর্ঘটনা অথবা অগ্নিকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার হিউজ এয়ারক্র্যাফ্‌ট কোম্পানী একপ্রকার অভিনব যন্ত্র-মানব আবিষ্কার করিয়াছেন। ইস্পাতে নির্মিত এই মানুষটি তিন ফুট দীর্ঘ এবং ওজনে আড়াই টন। ইহার প্রত্যেকটি হাত দেড়শত পাউণ্ড ওজন উত্তোলন করিতে পারে এবং ইহার দৃঢ়মুষ্টির শক্তি হইল দুই শত পাউণ্ড। যে সকল দ্রব্য তেজস্ক্রিয়তা বা অতিরিক্ত তাপের জন্য মানুষের পক্ষে স্পর্শ করা সম্ভব নয়, ইহার সাহায্যে সেই সকল জিনিষ লইয়া কাজ-কারবার করা যাইতে পারে। চন্দ্র উপগ্রহ সংক্রান্ত নানাবিধ পরীক্ষার ব্যাপারে এই ধরণের যন্ত্র-মানব বিশেষ কাজে লাগিবার সম্ভাবনা।

ইহার সাহায্যে সূক্ষ্ম কাজও সম্পন্ন হইয়া থাকে। যেমন, তাকের উপর হইতে কার্ড লইয়া আসা এবং দন্ত-চিকিৎসার ব্যাপারে তুরপুণের সাহায্যে ছিদ্র করিবার কাজ ইহার দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে।

এই যন্ত্র-মানবের বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ইহা অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ যন্ত্র। টেলিভিশন-ক্যামেরা ইহার দুইটি চোখ এবং মাইক্রোফোন দুইটি কানের কাজ করিয়া থাকে। দুই শত ফুট দীর্ঘ একটি বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে ইহাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। বিভিন্ন নির্দেশ অনুযায়ী ইহা চলাফেরা করিয়া বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করিল কি না, পরিচালক তাহা টেলিভিশন-চোখের সাহায্যে নির্ণয় করিয়া থাকেন।

সোভিয়েট কৃত্রিম উপগ্রহে নকল মানুষ

সোভিয়েট রাশিয়া ১৫ই মে, ঘোষণা করিয়াছে যে, পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করা হইয়াছে—যাহাতে একটি ক্ষুদ্র-কক্ষে মহাকাশ-যাত্রী নকল মানুষ রহিয়াছে। মহা-কাশযাত্রায় মানুষকে যে সকল অবস্থার মধ্যে কাটাইতে হইবে, কৃত্রিম উপায়ে তাহার প্রত্যেকটিরই ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান টাসের এক বিবৃতিতে জানা যায় যে, মহাকাশচারী উপগ্রহটির ওজন চার টনেরও অধিক। উহা পৃথিবীর দুই শত মাইল উর্ধ্বে থাকিয়া প্রতি ৯১ মিনিটে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। টাস বলিয়াছে, ইহার দ্বারা নিরাপদে মানুষের মহাকাশ-যাত্রার উপযোগী নির্ভরযোগ্য মহাকাশ-যান নির্মাণের কঠিন প্রয়াসের ভূমিকা রচিত হইল

পৃথিবীর বয়স

লেনিনগ্রাডের কয়েক জন বিশিষ্ট ভূ-বিজ্ঞানীর মতে, পৃথিবীর বয়স ৪৫০ কোটি বৎসর। তাঁহারা বল্‌টিক সমুদ্রের পর্বতাকীর্ণ উপকূলগুলির (কোলা উপদ্বীপ, কারেলিয়া, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি স্থানের) বিভিন্ন স্তরের ভূতাত্ত্বিক বয়স নির্ধারণের এক নূতন মাপকাঠি রচনা করিয়াছেন।

নিখিল সোভিয়েট বিজ্ঞান-পরিষদের ভূতত্ত্ব-গবেষণা বিভাগে প্রিক্যাম্‌ব্রিয়ান যুগের বিভিন্ন প্রস্তর-স্তরের বয়স ৫৫০ বার গণনা করিয়া দেখা হয়। ‘আর্গন পদ্ধতি’র প্রয়োগে এই কাজ পরিচালনা করেন সোভিয়েট ভূ-রসায়ন-বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার পোলকানফ। আর্গন একপ্রকার নিষ্ক্রিয় মৌলিক বায়বীয় পদার্থ। এই নূতন পদ্ধতি অনুসারে এই সকল প্রস্তর-স্তর হইতে অভ্র বাহির করিবার পর তাহা গলাইয়া আর্গন বাহির করিয়া লওয়া হয়। বিশেষ এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ওই অভ্রের অন্তর্ভুক্ত পটাসিয়ামের পরিমাণও নির্ধারণ করা হয়। এই পটাসিয়াম আর আর্গনের পরিমাণের আনুপাতিক হিসাব হইতেই ওই প্রস্তর-স্তরের বয়স পাওয়া যায়।

প্রিক্যাম্‌ব্রিয়ান যুগটি হইল পৃথিবীর দেহ-গঠনের ইতিহাসে আদিমতম ভূতাত্ত্বিক যুগ। উপরিউক্ত হিসাব হইতে জানা গিয়াছে—গ্রহ হিসাবে পৃথিবীর জন্মের সময় হইতে এই প্রিক্যাম্‌ব্রিয়ান যুগে আসিয়া পৌঁছিতে সময় লাগিয়াছে ৫০ কোটি বৎসর এবং ইহার সহিত প্রিক্যাম্‌ব্রিয়ান যুগের বয়স যোগ করিয়া পৃথিবীর বয়স পাওয়া গিয়াছে ৪৫০ কোটি বৎসর।

মঙ্গলগ্রহের খাল সম্পর্কে নূতন তত্ত্ব

মস্কোর ষ্টের্নবার্গ ইনষ্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রোনোমির বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভি. দেভিদফ দীর্ঘকাল গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, মঙ্গলগ্রহের যে রহস্যজনক খালগুলি নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কৌতূহলের সীমা নেই, আসলে সেই খালগুলি হলো জমাট তুষারস্তূপের বুকে খুব বড় রকমের কতকগুলি ফাটল। মঙ্গল গ্রহের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে এই জমাট-বাঁধা গভীর তুষার স্তর।

৬ই মার্চ তারিখের কম্‌সোমোল্‌স্কাইয়া প্রাভদায় প্রকাশিত দেভিদফের লেখা একটি প্রবন্ধে বিস্তৃত-ভাবে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দেভিদফ লিখেছেন—তাঁর হিসাব অনুসারে, মঙ্গলগ্রহে তরল জলের পরিমাণ পৃথিবীর তরল জলের পরিমাণের সমান কিংবা সামান্য কিছু বেশী। মঙ্গলগ্রহ সূর্য থেকে পৃথিবীর চেয়ে দূরবর্তী। সে জন্যে মঙ্গলের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের তাপাঙ্ক সারা বছরে ১০° থেকে ২০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে ওঠা-নামা করে। যে কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাপের সৃষ্টি হয়, মঙ্গলগ্রহের অভ্যন্তরেও তাপের সৃষ্টি হয় সেই একই কারণে। পৃথিবীর যত গভীরে যাওয়া যায়, অভ্যন্তরের তাপ ততই বৃদ্ধি পায়—এই নিয়ম অনুসারে মঙ্গলগ্রহের উপরিতল থেকে ভিতরের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে অগ্রসর হলে প্রতি কিলোমিটারে ৩০° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড হিসাবে তাপ বৃদ্ধির কথা। এই হিসাবে মঙ্গলগ্রহের উপরিতল থেকে আধ কিলোমিটার গভীরে গড়পড়তা যে তাপ ও চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, সেটা বরফ গলাবার পক্ষে (মঙ্গলগ্রহের অন্যান্য ভৌতিক পরিবেশ ও অবস্থাকে হিসাবের মধ্যে ধরে) যথেষ্ট।

দেভিদফের মতে, মঙ্গলগ্রহের তুষারের স্তরগুলি স্থানবিশেষে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত পুরু। এই জমাট-বাঁধা বরফস্তূপের উপরিতল থেকে নীচ পর্যন্ত আধ কিলোমিটার ব্যবধানেই চাপ ও তাপের যথেষ্ট পার্থক্য ঘটে এবং তার ফলেই এই তুষারাবৃত জায়গাগুলিতে ভূমিকম্পের ফলে গভীর ও সুদীর্ঘ ফাটলের সৃষ্টি হয়। তুষারস্তূপের ফাটলগুলি সাধারণতঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এই কারণে যে, যেখানে গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে তৎক্ষণাৎ অভ্যন্তর ভাগের তাপ ও চাপের এমন একটা পুনর্বিন্যাস ঘটে, যাতে সেখানে দীর্ঘকালের মধ্যে নতুন কোন ভৌত পরিবর্তন ঘটে না। এজন্যেই পৃথিবী থেকে যখন মঙ্গলগ্রহের খালগুলি দেখা যায়, তখন সেগুলির মধ্যে নতুন নতুন খাল মাঝে মাঝে চোখে পড়লেও পুরাতন খালগুলির বিলুপ্তি বা পরিবর্তন খুব কমই চোখে পড়ে।

তাছাড়া মঙ্গলগ্রহের বর্তমান ভৌত পরিবেশে এই তুষার-স্তরের ফাটলগুলির প্রান্তদেশ জুড়ে উদ্ভিদ জন্মানো খুবই সম্ভব। উদ্ভিদে ঢাকা এই অংশগুলি বরফের ফাটলের সঙ্গে মিশে গিয়ে পৃথিবী থেকে কতকগুলি নিরবচ্ছিন্ন রেখার টানা-পোড়েনের মত দেখায়।

দেভিদফের মতে, মানুষের চেয়ে বুদ্ধিতে উন্নততর মঙ্গলগ্রহবাসীদের হাতে কাটা বলে এই খালগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে ধারণা আছে, সেটা নিতান্তই কল্পনা মাত্র। আসলে মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকলেও তা এখনও খুব অনুন্নত পর্যায়ের।

সমুদ্রের তলদেশে ৪৫ হাজার মাইল দীর্ঘ ফাটল

প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের তলদেশ দিয়া যে ৪৫ হাজার মাইল দীর্ঘ একটি ফাটল অবিচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত রহিয়াছে, তাহা মার্কিন ভূ-বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা আফ্রিকার দক্ষিণ-প্রান্ত হইতে সুরু করিয়া কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হইবার পর আরব ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ভূত্বকে এই ধরণের ফাটলের কথা বিজ্ঞানীরা পূর্ব হইতেই জানিতেন। কিন্তু ভারত মহাসাগরের তলদেশ দিয়াও যে ইহা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া গিয়াছে, তাহা জানা ছিল না। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-বিজ্ঞানী ডাঃ মরিস ইউয়িং এবং ডাঃ ব্রুস সি. হিজেনের গবেষণার পূর্বে ইহা প্রমাণিত হয় নাই। তাঁহারা ল্যামন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক মানমন্দিরের জাহাজ 'বেমার' সাহায্যে ভারতমহাসাগরে গবেষণা চালাইয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন।

ডাঃ ইউয়িং ও ডাঃ হিজেন এই সম্পর্কে জানাইয়াছেন যে, বিজ্ঞানীরা এই ফাটলের আটলান্টিকের তিনটি এবং ভারত মহাসাগরের ছয়টি সংযোগস্থলে সমুদ্রের গভীরতা মাপিবার চেষ্টা করেন। ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ অঞ্চলের গভীরতা নির্ণয় করিতে না পারিয়া সমুদ্রের তলদেশের ফাটল অবিচ্ছিন্নভাবে ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমান করেন এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যে যথাযথভাবে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে থাকেন। এই চেষ্টার ফলে জানা যায় যে, ভারত মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশের এক হইতে দুই মাইল নীচে এই ফাটলের উপরিভাগটি রহিয়াছে। ইহার নীচের দিক একটি উপত্যকার মত। এই ফাটলের গভীরতা সমুদ্র-পৃষ্ঠের দুই হইতে তিন মাইলের মধ্যে এবং উপরিভাগের বিস্তৃতি ৪ মাইল হইতে ২০ মাইল এবং তলদেশের বিস্তৃতি ১ মাইল হইতে ৫ মাইল পর্যন্ত।

ভূমিকম্প-বলয় অনুসারে এই ফাটল আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার চারদিক ঘিরিয়া ভারত মহাসাগরের তলদেশ দিয়া গিয়াছে। আরব সাগরের শাখাটি আফ্রিকার ফাটলের সহিত যুক্ত হইয়াছে। আর একটি শাখা রহিয়াছে দক্ষিণ মেরু ও নিউ-জিল্যাণ্ডের মধ্যে। ইহাই প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়া পড়িয়াছে এবং এই শাখাটিই পুনরায় ইস্টার্ণ আয়ারল্যাণ্ডের কাছে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার আর একটি শাখা গিয়াছে ক্যালিফোর্ণিয়া ও আলাস্কা উপসাগরের তলদেশ দিয়া। এই বিজ্ঞানীদের মতে, বহু বৎসর পূর্বে আমেরিকা, আফ্রিকা ও ইউরোপ একটি অবিচ্ছিন্ন ভূভাগ ছিল। মহাসাগরের তলদেশের কেন্দ্রস্থলে ফাটল সুরু হওয়ায় কালক্রমে ভূভাগ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়।

কাম্বের অনতিদূরে নতুন তৈল খনি

কাম্বে শহর হইতে প্রায় একশত মাইল দক্ষিণে আঙ্কলেশ্বর নামক স্থানে ১৪ই মে একটি নতুন তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সরকারী উদ্যোগে

এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত তৈলখনিগুলির মধ্যে এইটিই সর্বোত্তম বলিয়া বলা হইয়াছে।

প্রভূত সম্ভাবনাপূর্ণ এই নূতন খনিটি তৈল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন কর্তৃক সোভিয়েট বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

খনি এবং তৈল দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী কে. ডি. মালব্য কর্তৃক ভারত সরকারকে প্রেরিত তারবার্তায়, সরকারী উদ্যোগে আবিষ্কৃত তৈল-খনিগুলির মধ্যে এই খনিটিই যে সর্বোত্তম—এই সংবাদের সত্যতা স্বীকার করা হইয়াছে। তিনি তারবার্তায় বলিয়াছেন যে, কাম্বে অঞ্চলে এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত খনিগুলির মধ্যে আঙ্কলেশ্বরে আবিষ্কৃত খনিটির তৈল এবং তাহার পরিমাণ সর্বাপেক্ষা ভাল।

অল্প কয়েক মাসের মধ্যে কাম্বে অঞ্চলে যে কয়টি তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই আবিষ্কারটিকে দ্বিতীয় বৃহৎ আবিষ্কার বলা যায়।

আঙ্কলেশ্বরের খনন-কার্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রী মালব্য বলেন যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে আঙ্কলেশ্বরে খনন সুরু করা হয়। খনন-কার্য সম্পন্ন করিতে প্রায় ষাট দিন লাগে। পরীক্ষা-কার্যের দ্বিতীয় দিনেই তৈল বাহির হইয়া আসে। তিনি বলেন, সম্পূর্ণ সংবাদ না আসিয়া পৌঁছাইলেও এই কথা বলা যায় যে, আঙ্কলেশ্বরের আবিষ্কারটি সরকারী উদ্যোগে সম্পন্ন আবিষ্কারগুলির মধ্যে সর্বোত্তম।

তিনি আরও বলেন, প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রথম কয়দিন নবাবিষ্কৃত খনি হইতে তৈল বাহির হইয়া যাইতে দেওয়া হয়।

লক্ষ্ণৌতে ১৫ই মে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী মালব্য বলেন, সরকারী উদ্যোগে আবিষ্কৃত অন্য দুইটি তৈলখনি হইল জ্বালামুখী ও কাম্বেতে।

অন্ধ্রে হীরকের সন্ধান

ইস্পাত, খনি ও জ্বালানী মন্ত্রীর সংসদ সচিব শ্রী জি. পি. সিংহ ১১ই এপ্রিল লোকসভায় বলেন, ভারতীয় ভূতত্ত্ব-সমীক্ষার অনুসন্ধান-কার্যের ফলে অন্ধ্র প্রদেশে বঙ্গপাল্লের নিকট সুড়ি বিস্তীর্ণ ভূমিতে হীরকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

খনি ও তৈল দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী কে. ডি. মালব্য বলেন, কিছুদিন পূর্বে একটি বেসরকারী সংস্থার হস্তে উক্ত অঞ্চলে খনিজ সম্পদ উত্তোলনের ইজারা দেওয়া ছিল। এখন উহার মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে। সরকার উক্ত অঞ্চলে সমীক্ষা ও খনিজ সম্পদ আহরণের একটি ব্যাপক কর্মসূচী তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক সমীক্ষার ফলে এই অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর হীরকের অস্তিত্বের কথা জানা গিয়াছে।

অন্ধদের জন্য পড়িবার যন্ত্র

হ্যান্স্ এ. মোচ নামে আমেরিকার জনৈক বিজ্ঞানী অন্ধদের জন্য একটি অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। মর্স-কোড অনুসারে টেলিগ্রামের ব্যাপারে বিভিন্ন শব্দ যেমন অক্ষর নিরূপণ করিয়া থাকে, এই যন্ত্রটিতেও তেমনি বিভিন্ন অক্ষরের জন্য বিভিন্ন প্রকার আওয়াজ উৎপন্ন হয়। ইহা সহজেই বহনযোগ্য এবং মূল্যও খুব বেশী নয়।

রেকর্ড করার অভিনব যন্ত্র

ডাঃ উইলিয়ম ই. গ্লেন নামে জনৈক মার্কিন পদার্থ-বিজ্ঞানী থার্মোপ্লাসটিক রেকর্ডার নামে রেকর্ড করিবার একপ্রকার অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে ২৪ মিনিটের মধ্যে ২৪ খণ্ডে সমাপ্ত এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটেনিকার রেকর্ড করা যাইতে পারে। রেকর্ডটি সূতা জড়াইবার অতি ছোট কাটিম অপেক্ষা বড় হইবে না।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োদশ বর্ষ | জুন, ১৯৬০ | ষষ্ঠ সংখ্যা

চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে

শ্রীজ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

একদা এক রাজকোষে চুরি হয়ে যায় এবং সেই উপলক্ষ্যে "বালক কিশোর উত্তীয়" আপন প্রাণ সঁপে দিয়েছিল।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যা ঘটতে পারে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই রকম ঘটা সব সময়ে সম্ভব নয়। তবু সেই রকম একটি বড় রকমের চুরির কিনারা করতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা নিউট্রিনো আবিষ্কার করেছিলেন। সেই গল্পটি বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু তার আগে গল্পের ভূমিকা স্বরূপ একটু শিবের গীত গেয়ে নিই।

বর্তমান যুগে, অর্থাৎ স্পুটনিক, নটিলাসের যুগে, একথা প্রায় সবাই জানেন যে, যাবতীয় জড় পদার্থের পরমাণুই নিউট্রন, প্রোটন এবং ঋণ-বিদ্যুৎসম্পন্ন ইলেকট্রন দিয়ে তৈরী। তাছাড়া পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত নিউট্রন ও প্রোটন দুটা আলাদা কণা নয়, এগুলি একই কণা, যাদের বলা হয়ে থাকে নিউক্লিওন—সেই কণারই দুটি পৃথক বৈদ্যুতিক অবস্থার প্রকাশ মাত্র। বস্তুতঃ একথাও জানা আছে যে, প্রোটন তার ধনাত্মক বিদ্যুৎ-মুক্ত হয়ে নিউট্রন এবং নিউট্রন ধনাত্মক বিদ্যুৎ-যুক্ত হয়ে প্রোটনে রূপান্তরিত হতে পারে।

সে যাই হোক, নিউক্লিওন এবং ইলেকট্রন ছাড়া অন্য ধরণের কণার সম্ভাব্যতা বিজ্ঞানীরা অস্বীকার করতে পারেন নি। যেমন, ইলেকট্রন যদি ঋণাত্মক বিদ্যুতের কণা হয়ে থাকে, তবে ধনাত্মক বিদ্যুতের কণা বা ধনাত্মক ইলেকট্রন থাকাও তো সম্ভব! তেমনি, নিউট্রন যেভাবে ধনাত্মক বিদ্যুৎ সংযোগে প্রোটনে রূপান্তরিত হয়, ঠিক সেভাবে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সংযোগে নিউট্রনের পক্ষে ঋণাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত প্রোটনে রূপান্তরিত হওয়াও অসম্ভব নয়!

প্রকৃতিতে একই জায়গায় ধনাত্মক ও ঋণাত্মক ধরণের পদার্থ একসঙ্গে থাকা কঠিন; কারণ এই দু-রকমের পদার্থ সংযুক্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী। প্রকৃতিতে ধনাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত ইলেকট্রনের অস্তিত্ব অনেক দিন আগেই প্রমাণিত হয়েছে এবং তার নাম দেওয়া হয়েছে পজিট্রন। সম্প্রতি ঋণাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত প্রোটন কণার অস্তিত্বও ধরা পড়েছে, যাকে বলা হয় অ্যান্টিপ্রোটন।

পরবর্তী প্রশ্ন হলো, ইলেকট্রনের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে কম ভরযুক্ত, অথচ কোনরূপ বিদ্যুতাবিষ্ট নয়, এরূপ কোন কণা আছে কি? বিজ্ঞানীরা এ-রকম কণার অস্তিত্বের প্রমাণ

পেয়েছেন—যদিও এই কণা একদম ধরা-ছোঁয়ার বাইরে (অবশ্য আজ পর্যন্ত)। এই কণারই নাম দেওয়া হয়েছে নিউট্রিনো।

আমরা জানি যে, পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত নিউক্লিওনের প্রায় * অর্ধেকটা বিদ্যুন্মুক্ত এবং বাকী অংশটা ধনাত্মক বিদ্যুৎ-যুক্ত; যেমন—হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে দুটি নিউট্রন, এবং দুটি প্রোটন, লিথিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে তিনটি নিউট্রন ও তিনটি প্রোটন। এই রকম সব পরমাণুর কেন্দ্রেই নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন থাকে। কোন উপায়ে যদি পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত প্রোটন বা নিউট্রনের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া যায় (এবং সেটা করা বর্তমান যুগে সম্ভবও হয়েছে), তা হলে কি হবে? পরমাণুর কেন্দ্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক নিউট্রন ও প্রোটন বেশ নিশ্চিন্তে ছিল, অনেকটা সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করবার মত। সেই সুখের সংসারে যদি বাড়তি নিউট্রন বা প্রোটন এসে হাজির হয়, তবে সেখানে একটু ওলটপালট হবে বই কি! Musical chair খেলাতে চেয়ারের সংখ্যা যখন প্রতিযোগীদের তুলনায় কম থাকে, তখন দু-একজনকে বিমুখ হয়ে তাঁবুতে ফিরে যেতেই হয়। পরমাণুর কেন্দ্রে যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক নিউট্রনের চেয়ে বেশী সংখ্যক নিউট্রন এসে পড়ে, তখন এক বা একাধিক নিউট্রন ঋণাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত ইলেকট্রন কণা বিচ্ছুরিত করে প্রোটনের রূপ পরিগ্রহ করবে—কেন্দ্রে নিউট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা আগের চেয়ে অন্য রকম হবে; অর্থাৎ আগের পরমাণু অন্য পরমাণু হয়ে যাবে। যেমন—বোরন পরমাণুর কেন্দ্রে একটা বাড়তি নিউট্রন এলে বোরন পরমাণু কার্বন পরমাণুতে রূপান্তরিত হবে এবং একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত ইলেকট্রন উৎসারিত হবে। তেমনি পরমাণু কেন্দ্রে যদি বাড়তি প্রোটন এসে হাজির হয়, তবে এক বা একাধিক প্রোটন ধনাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত ইলেকট্রন (পজিট্রন) উৎসারিত করে নিউট্রনের রূপ পরিগ্রহ করবে এবং এক্ষেত্রেও পরমাণুটি অন্য পদার্থের পরমাণুতে রূপান্তরিত হবে। যেমন—নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে একটি বাড়তি প্রোটন এলে নাইট্রোজেন পরমাণু কার্বন পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় এবং একটি পজিট্রন কণা উৎসারিত হয়। বিজ্ঞানের সাঙ্কেতিক ভাষায় *—

$$\underset{5}{B^{11}} + \underset{0}{n^{1}} \rightarrow \underset{6}{C^{12}} + \underset{-1}{e^{0}}$$

$$\underset{6}{N^{12}} + \underset{1}{H^{1}} \rightarrow \underset{6}{C^{13}} + \underset{+1}{e^{0}}$$
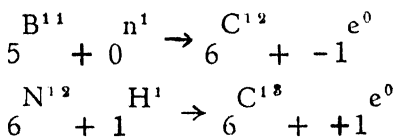
এই ভাবে যে ইলেকট্রন বা পজিট্রন উৎসারিত হবে, সেই ইলেকট্রনের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি থাকবে। কাজেই আমরা আশা করতে পারি যে, এই ভাবে উৎসারিত ইলেকট্রন বা পজিট্রন একই গতিতে পরিভ্রমণ করবে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, ঐ ইলেকট্রন বা পজিট্রনগুলির গতিবেগ এক নয়, তাদের গতীয় শক্তি শূন্য থেকে আরম্ভ করে একটি নির্দিষ্ট উচ্চ

---

* এখানে প্রায় কথাটি লক্ষণীয়—কারণ বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা পারমাণবিক ভর ও পারমাণবিক সংখ্যার (Atomic Number) উপর নির্ভর করে, সব সময়েই অর্ধেক অর্ধেক হয় না।

* $\underset{5}{B^{11}}$ অর্থ হলো বোরন পরমাণু যার প্রোটন সংখ্যা ৫ এবং নিউট্রন সংখ্যা (১১ – ৫) = ৬।

$\underset{0}{n^{1}}$ অর্থ নিউট্রন। $\underset{-1}{e^{0}}$ অর্থ ইলেকট্রন। $\underset{+1}{e^{0}}$ অর্থ পজিট্রন। $\underset{1}{H^{1}}$ অর্থ প্রোটন। $\underset{6}{C^{12}}$ অর্থ কার্বন পরমাণু, যার প্রোটন সংখ্যা ৬ এবং নিউট্রন সংখ্যা (১২ – ৬) = ৬।

$\underset{6}{N^{12}}$ অর্থ নাইট্রোজেন পরমাণু, যার প্রোটন সংখ্যা ৬, নিউট্রন সংখ্যা (১২ – ৬) = ৬।

$\underset{6}{C^{13}}$ অর্থ কার্বন পরমাণু যার প্রোটন সংখ্যা ৬, নিউট্রন সংখ্যা (১৩ – ৬) = ৭।

সীমা পর্যন্ত হতে পারে। কাজেই বিজ্ঞানীরা ভাবনায় পড়ে গেলেন। এই সব পরমাণুর রূপ বদলের সময় কোন কণা সৃষ্টি হতেও দেখা যাচ্ছে না, অথবা কোনরূপ বিকিরণও বিচ্ছুরিত হয় নি। কাজেই "চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে।" কি চুরি হয়েছে?—শক্তি। বিজ্ঞান-জগতে একটি খুব মূল্যবান জিনিষ হলো এই শক্তি। কারণ শক্তি নিত্য, এর সৃষ্টি বা বিনাশ সম্ভব নয়, সম্ভব শুধু রূপান্তর। শক্তির নিত্যতা মিথ্যা প্রমাণিত হলে বিজ্ঞানের বহু সত্যই মিথ্যা হয়ে যাবে, সব বিজ্ঞানসৌধ ভেঙ্গে পড়লেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সেই শক্তির সম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই বিজ্ঞানীরা ধরে নিলেন, উপযুক্ত পরীক্ষার সময় কেউ না কেউ শক্তি চুরি করেছে এবং সে জন্যেই ইলেকট্রন বা পজিট্রনগুলি বিভিন্ন গতিতে উৎসারিত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক পাউলি বললেন, এই চোর আর কেউ নয়, এর নাম হচ্ছে নিউট্রিনো, যার ভরের পরিমাণ ইলেকট্রনের ভরের চেয়ে বেশী নয় (বস্তুতঃ অনেক, অনেক কম) এবং যা কোনরূপ বিদ্যুতাবিষ্ট নয়। নিউট্রিনোর ভর খুবই কম এবং এরা বিদ্যুতাবিষ্টও নয়। কাজেই কোন যন্ত্রেই এদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে না, অথচ এরাই যে শক্তি চুরি করেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নইলে শক্তি যাবে কোথায় এবং শক্তির নিত্যতা মিথ্যা হলে সবই যে বানচাল হয়ে যায়।

না, শুধু এই কথা বললেই সবটুকু বলা হবে না। শক্তির হিসাব মিলছে না, শক্তির নিত্যতা মিথ্যা হবে, বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব ও তথ্য মিথ্যা হবে শুধু এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতেই নিউটিনোর কল্পনা করা হয় নি। নিউট্রিনো নিশ্চয়ই এসেছিল এবং খানিকটা শক্তি নিশ্চয়ই চুরি করে সবার অলক্ষ্যে সরে পড়েছে! এই চোরকে দেখা যায় নি, ধরাও যায় নি; দেখা বা ধরা যাবেও না। কিন্তু চোর যখন পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে একটি 'রুমাল' ফেলে গেছে। সেই রুমালে স্পষ্ট করে নাম লেখা আছে—নিউট্রিনো। কাজেই নিউট্রিনোই যে শক্তি চুরি করেছে, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

এখন এই রুমালের কথা বলি। যখন আমরা বন্দুক ছুঁড়ি, তখন গুলি বের হবার সময় বন্দুকটি পিছন দিকে একটা ঠেলা দেয় এবং কাঁধে একটু ঝাঁকুনি লাগে। কামান থেকে গোলা বর্ষণের সময় কামান পিছন দিকে হটে আসে। এই যে পিছন দিকে আসা বা প্রত্যাগতি, এর গতিবেগ, ভরবেগ অর্থাৎ মোমেণ্টামের সূত্র অনুসারে অঙ্ক কষে নির্ভুলভাবে বের করা যায়। কাজেই পরমাণুর কেন্দ্র থেকে যখন ইলেকট্রন বা পজিট্রন উৎসারিত হবে, তখন এই রকম প্রত্যাগতি আশা করা যেতে পারে। পরীক্ষার সাহায্যে এই প্রত্যাগতি প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, ইলেকট্রন বা পজিট্রনের যে গতিবেগই হোক না কেন, পরমাণু-কেন্দ্রের প্রত্যাগতি-বেগ সব সময়েই সমান থাকবে, কখনো কম বা বেশী হবে না। সাধারণ বলবিদ্যার নিয়ম অনুসারে তা হওয়া উচিত নয়, অর্থাৎ গুলি বা গোলা যাই ছোঁড়া যাক না কেন, পশ্চাৎ দিকে ঠেলা দেওয়াটা একই জোরের হওয়া স্বাভাবিক নয়। এই অসম্ভব ব্যাপারের ব্যাখ্যাও ঐ নিউট্রিনোর সাহায্যেই দেওয়া যায়। পরমাণু-কেন্দ্র থেকে যে সময়ে ইলেকট্রন বা পজিট্রন উৎসারিত হয়, সেই সময়ে নিউট্রিনোও উৎক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এই নিউট্রিনোই বাড়তি শক্তিটুকু নিয়ে নেয়। যদি উৎসারিত ইলেকট্রন বা পজিট্রনের গতিবেগ বেশী হয় তবে নিউট্রিনোর গতিবেগ হয় কম, আর যদি উৎসারিত ইলেকট্রন বা পজিট্রনের গতিবেগ কম হয়, তবে নিউট্রিনোর গতিবেগ হয় বেশী এবং সে জন্যে সব সময়েই পরমাণু-কেন্দ্রের প্রত্যাগতি-বেগ সমান থাকে। এই হলো নিউট্রিনোর ফেলে যাওয়া 'রুমাল', যা থেকে সে ধরাছোঁয়ার বাইরে হয়েও ধরা পড়ে গেছে।

ইলেক্‌ট্রনিক কম্পিউটার

শ্রীশিবনারায়ণ চক্রবর্তী

উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ছিল জীবন বিষয়ে নিরুত্তর। বিংশ শতাব্দীতে বায়োকেমিষ্ট্রির সাধনা চলেছে, জীবনের বাস্তব রহস্য উদ্ঘাটনে; আর অটোমেশন সার্ভো মিকানিক্স প্রভৃতি চেষ্টা করছে; মানব-মনের অনুকরণ করতে। ১৯৫৩ সালে ম্যাঞ্চেষ্টার সহরের ফেরান্টি কোম্পানী ইলেক্‌ট্রনিক কম্পিউটার আবিষ্কার করে বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। গণিত ও পদার্থ-বিদ্যার সমবেত চেষ্টায় তৈরী এই যন্ত্র চোখের পলকে কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবং জটিল সমস্যার সমাধান করে মননশীলতায় মানব-মনকে হারিয়ে দিতে বসেছে। ট্যাবুলেটিং, ক্যালকুলেটিং ও টেলিপ্রিণ্টার মেসিনকে একত্র করে ইলেক্‌ট্রনিক কম্পিউটার তৈরীর উপায় সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করেছিলেন বিগত শতাব্দীতে চার্লস্ ব্যাবেজ নামে একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী। কিন্তু অর্থের অভাবে তিনি তাঁর পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে পারেন নি। প্রশ্নের উত্তর, সমস্যার সমাধান প্রভৃতি কাজের জন্যে বর্তমানে যে সব কম্পিউটার উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলিকে বিভিন্ন দায়িত্বসম্পন্ন অসংখ্য কর্মীর এক বড় প্রতিষ্ঠান অথবা মানসিক শ্রমের কারখানার সঙ্গে তুলনা করা চলে। এতে একজন অপারেটার বিশেষ রকমের টাইপ-রাইটারের সাহায্যে প্রথমে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় কাজের নির্দেশ জানিয়ে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্দেশ ম্যাগ্‌নেটিক ফিতার উপর সঙ্কেতে পরিণত হয়। কম্পিউটার তখন সেই সঙ্কেত যন্ত্রের ব্রেন, অর্থাৎ মূল কেন্দ্রে পাঠায়। সঙ্কেত পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রেন তাঁর লক্ষ লক্ষ ইলেক্‌ট্রনিক টিউব কাজে লাগিয়ে দেয় এবং সেই সঙ্গে উত্তরটা কোন্ ধরণের হবে, তার একটা ছক্ বা খসড়া করে রাখে। পরে ঐসব বিভিন্ন টিউব থেকে তথ্যাদি পাবার পর কেন্দ্রীয় যান্ত্রিক কৌশল সেই ছকের পাদপূরণ করে প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ উত্তরের নকলও রক্ষিত হয়। এভাবে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়তো হাজার হাজার আঙ্কিক গণনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কম্পিউটারে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ এই যন্ত্রের প্রতি সেকেণ্ডে ৪০-৫০ হাজার যোগ-বিয়োগ প্রভৃতি অঙ্ক কষা এবং হিসাব করবার ক্ষমতা আছে। তাই কেন্দ্রীয় নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ সার্কিটে ইলেক্‌ট্রনিক চোখ জলে ওঠে এবং নিমেষের মধ্যে প্রিণ্টার মেসিনের কাছে উত্তর এসে পৌছায়। এই মেসিনের টাইপ করবার ক্ষমতা হচ্ছে—মিনিটে ১৫ হাজার লাইন। তাছাড়া এই উত্তর কথায়, অঙ্কে অথবা ছবি এঁকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা এই প্রিণ্টার মেসিনের আছে। তাছাড়া মজার ব্যাপার এই যে, নিজের হিসাবের ভুলচুক ধরবার ক্ষমতাও আছে কম্পিউটারের।

১। গত বছর ব্রাসেল্‌সের বিশ্বমেলায় আমেরিকার প্রদর্শনী-মণ্ডপে একটি ইলেক্‌ট্রনিক কম্পিউটার আনা হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ৪ সাল থেকে সুরু করে ১৯৫৮ সাল অবধি—এই ১৯৬২ বছরের প্রত্যেক সালের প্রধান প্রধান ঘটনার বিবরণ ছিল এর ভিতরে সন্নিবিষ্ট এবং প্রশ্ন করবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী রাশিয়ান প্রভৃতি ১০টা ভাষার যে কোন ভাষায় সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছিল এর কাজ। লেখকের এক বন্ধু জানতে চান ১৯৪৫ সালের ঘটনা ইংরেজীতে, আর লেখক ১৯১৯ সালের ঘটনা জানতে চান রাশিয়ান ভাষায়।

এক সেকেণ্ডের অনেক কম সময়ে উত্তর এল, ১৯১৯ সালে ভার্সাইয়ের সন্ধিপত্র লেখা কাচের ঘরে বসে (রাশিয়ান ভাষায় উত্তর); আর ১৯৪৫ সালে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মৃত্যু (ইংরেজীতে উত্তর)। অপর কেউ হয়তো জানতে চাইলেন ১৭৮০ ও ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা জার্মান ভাষায়। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল ঐ ভাষায়। ১৪৮০ সালে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির প্যারাসুট আবিষ্কার ও ১৭৬৬ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে মোজার্টের প্রথম অপেরা লেখা।

২। ইটালীতে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে ডেড-সি-স্ক্রোলের এর লুপ্ত পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। শব্দ সংগ্রহ ও প্রয়োজন মত সেগুলিকে ব্যবহার করা অবশ্য এই যন্ত্রের পক্ষে অতি সাধারণ ও নিত্যকার কাজ। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে কম্পিউটারের কৃতিত্ব ছিল, আগে ও পরের শব্দ বা বাক্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাঝখানের হারিয়ে-যাওয়া এক বা একাধিক শব্দ বা বাক্য খুঁজে বের করা। আর এভাবে ঠিক পাঠোদ্ধার হলো কিনা, তাও পরীক্ষা করে দেখা। কম্পিউটার উদ্ধার-করা পাঠের ভিত্তিতে জানা কথাগুলিকে যাচাই করে দেখে।

৩। আজকাল বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি অনুবাদের বিশেষ প্রচলন হয়েছে। এজন্যে প্রথমে মাঝামাঝি ধরণের একটা ইংরেজী শব্দকোষের প্রত্যেক শব্দকে একটা করে সাঙ্কেতিক নম্বর দেওয়া হয়। পরে ঐ শব্দের অর্থ-বোধক রাশিয়ান, জার্মান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি শব্দকে সেই নম্বরের তালিকায় ফেলা হয়। তারপর প্রয়োজন শুধু (রাশিয়ান থেকে ইংরেজীতে অনুবাদের জন্যে) রাশিয়ান সাঙ্কেতিক নম্বরের ফিতা মেসিনে পরিয়ে দিয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে ইংরেজী শব্দ বেছে নেওয়া। এতে প্রথম প্রথমে অবশ্য এক-আধটুকু অর্থের অসঙ্গতি ঘটেছিল; কিন্তু অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির ফলে কম্পিউটার এখন নিজেকে যথেষ্ট শুধরে নিয়েছে। শোনা গেছে, এভাবে প্রথম পরীক্ষায় Out of sight, out of mind-এর রাশিয়ান অনুবাদ হয়েছিল—Invisible and insane.

ইংল্যাণ্ডের হার্টফোর্ডশায়ারের এক কারখানায় একটা ইলেকট্রনিক কম্পিউটার আরো কম্পিউটার তৈরীর তদারক ও ব্যবস্থা করছে। অনেক ক্ষেত্রে দোকানের কর্মচারীরা কম্পিউটারের নির্দেশে কাজ করছে, আর পাঞ্চ করা কার্ডে তাদের রিপোর্ট বা বক্তব্য জানাচ্ছে। বাজার দর ও আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া, আইনের নজীর খুঁজে বের করা, রোগ নির্ণয় ও বেসুরা গান থেকে হারমনিক তৈরী করা এখন ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের দৈনিক কাজে পরিণত হয়েছে।

৫। লণ্ডনের কাছে সারে-র এক কারখানায় এক নতুন ধরণের মেসিন তৈরী হয়েছে, যার সাহায্যে কম্পিউটার এখন নিজেই ছাপা, টাইপ করা ইত্যাদি পড়ছে ও সঙ্কলন করে চলেছে লোকের সহায়তা না নিয়ে। তাছাড়া চেষ্টা চলছে, যাতে কম্পিউটার নিজের বের করা তথ্য সহজ ভাষায় প্রতি সেকেণ্ডে ৪০-৫০ লাইন লেখবার গতিতে লিখে যেতে পারে। বৃটেনের ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল লেবলেটরীতে আর এক ধরণের কম্পিউটার তৈরী হয়েছে, যাতে প্রশ্নের উত্তর বা সমস্যা সমাধানের জন্যে 'বেসিক ফ্যাক্টস্' সরবরাহের কোন প্রয়োজন হবে না। কম্পিউটার নিজেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে কাজ সুরু করবে। লোকের সাহায্য না নিয়ে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এখন লোকজন ও যানবাহনের ভীড় ঠেলে লরী চালাচ্ছে ও গাড়ী 'ব্যাক্' করছে।

৬। Mechanisation of thought processes-এর আন্তর্জাতিক অধিবেশনে গত বছর বৃটেনে কম্পিউটারের সাহায্যে অস্ত্রোপচারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে রোগীর পাল্স্, তাপ ও রক্তের চাপের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রেখে মানুষের

চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে অস্ত্রোপচার ও সেলাই করা সম্ভব হবে। এবারে বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনের ফল গণনায় ফেরান্টি কোম্পানীর পেগাসাস অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছে। মাত্র ১৭টা কেন্দ্রের নির্বাচনের ফলাফল বিচার করে পেগাসাস ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, রক্ষণশীল দলের জয় হবে, আর প্রায় নির্ভুল সংখ্যায় বলেছে, তারা মোট কত ভোট পাবে।

বিখ্যাত কম্পিউটার-বিজ্ঞানী ডাঃ এলান পার্লিন্‌স্ বলেছেন যে, আলাদিনের যাদু-প্রদীপের মত মানুষ মুখ দিয়ে যা চাইবে বা বলবে, কম্পিউটার তা করতে পারবে। বস্তুতঃ উন্নতিকামী মানুষের মত নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজেকে শুধ্‌রে নেবার চেষ্টা ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলেই মনে হয়। আশা করা যায়, এই কম্পিউটার একদিন সর্বতোভাবে মানুষের স্থান অধিকার করে বসবে।

কৃষিকার্যে রসায়ন

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে কৃষকেরা শিখলো যে, কালক্রমে তাদের জমির উর্বরতা কমে আসে এবং শস্যও উৎপন্ন হয় কম। পচা আবর্জনা দিয়ে চাষ করে জমির উর্বরতা বাড়াবার প্রথা প্রচলিত হলো। উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষজ্ঞদের মধ্যে জার্মান রসায়নবিদ লিবিগ উপলব্ধি করেন যে, কৃষি ও রসায়নের সংযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। বিভিন্ন জমির প্রকৃতি এবং জীবজন্তু ও গাছপালার পুষ্টি সম্বন্ধে তাঁর অনেক গবেষণা আছে। গবেষণার ফলে দেখা গেল—জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়াও গাছপালা বৃদ্ধির জন্যে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস, পটাসিয়াম প্রভৃতি আরও কয়েকটি মৌলিক পদার্থের আবশ্যক। তাদের মধ্যে নাইট্রোজেনই অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। গাছপালা কর্তৃক নাইট্রোজেন অপসারিত হলে জমিতে এই পদার্থটি আর পূরণ করা হয় না। আবর্জনার পরিবর্তে জমিতে সোডিয়াম নাইট্রেট যোগ করে খুব ভাল ফল পাওয়া গেল। চিলির খনি থেকে এই দ্রব্যটি পৃথিবীর সর্বত্র রপ্তানী হতে লাগলো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রতি বছর প্রায় তিন লক্ষ টন নাইট্রেট খরচা হচ্ছিল।

বিজ্ঞানীদের ভাবনা হলো যে, এভাবে খরচ হলে ভবিষ্যতে চাষের জন্যে নাইট্রেটের অভাব ঘটবে। তাঁরা জানেন, প্রত্যেক একর জমির উপর যতটা বাতাস আছে তাতে, নাইট্রোজেনের পরিমাণ প্রায় সাত কোটি পাউণ্ড। কিন্তু এই নাইট্রোজেন থাকে মুক্ত অবস্থায়, জীবজন্তু কিংবা গাছপালার কোন কাজে লাগে না—অবশ্য কয়েকটি বিশেষ গাছপালা ব্যতিরেকে। বাতাসের এই নাইট্রোজেনকে কাজে লাগানো যেতে পারে, যদি একে অন্য কোন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে আবদ্ধ করা যায়। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন—বজ্রপাতের সময় নাইট্রোজেন বায়ুতে আবদ্ধ হয়। বৃষ্টি এই নাইট্রোজেন বহন করে জমির উপর এনে দেয়, নাইট্রিক ও নাইট্রাস অ্যাসিডের আকারে। তারপর জমির ভিতরের জীবাণু রাসায়নিক পদার্থ দুটিকে গাছপালার গ্রহণোপযোগী করে তৈরী করে দেয়।

নরওয়ের বার্কল্যাণ্ড ও আইড নামে দু-জন বিজ্ঞানী বৈদ্যুতিক উপায়ে বাতাসের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন সংযোগ করে নাইট্রাস অক্সাইড পেলেন। এই পদার্থটিকে রাসায়নিক উপায়ে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত করা হয়। নাইট্রিক অ্যাসিড চুনাপাথরে

মিশিয়ে তৈরী হয় ক্যালসিয়াম নাইট্রেট। ক্যালসিয়াম নাইট্রেটই কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত প্রথম সংশ্লেষিত সার। কিছুকাল পরেই ফ্র্যাঙ্ক ও ক্যারো বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ৩০০০° ডিগ্রী সেন্টিগেড তাপমাত্রায় ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও বায়ুর নাইট্রোজেন সহযোগে ক্যালসিয়াম সায়েনামাইড তৈরী করেন। সায়েনামাইড আর্দ্র অবস্থায় অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে। তারপর জার্মেনীর রসায়নবিদ হেবার বায়ুর নাইট্রোজেন ও জলের হাইড্রোজেন মিলিয়ে অ্যামোনিয়া তৈরীর উপায় উদ্ভাবন করেন। জমিতে অ্যামোনিয়া মিশিয়ে দেবার নানাবিধ উপায় আছে।

যদিও সারের উপর জমির ফসলের গুণ ও পরিমাণ নির্ভর করে, তথাপি একমাত্র এটিই কৃষির উন্নতির সহায়ক নয়। নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গ, ছত্রাক জাতীয় রোগ এবং আগাছা, শস্যকে আক্রমণ করে এবং ফসল নষ্ট করে দেয়। এদের অনিষ্টকর ক্রিয়া প্রতিরোধ করবার জন্যে নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করা দরকার। ডি. ডি. টি, টক্সাফিন, এনড্রিন, ডাইয়েলড্রিন, হেপ্টাক্লোর, বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম আর্সেনেট প্রভৃতি কীটঘ্ন দ্রব্যসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

এনড্রিন ও ডাইয়েলড্রিন খুবই শক্তিশালী এবং বহুগুণসম্পন্ন। এদের একটি গুণ এই যে, জমিতে প্রয়োগ করলে গাছপালার পক্ষে হিতকারী জীবাণুকে ধ্বংস না করে মাটির নীচে উদ্ভিদের শিকড় ধ্বংসকারী পোকামাকড়ই বিনষ্ট করে। গুঁড়া, দানা কিংবা তরল অবস্থায় পদার্থ দুটিকে প্রয়োগ করা চলে। সার কিংবা বীজের সঙ্গেও একত্রে ব্যবহার করা যায়। বাড়ীঘরে পিঁপড়ে, আরশোলা প্রভৃতির বিরুদ্ধেও এগুলি প্রয়োগ করা যায়। রঙের সঙ্গে মিশিয়ে রান্নাঘরের দেয়াল. আসবাব প্রভৃতি রং করলে প্রায় দু-বছর পোকামাকড়ের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কৃষিকার্যে ব্যবহার করা যায়, এরূপ আরও কীটঘ্ন পদার্থ হলো—ক্লোর্ডেন, লিনডেন, পার্থেন, সিস্ট্যাক্স ও ম্যালাথিয়ন। কেবল গাছপালার উপকারের জন্যেই নয়, গোয়াল বা আস্তাবলে জীবজন্তু যাতে পোকামাকড়ের উপদ্রবে উত্যক্ত না হয়, এরূপ রাসায়নিক দ্রব্যও আবিষ্কৃত হয়েছে। একপ্রকার মাছি আছে যারা গরুর পিছন দিকে বসে রক্ত চুষে খায়। এতে গরু উত্যক্ত হয় এবং দুধও কম দেয়। মেথক্সিক্লোর গোয়ালঘরে ছড়িয়ে দিলে এরূপ মাছি আর আসতে পারে না এবং গরুও শান্তিতে থাকতে পারে। এই ব্যবস্থায় গরুর দুধ শতাংশের দশ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডি-ডি-টি মশকের বিরুদ্ধে, এমন কি, ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহক অ্যানোফিলিজ মশকের বিরুদ্ধেও ফলদায়ক। সান্নিপাতিক জ্বর, রক্তামাশয় প্রভৃতি রোগের জীবাণু বহনকারী সব রকম কীট-পতঙ্গের বিরুদ্ধেও ডি-ডি-টি প্রয়োগ করা চলে।

কেবল নানাপ্রকার কীটাণুর বিরুদ্ধেই নয়, উদ্ভিদের পক্ষেও মারাত্মক নানাপ্রকার রোগের বিরুদ্ধে কৃষককে সজাগ থাকতে হয়। বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর হয়, এরূপ অনিষ্টকারী কীটাণুর চেয়েও উদ্ভিদের ভিতরে রোগ বহন করে, এরূপ দুর্নিরীক্ষ্য জীবাণুকেই প্রতিরোধ করা অধিকতর দুঃসাধ্য। প্রায় ত্রিশ হাজার বিভিন্ন রোগ গাছপালাকে আক্রমণ করতে পারে। ছত্রাক, জীবাণু, ভাইরাস প্রভৃতি বাহিত প্রায় তিন-শ' রকমের বিভিন্ন রোগের দ্বারা গাছ আক্রান্ত হতে পারে। জীবাণু-ধ্বংসী অনেক প্রকার ফলপ্রদ রাসায়নিক দ্রব্য গত পনেরো বছরের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই দ্রব্যগুলি হলো—তামা, দস্তা ও পারাঘটিত যৌগিক পদার্থ এবং ক্লোরোকুইনোন ও ডাইথায়োকার্বামেট্স্ প্রভৃতি।

সম্প্রতি অ্যান্টিবায়োটিক্সও শস্যের রোগ নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে নিয়োজিত হচ্ছে। যে রহস্যময় ওষুধগুলি চিকিৎসায় আশ্চর্যজনক সাফল্য লাভ করেছে, তারা ফসলের রোগেও সমানভাবেই

কার্যকরী হতে পারে। বিজ্ঞানীরা ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, সাইক্লোহেক্সামাইড এবং টেরামাইসিন ব্যবহার করে উৎসাহিত হয়েছেন। অধুনা আবিষ্কৃত অ্যান্টিবায়োটিক্স, ফিলিপিনটোম্যাটো ও মটরকড়াই-এর বীজকে পচন থেকে রক্ষা করবার কাজে সাফল্য লাভ করেছে।

কেবল ফসলের রোগ প্রতিকারের জন্যেই নয়, পরন্তু যাতে কোন রোগ ফসলকে আক্রমণ করতে না পারে, এরূপ রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা হচ্ছে। এইটি হলো আধুনিকতম প্রচেষ্টা। কয়েক ক্ষেত্রে খানিকটা সুফলও পাওয়া গেছে। গবেষণা করবার সময় বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, কোন কোন জীবাণু বীজের খোলের ভিতর কিংবা বাইরে লেগে থাকে। আবার অনেক মারাত্মক জীবাণু রয়েছে জমিতে। বীজ বপন করলেই এরা আক্রমণ করে। বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেছেন যে, ফসল বৃদ্ধি হওয়ার আগেই এসব জীবাণু ধ্বংস করা আবশ্যক। পূর্বেই বীজে এরূপ রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করা দরকার, যাতে জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। ফর্ম্যালডিহাইডই প্রথমে এই কাজে নিয়োগ করা হয়। সম্প্রতি রসায়নবিদেরা রোগ-নিবারক জৈব ও অজৈব অনেক রকম পদার্থ সংশ্লেষণ করেছেন। এসব হলো—পারাঘটিত যৌগিক পদার্থ, গন্ধকঘটিত জৈব পদার্থ এবং কুইনোন শ্রেণীর। বীজ বপন করবার আগেই জমির ভিতরে যে সব অনিষ্টকর জীবাণু রয়েছে তাদের ধ্বংস করবার জন্যে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে; যেমন—ক্লোরো-পিক্রিন, মিথাইল ব্রোমাইড, এথিলিন ডাই-ব্রোমাইড ও ক্লোরোপ্রেনেস। এসব রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে ফসলের পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

কীট-পতঙ্গ ও রোগ ছাড়াও ফসলের আর একটি শত্রু হলো আগাছা। এসব আগাছা শস্যের জন্যে নির্দিষ্ট জল ও সার দখল করে নেয়, জল সেচনের খাল বন্ধ করে দেয়, জীবজন্তুকে বিষদুষ্ট করে এবং অনিষ্টকর কীট-পতঙ্গের জন্মস্থান হয়ে দাঁড়ায়। চিরকাল মানুষ হাত দিয়েই এই আগাছা পরিষ্কার করেছে। কিন্তু কিছুকাল হলো রসায়ন-বিদেরা আগাছা নষ্ট করবার জন্যে রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। বিজ্ঞানীরা জানেন যে, মানুষ ও জীবজন্তুর বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্যে হর্মোন অত্যা-বশ্যক। সংশ্লেষিত হর্মোন গাছপালার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করবার পক্ষে কিরূপ ফলদায়ক, এসব গবেষণা করতে গিয়ে তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ গাছপালার পক্ষে অনিষ্টকর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই আগাছার পক্ষে মারাত্মক এক রকমের রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হলো। এই দ্রব্যটির সাঙ্কেতিক নাম ২,৪-ডি; রাসায়নিক পরিভাষায়—ডাইক্লোরো ফেনোক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড। সৌভাগ্যক্রমে এই দ্রব্যটি কেবল চওড়া পাতার আগাছাকেই ধ্বংস করতে পারে, শস্যাদি পর্যায়ের অপ্রশস্ত পাতার গাছের কোন অনিষ্ট করে না। এক এক জাতীয় আগাছা নষ্ট করবার জন্যে এক একটি রাসায়নিক উদ্ভাবিত হয়েছে। ২, ৪, ৫-টি (২,৪,৫-ট্রাইক্লোরো ফেনোক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড) কাঠজাতীয় আগাছা এবং টি সি-এ (ট্রাইক্লোরো অ্যাসেটিক অ্যাসিড) ঘাসজাতীয় আগাছাকে ধ্বংস করে। উপরিউক্ত তিন প্রকার পদার্থ দিয়ে কৃষক যে কোন প্রকার আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর এক প্রকার ইউরিয়া-ঘটিত পদার্থ—সি-এম-ইউ জমিকে আগাছার পক্ষে অনুর্বর করে দেয়। কাজেই আগাছার বীজ আর অঙ্কুরিত হতে পারে না।

রসায়নবিদেরা অন্য এক শ্রেণীর পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন, যারা উদ্ভিদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। উদ্ভিদের এরূপ একটি হর্মোন হলো—ইণ্ডোল ব্যুটাইরিক অ্যাসিড। এই দ্রব্যটি টোম্যাটো গাছের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে যে ফল পাওয়া যায়, তা বিচিশূন্য এবং আকারে ও স্বাদে অনেক উন্নত। আর একটি

হর্মোন হলো—ইণ্ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড, যা আপেল, পাইন প্রভৃতি গাছের কাটা ডালে প্রয়োগ করলে তাড়াতাড়ি শিকড় গজায়।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী রাসায়নিক প্রয়োগ করলে আপেল, কমলালেবু প্রভৃতি গাছের ফল অকালে ঝরে পড়া নিবারিত হয়। ২,৪-ডি দ্রব্যটি এ-বিষয়ে খুব উপকারী। হর্মোন ছড়িয়ে দিলে ফলের গাছের অতিরিক্ত মুকুল পড়ে যায়; কাজেই খারাপ ফলের সংখ্যাও কমে যায়। দরকার হলে এই উপায়ে গাছের ফলোদ্গম দেরীতে করানো যায়, যদি তৎকালীন আবহাওয়া তুষার প্রভৃতির জন্যে অসন্তোষজনক হয়। হর্মোন প্রয়োগ করলে গুদামে রক্ষিত আলু ও পেঁয়াজ চার মাস পর্যন্ত অঙ্কুরিত হয় না। এই সম্বন্ধে আরও গবেষণা হচ্ছে। উদ্ভিদের হর্মোন কৃষিকার্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে।

রসায়নের আর দুটি সাম্প্রতিক কৃতিত্ব হলো, শস্যকে পত্রবিহীন করা ও জমিকে শস্য-বৃদ্ধির উপযোগী অবস্থায় রাখা। ক্যালসিয়াম সায়েনামাইড প্রয়োগ করলে কার্পাস গাছের পাতা পড়ে যায়, কিন্তু ফসলের কোন ক্ষতি হয় না। এই অবস্থায় যান্ত্রিক উপায়ে ফসল আহরণ করা খুবই সুবিধাজনক। উদ্ভিদকে পত্রবিহীন করবার প্রায় এক ডজন দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

জমি শিথিল ও সরন্ধ্র হলেই শস্য-বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়। বীজ অঙ্কুরিত হওয়া এবং চারাগাছ বৃদ্ধির জন্যে জমির এই দুটি অবস্থা বিশেষ আবশ্যক। নিরেট জমিতে বায়ু ও জল ভাল ঢুকতে পারে না। কাজেই অঙ্কুরোদ্গম ভাল হয় না; কাজেই উদ্ভিদ ও ফসল হয় খারাপ। যে সব রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে জমির অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব, বাজারে তাদের নাম হলো—ক্রিলিয়াম, ক্রাকিয়াম, মার্লোম ও এক্রিলন। এসব দ্রব্য সেলুলোজ, লিগ্নিন, পলিভিনাইল ও সিলিকেট থেকে উৎপন্ন। যদিও এসব রাসায়নিক পদার্থের কার্যকারিতা খুবই সন্তোষজনক, তথাপি কৃষিকার্যে এদের ব্যাপক ব্যবহার বহু ব্যয়সাপেক্ষ। কাজেই বর্তমানে এগুলি ব্যবহৃত হয়—বৃক্ষলতাদি রক্ষা করবার গৃহে, চারাগাছের বাগানে, ছোট জমিতে—যেখানে কোন বিশেষ ফসল পরীক্ষা হয় এবং বাড়ীর সৌখীন বাগানে।
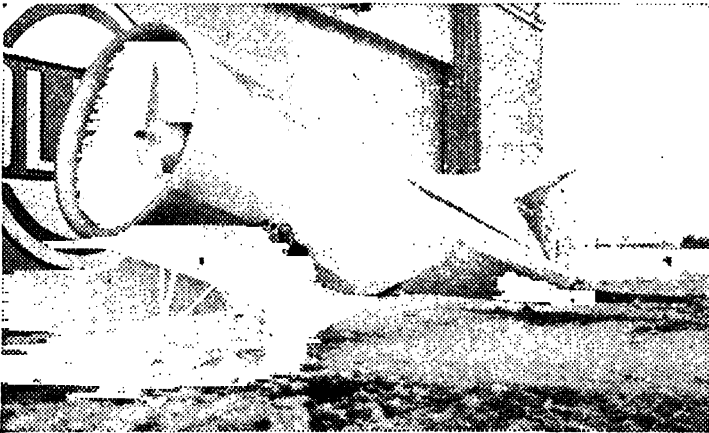
যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ আলেকজাণ্ডার লিপিক এরোডাইন নামে ডানাশূন্য একরকম নূতন এরোপ্লেন উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই অভিনব এরোপ্লেনটি সোজা উপরে উঠিতে বা নীচে নামিতে সক্ষম। প্লেনের তলায় ছিদ্রপথে নির্গত বায়ু এবং সামনের বাতাসের চাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্লেনটি যে কোন দিকে চলিতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ায় এখন ইহার উড্ডয়ন পরীক্ষা চলিতেছে।

চা-এর কথা

শ্রীসুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীতে যত চা ব্যবহৃত হয়, তার অর্ধেকেরও বেশী উৎপন্ন হয় আসামে। সমস্ত দুনিয়ার লোক আসামের চা পান করে। গোটা আসাম উপত্যকা যেন চা-পাতার সবুজ রঙে আচ্ছাদিত। কবিত্ব করে আসামকে তাই বলা হয়—'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি'র দেশ।

চা একটি কাঁচা মাল। পাট থেকে যেমন পাটকল, চা থেকে তেমনি চা-কল বা চা-শিল্প গড়ে উঠেছে। চা-পাতাকে যেখানে চা-শিল্পের পণ্যে পরিণত করা হয়, শ্রমিকদের ভাষায় তার নাম চাংঘর।

আসামে কয়েক হাজার ছোট-বড় চা-বাগান আর চাংঘর রয়েছে। সবচেয়ে বড় চা-বাগান পানিতালা,—তিনসুকিয়ার পরের ষ্টেশন। লখিমপুর জেলার পোয়াই হলো দ্বিতীয় বৃহত্তম চা-বাগান। এই বাগানের কারখানা বা চাংঘরকে কেন্দ্র করেই আমরা এখানে আলোচনা করবো।

চায়ের কল-ঘরের যন্ত্রপাতিগুলি ডিজেল তেলে চলে; অর্থাৎ এগুলি অয়েল-মেসিন। তবে বিদ্যুৎও ব্যবহৃত হয়। এজন্যে ডায়নামো আছে। একটি আধুনিক রোলিং মেসিনের দাম সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার মত। এই মূল রোলিং মেসিনটি মিনিটে ৬০০ বার ঘোরে। যন্ত্রগুলি দানবাকৃতির।

চা-পাতা তুলে আনবার পর প্রথমে মোটা তারের জালের মেঝেতে শুকোতে দেওয়া হয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনতলা চারতলা বাড়ী—এক একখানা মাঠের মত মেঝে, তারের জাল চট দিয়ে মোড়া। এখানে রোদ পড়তে পায় না। সিলিং বা মেঝের উপরের ছাতগুলি খুব নীচু। অর্থাৎ এই মেঝেগুলি বিরাট এক-একটা তাকের মত। এখানে সবুজ পাতা ঠাণ্ডায় শুকানো হয়। সাধারণতঃ ১৬ থেকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত চা-পাতা এখানে থাকে। এই ঘরের নামই চাংঘর।

চাংঘর থেকে শুকনো পাতা নিয়ে এসে ফেলা হয় পেষাই কলে। চা-পাতাগুলি এখানে যাঁতাকলে পেষা হয়। এই যাঁতাকলগুলি বিরাট আকৃতির। এই পেষাই কলে কাঁচাপাতার রস ঝরে গিয়ে নীচে পড়ে যায় এবং পাতাগুলি কতকটা মণ্ডের মত হয়ে পড়ে।

পেষাই কল থেকে রস-নিঃশেষিত মণ্ডের মত চা-পাতাগুলিকে আনা হয় কর্তন-যন্ত্রে। এই যন্ত্র হলো এক রকমের করাত। পাতাগুলিকে এখানে ঝুরঝুরে করে কাটা হয়।

এরপর নিয়ে আসা হয় ষ্ট্রেনার বা ছাকনি কলে। এখানে গুঁড়া গুঁড়া করে চেরা চা-পাতাগুলিকে ছাঁকা হয়, যাতে মোটা ডাঁটি বা আকাটা পাতাগুলি পৃথক হয়ে যেতে পারে। এগুলিকে ফের কর্তন-যন্ত্রে ফেলে কেটে নেওয়া হয়। কাটবার পর যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাকে বলে Farmenting.

ষ্ট্রেনার বা চালুনি-কলগুলি দেখতে বড় বড় রোলারের মত, তারের জাল দিয়ে তৈরী—ঝাঁঝরি দিয়ে সরু করে কাটা পাতা চালা হয়ে যায়, মোটা পাতা থেকে যায় ভিতরে। এরপর গুঁড়া চাগুলি ঠাণ্ডা ঘরে বিছিয়ে দেওয়া হয়। এই ঠাণ্ডা ঘরগুলি হলো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এই ভাবে এই ঠাণ্ডা-ঘরে চা শুকিয়ে নেওয়া হয়।

ঠাণ্ডা ঘর থেকে এনে চা ফেলা হয় শুষ্ক করবার জন্যে ড্রায়ার যন্ত্রে। ড্রায়ার হলো চা-পাতা ভাজবার কল। বড় বড় চুল্লীর উপর এই যন্ত্রগুলি বসানো থাকে। এতক্ষণ পর্যন্ত পাতাগুলি ছিল সবুজ,

এবার কিন্তু কালো হয়ে যায়; অর্থাৎ আমরা যে চা দেখি, ভাজা হওয়ার পর সেই চায়ের রূপ লাভ করে।

ড্রায়ার থেকে ভাজা গুঁড়া চা অন্য একটা ঘরে আনা হয়। এই ঘরে আছে সর্টিং মেসিন—এখানে চায়ের গুণানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা হয়। সর্টিং মেসিনের বাংলা নাম দেওয়া যেতে পারে, বাছাই কল। বাছাই কলগুলিতে নয়টা চোঙের মত কাঠের নল বা মুখ থাকে। এক-একটা চোঙ থেকে এক-এক গুণসম্পন্ন চা বেরিয়ে আসে। নয়টি চোঙ দিয়ে গুণানুযায়ী নয় রকমের চা পাওয়া যায়; যেমন—

(১) F. B. O. P; (২) O. P; (৩) B. O. P; (৪) B. O. P. F; (৫) Pekoe; (৬) B. P; (৭) B. P, S; (৮) P. F; (৯) Dust. সংক্ষিপ্ত বর্ণগুলির পূর্ণ অর্থ হলো—F=Flury; B=Broken; O=Orange; P=Pekoe; S=Sushan.

সর্টিং মেসিন থেকে বাছাই হওয়া চা নিয়ে আসা হয় আরেক রকম ষ্ট্রেনার বা ঝাড়াই কলে। চালুনি কলের মত ঝাড়াই কলে রোলিং ব্যবস্থা বা জাল নেই—আছে বৈদ্যুতিক পাখা। পাখার বাতাসে চায়ের মধ্যে যত ধূলাবালি ও অন্য যেসব আবর্জনা থাকে, সেগুলি উড়ে গিয়ে নীচে জমা হয়। ফলে পরিষ্কার খাঁটি গুঁড়া চা পাওয়া যায়। খুব ভাল গুণসম্পন্ন চা আরো একবার ঝাড়া হয় এবং কামিনরা অ্যালুমিনিয়ামের চালুনি দিয়ে হাতে করেই সে কাজ করে থাকে।

এরপর ঐ চা বড় বড় প্লাই-উডের চৌকা বাক্সে প্যাক করা হয়। রাংতায় মোড়া ঐ প্লাই-উডের বাক্সগুলি ষ্টিনইয়ার্ড পরিমাপক যন্ত্রের উপর চাপানো থাকে। চা-বাগান ও চা-শিল্পের আনুসঙ্গিক হিসাবে কাছাকাছিই প্লাই-উডের বাক্স তৈরীর কারখানাও গড়ে ওঠে। আসামের মার্গেরিটা প্লাই-উড শিল্পে সমৃদ্ধ।

যে চা কলকাতায় ছোট ছোট প্যাকেটে বিক্রয় হয়, সেগুলি বিভিন্ন এজেণ্টদের মারফৎ পাওয়া যায়। ব্রুকবণ্ড, ডোষ, লিপটন, চাকদা প্রভৃতি এজেণ্টরা বিভিন্ন চা-কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করে সরাসরি বাগান থেকে চা আমদানী করে' নিজেদের সুবিধামত বিভিন্ন গুণের চা মিলিয়ে-মিশিয়ে স্বতন্ত্র রকমের গুণসম্পন্ন করে নেয়। যে গুঁড়া চা আমরা ব্যবহার করে থাকি, চা হিসাবে সেটাই নিকৃষ্টতম।

এক মণ সবুজ পাতা থেকে সাধারণতঃ ১০ পাউণ্ড চা পাওয়া যায়। পোয়াই বাগানে দৈনিক গড়পড়তা ১০০ মণ সবুজ পাতা তোলা হয়। তার মানে, রোজ ১০০০ পাউণ্ড চা তৈরী হয়, যার মূল্য কমপক্ষে বিশ হাজার টাকা।

শ্রমিকেরা সের পিছু চা-পাতা তোলবার জন্যে ছয় পয়সা পারিশ্রমিক পায়, অর্থাৎ মণ পিছু পৌনে চার টাকা শ্রমিকদের দেওয়া হয়। একমণ সবুজ পাতা থেকে ১০ পাউণ্ড চা পাওয়া গেলে কোম্পানী (ধরা যাক) পঁচিশ টাকা উপার্জন করে। শ্রমিকদের দৈনিক এক টাকা নয় আনা হাজিরার জন্যে দেওয়া হয়। অবশ্য অনুপস্থিতির জন্যে বেতন নেই। পোয়াই বাগানে চার হাজার শ্রমিক আছে। এদের সকলে যদি কাজে যোগ দিত, তাহলে শ্রমিকদের পাতা তোলবার ভাতাসহ বেতন বাবদ ব্যয় হতো বড়জোর আট হাজার টাকা। বাবুদের বেতন, হাসপাতাল, কোয়ার্টার্স, যন্ত্রপাতি, ম্যানেজারদের বেতন ও রাহাখরচ সব বাদ দিয়েই অন্ততঃ একটি বড় চা কোম্পানীর দৈনিক পাঁচ হাজার টাকা মুনাফা থাকে। বস্তুতঃ গত বছর পোয়াইয়ের Consolidated T. E. বাইশ লক্ষ টাকা মুনাফা করেছে। চা-এর ব্যবসা যে কত লাভজনক এ-থেকেই তা বোঝা যাবে। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের বৃহত্তম সূত্র হলো—চা-রপ্তানী।

ট্র্যানজিষ্টরের কথা

শ্রীসন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। যে সব বিষয় ছিল মানুষের অজ্ঞাত, আজ তা মানুষের মুঠার মধ্যে এসে গেছে। মানুষ বিদ্যুৎকে করেছে ক্রীতদাস। বিশেষ করে সে আশ্চর্য উন্নতি লাভ করেছে ইলেকট্রনিক্সে। এর ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমান যুগের ট্র্যানজিষ্টরও অন্যতম বিস্ময়কর আবিষ্কার। আমেরিকার একটি লেবরেটরীতে কার্যরত কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ট্র্যানজিষ্টর আবিষ্কার করেন, ১৯৪৮ সালে। সুতরাং এর বয়স খুব বেশী নয়।

এতদিন পর্যন্ত যে সব কাজ ভ্যাকুয়াম টিউবের সাহায্যে করা হতো, সে সবই ট্র্যানজিষ্টর সহজে এবং আরও ভালভাবে করতে পারে। ট্র্যানজিষ্টর হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক শক্তির আধার।

ট্র্যানজিষ্টর সাধারণতঃ প্রস্তুত করা হয় খুব কম ব্যবহৃত জার্মেনিয়াম নামে একটি ধাতু থেকে। এই ধাতুটি দুটি বিশেষ গুণের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জার্মেনিয়াম তামার মত বিদ্যুৎ-পরিবাহী, আবার কাচের মত অপরিবাহী।

যেহেতু ট্র্যানজিষ্টর সাধারণ ডায়োড-এর মত কাজ করে, সেই কারণে অনেক সময় একে জার্মেনিয়াম ডায়োড বলা হয়ে থাকে। সাধারণ ভ্যাকুয়াম টিউবের চেয়ে ট্র্যানজিষ্টরের অনেকগুলি সুবিধা আছে। যেমন—এর কোন সূক্ষ্ম ফিলামেণ্ট থাকে না এবং কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রারও প্রয়োজন হয় না, কাজ আরম্ভ করবার জন্যে। খুব কম শক্তিতেই ট্র্যানজিষ্টর কাজ করতে সক্ষম।

ছোট্ট একটি তাম্রমুদ্রাকে স্যাঁতসেঁতে কাগজে জড়ালে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, সেই শক্তিতেই ট্র্যানজিষ্টর কাজ করতে পারে। ট্র্যানজিষ্টর দেখতে খুবই ছোট। সাধারণ ভ্যাকুয়াম টিউব এর চেয়ে ছোট। সাধারণ ভ্যাকুয়াম টিউব এর চেয়ে অনেক বেশী ঘাতসহ এবং সেই কারণে এর জীবনীশক্তিও অনেক বেশী।

ট্র্যানজিষ্টর আবিষ্কারের পর থেকেই বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রে এর ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০টি বিভিন্ন রকমের ট্র্যানজিষ্টর তৈরী হয়েছে। সাধারণ ভ্যাকুয়াম টিউবের চেয়ে এ অনেক বেশী ইলেক্‌ট্রনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ট্র্যানজিষ্টর এখন বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার মধ্যে রেডিও, কানে শোনবার যন্ত্র প্রভৃতিতে আশাতীত ফল পাওয়া গেছে। উড়োজাহাজেও বিভিন্ন কাজে ট্র্যানজিষ্টর ব্যবহৃত হচ্ছে।

ট্র্যানজিষ্টর যে কত কম খরচে কাজ করে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই থেকে যে, একটি পাঁচ ভালভ-বিশিষ্ট রেডিও চালু রাখতে যেখানে ২২০ ভোল্টের প্রয়োজন, সেখানে মাত্র কয়েকটি টর্চের ব্যাটারীতে ট্র্যানজিষ্টর রেডিও চালানো সম্ভব। হাতে বহনযোগ্য রেডিও তৈরী করতে ট্র্যানজিষ্টর অপরিহার্য।

একটি মহান জীবনের কাহিনী

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ সেনশর্মা

সংসারে রোগ-শোকের আধিপত্য সত্ত্বেও আমরা বেঁচে আছি। তার কারণ আঁধারের পর আলোর মত পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এমন এক এক জন মানুষের আবির্ভাব ঘটে, যিনি মানুষকে রোগ-শোকের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্যে প্রাণপাত করে থাকেন। এরূপই একজন দরদী মানুষ, যিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধারের উপায় আবিষ্কার করে গেছেন, তাঁর নাম হলো সেলম্যান আব্রাহাম ওয়াক্সম্যান।

রাশিয়ার এক গণ্ডগ্রামে ১৮৮৮ সালের ২রা জুলাই ওয়াক্সম্যানের জন্ম হয়। তাঁর পিতার ছিল তামার তারের জাল তৈরীর এক কারখানা। সেই কারণেই বালক ওয়াক্সম্যানকে তিনি শিল্প-বিষয়ক রসায়নে সুদক্ষ করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বালকের মনে ছিল জীব-বিদ্যা অধ্যয়নের আগ্রহ। তাই চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯১০ সালে তিনি আমেরিকায় যান এবং শেষে জীবাণু-বিদ্যা নিয়ে রটগর্সের কৃষি-বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন। ১৯১৫ সালে সেখান থেকে স্নাতক বৃত্তি লাভের পর ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং ১৯১৮ সালে সেখান থেকে পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি নিয়ে আবার তিনি ফিরে আসেন পুরনো কলেজে (রটগর্সের কৃষি-বিজ্ঞান কলেজ), শিক্ষার্থী হিসাবে নয়—শিক্ষক ও গবেষক হিসাবে। এখনও এই বিজ্ঞানী ক্লাস রুম আর বীক্ষণাগারের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন। তাঁকে বলতে শোনা গেছে—ছাত্রদের আমি যা শিক্ষা দিই, তার চেয়েও বেশী শিক্ষা আমি তাদের কাছ থেকে পাই। কলেজের সন্নিকটে একটি ছোট্ট বাড়ীতে নিরুপদ্রব পরিবার নিয়ে বাস করছেন তিনি। পরিবারে আছেন তাঁর স্ত্রী বার্থা. ডি. মিটনিক ও একমাত্র পুত্র সন্তান। সেও একজন কৃতী চিকিৎসকের সম্মান লাভ করেছে।

ওয়াক্সম্যানের কর্মজীবনের আরম্ভ হয় রটগর্স-এর কৃষি-বিজ্ঞান কলেজেরই বীক্ষণাগারে। আঠাশ বছরের সুদীর্ঘ একনিষ্ঠ সাধনার মধ্যে দিয়ে এই বিজ্ঞানী অনুসন্ধান করেছেন এমনি এক রকম জীবাণুর, যা রোগবিশেষে মানুষের জীবন রক্ষায় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে।

ডারুইন দেখিয়েছেন যে, প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে জীবন-সংগ্রামে যারা যোগ্যতম, তারাই কেবল টিকে থাকতে পারে। এই চিন্তাধারাই সম্ভবতঃ ওয়াক্সম্যানকে তাঁর গবেষণায় অনুপ্রাণিত করে। তিনি ভাবতে থাকেন, মাটির তলায়ও হয়তো এমনি অনেক অদৃশ্য জীবাণু রয়েছে, যাদের মধ্যে চলেছে বেঁচে থাকবার জন্যে পারস্পরিক সংগ্রাম। আর সে সংগ্রামে তারা হয়তো আপন শক্তিতেই টিকে আছে। মানুষের রোগের অন্তরালেও হয়তো এমনি বহুবিধ জীবাণু ক্রিয়াশীল। তিনি ভাবলেন, মাটির ঐ শক্তিশালী জীবাণুগুলিকে দিয়ে যদি রোগোৎপাদক জীবাণুগুলির ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করা যায় তবে খুবই সুবিধা হয়। অনেকটা বিষে বিষক্ষয়ের মতই ব্যাপার। কিন্তু সংশয় থেকে যায় যে, যদি এই জীবাণুগুলিই অবশেষে মারাত্মক হয়ে উঠে' ঘরের শত্রু বিভীষণের মত মানুষের দেহেই তাদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, তবে তো অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠবে! নানাবিধ পরীক্ষার সাহায্যে তিনি সন্ধান করতে লাগলেন

যে, কোন্ জীবাণু মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে, আর কোন্‌টা ক্ষতিকারক হবে না। এই সব জীবাণু, যাদের জ্ঞাতিশত্রু হিসাবে কাজে লাগানো যায়, তাদের দেহ-নিঃসৃত অপর জীবাণু-ধ্বংসী রসকে বলা হয় অ্যান্টিবায়োটিক্স। ডাঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন নামক প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয় অ্যান্টিবায়োটিক ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের আবিষ্কারকই এই কাহিনীর উপজীব্য—তিনি হলেন ওয়াক্সম্যান।

এই কাজে বাধা ছিল প্রচুর। নিউ ব্রান্সউইকের মাটি থেকে সংগ্রহ করলেন তিনি একপ্রকার জীবাণু—ষ্ট্রেপটোমাইসেস গ্রিসিয়াস। প্রথমে আশাপ্রদ মনে হলেও দেখা গেল, রোগ-জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রাম করবার মত শক্তি এর নেই। ওয়াক্সম্যানের প্রাক্তন ছাত্র রেনী জুল ডুবস একপ্রকার জীবাণুর সন্ধান পান—তার নাম গ্রামিসিডিন। মানুষের শরীরের কোন জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রামের ক্ষমতা থাকলেও দেখা গেল যে, মানুষের শরীরের উপর এর

ওয়াক্সম্যান

তারপরে অবশ্য বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অক্লান্ত চেষ্টায় আরো বহু অ্যান্টিবায়োটিক্স আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আমেরিকান বিজ্ঞানী ডুগার্স আবিষ্কৃত ওরিওমাইসিন এবং বার্কহোল্ডার আবিষ্কৃত ক্লোরোমাইসেটিন। ওয়াক্সম্যানের কাজ যে খুবই দুরূহ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। কারণ

প্রভাব মারাত্মক। চরমতম বাধার সম্মুখীন হলেন ওয়াক্সম্যান ১৯৪১ সালে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে গবেষণার জন্যে প্রদত্ত অর্থ বন্ধের সিদ্ধান্ত করলেন। কয়েক বছরের সময় চাইলেন ওয়াক্সম্যান। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, তাঁর এই গবেষণা এখনো ব্যর্থ হয় নি।

১৯৪৩ সালের একদিন এক কৃষক তার একটি মোরগের রোগ নির্ণয়ের জন্যে তাকে রটগর্সের কৃষি-বিজ্ঞান কলেজে নিয়ে আসে। ঐ কলেজের পশুরোগ-বিশেষজ্ঞ মোরগের ক্ষতস্থান থেকে এক-প্রকার নতুন রকমের জীবাণুর সন্ধান পান এবং সেগুলি ওয়াক্সম্যানকে গবেষণার জন্যে পাঠিয়ে দেন। আগ্রহান্বিত ওয়াক্সম্যান ঐ জীবাণুগুলিকে সতর্ক-ভাবে পালন করতে থাকেন। তিনি ঐ জীবাণু-গুলির সঙ্গে তাঁর নব আবিষ্কৃত জীবাণুর বেশ একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। কিন্তু এই উভয় জীবাণুই পূর্বাবিষ্কৃত ষ্ট্রেপটোমাইসেস গ্রিসিয়াস থেকে পৃথক ছিল। কারণ তিনি টেষ্ট টিউবে রক্ষিত ক্ষয়রোগের তীব্রতম জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রামে এর ধ্বংসকারী ক্ষমতার পরিচয় পান। কিন্তু তাঁর মনে স্বাভাবিক-ভাবেই এই প্রশ্ন জাগলো যে, মানুষে শরীরের কি এর প্রভাব কার্যকারী হবে?

এই নবাবিষ্কৃত অ্যান্টিবায়োটিকের নাম দেন তিনি ষ্ট্রেপটোমাইসিন। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষে এই জিনিষটি খুবই কার্যকরী। যক্ষ্মারোগের প্রবলতম জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রামের সর্বপ্রথম অস্ত্র মানুষের হস্তগত হলো। নিউমোনিয়া, আমাশয়, গণোরিয়া রোগেও এর কার্যকারিতা দেখা গেল।

এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের জন্যে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকেই এই বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। রাশিয়া তাঁকে ১৯৪৬ সালে ১৫০০ রুবল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে এবং রেড অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স-এর সভ্য মনোনীত করে। বিনীত ভাবে তিনি স্বীকার করেছেন যে, ষ্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কারের পিছনে ডাঃ অ্যালবার্ট সাজ, ডাঃ রবার্ট এল. ষ্টার্কি, ডাঃ ফেডকক আর. বুদো এবং আরো বহু সহকর্মীর নীরব সাধনা জড়িত।

রটগর্স বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বেতন ৪৬২০ শিলিং থেকে ১০,০০০ শিলিং-এ বৃদ্ধি করা হয় এবং তাঁর আবিষ্কারের জন্যে বেতনের শতকরা দশ ভাগ অধিক অর্থ প্রদত্ত হয়। তিনি এই অর্থ রটগর্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক জীবাণু গবেষণা কেন্দ্রের ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে দান করেন।
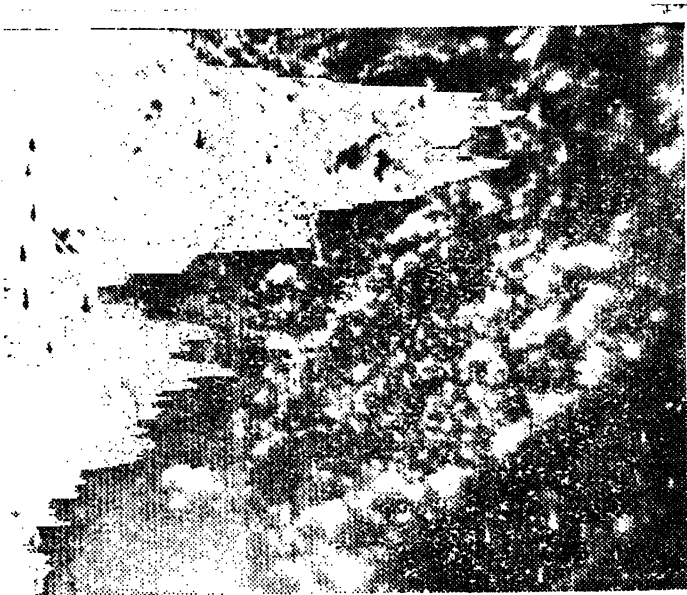
টাইরোস—১ কৃত্রিম উপগ্রহে স্থাপিত টেলিভিসন ক্যামেরার সাহায্যে গৃহীত যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক উপকূলের ১০০ বর্গ মাইলের ফটো। ছবিতে উক্ত অঞ্চলকে ঘন মেঘাবৃত দেখাইতেছে।

জিবারিলিক অ্যাসিড

শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকে বিভিন্ন উপায়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা ও ফলন বৃদ্ধির জন্যে চেষ্টা করে আসছেন। সম্প্রতি জিবারিলিক অ্যাসিড (সংক্ষেপে জি. এ.) নিয়ে পরীক্ষার ফলে এই বিষয়ে আশাপ্রদ ফল দেখা গেছে। এই সম্ভাবনাময় আবিষ্কার খুব বেশী দিনের কথা নয় এবং আবিষ্কারের কাহিনীও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

জাপানের কৃষকেরা অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করে আসছিল যে, তাদের জমির কোন কোন ধানগাছ হঠাৎ যেন দৈত্যের মত বড় হয়ে ওঠে, কিন্তু কিছুদিন পরেই মরে যায়। তারা একে বলতো Foolish seedling disease। ১৮৯০ সালে জাপানে উদ্ভিদ-রোগ বিশেষজ্ঞেরা এর কারণ অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা মাঠ থেকে রোগাক্রান্ত গাছগুলিকে সংগ্রহ করে গবেষণাগারে এনে পরীক্ষা করতে থাকেন। গবেষণার ফলে দেখা যায় যে, এই রোগের কারণ হলো জিবারেলা ফিউজিকুরয় নামে একপ্রকার ছত্রাক। এই ছত্রাকের সমগোত্রীয় অন্যান্য ছত্রাকও নানাপ্রকার শস্যের শিকড়-পচা রোগের জন্যে দায়ী।

এর অনেক দিন পরে ১৯২৬ সালে কুরুসওয়া নামক একজন গবেষক জিবারেলা ছত্রাক নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। তিনি জিবারেলা ছত্রাক থেকে জীবাণু-মুক্ত কালচার দ্রবণ তৈরী করেন এবং তা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, সেটি ধানগাছ ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদের বৃদ্ধিও উদ্দীপন করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক গাছের বৃদ্ধি উদ্দীপনকারী রাসায়নিকটি পৃথক করতে সক্ষম হন; কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের জন্যে এই গবেষণার কাজ কিছু কালের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়।

মধ্যবর্তীকালে ডাঃ বি. ই. ক্রশ নামক একজন ইংরেজ এবং ডাঃ ফ্র্যাঙ্ক এইচ. ষ্টোডোলা নামক একজন আমেরিকান বিজ্ঞানীর দ্বারা পাশ্চাত্য দেশে এ-সম্বন্ধে কাজ আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ ঐসব দেশে খুব সামান্য পরিমাণ অ্যাসিড তৈরী হতো। মাত্র ৩০০ গ্যালন ছত্রাক ও তার খাদ্য থেকে অল্প কয়েক গ্রাম জিবারিলিক অ্যাসিড পাওয়া যেত। বর্তমানে এলি লিলি, ফাইজার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রপ্তানীযোগ্য পরিমাণে জিবারিলিক অ্যাসিড তৈরী হচ্ছে।

জিবারিলিক অ্যাসিড দেখতে সাদা কেলাসিত পাউডারের মত। জলের সঙ্গে মিশিয়ে (সাধারণতঃ এক লক্ষ ভাগ জলে এক থেকে একশত ভাগ পাউডার) গাছের উপর ব্যবহার করে এমন আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে যে, অনেক সময় অবিশ্বাস্য মনে হয়।

আঙ্গুর, আলু ও তামাকের ফলন বৃদ্ধি, আলুবীজের সুপ্তাবস্থা হ্রাস, বার্লি, মটর ইত্যাদির অঙ্কুরের বৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, তুলার আঁশ বৃদ্ধি ও নানাপ্রকার ফুলের দ্রুতফলন এর দ্বারা সম্ভব হয়েছে।

এর রাসায়নিক গঠন এত জটিল যে, কৃত্রিম উপায়ে এই জিনিষ তৈরী করা এখনো সম্ভব হয় নি। তবে খুব সামান্য পরিমাণ অ্যাসিড থেকে অনেক কাজ পাওয়া যায়। মাত্র এক আউন্স অ্যাসিড প্রায় ১০০ একর জমিতে স্প্রে করবার পক্ষে যথেষ্ট।

জিবারিলিক অ্যাসিড অবশ্য উদ্ভিদ-খাদ্যের পরিপূরক নয়। এই পদার্থ প্রয়োগে উত্তম ফল

লাভের জন্যে অনেক সময় সাধারণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হয়। এখন পর্যন্ত কিভাবে এটি গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে তা জানা যায় নি। বৈজ্ঞানিকদের মতে, এটি উদ্ভিদ-কোষের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে' নতুন কোষ সৃষ্টি করে। কোন কোন গবেষকের মতে, জিবারিলিক অ্যাসিড উদ্ভিদের আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য এই অ্যাসিড প্রয়োগে কোন গাছের পাতার সংখ্যা না-ও বাড়তে পারে, তবে সাধারণ গাছের তুলনায় এসব গাছের পর্বগুলি বেশী লম্বা হবে এবং পাতাও বড় হবে।

গাছের বৃদ্ধি উদ্দীপন করলেও মানুষের উপর জি. এ.-র কোন খারাপ প্রভাব দেখা যায় নি। মার্ক ইন্‌ষ্টিটিউসনের রোগ গবেষণা বিভাগের কয়েকজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, জি. এ. খেলে বা ইনজেকসন নিলে অথবা চামড়ায় ঘষলে কোন ক্ষতি হয় না। এথেকে বুঝা যায়, কৃষকেরা নিরাপদে জিবারিলিক অ্যাসিড ব্যবহার করতে পারে।

ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৬ সাল থেকে জি. এ. ও কে. জি. এ. নিয়ে নানারকম গবেষণা হচ্ছে এবং সেখানে প্রায় ৭৫ রকমের শস্য ও ফলের বাগানের উপর জিবারিলিক অ্যাসিড প্রয়োগের ফলাফল পরীক্ষা করা হয়েছে।

কয়েক প্রকার গবেষণায় যেরূপ আশাপ্রদ ফল দেখা গেছে, তাতে মনে হয়—ভবিষ্যতে কৃষিকার্যে এর প্রয়োগ উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তবে কোন্ ফসলে কতটা পরিমাণ প্রয়োগ করতে হবে এবং বিভিন্ন ফসলে এর প্রয়োগের ফলই বা কি হবে, তা ভবিষ্যৎ গবেষণার দ্বারা স্থির হবে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ফসলের উপর জিবারিলিক অ্যাসিড ব্যবহারে নিম্নরূপ ফল পাওয়া গেছে—

আঙ্গুর—কয়েক জাতের বীজহীন আঙ্গুরের জমিতে জিবারিলিক অ্যাসিড প্রয়োগে বেশ বড় আঙ্গুর পাওয়া গেছে। আগে কয়েক জাতের আঙ্গুরের প্রতিটি গোছায় অনেকগুলি ফল হওয়ায় তাড়াতাড়ি পচে যেত। জিবারিলিক অ্যাসিড প্রয়োগে প্রতি গোছায় আঙ্গুরের সংখ্যা কমিয়ে তার পচন নিবারণ করা গেছে। আবার কয়েক স্থানে জিবারিলিক অ্যাসিড প্রয়োগে আঙ্গুর সাধারণ সময় অপেক্ষা তাড়াতাড়ি পেকে উঠেছে। ক্যালি-ফোর্নিয়ায় ১৯৫৮ সালে ১০০০ একর এবং ১৯৫৯ সালে ৫০০০ একর আঙ্গুরের ক্ষেতে জিবারিলিক অ্যাসিড 'স্প্রে' করা হয়েছে। এথেকে মনে হচ্ছে, জিবারিলিক অ্যাসিড প্রয়োগে আঙ্গুর ফলনের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদই হবে।

আলু—আলুর উপর জিবারিলিক অ্যাসিড প্রয়োগে কয়েকটি ক্ষেত্রে ফলন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে এবং আলুও হয়েছে বেশ ভাল জাতের। তবে আলুর বেলায় জিবারিলিক অ্যাসিড প্রয়োগের পরিমাণ বেশী হলে ফলন বাড়ে না বরং কমেই যায়।

লেটুস, সেলারী প্রভৃতি সব্‌জি চাষে জিবারিলিক অ্যাসিড অনেক সমস্যা সমাধান করেছে। সেলারী সাধারণতঃ শীতের সময় বেশী ভাল বাড়ে না, কিন্তু জি. এ. 'স্প্রে' করে এই অসুবিধা দূর করা সম্ভব হয়েছে এবং ফলনও বেশ বেড়েছে।

লেবু গাছে জিবারিলিক অ্যাসিড 'স্প্রে' করে দেখা গেছে—এতে যে কেবল ফলনই ভাল হয় তা নয়, উৎপাদন-ব্যয়ও অনেক কম পড়ে। জিবারিলিক অ্যাসিড 'স্প্রে' করে কমলালেবুর সি-ভিটামিনের পরিমাণ শতকরা ১৩ এবং রসের পরিমাণ শতকরা ৯ ভাগ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

পিচ, ন্যাসপাতি, অ্যাপ্রিকট, আপেল প্রভৃতির উপরও জিবারিলিক অ্যাসিড নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। অল্প কয়েক ক্ষেত্রে ভাল ফলও পাওয়া গেছে। জিবারিলিক অ্যাসিড 'স্প্রে' করে কোন কোন স্থানে লাল ও বেশ বড় জাতের আপেল পাওয়া গেছে।

নানাপ্রকার ফুল, যেমন—ক্যামেলিয়া, কারনেশন,

গোলাপ, এষ্টার প্রভৃতি ক্ষেত্রে জিবারিলিক অ্যাসিড 'স্প্রে' করে বেশ তাড়াতাড়ি ফুল ফুটেছে এবং ফুলের আকারও হয়েছে বেশ বড়।

ভারতে জিবারিলিক অ্যাসিড নিয়ে কিছু কিছু পরীক্ষা হয়েছে। কলকাতার ডাঃ সরকার গাঁদা ও দোপাটি গাছের উপর পরীক্ষা করেছেন। গাঁদা ফুলের বেলায় জিবারিলিক অ্যাসিড প্রয়োগে গাছ শতকরা ১০৬ ভাগ বেশী লম্বা হয়েছে এবং ফুলও তাড়তাড়ি ফুটেছে। কিন্তু দোপাটির বেলায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় নি। ভূপালে এস. সি. চক্রবর্তী ও এন. জে. আব্রাহাম তিল গাছের উপর জিবারিলিক অ্যাসিডের পরীক্ষা করেছেন; কিন্তু গাছের বৃদ্ধি অথবা ফুল ফোটার ব্যাপারে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পান নি।

জিবারিলিক অ্যাসিড প্রয়োগের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা নিয়ে গবেষণা চলছে। কারো মতে, গাছে জল দেওয়ার সময় জলে মিশিয়ে এই পদার্থটি ব্যবহার করা যায়। গাছ এভাবে দেওয়া রাসায়নিক পদার্থ মাটি থেকে শিকড় দিয়ে শোষণ করবে। এর ফলে গাছের সকল অংশের সমানভাবে বৃদ্ধি হবে। মিচিগানে ডাঃ উিট্ওয়ার শশা ও বেগুনের ফুল ফোটবার পর তাতে জিবারিলিক অ্যাসিড 'স্প্রে' করে বেশ বড় শশা ও বেগুন পেয়েছেন।

অন্যান্য পরীক্ষায় দেখা গেছে, জিবারিলিক অ্যাসিড গাছের শীতকালীন জড়তা ভেঙ্গে তার বৃদ্ধি অব্যাহত রাখে। এথেকে ভবিষ্যতে শীত-প্রধান উত্তর মেরুতেও কৃষির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

জিবারিলিক অ্যাসিড 'স্প্রে' করে গাছের কাণ্ড ও ফুল বেশ বড় হয় এবং ভ্রূণ, কাটিং ইত্যাদিও তাড়াতাড়ি বাড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে ফুল বেশ তাড়াতাড়ি ফোটে এবং অনেক দিন তাজা থাকে। অবশ্য সব গাছে জিবারিলিক অ্যাসিড প্রয়োগে সমান ফল পাওয়া যায় না এবং কোন কোন গাছে মোটেই কোন পরিবর্তন হয় না। আবার অতি-মাত্রায় প্রয়োগে সুফলের পরিবর্তে কুফলই দেখা গেছে। তবে আজ পর্যন্ত যে সব পরীক্ষা হয়েছে, তাথেকে জিবারিলিক অ্যাসিডের আবিষ্কার কৃষি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা আশীর্বাদ বলেই মনে করা যেতে পারে।

অল্প কিছুদিন আগেও জিবারিলিক অ্যাসিড নিয়ে গবেষণাগারেই পরীক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে প্রায় ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকার কৃষি বিভাগ ও অন্যান্য শাখা প্রতিষ্ঠানে এই পদার্থটি নিয়ে উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গম, পুষ্প-বিকাশ, বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে।

UCLA-এর ডাঃ বারনার্ড ফিনির মতে, এ-সম্বন্ধে মূল গবেষণা সবেমাত্র সুরু হয়েছে। গাছের বৃদ্ধি-উদ্দীপনকারী পদার্থ আবিষ্কারে জিবারিলিক অ্যাসিড একটি ধাপ হতে পারে এবং হয়তো একদিন এর গবেষণা থেকেই উদ্ভিদের জীবন-রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

অতীতের জলবায়ু

শ্রীপূর্ণেন্দু সেন

সৃষ্টির আদিকাল থেকে পৃথিবী-পৃষ্ঠ যে কত বিচিত্র আকৃতি পরিগ্রহণ করেছে, তার লেখাজোখা নেই। ভূ-ত্বকের পরিবর্তন ঘটেছে—সৃষ্টি হয়েছে অগণিত পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীর। আবহাওয়ারও অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে—কোন যুগে এসেছে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, আবার কোন যুগে এসেছে প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ। অতীতের ভূ-ত্বক ও আবহাওয়ার এই বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবর্তন নির্ধারণে প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবাশ্ম, তুষারাকর্ষিত শিলা প্রভৃতির দান অসামান্য।

ভূতত্ত্ব বিষয়ক তথ্যাদি থেকে জানা যায়—পৃথিবীর বিবর্তনের পর্যায়ে সময়ে সময়ে বহুবিস্তৃত হিমপ্রবাহ এসেছে। এর ফলে উত্তাপ বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে—প্রাণ হারিয়েছে অগণিত জীবজন্তু। বিভিন্ন যুগের হিমপ্রবাহের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়ার অস্তিত্বের কথাও জানা গেছে। এই উষ্ণতা ও প্রখর শৈত্যের স্থায়িত্ব কত যুগ পর্যন্ত ছিল, তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয় নি। অতীতের হিমপ্রবাহের প্রমাণ-স্বরূপ ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর সর্বত্র হৈমবাহিক শিলা, টিলাইটিস এবং বৃক্ষ ও প্রাণীর জীবাশ্ম আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন। টিলাইটিস—হিমপ্রবাহের ফলে উৎপন্ন একপ্রকার শিলামিশ্রিত কঠিন মৃত্তিকা। বর্তমানে আগ্নেয়শিলার তেজস্ক্রিয় পদার্থ (যথা—ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম) ও সীসকের আনুপাতিক হার নির্ণয় করে ও অন্যান্য পরীক্ষার মাধ্যমে ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরের বয়স নির্ধারণ করেছেন। অতীতের জলবায়ু প্রসঙ্গে কিছু বলবার আগে ভূতত্ত্ব বিষয়ক সময় মানের এক তালিকা দেওয়া প্রয়োজন। তালিকাটি নিম্নরূপ—

যুগ	স্থায়িত্ব কাল	বর্তমান কাল থেকে যত বছর পূর্বে
কোয়াটার্নারী প্লাইস্টোসিন	১০ লক্ষ বছর	১০ লক্ষ বছর
টার্শিয়ারী প্লায়োসিন	১ কোটি ১০ লক্ষ বছর	১ কোটি ২০ লক্ষ বছর
মায়োসিন	১ কোটি ৩০ " "	২ কোটি ৫০ " "
অলিগোসিন	১ কোটি ৫০ " "	৪ কোটি "
ইয়োসিন	২ কোটি "	৬ কোটি "
ক্রিটেসাস	৫ কোটি "	১১ কোটি "
মেসোজোয়িক জুরাসিক	৪ কোটি "	১৫ কোটি "
ট্রায়াসিক	৩ কোটি "	১৮ কোটি "
পার্মিয়ান	৩ কোটি ৫০ লক্ষ "	২১ কোটি ৫০ লক্ষ "
কার্বোনিফেরাস	৬ কোটি "	২৭ কোটি ৫০ লক্ষ "
প্যালিওজোয়িক ডিভোনিয়ান	৫ কোটি "	৩২ কোটি ৫০ লক্ষ "
সিলুরিয়ান	৩ কোটি ৫০ লক্ষ "	৩৬ কোটি "
অর্ডোভিসিয়ান	৬ কোটি "	৪২ কোটি "
ক্যাম্বিয়ান	১০ কোটি "	৫২ কোটি "
প্রাক-ক্যাম্বিয়ান	...	১৫০ কোটি "
আর্কিয়ান	...	৪০০ কোটি "

অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, উত্তর ইংল্যাণ্ড ও বৃহৎ হ্রদের অঞ্চল থেকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হিমবাহের নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের ঠিক কোন্ ভাগে এই হিমবাহ এসেছিল, সঠিকভাবে তা জানা যায় নি। একাধিক শিলাস্তর, নুড়ি প্রভৃতি পরীক্ষা করে স্থির হয়েছে যে, সে যুগে এক সুদীর্ঘ নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ছিল এবং এই সময়ের মধ্যেই কয়েকবার হিমবাহের আবির্ভাব হয়েছে।

চীন ও অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শিলাস্তরে হিমপ্রবাহের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রধানতঃ এই যুগে কয়েক স্থানে প্রচণ্ড শীত ও কতকাংশে মরুদেশীয় জলবায়ু ছিল। অর্ডোভিসিয়ান যুগে এই একই প্রকার জলবায়ু প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সিলুরিয়ান যুগের চুনাপাথরে প্রবালের অস্তিত্ব থেকে স্থিরীকৃত হয়েছে যে, সে যুগের সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা উষ্ণ ছিল—সম্ভবতঃ তাপমাত্রা ৬৮° ফারেনহাইটের মত ছিল। এই তাপমাত্রা প্রবালের জীবনধারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। উত্তর ডেভনের মত উচ্চ অক্ষাংশেও এই যুগের চুনা-পাথরে প্রবালের জীবাশ্ম পাওয়া যায়। উত্তর গোলার্ধে উত্তর কুইনস্‌ল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড ও দক্ষিণ গোলার্ধে টাসমানিয়া, ভিক্টোরিয়া, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড থেকে প্রাপ্ত সিলুরিয়ান যুগের জীবাশ্ম সে যুগে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বর্তমান আবহাওয়ার চেয়ে উষ্ণতর এক আবহাওয়ার অস্তিত্ব নির্দেশ করে। উত্তর ইউরোপ ও আমেরিকার ডিভোনিয়ান যুগের শিলাস্তর মরুদেশীয় শুষ্ক জলবায়ুর প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এই সময়েই দক্ষিণ আফ্রিকায় হিমপ্রবাহের নিদর্শন আছে।

কার্বোনিফেরাস অথবা অঙ্গার যুগে পৃথিবীর সর্বত্র উষ্ণ, আর্দ্রভাবাপন্ন জলবায়ু ছিল। এই যুগের গাছের গুঁড়িতে সমকেন্দ্রীয় বৃদ্ধি-চক্র অনুপস্থিত। শীত ও গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে গাছের বৃদ্ধি-চক্রের পরিবর্তন হয়।

সুতরাং এই বৃদ্ধি-চক্রের উপস্থিতি থেকে শীত, গ্রীষ্মের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। কার্বোনিফেরাস যুগে শীত ও গ্রীষ্মকাল থাকলেও তা স্বল্পস্থায়ী ছিল। এই সময়ে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় জলবায়ু শুষ্ক ছিল। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের শিলাস্তরে স্থানীয়ভাবে হিমবাহের সুনিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া গেছে।

ভূতত্ত্ববিদ্ ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, পার্মিয়ান যুগে দুই গোলার্ধে বিভিন্ন ধরণের জলবায়ু ছিল। দক্ষিণ গোলার্ধের ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে শীতল আবহাওয়া প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই যুগে হিমপ্রবাহের উৎপত্তি হয়েছিল। উত্তর গোলার্ধে কার্বোনিফেরাস যুগের পর মরুদেশীয় উদ্ভিদ ক্রমে ক্রমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

পার্মিয়ান ও কার্বোনিফেরাস যুগে ভারতে যে অবস্থায় তুষার-আস্তরণ সংগঠিত হয়েছিল, তাথেকে অনুমান করা হয়—এই যুগে তুষার নেমে এসে বর্তমান মধ্যপ্রদেশের কোন অঞ্চল দিয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করেছিল। তুষার-আস্তরণের অবস্থান থেকে স্থির হয়েছে, তুষার দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে নেমে এসেছিল।

বিখ্যাত জার্মান বায়ু-বিজ্ঞানবিদ্ ওয়েগ্‌নারের মতে, সে যুগে ভারত, বর্তমান ম্যাডাগাস্কারের নিকটে অবস্থিত ছিল এবং দক্ষিণ ভারতের কতকাংশ দক্ষিণ মেরুবৃত্তের মধ্যে থাকায় তুষার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।

মেসোজোয়িক যুগে পৃথিবীর সর্বত্র, বর্তমান আবহাওয়ার চেয়ে উষ্ণতর আবহাওয়া ছিল। উদ্ভিদ ও জীবাশ্ম পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, আবহাওয়া ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। ফ্রান্স এবং আরও উত্তর অঞ্চলে সে সময়ের যে সব উদ্ভিদ পাওয়া গেছে,

সেগুলির সঙ্গে কেবলমাত্র বর্তমান পৃথিবীর উষ্ণতর অঞ্চলের উদ্ভিদের তুলনা করা চলে। এই যুগে হিমপ্রবাহের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

ট্রায়াসিক যুগের পাললিক শিলাস্তরের উদ্ভিদ ও জীবাশ্ম থেকে সে যুগে মরুদেশীয় উষ্ণ জলবায়ুর অস্তিত্বের বিষয় সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চল পর্যন্ত তাপমাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছিল।

ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণায় জানা গেছে যে, জুরাসিক যুগে পৃথিবীব্যাপী উষ্ণ আবহাওয়া ছিল। শুষ্ক ও মরুদেশীয় উদ্ভিদও সে যুগের উষ্ণতার সাক্ষ্য প্রদান করে। সে যুগের বৃক্ষকাণ্ডে সমকেন্দ্রীয় বৃদ্ধি-চক্র, ঋতু পরিবর্তনের সুস্পষ্ট প্রমাণ। সিওয়ার্ড নিম্ন ক্রিটেসাস ও জুরাসিক যুগের উদ্ভিদ পরীক্ষা করে সে যুগের উদ্ভিদের মধ্যে এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছেন। সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা বর্তমান যুগের তাপমাত্রার চেয়ে বেশী ছিল বলে তিনি অনুমান করেন। জুরাসিক যুগের প্রথমভাগে সমুদ্রে প্রবাল-প্রাচীর বিরল হলেও পরবর্তীযুগে এর প্রাধান্য দেখা যায়। বায়ু-বিজ্ঞানবিদেরা জুরাসিক যুগের তাপমাত্রার সমতার কারণ নির্ধারণ করতে পারেন নি।

ক্রিটেসাস যুগে পুনরায় উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া প্রাধান্য লাভ করেছিল। টার্শিয়ারী যুগে জলবায়ুর পরিবর্তন খুব আকস্মিক। উত্তর ইউরোপের আবহাওয়া পূর্বের ন্যায় শীতল হয়ে বর্তমান অবস্থায় ক্রমশঃ ফিরে এসেছিল।

গ্রীনল্যাণ্ড, স্পিট্‌স্‌বার্জেন ও সুমেরু অঞ্চলের জীবাশ্ম পরীক্ষা করে ভূতাত্ত্বিকেরা স্থির করেন যে, ইয়োসিন যুগে উত্তর মেরুর আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ছিল এবং এই অঞ্চলে বর্তমানের তাপমাত্রা অপেক্ষা ৪৯° ফারেনহাইট অধিক ছিল। সুতরাং নিরক্ষীয় অঞ্চলেও তাপমাত্রা ১২৮° ফারেনহাইট ছিল। ফলে এই অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। ওয়েগ্‌নারের মতে, ইয়োসিন যুগে সুমেরু অঞ্চল ৪৫° উত্তরে অবস্থিত থাকায় এই অঞ্চলে উদ্ভিদের জীবনধারণ সম্ভব হয়েছিল।

অলিগোসিন যুগের পত্রত্যাগী উদ্ভিদসমূহ সে যুগে শীতের প্রকোপ এবং পর্যায়ক্রমে শুষ্ক ও অতি আর্দ্র আবহাওয়ার নির্দেশক।

মায়োসিন যুগের মধ্য ইউরোপের শিলাস্তরে যেসব উদ্ভিদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, সেগুলি বর্তমান শীতল জলবায়ু সহ্য করতে পারবে না বলে স্থিরীকৃত হয়েছে। সে যুগে উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল ভাগের তাপমাত্রা বর্তমানের চেয়ে আরও শীতল ছিল।

প্লায়োসিন যুগে জলবায়ুর এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। তাপমাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ার ফলে উষ্ণতর অক্ষাংশের উদ্ভিদসমূহ ইউরোপীয় অঞ্চল থেকে বিদায় নিয়ে আরও দক্ষিণ দিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ইউরোপের এই যুগের পুরাতন ও নতুন শিলাস্তরের শামুকজাতীয় প্রাণীর জীবাশ্মের পরিবর্তন থেকে সে যুগে শীতল জলবায়ুর পুনরাবির্ভাবের কথা জানা যায়। শুধুমাত্র উত্তরাঞ্চলেই নয়, সে যুগে আল্পস, পীরেনিজ পর্বতের শীর্ষদেশেও হিমবাহের জন্ম হয়।

প্লাইষ্টোসিন যুগের জলবায়ু অতীত যুগের জলবায়ুর ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। বিচিত্র, অভাবনীয় ছিল সে যুগের জলবায়ু। পৃথিবীর দুটি গোলার্ধে সে যুগে প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ দেখা দিয়েছিল—ক্রমান্বয়ে চারবার হিমপ্রবাহের আবির্ভাব ঘটেছিল। কাজেই এই যুগের নাম হয়েছে—তুষার-যুগ। আল্পস এবং হিমালয় পর্বতশ্রেণীও তুষারাবৃত হয়েছিল।

হিমালয় অঞ্চলের প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে বহু জীবজন্তু ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই অঞ্চলের উষ্ণ মৃদু জলবায়ু জীবজন্তুর জীবনধারণের পক্ষে উপযোগী ছিল। ভারতের

সমভূমি ও দক্ষিণের নীলগিরি পর্বতে বর্তমানে এমন অনেক জীবজন্তু ও উদ্ভিদ দেখা যায়, যেগুলি পূর্বে হিমালয় অঞ্চলে ছিল।

হিমবাহের দ্বারা বাহিত শিলার অবস্থান ও শিলাগাত্রে তুষার ঘর্ষণে উৎপন্ন রেখাসমূহের দিক নির্ণয় করে' ভূতাত্ত্বিকেরা এক মানচিত্র প্রস্তুত করেছেন, যা থেকে হিমবাহের উৎপত্তিস্থান ও অগ্রগতির দিক সহজেই স্থির করা যায়। এই ভাবে প্লাইষ্টোসিন যুগের হিমাবাহ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।

তুষার-ঘর্ষিত শিলা পরীক্ষা করে সুইডেনের ভূতাত্ত্বিকেরা খৃষ্টপূর্ব ৬৫০০ অব্দে তুষার-যুগের সমাপ্তি ঘটেছিল বলে স্থির করেছেন।

তুষার-যুগের পরবর্তী সময়ে জলবায়ুর পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। প্রথমে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়বার পর দীর্ঘস্থায়ী উষ্ণ আবহাওয়া দেখা দিয়েছিল। পর্ণমোচী উদ্ভিদ এই সময় যথেষ্ট প্রাধান্যলাভ করে। অবশেষে তাপমাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে এবং পর্ণমোচী উদ্ভিদের স্থলে সরলবর্গীয় উদ্ভিদের আধিক্য ঘটে। বিজ্ঞানীরা ফুলের পরাগ পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

গত দু-হাজার বছর থেকে আবহাওয়া ক্রমশঃ শুষ্ক হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক সোয়ার্জ দক্ষিণ আফ্রিকার নাগামি হ্রদের গত ১০০ বছরের পরিবর্তনের ইতিহাস থেকে দেখিয়েছেন যে. আবহাওয়ার অল্পস্থায়ী পরিবর্তন ঘটতে পারে। অতীতের আবহাওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা সত্ত্বেও এখন পর্যন্তও বহু তথ্য অজ্ঞাত রয়ে গেছে। বিভিন্ন যুগের শীত ও গ্রীষ্মকালের সীমারেখা আরও সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। হিমবাহ-বাহিত শিলা ও গ্রাবরেখা যত্ন সহকারে পরীক্ষা করা হলে ভারতের হিমপ্রবাহ সম্বন্ধে আরও অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবে বলে আশা করা যায়।
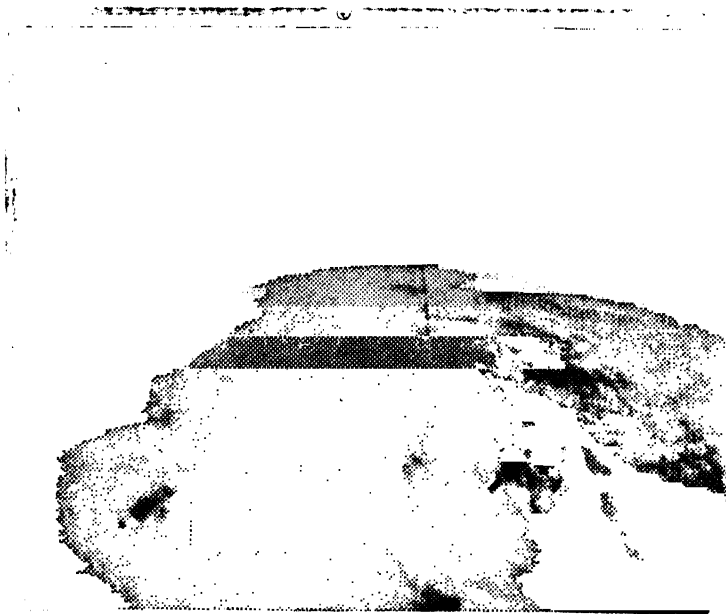
যুক্তরাষ্ট্রের টাইরোস-১ নামক কৃত্রিম উপগ্রহে স্থাপিত টেলিভিসন ক্যামেরায় প্রায় ৪৫০ মাইল উপর হইতে গৃহীত আমেরিকার আটলান্টিক উপকূলের ৮০০ বর্গ মাইল এলাকার ফটো। ছবিতে উক্ত অঞ্চলকে ঘন মেঘাবৃত দেখা যাইতেছে।

খনিজের সন্ধানে গাছপালার ভূমিকা

শ্রীশচীনাথ মিত্র

দেশের সম্পদ ও শক্তির উৎস স্বরূপ খনিজের সন্ধানে মানুষ আজ অস্থির চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক সময় এই ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে অজ্ঞাত, অখ্যাত, বন্য এবং স্থানীয় আদিবাসীরা। এভাবেই খনিজ-লুব্ধ সভ্য মানুষকে অপরিমিত স্বর্ণ-খনির সন্ধান দিয়েছিল অষ্ট্রেলিয়ার এক গ্রাম্য স্ত্রীলোক। সে তার ঘরের ভাঙ্গা দরজার পাল্লা ঠেক্‌না দিয়ে রেখেছিল এক বৃহদাকৃতির ভারী ডেলা। সে জানতো না যে, সেই ভারী জিনিষটা একটা সোনার তাল এবং সভ্যজগতে তার মূল্য কতখানি!

পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত দেশেই তাই সাধারণ লোককে খনিজ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলবার চেষ্টা চলছে। ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষাও ভূ-তাত্ত্বিকদের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করেছেন, স্থানীয় লোকদের নিত্যপ্রয়োজনীয় খনিজ সম্বন্ধে জ্ঞান দেবার জন্যে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ভূ-সম্পদের সন্ধানে স্থানীয় লোক ভূতাত্ত্বিককে অনেকখানি সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো এই যে, পৃথিবীতে এখনও অনেক জায়গা আছে, যেখানে খনিজ-সচেতন মানুষের লুব্ধদৃষ্টি পড়ে নি। সুতরাং মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদেরও সাহায্য নেবার জন্যে ভূতাত্ত্বিকেরা আজ হাত বাড়িয়েছেন। পশুপাখী, গাছপালাকেও ভূতাত্ত্বিকেরা খনিজের সন্ধানে প্রশ্ন করছেন এবং সাহায্য নিচ্ছেন।

গাছেরাও সন্ধান দেয়

খনিজের অবস্থান সম্বন্ধে উদ্ভিদেরাও অনেক সময় সন্ধান দেয় সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ভূতাত্ত্বিককে। কি ভাবে উদ্ভিদ খনিজ-সন্ধানী মানুষকে খনিজের সন্ধান দেয়, সেই প্রসঙ্গে কিছু বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

উদ্ভিদ কিছু পরিমাণে মাটির ভূতাত্ত্বিক ও রাসায়নিক গুণ সম্বন্ধে কিছু ধারণা দিতে পারে। যেমন, কতকগুলি গাছ মাটিতে কোনও একটা ধাতু মৌলের অবস্থানজনিত বিষ-ক্রিয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আবার ঐ মৌলের অবস্থানের ফলে সেই স্থানে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের মধ্যে জীবন সংগ্রামে প্রতিযোগিতা কম হওয়ায় কতকগুলি উদ্ভিদের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। এর কারণ, একই মৌল একপ্রকার উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক, কিন্তু অন্য প্রকার উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক। ঐ ধাতু মাটি থেকে উঠে আসে উদ্ভিদের দেহে। এর ফলে কোন কোন উদ্ভিদে বিষ-ক্রিয়া হয় এবং কোন কোন উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়তা করে। দেখা গেছে, খনিজ-বহুল স্থানে গাছপালার দেহে সে স্থানের কতকগুলি খনিজ ধাতু বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়; কিন্তু ঐ স্থান থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের গাছপালায় সে সব খনিজ পদার্থ মোটেই পাওয়া যায় না। টিন এবং মলিবডিনাম সমন্বিত খনিজের উপর বর্ধিত গাছপালার শরীরে টিন ও মলিবডিনাম পাওয়া গেছে। এখন এভাবে বিভিন্ন ধাতুর সন্ধানে বিভিন্ন খনিজের অস্তিত্ব নির্দেশক বিশেষ বিশেষ লক্ষণযুক্ত উদ্ভিদের সাহায্য নেওয়া হয়। এই রীতিকে ভূ-উদ্ভিদবিদ্যার সন্ধান বলা হয়।

উদ্ভিদের যে অংশে বাষ্পীভবন বেশী হয়, সেই অংশে ধাতুর প্রাচুর্য দেখা যায়। এজন্যে প্রধানতঃ পাতা ও নতুন পল্লবেই ধাতুর প্রাচুর্য ঘটে। বিভিন্ন উদ্ভিদের ধাতু সংগ্রহের ক্ষমতা বিভিন্ন রকম হবার ফলে একই প্রকার উদ্ভিদ থেকে

উদ্দেশ্যমূলক নমুনা সংগ্রহ করা হয় বছরের একই ঋতুতে। কারণ, ঋতুর তারতম্যে গাছের পাতার সংখ্যা বাড়ে বা কমে এবং তার জন্যে পাতার মধ্যে ধাতব পদার্থের পরিমাণেরও তারতম্য ঘটে।

প্রতিটি নমুনার পত্রাঙ্কুর বৈদ্যুতিক চুল্লীতে পোড়ানো হয় এবং স্পেক্ট্রোগ্রাফিক উপায়ে সেই ছাই পরীক্ষা করে সজীব গাছের শরীরে কি কি মৌল-ধাতু ছিল, তা নির্ধারণ করা হয়।

রানকামা নামে ভূ-রাসায়নিক এভাবে দেখিয়েছেন যে, অষ্ট্রেলিয়ার পলিকার্পেইয়া স্পাইরোস্টাইলিস নামক গাছ তাম্র খনিজের সন্ধান দেয়। অ্যামর্ফা কানোস্‌সিনেস নামক গাছ দেয় সীসার সন্ধান। ভূ-বিজ্ঞানী ভোগট্‌ বলেছেন, ভিস্‌কেরিয়া এলাপিনা ও মেলাণ্ড্রিয়াম ডিসেকাম গাছ তাম্র-বহুল মাটিতে জন্মায়। আমেরিকায় তাম্রবহুল রোরোস অঞ্চলে এই ধরণের গাছ প্রচুর দেখা যায়। কারণ তাম্র-বিষে অন্যান্য গাছ মরে যাওয়ার ফলে এই গাছগুলির পরিবর্ধন ও পরিপুষ্টির পথে প্রতিকূলতা করবার মত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না।

আবার ভায়োলা কালিমিনেরিয়া, যাকে দস্তা-গাছ বলা হয়, শুধুমাত্র দস্তাবহুল মৃত্তিকাতেই জন্মায়। মধ্য ইউরোপে অবস্থিত এই ধরণের গাছের ছাইয়ে কখনও কখনও বেশ কয়েক শতাংশ জিঙ্ক-অক্সাইড পাওয়া যায়। এ-ছাড়া দস্তার অস্তিত্ব নির্দেশক আর এক ধরণের উদ্ভিদ হচ্ছে থ্ল্যাস্‌পি গাছ। এরা জার্মেনী ও সুইডেনের দস্তাবহুল মাটিতে জন্মায় এবং এদের ছাইয়ে ১৬% পর্যন্ত দস্তা পাওয়া গেছে। সোনার অস্তিত্ব নির্দেশক অশ্ব-পুচ্ছের মত আকৃতি-বিশিষ্ট ইকুইসিটাম আরভেন্স নামক গাছের ছাইয়ে কখনও কখনও প্রতি টনে ৪.৫ আউন্স পর্যন্ত সোনা পাওয়া গেছে।

রানকামা আরও হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ফিনল্যাণ্ডে নিকেল-খনিজের নিকটস্থ বিচগাছের পাতায় ০.০০৬% থেকে ০.২% নিকেল থাকে। বিভিন্ন স্থানের গাছের এই মানগুলি ম্যাপের উপর বসিয়ে দেখা গেছে যে, সমমানের রেখাগুলি একটি নিকেল-আকরের স্থলকে ঘিরে রয়েছে। বলা বাহুল্য, এই জৈব-রসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলেই বোরোন গাছের ছাইয়ে এবং জার্মেনিয়াম কয়েক শ্রেণীর কয়লার মধ্যে সঞ্চিত হয়।

বুনো-মৃত্তিকার পরীক্ষা

বনের মাটিতে কতকগুলি ধাতুর ঘন সমাবেশ হয়। কিভাবে এই সমাবেশ হয়, তার ব্যাখ্যা করেছেন ভূ-রাসায়নিক গোল্ডস্মিথ। তাঁর মতে, গাছের পাতা যখন মাটির উপর পড়ে' পচন-ক্রিয়ায় নষ্ট হয়, তখন অধিকতর দ্রবণীয় মৌল—যথা, অ্যালকালি, অ্যালকালাইন আর্থ, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি দ্রবীভূত হয়ে জলের সঙ্গে মাটির গভীরে চলে যায় এবং কম দ্রবণীয় মৌল—যথা, রৌপ্য, স্বর্ণ, বেরিলিয়াম, দস্তা, ক্যাডমিয়াম, স্ক্যাণ্ডিয়াম, টেলুরিয়াম, জার্মেনিয়াম, টিন, সীসা, আর্সেনিক, কোবাল্ট এবং নিকেল মাটির উপর জমতে থাকে।

সুইডেনের অধিবাসী এইচ. লুণ্ডেগড় গাছের মধ্যে ট্রেস্ এলিমেণ্ট-এর অবস্থানের নিয়ম অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, গাছের শিকড়ের আবরণ-ত্বক ঋণতড়িৎ-সম্পন্ন। সে জন্যে, ধনতড়িৎ-সম্পন্ন ধাতুর ক্যাটায়ন শিকড়ের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করে। এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে ভূনিম্নস্থ জল। কোন আকরের মধ্যে প্রবেশ করে বেরিয়ে আসবার সময় এই ভূগর্ভস্থ জল ঐ আকরের কতকগুলি মৌল দ্রবীভূত করে এবং দ্রবীভূত মৌলগুলিকে মাটির উপরিভাগের দিকে নিয়ে আসে।

একটা নিয়মিত দূরত্ব রেখে এই মাটি, জল অথবা গাছের নমুনা নেওয়া হয় এবং সেগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে রসায়নিক ও স্পেক্ট্রোস্কপির সাহায্যে অনুধাবন করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসরণ

করেই কর্ণওয়াল, ডেভনশায়ার ও ওয়েল্‌সে টিন এবং টাংস্টেন আকরের অবস্থান নির্ণীত হয়েছে। গ্রীসেও ক্রোমাইট আবিষ্কারে এই পদ্ধতি খুব সাহায্য করেছিল।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে, এই পদ্ধতি অনুসরণ করে গাছপালা সম্পর্কে যথোচিত অনুসন্ধান অন্তে মিচিগানে যে স্থানে তাম্রের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, সেটি হলো এক পরিত্যক্ত তাম্র গলাবার স্থান, ঈপ্সিত তাম্রের আকরের স্তূপ নয়।
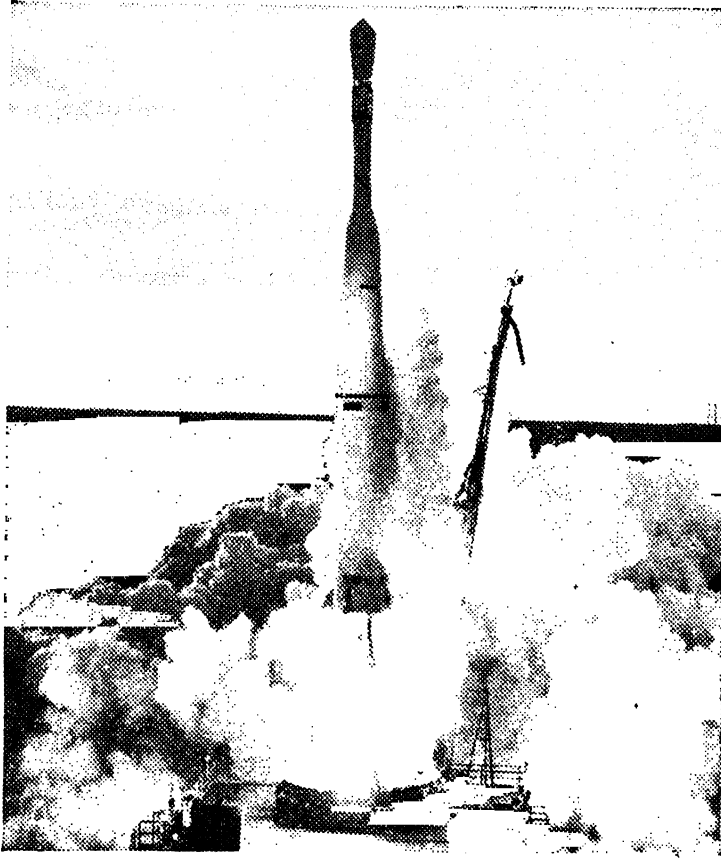
তিন-পর্যায়ী থর-এবল রকেটের সাহায্যে আবহাওয়া অনুসন্ধানী কৃত্রিম উপগ্রহ—টাইরোস-১ ফ্লোরিডার ক্যানাভেরাল অন্তরীপ হইতে মহাকাশে প্রেরিত হইতেছে।

সঞ্চয়ন

ভারতে পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ

সমগ্র পৃথিবীতে পঙ্গপালের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালাইবার পরিকল্পনায় ভারত এবং এশিয়ার বহু দেশও এই আতঙ্ক হইতে অনেকটা মুক্ত হইয়াছে। পঙ্গপাল শস্যের যে কি ক্ষতি করিয়া থাকে, পঙ্গপাল নিবারণী গবেষণা কেন্দ্র বা অ্যান্টি-লোকাস্ট রিসার্চ সেণ্টার শস্য ক্ষতির যে হিসাব দিয়াছে, তাহা হইতেই কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ হিসাবে জানা যায় যে, ১৯২৪ হইতে ১৯৩৪ সালের মধ্যে পঙ্গপালের আক্রমণে প্রতি বৎসর দেড়কোটি পাউণ্ড অথবা সাড়ে সাত কোটি ডলার মূল্যের শস্যহানি হইয়াছে। ইহার উপর পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণের বিপুল খরচ আছে।

আরব ও আফ্রিকার মরু অঞ্চল ইহাদের স্থায়ী বাসস্থল। এখান হইতেই তাহারা দক্ষিণ এশিয়া নিকট-প্রাচ্য এবং আফ্রিকার নানাদেশে অভিযান চালাইয়া থাকে। বর্ষারম্ভে ভারতের থর মরুভূমি অঞ্চল—রাজস্থান, পাঞ্জাবের সীমান্ত, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছদেশের আতপ-তপ্ত এলাকা কিছুটা শীতল হয়। ইহারা তখনই আফ্রিকার মরু অঞ্চল হইতে ভারতের ঐ আর্দ্র নরম বালুকা-ভূমিতে নূতন করিয়া ডিম পাড়িবার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া আসে। ঐ এলাকার আয়তন ৮০ হাজার বর্গ-মাইল।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় ভারত ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছে। কেন্দ্রীয় পঙ্গপাল নিবারণী সংস্থা বা সেণ্ট্রাল অ্যান্টি-লোকাস্ট অর্গ্যানিজেসনের সদর দপ্তর যোধপুরে অবস্থিত। এখান হইতেই সকল রকম নিয়ন্ত্রণ-কার্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

ভারতের সহিত এই জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই সকল চুক্তি অনুসারে মার্কিন কারিগরি সহযোগিতা মিশন ভারতকে ১৯৫২-'৫৪ সালের মধ্যে ৫৪৮৫৩৭ ডলার মূল্যের নানাপ্রকার কীটঘ্ন দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করিয়াছে। এই সকল সাজসরঞ্জামের মধ্যে ছিল, জীপ গাড়ি, ট্র্যাক্টর, ট্রেলার, ডাস্টার, বিমানের সাহায্যে কীটঘ্ন দ্রব্যাদি ছড়াইবার ব্যবস্থা, অ্যালড্রিন প্রভৃতি কীটঘ্ন দ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণ। রাজস্থানে বিমান হইতে এই সকল কীটঘ্ন দ্রব্য ছড়াইবার ব্যাপারে আমেরিকার প্রখ্যাত কীটতত্ত্ববিদ উইলিয়াম মেরী ভারত সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

পঙ্গপাল দেশদেশান্তরে উড়িয়া বেড়ায়। সুতরাং কোন একটি রাষ্ট্রে ইহাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হইলে ইহার সংলগ্ন রাষ্ট্রে এই বিষয়ে আর কোন আশঙ্কা থাকে না।

ভারত ব্যতীত আফগানিস্থান, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, তুরস্ক, মরোক্কো, টিউনিস প্রভৃতি রাষ্ট্রে ইহাদের উচ্ছেদ ও নিয়ন্ত্রণের বিপুল চেষ্টা হইতেছে। পাকিস্তানে কীটঘ্ন দ্রব্যাদি ছড়াইবার ১৮টি এবং ইরানে ১২টি বিমান রহিয়াছে—ইরান ১২ বার ইহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছে।

তবে এখনও অনেক কিছু করিবার রহিয়াছে। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে লেবাননে ইহাদের আক্রমণে সমস্ত শস্য ধ্বংসের আশঙ্কা দেখা দেয়। লেবানন কর্তৃপক্ষ ইহা জানাইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে জার্মেনী হইতে ৬ জন চালকসহ একটি বৃহৎ হেলিকপ্টার বিমান ঘটনাস্থলে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অবস্থা আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হয়।

১৯৫১ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার উদ্যোগে ইটালীর রাজধানী রোমে এই বিষয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে নিকট-প্রাচ্য, আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার বিজ্ঞানীরা যোগদান করেন। ১৯৫২ সালে ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কার্যসূচী রচনা সম্পর্কে যে অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ সময়েই একটি আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সময় ও অর্থ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামসমূহ প্রয়োজনানুযায়ী এক দেশ হইতে অন্য দেশে লইয়া যাওয়া স্থির হয়।

আঞ্চলিক পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ১৯৫১-'৫৭ সালের মধ্যে যে সকল কাজকর্ম করিয়াছে, তাহার একটি হিসাব হইতেই কি বিপুল চেষ্টা যে এই জন্য করা হইতেছে, তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ সময়ে কীটতত্ত্ববিদগণ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ৭৫ রকম কীট-পতঙ্গ সম্পর্কে ৫৮৫ বার বক্তৃতা দিয়াছেন, ৯৩টি বিমানের সাহায্য লওয়া হইয়াছে, ৩৬৪৭ টন কীটঘ্ন দ্রব্য ছড়ানো হইয়াছে এবং ৩২৬টি ট্র্যাক, বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত ১১২৯টি স্প্রেয়ার, ২০,০০০ হস্তচালিত স্প্রেয়ার নিয়োগ করা হইয়াছে। ৪ লক্ষ একর জমির প্রায় ৩২ রকম বিভিন্ন ফসল রক্ষার জন্য ৫০ রকমের বিভিন্ন কীটঘ্ন দ্রব্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে সকল বিমানের সাহায্যে কীটঘ্ন ছড়াইয়া থাকে, সেই সকল বিমান পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে ৮৩ জন বিমান-চালক ও ৬৫ জন যন্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। উদ্ভিদসমূহ পঙ্গপাল হইতে কি ভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে, সেই সম্পর্কে ২৯ জনকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

আগুনে-পোড়া রোগীর চিকিৎসায় লবণজল

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের লীনবুল এ-সম্পর্কে লিখেছেন—আগুনে-পোড়া প্রভৃতি দারুণ আঘাত বা বিষম দুর্ঘটনায় মানুষের দেহ-মনের অবস্থা এমন হয় যে, আশু চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে রোগীকে প্রায়ই এই 'শক' থেকে বাঁচানো যায় না। কিন্তু আঘাত প্রাপ্তির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই ধরণের রোগীর চিকিৎসা যে কি ভাবে হবে, তা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের কাছে কিছুকাল আগেও খুবই সমস্যার বিষয় ছিল।

আমেরিকার ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব হেলথে ডাঃ স্ট্যানফোর্ড রেজেনথ্যালের নির্দেশে এ-বিষয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। তাঁরা মানুষ এবং জন্তু উভয়ের উপরই গবেষণার ফলাফল প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পেয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন যে, দুর্ঘটনার ফলে শক-লাগা রোগীকে কিছুটা লবণজল খাইয়ে দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাদের আর মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না।

তবে এ-পর্যন্ত বড় রকমের দুর্ঘটনায় রোগীর দেহে সাধারণতঃ রক্ত বা প্লাজমা প্রয়োগ করা হতো। কিন্তু বন্যা, পারমাণবিক দুর্যোগ বা অগ্নি-কাণ্ডের সময় হাতের কাছে এসব জিনিষ পাওয়া যায় না।

এরূপ শক লাগার চিকিৎসায় বিজ্ঞানীরা প্রায় ৫০ বছর ধরে লবণজল প্রয়োগ করে আসছেন। তবে তার ফলাফল সম্পর্কে এখনও মতদ্বৈধ রয়েছে। অন্যান্য দুর্ঘটনার ব্যাপারে মতদ্বৈধ থাকলেও, আগুনে-পোড়া রোগীর দেহে লবণজল প্রয়োগ সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধ থাকতে পারে না—ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব হেলথের গবেষণায় এর ফল সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

তাঁরা সাত বছর ধরে এ-বিষয়ে গবেষণা করে জেনেছেন যে, লবণজল আগুনে-পোড়ার ব্যাপারে ঠিক সমপরিমাণ প্লাজমা বা রক্তের মতই কার্যকরী হয়ে থাকে। ডাঃ রোজেনথ্যালের সহকর্মীরা লবণজল, প্লাজমা এবং রক্ত প্রয়োগের কার্যকারিতা সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ আগুনে-পোড়া রোগীর উপরই এই জিনিষ প্রয়োগের বিষয় স্থির করেন।

তাঁরা একদল রোগীর উপর কেবলমাত্র লবণজল এবং আর একদল রোগীর উপর গ্লুকোজ মিশ্রিত জলসহ প্লাজমা প্রয়োগ করেন।

তবে একই স্থানের একই প্রকার বিভিন্ন রোগীর উপর দু-রকম চিকিৎসা অনুসরণ করা হচ্ছে বলে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠতে পারে—এই আশঙ্কায় পৃথিবীর যে সব স্থানে প্লাজমা পাওয়া যায় না, সে সব স্থানে, যেমন—লিমা এবং পেরুতে—তাঁরা লবণজল প্রয়োগে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

সে সব দেশে প্রতি বছর কেরোসিনের সাহায্যে রান্নার কাজ করতে গিয়ে আগুনে পুড়ে বহু লোক মারা যায়—প্লাজমার অভাবে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় না।

যে সব রোগীর শরীরের ১০ থেকে ৫০ ভাগ পর্যন্ত পুড়ে গেছে, কেবল তাদের নিয়েই পরীক্ষা করে দেখা হয়। এ-ধরণের ৭৯টি রোগীর দেহে লবণজল প্রয়োগের ফলে দেখা যায় যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটিরও মৃত্যু ঘটে নি।

কিন্তু ৭৪টি রোগীর দেহে গ্লুকোজের জলসহ প্লাজমা প্রয়োগ করবার পর শতকরা ১২ জন রোগীরই ঐ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, অর্থাৎ 'শক পিরিয়ডে' মৃত্যু হয়। কিন্তু আগুনে-পোড়া ১২৩টি শিশুর দেহে লবণজল, প্লাজমা, ডেক্সট্রোজ এবং জল প্রয়োগ করেও শতকরা ২০ জনকে ঐ সন্ধিক্ষণে বাঁচানো সম্ভব হয় নি। তবে ঐ 'শক-পিরিয়ডে' শিশুর দেহে লবণজল এবং প্লাজমা—এই দুইটি দ্রব্য প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। এর ফলে শতকরা একানব্বইটি শিশুই রক্ষা পেয়েছে।

তবে এ-বিষয়ে এখনও গবেষণা হচ্ছে। আগুনে পোড়া ছাড়া অন্যান্য আঘাতের ব্যাপারেও লবণজলের প্রয়োগ সম্পর্কে গবেষণা হচ্ছে। এ-জন্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর বড় রকমের বোমা বর্ষণের ফলে আগুনে-পোড়া রোগীদের বাঁচাবার জন্যে লবণজল প্রয়োগের সুপারিশ করেছেন। আগুনে-পোড়া রোগীর দেহে লবণজল প্রয়োগের পদ্ধতি এরূপ: প্রায় দশ ছটাক বা এক কোয়ার্ট জলের মধ্যে চায়ের চামচের এক চামচ লবণ এবং আধ চামচ বেকিং সোডা মিশিয়ে রোগীর দেহে প্রয়োগ করা হয়। রোগীর দেহের যে ওজন, সেই ওজনের অনুপাতে প্রতি ২০ পাউণ্ডের জন্যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই ওষুধ এক কোয়ার্ট বা দশ ছটাক পরিমাণে এবং পরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তার অর্ধেক পরিমাণে দেওয়া দরকার।

হরপ্পা আমলের বন্দর-নগরী লোথাল

গত ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে বোম্বাই রাজ্যের আমেদাবাদের নিকটে হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র লোথাল নগরী আবিষ্কৃত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের দিক দিয়া হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের পরেই লোথালের স্থান। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো আবিষ্কৃত হয় ১৯২০ সালে। লোথাল খৃষ্টপূর্ব ২৫০০—১০০০ বৎসরের প্রাচীন নগরী।

গত ১৯১৫ সাল হইতে ব্যাপক খনন-কার্যের ফলে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, হরপ্পা-সভ্যতা মহেঞ্জোদারোর বহু দক্ষিণে কাম্বে উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ভারত সীমান্তের মধ্যে হরপ্পা সভ্যতার যে একটি মাত্র পূর্ণাঙ্গ নগরীর কথা জানা গিয়াছে, তাহা হইল লোথাল। এই স্থানটি খননের ফলে হরপ্পা যুগে কিভাবে নৌ-চালানের ব্যবস্থা হইত, তাহা জানা গিয়াছে। সে যুগে কি কারণে উপনিবেশগুলি বিনষ্ট হইয়াছিল এবং কি অবস্থার মধ্যে সেই সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহার উপর অধিকতর আলোকপাত করা সম্ভব হইয়াছে।

গৃহগুলিতে বড় বড় হলঘর ও বারান্দা ছিল। প্রত্যেক গৃহে ছিল পাকা শানবাঁধান স্নানাগার এবং ময়লা জল বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা। ভূ-নিম্নে ও ভূমির উপরে পয়ঃপ্রণালী, ম্যানহোল ইত্যাদি নির্মিত হইয়াছিল। গৃহনির্মাণ ও পয়ঃ-প্রণালী নির্মাণের উপর যে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। পাকা গাঁথনি দেখিয়া ধারণা জন্মে যে, রাজমিস্ত্রীরাও সুদক্ষ ছিল।

আমেদাবাদের লোথাল খনন-কার্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর মত লোথালও একটি সুপরিকল্পিত নগরী ছিল। এই পর্যন্ত চারিটি বড় রাস্তা ও কয়েকটি ছোট রাস্তা বাহির হইয়াছে। বড় রাস্তাগুলি ১২ ফুট হইতে ২০ ফুট পর্যন্ত চওড়া। এই সকল রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারি সারি বাড়ী নির্মিত হইয়াছিল দেখা যায়।

লোথাল ছিল বন্দর-নগরী। ছোট ছোট জাহাজের আশ্রয়ের জন্য এখানে একটি বৃহৎ ডক-ইয়ার্ড নির্মাণ করা হইয়াছিল। এই সময়ে খনন-কার্য চালাইবার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, ৭১০ ফুট লম্বা ও ১২০ ফুট চওড়া যে আয়ত ক্ষেত্রটি বাহির হইয়াছে, তাহা ডক ইয়ার্ড কি না, স্থির করা।

এখানে ডক-ইয়ার্ডের কতকগুলি নিদর্শন আছে। এখানে সিঁড়ি নাই, পূব দিকের বাঁধে জল প্রবেশের পথ আছে এবং দক্ষিণ দিকের বাঁধে জল আটকাইবার ব্যবস্থাযুক্ত চ্যানেল আছে। কতকগুলি গর্ত দেখিয়া জানা যায় যে, সেগুলিতে নৌকা বাঁধিবার জন্য কাঠের খুঁটি পোঁতা থাকিত। তাহা ছাড়া সেখানে নোঙ্গর বাঁধিবার পাথরও আছে।

সর্বোপরি এই মরশুমে খনন-কাজের ফলে জল প্রবেশ ও জল নির্গমনের খালের গতি নির্ণয়ে সুবিধা হইয়াছে। খালের ভিতর হইতে পরে বালিমাটি তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, প্রবল জোয়ারের সময় জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিত। ভবনগরের নিকটে গোথা নামক স্থানে আধুনিক ধরণের যে ডক-ইয়ার্ড নির্মাণ করা হইয়াছে, সেখানে প্রবল জোয়ারের সময় জাহাজ প্রবেশ করে। লোথাল ডক-ইয়ার্ড পরিকল্পনা প্রায় গোথা ডক-ইয়ার্ডের মত। গোথার বাঁধগুলি মাটির, কিন্তু লোথালে বাঁধগুলি ছিল ইটের। লোথাল ডক আকারে অনেক বড়, সেখানে ভাঁটার সময়ও নৌকা প্রভৃতি চলাচল করিত।

লোথালে প্রায় ১৭ হাজার প্রাচীন দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। উহাদের কতকগুলি খুবই বিস্ময়কর। যেসব মোহর পাওয়া গিয়াছে, মাটির উপর তাহার কতকগুলি ছাপ দেখিয়া স্পষ্ট জানা যায় যে, বিখ্যাত সিন্ধু মোহর, আমদানী বা রপ্তানীর দ্রব্যাদির প্যাকেটের মুখ বন্ধ করিবার জন্য ব্যবহার করা হইত।

লোথালে বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরের কিছু কিছু যন্ত্রও পাওয়া গিয়াছে। পাথর বা ধাতুর মালার গুটি ছিদ্র করিবার তুরপুন, হাড়ের দাঁড়িপাল্লা, সমকোণ মাপিবার যন্ত্র প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। সে সময় প্রস্তর দিয়া মালার গুটি তৈয়ার করিবার একটি উন্নত শিল্প ছিল।

সে সময়ে নাক, কান ও আঙুলে যে অলঙ্কার ব্যবহার করা হইত, তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সে যুগের লোকে যে মাছ ধরিবার জন্য বড়শী এবং অস্ত্র হিসাবে ছোরা, বর্শা প্রভৃতি ব্যবহার করিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

প্রথম যুগে লোথাল নগরী ছিল বৃহৎ এবং ইহার অধিবাসীরা ছিল সমৃদ্ধ। প্রবল বন্যায় এই নগরী ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু অধিবাসীরা পুনরায় এই স্থানে আসিয়া ব্যবসা আরম্ভ করে। তখন এই নগরী আর বিস্তৃত ছিল না এবং ইহার লোকজনও সমৃদ্ধিশালী ছিল না। ডক-ইয়ার্ডও ব্যবহার করা যায় নাই। এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য বিনষ্ট হইয়া যায়।

ফলের গঠন ও ক্রমবিকাশ

শ্রীঅমল হালদার

জীব-বিজ্ঞানের দিক হইতে ফলের গুরুত্ব শুধু খাদ্য হিসাবেই নহে, তত্ত্বানুসন্ধানের দিক হইতে ফল একটি আকর্ষণীয় বস্তু। ফলের মধ্যে জীবনের লক্ষণগুলি জীববিদ্গণের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়িয়াছে। ভ্রূণের বিকাশ হইতে পরিণত অবস্থা পর্যন্ত ফলের স্বল্প জীবন-কালের মধ্যে অন্যান্য সজীব পদার্থের মত যে একই রকমের রাসায়নিক এবং দৈহিক ভুক্ত; কিন্তু লাউ, কুমড়া, বেগুন, কাঁচকলা, টোম্যাটো—এগুলি কি? সাধারণের মতে, এগুলি সব্জী, অর্থাৎ ভেজিটেবল পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের মতে, এগুলিও ফলের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে ফল দুই প্রকার; যথা—(১) সুমিষ্ট ফল ও (২) সব্জী ফল।

ফুল হইতেই ফলের সৃষ্টি। উদ্ভিদের জনন-

ফুলের বিভিন্ন অংশ।
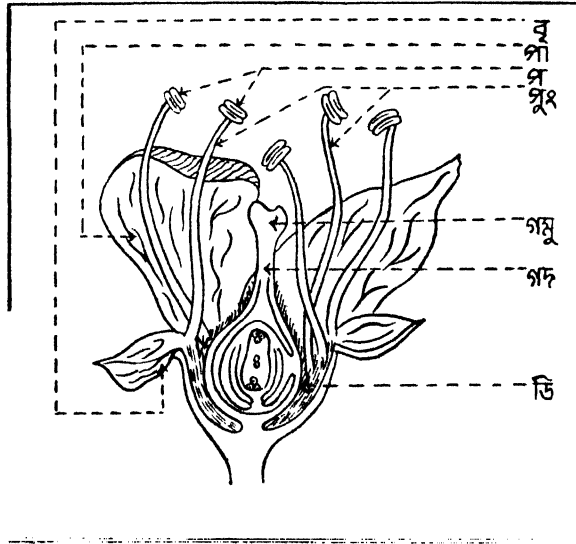
বৃ-বৃত্যংশ, পা-পাপড়ি, প-পরাগধানী, পুং-পুং-কেশর
গমু-গর্ভমুণ্ড, গদ গর্ভদণ্ড, ডি-ডিম্বাশয়।

পরিবর্তন সংঘটিত হয়, এই রহস্য বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ফলের এই ক্রমবিকাশ উপলব্ধি করিবার পূর্বে ফল কাহাকে বলে এবং কিভাবে গঠিত হয়, তাহা সম্যক জানা দরকার। আমরা সকলেই একমত যে—আম, জাম, কলা, কাঁঠাল, কমলালেবু—এগুলি ফল পর্যায়-

ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ফুলের যে সকল অংশ দায়ী, সেই সকল অংশের দ্বারাই ফলের সৃষ্টি হয়। ফলের গঠনের জন্য ফুলের প্রধান অংশগুলি হইতেছে—পুং-কেশর ও গর্ভকেশর।

পুং-কেশরের পরাগস্থলীতে পরাগরেণু থাকে। পরাগরেণুর আয়তন ধূলিকণার মত। প্রত্যেকটি

পরাগরেণু-কোষ ছুইটি আবরণের (রেণু-বহিস্তক ও রেণু-অন্তস্তক) দ্বারা আচ্ছাদিত। এই কোষের মধ্যে প্রথমতঃ থাকে একটি মাত্র নিউক্লিয়াস, পরে উহা একটি জনন-কোষ এবং একটি অঙ্গজ কোষে বিভক্ত হয়। গর্ভসঞ্চারের পূর্বে জনন-কোষ পুনরায় বিভক্ত হইয়া ছুইটি পুং-জনন-কোষের সৃষ্টি করে এবং অঙ্গজ কোষটির বিলুপ্তি ঘটে।

গর্ভকেশর (পিষ্টিল) তিনটি অংশ লইয়া রন্ধ্রের (মাইক্রোপাইল) দিকে অবস্থিত ভ্রূণস্থলী থাকে। গর্ভসঞ্চারের সময় প্রত্যেক ভ্রূণস্থলীতে থাকে ৮টি নিউক্লিয়াস। (১) একটি ডিম্বাণু এবং ছুইটি সাহায্যকারী কোষ লইয়া গঠিত গর্ভযন্ত্র; (২) তিনটি কোষ লইয়া গঠিত প্রতিপাদ কোষসমষ্টি (অ্যান্টিপোডাল সেল্‌স্) এবং (৩) ছুইটি নিউ-ক্লিয়াস লইয়া গঠিত গৌণ নিউক্লিয়াস (সেকেণ্ডারি নিউক্লিয়াস)।
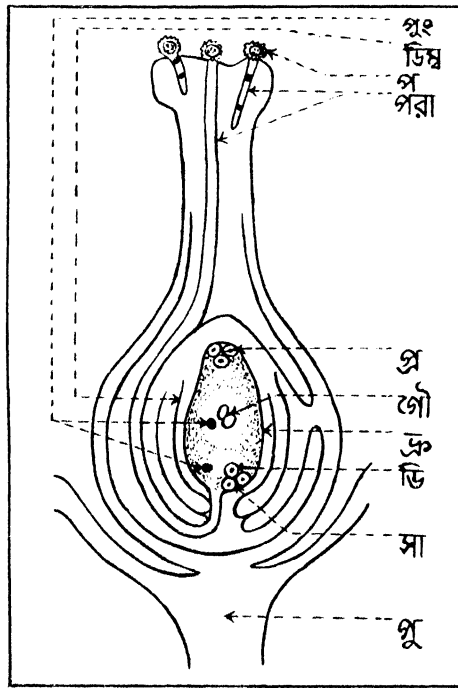
ফুলের গর্ভসঞ্চার প্রণালী।

প-পরাগরেণু, পুং-পুং-জনন-কোষ, ডিম্ব-ডিম্বক, পরা-পরাগ-নালী, প্র-প্রতিপাদ কোষসমষ্টি, গৌ-গৌণ নিউক্লিয়াস, ডি-ডিম্বাণু, সা-সাহায্যকারী কোষদ্বয়, পু-পুষ্পাধার, ভ্র-ভ্রূণস্থলী।

গঠিত। এইগুলি হইতেছে-(১) গর্ভমুণ্ড, (২) গর্ভদণ্ড এবং (৩) ডিম্বাশয় (ওভারি)। ডিম্বাশয়ের ভিতর থাকে ডিম্বক (ওভিউল); ইহা প্ল্যাসেণ্টার দ্বারা ডিম্বাশয়ের গাত্রে সংলগ্ন থাকে। আবার এই ডিম্বকের ভিতর ভ্রূণ, পোষকের মধ্যে ডিম্বক-

সপুষ্পক উদ্ভিদে ভ্রূণস্থলীর ডিম্বাণু (স্ত্রী-জনন-কোষ) এবং পুং-কেশরের পুং-জননকোষের মিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়। এই মিলন সংঘটিত হয় পরাগসংযোগ দ্বারা। ফুলের পুং-কেশর হইতে পরাগরেণু গর্ভকেশরের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত

হওয়ার নাম পরাগ-সংযোগ। উভলিঙ্গ ফুলে স্বপরাগ-সংযোগ এবং একলিঙ্গ ফুলে পরাগ-সংযোগ কীট-পতঙ্গের সাহায্যে বা অন্য উপায়ে সংঘটিত হয়। পরাগ-রেণু গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হইবার পর তাহা অঙ্কুরিত হয় এবং রেণু অন্তস্তক বর্ধিত হইয়া নলের আকার ধারণ করে। এই নলকে পরাগ-নালীকা বলা হয়। ইহা গর্ভমুণ্ড ভেদ করিয়া গর্ভদণ্ডে প্রবেশ করে। পুং-জননকোষসহ এই নালীকা ডিম্বাশয়ের ভিতর ডিম্বকের গা ঘেষিয়া ডিম্বক-রন্ধ্রের দিকে চলিতে থাকে। ক্রমে ডিম্বক-রন্ধ্রের আবরণ ভেদ করিয়া ভ্রূণস্থলীতে প্রবেশ করে। দুইটি পুং-জনন-কোষের একটি ডিম্বাণুর সহিত অপরটি গৌণ নিউক্লিয়াসের সহিত মিলিত হয়। এইরূপে উদ্ভিদের গর্ভসঞ্চার হয়। গর্ভসঞ্চারের পর সাহায্য-কারী কোষদ্বয় এবং প্রতিপাদ কোষসমষ্টি লুপ্ত হইয়া যায়। ডিম্বাণু ও পুং-জননকোষের মিলনের পর কোষ-প্রাচীর দ্বারা আবৃত হইয়া ভ্রূণাণুতে রূপা-ন্তরিত হয়। পরে ভ্রূণাণু হইতে ভ্রূণ, ডিম্বক হইতে বীজ ও শাঁস, গৌণ নিউক্লিয়াস হইতে এণ্ডোস্পার্ম এবং ডিম্বাশয় হইতে ফলের সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতিতে ফল ও বীজ সৃষ্টির ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু প্রশ্ন হইল, ডিম্বাশয়ের এই রূপান্তর কিরূপে সংঘটিত হয়? বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, অক্সিনের (উদ্ভিদ-হর্মোন) প্রভাবেই ডিম্বাশয়ের এই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশ—কুঁড়ি, কাণ্ড, পত্র, পুষ্প পরাগ-রেণু প্রভৃতিতে অক্সিন (ইণ্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড) উদ্ভিদ-দেহে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণক্ষম পদার্থ। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, পরাগ-রেণুতে ট্রিপটোফেন নামক একটি অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। পরাগ-রেণুর এই ট্রিপটোফেন অক্সিডাইজিং এন্‌জাইমের দ্বারা ইণ্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। পরাগ-সংযোগের পর বীজের সৃষ্টি হইলেই বীজাধার বৃদ্ধি পাইয়া ফলের সৃষ্টি হয়। পরাগ-নিঃসৃত হর্মোন যে বীজাধারের স্ফীতি সম্পাদন করে, ১৯১০ সালে ফিটিং তাহা আবিষ্কার করেন।

ফল বৃদ্ধির মূলেই যে অক্সিনের নিয়ন্ত্রণ শক্তি বর্তমান, হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জিননিস্কিও পরীক্ষামূলকভাবে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি ষ্ট্রবেরি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, বৃদ্ধির সময় বীজ, অর্থাৎ ফলগুলি ফেলিয়া দিলে পুষ্পাধারের (ইহা খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়) বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়।

কিন্তু কয়েকটি বীজ রাখিয়া দিলে পুষ্পাধার স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। আবার ষ্ট্রবেরিকে বীজহীন করিয়া পুষ্পাধারে রাসায়নিক অক্সিন প্রয়োগ করিলেও পুষ্পাধার স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। তারপর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেন, ষ্ট্রবেরির বীজে অক্সিন আছে। ইহা হইতে তিনি প্রমাণ করিলেন যে, বীজে সঞ্চিত অক্সিন পুষ্পাধারের স্ফীতির প্রধান কারণ।

প্রকৃতিতে বীজ ও ফল সৃষ্টির এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। অনেক ফল, যেমন—কোন কোন জাতীয় কমলা, কলা, আনারস, শশা প্রভৃতি বীজশূন্য হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরাগ-সংযোগ ঘটিলেও গর্ভসঞ্চার হয় না। পরাগ-নালীকা সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধি পায় না, ডিম্বকে প্রবেশের পূর্বেই উহার বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়। এখন প্রশ্ন হইতেছে, শুধু পরাগ সংযোগের দ্বারা ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধি কিভাবে সাধিত হয়? বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে বীজহীন ফল উৎপন্ন হয়, সে ক্ষেত্রে বীজাধারে সঞ্চিত অধিক পরিমাণ অক্সিনের প্রভাবেই ডিম্বাশয় বর্ধিত হয়। এরূপ অবস্থায় দেখা যাইতেছে, বীজাধার যৌন-সম্পর্ক ব্যতীতও ফলে পরিণত হয়। উদ্ভিদ-দেহজাত ইণ্ডোল-৩ অ্যাসিটিক অ্যাসিডের প্রভাবেও যে বীজহীন ফল উৎপন্ন হয়, তাহা পরীক্ষিত সত্য।

প্রকৃতিতে যে পদ্ধতিতে বীজহীন ফল সৃষ্টি হয়, বৈজ্ঞানিকেরা সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া

বীজহীন ফল সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কৃত্রিম ব্যবস্থায় অক্সিন ব্যবহার করিয়া বিন, ষ্ট্রবেরি, আপেল, টোম্যাটো, শশা প্রভৃতি বীজহীন ফল সৃষ্টি করা হইয়াছে। এইভাবে বীজহীন ফল উৎপাদনে রাসায়নিক অক্সিন ইণ্ডোল-৩ অ্যাসিটিক অ্যাসিড, ইণ্ডোল প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড, আলফা এবং বিটা ন্যাপথোক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রভৃতি বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে।

ভ্রূণের বিকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া পরিপক্কতা পর্যন্ত ফলের চারটি পর্যায় পরিলক্ষিত হয়। যথা:—প্রথম পর্যায়—গর্ভসঞ্চারের পর হইতেই কোষ-বিভাজন আরম্ভ হয় এবং ফল বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেখা গিয়াছে, প্রথম ৩·৪ সপ্তাহের মধ্যে আপেলে ক্রমান্বয়ে কোষ বিভাজিত হইয়া ৫ হইতে ১০ লক্ষ কোষ গঠিত হয়। ইহার পর কোষ-বিভাজন বন্ধ হইয়া যায় এবং ডিম্বাশয় স্ফীত হইয়া আকারে বড় হইতে থাকে।

দ্বিতীয় পর্যায়—এই সময় প্রত্যেক কোষের সাইটোপ্লাজম কোষ-প্রাচীরের দিকে স্থানান্তরিত হয় এবং রসপূর্ণ ভ্যাকুওল মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে। কোষের প্রায় ৮০ ভাগ স্থান এই ভ্যাকুওল দ্বারা পূর্ণ হয়। ভ্যাকুওলে এই সময় শর্করা এবং সাইটোপ্লাজমে শ্বেতসার সঞ্চিত হইতে থাকে। এই পর্যায়ে ফল পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কাজেই এই সময়কে বলা হয় ফলের যৌবনকাল।

তৃতীয় পর্যায়:—পূর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্তির পর ফলের সৌরভ ও গন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি প্রস্তুত হইতে থাকে। এই সময় শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী হয় এবং শ্বেতসার, অ্যাসিড ও নাইট্রোজেনের ভাগ কমিয়া যায়। এই পর্যায়ে অথবা এই পর্যায় শেষ হইবার পর হইতেই ফল পাকিতে আরম্ভ করে। চতুর্থ পর্যায়—এই পর্যায়ে আরম্ভ হয় ফলের রাসায়নিক পরিবর্তন এবং ক্রমে ফলের বার্ধক্য প্রাপ্তি ঘটে। জলে অদ্রবণীয় প্রোটোপেকটিনের পরিমাণ এই সময়ে খুব কমিয়া যায় এবং পেক্‌টিনের পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রথমেই এই পেক্‌টিনের (ফলের যে অংশ হইতে জেলী তৈয়ারী হয়) রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। পেক্‌টিন গ্যালাকটুরোনিক অ্যাসিডের সহিত মিথাইল গ্রুপ এবং কার্বোক্সিল গ্রুপ দ্বারা গঠিত। মিথাইল গ্রুপ পরে ভাঙ্গিয়া গ্যালাকটুরোনিক অ্যাসিড পেক্‌টিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। ফল সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ক হইলে পেক্‌টিন জাতীয় পদার্থ কমিয়া নিঃশেষিত হইয়া যায়। কোন কোন ফলের (যেমন কলা) শ্বেতসার শর্করায় পরিণত হয়।

এই রাসায়নিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফলের বর্ণ পরিবর্তিত হইতে থাকে। অনেক ফলে সবুজ রং (ক্লোরোফিল) অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহার পরিবর্তে ফলের খোসায় হলদে বা লালচে রং দেখা দেয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ফল পাকিলেও বর্ণের কোন পরিবর্তন হয় না। কোন কোন জাতীয় পেঁপে, আম, কলা প্রভৃতির ফলে এই অবস্থা দেখা যায়। বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ফলের এই বর্ণ ব্যতিক্রমে উপাদানের বিশেষ কোন তারতম্য ঘটে না।

পাতা, মূল, জীবাণু এবং যাবতীয় সজীব পদার্থের মত ফলের শ্বাসক্রিয়াও জীবনী-শক্তির ভিত্তিস্বরূপ। ফলের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্বাসক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জৈব-রসায়নের মতে, উদ্ভিদের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় একটি গ্লুকোজ অণু ও ছয়টি অক্সিজেন অণুর রাসায়নিক সংযোগের দ্বারা ৬৮০ কিলোক্যালোরি শক্তি নির্গত হয়।

কোষ বিভাজনের সময় শ্বাসক্রিয়ার গতি বেশী থাকে এবং ফল বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার গতি কমিতে থাকে। ফলের ক্রমবিকাশের তৃতীয় পর্যায়ে শ্বাসক্রিয়ার গতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং সেই মুহূর্তেই কমিয়া যায়। শ্বাসক্রিয়ার এই নির্দিষ্ট সময়কে বলা হয় 'পরিবর্তন কাল'। ফলের স্বল্প জীবন-কালে পরিবর্তন কালের প্রভাব অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তন কালে অথবা পরিবর্তন কাল শেষ হইবার পর ফল পাকিতে আরম্ভ করে। ইহাই গাছ হইতে ফল পড়িবার পক্ষে উপযুক্ত সময়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, পরিবর্তন কালের পূর্ব পর্যন্ত ফলের রোগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু এই সময়ের পর প্রতিরোধ-ক্ষমতা কমিয়া যায়।

ফলের ক্রমবিকাশে তাপমাত্রার অংশও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। পরিবর্তন কালে শ্বাসক্রিয়া বিশেষ ভাবে তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। তাপমাত্রা (নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে) যত বেশী হইবে, শ্বাসক্রিয়ার গতিও তদনুরূপ বৃদ্ধি পাইবে। তাপমাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় কম হইলে পরিবর্তন কালের অবলুপ্তি ঘটে, অর্থাৎ যে পর্যায়ে পৌছিলে ফল পাকিতে আরম্ভ করে, কম তাপমাত্রার প্রভাবে সে পর্যায়ে পৌছিতে পারে না। পর্যবেক্ষণে জানা গিয়াছে যে, দীর্ঘ সময়ের জন্য ফল কম তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করিলে পরিপক্কতার ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কলা ৫৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং লেবু ৫০ ফারেনহাইট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা উচিত। ফল-বিশেষজ্ঞেরা বাতাসে অক্সিজেনের অংশ কমাইয়া তাহাতে ফল সংরক্ষণ করিয়া পরিপক্কতার সময় বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অক্সিজেনের অংশ খুব কম থাকিলে সংরক্ষিত ফল পচিতে থাকে এবং ফলের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ জমিতে থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, শতকরা ৫-১০ ভাগ অক্সিজেন ফল সংরক্ষণের জন্য ভাল। কারণ, ইহাতে 'পরিবর্তন-কাল' বিলম্বে ঘটে, সংরক্ষণ-সময় বৃদ্ধি পায় এবং ফলের গুণও ভাল হয়।

আমাদের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত উপাদান প্রয়োজন, সেগুলি হইতেছে (১) শ্বেতসার ও শর্করাজাতীয় খাদ্য, (২) প্রোটিন বা ছানা জাতীয় খাদ্য, (৩) তৈলজাতীয় খাদ্য, (৪) খনিজ লবণজাতীয় খাদ্য, (৫) খাদ্যপ্রাণ, অর্থাৎ ভিটামিন প্রভৃতি। এই উপাদানগুলি প্রায় প্রত্যেক ফলেই কিছু কিছু আছে। ফল এবং শাকসব্জি হইতেই প্রধানতঃ খনিজ লবণ এবং ভিটামিন পাওয়া যায়। বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ ফলেই এ, বি, সি প্রভৃতি ভিটামিন মাত্রাভেদে বর্তমান। লেবু জাতীয় এবং আনারস প্রভৃতি ফলে ক্যালসিয়াম এবং তেঁতুল, ডালিম এবং বাদামজাতীয় ফলে যথেষ্ট ফস্‌ফরাস পাওয়া যায়। পুষ্টিবর্ধক হিসাবে কলা, খেজুর, আঙ্গুর, আম প্রভৃতি ফলের মূল্য অত্যধিক। কারণ এই সকল ফলে শর্করার মাত্রা প্রচুর। অতএব খাদ্য হিসাবে ফলের গুরুত্ব বিচার করিয়া ইহাকে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

বিজ্ঞান বার্তা

৪০ তলা বাড়ীর সমান উঁচু বেলুন

সম্প্রতি আমেরিকার ভর্জিয়াস্থিত ব্রান্সউইকের কাছাকাছি স্থান থেকে ৪০তলা বাড়ীর সমান উঁচু একটি বেলুন ছাড়া হয়েছে। গ্রহলোক থেকে অতিশয় শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মি-কণা প্রচণ্ড গতিতে পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলের উপর আঘাত করছে। এই রশ্মি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এই বৃহদাকার বেলুনটিকে আকাশে ছাড়া হয়।

ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন এবং নৌ-বিভাগীয় গবেষণা দপ্তর থেকে বলা হয়েছে যে, এই ধরণের বিরাটাকার বেলুন ছাড়াই ছিল একটি বড় রকমের

সমস্যা। ছাড়বার পর বেলুনটি ১১৫০০০ ফুট উর্ধ্বে ওঠে। বর্তমানে এই বেলুনটি আকাশে ২১ মাইল উপর থেকে রশ্মি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করছে। যে সব মহাজাগতিক রশ্মি-কণা পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উপর প্রচণ্ডবেগে আঘাত করছে, তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এতে রাখা হয়েছে ৮০০ পাউণ্ড সিলভার ইমালশন ফিল্ম ও নানারকমের সরঞ্জাম। একটি রেডিও ট্র্যান্সমিটারও এর মধ্যে আছে। বেলুনটির ওজন আড়াই টন। যন্ত্রপাতি সমন্বিত এই রকম ওজনের কোন বেলুনই আজ পর্যন্ত উর্ধ্বাকাশের ১,০০,০০০ ফুট উপরে ওঠে নি। ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত রেডিও-তরঙ্গের সাহায্যে বেলুনটি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং রেডারের সাহায্যে এর অবস্থান নির্ণীত হচ্ছে। ফিল্মগুলির সাহায্যে যে সব ছবি গৃহীত হবে, সেগুলির তথ্য উদ্ধারে তেরটি রাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা সহায়তা করবেন। এতে প্রায় দু-বছরের মত সময় লাগবে।

অধিকাংশ মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীতে পৌছায় না। কাজেই অনেক উপরে না উঠে এদের সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করবার উপায় নেই। এই বেলুনের সাহায্যে তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে অল্প শক্তিসম্পন্ন রশ্মির সঙ্গে উর্ধ্বাকাশের এই রশ্মির পার্থক্য নিরূপিত হবে।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্সেল স্কিনই প্রথম মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে এভাবে তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা করেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি লোকান্তরিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর এই বিষয়ে গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের ভার দেওয়া হয় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানী ডাঃ মাসাটোসী কোশিবার উপর। ইনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে এখানে আছেন।

মহাশূন্য-যাত্রা সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা রচনা করতে হলে, যাত্রাপথে মহাজাগতিক রশ্মির ঘনত্বের পরিমাণ এবং মহাশূন্যে কি কি আছে, সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যেও এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

সমুদ্রের অতলে তথ্য-সন্ধান

মার্কিন নৌ-বাহিনীর সমুদ্রের নীচে তথ্য-সন্ধানী যান ট্রিয়েষ্টির সাহায্যে এবার গ্রীষ্মকালে গুয়াম দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি এলাকায় প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন গভীরতায় শব্দের গতি, তাপমাত্রা, লবণের মাত্রার পরিমাণ, স্রোতবেগ, আলো প্রবেশের মাত্রা, সামুদ্রিক জীবজন্তু এবং ভূতত্ত্ব বিষয়ক তথ্য সন্ধান করা হবে। যে সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে তথ্য সন্ধান করা হয়ে থাকে; সমুদ্রের গভীরতায় তাদের কার্যকারিতার বিষয়ও পরীক্ষা করে দেখা হবে।

নৌ-বাহিনী তিন মাসের মধ্যে ৭ বার সমুদ্রের নীচে গিয়ে এসব তথ্য সংগ্রহ করবার বিষয় স্থির করেছেন।

১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে বিশেষ ধরণের এই জলযানটি প্রশান্ত মহাসাগরের মেরিনাজ ট্রেঞ্চে ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ফুট নীচ পর্যন্ত গিয়েছিল। এর আগে কোন মানুষের পক্ষে সমুদ্রের এত গভীরে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

কয়লার পরিত্যক্ত অংশ থেকে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট

কয়লার খনিতে অনেক জিনিষই পাওয়া যায়; কিন্তু তা কাজে লাগে না, ফেলে দেওয়া হয়। আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠান এই সব জিনিষকেও কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করছেন। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম নর্থ অ্যামেরিকান কোল কর্পোরেশন। শ্লেটের মত, কিন্তু তার চেয়েও নরম একরকম পাথর, কয়লার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। এতে আছে অ্যালুমিনিয়াম ও লোহা। এই পাথর সালফিউরিক অ্যাসিডে রাখলে অ্যালুমিনিয়াম ও আয়রন সালফেট পাওয়া যায়। তারপর ডিষ্টিলেশন বা পরিস্রবণ

ও ক্রিষ্টেলিজেশন বা কেলাশন প্রক্রিয়ায় সালফেট পৃথক করে নেওয়া হয়। ময়লা পরিষ্কার, জল বিশুদ্ধিকরণ এবং কাগজ উৎপাদনে এসব সালফেট ব্যবহৃত হয়।

ওহায়োরপোহাটনে বছরে ৪০ হাজার টন অ্যালুমিনিয়াম সালফেট উৎপাদনের একটি কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কয়লার পরিত্যক্ত অংশ থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ও আয়রন অক্সাইড তৈরীরও পরিকল্পনা করেছেন।

অদাহ্য বস্ত্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিদপ্তর কার্পাস থেকে একপ্রকার অদাহ্য কাপড় তৈরী করেছেন।

যাদের আগুনের সংস্পর্শে এসে কাজকর্ম করতে হয়, এই অদাহ্য কাপড় তাদের বিশেষ কাজে লাগবে। আমেরিকায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কেবল অদাহ্যই নয়—তাপ, জল প্রতিরোধক নানারকমের কাপড় তৈরী হয়েছে।

সূর্যের এক্স-রে-র ফটোগ্র্যাফ

নিউ মেক্সিকোর ১৩০ মাইল উপরে জনৈক মার্কিন বিজ্ঞানী একটি বিশেষ ধরণের ক্যামেরার সাহায্যে সূর্যের এক্স-রে'র একটি ফটোগ্রাফ নিয়েছেন। এই ছবিতে দেখা যায়—সূর্যের জ্যোতিচ্ছটাকে ঘিরে আছে এক্স-রে'র রশ্মি এবং ঠিক ঐ ধরণেরই উজ্জ্বল রশ্মি রয়েছে সূর্যের কেন্দ্রেও।

পৃথিবীর ৬০ মাইলের মধ্যে আবহমণ্ডল ভেদ করে এসব এক্স-রে এসে পৌছায় না বলে রকেটের সাহায্যে এই ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়েছে।

মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থির করেছে, আগামী তিন বছরের মধ্যে প্রতি বছরে তিনটি করে মোট ন'টি কৃত্রিম উপগ্রহ এবং চারটি করে মোট বারোটি যান মহাশূন্যে প্রেরণ করবে। মহাশূন্য-যুগের শুরু থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পরিকল্পনা অনুসারে কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে প্রেরণ করে আসছে, বর্তমানে তাকেই সম্প্রসারিত করা হচ্ছে মাত্র।

১৯৬৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পরীক্ষা-মূলকভাবে এগুলিকে রকেটের সাহায্যেই বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে মহাশূন্যে প্রেরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে এসব রকেট ছাড়া নতুন ধরণের কয়েকটি উপগ্রহও ঐ সময়ে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করা হবে।

স্কাউট :—চার পর্যায়ী এই স্কাউট রকেট দু-শ' পাউণ্ড ওজনের উপগ্রহকে পৃথিবী থেকে তিন-শ' মাইল উর্ধ্বে এবং ৫০ পাউণ্ড ওজনের কোন গ্রহকে ১২ হাজার নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের বিজ্ঞানীরাও বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে এসব উপগ্রহের সাহায্য পাবেন।

মার্কারী :—এই রকেটের সাহায্যে পৃথিবী থেকে কয়েক-শ' মাইল উর্ধ্বে একটি মনুষ্যবাহী উপ-গ্রহকে মহাশূন্যে প্রেরণ করা হবে এবং পুনরায় একে পৃথিবীর কক্ষপথে এনে স্থাপন করা হবে। ঐ মানুষকে ঐ কক্ষপথ থেকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা হবে।

সেণ্টার :—অতিশয় শক্তিশালী হাইড্রোজেন রকেট। এই রকেটের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অধিকতর ওজনের উপগ্রহ মহাশূন্যে প্রেরণ করা সম্ভব হবে।

স্যাটার্ণ :—স্যাটার্ণ হলো আমেরিকার প্রথম পর্যায়ের প্রথম শ্রেণীর রকেট। এর থ্রাস্ট বা ধাক্কা দেওয়ার শক্তি হলো ১৫০০,০০০ পাউণ্ড। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সব রকেট আছে, সেগুলির তুলনায় এই রকেট প্রায় চারগুণ অধিক শক্তিশালী।

সেণ্টার :—এরই দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেট হলো

সেণ্টার। এই দুই প্রকার রকেটের সাহায্যে বেশী ওজনের বস্তুকে গ্রহলোক পর্যন্ত প্রেরণ করা সম্ভব হবে।

মঙ্গল ও শুক্রগ্রহগামী যান:—সেণ্টার রকেটের সাহায্যেই বৈজ্ঞানিক তথ্য সন্ধানের উদ্দেশ্যে এই সব গ্রহ পর্যন্ত মহাশূন্য-যান প্রেরণ সম্ভব হবে।

চন্দ্র উপগ্রহে যন্ত্রপাতি প্রেরণ:—সেণ্টার রকেটের সাহায্যে চন্দ্র উপগ্রহে যন্ত্রপাতি প্রেরণ করা যাবে।

এসব রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাশূন্য-যান প্রেরণ ব্যতীত ঐ সময়ে নিম্নলিখিত নতুন ধরণের বেলুন উপগ্রহ ও কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণেরও ব্যবস্থা হবে।

একো:—এটি হচ্ছে দশতলা সমান উঁচু অ্যালুমিনিয়াম আচ্ছাদনযুক্ত একটি বিরাটকায় বেলুন। এই উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বেতার, বেতারবীক্ষণ ও টেলিফোনযোগে বার্তা প্রেরণ কার্যকরী করা যায় কি না, তা পরীক্ষা করে দেখবার উদ্দেশ্যে এই বেলুন উপগ্রহ ছাড়া হবে।

জিওডেটিক ফ্ল্যাশিং লাইট:—পৃথিবীর সঠিক আকৃতি নির্ধারণ এবং যথাযথ মানচিত্র তৈরীর তথ্য সংগ্রহের জন্যেই এই উপগ্রহটিকে মহাশূন্যে প্রেরণ করা হবে। ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত মানমন্দিরের মত দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করবার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পারমাণবিক রিয়্যাক্টরে অল্প খরচে ওষুধ তৈরীর ব্যবস্থা

আমেরিকার হারকিউলিস পাউডার কোম্পানী নতুন ধরণের পারমাণবিক রিয়্যাক্টর নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, এসব রিয়্যাক্টরের সাহায্যে অতি অল্প খরচে ওষুধপত্র তৈরী করা যাবে। বাজারে বর্তমানে যে সব ওষুধ পাওয়া যায়, তার তুলনায় এভাবে ওষুধ তৈরীর খরচ অনেক কম পড়বে।

ইলেকট্রিক বাল্‌বের ব্যাপক উৎপাদন

আমেরিকায় ওয়েষ্টিং হাউস কর্পোরেশন বছরে ৩২০০০,০০০ বৈদ্যুতিক আলোর বাল্‌ব্ তৈরী করে থাকে। কর্পোরেশনের এই কারখানায় যত তাড়াতাড়ি বাল্‌ব্ তৈরী হয়, সে রকম দ্রুততায় পৃথিবীর আর কোন কারখানাতেই তৈরী হয় না। এটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বাল্‌ব্ তৈরীর কারখানা। বাল্‌ব্ তৈরীর উপকরণসমূহ যন্ত্রের একদিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং আর একদিক দিয়ে প্যাক করা তৈরী মাল বেরিয়ে আসে।

বিনা তারে বিদ্যুৎশক্তি প্রেরণ

বিজ্ঞানীদের বিনা তারে বিদ্যুৎশক্তি প্রেরণের পরিকল্পনা বহু দিনের। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ালথাম-এর র্যাথিওন কোম্পানীর উদ্যোগে এই পরিকল্পনা সার্থকতা লাভ করেছে।

তাঁরা একপ্রকার টিউব তৈরী করেছেন; তার নাম দিয়েছেন অ্যামপ্লিট্রন। এর মধ্যে বিদ্যুৎশক্তিকে অতি স্বল্প দৈর্ঘ্যের অতিশয় শক্তিশালী বেতার-তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়। অতি সরু পেন্সিলের আকৃতির রশ্মির মত এদের অন্য স্থানে প্রেরণ করা যায়। তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে এদের শক্তির অপচয় ঘটে না।

পৃথিবীর যে কোন স্থানে বেতারে বার্তা প্রেরণে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য

ইণ্টারন্যাশন্যাল সায়েন্টিফিক রেডিও ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ ডি, বার্কনার জানিয়েছেন যে, কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে অদূর ভবিষ্যতেই অতি অল্প খরচে পৃথিবীর যে কোন স্থানে বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর বার্তা প্রেরণের কেন্দ্র থেকে প্রেরিত বার্তা গ্রহণ করবে এবং পুনরায় সেই বার্তা দূরাঞ্চলের বার্তা-গ্রহণ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুন—১৯৬০

১৩শ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা
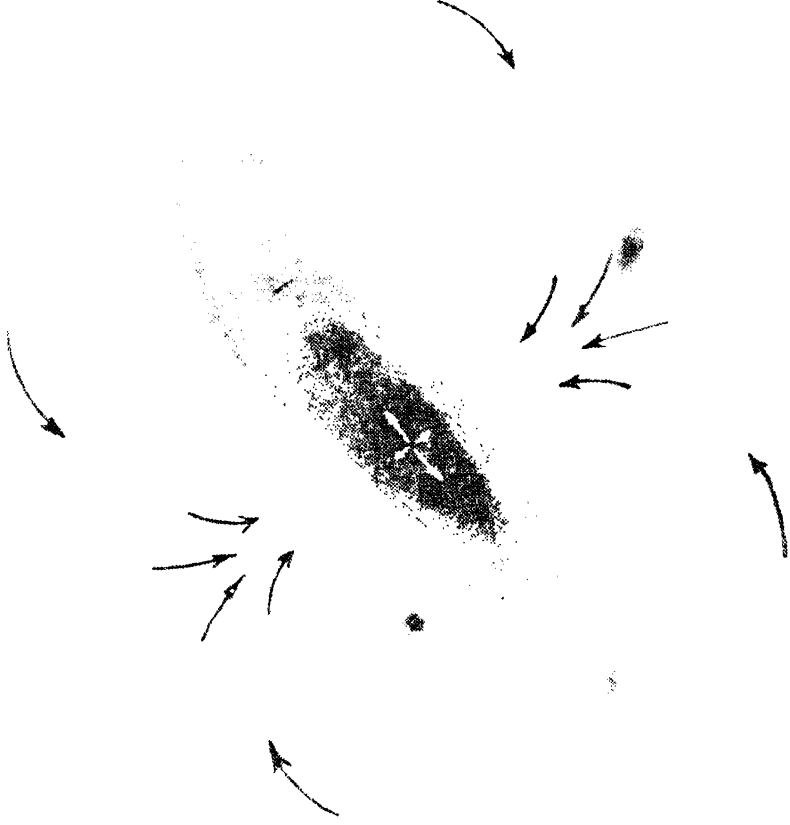
মাউণ্ট উইলসন ও প্যালোমার মানমন্দিরের ডাঃ গুইডো মাঞ্চ অ্যাণ্ড্রোমিডা (গ্যালাক্সি) পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, এর মধ্যস্থলের কালো তীর চিহ্নিত স্থান থেকে হাইড্রোজেন, মেঘপুঞ্জের আকারে বাইরে বেরিয়ে আসছে। মনে হয় যেন হাইড্রোজেন বাষ্পের এই মেঘপুঞ্জ চৌম্বক বলরেখায় কুণ্ডলীর মত বেষ্টন করে সাদা তীর চিহ্নিত পথে পুনরায় এর ভিতরের দিকে প্রবেশ করছে।

হীরার চেয়ে দামী

বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন কার্বন—কয়লা আর হীরা উভয়ে সেই একই পদার্থ। কয়লার মধ্যেও নাকি হীরা পাওয়া যায়। হীরার জ্যোতি মানুষকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু কালো কয়লা মানুষের কাছে হীরার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজনীয়, এমন কি অপরিহার্যও বটে। আসল কথা হচ্ছে, কয়লা আজ হীরার চেয়েও দামী। অনেকে তো রব তুলেছেন—কয়লাকে আর এমন করে পুড়িয়ে নষ্ট করা চলবে না। প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে জিনিষের দাম বেড়ে যায়। আজকের দিনে কয়লার প্রয়োজন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। রান্নার কথা বাদ দিলেও, যে বিদ্যুৎ এই সভ্যতার আলো, তার বেশীর ভাগই আসছে এই "কালো মাণিক" থেকে। জল বা বাতাসের শক্তির সাহায্যেও বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। দামোদরের জল বেঁধে এই বাংলার কাছেই জলশক্তি থেকে বিদ্যুৎ তৈরীর কারখানা স্থাপিত হয়েছে। আজকাল পরমাণু-শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা শোনা যাচ্ছে। বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর কয়লার পরিমাণ দিন দিন কমে আসছে। শেষে এমন দিন আসবে যখন ব্যবহারের জন্যে আর কয়লা পাওয়া যাবে না।

কিন্তু আমরা বলছিলাম অন্য কথা। কয়লা থেকে যে সব জিনিষ তৈরী করা যায় তাদের দাম হীরার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কয়লাকে বাতাসের স্পর্শ থেকে দূরে রেখে আগুনে পোড়ালে তাথেকে অনেক জিনিষ পাওয়া যায়। রুশ দেশের বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, তবে আর কষ্ট করে কয়লাকে খনির উপরে তোলা কেন? খনিতেই তাঁরা কয়লা পোড়াবার ব্যবস্থা করলেন। এভাবে পাওয়া যায় কয়লার গ্যাস, আর আলকাত্‌রা। নতুন এক ধরণের কয়লাও এই সঙ্গে পাওয়া যায়। ধাতু শোধনের কাজে এই কোকের খুব ব্যবহার হয়। কয়লার গ্যাস জ্বালানী হিসাবে কাজে লাগে। আর আলকাত্‌রা? যে রাসায়নিকদের কথা বলছিলাম, তাঁদের কথায় আলকাত্‌রা হলো—হীরার চেয়েও দামী। রাস্তায় যা ঢালা হয় তা আলকাত্‌রা নয়—পীচও নয়, তা হলো—অ্যাস্‌ফাল্ট।

আলকাত্‌রা থেকে পাওয়া যায় বেনজিন ইত্যাদি দশ রকমের জিনিষ। এগুলি থেকে আবার পাই শ'তিনেক নতুন পদার্থ। আর এই তিনশ' থেকে আসছে হাজার হাজার রং—কোনটা গাঢ়, কোনটা বা ফিকে, কোনটা লাল, কোনটা বা নীল।

কয়লা থেকে রং তৈরীর কথায় খুবই আশ্চর্য লাগে। অন্যান্য অনেক আবিষ্কারের মত এই রং তৈরীর ব্যাপারও আকস্মিকভাবে উদ্ভাবিত হয়েছে। হাফম্যান কাজ করতেন

বিজ্ঞানী লিবিগের লেবরেটরীতে। কয়লা থেকে তৈরী অ্যানিলিন জাতীয় জিনিষ থেকে একদিন তিনি খুব গাঢ় নীল রং পেলেন। এর অনেক আগেই অবশ্য জেনিন নামে এক ভদ্রলোক নীলগাছ থেকে এই রং তৈরী করবার কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর এই পদ্ধতি মেনে তখন প্রচুর নীল চাষ হতো বাংলা দেশে। হাফম্যানের আবিষ্কারের পর নীল চাষের আর প্রয়োজন রইলো না। কয়লা থেকে কৃত্রিম উপায়েই এবার নীল রং তৈরী সম্ভব হলো। হাফম্যান এক সময়ে রয়েল কলেজ অফ সায়েন্সের অধ্যাপক হিসাবে লণ্ডনে যান। সেখানে উইলিয়াম হেনরী পার্কিন নামে পনেরো বছরের একটি ছেলে তাঁর কাছে পড়তে আসে। ১৮৫৬ সালে এই পার্কিন অ্যানিলিন থেকে কৃত্রিম উপায়ে নতুন রং (Mouve) আবিষ্কার করেন। এর দশ বছর পরে তৈরী হলো টার্কিস রেড। টার্কিস রেড তৈরীর জন্যে আগে ফ্রান্সে এক ধরণের গাছের খুব চাষ হতো। কিন্তু পার্কিনের এই আবিষ্কারের পর নীল চাষের মত এই চাষও বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে আমরা যাকে সামান্য কয়লা বলে জানি, তা থেকে অভিনব রং প্রস্তুত করে বিজ্ঞানীরা দুনিয়ার অবস্থাই বদ্‌লে দিলেন। কয়লা থেকে যে কত রং তৈরী হয়েছে, তা শুনলে বিস্মিত হতে হয়।

আলকাত্‌রা থেকে নানারকম ওষুধও তৈরী হয়ে থাকে। এদের মধ্যে অ্যাসপিরিন, ফেনাসিন, সালফোন্যাল বিশেষ প্রচলিত। বিশেষজ্ঞদের মতে অবশ্য এসব ওষুধ উপকারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষতিও করে থাকে। কিন্তু বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে এসব ওষুধই আমরা সচরাচর ব্যবহার করি।

সুগন্ধি জিনিষ তোমরা কিন্‌তে ভালবাস। আতর তৈরীর জন্যে আগে অনেক গোলাপ ফুলের চাষ হতো। তারপর এই ফুল থেকে তৈরী হতো আতর। আজ তার দরকার হয় না। কয়লা থেকে তা সহজেই তৈরী করা হচ্ছে। শুধু আতর কেন, বহু সুগন্ধি জিনিষ এখন আলকাত্‌রা থেকে তৈরী হয়।

আলকাত্‌রার মধ্যে যে এত রকম সম্পদ লুকানো আছে, কে তা জানতো? কিন্তু দুঃখের কথা হলো—পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত দেশ যখন কয়লা থেকে এসব মূল্যবান জিনিষ সংগ্রহ করে নিচ্ছে, আমাদের দেশে তখন পুড়িয়েই বেশীর ভাগ কয়লা নষ্ট করা হচ্ছে।

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

মাটি

বাঁচতে কে না চায় ?

কিন্তু বাঁচতে হলে মানুষের কয়েকটি জিনিষ চাই-ই। তার মধ্যে তিনটি জিনিষ হলো—অন্ন, বস্ত্র আর গৃহ। মানুষের এই তিনটি মূল প্রয়োজন মিটে মাটি থেকে। তাই মাটি আমাদের এত আদরের। তাই তো কবি বলেছেন—

"ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।"

ভারত মায়ের সন্তান আমরা। ভারতের মাটিতে জন্ম আমাদের। ভারতের মাটিই জোগাচ্ছে আমাদের অন্ন আর বস্ত্র। এই জীবন শেষ করে আবার এই মাটিতেই আমরা মিশে যাব। এই মাটি আমাদের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে আছে। তাই মাটির বিষয় আমাদের জানা প্রয়োজন।

আমাদের এই পৃথিবী কি সুন্দর! যেদিকে চাই সেদিকেই কত গাছপালা, পশুপাখী, পোকামাকড়। এরাই জগৎকে সুন্দর করে তুলেছে। তাই তো কবি বলেছেন—

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।"

কিন্তু এসব জীবজন্তু, পশুপাখী, পোকামাকড়—যারা পৃথিবীকে সুন্দর করেছে—কত কোটি বছর ধরে যে এখানে রয়েছে, তার হিসাব নেই। কিন্তু একদিন এসব কিছুই ছিল না—ছিল কেবল জল আর পাহাড়। মাটি সৃষ্টির মূলে আছে এই পাহাড়।

পাহাড় তৈরী পাথর দিয়ে। দিনের বেলায় সূর্যের প্রচণ্ড তাপে পাথর আয়তনে বেড়ে যায়, আর রাতে ঠাণ্ডায় কুঁচকে যায়। ক্রমাগত এভাবে বেড়ে যাওয়া ও কুঁচকে যাওয়ার ফলে পাথর যায় ফেটে। ঝড় ঐ পাথরের ছোট ছোট টুক্‌রাগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে তারা যায় ভেঙ্গে—গুঁড়িয়ে। জল আর বাতাস ঐ গুঁড়া পাথরকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বয়ে নিয়ে যায়।

পাথরের অনেক উপাদান বৃষ্টির জলে ক্রমশঃ গলে যায়। তাতে পাথরের সংহতি নষ্ট হয়। তার ফলে কালক্রমে শক্ত পাথর গুঁড়া হয়ে যায়। আবার নদীর স্রোতে পাথরের নুড়ি ক্রমাগত গড়িয়ে যাবার ফলে ঘষে ক্ষয় পায়। নদীর ধারে আমরা যে বালি দেখতে পাই, তা এই জিনিষ।

গাঁথনির ফাঁকে অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি গাছ গজালে পাকা বাড়ীও দুর্বল হয়ে একদিন ধ্বসে পড়ে। পাহাড়ের গায়ে যে সব উদ্ভিদ জন্মে, তারা তাদের শিকড় ঢুকিয়ে দেয়

পাথরের গায়ে ফাটলের মধ্যে। তার ফলে চাড় পেয়ে শক্ত পাথর গুঁড়িয়ে যায়। জীবজন্তু আর গাছপালা মরে' পচে' গিয়ে পাথরের গুঁড়ার সঙ্গে মেশে। পাথরের গুঁড়ার সঙ্গে জৈব পদার্থ মিশে তৈরী হয় মাটি। কাজেই মাটি পাথরের গুঁড়ারই রূপান্তর মাত্র।

এতক্ষণ মাটির উৎপত্তির কথা বলা হলো। উৎপত্তি অনুসারে মাটিকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে—বাহিত মাটি, আর প্রাথমিক মাটি। ঝড়-বৃষ্টি অনেক সময় বিশুদ্ধ মাটিকে তার আদি জন্মস্থান থেকে বয়ে দিয়ে অন্য জায়গায় জমা করে। এ-ধরণের মাটিকেই বলা হয় বাহিত মাটি। পৃথিবীতে বাহিত মাটির পরিমাণই বেশী। উঁচু জমি থেকে বয়ে আনা নদীর পলি নীচু জমিতে জমে। এই পলিমাটিও বাহিত মাটি। নানা রঙের পলিমাটিই কুমোরেরা তাঁদের কাজের জন্যে সচরাচর ব্যবহার করে। আর্যাবর্তের সমভূমির মাটিও এই বাহিত মাটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাহিত মাটি ছাড়াও আছে প্রাথমিক মাটি। যে মাটি তার আদি জন্মস্থানে আজও পড়ে আছে, তার নাম প্রাথমিক মাটি। প্রাথমিক মাটির রং একটু কালো হয়। প্রাথমিক মাটি কখনও কখনও উর্বর হয়ে থাকে। যেমন মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের কালো মাটি। এই কালো মাটি কাপাস তুলার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

চাষের জন্যে মাটিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে থাকি। এঁটেল মাটি, বেলে মাটি আর দোআঁশ মাটি। এঁটেল মাটির কণাগুলি খুব সূক্ষ্ম। এই মাটিতে বালির ভাগ কম, আর কাদার ভাগ বেশী। তাই এই মাটি বেশী চট্‌চটে। বেশী চট্‌চটে বলে চাষ করতেও কষ্ট হয়। এই মাটিতে জল, বাতাস ও রোদ ঢুকতেও দেরী হয়।

এঁটেল মাটি শুকিয়ে গেলে খুব শক্ত হয়, কিন্তু রোদে ফেটে যায়। তাই শুধু এঁটেল মাটি দিয়ে সব কাজ চলে না। এঁটেল মাটিতে আমন ধান, গম, পাট, আখ প্রভৃতি ফসল হয়। এঁটেল মাটিকে দোআঁশ মাটিতে পরিণত করতে হলে বালি, চুন, ছাই, পাতা সার প্রভৃতি মেশাতে হয়।

বেলে মাটি—নামটা শুনেই বোঝা যায় যে, বেশী ফাঁক থাকে বলে জল দাঁড়ায় না। এই মাটি সহজেই জল টেনে নেয়, কিন্তু ঐ জল শীঘ্রই শুকিয়ে যায়। বেলে মাটির কণাগুলি বড় এবং খস্‌খসে। এই মাটি তাড়াতাড়ি গরম ও ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। ফলন তেমন ভাল হয় না বেলে মাটিতে। তবে কিছু ফসল, যেমন—ফুটি, তরমুজ, পটল প্রভৃতি হতে পারে। এঁটেল মাটি, ছাই, হাড়ের গুঁড়া, পাতা সার প্রভৃতি মিশিয়ে এই মাটিকে দোআঁশ মাটিতে পরিণত করা হয়।

দোআঁশ মাটিতে কাদা ও বালি প্রায় সমান সমান থাকে। এই মাটি খোঁড়া এবং চষা দুই-ই সহজ। দোআঁশ মাটিতে জল, বাতাস ও রোদ সহজেই ঢোকে। চাষের ব্যাপারে দোআঁশ মাটিই সবচেয়ে ভাল। সেরা মাটি বলে প্রায় সব রকম ফসলই

ওতে ফলানো যায়। তবে আউশ ধান, পাট, আলু, আদা, তামাক, ছোলা, মটর, হলুদ প্রভৃতি ফসল এই মাটিতে খুব ভালই ফলে।

আমাদের দেশের অনেক জায়গায়, বিশেষ করে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের মাটির রং লাল। কারণ ঐ সব অঞ্চলের মাটিতে লোহার (ফেরিক অক্সাইড) ভাগ বেশী। যে মাটিতে এই উপাদানটি বেশী, তার নাম গেরিমাটি। আর যে মাটিতে ফেরিক অক্সাইডের বদলে ফেরিক হাইড্রক্সাইড বেশী থাকে, সে মাটির রং হয় হলদে। এই হলদে মাটিকে বলে এলামাটি।

রং হিসাবে এই দু-রকমের মাটিই আমাদের দেশে খুব বেশী ব্যবহৃত হয়। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহীশূর এবং কাশ্মীর অঞ্চলে গেরিমাটি ও এলামাটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এই দু-রকমের মাটি রঙীন হওয়ার মূলে আছে লোহা। আবার পোড়া মাটির রং লাল। এর মূলেও আছে লোহা। মাটিতে যে লোহা থাকে—মাটি পোড়ালে তা ফেরিক অক্সাইডে পরিণত হয়। এই ফেরিক অক্সাইডের জন্যেই পোড়া মাটির রং লাল।

শ্রীঅমরনাথ রায়

জানবার কথা

১। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে প্রাণীমাত্রেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকে। শত্রুর চোখে ধূলা দেবার জন্যে বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন রকমের কৌশল অবলম্বন করে।

১নং চিত্র

টারমিগান পাখী (মোরগ জাতীয় পাখী) উড়ন্ত অবস্থায় আক্রান্ত হলে—একেবারে খাড়াভাবে তুষারাবৃত নদীর উপর ঝুপ্ করে নেমে পড়ে। এই অবস্থায় শত্রুর আর তাড়া করবার উপায় থাকে না।

২। বর্ণমালা আবিষ্কৃত হবার ফলে মানব-সভ্যতার যুগান্তকারী অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বর্ণমালাকে কে প্রথম আবিষ্কার করে? এ-সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা অনেক অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, সাইরোপ্যালেষ্টিনিয়ান সেমিটিক জাতির মধ্যে সম্ভবতঃ কোন অজ্ঞাত প্রতিভাশালী ব্যক্তি ৩০০০ বছরেরও অনেক আগে বর্ণমালা

২নং চিত্র

আবিষ্কার করেন। সেই আদি বর্ণমালা থেকেই ক্রমশঃ আধুনিক গ্রীক, ল্যাটিন, রুনিক, হিব্রু, আরবী, সিরিলিক (শ্লাভিক), ব্রাহ্মী ও কোরীয়ান ভাষার বর্ণমালার উৎপত্তি হয়েছে।

৩। যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রীবাহী কত মোটরগাড়ী আছে, তা বোধহয় তোমাদের জানা নেই। সঠিক সংখ্যা জানা না থাকলেও—তোমরা বোধ হয় জান যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রায়
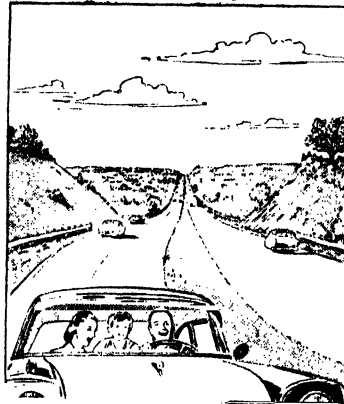
৩নং চিত্র

প্রতিটি লোক মোটর গাড়ীতে চলাফেরা করে। একটা হিসাবে জানা গেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে ৫৬,০০০,০০০ মোটরগাড়ী আছে। প্রতিটি গাড়ী বছরে গড়ে ১০,০০০ মাইল ভ্রমণ করে।

৪। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দুর্গম স্থানের মধ্য দিয়েও ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা আছে। এসব জায়গায় ট্রেন চলাচলের দৃশ্য খুবই বিস্ময়কর। তবে এসব রেল-লাইনগুলিকে ঠিক সাধারণ পর্যায়ে ফেলা যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, পৃথিবীর মধ্যে
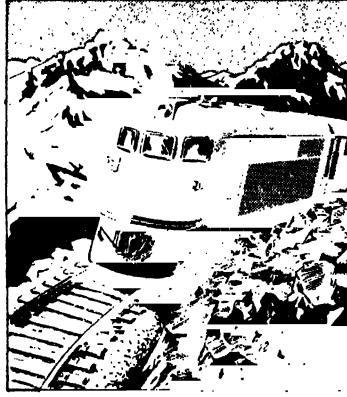
৪নং চিত্র

এই ধরণের রেল লাইনের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো—ইকুয়াডোরের পার্বত্য রেল লাইন। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৩০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত গুয়াইয়াকুইল বন্দর-নগর থেকে এই লাইন আরম্ভ হয়ে ৯,৩০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত কুইটোর প্রধান শহরে গিয়ে শেষ হয়েছে এবং লাইনের মাপ অনুযায়ী এই দুই স্থানের দূরত্ব হলো ২৮৮ মাইল।

৫। পৃথিবীর অধিকাংশ পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাদি সাদা কাগজের উপর কালো কালি দিয়ে ছাপা। কিন্তু কালো কালিতে ছাপার দরুণ তাড়াতাড়ি পড়বার পক্ষে

৫নং চিত্র

কোন সুবিধা হয় কি? বিজ্ঞানীরা বলেন—এই পদ্ধতিতে মুদ্রিত পুস্তক সহজে পড়া যায় না। বরং সহজে পড়বার দিক থেকে অন্যান্য রঙের কালির তুলনায় সাদার উপর

কালো কালির স্থান ষষ্ঠ। তাঁরা আরও বলেছেন যে, সবচেয়ে সহজে পড়া যায়, হল্‌দের উপর কালো কালির লেখা এবং অপরগুলি হলো যথাক্রমে সাদার উপর সবুজ, সাদার উপর লাল, সাদার উপর নীল এবং নীলের উপর সাদা।

৬। টিয়া, ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখী তোমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত। অনেক সময় এরা এমনভাবে কথা বলে, যা শুনতে খুব ভাল লাগে। অনেকে আবার এদের নানারকম কথা ও ছড়া শেখায়। ইংল্যাণ্ডের মিডেলসেক্সের অন্তর্গত স্টেন্‌সে আইরিন পল নামক কোন এক মহিলার একটি পোষা হরবোলা পাখী আছে। পাখীটির নাম
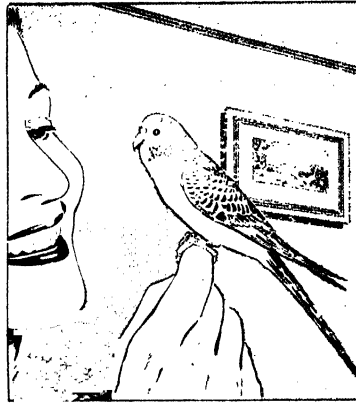
৬নং চিত্র

হলো স্যাণ্ডি পল। এর ঠোঁটের রং হলুদ ও বাদামী মিশ্রিত। পৃথিবীর অন্যান্য কথক পাখীর তুলনায় স্যাণ্ডি পল বারোটি ছড়া এবং তিন-শয়েরও বেশী কথা বা শব্দ বলতে পারে। স্যাণ্ডি পল ডিম ফুটে বেরিয়েছে ১৯৫২ সালে।
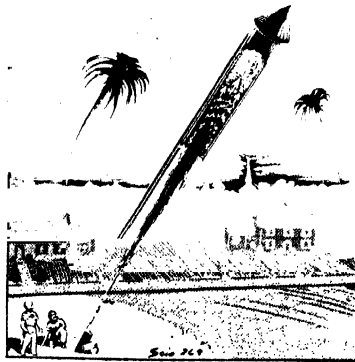
৭নং চিত্র

৭। যুক্তরাষ্ট্রের পরলোকগত পদার্থ-বিজ্ঞানী ডাঃ রবার্ট এইচ. গডার্ডকে বলা হয়

"আধুনিক রকেটের জনক"। রকেট থেকে নির্গত গ্যাস বায়ুস্তরে ধাক্কা দিয়ে তাকে সামনের দিকে ঠেলে দেয় এবং তার ফলেই রকেট গতিবেগ লাভ করে—এক সময় এই ধারণাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৯২০ সালের প্রথম দিকে ডাঃ গডার্ডের গবেষণার ফলে এই ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়। ডাঃ গডার্ড পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, রকেটের অভ্যন্তরের গ্যাসের চাপই রকেটকে সামনের দিকে ঠেলে দেয় এবং এই ধাক্কার ফলেই রকেট প্রচণ্ড গতিবেগ লাভ করে।

৮। মানুষের শরীরের বিভিন্ন কাজ ২৪ ঘণ্টায় কি হারে চলে—এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে পরীক্ষার ফলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। তাঁদের মতে—গড়ে স্বাভাবিক দৈহিক ওজনের একটি মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ ২৪ ঘণ্টায় নিম্নোক্ত হারে
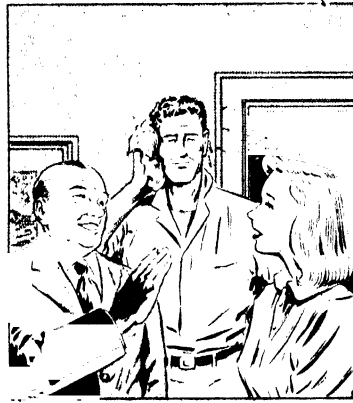
৮নং চিত্র

কাজ করে—শ্বাস-প্রশ্বাস ২৩,০৪০ বার, নিঃসৃত ঘামের পরিমাপ হলো ১'৪৩ পাঁইট। ৫,০০০ শব্দ উচ্চারণ করে, সাত মিলিয়ন মস্তিষ্ক-কোষ কার্যকরী থাকে, হৃৎস্পন্দন হয় ১০৩,৬৮০ বার এবং চুলের বৃদ্ধির পরিমাপ হলো, এক ইঞ্চির ০'০১৭১৪ ভাগ।

৯নং চিত্র

৯। প্যান-আমেরিকান রাস্তা আলাস্কার ফেয়ারব্যাঙ্ক থেকে আরম্ভ হয়ে

আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ারসে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই রাজপথের দৈর্ঘ্য হলো ১৮,৮৭৯ মাইল। এই রাজপথের সঙ্গে পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত প্রতিটি দেশের রাজধানীর যোগ রয়েছে। এই রাস্তা তৈরীর কাজ আরম্ভ হয় ১৯২৩ সালে এবং বর্তমানে রাস্তা নির্মাণ-কাজের শতকরা ৯৫ ভাগেরও বেশী সমাপ্ত হয়েছে এবং বাকীটুকু সমাপ্ত হলে—রাস্তাটি সম্পূর্ণ হবে।

১০। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রস্তর-মূর্তি বা ভাস্কর্যের নিদর্শন রয়েছে দক্ষিণ ডাকোটায়। এগুলি গণতন্ত্রের পূজারীদের মূর্তি হিসাবে মাউণ্ট রাসমোর ন্যাশন্যাল মেমোরিয়ালে স্থাপিত রয়েছে। প্রত্যেকটি মূর্তি গ্রানিটের তৈরী। এর মধ্যে আছেন প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটন, জেফারসন, থিওডোর রুজভেল্ট ও লিঙ্কনের মূর্তি। মূর্তিগুলি ৪৬৫
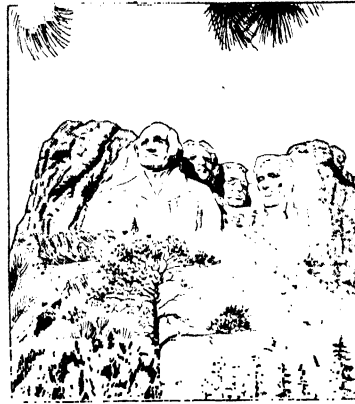
১০নং চিত্র

ফুট উঁচু মানুষের অনুপাতে তৈরী করা হয়েছে; অর্থাৎ সম্পূর্ণ মূর্তিটা তৈরী করলে (এই মূর্তিগুলির বুক পর্যন্ত তৈরী করা হয়েছে) ৪৬৫ ফুট উঁচু হতো। ওয়াশিংটনের মূর্তিটির মাথা থেকে চিবুক পর্যন্ত পরিমাপ হচ্ছে ৬০ ফুট। এই মূর্তিগুলি খোদাই করেছেন পরলোকগত বিখ্যাত ভাস্কর গুট্‌জন বর্গ্‌লাম।

১১। প্রাকৃতিক ও অন্যান্য কারণে পৃথিবী থেকে বহু প্রাণী একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে—আবার কেউ কেউ সংখ্যায় গেছে অনেক কমে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, গত ২০০০ বছরে বিভিন্ন জাতের ১০৬ রকম স্তন্যপায়ী এবং ১৮০০ সাল থেকে ৭৩টি বিভিন্ন জাতের প্রাণী পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ডোডো পাখী। নাবিকেরা মরিশাস দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারত মহাসাগরস্থিত রিইউনিয়ন দ্বীপের ডোডো পাখী পাইকারী হারে হত্যা করে। এর ফলে ১৮৬০ সাল থেকে এদের আর দেখা যায় না; অর্থাৎ এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সে জন্যে ডোডো পাখী

পৃথিবীতে সত্যই ছিল কিনা—সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা কখনও কখনও সন্দেহ প্রকাশ
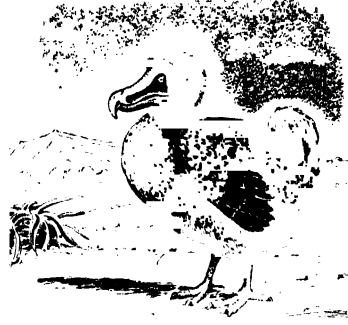
১১নং চিত্র

করেছেন।

১২। যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসকেরা ব্যাপক পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত

১২নং চিত্র

হয়েছেন যে, কলাম্বিয়ার অধিবাসী জেভিয়ার পেরিরার বয়স সম্ভবতঃ ১৫০ বছর হতে পারে। কিন্তু পেরিরা দাবী করছেন যে, তাঁর বয়স ১৬৭ বছর।

১৩। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে নানা ধরণের অনুষ্ঠান, কিংবদন্তী ও কুসংস্কার ইত্যাদি প্রচলিত আছে। অনেক সময় বাড়ীর বিভিন্ন অংশকে কেন্দ্র করে এসব চালু রয়েছে, দেখা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাড়ীর অন্যান্য অংশের

তুলনায় দরজাকে কেন্দ্র করেই (সে দরজা সাধারণ বা অদ্ভুতও হতে পারে) সবচেয়ে
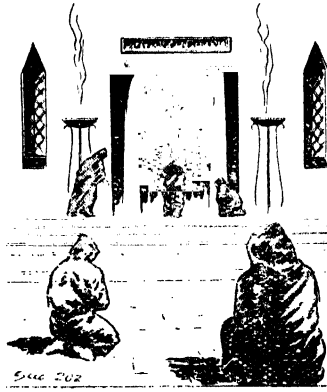
১৩নং চিত্র

বেশী ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কিংবদন্তী, কুসংস্কার ইত্যাদি প্রচলিত হয়েছে।

১৪। আকাশে কখনও কখনও ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়—একথা তোমরা জান। ধূমকেতু এত হাল্‌কা যে, এর ১০.০০০ কিউবিক মাইল লম্বা পুচ্ছের মধ্যে যে সব

১৪নং চিত্র

পদার্থের খোঁজ পাওয়া গেছে—তা এক ঘনইঞ্চি বায়ুর মধ্যস্থিত পদার্থের তুলনায়ও কম। ধূমকেতুর পুচ্ছ যে কতখানি লম্বা হতে পারে তা ধারণা করা সম্ভব নয়—যেমন, ১৮৪৩ সালের ধূমকেতুর পুচ্ছ লম্বায় ছিল আনুমানিক ২০০,০০০,০০০ মাইল।

১৫। নাক্ষত্রিক দূরত্ব বোঝাতে 'আলোক-বর্ষ' কথাটা ব্যবহার করা হয়। এক আলোক-বর্ষ বললে বোঝায় আলো এক বছরে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করেছে (আলোর

গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,২৩৯ মাইল) এবং তা হলো ৫,৮৭৩,১৮৫,৮০০,০০০ মাইল।
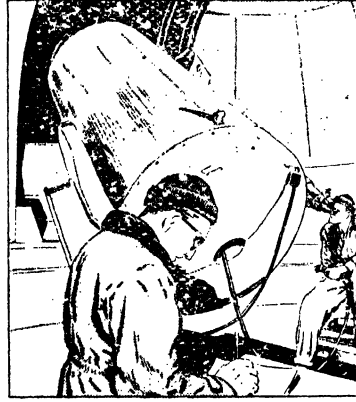
১৫নং চিত্র

অধিকাংশ নক্ষত্রই পৃথিবী থেকে ১০০ আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত।

১৬। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাঝে মাঝে ব্যাং, সাপ, কচ্ছপ, মাছ, অ্যাঞ্জেলওয়ার্ম প্রভৃতির বৃষ্টির কথা শোনা যায়। অনেকের বিশ্বাস—কোন কোন সময় বৃষ্টির সঙ্গে ঐ সব প্রাণীগুলি আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে। বিজ্ঞানীদের মতে, এই বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই। এরা কখনও আকাশ থেকে পড়ে না। তবে বৃষ্টি হলে এদের মধ্যে

১৬নং চিত্র

কোন কোন প্রাণী খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং দলবদ্ধভাবে বৃষ্টির জলে সমবেত হয়ে থাকে। সে জন্যে অনেক সময় মনে হয় যেন এরা বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে পড়ছে। কিন্তু সামুদ্রিক প্রাণীদের সম্বন্ধে অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, ঝড় বৃষ্টির ফলে সমুদ্রে জলস্তম্ভের উৎপত্তি হলে দলবদ্ধভাবে বিচরণকারী মাছ ও অন্যান্য প্রাণী জলের সঙ্গে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে আবার জলের সঙ্গেই ডাঙ্গায় বা জলে পড়ে। এথেকেই লোকের মনে এরূপ ধারণার উৎপত্তি হয়েছে।

বিবিধ

রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে নতুন শক্তির উৎস সন্ধান

১৯৬১ সালে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি এবং পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপশক্তি সম্পর্কে পর্যালোচনা ও তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হওয়ার কথা আছে। ইহার প্রস্তুতির জন্য সৌরশক্তি সম্পর্কে আগামী ২৫শে মে হইতে ২৬শে মে পর্যন্ত মাদ্রিদে, ১৪ই জুন হইতে ১৭ই জুন পর্যন্ত বায়ুশক্তি সম্পর্কে সুইজারল্যাণ্ডে এবং ২৭শে জুন হইতে ২রা জুলাই পর্যন্ত পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপশক্তি সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদর দপ্তর রোমে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীদের বৈঠক হইবে।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ড্যাগ হ্যামারশোল্ড এই সম্পর্কে আরও জানাইয়াছেন যে, নূতন যে সকল শক্তির উৎসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, এই বিষয়ে কারিগরি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সকল উন্নতি হইয়াছে, তাহা দ্বারা পৃথিবীর নূতন নূতন উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহ কিভাবে লাভবান হইতে পারে, তাহাও এই সকল অধিবেশনে পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইবে। বিশেষ করিয়া উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহে ইন্ধনের অভাব এবং শক্তির দুর্মূল্যতার জন্য সূর্য, বায়ু এবং পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপ হইতে সস্তায় কিভাবে শক্তি উৎপাদন করা যাইতে পারে, তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইবে এবং ১৯৬১ সালের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কার্য-সূচী প্রস্তুত করা হইবে। এই সম্মেলন ইউরোপে ১৯৬১ সালের ২১শে অগাষ্ট হইতে ৩১শে অগাষ্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে। ইহাতে বিশেষ করিয়া নূতন নূতন শক্তির সন্ধান করা হইবে।

পঞ্চম পায়োনিয়ারের সাহায্যে নূতন তথ্য সংগ্রহ

মার্কিন কৃত্রিম গ্রহ পঞ্চম পায়োনিয়ার পৃথিবী হইতে এক কোটি মাইল উর্ধ্বে থাকিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই কৃত্রিম গ্রহটি ১১ই মার্চ মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। ইহার সাহায্যে এই সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে:—

১। সূর্য হইতে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস নির্গত হইয়া থাকে। এই সকল গ্যাসের দরুণ মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর উপর পতিত না হইয়া অন্যদিকে সরিয়া যায়।

২। পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া যে 'ভ্যান অ্যালেন' তেজস্ক্রিয় বলয় রহিয়াছে, তাহা এই সকল গ্যাসের সংস্পর্শে আসিবার পর সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

৩। ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের বিস্তৃতি পূর্বে যেরূপ অনুমান করা গিয়াছিল, তাহার তুলনায় দ্বিগুণ।

ইহার সাহায্যে পৃথিবী ও সূর্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

পঞ্চম পায়োনিয়ারের পূর্বে চতুর্থ পায়োনিয়ার নামে মার্কিন উপগ্রহ এবং লুনিক নামে সোভিয়েট উপগ্রহটি যথাক্রমে ৪০৭০০০ মাইল এবং ৩৯৬০০০ মাইল পর্যন্ত যাওয়ার পর তাহাদের বেতারবার্তা প্রেরক যন্ত্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

পেনিসিলিনের অনিষ্টকারী প্রতিক্রিয়া

পেনিসিলিনের অনিষ্টকারী প্রতিক্রিয়ার ফলে অসুস্থ একটি ভারতীয় বালকের জন্য সম্প্রতি একটি দুষ্প্রাপ্য ঔষধ বিমানযোগে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা

হয়। পেনিসিলিনের এইরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে কখনও কখনও রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। এই ঔষধটির নাম নিউট্রাপেম। পেনিসিলিনের কুফল দূর করিবার জন্য এই ঔষধটি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ঔষধটি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রস্তুত হয়। নয়া দিল্লী হইতে প্রায় ১১০ মাইল দূরে অবস্থিত দেরাদুনে শ্রী এন. কে. জৈন নামক এক ব্যক্তির পুত্র পেনিসিলিনের এইরূপ অনিষ্টকারী প্রতিক্রিয়ার ফলে অসুস্থ হয়। এই কথা জানিতে পারিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী এম. সি. চাগলা এই ঔষধটি পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন।

এই ঔষধের ৬টি শিশিপূর্ণ একটি বাক্স ৪ঠা মে রাত্রিতে বৃটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশনের একখানি বিমানযোগে ভারতে প্রেরণ করা হয়।

নূতন ধরণের রেডার-রশ্মি

সম্প্রতি লণ্ডনের 'ইভিনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ করিয়া বলা হয় যে, বৃটেন অতি গোপনীয়ভাবে এমন একটি রেডার যন্ত্র নির্মাণ করিতেছে, যাহা দিক্‌চক্রবালের অপর দিক হইতে আগত ক্ষেপণাস্ত্রের সন্ধান দিতে পারিবে—এমন কি, যে দেশ হইতে হাইড্রোজেন বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছে, সে দেশের আকাশেই উহাকে ফাটাইয়া দিতে পারিবে।

সংবাদে বলা হয় যে, নূতন যন্ত্রটি দিক্‌চক্রবালের উপর দিয়া রেডার রশ্মি প্রক্ষেপ করিবে এবং শত্রু-দেশের গভীর অভ্যন্তরেও দৃষ্টিপাত করিয়া সকল কিছু জানিয়া লইবে। মামুলী রেডার যন্ত্র যে সকল বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আকাশে ছড়াইয়া দেয়, সেগুলি কেবলমাত্র সরল রেখায় অগ্রসর হইয়া থাকে। এদিক হইতে নূতন যন্ত্রটি এক বিস্ময়কর পরিবর্তন আনিয়া দিবে।

'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' আরও বলিয়াছে, 'রকেট রশ্মি' আবিষ্কারের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নেও অনুরূপ গবেষণা চলিতেছে। ১৯৬৫ সালের মধ্যে এই ব্যাপারে তাঁহারা কৃতকার্য হইবেন বলিয়া সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা আশা করেন।

এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফলেই বৃটেন 'ব্লু ষ্ট্রীক রকেট' নির্মাণ বন্ধ করিয়া দিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। সংবাদে আরও বলা হয় যে, ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া আসা ক্ষেপণাস্ত্রকে কিভাবে নূতন রেডার রশ্মির দ্বারা ধ্বংস করিয়া ফেলা যায়, বৃটেন তাহা সযত্নে গোপন রাখিবে। তবে এটুকু জানা গিয়াছে যে, নূতন রশ্মিটি যে কোন রকেটের গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পর্যুদস্ত করিয়া দিতে পারে; এমন কি, উহা পারমাণবিক বা হাইড্রোজেন বোমার 'ফিউজ' চালু করিয়া তাহাকে ফাটাইয়া দিতেও পারে।

সংবাদে আরও বলা হয় যে, বৃটিশ বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্পর্কে মার্কিন সরকার আগ্রহান্বিত রহিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই এই সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য মার্কিন বিশেষজ্ঞগণ এই দেশে আসিয়াছেন।

পৃথিবীর বৃহত্তম রেডিও-টেলিস্কোপ

ডেনভিলের নিকট সাড়ে পাঁচ একর জমির উপর আমেরিকার নৌ-বিভাগীয় গবেষণা দপ্তরের উদ্যোগে পৃথিবীর বৃহত্তম রেডিও-টেলিস্কোপটি নির্মিত হইতেছে। ইংল্যাণ্ডের জডরেল ব্যাঙ্কের রেডিও-টেলিস্কোপের তুলনায় ইহা আকারের দিক হইতে দ্বিগুণ হইবে। তবে ইহাকে ঘুরানো-ফিরানো যাইবে না।

আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে এক বৎসরে যতখানি পথ অতিক্রম করিয়া থাকে, সেই দূরত্ব জ্ঞাপক সময়কে এক আলোক-বর্ষ বলে। আজিকার অপ্টিক্যাল টেলিস্কোপের সাহায্যে দুইশত কোটি আলোক-বর্ষ দূরের নক্ষত্রের সন্ধান করা যাইতে পারে। কিন্তু এই রেডিও-টেলিস্কোপে ছায়াপথ হইতেও দূরবর্তী কোটি কোটি নক্ষত্রের সামান্যতম সংবাদও ধরা পড়িবে।

পূর্বে পৃথিবীর বৃহত্তম অপ্টিক্যাল টেলিস্কোপের সাহায্যে যে সকল নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিল না, সেই অসম্ভবও এই যন্ত্রের সাহায্যে সম্ভব হইবে; ইহার সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের একটি বিস্তৃত মানচিত্র রচনা করা যাইবে। ইহা সম্পূর্ণ করিতে তিন হইতে পাঁচ বৎসর সময় লাগিবে।

মহাকাশের নির্বিঘ্ন পথ

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'টাস' জানাইতেছে—পৃথিবীর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া ইলেকট্রন ও নিউট্রন সমাকীর্ণ বিপজ্জনক বিকিরণ-বলয় রহিয়াছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা তাহা এড়াইয়া মহাকাশে পাড়ি দিবার একটি পথ আবিষ্কার করিয়াছেন।

১৯৬০ সালে বিজ্ঞান ও প্রয়োগ-বিদ্যায় চারজন পদার্থ-বিজ্ঞানীকে লেনিন পুরস্কার দানের সংবাদ ঘোষণা করিয়া বলা হয় যে, ইহারা পৃথিবীর চতুর্দিকের বিকিরণ-বলয় আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সে সম্পর্কে গবেষণা চালাইতেছেন। মহাকাশে বিদ্যুৎ-সমৃদ্ধ পরমাণু-কণার অবস্থান সম্পর্কেও মোটামুটি একটি চিত্র তাঁহারা উপস্থিত করিয়াছেন। পৃথিবীর মেরুর চতুর্দিকে তাঁহারা একটি বিকিরণ-মুক্ত পথ আবিষ্কার করিয়াছেন—বিপজ্জনক বিকিরণ-এলাকা এড়াইয়া সে পথ ধরিয়াই ভাবী কালের মহাকাশ-যানসমূহ গ্রহ-উপগ্রহের দিকে অগ্রসর হইবে। এই চারজন পদার্থ-বিজ্ঞানীর নাম হইতেছে, সার্গেই ভারনোভ, আলেকজাণ্ডার চুদাকোভ, সীসা দলগিনোভ ও নিকোলাই পুলকোভ।

মার্কিন পরমাণু শক্তিচালিত ডুবোজাহাজ সী-ড্র্যাগন

আমেরিকার পরমাণু শক্তিচালিত অন্যতম সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ সী-ড্র্যাগন আগামী ১লা অগাষ্ট কানেটিকাটের নিউ লণ্ডন হইতে যাত্রা করিয়া সুমেরু সাগরের তলদেশ দিয়া প্রশান্ত মহাসাগর হইয়া প্রাচ্য বা প্রতীচ্য অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া আসিবে। আজ পর্যন্ত কোন অর্ণবপোত বা সাবমেরিন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অঞ্চলে গমনকালে সুমেরু সাগরের পথটি অনুসরণ করে নাই। বিজ্ঞানীরা গ্রীষ্মকালে ঐ অঞ্চলে বরফের অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং সমুদ্র সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই এই ভ্রমণে বাহির হইতেছেন।

মারণ-যজ্ঞের সমিধ

এঙ্গেলউড (নিউ জার্সি)—নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত বিজ্ঞানী অধ্যাপক লিনাস পলিং এখানে এক বক্তৃতায় বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মজুদ পারমাণবিক বোমার সংখ্যা হইতেছে এক লক্ষ—রাশিয়ার হইতেছে ৫০ হাজার। কিন্তু মাত্র তিন শতটি বোমার দ্বারাই ইহার যে কোন একটি দেশ ধ্বংস করিয়া দেওয়া সম্ভব।

ডাঃ পলিং আরও বলেন, পারমাণবিক যুদ্ধে এমন ঝটিকা লাগিবে এবং পারমাণবিক ভস্মরাশি এমন-ভাবে ছড়াইয়া পড়িবে যে, ইহার পর খুব বেশী লোক প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না।

ইতিপূর্বে যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হইয়াছে, তাহারই ফলস্বরূপ পৃথিবীর প্রায় দেড় লক্ষ শিশুর বহু রকমের দৈহিক ও মানসিক ত্রুটি দেখা যাইবে।

ক্ষুদ্রতম রেডিও টেলিমিটার যন্ত্র

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা একটি ক্ষুদ্রাকৃতি রেডিও-টেলিমিটার যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই যন্ত্রটি মানবদেহের অভ্যন্তরে অস্বাভাবিক লক্ষণসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কার্যে ব্যবহৃত হইবে। ইহা পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম রেডিও-টেলিমিটার যন্ত্র। "প্রতিধ্বনির আধার" নামে অভিহিত এই বেতার যন্ত্রটি রোগীর গলার মধ্য দিয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইবে। আকারে উহা একটি ঔষধের বড়ি অপেক্ষা বড় নহে।

পরলোকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী

বার্লিনের খবরে প্রকাশ, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ম্যাক্স ফন লাউয়ে গত ২৪শে এপ্রিল অপরাহ্ণে এখানকার হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮০ বৎসর হইয়াছিল। ১৯১৪ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োদশ বর্ষ | জুলাই, ১৯৬০ | সপ্তম সংখ্যা

ম্যাক্স ফন লাউয়ে

শ্রীসুবোধনাথ বাগচী

৮ই এপ্রিল, ১৯৬০ সকাল বেলায় অশীতিপর এক বৃদ্ধ মিটিং-এ যাবার জন্যে প্রস্তুত। ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছে। ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে বৃদ্ধ একাই গাড়ী চালিয়ে চলেছেন। হঠাৎ পথিমধ্যে মোটর সাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পাশের একটা গাছের গায়ে লেগে গাড়ীখানা ভেঙ্গে যায়। তারপর পুলিস এসে অচৈতন্য অবস্থায় বৃদ্ধকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ২৪শে এপ্রিল অজ্ঞান অবস্থাতেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তখনই জানা গেল যে, এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমরা বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী ম্যাক্স ফন লাউয়েকে হারিয়েছি। কিছুদিন পূর্বে তাঁর গুণ-গ্রাহীরা আশী বছর পূর্ণ হওয়ায় বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে (Beitraege Zur Physik und Chemie des 20-Jahrhunderts. Friedr, Viewg & Sohn, Braunschweig, 1959) মুদ্রিত করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তখন কিন্তু কেউ ভাবতেও পারেন নি যে, তিনি এত শীঘ্র আমাদের মধ্য থেকে চলে যাবেন। সবচেয়ে গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, তিনি বৃদ্ধ হলেও মানসিক ও শারীরিক পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। লাউয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পদার্থ-বিদ্যায় ক্ল্যাসিক্যাল যুগের শেষ মহারথীকে হারালাম। প্রকৃতপক্ষে লাউয়ে মনেপ্রাণে পদার্থবিদ্যার ক্ল্যাসিক্যাল ধারাতেই বিশ্বাস করতেন এবং আধুনিক কোয়াণ্টাম তত্ত্ব ভালভাবে জানা সত্ত্বেও তা গতানুগতিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। এ-বিষয়ে তিনি আইনষ্টাইন, দে ব্রয়এল, শ্রে'য়-ডিঙ্গার প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত বিরোধী দলের অন্তর্গত ছিলেন। বোর, বর্ন্, হাইজেনবার্গ প্রবর্তিত অনিশ্চয়তাবাদকে এঁরা কেউ গ্রহণ করেন নি। এ-বিষয়ে লাউয়ের মত এত পরিষ্কার ও সুদৃঢ় ছিল যে, অল্প কিছুদিন পূর্বেও লেখককে তিনি পত্রে জানান যে—তিনি যদি নিজেই ছেলে বয়সে এরূপ তত্ত্বে এসে পৌঁছাতেন, তাহলেও তা নিয়ে আর নাড়াচাড়া করতেন না।

ম্যাক্স ফন লাউয়ে ৯ই অক্টোবর ১৮৭৯ সালে জার্মেনীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তদানীন্তন কাইজার সরকারের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। বারো বছর বয়সে বার্লিনের বিদ্যালয়ে

বালক ম্যাক্স প্রথম দেখতে পেলেন যে, তুঁতের জল থেকে তড়িতের সাহায্যে অতি সহজেই তামা বেরিয়ে আসে। পদার্থ-বিদ্যার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হয় এই প্রথম এবং এই ছোট্ট ঘটনা স্কুলের ছাত্রটিকে এতটা অভিভূত করে যে, তার পর বেশ কিছুদিন তিনি কিছুতেই মনোনিবেশ করতে পারেন নি। বালকের অবস্থা দেখে তাঁর মা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন এবং ব্যাপারটা শুনে বালক যাতে নিয়মিত "ইউরানিয়া" সংসদে যোগদান করতে পারে, তার ব্যবস্থা করেন। এই ইউরানিয়ার উদ্দেশ্য প্রায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মতই—জনগণের নিকট বিজ্ঞানকে সুখবোধ্য ও আনন্দদায়ক করে তোলা। তবে তাদের কর্মশক্তির আধিক্যের ফলে সেই সংসদ জার্মেনীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বহু জায়গায় মিউজিয়ামের মাধ্যমে দেশবাসীকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। এসব মিউজিয়ামের আর একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে, দর্শক বোতাম টিপলেই অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখতে পেতেন। লাউয়ে ইউরানিয়া সম্পর্কে বৃদ্ধবয়স অবধি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। আশা করি, এ-সম্পর্কে বিজ্ঞান পরিষদের প্রায় একযুগ পূর্বে গৃহীত অনুরূপ পরিকল্পনা শীঘ্রই বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব হবে।

১৮৯৮ সালে ষ্ট্রাসবুর্গ থেকে লাউয়ে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ করেন। এখানে তিনি খুব ভাল শিক্ষক পেয়েছিলেন এবং এই স্কুলেই তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করেন ও পদার্থবিদ্ হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর পর ৩-৪ বছর গোয়টিং-গেন ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে ১৯০২ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের নিকট ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্যে গবেষণা সুরু করেন। ১৯০২ সালে বার্লিন সহরেও প্ল্যাঙ্কের বিখ্যাত আবিষ্কার—কোয়াণ্টাম-তত্ত্ব সম্পর্কে প্রায় কেউ খবর রাখতো না। লাউয়ে প্ল্যাঙ্কের নাম শুনেছিলেন

সত্যেন্দ্রনাথ বসু — এম. লাউয়ে

তাঁর বিখ্যাত তাপ-বলবিদ্যা সম্পর্কিত পুস্তকখানার জন্যে—কোয়াণ্টাম-তত্ত্বের কথা তিনিও জানতেন না। ১৯০৩ সালে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে লাউয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল "Theory of Interference Phenomena on Plane Parallel plates"। এর পর আবার গোয়েটিংগেনে কিছুদিন পড়াশুনা করে ১৯০৫ সালে প্লাঙ্কের সহকারী হিসাবে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এই সময়ে তাঁর নিজস্ব যেসব গবেষণায় তিনি খ্যাতি লাভ করেন—তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—আলোকরশ্মির এন্‌ট্রপি ও আপেক্ষিকতাবাদের সাহায্যে ফিজোর ইণ্টারফিয়ারেন্স পরীক্ষা সম্পর্কে গবেষণা। ১৯১০ সালে তিনিই সর্বপ্রথম আপেক্ষিকতা তত্ত্বের উপর প্রামাণ্য পুস্তক প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাঁর প্রণীত পুস্তক 'পদার্থ-বিদ্যার ইতিহাস' বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বহুবিধ পুস্তক রচনায় ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহের সামান্য ফিরিস্তি দিতে গেলেও বর্তমান প্রবন্ধের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং এখানে শুধু তিনি যে গবেষণা করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন, তার কথাই বলবো।

১৯০৯ সালে লাউয়ে মিউনিকে সমারফেল্ডের সহকারী হিসাবে যোগদান করেন। মিউনিক তখন পদার্থ-বিদ্যার আসরে একটা মস্ত বড় তীর্থক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিখ্যাত বোল্‌ৎসমান বহু দিন এখানে অধ্যাপনা করেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী সমারফেল্ডও অল্পদিনেই অধ্যাপক হিসাবে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। বৃদ্ধ র‍্যাণ্টগেন তখনও তাঁর গবেষণাগার পরিচালনা করতেন এবং কেলাস-বিদ্যাবিশারদ বিখ্যাত পল ফন গ্রোথ মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অমূল্য সঞ্চয়নের সাহায্যে কেলাস-বিদ্যার অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্বের কথা প্রচার করছেন। ডেবায়ে, এম্‌ডেন, এপ্‌স্টাইন, লাউয়ে বয়সে অপেক্ষাকৃত নবীন হলেও এর মধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং প্রবীণদের আসরে স্থান পেয়েছেন। অন্যান্য বহু বিজ্ঞানী, আজ যাঁরা সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করছেন, তাঁরা তখন ছাত্র। মিউনিকের কাফে লুৎস প্রবীণ ও নবীন বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানচর্চায় মুখরিত। ছাত্রেরাও নানারূপ গল্পগুজব, জল্পনা-কল্পনায় মগ্ন হয়ে থাকে এই কফি হাউসে এবং মাঝে মাঝে বড়দের আসরেও যোগদান করে। রেস্তোরাঁর মূক-বধির মর্মর টেবিলগুলি এদের সবারই অত্যাচার নীরবে সহ্য করে এবং কফি হাউসের বেয়ারারাও যাদের—টেবিল থেকে অঙ্কগুলি মুছে ফেলতে এবং টেবিল পরিষ্কার করতে বেশ বেগ পেতে হতো—হাসিমুখেই এঁদের সব আবদার সহ্য করতো। সমারফেল্ড আসবার পর মিউনিকের আবহাওয়া আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কফি হাউসে তখন র‍্যাণ্টগেন রশ্মির স্বরূপ নিয়ে বিশেষ বাগ-বিতণ্ডা চলছে। এক দিকে র‍্যাণ্টগেন নিজে ডাব্লিউ. এইচ. ব্র্যাগের কণাবাদ প্রচার করছেন, অন্য-দিকে সমারফেল্ড পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করতে চলেছেন যে, র‍্যাণ্টগেন-রশ্মি আলোক-রশ্মির ন্যায়ই একরূপ তরঙ্গ-প্রবাহ মাত্র, শুধু তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনেক ছোট। তবুও দ্বন্দ্ব মেটে না। তখন লাউয়ে বললেন যে, র‍্যাণ্টগেন-রশ্মিকে কেলাসের ভিতর দিয়ে পরিচালিত করলে এই সমস্যার সঠিক সমাধান হবে। অনেক বাধাবিপত্তির পর র‍্যাণ্টগেনের দুটি ছাত্র ফ্রিডরিক ও ক্লিপিং-এর সাহায্যে লাউয়ে ১৯১২ সালে ইস্টারের ছুটিতে পরীক্ষা করে দেখালেন যে, র‍্যাণ্টগেন-রশ্মি আলোক-রশ্মির ন্যায় অবিকল একটা হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ-প্রবাহ মাত্র।

এই আবিষ্কারের প্রভাব যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, তা আজ আমরা বিশেষভাবেই জানি। এর দ্বারা শুধু যে র‍্যাণ্টগেন-রশ্মির প্রকৃতি নির্ধারিত হলো, তাই নয়—তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ণয় করবার

উপায়ও জানা গেল এবং পদার্থের আণবিক ও পারমাণবিক গঠন সম্পর্কেও বিশেষ জ্ঞান লাভ করা গেল। গত ৪৮ বছরে র‍্যাণ্টগেন-রশ্মির দ্বারা পদার্থের কাঠামোর বিশ্লেষণ-পদ্ধতি বিজ্ঞানের প্রায় প্রতি শাখাতেই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজ একবাক্যে এই গবেষণার মূল্য স্বীকার করেন এবং এর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য উপলব্ধি করে ১৯১৪ সালেই লাউয়েকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেন।

বহুদিন যাবৎ বিজ্ঞানী-মহলে লাউয়ে বিশেষ জ্ঞানী ও যোদ্ধারূপে খ্যাত ছিলেন। পদার্থ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর নিজস্ব দানও কম নয়! বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর স্থান জগৎ-সভায় অতি উচ্চে ছিল। কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়। গত ৪০ বছর জার্মেনীতে তিনি সত্যই বিজ্ঞানের আচার্য ছিলেন। সর্বত্রই তাঁর সম্মান ও মর্যাদা ছিল অত্যধিক। বিজ্ঞানীদের অধিকার, স্বাতন্ত্র্য ও বিশ্বজনীনতায় তিনি অগাধ বিশ্বাসী ছিলেন। সমাজ ও সভ্যতায় বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও তিনি খুব সচেতন ছিলেন। তাঁর কর্তব্যবোধ ছিল অসাধারণ। আদর্শের জন্যে তিনি হিটলার সরকারের বিরোধিতা করেন এবং সে জন্যে তাঁকে অনেক নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে। হিটলারের আমলে বিপদ বরণ করেও তিনি বহু বিজ্ঞানীকে বিদেশে যেতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁকে বিশ্বের বিজ্ঞানীরা যে কিরূপ শ্রদ্ধা করতেন, তা একটা ছোট্ট ঘটনা থেকেই বেশ বোঝা যাবে। ১৯৩৮ সালে এভাল্ড একবার আমেরিকায় আইনষ্টাইনের সঙ্গে দেখা করেন। বিদায় নেবার সময় তিনি আইনষ্টাইনকে জানান যে, শীঘ্রই তিনি জার্মেনী যাবেন এবং আইনষ্টাইনের কিছু বলবার আছে কিনা। আইনষ্টাইন শুধু বলেন, লাউয়েকে আমার সম্ভাষণ জানাবেন। এভাল্ড পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—আরও কিছু তাঁর বলবার আছে কিনা। আইনষ্টাইন পুনরাবৃত্তি করে বলেন—লাউয়েকে আমার সম্ভাষণ জানাবেন।

১৯৩৫ সালে হান, হাইজেনবার্গ প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে লাউয়েকে ইংরেজেরা ইংল্যাণ্ডের হান্টিংডন প্রাসাদে অবরুদ্ধ করে রাখেন। ১৯৪৬ সালে সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে লাউয়ে কাইসার ভিলহেলম্ ইনষ্টিটিউটের পদার্থ-বিজ্ঞানের ডেপুটি ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করেন এবং জার্মেনীকে বিজ্ঞানানুশীলনে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৫ই এপ্রিল ১৯৫১ সালে তিনি বার্লিনের হাবের ইনষ্টিটিউটে ডিরেক্টরের পদে যোগদান করেন এবং ১লা মার্চ ১৯৫৯ সালে ঐ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই কয়েক বছরেই তিনি জার্মেনীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পুরাতন আবহাওয়া সৃষ্টি করতে অনেকাংশে সফল হন। দেশ-বিভাগের কুফলবশতঃ জার্মেনীর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে; কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও তিনি নিরন্তর ব্যক্তিগত আদর্শের দ্বারা চেষ্টা করে গেছেন, যাতে সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানে জার্মেনীর ঐক্য ও সংহতি নষ্ট না হয়।

ম্যাক্স ফন লাউয়ে যদিও ডিরেক্টরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, তবুও নিয়মিত ইনষ্টিটিউটে আসতেন এবং বিজ্ঞানীরা সবাই আশা করেছিলেন যে, এবার তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে। কিন্তু বিধি বাম। আশী বছর বয়সেও তিনি এতটা কর্মক্ষম ছিলেন যে, তাঁর বন্ধুরা তাঁর মৃত্যুকে অকালমৃত্যু বলেই মনে করবেন। তাঁদের এই মাত্র সান্ত্বনা যে, তিনি তাঁর দীর্ঘজীবনে সর্বদাই আদর্শে মহান আচার্যের ন্যায়, ঋষির ন্যায় আচরণ করে গেছেন এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনি অক্ষয়-অমর হয়ে থাকবেন।

বায়ুর আয়নায়ন ও জনস্বাস্থ্য

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

আয়ুর্বেদে আছে, প্রভাতে শয্যাত্যাগ করে মুক্ত বায়ুতে পরিভ্রমণ করলে শরীর ও মন উভয়ই প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। এটা সব দেশের, বিশেষ করে গরম দেশের মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতা। সহরের ধনীরা পূজার ছুটিতে ছোটেন শৈলশিখরে, নয়তো সমুদ্রোপকূলে বায়ুসেবনে। যাদের পুঁজিপাটা কম, তারা সুযোগ পেলে একবার দেশগাঁয়ের খোলা মাঠের হাওয়া খেয়ে আসেন। দুরারোগ্য ব্যাধি হলে চিকিৎসকগণ উপদেশ দেন, পশ্চিমের পাহাড়ে হাওয়া বদল করতে। সহরের কলের ধোঁয়া-ধূলা-ভর্তি বায়ু অস্বাস্থ্যকর এবং সমুদ্র-তীর বা পাহাড়ী দেশের খোলামাঠের হাওয়া স্বাস্থ্যকর—এই তত্ত্বটা বহু দিন থেকে কেবল সাধারণ অভিজ্ঞতার ফলে নয়, বিজ্ঞানসম্মতভাবেও স্বীকৃত হয়ে আসছে। বিজ্ঞানীরা এর যে সব কারণ দেখান, তা হলো—সহরের বায়ুতে অক্সিজেনের আনুপাতিক হার কম ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের হার বেশী। শিল্পাঞ্চলে কলের ধোঁয়া ও ধূলায় বায়ু সর্বদা ভারাক্রান্ত থাকে। তাছাড়া সহরাঞ্চলে বহু লোকের একত্র বাস এবং সূর্যালোকের অপ্রাচুর্যের জন্যে বায়ুতে নানাপ্রকার মারাত্মক রোগের জীবাণু ছড়িয়ে থাকে। অক্সিজেনের অ্যালোট্রোপ ওজোন আবিষ্কারের পর বৈজ্ঞানিকেরা আরও দেখালেন যে, ওজোন গ্যাসটা অক্সিজেন অপেক্ষা অনেক বেশী সক্রিয় এবং এর জীবাণু-নাশক ক্ষমতা অনেক বেশী। বায়ুমণ্ডলে অতি সামান্য পরিমাণ ওজোন থাকে। সমুদ্র-তীরের বায়ুতে ওজোনের ভাগ বেশী বলে সমুদ্র-বায়ু স্বাস্থ্যকর। সকাল ও সন্ধ্যায় বায়ুতে এর পরিমাণ সামান্য বাড়ে। এ-জন্যে সকাল ও সন্ধ্যায় খোলা হাওয়ায় বেড়ানো ভাল। সম্প্রতি সোভিয়েট ও অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন—সেটা হলো বায়ুর আয়নায়ন ও স্বাস্থ্যের উপর তার প্রভাব বিষয়ক।

কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মোটামুটি গঠন হলো এই যে, কেন্দ্রস্থিত ধন তড়িৎ-কণিকাযুক্ত নিউক্লিয়াসের চারদিকে কয়েকটা ঋণ তড়িৎ-কণিকা বিভিন্ন পথে আবর্তন করছে। কেন্দ্রস্থ ধন তড়িৎ-কণিকাগুলির নাম প্রোটন এবং ঋণ তড়িৎ-কণিকাগুলিকে বলা হয় ইলেকট্রন। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন এবং এই ইলেকট্রনের সংখ্যাকে বলা হয় পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা। প্রোটন ও ইলেকট্রনের তড়িৎ-মান সমান ও বিপরীত-ধর্মী; কিন্তু প্রোটনের ভর ইলেকট্রনের প্রায় ১৮৩০ গুণ অধিক। সাধারণ অবস্থায় প্রোটন ও ইলেকট্রন সমসংখ্যায় থাকে। এই জন্যেই পরমাণুগুলি বৈদ্যুতিক সমতা লাভ করে। কিন্তু কোন কারণে এক বা একাধিক ইলেকট্রন কক্ষচ্যুত হলে পরমাণু হয় ধন-তাড়িতিক আয়ন, আবার মুক্ত ইলেকট্রন অন্য কোন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হলে ঋণ-তাড়িতিক আয়নের সৃষ্টি হয়। ইলেকট্রন কণিকার এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে পরমাণু আয়নায়িত হয়ে পড়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আয়ন হলো ধন বা ঋণ তড়িদ্বাহী পরমাণু। আয়ন দু-রকম—ধন-আয়ন ও ঋণ-আয়ন।

কোন গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণ হলে বা গামা-রশ্মি, রঞ্জেন-রশ্মি প্রভৃতি পরিচালনা করলে গ্যাসীয় পরমাণুগুলি আয়নায়িত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন কারণে বাতাসের বিভিন্ন পরমাণুগুলিও কিছু পরিমাণ আয়নায়িত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে প্রধান কারণ হলো, বায়ুমণ্ডলে বজ্র ও বিদ্যুৎ-

স্ফুরণ, সূর্যের অতিবেগুনী-রশ্মি, মহাজাগতিক বিকিরণ এবং ভূগর্ভ নিহিত রেডিও-অ্যাকটিভ পদার্থ থেকে রশ্মি নির্গমন প্রভৃতি। বাতাসের আয়ন-গুলিকে বলা হয়, এরো-আয়ন। এগুলিও দু-রকমের —ধন-আয়ন ও ঋণ-আয়ন। এদের মধ্যে ঋণ-আয়নগুলি ধন-আয়ন থেকে অনেক বেশী হাল্কা, গতিসম্পন্ন ও ক্রিয়াশীল। সম্প্রতি সোভিয়েট ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষার ফলে প্রমাণ করেছেন যে, বায়ুর আয়নগুলি জনস্বাস্থ্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বায়ুতে ঋণ-আয়নের অনুপাত বেশী থাকলে তা শরীর ও মনের উপর অনুকূল ক্রিয়া করে, কিন্তু ঋণ-আয়নের ভাগ কমে গেলে স্বাস্থ্যের উপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া হয়। ১৯০৩ সালে সোভিয়েট বিজ্ঞানী প্রফেসর সোকোলভ পরীক্ষার ফলে দেখেছিলেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলের বায়ুতে বিভিন্ন পরিমাণে আয়ন থাকে এবং বায়ুর আয়নায়ন জনস্বাস্থ্যের উপর বিশেষ প্রভাবশীল। এখন বিশেষ পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গেছে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ স্বাস্থ্যনিবাসের স্থানগুলিতে বায়ু যেমন যথেষ্ট পরিমাণে আয়নায়িত থাকে, তেমনি বায়ুতে ঋণ-আয়নের পরিমাণও বেশী থাকে। এই সঙ্গে আরও একটা জিনিষ লক্ষণীয় যে, ওজোন গ্যাসও স্বাস্থ্যকর অঞ্চলের বায়ুতে বেশী পরিমাণে থাকে এবং এই গ্যাসের উৎপত্তি ও বায়ুর আয়নায়ন একই রকম কারণ-সম্ভূত।

বড় বড় সহর ও শিল্পাঞ্চলের বায়ুতে ঋণ-আয়নের ভাগ অনেক কম, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের বায়ুতে এর ভাগ বেশী থাকে। এর প্রধান কারণ, হলো সহরের বায়ুতে ধূলা ও কলের ধোঁয়ার আধিক্য। ধোঁয়া ও ধূলা আয়নায়নের পরিপন্থী তো বটেই, অধিকন্তু এর প্রভাবে ঋণ-আয়নের ভাগ হ্রাস পায়। কোন স্থানের বায়ুতে ঋণ-আয়ন ধন-আয়নের তুলনায় কম হলে বুঝতে হবে, সেখানের বায়ু দূষিত হয়েছে। পাহাড়ের উপর, সমুদ্র ও হ্রদের উপকূলে হাল্কা ঋণ-আয়নের প্রাধান্য দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা এখন মনে করছেন যে, এই ঋণ-আয়নের প্রাধান্যই এসব অঞ্চলের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার প্রধান কারণ। এরা যে শুধু মারাত্মক জীবাণুগুলিকে নষ্ট করে ফেলে, তাই নয়—মানুষের কোষ-তন্তুর উপরে একটা চমৎকার আরামদায়ক প্রভাব বিস্তার করে। তার ফলে শরীর ও মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে এবং রোগ প্রতিষেধক-শক্তি বৃদ্ধি পায়। ঋণ-আয়ন রক্তের উচ্চচাপ কমিয়ে দেয়, রক্তের গঠন এবং প্রবাহের উন্নতি সাধন করে, ফুস্‌ফুসের অক্সিজেন গ্রহণের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়, অবসাদ দূর করে স্নায়ুগুলিকে সতেজ রাখে, মস্তিষ্কের সজীবতা আনে, মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং এভাবে একটা সর্বাঙ্গীন সুস্থতার ভাব আনয়ন করে। আবার এও দেখা গেছে যে, যে সব বদ্ধ ঘরের ভিতর বায়ু চলাচলের সুবন্দোবস্ত নেই, তাতে ঋণ-আয়নের ভাগ খুব কম থাকে এবং নিঃশ্বাসের ফলে নির্গত বায়ুতে একেবারে থাকে না। এ-জন্যেই শ্বাসবায়ুপূর্ণ বদ্ধ ঘরের বায়ু খুব তাড়াতাড়ি কর্মক্ষমতা হ্রাস করে এবং ক্লান্তি আনয়ন করে।

বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন আয়নায়নের বিভিন্নতা ঘটে, তেমনি একই অঞ্চলে বিভিন্ন ঋতুতেও আয়নায়নের পার্থক্য ঘটে। বায়ুমণ্ডল যখন ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ হয় তখন সমুদ্র-উপকূলে ঋণ-আয়নের আধিক্য দেখা যায় এবং শান্ত আবহাওয়ার দেবদারু বনপূর্ণ শৈলাবাসগুলিতে ঋণ-আয়নের প্রাচুর্য ঘটে। গ্রীষ্মকালের বায়ুতে সর্বাধিক ঋণ-আয়নের সৃষ্টি হয়, এবং এই সময় সকাল ও সন্ধ্যায় এদের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। এ জন্যেই গ্রীষ্মের প্রভাত ও দিবাবসানে বায়ুমণ্ডল এত মনোরম হয়ে ওঠে। শীতকালে ও শরতের প্রথম দিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডিপ্‌থেরিয়া প্রভৃতি কতকগুলি সংক্রামক রোগ বিস্তারের মূলে আছে সেই সময়ের বায়ুমণ্ডলে আয়নায়নের হ্রাস। শরৎকাল কবিদের প্রিয় হলেও, সেই সময়ে মানুষকে স্বাস্থ্যের

প্রতি যে বিশেষ নজর দিয়ে চলতে হয়, এটা আমাদের দেশের সাধারণ অভিজ্ঞতা।

বাতাসের আয়নায়ন চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও কৃষি-বিজ্ঞানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ-সম্বন্ধে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করেছেন। কয়েকটা গিনিপিগ এবং খরগোসকে একটা ঋণ-আয়নহীন প্রকোষ্ঠে রেখে দেখা গেছে, তারা তাড়াতাড়ি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কখনও বা মারা পড়ে। আবার প্রকোষ্ঠটিকে ঋণ-আয়নে সম্পৃক্ত করলে জন্তুগুলি রোগমুক্ত হয় এবং ওজনেও বৃদ্ধি পায়। এভাবে মুরগীর ডিম দেবার ক্ষমতা, গরুর অধিক স্নেহযুক্ত দুধ এবং ভেড়ার উচ্চশ্রেণীর পশম উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন পশুর উপরে দীর্ঘদিনব্যাপী পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঋণ-আয়নগুলি জীবন্ত তন্তুসমূহের বার্ধক্য বিলম্বিত করে। পশুখাদ্যের উপরও আয়নায়িত বায়ু প্রয়োগ করে দেখা গেছে, সেই খাদ্য গ্রহণ করে পশুরা তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। বায়ুর ঋণ-আয়নগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে এই যে, তারা বাতাসকে ধূলিমুক্ত করতে পারে এবং অদৃশ্য রোগ-জীবাণু নষ্ট করে সংক্রামক ব্যাধি দূর করতে পারে।

এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে সোভিয়েট ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা বায়ুর আয়নায়ন নিয়ে নানারকম গবেষণায় রত আছেন। কৃত্রিম উপায়ে বায়ুকে আয়নায়িত করবার জন্যে আয়নাইজার নামে একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এর সাহায্যে বিদ্যুৎস্ফুরণ ঘটিয়ে বায়ুকে দ্রুত আয়নায়িত করা যায়। এরূপ যন্ত্র যে কেবল হাসপাতালে রোগ দূরীকরণের জন্যে ব্যবহৃত হবে তা নয়, অদূর ভবিষ্যতে কারখানা, বিদ্যালয়, প্রেক্ষাগৃহ—এমন কি, হয়তো প্রত্যেক গৃহেও ব্যবহৃত হবে। সম্প্রতি কয়েকটি হাসপাতালে এই যন্ত্র ব্যবহার করবার চেষ্টা চলছে। এতে একরূপ বিশেষ যন্ত্রে অতি সূক্ষ্মকণায় ঘরের মধ্যে জল ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আয়নাইজার যন্ত্রে বায়ুকে আয়নায়িত করা হয়। এর ফলে জলকণাগুলি ধনাত্মক চার্জ গ্রহণ করে নেয় এবং বায়ুতে ঋণ-আয়নের প্রাচুর্য ঘটে। দেখা গেছে যে, এরূপ ব্যবস্থায় জলপ্রপাত, ঝর্ণা ও পার্বত্য অঞ্চলের স্বাস্থ্যনিবাস-গুলিতে যেরূপ আরোগ্যকারী ও আরামদায়ক স্বাভাবিক আবহাওয়া পাওয়া যায়, তার চেয়েও অধিক ভাল ফললাভ করা যেতে পারে।

আয়নায়িত বায়ুসেবনের দ্বারা চিকিৎসার কতক-গুলি ক্ষেত্রে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেছে। শ্বাস-ঘটিত বিভিন্ন পীড়ায় এবং স্নায়বিক বিকারে এই প্রক্রিয়া আশ্চর্য ক্রিয়া করে। আয়নায়িত বায়ুসেবনে হাঁপানির টান সঙ্গে সঙ্গে কমতে দেখা গেছে এবং প্রাথমিক পীড়ার ক্ষেত্রে বহু স্থলে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ হয়েছে। নিউরোসিস ও নিউরেস্থেনিয়া রোগে এতে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। ঋণ-আয়নযুক্ত বায়ুসেবনে তীব্র মানসিক অবসাদ অতি সত্বর দূর হয়ে যেতে দেখা যায়। এভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা গড়ে উঠেছে, যাকে বলা হয় এরো-আয়নোথিরাপি।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, এই আবিষ্কারটি এখনও প্রাথমিক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এর ব্যাপক ব্যবহার হবে। আমাদের দেশে এর সূত্রপাতই ঘটে নি। আশা করা যায়, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে পিছিয়ে থাকবেন না।

ইস্পাত-শিল্পে বেসিক ওপেন-হার্থ ফার্নেস

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ইস্পাত প্রস্তুত হয় বেসিক ওপেন-হার্থ ফার্নেসে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, মারুৎ-চুল্লী বা ফার্নেস হইতে যে পিগ লৌহ পাওয়া যায়, তাহার ফস্‌ফরাস ইস্পাত অপেক্ষা অনেক বেশী। এই ফস্‌ফরাস কমানো যায় একমাত্র বেসিক ওপেন-হার্থ ফার্নেসেই। তাহা ছাড়া আরও অনেক কারণে এই ফার্নেস ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ পিগ-লৌহে লোহা ব্যতীত সিলিকন থাকে শতকরা ১'০ হইতে ২'০ ভাগ, ম্যাঙ্গানিজ থাকে শতকরা ০'৪ হইতে ০'৮ ভাগ, ফস্‌ফরাস ০'৩ হইতে ০'৬, সালফার ০'০৪ হইতে ০'১০, কার্বন ৩'৫ হইতে ৪'৫ ভাগ।

কিন্তু ইস্পাতে সাধারণতঃ ফস্‌ফরাস থাকে ০'০৫ ভাগ। দুই-এক রকম ইস্পাত আছে, যাহাতে ফস্‌ফরাস বেশী থাকিলেও ০'১০-এর বেশী থাকে না; অথচ পিগ-লৌহ ফস্‌ফরাস থাকে ০'৩ হইতে ০'৬ ভাগ পর্যন্ত।

এই ফস্‌ফরাস কমানো যায় একমাত্র বেসিক ওপেন-হার্থ ফার্নেসেই। অবশ্য যদি পিগ-লৌহে ফস্‌ফরাস খুব বেশী থাকে এবং সিলিকন খুব কম থাকে, তবে বেসিক কনভার্টারের সাহায্যে ফস্‌ফরাস কমানো যায়। কিন্তু তাহাতেও কার্বন হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত ফস্‌ফরাস কমানো যায় না। কাজেই যে দেশের পিগ-লৌহে ফস্‌ফরাস শতকরা ২ হইতে ৩ ভাগ এবং সিলিকন ০'৫ হইতে ০'৮ ভাগ মাত্র থাকে, সেই দেশে বেসিক কনভার্টারের সাহায্যে কম কার্বনের ইস্পাত (যেমন—রিমিং ইস্পাত) সোজাসুজি তৈয়ারী করা হয়। পিগ-লৌহে সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ এবং কার্বন হ্রাস করা সহজ। ইহারা প্রত্যেকেই অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া প্রথমে অক্সাইডে পরিবর্তিত হয়। প্রথম সিলিকন, তার পরে ম্যাঙ্গানিজ এবং শেষে কার্বন অক্সিজেনের সহিত জারিত হয়। সিলিকন অক্সাইড (সিলিকা) একটি অম্লাত্মক পদার্থ। ইহার সহিত চুন (ক্ষারাত্মক) মিশ্রিত করিলে ধাতুমলের সৃষ্টি হইয়া লোহার উপরে ভাসিতে থাকে। ম্যাঙ্গানিজও তাহাই হয়। ইস্পাতে পিগ-লৌহ অপেক্ষা বেশী ম্যাঙ্গানিজ থাকে; কাজেই ম্যাঙ্গানিজ কমাইবার দরকার হয় না, কিন্তু ইহা কমিয়া যায়। কাজেই ইস্পাত তৈয়ারীর সময় ফেরোম্যাঙ্গানিজ দ্বারা ম্যাঙ্গানিজ বাড়ানো হয়। সালফার বেসিক ওপেন-হার্থে বিশেষ কমানো যায় না। দুই-এক প্রকার ইস্পাত ছাড়া সব ইস্পাতেই সালফার ০'০৫০-এর বেশী হয় না। কাজেই পিগ-লৌহে সালফার যাহাতে '০৫ হইতে '০৬-এর বেশী না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। মারুৎ-চুল্লীতেই এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হয়, যাহাতে গন্ধক ০'০৫০-এর বেশী না হতে পারে। মারুৎ-চুল্লীতে যে অবস্থায় সিলিকন বাড়ে, সেই অবস্থায় সালফার কমিয়া থাকে। কাজেই সিলিকন কিছু বাড়িয়াও যাহাতে গন্ধক কম থাকে, তাহার চেষ্টা করা হয়। কারণ সিলিকন অ্যাসিড কনভার্টার অথবা বেসিক ওপেন-হার্থে কমানো অনেক সহজ। বেসিক ওপেন-হার্থে সামান্য পরিমাণে গন্ধক কমানো যায়। বেশী পরিমাণ চুন ব্যবহার করিয়া ফ্লোরস্পার (CaF_2) দ্বারা চুনের গলনাঙ্ক কমাইয়া ধাতুমলকে পাতলা করিয়া গন্ধক কিছু কমানো যায়। ম্যাঙ্গানিজও গন্ধক কমাইতে পারে। বেশী পরিমাণ চুন ফস্‌ফরাসও কমায়। কাজেই বেসিক ওপেন-হার্থে ফস্‌ফরাস কমাইতে গেলে গন্ধকও কিছু

পরিমাণ কমে। আরও কমাইতে হইলে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ বাড়াইলে গন্ধক কিছু কমে। কাজেই ইস্পাত-শিল্পে ওপেন-হার্থের সাহায্যে গন্ধক কিছু কমানো যায়। মারুৎ-চুল্লীতে সিলিকন এবং গন্ধকের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করা হয়।

কার্বন ওপেন-হার্থে কমানো সহজ। লোহার অক্সাইড, খনিজ লৌহ-প্রস্তর বা মিলের লৌহ-মরিচা দিলেই কার্বন কমিবে। কিন্তু যতক্ষণ সিলিকন থাকিবে ততক্ষণ কার্বন বিশেষ কমিবে না। সিলিকন এবং ম্যাঙ্গানিজ কমিবার পর কার্বন জারিত হইয়া গ্যাসরূপে বাহির হইয়া যায়। বেসিক ওপেন-হার্থ অপেক্ষা অ্যাসিড কনভার্টারে খুব তাড়াতাড়ি সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ এবং কার্বন কমানো যায়। বেসিক ওপেন-হার্থে এইগুলিকে কমাইবার জন্য যে লোহার অক্সাইড দেওয়া হয়, তাহাতে লোহার তাপ কিছু কমে। কাজেই কার্বন কমাইতে অ্যাসিড কনভার্টার অপেক্ষা বেসিক ওপেন-হার্থে অনেক বেশী সময় লাগে। এই সময় কমাইয়া তাড়াতাড়ি ইস্পাত তৈয়ারীর জন্য অ্যাসিড কনভার্টারের সাহায্য লওয়া হয়। সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা এবং কার্বন প্রভৃতি কনভার্টারে বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত করা হয়। জারিত হইবার সময় ইহারা তাপ সৃষ্টি করে। খাদ কমিলে লোহার গলনাঙ্ক বাড়িয়া যায়। উপরিউক্ত তাপই কনভার্টারের লোহাকে তাপ দিয়া থাকে। বেসিক কনভার্টারে যে পিগ-লৌহ ব্যবহার করা হয়, তাহার সিলিকন কম থাকায় ফস্‌ফরাস জারিত হইয়া উপযুক্ত তাপ দিয়া থাকে। সেই জন্য বেসিক কনভার্টারে যে পিগ-লৌহ ব্যবহৃত হয়, তাহার ফস্‌ফরাস বেশী হওয়া একান্ত দরকার। আমাদের দেশের পিগ-লৌহে সিলিকন বেশী হওয়ায় বেসিক কনভার্টার চলে না; কারণ সিলিকা অম্লাত্মক, কাজেই বেসিক কনভার্টারের দুর্গলন পদার্থ ক্ষারাত্মক হওয়ায় রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া কনভার্টার অতি সহজে খারাপ হইয়া যায়।

আমাদের দেশে এইরূপ হওয়ার কারণ পিগ-লৌহ তৈয়ারী করিবার মত উপযুক্ত কয়লার অভাব। কয়লার ছাই হইতেই পিগ-লৌহে সিলিকন আসিয়া থাকে। এই ছাইয়ের মাত্রা কমাইবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কয়লা খনি অঞ্চলে ধৌতাগার স্থাপন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

বেশী ফস্‌ফরাস এবং কম সিলিকন মিশ্রিত পিগ-লৌহ আমাদের দেশে হয় না; কাজেই বেসিক কনভার্টার অচল।

অ্যাসিড কনভার্টারের দ্বারা ইস্পাত তৈয়ারী করা হয় না, কারণ ফস্‌ফরাস ইহার দ্বারা কমানো যায় না। কিন্তু অ্যাসিড কনভার্টারের সাহায্য নেওয়া হয়। ইহার দ্বারা সিলিকন প্রায় সম্পূর্ণভাবে এবং কার্বন দরকারমত কমাইয়া (ম্যাঙ্গানিজ কমাইবার দরকার না হইলেও কমিয়া যায়) গলিত লোহা বেসিক ওপেন-হার্থে ঢালিয়া ফস্‌ফরাস কমাইয়া এবং কার্বন দরকারমত রাখিয়া ইস্পাত তৈয়ারী হয়।

শুধু বেসিক ওপেন-হার্থের সাহায্যেও ইস্পাত তৈয়ারী হইতে পারে। ইস্পাতের ছাট (যাহার কার্বন ০·১ হইতে ০·৭) চার্জ করিয়া গরম করিবার পর মারুৎ-চুল্লীর লোহা লইয়া এই মিশ্রিত পদার্থকে বেসিক ওপেন-হার্থে ইস্পাত তৈয়ারী করা হয়। ইস্পাতের ছাট বেশী পরিমাণ লইয়া অথবা খনিজ লৌহ-প্রস্তর কিছু পরিমাণ চার্জ করিয়া কার্বনের অনুপাত কম করা হয়। ইস্পাতের ছাট বেশী লইলে সময় বেশী লাগে, কম লইলে মারুৎ-চুল্লীর লোহা বেশী লইতে হয়। তাহাতে কার্বন বেশী হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য কিছু পরিমাণ খনিজ লৌহ-প্রস্তর ইস্পাতের ছাটের সহিত চার্জ করা হয়।

বেসিক ওপেন-হার্থে ইস্পাতের তাপ নিয়ন্ত্রণ

করা যায়। যত কার্বন কমিতে থাকিবে, ইস্পাতের তাপ তত বেশী দরকার হইবে। বেসিক ওপেন-হার্থে ইহা নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। দরকারের অপেক্ষা বেশী গরম হইলে ইস্পাতে বেশী পরিমাণ গ্যাস শোষিত হয়, যাহা ইস্পাতের পক্ষে খারাপ। বেসিক ওপেন-হার্থে ইন্ধন জ্বালাইতে যে বাতাসের প্রয়োজন, তাহার চেয়ে বেশী রাখা হয়, যাহাতে চুল্লীর ভিতরের আবহাওয়াতে অক্সিজেনের ভাগ কিছু বেশী থাকে; কারণ এইরূপ আবহাওয়া ফস্‌ফরাস কমাইবার জন্য দরকার। শেষের দিকে এই বাতাসের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হয়, যাহাতে জারিত লোহা ইস্পাতে যথাসম্ভব কম থাকে। ইস্পাতে জারিত লোহা বেশী পরিমাণও ক্ষতিকারক। বেসিক ওপেন-হার্থে শুধুই ইস্পাতের ছাট ব্যবহার করিয়া ইস্পাত করা যায় এবং একবারে একটি চুল্লী হইতে ২০০ টন ইস্পাত পাওয়া যায়। মারুৎ-চুল্লীর গলিত পিগ-লৌহ হইতে কনভার্টারের সাহায্যে কার্বন কমাইয়া বেসিক ওপেন-হার্থে (পূর্বেই চুন এবং লৌহ-মরিচার সাহায্যে ধাতুমলের সৃষ্টি করিয়া) ঢালিয়া ফস্‌ফরাস কমাইবার পর ইস্পাত তৈয়ারী করা হয়। কম সময়ে বেশী ইস্পাত পাইবার জন্য ইস্পাতের ছাট চার্জ করা হয় না। ইহাকে ডুপেক্স নিয়মে ইস্পাত তৈয়ার বলে। কম কার্বনের ইস্পাতই সাধারণতঃ ইহাতে তৈয়ারী হয়। সময় কম দেওয়া হয় বলিয়া ইস্পাতে জারিত লোহা কিছু থাকিয়া যায়। সেই জন্য খুব ভাল ইস্পাত সাধারণতঃ এইভাবে তৈয়ারী করা হয় না। বেসিক ওপেন-হার্থ, ইস্পাতের ছাটের সহিত ১০-১৫ টন খনিজ লৌহ-প্রস্তর চার্জ করিয়া গলিত পিগ-লৌহ লইলে প্রাথমিক গাদ বাহির হইয়া যায়। তাহাতে সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, কার্বন এবং ফস্‌ফরাস বেশ কমিয়া যায়। এই মিশ্র পদার্থ হইতে ইস্পাত কনভার্টারের সাহায্য ছাড়াও করা যায় এবং ১০-১৫ টন খনিজ লৌহ-প্রস্তর সোজাসুজি ইস্পাতে পরিণত হয়।

এইরূপ নানাভাবে বেসিক ওপেন-হার্থ হইতে ইস্পাত তৈয়ারী হয়। ইস্পাত, ওপেন-হার্থ ছাড়াও বিজলী-চুল্লী, কনভার্টার এবং আধুনিক এল. ডি. নিয়মে তৈয়ারী করা হয়। বিজলী-চুল্লী সাধারণতঃ বেসিক হইয়া থাকে। এই প্রকার চুল্লীর সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা এই যে, ইহার ভিতরের আবহাওয়া পরিবর্তন করা যায়। অম্লজানের আবহাওয়ায় চুনের সাহায্যে গাদ বাহির করিয়া আবার নূতন গাদ তৈয়ারী করিতে হয়। যে সকল ধাতু মিশাইয়া সঙ্কর ইস্পাত তৈয়ারী হয়, তাহার মধ্যে অনেক প্রকার ধাতু অম্লজানের আবহাওয়ায় অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া গাদে চলিয়া যায়। যেমন—ফেরোম্যাঙ্গানিজ, ফেরোক্রোম, মলিবডেনাম ইত্যাদি। বিজলী-চুল্লীতে সময়মত আবহাওয়া বদ্‌লাইয়া এই সকল ধাতু মিশাইবার পর কাৎ করিয়া ঢালাই করা হয়। এই প্রকার চুল্লীতে খুব ভাল এবং দামী ইস্পাত তৈয়ারী করা যায়। বেসিক ওপেন-হার্থের বেশীর ভাগ সুবিধা ইহাতে পাওয়া যায়। একমাত্র অসুবিধা এই যে. ইহা হইতে একবারে বেশী পরিমাণ ইস্পাতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ ৫ হইতে ১০ টনের চুল্লী হইয়া থাকে। আজকাল ৪০ টনের চুল্লীও হইয়াছে। এক ঢালাই হইতে অন্য ঢালাই পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা কম সময় লাগে চার ঘণ্টা।

L. D. নিয়মে ইস্পাত প্রস্তুতে ৪০ টন ১৫ মিনিটে হইয়া থাকে। কনভার্টারের তলদেশ প্রায়ই খারাপ হয় এবং বাতাসের সাহায্যে কার্বন কমাইয়া ইস্পাত তৈয়ারী করা হয়। বাতাসের নাইট্রোজেন ইস্পাতের প্রসার্যতা (ductility) কমাইয়া দেয়। সেই জন্য অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়। একটি বাল্‌তিতে দরকারমত চুন এবং ইস্পাতের ছাট লইয়া মারুৎ-চুল্লীর গলিত লোহা ঢালা হয়। সেই লোহার কিছু উপর হইতে চালিত জলের দ্বারা ঠাণ্ডা তামার নলের ভিতর দিয়া শব্দ হইতেও দ্রুততর গতিতে অম্লজান চালিত

করে। এই অম্লজান লোহার উপরের কিছু অংশকে ইস্পাতে পরিণত করে। ইস্পাত লোহা অপেক্ষা ভারী বলিয়া নীচে চলিয়া যায় এবং লোহা উপরে আসিয়া ইস্পাতে পরিণত হয়। কার্বন, সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ কমিলে চুনের সাহায্যে ফস্‌ফরাস কমে। যাহাতে বেশী উত্তপ্ত না হয়, সেই জন্য লোহা বা ইস্পাতের ছাট ব্যবহার করা হয়। বাল্‌তি ব্যবহার করায় কনভার্টারের মত তলদেশ খারাপ হয় না। তবে ঢালাইয়ের পূর্বে গাদ উপর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া দিতে হয়; নচেৎ ইস্পাতে কিছু গাদ আট্‌কাইয়া ও অন্যান্য কারণে খারাপ ইস্পাত উৎপন্ন হয়। আমাদের মত গরমের দেশে ইহা একটি শ্রমসাধ্য কাজ, বিশেষতঃ লোহার উপর গাদের পরিমাণ নির্ভর করে। এই নিয়মের সুবিধা এই যে, কম কার্বনের ইস্পাত (৪০ টন) ১৫ মিনিটের মধ্যে তৈয়ারী হয়।

ইহাতে কনভার্টার অপেক্ষা ক্ষয়ক্ষতি কম। অক্সিজেন ব্যবহার করায় কিছু ভাল ইস্পাত উৎপন্ন হয়। বেসিক ওপেন-হার্থের সুবিধা অনেক; যেমন—

১। যে কোনও কার্বনের ইস্পাত তৈয়ারী করা যায়।

২। লৌহ বা ইস্পাতের ছাট এবং মারুৎ-চুল্লীর গলিত লৌহ যে কোনও অনুপাতে ব্যবহার করা যায়।

৩। সময়—২ ঘণ্টা হইতে ১২ ঘণ্টার মধ্যে ঢালাই হয় এবং একসঙ্গে অনেক বেশী পরিমাণ ইস্পাত পাওয়া যায়। সময় বেশী দিলে ইস্পাত ভাল হয় এবং নানাপ্রকার সঙ্কর ইস্পাতও তৈয়ারী করা যায়।

৪। ইহার ক্ষয়-ক্ষতি অপেক্ষাকৃত কম।

৫। সুবিধামত জ্বালানী ব্যবহার করা যায়।

৬। দেশ, কাল ও সুবিধা অনুযায়ী ইহার চার্জ কিছু অদল-বদল করা যায়।

এই সকল নানারকম সুবিধার জন্য শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিভিন্ন দেশে ওপেন-হার্থের সাহায্যেই ইস্পাত বেশী তৈয়ারী হয়।

কাগজের কথা

পুষ্প মুখোপাধ্যায়

কাগজের আবিষ্কার হয়েছে প্রায় দু-হাজার বছর আগে। কিন্তু বোল্‌তা বাসা বেঁধে আসছে নিজের তৈরী কাগজ দিয়ে, তাদের আবির্ভাবের গোড়া থেকেই। গাছের ছাল, কাঠের টুক্‌রা থেকে কিছুটা অংশ কুঁড়ে কুঁড়ে নিজের লালার সঙ্গে মিশিয়ে সেই কাগজের মত জিনিষ দিয়ে তারা বাসা তৈরী করে,। বোল্‌তার বাসা দেখেই বোধ হয় মানুষের কাগজ তৈরীর হাতেখড়ি হয়েছিল।

কাগজে লেখবার আগে মানুষ তার চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করে সেগুলি সযত্নে রক্ষা করবার জন্যে অনেক রকম চেষ্টা করেছে। পাথরের উপর অক্ষর খোদাই করে, সেগুলি আবার মাটির উপর পর পর বসিয়ে মানুষ ভারী ভারী বই তৈরী করেছে এবং সে সব বই পাঠাগারে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। মিশরে পেপিরাস গাছ থেকে লেখবার সরঞ্জাম তৈরী করে নেবার প্রথা ছিল। আমাদের দেশে তালপাতায় লেখবার রেওয়াজ ৫০।৬০ বছর আগেও প্রচলিত ছিল। ছেলেরা তখন বই, শ্লেট নিয়ে স্কুলে যেত না, পাত্‌তাড়ি বগলে করে পাঠশালায় যেত।

দীর্ঘ কাল স্থায়ী করবার জন্যে জীবজন্তুর চামড়ার উপর লেখবার প্রথাও প্রচলিত ছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন গবেষণা চলেছিল লেখবার উপযোগী ভাল উপকরণ আবিষ্কারের জন্যে, চীনারা তখন আবিষ্কার করে ফেলেছে কাগজ তৈরীর কৌশল। প্রায় এক হাজার বছরেরও বেশী তারা এই কৌশল গোপন রেখেছিল। দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের লোকেরা কাগজ তৈরীর প্রণালী শিখে নেয়। প্রথম ব্যবসা সুরু হয় হাতে তৈরী কাগজ নিয়ে; তারপর তৈরী হয় যন্ত্রপাতি। ভারতবাসী কাগজ তৈরী করতে শিখেছে ইংরেজদের কাছে।

কাগজের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃই বেড়ে উঠতে লাগলো এবং কাগজ-কলের সংখ্যাও দ্রুত বেড়ে

মিশরের পেপিরাস গাছ।

কাগজ তৈরীর প্রণালী প্রচার করতে দেয় নি চীনারা, কিন্তু নিজের দেশে কাগজ তৈরী করে ব্যবহার করেছে। ৮০০ খৃষ্টাব্দে আরব দেশের লোকেরা কাগজ তৈরীর কৌশল জেনে নেয় কয়েকজন চীনা যুদ্ধ-বন্দীর কাছে। আরবদের কাছ থেকে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন কাগজ তৈরীর কৌশল জানতে পারে। এরপর সারা ইউরোপে কাগজ তৈরীর বার্তা উঠলো। কাগজ-বিহীন দিনের কথা এখন ভাবতেও পারা যায় না।

এখন রকমারী ব্যবহারের জন্যে কাগজের প্রয়োজন। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে শুধু লেখবার প্রয়োজন ছাড়াও কাগজের ব্যবহার যেমন বেড়ে গেছে, কাগজের উৎকর্ষও তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে। লেখবার ভাল কাগজ একবিন্দু কালিও শুষে নেয়

না, আবার ব্লটিং কাগজ শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত শুষে নেয়। জামাকাপড় মুড়ে রাখবার কাগজগুলি খুবই শক্ত, টানলে সহজে ছেঁড়ে না; আবার টিস্যু-পেপার যেন হাওয়ার ভারটুকুও সইতে পারবে বলে মনে হয় না। একই লেখার বহুসংখ্যক কপি তৈরী করে দেয় কার্বন পেপার। অয়েল পেপার জড়িয়ে রাখলে জল লেগে কোনও জিনিষ নষ্ট হবার ভয় থাকে না। কয়েক রকম খাবার মুড়ে রাখবার জন্যে ওয়াক্স পেপার খুবই সুবিধাজনক। ওয়াল পেপার দিয়ে সারা দেয়াল শ্রীসম্পন্ন করা যায়। কারেন্সি নোট তৈরী করবার জন্যে পাতলা অথচ শক্ত কাগজ বিশেষভাবে তৈরী করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় পুস্তক মুদ্রণের জন্যে যে কাগজ ব্যবহৃত হয়, সাধারণ লেখবার খাতার কাগজ তার চেয়ে নিকৃষ্ট। আবার খবরের কাগজ বা যে কাগজ একবার ব্যবহারের পরেই ফেলে দেওয়া হয়, সেগুলি ছাপা হয় আরও খারাপ কাগজে। কাগজ যে কত রকমের, আর কত দামের হতে পারে, তা শুনলে অবাক হতে হয়। শুধু রকমফেরই নয়, কি পরিমাণ কাগজ দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, তার সঠিক হিসাব পাওয়া শক্ত ব্যাপার। শোনা যায় যে, ইংল্যাণ্ডের একটি প্রধান খবরের কাগজের রবিবারের সংখ্যা মুদ্রণের জন্যে যত কাগজ লাগে, সারা পৃথিবীর পরিধি সেই কাগজ দিয়ে একবার মুড়ে দেওয়া যায়। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে মাথাপিছু যথাক্রমে ৪১৮ ও ১৮৮ পাউণ্ড কাগজ ব্যবহৃত হয়। এই তুলনায় ভারতবর্ষে কাগজের ব্যবহার খুবই কম, মাথাপিছু মোটামুটি ২ পাউণ্ড মাত্র। আশা করা যায়, শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে কাগজের প্রয়োজন ভবিষ্যতে আরও বেড়ে যাবে। কিন্তু উপস্থিত প্রয়োজনমত কাগজও আমাদের দেশে সবটা তৈরী হয় না। প্রয়োজনের তুলনায় বছরে ৫০,০০০ টন কাগজ কম তৈরী হয়। সমগ্র ভারতবর্ষের প্রয়োজনের শতকরা ৪৫ ভাগ কাগজ এখন বাংলা দেশেই তৈরী হয়। এখানে সবসমেত ১৮টি কাগজের কলে বছরে গড়পড়তা ৪৮,২৬৪

পেপিরাস গাছ থেকে প্রাচীন মিশরীয়দের কাগজ তৈরীর দৃশ্য।

টন নানাপ্রকার কাগজ ও পেপার বোর্ড প্রস্তুত হয়।

তন্তুবিশিষ্ট (Fibrous) যে কোনও জিনিষ দিয়েই কাগজ তৈরী করা যেতে পারে। পাট, শণ, বাঁশ, কয়েক প্রকার ঘাস জাতীয় গাছ, পুরনো কাপড়ের টুক্‌রা ও আরও অনেক রকম জিনিষ, যা আমরা সাধারণতঃ অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি, সেগুলি কাগজ তৈরীর জন্যে ব্যবহার করা হয়। বিলাতী পাইন গাছের কাঠ দিয়ে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী কাগজ তৈরী হয়। কারণ খবরের কাগজ এবং সাধারণ বই ছাপবার জন্যে এই কাগজ ব্যবহৃত হয়। এই কাগজ খুব উৎকৃষ্ট নয়। ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রা থেকে যে কাগজ তৈরী হয়, কাঠ থেকে তৈরী কাগজের চেয়ে সেগুলি অনেক উঁচু দরের। কাঠের টুক্‌রা দিয়ে মিলে তৈরী কাগজ অল্প দিনেই ঝুরঝুরে হয়ে ছিঁড়ে যায় এবং আলো লাগলে অল্প দিনের মধ্যেই হল্‌দে হয়ে যায়; তাই দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যে এই কাগজ ব্যবহার করা হয়।

কেমন করে কাগজ তৈরী হয়, এখন তার একটু বর্ণনা প্রয়োজন। পুরনো কাগজ, ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রা, খড় প্রভৃতি জড়ো করা হয়। প্রথমে এগুলিকে পরিষ্কার করে সব ময়লা ও রং তুলে ফেলা হয়। তারপর খুব ছোট ছোট টুক্‌রা করে সবগুলি একসঙ্গে একটি জলভর্তি চৌবাচ্চায় ফেলে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে যতদূর সম্ভব জলের সঙ্গে মিশিয়ে মণ্ডে পরিণত করা হয়। কাঠের ফ্রেম দিয়ে ঘেরা একটি সূক্ষ্ম জাল্‌তির উপর ঐ মণ্ড খানিকটা তুলে নেওয়া হয়। যেমন কাগজ তৈরী হবে, তারই সমান মাপে ফ্রেমটি তৈরী। পরে জাল্‌তিটি নেড়ে নেড়ে সব মণ্ডটি সমভাবে জাল্‌তির উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সব জল জাল্‌তির ছিদ্র দিয়ে নীচে ঝরে পড়ে। তখন জাল্‌তিটি উবুড় করে তার উপরে ছড়ানো ভিজা কাগজ কম্বলের মত এক প্রকার কাপড়ের উপর রাখা হয়। এভাবে এক-খানি ভিজা কাগজ এবং এক একখানি ফেল্ট পর পর রেখে উপরে একটি ভারের চাপ দিয়ে কিছুক্ষণ রাখবার পর কাগজগুলি প্রায় জলশূন্য হয়ে যায়। অনেক সময় কাগজ ভারী ও ধবধবে সাদা করবার জন্যে এবং কাগজে কালি না ছড়িয়ে পড়বার উদ্দেশ্যে চৌবাচ্চায় মণ্ড তৈরীর পর কয়েক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়।

জীবজন্তুর চামড়াকে লেখবার উপযোগী করা হচ্ছে। এক সময়ে জীবজন্তুর চামড়ার উপর লেখবার প্রথা চালু ছিল।

পিঠ-ব্যথা

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

যারা দু'পায়ে হাঁটে তাদের জন্যে পিঠ সৃষ্টি হয় নি। একটু ভেবে দেখলেই বুঝা যায় যে, কথাটা মিথ্যা নয়। যারা দু-পায়ে হাঁটে, তাদের পক্ষে পিঠের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী নয়। বোধ হয়, সে জন্যেই মানুষ পিঠের ব্যথায় ভুগে থাকে। যখন আমরা দাঁড়াই, তখন পিঠের মাংসপেশীগুলি সর্বদাই সক্রিয় অবস্থায় থেকে পিঠটাকে সোজা করে ধরে রাখে এবং ঘাড়, মাথা ও কাঁধকে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে সহায়তা করে। আমরা হামেশাই দেখি, শিশু থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সব বয়সের লোকেরা পিঠের ব্যথায় ভুগে থাকে। পিঠ বা কোমরের ব্যথা যে কত কষ্টদায়ক, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। পিঠ-ব্যথা হলেই অনেকে মনে করেন, যক্ষ্মারোগ হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল; যেহেতু অনেক কারণেই পিঠের ব্যথা হতে পারে। এখানে তারই কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

যাদের স্বাস্থ্য ভাল নয়, তারা অতি সাধারণ কাজের পরেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করলে অথবা ভারী কাজ করলে তাদের পিঠের মাংসপেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ক্লান্ত মাংসপেশী যখন কাজ করতে অক্ষম হয়, তখন থেকে পিঠ-ব্যথা সুরু হয়। পিঠের মাংসপেশী পরিপূর্ণ পুষ্টিলাভ না করলে তাদের দিয়ে স্বাভাবিকভাবে কাজ করানো যায় না। দুর্বল মাংসপেশী অত্যধিক মাত্রায় চালিত হলে শীঘ্রই অক্ষম হয়ে পড়ে। এর ফলেই পিঠে ব্যথা হয়ে থাকে। যারা ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, গল্‌ফ খেলে বা সাঁতার কাটে, তারা কখনো এই রোগে ভুগেছে বলে শোনা যায় না। এর কারণ হচ্ছে, প্রতিনিয়ত ব্যায়াম করবার ফলে তাদের পিঠের মাংসপেশী সবল ও সুস্থ অবস্থায় থাকে।

অনেক সময় আমাদের হঠাৎ পিঠ-ব্যথা সুরু হয়। হয়তো বাথরুমে গিয়ে জল তুলতে গেছি বা নীচু হয়ে সুটকেশ তুলছি—হঠাৎ আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। পিঠে ও কোমরে অসহ্য ব্যথা। মনে হয় যেন নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে যাবে। এই অসহ্য যন্ত্রণা কয়েক দিন—এমন কি, কয়েক সপ্তাহ অবধি থাকতে পারে। এই অবস্থায় চলাফেরা সব বন্ধ। শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিছু দিন পরে যন্ত্রণা কমে গেলেও মাঝে মাঝে এই রোগের আক্রমণে রোগী ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। অথচ দেখা যায়, জাহাজ-ঘাটার কুলি, যারা প্রত্যহ মণে মণে মাল টানছে, তাদের কিছুই হয় না। কাজেই একথা আমাদের বুঝা উচিত যে, কোমরের অস্থি-সন্ধিতে কোন রোগ না হলে এই ধরণের ব্যথাকে চিকিৎসাশাস্ত্রে লাম্বেগো বলা হয়।

দেহের বিভিন্ন ধরণের মাংসপেশীর মধ্যে পিঠের মাংসপেশী-ই বেশী কাজ করে। তার কারণ হচ্ছে, পিঠে মেরুদণ্ডের বক্রতা সর্বত্র সমান নয়। সেহেতু উবুড় হয়ে কোন কাজ করতে গেলে বা বসতে গেলে পিঠের মাংসপেশীতে টান পড়ে। খোঁড়া লোকেরা সাধারণতঃ এক-পায়ের উপর বেশী জোর দিয়ে হাঁটে। সে জন্যে তাদের মেরুদণ্ড একদিকে বেশী হেলে পড়ে। তাছাড়া অন্য কোন কারণেও যদি কোমরের উপর অত্যধিক চাপ পড়ে, তাহলেও পিঠ-ব্যথা হবার সম্ভবনা থাকে। সন্তান-সম্ভবা স্ত্রীলোক

অথবা স্ফীতোদর ব্যক্তিদের কোমরে অত্যধিক চাপ পড়ায় তারা পিঠের ব্যথায় ভুগে থাকে।

আমাদের দেশে অনেক স্ত্রীলোক প্রৌঢ় বয়সে পিঠ এবং কোমরের ব্যথায় ভুগে থাকে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের পরে স্ত্রীলোকদের যৌনজীবনের এক বিশেষ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। তখন দেহে হর্মোনের অভাবে এবং অন্যান্য কারণে মেরুদণ্ডের ক্যালসিয়াম বা চুনজাতীয় পদার্থ ক্ষয়ে গিয়ে কটিদেশের কশেরুকাগুলির সূচলো দিক মেরুদণ্ডের সারি থেকে একটু বাইরে হেলে পড়ে। এর ফলে কটিদেশ ও নিতম্বদেশে অত্যধিক যন্ত্রণা হয়। দাঁড়ানো বা চলাফেরার কথা ভাবতেও তারা শিউরে ওঠে। এসব ক্ষেত্রে রোগীকে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন-ডি-ঘটিত ওষুধ এবং বিশেষ ধরণের হর্মোন দেওয়া হয়। তাছাড়া বগল থেকে কুঁচকি পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গ শক্ত প্লাষ্টারে আবৃত রাখা হয়।

সচরাচর আমরা যে ধরণের পিঠ-ব্যথার কথা শুনে থাকি, সে সব হয় আরথ্রাইটিস এবং ফাইব্রোসাইটিস রোগের জন্যে। আরথ্রাইটিস হচ্ছে অস্থি-সন্ধির রোগ, আর ফাইব্রোসাইটিস রোগে মেরুদণ্ডের আশেপাশের তন্তু শক্ত হয়ে যায়। দুটি রোগ প্রায় একই রকমের, তবে আরথ্রাইটিস রোগে অস্থি-সন্ধি ক্রমশঃই বিকৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু ফাইব্রোসাইটিস রোগে অস্থি-সন্ধির বিকৃতাবস্থা আসে না, তবে সারাজীবন ধরে মাঝে মাঝে প্রায়ই কোমর ও পিঠের ব্যথায় ভুগতে হয়।

অনেক সময় যুবকদের জটিল ধরণের আরথ্রাইটিস রোগের আক্রমণ হয়। এই রোগে মেরুদণ্ডের কশেরুকাগুলির মধ্যেকার ফাঁকা জায়গা বুজে গিয়ে গোটা মেরুদণ্ডটা একখণ্ড হাড়ে পরিণত হয়। মেরুদণ্ড ধনুকের মত বেঁকে থাকে, তারজন্যে সব সময় অসহ্য যন্ত্রণা হয় এবং রোগী গড়িয়ে ছাড়া চলতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে আবার কশেরুকার মধ্যেকার ছিদ্রপথ, যার মধ্য দিয়ে স্পাইনাল নার্ভ চলে গেছে, সেখানে যদি হাড়ের চুন জাতীয় পদার্থ ক্রমাগত সঞ্চিত হতে থাকে, তাহলে ঐ পথ ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে যায় এবং স্নায়ুতন্তুর উপরে চাপ পড়ে। এর ফলে অসহ্য যন্ত্রণা সুরু হয়।

বিশেষ ধরণের ভাইরাস-ঘটিত রোগে কোমর ও পিঠে যন্ত্রণা হয়ে থাকে। Coxsackie নামে এক ধরণের ভাইরাস কর্তৃক আক্রান্ত রোগীর অবস্থা অনেকটা পোলিও রোগে আক্রান্ত রোগীর মত। এই রোগে আক্রান্ত রোগীর পিঠ ও কোমরে এত বেশী যন্ত্রণা হয় যে, তারা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। এই ধরণের রোগের চলিত নাম শয়তানের থাবা বা Devil's grip। বসন্ত রোগাক্রমণের দিন সাতেক আগে রোগীর কোমরে ও পিঠে খুব যন্ত্রণা হয়ে থাকে।

এক ধরণের কোমর-ব্যথার রোগীরা অভিযোগ করেন যে, হাঁচি, কাশি বা কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্যে পেটে জোর চাপ দিলে তাদের পিঠের নীচেকার অংশে, এক সঙ্গে কতকগুলি পিন ফুটিয়ে দিলে যেমন হয়, সেরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হতে থাকে। এই ধরণের ব্যথার কারণ হচ্ছে, দুই কশেরুকার মাঝখানে প্লেটের মত যে বস্তুটি আছে, সেটি কোন কারণে ভেঙ্গে গেলে তার ভগ্ন অংশগুলি শিড়দাঁড়ার স্নায়ু-পথের মধ্যে জমা হয়ে স্নায়ুতন্তুতে ক্রমাগত চাপ দেয়। হাঁচি বা কাশিতে পেটের মাংসপেশীর উপর চাপ পড়ে এবং তার ফলে স্নায়ুতন্তু পীড়িত হয়।

দেখা গেছে যে, বেশী আবেগপ্রবণ লোকেরা পিঠের ব্যথায় ভুগে থাকে। বাতিকগ্রস্ত লোকেরা প্রায়ই বলে থাকে যে, তাদের কোমর, পিঠে ও নিতম্বদেশে অসহ্য যন্ত্রণা। এক রোগিণীর ইতিহাসে জানতে পারা যায়, যেদিন সে তার পিতার মৃত্যুসংবাদ শোনে, সেদিন থেকেই তার পিঠে যন্ত্রণা সুরু হয়। আর একজন বলেছে যে, তার সংসারে এক বিশেষ দুর্ঘটনা ঘটবার পর থেকেই তার কোমরে অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে। আরও

একজনের রোগের ইতিহাস থেকে জানা গেছে যে, রেডিওতে অডিশন দেবার সময় অকৃতকার্য হবার পর থেকেই সে পিঠের ব্যথায় ভুগছে। কেন যে এই ধরণের অবস্থা হয়, তার সঠিক কারণ জানা যায় নি।

এতক্ষণ পিঠ-ব্যথার বহুবিধ কারণ নিয়ে আলোচনা করা হলো। এবারে চিকিৎসার কথা সংক্ষেপে বলা যাক। সাধারণ অবস্থায় অ্যাসপিরিন, নোভালজিন, ইরগাপাইরিন প্রভৃতি বড়ি খাওয়া যেতে পারে। আরথ্রাইটিস হলে কর্টিসোন জাতীয় ওষুধ ভাল কাজ করে। নিয়মিতভাবে ব্যায়াম ও মাসাজ করা উচিত। তাপ বা ডায়াথার্মি-পদ্ধতিতেও চিকিৎসা করা হয়। অনেক সময় অস্ত্রোপচারেরও প্রয়োজন হয়। যে কোন অবস্থাতেই উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য।
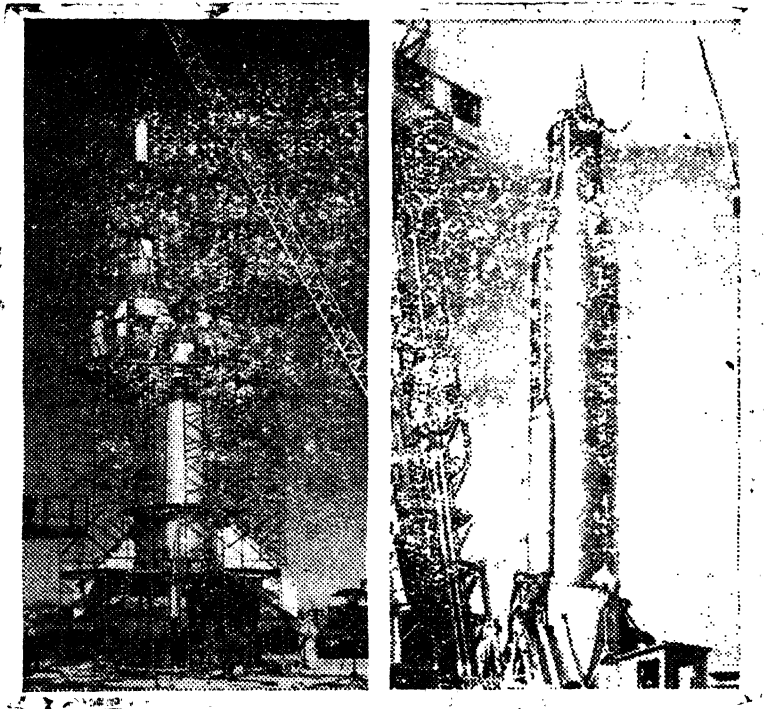
ফার্ষ্ট প্রোজেক্ট মার্কারী অ্যাষ্ট্রোনাট ক্যাপসুল সমেত মহাশূন্যে পাঠাইবার সন্তোষজনক ব্যবস্থার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা 'লিটল জো' এবং 'বিগ জো' কে (ডান দিকে) কেপ ক্যানাভেরালের (ফ্লোরিডা) এসকেপ টাওয়ার হইতে ঊর্ধ্বে প্রেরণের পর সংলগ্ন ক্যাপসুলটিকে প্যারাসুটযোগে অবতরণের পরীক্ষা করিতেছেন।

লৌহ

অমূল্যধন দেব

প্রাক-আর্য যুগে ভারতবর্ষে লৌহ প্রস্তুত হইত। বেদে লৌহের উল্লেখ আছে। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, লোহা ময়দানবের তপস্যার সৃষ্টি। শিল্প-সমালোচক বার্ডউড মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারত যদি লৌহ-শিল্পে দক্ষতা না হারাইয়া বেদান্ত হারাইত, তবে বোধ হয় ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতা ঘটিত না। অবশ্য বেদান্ত লোহাকে তুচ্ছ করিতে বলে নাই। লোহাকে রাখিয়াও বেদান্তকে রাখা যায়, ইহা আমাদের সংস্কৃতি দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে। বর্তমান বৈষয়িক সভ্যতার উপর লোহার প্রভুত্ব অনস্বীকার্য।

ভারতই লৌহ ব্যবহারের প্রথম প্রবর্তক—এই তথ্য স্যামুয়েল স্মাইল্‌স্‌ এক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত দামাস্কাস তরবারি ভারতীয় লৌহ হইতেই প্রস্তুত হইত। দেহলী প্রান্তে কুতুব মিনারের নিকট যে স্তম্ভ আছে, তাহা ৩০০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। আজও সেই স্তম্ভ কলঙ্কহীন এবং ধাতুবিদ্‌দের অতি আধুনিক জ্ঞানের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। মাণ্ডু শহরের ভূপতিত লৌহস্তম্ভ প্রস্তুত করিবার সময় কিভাবে শিল্পীরা ইহা নাড়াচাড়া করিল, তখন কোন ক্রেন ছিল কিনা—ইত্যাদি বিষয় আজও বিস্ময় উদ্রেক করে। ফরাসী পর্যটক ট্যাভারনিয়ারের লিখিত ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে, ভারতের ইস্পাতই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ইস্পাত। আমরা অতীতের গৌরবে গৌরবান্বিত; কিন্তু ব্যবহারিক বা বৈষয়িক সিদ্ধিলাভের জন্য অতীতের জ্ঞানকে কাজে প্রয়োগ করি নাই। আজ বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সহিত সমানভাবে চলিতে হইলে আমাদের জ্ঞানকে বৈষয়িক স্বার্থে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইব।

বিংশ শতকের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে লৌহ উৎপাদনের জন্য জামসেদজী টাটা কারখানা স্থাপন করেন। ইতিপূর্বে বাংলাদেশেই বীরভূম জেলায় লোহার কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল এবং ফোর্ট উইলিয়ামের কামানের গোলাও ঐ কারখানা হইতে সরবরাহ হইত। জামসেদজী টাটা বিলাতে অবস্থানকালীন ম্যানচেষ্টারে এক সভায় টমাস কার্লাইলের বক্তৃতা শুনিয়া উদ্দীপনা লাভ করেন। কার্লাইল বলিয়াছিলেন—যে জাতি লোহা পাইয়াছে, সে জাতি সোনাও পাইয়াছে। ভারতবর্ষে লৌহ-শিল্প প্রবর্তনে বাঙালী ভূতাত্ত্বিক স্বর্গতঃ প্রমথনাথ বসুর অবদানও কম নয়। বস্তুতঃ তাঁহার রিপোর্ট অনুসারেই জামসেদজী টাটা স্থান নির্বাচন করেন। ভিলাইয়ে যে ইস্পাত-নগরী স্থাপিত হইয়াছে, তাহারও মূলে ছিল স্বর্গতঃ প্রমথ বসুর রিপোর্ট। তিনিই রাজহারা পাহাড়ে আকরিক লৌহের সন্ধান দিয়াছিলেন। লৌহ-শিল্প প্রতিষ্ঠায় প্রমথ বসুর অবদানের কথা বিস্মৃত হইলে গর্হিত কাজ হইবে। ভূতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য আজকাল নূতন নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইতেছে; কিন্তু প্রমথ বসুর অবদানের বিষয় এখনও অম্লান রহিয়াছে।

১৯১২ সালে জামসেদজী টাটার কারখানা হইতে প্রথম লৌহপিণ্ড উৎপন্ন হয়। ১৯১৮ সালে বার্নপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টীল কোম্পানীও উৎপাদন সুরু করে। মহীশূর সরকার ভদ্রাবতীতেও কারখানা স্থাপন করে। লৌহ, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে অপরিহার্য। তাই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ লৌহ-শিল্পকে অগ্রগতির পথে ত্বরান্বিত করিয়া দিয়াছে। ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে ৮,৩৯,০০০ টন

লৌহ উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে কি পরিমাণ লোহার প্রয়োজন, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে অন্য দেশের খবর জানা দরকার। আমেরিকায় জন প্রতি ১৫০০ পাউণ্ড ও ইংল্যাণ্ডে জন প্রতি ৬৫০ পাউণ্ড লোহার প্রয়োজন হয়। আর ভারতবর্ষে জন প্রতি ১৫ পাউণ্ড লোহার দরকার হয়। এই লোহাও আবার দেশে উৎপন্ন হয় না, বিদেশ হইতে মুদ্রা বিনিময়ে আমদানী করিতে হয়। ১৯৫৬ সালে ১২৩ কোটি এবং ১৯৫৭ সালে ১৩৫ কোটি টাকার লোহা বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। আজ লৌহ উৎপাদনের তাই এত প্রয়োজন।

সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশ লৌহ উৎপাদনের পক্ষে খুবই উপযোগী। আমাদের দেশের আকরিক লৌহে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ লৌহ আছে এবং অন্যান্য দেশের আকরিক লৌহের তুলনায় এই শতাংশ অনেক বেশী। লৌহ উৎপাদনের জন্য যে কয়লার প্রয়োজন, তাহা আমাদের দেশে পর্যাপ্ত নহে। জাতীয় ধাতু-গবেষণাগার কয়লার সাশ্রয় করিবার জন্য গবেষণায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। এই জন্য ১৫ টন লৌহের উপযোগী নমুনা ও পশ্চিম জার্মেনীর অনুকরণে কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে কয়টি লৌহ উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ হইল—

নাম	ইস্পাত পিণ্ড	প্রস্তুত ইস্পাত
টাটানগর	২,০০০,০০০ টন	১'৫০০,০০০ টন
বার্নপুর	১,০০০,০০০ „	০'৮০০,০০০ „
রাউরকেলা	১,০০০,০০০ „	০'৭২০,০০০ „
ভিলাই	১,০০০,০০০ „	০'৭৫০,০০০ „
দুর্গাপুর	১,০০০,০০০ „	০'৭৫০,০০০ „
	৬,০০০,০০০ „	৪'৫২০,০০০ „

শেষোক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠান সরকারী আওতায় ৫০০ কোটি টাকার অধিক ব্যয়ে স্থাপিত হইয়াছে। বোকারোতে আরও একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার কথা বিবেচনা করা হইতেছে। প্রতি দশলক্ষ টন উৎপাদনক্ষম কারখানার পক্ষে ৬০০ অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার ও ৬০০০ কর্মীর প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইস্পাত উৎপাদনের যে লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, তাহা পূর্বেকার তুলনায় অন্ততঃ ৪ গুণ বেশী। বিশেষ গুণসম্পন্ন মিশ্র ইস্পাত, যাহা এখন বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়, সেই ইস্পাত প্রস্তুত করিবার চেষ্টাও হইতেছে। কারখানায় লোহা কাটিবার জন্য যে লোহার বাটালী ব্যবহৃত হয় তাহা বিশেষভাবে প্রস্তুত ইস্পাত হইতে তৈয়ারী হয়। টাংষ্টেন, ভেনাডিয়াম, কোবাল্ট প্রভৃতি ধাতুর মিশ্রণে ইহা তৈয়ার হয়। লোহা কাটিবার অন্যান্য যন্ত্রাদিও বিশেষভাবে নির্মিত ইস্পাত হইতে তৈয়ার হয়। আমাদের দেশে এই সব বিশেষ ধরণের ইস্পাত তৈয়ার করিতে হইবে। সিমেণ্টেড কারবাইড, আর্ডলয়, সেরামিক প্রভৃতি নামে এই সব বিশেষ সঙ্কর ধাতুর নামকরণ হইয়াছে। আমরা সাধারণতঃ যাহাকে চীনা লোহা বা কাষ্ট আয়রন বলি, তাহার উৎপাদনেও অনেক উন্নতি হইয়াছে। এই চীনা লোহা এসিকিউলার কাষ্ট আয়রন, স্ফেরয়েডল গ্র্যাফাইট কাষ্ট আয়রন প্রভৃতি নামে প্রস্তুত হইতে পারে এবং কোনও কোনও বিষয়ে এই রকম চীনা লোহা ইস্পাত হইতেও ভাল। দৈনিক দুই মিলিগ্রাম লোহা যদি খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়, তবে মৃত্যু নিশ্চিত। এই জন্য ঔষধরূপেও লোহার প্রয়োজন।

টাটানগর ও বার্নপুরে যে প্রণালীতে ইস্পাত তৈয়ার হয়, তাহা প্রাচীন পদ্ধতি। নবনির্মীত তিনটি ইস্পাত কারখানায় যে পদ্ধতিতে ইস্পাত তৈয়ার হইবে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকের কৌতুহল বৃদ্ধি করিবে।

	ভিলাই	দুর্গাপুর	রাউরকেলা
মিক্সার	১	২	২
ওপেন হার্থ ফার্নেস	৬ (প্রতিটি ২৫০ টন)	৭ (প্রতিটি ২০০ টন) ১ (১০০ টন)	৪ (প্রতিটি ৮০ টন)
কনভার্টার	—	—	৩ (প্রতিটি ৪০ টন)
ব্লাষ্ট ফার্নেস	৩ (প্রতিটি ১১৩৫ টন)	৩ (প্রতিটি ১২৫০ টন)	৩ (প্রতিটি ১০০০ টন)
কোক্ ওভেন	৩ (প্রতিটি ৬৫ টন)	৩ (প্রতিটি ৭৮ টন)	৩ (প্রতিটি ৭০ টন)

আমাদের দেশের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের ও মাপের প্রস্তুত ইস্পাত এই তিন কারখানায় তৈয়ার হইবে। যেমন রাউরকেলা উৎপন্ন করিবে লোহার পাত। ভিলাই দিবে লৌহবর্ত্ম ও লোহার বাট। দুর্গাপুর হইতে পাওয়া যাইবে রেলগাড়ীর চাকা ও কামারশালার কাজের জন্য বড় বড় চৌপল। এই ভাবে দেশের চাহিদা অনুযায়ী কারখানাসমূহের উৎপন্ন লৌহ প্ল্যান করা হইবে, যাহাতে অনাবশ্যক প্রতিযোগিতা না হয়।

বর্তমানে লৌহ প্রস্তুত করিবার বিভিন্ন প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। নাইট্রোজেন গ্যাসের অবস্থিতি লৌহের পক্ষে অনুকূল নয়। নাইট্রোজেন গ্যাস বিতাড়নের জন্য বর্তমানে তিনটি প্রক্রিয়ার পরীক্ষা চলিতেছে।

(১) অক্সিজেন-সমৃদ্ধ বায়ু উচ্চ চাপে ব্যবহার করা।

(২) অক্সিজেন বাষ্পের সঙ্গে মিশাইয়া ব্যবহার করা।

(৩) অক্সিজেন-এর ঝাপ টা দেওয়া।

ইস্পাত উৎপাদনের একজন পথিকৃৎ বেসেমার। তাঁহার মূল পদ্ধতির উপরেই নানাবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে দোষমুক্ত ও স্বল্প খরচে ইস্পাত তৈয়ার করিবার প্রয়াস চলিতেছে। অন্যান্য পুরোধাদের মধ্যে মার্টিন ও টমাসের নাম উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক কালে যে সকল পদ্ধতির উপর দৃষ্টি দেওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অষ্ট্রিয়ায় প্রবর্তিত এল-ডি পদ্ধতি ও সুইডেনে প্রবর্তিত কালডো পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

এল-ডি পদ্ধতিতে ১৯৫৩ সাল হইতে ইস্পাত তৈয়ার সুরু হইয়াছে। এল-ডি নাম Linzer Dusenver fahren হইতেই হইয়াছে। অষ্ট্রিয়ার লিনৎস ও জেনাভিট্‌ৎস্ নামক দুইটি স্থানে এই পদ্ধতি প্রথমে উদ্ভাবিত হয়। অষ্ট্রিয়ার লৌহ আকরে ফস্‌ফরাসের অনুপাত বেশী (·৩%) থাকায় তথায় এই পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছে। ভারতবর্ষে রাউরকেলায় ইস্পাত উৎপাদনের যে প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা এই এল-ডি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত অল্প ছাট ও শক্তি ব্যবহৃত হয়, এই কারণে ইহার উৎপাদন ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত কম।

এল ডি পদ্ধতি হইতেও আধুনিক কালডো পদ্ধতি সুবিধাজনক। ১৯৫৬ সালে ইহা সুইডেনে প্রবর্তিত হয়। সুইডেনের আকরিক লৌহ ফস্‌ফরাস সমৃদ্ধ এবং ফস্‌ফরাস ইস্পাত তৈয়ার করিবার জন্য সর্বদা পরিত্যজ্য। এই পদ্ধতির আবিষ্কর্তা Bo Kalling এবং ইহা সুইডেনের Domnavert নামক স্থানে প্রথম প্রবর্তিত হয়। আবিষ্কর্তা ও কারখানার নাম অনুসারেই কালডো পদ্ধতি নাম হইয়াছে। এই আধার দেখিতে বেসেমার কনভার্টারের মতই। জলের সাহায্যে শীতলীকৃত নলের মধ্য দিয়া অক্সিজেন প্রবেশ করানো হয়। কিন্তু এই অক্সিজেন শুধু গলিত লৌহের উপরিভাগেই ঝাপ্‌টা দেয়। আধারটি হেলানো অবস্থায় রাখিয়া ঘুরানো হয়। ইস্পাত প্রস্তুত করিতে যে উত্তাপের প্রয়োজন, এই

পদ্ধতিতে তাহার সাশ্রয় হয়। এই জন্য খরচও কম পড়ে।

আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মেনী, জাপান ইত্যাদি প্রত্যেকটি দেশই লৌহ উৎপাদন করে। লৌহ উৎপাদনে তাই প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। কম খরচে ভাল গুণসম্পন্ন লোহা তৈয়ার করাই এই প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র পথ। দেশের বিভিন্ন কারখানায় যাহাতে এই প্রতিযোগিতার কোনও কুফল না হয়, এই জন্য সরকার হইতে উৎপন্ন লোহার দর নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। বিদেশ হইতে আমদানীকৃত লোহার দরও এই জন্য বিবেচনা করা হইয়া থাকে এবং দেশের উৎপন্ন পণ্যকে যথাসম্ভব সুবিধা দেওয়া হয়। এখন যে সব কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে ভারী শিল্প, রেলওয়ে, ঘরবাড়ী তৈরীর প্রয়োজনমাফিক লোহা দেশেই পাওয়া যাইবে। তথাপি বিশেষ গুণসম্পন্ন লোহার জন্য আরও কারখানা স্থাপিত হইবে। এই সকল কারখানায় সঙ্কর ইস্পাত তৈয়ারী হইবে। ইস্পাতে স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত আমাদের দেশের শিল্পায়ন কখনও সম্পূর্ণ সফল হইবে না।

রসায়নে নোবেল পুরস্কার—১৯৫৯

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

১৯৫৯ সালে রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন জ্যারোস্লাভ হারোফস্কি। বলা হয়েছে, তাঁর আবিষ্কৃত পোলারোগ্রাফ পদ্ধতির জন্যে তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করা হলো। ১৮৯০ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ শহরে তাঁর জন্ম হয়। ১৯২২ সালে প্রাগ শহরের চার্লস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রাসায়নিক পদার্থের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের জন্যে পোলারোগ্রাফ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিন বছর পরে ১৯২৫ সালে এম. সিকাতার সঙ্গে তিনি এই পদ্ধতিকে স্বয়ংক্রিয় করবার ব্যবস্থা করেন। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের উদ্ভাবনে এই পদ্ধতি অনেক সহজ এবং অল্প সময়সাপেক্ষ হয়েছে। পরবর্তী কালে এই পদ্ধতির অনেক উন্নতি সাধিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এর ব্যবহার চলছে। হারোফস্কির পোলারোগ্রাফ পদ্ধতি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর দীর্ঘ সাধনার উপযুক্ত সম্মান দিয়ে সুইডিস নোবেল কমিটি বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধালাভ করেছেন সন্দেহ নেই তবু মনে হয়, এই সম্মান তাঁর আরও পূর্বে পাওয়া উচিত ছিল। সেদিনের যুবক বিজ্ঞানী আজ উনসত্তর বছরের কোঠায় পৌঁচেছেন। সময়মত এই পুরস্কার পেলে হয়তো তিনি আরও অনেক উৎসাহ পেতেন, হয়তো তাঁকে এত বাধার সম্মুখীন হতে হতো না। যাহোক তাঁর সম্মান লাভে চেকোস্লোভাকিয়ার মুখ আজ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কারণ এই সর্বপ্রথম ঐ দেশ নোবেল পুরস্কার লাভ করলো।

অধ্যাপক জ্যারোস্লাভ হারোফস্কির পোলারোগ্রাফ পদ্ধতির প্রয়োগে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের কি সুবিধা হয়েছে, সে সম্বন্ধে তাঁর বিস্তৃত আলোচনা ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনা প্রকাশিত হবার পর বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়।

কোন পদার্থকে জলে মেশালে সাধারণতঃ ঐ দ্রাবক জারক (অর্থাৎ অন্য দ্রব্যের সঙ্গে মিশে তার অক্সিজেনের অনুপাত বাড়িয়ে দেয়) অথবা বিজারক (অর্থাৎ অন্য দ্রব্যের সঙ্গে মিশে

অক্সিজেনের অনুপাত কমিয়ে দেয়) হয়ে থাকে। কিন্তু কোন রাসায়নিক পরিবর্তনের পূর্বে প্রত্যেক দ্রাবকের এক নিজস্ব বিশেষ বিদ্যুৎ-বিভবের প্রয়োজন হয়। মোটামুটি পোলারোগ্রাফ যন্ত্রের কাজ হচ্ছে, এই বিদ্যুৎ-বিভব পরিমাপ করা। স্বভাবতঃই কোন বিদ্যুৎ-বিভবের পরিমাপ করতে হলে বিদ্যুৎ-পথ, অর্থাৎ 'সার্কিট' রচনা করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে পোলারোগ্রাফ যন্ত্রে ক্যাথোড হিসাবে ব্যবহার করা হয় পড়ন্ত পারদ-বিন্দু, তাছাড়া দ্রবণ (electrolyte) এবং অ্যানোড থাকে। ধীরে ধীরে বাইরের বিদ্যুৎ-বিভবকে পরিবর্তন করানো হয় এবং বিদ্যুৎ-পথে প্রবাহিত বিদ্যুৎ-স্রোতের পরিমাপ নেওয়া হয়ে থাকে। কোন আয়নের উদ্ভব বা কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটলে বিদ্যুৎ-স্রোতে এক আকস্মিক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। এই আকস্মিক বৃদ্ধির সাহায্যে দ্রাবকের পরিচয় এবং দ্রবণে এর পরিমাণ বের করা যায়। এই হচ্ছে পোলারোগ্রাফ পদ্ধতির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

তড়িদ্দ্বারের (electrode) ব্যবস্থা নিম্নরূপ:—পূর্বেই বলেছি যে, ক্যাথোড হচ্ছে পড়ন্ত পারদ-বিন্দু। পারদবিন্দু যাতে ধীরে ধীরে সমভাবে পড়তে পারে, সেই উদ্দেশ্যে একটি কাঁচের পাত্রে পারদ ভর্তি করা হয়। ঐ পাত্রের একটি মুখ হচ্ছে কৈশিক নলের মত। ঐ কৈশিক নলের মুখ দিয়ে পারদবিন্দু ধীরে ধীরে পড়তে থাকে। অ্যানোড হচ্ছে, একটি পাত্রের তলায় রক্ষিত পারদ। অ্যানোডের পারদের পরিমাণ এবং বিশেষ করে তার অধিকৃত বর্গক্ষেত্র অধিক হওয়া প্রয়োজন, যাতে সবগুলি প্রক্রিয়ায় অ্যানোডের প্রভাব হয় নগণ্য। অতএব তড়িদ্দ্বারের ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশ হচ্ছে ক্যাথোড। বাইরে থেকে বিদ্যুৎ-বিভব প্রয়োগের সাহায্যে এই অ্যানোড ও ক্যাথোডের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিভবের সৃষ্টি করা হয়। স্বভাবতঃই বাইরের বিভবকে প্রয়োজনমত পরিবর্তন করবার জন্যে একটি বিভব-তার (Potentiometer wire) ব্যবহার করা হয়। আর বিদ্যুৎ-স্রোত পরিমাপ করবার জন্যে একটি গ্যালভ্যানোমিটার থাকে।

যে বৈদ্যুতিক সেলে ক্যাথোড ও অ্যানোড থাকে, সেখানে তড়িৎ-বিশ্লেষণের জন্যে রাখা হয় একটি বস্তুর দ্রবণ। ঐ দ্রবণের সঙ্গে থাকে আর একটি সহায়ক দ্রবণ। সহায়ক দ্রবণের প্রয়োজনীয় বিভব অনেক বেশী। সাধারণতঃ ক্ষারীয় ধাতুর লবণ এই কাজে ব্যবহৃত হয়। এই সহায়ক দ্রবণ নির্ণেয় বস্তুটিকে ক্যাথোডের নিকটবর্তী হতে বাধা দেয়, নতুবা ক্যাথোডে গোলযোগ ঘটলে সব পরীক্ষার ফল নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

শুধু সহায়ক দ্রবণ থাকলে বিভব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ-স্রোত বাড়তে থাকে। তারপর বিভব যখন সহায়ক দ্রবণে রাসায়নিক পরিবর্তনের উপযোগী হয় তখন ঐ বৃদ্ধি হয় অতি দ্রুত এবং আকস্মিক। শুধু সহায়ক দ্রবণ থাকলে যে বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়, তাকে বলা হয় অবস্থায়ী স্রোত (Residual current)। নির্ণেয় বস্তু দ্রবণে যোগ করলে সামান্য বিভব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ-স্রোত হঠাৎ খুব বেড়ে যায়। কিন্তু বিভব আরও বৃদ্ধি করলে বিদ্যুৎ-স্রোত সমপরিমাণই থাকে। তারপর ঐ বিভব যখন সহায়ক দ্রবণের পরিবর্তনের উপযোগী হয়, তখন বিদ্যুৎ-স্রোত আবার আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উপরিউক্ত সমপরিমাণ বিদ্যুৎ-স্রোত থেকে অবস্থায়ী স্রোত বাদ দিলে যে বিদ্যুৎ-স্রোত পাওয়া যায় তার ওঠা নামাই লক্ষ্য রাখা হয়।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, ক্যাথোডের পড়ন্ত পারদবিন্দুর গঠনে পরিবর্তন হবার দরুণ প্রবাহিত বিদ্যুৎ-স্রোতে তরঙ্গের মত ওঠা-নামা হয়ে থাকে। যাহোক, এই ওঠা-নামার দরুণ তরঙ্গের উচ্চতার পরিমাপ দ্রবণে নির্ণেয় বস্তুর পরিমাণের সঙ্গে সমানুপাতিক।

বিদ্যুৎ-স্রোতের তরঙ্গের উচ্চতার পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজনীয় বিভব কিন্তু কোন বস্তুর সঠিক বৈশিষ্ট্য নয়—কারণ দ্রবণে বস্তুর গাঢ়তা এবং ক্যাথোডের আকৃতির উপর তা নির্ভরশীল। হারোফস্কি ও ইল্‌কোভিক প্রমাণ করেছেন যে, তরঙ্গ-শীর্ষার্ধে যে পরিমাণ বিভবের দরকার তা বস্তুর গাঢ়তা বা ক্যাথোডের আকারের অধীন নয়। এই বিভবকে বলা চলে বস্তুর অর্ধ-তরঙ্গ বিভব।

১৯৩৪ সালে ইলকোভিক বিভিন্ন প্রভাবকে সম্মিলিত করে বিদ্যুৎ-স্রোতের পরিমাণ নির্ধারণ করবার জন্যে একটি সমীকরণ প্রতিষ্ঠিত করেন।

দ্রবণে অনেক সময় অক্সিজেন বর্তমান থেকে ছোট ছোট বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে। এর ফলে পরিমাপের অসুবিধা ঘটে। সে জন্যে নির্ণেয় বস্তুর গাঢ়তা বৃদ্ধি করা হয়। সময় সময় কিঞ্চিৎ সোডিয়াম সালফাইট ব্যবহার করেও অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস করা হয়ে থাকে।

দ্রবণে বিভিন্ন নির্ণেয় বস্তু থাকলে এবং তাদের তরঙ্গগুলি যদি পৃথক পৃথক দৃষ্ট হয়, তবে পৃথক তরঙ্গ-শীর্ষ থেকে তাদের পরিচয় ও গাঢ়তা আলাদা-ভাবে বের করা সম্ভব।

পোলারোগ্রাফ পদ্ধতির কয়েকটি বিশেষ সুবিধার বিষয় উল্লেখ করা হলো—

১। অতি সামান্য বস্তুর সাহায্যেই বিশ্লেষণ সম্ভব; কারণ, অতি অল্প গাঢ় দ্রবণেও কাজ করা যায় এবং দ্রবণের পরিমাণ বেশী না হলেও চলে।

২। অধিকাংশ মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৩। কেবল মৌলিক পদার্থই নয়, সঙ্কর ধাতু, বিভিন্ন ধাতব ও অজৈব পদার্থের বিশ্লেষণেও এই পদ্ধতির সাহায্য লওয়া হয়ে থাকে।

৪। জৈব পদার্থের বিশ্লেষণও সম্ভব।

৫। এই পদ্ধতি অনেক জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে সহজতর করেছে। কোন দ্রবণে যদি কোন বিরোধী বস্তুর অস্তিত্ব থাকে তবে অধিকাংশ সময় তাকে পরিস্রুত করবার প্রয়োজন হয় না, অধঃক্ষেপণের সাহায্যে তার পরিমাণ কিঞ্চিৎ কমিয়ে নিলেই হয়। এই ব্যবস্থায় অনেকটা সময় বাঁচানো চলে। তাছাড়া যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয় বলে সহজেই নির্ণেয় বস্তুর একটি স্থায়ী বিবরণ লাভ করা যায়।

৬। এই পদ্ধতিতে প্রবাহিত তড়িৎ-স্রোতের পরিমাণ খুবই কম; কাজেই একই পরীক্ষা বার বার করা চলে—তড়িৎ-পথের কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না।

৭। বিভিন্ন শিল্পে দ্রবণ পরীক্ষায় এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হারোফস্কির আবিষ্কৃত পোলারোগ্রাফ পদ্ধতি আজ পৃথিবীর সর্বত্র অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের গবেষণায় ব্যবহৃত হচ্ছে। কেবল তাই নয়, দিনের পর দিন এই পদ্ধতির উন্নতি সাধিত হচ্ছে। হারোফস্কির আবিষ্কারের পর চেকোস্লোভাকিয়ায় রাসায়নিক বিশ্লেষণে বিশেষ তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। অনেক বৈজ্ঞানিক এই অভিনব বিশ্লেষণের কাজে আত্মনিয়োগ করে যশস্বী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সিকাতা ও ইলকোভিকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রসায়ন শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে হারোফস্কির আবিষ্কার সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও জনসাধারণের নিকট তাঁর পরিচয় ও কীর্তি বিশেষ প্রচারিত নয়। নোবেল কমিটি তাঁকে আমাদের নিকট পরিচিত করে দিয়ে তাঁর উপযুক্ত সম্মান দিয়েছেন। চেকো-স্লোভাকিয়ার এই নবলব্ধ গৌরবে আমরা সবাই আনন্দিত।

পারমাণবিক চুল্লীর উপজাত পদার্থের সমস্যা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

পরমাণুর কেন্দ্র-বস্তুর বিভাজনের দ্বারা পারমাণবিক চুল্লী শক্তি উৎপাদন করে। বিভাজন হলেই চুল্লীতে খানিকটা উপজাত পদার্থ জমা হয়। ইউ-২৩৫ পরমাণু খণ্ডিত হলে উৎপন্ন হবে, মাঝারি ভরের বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ; যেমন—আয়োডিন, বেরিয়াম, ষ্ট্রনসিয়াম, জির্কোনিয়াম, সিজিয়াম, সিরিয়াম প্রভৃতি। এসব উপজাত পদার্থ যাতে চুল্লী থেকে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় এড়িয়ে না যায়, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। চুল্লীটি সাবধানতার সঙ্গে নির্মিত ও নিয়ন্ত্রিত হলে বিপজ্জনক দ্রব্যসমূহকে কিছুকাল চুল্লীতেই রাখা যায়। কিন্তু অবশেষে বিভাজিত কিংবা আংশিক বিভাজিত ইউরেনিয়াম অপসারণ করে নতুন ইন্ধন চুল্লীতে বোঝাই করতে হলে সঞ্চিত উপজাত পদার্থ দুরীভূত করা দরকার; নতুবা বিভাজনের শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম পৃথক করলে যাবতীয় উপজাত পদার্থের একটি মিশ্র দ্রব থাকে। এরূপ অবস্থায় তেজস্ক্রিয় উপজাত পদার্থ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করাই বিশেষ সমস্যা।

এক-একটি চুল্লীর দীর্ঘকাল যাবৎ পরিচালনার ফলে বিভাজন প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন অল্পকাল স্থায়ী অধিকাংশ তেজস্ক্রিয় পদার্থ চুল্লীতেই ক্ষয় পেয়ে যায়। দীর্ঘকাল স্থায়ী পদার্থগুলিই জমা হয়। কাজেই চুল্লী থেকে অপসারিত পদার্থগুলি যথেষ্ট তেজস্ক্রিয় হয় এবং এই তেজস্ক্রিয়তা থাকে অনেক কাল পর্যন্ত। এসব তেজস্ক্রিয় দ্রব্য অসাবধানে দুরীভূত করা মোটেই উচিত নয়। বিভিন্ন উপায়ে এই পদার্থগুলিকে নিরাপত্তার সঙ্গে মজুত রাখা যায়; যেমন—বিশেষভাবে নির্মিত ভূ-গর্ভস্থ চৌবাচ্চায় জমা রাখা যায়, কংক্রীটের বাক্সে বন্ধ করে সমুদ্রের তলায় ফেলে দেওয়া চলে কিংবা রকেটে রেখে আকাশে ছুঁড়ে দিলে তেজস্ক্রিয়তা কোনরূপ ক্ষতি না করে মহাশূন্যে ক্ষয় পেয়ে যায়। এসব প্রক্রিয়ায় অনেক টাকা খরচ হবে; কাজেই পারমাণবিক শক্তির মূল্যও বৃদ্ধি পাবে। যদি তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলিকে কোন প্রয়োজনীয় এবং নিরাপদ কাজে লাগাবার উপায় উদ্ভাবন করা যায়, তাহলে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা হয়। খানিকটা বিপদসঙ্কুল হলেও এসব উপজাত পদার্থ কোন কোন হিতকর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তেজস্ক্রিয় উপজাত পদার্থ থেকে গামা ও বিটা-রশ্মি বিকিরিত হয়। অনেক প্রকার প্রয়োজনেই এসব তেজস্ক্রিয়তার প্রয়োগ করা চলে; যেমন—জীবাণু ধ্বংস করা, ধাতুর আলোকচিত্র গ্রহণ করা, ঘনত্ব পরিমাপ করা, রাসায়নিক বিক্রিয়া ও অগ্নিশিখার গতিবেগ ত্বরান্বিত করা, বায়ু আয়নায়িত করা প্রভৃতি অনেক কাজ করা যেতে পারে। রঞ্জেন-রশ্মি, রেডিয়াম ও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দিয়ে যে সব কাজ করা সম্ভব, সে সব অনেক প্রয়োজনীয় কাজেই উপজাত পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা নিয়োগ করা চলে। উপজাত পদার্থের অধিকতর গুরুত্ব হলো এই যে, সেগুলিকে অনেক অধিক পরিমাণে এবং সুলভে পাওয়া যায়।

বিভাজন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন দ্রব্য গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তার দোসর তেজস্ক্রিয়তাবিহীন পদার্থের রীতিনীতি সর্বতোভাবে অনুকরণ করে; অর্থাৎ সব রাসায়নিক বিক্রিয়া সজীব দেহের ভিতরকার সব জটিল প্রক্রিয়া-সমূহে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ও তার দোসর সাধারণ পদার্থের আচরণ একই রকমের হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থকে সহজেই খুঁজে বের করা যায়।

তেজষ্ক্রিয়তার নিরাপদ মাত্রার দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও কম লঘুকৃত হলেও পদার্থটির সন্ধান পাওয়া যাবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যেমন জীবাণুর গঠন অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়েছে, তেমনি আবার সজীব পদার্থের রাসায়নিক কার্যকলাপ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

রঞ্জেন রশ্মির ন্যায় তেজষ্ক্রিয়তার সাহায্যেও সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হবে। ক্যান্সার রোগাক্রান্ত পেশীর অস্ত্রোপচার না করে তেজষ্ক্রিয়তার সাহায্যে তাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়তো অনেক সময় অধিকতর বাঞ্ছনীয় হতে পারে। তেজষ্ক্রিয়তার সাহায্যে এরূপ চিকিৎসা অভিনব। যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে তেজষ্ক্রিয় দ্রব্যাদি যথেষ্ট ফলপ্রদ হবে এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে।

এসব প্রয়োগ সত্ত্বেও উপজাত পদার্থের খুব সামান্য অংশই কাজে লাগে। অধিকন্তু জীববিদ্যায় প্রযোজ্য অধিকাংশ আবশ্যকীয় মৌলিক পদার্থই ইউরেনিয়াম বিভাজনের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। অবশ্য চুল্লীতে নিউট্রনের ক্রিয়ার সাহায্যে অনেক দরকারী বস্তু উৎপাদন করা যায়। কিন্তু ইউরেনিয়াম বিভাজনের দ্বারা প্রাপ্ত অংশসমূহের মধ্যে বোধ হয় কেবলমাত্র তেজষ্ক্রিয় আয়োডিনই শারীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে।

আরও বেশী উপজাত পদার্থ ব্যবহার করা যাবে শিল্পে। সে ক্ষেত্রে তেজষ্ক্রিয়তা অনেক রকম কাজ করবে। তেজষ্ক্রিয়তার সাহায্যে ধাতুর চাদরের ঘনত্ব স্বতঃই নিয়ন্ত্রিত হয়। যন্ত্রের ঘর্ষণজনিত ক্ষয়ের হার পরীক্ষা করা যায়। তেজষ্ক্রিয় দ্রব্যের ভেদকারী রশ্মির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে, ধাতুর অভ্যন্তরস্থ গলদ নির্ণয় করা। শিল্পে এর এতই প্রয়োজনীয়তা দেখা গেছে যে, রঞ্জেন-রশ্মি, রেডিয়াম কিংবা রেডিও-কোবাল্ট প্রভৃতি ঢালাই দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতির ত্রুটি পরীক্ষার জন্যে আজকাল প্রায়ই ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু উপজাত পদার্থ, বিশেষতঃ গামা-রশ্মি বিকিরণকারী সিজিয়াম-১৩৭ অধিকতর সুলভে একই কাজ করবে। রশ্মির দ্বারা শিল্পের আরও অনেক প্রকার উপকরণের আলোক-চিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই উপায়ে অধিকতর নিরাপদ এবং উৎকৃষ্ট, হাল্কা অথবা দৃঢ় সুলভ ধাতু ও ধাতব পদার্থ তৈরী করা যাবে।

বর্তমানে অন্ধকারে দীপ্যমান রং প্রস্তুত করা হয় রেডিয়াম কিংবা রেডিও-আইসোটোপ দিয়ে। কাজেই এগুলি মহার্ঘ। ষ্ট্রনসিয়াম-৯০-এর মত উপজাত পদার্থ ব্যবহার করলে রঙের দাম অনেক কম হবে। সস্তা হলে উজ্জ্বল রং অনেক কাজে, যেমন—থিয়েটার ও সিনেমা হলের বাইরে যাবার পথ-নির্দেশন, বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, পথ-চিহ্ন নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে নিয়োগ করা যাবে।

স্থির-বিদ্যুৎ অনেক শিল্পেই বিপজ্জনক বা বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, মুদ্রণের সময় কাগজের পাতের উপর স্থির-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার ফলে পাতগুলি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট কিংবা পরস্পর থেকে বিকৃষ্ট হয়। কোন বস্তুর উপর স্থির-বিদ্যুৎ উৎপাদন নিবারণ করবার একটি উপায় হলো চতুর্দিকের বায়ু আয়নায়িত করা। আয়নায়িত বায়ু উৎকৃষ্ট পরিবাহী বলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অপসারিত করে। রেডিয়াম কিংবা পোলোনিয়াম সমন্বিত স্থির-বিদ্যুৎ-নিবারক যন্ত্র এখন বাজারে পাওয়া যায়। রেডিয়াম কিংবা পোলোনিয়ামের পরিবর্তে ষ্ট্রনসিয়াম-৯০-এর ন্যায় উপজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করলে যন্ত্রের দামও অনেক কম হবে।

রাসায়নিক শিল্পে তেজষ্ক্রিয়তার দ্বারা অভিনব পদার্থ উৎপাদন করাও সম্ভব। বিটা ও গামা-রশ্মি অণুকে ভেঙ্গে বিক্রিয়াশীল অংশে পরিণত করে। এই অংশগুলি অভিনব অণু গঠন করে, যা আর কোন উপায়ে সংশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

আয়নসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে অগ্নিশিখা বিস্তৃত হয়। কাজেই আয়নায়িত করবার

ক্ষমতার জন্যে তেজস্ক্রিয় উপজাত পদার্থ দহনক্রিয়া ত্বরান্বিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার ফলে জেট এবং ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌সন ইঞ্জিনের বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তেজস্ক্রিয় দ্রব্যাদি সামান্য পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করতে পারে। বিশুদ্ধ বিটা-রশ্মি বিকিরণকারী দ্রব্যাদি বায়ুশূন্য কাচ-নলে রেখে দিলে বিটা-কণিকা, অর্থাৎ ইলেকট্রন মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনাত্মক বিদ্যুৎ জমা হবে। এই শক্তি আহরণ করা যায়। যদিও শক্তির পরিমাণ খুবই কম (প্রায় এক ওয়াট) হবে, তথাপি এই ব্যবস্থাটি নতুন ইন্ধন কিংবা রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই বহু বছর ধরে এরূপ শক্তি উৎপাদন করতে থাকবে। দূরবর্তী স্থানে স্থাপিত আবহাওয়া-নির্দেশকের মত যন্ত্র পরিচালন করবার জন্যে পূর্বোক্ত শক্তি-উৎপাদক যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে।

এসব প্রক্রিয়ায় শিল্পে অনেক অর্থ সঞ্চিত হয়েছে। নতুন পদার্থসমূহের ব্যবহার পদ্ধতি সম্বন্ধে যতই জ্ঞান হবে, সঞ্চয়ের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রক্রিয়াগুলি সংঘটিত হওয়ার সময় কিংবা পরে যেন কোন লোক আহত না হয়।

বোধ হয় সবচেয়ে বেশী তেজস্ক্রিয়তার দরকার হবে, খাদ্যদ্রব্যকে জীবাণুমুক্ত ও সংরক্ষণ করবার জন্যে। খাদ্যদ্রব্য জীবাণুমুক্ত করতে হলে সবগুলি জীবাণুকেই ধ্বংস করতে হবে। অনেক জীবাণুই তেজস্ক্রিয়া প্রতিরোধ করে। যদি সেগুলিকে পঞ্চাশ হাজার কিংবা ততোধিক রঞ্জেনে রাখা যায়, তবে সেগুলি ধ্বংস হবে। স্তন্যপায়ী জীবকে বিনাশ করতে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার দরকার, উপরিউক্ত সংখ্যাটি তার চেয়েও এক-শ' গুণ বেশী। এরূপ পার্থক্য আশ্চর্যজনক নয়। কারণ আহার্য পদার্থকে জীবাণুমুক্ত করতে হলে সব জীবাণুকে, এমন কি, তেজস্ক্রিয়া-প্রতিরোধক জীবাণুকেও বিনষ্ট করতে হবে। অধিকন্তু ক্ষুদ্র জীবাণু দৈবক্রমে তেজস্ক্রিয়তার আওতা থেকে এড়িয়ে যেতেও পারে। অপরপক্ষে, অত্যাবশ্যক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেটি সহজেই অভিভূত হয়, সেটি নষ্ট হলেই বৃহৎ জীবের প্রাণান্ত হবে। এরূপ অত্যধিক তেজস্ক্রিয়তার দরুণ খাদ্যদ্রব্য আক্রান্ত হতে পারে। কয়েক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, উত্তপ্ত কিংবা অত্যধিক ঠাণ্ডা করবার চেয়ে রশ্মির সাহায্যে জীবাণুশূন্য করবার ফলে আহার্য-সামগ্রীর অধিকতর বিকৃতি ঘটেছে। আবার এরূপ অবস্থাও অনেক হয়েছে যে, অন্যান্য প্রক্রিয়ার চেয়ে তেজস্ক্রিয়াতেই অবাঞ্ছিত ফল পাওয়া গেছে।

টোম্যাটো, আপেল, নেবু, তরমুজ, আঙ্গুর, ডিম প্রভৃতি টাট্‌কা খাদ্যদ্রব্যের উপরিভাগ তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করবার পর সেগুলিকে আর ঠাণ্ডা না করলেও চলে। রশ্মির সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করে শাকসব্জী কয়েক দিন উন্মুক্ত রাখলেও নষ্ট হবে না।

কোন কোন ওষুধ উত্তপ্ত করে জীবাণুমুক্ত করলে তাদের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই বর্তমানে অ্যাণ্টিবায়োটিক্সের মত ওষুধ, রক্ত, অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধীয় পটি এবং ভ্যাক্‌সিন তৈরী ও নাড়াচাড়া করতে ব্যয়সাধ্য উপায় অবলম্বন করতে হয়। তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে সাধারণ তাপমাত্রায় জীবাণুমুক্ত করে সেগুলিকে সহজভাবেই ধরাছোঁয়া যাবে।

কৃষিজাত দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্যে তেজস্ক্রিয়া ব্যবহৃত হতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি নির্বীজনের মত দুঃসাধ্য হবে না। মারাত্মক কীট-পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং সংরক্ষিত বীজের অঙ্কুরোদ্গম নিবারণ করতে পারলে কৃষিকার্যে অনেক সুফল পাওয়া যাবে। নির্বীজন প্রক্রিয়ার অনুপাতে এক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তার দরকার হবে শতাংশের এক ভাগ মাত্র। এরূপ সামান্য তেজস্ক্রিয়ার দরুণ আহার্য দ্রব্যাদি বিশেষ বিকৃত হবে না। কিন্তু এই ব্যবস্থায় অনেক

বেশী উপাদান তেজস্ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত করতে হবে। কাজেই অনেক বেশী উপজাত পদার্থ নিয়োগ করতে হবে। অধিক উপজাত পদার্থ ব্যবহার করবার সময় যথেষ্ট সাবধান হতে হবে, যাতে তেজস্ক্রিয় দ্রব্য অসাবধানভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হয়।

ভবিষ্যতে উপজাত পদার্থ প্রজননের ব্যাপারে যথেষ্ট কার্যকরী হতে পারে। তেজস্ক্রিয়া এরূপ পরিবর্তন প্রবর্তন করে। যাঁরা পশুপক্ষী কিংবা গাছপালার মধ্যে প্রজননের ব্যবস্থা করেন, তাঁদের নিকট তেজস্ক্রিয়তা খুবই কার্যকরী হবে। বহুদিন যাবৎ এরূপ কৃত্রিম পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। কিন্তু যাঁরা প্রজনন-বিদ্যা অনুশীলন করেন তাঁরা এই কাজের জন্যে এখন পাবেন একপ্রকার সরল ও সুলভ যন্ত্র। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কেবল যোগ্য এবং দায়িত্ব-পূর্ণ ব্যক্তিই যেন তেজস্ক্রিয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করেন। ঔষুধ-বিক্রেতা বিপজ্জনক বিষ বিতরণ করেন। চিকিৎসক এবং জীববিদ্যাবিদ্ তাঁদের গবেষণাগারে মারাত্মক জীবাণু উৎপাদন করেন। এ সবই করা হয় যথেষ্ট নিরাপত্তার সঙ্গে জনকল্যাণের জন্যে। তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার অধিকতর নিরাপদ হবে, কারণ সহজেই তেজস্ক্রিয় দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু বিষ কিংবা জীবাণু দেহাভ্যন্তরে হারিয়ে গেলে খুঁজে বের করা মুস্কিল। খড়ের স্তূপে সূচ হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া সহজ হয় না; কিন্তু সূচটি তেজস্ক্রিয় হলে খুঁজে পাবার সম্ভাবনাই বেশী। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে তেজস্ক্রিয় উপজাত পদার্থের সমস্যা আরও যোগ্যতার সঙ্গে সমাধান করা হবে।

প্রকৃত সমস্যা হবে, ক্রিপটনের মত দীর্ঘকাল স্থায়ী বায়বীয় পদার্থের ব্যাপারে। ক্রিপটনের অর্ধজীবন হলো ১০'৪ বছর। এরূপ বায়বীয় পদার্থকে কোন বস্তুর সঙ্গে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় না। একে ছেড়ে দেওয়াও মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। নিম্ন তাপমাত্রায় কিংবা উচ্চ চাপে মজুদ করতেও অনেক খরচার দরকার।

বিজ্ঞান-বার্তা

বিমানে ঘণ্টায় হাজার হাজার মাইল অতিক্রমের ব্যবস্থা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেল এয়ারক্র্যাফট কর্পো-রেশনের চেয়ারম্যান প্রকাশ করেছেন যে, আগামী ২০ বছরের মধ্যেই পি. জী. ব্যাক প্লেন নামে অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন দূরপাল্লার জেট বিমান ও রকেট বিমানের সমন্বয়ে নতুন এক ধরণের বিমান তৈরী হবে। জেট বিমানখানি আকাশের ২০ মাইল উপর অবধি একটি রকেট প্লেনকে নিয়ে যাবে। রকেট বিমানের পাখাদুটিতে ৩০ জন যাত্রীর বসবার ব্যবস্থা থাকবে। ২০ মাইল উর্ধ্বে গিয়ে রকেট বিমান আর জেট বিমান আলাদা হয়ে যাবে। তারপর ঐ বিমান তার যাত্রীদের নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে গন্তব্য স্থলে গিয়ে পৌছাবে।

পাঁচ হাজার বা তারও বেশী দূরবর্তী স্থান অতিক্রম করতে হলেই এ-ধরণের বিমান ব্যবহৃত হবে।

দুধ সংরক্ষণের উপায়

আমেরিকার উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গব্য-শালা বিভাগীয় জনৈক বিজ্ঞানী কয়েক মাস পর্যন্ত দুধ টাট্‌কা রাখবার এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। এই পন্থায় প্রথমতঃ কাচা দুধ যান্ত্রিক উপায়ে জীবাণুমুক্ত করে মাখনের সঙ্গে ভাল করে

মিশানো হয়। দুধের উপকরণের শতকরা ৩৬ ভাগ যাতে বজায় থাকে, সেভাবে জ্বাল দিয়ে দুধ ঘন করা হয়। সেই দুধ টিনের কৌটায় ভর্তি করে আবার গরম করবার পর হিমায়িত করা হয়। এই দুধ অন্ততঃ তিন মাস থেকে সাড়ে তিন মাস পর্যন্ত টাট্‌কা থাকে—দুধের গন্ধটুকুও নষ্ট হয় না।

সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিণত করবার ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিভাগ টেক্‌সাসের ফ্রী-পোর্টে সমুদ্র-জলকে পানীয় জলে রূপান্তরিত করবার উদ্দেশ্যে নতুন একটি কারখানা তৈরী করেছেন। ওখানে বাষ্পীভূত করবার সাধারণ প্রক্রিয়ায় সমুদ্র-জলকে প্রতিদিন ১,০০০,০০০ গ্যালন পানীয় জলে পরিণত করা হবে।

মেক্সিকো উপসাগরের প্রতি-হাজার গ্যালন জলকে এভাবে পানীয় জলে পরিণত করবার খরচ পড়বে এক ডলার। এই ধরণের পাঁচটি কারখানা যুক্তরাষ্ট্রে স্থাপন করা হবে। সমুদ্র-জল উত্তপ্ত করবার বয়লার ও ঠাণ্ডা করবার যন্ত্র কনডেনসারে অতি কঠিন ধাতব বস্তু জমা হয়ে থাকে এবং পাত্র-গুলিও ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই নতুন প্রক্রিয়ায় এই ধরণের কোন ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

হৃদ্‌রোগের চিকিৎসায় পরমাণু-শক্তি

হৃদ্‌রোগে অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটে। কখন যে তার আক্রমণ হবে, কেউ বলতে পারে না, যদিও বাইরে থেকে তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে হয়।

বর্তমানে আমেরিকার ফিলিপ জনসন ও গুনার সিভিলিয়াস নামে ওকলাহোমার দু-জন চিকিৎসক পরমাণু-শক্তির সাহায্যে আপাতপ্রতীয়-মান সুস্থ ব্যক্তিদের হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা, তাদের রক্ত-প্রবাহের মাত্রা নিরূপণ করবার একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় ঐরূপ ব্যক্তির রক্তের সঙ্গে অতি সামান্য পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বস্তু মিশিয়ে দেওয়া হয়। কি রকম গতিতে এই বস্তুটি হৃদ্‌যন্ত্রের দিকে যায়, তা তেজস্ক্রিয় বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের কাউণ্টার যন্ত্রটি দিয়েই নিরূপণ করা হয়। এভাবে রক্তপ্রবাহের মাত্রা জানা যায় এবং হৃদ্‌যন্ত্রটি যে কেমন আছে, তাও নিরূপণ করা হয়। হৃদ্‌রোগে রক্তপ্রবাহের মাত্রা বৃদ্ধির জন্যে নাইট্রোগ্লিসারিন এবং পেরিট্রে নামক ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এ-সব ওষুধের কার্যকারিতা কতখানি এবং কিভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে, তার মাত্রা নিরূপণ করা হয় নি। চিকিৎসক এ-সব ওষুধের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে রোগীর রক্ত-প্রবাহের মাত্রা নিরূপণ করতে সক্ষম হন।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে বর্তমানে যে প্রক্রিয়ায় রক্ত-প্রবাহের মাত্রা নিরূপণ করা হয়, যাদের হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল সেই সব রোগীর পক্ষে তা অনেক সময়েই মারাত্মক হয়ে পড়ে। এতে রক্তবহা নাড়ীর মধ্য দিয়ে একটি নল হৃদ্‌যন্ত্র পর্যন্ত প্রবেশ করানো হয়।

বর্তমান প্রক্রিয়ায় রোগীর কোন রকম ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই। পরীক্ষামূলকভাবে ১১১ জন চিকিৎসকের উপর এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে তাদের ৮ জন যে হৃদ্‌রোগে ভুগছেন, সে কথা সুস্পষ্টভাবে জানা সম্ভব হয়েছিল। এই আট জনের মধ্যে চার জনের হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। এভাবে ধরা পড়বার আগে তাঁরা তা জানতেন না। এই পরীক্ষা ঠিক এক্স-রে'র পরীক্ষার মতই সহজ এবং বারে বারেই করা যেতে পারে—কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না।

ভারত মহাসাগরে তথ্যানুসন্ধানী মার্কিন জাহাজ আর্গো

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ক্রিপ্‌স্ ইনষ্টি-টিউশনের আর্গো নামে বিবিধ যন্ত্রপাতি সমন্বিত বৃহত্তম সমুদ্র-তথ্যানুসন্ধানী জাহাজটিকে ভারত মহাসাগরে পাঠানো হচ্ছে। এতে থাকবে ৬ টনের

একটি ক্রেন, আর ৪৫ হাজার ফুট ক্যাবল-এর সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতম স্থানে পৌঁছানো যাবে। তাছাড়া সমুদ্রের গভীরতা মাপবার জন্যে প্রিসিশন ডেপথ্-রেকর্ডার এবং সমুদ্রের গভীরে প্রতিধ্বনি নিরূপণের জন্যে ডিপ ওয়াটার-একো-সাউণ্ডার প্রভৃতি যন্ত্রপাতিসহ এতে তিনটি গবেষণাগার থাকবে এবং ২৪ জন মার্কিন বিজ্ঞানী তথ্যানুসন্ধানে অংশ গ্রহণ করবেন।

নিম্নলিখিত ১৬টি রাষ্ট্রের ২০টি জাহাজ এবং বিজ্ঞানীরা ভারত মহাসাগর সম্পর্কে এই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করছেন—অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মেনী, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, তাইওয়ান, ডেনমার্ক, ইসরাইল এবং নেদারল্যাণ্ডস।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লেমণ্ট জিওলোজিক্যাল অবজারভেটরীর বীমা নামে আর একটি জাহাজ ভারত মহাসাগরে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছে।

চক্ষু চিকিৎসার অভিনব যন্ত্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক চিকিৎসক, যে সব চোখের চিকিৎসার ব্যাপারে শল্য-চিকিৎসায় বিপদের সম্ভাবনা আছে তাথেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে একপ্রকার অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এই যন্ত্রটির নাম লাইট কোয়েগুলেটার।

যে সব ছেলেমেয়ে চোখের রেটিনার উপর টিউমার হবার ফলে কষ্ট পায়, তাদের টিউমারের উপর ঐ যন্ত্র থেকে তীব্র আলোক নিক্ষেপ করে সেটিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। এর ফলে রেটিনার উপর যে গর্ত হয়ে থাকে, তাও এই প্রক্রিয়ায় ভর্তি করা যায় এবং যে সব কোমল ঝিল্লী বা মেমব্রেন দৃষ্টিশক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলিকে নষ্ট করে ফেলা হয়।

ফিল্টারের মধ্য দিয়ে অতিবেগুনী রশ্মি প্রক্ষেপের ফলে চোখের কোন ক্ষতি হয় না। ওহিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ উইলিয়াম এইচ. হ্ভনার এর উদ্ভাবক।

পরমাণুর গঠন সম্পর্কে যুগান্তকারী মতবাদ

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানী ডাঃ লয়েড মৎজ আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মধ্যে যে ফাঁকটুকু ছিল—যার সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় নি, তার সন্ধান দিয়ে বিজ্ঞান-জগতে বিস্ময় উৎপাদন করেছেন। পরমাণু যে ইলেকট্রন ও প্রোটন নিয়ে গঠিত, তিনি তাদের গঠন সম্বন্ধে বিস্ময়কর তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইলেকট্রন ও প্রোটন হচ্ছে অভিকর্ষ বা গ্র্যাভিটির সমষ্টি। এই অভিকর্ষের জন্যেই প্রোটন ও ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। এই অভিকর্ষ-শক্তিই এদের ধরে রাখে। কিন্তু এসব অতি ক্ষুদ্র কণার মধ্যে প্রচণ্ড অভিকর্ষ-শক্তির যে ক্ষেত্র তৈরী হয়, তাকে নিউটনের মতবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

ছ'শ কোটি আলোক-বর্ষ দূরের নক্ষত্রের আলোকচিত্র

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্রেট মাউণ্ট প্যালোমার টেলিস্কোপের সাহায্যে ছ'শ কোটি আলোক-বর্ষ দূরের একটি নক্ষত্রের আলোক-চিত্র গ্রহণ করেছেন। আজ পর্যন্ত এত দূরের কোন নক্ষত্রের আলোকচিত্র গ্রহণ সম্ভব হয় নি। এর আগে দু'শ কোটি আলোক-বর্ষ দূরের নক্ষত্রের আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হয়েছিল।

সমুদ্রগর্ভ থেকে গন্ধক উত্তোলন

লুইসিয়ানার উপকূল থেকে সাত মাইল দূরবর্তী মেক্সিকো উপসাগরে আমেরিকার ফ্রি-পোর্ট সালফার কোম্পানী সমুদ্রগর্ভের গন্ধক উত্তোলনের জন্যে সমুদ্রের উপরে মাইলখানেক দীর্ঘ একটি প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ করেছেন।

ইস্পাতের খুঁটার উপরে তৈরী এই প্ল্যাটফর্মে যে সব যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছে, তাতে সমুদ্রের জল উত্তপ্ত করা হয়। সেই প্রচণ্ড গরম জল গন্ধক উত্তোলনের কূপসমূহে ঢেলে দেওয়া হয়। তাতে গন্ধক গলে গিয়ে উপরে ভেসে উঠে।

বন্ধ্যাত্বের কারণ নির্ণয়

বোম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও ইণ্ডিয়ান ক্যান্সার রিসার্চ সেণ্টারের পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত গবেষণা বিভাগের অধিকর্তা ডাঃ শান্তা রমা রাও সহ আমেরিকা ও নেদারল্যাণ্ডস-এর ছয় জন বিজ্ঞানীর চেষ্টায় বন্ধ্যাত্বের অন্যতম কারণ নির্ণীত হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজী, রকফেলার ইনষ্টিটিউটের পপুলেশন কাউন্সিল, টাইলার ক্লিনিক, নেদারল্যাণ্ডস-এর সেনট্রাল রেডক্রশ লেবরেটরী এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলের বিজ্ঞানীরা এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বিজ্ঞানীরা এই গবেষণার ফলাফল ফ্লোরিডার নিয়ামি বীচে অনুষ্ঠিত আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশনে প্রকাশ করেন।

তাঁরা বলেছেন, দম্পতিদের স্বাস্থ্য বাইরে থেকে অতি উত্তম বলে মনে হলেও তাঁদের মধ্যে কারো কারো দেহে এমন একটি বস্তু জন্মে, যার জন্যে তাঁদের পক্ষে সন্তান লাভ সম্ভব হয় না। এই বস্তুটি পুরুষের সুস্থ শুক্রকীট এবং স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষের উপরিভাগে লেগে থাকে। এই বস্তুটির জন্যে ঐ সব দম্পতির দেহে প্রচুর পরিমাণে অতিশয় শক্তিশালী রাসায়নিক দ্রব্য জন্মে। ঐ সব রাসায়নিক দ্রব্য কেবল ঐ অবাঞ্ছিত আচ্ছাদনকেই নয়, শুক্রকীট এবং ডিম্বকোষকেও সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে ফেলে।

দেহজাত বস্তুর দ্বারা দেহের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রাণীদের নিয়ে এই সম্পর্কে গবেষণা করে এই ধরণের অটো-ইমিউনাইজেশনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ-সব ক্ষেত্রে কোন কোন দেহজাত বস্তুর উচ্ছেদ সাধনের জন্যে দেহের মধ্যেই সংগ্রাম বাধে, তবে সেটা প্রাণঘাতী হয় না।

অটো-ইমিউনাইজেশনকে ভিত্তি করেই এই বিষয়ে গবেষণা চালানো হয়।

গত শতাব্দীতে বিজ্ঞানী জেনারই প্রথম ইমিউ-নাইজেশন বা টীকা নেওয়ার তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি জাত বসন্তের টীকার উদ্ভাবক। বসন্ত, কলেরা, শিশু পক্ষাঘাত বা পোলিও রোগের ভাইরাস ও রোগ-জীবাণু জীবদেহকে সহজে আক্রমণ করতে পারে না—যদি ঐ রোগ-জীবাণু জীবের দেহে অল্প পরিমাণে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এতে তার ঐ রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা জন্মায়। এই হলো ইমিউনাইজেশন বা টীকা নেবার গোড়ার কথা। দেহের মধ্যেই যে রোগ-প্রতিরোধক শক্তি জন্মায়, তাকে বলা হয় অটো-ইমিউনাইজেশন।

অতি অল্প সংখ্যক বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদের রক্তে ও পুরুষের শুক্রে বিজ্ঞানীরা এই অটো ইমিউনাইজে-শন যে বস্তুর জন্যে হয়ে থাকে, তার সন্ধান পেয়েছেন।

তাঁরা বলেন, বন্ধ্যাত্বের এই কারণ দূর করা সম্ভব এবং কৃত্রিম উপায়ে এই ধরণের প্রতিরোধী বস্তু প্রস্তুত ও প্রয়োগ করে সাময়িকভাবে জন্ম-নিরোধ করা সম্ভব হতে পারে।

কুমেরু-অঞ্চলে পরমাণু থেকে শক্তি উৎপাদনের আয়োজন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬২ সালের প্রথম ভাগে কুমেরুর ম্যাকমুরডো সাউণ্ড এলাকায় বয়েলিং ওয়াটার রিয়্যাক্টরের সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনা করেছেন। বহনযোগ্য এই রিয়্যাক্টরে ১৫০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে।

পারমাণবিক ইন্ধনের সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তি

উৎপাদনের সুবিধা এই যে, ডিজেল ইঞ্জিনের সাহায্যে শক্তি উৎপাদন করতে হলে, ঐ দূরাঞ্চলে নিয়মিতভাবে যে সব ইন্ধন বয়ে নিয়ে যেতে হয় এতে তার প্রয়োজন হয় না।

তৈল-শোধনের ক্ষুদ্রাকৃতি যন্ত্রপাতি

আমেরিকার উইচিটার একটি ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান তৈল-শোধন করবার একটি অতি ক্ষুদ্র ও অভিনব যন্ত্রপাতি সমন্বিত কারখানা তৈরী করেছেন। এসব যন্ত্রপাতির মোট ওজন হচ্ছে মাত্র ১৫ টন। ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে কারখানাটি চালু করা হয়। এই ক্ষুদ্র কারখানার প্রতিদিনের তৈল উত্তোলনের ক্ষমতা হলো ২০০ ব্যারেল বা ৭২০০ গ্যালন। এই ধরণের কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি মোটর ট্রাকে করেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। যেখানে পরিবহনের অসুবিধা রয়েছে এবং যাতায়াতের এই অসুবিধার দরুণ অল্প খরচে অন্যান্য স্থান থেকে তৈল সংগ্রহ করে বৃহৎ শোধনাগারসমূহে তৈল প্রেরণ করতে পারেন না, তাদের পক্ষে এই ধরণের কারখানা বিশেষ কাজে লাগবে।

ধাতুর বদলে প্লাষ্টিক

যুক্তরাষ্ট্রে বহু বছরের গবেষণার পর ডেলরিন নামে এক ধরণের খুব শক্ত প্লাষ্টিক তৈরী হয়েছে। এই জিনিষটিকে ইস্পাত, পিতল, দস্তা ও অ্যালুমিনিয়ামের বদলে ব্যবহার করা যেতে পারে। আণবিক গঠন প্রণালীই হলো এই ধরণের থার্মোপ্লাষ্টিকের বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন আকারের জিনিষ এতে তৈরী হতে পারে।

সাধারণ গৃহ-নির্মাণ

শ্রীশঙ্করনাথ মিত্র

প্রত্যেকেরই ইচ্ছা হয় নিজের বাড়ীতে বাস করতে। কারণ সেটা হলো নিজের বাড়ী এবং নিজের অভিরুচি অনুযায়ী গৃহাদি নির্মিত।

এই গৃহ-নির্মাণের কৌশল সকলের পক্ষেই জানা সম্ভব নয়; কাজেই ধনী বা ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা গৃহ-নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে গৃহ-নির্মাণ করে থাকেন। তবে যারা ছোটখাটো দু-এক খানা কোঠা নির্মাণ করবেন, তাদের পক্ষে এই ব্যয়বহুল পরামর্শ নেওয়া সম্ভব নয়। সে জন্যে মধ্যবিত্তেরা অনেক সময়েই মিস্ত্রীদের পরামর্শে ও তাদের তত্ত্বাবধানে কাজ করান। কিন্তু এর ফলে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, সে পরিমাণে সুষ্ঠুভাবে কাজ পাওয়া যায় না। কিন্তু রাজমিস্ত্রীরা সাধারণতঃ কোন কাজেরই প্রকৃত কারণ ও প্রকৃত নিয়মাবলী জানে না। সে জন্যে বাড়ী তৈরীর কতকগুলি নিয়মাবলী জানা থাকলে যে কোন লোক নিজেই ছোটখাটো বাড়ীর সব কাজ সুষ্ঠুভাবে তদারক করতে পারেন।

(১) বাড়ীর বুনিয়াদ বা ভিৎ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বাড়ীর ভিৎ বাড়ীর উচ্চতার অনুপাতে কম হলে দেয়ালে ফাটল ধরবে, আবার বুনিয়াদ বেশী হলে অযথা খরচ বেড়ে যাবে। ভিতের গভীরতা বাড়ীর উচ্চতার উপর নির্ভর করে। যত ফুট উঁচু বাড়ী হবে তার $\frac{1}{১০}$ ফুট + ১ ফুট হবে জমি থেকে ভিতের গভীরতা। ভিতের প্রশস্ততা নির্ণয় করতে হলে সাধারণতঃ একতলার দেয়ালের প্রশস্ততার দ্বিগুণের সঙ্গে ১ ফুট যোগ করতে হবে।

অর্থাৎ একটি দ্বিতল বাড়ীর উচ্চতা যদি ২০′

ফুট হয়, তবে তার বুনিয়াদের গভীরতা হবে ২০×$\frac{১}{১০}$+১=৩ ফুট এবং ঐ বাড়ীর একতলার দেয়ালের প্রশস্ততা যদি ১৫" ইঞ্চি হয় হবে তার বুনিয়াদের প্রশস্ততা হবে ১৫"×২+১ ফুট=৩' ফুট ৬" ইঞ্চি।

(২) বুনিয়াদের প্রশস্ততা ও গভীরতা অনুসারে মাটি কেটে অল্পবিস্তর দুর্মুজ করতে বা পেটাতে হয়। এই মাটির উপর একবার ঝামা-ইট সাজিয়ে চুন, সুরকী ও ঝামা-খোয়ায় মিশ্রিত কংক্রীট ঢেলে দিতে হয়। সাধারণতঃ এই কংক্রীট আট

(৩) বুনিয়াদের ইট গাঁথবার সময় চুন-মিশ্রণের উভয় দিক থেকে ৬" করে বাদ দেবার পর এমন ভাবে ইটের ধাপ ঠিক করে নিতে হবে যেন উপরের সকল চাপ ৪৫° কোণ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারে। সাধারণতঃ দু-বার ইট গেঁথে উভয় দিক থেকে ২$\frac{১}{২}$" বাদ দিয়ে আবার দু-বার ইট গেঁথে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত ঘরের ঠিক নীচে যেন ঘরের দেয়ালের চেয়ে ৫" ইঞ্চি বেশী চওড়া হয়।

(৪) উপরের দেয়াল যাতে জলসিক্ত না হয়, সে জন্যে $\frac{১}{২}$"–$\frac{৩}{৪}$" সাইজের পাথরের টুকরার ৪
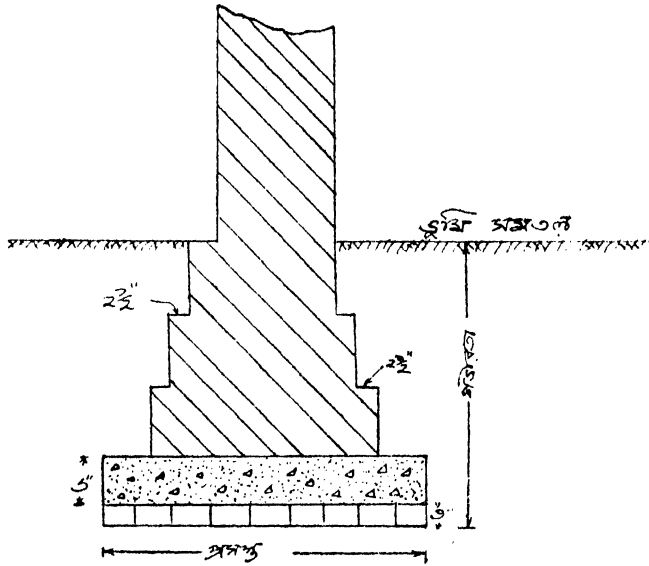
১। দেয়ালের বুনিয়াদের লম্বা ছেদন।

ইঞ্চি পুরু করে ঢালবার পর ঠিকমত ১০ বা ১২ পাউণ্ডের দুর্মুজ ব্যবহার করলে ছয় ইঞ্চি হয়ে যায়। এই চুন, সুরকী ও খোয়া ১৮ : ৩৬ : ১০০ (১৮ ভাগ চুন, ৩৬ ভাগ সুরকি ও ১০০ ভাগ ১"–১$\frac{১}{২}$" সাইজের ঝামা-খোয়া) অনুপাতে মিশ্রিত করা হয়। অনুপাতমাফিক চুন ও সুরকি আগে ভালভাবে মিশ্রিত করবার পর ঝামা-খোয়ার সঙ্গে মিশিয়ে তবে জল দিতে হয়। এই মিশ্রণ জায়গা মত ঢালবার পর চুন-জল ছিটিয়ে পাঁচ দিন পর্যন্ত দুর্মুজ করা দরকার।

ভাগের সঙ্গে ২ ভাগ বালি ও ১ ভাগ সিমেণ্ট ও ৪$\frac{১}{২}$ গ্যালন জল দিয়ে পূর্বোক্ত আনুপাতিক মিশ্রণ ১" পুরু করে মেঝের সমান ইটের বুনিয়াদের উপর ঢেলে দিতে হয়। এই মিশ্রণের সঙ্গে সিমেণ্টের ওজনের ৩% "সিকো" দিলে মিশ্রণের সচ্ছিদ্রতা অনেক কমে যায়। এই ঢালাইকে সিক্ততা-প্রতিষেধক স্তর বলে। এই সিক্ততা-প্রতিষেধক স্তরের অভাবে দেয়াল জলসিক্ত হয়; ইটে সহজে নোনা লাগে এবং বাড়ীর সৌন্দর্য অচিরে নষ্ট হয়ে যায়।

(৫) সিক্ততা-প্রতিরোধক স্তর ঢালবার পাঁচ-ছয় দিন পরে ইটের কাজে অগ্রসর হওয়া যায়। এই সময় দরকারমত দরজা ও জানালা বসানো প্রয়োজন। ইট গাঁথবার সময় দেখতে হবে, সেগুলি ভালমত ভিজানো হয়েছে কিনা। ইট ভালমত ভিজানো হলে তার নোনা পদার্থ অনেকটা ধুয়ে বের হয়ে যায় এবং মিশ্রণের সঙ্গে ইটের বন্ধন-শক্তির সহায়তা করে। সাধারণতঃ ১০" বা তারও বেশী চওড়া দেয়ালের জন্যে ১ : ৬ (১ভাগ সিমেণ্ট ও ৬ ভাগ বালি) অনুপাতিক মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। দেবার ফলে তার মধ্য দিয়ে উপরের চাপ প্রত্যেক দেয়ালে সমতা বজায় রাখে এবং দরজা, জানালার উপরের চাপ পার্শ্ববর্তী দেয়ালে পরিচালিত করে।

(৭) দেয়াল যখন লিনটেলের উপর থেকে ছাত অবধি ওঠে, অর্থাৎ দেয়ালের উচ্চতা যখন সিক্ততা-প্রতিরোধক স্তর থেকে ১০-১০½ ফুট ওঠে তখন ছাত ঢালাই করা দরকার হয়ে পড়ে। আজকালকার লোহা-কংক্রীটের ঢালাই ছাত করতে হলে কি পরিমাণ ও কি সাইজের লৌহদণ্ডের প্রয়োজন, তা জানা দরকার।

২। ছাত ও দেয়ালের লম্ব-ছেদ।

৫" ও ৬" দেয়ালের জন্য ১ : ৪ ভাগের মিশ্রণ প্রতি ৪-৬ স্তর ইট গাঁথবার পর একবার লোহার জাল দেওয়া প্রয়োজন। এই জাল দেবার ফলে পাতলা দেয়াল সুসংবদ্ধ হয়।

(৬) ইটের কাজ যখন দরজার সমান হয়ে ওঠে, তখন সমস্ত দেয়ালের উপর দিয়ে ৪"-৬" ইঞ্চি পুরু লোহা-কংক্রীটের ঢালাই করা হয়। এই ঢালাই-করা বস্তুকে লোহা-কংক্রীটের ঢালাই লিনটেল (R. C. Lintel) বলে। এই লিনটেল

ছোটখাটো ঘর, যেমন ১০'-০" × ৯'-০" বা তার চেয়ে ছোট ঘরের ছাতে কোন প্রকার কড়ি-বরগার প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র ৩"-৪" ইঞ্চি পুরু কংক্রীট করলেই চলবে। ঘর যত বড় হবে, বরগাও তত ব্যবহার করতে হবে। ঘরের দৈর্ঘ্যকে সমান কয়েক ভাগে ভাগ করে বরগা ব্যবহার করা হয় ১৬'-০" × ১০'-০" বা ১৫'-০"-× ১০'-০" আকারের ব্যবহারযোগ্য একটি বড় ঘরে

দৈর্ঘ্যের ঠিক মধ্যে ৭″×৫″ আকারের কংক্রীটের বরগা ব্যবহার করা হয়। এসব মাপের ঘরের ছাতে ৩/৮″ ব্যাসের আসল লৌহদণ্ড ও ১/৪″ ব্যাসের প্রসারিত লৌহদণ্ড ব্যবহার করা হয়। আসল লৌহদণ্ড ব্যবহারের সময় অনেকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। ঘরের চওড়ার দিকে বা বরগা-ব্যবহৃত ঘরে বরগার সমকোণে আসল লৌহদণ্ড ব্যবহৃত হয়। বরগা ও দেয়াল বা দুই বরগা বা ছোট ঘরের চওড়ার দূরত্বকে ফাঁক বা 'স্পেস' বলে। আসল লৌহদণ্ডকে '৬×ব্যাস-এর সমান করে অগ্রভাগ বড়শীর মত বাঁকিয়ে দেওয়া হয়। পরে দণ্ডের উপরে ও নীচে ১/২″ বেশী হয়; অর্থাৎ ৩″ ছাতের জন্যে আসল লৌহদণ্ডের উপরিভাগ ও নিম্নভাগ দু-ইঞ্চির বেশী না হয়। এই আসল লৌহদণ্ডের পরস্পরের দূরত্ব যেন ৪″-৬″ ইঞ্চির মধ্যে থাকে।

প্রসারিত লৌহদণ্ডের প্রান্তদ্বয় বক্র করা হয় এবং সেটা আসল লৌহদণ্ডের এক সমকোণে অবস্থান করে। এদের পরস্পরের দূরত্ব ৬″—১০″ ইঞ্চির মধ্যে থাকে।

৩নং চিত্রে আসল ও প্রসারিত লৌহদণ্ডের অবস্থান দেখানো হলো।

ঘরে যদি কোন ঢালাই বরগার প্রয়োজন হয়,
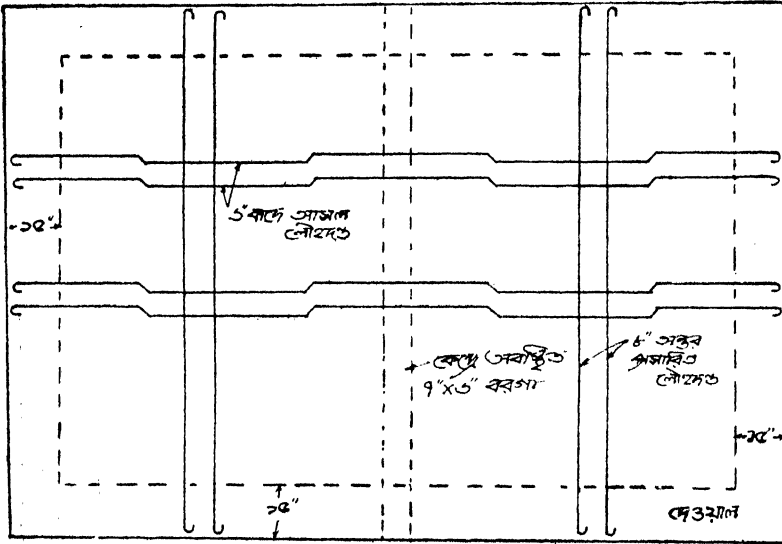
৩। একটি ১৬′—০″×১০′—০″ ঘরের আসল ও প্রসারিত লৌহদণ্ডের অবস্থান।

ঐ লৌহদণ্ডকে চারটি সমান ভাগে দাগ দেওয়া হয়। ২নং চিত্র দেখলে বোঝা যাবে যে, আসল লৌহদণ্ড যখন কোন দেয়াল বা কোন বরগার উপর দিয়ে আসবার সময় ঢালাইয়ের উপরিভাগ দিয়ে যায় এবং ফাঁকের সেই ১/৪ অংশ অতিক্রম করে, তখনই ৪৫° কোণে বাঁকা হয়ে ঢালাইয়ের নিম্ন ভাগে নেমে আসে এবং নিম্নতল দিয়ে ফাঁকের ১/২ অংশ অতিক্রম করে ৪৫° কোণে আবার উপরিভাগে উঠে পূর্বের ন্যায় অগ্রসর হয়। এটা সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ঢালাই যেন আসল লৌহ- তবে তার ১/২″ ব্যাসের লৌহদণ্ড আসল লৌহদণ্ডের ন্যায় উঠানো-নামানো হয়।

ছাত ঢালাইয়ের পরদিন থেকে অন্ততঃ পাঁচ দিন ধরে বেশ ভাল করে ছাতে জল দেওয়া প্রয়োজন। এতে ছাত খুব শক্ত হয়।

(৮) ভিতর ও বাইরের দেয়াল প্লাষ্টার করবার সময় ভালভাবে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলে খাড়া দেয়ালে ১:৬ (১ ভাগ সিমেণ্ট ও ৬ ভাগ ভাল মোটা বালি) ভাগের মিশ্রণ ১/২″ পুরু করে এবং ছাতে তলার দিকে ১:৪ (১ ভাগ সিমেণ্ট ও ৪ ভাগ

ভাল মোটা বালি) ভাগের মিশ্রণ ½" পুরু করে লাগানো উচিত।

(৯) মেঝে করবার সময় ভিতের মধ্যে মাটি ভাল করে ভর্তি করে জল ও দুর্মুজ সাহায্যে মাটি ঠিক মেঝের ৩" নীচে বসিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, যাতে মাটি আর বসতে না পারে। ভাল পোড়া ইট সেই মাটির উপর বিছিয়ে দিতে হবে এবং ১:২:৪ (১ ভাগ সিমেণ্ট, ২ ভাগ বালি ও ৪ ভাগ ½"–¾" আকারের ঝামা ইট বা পাথরের টুক্‌রা) ভাগের মিশ্রণ ঠিকমত ঢাল রেখে গড়ে ১" করে ঢেলে দেবার পর ½" পুরু করে সিমেণ্ট দিয়ে কর্নিকের সাহায্যে পালিশ করে দিতে হয়।

এ-সম্পর্কে যে কোন কাজের একদিন পরে তাতে বেশ ভাল মত জল দেওয়া, অর্থাৎ কিউরিং করা প্রয়োজন। এই জল দেবার ফলে বাড়ীর সব কাজই বেশ শক্ত হয়।

সঞ্চয়ন

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কাজ

১৯৫৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ভারতের প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক ১নং ব্লাস্ট-ফার্নেসের উদ্বোধন-কার্য সম্পন্ন হয়। লৌহপিণ্ড উৎপাদনের কাজ দুর্গাপুর হইতে ২০০০ টন লৌহপিণ্ড যুক্তরাজ্যে রপ্তানীর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

২১শে এপ্রিল নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই ইস্পাত
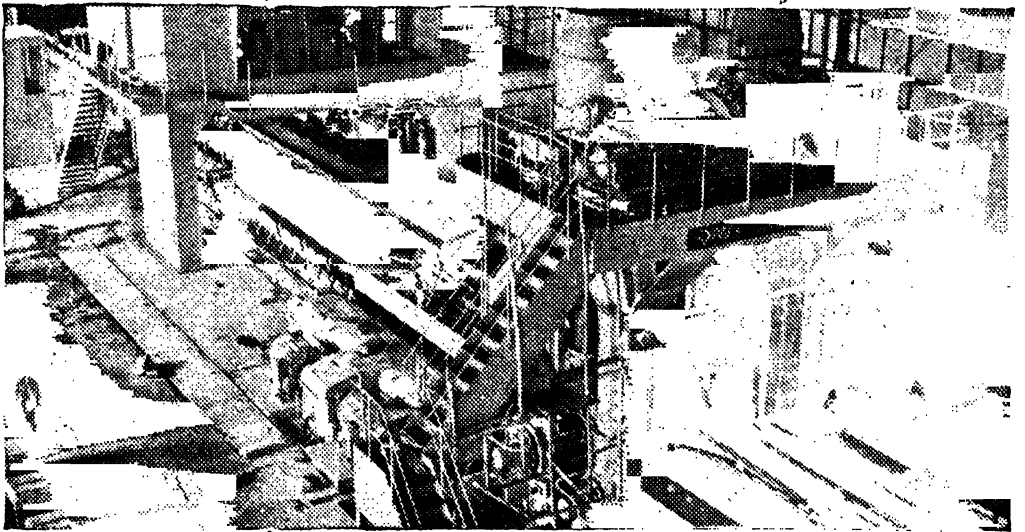
দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানায় ৪২ ফুট ব্লুমিং মিলের দৃশ্য।

আরম্ভ হইবার পর দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্মাণ-কার্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। ইত্যবসরে হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেড উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে এবং সম্প্রতি রোলিং মিল এলাকার দুইটি ইউনিট কাজ আরম্ভ করিয়াছে। মে মাসের শেষাশেষি বিলেট মিলের

কাজ আরম্ভ হওয়ার প্রথম পর্যায়ের কাজ একরূপ শেষ হইয়াছে।

এই পর্যায়ের একটি কাজ হইল উপজাত পদার্থের এলাকায় কতকগুলি যন্ত্র চালু করা। এই যন্ত্রগুলি হইল টার ডিষ্টিলেশন প্ল্যাণ্ট, সালফেট অব অ্যামোনিয়া প্ল্যাণ্ট এবং সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যাণ্ট। কয়লা ধৌতকরণের কারখানাটিও এই সঙ্গে কাজ আরম্ভ করে। ইহা ভারতের ধাতুশোধনের কয়লার অভাব অনেকটা দূর করিতে সক্ষম হইবে।

দুর্গাপুরে কেবল যে স্বতন্ত্রভাবে এক একটি পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ করিবারই চেষ্টা হইতেছে তাহা নহে, এক সঙ্গে অন্যান্য পর্যায়ের কাজও চলিতেছে।

'ইস্কন' আশা করে যে, পরবর্তী বৎসরে নির্দিষ্ট তারিখে ইস্পাত কারখানার নির্মাণ কার্য শেষ হইয়া যাইবে। ইহা শেষ হইলে হিন্দুস্তান ষ্টীল বোর্ডের হস্তে ইহার পরিচালনের দায়িত্ব তুলিয়া দেওয়া হইবে।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় ৩২ ফুট মাধ্যমিক মিল।

আইনষ্টাইন ও কৃত্রিম উপগ্রহ

মহাবিশ্বের গঠন-প্রকৃতির স্বরূপ কি? এই মহাবিশ্বের সব কাজ চলছে কোন্ কোন্ শক্তির বলে? দেশ, কাল আর পদার্থের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে রহস্যময় যে অভিকর্ষ আর মহাকর্ষ, যে শক্তির টানে প্রত্যেকটি গ্রহ নিখুঁত আর সুনির্দিষ্ট এক-একটি কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেই শক্তিরই বা স্বরূপ কি? এসব প্রশ্ন যুগ যুগ ধরে মানুষের কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে শাখায় সমগ্রভাবে মহাবিশ্বের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে অনুশীলন করা হয়, সেই শাখাটির নাম ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বা কস্‌মোলজি। এই ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের তত্ত্বগত ভিত্তি হলো আইনষ্টাইনের জেনারেল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি। এই রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতা-বাদের দ্বারাই আইন-ষ্টাইন সর্বপ্রথম দেশ (স্পেস্), কাল (টাইম) আর জড়ের (ম্যাটার) পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন।

বিশ্ব-রহস্য উদ্ঘাটনে আইনষ্টাইনের তত্ত্ব প্রয়োগ করবার আগে ওই তত্ত্বটিকে যাচাই করে নিতে

হবে; অর্থাৎ আপেক্ষিকতা-বাদের সিদ্ধান্তগুলি কতটা ঠিক, সেটা জানা দরকার। এ-পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সেটা চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করতে পারেন নি। কারণ, এই তত্ত্বের সঙ্গে যে নতুন নতুন কার্য-কারণগুলি সংশ্লিষ্ট এবং যে কার্য-কারণগুলির পরিমাণগত যাচাইয়ের সম্ভাবনা আছে, তা নিতান্তই কম। বৈজ্ঞানিকেরা আইনষ্টাইনের তত্ত্বের বাস্তবতা যাচাই করবার জন্যে অনবরত যে নতুন নতুন পদ্ধতি অনুসন্ধান করে চলেছেন, এটা তার অন্যতম প্রধান কারণ।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা একটি নতুন আর রীতিমত নির্ভরযোগ্য সূত্র পেয়েছেন, এই আপেক্ষিকতা-বাদ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে। মানুষের হাতেগড়া অনেকগুলি কৃত্রিম গ্রহ-উপগ্রহ মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হবার পর তাঁরা মনে করেন যে, এ-থেকে জেনারেল থিওরী অব রিলেটিভিটির তত্ত্ব যাচাইয়ের কার্যে তাঁরা বিশেষ রকমের সাহায্য পাবেন।

আপেক্ষিকতা-বাদের তত্ত্ব যাচাইয়ের ব্যাপারে স্পুটনিক আর লুনিক যে কি ভাবে কাজে লাগতে পারে, সেটা বুঝতে হলে আগে আইনস্টাইনের তত্ত্বটি সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা দরকার।

আজ থেকে প্রায় এক-শো বছর আগে লেভেরিয়ে নামে একজন ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী বুধের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবার সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন। অন্যান্য গ্রহের মতই এই গ্রহটি তার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে একবার করে সূর্যের নিকটতম বিন্দুতে এসে পৌঁছায়, আবার ক্রমশঃ দূরে সরে যায়। গ্রহগুলির এই কক্ষপথেরও একটা গতি আছে—যদিও এই গতি অত্যন্ত মন্থর। সূর্যের নিকটতম বিন্দুতে গ্রহের এই অবস্থানকে বলা হয় অনুসূর বা পেরিহিলিয়ন। কক্ষের গতি আছে বলে এই অনুসূরেরও গতি আছে। লেভেরিয়ে লক্ষ্য করেন যে, বুধের এই অনুসূরের গতিটা বুধের গতিমুখের দিকে অতি সামান্য পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে। লেভেরিয়ে প্রথমে ভাবলেন যে, বুধের অনুসূরের এই গতি-বৃদ্ধির কারণ হলো অন্যান্য গ্রহের মহাকর্ষের ক্রিয়া। কিন্তু তিনি হিসাব করে দেখলেন যে, অন্যান্য গ্রহের মহাকর্ষের ক্রিয়ায় বুধের অনুসূরের যতটা গতি বৃদ্ধি হওয়া উচিত, আসলে তার চেয়ে গতি বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাপারটা বিভিন্ন দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পদার্থ-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও কেউ এর ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি।

এর অনেক পরে, ১৯১৫ সালে, আইনষ্টাইন তাঁর সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাহায্যে এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দেন।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে, বুধের এই কক্ষের ঘূর্ণন-গতি অত্যন্ত কম। বুধ-কক্ষের ৩৬০° ডিগ্রি, অর্থাৎ সম্পূর্ণ এক পাক ঘুরতে সময় লাগে প্রায় ৩০ লক্ষ বছর। সুতরাং এই গতিকে সঠিকভাবে মাপতে গেলে বুধগ্রহের গতিবিধি আর এক অনুসূর, অর্থাৎ প্রায় দু-শো বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করে সেই ফলাফলকে কাজে লাগাতে হবে।

এই তো গেল বুধ-কক্ষের ঘূর্ণন-গতি। অন্যান্য গ্রহের বেলায় তাদের কক্ষ-ঘূর্ণনের গতি এতই কম যে, এখনও পর্যন্ত হিসাব করেই ওঠা যায় নি।

সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতা তত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তগুলিও প্রমাণ করা কঠিন। সূর্য অথবা কোন তারকার কাছ দিয়ে যখন একটা আলোক-রশ্মি চলে যায়, তখন সেই রশ্মির গতিপথ কিছুটা বেঁকে যাবেই—এই হচ্ছে আপেক্ষিকতা-বাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়। এই সিদ্ধান্তের মূল কথাটি হলো—আলোর এনার্জি অর্থাৎ শক্তি রয়েছে। অতএব তার একটা ভর অর্থাৎ মাসও আছে এবং মহাকর্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আলোর এই ভর সূর্য বা তারকার ভরের টানে আকৃষ্ট হয় বলেই আলোক-রশ্মির পথটা বেঁকে যায়। আলোক-রশ্মির এভাবে বিপথচালিত হবার ব্যাপারটাকে বলা হয় বিক্ষেপ বা ডিফ্লেক্‌শন। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, এই বিক্ষেপের মাত্রা—অর্থাৎ

কত পরিমাণে আলোর পথটা বিক্ষিপ্ত হচ্ছে—জানা না থাকলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহু দূরের তারকার সঠিক অবস্থান দূরবীক্ষণের সাহায্যে নির্ণয় করতে পারেন না।

আইনষ্টাইনের তত্ত্বের তৃতীয় পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলিকে প্রমাণ করা আরও কঠিন। এই তৃতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে যে আলোক-তরঙ্গ বা বেতার-তরঙ্গ এসে পৌছায়, সেই তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি (প্রতি সেকেণ্ডে তরঙ্গের সংখ্যা) অভিকর্ষ-শক্তির প্রভাবে বদলে যায়। জ্যোতির্মণ্ডলীয় অবস্থাধীনে এই পরিবর্তন কি পরিমাণে ঘটে, সেটা বৈজ্ঞানিকেরা আজ পর্যন্ত হিসাব করে উঠতে পারেন নি।

আইনষ্টাইনের তত্ত্বের এই নতুন কার্যকারণগুলি যদি যৎসামান্যই হয়, তাহলে এই তত্ত্বটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? আমাদের সৌর-পরিবারের পক্ষে এই তত্ত্বের কার্যকারণগুলি যৎসামান্য হলেও মহাব্রহ্মাণ্ডের বিপুল বিস্তারের ক্ষেত্রে এই সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতা-বাদের নিয়ম নিখুঁতভাবে খাপ খেয়ে যায়। তাছাড়া এই মহাব্রহ্মাণ্ডের আয়তনের তুলনায় আমাদের এই সৌরমণ্ডল হলো—এক পুকুর জলের মধ্যে একটি জলবিন্দুর মত।

আমাদের এই সৌর-পরিবার যে মহাজাগতিক মাপকাঠির হিসাবে কত ক্ষুদ্র, তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে এই উদাহরণটি থেকে—সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌছাতে লাগে আট মিনিট। সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দিয়ে এমন নক্ষত্রেরও সন্ধান পাওয়া গেছে, যেখান থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌছাতে লেগেছে ১০০ কোটি বছর; অর্থাৎ সেই নক্ষত্র থেকে যদি কোন মানুষ পৃথিবীকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেত, তাহলে সে ১০০ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর অবস্থা চাক্ষুষ দেখতে পারতো। এথেকে বোঝা যাচ্ছে, সৌর-পরিবারের তুলনায় মহাব্রহ্মাণ্ডের আয়তন কত বিপুল।

কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান প্রাকৃতিক পরিবেশে এই তত্ত্বের পরিমাণগত কার্যকারণগুলিকে একেবারে নিখুঁতভাবে যাচাই করা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে মহা-বিশ্বের অনুশীলন-ক্ষেত্রে পুরাপুরি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কি ভাবে এই যাচাই করা যেতে পারে? কৃত্রিম গ্রহ-উপগ্রহগুলির সাহায্যে—আইনষ্টাইনের তত্ত্ব যাচাইয়ের জন্যেই এ-ক্ষেত্রে লুনিক-স্পুটনিকের অন্যতম কার্যকারিতার প্রশ্ন উঠছে।

কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষের ঘূর্ণন-কোণ, গ্রহগুলির কক্ষের ঘূর্ণন-কোণ অপেক্ষা অনেক বেশী—বুধের কক্ষের ঘূর্ণন-কোণের চেয়ে প্রায় ৩০ গুণ বেশী। ইতিমধ্যেই এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির সাহায্যে পৃথিবীর সঠিক আকৃতি নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। পৃথিবীর ভিতরের পদার্থ কি ভাবে ছড়িয়ে আছে এবং কোন্ জায়গায় তার ঘনত্ব কত, তাও জানা গেছে। কৃত্রিম উপগ্রহের গতি-বিধির উপরে চাঁদের মহাকর্ষ আর পৃথিবীর আবহ-মণ্ডল কতটা এবং কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করে, সেটাও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হচ্ছে। এসব হিসাব নিখুঁতভাবে পাওয়ার পর কৃত্রিম গ্রহ-উপগ্রহগুলি বিজ্ঞানীদের হাতে এমন নিখুঁত ও সূক্ষ্ম যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার সাহায্যে আইন-ষ্টাইনের ওই তত্ত্বটির কার্যকারণগুলি যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে। কাজেই মহাব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যেই কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গগুলির ফ্রিকোয়েন্সি পৃথিবীর অভিকর্ষ-ক্ষেত্রের প্রভাবে কতটা এবং কি ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে—সেটা কৃত্রিম উপগ্রহগুলির সাহায্যে অনেকটা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আইনষ্টাইনের আরেকটি অত্যন্ত দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তের কথাও বলা দরকার। সেটা হলো—গতির উপরেই সময় নির্ভর করে; অর্থাৎ

গতি যত বাড়বে, সময়ও ততই মন্থর হয়ে আসবে। আলোর গতিতে যদি কোন মানুষ মহাশূন্যে চলতে থাকে, তাহলে তার কাছে সময়ের প্রবহমানতা প্রায় থাকবে না বললেই চলে। ধরা যাক, এমন একটা মহাব্যোমযানে চেপে আমরা চলেছি, যার গতি আলোর গতির নয়-দশমাংশ বা সেকেণ্ডে ১,৬৭,৪০০ মাইল। সে ক্ষেত্রে এই মহাব্যোমযানের ভিতরে আমাদের কাছে সময়ের মাত্রা দাঁড়াবে পৃথিবীর সময়ের মাত্রার অর্ধেক; অর্থাৎ পৃথিবীর এক দিন হবে এই মহাব্যোমযানের ভিতরের ১২ ঘণ্টার সমান। পৃথিবীতে যে মানুষের ৮০ বছর বাঁচবার কথা, সেই মানুষ যদি আজীবন এই মহাব্যোমযানের ভিতরে থেকে যায়, তাহলে সে বাঁচবে পৃথিবীর হিসাবে ১৬০ বছর। অবশ্য সে নিজে এ-সম্বন্ধে সচেতন থাকবে না।

কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহের বেলায় সময়ের এই তারতম্যটুকু নিতান্তই নগণ্য। আমাদের কাছে কৃত্রিম উপগ্রহের সেকেণ্ডে ৫ মাইল গতি প্রচণ্ড হলেও, আলোর গতির কাছে সেটা কিছুই নয়। তাই লাইকার পক্ষে সময়ের মন্থরতা মোটেই লক্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে নি। কারণ সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল গতিতে যে চলেছে, তার কাছে সময়ের প্রবহমানতার মাত্রা কমে আসবে—এক বছরে এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম। তা সত্ত্বেও পারমাণবিক ঘড়ির সাহায্যে সময়ের এই অতি সূক্ষ্ম তারতম্যটুকু ধরা সম্ভব। ইদানীং বিজ্ঞানীরা এমন নিখুঁত পারমাণবিক ঘড়ি তৈরী করেছেন, যার সাহায্যে তিন হাজার বছরে এক সেকেণ্ডের তারতম্য ধরা যায়। তাছাড়া ভবিষ্যৎ মহাব্যোমযান ও কৃত্রিম উপগ্রহগুলির গতি আরও বাড়ানো যাবে। এর ফলে আইনষ্টাইনের সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতা তত্ত্বের তৃতীয় কার্যকারণের সিদ্ধান্তগুলিকেও যাচাই করা চলবে—যা এ-পর্যন্ত প্রায়োগিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।

পারমাণবিক বিকিরণের বিপদ

এই সম্পর্কে ডাঃ টি. এ. মার্গারিসন লিখেছেন—বিশ্বের সর্বত্র মানুষ পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ফলে উপকৃত হচ্ছে। বৃটেন, ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ প্রতিমুহূর্তে যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে, তার একটা অংশ আসছে এমন একটি শক্তি-কেন্দ্র থেকে, যেখানে কয়লার পরিবর্তে ইউরেনিয়াম অ্যাটম বিদারণের ফলে উদ্ভূত শক্তির সাহায্যে কাজ হচ্ছে।

অ্যাটম বিদারণের একটি উপজাত পদার্থ হলো খণ্ডিত ইউরেনিয়াম অ্যাটম, যা অতিমাত্রায় তেজস্ক্রিয় এবং যার নানারকমের ব্যবহার আছে। এগুলি যেমন রোগনির্ণয়ে এবং কতকগুলি রোগ-দূরীকরণের কাজে সাহায্য করে, তেমনি আলুর অঙ্কুর উদ্গম প্রতিরোধ করবার কাজে এবং শস্যনষ্টকারী পোকামাকড় ধ্বংসের কাজে সহায়তা করে। পলিথিন প্রভৃতি প্লাষ্টিক দ্রব্যের দৃঢ়তা বৃদ্ধির জন্যেও তা ব্যবহৃত হতে পারে। শ্রমশিল্পে এগুলি ব্যবহৃত হয়, যন্ত্রাদির ধাতব অংশের ভিতরে কোন ফাটল আছে কিনা, তা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করবার জন্যে। কাগজ, প্লাষ্টিক ফিল্ম অথবা ধাতব চাদরের পুরুত্ব পরিমাপের কাজেও তা ব্যবহৃত হয়।

এই ধরণের কাজের মধ্যে কিছুটা ঝুঁকি থেকেই যায়। অবশ্য প্রত্যেক শ্রমশিল্পেই ঝুঁকি রয়েছে; কিন্তু পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে যে ঝুঁকি রয়েছে, তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। আপনার গাড়ী থেকে তেল চুইয়ে পড়ছে, আপনি তা গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারেন। কিন্তু পারমাণবিক বিকিরণ কোন ছিদ্র পথে নির্গত হতে থাকলে তা বুঝতে পারা যায়

না। কারণ তা আদৌ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। আপনার কাছে সমস্তটাই স্বাভাবিক মনে হবে এবং আপনি যদি সামান্য কিছু বিকিরণ গ্রহণও করেন তাহলেও আপনি তা বুঝতে পারবেন না। এমন কি, তা আপনার ক্ষতি করলেও আপনি বুঝতে পারবেন না; কারণ ক্ষতির কথা আপনি জানতে পারবেন অনেক পরে। এমনও হতে পারে, এই ক্ষতির কথা আপনি আপনার জীবনকালে আদৌ বুঝতে পারবেন না, সেই ক্ষতির বিষয় প্রকাশ পাবে আপনার ভবিষ্যৎ সন্তানসন্ততির মধ্যে।

এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কারণ সাধারণ মানুষ বিকিরণ সম্পর্কে অত্যন্ত ভীত। সৌভাগ্যের কথা এই যে, আমরা বাহ্যেন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই বিকিরণের অস্তিত্ব বুঝতে না পারলেও গাইগার কাউণ্টার প্রভৃতি কতকগুলি সরল যন্ত্রের সাহায্যে তা বুঝতে পারি। এই যন্ত্রগুলি সামান্যতম পারমাণবিক বিকিরণ ধরে ফেলতে পারে।

বিকিরণের বিপদ সম্পর্কে বহুকাল ধরেই মানুষ সচেতন হয়েছে। সেজন্যে বিশ্বের সর্বত্র পারমাণবিক কারখানাগুলিতে গাইগার কাউণ্টার এবং অন্যান্য 'ডিটেকটরের' সাহায্য নেওয়া হচ্ছে এবং তা নেওয়া হচ্ছে ব্যাপকভাবে, যাতে বিকিরণের নির্গমন একেবারে বন্ধ করা যায়। পারমাণবিক কারখানাগুলিতে প্রত্যেকেই এক-একটি ব্যক্তিগত 'ডিটেকটর' সঙ্গে রাখেন যাতে নিজের অজ্ঞাতে তিনি কি পরিমাণ বিকিরণ গ্রহণ করছেন তা বুঝতে পারেন। এসব 'ডিটেকটর' হলো কালো কাগজে মোড়া (আলো প্রতিরোধের জন্যে) এক টুক্‌রা ফোটোগ্রাফিক ফিল্ম। পারমাণবিক বিকিরণ এই কালো কাগজের মধ্য দিয়ে সাধারণ আলোর মত ফিল্মটিকে এক্সপোজ করে। ফিল্মটিকে পরে 'ডেভেলপ' করে দেখা হয়, মানুষটি কি পরিমাণ বিকিরণ নিজের শরীরে গ্রহণ করেছে।

এসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্যে পারমাণবিক শক্তি শিল্প বৃটেনে একটি সর্বাপেক্ষা নিরাপদ শিল্প হিসাবে খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছে। এখানে দুর্ঘটনা যে ঘটে না তা নয়, কিন্তু সেই সব দুর্ঘটনার সঙ্গে বিকিরণের কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু বৃটেনে যেভাবে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার দ্রুত প্রসার লাভ করছে, তাতে নিরাপত্তা সম্পর্কে আরও কিছু ব্যবস্থা অবলম্বিত হবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। নতুন ধরণের বিজ্ঞানীর অভাব এখনও দেশের মধ্যে রয়েছে—এই সব বিজ্ঞানীদের বলা হয় "হেল্‌থ ফিজিসিস্ট"। এঁরা বিকিরণ-উৎপাদনকারী পদার্থ এবং যন্ত্রাদির ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং কর্মীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে দায়ী। সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিষ্টার সার ডগ্‌লাস ভীল-এর সভাপতিত্বে একটি বিশেষ সরকারী কমিটি এই ধরণের বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখেছেন।

কমিটির রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কমিটি মনে করেন ১০ বছরের মধ্যে পারমাণবিক শক্তি শিল্প যেভাবে প্রসার লাভ করবে, তাতে বৃটেনে নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখবার জন্যে ১,১০০ লোকের প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে ২০০ জন হবেন বিজ্ঞান, ভেষজ অথবা ইঞ্জিনীয়রিং বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রীধারী, ৩০০ জনের থাকবে বৃত্তিগত ট্রেনিং এবং বাকী ৬০০ জন থাকবেন সাহায্যকারী ষ্টাফ হিসাবে।

এঁদের মধ্যে একদল অ্যাটমিক অ্যানার্জি অথরিটি, কেন্দ্রীয় বিজলী উৎপাদন বোর্ড এবং পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারী অন্যান্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কাজ করবেন। অন্যেরা কমিটির সুপারিশ মত, ব্যক্তি বিশেষকে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোম্পানীগুলিকে, যাদের পারমাণবিক শক্তির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে উপদেশের প্রয়োজন আছে, তাদের সাহায্যের জন্যে একটি জাতীয় রেডিওলজিক্যাল অ্যাডভাইসরি সার্ভিস গঠন করবেন।

পারমাণবিক বিকিরণ সম্পর্কে ভয়ের কিছুই নেই যদি বিশেষ একটু সতর্কতা অবলম্বন করা যায়। ভীল কমিটির সুপারিশ কার্যকরী হলে কর্মীরা এ বিষয়ে অনেকটা সচেতন হতে পারবে এবং সেই সঙ্গে কি ভাবে কাজকর্ম নিরাপদে করা সম্ভব, তা বুঝতে পারবে। এর ফলে সাধারণ মানুষও ভয়ের ভাব দূর করে তেজষ্ক্রিয় পদার্থের ব্যাপক ব্যবহারে উৎসাহিত হবে।

রোগ নিরাময়ে প্লাষ্টিক

কিছুকাল আগে নয় বছর বয়সের একটি মেয়ের দেহ নানা জায়গায় ভীষণভাবে পুড়ে যাওয়ার ফলে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে রাশিয়ায় কিশিনেফ সহরের ১নং হাসপাতালে আনা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত যে সব চিকিৎসা-পদ্ধতি আছে, তা প্রয়োগ করে যখন কোন ফল পাওয়া গেল না, তখন সেখানকার মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক ডাক্তার নিকোলাই কুজনেৎসফের নির্দেশে মেয়েটিকে বায়োপ্লাষ্টিকস্-এর সাহায্যে চিকিৎসা করবার ব্যবস্থা হলো। এই বায়োপ্লাষ্টিক হচ্ছে খুব পাত্‌লা কাগজের মত এক বিশেষ ধরণের প্লাষ্টিকের চাদর। দেহের পোড়া জায়গাগুলি এই বায়োপ্লাষ্টিক দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার ফলে মেয়েটি ২-৩ দিনের মধ্যেই অনেকখানি সুস্থ হয়ে ওঠে এবং এক মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে সক্ষম হয়।

সম্প্রতি সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এই বায়োপ্লাষ্টিকের আরও উন্নতি সাধন করেছেন এবং নতুন নতুন রোগের চিকিৎসায় সাফল্যের সঙ্গে এই পদার্থটি ব্যবহার করছেন। নালী-ঘা সারাবার কাজেও এই বায়োপ্লাষ্টিক প্রয়োগ করা হচ্ছে।

অধ্যাপক কুজনেৎসফ দীর্ঘকাল আগে প্রাণী-দেহের ভিতরে রক্তরস-আধারের খুব পাত্‌লা আচ্ছাদন সম্পর্কে গবেষণা করবার সময় লক্ষ্য করেন যে, এই আচ্ছাদন এক ধরণের অতি সূক্ষ্ম, সুদৃঢ় এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তন্তু দিয়ে তৈরী। পরে এই বায়োপ্লাষ্টিক তৈরী করবার প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়ায় গরু আর বলদের তলপেটের রক্ত-রসাধারের আচ্ছাদনের জালক। ইদানীং রাশিয়ায় এই উপাদান থেকে নানা ধরণের বায়োপ্লাষ্টিক্‌স্ তৈরী হচ্ছে। অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে এখন শল্য-চিকিৎসকদের কাছে অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বায়োপ্লাষ্টিকের ব্যাণ্ডেজ। একে সহজেই বীজাণুশূন্য করা যায় এবং যে কোন অবস্থায় রাখা যেতে পারে। ক্ষতস্থান জোড়বার পক্ষে এবং দ্রুত নতুন চামড়া সৃষ্টির ব্যাপারে এই প্লাষ্টিকের ব্যাণ্ডেজ সবচেয়ে বেশী কার্যকরী।

তাছাড়া চোখের অসুখে যে ক্ষেত্রে অক্ষি-গোলকের কোষতন্তু অপসারণের দরকার হয়, সে ক্ষেত্রে অপসারিত তন্তুর বদলে স্বচ্ছন্দে এই বায়োপ্লাষ্টিক ব্যবহার করা চলে। অধ্যাপক কুজনেৎসফের পদ্ধতির উন্নতি ঘটিয়ে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বায়োপ্লাষ্টিকের কৃত্রিম হাড় পর্যন্ত তৈরী করেছেন। কিছুকাল আগে কাণ্ডলা সহরের একজন ১৯ বছর বয়স্ক ছাত্রের হাতের হাড় এমন ভাবে ভেঙ্গে যায় যে, তার বাহুর নীচের অংশ কেটে বাদ দিতে হবে বলে মনে হয়; কিন্তু সার্জন পিওৎর্ পোলিয়াকফ আশ্চর্য কৃতিত্বের সঙ্গে ভাঙ্গা হাড়ের টুক্‌রাগুলি অপসারণ করে সেই জায়গায় আস্ত একটা প্লাষ্টিকের হাড় জুড়ে ছাত্রটিকে সুস্থ করে তুলেছেন। সে এখন স্বাভাবিকভাবেই তার হাত ব্যবহার করে থাকে।

শ্বাসযন্ত্রের নালীপথ সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়বার ফলে এক বছরের একটি শিশুর মৃত্যুলক্ষণ দেখা দেয়। পর পর চারবার অস্ত্রোপচার করবার পরেও শিশুটির শ্বাসনালী ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসতে থাকে এবং

শিশুটির শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সোভিয়েট সার্জনেরা শিশুটিকে বাঁচিয়ে তুলেছেন, তার শ্বাসনালীর রোগাক্রান্ত অংশটুকু কেটে বাদ দিয়ে। সেই জায়গায় তাঁরা একটি বায়োপ্লাষ্টিকের নল জুড়ে দিয়েছেন। ২৫ দিনের মধ্যে এই প্লাষ্টিকের নল সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে শিশুটির শ্বাসনালীর কাজ করতে থাকে এবং তার দেহের একটি স্বাভাবিক অঙ্গে পরিণত হয়।

৫২ বছর বয়স্ক একটি রোগীর ক্ষেত্রেও এই একই ধরণের অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে রোগীকে সুস্থ করে তুলতে লেগেছিল মাত্র ৮ দিন।

অধ্যাপক কুজনেৎসফ প্রবর্তিত এই বায়োপ্লাষ্টিকস্ প্রয়োগ-পদ্ধতি বহু বিচিত্র রোগ-চিকিৎসায় সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে; যেমন—পিত্তনালীর রোগ, কানে কম শোনা, স্নায়ু-শিরা-উপশিরা ইত্যাদির ব্যাধি, যকৃৎনালীর রোগ, মস্তিষ্ক, কণ্ডরা (টেণ্ডন) ও পাকযন্ত্রের নানারকম ব্যাধি ইত্যাদি। ইদানীং প্রায় ১০০ রকমের রোগ চিকিৎসায় বিভিন্ন রকমের বায়োপ্লাষ্টিক্স্ কাজে লাগানো হচ্ছে।

গ্রহান্তরবাসী প্রাণীর চেহারা কিরূপ ?

ইজভেস্তিয়া সংবাদপত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বিশিষ্ট সোভিয়েট বিজ্ঞানী ডক্টর ইউরি রল লিখেছেন—আমাদের এই সৌরমণ্ডল যে ছায়াপথ বা গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত সেই ছায়াপথে এমন দেড় লক্ষ গ্রহ আছে, যেগুলিতে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই পর্যন্ত যে হিসেব করেছেন তাতে আমাদের ছায়াপথে মোট ১৫০ শত কোটি তারকা আছে বলে মনে করা হয়। বিশিষ্ট সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভ্লাদিমির ফেসেনকফ বলেছেন যে, প্রতি দশ লক্ষ তারকার মধ্যে মাত্র একটি তারকার মধ্যে এমন একটিমাত্র গ্রহ থাকা সম্ভব, যে গ্রহে জীবনের অস্তিত্বের উপযোগী অবস্থা ও পরিবেশ বর্তমান। সুতরাং আমাদের ছায়াপথে মোট দেড় লক্ষ গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। তবে এসব গ্রহ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যতটা পর্যবেক্ষণের কাজ চালানো হয়েছে, তাথেকে মনে হয়, গ্রহান্তরে জীবনের অস্তিত্ব থাকলেও তা উদ্ভিদের পর্যায় অতিক্রম করেছে কি না সন্দেহ। এই জীবনের অস্তিত্ব হয়তো উন্নতবুদ্ধি প্রাণীর পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে খুব কম গ্রহেই।

প্রবন্ধ লেখক এই বৈজ্ঞানিক প্রকল্পটিকে সমর্থন করে বলেছেন যে, প্রাণীর অস্তিত্ব শুধু আমাদের এই গ্রহটিরই একচেটিয়া অধিকার নয়। ছায়াপথে শত শত গ্রহ আছে, যেগুলি গ্রহ-বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। এসব গ্রহে বস্তুর বিকাশ-বিবর্তনের শাশ্বত নিয়মে প্রাণের আবির্ভাব-তিরোভাবের মধ্যে দিয়ে জীবন নতুন নতুন রূপ নিচ্ছে।

গ্রহান্তরের এই প্রাণী দেখতে কি রকম হওয়া সম্ভব? তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শারীরবৃত্তই বা কি রকম হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে ইউরি রল লিখেছেন—কাল্পনিক বিজ্ঞান-কাহিনীর (সায়েন্স ফিক্শন) রচয়িতারা এ-সম্পর্কে যা লেখেন, প্রাণী-বিজ্ঞানীরা তার সঙ্গে একমত হতে পারবেন না। গ্রহান্তরবাসী বুদ্ধিমান প্রাণীরা যে চেহারা ও শারীরবৃত্তের দিক থেকে মানুষের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের হবে, তার কোন মানে নেই। এ-রকম প্রাণীদের অবশ্যই থাকা চাই খুব উন্নত ধরণের স্নায়ুতন্ত্র যা মানুষের মস্তিষ্ক-ব্যবস্থার অনুরূপ এবং এই ব্যবস্থাকে বাইরের আকস্মিক ও ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষিত রাখবার জন্যে মানুষের করোটির অনুরূপ একটা কঠিন আবরণের মধ্যেই সেটা থাকা চাই। প্রত্যেক গ্রহেরই নিজস্ব অভিকর্ষ আছে। সুতরাং ভিন্ন গ্রহবাসী সেই

প্রাণীর মস্তিষ্কের (অথবা অনুরূপ অঙ্গ) উপরে যাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে, সেই উদ্দেশ্যে ওই অঙ্গের জন্যে দেহের একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট থাকবে।

গ্রহান্তরবাসী এই বুদ্ধিমান প্রাণীকে অবশ্যই ত্রিমাত্রিক স্থানে চলাফেরা, ওঠানামা করতে হবে। অতএব মানুষের মতই তারও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থাকা চাই এবং এজন্যে তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে হতে হবে প্রতিসম বা সিমেট্রিক্যাল।

এই প্রাণীর একটা, দুটা অথবা তারও বেশী দর্শনেন্দ্রিয় থাকতে পারে। কিন্তু এ-রকম মনে করবার কোন কারণ নেই যে, তার দর্শনেন্দ্রিয় আলোর বহুবিধ রূপকে একই সঙ্গে অনুভব বা উপলব্ধি করতে পারে। কারণ, সে ক্ষেত্রে মহাবিশ্বে সঞ্চরমান অসংখ্য (মানুষের চোখে অদৃশ্য) আলোক-তরঙ্গের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সে দিশেহারা হয়ে পড়বে। তার মস্তিষ্কে একই সঙ্গে অসংখ্য দৃশ্যের ছাপ পড়বার ফলে সে কোনটিকেই ভালভাবে উপলব্ধি বা অনুভব করতে পারবে না। অবশ্য এ-রকম হওয়া অসম্ভব নয় যে, এই প্রাণী তার একাধিক দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যে একবারে এক-একটিকে এক-একরকম আলোক-তরঙ্গ অনুভব করার কাজে ব্যবহার করতে পারে। শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ইত্যাদির বেলায়ও এ-রকম হওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক সারূপ্যের নিয়ম অনুযায়ী গ্রহান্তরবাসী এই উন্নতবুদ্ধি প্রাণীর অঙ্গসংস্থান ও শারীরিক ক্রিয়াকলাপ অনেকখানি মানুষের অনুরূপ বলে সিদ্ধান্ত করাই হবে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণগুলি যদি অনুরূপ হয়, তাহলে ক্রিয়াগুলিও অনুরূপ হবে—এই হচ্ছে প্রাকৃতিক ব্যাপারে সাধারণ নিয়ম। সেদিক থেকে গ্রহান্তরে প্রাণের অনুকূল পরিবেশ ও অবস্থাগুলিকে অনেকখানি পৃথিবীরই অনুরূপ হতে হবে এবং সেখানকার জীব-বিবর্তনের ধারাও হবে মোটামুটি পার্থিব জীব-বিবর্তনের অনুরূপ। সুতরাং গ্রহান্তরের উন্নতবুদ্ধির প্রাণীও চেহারা ও অবয়বের দিক থেকে অনেকখানি মানুষের মতই হবে বলে মনে করবার পিছনে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে।

ক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ

এই সম্পর্কে ডগলাস ওয়ার্থ লিখেছেন—জলের মধ্যে ধাতব জিনিষগুলিতে সব সময় কলঙ্ক পড়তে দেখা যায়। জাহাজের তলদেশ এবং প্রোপেলার এই কলঙ্কের ফলে, লোহার জাহাজ নির্মাণের প্রথম থেকেই, ক্ষয় পেয়ে এসেছে। কিন্তু আজ এই জাহাজকে যদি জল থেকে সরিয়ে এনে শুকিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, তার খোলের কোথাও এতটুকু কলঙ্কও পড়ে নি এবং ১২ মাস ব্যবহারের পরও এর প্রোপেলার একেবারে নতুন।

ক্ষয় প্রতিরোধের চিরন্তন পদ্ধতি হলো পেইন্টিং বা রং লাগানো। কিন্তু এর ফল খুব ভাল হয় না, কারণ বাইরে রঙের একটা প্রলেপের সাহায্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এই বৈদ্যুতিক প্রবাহই মৃত্তিকার মধ্যে বা জলের মধ্যে ক্ষয়ের কারণ বলে জানা যায়। ক্যাথডিক প্রোটেকশনের ব্যবস্থা হলো প্রকৃতপক্ষে ক্ষয় প্রতিরোধের বিজ্ঞান—জলের মধ্যে অবস্থিত অংশে বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রয়োগ করে এই ক্ষয় প্রতিরোধ করা হয়।

সংক্ষেপে ব্যাপারটি হলো এই—কতকগুলি ধাতব দণ্ড খোলের সঙ্গে যুক্ত করে এবং তার মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালিয়ে বিদ্যুতের স্বাভাবিক প্রবাহ প্রতিহত করা। তার ফলে এই দণ্

ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং জাহাজের যে অংশ জলের মধ্যে থাকে, তা কলঙ্ক এবং আগাছা-মুক্ত থাকে।

অনেকে শুনে হয়তো আশ্চর্য হবেন যে, ক্যাথডিক প্রোটেকশনের এই ধারণা একেবারেই নতুন নয়, বরং তা অতি পুরাতন। ১০০ বছর বা তারও পূর্বে বৃটিশ বিজ্ঞানী সার হামফ্রি ডেভি এই ধারণার কথা প্রথমে ব্যক্ত করেন। কোন বিশেষ কারণে তিনি তা কার্যে পরিণত করতে পারেন নি।

১০০-এর বেশী বড় বড় জাহাজে ক্যাথডিক প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা হলেও প্রায় তিন বছর আগে পর্যন্ত ট্রলার, টাগ, কোষ্টার এবং বার্জগুলিকে কলঙ্ক-সংক্রান্ত এই পুরাতন সমস্যা নিয়ে বিব্রত থাকতে হয়। এই সময়েই প্রথম ছোট ছোট জাহাজ, পাইপ-লাইন ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ক্যাথডিক প্রোটেকশন ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হয় এবং খুব সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ক্যাথডিক প্রোটেকশনের ব্যবস্থাকে শামুক-গুগ্‌লি এবং আগাছার আক্রমণ-রোধের কাজেও ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন।

আজ ক্যাথডিক প্রোটেকশন নানা দিক দিয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্যাস ও জলের পাইপের ক্ষয়, লক-গেট, ডক-গেট ও ইস্পাত-নির্মিত সেতুর ক্ষয় প্রতিরোধের কাজে তা ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন কি, তা তৈলবাহী জাহাজের অভ্যন্তরেও সমানভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে; কারণ এই জাহাজগুলি প্রথম যাত্রায় তেল বহন করলেও ফেরবার মুখে বহন করে আনে সমুদ্রের জল।

এই ক্যাথডিক প্রোটেকশন শামুক-গুগ্‌লি এবং আগাছা, সেগুলি জাহাজের মালিকদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর জিনিষ সেগুলিকে দূর করবার কাজেও সাহায্য করছে। এই শামুক-গুগ্‌লি এবং আগাছা অকারণ জাহাজের গতি মন্থর করে দিয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করে।

এই রক্ষা ব্যবস্থার ফলে একটি জাহাজকে দুই বা তিন গুণ বেশী সময় চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে। জাহাজের কাঠামো নির্মাণের দিক দিয়েও কাজ অনেক সহজ হয়েছে। অতিরিক্ত ইস্পাত ব্যয়ের প্রয়োজন বন্ধ হয়েছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই—১৯৬০

১৩শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

সূর্যের সর্বপ্রথম এক্স-রে ফটোগ্রাফ

ইউ. এস, ন্যাভাল রিসার্চ লেবরেটরীর রিচার্ড এল, ব্লেক সর্বপ্রথম সূর্যের এই এক্স-রে ফটোগ্রাফটি তুলিয়াছেন। মেক্সিকোর হোয়াইট স্যাণ্ডস্ হইতে উৎক্ষিপ্ত এরোবি-এইচ-আই রকেট হইতে ছবিটি গৃহীত হইয়াছে।

পাহাড়ের কথা

পাহাড় দেখতে, পাহাড়ে চড়তে আর পাহাড়ের গল্প শুনতে সবাই ভালবাসে। কিন্তু কেন? মনে হয়, পাহাড়ের প্রাকৃতিক রূপের পিছনে লুকিয়ে আছে এক অজানা রহস্য। পাহাড়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মন জানতে চায় তাদের সৃষ্টির রহস্য। হয়তো কোন কল্পনাতীত ঘটনা জড়িয়ে আছে এদের জন্ম-ইতিহাসের সঙ্গে। তাই অনেক সময় অনেকে কল্পনার আশ্রয় নেয়। তাই পাহাড়-পর্বতের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করতে অলৌকিক ঘটনা নিয়ে পুরাণের গল্প সৃষ্টি হয়।

বাংলা, পলিমাটির দেশ; তাই পাহাড়ের প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে—অদেখাকে দেখা, অজানাকে জানবার আগ্রহ। তবু পাহাড় যে এদেশে

১নং চিত্র

একেবারেই নেই, তাও নয়। উত্তরবঙ্গ রয়েছে হিমালয়ের কোলে; পশ্চিমেও ছোট-বড় পাহাড়ের দেখা মিলে। বীরভুমের রামপুরহাট থেকে লালমাটির পথ ধরে দুমকার দিকে হাঁটতে সুরু করলে প্রথমে ল্যাটেরাইট, তার পর কালো কালো পাহাড়ের সারি—রাজমহল পাহাড়ের অংশ। তাছাড়া বিহারের পাহাড়ী অঞ্চলের লাগোয়া উঁচু জমিতে ছোট-বড় পাহাড় দু-একটা দেখা যায়। বাঁকুড়ায় শক্ত পাথর দিয়ে গড়া পাহাড়ী অঞ্চল বাংলার ধূ-ধূ-মাঠের মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছে।

এসব পাহাড়ের চেহারা কিন্তু একরকম নয়, বাংলা বা বাংলার বাইরে যারা দু-চারটা পাহাড় দেখেছ, তারা নিশ্চয়ই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে থাকবে। রাঁচীর পাহাড় অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে, যেন অনেকগুলি কালো কালো কুমীর রোদ পোহাচ্ছে। এই ধরণের পাহাড়ের চূড়া বলতে ঠিক কোন কিছু নেই। পাহাড়ের গা খুব খাড়া নয়, বেশ ঢালু (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। পাথরের গোলাকার চাঙ্গড়গুলির উপরটা কালো হলেও টাট্‌কা পাথর ভাঙলে সাদা বা লাল্‌চে দেখাবে। এগুলি গ্র্যানিট পাথরের পাহাড়।

আবার কোন কোন পাহাড় খুব খাড়া আর উপরটা সূচালো, অর্থাৎ চূড়া আছে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এরা মাইকাসিস্ট বা ওই জাতীয় পরিবর্তিত শিলা দিয়ে গড়া। এই ধরণের পাথর একটি তলে সহজেই ভেঙ্গে যায় এবং অভ্রের দানাগুলি আলোয় চক্‌মক্
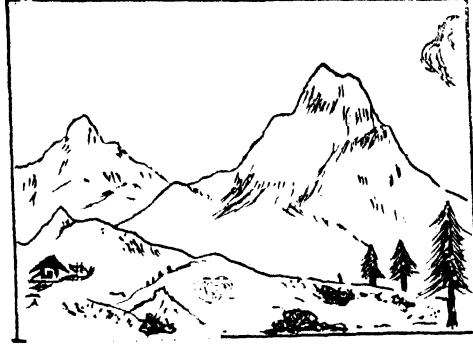
২নং চিত্র

করে ওঠে। আবার কোন কোন পাহাড় ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে উঠেছে, সিঁড়ির মত (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। মাঝে মাঝে সমতল ভূমি ও সমতল মাথা এই সব পাহাড়ের বৈশিষ্ট্য। এই জাতের পাহাড় বেসাল্ট-স্তর দিয়ে গড়া; যেমন—দাক্ষিণাত্যের মালভূমি বা রাজমহলের পাহাড়। এরা প্রাচীন আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের সাক্ষী।
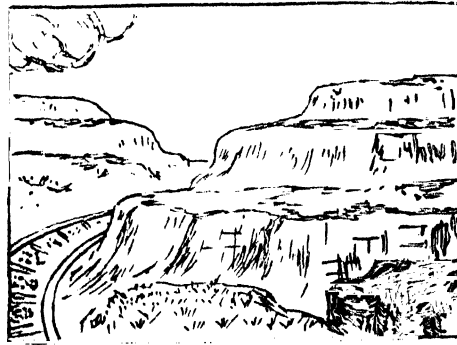
৩নং চিত্র

সুতরাং পাহাড়ের সৃষ্টি ও তার আকৃতি অনেকখানি পাথরের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তবে পাথরের গঠনও অনেকটা পর্বত সৃষ্টির দায়িত্ব নেয়। মনে করা যাক, কোন এক জায়গায় অতি প্রাচীন যুগে পলি জমে কতকগুলি শিলাস্তর গড়ে উঠলো। হয়তো সেগুলি ছিল চুনাপাথর, কাদাপাথর আর বেলেপাথর (৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। পরবর্তীকালে তাপ ও চাপের ফলে সেগুলি যথাক্রমে মার্বেল, মাইকাসিস্ট ও কোয়ার্টজাইটে রূপান্তরিত হলো। বাতাস ও বৃষ্টিতে এসব পাথর ক্রমশঃ ক্ষয় পেতে সুরু করলো। কোয়ার্টজাইট সাধারণতঃ এমন কঠিন ও জমাট হয় যে, অন্যান্য পাথরের তুলনায় ক্ষয় পায়

কম। সুতরাং বহুদিন পরে হয়তো দেখা যাবে, আশেপাশের মাইকাসিস্ট প্রভৃতি শিলা যখন অনেকটা ক্ষয়ে গেছে, তখন কোয়ার্টজাইট সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে
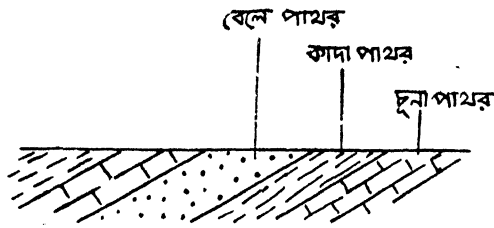
৪নং চিত্র
বিভিন্ন প্রকার শিলাস্তরের বিন্যাস—ক্ষয়ের আগে।

(৫নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। আজকের দিনে কোয়ার্টজাইটের স্তরটিকে আমরা বলবো পাহাড়। কোন অঞ্চলে যদি ভঙ্গুর ও কঠিন শিলা কাছাকাছি থেকে থাকে, তাহলে বহুদিনের ক্ষয়ের
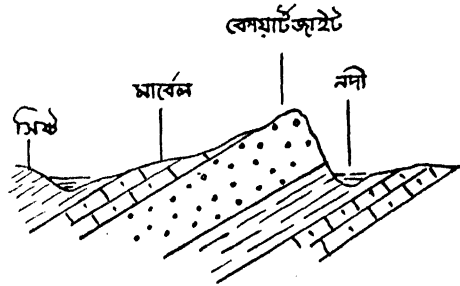
৫নং চিত্র
বিভিন্ন প্রকার শিলাস্তরের বিন্যাস—রূপান্তর ও ক্ষয়ের পরে।

ফলে কঠিন পাথরটি পাহাড়ের সৃষ্টি করবে। এই কঠিন শিলাটি পরিবর্তিত শিলা বা আগ্নেয়শিলা—এমন কি, পাললিক শিলাও হতে পারে।

অনেক সময় মাটির তলা থেকে গলিত প্রস্তর (লাভা) ও ছাই-ভস্ম পৃথিবীর উপর জমে উঠে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করে। আবার অনেক সময় কেবল লাভাই উঠে আসে ভূপৃষ্ঠে এবং অনেক দূর অবধি বিস্তৃত হয়। একটি স্তরের উপর আর একটি স্তর জমে ওঠে। এই আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের ফলেই বেসাল্ট দিয়ে গড়ে উঠেছে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও রাজমহল পাহাড়—একথা আগেই বলেছি। বহুক্ষেত্রে গলিত প্রস্তর ভূপৃষ্ঠে না উঠে অন্যান্য শিলাস্তরের নীচে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। অনেক সময় উপরের শিলাস্তর ঠেলে উঁচু হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে পাহাড়ের রূপ নেয়। সুতরাং পর্বত সৃষ্টির মূলে অনেক সময় আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের পরোক্ষ সহযোগিতা থাকে।

কোন অঞ্চলের প্রস্তর স্তরের গঠন পর্বত সৃষ্টি এবং পর্বতের বিন্যাসের কারণ হতে

পারে। প্রস্তরের স্তর যদি ভাঁজ-করা হয়, তাহলে পর্বত-বিন্যাসের কারণ হতে পারে। স্তরের কোন কোন অংশে যেমন খুব চাপে পড়বে, তেমনি আবার কোন কোন অংশে টানও পড়বে; ফলে ভাঙ্গন ধরবে। ক্ষয়ের ফলে সেই অঞ্চলটি কিন্তু সমতল হবে না। ভাঁজ যেখানে চাপের সৃষ্টি করেছে, সেখানে ক্ষয় হবে কম—আর যেখানে ভাঙ্গন ধরেছে, সেখানে সৃষ্টি হবে নদী, উপত্যকা ইত্যাদি (৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এভাবে ভঙ্গিল স্তরের ক্ষয়প্রাপ্তির ফলে কোন কোন অঞ্চলে সারি সারি একই ধরণের কতকগুলি পাহাড়
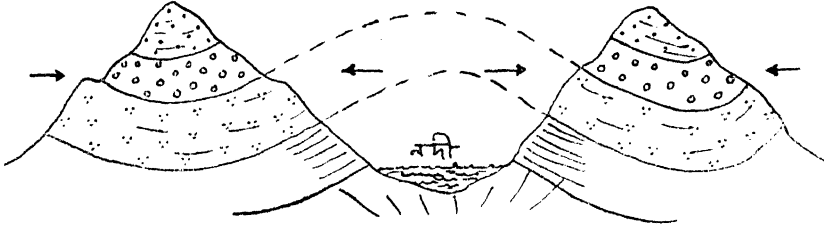
৬নং চিত্র

সৃষ্টি হতে পারে। কোন কোন সময় ভূপৃষ্ঠে পাথরের স্তর বা স্তরগোষ্ঠী খানিকটা উঠে যেতে পারে বা নেমে যেতে পারে। প্রস্তর-স্তরের এই আপেক্ষিক উঠা-নামার ফলে পাহাড়ের সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

প্রত্যেক দেশের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কোন কোন সময় দেশের উপকূলের বিস্তৃত জায়গা জুড়ে পর্বতের অভ্যুত্থান হয় এবং সৃষ্টি হয় বহুদূর-ব্যাপী সুবিশাল পর্বতশ্রেণীর। এসব পার্বত্য অঞ্চলে আগে ছিল অগভীর সমুদ্র। বহুদিন ধরে এই সমুদ্রতলে পলি জমে ওঠে। অবশেষে এসব পাললিক শিলাস্তর চাপের ফলে ভেঙ্গে, দুম্ড়ে উঠে পড়ে সমুদ্রের তলদেশ থেকে। এ-দেশে হিমালয় হচ্ছে আধুনিক কালের সৃষ্ট পর্বত। প্রাচীনতম পর্বত হচ্ছে আরাবল্লী ও পশ্চিমঘাট, তারপর হয়েছে পূর্বঘাট, সাতপুরা ও বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণী। এভাবে একের পর এক পর্বতের অভ্যুত্থান ঘটে চলেছে এই আধুনিক কাল পর্যন্ত। তাই একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে ধরা পড়বে যে, পর্বত সৃষ্টির ক্রিয়া চলেছে প্রতি মুহূর্তে।

মিহির বসু

ইস্পাত নগরী—ভিলাই

গ্রাম থেকে নগরী :

মধ্যপ্রদেশের একটি ছোট গ্রাম। নাম তার ভিলাই। বছর ছয়েক আগেও সেখানে ছিল কুঁড়ে ঘর—চাষীর ক্ষেত ও খামার। শান্ত, স্নিগ্ধ ও সুন্দর ছিল ভিলাইয়ের পরিবেশ। দিগন্ত-বিস্তৃত গমের ক্ষেতের উপর দিয়ে বাতাস ঢেউ তুলে বয়ে যেত। ভোর না হতেই রাখাল বালকেরা পাঁচন হাতে বেড়িয়ে পড়তো গরু চরাতে। আবার পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ঢলে পড়তে না পড়তেই গরুর পাল নিয়ে রাখাল বালকেরা ফিরে আসতো ঘরে। সহরের ছোঁওয়া তখন একটুও লাগে নি ভিলাইয়ের বুকে। কে জানতো তখন—এই মনোরম গ্রামটিই একদিন পরিণত হবে বিরাট এক ইস্পাত নগরীতে! কে জানতো তখন—এই গ্রামের বুকেই গড়ে উঠবে ভারতের অন্যতম বৃহৎ ইস্পাতের কারখানা—লোহার ঠক্-ঠক্, ঠুন-ঠুন আওয়াজ আর অজস্র শ্রমিকের কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠবে গ্রামখানি! ভিলাইয়ের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে চাষীর চালা ঘর, চাষের জমি ও খামার! আর তার জায়গায় গড়ে উঠবে গগনচুম্বী চিম্‌নিযুক্ত বিরাট এক ইস্পাত কারখানা এবং কারখানার অজস্র শ্রমিকের জন্যে অসংখ্য বাসস্থান। সেই সঙ্গে পাকা রাস্তা, রেলপথ, স্কুল, বাজার ও হাসপাতাল—কিছুই বাকী থাকবে না। রাতের গাঢ় অন্ধকারকে ঘুচিয়ে দেবে অসংখ্য বিজলী বাতি। ভিলাইয়ের গ্রামত্বটুকু যাবে ঘুচে। অখ্যাতনামা এক গ্রাম পরিণত হবে এক অতি আধুনিক ইস্পাত নগরীতে!

না, এত বড় পরিবর্তনের কথা ভিলাই কেন—ভারতের কোন অধিবাসীই ভাবতে পারে নি ছ'বছর আগে। কিন্তু এই পরিবর্তনের কারণটা কি? গোড়াতেই তা বলে রাখা দরকার মনে করি।

কেন এই পরিবর্তন ?

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলো। তখন দেখা গেল, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশ রয়েছে অনেক পিছিয়ে। বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। কাজেই দেশের আর্থিক উন্নতি সাধনের যত রকম উপায় আছে, তার মধ্যে একটি হলো—দেশের ভারী শিল্প গড়ে তোলা। আর ভারী শিল্পের মধ্যে ইস্পাত শিল্প হচ্ছে অন্যতম।

ইস্পাত শিল্প আমাদের দেশে রয়েছে—সত্যি কথা। কিন্তু কারখানার সংখ্যা কম। উৎপাদনও কম। জামসেদপুরের টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী, বার্নপুরের ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী আর মহীশূরের মাইশোর আয়রন অ্যাণ্ড ওয়ার্কস—এই তিনটিই হচ্ছে ভারতের পুরনো কারখানা।

১৯৫৭ সালে ভারতে ইস্পাত উৎপন্ন হলো তের লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টন। কিন্তু চাহিদা বেশী। তাই সে বছর বিদেশ থেকে ইস্পাত আমদানী করতে হলো দশ লক্ষ সত্তর হাজার টন। এই পরিমাণ ইস্পাত কিনতে গিয়ে দেশের প্রচুর অর্থ বিদেশীদের হাতে তুলে দিতে হলো। সেটা দেশ ও দশের ক্ষতি। ভারত সরকার তা উপলব্ধি করলেন এবং দেশে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে মনস্থ করলেন। এই উদ্দেশ্যে পুরনো তিনটি ইস্পাত কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার ব্যবস্থা করা হলো। সেই সঙ্গে নতুন তিনটি ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলবার ব্যবস্থা স্থির হলো। ভিলাই হচ্ছে সেই নতুন তিনটি ইস্পাত কারখানার একটি।

ভারত-সোভিয়েট যুগ্ম প্রচেষ্টা ঃ

১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে স্থির হলো যে, মধ্যপ্রদেশের ভিলাই গ্রামে একটি নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হবে। এর কিছুকাল আগে থেকেই ভারত সরকারের সঙ্গে সোভিয়েট সরকারের কথাবার্তা চলছিল, নতুন কারখানাটির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে। ১৯৫৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে উভয় সরকারের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হলো। সেই চুক্তি অনুযায়ী স্থির হলো যে, সোভিয়েট সরকার নতুন কারখানার জন্যে প্রধান প্রধান যন্ত্রপাতিগুলি ধারে সরবরাহ করবেন। একজন সোভিয়েট চীফ ইঞ্জিনীয়ার এবং ইস্পাত শিল্পে অভিজ্ঞ একদল সুদক্ষ কারিগর নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করবেন। শুধু তাই নয়, কারখানার কাজ চালু হওয়ার পরও তিন বছর কিছু সংখ্যক সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়ার ভিলাইয়ে থাকবেন। তাঁদের কাজ হবে, কারখানার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সাহায্য করা ও পরামর্শ দান।

ভিলাই কারখানার পরিকল্পনা ও নক্সা প্রণয়ন করবেন সোভিয়েট বিশেষজ্ঞেরা। তার জন্যে ঐ বিশেষজ্ঞদের কুড়ি লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। ভারতে অবস্থানকালে সোভিয়েট কর্মীদের বেতন ভারত সরকারই বহন করবেন। ভিলাইয়ের পথ-ঘাট, রেলপথ, ঘরবাড়ী, স্কুল, হাসপাতাল—এককথায় ভিলাই নগরীটিকে গড়ে তোলা এবং কারখানা ও সহর পত্তনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মাল-মশলা সংগ্রহ করাই হবে ভারত সরকারের প্রধান কাজ।

ভারত-সোভিয়েট চুক্তিতে আরও স্থির হয় যে, ভিলাই পরিকল্পনার প্রতি পদক্ষেপে সোভিয়েট কর্মীদের সঙ্গে ভারতীয় কর্মীরা যুগ্মভাবে কাজ করবেন। কারখানার জন্যে যে যন্ত্রপাতিগুলি সোভিয়েট সরকার সরবরাহ করবেন, তার মূল্য ৬৩.১ কোটি টাকা। এই ঋণ বারোটি সমান কিস্তিতে ভারত সরকার শোধ করে দেবেন। ঋণের জন্যে শতকরা ২½% হারে সুদ দিতে হবে। সব ঋণ পরিশোধ করা হবে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে।

ভিলাইয়ে কারখানা প্রতিষ্ঠার সুবিধা ঃ

ভিলাইয়ে ইস্পাত নগরী প্রতিষ্ঠার পূর্বে বেশ ভালভাবে চিন্তা করে দেখতে হয়েছে, সুবিধা-অসুবিধার কথা। পরে সোভিয়েট ও ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের সুপারিশক্রমে ভিলাইকে ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে। স্থির হয়েছে, ভিলাই কারখানার জন্যে প্রয়োজনীয় লৌহ-প্রস্তর (আয়রন ওর) আনা হবে দাল্লি রাজহারা খনি থেকে। এই লোহার খনিটি ভিলাই থেকে মাইল ষাটেক দূরে। কয়লা আসবে প্রধানতঃ ঝরিয়ার কয়লা খনি থেকে। ঝরিয়া, ভিলাই থেকে ৪৬৩ মাইল দূরে। ঝরিয়া ছাড়াও ভিলাইয়ের জন্যে কয়লা আসবে ৪৮৫ মাইল দূরের কারগালি খনি থেকে। ইস্পাত উৎপাদনের আর একটি প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল হলো লাইমস্টোন। ভিলাইয়ের জন্যে লাইমস্টোন আসবে নন্দিনী পাহাড় থেকে। এ পাহাড়টি ভিলাই থেকে মাত্র ১২ মাইল দূরে। ইস্পাত উৎপাদনে লাইমস্টোন ছাড়াও দরকার ডোলোমাইট ও ম্যাঙ্গানিজ। ডোলোমাইট আসবে ৮০ মাইল দূরের হিরী খনি থেকে। আর ম্যাঙ্গানিজ কেনা হবে বাজার থেকে। কারখানার জন্যে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করবে ভিলাইয়ের কয়েকটি বৃহৎ জলাধার।

জল ছাড়াও বিদ্যুতের দরকার। কর্বার বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র ভিলাইকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। এ-ছাড়াও ভিলাইয়ের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ২৪,০০০ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ইস্পাত উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামালগুলি রয়েছে ভিলাইয়ের কাছেপিঠেই। জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবন্দোবস্ত রয়েছে ভিলাইয়ে। আর ভারতের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে নানাবিধ যান-বাহনের মাধ্যমে সহজ যোগাযোগ রয়েছে ভিলাইয়ের। এর ফলে কারখানার যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ভিলাইয়ে সহজে আনা যাবে, আর এখানে উৎপাদিত ইস্পাত ভারতের সর্বত্র সহজেই চালান দেওয়া যাবে। এসব সুবিধার বিষয় ভালভাবে বিবেচনা করেই ভিলাইকে ইস্পাত কারখানার উপযুক্ত স্থান হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে।

শেষ কথা ঃ

পরিকল্পনা তো বহু আগেই শেষ হয়েছে। কারখানা ও সহর নির্মাণের কাজও সমাপ্ত-প্রায়। ১৯৫৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ভিলাইয়ের প্রথম ব্লাস্ট-ফার্নেসটিতে আগুন ধরিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কারখানার উদ্বোধন করে গেছেন। ভিলাই কারখানায় ইস্পাত উৎপাদনও ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে। কারখানা ও নগরী গড়ে তুলতে খরচ হয়েছে মোট ১৭৮ কোটি টাকা। এত অর্থব্যয়, এত পরিশ্রম সার্থক হোক। ভিলাই আমাদের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করুক—আমরা এই শুভ কামনাই করি।

অমরনাথ রায়

আগুনে-পিঁপড়ে

ঘরের মধ্যে এবং আশেপাশে নানা জায়গায় তোমরা যে সব কীট-পতঙ্গ দেখতে পাও—তাদের মধ্যে পিঁপড়েই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পিঁপড়ের কথা কম-বেশী তোমরা সবাই জান। তবু এখন একজাতের দুর্ধর্ষ পিঁপড়ের কথা তোমাদের বলছি।

এরা আগুনে-পিঁপড়ে বা ফায়ার অ্যাণ্ট নামে পরিচিত। এদের এই অদ্ভুত নামকরণ কেন হলো—তা সঠিক বলা শক্ত। সম্ভবতঃ এদের উগ্র মেজাজের দরুণ ফায়ার অ্যাণ্ট নাম দেওয়া হয়ে থাকবে। ফায়ার অ্যাণ্ট এক সময়ে ছিল শুধু দক্ষিণ আমেরিকায়। পরে তারা নানাভাবে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

এরা সাধারণতঃ সিকি ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। আবার এর চেয়ে ছোট ফায়ার অ্যাণ্টও অনেক সময় দেখা যায়। এদের গায়ের রং সাধারণতঃ গাঢ় বাদামী বা লালচে-কালো। হুল-ই হলো এদের প্রধান হাতিয়ার। হুলটা থাকে শরীরে প্রান্তভাগে।

আগুনে-পিঁপড়েকে সর্বভুক বলা চলে ; এরা শস্যাদি তো উদরসাৎ করেই তাছাড়া ছোট-বড় কীট-পতঙ্গ থেকে পশুপাখী পর্যন্ত কোন কিছুই বাদ দেয় না। গাছের কাণ্ড থেকে এরা রস চুষে খায়—শিকড়, বোঁটা, কুঁড়িতে গর্ত করে শস্যাদি ও গাছপালার সাংঘাতিক ক্ষতি করে। কোন বাড়ীতে রুটি, পনির, মাখন. মাংস, বাদাম প্রভৃতির সন্ধান পেলে সেখানে দলবদ্ধভাবে অভিযান চালায়। এক-একটা দলে হাজার হাজার পিঁপড়ে থাকে। সুযোগ পেলে হাঁস মুরগীর বাচ্চা থেকে আরম্ভ করে গরু-বাছুর প্রভৃতি কাউকে আক্রমণ করতে ইতস্ততঃ করে না। অনেক সময় এরা হাঁস-মুরগীর বাসস্থল আক্রমণ করে তাদের তাড়িয়ে সদ্য ফোটা বাচ্চাগুলিকে খেয়ে ফেলে।

এদের বাসাগুলি মাটি দিয়ে তৈরী ঢিবির মত। ২০-২৫ ফুট অন্তর এই রকম অনেক মাটির ঢিবি থাকে। এক-একটা ঢিবিতে প্রায় বিশ-পঁচিশ হাজার পিঁপড়ে থাকে। ঢিবিগুলি ১০ থেকে ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত উঁচু হয় এবং সাধারণতঃ ১৫-২০ ইঞ্চির বেশী চওড়া হয় না।

শত্রু এদের বাসা আক্রমণ করলে এরা দলে দলে বাইরে এসে তাকে ঘিরে ফেলে। তারপর শক্তিশালী চোয়ালের সাহায্যে শত্রুর দেহের চামড়া কামড়ে ধরে শরীরটাকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে পিছনের হুলের সাহায্যে দংশন করে। এরা শত্রুর দেহে যে এক জায়গাতেই হুল ফোটায় তা নয়—এক-একটা পিঁপড়ে তিন-চারবার করে বিভিন্ন জায়গায় হুল ফুটিয়ে দেয়। হুল ফোটালেও কিন্তু কামড় ছাড়ে না, অর্থাৎ প্রথম যে জায়গায় কামড়ায়, শেষ পর্যন্ত সেখানেই লেগে থাকে।

এদের দংশনে খুব যন্ত্রণা হয়। হুল ফোটাবার কিছুক্ষণ পরে ক্ষত স্থানে ফুসকুড়ির মত হয় এবং সেটা শুকিয়ে গেলেও একটা দাগ থাকে। দেখা গেছে—কোন কোন লোক এদের আক্রমণে খুব কাতর হয়ে পড়ে। তাদের বুকে ব্যথা ধরে, বমির ভাব হয়—কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় মারাও যায়। এদের বিষে ফর্মিক অ্যাসিড থাকে বলে জ্বালা-যন্ত্রণা হয়। একবার যে এদের বিষের জ্বালা টের পেয়েছে, সে সব সময়েই এদের এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করে।

প্রত্যেক ঢিবিতে মাত্র কয়েক ডজন রাণী ও পুরুষ-পিঁপড়ে থাকে। বাদবাকী সব কর্মী। রাণী ও পুরুষ-পিঁপড়ের ডানা থাকে; কিন্তু কর্মীদের কোন ডানা নেই।

আগুনে-পিঁপড়ের হুল ফোটাবার কায়দা।

কর্মীরা স্ত্রীজাতীয় পিঁপড়ে হলেও তাদের ডিম পাড়বার ক্ষমতা নেই। রাণী-পিঁপড়েই কেবল ডিম পাড়ে।

রাণী ও পুরুষ-পিঁপড়েরা সাধারণতঃ বাসার বাইরে যায় না। কর্মীরাই খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে বাসায় নিয়ে আসে।

ডিম পাড়বার সময় হলে রাণী ও পুরুষ-পিঁপড়েরা বাসা ছেড়ে উড়তে থাকে এবং উড়ন্ত অবস্থায় তাদের মিলন হয়। মিলনের পর রাণী নীচে নেমে আসে (অনেক সময় দমকা বাতাসে এরা মারাও যায়)। নীচে নামবার পর রাণী একটা জায়গা ঠিক করে সেখানে ডিম পাড়বার জন্যে মাটির নীচে প্রায় তিন চার ইঞ্চি পর্যন্ত গর্ত

তৈরী করে। মিলনের পর রাণীর ডানা খসে যায়। এরা একবারে এক গোছায় ১০।১৫টা ডিম পাড়ে। একটা রাণী এই রকম এক-শো গোছা বা তারও বেশী ডিম পেড়ে থাকে। মিলনের পর পুরুষগুলি মরে যায়।

৮ থেকে ১২ দিনের মধ্যেই ডিমগুলি লার্ভা বা বাচ্চায় পরিণত হয়। তখন সেগুলির রং থাকে কাল্‌চে মত। তারপর ৬ দিন থেকে ১২ দিনের মধ্যেই লার্ভাগুলি পিউপায় পরিণত হয়। তখন এদের গায়ের রং হয় কিছুটা উজ্জ্বল সাদা এবং আকৃতিতে অনেকটা পূর্ণবয়স্ক পিঁপড়ের মত দেখায়। তারপর ৯ থেকে ১২ দিনের মধ্যেই পরিণত আকৃতির পিঁপড়েতে রূপান্তরিত হয়। এ-সময়ে বাচ্চাদের সবরকম তত্ত্বাবধান কর্মীরাই করে থাকে। খাদ্যাদি সংগ্রহ করে সেগুলিকে রাখবার সুব্যবস্থা, শত্রুর আক্রমণ থেকে বাসা রক্ষা, বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাসা নির্মাণের যাবতীয় কাজ কর্মীরাই সম্পন্ন করে।

শ্রীনীহাররঞ্জন ভট্টাচার্য।

জানবার কথা

১। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে লোকের কর্মক্ষমতাও কমে যায় বলে আমাদের প্রায় সকলেরই ধারণা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবিভাগ এ-সম্পর্কে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে বিপরীত ধারণা প্রকাশ করেছেন। সমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে তাঁরা দেখেছেন যে, যে সব লোকের বয়স ৪৫-এর বেশী তারা তাদের থেকে কম বয়স্কদের

১নং চিত্র

সমানই কর্মক্ষম থাকে। ৪৫ বছরের বেশী যাদের বয়স তাদের কর্মক্ষমতা ২৫ থেকে ৪৫ বছর বয়স্ক ব্যক্তিদের কর্মক্ষমতার সমান এবং ২৫ বছরের কম যাদের বয়স—তাদের

তুলনায় বেশী। সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে, বয়স্ক ব্যক্তিরা তুলনামূলক হিসাবে কাজের হার ঠিক রাখে, কামাই কম করে এবং কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে কম।

২। ল্যাটিন আমেরিকার আদিবাসী মায়ান ইণ্ডিয়ানেরা অদ্ভুত পদ্ধতিতে তাদের জুতা তৈরী করতো। তাদের জুতার দরকার হলে সোজা রবার গাছের কাছে চলে যেত। রবার গাছের ক্ষত স্থান থেকে গা বেয়ে যে কাঁচা রস গড়িয়ে পড়ে, সে রস একটা পাত্রে ধরে তার মধ্যে পা-দুটা বারবার ঢুকিয়ে দিত। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই

২নং চিত্র

তাদের জুতা (সে জুতার সঙ্গে অবশ্য আধুনিক জুতার কোন সাদৃশ্যই ছিল না) তৈরী হয়ে যেত। তাদের জুতা তৈরীর পদ্ধতিটা অতি সহজ হলেও জুতা কিন্তু তাদের পায়ে বেশ ভালভাবেই এঁটে থাকতো। ১৪৯২ সালে কলাম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই সেখানকার আদিবাসীরা এভাবেই জুতা প্রস্তুত করতো।

৩নং চিত্র

৩। জৈব আলোর কথা তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে। প্রাণী ও উদ্ভিদের

দেহ থেকে যে আলো নির্গত হয়, তাকেই জৈব আলো বলে। এদের শরীরের যে সব অংশ থেকে আলো নির্গত হয়—তাকে সাধারণভাবে লণ্ঠন বলা হয়। জোনাকির আলো একবার জ্বলে আবার নিবে যাবার ফলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত দেখায়। কয়েক জাতের মাছের শরীর থেকেও আলো নির্গত হয়। কয়েক রকম আলো-বিকিরণকারী জীবাণু পচা মাংসের মধ্যে জন্মায়। কম-বেশী ৪০ জাতের প্রাণী এবং দু'রকম উদ্ভিদ (ব্যাক্টিরিয়া ও ছত্রাক) আলো বিকিরণ করে থাকে।

৪। জাপানের নিক্কোতে অবস্থিত পবিত্র তোসোগু মন্দিরের দরজার উপরে একটি কাঠের ফলকে তিনটি বানরের মূর্তি আছে। এর উদ্দেশ্যে সাধারণকে দেখানো, এই বানর তিনটির একটি কোন খারাপ কথা বলে না, একটি খারাপ কথা শোনে না এবং
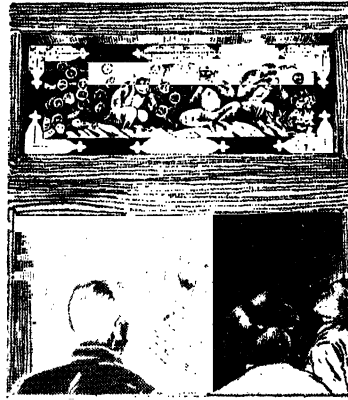
৪নং চিত্র

অপরটি খারাপ দৃশ্য দেখে না। সপ্তদশ শতাব্দীতে দরজার উপর তিন বানরের মূর্তি খোদাই করে রাখবার প্রথা চালু ছিল। তার পরে এই প্রথা চীন দেশে চালু হয় এবং পরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই প্রথা প্রচলিত হয়।

৫নং চিত্র

৫। অনেকের ধারণা, কোন জায়গায় একবারের বেশী বাজ পড়ে না। কিন্তু

অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, কোন কোন স্থানে দু'বার-তিনবার—এমন কি, আরও বেশী বার বাজ পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বছরের পর বছর একই জায়গায় বাজ পড়ে। যেমন—নিউইয়র্ক সহরের এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিংস্-এ কয়েক-শ' বার বাজ পড়েছে। কিন্তু এর ২৫,০০০ বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ কখনও তাদের বাস-গৃহের উপর বজ্রপাতের ফলে অস্বস্তি বোধ করে না। তার কারণ হলো—ইস্পাতের কাঠামোর উপর নির্মিত এই বাড়ীটি তড়িৎ-পরিচালক হিসাবে কাজ করে বিদ্যুৎ-প্রবাহকে মাটিতে মিলিয়ে যেতে সাহায্য করে।

৬। কোন কোন প্রাণীর দেহ থেকে পশম পাওয়া যায়। কোন কোন পোকা রেশমের সুতা তৈরী করে এবং তুলা গাছ থেকে তুলা পাওয়া যায়। এসব আমাদের জানা কথা। যদি বলা হয় কঠিন শিলা দিয়েও কাপড় বোনা যায়—তবে সে কথা তোমরা হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু কথাটা সত্যি। অ্যাজবেষ্টস (এক

৬নং চিত্র

প্রকার কঠিন খনিজ শিলা) ভেঙ্গে সরু সরু চুলের মত অংশে পরিণত হয় এবং সেগুলি দিয়ে কাপড় বোনা যায়। অ্যাজবেষ্টস অদাহ্য ও বিদ্যুৎ-প্রতিরোধক পদার্থ। প্রাচীন-কাল থেকেই অ্যাজবেষ্টস প্রদীপের পল্‌তে, মৃতদেহের পোষাক এবং গামছা তৈরীতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৭। চাঁদকে নিষ্ক্রিয় রীলে-কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি বেতার-বার্তা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা এই ব্যবস্থায় ওয়াশিংটন ডি. সি.-এর নিকটবর্তী মেরিল্যাণ্ড ও হাওয়াই রাজ্যে অবস্থিত কেন্দ্রসমূহের মধ্যে

সঙ্কেত-বার্তা আদান-প্রদান করেছেন। ২·৫ সেকেণ্ডের মধ্যে এই সঙ্কেত প্রায় ৫০০,০০০
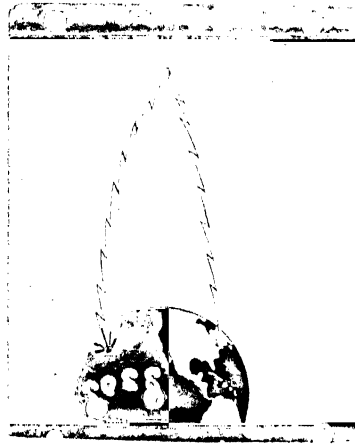
৭নং চিত্র

মাইল দূরত্ব অতিক্রম করেছিল।

৮। আব্রে ফেসেনডেন নামক একজন ক্যানাডিয়ান প্রথম বেতারে কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত প্রচার করেন। ফেসেনডেন এক সময়ে টমাস এডিসনের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত শ্রোতারা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন। ফনোগ্রাফে

৮নং চিত্র

ফেসেনডেন প্রথম হ্যাণ্ডেলের 'লার্গো' গেয়েছিলেন এবং বেহালায় গৌনডের 'ও হলিনাইট' বাজিয়েছিলেন। যেসব জাহাজে বেতার গ্রাহক-যন্ত্র ছিল—বেতারে প্রচারিত তাঁর অনুষ্ঠান সেখানে শোনা গিয়েছিল।

বিবিধ

হিলারির হিমালয় অভিযান

সার এডমণ্ড হিলারি হিমালয়ে এক অভিনব অভিযান পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার এই অভিযান নয় মাস ধরিয়া চলিবে এবং যে দলটি এই অভিযান পরিচালনা করিবে, তাহাতে থাকিবে সাতজন নিউজিল্যাণ্ডবাসী, পাঁচজন ইংরেজ, পাঁচজন আমেরিকান, ২০ জন শের্পা ও ৬৩০ জন ভারবাহক।

এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে এই অভিযান সুরু হইবে। ইহার উদ্দেশ্য হইল সাগর-পৃষ্ঠ হইতে বহু উচ্চে দীর্ঘকাল অবস্থানের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালনা করা; অক্সিজেন ব্যতিরেকে মাকালু পর্বত-শীর্ষে (২৮,৭৯০ ফুট,) আরোহণ এবং ইয়েতি অথবা "তুষার মানব" অনুসন্ধান।

অভিযানের মূল ঘাঁটি স্থাপিত হইবে কাঠমাণ্ডু হইতে ১৭০ মাইল দূরে, প্রায় ১৩,০০০ ফুট উচ্চে। সার এডমণ্ড ও দুইজন মনস্তত্ত্ববিদ্ সহ অভিযাত্রী দলের ছয় জন শীতের তিন মাস এভারেষ্ট হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে আমা ডাবলাম পর্বত শিখরের নিকটে ১৯,১০০ ফুট উচ্চ গিরিসঙ্কটে অতিবাহিত করিবেন। তাঁহারা একটি বিশেষভাবে নির্মিত প্রি-ফ্যাব কুটিরে বাস করিবেন। এই বারই প্রথম একদল অভিযাত্রী হিমালয়ে শীতকাল অতিবাহিত করিবার পরিকল্পনা করিতেছেন। ইহা নিঃসন্দেহে এভারেষ্ট আরোহণ অপেক্ষা অনেক বেশী দুরূহ হইবে। ইহার উদ্দেশ্য হইল সাগর-পৃষ্ঠ হইতে বহু উচ্চে অবস্থানের ফলে মানুষের মধ্যে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা আবিষ্কার করা। একমাত্র অ্যাণ্ডিস-এ ১৮,০০০ ফুট উচ্চে মনুষ্য-বসবাস লক্ষ্য করা যায়।

অক্সিজেন ব্যতিরেকে মাকালু পর্বত-শীর্ষে আরোহণের চেষ্টা পরবর্তী বসন্তকালে হইবে। একটি ফরাসী দল এই পর্বত আরোহণ করেন—কিন্তু তাঁহারা আরোহণকালে অক্সিজেন ব্যবহার করেন।

অভিযানে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইবে তাহার মধ্যে প্রায় ৪৪,০০০ পাউণ্ড ব্যয়িত হইবে "তুষার মানব" অনুসন্ধানের জন্য। ফ্ল্যাশলাইট সহ ১২টি ক্যামেরা দলের সহিত থাকিবে। সার এডমণ্ড বলেন—জন্তুর চিত্র গ্রহণ সম্ভব হইলে আমাদের গবেষণার কাজ অনেকটা সহজ হইবে।

তিনি আরও বলেন—আমাদের কাছে একটি ২০২-বন্দুক থাকিবে, যাহা ভেষজ পরিপূর্ণ হাই-পোডারমিক সিরিঞ্জ নিক্ষেপ করিতে পারে। ইহা জন্তুর কোন ক্ষতি করিবে না অথচ তাহা আমাদের পরীক্ষার সুযোগ দিবে। এই সঙ্গে দলের সহিত থাকিবে বাইনোকুলার ও ওয়াকি-টকি রেডিও।

অভিযানে যে সমস্ত সাজসরঞ্জাম ব্যবহৃত হইবে, তাহার অধিকাংশই বৃটিশ মেডিক্যাল গবেষণা পরিষদের মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ গ্রিফিথ পিউ কর্তৃক উদ্ভাবিত। ডাঃ পিউ মনস্তত্ত্ববিদদের দলটির নেতৃত্ব করিবেন। তিনি নিজেও এভারেষ্ট সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

এই অভিযানে হিমবাহ-তত্ত্ব এবং আবহতত্ত্ব সম্পর্কেও গবেষণা করা হইবে।

কফির গুণাগুণ সম্পর্কে গবেষণা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন লেকচারার ডাঃ অজিতকুমার মাইতি এবং মিচিগ্যান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডাঃ এডওয়ার্ড এফ. ডোমিনো জানিয়ে-

ছেন যে, এক কাপ কফি শরীরটাকে বেশ চাঙ্গা করে দিলেও প্রথম কাপের আড়াই ঘণ্টার মধ্যে যদি আরও কফি খাওয়া যায় তাহলে প্রথম কাপে শরীর যতটুকু চাঙ্গা হয়েছিল, তার বেশী আর হবে না।

এক কাপ কফিতে সাধারণতঃ ১০০ মিলিগ্র্যাম ক্যাফিন থাকে এবং পান করবার কুড়ি মিনিটের মধ্যে ক্যাফিনের কাজ স্থরু হয়ে যায়। এই জিনিষটি শরীরটাকে বেশ চাঙ্গা করে তোলে। আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত এর ক্রিয়া চলে। এই সময়ের মধ্যে এই এক কাপের পরে যত কাপই খাওয়া যাক না কেন, ক্যাফিনের কোন ক্রিয়াই আর শরীরের উপর হবে না। বিজ্ঞানীরা এই তিন ঘণ্টার মধ্যে প্রথম কাপ খাওয়ার পরে দেহের যে অবস্থার জন্যে ঐ বস্তুটির ক্রিয়া হয় না, তাকে বলেছেন 'ট্যাকোফিল্যাক্সিস'। তবে ডাঃ ডোমিনো বলেছেন যে, দৈহিক প্রকৃতি-ভেদে এই যে আড়াই ঘণ্টার কথা বলা হলো, তার তারতম্য হয়ে থকে। কফিতে যে অন্যান্য গুণ রয়েছে, তাঁরা তা নির্ধারণের চেষ্টা করেন নি। যে সব বস্তু ও ভেষজ স্নায়ুর উপর এবং মনের উপর ক্রিয়া করে থাকে, সে সব ভেষজ নিয়েই এঁরা মিচিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস্-এর উদ্যোগেই ডাঃ মাইতি ১৯৫৯ সালে দু-বছরের জন্যে মিচিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেষজ-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করবার জন্যে এসেছেন।

দেশী চামড়া হইতে উচ্চ শ্রেণীর জিলেটিন উৎপাদন

পুণার জাতীয় রসায়ন গবেষণাগারে দেশী চামড়া হইতে উচ্চ শ্রেণীর জিলেটিন উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দুই শত পাউণ্ড উৎপাদনক্ষম একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র স্থাপন করিয়া উক্ত পদ্ধতিতে উৎপাদন আরম্ভ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, চামড়া হইতে শতকরা ৪৮ ভাগ উচ্চ শ্রেণীর জিলেটিন ও আঠা পাওয়া যাইতে পারে। এক হাজার পাউণ্ড জিলেটিন ও সমপরিমাণ আঠা উৎপাদনের একটি কারখানা স্থাপন করিতে ৭ লক্ষ টাকার মত মূলধন বিনিয়োগ করিতে হইবে। বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থার মাসিক পত্র বিজ্ঞান প্রগতির জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। শিল্পে জিলেটিন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৯৫৮ সালে ৭ লক্ষ টাকা মূল্যের জিলেটিন আমদানী করা হইয়াছিল।

ঔষধের বটিকা প্রস্তুত করিতে ভুট্টার শ্বেতসার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমেদাবাদের এল. এম. কলেজ অব ফার্মেসী কলার শ্বেতসার প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ কাজে উহা ব্যবহার করা চলে। উক্ত পত্রিকায় কলার শ্বেতসার প্রস্তুতের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

খইল হইতে প্রোটিন কন্সেণ্ট্রেট তৈরীর পদ্ধতি উদ্ভাবন

লক্ষ্ণৌয়ের কেন্দ্রীয় ভেষজ-গবেষণাগারে পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, সরিষা ও তিলের খইল হইতে প্রস্তুত প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট পুষ্টির দিক দিয়া দুগ্ধজাত প্রোটিনের সমকক্ষ।

এই পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে সস্তায় দেশীয় দ্রব্য হইতে প্রোটিন কন্সেণ্ট্রেট প্রস্তুত করা যাইবে। বর্তমানে এই দ্রব্য বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করা হইয়া থাকে। প্রোটিনের অভাব-জনিত রোগের চিকিৎসায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

খইল হইতে প্রস্তুত প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট ইঁদুরের উপর প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে সকল রকম অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড রহিয়াছে। কৃত্রিম খাদ্য হিসাবে ইহা দিলে ছানা জাতীয় পদার্থের মতই শরীরের পুষ্টিসাধন করে। তাহা ছাড়া ইহার অন্তর্গত অ্যামিনো অ্যাসিড শরীর সহজেই গ্রহণ করিতে পারে।

'জার্নাল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ' পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যার এই উদ্ভাবনের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতে পঙ্গপালের আক্রমণ সম্ভাবনা

লণ্ডনস্থ পঙ্গপাল-বিরোধী গবেষণা কেন্দ্রের সাম্প্রতিক বিবরণী হইতে জানা যায়, ইরান ও পাকিস্তান হইতে শীঘ্রই ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল ভারত আক্রমণ করিতে পারে।

বিবরণীতে আরও বলা হইয়াছে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইরান ও পাকিস্তানের প্রজনন এলাকাগুলি হইতে এই আক্রমণের সম্ভাবনা বিশেষ রহিয়া গিয়াছে। ভারত, সুদান, ইথিওপিয়া, সোমালিল্যাণ্ড প্রটেকটরেট, দক্ষিণ-পশ্চিম আরব এবং পাকিস্তানে পঙ্গপালের বংশবৃদ্ধি অত্যধিক মাত্রায় লক্ষিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়।

নতুন পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ডের এক্স-রে চিত্র গ্রহণ

ইংল্যাণ্ডের হার্টফোর্ডশায়ারের অন্তর্গত সেণ্ট এলবান্সের মার্কনি ইনষ্ট্রুমেণ্টস্ লিমিটেড এমন একটি ইলেকট্রনিক এক্স-রে যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, যাহা মানুষের হৃৎপিণ্ডের স্পষ্টতর চিত্র গ্রহণ এবং দ্রুত রোগ-নির্ণয়ে চিকিৎসকদের সাহায্য করিবে। এই যন্ত্রটি বার্মিংহামের নিকটে ওয়ারউইকে কিং এডওয়ার্ড দি সেভেন মেমোরিয়াল হস্‌পিটালে স্থাপিত হইয়াছে।

এই নূতন যন্ত্রের নাম হইয়াছে মার্কনি লার্জ স্ক্রীন এক্স-রে ইমেজ এম্‌প্লিফায়ার। ইহার একটি সুবিধা হইল এই যে, ইহাতে রেডিয়েশনের পরিমাণ কম হইবার সম্ভাবনা আছে।

কিং এডওয়ার্ড হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ জন রেইসন বলেন, যন্ত্রটি হৃৎপিণ্ডের কাজকর্মের উপর নূতন আলোকপাত করিতে পারিবে। ক্যানাডার টোরোন্টো জেনারেল হাসপাতাল হইতে প্রথম এই যন্ত্র সরবরাহের এক অর্ডার আসিয়াছে।

প্লাষ্টিকের চুম্বক

প্লাষ্টিক, রবার আর অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য থেকে ইদানীং এমন সব জিনিষ তৈরী করা হচ্ছে, যাদের কোনটি ধাতুর গুণ, কোনটি কাঁচের গুণ, কোনটি আবার কাঠ, পাথর বা পশমের গুণ লাভ করছে। সোভিয়েট রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারেরা সম্প্রতি চুম্বকের গুণসম্পন্ন প্লাষ্টিক আর রবারের জিনিষ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। নমনীয় এই প্লাষ্টিক-চুম্বক একই আকারের ইস্পাত-চুম্বকের চেয়ে বেশী চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে এবং এর চৌম্বকশক্তি সাধারণ চুম্বকের চেয়ে ঢের বেশী স্থায়ী হয়। সাধারণ প্লাষ্টিক বা রবারের সঙ্গে এক বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অতি সূক্ষ্ম লৌহ-চূর্ণ মিশিয়ে এই প্লাষ্টিক রবার-চুম্বক তৈরী করা হয়। উৎপাদন-শিল্প ও নির্মাণকার্যাদিতে এই প্লাষ্টিক চুম্বক ইদানীং সোভিয়েট দেশে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে।

কারবিউরেটরবিহীন মোটর গাড়ী

লেনিনগ্রাডের অটোমোবাইল ইঞ্জিন রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের গবেষকেরা সম্প্রতি যে নতুন ধরণের মোটর ইঞ্জিন তৈরী করেছেন, তাতে কোন কারবিউরেটর নেই। কারবিউরেটরশূন্য ইঞ্জিন বসানো একটি মোটরগাড়ী পরীক্ষামূলকভাবে সাড়ে বারো হাজার মাইল পথ নির্বিঘ্নে অতিক্রম করেছে। এই মোটরগাড়ীটির বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এর কারবিউরেটরের কাজ চালনা করা হয় এক বিশেষ ধরণের ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা। এর ফলে যে কোন গতিতে চলবার সময়েই মোটর সিলিণ্ডারে পেট্রোল সরবরাহের কাজ নিখুঁতভাবে চলে এবং মোটরের কার্যকারিতা ২০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

সিলিণ্ডারে পেট্রোল সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় চৌম্বক-বৈদ্যুতিক ইন্‌জেক্টরের ভাল্‌ভ-এর মারফতে। পেট্রোল-পাইপের ভিতরের চাপ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় সর্বদাই সমান থাকে। এই ইলেক্‌ট্রনিক ব্যবস্থার যৎসামান্য অদলবদল করে একই যন্ত্রকে যে কোন অশ্বশক্তিসম্পন্ন মোটর-ইঞ্জিনে বসানো চলে।

নিয়েভেলির জন্যে বাষ্প-টার্বাইন

মাদ্রাজের কাছে নিয়েভেলি বিদ্যুৎ উৎপাদন স্টেশনের জন্যে লেনিনগ্রাডের ধাতু কারখানায় এক বিশেষ ধরণের ৫০ হাজার কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ষ্টিম-টার্বাইন তৈরী করা হয়েছে। এই টার্বাইনটি ৯০ অ্যাট্‌মস্ফিয়ার প্রাথমিক চাপ ৫২৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপাঙ্কে উত্তপ্ত বাষ্প দ্বারা চালিত হবে। এটিকে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে, যাতে দক্ষিণ ভারতের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এর কাজ নিখুঁতভাবে চলে এবং কোন যন্ত্রাংশ ক্ষয় না পায়। নিয়েভেলীর জন্যে ঠিক এই ধরণের আরও একটি টার্বাইন নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শেষ হবে।

গ্রহান্তরে প্রাণের অস্তিত্ব

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর মহাকাশ বিজ্ঞান সমিতির এক রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে, মঙ্গলগ্রহে কোন প্রকার প্রাণী আছে কিনা, তাহা যন্ত্রপাতি-সমন্বিত মহাশূন্য যানের সাহায্যে নির্ধারণ করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

এই যানে অণুবীক্ষণ, বেতারবীক্ষণ এবং মঙ্গল-গ্রহের মাটির নমুনা সংগ্রহের যন্ত্রপাতি থাকিবে। মঙ্গলগ্রহে অবতরণের পর ঐ মহাশূন্যযান হইতে একটি স্বচ্ছ ফিতা বাহির হইয়া আসিবে। ইহারই সাহায্যে মঙ্গলগ্রহের মাটির নমুনা সংগৃহীত হইবে এবং ইহার আলোক-চিত্রসমূহ বেতারবীক্ষণ-যোগে পৃথিবীতে প্রেরিত হইবে। বিজ্ঞানীরা এই সকল চিত্র পর্যালোচনা করিয়া সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না, তাহা নির্ধারণ করিবেন।

এই ধরণের পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্ভব কি না, তাহা প্রজনন-বিদ্যা বিশেষজ্ঞ নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডাঃ জশুয়া লিডারবার্গ পর্যালোচনা করিয়া দেখিতেছেন। গত ২রা মে, তিনি মহাশূন্য সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য গ্রহেও প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না, সে সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য বলিয়াছেন। তবে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে কখন যে পরীক্ষা চালানো হইবে, সে বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট তারিখের কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই। জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা ১৯৬২ সালের প্রথম দিকে এই বিষয়ে পরীক্ষা চালাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

চন্দ্র উপগ্রহে জল এবং বাতাস নাই বলিয়া সেখানে কোন প্রকার প্রাণীর অস্তিত্ব সম্ভব নহে—ডাঃ লিডারবার্গ এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

শিশুদের হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচার সম্ভাবনা

লণ্ডনের গ্রেট অরমণ্ড ষ্ট্রীট হস্পিটাল ফর সিক চিলড্রেন-এর সহিত যুক্ত ইনষ্টিটিউট অব চাইল্ড হেল্‌থ-এ শল্য-চিকিৎসকগণ শিশুদের হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচার সম্ভব করা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

চিকিৎসক দলের জনৈক মুখপাত্র বলেন, তিন বৎসরের চেষ্টার পর চিকিৎসকগণ শিশুদের জন্য একটি হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারা আশা করেন, কয়েক মাসের মধ্যেই তাহা ব্যবহার করা সম্ভব হইবে। বয়সে বড় শিশুদের ক্ষেত্রেও ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে।

হাসপাতালের জনৈক মুখপাত্র বলেন, শিশুদের ক্ষেত্রে এই যন্ত্রটি যে বিশেষ ফলপ্রদ হইবে, তাহার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। একটি দুই দিনের শিশুর ডায়াফ্রামে একটি ছিদ্র দেখা যায়, যাহার ফলে তাহার পাকস্থলী কণ্ঠনালী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। অবরুদ্ধ ফুস্‌ফুস বেলুনের ন্যায় ফুলিয়া ওঠে। তাহার অপারেশন হয় এবং অপারেশনের পর পাকস্থলী স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ডায়াফ্রামের ছিদ্রেরও সংস্কার হয় এবং ফুস্‌ফুস পুনরায় স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা লাভ করে।

ইনষ্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ এই সম্পর্কে কাজকর্ম সম্প্রসারণের জন্য ৪০০,০০০ পাউণ্ড অর্থ সাহায্যের আবেদন জানাইয়াছেন। এই অর্থের প্রায় এক চতুর্থাংশ ইতিমধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে।

মার্কিন যুগল উপগ্রহ

২২শে জুন প্রথম ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল হইতে থর এবল স্টার নামে একটি তিন-পর্যায়ী রকেটের সাহায্যে দুইটি কৃত্রিম উপগ্রহকে একই সঙ্গে ও একই সময়ে কক্ষপথে স্থাপন করা হইয়াছে। উপগ্রহদ্বয় পৃথিবী হইতে ৫০০ মাইল উর্ধ্বে থাকিয়া উপবৃত্তাকারে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদের অনুভূ হইতেছে ৪৬০ মাইল এবং অপভূ ৫৬৩ মাইল।

বিষুবরেখার দিকে ৬৭.৫ ডিগ্রী পর্যন্ত হেলিয়া পৃথিবী পরিক্রমা করিতেছে বলিয়া উপগ্রহদ্বয় কুমেরু এলাকার মধ্যবর্তী পৃথিবীর সকল অঞ্চলের উপর দিয়াই ঘুরিয়া আসিবে। ১০১.৫ মিনিটের মধ্যে ইহারা একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে।

এই উপগ্রহদ্বয়ের আয়ুষ্কাল ৫০ বছর পর্যন্ত হইতে পারে বলিয়া বিজ্ঞানীরা অনুমান করিতেছেন। তবে ইহাদের পক্ষে পাঁচ বছর পর্যন্তই বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রেরণ করা সম্ভব হইবে।

মার্কিন নৌ-বাহিনীর নির্দেশে ইহারা নির্মিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম আচ্ছাদন যুক্ত গোলাকৃতি ট্র্যানজিট-২-এ নামে বৃহত্তম উপগ্রহটির ওজন হইতেছে ২২৩ পাউণ্ড এবং ব্যাস ৩৬ ইঞ্চি। ইহার মধ্যে মহাকাশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বহু যন্ত্রপাতির সহিত ক্যানাডায় প্রস্তুত এক-প্রকার যন্ত্রও আছে। ইহার সাহায্যে এই প্রথম পৃথিবীর ২৫ মাইল উর্ধ্বে হইতে যে স্তর সুরু হইয়াছে, সেই স্তর সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। এতদ্ব্যতীত ইহার সাহায্যে পৃথিবীর এক মাইলের এক-দশমাংশ স্থানের মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হইবে। সঠিকভাবে জাহাজ চালনা ও সঠিক সময় নির্ধারণেও ইহা সাহায্য করিবে। ইহাতে ডিজিয়েল ক্লক নামে এক প্রকার ইলেকট্রনিক ঘড়ি রাখা হইয়াছে। ইহার সাহায্যেই সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সময় নির্ধারণ করা যাইবে।

ট্র্যানজিট-২-এ উপগ্রহের পৃষ্ঠস্থিত ৪৩ পাউণ্ড ওজনের ও ২০ ইঞ্চি ব্যাসের উপগ্রহটি বৃহত্তর উপগ্রহটির সঙ্গে উর্ধ্বাকাশে প্রেরিত হইবার পর একটি স্প্রিং ইহাকে উর্ধ্বদিকে ঠেলিয়া দেয়। ক্ষুদ্রতর উপগ্রহটি তখন পৃথক হইয়া যায়। সৌরতাপ বিকিরণের পরিমাণ নির্ধারণে ক্ষুদ্রতর উপগ্রহটি সাহায্য করিবে। ১৯৬২ সালের মধ্যে তিন হইতে ছয়টি ট্র্যানজিট উপগ্রহ ছাড়িবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

এই সকল উপগ্রহে রক্ষিত বেতার-যন্ত্র দুইটি সুস্পষ্টভাবেই সঙ্কেত ধ্বনি প্রেরণ করিতেছে। মেরিল্যাণ্ডের জন্ হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, অষ্টিনস্থিত টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়, সিয়াটেলস্থিত ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়, লাস ক্রুসেসস্থিত নিউ মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয় এবং আর্জেন্টিনা, নিউফাউলল্যাণ্ড ও ক্যানাডার মার্কিন নৌ-বাহিনীর বিমান ঘাঁটি, ইংল্যাণ্ডের টাশামাস্থিত এয়ারক্র্যাফট এস্টাব্লিশ-মেণ্ট এবং ব্রেজিলের স্যান জোস ডস ক্যাম্পস হইতে ইহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হইতেছে এবং ঐ সকল তথ্যাদি সংগৃহীত হইতেছে।

সিসল গাছ হইতে কৃত্রিম মোম উৎপাদন

পুণার জাতীয় রসায়ন গবেষণাগার সিসল গাছের আঁশ হইতে কর্নৌবা মোম উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছে। জুতা ও মোটর গাড়ীর পালিশ তৈয়ার করিতে কর্নৌবা মোমের প্রয়োজন হয়। কার্বন পেপারেও উহা ব্যবহৃত হয়।

এই জাতীয় মোম ভারতে উৎপন্ন হয় না। এই জন্য প্রতি বৎসর বহু টাকার কার্নৌবা মোম বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে ১৭ লক্ষাধিক টাকার ঐ জাতীয় মোম বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হয়। তাপ-নিরোধ উহার বিশেষ গুণ।

জাতীয় রসায়ন গবেষণাগারে সিসল পাতার আঁশ বাহির করিবার সময় এই মোম নিষ্কাশন করা হয়। ভারতের অনেক রাজ্যে সিসল গাছের চাষ হয় এবং সিসল পাতার আঁশ বাহির করিবার জন্য দেশে অনেক ছোট বড় কারখানা আছে। দেখা গিয়াছে যে, একটি ছোট যন্ত্রের সাহায্যে সাধারণ প্রক্রিয়ায় সিসলের ছাঁট হইতে ঐরূপ মোম পাওয়া যায়।

যাহারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সিসলের ছাঁট হইতে কার্নৌবা মোমের বিকল্প তৈয়ার করিতে ইচ্ছুক, তাহারা নয়াদিল্লীর লিটন রোডস্থ মণ্ডী হাউসের ঠিকানায় ভারতের জাতীয় গবেষণা উন্নয়ন করপোরেশনের কর্মসচিবের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারেন।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োদশ বর্ষ | অগাষ্ট, ১৯৬০ | অষ্টম সংখ্যা

মাইকেল ফ্যারাডে

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

বাবা কামারশালায় কাজে ব্যস্ত রয়েছেন ; সেই অবসরে ছোট্ট ছেলেটি ছাতে উঠেছে খেলা করতে। ধোঁয়া বেরিয়ে যাবার জন্যে ছাতে রয়েছে মস্ত একটা ফুটো, ছেলেটির সেদিকে খেয়াল নেই। পিছু হট্‌তে গিয়ে হঠাৎ সে নীচে পড়ে গেল, সেই ফুটো দিয়ে। ঠিক নীচেই লোহা পেটাবার নেহাই। তার উপর পড়লে আর রক্ষা ছিল না! কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে! ঠিক সেই সময় বাবা উবুড় হয়ে সেখানে কাজ করছিলেন, ছেলেটি পড়লো তার পিঠের উপর। তাই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ছেলেটি রক্ষা পেয়ে গেল। এই বালকই পরে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরূপে খ্যাতিলাভ করেন। এঁর নাম মাইকেল ফ্যারাডে।

মাইকেলের জন্ম হয় ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত নিউইংটন বাট্‌স্‌-এ, ১৭৯১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর। বাবা সামান্য কর্মকার। তাই ছোট-বেলায় তিনি লেখাপড়ার বিশেষ সুযোগ পেলেন না। মাত্র তেরো বছর বয়সেই তাঁকে কোন এক পুস্তক ব্যবসায়ীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করতে হলো। মনিব তাঁর কাজে এতদূর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, কিছুদিন তাঁকে দপ্তরীর কাজে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করেন।

দপ্তরীর কাজে নিযুক্ত থাকবার সময় মাইকেলের হাতে নানারকম পুস্তক আসতো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সব পুস্তক পাঠ করতেন। বিজ্ঞানের পুস্তক পাঠেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী। এর ফলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষ করে তড়িৎ সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল উদ্দীপিত হলো।

বৈজ্ঞানিক হিসেবে তখন হাম্ফ্রি ডেভির নাম দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই সুযোগ পেলেই ফ্যারাডে রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশনে যেতেন ডেভির বক্তৃতা শুনতে। ডেভির প্রাঞ্জল অথচ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনতে শুনতে বিজ্ঞান-অনুশীলনে ক্রমশঃই তাঁর আগ্রহ বাড়তে লাগলো। যতদূর সম্ভব তিনি ডেভির বক্তৃতা নোট করে নিতেন। আর সম্ভব হলে বাড়ী এসে সেই সব পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করতেন।

ফ্যারাডে স্কুল বা কলেজে শিক্ষালাভ করেন নি, তাই একাজে যে সব সময় সাফল্যলাভ করতেন,

তা নয়। বিফল হলে তাঁকে বুঝিয়ে দেবার কিংবা সাহায্য করবার কেউ ছিল না। কিন্তু তাঁর জ্ঞানার্জনের স্পৃহা এত প্রবল ছিল যে, এসব বাধা তাঁকে নিরুৎসাহিত না করে বরং দুঃসাহসী করে তুললো। একদিন তিনি সোজাসুজি ডেভির সাহায্য প্রার্থনা করে তাঁর কাছে এক পত্র লিখে বসলেন। নিষ্ঠা এবং সততার প্রমাণস্বরূপ নোট বইটিও ডেভির কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ডেভি তখন সম্মানের উচ্চতম শিখরে সমাসীন। দেশ-বিদেশে তাঁর কত নামডাক! দিনরাত কর্মব্যস্ত থাকেন। সামান্য একজন দপ্তরীর এমন আব্দারে কর্ণপাত করবার মত তাঁর সময় কোথায়? কিন্তু ফ্যারাডেকে তিনি নিরাশ করতে পারলেন না; কারণ ফ্যারাডের মধ্যে তিনি এক অপূর্ব প্রতিভার বীজ দেখতে পেলেন। এক মুহূর্তেই উপলব্ধি করলেন, উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলে এবং তাতে নিয়মিত জলসিঞ্চন করলে এই সামান্য বীজই একদিন বিরাট এক মহীরুহে পরিণত হবে। তাই ১৮১২ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তিনি ফ্যারাডেকে লিখলেন, "I am far from displeased with the proof you have given me of your confidence, and which displays great zeal, power of memory and attention. I am obliged to go out of town till the end of January; I will then see you at any time you wish. It would gratify me to be of any service to you; I wish it may be in my power."

এর অল্পদিন পরেই কর্মক্লান্ত দিনের শেষে ফ্যারাডে শয্যাগ্রহণের উদ্যোগ করছেন, এমন সময় তাঁর ক্ষুদ্র বাসগৃহের সম্মুখে একটি সুন্দর গাড়ী এসে দাঁড়ালো। একটি ভৃত্য নেমে এসে দরজায় করাঘাত করলো এবং একটি সংক্ষিপ্ত পত্র রেখে গেল। পত্রের মর্ম—ডেভি ফ্যারাডেকে পরদিন সকালে দেখা করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বলা বাহুল্য, আনন্দের আতিশয্যে ফ্যারাডে সারা-রাত ঘুমাতে পারলেন না।

এই সাক্ষাৎকারের ফল খুবই শুভ হলো। কারণ, এর ফলে ডেভি এতদূর সন্তুষ্ট হন যে, ফ্যারাডেকে নিজের লেবরেটরীতেই সহকারী নিযুক্ত করে নেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রতিভা এমনই জিনিষ যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করে। বাস্তবিক, প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে এসে আর একটি নূতন প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেল।

এরপর ডেভি যখন ইউরোপ সফরে বের হলেন, তখন ফ্যারাডেকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন সহকারী হিসেবে। ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাঁরা আবার লণ্ডনে ফিরে এলেন প্রায় দেড় বছর পরে। এখানে আসবার পর ফ্যারাডে পুনরায় রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশনের লেবরেটরীতেই সহকারীরূপে নিযুক্ত হলেন।

ত্রিশ বছর বয়সেও ফ্যারাডে সামান্য সহকারীর কাজই করতেন। তখন তাঁর বার্ষিক বেতন ছিল মাত্র একশ' পাউণ্ড (প্রায় ১,৫০০ টাকা)। এই সময় তিনি একজন রৌপ্যকারের কন্যার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এ-সম্পর্কে তাঁর ডায়েরীতে যা লিখেছিলেন, তা সংক্ষিপ্ত হলেও বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ।

Amongst these records and events, I here insert the date of one which, as a source of honour and happiness, far exceeds all the rest, we were married on June 12, 1821.

বত্রিশ বছর বয়স থেকে তিনি মাঝে মাঝে বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেতে লাগলেন, তাও যদি অধ্যাপক অনুপস্থিত থাকতেন, তাহলে। নিয়মিত বক্তৃতা দেবার সুযোগ এল ছত্রিশ বছর বয়সে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, তিনি রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশনে যোগ দেন বাইশ বছর বয়সে;

তাছাড়া আগে স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করবার সুযোগও তিনি পান নি। তাই তাঁর জীবনে সুযোগ আসতে এত দেরী হলো। কিন্তু তাঁর ছিল অপূর্ব অধ্যবসায় এবং জ্ঞানার্জনের অদম্য স্পৃহা। কাজেই অবশেষে সুযোগ যখন এল, তখন তিনি তা দু-হাতে আঁকড়ে ধরলেন। সব কাজ করতে লাগলেন অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে। তাই অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। এর আর একটা বড় কারণ ছিল—বিজ্ঞানের দুরূহ পরীক্ষা-প্রদর্শনে তাঁর অনন্যসাধারণ দক্ষতা।

প্রথম দিকে গুরুর দেখাদেখি তিনি ক্লোরিন সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন এবং কিছু কিছু নতুন তথ্য আবিষ্কারেও সক্ষম হন। কিন্তু এর অল্পদিন পরেই তিনি তড়িৎ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি এই বিষয়েই সবচেয়ে বেশী আগ্রহশীল ছিলেন। তড়িৎ সম্পর্কে তিনি অনেক মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তবে তার মধ্যে দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান প্রবন্ধে এই দুটি বিষয় সম্পর্কেই শুধু সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

যে সব যৌগিক পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় অথবা বিগলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করে এবং তার ফলে বিয়োজিত হয়ে নতুন পদার্থ উৎপন্ন করে, তাদের সাধারণভাবে তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ (electrolyte) বলা হয়। এগুলি অ্যাসিড, ক্ষার বা লবণ-জাতীয় পদার্থ হতে পারে।

তড়িৎ-বিশ্লেষণ সম্পর্কে নানারূপ পরীক্ষার ফলে ফ্যারাডে ১৮৩২ সালে দুটি সূত্র (Law) প্রকাশ করেন:

(১) কোন তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালে প্রতি তড়িৎ-দ্বারে সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণ তড়িতের পরিমাণের সমানুপাতিক হয়।

(২) বিভিন্ন তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের ভিতর দিয়ে একই পরিমাণ তড়িৎ পাঠালে, বিভিন্ন তড়িৎ-দ্বারে সঞ্চিত পদার্থগুলির ওজনের পরিমাণ তাদের নিজ নিজ রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের (Equivalent weight) সমানুপাতিক হয়।

এগুলি ফ্যারাডের তড়িৎ-বিশ্লেষণের সূত্রাবলী (Faraday's Laws of Electrolysis) বলে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

ফ্যারাডের সর্বপ্রধান আবিষ্কার হলো বৈদ্যুতিক ডায়নামো। দুটি সহজ পরীক্ষা থেকেই ডায়নামো আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। ফ্যারাডে দেখেন, একটা চুম্বকের কাছে একটা তারের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালাতে থাকলে চুম্বকটা ঘুরে যায়। আবার একটা শক্তিশালী চুম্বকের কাছে তড়িৎ-বাহী তার-কুণ্ডলী ঘোরবার ব্যবস্থায় রাখলে, সেটা বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকে। এই পরীক্ষায় যখন চুম্বক ও বৈদ্যুতিক তার সত্য সত্যই ঘুরতে আরম্ভ করলো, ফ্যারাডে তখন আনন্দে অধীর হয়ে ছোট্ট ছেলের মত নাচতে লাগলেন, আর চীৎকার করতে লাগলেন—'ঐ যে ওরা ঘুরছে', 'ঐ যে ওরা ঘুরছে'।

ফ্যারাডে বুঝলেন, চুম্বক ও তড়িতের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

এরপর তিনি আর একটি পরীক্ষা করেন। এতে তিনি দেখলেন, বদ্ধ একটি তার কুণ্ডলীর ভিতর চুম্বক দণ্ডের একটি মেরু খুব তাড়াতাড়ি প্রবেশ করালে কুণ্ডলীর তারে তড়িৎ প্রবাহিত হয়; কিন্তু চুম্বক থেমে গেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। আবার চুম্বকটি দ্রুত সরিয়ে নিলে বিপরীত দিকে তড়িৎ প্রবাহিত হতে থাকে। এতে বোঝা গেল, চুম্বক ও কুণ্ডলীর মধ্যে আপেক্ষিক গতি থাকলেই ক্ষণস্থায়ী তড়িৎ-প্রবাহের উৎপত্তি হয়। এর নাম তড়িচ্চুম্বকীয় আবেশ (Electro-magnetic induction)।

উপরিউক্ত পরীক্ষায় চুম্বক বা কুণ্ডলীর অবস্থান

পরিবর্তনের ফলে কুণ্ডলীর মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। চুম্বক তার-কুণ্ডলীর কাছে এলে কুণ্ডলীর মধ্যে বলরেখার (Lines of force) সংখ্যা বাড়ে, আবার চুম্বক দূরে সরে গেলে কুণ্ডলীর মধ্যে বলরেখার সংখ্যা কমে যায়। আবিষ্ট তড়িৎ-প্রবাহ কুণ্ডলীর অভ্যন্তরস্থ চৌম্বক বলরেখা পরিবর্তনের হারের সমানুপাতিক। বলরেখা বাড়লে যেদিকে প্রবাহ হয়, বলরেখা কমলে প্রবাহ তার বিপরীত দিকে হবে। একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকের দুটি মেরুর মধ্যে একটি বদ্ধ তার-কুণ্ডলী ঘোরালেও একই ফল পাওয়া যায়। আবার উপরিউক্ত পরীক্ষায় কুণ্ডলীতে তারের পাক যত বেশী থাকে, আবেশোদ্ভূত প্রবাহের তীব্রতাও তত বেশী হয়। এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করেই শেষ পর্যন্ত ডায়নামো নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। কাজেই ফ্যারাডের এসব আবিষ্কার যে অতি গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একদিন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্মুখে ফ্যারাডে তাঁর ডায়নামোর কার্যপ্রণালী বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। পরীক্ষা দেখে সবাই মুগ্ধ হন। কিন্তু একজন মহিলা ফ্যারাডের কাছে এসে বললেন—পরীক্ষাটি খুবই চমৎকার, কিন্তু এ কোন্ কাজে লাগবে? ফ্যারাডে উত্তর দিলেন—"জানি না। তবে আপনার ছোট্ট শিশুকে লালন-পালন করেন কেন বলুন তো? নিশ্চয়ই এই ভরসায় যে, সে একদিন বড় হয়ে সমাজের সেবা করবে।"

বাস্তবিক, লাভ-লোকসান বিচার করে গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া বিজ্ঞানীর ধর্ম নয়। একটি গবেষণার কাজ শেষ করেই তিনি আর একটি গবেষণায় হাত দেন। অজানাকে জানবার অদম্য কৌতূহলই তাঁকে ঠেলে নিয়ে যায় সাধনার দুর্গম পথে। বিজ্ঞানী যদি লাভ-লোকসান হিসেব করে তাঁর গবেষণা বন্ধ করে বসে থাকতেন, তাহলে বিজ্ঞানের এতটা উন্নতি কখনই সম্ভব হতো না।

গ্ল্যাডস্টোন তখন ইংল্যাণ্ডের চ্যান্সেলর অব দি এক্সচেকার। একদিন তিনি ফ্যারাডের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে ওয়েলস্ লিখেছেন—"The man of science tried in vain to explain some simple piece of apparatus to this fine flower of the parliamentary world. 'But', said Mr. Gladstone, 'after all, what good is it?' 'Why sir', said Faraday, doing his best to bring things home to him, presently you will be able to tax it."

সে দিন আসতে বেশী দেরী হয় নি। ফ্যারাডে যখন সত্তর বছর বয়সে পদার্পণ করেন, তখনই তিনি শিল্প-প্রয়োজনে ডায়নামোর সাহায্যে প্রচুর তড়িৎ-উৎপাদন করতে দেখেছিলেন। বাস্তবিক, ডায়নামো আবিষ্কৃত হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই শিল্প-ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লবের সূচনা হলো। কালক্রমে অনেক ক্ষেত্রেই বাষ্পীয় যন্ত্রকে পরাস্ত করে বৈদ্যুতিক যন্ত্র তার স্থান অধিকার করলো। তড়িতের সাহায্যেই বড় বড় নগর আলোকিত হলো, পাখা ঘুরলো, ট্রাম ও রেলগাড়ী চললো। তবে ফ্যারাডের পক্ষে এসব দেখে যাওয়া সম্ভব হয় নি; কারণ এসব ঘটেছে ধীরে ধীরে—প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে।

ফ্যারাডের কোন সন্তান ছিল না। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই তিনি এক ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিজের কন্যার মত লালন-পালন করতেন। বাড়ী ফিরে তার সঙ্গে খেলা করা বা তাকে বই পড়ে শোনানো ছিল তাঁর নিত্যকার কাজ। কোনদিন হয়তো তাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যেতেন এবং ছোট শিশুর মতই তার সঙ্গে নানাপ্রকার ছেলেমানুষী আনন্দে যোগ দিতেন। এক এক সময় দেখা যেত, বাঁদরের কার্যকলাপ দেখে তিনি ছেলেমানুষের মত এত হাঁসছেন যে, তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

ফ্যারাডে অতি সাধারণ অবস্থা থেকে সম্মানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেন। কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন নিরহঙ্কার। স্বাভাবিক অনাড়ম্বর

জীবনযাপন করতেই তিনি বেশী ভালবাসতেন। যশ কিংবা অর্থের প্রতি তাঁর কোন লোভ ছিল না। তাই তিনি নাইটহুড প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু তাই নয়, রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্টের পদও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে যে সময়টা তিনি বিজ্ঞানের সাধনায় নিয়োজিত করতে পারছেন, বড়লোক হলে কিংবা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকলে তাঁর পক্ষে তা কখনই সম্ভব হবে না। এই বিষয়ে তাঁর মনোভাব কিরূপ ছিল, তা নীচের চিঠিতেই ব্যক্ত হয়েছে—"In consequence of the good-will and confidence of all around me, I can at any moment convert my time into money, but I do not require more of the latter than is sufficient for necessary purposes." এক কথায় বলা যায়, তিনি ছিলেন সর্বকালের গবেষক বিজ্ঞানীদের আদর্শস্বরূপ। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের মতই তিনি ছিলেন সাধনায় একনিষ্ঠ।

এ-জন্যে শেষ বয়সে তিনি নিদারুণ অর্থসঙ্কটের সম্মুখীন হন। কিন্তু তখনও তাঁর আত্মমর্যাদা-বোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। ১৮৩৫ সালে, তাঁর আর্থিক অনটনের কথা জানতে পেরে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট পীল তাঁকে পেন্‌শন দিতে মনস্থ করেন। তাঁরই অভিপ্রায় অনুসারে ফ্যারাডে গেলেন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ণের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তাঁর বুর্জোয়াসুলভ মনোভাব ফ্যারাডেকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না। মনে হলো, লর্ড মেলবোর্ণ পেন্‌শন দেবার প্রথাকেই উপহাস করছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে অসাবধানে দু-একবার তিনি 'হামবাগ' কথাটাও উচ্চারণ করেছিলেন। এর ফলে ফ্যারাডে নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন এবং বাড়ী ফিরে এসেই পেন্‌শন প্রত্যাখ্যান করে পত্র লিখে পাঠান। অবশ্য বন্ধুবর্গের ঐকান্তিক চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত এর একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হয়ে যায়। লর্ড মেলবোর্ণ লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ফ্যারাডেও পেন্‌শন গ্রহণে সম্মত হন।

১৮৬৭ সালের ২৫শে অগাস্ট ফ্যারাডের জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়। ফ্যারাডের অভিপ্রায় অনুসারে শুধু আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে এবং অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে হাইগেট সমাধিস্থলে তাঁর নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ হলে গুণমুগ্ধ বন্ধুগণ গাছপালার আড়াল থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন এবং এই মহান বিজ্ঞানীর প্রতি হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ভূ-চৌম্বক সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

দ্বিতীয় সোভিয়েট মহাকাশযাত্রী রকেট চন্দ্র-পৃষ্ঠে অবতরণ করে তার বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে একটা বিস্ময়কর তথ্য এই যে, রকেট-বাহিত ম্যাগ্‌নেটোমিটার যন্ত্রে চন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে কোনও চৌম্বক-ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়ে নি। এই ব্যাপারটা যে কেবল চাঁদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য বহন করছে—তাই নয়, এতে ভূ-চৌম্বক সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিতও আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই প্রবন্ধে ভূ-চৌম্বক সমস্যা এবং তার সমাধানে চন্দ্রগামী রকেট কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

পৃথিবী যে একটা বিরাট চুম্বক, অথবা আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে—চৌম্বক ক্ষেত্রবিশিষ্ট গোলক, তা বহুকাল থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে। পৃথিবীকে ঘিরে যে একটা চৌম্বকক্ষেত্র আছে, তার সবচেয়ে সহজ ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করছে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের চুম্বক-শলাকা। অবশ্য এই চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক ও শক্তির পরিমাণ নির্ধারণ করবার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা ম্যাগ্‌নেটোমিটার নামক জটিল ও সূক্ষ্ম যন্ত্র ব্যবহার করেন। চুম্বক-শলাকা পৃথিবীর সর্বত্র প্রায় ভৌগলিক মেরু বরাবর থাকে। এ-থেকে মনে হয়, পৃথিবীর ভৌগলিক মেরুদ্বয়ের সন্নিকটে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে কোথাও দুটা চৌম্বক মেরু আছে এবং তার ফলে এরূপ একটা সহজ সিদ্ধান্ত মনে আসা স্বাভাবিক যে, পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড চৌম্বক পদার্থের গোলক, আর চৌম্বক মেরুদ্বয় ভৌগলিক মেরু থেকে কিছুটা তফাতে অবস্থিত। পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, পৃথিবীর ভৌগলিক মেরুরেখা ও চুম্বকীয় মেরুরেখার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম কোণ সৃষ্টি হয়েছে। এর নাম চৌম্বক-বিচ্যুতি। এর পরিমাণ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হলেও, মোটামুটি ১১°-এর মধ্যে থাকে। পৃথিবীর আকারের তুলনায় এর চৌম্বক ক্ষেত্রটা কিন্তু মোটেই শক্তিশালী নয়। পৃথিবী-পৃষ্ঠে এর মান প্রায় এক 'ওয়রষ্টেড'। (ওয়রষ্টেড হচ্ছে চৌম্বক শক্তি মাপবার একক)। সেই তুলনায় বিভিন্ন যন্ত্রশিল্পে যে সব শক্তিশালী কৃত্রিম চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়, তাদের শক্তির মান বহু হাজার ওয়রষ্টেড।

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সর্বস্বীকৃত হলেও এর উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে বহু সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। পৃথিবীকে যদি তার চুম্বকীয় ব্যাস বরাবর চুম্বকিত একটা গোলক বলে ধরা যায়, তাহলে সমস্যাটা খুবই সহজ হয়ে যায়। এ-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অবশ্য পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র পরীক্ষা করে পৃথিবী অভ্যন্তরে ঠিক কোথায় এই চৌম্বক ক্ষেত্রের উৎপত্তির উৎস অবস্থিত, তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে অগভীর বা গভীর স্তরে যে সব চৌম্বক ধাতু ও শিলা আছে, সেগুলিই এই চৌম্বক ক্ষেত্রের উৎস। পৃথিবীর অভ্যন্তরে বহুস্থানে লৌহ-খনিজের বিপুল সঞ্চয় আছে এবং যে সব স্থানে এরূপ সঞ্চয় আছে, সে সব স্থানে চৌম্বক ক্ষেত্রে নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। এরূপ বিশৃঙ্খলা পরীক্ষা করে পরে কোন কোন স্থানে ভূগর্ভে লৌহ-খনিজের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। চৌম্বক ক্ষেত্রের এরূপ ব্যাখ্যা সহজ হলেও এর অভ্রান্ততা সম্বন্ধে বহু সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। এর একটা বড় প্রতিবন্ধক এই যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে যতই

প্রবেশ করা যায়, ততই উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। উত্তাপে চুম্বকত্ব হ্রাস পায়, আবার একটা 'সঙ্কট' উষ্ণতায় উপস্থিত হলে চুম্বকত্ব একেবারে লোপ পেয়ে যায়। এই উষ্ণতার নাম 'ক্যুরি-পয়েণ্ট'। পৃথিবীর অভ্যন্তরে ৯০-১০০ মাইলের মধ্যে উষ্ণতা ক্যুরি-পয়েণ্ট ছাড়িয়ে যায়। সুতরাং পৃথিবীর অভ্যন্তরের কোন চৌম্বক পদার্থের চৌম্বক শক্তি থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য ১০০ মাইলের মধ্যে পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত শীতল বহিরাবরণে অবস্থিত চৌম্বক পদার্থের চৌম্বক শক্তি থাকতে পারে; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বলা যায়, তাদের চৌম্বক শক্তি পৃথিবীর বাস্তব চৌম্বক শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী হওয়া উচিত ছিল।

ভূ-কম্পন ও ভূ-বিক্ষোভ তরঙ্গের প্রবাহ পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রায় ১৮০০ মাইল গভীরতা থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত বস্তুসমূহ ঠিক তরল না হলেও প্রায় তরল অবস্থায় আছে। এই কেন্দ্রমণ্ডলের উষ্ণতা এত অধিক যে, এই অংশে কোন চৌম্বক পদার্থ থাকলেও তার চৌম্বক শক্তি থাকতেই পারে না। সুতরাং ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্র উৎপত্তির অন্য কোন ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলটি অর্ধ-তরল পদার্থে গঠিত হওয়ায় এর ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত হবার কোন বাধা নেই। মনে করা যেতে পারে যে, এরূপ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-প্রবাহই পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গেরই বা কেমন করে সৃষ্টি হচ্ছে? এ-সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দিলেও একটা বিশেষ জিনিষের উপর এখন বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যে এর অর্ধ-তরল কেন্দ্রমণ্ডলে একটা আলোড়ন বা প্রবাহের সৃষ্টি হতে পারে, যেমন করে এর বহিস্থ জল-মণ্ডলে একটা স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে। এখন এই কেন্দ্রমণ্ডলের কোন স্থানে যদি একটা ক্ষীণ চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে থাকে, তবে এই আলোড়নের জন্যে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের ফলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এরূপ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ একবার সৃষ্টি হলে কেন্দ্রস্থ চৌম্বক ক্ষেত্রটি ক্রমশঃ অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং এই ভাবে পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডল একটি ডায়নামোতে পরিণত হবে, যা চিরদিন স্বতঃই কার্যকরী থাকবে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে এরূপ একটি ডায়নামো আছে এবং সেই ডায়নামো থেকে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক তরঙ্গই পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করছে, বিজ্ঞানীদের এরূপ দৃঢ় ধারণা হয়েছে।

এই ডায়নামো-তত্ত্বের দ্বারা পৃথিবীর চৌম্বক মেরুরেখার বিচ্যুতিও ব্যাখ্যা করা সহজ হয়েছে। আরও একটি ব্যাপার এই যে, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের বছরে বছরে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তন আবার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম এবং একই স্থানেও এর বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়। ডায়নামো-তত্ত্বে এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যাও সহজসাধ্য। কারণ কেন্দ্রমণ্ডলের গঠন মোটেই সু-সম নয় এবং পৃথিবীর আহ্নিক গতিরও প্রতিবছরে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং কেন্দ্রমণ্ডলের আলোড়নটাও ঠিক সু-সম হতে পারে না। এই অ-সম আলোড়নের ফলে চৌম্বক ক্ষেত্রেও বৈষম্য আসতে পারে। আর একটি ব্যাপার, যা পূর্বে বিজ্ঞানীদের কাছে হেঁয়ালির মত ছিল, তাও এই তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরের শিলার চুম্বকন পরীক্ষা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, এদের চুম্বকনের দিক কোনও সময়ে বর্তমানের মত ছিল, নয় ঠিক বিপরীত দিকে ছিল। এ-জন্যে মনে করা হচ্ছে যে, পৃথিবীর চৌম্বক মেরুদ্বয় বহু লক্ষ বছর পূর্বে ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল; অর্থাৎ এখনকার উত্তর মেরুটা তখনকার দক্ষিণ মেরু ছিল এবং দক্ষিণ মেরুটা উত্তর মেরু ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরূপ ঠিক পরস্পর বিপরীত দিকে চুম্বকন ব্যতীত মধ্যবর্তী

কোন দিকে চুম্বকনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় নি। পৃথিবীকে চৌম্বক পদার্থ বলে স্বীকার করলে এই ব্যাপারটা এক মহা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। কারণ পৃথিবী গোলাকার বলে তার পক্ষে যে কোন ব্যাস বরাবর চুম্বকিত হওয়া সম্ভব। ডায়নামো-তত্ত্বে এখন এটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে যে, কেন্দ্র-মণ্ডলের আলোড়নের পরিবর্তনে তার চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকও হঠাৎ ঠিক বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু এ-পর্যন্ত এই ডায়নামো-তত্ত্বকে পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হয় নি; কারণ এই তত্ত্বটা এমন কয়েকটি প্রাথমিক অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাদের সত্যতা প্রমাণ করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কয়েক বছর পূর্বে সূর্য এবং অন্য কয়েকটি তারকার চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। সূর্য এবং তারকাদের অভাবনীয় উষ্ণতার জন্যে তাদের চৌম্বক ক্ষেত্র একমাত্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গ থেকেই উদ্ভূত হওয়া সম্ভব। এখন আবার দেখা যাচ্ছে যে, চন্দ্রগামী রকেট-বাহিত ম্যাগ্‌নেটোমিটার যন্ত্রে চন্দ্রের চৌম্বক ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নি। এর থেকে বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের ডায়নামো-তত্ত্বটাকে আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। চন্দ্রের আভ্যন্তরীণ উত্তাপ ও ভর এত কম যে, এর কেন্দ্রমণ্ডলে তরল বা অর্ধ-তরল পদার্থ থাকা সম্ভব নয়, এর সবটাই একেবারে নিরেট কঠিন। এই কারণে এর মধ্যে কোন আলোড়ন থাকতে পারে না। সে জন্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপন্ন হতে পারে না বলে চৌম্বক ক্ষেত্রও থাকতে পারে না। যে সব গ্রহ-নক্ষত্রের কেন্দ্র-মণ্ডল তরল বা গ্যাসীয় অবস্থায় আছে, তাদেরই চৌম্বক ক্ষেত্র থাকা সম্ভব। এভাবে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যায় ডায়নামো-তত্ত্ব এখন প্রাধান্য লাভ করেছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে যে সব রকেট প্রেরণ করবার পরিকল্পনা চলছে, তাদের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে এই মতবাদ আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়।
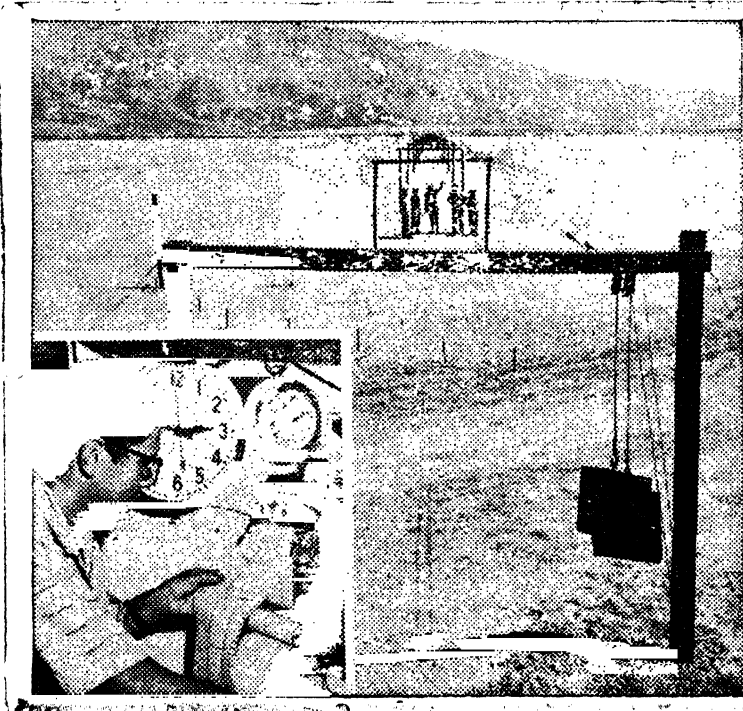
ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগোর নিকটে নির্মীয়মান বৃহদাকৃতির বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ৮০০ ফুট চওড়া এবং ১০,১০০ ফুট লম্বা একটি আয়তক্ষেত্রাকার তারের গ্রিড, রেডিও-তরঙ্গ অনুভূতিশীল একটি কেন্দ্রীয় চোখ ও একটি স্বয়ংক্রিয় পেন-রেকর্ডার আছে। এইটিই বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ নিশ্চল রেডিও-টেলিস্কোপ হবে।

মধুর ভেষজ গুণ

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ মধুর অসাধারণ ভেষজ গুণের কথা জেনেছে। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রাদিতে মধুর রোগাপহারক ও পুষ্টিবর্ধক শক্তির বিস্তর উল্লেখ আছে। এক সময়ে হিন্দুরা একে দেবভোগ্য বস্তু বলে মনে করতো; কাজেই সব রকম পূজা-পার্বণে মধুর ব্যবহার প্রচলিত আছে—মধু না হলে দেবতার ভোগ শুদ্ধ হয় না। কেবল হিন্দুশাস্ত্রেই নয়, প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের পৌরাণিক কাহিনীতেও মধুকে 'দেবভোগ্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাজার হাজার বছর পূর্বেকার মিশরীয় চিত্রলিপিতে মধুর স্বাস্থ্যপ্রদ ও ভেষজ গুণের অনেক উল্লেখ দেখা যায়। ভারতে বৌদ্ধযুগেই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয়; কিন্তু তার অনেক পূর্বেই আয়ুর্বেদে মধুর অসাধারণ গুণের বিষয় উল্লিখিত হয়েছিল।

ভারতীয় আয়ুর্বেদে সুশ্রুতের মত, প্রাচীন গ্রীসের হিপোক্রেটিসকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। উল্লিখিত আছে—এই হিপোক্রেটিস নাকি সুস্থ দেহে ১০৭ বছর বেঁচে ছিলেন। এরূপ দীর্ঘজীবন লাভের প্রকৃত রহস্য সম্বন্ধে তিনি বলে গেছেন, প্রতিদিন আহারের সঙ্গে এক চামচ বিশুদ্ধ মধু গ্রহণ করা দীর্ঘায়ু লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। মধুর স্বাস্থ্যপ্রদ ভেষজ গুণাবলী সম্পর্কে প্রাচীন কালের মানুষ যে বিশেষ অবহিত ছিলেন, তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদে প্রায় সব রকম ওষুধই মধুর অনুপান দিয়ে ব্যবহার করবার ব্যবস্থা আছে।

মৌমাছিরা যেভাবে বিন্দু বিন্দু ফুলের মধু চয়ন করে' তাদের চাকে সঞ্চয় করে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। মধু আহরণে মৌমাছিদের কেবল পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের কথাই নয়, তারা সেই মধুকে অপূর্ব কৌশলে বিশেষ গুণান্বিত করে তোলে। রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে মধু একটি অতি জটিল জৈবরাসায়নিক তরল পদার্থ। মাত্র এক আউন্স মধু তৈরি করবার জন্যে একটি মৌমাছিকে কমপক্ষে দশ হাজার ফুলের মধু বা পুষ্পসার আহরণ করতে হয়। একটি মৌমাছি-পরিবারে অবশ্য অসংখ্য মৌমাছি থাকে। তাদের সমবেত চেষ্টায় অনেক ক্ষেত্রে একটি ঋতুতেই প্রায় শতাধিক পাউণ্ড মধু সঞ্চিত হয়ে থাকে। জীবজগতে খাদ্য-সঞ্চয়ের জন্যে এরূপ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত বিরল।

মধুর বিশেষ কয়েকটি বীজাণুনাশক গুণ আছে। মধুর এরূপ গুণ কতকটা ফুল ও গাছ-গাছড়ার ভেষজ শক্তি থেকে আসে এবং কতকটা মৌমাছিদের মুখ-নিঃসৃত লালা থেকে উপজাত বলে মনে হয়। ষ্ট্রেপটোকক্কাস, টিটেনাস ব্যাসিলাস, বিভিন্ন ছত্রাক বা ফাঙ্গাস প্রভৃতি অনেক রোগ-জীবাণু মধুর সংস্পর্শে বিনষ্ট হয়ে যায়। এ জন্যে কেটে যাওয়া বা পুড়ে যাওয়ার ফলে যে সব পুরাতন ক্ষত থেকে অনবরত পুঁজ ঝরে—কিছুতেই সারে না, তাতে মধু লাগালে বেশ সুফল পাওয়া যায়। মাংস-পেশীর বেদনায় ও ফুলে-ওঠা গ্রন্থির উপরে চুন ও মধুর প্রলেপ লাগালে ব্যথা-বেদনার উপশম ঘটে। ফোঁড়ার উপরে মধুর প্রলেপ দিলে তাড়াতাড়ি পেকে ফেটে যায়, কোন রকমে দূষিত হওয়ারও ভয় থাকে না। এ-সব ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত আছে।

প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মতে, মধু যত পুরাতন হয় ততই নাকি তার গুণ বাড়ে। পুরাতন হলে মধুর ভেষজ গুণ বাড়ে বলে অবশ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু খাদ্য হিসাবে তার গুণ যে

কিছুমাত্র নষ্ট হয় না, তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা গত ১৯২৩ সালে মিশরের একটি অতি প্রাচীন পিরামিড খনন করে তার মধ্যে ফ্যারাও তুতেন্‌খামেনের মমি বা সংরক্ষিত শব আবিষ্কার করেন। তুতেন্‌খামেন খৃঃ পূঃ ৩৩১০ বছর পূর্বে মিশরের ফ্যারাও ছিলেন। এই সমাধি ক্ষেত্রে অন্যান্য বহু মূল্যবান সামগ্রীর সঙ্গে একটি পাথরের পাত্রে কয়েক সের মধুও পাওয়া যায়। এই মধুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কয়েক হাজার বছরের এই পুরাতন মধু কিছুমাত্র বিকৃত হয় নি, খাদ্য হিসাবে সম্পূর্ণ উপযোগী রয়েছে। আমরা জানি, হাওয়ায় ভাসমান বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবেই বিভিন্ন জৈব-পদার্থ পচে বিকৃত হয়ে যায়। কিন্তু মধুর জীবাণুনাশক অসাধারণ শক্তির জন্যে তা হাজার হাজার বছরেও বিকৃত হয় নি।

খাদ্য হিসাবে মধু যেমন সুস্বাদু, নানারকম ভিটামিন যুক্ত থাকায় তেমন আবার স্বাস্থ্যপ্রদ ও পুষ্টিকর। মধুর রোগনাশক ও রোগ-প্রতিরোধক শক্তিও অসামান্য। প্রাচীন কালের মানুষ যে মধুকে 'দেবভোগ্য' বলে উল্লেখ করে গেছেন, তা এ-যুগেও সব দেশেই স্বীকৃত। পৃথিবীর সব উন্নত দেশেই এখন মধু নিয়ে নানারকম রাসায়নিক গবেষণা ও পরীক্ষা চলছে এবং উন্নত ধরণের মধু উৎপাদনের জন্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মৌমাছি পালনের ব্যবস্থাও হয়েছে। মৌমাছি-পালন এখন একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই কাজে অদম্য উৎসাহ, অধ্যবসায় ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রয়োজন।

এ-কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বিভিন্ন স্থানের মধুর স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ ও গুণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। মৌচাকের নিকটবর্তী অঞ্চলের ফুল ও গাছ-গাছড়ার গুণগত বৈশিষ্ট্যের উপরে মধুর গুণ ও ধর্ম স্বভাবতঃই নির্ভর করে; কারণ ঐ সব ফুলের মধু সংগ্রহ করেই মৌমাছিরা চাকে সঞ্চিত রাখে। বিভিন্ন রকমের ফুল থেকে বিভিন্ন রকমের মধু হয়; যেমন—পদ্মমধু, মহুয়া মধু, অ্যাকেসিয়া মধু, চেস্টনাট মধু ইত্যাদি।

এসব বিভিন্ন প্রকারের মধুর স্বাদ-গন্ধ যেমন পৃথক, রোগ-নিরাময়ের গুণও তেমনি পৃথক হয়ে থাকে। মৌমাছিরা খুশীমত বন-জঙ্গলের যেখানে-সেখানে চাক বাঁধে ও মধু সঞ্চয় করে; কাজেই সেই মধু স্বভাবতঃই পাঁচমিশালী হয়। মধুর মোটামুটি গুণ তাতে থাকে সত্য, কিন্তু সুনির্দিষ্ট গুণবিশিষ্ট হয় না। এ-জন্যে নির্দিষ্ট গুণের ভিন্ন ভিন্ন রকমের মধু ইচ্ছামত মৌমাছিদের দিয়ে তৈরি করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা মানুষ করেছে এবং তাতে সফলও হয়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মৌমাছি-পালনের কেন্দ্র স্থাপন করে নিকটবর্তী স্থানে বিরাটাকারে নির্দিষ্ট ফুলের বাগান রচনা করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশগুলিতে এরূপ বহু মৌমাছি-পালনের কেন্দ্র স্থাপন করে উৎকৃষ্ট ও বিশেষ গুণবিশিষ্ট মধু উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এভাবে উৎপাদিত মধুর ভেষজ গুণ সম্পর্কে নানাভাবে পরীক্ষা চালিয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন। এক্ষেত্রে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের দান অসামান্য। সোভিয়েট বিজ্ঞানী ডাঃ ইয়োইরিশ দীর্ঘকাল ধরে এই বিষয়ে গবেষণা করে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তিনি মোট ৮৩ রকমের বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট মধু উৎপাদন করেছেন। তার কোনটিতে ভিটামিন-এ, কোনটিতে ভিটামিন-বি, কোনটিতে ভিটামিন-সি বা অ্যাটোফেন, থাইরয়ডিন প্রভৃতির পরিমাণ বেশী। মৌমাছি-পালনের কেন্দ্রে কেবল নির্দিষ্ট ফুলের উদ্যানই রচিত হয় না, মৌমাছিরা কোন্ কোন্ খাদ্য গ্রহণ করে, বিশেষ করে কোন্ কোন্ ফুলের মধু আহরণ করে—তার উপরেই চাকে সঞ্চিত মধুর গুণাগুণ নির্ভর করে। তাহলে পালন-কেন্দ্রগুলির এক-একটিতে যদি এক এক রকমের ফুলের গাছ জন্মানো যায় এবং এক এক রকমের খাদ্য পরিবেশিত হয়, তাহলে ইচ্ছামত

নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন মধুও পাওয়া যাবে। ডাঃ ইয়োইরিশ আবার বিশেষ প্রণালীতে এসব বিভিন্ন গুণসম্পন্ন মধুর এক ধরণের রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বহু ভিটামিনযুক্ত ও বিশেষ ভেষজ গুণবিশিষ্ট মধু তৈরি করেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা-প্রণালীতেও বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের কাজে ইদানীং মধু ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। সোভিয়েট দেশের কোন কোন হাসপাতালে ফুস্ফুসের যক্ষ্মারোগগ্রস্ত রোগীদের মধু ব্যবহার করিয়ে যথেষ্ট সুফল লাভ হয়েছে। এসব রোগীদের প্রত্যহ ১০০ থেকে ১৫০ গ্র্যাম মধু নিয়মিত ব্যবস্থায় খেতে দেওয়া হয়। এর ফলে ক্রমেই এদের কাশি কমতে থাকে, রক্তের সংযুতি স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং রোগীর ওজন বেড়ে যায়। পাকস্থলীর ক্ষত বা গ্যাষ্ট্রিক আল্‌সারের পক্ষেও মধু বিশেষ উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই দুরারোগ্য রোগে মধুর নিরাময়-শক্তি আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও আশার সঞ্চার করেছে। এরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দৈনিক ৬০০ গ্র্যাম বিশুদ্ধ মধু সেবন করিয়ে দেখা গেছে, অল্পদিনের মধ্যেই পেটের যন্ত্রণা, বমির ভাব ও বুক-জ্বালা একেবারে দূর হয়ে যায়। শুনা যায়, আজকাল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র হাসপাতাল-গুলিতে উপরিউক্ত রোগের চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে মধু ব্যবহার করা হচ্ছে।

এভাবে বিভিন্ন কঠিন রোগে মধুর নিরাময়-শক্তি প্রমাণিত হওয়ায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা মধু নিয়ে এখন ব্যাপকভাবে গবেষণা করে যাচ্ছেন। এসব কাজে উন্নত প্রণালীতে উৎপাদিত বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ মধুর চাহিদা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সব দেশেই এখন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মৌমাছি পালন করা হয় এবং ইচ্ছামত বিভিন্ন গুণ-সম্পন্ন মধু প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। আর সর্বত্রই এখন পূর্বোল্লিখিত ডাঃ ইয়োইরিশের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে মৌমাছি-পালন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এসব কেন্দ্রে বিশেষ বিশেষ ফুল ও গাছ-গাছড়ার বাগান তৈরি করা হয়। উপযুক্ত স্থানে মৌমাছিদের চাক তৈরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এবং তার কাছাকাছি জায়গায় রাখা হয় মৌমাছিদের খাদ্যসামগ্রী। এসব খাদ্যের মধ্যে প্রধানতঃ থাকে ডিমের শ্বেতাংশ, দুধ থেকে তোলা চর্বি, বিভিন্ন ফল ও সব্জির রস, সুমিষ্ট রাসায়নিক দ্রবণ প্রভৃতি। এই পদ্ধতিতে মৌমাছিদের মধু আহরণের জন্যে এখন আর প্রকৃতির উপরে নির্ভর করতে হয় না। বছরের যে কোন সময়ে, এমন কি—শীতকালেও মধু উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

আমাদের দেশে এরূপ উন্নত পদ্ধতিতে মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদনের ব্যবস্থা এখনও হয় নি; তবে অনেকে ব্যবসায় হিসাবে মৌমাছি পালনের কিছু কিছু চেষ্টা করছেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিরাট আকারে কেন্দ্র স্থাপন করতে যে উৎসাহ, উদ্যম ও অর্থের প্রয়োজন, তা এদেশে সাধারণ কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব নয়। সরকারী উদ্যোগে এর ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়; সরকারী বনবিভাগের পক্ষে এই প্রচেষ্টা সহজেই ফলবতী হতে পারে। কিছু কিছু চেষ্টা চলছে, কিন্তু তা নিতান্ত গতানুগতিক ধারায়। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি নিয়ে অগ্রসর না হলে এরূপ কাজে আশানুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিম বাংলা সরকারের বনবিভাগ থেকে ইদানীং সুন্দরবন অঞ্চলের মধু আহরণ ও জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু এই মধু স্বভাবজাত পাঁচমিশালী মধু, সাধারণ ব্যবস্থায় সংগৃহীত বলে তেমন উন্নত গুণসম্পন্ন বা বিশুদ্ধও নয়। মধুর অসামান্য ভেষজ গুণের কথা স্মরণ করে সরকারের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

ভারতীয় লৌহ-আকরিকের শ্রেণীবিভাগ

শ্রীকানাইলাল চক্রবর্তী

ভারতবর্ষ যে লৌহ-আকরিকের অফুরন্ত ভাণ্ডার, সে কথা কাহারও অজ্ঞানা নয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে এই দেশের প্রতিটি ধূলিমুষ্টিতে লৌহের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই কিছু না কিছু লৌহ-আকরিকের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যেগুলিতে লৌহের পরিমাণ বেশী এবং সেগুলি পৃথিবীর লৌহ-সমৃদ্ধ বৃহৎ অঞ্চলসমূহের সমকক্ষ, তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত অঞ্চলগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

১। বিহারে সিংভূম জেলা।

২। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও কেওঞ্জর অঞ্চল।

৩। মধ্যপ্রদেশে বাস্তার জেলা।

৪। দক্ষিণ ভারতের মহীশূর জেলা।

এই সকল অঞ্চলের আকরিকের প্রত্যেকটিতেই লৌহের পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগের বেশী।

ইহা ছাড়াও বাংলাদেশের রাণীগঞ্জ অঞ্চল, বিহারের পালামৌ জেলা, আসাম, উড়িষ্যা, প্রাক্তন বোম্বাই প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে লৌহ-আকরিকের অস্তিত্ব রহিয়াছে। এই অফুরন্ত লৌহ-ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়নের প্রারম্ভে এই আকরিকের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সর্বপ্রকার ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চলিতেছে।

এই লৌহ-আকরিকের শ্রেণীবিভাগ ভূ-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ আলোচনার বিষয়। লৌহের পরিমাণের উপরই সাধারণতঃ আকরিকের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। ভারতীয় লৌহ-আকরিকের প্রায় সর্বগুলিতেই শতকরা ৬০ ভাগের অধিক লৌহ পাওয়া যায়। কাজেই এগুলিকে প্রথম শ্রেণীর আকরিক বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায় এবং অনায়াসে লৌহ ও লৌহজাত অন্যান্য মিশ্রধাতু তৈয়ারীর কাজে ব্যবহার করা চলে। কিন্তু এই দেশের বিভিন্ন স্থানে (যেমন—উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও কেওঞ্জর অঞ্চল) এমন কতকগুলি লৌহ-আকরিকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে লৌহ ছাড়াও কিছু কিছু বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থ (যেমন—ভেনাডিয়াম, টাইটানিয়াম প্রভৃতি) রহিয়াছে। এই আকরিকসমূহে লৌহের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম এবং ভেনাডিয়াম, টাইটানিয়াম প্রভৃতি ধাতব পদার্থের অপসারণও একপ্রকার অসম্ভব। কাজেই লৌহ প্রস্তুতের কাজে আজও ইহার ব্যবহার হয় না এবং এই জাতীয় আকরিকের শ্রেণীবিভাগ করাও সম্ভব নহে।

কিন্তু আমরা যদি লৌহ-আকরিকের জন্ম ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে ইহার শ্রেণীবিভাগ করা বিশেষ কঠিন বলিয়া মনে হয় না। ভূপৃষ্ঠে লৌহ-আকরিকের বিন্যাস ভালভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের একটা সহজাত ধর্ম আছে। সাধারণতঃ তিন প্রকার শিলাগোষ্ঠীর সঙ্গে ইহারা সংশ্লিষ্ট থাকে: যথা—স্তরীভূত শিলা, আগ্নেয় শিলা এবং রূপান্তরিত শিলা। এই সকল লৌহ-আকরিকের মণিক ও রাসায়নিক গঠনও বিভিন্ন। স্তরীভূত শিলার ভিতর যে লৌহ-আকরিক পাওয়া যায়, তাহা সাধারণতঃ হিমাটাইট (Fe_2O_3) মণিক দ্বারা গঠিত এবং ইহাতে লৌহের পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগের অধিক। একপ্রকার স্তরবিন্যস্ত হিমাটাইট কোয়ার্টজাইট (B. H. Q.) প্রস্তরই এই আকরিকের প্রধান উৎস। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র

লৌহ-শিল্পে এই শ্রেণীর আকরিকের ব্যবহারই অধিক। আগ্নেয়শিলা জড়িত লৌহ-আকরিক সাধারণতঃ ম্যাগ্‌নেটাইট (FeO, Fe_2O_3) মণিক দ্বারা গঠিত এবং লৌহ ছাড়াও ইহাতে আছে ভেনাডিয়াম ও টাইটানিয়াম প্রভৃতি ধাতু। তৃতীয় শ্রেণীর লৌহ-আকরিকে হিমাটাইট এবং ম্যাগ্‌নেটাইট দুই-ই থাকে। ইহাতে লৌহের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম এবং অধিক পরিমাণ ম্যাগ্‌নেটাইট ও সিলিকা (SiO_2) থাকায় এই আকরিক সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হয় না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এই তিন শ্রেণীর লৌহ আকরিকের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের ভিতর প্রথম শ্রেণীর আকরিকের পরিমাণই সর্বাধিক।

অতএব দেখা যাইতেছে, উৎপত্তির উপর ভিত্তি করিয়া ভারতীয় লৌহ-আকরিকের নিম্নোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব:

১। স্তরীভূত লৌহ-আকরিক:—বাংলাদেশের রাণীগঞ্জ, বিহারের সিংভূম জেলা, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও কেওঞ্জর, মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলা এবং মহীশূর রাজ্যে এই শ্রেণীর লৌহ-আকরিকের প্রচুর অস্তিত্ব রহিয়াছে।

২। আগ্নেয় লৌহ-আকরিক:—এই আকরিক সাধারণতঃ ক্ষারকীয় আগ্নেয়শিলা যথা—গ্যাব্রো, এনর্থসাইট, নোরাইট ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও কেওঞ্জর জেলা ও মহীশূর রাজ্যে এই শ্রেণীর আকরিক অল্পবিস্তর পাওয়া যায়।

৩। রূপান্তরিত লৌহ-আকরিক:—বিহারের পালামৌ জেলা, মধ্য প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের কয়েক স্থানে এই শ্রেণীর আকরিক আছে। দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ল্যাটেরাইট প্রস্তরকে যদি এই শ্রেণীভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে এই আকরিকের পরিমাণও এই দেশে কম নয়। ল্যাটেরাইটে লৌহের পরিমাণ শতকরা ২৫ হইতে ৩০ ভাগের অধিক নয়। ভারতবর্ষে স্তরীভূত লৌহ-আকরিকের প্রচুর অস্তিত্ব থাকিবার ফলে ল্যাটেরাইট প্রস্তর আজও অব্যবহৃত রহিয়াছে। কিন্তু জাপান, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলিতে স্তরীভূত লৌহ-আকরিকের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় তাহারা এই ল্যাটেরাইট পাথরকেই শোধন করিয়া লৌহ-শিল্পে ব্যবহার করিতেছে।

আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে লৌহ, ইস্পাত ও লৌহজাত মিশ্রধাতু প্রস্তুতের কাজে প্রথম শ্রেণীর লৌহ-আকরিকই ব্যবহৃত হইতেছে। এই আকরিক যে শুধু দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদাই মিটাইতেছে—তাহা নহে, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, জার্মেনী, জাপান প্রভৃতি দেশে এই উচ্চ শ্রেণীর আকরিক রপ্তানী করিয়া ভারত প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে (প্রায় দশ কোটি টাকা) বিদেশী মুদ্রাও অর্জন করিতেছে।

আয়নোস্ফিয়ার ও বেতার-তরঙ্গ

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ভট্টাচার্য

আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে বাতাসের একটি আবরণ। পৃথিবীর বহু প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই বায়ুমণ্ডল। ঝড়-বৃষ্টি, তুষারপাত, বজ্রপাত প্রভৃতি বিবিধ ঘটনাবলীর মাধ্যম হলো এই বায়ুমণ্ডল; অথবা বলা যেতে পারে—পৃথিবীর গরম বা ঠাণ্ডা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত করছে বায়ুমণ্ডলের ঘটনাবলী। এসব ঘটনাগুলির উৎপত্তিস্থল হলো বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরগুলি। কিন্তু তাছাড়াও পৃথিবীর আর একটি আবহাওয়া আছে, যাকে বলা যেতে পারে বৈদ্যুতিক আবহাওয়া। বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরগুলি হলো এই বৈদ্যুতিক আবহাওয়ার উৎপত্তিস্থল। ভূপৃষ্ঠের উপরে ৩২ থেকে ৪৫ মাইল বাদ দিয়ে তার উপরে যে স্তরগুলি আছে, সেখান থেকেই এই আবহাওয়ার উৎপত্তি হয়ে থাকে। এই অঞ্চলকে বলা হয় আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নায়িত বায়বীয় স্তর।

সুতরাং বায়ুমণ্ডলের বৃহত্তম অংশ জুড়ে রয়েছে এই আয়নোস্ফিয়ার। কিন্তু এখানকার বাতাসের ঘনত্ব খুবই কম। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, এখানকার বাতাসের এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, যা নীচেকার স্তরগুলিতে নেই। যেমন এই অঞ্চলের বায়ু বিদ্যুৎপরিবাহী। কিছুকাল আগেও উপরকার স্তরগুলির এই কার্যকলাপ অদ্ভুত বলে বর্ণনা করা হতো। কিন্তু বহু অনুসন্ধান ও পরীক্ষার পর জানা গেছে যে, মেরুজ্যোতি, চুম্বক-ঝটিকা, বেতার-তরঙ্গের দূরদূরান্তে ছড়িয়ে-পড়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি ঘটছে এই আয়নোস্ফিয়ারের অস্তিত্বের ফলে। অন্য সব ঘটনার কথা বাদ দিয়ে, কেমন করে এই স্তরের সৃষ্টি হয় ও তার বিশেষত্ব এবং বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলনে তার ভূমিকা নিয়েই এখানে আলোচনা করবো।

আমাদের বায়ুমণ্ডল প্রধানতঃ নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস নিয়ে গঠিত। আমাদের চতুর্দিকে যাবতীয় জিনিষের মত এই গ্যাসগুলিও অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর সমষ্টি। এই অণুগুলি আরও ছোট কণিকা, অর্থাৎ পরমাণু দিয়ে গঠিত। এই ক্ষুদ্র পরমাণু আবার ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন নামে আরও কতকগুলি ছোট কণিকার সমবায়ে গঠিত। ইলেক্ট্রন ঋণ-তড়িতাবিষ্ট, প্রোটন ধন-তড়িতাবিষ্ট এবং নিউট্রন নিস্তড়িৎ কণিকা। পরমাণুর কেন্দ্রীয় অংশটি হলো প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে গঠিত অতি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস। ইলেক্ট্রনগুলি এই নিউক্লিয়াসের চারধারে ঘুরে বেড়ায়। ইলেক্ট্রনের এই ঘূর্ণনের কক্ষপথ নিয়েই হলো সমগ্র পরমাণু। পরমাণুর বিভিন্ন কণিকাগুলি তড়িৎবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সমগ্রভাবে তড়িৎ-নিরপেক্ষ। এর কারণ হলো নিউক্লিয়াসের ধন-তড়িৎশক্তি সেই পরমাণুর ইলেক্ট্রনগুলির সমগ্র তড়িৎ-শক্তির সমান। পরমাণু যেমন স্বাভাবিক অবস্থায় তড়িৎ-নিরপেক্ষ, অণুও তেমনি স্বাভাবিক অবস্থায় তড়িৎ-নিরপেক্ষ। পরমাণু বা অণু হলো পদার্থ-কণিকাসমূহের এক সুদৃঢ় অবস্থা। প্রতিটি পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি তড়িৎ-শক্তির আকর্ষণের জোরে ধন-তড়িতাবিষ্ট নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সুসংবদ্ধ। এই কারণেই তারা সহজে নিউক্লিয়াস থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।

কিন্তু তড়িৎ-নিরপেক্ষ একটি অণু বা পরমাণু থেকে যদি এক বা একাধিক ইলেকট্রন বেরিয়ে যায়, তবে ঐ অণু বা পরমাণুটি ধন-তড়িতাবিষ্ট হয়ে পড়বে। আবার যদি কোন তড়িৎ-নিরপেক্ষ অণু

বা পরমাণুর মধ্যে বাইরের একটি ইলেকট্রন ঢুকে পড়ে, তবে সেক্ষেত্রে অণু বা পরমাণুটি ঋণ-তড়িতাবিষ্ট হয়ে পড়বে। এরূপ তড়িতাবিষ্ট অণু বা পরমাণুকে বলা হয় আয়ন। উপরের বায়ুর স্তরের উপাদানগুলি এভাবে আয়নায়িত অবস্থায় থাকে বলেই সেই স্তরগুলিকে বলা হয় আয়নোস্ফিয়ার।

এখন প্রশ্ন হলো—একটি পরমাণু বা অণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করতে যে শক্তির প্রয়োজন, সে শক্তিটা আসে কোথা থেকে? এই ব্যাপারটি ঘটে সূর্যের রশ্মি-বিকিরণের ফলে। সূর্যের শক্তিশালী রশ্মিপ্রবাহের মধ্যে আছে আলট্রাভায়োলেট রে বা অতিবেগুনী রশ্মি। এই অতিবেগুনী রশ্মির একটি ধর্ম হলো—এরা গ্যাসের অণু বা পরমাণুকে আয়নায়িত করতে পারে। উপরকার স্তরের মধ্য দিয়ে আসবার সময় এই রশ্মির অধিকাংশই ঐ স্তরগুলিতে শোষিত হয়ে যায় এবং ঐ শোষিত রশ্মির সব শক্তি ব্যয়িত হয়ে যায়, সেখানকার বায়ুকে আয়নায়িত করবার জন্যে। অবশিষ্ট যেটুকু অশোষিত থাকে, সেটা এসে পৌঁছায় পৃথিবী-পৃষ্ঠে। কিন্তু সেই অল্পপরিমাণ রশ্মি এখানকার বায়ুকে আয়নায়িত করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে কেবলমাত্র উপরের স্তরের বায়ুই আয়নায়িত হয়, নীচেকার স্তর স্বাভাবিক অবস্থায়ই থাকে। কিন্তু উপরকার স্তরের বায়ু আয়নায়িত হবার কারণ একমাত্র অতিবেগুনী রশ্মিই নয়—যেসব অগণিত নক্ষত্র আমরা দেখতে পাই, সেগুলিও মহাশূন্যে অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরণ করে। সেই রশ্মিপ্রবাহ পৃথিবীতেও এসে পড়ে এবং বায়ুকে আয়নায়িত করে। কিন্তু তারকাগুলি অনেক দূরে অবস্থিত বলে তাদের এই রশ্মির প্রভাব সূর্যের তুলনায় অনেক কম, কিন্তু তা বলে নগণ্য নয়। যাহোক, রশ্মি ছাড়াও সূর্য থেকে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে—ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ও পরমাণুর নিউক্লিয়াস প্রভৃতি পদার্থ-কণিকাসমূহ। এসব সূক্ষ্ম কণিকাও বায়ুর ঊর্ধ্ব স্তরগুলিকে আয়নায়িত করে। তাহলে বাতাসের উপরের স্তরে অনবরত যে আয়নন-ক্রিয়া চলছে, তার ভারসাম্য রক্ষা পাচ্ছে কেমন করে? এটা ঘটে একটা বিপরীত-ধর্মী ক্রিয়ার ফলে, ইলেকট্রন ও আয়নের পুনর্মিলনের দ্বারা।

এই আয়নন-ক্রিয়া বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে কাজ করে। উপরকার স্তর, যেখানে বাতাস খুব পাতলা, সেখানে আয়ননের মাত্রা খুব বেশী। তারপর নীচেকার স্তরগুলিতে এর তীব্রতা ধাপে ধাপে কমে আসে। ইলেকট্রনের পরিমাণ অনুসারে আয়নোস্ফিয়ারকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই স্তরগুলিকে চিহ্নিত করা হয় D, E, F_1 ও F_2, এই চারিটি অক্ষরের সাহায্যে। D-স্তরটির শুধু দিনের বেলাতেই অস্তিত্ব থাকে। এর উচ্চতা হলো ৩৫ থেকে ৪৫ মাইলের মধ্যে। এই D-স্তরটির উপরে আছে E-স্তর; এখানে আয়নায়িত কণিকার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। এই স্তরটিই সবচেয়ে শান্ত। এর উচ্চতা হলো প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ মাইল। এর পরে প্রায় ১২০ মাইল উপরে রয়েছে F_1-স্তর। গ্রীষ্মের রাত্রে আর শীতকালে এই স্তরটির স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব থাকে না। তারপরে ১৩০ মাইল পর্যন্ত উচ্চতায় রয়েছে অস্থির F_2-স্তরটি। এই স্তরে ইলেকট্রন ও আয়নের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী এবং বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতাও এই স্তরের সর্বাধিক।

এই আয়নোস্ফিয়ারের গতি-প্রকৃতি জানা আবহ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পক্ষে যতখানি প্রয়োজন, তার চেয়ে ঢের বেশী প্রয়োজন তাঁদের—যাঁরা দূরপাল্লার বেতার-বার্তা পাঠাবার বা ধরবার কাজ পরিচালনা করেন। বেতার-বার্তায় যে তড়িৎ-তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়, তা হলো তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। বেতার-বার্তা প্রেরণের জন্যে থাকে একটি তরঙ্গপ্রেরক ধাতব তার। কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে এই তারে তড়িৎপ্রবাহ একেবারেই থাকে না। পরমুহূর্তেই এই তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ

চালিত হয় এবং তার তীব্রতাও ক্রমশঃ বেড়ে যায়। তীব্রতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে' প্রবাহ একেবারেই লোপ পেয়ে যায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার প্রবাহের আবির্ভাব ঘটে—তবে এই প্রবাহের গতি হয় এবার বিপরীত দিকে। এই প্রবাহেরও তীব্রতা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে চরম পর্যায়ে উঠে লোপ পেয়ে যায়। ঠিক এ রকম ভাবেই ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি ঘটে। এভাবে তড়িৎ-প্রবাহের পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয় 'বৈদ্যুতিক দোলন'। প্রতি সেকেণ্ডে দোলনের সংখ্যা যত, সেই সংখ্যাটাকেই বলা হয় ফ্রিকোয়েন্সি। আলো জ্বালাবার জন্যে যে এ. সি. বা অল্টারনেটিং কারেন্ট ব্যবহার করা হয়, তার দোলনের সংখ্যা বা ফ্রিকোয়েন্সি হলো ৫০। এরিয়েল বা তরঙ্গ-প্রেরক তারের মধ্য দিয়ে যে তড়িৎপ্রবাহ চলে তার দোলনের সংখ্যা বা ফ্রিকোয়েন্সি হলো লক্ষ লক্ষ।

কোন তারের মধ্য দিয়ে যখন বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত হয় তখন তার চতুর্দিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। তারের মধ্য দিয়ে প্রবহমান তড়িৎপ্রবাহ প্রতিমুহূর্তে বদ্‌লে যেতে থাকে; তাই এই চৌম্বক ক্ষেত্রেরও সর্বদা বদবদল হতে থাকে। চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা ছাড়া এই তারের চতুর্দিকে সৃষ্টি হয় অবিরাম পরিবর্তনশীল তড়িৎ-ক্ষেত্র। এই চৌম্বক ক্ষেত্র এবং তড়িৎক্ষেত্র দুটির পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। এই দুটি ক্ষেত্র পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং দুটিতে মিলে একটি তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এই তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের একটি উল্লেখযোগ্য ধর্ম হলো, এটা অদৃশ্য তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ তৈরী করতে করতে খুব তাড়াতাড়ি সব দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এইগুলিই হলো বেতার-তরঙ্গ।

বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে যখন বার্তা প্রেরণ ও বার্তা গ্রহণের কাজ সম্ভব হয়ে উঠলো, তখন দূরতম কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে দীর্ঘ তরঙ্গগুলিকেই অধিকতর কার্যকরী বলে মনে করা হতো। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, দীর্ঘ তরঙ্গের চেয়ে হ্রস্ব তরঙ্গগুলি বহু দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পক্ষে অনেক বেশী কার্যকরী। কিন্তু হ্রস্ব তরঙ্গের সাহায্যে বার্তা আদান-প্রদানে বহু জটিলতা দেখা দিতে লাগলো। তখন বেতার-বিজ্ঞানীরা হ্রস্ব তরঙ্গের সাহায্যে বার্তা আদান-প্রদান সহজসাধ্য ও সুব্যবস্থিত করবার জন্যে গবেষণাও সুরু করেন।

এরিয়েল বা তরঙ্গ-প্রেরক তার থেকে বেতার-তরঙ্গ পৃথিবী-পৃষ্ঠের সমান্তরালে চলতে থাকে। এই পথের মধ্যে পড়ে সাগর, নদী, পাহাড়, বন, মরুভূমি, তুষার অঞ্চল ইত্যাদি। এই যাত্রাপথে জল, মাটি ও তার উপরকার বিভিন্ন জিনিষ তরঙ্গের শক্তির একটি অংশকে শোষণ করে নেয়। সুতরাং তরঙ্গ তার উৎস-কেন্দ্র থেকে যত দূরে যাবে ততই তার তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতাও হ্রাস পাবে এবং একটি নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে এই তরঙ্গের শক্তি এতই কমে যাবে যে, বার্তা-গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। সেই কারণেই দেখা যাচ্ছে—তরঙ্গ যদি কেবলমাত্র পৃথিবী-পৃষ্ঠের সমান্তরালে যায়, তবে খুব বেশীদূর পৌঁছাবে না। যেহেতু পৃথিবীর আকার গোল এবং বেতার-তরঙ্গ সরল পথে চলে, সেহেতু কোন একটি স্থানে উৎপন্ন তরঙ্গ পৃথিবী-পৃষ্ঠের সমান্তরালে খুব বেশী দূর যেতে পারে না। কিন্তু এই তরঙ্গ কেবল একই দিকে প্রেরিত হয় না, এগুলি সবদিকে—এমন কি, উপর দিকেও প্রেরিত হয়। আগেই বলেছি যে, বিদ্যুদ্বাহী আয়নোস্ফিয়ার বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত করতে পারে। কাজেই উপরের দিকে প্রেরিত তরঙ্গগুলি আয়নোস্ফিয়ারে প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীর দিকে ফিরে আসে। কিন্তু ঐ প্রেরক যন্ত্রের কাছে ফিরে আসে না—তার থেকে অনেক দূরে আসে। এই কারণেই বহু দূরের অঞ্চলে বেতার-বার্তা প্রেরণে আয়নোস্ফিয়ারের এই প্রতিফলন ক্ষমতাকে কাজে

লাগানো হয়। কিন্তু আয়নোস্ফিয়ারের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলির ক্রিয়া এক রকম নয়। দীর্ঘ তরঙ্গগুলি আয়নোস্ফিয়ারকে বেশী ভেদ করতে পারে না। অপর পক্ষে হ্রস্ব তরঙ্গগুলি আয়নোস্ফিয়ারের উচ্চতম স্তর পর্যন্ত উঠে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দীর্ঘ তরঙ্গগুলি আয়নোস্ফিয়ারের অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরে প্রতিফলিত হয়ে উৎস-কেন্দ্র থেকে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, হ্রস্ব তরঙ্গগুলি আয়নোস্ফিয়ারের উচ্চতম F_1 ও F_2 স্তরে প্রতিফলিত হয়ে তার চেয়ে আরও অনেক বেশী দূরে যেতে পারে। এই ব্যাপারটিই হলো হ্রস্ব তরঙ্গের দূরপাল্লার বার্তা-প্রেরণে কার্যকারিতার আসল রহস্য।

কিন্তু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যদি খুব কম হয়, তবে তাকে প্রতিফলিত করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা আয়নোস্ফিয়ারের থাকে না। সে ক্ষেত্রে সেই তরঙ্গ আয়নোস্ফিয়ারের বাধা অতিক্রম করে মহাশূন্যে চলে যায়। এই কারণে দূরপাল্লার বেতার-বার্তা প্রেরণে অতি হ্রস্ব তরঙ্গের বিশেষ গুরুত্ব নেই। অবশ্য এই তরঙ্গগুলিকে স্বল্প পাল্লার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। উপরের কথাগুলি থেকে পাঠকের এই ধারণা হতে পারে যে, তরঙ্গগুলি বুঝি একবারই মাত্র আয়নোস্ফিয়ারে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। আয়নোস্ফিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয়ে তরঙ্গটি আসে পৃথিবীর গায়ে, আবার সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায় আয়নোস্ফিয়ারে। এভাবে প্রতিফলিত হতে হতে এই তরঙ্গ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে যাত্রা করে মরুভূমি, বনাঞ্চল ইত্যাদি ডিঙিয়ে সুদূর অপর প্রান্তে গিয়ে পৌছায়। অবশ্য এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এই তরঙ্গ যতদূর যাবে, ততই এর শক্তি হ্রাস পাবে।

কিন্তু হ্রস্ব তরঙ্গের সাহায্যে বেতার সংযোগ করা খুব সহজ কাজ নয়। কারণ প্রেরক কেন্দ্র থেকে পাঠানো তরঙ্গগুলি প্রতিফলিত হয়ে যেখানে পৌছাবে, সেই অঞ্চলেই কেবল মাত্র বেতার বার্তা প্রেরণ করা সম্ভব। বাদবাকী অঞ্চলে এটা ধরা সম্ভব নয়। আবার আয়নোস্ফিয়ারের স্তরগুলিও স্থির নয়। রোজই এদের পরিবর্তন হচ্ছে। দিনে যখন সূর্যের কিরণ প্রখর তখন আয়নায়িত স্তরগুলি নীচের দিকে থাকে, কিন্তু রাত্রি বেলায় আয়নন-ক্রিয়ার মাত্রা কমে যায় এবং আয়নায়িত স্তরগুলি উপরে উঠে যায়। ফলে, যে তরঙ্গের দ্বারা দিনের বেলায় একটি নির্দিষ্ট স্তর থেকে রেডিও-তরঙ্গ প্রতিফলিত হওয়ার ফলে একটি অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিল, রাত্রি বেলায় সেই তরঙ্গের প্রতিফলন আরও উপরে হওয়ায় সেই তরঙ্গের দ্বারা আর উক্ত এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয়। গ্রীষ্মকালে আয়নন-ক্রিয়ার মাত্রা বেশী, শীতকালে অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং গ্রীষ্মকালে কোন একটি দিনের বিশেষ একটি সময়ে কোন অঞ্চলের সঙ্গে বেতার-বার্তার আদান-প্রদানে যে দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ উপযোগী, শীতকালের ঐরূপ সময়ে সেই তরঙ্গ উপযোগী না-ও হতে পারে। তাই দেখা যাচ্ছে, উপরকার বায়ুমণ্ডলের আয়নায়িত হওয়ার মাত্রার উপরই তরঙ্গ বিস্তারের কাজটি নির্ভর করছে—এমন কি, তরঙ্গ প্রেরণ আদৌ সম্ভব কিনা, তাও নির্ভর করছে আয়নন-ক্রিয়ার মাত্রার তীব্রতার উপর। কারণ গ্রীষ্ম-কালের দীর্ঘস্থায়ী দিনের সময় কিংবা যখন সৌর-কলঙ্ক দেখা দেয়, সে সময় আয়নন-ক্রিয়ার মাত্রা যখন চরমে পৌছায়, তখন বেতার যোগাযোগ খুব কষ্টকর হয়ে ওঠে।

সে জন্যে বিভিন্ন দেশের আয়নোস্ফিয়ার ষ্টেশনগুলির সাহায্যে এই দ্রুত পরিবর্তনশীল আয়নোস্ফিয়ারকে সর্বদা পর্যবেক্ষণাধীন রাখা হয়। বহু বছরের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে আজ বিজ্ঞানীরা আয়নোস্ফিয়ারের ভাবগতিক সম্বন্ধে পূর্বাভাস দিতে পারেন। আজ বেতার-বার্তা প্রেরক ও গ্রাহকেরা এই পূর্বাভাস থেকে দিনের

একটি বিশেষ সময়ে কোন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে কোন্ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ সবচেয়ে উপযোগী, তা জেনে নিয়ে কাজে লাগাতে পারেন।

মোট কথা, এসব জটিলতা সত্ত্বেও আয়নোস্ফিয়ারের অস্তিত্ব না থাকলে দূর-দূরান্তে সংযোগ স্থাপনে বেতারের ভূমিকা অনেকাংশে হ্রাস পেত।
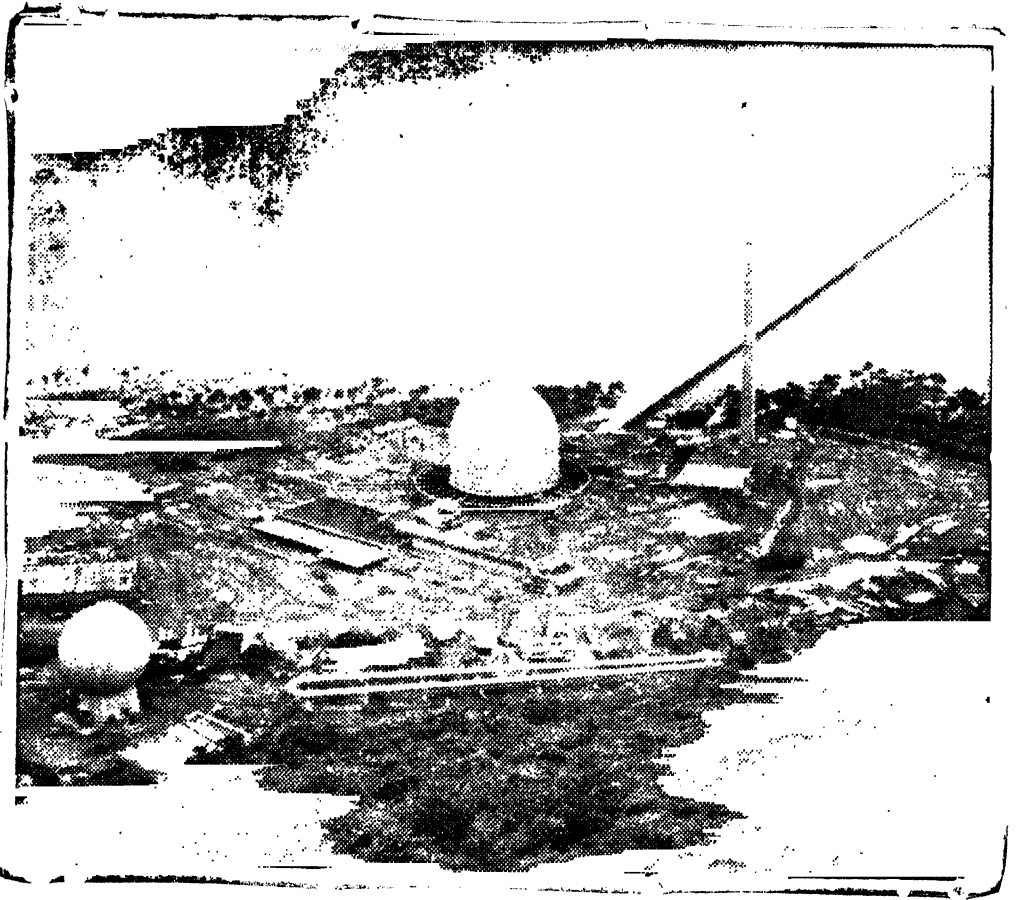
ভারতের দ্বিতীয় রিয়্যাক্টর 'ক্যানাডা-ইণ্ডিয়া' বোম্বের নিকটস্থ ট্রম্বেতে স্থাপিত হয়েছে। বিমান হইতে গৃহীত 'ক্যানাডা-ইণ্ডিয়া' রিয়্যাক্টর অঞ্চলের দৃশ্য।

পরমাণু-সংযোজন

শ্রীসরোজকুমার দে

দিনের আকাশের উজ্জ্বল সূর্য লক্ষ লক্ষ বছর ধরে দিনের পর দিন এক নাগাড়ে তাপ বিকিরণ করে আসছে। কোন দাহ্য বস্তুর অগ্নিশিখাও এক সময় শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সূর্যের এই অনন্ত শক্তির উৎস কোথায়? কেবল সূর্যই নয়, রাতের আঁধারে দিগন্তবিস্তৃত নীল আকাশের পানে তাকালেই যে অগণিত উজ্জ্বল নক্ষত্র চোখে পড়ে, তারাও লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মহাশূন্যে তেজ বিকিরণ করে আসছে। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে এই সৌর ও নাক্ষত্রিক শক্তির উৎস কি, তা আজ একরূপ নির্ণীত হয়েছে—যাকে বলা হয় থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন বা তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়া। যে প্রচণ্ড উষ্ণতা, চাপ ও ঘনত্বের দরুণ সৌর-বস্তুতে এই তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে, সেরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা পৃথিবীতে সৃষ্টি করা একরূপ অসম্ভব বলে একদিন মনে হলেও, বর্তমানে হাইড্রোজেন বোমার মাধ্যমে তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়া পৃথিবীতে বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

পারমাণবিক শক্তির মূলে রয়েছে পরমাণু-কেন্দ্রক। পারমাণবিক শক্তির অন্যতম উৎস হলো অ্যাটমিক ফিসন বা পরমাণুর বিভাজন। এ-ক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম প্রভৃতি ভারী মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রককে নিউট্রন নামক মৌলিক কণিকার দ্বারা দুই বা ততোধিক ভিন্ন পরমাণু-কেন্দ্রকে (যেগুলি পিরিয়ডিক টেবলের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত) বিভাজিত করা হয়। এর ফলে মূল পরমাণু-কেন্দ্রকের ভর অপেক্ষা বিভাজিত কেন্দ্রক-গুলির মোট ভর কম হয় এবং এই ক্ষয়িত ভর আইনষ্টাইনের সূত্রানুসারে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পরমাণু বিভাজনে কেন্দ্রকের পারস্পরিক শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়ায় (নিউক্লিয়ার চেন-রিয়্যাকশন) মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে পারমাণবিক শক্তি লাভ করা যায় —যে শক্তি বর্তমানে পরমাণু-চুল্লী, পারমাণবিক অস্ত্র ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এর চেয়েও বেশী পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়ায়—যার আর এক নাম দেওয়া যায় অ্যাটমিক ফিউসন বা পরমাণু-সংযোজন। পরমাণু-সংযোজন পরমাণু-বিভাজনের একরূপ বিপরীত প্রক্রিয়া। এ-ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক হাল্কা পরমাণু-কেন্দ্রকের মিলনের ফলে একটি নতুন পরমাণু-কেন্দ্রকের সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রকের মধ্যস্থিত কণিকাগুলির বাইণ্ডিং এনার্জি, অর্থাৎ বন্ধন শক্তির সমপরিমাণ শক্তির উদ্ভব হয়ে থাকে।

কেন্দ্রকের 'বন্ধন-শক্তি' কি? আইনষ্টাইন দেখিয়েছেন যে, কোন বস্তুর ভর ও শক্তির মধ্যে পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এটি তাঁর বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ ($E=$ শক্তি, $m=$ বস্তুর ভর, $c=$ সেকেণ্ডে আলোকের গতিবেগ) দ্বারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজিত ও প্রমাণিত হয়েছে। সমীকরণটির মূল সূত্র হলো, বস্তুর ভর ও শক্তি একটি থেকে অপরটিতে পরস্পর রূপান্তরিত হতে পারে। পরমাণু-কেন্দ্রক প্রোটন ও নিউট্রন কণিকার সমন্বয়ে গঠিত। কোন কেন্দ্রকের বন্ধন-শক্তি কেন্দ্রকের অন্তর্গত কণিকা-সমূহের পৃথক পৃথক ভরের সমষ্টি থেকে নির্ণয় করা যায়। উদাহরণস্বরূপ ডয়টেরন-কেন্দ্রকের (ভারী হাইড্রোজেন) কথা ধরা যাক। ডয়টেরনের পার-মাণবিক ভর হলো ২.০১৪৭। ডয়টেরন-কেন্দ্রকে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন থাকে, যাদের ভর

হলো যথাক্রমে ১'০০৮১ ও ১'০০৮৯, অর্থাৎ কণিকা-দ্বয়ের মোট ভর হলো ২'০১৭০ এবং এই ভর মূথ কেন্দ্রকের ভর অপেক্ষা (২'০১৭০ – ২'০১৪৭) বা ০'০০২৩ বেশী।

এক একক পারমাণবিক ভর-সম্পন্ন পরমাণুর ওজন $১'৬৬ \times ১০^{-২৪}$ গ্র্যাম। সুতরাং প্রোটন ও নিউট্রন কণিকাদ্বয়ের মোট ভর অপেক্ষা একটি ডয়টেরন-কেন্দ্রকের ভর $০'০০২৩ \times ১'৬৬ \times ১০^{-২৪}$ গ্র্যাম কম। এই ভরকে আইনষ্টাইনের সূত্রানুসারে যদি শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে দেখা যাবে ৪×১০^{-৬} আর্গ পরিমাণ শক্তি হয়। আবার $১'৬ \times ১০^{-৬}$ আর্গ = ১,০০০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট বা ১ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। সুতরাং একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রনের মিলনে একটি ডয়টেরন-কেন্দ্রক উৎপন্ন হবার ফলে $\frac{৪ \times ১০^{-৬}}{১'৬ \times ১০^{-৬}}$ বা ২'১ মি. ই. ভো. পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং এই শক্তি ডয়টেরন-কেন্দ্রকের বন্ধন-শক্তির সমপরিমাণ। একটি কেন্দ্রকের গঠনে যত বেশী পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হবে তত অধিক কেন্দ্রকটি স্থায়ী হবে এবং কেন্দ্রকটিকে বিভাজিত করতেও অধিক শক্তির প্রয়োজন হবে।

পরমাণু-কেন্দ্রকের অন্যতম ধর্ম হলো স্পেসিফিক বাইণ্ডিং এনার্জি বা আপেক্ষিক বন্ধন-শক্তি—যার অর্থ হলো কোন একটি কেন্দ্রকস্থ প্রতিটি কণিকার বন্ধন-শক্তির পরিমাণ। এর আর এক নাম প্যাকিং ফ্যাক্টর। অর্থাৎ প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে কেন্দ্রক গঠিত হবার কালে যে ভরের ক্ষয় হয় তাকে কেন্দ্রকস্থ মোট কণিকা-সংখ্যার দ্বারা ভাগ করলে ভাগফলটিকে প্যাকিং ফ্যাক্টর বলা হয়। যে মৌলিক পদার্থের পরমাণুর প্যাকিং ফ্যাক্টর যত বেশী, তার গঠনকালে তত বেশী শক্তি উৎপন্ন হয় এবং স্থায়িত্বও তার তত বেশী।

বর্তমানে প্রায় সকল পরমাণু-কেন্দ্রকের বন্ধন-শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন পরমাণু-কেন্দ্রকের কণিকা-সংখ্যার সঙ্গে যদি তাদের প্যাকিং ফ্যাক্টরের একটি লেখ বা গ্রাফ অঙ্কন করা যায় তাহলে দেখা যাবে, পিরিয়ডিক টেবলে অবস্থিত হাল্কা, মাঝারী ও ভারী কেন্দ্রকের প্যাকিং ফ্যাক্টরের মান বিভিন্ন। মাঝারী ভরবিশিষ্ট কেন্দ্রকের প্যাকিং ফ্যাক্টর হাল্কা (হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম ইত্যাদি) ও ভারী কেন্দ্রকের (ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, প্লুটোনিয়াম ইত্যাদি) প্যাকিং ফ্যাক্টর অপেক্ষা বেশী। মাঝারী কেন্দ্রকগুলির প্যাকিং ফ্যাক্টরের মান ৮'৪ থেকে ৮'৬ মি. ই. ভো. এবং এদের স্থায়িত্বও অধিক। অপর পক্ষে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি কেন্দ্রকের প্যাকিং ফ্যাক্টর প্রায় ৭'৫ মি. ই. ভো.। সে জন্যে এ-সব কেন্দ্রকের বিভাজন-ক্রিয়ায় প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয়। আবার হাল্কা কেন্দ্রককে যদি তার অধিক প্যাকিং ফ্যাক্টরযুক্ত ভারী কেন্দ্রকে রূপান্তরিত করা যায়, তাহলেও প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হবে এবং এরূপ প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরমাণু-সংযোজন।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ভারী পরমাণু-কেন্দ্রকের বিভাজনের ফলে যেমন শক্তি উৎপন্ন হয়, তেমনি হাল্কা পরমাণু-কেন্দ্রকের সংযোজনের ফলেও শক্তির উদ্ভব হয়। বিভাজন ও সংযোজন প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন্‌টির ক্ষেত্রে অধিক শক্তি উৎপন্ন হয়, সে-কথা নির্ণয় করা প্রয়োজন। ধরা যাক, দুটি ডয়টেরন-কেন্দ্রকের সংযোজনের ফলে একটি হিলিয়াম-কেন্দ্রক উৎপন্ন হলো। একটি হিলিয়াম-কেন্দ্রকের ভর ৪'০০৩৮ এবং দুটি ডয়টেরন-কেন্দ্রকের মোট ভর $২ \times ২'০১৪৭$ বা ৪'০২৯৪। এই সংযোজনের ফলে $\frac{৪'০২৯৪ - ৪'০০৩৮}{'০০১১}$ বা প্রায় ২৫ মি. ই. ভো. (০'০০১১ পারমাণবিক ভর = ১ মি. ই. ভো.) পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হবে। অপর পক্ষে একটি ইউরেনিয়াম-২৩৫ কেন্দ্রকের বিভাজনের ফলে প্রায় ২০০ মি. ই. ভো. শক্তি উৎপন্ন হয়। এখানে

আপাতদৃষ্টিতে সংযোজন-প্রক্রিয়ার উৎপন্ন শক্তি বিভাজন-প্রক্রিয়া অপেক্ষা কম বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু দুটি ডয়টেরন-কেন্দ্রকের মোট ভর একটি ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকের ভর অপেক্ষা কম। সুতরাং একটি ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকের (২৩৫) সমভর-সম্পন্ন ডয়টেরন-কেন্দ্রকের সংযোজনের ফলে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করলে দেখা যাবে, তা প্রায় ১৪৫৭ মি. ই, ভো. অর্থাৎ বিভাজন-প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী। এক গ্র্যাম ইউ-২৩৫-কেন্দ্রকের বিভাজনে যেখানে প্রায় ২২,০০০ কিলো-ওয়াট-আওয়ার শক্তি উৎপন্ন হয়, সেখানে সমপরিমাণ ডয়টেরন-কেন্দ্রকের সংযোজনে সৃষ্ট হিলিয়াম-কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে প্রায় ১৬০,০০০ কি. ও. আ. শক্তি উৎপন্ন হয়। আরও অধিক শক্তি উৎপন্ন হবে, যদি চারটি প্রোটনের সংযোজনে একটি হিলিয়াম-কেন্দ্রক উৎপন্ন হয়—এক গ্র্যাম হাইড্রোজেন থেকে প্রায় ১৭৬,০০০ কি. ও. আ.।

একটি কেন্দ্রকের সঙ্গে আর একটি কেন্দ্রকের সংযোজন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে গেলে কেন্দ্রকগুলিকে পরস্পর মিলিত হতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রকস্থ চার্জ বা আধানের দরুণ তাদের পরস্পরের তড়িৎজনিত বিকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করা প্রয়োজন—এই শক্তিকে বলা হয় অ্যাকটিভেসন এনার্জি বা সক্রিয়তা শক্তি। এর জন্যে প্রতি কেন্দ্রকের বেশ কিছুটা বেগজনিত শক্তির প্রয়োজন হয়। কেন্দ্রকের আধান যত বেশী হবে, তত বেশী এই বেগজনিত শক্তির প্রয়োজন হবে। দুটি ডয়টেরন-কেন্দ্রক বা চারটি হাইড্রোজেন-কেন্দ্রকের (প্রোটন) ক্ষেত্রে এই বেগজনিত শক্তির প্রয়োজন অন্যান্য ভারী কেন্দ্রক অপেক্ষা কম; কারণ এসব কেন্দ্রকের আধান অল্প। যদি কেন্দ্রকগুলির পর্যাপ্ত পরিমাণে বেগজনিত শক্তি থাকে তাহলে তাদের সংযোজন-প্রতিক্রিয়া ঘটা সম্ভব—এমন কি এই শক্তি সামান্য কম হলেও। তবে কেন্দ্রকের প্রতিটি সংঘর্ষে সংযোজন-প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় না—তার পূর্বে বহুবার তাদের সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়। সংযোজন-প্রক্রিয়াটি অনেকটা পরিসংখ্যানুপাতিক। গড়ে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক সংঘর্ষের পর সংযোজন প্রক্রিয়াটি সম্ভাব্য হওয়ায় প্রক্রিয়াটিকে সংযোজনের সম্ভাব্যতার উপর নির্ভরশীল বলা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ, ডয়টেরন-কেন্দ্রকের বেগজনিত শক্তি ১০,০০০ ই. ভো. হলে গড়ে প্রতি ১০ লক্ষ সংঘর্ষে একবার, ৪০,০০০ ই. ভো. হলে গড়ে প্রতি ১,০০০ সংঘর্ষে একবার সংযোজন-প্রক্রিয়া সংঘটিত হতে পারে।

কিন্তু ডয়টেরন-কেন্দ্রককে ত্বরকযন্ত্রের সাহায্যে বেগজনিত শক্তিসম্পন্ন করে ${}_1D^2 + {}_1D^2 \rightarrow {}_2He^4$, এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা সুবিধাজনক বা লাভজনক নয়। কারণ আহিত কেন্দ্রকের আয়নিকরণের দরুণ ক্ষয় অত্যন্ত বেশী এবং সে জন্যে দুটি ডয়টেরন-কেন্দ্রক কয়েকটি সংঘর্ষের পর সংযোজিত হওয়ার পূর্বে শক্তিক্ষয় করে থাকে। অন্য আর এক উপায়ে ডয়টেরন-কেন্দ্রককে বেগজনিত শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কোন কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় বস্তুকে উত্তপ্ত করলে তার অন্তর্গত অণু ও পরমাণুর বেগজনিত শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং একটা নির্দিষ্ট তাপে তাদের গড়শক্তি উত্তাপের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এই শক্তি প্রতিটি কণিকায় সমভাবে বিতরিত হয় না—পরিসংখ্যানুপাতিক বণ্টন সূত্র (statistical distribution law) অনুযায়ী কিছু অণু গড়শক্তি অপেক্ষা কম ও কিছু বেশ অধিক শক্তি আহরণ করে। দেখা গেছে, ৭৫০০° সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করলে অণুগুলি ১ ই. ভো. বেগজনিত শক্তি আহরণ করে। কিন্তু এত অল্প 'সক্রিয়তা' শক্তিতে সংযোজন-প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প—একেবারে হবেই না বলা চলে। যদি ভারী হাইড্রোজেনকে ১,০০০,০০০° সে. উত্তপ্ত করা যায়, তাহলে সংযোজন-প্রক্রিয়া সম্ভব হতে পারে। এই উত্তাপে ডয়টেরনের বেগজনিত শক্তি গড়ে প্রায় ১৩০ ই. ভো.—তবুও এক্ষেত্রে সংযোজনের সম্ভাবনা খুব বেশী নয়। কিন্তু এই অবস্থায় কিছু সংখ্যক

ডয়টেরন নিশ্চয়ই থাকবে যাদের শক্তি ১৬০০—২৫০০ ই. ভো. এবং এর ফলে সংযোজনের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাবে। দশ লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে কোন বস্তুর প্রতিটি পরমাণুর সেকেণ্ডে প্রায় ১০১০ (এক সহস্র কোটি) বার সংঘর্ষ হয়। যদি এক কিলোগ্র্যাম ভারী হাইড্রোজেনে ৩×১০২৬ সংখ্যক ডয়টেরন থাকে, তাহলে এই অবস্থায় বহু সংখ্যক বার দুটি করে ডয়টেরনের সংযোজনের ফলে হিলিয়াম উৎপন্ন হবে। এক কিলোগ্র্যাম ডয়টেরনের দশ লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সংযোজনের ফলে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১০০ কিলোওয়াট পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। যদি উত্তাপ ৫০-৬০ লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়, তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই এক কিলোগ্র্যাম ডয়টেরনের সবটাই সংযোজিত হবে এবং তার ফলে প্রায় ১৫ কোটি কি. ও. আ. শক্তি উৎপন্ন হবে। প্রায় ২ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে $_1H^1 + _3Li^7 \rightarrow 2_2He^4$ (অর্থাৎ একটি প্রোটন ও একটি লিথিয়াম-কেন্দ্রকের সংযোজনে উৎপন্ন হয় দুটি হিলিয়াম-কেন্দ্রক) প্রক্রিয়াটি আরও অধিক কার্যকরী এবং এতে প্রায় ১৭ মি. ই. ভো. শক্তি উৎপন্ন হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যথেষ্ট উচ্চ তাপে পরমাণু-কেন্দ্রক বেগজনিত শক্তি আহরণ করে এবং ফলে তাদের সংযোজন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে। উচ্চ তাপে সংঘটিত পরমাণু-কেন্দ্রকের প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন বা তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়া।

সূর্য, তারকা প্রভৃতি অসংখ্য সৌর-বস্তুর অনন্ত শক্তির উৎস কোথায়—তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়া তার চমৎকার সমাধান করেছে। সূর্যের কথাই ধরা যাক। সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৩.৭৮×১০৩৩ আর্গ পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে। সূর্যের ভর ১.৯৮৫×১০৩৩ গ্র্যাম। সুতরাং বলা যায়, সূর্যের প্রতি গ্র্যাম অংশ থেকে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২ আর্গ পরিমাণ শক্তি বিকিরিত হচ্ছে। সূর্য কয়েক কোটি বছর ধরে এই হারে শক্তি বিকিরণ করে আসছে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, সূর্যের এই অনন্ত শক্তি কোথা থেকে আসছে? সূর্য ছাড়াও এই বিশ্ব-জগতে রয়েছে আরও কোটি কোটি সৌর-বস্তু, যারা এভাবে প্রচুর পরিমাণে শক্তি বিকিরণ করে চলেছে।

সাধারণ দহন-প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ কার্বন বা কার্বন-জনিত বস্তুর সঙ্গে অক্সিজেনের দহন-ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন তাপ বা শক্তি যে সৌর-বস্তুগুলির শক্তির উৎস নয়, তা অতি সহজেই বোঝা যায়। সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কার্বন ও অক্সিজেনের দহন-ক্রিয়ার ফলে $(C + O_2 \rightarrow CO_2)$ প্রতি গ্র্যাম কার্বনে মাত্র ৮১০০ ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয়। এর তুলনায় $_1H^1 + _3Li^7 \rightarrow 2_2He^4$—এই তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি প্রায় ১৭,০০০,০০০ গুণ বেশী। অর্থাৎ ৭০০০ গ্র্যাম লিথিয়াম ও ১০০০ গ্র্যাম হাইড্রোজেনের তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়ায় যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তা ৪৬,০০০ টন কয়লার দহন-ক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তির সমতুল্য। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সূর্য কেবলমাত্র কার্বন ও পর্যাপ্ত অক্সিজেন দ্বারা তৈরী, তবে সমস্ত কার্বনের দহন-ক্রিয়া সম্পন্ন হলে ৪×১০৩৩ কিলোক্যালরি পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হবে। আজ পর্যন্ত সূর্যের প্রতি গ্র্যাম অংশ থেকে প্রায় ২.৬×১০৬ কিলোক্যালরি পরিমাণ শক্তি বিকিরিত হয়েছে। সুতরাং কেবল কার্বনের দহন-ক্রিয়ার ফলে যদি সূর্যে তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকতো, তাহলে সূর্যের অস্তিত্ব কয়েক শ' বছরেই শেষ হয়ে যেত—কিন্তু সূর্যসহ এই সৌরজগতের বয়স কয়েক কোটি বছর। সুতরাং সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া যে সূর্যের শক্তির উৎস নয়, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিজ্ঞানী হেল্‌মহোল্টজ্‌ দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, সৌর-বস্তুর মাধ্যাকর্ষণজনিত সঙ্কোচন থেকে শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাঁর এই তত্ত্বও বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। দেখা গেছে, বিভিন্ন সৌর-বস্তুতে উৎপন্ন শক্তির হারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য

আছে এবং এটি হয় বস্তুর তাপ, চাপ ও গঠনের পার্থক্যের জন্যে।

১৯১৯ সালে বিজ্ঞানী হান্স্ বেথে সর্বপ্রথম কার্বন-সাইক্লের তথ্য প্রচার করেন। বেথের কার্বন-সাইক্লের মূল তত্ত্ব হলো, তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়ায় চারটি হাইড্রোজেন-কেন্দ্রকের (প্রোটন) সংযোজনের ফলে একটি হিলিয়াম-কেন্দ্রকের সৃষ্টি।

$4_1H^1 \rightarrow {}_2He^4 + 2_1e^0_0 + 24$ মি. ই. ভো.
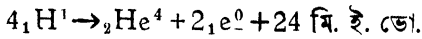
যেমন অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া ক্যাটলিষ্ট বা অনুঘটকের সাহায্যে সম্পন্ন হয় এবং তাতে প্রক্রিয়ার শেষেও অনুঘটকটি অপরিবর্তিত থাকে, তেমনি বেথের কার্বন-সাইক্ল-এ কার্বন অনুঘটকের কাজ করে এবং এর জন্যে সর্বাপেক্ষা অল্প 'সক্রিয়তা' শক্তির প্রয়োজন হয়। কার্বন-সাইক্লে কয়েকটি প্রক্রিয়া পরপর সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রথমতঃ কার্বন-12 কেন্দ্রকে একটি প্রোটন প্রবেশ করলে একটি নাইট্রোজেন-13 তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সৃষ্টি নয়, যেটি একটি পজিট্রন নির্গত করে স্থায়ী C-13-এ পরিণত হয়। এই C-13-এ আরও একটি প্রোটন প্রবেশ করে N-14 উৎপন্ন করে, যার সঙ্গে আরও একটি প্রোটনের মিলনের ফলে তেজস্ক্রিয় অক্সিজেন-15 আইসোটোপের সৃষ্টি হয়, যা একটি পজিট্রন নির্গত করে স্থায়ী N-15-এ পরিণত হয়। অবশেষে N-15-কেন্দ্রকে চতুর্থ প্রোটন প্রবেশ করে এবং C-12 ও হিলিয়াম-কেন্দ্রক উৎপন্ন করে। সুতরাং C-12-কেন্দ্রকটি শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থেকে যায় এবং ইতিমধ্যে চারটি প্রোটন কণিকার সংযোজনের ফলে একটি হিলিয়াম-কেন্দ্রক উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রায় ২৪ মি. ই. ভো. পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়।

বেথে কার্বন সাইক্ল	উৎপন্ন শক্তি	অর্ধ আয়ুষ্কাল
${}_6C^{12} + {}_1H^1 \rightarrow {}_7N^{13}$	২.০ মি. ই. ভো.	৪০,০০০ বছর
${}_7N^{13} \rightarrow {}_6C^{13} + {}_1e^0$	০.৫ "	১০ মিনিট
${}_6C^{13} + {}_1H^1 \rightarrow {}_7N^{14}$	৮.২ "	৭,০০০ বছর
${}_7N^{14} + {}_1H^1 \rightarrow {}_8O^{15}$	৭.৫ "	১,০০০,০০০ বছর
${}_8O^{15} \rightarrow {}_7N^{15} + {}_1e^0$	০.৭ "	২ মিনিট
${}_7N^{15} + {}_1H^1 \rightarrow {}_6C^{12} + {}_2He^4$	৫.২ "	২০ বছর

মোট ফলাফল, $4_1H^1 \rightarrow 2He^4 + 2_1e^0 \cdots$ ২৪ মি. ই. ভো.

বেথের এই কার্বন সাইক্লের তত্ত্ব সূর্য-তারকার অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস সম্বন্ধে একরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করেছে বলা চলে। অবশ্য সৌর-বস্তুতে এই তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়ার হার এর অন্তর্ভাগের তাপ, চাপ, প্রোটন ও কার্বনের ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানী ব্লাঙ্কের মতানুসারে সূর্যের কেন্দ্রভাগের উত্তাপ হলো ২৬,০০০,০০০° সেন্টিগ্রেড, চাপ প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ৯.৭×১০¹⁰ গ্রাম (পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের ৮.৪৭×১০⁸ গুণ) ঘনত্ব প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ১১০ গ্রাম। সূর্যে কার্বনের ভাগ খুব কম। একটি কার্বন-কেন্দ্রক কয়েক লক্ষ বছরে একবার হাইড্রোজেন কেন্দ্রক থেকে হিলিয়াম-কেন্দ্রকে পরিণত হবার ব্যাপারে সাহায্য করে। সেজন্যে বলা যায়, সূর্য এত অধিক বছর ধরে শক্তি বিকিরণ করে চলেছে এবং বর্তমানে সূর্যে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন আছে, তাতে সে আরও আট হাজার কোটি বছরব্যাপী শক্তি বিকিরণ করতে থাকবে।

অবশ্য বেথের কার্বন সাইক্লই একমাত্র তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রক্রিয়া নয়, যা সূর্যের শক্তির উৎস। তবে সূর্যের অন্তর্ভাগে যে প্রচণ্ড তাপ বর্তমান, তাতে

দুটি ডয়টেরন-কেন্দ্রকের সংযোজনে একটি হিলিয়াম-কেন্দ্রক বা একটি লিথিয়াম ও একটি হাইড্রোজেন-কেন্দ্রকের সংযোজনে একটি হিলিয়াম-কেন্দ্রক অত্যন্ত দ্রুত উৎপন্ন হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়াগুলিও সূর্যের তাপের উৎস বলা যেতে পারে:

$$_1H^1 + {}_1H^1 \rightarrow {}_1H^2 + {}_1e^0$$
$$_1H^2 + {}_1H^1 \rightarrow {}_2He^3$$
$$_2He^3 + {}_2He^4 \rightarrow {}_4Be^7$$
$$_4Be^7 + {}_{-1}e^0 \rightarrow {}_3Li^7$$
$$_3Li^7 + {}_1H^1 \rightarrow 2\,{}_2He^4$$
$$4\,{}_1H^1 + {}_{-1}e^0 \rightarrow {}_2He^4 + {}_1e^0$$
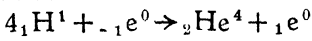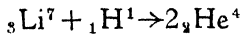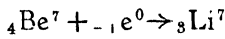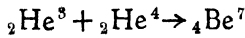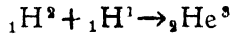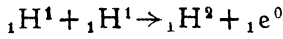
এক্ষেত্রে প্রথম প্রতিক্রিয়াটি অনুঘটকবিহীন অবস্থায় অত্যন্ত ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

চারটি প্রোটনের সংযোজনে উৎপন্ন হিলিয়ামে উপরিউক্ত দুটি প্রতিক্রিয়া পৃথিবীতে বর্তমানে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কারণ সূর্যের যে তাপ, চাপ ও ঘনত্বের মধ্যে এত ধীরে ধীরে প্রতিক্রিয়াদ্বয় সংঘটিত হয়, সেই অবস্থা পৃথিবীতে সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন। কিছু সংখ্যক পরমাণু সংযোজন প্রতিক্রিয়া আছে, যাদের 'সক্রিয়তা' শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। এসব সংযোজন-প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী কিছু কিছু কেন্দ্রকের অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে এবং কিছু পরমাণু-কেন্দ্রক কৃত্রিমভাবেও তৈরী করা যায়। যেমন হাইড্রোজেনের তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ ট্রাইটিয়াম পরমাণু-চুল্লী ও সাইক্লোট্রনের মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে কয়েক প্রকারে প্রস্তুত করা হয়।

$$_3Li^6 + {}_0n^1 \rightarrow {}_2He^4 + {}_1T^3$$
$$_1D^2 + {}_0n^1 \rightarrow {}_1T^3$$
$$_2He^3 + {}_0n^1 \rightarrow {}_1T^3 + {}_1H^1$$
$$_4Be^9 + {}_1D^2 \rightarrow {}_1T^3 + 2\,{}_2He^4$$
$$_1D^2 + {}_1D^2 \rightarrow {}_1T^3 + {}_1H^1$$
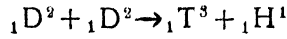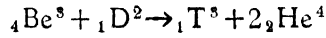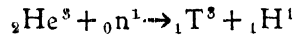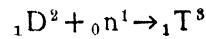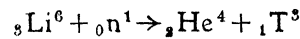
হাইড্রোজেনের সব রকম আইসোটোপ প্রোটন ($_1H^1$), ডয়টেরন ($_1H^2$ বা $_1D^2$), ট্রাইট্রন ($_1H^3$ বা $_1T^3$) দ্বারা পরমাণু সংযোজন-প্রতিক্রিয়া সহজেই সম্পন্ন করা যেতে পারে।

	উৎপন্ন শক্তি (মি. ই. ভো.)	অর্ধ আয়ুষ্কাল ১১
$_1H^1 + {}_1H^1 \rightarrow {}_1D^2 + {}_1e^0$	১.৪	$১০^{১১}$ বছর
$_1D^2 + {}_1H^1 \rightarrow {}_2He^3$	৫.০	০.৫ সেকেণ্ড
$_1T^3 + {}_1H^1 \rightarrow {}_2He^4$	২০.০	০.০৫ সেকেণ্ড
$_1D^2 + {}_1D^2 \rightarrow {}_2He^3 + {}_0n^1$	৩.২	০.০০০০৩ সেকেণ্ড
$_1D^2 + {}_1D^2 \rightarrow {}_1T^3 + {}_1H^1$	৪.০	০.০০০০ ৩ সেকেণ্ড
$_1T^3 + {}_1D^2 \rightarrow {}_2He^4 + {}_0n^1$	১৭.০	০.০০০০০ ১২ সেকেণ্ড
$_1T^3 + {}_1T^3 \rightarrow {}_2He^4 + 2\,{}_0n^1$	১১.০	০.০০০০০ ১ সেকেণ্ড

দেখা গেছে, প্রোটন, ডয়টেরন ও ট্রাইটনের ক্ষেত্রে সংযোজন-প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করবার জন্যে প্রয়োজনীয় 'সক্রিয়তা' শক্তি ক্রমশঃ কমে গেছে, অর্থাৎ সংযোজন-প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্যে সাধারণ হাইড্রোজেন অপেক্ষা ডয়টেরিয়াম ও ডয়টেরিয়াম অপেক্ষা ট্রাইটিয়ামের ক্ষেত্রে কম উত্তাপ প্রয়োজন হয়। ডয়ট্রন ও ট্রাইট্রনকে যদি অতি উচ্চ তাপে এক কোটি ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডে হঠাৎ উত্তপ্ত করা যায়, তাহলে সংযোজন-প্রতিক্রিয়া প্রায় এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের মধ্যে বিস্ফোরণসহ সংঘটিত হবে।

পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের পূর্বে পার্থিব অবস্থায় এত উচ্চ তাপ সৃষ্টি করা কল্পনার মধ্যেই ছিল। কিন্তু পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের

পর সেই অসম্ভব বিষয় আজ সম্ভব হয়েছে। যেমন পরমাণুর বিভাজন-প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে পারমাণবিক বোমা নির্মাণ করা হয়, তেমনি পরমাণুর সংযোজন-প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণও সম্ভব হয়েছে। হাইড্রোজেন বোমায় তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়া সংঘটনের জন্যে উপযুক্ত অতি উচ্চ তাপ ও চাপ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে, যার ফলে কিছুক্ষণের জন্যে বয়েক কোটি ডিগ্রি উত্তাপ ও প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে প্রায় দশ কোটি টন চাপের সৃষ্টি হয় ও হাইড্রোজেন বোমায় বিস্ফোরণ ঘটায়। হাইড্রোজেন বোমায় সাধারণতঃ ডয়টেরিয়াম ও ট্রাইটিয়াম ব্যবহার করা হয়। পারমাণবিক বোমায় কেন্দ্রকের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করবার জন্যে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের একটা 'ক্রিটিক্যাল মাস'-এর প্রয়োজন হয়। হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণে তার কোন প্রয়োজন হয় না—এই বোমার শক্তির সীমা ট্রাইটিয়ামের পরিমাণ, বহন করবার সুবিধা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। পারমাণবিক বোমা অপেক্ষা হাইড্রোজেন বোমা বহুগুণ শক্তিশালী এবং বিস্ফোরণজনিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ বহু দূর পর্যন্ত বাতাসের মাধ্যমে বাহিত হয়ে জীবদেহের বহু ক্ষতিসাধন করতে পারে—এমন কি, মানুষের ভবিষ্যৎ বংশধরগণেরও এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা আছে।

তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়া কৃত্রিম উপায়ে হাইড্রোজেন বোমার মাধ্যমে পৃথিবীতে সাফল্যের সঙ্গে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে ক্ষণিকের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয়। এখন এই তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তিকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে সেই শক্তিকে মানব-কল্যাণে ব্যবহার করা যাবে। পৃথিবীতে বহু যুগব্যাপী সঞ্চিত কয়লা ও পেট্রোলিয়াম বর্তমানে প্রধান প্রাকৃতিক শক্তির উৎস। কিন্তু এখন দেশে দেশে যে হারে শিল্পোন্নতির কাজে এই ইন্ধন ব্যবহৃত হচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে কয়লা এবং পেট্রোলিয়ামও এক দিন শেষ হয়ে যাবে। কেন্দ্রকীয় পারস্পরিক শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া বা নিউক্লিয়ার চেন রিয়্যাকশন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের মধ্যে নতুন এক প্রাকৃতিক ইন্ধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং পরমাণু-চুল্লী ইত্যাদির মাধ্যমে এই পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার বিভিন্ন উন্নত দেশে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়া এর চেয়েও সম্ভাবনাপূর্ণ—কারণ এই প্রক্রিয়ার প্রধান ইন্ধন হাইড্রোজেন সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে শক্তি উৎপাদনের জন্যে বিজ্ঞানীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। এ-বিষয়ে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন। বিজ্ঞানাগারে তাঁরা নিয়ন্ত্রিত উপায়ে প্রায় দশ লক্ষ ডিগ্রি তাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। সাফল্যের সঙ্গে যেদিন এই তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিতভাবে শক্তি উৎপাদন সম্ভব হবে, সেদিন মানুষের শান্তি ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্যে এক অনন্ত শক্তির উৎসের দুয়ার খুলে যাবে।

ক্ষুদে প্রাণীর জীবন-কথা

আবুলহক খন্দকার

সৃষ্টির সেরা হলেও বিশেষ বিশেষ দিক থেকে দেখতে গেলে অনেক প্রাণীই যে মানুষের চাইতেও সেরা, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। দৈহিক শক্তিতে অনেক বন্য পশুই মানুষ হার মানায়। আবার অন্ধকারে যেখানে মানুষের দৃষ্টি-শক্তি একেবারে পঙ্গু, সেখানে বিভিন্ন জাতের কীট, পতঙ্গ এবং বিড়াল, বাদুড় প্রভৃতি প্রায় নির্বিঘ্নে চলা-ফেরার জন্যে বিশেষ বিশেষ শক্তির অধিকারী। বুদ্ধির দৌলতে মানুষ অবশ্য নানা-বিধ যন্ত্রাদি আবিষ্কার করে তাদের দৃষ্টির দৈন্য অনেক পরিমাণে ঘুচিয়েছে। এই ক্ষমতা যদি মানুষের না থাকতো, অর্থাৎ যদি শুধুমাত্র চোখের দেখার উপরই নির্ভর করতে হতো, তবে কত জিনিষই যে তাদের অজানা থেকে যেত, কত আশ্চর্য—কত বিচিত্র জগৎ যে তাদের জ্ঞানের সীমার বাইরে থেকে যেত, তা আর বলবার নয়! মানুষের দৃষ্টির একান্ত বাইরে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী কত যে বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন করছে, কত রকমের জীবাণু যে বাতাসের মধ্যে অবাধে ভেসে বেড়াচ্ছে, সামান্য এক ফোঁটা জলে কত লক্ষ লক্ষ প্রাণী যে লীলাচাঞ্চল্য ফুটিয়ে তুলছে—শুধুমাত্র চোখে দেখার উপর নির্ভর করলে এই অসীম, অপরূপ জগৎকে দেখবার ও জানবার সুযোগ মানুষের কোনদিনও ঘটতো না।

আজ পৃথিবীতে যত মানুষ, যত জীবজন্তু বসবাস করছে, তাদের তুলনায় এরূপ অলক্ষ্যে বিচরণকারী প্রাণীর সংখ্যা যে কত বেশী, তার ধারণা করা সহজ নয়। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি সংখ্যা দিয়ে মানুষের সংখ্যাকে যদি বাড়িয়ে তোলা যায়, তথাপি তাদের সংখ্যার কাছাকাছিও হয়তো যাবে না। এদের মধ্যে কেউ বা মানুষের মিত্র, কেউ বা মানুষের শত্রু। যারা মিত্র তাদের মধ্যে কেউ বা ভূমিকে উর্বর করছে, কেউ বা প্রাণীদেহকে নিশ্চিহ্ন করে পৃথিবীকে পরিচ্ছন্ন রাখছে, কেউ বা আবার নানাপ্রকার খাদ্য-প্রস্তুতির কাজে সাহায্য করছে। যারা মানুষের শত্রু, তাদের মধ্যে কেউ বা মানুষের শরীরে কিম্বা অন্যান্য জীবদেহে প্রবেশ করে নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি করছে এবং প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না হলে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছে।

প্রাণীদের সর্বনিম্ন কোঠায় যাদের স্থান, তাদের সমষ্টিগতভাবে বলা হয় প্রোটোজোয়া। এদের অনেকেরই দেহাকৃতির একটি বিশিষ্ট ধাঁচ আছে—চলবার সুবিধার জন্যে দেহের চতুষ্পার্শ্বে সরু সরু লোমের মত, কারোর বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঁটার মত উপাঙ্গও দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অ্যামিবা নামক প্রাণীর আবার দেহের সুনির্দিষ্ট কোন গঠন নেই—সব সময়েই দেহাকৃতির পরিবর্তন ঘটছে। দৈহিক সকল অংশই এদের উন্মুক্ত—শুধুমাত্র জীবাধারের অংশগুলিকে আবৃত করে রেখেছে একটি পাতলা পর্দা।

প্রোটোজোয়াদের আস্তানা সাধারণতঃ জলাশয় বা স্যাঁৎসেঁতে ভিজা জায়গা। কেন না, জল ছাড়া এরা বাঁচতে পারে না। আমরাও জল ছাড়া বাঁচি না; কিন্তু শুষ্ক জায়গা বা জলাশয় থেকে দূরে বাস করেও আমাদের প্রয়োজনীয় জল পাওয়ার যতটা সুযোগ-সুবিধা আছে, তাদের তা নেই। কাজেই তাদের পক্ষে শুষ্ক জায়গায় বাস করা সম্ভব নয়। তবে তেমন যদি বিরুদ্ধ পরি-স্থিতির উদ্ভব হয়, তবে তাদের দেহের চতুর্দিকে

সুদৃঢ় বর্মের মত একটা আবরণ গঠিত হয় এবং সুদিনের অপেক্ষায় তার মধ্যে নির্জীবের মত পড়ে থাকে।

আগেই বলেছি, এদের মধ্যে কারুর দেহে আছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শোঁয়ার মত কতকগুলি পদার্থ, যার সাহায্যে এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিচরণ করতে পারে। কারুর দেহাকৃতি পরিবর্তনশীল, কারুর বা অপরিবর্তনীয়। চুন বা বালির খোলসে আবৃত কতকগুলি প্রাণীর দেহ এরূপ অপরিবর্তনীয়। এসব প্রাণীদের অংশ ডায়েটম শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এদের খোলসের কারুকার্য এক শক্তির পরিচয় দেয়, এরাও যেন তেমনি বিভিন্ন রূপে চাঞ্চল্য প্রকাশ করে তাদের প্রাণ-প্রাচুর্যের নিদর্শন ফুটিয়ে তোলে।

এমনি অগুণ্তি প্রোটোজোয়ার সকলের জীবন-কথার সামান্যতম আভাস দেওয়াও একটি প্রবন্ধে সম্ভব নয়; কাজেই সে পথে না গিয়ে এদের মধ্যেকার যে প্রাণীদের জীবনযাত্রা নানা দিক দিয়ে কৌতুকপ্রদ, সেই অ্যামিবার কথাই এখানে বলবো।

এদের দেহের সব অংশই যে উন্মুক্ত—সব সময়েই যে বহুরূপীর মত দেহের পরিবর্তন ঘটছে,
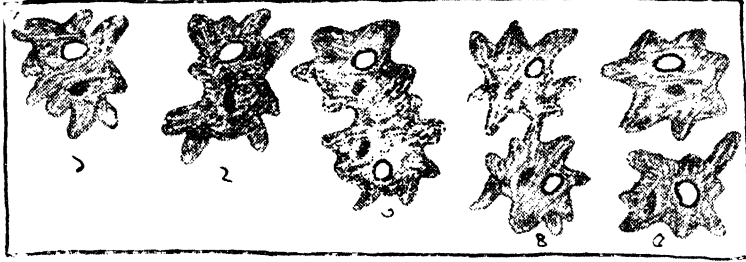
অ্যামিবার বংশবৃদ্ধি-প্রক্রিয়া

মহাবিস্ময়ের বস্তু। প্রোটোজোয়া, ডায়েটম প্রভৃতি সরাসরি মানুষের উপকারে না এলেও সামুদ্রিক মাছের প্রিয় খাদ্যরূপে ঘুরতি পথে আমাদেরও খোরাক জোগাতে এরা কম সাহায্য করে না। প্রোটোজোয়ার মধ্যে কেউ কেউ প্রাণীদেহে প্রবেশ করে কালাজ্বর, ঘুম-রোগ, ম্যালেরিয়া, সবিরাম জ্বর প্রভৃতি মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে কারুর খাদ্য সংগ্রহ করবার জন্যে মুখ আছে, কারুর বা সেরূপ কিছুই নেই। জলের মধ্যে কেউ বা নির্বিঘ্নে সাঁতারকেটে চলে, কেউ বা আস্তে আস্তে চলতে চলতে হঠাৎ এক সময়ে তীরের মত ছুটতে থাকে, কেউ বা আবার শোঁয়ার সাহায্যে জলের মধ্যে ছোট ছোট আবর্তের সৃষ্টি করে। ছোট শিশু যেমন চলাফেরার অক্ষমতা হেতু শুধু হাত পা নেড়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে তাদের জীবনী-সে কথা এর আগেই বলেছি। আবার ক্ষুদ্রতাতেও এরা কম যায় না। পাশাপাশি এদের শরীরের পরিমাপ এক ইঞ্চির একশ' থেকে দেড়শ' ভাগের এক ভাগের মত। স্বচ্ছ জেলির মত একটু পদার্থের ভিতর একটি বিন্দুর মধ্যেই এদের সবকিছু বৈশিষ্ট্য নিবদ্ধ থাকে। এদের না আছে কোন তন্তু, না আছে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অস্থি, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, পাকস্থলী প্রভৃতিরও কোন বালাই নেই। তবু এরা প্রাণী। প্রাণীর মতই এরা জীবনধারণ করে, প্রাণীর মতই এরা ইতস্ততঃ বিচরণ করে। জেলীর মধ্যে ক্ষুদ্র বিন্দুটিই এদের প্রাণাধার, আর তারই সাহায্যে বায়ু থেকে এরা অক্সিজেন নিয়ে শরীরের কাজে লাগায়। খাদ্য গ্রহণের কৌশলও এদের বিচিত্র। কোন মুখ না থাকায় দেহের যে কোন অংশে এরা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে পারে।

প্রতিনিয়তই এদের দেহাকৃতির পরিবর্তন ঘটছে এবং তার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ, ক্ষুদ্রকায় বিভিন্ন জাতীয় প্রোটোজোয়া বা জৈব পদার্থ আবদ্ধ করে নিয়ে ক্রমশঃ তা হজম করে ফেলে।

অ্যামিবার মধ্যে আবার নানাপ্রকার শ্রেণী-বিভাগ আছে। এদের কেউ কেউ মিঠা জলে, কেউ কেউ সামুদ্রিক লোনা জলে, কেউ কেউ স্যাঁৎসেতে ভিজা মাটিতে বাস করে। কয়েক জাতের অ্যামিবা আবার পরভোজী। আমাদের পাকস্থলীতেও এদের দৌরাত্ম্যের অন্ত নেই। যদিও এদের অনেকেই আমাদের কোন ক্ষতি করে না, তবুও কোন কোন জাতের অ্যামিবা

অ্যামিবার খাদ্যসংগ্রহের কৌশল

আমাদের শরীরে প্রবেশ করে মারাত্মক আমাশয় রোগের সৃষ্টি করে।

অ্যামিবার জীবন-বৈচিত্র্যের আরও একটি দিক হলো—তাদের বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া। কিছুকাল বেশ নিশ্চিন্তে কাটিয়ে এক সময়ে এরা দুটি অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নিউক্লিয়াস বা কর্ম-কেন্দ্রটিও দুটি অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই অংশ দুটিই হলো এক-একটি শিশু অ্যামিবা। এই শিশু অ্যামিবা স্বাধীনভাবে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায় খাদ্য-সংগ্রহের জন্যে, দেহপুষ্টি ঘটিয়ে আবার সৃষ্টির উন্মাদনায় নিজেকে বিভাজিত করে। তারাও আবার বড় হয়, আবার সেই উন্মাদনা আসে তাদের জীবনে—এমনিভাবে বংশপরম্পরায় একাদি-ক্রমে নবজীবন সৃষ্টির প্রবাহ চলে। অ্যামিবার কথা নিয়ে সুরু করলেও, দৈহিক বিভাজন ঘটিয়ে এই যে বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া, তা শুধু অ্যামিবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রোটোজোয়া শ্রেণীর মধ্যেই এভাবে বংশবৃদ্ধি ঘটে থাকে। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে তার যে ব্যতিক্রম ঘটে না, এমন নয়। কখনও বা দুটি অংশে বিভক্ত না হয়ে অনেকগুলি অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই ক্ষুদ্র অংশগুলিই আবার এক সময়ে পুরাপুরি নতুন জীবে পরিণতি লাভ করে। এদের মধ্যে যারা দৈহিক আয়তনে একটু বড়, তারা হয়তো কিছুদিন—এমন কি, মাসের পর মাস নিজের দেহ অক্ষত রেখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাতে পারে। কিন্তু দৈহিক আয়তন যাদের ক্ষুদ্র, তাদের সে সুযোগ নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ধরা যাক, এমনি একটি প্রোটোজোয়া তার বংশবৃদ্ধি সুরু করলো। ঘণ্টাখানেক পরে সেটি তাহলে দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে দুটি সম্পূর্ণ নতুন প্রোটোজোয়ায় পরিণত হবে। দু-ঘণ্টা পরে এদের সংখ্যা দাঁড়াবে চার; তিন ঘণ্টা পরে আট। এমনি ভাবে ৩৬ ঘণ্টায় অর্থাৎ মাত্র দেড় দিনে তাদের যে বিপুল সংখ্যা দাঁড়াবে তার হিসাব করলে পৃথিবীর সমস্ত লোকের ত্রিশগুণ সংখ্যাকে এই ক্ষুদ্র প্রাণীটি ছাড়িয়ে যাবে। সপ্তাহখানেক পরে এদের সংখ্যা এত দাঁড়াবে যে, তাদের ওজন আমাদের বিরাটকায় পৃথিবীর ওজনকেও ছাড়িয়ে যাবে। ভাবনার

কথা নয় কি? সেই ক্ষুদে প্রাণী, যাদের শতাধিক প্রাণীকে পর পর সাজালে দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে মাত্র এক ইঞ্চি, অথচ তার বংশবৃদ্ধি করবার ক্ষমতা কি অসীম!

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এমনি ধারা কারবার তো আর চলতে পারে না পৃথিবীতে। তাহলে অন্য প্রাণীরই বা কি অবস্থা দাঁড়াবে, আর পৃথিবীই বা কতদিন তাদের ভার বইতে সক্ষম হবে? কাজেই প্রকৃতির মধ্যেই এমন কতকগুলি প্রতিকূল ব্যবস্থা আছে, যাতে তাদের এতটা বেপরোয়া বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে না। খাদ্যাভাব, অন্য প্রাণীর জঠরজ্বালা নিবৃত্তি, জীবনের অল্প পরিধি, তাদের

দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে, তাকে বলা হয় ব্যাক্টিরিয়া। অবশ্য এর চেয়েও যে ক্ষুদ্র জীব নেই, তা বলা যায় না; কেন না, তাদের অস্তিত্ব অন্য ভাবে ধরতে পারা গেলেও চোখে দেখা বা তাদের বিষয় বিশদ-ভাবে জানবার আমাদের ততটা সুযোগ নেই। আবার এরা প্রাণী না জড় পদার্থ, তাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কাজেই ব্যাক্টিরিয়াকেই আমরা সবচেয়ে ক্ষুদ্র জীব বলে ধরে নিয়েছি। এরা কতটা ক্ষুদ্র? তুলনামূলকভাবে বলা যায় যে, এক ইঞ্চি লম্বা একটি লাইন পূরণ করতে যেখানে অ্যামিবার প্রয়োজন হয় ১০০টির কিছু বেশী, সেখানে ২৫০০০-এরও বেশী ব্যাক্টিরিয়ার প্রয়োজন হবে।
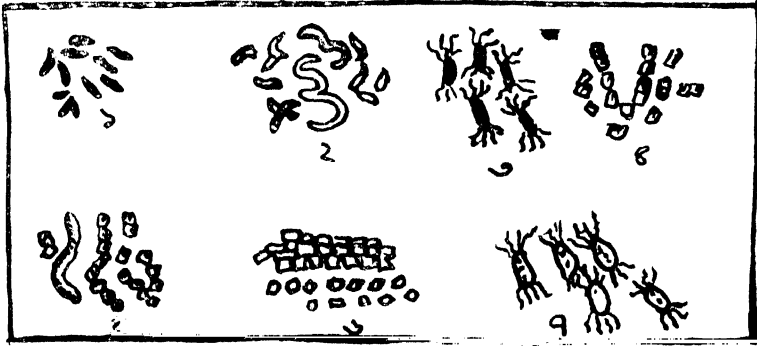
১। যক্ষ্মার জীবাণু, ২। কলেরার জীবাণু, ৩। টাইফয়েডের জীবাণু, ৪। দধি ও মাখন উৎপাদক জীবাণু, ৫। পনির উৎপাদক জীবাণু, ৬। সিরকা উৎপাদক জীবাণু, ৭। মাখন, পনির প্রভৃতি পচাবার জীবাণু।

বৃদ্ধিকে তাই সব সময়েই একটি সমুচিত পরিমাণের মধ্যেই নিবদ্ধ রাখে। তবে এদের সংখ্যা-বৃদ্ধির হার অনুকূল অবস্থায় যে কিরূপ অভাবনীয় হতে পারে, তারই আভাস উপরিউক্ত হিসাবে বোঝা যাবে। এতেই বুঝতে পারা যায় যে, একটি শত্রুভাবাপন্ন ক্ষুদ্র জীব যদি আমাদের শরীরে প্রবেশ করে' অনুকূল পরিবেশে বেড়ে ওঠে, তবে কত অল্প সময়েই আমাদের সুস্থ দেহেও বিপর্যয় ঘটিয়ে তুলতে পারে।

সবচেয়ে যে ক্ষুদ্রতম জীব অণুবীক্ষণ যন্ত্রে

ব্যাক্টিরিয়ার দেহকোষ যেন বাহুল্য মনে করে যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিহার করেছে! তবুও এরা কেমন করে জীবন্ত? সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া আজও কঠিন। যাহোক, প্রোটোজোয়ার মতই এদের বংশবৃদ্ধি ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় এরা যেন আরও বেশী দক্ষ। সাধারণতঃ বিশ মিনিট পর পর এদের দেহ বিভাজিত হয়ে থাকে। প্রোটোজোয়া যেখানে মাত্র দেড় দিনের বংশ-বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর লোক-সংখ্যাকে ছাড়িয়ে

যায়, সেখানে ব্যাক্‌টিরিয়ার লাগে মাত্র আট ঘণ্টারও কম সময়।

সাধারণতঃ গরম জলের তাপেই ব্যাক্‌টিরিয়া জীবনলীলা সাঙ্গ করে; কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে এদের প্রতিরোধী বীজ-রেণুর (spores) সৃষ্টি হয়। তখন আর অত সহজে এদের বিনাশ ঘটে না এবং এমনিভাবে অনেকদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে—এমন কি, কয়েক বছর পর্যন্ত এদের এমনি ভাবে বেঁচে থাকতে দেখা গেছে।

এদের মধ্যে কেউ গোলাকৃতি, কেউ ডিম্বাকৃতি, কেউ বক্র, কেউ বা আবার ছোট ছোট কাঠির মত। এদের অনেকেরই দেহাকৃতির সাদৃশ্যের দরুণ জাতিগত পার্থক্য ধরা কঠিন। বাহ্যিক সাদৃশ্যের জন্যে এদের কার্যকারিতা, চাল্‌চলন লক্ষ্য না করলে জাতিগত পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না।

ব্যাক্‌টিরিয়া ক্ষুদ্র হলেও তাদের সংখ্যা ও বিভিন্নতার অন্ত নেই। প্রতি মুহূর্তে এদের যেমন অগণিত সংখ্যায় বিনাশ ঘটছে, তেমনি আবার অগণিত সংখ্যায় জন্মও হচ্ছে। এদের কেউ শত্রু হিসাবে, কেউ বা মিত্র হিসাবে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে বিজড়িত। পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই, যেখানে এদের সাক্ষাৎ মেলে না। আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে, তুষার-কণায়, বরফের মধ্যেও এদের আস্তানা। যে কোন স্থান যেমন এদের পক্ষে অবারিত, কার্যকরী প্রকৃতিও এদের সেরূপ অনন্ত। কখনও বা মৃতদেহ পচিয়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করছে, কখন বা ভূমিকে উর্বর করছে, কেউ বা আবার জীবদেহে প্রবেশ করে রোগের সৃষ্টি করছে। কেউ বা অন্যান্য জীবের জীবনীশক্তি সঞ্জীবিত করছে। অনেক ক্ষেত্রে নানারকম সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় ঘটে, তার মূলে রয়েছে এই ব্যাক্‌টিরিয়া। মাখন ও পনিরের সুস্বাদ ও সুগন্ধ, বিলাসপ্রিয় লোকের সিগারেট ও মাদকদ্রব্যের স্বাদ ও গন্ধ কয়েক শ্রেণীর ব্যাক্‌টিরিয়ার উপরই নির্ভর করে। কৃষিকার্যেও এরা কম সাহায্য করে না। বাতাসের নাইট্রোজেনকে রূপান্তরিত করে' গাছপালার পরিপুষ্টি সাধন করে। শীমজাতীয় উদ্ভিদের শিকড়েও এরা বসবাস করে' আশ্রয়দাতার দেহপুষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করে। কাঁচা চামড়া থেকে লোম তুলে ফেলবার কাজেও এদের সাহায্য না হলে চলে না। মাছ মাংস বা পচনশীল অন্যান্য বস্তু থেকে যে অনুজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হয়, তার কারণও এই ব্যাক্‌টিরিয়ার উপস্থিতি।

ব্যাক্‌টিরিয়াকে আমরা সাধারণতঃ রোগ-উৎপাদক বলেই জানি। অবশ্য একথা ঠিক যে, কলেরা, টাইফয়েড, ডিপথিরিয়া, প্লেগ, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি ব্যাক্‌টিরিয়ার দ্বারাই ঘটে সত্য কিন্তু এরা মানুষের যা উপকার করে তারও তুলনা হয় না। সামান্য একটি উদাহরণেই সেকথা বুঝতে পারা যাবে। একথা কারুর অজানা নয় যে, দৈনন্দিন আমাদের পৃথিবীতে অসংখ্য জীবজন্তুই মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। ব্যাক্‌টিরিয়া যদি সেগুলিকে পচিয়ে বিনষ্ট না করতো, তবে অচিরেই জীবজন্তুর মৃতদেহে ভূ-পৃষ্ঠ ভরপুর হয়ে উঠতো। কাজেই ব্যাক্‌টিরিয়ার অনুপস্থিতিতে পৃথিবীতে কিছুকাল হয়তো জীবন-স্পন্দন অক্ষুণ্ণ থাকতো বটে, কিন্তু সে চাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে যেতেও বিশেষ দেরী লাগতো না।

অ্যালুমিনিয়াম

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

ভূত্বকে বহুল প্রাপ্তব্য মৌলিক পদার্থসমূহের মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের স্থান তৃতীয়। অক্সিজেন এবং সিলিকন আরও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়—অবশ্য, এরা ধাতু নয়। যাবতীয় ধাতুর মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামই সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়। ভূত্বকের শতাংশের সাত ভাগই অ্যালুমিনিয়াম। অ্যালুমিনিয়ামকে প্রধানতঃ বিভিন্ন প্রকারের অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেটের আকারে মাটিতে পাওয়া যায়। এই যৌগিক পদার্থগুলি অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, অক্সিজেন এবং আরও দু-একটি সাধারণ মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।

স্ফটিক, ফেল্ডস্পার ও অভ্র, এই তিনটি পদার্থের সমন্বয়ে ভূত্বকের গ্র্যানিট-প্রস্তর গঠিত। তাদের মধ্যে ফেল্ডস্পার ও অভ্র উভয়েই হলো ভিন্ন প্রকারের অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট। আর স্ফটিক হলো সিলিকন ডাইঅক্সাইড। অভ্রকে বিচ্ছিন্ন করে খুব পাত্‌লা পাত্‌ করা যায়। অভ্রের পাত কাচের পরিবর্তে ব্যবহার করা চলে। চুল্লীর জানালায় অভ্রের পাত্‌ লাগানো হয়; কারণ অভ্র কাচের চেয়ে বেশী উত্তাপ প্রতিরোধ করতে পারে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে অভ্র অন্তরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জলবায়ুর আক্রমণে ফেল্ডস্পার মাটিতে পরিণত হয়। এই শ্রেণীর মাটির কণিকা বালির কণিকার চেয়েও ক্ষুদ্র। এই রকম মাটি স্পঞ্জের মত পিণ্ডে পরিণত হয়ে বৃষ্টির জল দ্রুত বাষ্পীভূত হতে বাধা দেয় বলে জমির উর্বরতার পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু জীবজন্তুর জীবনধারণের জন্যে অ্যালুমিনিয়াম কিংবা সিলিকনের কোন উপকারিতা নেই। এই পদার্থ দুটির কোনটিই সজীব পেশীকলায় থাকে না। গৃহাদি নির্মাণের জন্যে এই শ্রেণীর মাটি প্রয়োজনীয় উপাদান। এই মাটিকে প্রায় ১০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পুড়িয়ে কঠিন ও অদাহ্য ইট তৈরী করা হয়। ইটের মধ্যে মাটি ছাড়াও বালি থাকে। লাল ইটে লৌহঘটিত পদার্থও থাকে। লৌহঘটিত পদার্থের জন্যেই ইটের রং লাল হয়।

একপ্রকার বিশুদ্ধ মাটিকেই কেওলিন বা চীনামাটি বলে। চীনামাটিই মৃৎপাত্র ও চীনামাটির বাসন তৈরীর উপাদান। এই দ্রব্য দিয়ে হাতমুখ ধোবার সিঙ্ক, রেফ্রিজারেটর, চুল্লী প্রভৃতির উপরে সাদা কলাই করা হয়। ভূগর্ভে যে মাটি যথেষ্ট চাপ পেয়ে শক্ত হয়েছে তাকে শ্লেট বলে। এই শ্লেটেই লেখা হয়।

অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে গন্ধক, অক্সিজেন এবং অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে একশ্রেণীর যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়; তাদের বলে ফটকিরি। ফটকিরি সঙ্কোচক পদার্থ, অর্থাৎ চামড়ায় লাগালে চামড়া কুঞ্চিত হয়। দাড়ি কামাবার সময় ক্ষত-স্থানে ফটকিরি লাগালে চামড়া কুঞ্চিত হয়ে রক্ত-ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। পানীয় জল বিশুদ্ধ করবার জন্যে ফটকিরি ব্যবহৃত হয়। ফটকিরি জলের জীবাণুগুলিকে ডেলার মত করে দেয়। জীবাণু, ফটকিরি এবং জলের অন্যান্য ময়লা নীচে পড়ে যায়। উপরে জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার জল থাকে।

অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেটসমূহ এরূপ সহজপ্রাপ্য হওয়াতে মনে হয়, অ্যালুমিনিয়াম ধাতুও সহজলভ্য ও সস্তা হবে। কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা সহজসাধ্য নয়। ১৮৫০ সালে অ্যালুমিনিয়াম প্রথম বাজারে পাওয়া যায়। তখন এর মূল্য ছিল প্রতি পাউণ্ডে পাঁচ-শ' টাকা—রূপার চেয়ে মহার্ঘ, প্রায় সোনার দর।

ফরাসী দেশের তৎকালীন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন বিশেষ অধিকার হিসাবে খাবার সময় অ্যালুমিনিয়ামের কাঁটা ব্যবহার করতেন। সোনা ও রূপার কাঁটার ব্যবস্থা ছিল তাঁর অতিথিদের জন্যে। ১৮৮০ সালের পরে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করবার প্রক্রিয়ার উন্নতি করা হয়। ধাতুর দাম হয় প্রতি পাউণ্ডে প্রায় পঁচিশ টাকা। ১৮৮৪ সালে স্থাপিত ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভের উপরে অ্যালুমিনিয়ামের টুপি স্থাপন করা হয়। টুপিটি এখনও সেখানেই আছে।

১৮৮৬ সালে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। ঐ সময়ে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করবার সহজ উপায় উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে ধাতু অনেক সুলভ হয়। বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড হলো সাদা স্ফটিকের মত বস্তু। এর প্রতি অণুতে থাকে দুটি অ্যালুমিনিয়াম এবং তিনটি অক্সিজেন পরমাণু। সাধারণতঃ একে অ্যালুমিনা বলে। দুটি কঠিন বস্তু, কোরাণ্ডাম ও এমারি হলো খানিকটা ভেজাল মিশ্রিত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। কোরাণ্ডাম এমারির চেয়ে অধিকতর বিশুদ্ধ। এরা কার্বোরাণ্ডাম কিংবা হীরকের ন্যায় অত কঠিন না হলেও অধিকতর সুলভ। এদের পালিশের কাজে ব্যবহার করা যায়। সংশ্লেষিত কোরাণ্ডামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ঘড়ি ও অন্যান্য যন্ত্রে বেয়ারিং হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক মণিই হলো ভেজাল মিশ্রিত কোরাণ্ডাম। ভেজালের জন্যেই নানাপ্রকার রং হয়। এই সব মূল্যবান প্রস্তরের মধ্যে আছে—পোখরাজ বা পীতমণি, নীলকান্তমণি বা নীলা এবং পদ্মরাগমণি বা চুনি। কোরাণ্ডামে বিশেষ ভেজাল যোগ করে কৃত্রিম নীলা ও চুনি তৈরী করা যায়। ওই সব কৃত্রিম মণির রাসায়নিক গঠন প্রাকৃতিক মূল্যবান প্রস্তরের অনুরূপই হয়ে থাকে।

বক্সাইট হলো আর একপ্রকার অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করবার জন্যে এটিই সবচেয়ে বেশী দরকারী। এই পদার্থটি পৃথিবীর অনেক জায়গায় বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। এ পদার্থটিকে প্রথমে সিলিকন ও অন্যান্য ভেজাল থেকে মুক্ত করলে সাদা অ্যালুমিনা-চূর্ণ পাওয়া যাবে। তারপর এই বিশুদ্ধ অ্যালুমিনা-চূর্ণ গলিত খনিজ পদার্থ ক্রাইয়োলাইটে গলানো হয়। এই খনিজাত পদার্থ হলো সোডিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম-ফ্লোরাইড, যার প্রতি অণুতে আছে তিনটি সোডিয়াম, একটি অ্যালুমিনিয়াম ও ছটি ফ্লোরিন পরমাণু। উত্তপ্ত দ্রব্যটি এরূপ পাত্রে রাখা হয়, যার অভ্যন্তর ভাগ কার্বনের দ্বারা আচ্ছাদিত। কার্বনের দণ্ড দ্রবের ভিতরে সন্নিবিষ্ট করা হয়। দণ্ড ও আচ্ছাদনের মধ্যবর্তী দ্রবে বিদ্যুৎ পরিচালনা করলে গলিত অ্যালুমিনিয়াম ধাতু পাত্রের তলদেশে জমা হয়। নতুন প্রক্রিয়া আবিষ্কারের পরেই অ্যালুমিনিয়ামের দাম কমে' প্রতি পাউণ্ড প্রায় দেড় টাকার মত হয়ে যায়। এই ভাবে অ্যালুমিনিয়াম খুব সুলভ হয়ে ওঠে এবং ধাতুটিকে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় কাজে নিয়োগ করবারও ব্যবস্থা হতে থাকে।

অ্যালুমিনিয়াম লোহার চেয়ে হাল্কা ও অকঠিন। এক ঘনইঞ্চি লোহার ওজন হবে সাড়ে চার আউন্স; অপর পক্ষে সমআয়তনের অ্যালুমিনিয়ামের ওজন হবে দেড় আউন্স। অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে অন্যান্য ধাতু খুব অল্প পরিমাণে যোগ করে সঙ্কর ধাতু তৈরী করলে অ্যালুমিনিয়ামের কাঠিন্য অনেক বেড়ে যায়। পঁচানব্বই পাউণ্ড অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে চার পাউণ্ড তামা, আধ পাউণ্ড ম্যাগ্নেসিয়াম এবং আধ পাউণ্ড ম্যাঙ্গানিজ যোগ করে যে সঙ্কর ধাতু তৈরী হয়, তার নাম ডুরাল। ডুরাল বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে অনেক কঠিন। তাহলেও লোহা কিংবা তার সঙ্কর ধাতুসমূহের মত অত কঠিন নয়। অ্যালুমিনিয়ামের শত শত সঙ্কর ধাতু তৈরী হয়—তাদের বিশেষত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসারে। অ্যালুমিনিয়ামের

লঘুত্বের জন্যে এরোপ্লেন প্রধানতঃ এই ধাতু দিয়েই নির্মিত হয়। অ্যালুমিনিয়াম হলো উৎকৃষ্ট বিদ্যুৎ-পরিবাহী। বিদ্যুৎ প্রেরণের জন্যে তামার তারের পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়ামের তারও ব্যবহার করা হয়, বিশেষতঃ অনেক দূরে প্রেরণ করতে হলে।

অ্যালুমিনিয়াম লোহার ন্যায় মরিচা পড়ে ক্ষয় হয় না। অ্যালুমিনিয়াম অক্সিজেনের সঙ্গে সহজেই মিলিত হয়ে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড গঠন করে।

এই পদার্থটি অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর গায়ে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড নিষ্ক্রিয় হওয়ার ফলে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। কাজেই অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের খুব পাত্‌লা একটি স্তর অ্যালুমিনিয়ামের গায়ে জমা হলে ধাতুটি অধিকতর ক্ষয় থেকে রক্ষা পায়। স্তরটি খুব পাত্‌লা হওয়ার জন্যে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়। কাজেই অভ্যন্তরের ধাতুর ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয় না। এই কারণেই জলবায়ুর দ্বারা আক্রান্ত হয় না। এই কারণে দেয়াল, দরজা, জানালার ফ্রেম, বৃষ্টির জলের পাইপ প্রভৃতির জন্যে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। গাড়ী, লরী প্রভৃতি অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে নির্মাণ করা হয়।

অধিকাংশ ধাতুই গুঁড়া করলে কালো হয়ে যায়। কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম-চুর্ণ রূপার মতই চক্‌চকে থাকে। তিসির তেলের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম-চুর্ণ মিশিয়ে অ্যালুমিনিয়াম পেণ্ট প্রস্তুত করা যায়। এই রং যে স্থানে লাগানো যায়, সে স্থান ক্ষয় থেকে রক্ষা পায় এবং আলো প্রতিফলিত করে। অ্যালুমিনিয়াম উৎকৃষ্ট আলো-প্রতিফলক হওয়াতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আর্শির উপরে ব্যবহৃত হয়। কারণ এ-স্থলে যথেষ্ট আলোর প্রতিফলন হওয়া দরকার।

বর্তমানে গৃহস্থালীর কাজে এত অধিক অ্যালুমিনিয়ামের বাসন ব্যবহৃত হয় যে, তার ব্যয়ভার বহন করা তৃতীয় নেপোলিয়ানের পক্ষেও তৎকালে সম্ভব ছিল না। অ্যালুমিনিয়ামের গায়ে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের একটি সূক্ষ্ম স্তর উৎপন্ন হয় বলেই খাদ্যদ্রব্যের কোন অ্যাসিড কিংবা অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ ধাতুটিকে আক্রমণ করতে পারে না। এই জন্যে ধাতুও খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে আসতে কিংবা একে বিষাক্ত করতে পারে না। অবশ্য সামান্য পরিমাণ লোহা কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের জন্যে কোন বিষক্রিয়া হয় না। সিগারেট, চিউয়িংগাম প্রভৃতি অনেক জিনিষ অ্যালুমিনিয়ামের পাত্‌ দিয়ে মুড়ে বাজারে বিক্রয় করা হয়।

১৯৫৭ সালে পৃথিবীতে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের মোট পরিমাণ হচ্ছে ৩,৭৩০,০০০ টন।

বিজ্ঞান বার্তা

তুষারপাতের মধ্যে গাছপালাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা

আমেরিকার ফ্লোরিডার মত বিভিন্ন অঞ্চলে তুষারপাতের জন্যে লেবুজাতীয় গাছগুলিকে বাঁচানো খুবই কঠিন। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, সেই সময়ে গাছগুলির বৃদ্ধি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে পারলে তারা বেঁচে থাকে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা এজন্যে এম-এইচ ৩০ নামে একপ্রকার ভেষজ আবিষ্কার করেছেন। এই ওষুধ প্রয়োগে এই ধরণের গাছের বৃদ্ধি কিছুদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়, অর্থাৎ এদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়। এভাবে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের ফলে এদের আর মৃত্যু ঘটে না। ইউনাইটেড স্টেটস্ রাবার কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠান এই খবর দিয়েছেন।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চিত তেল সংগ্রহের উপায়

ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে পরিমাণ জমাট তেল রয়েছে, তা তরল করে সংগ্রহ করতে পারলে পৃথিবীর তেল উৎপাদনের পরিমাণ সাতগুণ বেড়ে যাবে। আমেরিকার ইলেকট্রনিক টিউব ম্যানুফ্যাক্চারার কোম্পানী সম্প্রতি এজন্যে পরীক্ষামূলক একপ্রকার 'ইলেকট্রনিক হিটার' তৈরী করেছে। এতে ৬ ইঞ্চি ব্যাসের নল ব্যবহৃত হবে এবং অতি তীব্র আলোকচ্ছটারূপে ১০ হাজার ওয়াট পর্যন্ত তাপশক্তি পাওয়া যেতে পারে বলে তাঁরা আশা করেন।

টেলিফোনে প্রেরিত বার্তা রেকর্ড করবার অভিনব যন্ত্র

আমেরিকার ইণ্টারন্যাশন্যাল বিজিনেসমেন্স্ কর্পোরেশন টেলিফোনে প্রেরিত বার্তা গ্রহণ ও প্রণালীবদ্ধভাবে রেকর্ড করবার একটি অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। এই যন্ত্রটির নাম '১০০১ ডেটা ট্র্যান্সমিশন সিস্টেম'। কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের অতিরিক্ত বেতনের হিসাব ও জিনিষ-পত্রের তালিকা প্রস্তুত করা, বিল তৈরী করা এবং হিসাবপত্র রাখবার ব্যাপারেও এই যন্ত্রটি বিশেষ-ভাবে সাহায্য করতে পারে।

আর্দ্রতাও সংক্রামক রোগ বিস্তারের সহায়ক

মার্কিন ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানী ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ কে. এইচ. কিংডম বলেছেন, আবহাওয়ায় শতকরা ৮৫ ভাগ থেকে ৯৫ ভাগ আর্দ্রতাই হলো বহু সংক্রামক রোগ বিস্তারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত কোন রোগী যখন হাঁচি দেয়, তখন সেই হাঁচির সঙ্গে হাজার হাজার জলের কণার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ রোগ জীবাণু আবহাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। আবহাওয়ার আর্দ্রতার পরিমাণ শতকরা ৮৫ থেকে ৯৫ পর্যন্ত হলে সেই জলকণাসমূহ অনেকক্ষণ থাকে। আর্দ্রতার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেলে তারা মাটির কাছাকাছি আরও বেশী নেমে আসে। আর্দ্রতা হ্রাস পেলেই ভিজে আবহাওয়ায় পুষ্ট জীবাণু জলাভাবে মরে যায়। ১৯৫৭ সালে এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ইনফ্লুয়েঞ্জা যে সংক্রামক রোগের আকারে দেখা দিয়েছিল—তখনকার অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই রোগ-জীবাণু যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন এই রোগের তেমন আক্রমণ হয় নি, হয়েছে তার কয়েক মাস পরে, আবহাওয়ার আর্দ্রতা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে। আর্দ্রতার পরিমাণ

শতকরা ৮৫ থেকে ৯৫ ভাগের মধ্যে থাকবার সময়েই এই রোগ-সংক্রমণ বেড়ে গিয়েছিল।

শল্য-চিকিৎসাকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার কারণ

আমেরিকার ভেটারেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা প্রাক্তন সৈনিক সংস্থার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ হ্যারী লিভিন এবং তাঁহার সহকর্মীরা জানিয়েছেন, শল্য-চিকিৎসার সময়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার সঙ্গে যকৃতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। যখন অতি দ্রুত রক্তপাত হতে থাকে, তখন যকৃৎ থেকেই পটাসিয়াম নির্গত হয় এবং রক্তে পটাসিয়ামের অবস্থিতির দরুণ বিষক্রিয়ার ফলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটে। দশটি রোগীর মধ্যে চারটির ক্ষেত্রে এই রকম হতে দেখা গেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁরা বলেছেন, শল্য-চিকিৎসার সময়ে অতিরিক্ত রক্তপাতের জন্যে রোগীর দেহে প্রচুর পরিমাণে রক্ত দিতে হলে, সেই রক্ত ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে—পটাসিয়ামের পরিমাণ যে রক্তে কম, সেই রক্তই রোগীকে দিতে হবে। তবে শল্য-চিকিৎসার সময়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে খুব কম লোকেরই মৃত্যু ঘটে।

হীরার মূল্য নির্ধারণের অভিনব যন্ত্র

জহুরী তো জহর চেনেই—কিন্তু সাধারণ লোকেও যাতে হীরা, চুনি, মণি, পান্নার ভালমন্দ বিচার করতে পারে—তাদের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করতে পারে, অ্যালবার্ট এস স্যামুয়েল নামে জনৈক আমেরিকান তার একটি উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত একটি যন্ত্রের সাহায্যে হীরা, চুনি, পান্না ইত্যাদির ছবি বৃহদাকারে পর্দার উপর প্রতিফলিত করা হয়। পর্দাটির উপর রেখায় চার হাজার সমচতুর্ভুজ বা স্কোয়ার অঙ্কিত থাকে। এসব মণিমাণিক্যে কোন ত্রুটি থাকলে, তা ঐ চিত্রে ধরা পড়ে। ঐ ত্রুটির জন্যে ঐ সব সমচতুর্ভুজের মধ্যে কোন কোনটিতে তেমন আলোকপাত হয় না, অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এই বিষয়টি বিচার করেই সেই মণিটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় দেড় ক্যারেট ওজনের একটি মণিকে প্রকৃত আকৃতির ৩৯১০ গুণ বড় করা হয়।

গ্রহলোকে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডাঃ হ্যারল্ড. সি. উরে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীতে যন্ত্রপাতি-সমন্বিত মহাশূন্যগামী যানের সাহায্যে গ্রহলোকের তথ্য সন্ধান সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, সৌরমণ্ডলের উৎস ও বিবর্তন সম্পর্কে বহু রহস্যের সন্ধান, গ্রহসমূহে প্রাণীর বর্তমান অস্তিত্ব অথবা লুপ্ত অস্তিত্বের সন্ধান মহাশূন্যগামী যানের সাহায্যেই করা সম্ভব।

গ্রহলোক সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও তথ্যানুসন্ধানের জন্যে তিনি এই প্রসঙ্গে যে সব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে রয়েছে—এই পরিকল্পনা অনুসারে গ্রহসমূহের নিকটবর্তী স্থানে অথবা উপরিভাগে সৌরমণ্ডলের বহু বিষয় বেতার-বীক্ষণের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ, গ্রহসমূহের ভর, আকার, উপরিভাগের ও আভ্যন্তরীণ গঠনপ্রণালী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং গ্রহসমূহে তাপ, চাপ ও গভীরতার পরিমাণ, আবহাওয়ার রাসায়নিক সংগঠন, আয়নের পরিমাণ ও প্রকৃতি নিরূপণের চেষ্টা করা হবে। গ্রহসমূহে প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কি না অথবা কোন কালে ছিল কি না—সে বিষয়েও পরীক্ষা করে দেখা হবে।

ডাঃ উরের ধারণা, মঙ্গলগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। তিনি বলেন—এর সঙ্গত কারণও আছে। তবে আমরা পৃথিবীতে যে ধরণের প্রাণী দেখতে পাই, সে ধরণের প্রাণী হয়তো সেখানে নেই। প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখবার

জন্যে মঙ্গলগ্রহকেই বেছে নেওয়া হবে। এটিই হবে এই বিষয়ের পরীক্ষার উপযুক্ত স্থল।

তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, রাসায়নিক সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের জন্যে এবং ভূমিকম্প সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্যে বুধগ্রহের যে দিকটা খুবই ঠাণ্ডা, সেদিকে যন্ত্রপাতি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হবে। বুধগ্রহের যে দিকটা সূর্যালোকিত, সেদিক এত উত্তপ্ত যে, সেখানে কোন বেতার যন্ত্র কার্যকরী হওয়া কঠিন বলেই তাঁর ধারণা।

মহাশূন্য ও গ্রহলোক সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সব পরীক্ষাকার্য চালানো হচ্ছে, তার ফলে ভেষজ-বিজ্ঞান এবং কারিগরি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রও বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে—একথা মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি সভার সায়েন্স অ্যাণ্ড অ্যাস্ট্রোনটিক্স কমিটি জানিয়েছে।

কমিটির একটি রিপোর্টে জানা যায়, হাইড্রাজিন হলো রকেটের এক প্রকার ইন্ধন। নবাবিষ্কৃত এই জিনিষটি এখন যক্ষ্মারোগ ও মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

তারপর এজন্যে যে সব অতি সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের রক্তপ্রবাহ ও তাপমাত্রা নিরূপণে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ

বেল টেলিফোন লেবরেটরির প্রেসিডেণ্ট জেমস্. জি. ফিস্ক পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে টেলিফোন ও টেলিভিশনের সাহায্যে বার্তা প্রেরণের একটি অভিনব পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন। এই ব্যবস্থায় পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণে মেরু এলাকার মধ্য দিয়ে প্রদক্ষিণরত ৫০টি কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোন একটি স্থানের টেলিফোন কেন্দ্রের সঙ্গে অন্য যে কোন স্থানের টেলিফোন কেন্দ্রের যোগাযোগ স্থাপিত হবে। ভূতলস্থিত এই ধরণের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্যে খরচ পড়বে ১৭০,০০০,০০০ ডলার। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করবার ব্যাপারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাহায্য পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা করছেন। ফিস্ক এই পরিকল্পনার খসড়াটি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশনের নিকট উপস্থাপিত করেছেন। এসব উপগ্রহ পৃথিবীর তিন হাজার মাইল উর্ধ্বে থেকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে। এর জন্যে তেরোটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

অল্প জলে ভুট্টা চাষ

ভুট্টা চাষ এবং ভুট্টাগাছকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়, তার এক তৃতীয়াংশ জলেও ভুট্টাগাছ বাঁচে এবং ভুট্টার চাষ হতে পারে—আমেরিকার দু-জন বিশিষ্ট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী একথা প্রমাণ করেছেন। তাঁরা প্রথমতঃ ভুট্টা গাছের গোড়ার মাটির সঙ্গে হেক্সাডেকানল নামে একপ্রকার রাসায়নিক তেল মিশিয়ে দিয়ে দেখেছেন যে, ভুট্টাগাছ এই রাসায়নিক পদার্থটি যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করে থাকে এবং তা ভুট্টাগাছের পাতায় এসে জমা হয়। গাছ তার পাতার সাহায্যেই শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, যে জল গ্রহণ করে তাও ঐ পাতার মধ্য দিয়েই নানাভাবে উবে যায়। কিন্তু ঐ তৈলাক্ত পদার্থটি পাতায় জমা হওয়ার দরুণ যে জলটুকু গাছ গ্রহণ করে তা আর উবে যেতে পারে না।

পরমাণুর বিভাজন থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি

শিকাগোর ড্রেসডেনস্থিত পরমাণুর বিভাজন থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্যে ৫ কোটি ১০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে যে কারখানাটি নির্মিত হয়েছে, তাতে ১৮০,০০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হবে। বিগত ৩০শে জুন থেকেই এই সহরের ঘরবাড়ীতে, কলকারখানায় এখান থেকেই বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে। তবে কারখানাটি এখনও পুরাপুরি চালু করা হয় নি। এই কার-খানায় ৬৬ টন ইউরেনিয়াম থেকে সাড়ে তিন বছর ধরে দুই লক্ষ লোককে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা

যাবে। কিন্তু এই সময়ে এই পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করবার জন্যে কয়লার প্রয়োজন হতো ২০ লক্ষ টনের।

রোগ-চিকিৎসায় সঙ্গীত

সঙ্গীতে বেদনার উপশম হয়, ব্যথার তীব্রতা কমে আসে—ম্যাসাচুসেট্স্-এর দন্ত-চিকিৎসক ডাঃ ওয়ালেস. জে. গার্ডেনার ৫০০০ দন্ত-সংক্রান্ত রোগীর উপর সঙ্গীতের সাহায্যে বেদনা হ্রাস করবার প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছেন। শল্য-চিকিৎসার ব্যাপারেই তিনি এই প্রক্রিয়ার সাহায্য নেন। তিনি বলেন, এসব রোগীর ১০০০টির মধ্যে শতকরা ৬৫টির ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে—তাদের শল্য-চিকিৎসার স্থল ওষুধ প্রয়োগ করে অসাড় করবার প্রয়োজন হয় নি। শতকরা ২৫ জনের ক্ষেত্রে সহনশীলতায় বেশ সাহায্য করেছে, শতকরা ১০টি ক্ষেত্রে আশানুরূপ কার্যকরী হয় নি। হেডফোনের সাহায্যেই তাদের সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়েছিল।

সংক্রামক ব্যাধির নতুন অ্যান্টিবায়োটিক

আমেরিকার লেডারলি লেবরেটরী থেকে ডেক্লোমাইসিন নামে নতুন এক ধরণের অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয়েছে। চিকিৎসকেরা এই নতুন ওষুধটি পাঁচহাজার রোগীর উপর প্রয়োগ করে দেখেছেন যে, ব্যাসিলারী আমাশয়, মূত্রনালী সংক্রান্ত সংক্রামক ব্যাধি, যৌন ব্যাধি, চর্মরোগ এবং অত্যন্ত খারাপ ধরণের নিউমোনিয়া রোগের চিকিৎসায় এটি খুবই কার্যকরী হয়ে থাকে। টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের অর্ধ-মাত্রায় ডেক্লোমাইসিন প্রয়োগ করতে হয়। মানবদেহে ঐ সব ওষুধের তুলনায় এই ওষুধটি অনেক বেশী সময় থাকে।

আগুন নেবানোর পাউডার

ওয়াশিংটনের নেভ্যাল রিসার্চ লেবরেটরী তেল বা গ্যাসের আগুন নেবানোর জন্যে একপ্রকার পাউডার আবিষ্কার করেছেন—এ হচ্ছে পটাসিয়াম বাই-কার্বোনেটের গুঁড়া। এটির নাম দেওয়া হয়েছে পার্পল কে পাউডার। এই জিনিষের মত তাড়াতাড়ি আর কোন কিছুতেই এই ধরণের আগুন নেবানো যায় না।

একটি বিধ্বস্ত বিমানের আগুন এই পাউডারের সাহায্যে ১১ সেকেণ্ডের মধ্যে নেবানো হয়েছে। ধোঁয়া বেরোবার আগেই যে তেলের আগুন এই জিনিষের সাহায্যে নেবানো যায়, তা প্রমাণিত হয়েছে। এর খরচও খুব কম এবং কোন রকম বিষাক্ত দ্রব্যও এই জিনিষটিতে নেই। আগুন নেবাবার যন্ত্রে এই জিনিষটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সমুদ্রগর্ভে তৈল-ভাণ্ডার স্থাপনের ব্যবস্থা

জাহাজ, সাবমেরিন ও বিমানসমূহ সাগরের উপর দিয়ে যাবার সময়ে প্রয়োজন হলে যাতে তেল নিতে পারে, তারই উদ্দেশ্যে মার্কিন নৌ-বাহিনী জলের তলে তৈল-ভাণ্ডার স্থাপনের পরিকল্পনা করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে এই প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে মেক্সিকো উপসাগরে লুইজিয়ানার কিছুটা দূরে একটি বিরাট রবারের আধার সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৫২ ফুট নীচে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। এতে ৫০ হাজার গ্যালন তেল ধরবে। এই আধারটি চওড়ায় ২২ ফুট এবং লম্বায় ৭০ ফুট। সমুদ্রের স্রোতে এই আধারটি যাতে ভেসে না যায়, তার জন্যে একটি ইস্পাতের কাঠামোতে বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা হবে।

নক্ষত্রের সঠিক অবস্থান নির্ণয়

ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের অর্থ-সাহায্যে আমেরিকার

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণের জন্যে একটি অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন। দক্ষিণ গোলার্ধে এ-রকম আর একটি মাত্র দূরবীক্ষণ আছে।

এ-ধরণের দূরবীক্ষণের নাম হলো অ্যাস্ট্রোগ্রাফ। ক্যালিফোর্ণিয়ার মাউণ্ট হ্যামিলটনস্থিত লিক মানমন্দিরে বর্তমানে যে অ্যাস্ট্রোগ্রাফটি রয়েছে, তার সাহায্যে অর্ধাকাশের ঘনসন্নিবিষ্ট নক্ষত্রসমূহ দৃষ্টিগোচর হয় না, এদের আলোকচিত্র গ্রহণও সম্ভব নয়। উত্তর গোলার্ধে এই একটি মাত্রই অ্যাস্ট্রোগ্রাফ রয়েছে। ঐ নতুন অ্যাসট্রোগ্রাফের সাহায্যে এই দৃষ্টির অগোচর নক্ষত্রপুঞ্জের আলোকচিত্র গ্রহণ সম্ভব হবে।

ছায়াপথে যে অসংখ্য নক্ষত্র রয়েছে, তাদের অবস্থান পরিবর্তিত হচ্ছে। নতুন এই দূরবীক্ষণটি ছায়াপথের গঠন-প্রণালী, নক্ষত্রের অবস্থান পরিবর্তন সম্পর্কে বহু তথ্যের সন্ধান দেবে।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন এই দূরবীক্ষণ নির্মাণের জন্যে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়কে ৭৫০,০০০ ডলার দান করেছেন। এই দূরবীক্ষণ ১৯৬২ সালের মধ্যে চালু করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। চিলি অথবা আর্জেন্টিনার আবহাওয়ার তেমন কোন পরিবর্তন হয় না এবং আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকে বলে ঐ দুটি স্থানের কোন একটিতে এই যন্ত্রটি স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এই অ্যাস্ট্রোগ্রাফের সাহায্যে দক্ষিণ আকাশের ৪০০০ আলোকচিত্র গ্রহণ করা হবে এবং বহু দূরবর্তী ছায়াপথের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই পৃথিবীর নিকটবর্তী ছায়াপথে যে সব নক্ষত্র রয়েছে, তাদের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা হবে। এই আলোকচিত্র গ্রহণের ২৫ বছর পরে আবার ঐ সব নক্ষত্রপুঞ্জের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হবে এবং তার সঙ্গে তুলনা করে প্রথম অবস্থান থেকে তারা যে কতখানি সরে এসেছে, তা জানা যাবে। বহু দূরবর্তী ছায়াপথের কথা এখানে এজন্যে বলা হয়েছে—এরা এতদূরে রয়েছে যে, তাদের স্থান পরিবর্তন আদৌ দৃষ্টিগোচর হতে পারে না। এজন্যেই এদের মাপকাঠি হিসাবে দাঁড় করিয়ে এদের পরিপ্রেক্ষিতে নিকটবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। দশলক্ষ নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয়ের জন্যে যে বিশেষ ধরণের কম্পিউটারের প্রয়োজন হবে, তা নির্মাণের জন্যে ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন তিন লক্ষ ডলার দান করেছেন।

ঘড়ির কাঁটায় ও ফলকে ট্রিটিয়াম

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন ঘড়ির কাঁটা ও ফলকে অতি অল্প পরিমাণ হাইড্রোজেন-৩ বা ট্রিটিয়াম প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছেন। অন্ধকারেও যাতে ঘড়ির কাঁটা দেখা যেতে পারে, তারই জন্যে ঘড়ির কাঁটায় ও ফলকে এ-পর্যন্ত র‍্যালব-২৬৬ নামে একটি পদার্থ ব্যবহৃত হতো। এখন ঐ জিনিষটির বদলে আলোক বিকিরণকারী ট্রিটিয়াম প্রয়োগ করা যাবে। ট্রিটিয়াম থেকে গামারশ্মি নির্গত হয় না। তবে এথেকে যে সামান্য বিটারশ্মি নির্গত হয়, তা ক্ষতিকর নয় এবং ঘড়ির ফলকের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না।

তিমিজাতীয় প্রাণী—শুশুকের ভাষা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনী তিমিজাতীয় প্রাণী—শুশুক নিয়ে পাঁচ বছর ধরে গবেষণা করছেন। তাঁরা বলছেন, নৌকা বা বিমান পোত চালনায় যোগাযোগ সাধনে শুশুক, মাছ, পাখী এবং অন্যান্য প্রাণী নিয়ে গবেষণার ফলাফল বিশেষ কাজে লাগতে পারে। এই গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, শুশুকের একপ্রকার ভাষা আছে, তারা মানুষের সঙ্গ ভালবাসে, মানুষের কথা অনুকরণের ক্ষমতাও এদের আছে। আর কোন কিছু অনুকরণ করবার ক্ষমতা এদের বাঁদরের চেয়ে বেশী। তাছাড়া দূরবর্তী কোন বস্তুর অস্তিত্বের সন্ধান এরা যত দ্রুত পায়, এত দ্রুত মানুষও পায় না।

সঞ্চয়ন

ঐতিহাসিক রহস্য সন্ধানে তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪

কার্বন-১৪ নামে মৌলিক পদার্থের তেজস্ক্রিয় পরমাণুর সাহায্যে ত্রিশ হাজার বৎসরেরও পুরাতন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের সঠিক সন, তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব হওয়ায় আজ ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভৌগলিক বিষয়ে বহু নূতন নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে এবং এই সকল ক্ষেত্রে বিদ্বজ্জন যে সকল ধারণা পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাও পরিবর্তিত হইতেছে।

১৯৪১ সালে আমেরিকার বার্কলেস্থিত ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কার্বন-১৪ আবিষ্কার করেন। ইহার সাত বৎসর পরে ডাঃ উইলিয়াড. এফ. লিবী নামে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের জনৈক অধ্যাপকের মনে এই বিষয়ে একটি নূতন ধারণার উদয় হয়। তিনি জানিতেন যে, সৃষ্টির আদিকাল হইতেই মহাশূন্য হইতে আগত মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক-রে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে। এই কসমিক-রে'র কতক কতক পৃথিবীর পাঁচ মাইল উর্ধ্বস্থিত আবহমণ্ডলের নাইট্রোজেন পরমাণুর উপর আঘাত করিবার ফলে তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ সৃষ্টি হইতেছে এবং ইহারা পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিতেছে। এই কার্বন-১৪ কার্বন-ডাইঅক্সাইড হিসাবে জীবন্ত প্রাণী, মানুষ ও উদ্ভিদেরা গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু মৃত্যুর পর আর তাহারা ইহা গ্রহণ করিতে পারে না। এই সকল প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত কার্বন-১৪ সুনির্দিষ্ট হারে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। মোটামুটি কোন বস্তুতে সঞ্চিত কার্বন-১৪-এর অর্ধেক ছয় হাজার বৎসরে নষ্ট হইয়া যায়।

জীবিত অবস্থায় কোন প্রাণী, মানুষ বা উদ্ভিদ কি পরিমাণ কার্বন-১৪ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণের একটি উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ডাঃ লিবীর মনেই প্রথম এই ধারণা হইয়াছিল যে—কোন প্রাণীর দেহে কি পরিমাণ কার্বন-১৪ আছে, তাহা নির্ধারণ করিবার কোন সূক্ষ্ম যন্ত্র উদ্ভাবন এবং ঐ বস্তুটি কি পরিমাণে ও কি হারে নষ্ট হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে পারিলেই ইহার সঠিক বয়সও নির্ধারণ করা যাইবে।

ডাঃ লিবি অতঃপর তাঁহার এই ধারণাকে কার্যে পরিণত করেন। তাঁহার মনোমত একটি যন্ত্রও তৈয়ার করা হইল। প্রথমতঃ তিনি মিশরে প্রাপ্ত একখণ্ড কাঠের উপর পরীক্ষাকার্য চালাইলেন।

মিশরের রাজা তৃতীয় সিসোট্রিসের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া উপলক্ষে যে নৌকাটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেই নৌকাটি তাঁহার সমাধিস্থলে রক্ষিত ছিল। ঐ নৌকা হইতেই এই কাষ্ঠখণ্ডটি সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐতিহাসিকেরা বলেন, সিসোট্রিসের খৃঃ পূর্ব ৩৭০০ বৎসর পূর্বে মৃত্যু হইয়াছিল। এই যন্ত্রের সাহায্যে ঐ কাষ্ঠখণ্ডে সঞ্চিত কার্বন-১৯-এর তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া তিনি ইহার বয়স, অর্থাৎ ইহা যে কত কালের, তাহা নিরূপণ করিতে সক্ষম হন। এই প্রক্রিয়ায় রাজা সিসোট্রিসের যে খৃঃ পূর্ব তিন হাজার সাত শত বৎসর পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা সমর্থিত হয়।

ইহার পর পৃথিবীর নানা স্থান হইতে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বহু নিদর্শনের সঠিক সময় নির্ধারণের জন্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়।

মিশর হইতে প্রেরিত গম ও বার্লি পরীক্ষা করিয়া সেগুলি যে ৫২০০ বৎসরের পুরাতন, তাহা নির্ধারিত হইল। ইরাক হইতে প্রেরিত একখণ্ড অঙ্গার পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল সেটি ৬৬০০ বৎসরের পুরাতন। তিনি শিকাগোর মৃত্তিকাভ্যন্তরে বালুকা-স্তরে প্রাপ্ত একখণ্ড কাঠ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—তাহা যে ৮২০০ বৎসরের পুরাতন, এ-কথা কেহ ধারণাও করিতে পারেন নাই। এই প্রক্রিয়ায় ক্যালিফোর্নিয়ার মণ্টেরো কাউন্টিতে যে সকল জৈব পদার্থ পড়িয়া আছে, সেগুলি ১৭ হাজার বৎসরের এবং অরিগণের নিউবেরী ক্রেটারে প্রাপ্ত নিদর্শনটি ২০ হাজার বৎসরের পুরাতন বলিয়া প্রমাণিত হইল।

সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক ও অন্যান্য নিদর্শনের সঠিক সময় নির্ধারণের এই অভিনব পন্থার কথা জানিতে পারিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ, প্রাণীতত্ত্ববিদ ভূতাত্ত্বিক এবং ভূগোল-বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে উৎসাহিত হইলেন। যে সকল নিদর্শনের তথ্য ও সন-তারিখ পূর্বে কিছুই জানা ছিল না, এই উপায়ে তাঁহারা এই বিষয়ে অনেক নূতন তথ্যেরও সন্ধান পাইলেন। ইতিহাসের আরও জটিল সঠিক সন-তারিখের নির্ঘণ্ট রচিত হইতে লাগিল। পূর্বে যে সকল সন-তারিখ সম্পর্কে সকলেই নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন, তাহাও পরিবর্তিত হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

নিউইয়র্ক রাজ্যের কোন কোন অংশ হইতে বহুকাল ধরিয়াই রেড-ইণ্ডিয়ান জাতির বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগৃহীত হইতেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরাও এই সকল নিদর্শন যে রেড-ইণ্ডিয়ান জাতির বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের এবং ইহারা যে কতকালের পুরাতন, সে বিষয়ে তাহারা একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল, এই সকল নিদর্শন ১৯০০ বৎসরের পুরাতন। ১৯৫০ সালেও ঐ অঞ্চল হইতে আরও বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। অতঃপর এই সকল নিদর্শন কার্বন-১৪-এর সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া সঠিক সময় নির্ধারণের চেষ্টা হয়। এই পরীক্ষায় জানা গেল—এই সকল নিদর্শন, বর্তমানে আমরা যে রেড-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে জানি, সেই সম্প্রদায়ের নয়—সেগুলি তাহাদেরই অন্য কোন সম্প্রদায়ের। তাহারা এই অঞ্চলে খৃষ্টের জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে বসবাস করিত। এই তথ্য আবিষ্কারের ফলে এই অঞ্চলের ইতিহাস সন-তারিখ তথ্য ইত্যাদির অনেক পরিবর্তন করিতে হইবে।

কেবল প্রত্নতত্ত্ব এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রেই নয়, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কার্বন-১৪ বহু নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছে। চীনের মাঞ্চুরিয়ার পুলাতিয়েন গ্রামে একটি জলশূন্য হ্রদ আছে। কখন যে, এই বিশাল হ্রদ শুকাইয়া গিয়াছে, তাহা কেহই জানে না। এই হ্রদের তলায় মাটির গভীরে জনৈক জাপানী উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী জলজ পদ্মবীজের সন্ধান পাইলেন। এই সকল বীজ কার্বন-১৪-এর সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, সেগুলি এক হাজার বৎসরের পুরাতন। ইহা হইতে এই হ্রদ যে ঐ সময়েই শুকাইয়া গিয়াছে, তাহা প্রমাণিত হয়।

এই সকল বীজের কিছু কিছু নমুনা আমেরিকায় প্রেরিত হয় এবং মার্কিন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা এক হাজার বৎসরের পুরাতন এই সকল বীজ হইতে গাছ উৎপাদনের জন্য তৎপর হন। ওয়াশিংটন সহরের ন্যাশন্যাল পার্কের কেজিলওয়ার বাগানে এই সকল বীজ রোপণ করা হয় এবং ১৯৫১ সালের ৩রা মার্চ এই বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং ১৯৫২ সালের ৩০শে জুন গোলাপী রঙের ষোড়শ দল পদ্মসমূহ প্রস্ফুটিত হয়।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, ২০০ বৎসরের বেশী পুরাতন কোন বীজ অঙ্কুরিত হয় না। কিন্তু এক হাজার বৎসরের পুরাতন পদ্মবীজ অঙ্কুরিত হওয়ায় তাঁহাদের এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হইল।

শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমানের ইঞ্জিন—র‍্যামজেট

আমেরিকার বিমান নির্মাণের কারখানায় ঘণ্টায় দু-হাজার মাইল গতিসম্পন্ন বিমান নির্মাণ এখন আর নিছক কল্পনার বিষয় নয়; এর কাজ আজ অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। র‍্যামজেট ইঞ্জিনের সাহায্যেই এসব বিমান চালিত হবে। মার্কিন বিমান প্রস্তুতকারীরা এখন তাই নিয়ে পরীক্ষার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এই ধরণের বিমানে দু-ঘণ্টায়ই যে নিউ ইয়র্ক থেকে লণ্ডন বা টোকিও থেকে নয়া দিল্লী পাড়ি দেওয়া যাবে, তা বলা যেতে পারে। আর পৃথিবী পরিক্রমণের অর্ধেক পথ বারো ঘণ্টায় অতিক্রম করা সম্ভব হবে।

র‍্যামজেট এমন কিছু জটিল ধরণের ইঞ্জিন নয়। ঘণ্টায় ১২ শত মাইল এবং আরও অনেক বেশী গতিতে এই ইঞ্জিন খুব সুষ্ঠুভাবেই চালিত হতে পারে। এর ভিতরকার কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি অতি সাধারণ রকমের এবং গোল চোঙের মত দেখতে বলেই এদের অনেক সময় 'ফ্লাইং স্টোভ পাইপ্‌স্‌'ও বলা হয়।

আজকাল বহু দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমান টার্বোজেট ইঞ্জিনের সাহায্যে চালিত হয়। এসব ইঞ্জিনের তুলনায় র‍্যামজেট ইঞ্জিনের ব্যবহার অনেক বেশী সুবিধাজনক। একে তো র‍্যামজেটের নির্মাণ-কৌশল অতি সহজ, তাছাড়া একে অতি দ্রুতগতিতে চালিত করলে যে খরচ পড়ে, সেটা টার্বোজেট ইঞ্জিনের তুলনায় অনেক কম। এতে কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা লুব্রিকেশন সিস্টেম নেই। টার্বোজেট ইঞ্জিনের তুলনায় র‍্যামজেট অনেকখানি হাল্‌কাও বটে; তাছাড়া এই ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের সংখ্যা ও জটিলতা টার্বোজেটের তুলনায় কম। কাজেই এর উপর বেশী নির্ভর করা যেতে পারে। টার্বোজেট ইঞ্জিন যে পরিমাণ তাপমাত্রায় চালু থাকে, তার তুলনায় অনেক কম তাপমাত্রায় র‍্যামজেটকে চালু রাখা যায়।

টার্বোজেট ইঞ্জিনে উত্তপ্ত ও সম্প্রসারিত গ্যাসের সাহায্যে একটি টারবাইন অতি দ্রুত-গতিতে ঘুরতে থাকায় একটি কম্প্রেসার চালু হয়। এই কম্প্রেসারটি বহু পরিমাণে বাতাস টেনে আনে এবং বাতাসের চাপ বাড়বার ফলে তাপমাত্রাও বেড়ে যায়। এই উত্তপ্ত বাতাসকে একটি কম্বাশ্‌সন চেম্বারে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানে উত্তপ্ত বাতাস ইঞ্জিনের ইন্ধনের সঙ্গে মিশে যায়। তারপর সেই মিশ্র বস্তুটি প্রজ্জলিত হওয়ার ফলে যে উত্তপ্ত গ্যাস তৈরী হয়, তা ইঞ্জিনের পিছন দিক দিয়ে অতি দ্রুতগতিতে বেরিয়ে আসে। এর ফলে সামনের দিকে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে এবং ইঞ্জিন চলতে থাকে।

র‍্যামজেটে এই রকমের কোন জটিল যান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই। এই ইঞ্জিনটি হলো প্রকৃত পক্ষে একটি ধাতু-নির্মিত নলের মত, দু-দিকেই খোলা। আবহ-মণ্ডলে দ্রুতগতিতে চলবার ফলে এর ভিতরে বাতাস জমা হয়। তবে তা কোন যান্ত্রিক উপায়ে নয়। দ্রুতগতিতে যাওয়ার ফলে বাতাসের চাপ বেড়ে যায় এবং তা এর সংকীর্ণ স্থানে এসে জমা হতে থাকে। তারপর সেই বাতাস এই ইঞ্জিনের ইন্ধনের সঙ্গে মিশে যায়। কম্বাশ্‌সন চেম্বারে এই মিশ্র বস্তুটি প্রজ্জলিত হয় এবং এর ফলে উত্তপ্ত গ্যাস অতি দ্রুতগতিতে পিছনদিকে বেরিয়ে আসে।

এই ধরণের বিমানের সবচেয়ে অসুবিধা হলো এই যে, প্রথমে এদের চালু করা খুব কঠিন, কারণ সামান্য রকম গতিতে এর মধ্যে বায়ুর চাপ বাড়ানো যায় না এবং সেই পরিমাণ বায়ু এর মধ্যে প্রবেশ করে না।

বর্তমানে আমেরিকায় এ-সম্পর্কে বড় বড়

প্রতিষ্ঠান এসব অসুবিধা দূর করবার দিকে নজর দিয়েছেন—গবেষণাগারে তারই পরীক্ষার ব্যাপার চলছে।

মারকোয়ার্ট এয়ারক্র্যাফ্‌ট কোম্পানীর বিজ্ঞানীরা বলেছেন—এই অসুবিধা জেট ইঞ্জিনের সাহায্যে দূর করা যেতে পারে। ২০০০ মাইল গতিসম্পন্ন জেট ইঞ্জিন বিমানখানিকে অতি উর্ধ্বে নিয়ে যাবে, তারপর টার্বোজেট ইঞ্জিনটি বন্ধ করে দিয়ে র‍্যামজেট ইঞ্জিন চালালেই হবে।

এই র‍্যামজেট-টার্বোজেট ইঞ্জিন-চালিত বিমান ১৯৭০ সালের মধ্যে চালু হতে পারে বলে তাঁরা আশা করেন। তাঁদের পরিকল্পনা অনুসারে এই বিমানের আকার হবে বোয়িং-৭০৭ বা ডগলাস ডি. সি-৮ বিমানের মত। এসব বিমান জেট-বিমানের মত ১৩০ জন যাত্রী বহন করতে পারে, পৃথিবী ছেড়ে ১০ থেকে ১৫ মাইল উপর দিয়ে শব্দের গতির তুলনায় তিনগুণ দ্রুততর গতিতে (ঐ স্থানে শব্দের গতি ঘণ্টায় ৬৬০ মাইল) চালিত হবে। বর্তমানে এর চেয়ে কম গতিতে যে সব জেট-বিমান চলাচল করে, তার তুলনায় অনেক কম খরচে এই ধরণের বিমান চালিত হবে। তাছাড়া টার্বোজেট ইঞ্জিনের সাহায্যে ঘণ্টায় ২০০০ মাইল গতিতে যেসব বিমান চলাচল করবে, তাদের খরচের তুলনায় অন্ততঃ শতকরা ২০ ভাগ খরচ কম পড়বে র‍্যামজেট-টার্বোজেট বিমানে চলাচল করলে। আর একটি সুবিধা হলো, কোন জায়গায় না থেমে এই ধরণের ইঞ্জিন ৬ হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে পারবে।
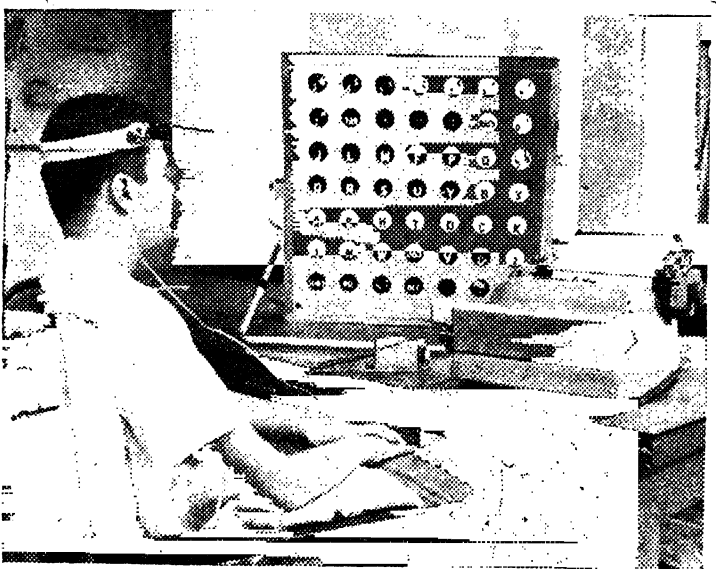
যারা নিজের হাতে টাইপ করতে পারে না, তাদের জন্যে একটি নতুন ধরণের টাইপ রাইটার যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে দণ্ডায়মান কী-বোর্ডস্থিত ফটো-ইলেকট্রিক সেলগুলিকে আলোক-রশ্মির সাহায্যে কার্যকরী করে টাইপ করা হয়।

মাছের লড়াই

শ্রীশান্তি চক্রবর্তী

প্রাচীন কাল থেকেই কোন না কোন সময়ে ষাঁড়ের লড়াই, মুরগীর লড়াই, তিতির ও বুলবুলের লড়াই, সিংহের লড়াই, উইচ্চিংড়ি ও গুবড়ে পোকার লড়াই প্রভৃতির প্রচলন ছিল। এই সব খেলা লোককে যথেষ্ট আনন্দ ও উত্তেজনার খোরাক যোগাতো। সে জন্যে মানুষ বিভিন্ন পশু-পাখীকে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে বিভিন্ন ধরণের লড়াইয়ের কায়দা শিখিয়েছে এবং তাদের লড়াইয়ের খেলা দেখিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। তাছাড়া মানুষে-মানুষে লড়াইয়ের খেলাতেও উত্তেজনা কম নয়। এক সময়ে মানুষের লড়াইতে—একজনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলতো। এই বীভৎস খেলার অনুরাগী দর্শকের সংখ্যাও তখন ছিল প্রচুর। বর্তমানে প্রচলিত মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধও কম জনপ্রিয় নয়। এসব লড়াইয়ের মধ্যে শ্যামদেশের (থাইল্যাণ্ড) মাছের লড়াই-ও বিশেষ জনপ্রিয়।

শ্যামদেশের লড়িয়ে মাছ পৃথিবী-বিখ্যাত। এদের লড়াই দেখবার মতই বটে; কিন্তু তাছাড়াও এই মাছগুলির চেহারাও খুব সুন্দর। এরা যখন তাদের লম্বা ও চটকদার পাখনা কাঁপিয়ে জলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়—তখন সে দৃশ্য দেখবার মত। এদের গায়ের রং লাল, নীল, সবুজ ও সাদা-সবুজ মিশ্রিত। রঙের ঔজ্জ্বল্যের জন্যেই এদের দেখতে ভাল লাগে।

এদের আদিপুরুষেরা কিন্তু দেখতে এত সুন্দর ছিল না। কুৎসিত আকৃতির ফিকে বাদামী বা সবুজ রঙের এক জাতের ছোট মাছ থেকে এই জঙ্গী মাছের উৎপত্তি হয়েছে। এসব মাছ শ্যামদেশের পুকুর, নালা, বদ্ধ জলাশয়ে বাস করতো। বক, মাছরাঙা ও অন্যান্য শত্রুর উপস্থিতির সম্ভাবনা বুঝলে জলের তলায় লতাপাতার মধ্যে আত্মগোপন করতো।

লড়িয়ে মাছ একটানা বেশীক্ষণ জলের নীচে থাকতে পারে না। মাঝে মাঝেই জলের উপর উঠে আসতে হয় বাতাস নেবার জন্যে। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন উপযুক্ত পরিমাণে এরা কান্‌কোর সাহায্যে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে, শ্বাসকার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সে জন্যে এদের জলের উপর মুখ বাড়িয়ে বাতাস নিতে হয়। কৈ মাছকেও এই ভাবে জলের উপর থেকে মাঝ মাঝে বাতাস নিতে হয়। কোন কারণে যদি এরা বাইরের বাতাস নিতে না পারে, তাহলে জলের মাছ জলেই শ্বাসবদ্ধ হয়ে ছট্‌ফট্‌ করে মারা যায়।

লড়িয়ে মাছ জলের উপর থেকে বাতাস নেবার সময় মুহূর্তের জন্যে মুখটা জলের বাইরে বের করে, আর শরীরের ব্যবহৃত বাতাস বুদ্‌বুদের মত বের করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই আবার কিছুটা নির্মল বাতাস গ্রহণ করে জলের তলায় চলে যায়। যে বাতাস গ্রহণ করে তার খানিকটা প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্যে মাথার দু-দিকে অবস্থিত দুটি গর্তের মত অংশে জমিয়ে রাখে।

এদের যোদ্ধা-মাছ বলা হলেও বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে Betta splendens। এদের লড়াইয়ের কায়দাকানুন রীতিমত প্রণালীবদ্ধ। প্রায় এক-শো বছরেরও আগে থেকে এদের লড়াই মানুষের আনন্দের ও উত্তেজনার খোরাক যোগাচ্ছে।

প্রায় ১৮৫০ সাল বা তার কিছু আগে থেকেই শ্যামদেশে এই মাছের লড়াই খুব জনপ্রিয় খেলা ছিল। প্রথমতঃ যেসব যোদ্ধা-মাছ স্বাভাবিক পরি-বেশে বেড়ে উঠতো, তাদের দিয়েই খেলা দেখানো

হতো। কিন্তু ক্রমশঃ এই মাছের চাহিদা এতই বাড়তে থাকে যে, স্বাভাবিক পরিবেশে যে পরিমাণ মাছ জন্মায়, তাতে চাহিদা পূরণ করা যায় না। সে জন্যে অনেকে এই মাছের চাষ আরম্ভ করে। কিছুকালের মধ্যেই দেখা গেল যে, এই মাছ-চাষের ব্যবসা খুবই লাভজনক।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে যোদ্ধা-মাছের চাষ করবার সময় এদের শরীরের রঙের ঔজ্জ্বল্য ও শক্তি বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। কেউ কেউ আবার রঙের দিকেই জোর দেয় বেশী। তাছাড়া এদের সুন্দর ঝোলানো পাখ্‌নার সৌন্দর্য যাতে আরও বাড়ে, সেদিকেও বিশেষ চেষ্টা করা করা হয়। যে সব যোদ্ধা-মাছ জন্মায়, তাদের জঙ্গী মনোভাব—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত যোদ্ধা-মাছের তুলনায় অনেক কম। সে জন্যে আজকাল খেলা দেখাবার জন্যে চাষ-করা মাছের মধ্য থেকে যোদ্ধা নির্বাচন করা হয়। স্বাভাবিক পরিবেশে বর্ধিত যোদ্ধা-মাছ অল্প সময় লড়াই করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ১৫।২০ মিনিট লড়াই তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বলা চলে। কিন্তু চাষ-করা যোদ্ধা-মাছ যেমন তেজী—তেমনি লড়িয়ে। দুটি লড়িয়ে মাছের একটিও অপরটিকে সহজে রেহাই দিতে চায় না। দু-জনের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলে। কখনও কখনও এরা একটানা ছয় ঘণ্টারও বেশী সময়

শ্যামদেশীয় মাছের লড়াই

যোদ্ধা-মাছের লড়াই করবার ক্ষমতা, শারীরিক গঠন ও রঙের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কৃত্রিম প্রজননের সময় এদের জোড়া নির্বাচন করা হয়।

লড়াই এদের জীবনের প্রধান ধর্ম। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এদের লড়াইয়ের প্রবৃত্তিও তীব্র হতে থাকে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়—কোন মাছ দু-মাস বয়স থেকেই সাংঘাতিক যুদ্ধবাজ হয়। পূর্ণবয়স্ক যোদ্ধা-মাছ সুযোগ পেলেই লড়াই সুরু করে দেয়। সাধারণতঃ এদের জীবনকাল দু-বছর বা সামান্য কিছু বেশী।

বর্তমানে দেখা গেছে যে, স্বাভাবিক পরিবেশে যুদ্ধ চালায়, একটুও বিশ্রাম না নিয়ে; তবে মাঝে মাঝে উভয়েই বাইরের বাতাস নেবার জন্যে জলের উপর ভেসে ওঠে, তারপরই আবার জলের তলায় গিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করে। সাধারণতঃ এদের লড়াই ২-৩ ঘণ্টা পর্যন্ত চলে। ডাঃ হিউ এম. স্মিথ বলেছেন—এমনও দেখা গেছে, যোদ্ধা-মাছের লড়াই দিন-রাত্রি সমানে চলেছে। এই সময়ের দুটি মাছের কেউই বাইরের বাতাস গ্রহণ করবার সময়টুকু ছাড়া বিশ্রাম করবার সময় পায় নি।

এদের মেজাজও খুব উগ্র। খেলা দেখাবার

আগে মালিকেরা বিশেষ পদ্ধতিতে এদের মেজাজের উগ্রতা স্থির করে। সাধারণতঃ পুরুষ লড়িয়ে মাছ দিয়েই খেলা দেখানো হয়। প্রথমতঃ একজোড়া প্রায় সমান আকারের যোদ্ধা-মাছ নির্বাচন করা হয়। তারপর তাদের দুটি পৃথক কাচের পাত্রে রেখে পাত্র দুটি গায়ে গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়। যদি দেখা যায় যে, মাছ দুটি তাদের পাখ্না বিস্তার করে উভয়ে উভয়ের দিকে তেড়ে যাচ্ছে—তাহলে বোঝা যায়, এদের জঙ্গী মনোভাব পুরা-মাত্রায় বজায় আছে। তখন মাছ দুটিকে একটি কাচের পাত্রে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এক পাত্রে রাখবার পর উত্তেজনাবশে তাদের মধ্যে অদ্ভূত একটা পরিবর্তন দেখা যায়। পাখ্না দুটি সম্পূর্ণ ছড়িয়ে এরা কান্‌কোর ঝিল্লীগুলি কুঞ্চিত গলবেষ্টনীর মত দেহের বাইরে বের করে দেয়। সেটাকে দেখায় ঠিক যুদ্ধরত মোরগের ঝুঁটির মত। সমগ্র শরীর উজ্জ্বল লাল বা নীল বর্ণ ধারণ করে। সে জন্যে লড়াইয়ের সময় এদের মিঠা জলের অন্যান্য মাছের তুলনায় ভারী সুন্দর দেখায়।

প্রাথমিক পাঁয়তারা কষবার পর আক্রমণের জন্যে উভয়েই একটা সুবিধামত স্থান স্থির করে নেয়। সাধারণতঃ এরা পাশাপাশি অবস্থান করে' আক্রমণ চালায়। কখনও কখনও একটি অপরটির সামান্য পিছনে থাকে। আবার অনেক সময় মুখোমুখি হয়েও আক্রমণ চালায়; অর্থাৎ সুবিধা-সুযায়ী আক্রমণ-কৌশল পাল্‌টে দেয়। আক্রমণের স্থান স্থির করবার পর এরা কয়েক সেকেণ্ডের মত চুপচাপ থাকে। তারপর ভীষণবেগে আক্রমণ চালায়। পূর্বেই বলা হয়েছে—বাইরের বাতাস নেওয়া ছাড়া এদের আক্রমণে কোন বিরতি দেখা যায় না। এদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থলই হলো—পাখ্না। উভয়েই উভয়ের পাখ্না ক্ষত-বিক্ষত করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে। এর ফলে এদের পাখনা ছিঁড়ে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে যায়। কখন কখন পাখ্নার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। পাখ্না ক্ষত-বিক্ষত হলে এদের সাঁতার কাটতে খুবই অসুবিধা হয়। ফলে পরাজয় বরণ করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। সময় সময় এরা শরীরের যে কোন পাশ থেকে খোঁচা মেরে কিছু সংখ্যক আঁশ তুলে ফেলে এবং কান্‌কোর আবরণী দংশন করে সেটাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। কান্‌কো জখম হলে এরা খুবই কাবু হয়ে পড়ে। কখন কখন এরা লড়াই করবার সময় শক্ত করে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে থাকে। এই অবস্থায় লড়াই করবার সময় বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে জলের একেবারে তলায় চলে যায়। সেখানে কয়েক সেকেণ্ড সম্পূর্ণ নিশ্চলভাবে থাকবার পর আবার জলের উপরে চলে আসে। দাঁত-লাগা অবস্থায় এরা বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। কারণ এই অবস্থায় শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে।

লড়াইয়েরও একটা নিয়ম আছে। সেটা হচ্ছে—বাইরের বাতাস গ্রহণ করবার সময় কেউ কাউকে আক্রমণ করে না। এই সময়টুকু তাদের শ্বাসক্রিয়ার প্রয়োজন হিসাবে গণ্য হয়।

এদের লড়াইয়ে কে জয়ী বা পরাজিত হলো তা বোঝা যায় যখন কোন যোদ্ধা লড়াই চালাতে অনিচ্ছুক হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে দূরে চলে যায়। সাংঘাতিক আঘাত পেলেও এরা সমানে লড়াই চালিয়ে যায়, শারীরিক আঘাতের দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। সুতরাং যখন বোঝা যায়, কোন একটি যোদ্ধা লড়াই চালাতে অনিচ্ছুক, তখনই লড়াই শেষ হয় এবং মাছ দুটিকে পৃথক কাচের জারে রেখে দেওয়া হয়।

এদের দাঁত খুব ছোট। সে জন্যে খুব বেশী সাংঘাতিক শারীরিক আঘাত করতে সক্ষম হয় না। ডাঃ হিউ এস. স্মিথ শ্যামদেশে বারো বছরব্যাপী এই মাছ সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়েছেন। তিনি বেশীর ভাগ যোদ্ধা-মাছকে লড়াইয়ের ফলে খুব

সাংঘাতিক কোন শারীরিক আঘাতে ভুগতে দেখেন নি।

লড়াইয়ের শেষে এরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরদিন যদি আবার এদের লড়াই বাঁধানো হয়, তখনও কিন্তু পূর্ণোদ্যমেই লড়াই চালিয়ে যায়। এদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পাখ্না আবার গজিয়ে ওঠে এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পাখ্নায় আঘাতের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। আঁশ যদি বেশী পরিমাণে শরীর থেকে উঠে যায়, তাহলে অন্যান্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে। সে জন্যে সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা হিসাবে আঁশ-ওঠা মাছগুলিকে অল্প লবণ মিশ্রিত জলে ডুবিয়ে নেওয়া হয়।

যখন দেখা যায়, পুরুষ যোদ্ধা-মাছ জলের উপর প্রচুর বুদ্বুদ ছাড়ছে, তখনই এদের যৌন-মিলনের সময়। বুদ্বুদগুলি ফেনার মত দেখায়। এই পুঞ্জীকৃত ফেনাই এদের ডিম রাখবার বাসা। এরা একসঙ্গে কয়েক শত ডিম পাড়ে। ডিমগুলি খুব ক্ষুদ্র এবং এত স্বচ্ছ যে, বুদ্বুদের মধ্যে ডিমের অবস্থিতি বোঝাই যায় না।

স্ত্রী-যোদ্ধা মাছ ডিম পাড়বার পরেই ডিমগুলি জলে ডুবে যায়। পুরুষ যোদ্ধা জলের তলা থেকে ডিমগুলি মুখে করে এনে জলের উপরে ফেনার বুদ্বুদের মধ্যে পিচ্কিরির মত ছুঁড়ে দেয়। ডিম পাড়বার পর স্ত্রী যোদ্ধা-মাছের আর কোন কাজ থাকে না। পুরুষ মাছেরা পরবর্তী সব কাজ করে। তারা স্ত্রী-মাছদের বাসার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেয়—অনেক সময় হত্যা পর্যন্ত করে। কারণ স্ত্রী-মাছ সুযোগ পেলেই ডিম খেয়ে ফেলে।

পুরুষ মাছেরা ডিমের বাসাটিকে সর্বক্ষণ পাহারা দেয়, যাতে কোন শত্রু এসে ডিমগুলির ক্ষতি করতে না পারে। বাসা থেকে কিছু ডিম যদি জলের মধ্যে পড়ে যায়—তাহলে পুরুষ মাছ পুনরায় সেগুলিকে মুখে করে নিয়ে এসে বাসার মধ্যে ছেড়ে দেয়। ডিম ফুটে বাচ্চাগুলি স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত পুরুষ মাছ তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে।

সাধারণতঃ ডিম পাড়বার পর ৩০-৪০ ঘণ্টার মধ্যে ডিমগুলি ফুটে যায়। এই সময় জলের উষ্ণতা সাধারণতঃ ৮০° ডিগ্রি থেকে ৮৫° ডিগ্রি ফারেন-হাইটের মধ্যে থাকে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবার পর বাচ্চাগুলি কিছু সময় বাসার মধ্যেই থাকে। অনেক সময় এরা পুরাতন বাসা ভেঙ্গে নতুন বাসা তৈরী করে' তার মধ্যে বাচ্চাদের রেখে দেয়।

যোদ্ধা-মাছ পুরাপুরি আমিষভোজী। এদের প্রধান এবং প্রিয় খাদ্যই হলো মশার বাচ্চা। অনেক সময় এরা মশার বাচ্চা ছাড়া অন্য কিছু খায় না। সে জন্যে এই মাছের চাষে মশার বাচ্চার প্রয়োজন খুব বেশী। কিন্তু বছরের সব সময় মশার বাচ্চা পাওয়া খুব কঠিন। তাছাড়া চাহিদা অনুযায়ী মশার বাচ্চা পাওয়া অনেক সময় খুব কঠিন হয়ে পড়ে। সে জন্যে শ্যামদেশে যোদ্ধা-মাছের চাষের সঙ্গে সঙ্গে মশার চাষও খুব বেড়ে গেছে। অনেকে মশার চাষ করেও অর্থ উপার্জন করছে।

মাছের লড়াই দেখে বহু দর্শক যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করে। এদের লড়াই দেখবার জন্যে ভীড়ও হয় খুব। অনেক লোক এই মাছের চাষ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। অনেকে অবসর সময়ে মাছের লড়াই দেখবার জন্যে বাড়ীতে এই মাছ পোষে। শ্যামদেশে মাছের লড়াই জনপ্রিয় খেলা হিসাবে চালু থাকলেও এখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই খেলা ক্রমশঃ চালু হচ্ছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অগাষ্ট—১৯৬০

১৩শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা
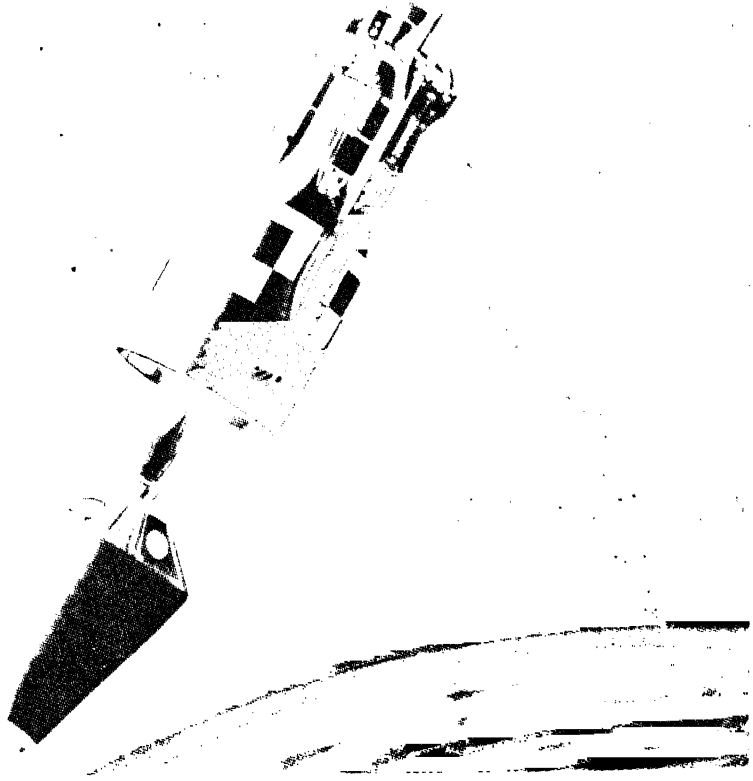
কৃত্রিম উপগ্রহ ডিসকভারার-১৩-এর সঙ্গে ৮৫ পাউণ্ড ওজনের একটি ক্যাপস্থল পাঠানো হয়েছিল। সবসমেত এই কৃত্রিম উপগ্রহটির ওজন ছিল ৩০০ পাউণ্ড। ক্যাপস্থলটি বিচ্ছিন্ন হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রায় ৩০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে এটিকে উদ্ধার করা হয়।

ইস্পাত নগরী—রাউরকেলা

কলকাতা থেকে দু'শো পঁচাত্তর মাইল দূরে ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে এক নতুন ইস্পাত নাগরী গড়ে উঠেছে। নাম তার রাউরকেলা। বত্রিশ হাজার একর পরিমিত বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর এই ইস্পাত নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাউরকেলা ইস্পাত কারখানার সর্বস্তরের কর্মচারীদের বসবাসের জন্যে যোল কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠেছে এই শিল্পনগরী।

এখানে আছে সাড়ে সাত হাজার বাসগৃহ। আছে অফিস, ইস্কুল, হাসপাতাল, হাট-বাজার। রাস্তাঘাট এখানকার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, জল নিকাশের ব্যবস্থাও আধুনিক। কারখানা ও নগরীর মাঝে আছে একটি ছোট পাহাড়। পাহাড়টি কারখানার ধোঁয়া থেকে রাউরকেলার অধিবাসীদের অনেকাংশে রক্ষা করছে। এখানকার পরিবেশ মনোরম। শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত এমন সুন্দর ও সুপরিকল্পিত আধুনিক নগরী বিশ্বের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। কাজেই রাউকেলা ভারতের গর্বের বস্তু।

সুন্দর সুপরিকল্পিত এক শিল্পনগরী হিসাবেই যে রাউরকেলা ভারতের গর্বের বস্তু, তা নয়। ভারতের অর্থনৈতিক জীবনেও রাউরকেলা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। কি ভাবে, তা বলি।

আমরা জানি যে, দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করতে হলে দেশে ভারী শিল্প গড়ে তোলা দরকার। আর ভারী শিল্পের মধ্যে ইস্পাতশিল্প অন্যতম। দেশের শিল্পোন্নতি অব্যাহত রাখতে হলে, দেশ ও দশের সমৃদ্ধি সাধন করতে হলে ইস্পাত চাই-ই। বেশী দিন নয়—বছর দশেক আগেও আমাদের দেশে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল নগণ্য—বছরে মাত্র দশ লক্ষ টন। দেশ তখন স্বাধীন হয়েছে। দেশে তখন গড়ে উঠছে বড় বড় কল-কারখানা, নগর-বন্দর। ঐ সামান্য পরিমাণ দেশীয় ইস্পাতে দেশের প্রয়োজন মিটলো না। বাধ্য হয়ে বিদেশ থেকে বছরে প্রায় একশো কোটি টাকার ইস্পাত আমদানী করতে হলো। দেশের অর্থের এক বিরাট অংশ বিদেশে চলে গেল। ভারত সরকার তখন দেশে ইস্পাতশিল্প গড়ে তোলবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন।

ভারতে ইস্পাতশিল্প গড়ে তোলবার সুবিধা অনেক। প্রকৃতি আমাদের অনুকূলে। ভারতের বুকে আকরিক লৌহ, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ ও লৌহ উৎপাদনের উপযোগী এমনি অনেক কাঁচা মাল রয়েছে বিপুল পরিমাণে। কাঁচা মালগুলি দূরে দূরে ছড়ানো নেই। সবগুলির অবস্থানই কাছাকাছি। এই সব সুবিধার জন্যে এদেশে উৎপন্ন ইস্পাতের খরচ পৃথিবীর যে কোন দেশের থেকেই কম। এ বড় কম কথা নয়।

যাহোক ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকারের সঙ্গে জার্মেনীর বিখ্যাত

ক্রুপ-ডেমাগ কোম্পানীর এক চুক্তি সম্পাদিত হলো। স্থির হলো, ভারতে ঐ কোম্পানীর সহায়তায় বছরে পাঁচ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের উপযোগী একটি কারখানা গড়ে তোলা হবে। এই চুক্তি সম্পাদনের পরেই একশো কোটি টাকা মূলধন সম্বলিত এক নতুন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হলো। তার নাম হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেড। রাউরকেলা ইস্পাত কারখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যেই হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটিড-এর জন্ম হয়। কিন্তু ১৯৫৭ সালে ভিলাই এবং দুর্গাপুর কারখানারও পরিচালনার ভার পড়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের উপর। তখন কোম্পানীর মূলধন একশো কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে তিনশো কোটি টাকা করা হয়।

ভারত-জার্মান চুক্তিতে কিছু পরিবর্তন সাধিত হলো, ১৯৫৫ সালের ২১শে জুলাই তারিখে। ঐ দিন সংশোধিত এক চুক্তিতে স্থির হলো যে, রাউরকেলার কারখানাকে পাঁচ লক্ষ টনের পরিবর্তে দশলক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। আর ইস্পাত উৎপাদনের এক নতুন পদ্ধতি এখানে চালু করা হবে। এই পদ্ধতিটির নাম এল-ডি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এতে অল্প কার্বনযুক্ত ইস্পাত উৎপাদনের খরচ খুবই কম পড়ে।

এল-ডি পদ্ধতিতে ইস্পাত উৎপাদনের কাজে বাতাসের পরিবর্তে অক্সিজেন গ্যাস প্রবেশ করানো হয়। তাতে কিছু কোক্ কয়লা ও গ্যাস উদ্বৃত্ত হয়। ঐ উদ্বৃত্ত গ্যাস থেকে নাইট্রোলাইম স্টোন প্রস্তুত করা সম্ভব। তাই এল-ডি পদ্ধতিকে গ্রহণ করলে মূল ইস্পাত কারখানার সঙ্গে আরও কয়েকটি আনুসঙ্গিক ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা যাবে। সে সব শিল্পালয়ের কোনটিতে তৈরি হবে জমির সার, কোনটিতে বা উদ্বৃত্ত কোক্ কয়লা থেকে উদ্ধার করা হবে বেন্‌জল, আলকাত্‌রা ও অ্যামোনিয়া। আবার এসব দ্রব্য থেকে তৈরী করা যাবে নানারকম মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য। কাজেই সকল বিষয় বিবেচনা করে এল-ডি পদ্ধতিকেই গ্রহণ করা হলো। রাউরকেলায় গড়ে উঠলো বহু প্রতীক্ষিত আধুনিকতম এক ইস্পাত কারখানা। মূল কারখানাটি গড়তে খরচ পড়লো এক'শো সত্তর কোটি টাকা। আর কারখানা সমেত শহর ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য জিনিষগুলি গড়ে তুলতে মোট খরচ পড়লো দু'শো চৌদ্দ কোটি টাকা।

রাউরকেলা কারখানায় যদিও এখন দশ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদিত হবে, ভবিষ্যতে এখানে ষোল লক্ষ টন পর্যন্ত ইস্পাত উৎপাদিত হতে পারবে। এখানে প্রধানতঃ তৈরী হবে ইস্পাতের চাদর ও রড। এ-সব জিনিষের প্রয়োজন হবে জাহাজ ও মোটর শিল্পে।

বর্তমানে রাউরকেলায় ইস্পাত উৎপাদন আরম্ভ হয়েছে। ১৯৫৯ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ রাউরকেলায় শুভ পদার্পণ করে সেখানকার প্রথম ব্লাস্ট ফার্ণেসটি চালু করে গেছেন।

শিল্পোন্নতির পথে ভারতের অগ্রগতির প্রথম প্রচেষ্টা রাউরকেলা সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হোক—এই আমাদের প্রার্থনা।

অমরনাথ রায়

জীবের জন্ম

তোমরা এখনও বয়সে অতি ছোট, পৃথিবীটাকে দেখছো অতি অল্পদিন, তোমাদের কাছে এখনও সময়ের বিশেষ কোন বোধ নেই। হয়তো দু-বছর পূর্বে তোমার বয়স ছিল আট, আর এখন দশ, কিম্বা চার বছর পূর্বে ছিল নয়, আর এখন তের। কিম্বা হয়তো এক বছর বাদে তুমি ক্লাস এইটে উঠবে বা বড়জোর আর তিন বছর বা চার বছর বাদে স্কুল শেষ করে কলেজে যাবে, এই মাত্র। অবশ্য ইতিহাসের ক্লাসে পড়—তিনশ' বছর পূর্বে আওরঙজেব সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিম্বা আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেব বেঁচেছিলেন এই পৃথিবীতে। আ-ড়া-ই হা-জা-র বছর। কি সাংঘাতিক। কিন্তু জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে তাও অতি অল্প। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পার সভ্যতা ছিল চার হাজার বছর আগে। তার আগে ছিল মিশরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, সুমেরীয় সভ্যতা—এমনি অনেক। তারা ছিল সাত হাজার থেকে দশ হাজার বছর পূর্বে। আমরা জানি, শুধু খৃষ্টীয় কালের দু-হাজার বছরের ইতিহাস। তার পূর্বের এসব সভ্যতারও কিছু ইতিহাস মানুষের দপ্তরে গোছালোভাবে ছিল এবং অনেকই ছিল অগোছালোভাবে, যা উদ্ধার করা হয়েছে ধীরে ধীরে। অবশ্য তাতেই তা শেষ হয়ে যায় নি, সে সম্বন্ধে গবেষণা ও নতুন তথ্য সংযোজনা সর্বদাই হয়। তারও পূর্বে আছে, প্রাগৈতিহাসিক কাল। প্রাক্ অর্থ পূর্ব, অর্থাৎ ইতিহাসের পূর্বের। সেখানে ঐতিহাসিকের চাইতে বৈজ্ঞানিকেরই বেশী অধিকার। নানা রকম বস্তু দেখে, সভ্য-অসভ্য নানা জাতি দেখে, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, হাতিয়ার, আসবাব, স্বভাব, উপকথা, কিম্বদন্তী. মন্ত্রতন্ত্র, সামাজিক নিয়মকানুন দেখে একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে আসতে হয়।

তোমরা দেখছো এই পৃথিবীটাকে। দেখছো তোমাদের জিনিষপত্র, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মানুষ, গরু, ঘোড়া, ছাগল, মাছ, পাখী, পোকা-মাকড়, গাছপালা, নদীনালা-খাল। এ-সব কিছুই একদিন পৃথিবীতে ছিল না, কারণ এই পৃথিবীটাই একদিন ছিল না। এও একদিন জন্মগ্রহণ করেছিল আকাশচারী জলন্ত গ্যাস থেকে বা সূর্যের একটা অংশ ছিট্‌কে এসে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সেটা ঘটেছিল দু-শো থেকে চার-শো কোটি বছর পূর্বে। কত কোটি—তার সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে তাঁরা এখনও আসতে পারেন নি। যদি মাঝামাঝি একটা হিসেব নিয়ে তিন-শো কোটি বছর ধরা হয়, তাহলেও তার অর্ধেক সময় গেছে পৃথিবীটাকে ঠাণ্ডা হয়ে প্রাণীদের বসবাসের উপযোগী হতে। তারপর প্রায় দেড়-শো কোটি বছর পূর্বে সূর্যের তেজে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সমুদ্রের জলে-কাদায় আবির্ভূত হলো ক্ষুদ্র প্রাণের স্পন্দন, এক কোষের জীবাণু, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া যা মানুষের চোখে পড়ে না।

তার পর লক্ষ লক্ষ বছর তারাই রইলো এই সমুদ্রের জলে, ভেসে ভেসে ঘুরে বেড়ালো এই সমুদ্রের মধ্যেই। বিস্তার করলো নিজেদের বিভক্ত করে দিয়ে। সূর্যের তেজ থেকেই হয়তো তাদের জন্ম হয়েছিল, সূর্যের তেজ দিয়েই সে বেঁচে রইলো, আবার সূর্যের তেজেই তাদের জীবনান্ত হলো একদিন। এমনি করে কেউ চলে গেল, আবার নতুন জন্ম নিল, চললো জীবন-চক্র (The cycle of Life), তারপর এক কোষ আরও কোষে পরিণত হলো, ক্রমে সে বৃহত্তর হয়ে উঠলো—রূপান্তরিত হলো প্রাণবিন্দু থেকে কীটে।

পৃথিবীর সমগ্র জীব-জগৎ এই কোষ দিয়ে তৈরী। এক-একটি শরীরে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কোষ। সংসারে দুটি জিনিষ আছে প্রাণবন্ত। তার একটি হচ্ছে প্রাণী-জগৎ, আর একটি উদ্ভিদ-জগৎ। গাছও জীবন্ত বস্তু। প্রাণী যে জীবন্ত তা না হয় বুঝতে পারি—সে আহার করে, সে শব্দ করে, সে ঘুরে বেড়ায়, তার সুখ-দুঃখ, বেদনাবোধ আছে। কিন্তু গাছ জীবন্ত কিসে? হ্যাঁ, গাছ এর সব কিছুই করে না বটে, তবে তার কিছু কিছু করে বৈ কি! সেও আহার করে, রসদের প্রয়োজন হয় জীবনধারণ করতে। সেও আঘাত, উত্তেজনায় সাড়া দেয়—একথা নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন বৈজ্ঞানিক জগদীশ বোস। জীবনের প্রধান লক্ষণ হলো তিনটি—জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু। এই সব কয়টি লক্ষণই গাছের আছে।

সেই আদিম কোষ যখন জীবে রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করলো, তখন তার একটা অংশ গেল উদ্ভিদে। প্রথমে ক্ষুদ্রতম শ্যাওলা, তারপর হলো ছোট ছোট পাতা আর শিকড়, হলো গুল্ম। তারপর তাতে হলো ফুল, ফল, আঁঠি, ডালপালা, কাঠ, বাকল। গুল্ম রূপান্তরিত হলো গাছে, গাছ মহীরুহে। বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন আবহাওয়ায় তার হলো বিভিন্ন রকম রূপভেদ—এক পর্যবসিত হলো বহুতে।

জীবও তেমনি রূপান্তরিত হয়েছে এককোষ থেকে কীটে, কীট থেকে মাছে, মাছ থেকে সরীসৃপে, সরীসৃপ থেকে ক্রমশঃ বৃহদাকার প্রাণীতে। এক একটি জীব থেকে তার জাতের অন্যান্য জীবের উদ্ভব হয়েছে। যেমন—কুকুর, শেয়াল, খেঁকশেয়াল, নেকড়ে, হায়েনা—এরা একজাত। তেমনি আবার একজাত বেড়াল, বন-বেড়াল, বাঘ, সিংহ, চিতা, পুমা, জাগুয়ার প্রভৃতি। আবার উট, লামা, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি হলো একজাতের। বাঁদর, হনুমান, উল্লুক, গিবন, ওরাং, শিম্পাঞ্জি, গরিলা—এরাও একই জাতের অন্তর্গত। আর এদেরই সর্বশেষ পরিণতিতে এসে আবির্ভূত হয়েছে মানুষ। সেটাও হয়েছিল পঞ্চাশ লক্ষ বছর বা তারও আগে; সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মতদ্বৈধ আছে।

শ্রীবিশ্ব সেনগুপ্ত

জানবার কথা

১। আমাদের চোখের পাতা প্রায় সব সময়েই মিট্‌মিট্‌ করে, অর্থাৎ একবার বোজে আবার খোলে। বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী গড়ে পুরুষদের চোখের পাতা
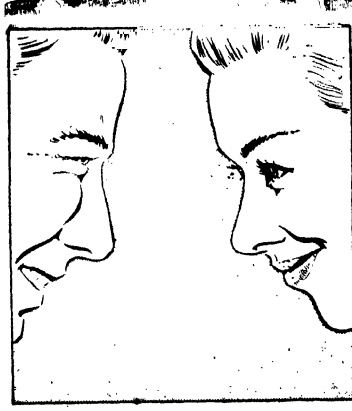
১নং চিত্র

প্রতি তিন সেকেণ্ডে একবার মিট্‌মিট করে এবং গড়ে স্ত্রীলোকদের চোখের পাতা প্রতি চার সেকেণ্ডে একবার মিট্‌মিট করে। চোখের পাতা মিট্‌মিট করবার ব্যাপারটা মানুষের ইচ্ছাধীন নয় এবং এটা এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের চার ভাগ সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে।

২। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে মানুষের কণ্ঠস্বরকে স্পষ্টভাবে নির্ধারণ এবং তাকে সাঙ্কেতিক ভাষায় রূপ দেবার জন্যে পৃথিবীর অন্ততঃ ছয়টি গবেষণাগারে গবেষণা চলছে।

২নং চিত্র

যদি এই গবেষণা সফল হয়—তাহলে কারো কোন টাইপ করবার দরকার হলে—তাকে আর টাইপ করতে হবে না। কথাগুলি পড়ে গেলেই—ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তা টাইপ

করা হয়ে যাবে। এর ফলে সর্বশেষ এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হবার সম্ভাবনা, যার দ্বারা উচ্চারিত ভাষাকে অন্য যে কোন ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করা সম্ভব হবে।

৩। বড় বড় জাতের গাছকে খর্বাকৃতি করা জাপানের একটি জনপ্রিয় ও সৌখীন শিল্প। বহু শতাব্দী যাবৎ জাপানে এই শিল্প প্রচলিত আছে। নানা জাতের গাছকে তারা বিশেষ কায়দায় খর্বাকৃতির গাছে পরিণত করে। এমন কি, বড় বড় জাতের গাছ-

৩নং চিত্র

গুলিকে তারা এমনভাবে খর্বাকৃতির গাছে পরিণত করে—যা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এ-রকম বড় বড় জাতের বেঁটে গাছগুলিকে একটি ঘরে রাখলে মনে হবে, যেন একটা বিশাল অরণ্যকে খুব ছোট করে ঐ ঘরের মধ্যে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

৪। পৃথিবীর মধ্যে স্থল ভাগে কার্যকরী সবচেয়ে বড় গতিশীল যন্ত্র হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের
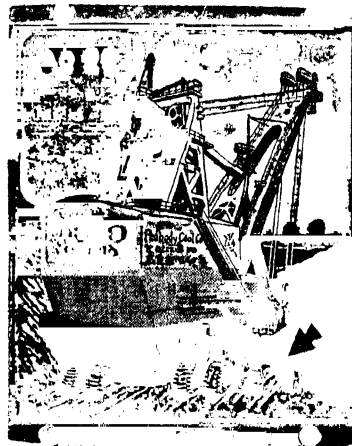
৪নং চিত্র

এক ধরণের কয়লা-তোলা যন্ত্র। কয়লা-খনির উপর চালিয়ে এই বিশাল যন্ত্র-দানবের লম্বা সোভেল বা বেলচার মত যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি ৪৫ সেকেণ্ড অন্তর এক এক ক্ষেপে ১০৫ টন

মাটি ও পাথর তোলা যায়। যন্ত্রটির বিশাল আয়তনের একটা ধারণা করবার জন্যে ছবির তীরচিহ্নিত স্থানে একটা মানুষ ও একটা বুলডোজারের ছবি দেওয়া হয়েছে।

৫। প্রাচীনকালে মানুষের বিশ্বাস ছিল—আমাদের পৃথিবীই সৌরমণ্ডল ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র-স্থলে অবস্থিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ এই ধারণা পোষণ করে আসছিল। তার-পর প্রমাণিত হলো—পৃথিবী একটি ছোট গ্রহ মাত্র। তারও পরে

৫নং চিত্র

মানুষের ধারণার বিরাট পরিবর্তন হলো, যখন প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে, সৌরমণ্ডল ছায়াপথের একটি নগণ্য অংশ মাত্র—আমাদের ছায়াপথ হলো লক্ষ লক্ষ ছায়াপথের একটি অংশ মাত্র।

৬। বিদ্যুতের কাহিনী মানুষ ২৫০০ বছর আগেই জানতো। তখন মানুষ এই

৬নং চিত্র

বিদ্যুতের সাহায্যে মজার খেলা করতো; কিন্তু কেউ এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে নি। প্রায় ৬০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে গ্রীসের দার্শনিক থেলিস লক্ষ্য করেন যে, একটা অ্যাম্বার দণ্ডকে

কাপড় দিয়ে ঘষবার পর খড়কুটার কাছে আনলে সেগুলি দণ্ডটার গায়ে এসে লাগে। থেলিস ছাড়া অন্য কেউ এই ঘটনার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। কেউ তখন ভাবতেও পারেন নি যে, একদিন এই বিদ্যুতের সাহায্যে মানুষ অসাধ্য সাধন করবে।

৭। অনেকের ধারণা আছে যে, চোখের তারার উপর সোজাসুজি চশমার কাচ পরা, অর্থাৎ কণ্ট্যাক্ট লেন্সের ব্যবহার আধুনিক যুগেই চালু হয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা মোটেই আধুনিক নয়। প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিওনার্ডো দা ভিনসি চশমা

৭নং চিত্র

পরবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। প্রায় ১৮৮০ সাল পর্যন্ত মানুষ বেশী সময় কণ্ট্যাক্ট লেন্স চোখের উপর পরে থাকতে পারতো না—অস্বস্তি বোধ করতো। বর্তমানে আরামদায়ক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার ফলে মানুষ দিনে ১৬ ঘণ্টা বা তারও বেশী সময় চশমা চোখে দিয়ে থাকতে পারে।

৮নং চিত্র

৮। শুশুক একজাতের স্তন্যপায়ী সমুদ্রগামী প্রাণী। এদের মস্তিষ্ক মানুষের

মস্তিষ্কের চেয়েও বড়। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির মতে, মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে শুশুক হলো বৃহদাকৃতির মস্তিষ্কবিশিষ্ট প্রাণী। ফ্লোরিডার মেরিল্যাণ্ডে একটি শুশুককে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সে সেখানকার একজন মনস্তাত্ত্বিকের গলার স্বর খুব সুন্দরভাবে নকল করে। সেই শব্দ শুনে গবেষকের স্ত্রী তো হেসেই অস্থির। কিন্তু শুশুকটি সেই হাসিও নিখুঁতভাবে নকল করে সবাইকে অবাক করে দেয়।

৯। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন—মানুষ যদি যুদ্ধ এবং ধ্বংসাত্মক কাজের পরিবর্তে কেবল পৃথিবীর উন্নতির জন্যে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতো—তাহলে পৃথিবীতে

৯নং চিত্র

কোন ব্যাধিই অজেয় থাকতো না এবং পৃথিবীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরেরা প্রচুর খাদ্য ও অন্যান্য সুবিধাদি লাভ করতে পারতো।

১০নং চিত্র

১০। মানুষ যদি পঙ্গপালের মত লাফাতে পারতো—তাহলে সেই অনুপাতে পঙ্গপাল এক লাফে প্রায় ৩০০ ফুট অতিক্রম করতে পারতো। সুতরাং এ-থেকেই

তোমরা বুঝতে পারছো যে, লাফানোর দিক থেকে মানুষ পঙ্গপালের কাছে নেহাৎই শিশু।

১১। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাখীদের স্বাদ বা গন্ধের কোন অনুভূতি নেই। পাখীদের মধ্যে কেবল পায়রাই জলের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে চুমুক দিয়ে জল পান করে।

১১নং চিত্র

অন্যান্য পাখীরা তা পারে না। তাদের জল গলাধঃকরণের সময় মাথাটা উপরের দিকে তুলে খানিকটা পিছনের দিকে হেলিয়ে দিতে হয়।

১২। সাহারা মরুভূমির কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। সাহারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মরুভূমি। আটলান্টিক থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত আফ্রিকার আড়াআড়ি

১২নং চিত্র

সাহারা প্রায় ৩০০০ মাইল বিস্তৃত। এর মধ্যে কোন স্থানেই সাহারা চওড়ায় ১০০০ মাইলের কম নয়।

১৩। আইস্‌ল্যাণ্ড খুব ঠাণ্ডার দেশ। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের ধারণা—গত পঞ্চাশ

বছরে সেখানকার আবহাওয়ায় গরমের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের এরূপ বিশ্বাসের

১৩নং চিত্র

কারণ হচ্ছে—হিমবাহের বরফ এবং উত্তর উপকূলে তুষার-স্তূপের পরিমাণ কমে যাওয়া। ঠাণ্ডা কমবার ফলেই আরও সাতটি বিভিন্ন প্রজাতির পাখী আইস্‌ল্যাণ্ডে বাসা বেঁধেছে।

১৪। কাঠের বাড়ীঘর তৈরী করতে এখন পেরেক-হাতুড়ী ইত্যাদি না হলে চলে না। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা হাতুড়ী, পেরেক ইত্যাদির সাহায্য ছাড়াই বাড়ীঘর তৈরীর চেষ্টা করছেন। তাঁরা এক ধরণের অদ্ভুত শিরিষের আঠা তৈরী করেছেন—যার দ্বারা
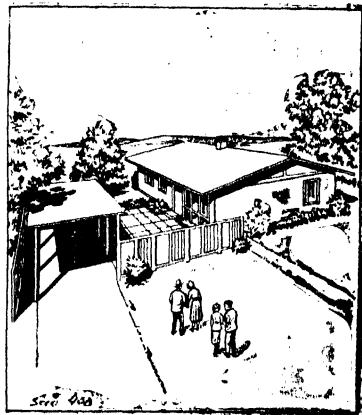
১৪নং চিত্র

হাতুড়ী, পেরেক ইত্যাদি ছাড়াই কাজ চলবে। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি পেরেক-বিহীন বাড়ী তৈরী করেছে, যেগুলি তিন বছর যাবৎ অটুট আছে।

১৫। দাঁড়টানা নৌকায় একজন লোক একটা দড়ির সাহায্যে নিজেই নিজেকে টেনে নিতে পারে। দড়িটা নৌকার পিছনের দিকে বাঁধা থাকে। সেই দড়িটা ধরে
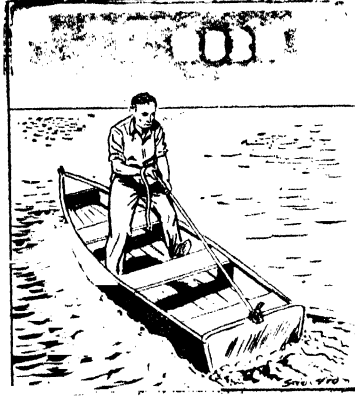
১৫নং চিত্র

কিছুক্ষণ পর পর তাড়াতাড়ি সামান্য হেঁচ্‌কা টান মারলেই নৌকাটা এগুতে থাকে।

১৬। অসীম অধ্যবসায়ে মানুষ বহুবিধ পরীক্ষার পর অনেক বিস্ময়কর যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে অনেক যন্ত্র প্রায় নিখুঁত। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের
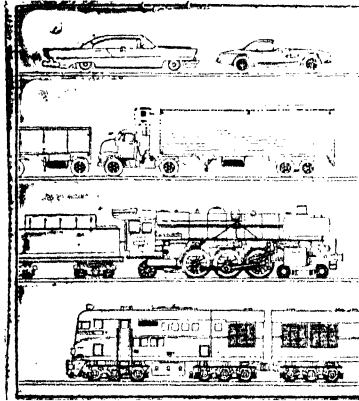
১৬নং চিত্র

মতে—মানুষের উদ্ভাবিত সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বাষ্পীয় ইঞ্জিন শতকরা মাত্র ৬ থেকে ৮ ভাগ কর্মক্ষম এবং ডিজেল ও গ্যাসোলিন ইঞ্জিন শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ কর্মক্ষম।

বিবিধ

উত্তর-পশ্চিম ভারতে পঙ্গপালের ঝাঁকের বিস্তার

ইণ্টারন্যাশন্যাল ডেজার্ট লোকাষ্ট ইনফরমেশন সার্ভিসের সদ্যপ্রকাশিত রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ইরান এবং পাকিস্তানে মরু-পঙ্গপালের ব্যাপক বংশবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাইতেছে এবং শিশু পঙ্গপালের কতকগুলি ঝাঁক ইতিমধ্যে পাকিস্তানের মধ্য দিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, আরও কয়েকটি ঝাঁক শীঘ্রই পাকিস্তান ও ভারত আক্রমণ করিতে পারে এবং তুই দেশে অধিকতর মাত্রায় বংশবৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনা আছে।

প্রায় সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল হইতেও শিশু পঙ্গপালের গতিবিধি এবং বংশবৃদ্ধির সংবাদ আসিয়াছে।

নতুন রোগ নিরাময়ে শর্করা

বেশী পরিমাণে চিনি খাওয়াইয়া মন ও শরীর অবসন্নকারী এক নূতন রোগ সারানো সম্ভব বলিয়া জানা গিয়াছে। ডাঃ ব্যারি ডি. ওয়াইক লণ্ডনস্থ রয়েল কলেজ অব সার্জন্স-এর শারীরবিদ্যা বিভাগে গবেষণা কালে এই নূতন রোগটি আবিষ্কার করেন।

এই রোগের বর্ণনা প্রদানকালে তিনি বলেন, ইহা মনের ব্যাধি; সাধারণভাবে ইহার চিকিৎসা সম্ভব নয়। কিন্তু এই রোগে যাহারা ভুগিতেছে, তাহারা বেশী পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট খাইয়া উপকৃত হইতে পারে।

এই রোগকে এখন পর্যন্ত বলা হইয়া থাকে "রিলেটিভ সেরিব্র্যাল হাইপোগ্লাইকেমিয়া"। ইহা বহুমূত্র রোগের ঠিক বিপরীত। রোগীর রক্তে যথেষ্ট পরিমাণে চিনি না থাকায় তাহার এই মানসিক বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে।

যক্ষ্মার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

বৃটিশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের সদ্য-প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ভারতে যক্ষ্মারোগের উন্নততর চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং সুলভ চিকিৎসা-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে গবেষণা চলিয়াছে, তাহা বৃটেনে এবং সেই সঙ্গে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশসমূহে রোগ-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

কাউন্সিলের যক্ষ্মা গবেষণা ইউনিটটি ১৯৫৬ সালে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত কেমোথিরাপি রিসার্চ সেণ্টারের সহিত এই সম্পর্কে সহযোগিতা করিতেছেন।

যক্ষ্মারোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ভেষজ হইল আইসোনিয়াজিড (Isoniazid)। ইহার কার্যক্ষমতা যেমন অধিক তেমনই ইহার প্রয়োগ ব্যবস্থাও সহজ এবং ভেষজটিও সুলভ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর শরীরে ভেষজ-প্রতিরোধক ক্ষমতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। এখন দেখা গিয়াছে, আইসোনিয়াজিড ও পি-এ-এস একত্রে ব্যবহার করিলে ভেষজ-প্রতিরোধের ক্ষমতা দূর করা সম্ভব হয়। অন্যান্য ভেষজের সহিত ইহার কার্যকারিতাও এই সঙ্গে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

পৃথিবীর জলভাগ বৃদ্ধি

বিশিষ্ট সোভিয়েট ভূ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ভ্লাদিমির বেলসুফের মতে, পৃথিবীর সমুদ্রগুলির বিস্তার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং স্থলভাগ ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। বহু বছর ধরে পর্যবেক্ষণ চালাবার পর সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। অন্যান্য দেশের ভূ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকের ধারণা—পৃথিবীর সমুদ্রগুলির পরিসর ক্রমশঃ কমে আসবার ফলে স্থলভাগই বেড়ে চলেছে।

কিন্তু সোভিয়েট ভূ-বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের ফলাফল এর বিপরীত সিদ্ধান্তকেই প্রমাণিত করছে।

অধ্যাপক বেলহুফ বলেন—পৃথিবীর জলভাগে নানা জায়গায় নতুন নতুন দ্বীপ-বৃত্তাংশ (আইল্যাণ্ড আর্ক) সৃষ্টি হচ্ছে। এগুলি ভূতপূর্ব পর্বতশ্রেণীর অবশিষ্টাংশ। এগুলির প্রত্যন্তদেশে মহাদেশীয় ভূত্বকের সাগরিক ভূত্বকে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হচ্ছে। এই দ্বীপ-বৃত্তাংশ কিউরাইল্‌স্‌, জাপান ও অ্যান্টিলস দ্বীপপুঞ্জের বৈশিষ্ট্য। এরূপ মনে করবার কারণ আছে। এসব দ্বীপের মধ্যবর্তী সমুদ্রগুলি, যেমন—বাবেগুস সাগর, জাপান সাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর এবং সেই সঙ্গে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্বর্তী সাগরও—বয়সের দিক দিয়ে যথেষ্ট অর্বাচীন। এগুলির বয়স মাত্র কয়েক নিযুত বছরের বেশী নয়। এ-সব সমুদ্রের উৎপত্তির আগে দ্বীপগুলি ছিল মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত।

পৃথিবীর ভিতরের দিকে অনেক নীচের ভূত্বক পরীক্ষা করে দেখা গেছে, উপরিতল মহাসাগরে পরিণত হলে সেই নীচের ভূত্বকের গঠন ও রাসায়নিক উপাদান বদলে যায় এবং অনেক পাত্‌লা হয়ে পড়ে। এরূপ হবার কারণ—পৃথিবীর ভিতরে কয়েক শত কিলোমিটার গভীর থেকে প্রচণ্ড তাপে গলিত বেসাল্ট বা আগ্নেয় কৃষ্ণপ্রস্তর পৃথিবীর বহিরাবরণের ফাটলগুলি দিয়ে বেরিয়ে আসে। পৃথিবীর বহিরাবরণও এই বেসাল্টের প্রভাবে গলিত অবস্থায় বেরিয়ে আসে। দ্বীপ-বৃত্তাংশগুলির অধিকাংশ স্থানেই যে আগ্নেয়গিরির আধিক্য, আর মাঝে মাঝে প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্গার লক্ষ্য করা যায়, সেটাকে ভূ-বিজ্ঞানীরা এভাবেই ব্যাখ্যা করে থাকেন।

এ-ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে বাষ্প উদ্গীরিত হয়। কাজেই এরূপ মনে করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে, সমুদ্র-জলের উৎপত্তি হয় প্রধানতঃ পৃথিবীর গভীর অন্তর্দেশে।

হেলসিঙ্কিতে ২৬শে জুলাই তারিখে আন্তর্জাতিক ভূ-বিজ্ঞান সমিতির যে দ্বাদশ অধিবেশন সুরু হয়েছে, সেই অধিবেশনে অধ্যাপক ভ্লাদিমির বেলহুফ এই বিষয়ে লেখা তাঁর একটি নিবন্ধ পাঠ করেছেন।

অগ্নি ও তাপরোধক পোষাক

খনিগর্ভে বা অন্য কোন স্থানে অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রাণহানি যাহাতে না ঘটে, তাহার জন্য সোভিয়েট সেন্ট্রাল মাইনিং রেস্কিউ স্টেশনের বিজ্ঞানীরা এমন এক ধরণের পোষাক তৈয়ার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাহা পরিয়া থাকিলে ৪৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উচ্চ তাপেও কোন ক্ষতি হইবে না। পরীক্ষামূলকভাবে তাপরোধক ও অগ্নিরোধক পোষাক পরিয়া একদল ধাতু-বিজ্ঞানী একটি ইস্পাত কারখানার জ্বলন্ত ওপন-হার্থ ফার্নেসের ভিতরে ঢুকিয়া এক ঘণ্টারও বেশী সময় অবস্থান করেন। তাঁহাদের শরীরের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় নাই এবং মুখোসের ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণেও কোন রকম অসুবিধা হয় নাই।

এই পোষাক যে বস্তু হইতে নির্মিত, তাহার প্রধান উপাদান হইল গ্লাস ফাইবার। এই পোষাকের ভিতরের দিকে আগাগোড়া সিলিকনের আচ্ছাদন আছে এবং বাহিরের দিকে আছে অ্যালুমিনিয়ামের আচ্ছাদন। বাহির ও ভিতরের আচ্ছাদনের ফাঁকে এয়ার-কণ্ডিশনিং বা শীতলতা রক্ষার ব্যবস্থা আছে। মুখোসটির ভিতরে অক্সিজেন সরবরাহের যে ব্যবস্থা আছে, তাহার ফলে এই পোষাক পরিয়া অনায়াসেই প্রায় দেড় ঘণ্টা আগুনের ভিতরে থাকা যায়। তাছাড়া মুখোসের ভিতরে রক্ষিত বেতার-টেলিফোনের মারফৎ বাহিরের সহিত যোগাযোগও রাখা যায়।

অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর লোকদের জন্য এই ধরণেরই, কিন্তু আরও হাল্‌কা পোষাক নির্মাণের কাজেও সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা সক্ষম হইয়াছেন। মুখোস ও অক্সিজেন-চেম্বার বাদ দিয়া এই অগ্নি-রোধক পোষাকের ওজন কিঞ্চিদধিক পাঁচ সের।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

দ্বাদশ-বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন—১৯৬০

বিজ্ঞান কলেজ,
পদার্থবিদ্যা বিভাগের বক্তৃতা-কক্ষ

৬ই আগষ্ট '৬০
শনিবার, অপরাহ্ণ ৪টা

কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট ৩৪জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশনে নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ে যথোচিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী

কর্মসচিব শ্রীমৃগাঙ্কশেখর সিংহ মহাশয়ের বার্ষিক বিবরণী পাঠের প্রারম্ভে পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য ও শুভানুধ্যায়ী রাজশেখর বসু মহাশয়ের আকস্মিক পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করেন এবং সভায় উপস্থিত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্বর্গতঃ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর আলোচ্য বৎসরে পরিষদের কাজকর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া কর্মসচিব মহাশয় পরিষদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা রূপায়ণে সভ্যগণের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। পরিষদ কর্তৃক বর্তমান বৎসর হইতে 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা প্রবর্তন এবং পরিষদের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার 'রাজশেখর বসু বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশের কথাও বিবরণীতে উল্লিখিত হয়। পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিবিধ সাংস্কৃতিক কাজকর্ম ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বিবরণীতে উল্লিখিত বিষয়গুলি শুনিয়া উপস্থিত সভ্যগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এই বার্ষিক বিবরণী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পরীক্ষিত হিসাব ও ব্যয়বরাদ্দ

পরিষদের নির্বাচিত হিসাব-পরীক্ষক শ্রীপি, কে, গুহঠাকুরতা, চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট মহাশয় গত ১৯৫৯-'৬০ সালের যে আয়-ব্যয় হিসাব বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করিয়াছেন এবং কার্যকরী সমিতি কর্তৃক বর্তমান ১৯৬০-'৬১ সালের জন্য পরিষদের যে আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দ স্থির করা হইয়াছে, তাহা অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপিত হয়। এই পরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও ব্যয়বরাদ্দের মুদ্রিত কপি সভ্যগণের বিবেচনার জন্য পূর্বেই নিয়মানুযায়ী যথাসময়ে প্রেরিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে আলোচনাকালে পরিষদের সভ্য শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ মহাশয় উদ্বৃত্তপত্রের বাংলা অনুবাদে মূলধন ও তহবিল কথা দুইটি যথাযথ প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন। এই বিষয়ে স্থির হয় যে, হিসাব পরীক্ষক মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া পরবর্তী বৎসরের উদ্বৃত্তপত্রে কথা দুইটির যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হইবে। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে এবং উপস্থিত সভ্যগণের সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত পরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও ব্যয়বরাদ্দ সভায় গৃহীত হয়।

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি গঠন

পরিষদের গঠনতন্ত্র অনুসারে বর্তমান বছরের কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সদস্য পদের জন্য সাধারণ সভ্যগণের প্রেরিত মনোনয়ন পত্র ও বিদায়ী কার্যকরী সমিতির সুপারিশসমূহ সভায় উপস্থাপিত হয়। বিভিন্ন পদের জন্য এভাবে বিভিন্ন সদস্যের নাম পৃথকভাবে উত্থাপিত ও সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এরূপ পর্যায়

ক্রমিক মনোনয়নের দ্বারা ১৯৬০-'৬১ সালের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে গঠিত হয়:—

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী:

সভাপতি— শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
সহঃ সভাপতি— শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
শ্রীসুবোধনাথ বাগচী
শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন
শ্রীমৃগাঙ্কশেখর সিংহ
কর্মসচিব— শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ
সহযোগী কর্মসচিব—শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
" " শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
কোষাধ্যক্ষ— শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কার্যকরী সমিতির সদস্য:

১। শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
২। শ্রীমুক্তিসাধন বসু
৩। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
৪। শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
৫। শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়
৬। শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ
৭। শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী
৮। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
৯। শ্রীদিলীপকুমার বসু
১০। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
১১। শ্রীঅমূল্যধন দেব
১২। শ্রীশান্তিরঞ্জন পালিত
১৩। শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়
১৪। শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ
১৫। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

ন্যাসরক্ষক মণ্ডলীকে ক্ষমতা দান

পরিষদের এই দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে শ্রীসুবোধনাথ বাগচী মহাশয় এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করেন—

"পরিষদের নিজস্ব গৃহনির্মাণকল্পে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট হইতে বার্ষিক কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সর্তে যে জমি ক্রয়ের চুক্তি হইয়াছে, ঐ জমির সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নিয়ম অনুসারে মূল্যের টাকার বাবদ ট্রাষ্টের নিকট ঐ জমি বন্ধক রাখিতে হইবে। অতএব এই পরিষদ প্রস্তাব করিতেছে যে, ঐ জমি উক্তরূপ প্রয়োজনে বন্ধক দেওয়া হউক এবং পরিষদের নির্বাচিত ন্যাসরক্ষক মণ্ডলীকে (Board of Trustees) ঐ জমি বন্ধক দিবার জন্য যথোচিত ক্ষমতা দেওয়া হউক। এই বিষয়ে আরও প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, বর্তমানে ন্যাসরক্ষক মণ্ডলীর নিম্নলিখিত পাঁচ জন:

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন
শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়

সভ্যের মধ্যে যে কোন দুইজন সভ্য উক্ত বন্ধকের প্রয়োজনীয় দলিলাদি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে সম্পাদন করিবেন।"

এই প্রস্তাব শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমর্থন করেন। অতঃপর উপস্থিত সভ্যগণের সম্মতিক্রমে উল্লিখিত প্রস্তাব যথাবিহিতভাবে সভায় গৃহীত হইল বলিয়া সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করেন।

সারস্বত সঙ্ঘ

পরিষদের নিয়মতন্ত্র অনুসারে বিবিধ সাংস্কৃতিক কর্তব্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত যে সারস্বত সংঙ্ঘ গঠিত রহিয়াছে তাহার বিভিন্ন শাখার পুনর্গঠনের প্রয়োজন সম্পর্কে সঙ্ঘসচিব শ্রীমহাদেব দত্ত এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কিছু সংখ্যক উৎসাহী ও কর্মনিষ্ঠ নূতন সভ্য লইয়া বিভিন্ন শাখা সঙ্ঘ পুনর্গঠিত করিলে কাজের সুবিধা হইবে। এই বিষয়ে যথাসম্ভব সত্বর ব্যবস্থা

অবলম্বন করা আবশ্যক; কিন্তু বর্তমানে সহসা এরূপ পরিবর্তন সম্ভব নহে। সুতরাং আপাততঃ বর্তমান সারস্বত সঙ্ঘের সভ্যগণকেই পুনর্নির্বাচিত করিবার জন্য তিনি সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ অনুসারে সভাপতি মহাশয় বর্তমান সারস্বত সঙ্ঘের সভ্যগণকে পুনর্নির্বাচনের প্রস্তাব করেন এবং সভায় সেই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচন

গত কয়েক বছর যাবং মেসার্স মুখার্জী, গুহ-ঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং-এর পক্ষে শ্রী পি. কে. গুহঠাকুরতা, চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট পরিষদের নির্বাচিত হিসাব-পরীক্ষকরূপে পরিষদের যাবতীয় বার্ষিক হিসাবপত্র বিশেষ দক্ষতার সহিত পরীক্ষা করিয়া বার্ষিক বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করিতেছেন। শ্রীগুহঠাকুরতা পরিষদের সভ্য হিসাবে হিসাবপত্র সম্পর্কীয় কাজে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়া থাকেন। এমতাবস্থায় শ্রীহৃদয়চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে এবং উপস্থিত সভ্যগণের সম্মতিক্রমে ১৯৬০-'৬১ সালের জন্য শ্রীগুহঠাকুরতাকে পরিষদের হিসাব-পরীক্ষকের পদে নির্বাচিত করা হয়।

অনুমোদক মণ্ডলী নির্বাচন

পরিষদের নিয়মাবলী অনুসারে বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহের অনুলিপি বিধিসম্মতভাবে অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণকে অনুমোদক হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয়:

১। শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়
২। শ্রীদিবাকর মুখোপাধ্যায়
৩। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
৪। শ্রীশান্তিরঞ্জন পালিত
৫। শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ

বর্তমান অধিবেশনের সভাপতি ও পরিষদের কর্মসচিবসহ উক্ত পাঁচজন নির্বাচিত অনুমোদকের দ্বারা এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত হইলে তাহা পরিষদ কর্তৃক যথোচিত ভাবে গৃহীত প্রস্তাব বলিয়া গণ্য হইবে।

সভাপতির ভাষণ

অধিবেশনের কার্যসূচী অনুসারে উল্লিখিত প্রস্তাবাদি নিয়মতন্ত্রানুযায়ী গৃহীত হইবার পরে সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষদের আদর্শ ও কর্তব্যাদি সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যাদি পরিবেশন করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদের বিবিধ সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা সফল করিয়া তুলিবার জন্য সভাপতি মহাশয় সভ্যগণের নিকট আবেদন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন যে, শীঘ্রই 'রাজশেখর বসু সংখ্যা' নামে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যায় বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণামূলক নিবন্ধাদি বাংলায় প্রকাশিত করিবার এই উদ্যমকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সভ্যগণের সহযোগিতা কামনা করেন। পরিশেষে তিনি পরিষদের গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য সভ্যগণের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানান।

অতঃপর উপস্থিত সভ্যগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণ শেষ করেন।

সত্যেন বোস — সভাপতি
পরিমলকান্তি ঘোষ — কর্মসচিব

অনুমোদক মণ্ডলীর স্বাক্ষর:—

১। শ্রীদিবাকর মুখোপাধ্যায়
২। অনাদিনাথ দাঁ
৩। শান্তিরঞ্জন পালিত
৪। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
৫। শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

বিশেষ সাধারণ অধিবেশন

বিজ্ঞান কলেজ,
ফলিত রসায়ন বিভাগের বক্তৃতা-কক্ষ

২১শে অগাষ্ট '৬০
রবিবার, অপরাহ্ণ ৪টা

কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে মোট ৩৬ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশনের নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুসারে কর্মসচিব শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ মহাশয় গত ৬ই অগাষ্ট '৬০ তারিখে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত ন্যাসরক্ষক মণ্ডলীকে ক্ষমতাদান সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পাঠ করেন—

"পরিষদের নিজস্ব গৃহনির্মাণকল্পে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট হইতে বার্ষিক কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সর্তে যে জমি ক্রয়ের চুক্তি হইয়াছে, ঐ জমির সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নিয়ম অনুসারে মূল্যের টাকার বাবদ ট্রাষ্টের নিকট ঐ জমি বন্ধক রাখিতে হইবে। অতএব এই পরিষদ প্রস্তাব করিতেছে যে, ঐ জমি উক্তরূপ প্রয়োজনে বন্ধক দেওয়া হউক এবং পরিষদের নির্বাচিত ন্যাসরক্ষক মণ্ডলীকে (Board of Trustees) ঐ জমি বন্ধক দিবার জন্য যথোচিত ক্ষমতা দেওয়া হউক। এই বিষয়ে আরও প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, বর্তমানে ন্যাসরক্ষক মণ্ডলীর নিম্নলিখিত পাঁচ জন:

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন
শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়

সভ্যের মধ্যে যে কোন দুইজন সভ্য উক্ত বন্ধকের প্রয়োজনীয় দলিলাদি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে সম্পাদন করিবেন।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয় পূর্বগৃহীত এই প্রস্তাবটি সভায় উপস্থিত সভ্যগণের অনুমোদনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আবশ্যকতার বিষয় উল্লেখ করেন এবং শ্রীশান্তিরঞ্জন পালিত মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন—

"পরিষদের নিয়মতন্ত্র অনুসারে গত ৬.৮.৬০ তারিখের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত ও এই অধিবেশনে পঠিত ৪নং প্রস্তাবটি এই সভার অনুমোদনের জন্য আমি আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করিতেছি।"

এই অনুমোদন-প্রস্তাবটি শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সমর্থন করেন। অতঃপর উপস্থিত সভ্যগণের সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হইল বলিয়া সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করেন।

সত্যেন বোস
সভাপতি

পরিমলকান্তি ঘোষ
কর্মসচিব

অনুমোদক মণ্ডলীর স্বাক্ষর

১। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
২। শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
৩। শ্রীমুক্তিসাধন বসু
৪। শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
৫। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

// জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োদশ বর্ষ | সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ | নবম সংখ্যা

ট্র্যানজিষ্টরের কথা

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ট্র্যানজিষ্টর অতি-আধুনিক আবিষ্কার হইলেও ইহার মূলে যে ধাতু দুইটি (সিলিকন ও জার্মেনিয়াম) রহিয়াছে, তাহারা অনেক কাল ধরিয়াই আমাদের পরিচিত। বেতার-তরঙ্গ আবিষ্কৃত হইবার কয়েক বৎসর পর হইতেই প্রথমে সিলিকন ও পরে জার্মেনিয়াম বেতার-তরঙ্গ ধরিবার কাজে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

মেণ্ডেলিয়েফের আবিষ্কৃত পর্যায়-সারণিতে (Periodic Table) সিলিকন ও জার্মেনিয়াম একই শ্রেণীর অন্তর্গত। উভয়েরই পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনগুলির মধ্যে চারটি সবচেয়ে বাহিরের কক্ষে রহিয়াছে। পরমাণুর এই ৪টি ইলেকট্রন উহার ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের জন্য দায়ী—বাকী ইলেকট্রনগুলি ভিতরের কক্ষে (orbit) থাকে।

একটি পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে যতগুলি ঋণাত্মক ইলেকট্রন থাকে, নিউক্লিয়াসে ঠিক ততগুলি ধনাত্মক প্রোটন বর্তমান থাকায় স্বাভাবিক অবস্থায় কোন পরমাণুই বিদ্যুৎ-আধানযুক্ত নহে। সোনা, রূপা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি তড়িৎ-পরিবাহক ধাতুতে বাহিরের কোন বৈদ্যুতিক বিভব (electric potential) প্রয়োগ করিলেই বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়; কারণ উহাদের কেলাসে অনেক মুক্ত ইলেকট্রন থাকে, যাহারা সামান্যতম বিদ্যুৎ-বিভবেই ধনাত্মক প্রান্তের দিকে গতিশীল হইয়া পড়ে। আবার কাচ, অভ্র প্রভৃতি অন্তরকে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা এত নগণ্য যে, বিভবের মাত্রা অধিক করিলেও বিদ্যুতের প্রবাহ হয় না বলিলেই চলে। সিলিকন ও জার্মেনিয়াম এই ব্যাপারে মধ্যবর্তী স্থানে রহিয়াছে। এই জন্য ইহাদিগকে অর্ধ-পরিবাহক বা সেমিকণ্ডাক্টর বলা হয়।

সিলিকন বা জার্মেনিয়ামের পরমাণুর একেবারে বাহিরের ৪টি ইলেকট্রনের একটিকে ঐ পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে যথাক্রমে ১.১২ অথবা ০.৭৫ ইলেকট্রন-ভোল্টের প্রয়োজন হয়। তাপ বাড়িলে বাহিরের ইলেকট্রনগুলি অধিক মাত্রায় উত্তেজিত হয় এবং নিউক্লিয়াসের আকর্ষণকে কাটাইয়া উঠিতে পারে; কাজেই মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। একই তাপমাত্রায় জার্মেনিয়াম অপেক্ষা

সিলিকনে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা কম থাকে এবং সিলিকনের ইলেকট্রনগুলির গতিও মন্থর।

কোন কারণে একটি পরমাণু হইতে যখন একটি ইলেকট্রন বিচ্যুত হয়, তখন ঐ পরমাণুটিতে ধনাত্মক বিদ্যুৎ-আধানের আধিক্য ঘটে। মুক্তিপ্রাপ্ত ইলেক্ট্রনের শূন্য স্থানটিতে একটি ধনাত্মক ছিদ্রের (hole) আবির্ভাব আমরা কল্পনা করিতে পারি। এই ছিদ্রটি ইলেকট্রনের মতই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিচরণ করে। আমরা যখন বলি, একটি ছিদ্র 'ক' হইতে 'খ'-তে গেল, বাস্তবে কিন্তু তখন 'খ' হইতে 'ক'তে একটি ইলেকট্রন গমন করিয়া থাকে।

একটি জার্মেনিয়াম (অথবা সিলিকন) কেলাসে অনেক পরমাণুর মধ্যে একটি ভিন্ন রকমের পরমাণু থাকিলে তাহার পক্ষেও ঐ কেলাসে একইভাবে বিন্যস্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব ঐ ভিন্ন রকমের পরমাণুটি যতটা মূল পরমাণুর সদৃশ হইবে ততই তাহার পক্ষে বিন্যাসে যুক্ত হওয়া সহজ হইয়া উঠিবে। জার্মেনিয়াম ও সিলিকন পরমাণুর আশেপাশের পরমাণুগুলির নিউক্লিয়াসের চারিদিকে একেবারে বাহিরের কক্ষে তিনটি অথবা পাঁচটি ইলেকট্রন রহিয়াছে। একেবারে বাহিরে তিনটি ইলেকট্রন রহিয়াছে, এমন মৌলিক পদার্থগুলির নাম হইতেছে—বোরন, গ্যালিয়াম, ইণ্ডিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম। এই মৌলিক পদার্থগুলির একটি পরমাণু যখন সিলিকন ও জার্মেনিয়ামের অজস্র পরমাণুর ভিতরে প্রবেশ করে, তখন ইহার নিউক্লিয়াস ও তিনটি ইলেকট্রন কেলাসের বিন্যাসে যুক্ত হয় বটে। কিন্তু একটি ইলেক্ট্রনের স্থান শূন্য পড়িয়া থাকে এবং ঐ শূন্য স্থানে একটি ছিদ্রের আবির্ভাব ঘটে। একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া এই মৌলিক পদার্থগুলিকে গ্রহীতা (acceptor) বলা হয় এবং সিলিকন ও জার্মেনিয়াম কেলাসে এরূপ গ্রহীতা থাকিলে ঐ কেলাসকে P শ্রেণীর (Positive-ধনাত্মক) বলা হয়। P শ্রেণীর কেলাসে ছিদ্রের সাহায্যে তড়িৎ পরিবাহিত হইয়া থাকে।

একেবারে বাহিরের কক্ষে পাঁচটি ইলেকট্রন রহিয়াছে, এরূপ মৌলিক পদার্থগুলির নাম হইল—ফস্‌ফরাস, আর্সেনিক, ও অ্যাণ্টিমনি। এই মৌলিক পদার্থগুলির একটি পরমাণু যখন সিলিকন বা জার্মেনিয়ামের কেলাস-বিন্যাসে স্থান করিয়া লয়, তখন ৪টি ইলেকট্রন অন্যান্য পরমাণুর সঙ্গে মিশিয়া যায় বটে, কিন্তু একটি ইলেকট্রন অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া পড়ে। একটি ইলেকট্রন দান করিতে পারে বলিয়া এই মৌলিক পদার্থগুলিকে দাতা (Donor) বলা হয় এবং দাতা-সহ কেলাসকে বলা হয় N (Negative বা ঋণাত্মক) শ্রেণীভুক্ত। বলাবাহুল্য, N শ্রেণীর কেলাসে ইলেকট্রন তড়িৎ-পরিবহন সম্ভব করিয়া তোলে।

ভিন্ন রকমের অতি সামান্য কিছু পরমাণু সিলিকন ও জার্মেনিয়ামের কেলাসে প্রবিষ্ট হইলেই কাজ চলে। শুধু কাজ চলা নয়, কেলাসের তড়িৎ-পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে তাহাই দরকারী। প্রতি এক বা দশ কোটি জার্মেনিয়াম পরমাণুতে সাধারণতঃ একটি ভিন্ন রকমের পরমাণু থাকে। সময় সময় হাজার কোটি জার্মেনিয়াম পরমাণুতে একটি মাত্র ভিন্ন রকমের পরমাণু বর্তমান থাকে। বস্তুতঃ ট্র্যানজিষ্টর বিশুদ্ধতার এক সর্বোচ্চ উদাহরণ।

একটি P শ্রেণীর কেলাসের সঙ্গে একটি N শ্রেণীর কেলাস যুক্ত করিলে একটি P. N জাংশন পাওয়া যায়। এরূপ জাংশনকে একটি দ্বিপদী রেকটিফায়ার (Diode rectifier) বলা হয়। কোন তড়িৎ-বিভবের (ডি. সি) পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রান্তদ্বয় কোন পদার্থের সঙ্গে দুই ভাবে লাগানো যায়। যদি দেখা যায়, এই দুই ভাবে লাগাইলে বিদ্যুৎ-স্রোতের পরিমাণে বেশ তারতম্য ঘটে, তবে এই বস্তুটিকে রেকটিফায়ার বলা হয়। কারণ এই বস্তুটি এ. সি. কারেণ্টকে পরিবর্তন করিয়া ডি. সি.তে পরিণত করিতে পারে। P. N জাংশনেও এরূপ

হইয়া থাকে। তড়িৎ-বিভবের পজিটিভ প্রান্ত যখন P-এর দিকে যুক্ত হয়, তখন P অঞ্চল হইতে ছিদ্র এবং N অঞ্চল হইতে ইলেকট্রন জাংশনের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহাতে পরিবহন অধিক হওয়ায় প্রচুর বিদ্যুৎ-স্রোতের সৃষ্টি হয়। তড়িৎ-বিভবের নেগেটিভ প্রান্ত যখন P-এর দিকে যুক্ত হয়, তখন P অঞ্চল হইতে ইলেকট্রন এবং N অঞ্চল হইতে ছিদ্র জাংশনের দিকে প্রবাহিত হয়। P ও N অঞ্চলে যথাক্রমে ইলেকট্রন ও ছিদ্রের সংখ্যা অল্প হইবার দরুণ বিদ্যুৎ-পরিবহন কম হয় এবং উৎপন্ন বিদ্যুৎ-স্রোতের পরিমাণও হয় সামান্য। প্রথমোক্ত বিদ্যুৎ-স্রোতকে 'সম্মুখ' (forward) এবং দ্বিতীয় বিদ্যুৎ-স্রোতকে 'পশ্চাৎ' (reverse) বলা হয়। 'সম্মুখ' বিদ্যুৎ-স্রোতের কারণ P অঞ্চলে ছিদ্রের আধিক্য এবং N অঞ্চলে ইলেকট্রনের আধিক্য। 'পশ্চাৎ' বিদ্যুৎ-স্রোতের কারণ, P অঞ্চলে ইলেকট্রনের অস্তিত্ব এবং N অঞ্চলে কিছু ছিদ্রের অস্তিত্ব। যেহেতু P অঞ্চলে ইলেকট্রনের এবং N অঞ্চলে ছিদ্রের সংখ্যা খুব কম থাকে, সেহেতু অল্প বিভবে 'পশ্চাৎ' বিদ্যুৎ-স্রোতের পরিমাণ বেশ কম হয়। বিভব বৃদ্ধি করিলে কিন্তু 'পশ্চাৎ' কারেণ্টের পরিমাণ বেশ বাড়িয়া যায়। কারণ অধিক বিভবে জার্মেনিয়ামের একেবারে বাহিরের চারটি ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তখন সমস্ত বিদ্যুৎ-পরিবহন ইলেকট্রনের সাহায্যে হইয়া থাকে এবং P ও N অঞ্চল দুইটির বিশিষ্ট ধর্ম বজায় থাকে না। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইলে 'পশ্চাৎ' বিদ্যুৎ-স্রোতের পরিমাণ অধিক হয়।

P. N. জাংশন রেক্টিফায়ার।

P. N. জাংশন রেক্টিফায়ার।

উপরে আমরা দ্বিপদী জার্মেনিয়াম কেলাস লইয়া আলোচনা করিলাম। এবার ত্রিপদী কেলাস বা ট্র্যানজিষ্টরের ব্যবহার লক্ষ্য করিব। ট্র্যানজিষ্টরের মধ্যে P অথবা N কেলাস থাকে এবং দুই পাশে যথাক্রমে দুইটি N অথবা P কেলাস থাকে। সাঙ্কেতিক ভাষায় বলা চলে, ইহার গঠন N-P-N অথবা P-N-P হইয়া থাকে। N-P-N অথবা P-N-P-এর প্রথম কেলাসকে বলা হয় এমিটার (emitter), মাঝেরটিকে বেজ (Base) এবং শেষেরটিকে বলা হয় কলেক্টর (Collector)। N-P-N অথবা P-N-P ট্র্যানজিষ্টরের গঠন-কৌশল হইতে এই কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এমিটার ও কলেক্টরের ভূমিকা পরিবর্তিত করা যাইতে পারে, অবশ্য বাহিরের বিভবের যোগাযোগও বদলাইতে হইবে। এরূপ করা সম্ভব, তবে ট্র্যানজিষ্টর প্রস্তুত করিবার সময় কলেক্টর ও এমিটারে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয় বলিয়া ভূমিকার পরিবর্তনে কার্যকারিতার অবনতি ঘটিয়া থাকে।

P-N-P ও N-P-N ট্র্যানজিষ্টর সম্বন্ধে পৃথক পৃথক আলোচনার প্রয়োজন নাই। কারণ P-N-P ও N-P-N ট্র্যানজিষ্টরগুলির মধ্যে বাহিরের বিভব, বিদ্যুৎ-স্রোত এবং ছিদ্র ও ইলেকট্রনের ভূমিকা বিপরীত হইয়া থাকে, মূলতঃ আর কোন তফাৎ নাই।
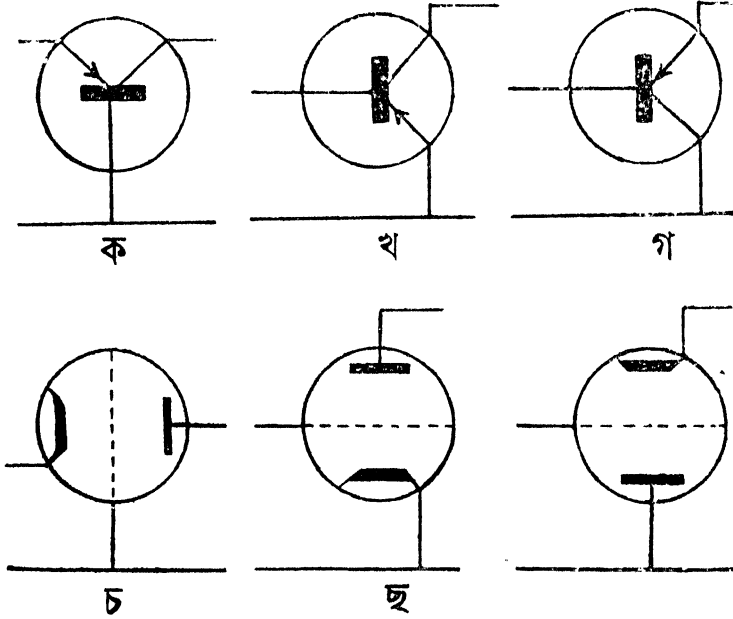
ট্র্যানজিষ্টর ও রেডিও-ভাল্‌ভ সার্কিট
ক-সাধারণ বেজ, খ-সাধারণ এমিটার, গ-সাধারণ কলেক্টর,
চ-সাধারণ গ্রিড, ছ-সাধারণ ক্যাথোড, জ-সাধারণ অ্যানোড।

P-N-P ট্র্যানজিষ্টরের সার্কিটে একটি সুইচের সাহায্যে এমিটারকে প্রথম বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইল। কলেক্টর ও বেজ এখন একটি P-N জাংশন রেকটিফায়ারে পরিণত হইল। যদি বাহিরের তড়িৎ-বিভবের নেগেটিভ দিক কালেক্টরের সঙ্গে এবং পজিটিভ দিক বেজের সঙ্গে যোগ করা যায়, তবে 'পশ্চাৎ' কারেন্টের সৃষ্টি হইবে এবং কারেন্টের পরিমাণ হইবে খুব কম।

স্বতন্ত্রভাবে এমিটার এবং বেজও একটি P-N জাংশন রেকৃটিফায়ার। বাহিরের বিভবের পজিটিভ দিক এমিটারের সঙ্গে এবং নেগেটিভ দিক বেজের সঙ্গে যুক্ত করিলে প্রচুর 'সম্মুখ' কারেন্টের সৃষ্টি হইবে। প্রচুর কারেন্টের ফলে ট্র্যানজিষ্টরের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া ঐ কারেন্টকে সীমায়িত রাখিবার জন্য একটি রেজিষ্ট্যান্স (১৫০০ ওহ্‌মের মত) এমিটার প্রান্ত ও বিভবের পজিটিভ প্রান্তের মধ্যে স্থাপন করা হয়। এই সীমায়িত বিদ্যুৎ-স্রোত ছিদ্রের আকারে এমিটার হইতে বেজের দিকে প্রবাহিত হয়। যেহেতু ট্র্যানজিষ্টরে বিদ্যুৎ-স্রোতের উৎস হইতেছে এমিটার, হইতে ৯৯ ভাগ কলেক্টরে উপনীত হয়। এই শতকরা ভাগকে ট্র্যানজিষ্টরের কারেন্ট গ্যাইন বলা হয়। এমিটার ও বেজের মধ্যে যে বিদ্যুৎ-শক্তি প্রযুক্ত হয়, কলেক্টরে আগত এই বিদ্যুৎ-স্রোতের সাহায্যে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করা যায়। অতএব ট্র্যানজিষ্টর অ্যাম্প্লিফায়ারের কাজ করিতে পারে। আমাদের অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, ট্র্যানজিষ্টরে উৎপন্ন শক্তি আপনা হইতেই উদ্ভূত হয় না, বাহিরের বিভব হইতে তাহা সরবরাহ করা হয়।

নীচে ট্র্যানজিষ্টরের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :—
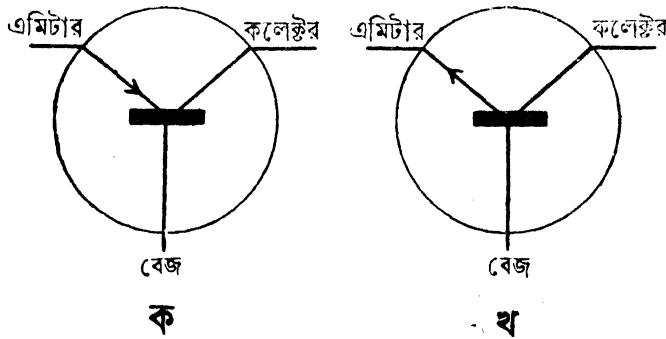
ক ও খ—ছবি দুইটিতে যথাক্রমে P-N-P ও N-P-N ট্র্যানজিষ্টরের প্রতীক আঁকা হইয়াছে। তীর চিহ্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহের দিক দেখাইতেছে।

সেহেতু ইহার এরূপ নাম হইয়াছে। বেজের অংশটি খুব পাত্‌লা করা হয়, যাহাতে অধিকাংশ ছিদ্র অনায়াসে এই অংশটি পার হইয়া কলেক্টরে গিয়া জমা হইতে পারে। সামান্য পরিমাণ ছিদ্রই শুধু বেজে জমা হয়। কারশফের নিয়ম অনুসারে কোন বিন্দুর দিকে আগত বিদ্যুৎ-স্রোতের পরিমাণ তাহার বিপরীত দিকে প্রবাহিত বিদ্যুৎ-স্রোতের পরিমাণের সমান হইয়া থাকে। অতএব এমিটার হইতে নির্গত বিদ্যুৎ-স্রোত বেজ ও কলেক্টরে উপনীত বিদ্যুৎ-স্রোতের যোগফলের সমান। সাধারণতঃ এমিটারের বিদ্যুৎ-স্রোতের শতকরা ৯৫

১। ট্র্যানজিষ্টর যে কোন প্রযুক্ত বিদ্যুৎ-সঙ্কেতকে বর্ধিত করিতে পারে। ইহা হইতে উৎপন্ন শক্তি কিন্তু কয়েক ওয়াটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

২। ট্র্যানজিষ্টরে উৎপন্ন শক্তি ইহার প্রযুক্ত শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে—ইহাকে ফিড-ব্যাক বলা হয়। রেডিও-ভাল্‌ভে এই ব্যাপারটি মিলার এফেক্ট বলিয়া পরিচিত; সাধারণতঃ অল্প তরঙ্গ-সংখ্যার সার্কিটে এই ব্যাপারটির তেমন প্রভাব নাই। কিন্তু ট্র্যানজিষ্টরে এই প্রভাব সর্বদাই লক্ষিত হয়। ফলে ট্র্যানজিষ্টরে অনেক সময় অনভিপ্রেত কম্পনের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

৩। যে কোন ট্র্যানজিষ্টরের তরঙ্গ-সংখ্যার একটি উর্দ্ধতম সীমা রহিয়াছে। এই সীমাটি ট্র্যানজিষ্টরের গঠনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, বাহিরের সার্কিটের পরিবর্তনে কোন লাভ হয় না। দেখা গিয়াছে যে, ট্র্যানজিষ্টরের আকার ক্ষুদ্রতর করিয়া ব্যবহারযোগ্য তরঙ্গ-সংখ্যার সীমা বর্ধিত করা যায় বটে, কিন্তু আকার যতই ক্ষুদ্র হয়, ততই তাহার উৎপাদন কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

P-N-P বিন্দুস্পর্শ ট্র্যানজিষ্টর।

৪। দেখা যায়, প্রতি ২০° সেন্টিগ্রেড পরিমাণ তাপমাত্রার বৃদ্ধিতে জার্মেনিয়াম ট্র্যানজিষ্টরের কার্যকারিতা প্রায় অর্ধেক হইয়া পড়ে। ট্র্যানজিষ্টরের তাপমাত্রার বৃদ্ধি সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ এবং স্থানীয় ব্যাপার; বাহিরে তাপমান যন্ত্রের প্রয়োগে তাহা জানিবার উপায় নাই। একমাত্র বিদ্যুৎ-বিভবের সঠিক প্রয়োগে এই তাপবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

জার্মেনিয়াম পরমাণু-বিন্যাসের মডেল।

৫। ট্র্যানজিষ্টরের শক্তি উৎপাদনের উৎকর্ষ যথেষ্ট, অর্থাৎ ব্যাটারীর সাহায্যে প্রযুক্ত শক্তির অনেকখানিই উৎপন্ন শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। ভাল্‌ভের ক্যাথোডকে উত্তপ্ত করিতে যেমন শক্তি ব্যয়িত হয়, ট্র্যানজিষ্টরের এমিটারে তেমন দরকার পড়ে না।

৬। বিভিন্ন শ্রেণীর ট্র্যানজিষ্টরের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য উহাদিগকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। বিপরীত-ধর্মী ট্র্যানজিষ্টরগুলি, যেমন—P-N-P ও N-P-N, কতিপয় সার্কিটে বিশেষ উপযোগী।

৭। ট্র্যানজিষ্টরে অনভিপ্রেত শব্দের (noise) উৎপত্তি ইহার ব্যবহারে এক প্রধান অন্তরায়। তরঙ্গ-সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, অনভিপ্রেত শব্দের পরিমাণ ততই কমিতে থাকে। তবে যেহেতু সাধারণতঃ ট্র্যানজিষ্টরে প্রযুক্ত বিভব ব্যাটারীর সাহায্যে দেওয়া হয়, সেহেতু ট্র্যানজিষ্টর রেডিওতে এই অনভিপ্রেত শব্দ কোন বিপত্তির সৃষ্টি করে না।

একটি ট্র্যানজিষ্টরের এমিটার, বেজ ও কলেক্টর যথাক্রমে একটি ত্রিপদী (Triode) ভাল্‌ভের ক্যাথোড, গ্রিড ও অ্যানোডের সমতুল্য। ট্র্যানজিষ্টরের তিনটি পদের যে কোন দুইটির মধ্যে আগত সঙ্কেত (input signal) প্রযুক্ত করা যায় এবং অপর একটি পদ হইতে উৎপন্ন সঙ্কেত (output signal) পাইবার বন্দোবস্ত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এমিটার ও বেজের মধ্যে আগত সঙ্কেত প্রয়োগ করিয়া কলেক্টর ও বেজ হইতে উৎপন্ন বর্ধিত সঙ্কেত লাভ করা সম্ভব। এখানে বেজ হইতে আগত ও উৎপন্ন উভয় সার্কিটই রহিয়াছে। তেমনই এই এমিটার ও কলেক্টর উভয় ক্ষেত্রেই থাকিতে পারে। এই তিন প্রকার সার্কিটের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য দেওয়া হইল :—

সাধারণ বেজ ট্র্যানজিষ্টর (P-N-P) অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিট।

ধর্ম	সাধারণ বেজ	সাধারণ এমিটার	সাধারণ কলেক্টর
১। শক্তি-বৃদ্ধি	মোটামুটি	অধিক	অল্প
২। ভোল্টেজ বৃদ্ধি	অধিক	অধিক	অল্প
৩। কারেন্ট বৃদ্ধি	অল্প	অধিক	অধিক
৪। আগত ও উৎপন্ন সঙ্কেতের সাদৃশ্য	অন্য দুই প্রকার সার্কিটের তুলনায় ভাল	—	—
৫। উৎপন্ন শক্তি	সর্বাধিক	মাঝারি	ন্যূনতম

জাংশন ট্র্যানজিষ্টর যদিও রেডিও-ভাল্‌ভের অনেকটা অনুরূপ, বিন্দুস্পর্শ ট্র্যানজিষ্টর (point-contact transistor) কিন্তু একেবারেই আলাদা। বিন্দুস্পর্শ ট্র্যানজিষ্টরে এমিটার ও কলেক্টরের সংযোগ-স্থলে দুইটি P-N জাংশন রেক্টিফায়ারের উদ্ভব হয়। চিত্রে বিন্দুচিহ্নিত অংশে জাংশন

রেকৃটিফায়ারের স্থান দুইটি প্রদর্শিত হইয়াছে। বেজের তুলনায় এমিটারকে যদি 'সম্মুখ' কারেণ্টের এবং কলেক্টরকে 'পশ্চাৎ' কারেণ্টের উপযোগী বিভব প্রয়োগ করা হয়, তবে এমিটার হইতে নির্গত ছিদ্র বেজে প্রবেশ করিয়া কলেক্টরের দিকে ধাবমান হইবে, ঠিক জাংশন ট্র্যানজিষ্টরের মতই। কিন্তু বিন্দুস্পর্শ ট্র্যানজিষ্টরের কলেক্টর সার্কিটে কারেণ্ট বেশী বর্ধিত হয়; কারণ এখানে ফিডব্যাকের মাত্রা বেশী বলিয়া এমিটার কারেণ্ট বাড়িয়া যায়। এই কারণে এমিটার ও বেজের ভিতরকার বিরোধিতার মাত্রা নেগেটিভ হইয়া যাইতে পারে এবং বিদ্যুৎ-স্রোতকে বাধা না দিয়া বরং টিকিয়া থাকিতে সাহায্য করে। ফলে, কোন কারণে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ একবার উৎপন্ন হইলে বাহিরের আর কোন বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্য ছাড়াই উহা বজায় থাকিতে পারে। এই প্রকার সার্কিটকে কম্পন (oscillation)-সার্কিট বলা হয়। বিন্দুস্পর্শ ট্র্যানজিষ্টর কম্পন-সার্কিটে বিশেষ উপযোগী।

ট্র্যানজিষ্টরের প্রয়োগ বাড়িয়া চলিয়াছে। ট্র্যানজিষ্টর আকারে ছোট, ওজনে হাল্‌কা এবং শক্তি খরচও খুব কম। খুব ছোট আকারের রেডিও-ভাল্‌ভ ট্র্যানজিষ্টরের সঙ্গে ওজনে ও আকারে কিছুটা পাল্লা দিতে পারিলেও শক্তি-ব্যয়ের ব্যাপারে ইহাদের সহিত ট্র্যানজিষ্টরের কোন তুলনাই চলে না। এই জন্য যেখানে বিদ্যুৎ-সরবরাহ নাই, সেখানে এবং যন্ত্র-তন্ত্র ব্যবহারের জন্য ট্র্যানজিষ্টরে তৈয়ারী ইলেকট্রনিক যন্ত্রের উপযোগিতা ও প্রচলন রহিয়াছে। খেলার মাঠে, বনভোজনে, ভ্রমণে ট্র্যানজিষ্টর বেতার-গ্রাহক যন্ত্র ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আমাদের আনন্দ দান করিতেছে। সহর হইতে বহু দূরের পল্লীতে, গহন অরণ্যে এবং দুর্লঙ্ঘ্য পার্বত্য অঞ্চলে ট্র্যানজিষ্টরে প্রস্তুত যন্ত্র খুবই উপযোগী।

সাগরের গভীরে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার নিমজ্জিত থাকিয়া দেশ-দেশান্তরে সংবাদ আদান প্রদান ও কথাবার্তায় সহায়তা করে। কয়েক শত মাইল দূরে দূরে সঙ্কেত-মাত্রা বর্ধনের ব্যবস্থা করিতে হয়, নতুবা সঙ্কেত বা কথার শক্তি মধ্য পথেই এত ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে, গন্তব্য স্থানে তাহা উদ্ধার করা বা বুঝিয়া লওয়া সম্ভব নহে। এইরূপ ব্যবস্থা অনেক দিন ধরিয়া চালু রাখিতে হয়। একটি ট্র্যানজিষ্টরের আয়ু প্রায় এক লক্ষ ঘণ্টা; অর্থাৎ প্রায় সাড়ে দশ বছর একটি যন্ত্র কোন যত্ন ব্যতীতই একটানা কাজ করিয়া যাইতে পারে। ট্র্যানজিষ্টরের দীর্ঘ আয়ু ইহার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

শ্রুতি-সহায়ক যন্ত্রে ট্র্যানজিষ্টর ইতিমধ্যেই রেডিও-ভাল্‌ভকে প্রায় অপসারিত করিয়া ফেলিয়াছে।

জাংশন ট্র্যানজিষ্টরের ত্রৈমাত্রিক ছবি।

টেলিভিশনের যন্ত্রপাতিতে—এমন কি, টেলিভিশন ক্যামেরাতেও ট্র্যানজিষ্টর স্থান করিয়া লইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত R. C. A. কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত একটি টেলিভিসন ক্যামেরায় ৭২টি ট্র্যানজিষ্টর রেডিও-ভাল্‌ভের সমস্ত কাজ করিতেছে।

কম্পিউটার যন্ত্রে ট্র্যানজিষ্টর ব্যবহারের ফলে ঐ যন্ত্র ক্ষুদ্রতর এবং অধিক কর্মক্ষম হইয়াছে। একটি কম্পিউটার যন্ত্রে কয়েক হাজার ট্র্যানজিষ্টর ব্যবহৃত হয়। ট্র্যানজিষ্টরের বদলে রেডিও-ভাল্‌ভ ব্যবহার করিলে অনেকটা বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন এবং তাহা হইতে উৎপন্ন তাপ একটি বিরাট সমস্যার ব্যাপার। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ট্র্যানজিষ্টরের মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই ট্র্যানজিষ্টর ছোট আকারের রেডিও-ভাল্‌ভকে প্রায় পরাস্ত করিয়া আনিয়াছে। ট্র্যানজিষ্টর শুধু একটি নূতন সংযোজন মাত্র নহে, ইহা বিদ্যুৎ-প্রবাহ সম্বন্ধে নূতন ভাবধারার অগ্রদূতও বটে।

মহাশূন্যে দূরপথের যাত্রীদের অনবরত পানীয় জল সরবরাহের জন্য নিউ ইয়র্কের এলিজাবেথ কেলিজি একপ্রকার অভিনব যান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার ফল আশাপ্রদ। এই পদ্ধতিতে পরিত্যক্ত তরল পদার্থ হইতে পাতনক্রিয়ার দ্বারা বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায়। এক মাস যাবৎ এই জল পান করিবার ফলে গবেষণাগারে ছোট ছোট প্রাণীদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই।

ঈষ্টের কথা

শ্রীজয়া রায়

ক্রমবিকাশের ইতিহাসে মানুষ যত রকম উদ্ভিদের চাষ বা পরিচর্যা করেছে, ঈষ্ট তার মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন। শস্য উৎপাদন করতে শেখবার আগেই আদিম মানুষ বন্য শস্যকণা গাঁজিয়ে তোলবার জন্যে এই উদ্ভিদের ব্যবহার করতো। প্রায় ৪০০০ বছর আগেকার এক সমাধিস্তূপে রুটি ও সুরা প্রস্তুত-প্রণালীর নিখুঁত প্রতিরূপ পাওয়া গেছে। আজ সকলেই জানেন যে, ঐ দুই শিল্পে ঈষ্ট অপরিহার্য।

লিউয়েনহোয়েকই প্রথম লেন্সের সাহায্যে বিয়ারের মধ্যে ঈষ্টের জীবকোষ দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু গাঁজিয়ে তোলা বা বিশ্লেষণের ব্যাপারে ঈষ্ট কি ভাবে সাহায্য করে, তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। ১৮৭৫ সালে প্রসিদ্ধ ফরাসী রাসায়নিক লুই পাস্তুর প্রমাণ করেন যে, ঐ জীবন্ত ঈষ্টের কোষই ফলের রস গাঁজিয়ে তোলে। তবুও বিজ্ঞানীমহলে প্রশ্ন ওঠে যে, শর্করার অণু কি ঈষ্টের কোষের ভিতরেই বিশ্লিষ্ট হয়, না কোষের ভিতরকার কোন বস্তু বা রস কোষের বাইরে বেরিয়ে এসে শর্করার অণুগুলিকে বিশ্লিষ্ট করে দেয়? এরপরে ঈষ্ট সম্পর্কে গবেষণায় অগ্রসর হন বৈজ্ঞানিক ভ্রাতৃযুগল হানস্ ও এডওয়ার্ড বুকনার। এঁরা ঈষ্টের কোষকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তাথেকে রস বের করবার পর তার সঙ্গে কিছু চিনি মিশিয়ে পরীক্ষা সুরু করেন। অল্পকালের মধ্যেই দেখা গেল—চিনির রসে বুদ্বুদ উঠে সেগুলি ফেনার আকার ধারণ করে। কোষের অভ্যন্তরের কোন বস্তুই যে এই উচ্ছলনে সাহায্য করছে, তাতে তাঁদের কোন সন্দেহ রইলো না। যে জৈব অনুঘটক এই কাজ করে, তাঁরা তার নাম দিলেন—এনজাইম।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, গ্লুকোজ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অ্যালকোহল থেকে প্রায় বারো রকমের শৃঙ্খলাবদ্ধ বিক্রিয়া ঘটে। বিভিন্ন জীবন্ত দেহে এনজাইম এভাবে কাজ করে গ্লুকোজ অণুর আবদ্ধ শক্তি মুক্ত করে দেয়।

ঈষ্ট পত্রহরিৎশূন্য অতি সরল একজাতীয় ছত্রাক। জীবাণু ও অ্যালগার মত ঈষ্টের উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের সঙ্গে বেশী মিল নেই। ছত্রাকের শ্রেণীবিভাগেও ঈষ্টের বিশিষ্ট কোন স্থান দেখা যায় না। আকৃতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে ঈষ্টকে বিশেষ ধরণের ছত্রাক বলেই মনে হয় না; তবুও বিশেষ কয়েকটি প্যাথোজেনিক ছত্রাক ছাড়া ঈষ্ট অন্যান্য সাধারণ ছত্রাকের সমগুণসম্পন্ন। পূর্বোল্লিখিত ছত্রাক সূক্ষ্ম তন্তুবৎ (filamentory) উদ্ভিদ। বিশেষ অবস্থার চাপে এরা এককোষী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঈষ্ট—হয় পরগাছা হিসাবে, নয় তো মৃতভুক হিসাবে বাস করে।

ঈষ্টের জীবকোষগুলি গোল বা ডিম্বাকার। একটি কোষ নিয়েই এর দেহ গঠিত। আয়তনে ঈষ্ট একটি মানুষের রক্তকণিকার সমান। ঈষ্ট-কোষের সঙ্গে অন্যান্য উদ্ভিদ কোষের কোনও পার্থক্য নেই। মোটা কোষ-প্রাচীরের মধ্যে প্রোটোপ্লাজম ও তার মধ্যে নানা আকারের দানাদার বস্তু থাকে। বিশেষ রঙের সাহায্যে এই দানাগুলিকে মাইটোকন্‌ড্রিয়া বলে চেনা যায়, যা অন্যান্য কোষকে অক্সিজেন যোগাবার কাজে সাহায্য করে। ঈষ্ট-কোষের মাইটোকন্‌ড্রিয়া বিশ্লেষণেও সহায়তা করে। কোষের কেন্দ্রের কাছে অবস্থিত একটি গর্তে দু'একটি নিউক্লিয়াসের মত বস্তু দেখা যায়। সেগুলি বংশানুক্রমে প্রাপ্ত গুণাবলীর নির্দেশক (যেমন,

বিশ্বকরণের সময় কন্যাকোষগুলি কতখানি শক্তি ব্যবহার করবে ইত্যাদি)।

প্রকৃতিতে ঈষ্ট নানাভাবে থাকে। যেমন মাটিতে, সমুদ্রে, এমন কি মানুষের চর্মের উপরেও ঈষ্ট থাকতে পারে। অধিকাংশ ঈষ্ট শ্বেতসার-প্রধান বস্তু বা মিষ্টদ্রব্যের মধ্যেই বাস করে। ধ্বংসপ্রাপ্ত গাছের রস, ফুলের মধু ও মিষ্ট ফলের গায়ে ঈষ্ট জন্মায়। আঙুর, আতা প্রভৃতির গায়ে সাদা স্তর পড়তে দেখা যায়। ঐ সব ফল হাতে নিলে সেগুলি হাতে লেগে যায়। এগুলির ঈষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। জেলী ও সিরাপে শতকরা ৬০ ভাগ চিনি থাকলেও ঈষ্ট জন্মাতে পারে। অধিকাংশ আণুবীক্ষণিক প্রাণী চিনির এই রকম গাঢ়তায় বাড়তে পারে।

ঈষ্টের মিষ্টপ্রিয়তার কারণ হচ্ছে, ঈষ্ট শর্করাকে বিশ্লিষ্ট করে তাথেকে শক্তি সংগ্রহ করে। এই সময় অক্সিজেন পেলে শর্করাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলে পরিণত করে; অভাবে অ্যালকোহল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড হয়। সে ক্ষেত্রে শর্করার সব শক্তি অ্যালকোহলে আবদ্ধ থাকে। এ-জন্যেই সুরা ও রুটি প্রস্তুতকারকদের কাজে ঈষ্ট অপরিহার্য।

আণুবীক্ষণিক বা জীবন্ত তন্তুর কোষ পুষ্টিকর খাদ্য পেয়ে বাড়তে থাকে এবং আয়তনে যথেষ্ট বাড়বার পর ওদের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ও বর্ধিত কোষটি দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এককোষী বা যে কোন বহুকোষী প্রাণীর কোষ এই ভাবেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়, একটি পূর্ণবয়স্ক ঈষ্ট-কোষের কোষ-প্রাচীরের একটি ক্ষুদ্র অংশ ফুঁড়ে প্রোটো-প্লাজমের কিয়দংশ বাইরে এসে কুঁড়ির আকারে ছোট থেকে বড় হয়। ক্রমশঃ সেই কুঁড়িটি পুরাতন মাতৃকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

কোন কোন ঈষ্ট-কোষ যৌন উপায়েও সংখ্যা-বৃদ্ধি করে। রুটি ও সুরা প্রস্তুতকারীরা যে ঈষ্ট ব্যবহার করে, সেই ঈষ্ট-কোষ বীজরেণু (spore) সৃষ্টি করে। প্রত্যেকটির নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ঈষ্ট-কোষের অর্ধেক থাকে। বীজরেণুতে ক্রোমোসোমের স্ত্রী অংশ থাকলে স্ত্রী-বীজরেণু ও পুং অংশ থাকলে পুং-বীজরেণু বলে। স্ত্রী ও পুং-কোষ মিলে যে পূর্ণাঙ্গ কোষ জন্মে, সেগুলি কুঁড়ির আকারে বা যৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। আবার স্ত্রী+স্ত্রী-রেণু বা পুং+পুং-রেণু মিশে যে অস্বাভাবিক কোষ সৃষ্টি হয়, সেগুলি যৌন উপায়ে প্রজনন ঘটাতে না পারলেও কুঁড়ির আকারে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে। এদের অস্বাভাবিক নিউক্লিয়াস প্রজননে কোন বাধা সৃষ্টি করে না; এমন কি, নিউক্লিয়াস নষ্ট করে দিলেও তাদের প্রজনন-শক্তি নষ্ট হয় না।

প্রাচীনকাল থেকেই রুটি ও সুরা প্রস্তুতের জন্যে ঈষ্টের ব্যবহার হয়েছে। সুরা প্রস্তুতকারীরা Sacchromyces Cerevisiae জাতীয় ঈষ্টকে কাজে লাগায়। কল-বেরোনো যবের ক্বাথকে ঈষ্টের সাহায্যে গাঁজিয়ে তাথেকে অ্যালকোহল ঊর্ধ্বপাতনের সাহায্যে বের করে নেওয়া হয়। রুটি তৈরীর জন্যে দরকার কার্বন ডাইঅক্সাইড। ঈষ্ট ভিজা ময়দার তাল ফুলিয়ে তোলে, সুস্বাদু করে এবং রুটি হজমেও সাহায্য করে।

হুইস্কি, রাম্, ব্রাণ্ডি, জিন ইত্যাদি মদ্য-জাতীয় পানীয় বিভিন্ন শস্যের ক্বাথ ও দ্রাক্ষারসকে ঈষ্ট দিয়ে গাঁজিয়ে তৈরী করা হয়। বিশেষ এক ধরণের ঈষ্ট এই কাজ করে। শর্করা ও অ্যাল-কোহলের পরিমাণ বেশী থাকলেও এই ঈষ্ট কাজ করতে পারে। ঈষ্ট, গুড়কে ও ইথাইল অ্যাল-কোহল তৈরীর সময় যে মিষ্টদ্রব্য অপচিত হয়, সেগুলিকে গাঁজিয়ে তোলে।

অন্যান্য শিল্পেও ঈষ্ট নানাভাবে কাজে লাগে। ইনভার্টেজ (ঈষ্ট এন্‌জাইম) চকোলেটের মধ্যে ক্রীম দেবার জন্যে ব্যবহার করা হয়। ভিতরের ছাঁচ তৈরী করবার পর ও চকোলেটের কোটিং দেবার সময় তাতে স্ফটিকাকার চিনি বা সুক্রোজ

দিয়ে দেওয়া হয়। ইনভার্টেজ+চিনির ক্রিয়ায় সেই চিনি ক্রীমের মত গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজের একটি মিশ্রণ হয়ে যায়। অন্য আর এক ধরণের ঈষ্ট এনজাইম ল্যাক্টোজ বা দুগ্ধশর্করাকে বিশ্লিষ্ট করে। এই এনজাইম আইসক্রিমে দেওয়া হয়, যাতে দুগ্ধশর্করা স্ফটিকাকৃতি হতে পারে না। এসব কাজে যে ঈষ্টের ব্যবহার হয়, তা স্যাকরোমাইসেস সেরিভিসিয়ে জাতীয় নয়। বিশেষ তিন রকমের ঈষ্ট উপযুক্ত পোষক-মাধ্যমে প্রচুর রিবোফ্লেভিন বা ভিটামিন-বি$_2$ সৃষ্টি করে। এই ভিটামিন মানুষ ও পশু—উভয়ের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

একজন জার্মান আণুবীক্ষণিক প্রাণিবিদ্ ১৯১০ সালে ঈষ্টকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ঈষ্টে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আছে, অথচ খুব অল্প দামের কাঁচা মাল থেকেই এগুলি উৎপাদন করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানরা সুপ ও সসেজের আকারে খাদ্যোপযোগী ঈষ্ট খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

ছত্রাক অবশ্য খাদ্য হিসাবে নতুন নয়। ব্যাঙের ছাতা বহু শতাব্দী ধরে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যে শিল্পে সেলুলোজ ও কাঠের মণ্ড তৈরী করা হয়, তাতে উপজাত পদার্থ হিসাবে খাদ্যের অনুপযোগী একরকম নিম্নস্তরের শর্করা উৎপন্ন হয়। Candida utilis নামক ঈস্ট উপযুক্ত মাধ্যমে সেই শর্করাকে প্রোটিনে পরিণত করতে পারে। খাদ্যে জৈব-প্রোটিনের অভাব হলে ঈস্ট তা পূরণ করতে পারে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড লাইসিন কমই থাকে। ঈষ্টে কোন কোন অ্যামিনো অ্যাসিডের ঘাটতি থাকলেও লাইসিন নামক অ্যাসিড প্রচুর আছে। দুঃখের বিষয়, ঈষ্ট খাদ্য হিসাবে সুষম হলেও ঈষ্টযুক্ত খাদ্য উপযুক্তভাবে পাক করতে না পারলে সুস্বাদু হয়ে ওঠে না।

বৈজ্ঞানিকেরা ঈষ্টকে কোষের শারীরিক গঠন ও বিভাজন প্রক্রিয়া নির্ণয়ের কাজে লাগিয়েছেন। ঈষ্ট-কোষের অভ্যন্তরস্থ প্রোটোপ্লাজম কোষ-প্রাচীর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে কুঁড়ির আকারে বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হলে মাতৃকোষ থেকে নতুন কোষ আলাদা হয়ে যায়। এই বিষয়টি ভাল ভাবে জানবার জন্যে রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আণুবীক্ষণিক প্রাণিবিদ্ নিকারসন ও তাঁর সহকর্মীরা ক্যানডিডা অ্যালবিকান্স্ জাতীয় ঈষ্টকে পরীক্ষা করেছেন। এই জাতীয় ঈষ্ট কুঁড়ির সাহায্যেই সংখ্যাবৃদ্ধি করে। কিন্তু এরই একটি পরিব্যক্ত (mutant) জাতি সূত্রাকারেও বাড়ে। প্রথম পরীক্ষায় এদের তফাৎ চোখে পড়ে নি। এদের খাদ্য, বৃদ্ধির হার, কিণ্বকরণের হার ও রাসায়নিক গঠন প্রভৃতি সব একই রকম মনে হয়েছিল। পরে পরীক্ষায় জানা গেল যে, পরিব্যক্ত জাতিটির বর্ধনশীল কোষ লাল টেট্রাজোলিয়াম জাতীয় রংকে হাইড্রোজেন অণুর সংযোগ ঘটিয়ে তার রাসায়নিক গঠন বদ্‌লে দেয়। এই নতুন গঠন সুরু হলেই পরিবর্তিত জাতিটি আর কুঁড়ির আকারে প্রজনন করে না। যে কোন কারণেই হোক, এই নতুন সৃষ্ট বস্তু রংকে জারিত করতে পারলেও কোষের উপাদানকে জারিত করতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা এই উপাদানের সন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। উপাদানের খোঁজে তাঁরা কোষ-প্রাচীরকেই বিশ্লেষণ করছেন, কারণ কোষ-প্রাচীর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসাই কোষ-বিভাজনের প্রথম লক্ষণ। নিকারসন ও নেপল্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যালকন আবিষ্কার করেছেন যে, ঈষ্টের কোষ-প্রাচীর দুটি বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। প্রথমটি হচ্ছে—গ্লুকান যা গ্লুকোজ এককের তৈরী লম্বা শৃঙ্খলাবদ্ধ অণুর সমষ্টি, আর দ্বিতীয়টি হলো গ্লুকোমান্নান্—এটি গ্লুকোজ ও ম্যানোজ শর্করা দুটির এককের লম্বা শৃঙ্খলিত অণু। এই দুটি পলিস্যাকারাইড কেরাটিন জাতীয় প্রোটিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে। এই প্রোটিন চুল ও নখে দেখা যায়। কেরাটিন

প্রোটিনের সঙ্গে reducing agent যোগ করলে তা নমনীয় হয়ে যায়। অতএব বোঝা যায়, কোষ-প্রাচীরের প্রোটিন জারিত হলে প্রাচীরের স্থান বিশেষ নরম হয়ে যায় এবং কোষের অভ্যন্তরের চাপের ফলে ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে কুঁড়ির সৃষ্টি করে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নতুন কোষ মাতৃকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপে দেখা গেছে, কোষ-প্রাচীর গ্লুকান-প্রোটিনের তৈরী পশমের মত তন্তু-সমষ্টি দিয়ে তৈরী। এই তন্তু গ্লুকোম্যান্নান প্রোটিনের জটিল যৌগিক দ্বারা যুক্ত। এই দুটি বস্তুই সালফার অণুযুক্ত প্রোটিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দুটি বস্তুর সালফার অণুর বন্ধনী (bond) কোষ-প্রাচীরকে দৃঢ়সংবদ্ধ রাখে। যখন কোষে কুঁড়ির উৎপত্তি হয়, তখন একটি এন্‌জাইম সালফার অণুকে হাইড্রোজেন যোগায় ও বন্ধনী ভেঙে যাওয়ায় কোষ-প্রাচীর দুর্বল হয়ে পড়ে, তখনই ভিতরের চাপে কুঁড়ির গঠন হতে থাকে। পরিব্যক্ত জাতিটির কোষে ঐ এন্‌জাইম ঠিকমত কাজ না করায় কুঁড়ি হতে পারে না।

ঈষ্টের রাসায়নিক ক্রিয়া সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনেক তথ্যই জেনেছেন এবং ভালভাবেই সে-গুলিকে কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু কতকগুলি ঈষ্ট মানুষের দেহে রোগ সৃষ্টি করে। তাদের নিয়ন্ত্রণে আনা কষ্টসাধ্য। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ও নখের কষ্টদায়ক ও সংক্রামক মনিলিয়েসিস্ রোগ Candida albicans জাতীয় ঈষ্টের দ্বারাই হয়। ক্রিপটোকক্কাস নিওসরমানস্ নামক ঈষ্ট আরও ভয়ঙ্কর। এগুলি মারাত্মক রকমের মেনিনজাইটিস ঘটায়। ঈষ্টের ধরণের এক জাতীয় ছত্রাক ফুস্‌ফুসের সংক্রামক হিস্টোপ্লাজমোসিস ও চর্মের ব্লাস্টোমাই-কোসিস ঘটায়। এই আণুবীক্ষণিক প্রাণী দেহের ভিতরে এককোষী অবস্থায় এবং গবেষণাগারে বাড়ালে বহুকোষী সূতাকৃতি হয়ে বাড়তে থাকে। এদের প্রতিরোধ করবার জন্যে কয়েক জাতীয় ছত্রাক-ধ্বংসী অ্যান্টিবায়োটিক ভিন্ন অন্য ওষুধ জানা যায় নি।

অবশ্য ঈষ্টের দ্বারা অপকারের চেয়ে মানুষ উপকারই বেশী পেয়েছে। ঈষ্ট নিয়ে গবেষণা করবার ফলে জীবাণু-বিজ্ঞান ও জৈবরসায়ন (Biochemistry) সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া খাদ্য, পানীয়, ওষুধ এবং নানাবিধ গবেষণার কাজে ঈষ্ট মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করছে। আজকাল কোষ-বিভাজনের গবেষণায়ও ঈষ্টের প্রয়োজনীয়তা কম নয়। ঈষ্ট নিয়ে গবেষণার ফলে মানুষ হয়তো একদিন তার নিজের সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে বলে বৈজ্ঞানিকেরা আশা করছেন।

পেশী-সঞ্চালন

শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল

প্রায় প্রত্যেক জীবেরই কম বেশী অঙ্গচালনার ক্ষমতা আছে। উদ্ভিদেরাও এর ব্যতিক্রম নয়। লজ্জাবতী প্রভৃতি স্পর্শকাতর গাছের বেলায় আমরা এটা সহজেই দেখতে পাই। যে সব গাছের অঙ্গসঞ্চালন দৃষ্টিগোচর হয় না, তাদেরও এই ক্ষমতা আছে; যেমন—গাছের কাণ্ড আলোর দিকে বাড়ে, অধোমুখী করলে কাণ্ড বেঁকে গিয়ে উর্ধ্বমুখী হয়। এগুলিও অঙ্গসঞ্চালনের উদাহরণ।

অঙ্গসঞ্চালনের জন্যে শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি জীবদেহে আসে কোথা থেকে? অবশ্যই খাদ্যবস্তু থেকে। ইঞ্জিনে যেমন জ্বালানী কয়লা বা পেট্রোল পুড়িয়ে তাপশক্তি পাওয়া যায় এবং সেই শক্তিতে ইঞ্জিন চলে, জীবদেহেও তেমনি খাদ্যবস্তুর মৃদু দহনে শক্তির উৎপত্তি হয়। খাদ্যবস্তুর দহনের ফলে দেহেও তাপের সৃষ্টি হয়, তবে তার পরিমাণ অল্প। বেশীর ভাগ শক্তিই জীবদেহে রাসায়নিক স্থিতিশক্তি হিসাবে সঞ্চিত হয় এই জন্যে যে, তাপশক্তিকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা জীবদেহের নেই। এখানে আমরা দেখাতে চেষ্টা করবো, কি ভাবে রাসায়নিক শক্তি পেশী-সঞ্চালন ক্রিয়ার যান্ত্রিক শক্তিতে পরিবর্তিত হয়।

জীবদেহে খাদ্যবস্তুর দহন থেকে প্রাপ্ত শক্তি যে কতকগুলি শক্তিসমৃদ্ধ জৈব ফস্ফেট যৌগিক পদার্থ হিসাবে সঞ্চিত থাকে এবং সেগুলিই যে জীবের যাবতীয় কর্মচাঞ্চল্যের মূল—এই তত্ত্ব অনেকের গবেষণার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মায়ারহফ, এমডেন, ইগ্‌ল্টন, ফিস্কে, সুব্বারাও, লোম্যান প্রমুখ বিজ্ঞানীদের দান এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। উচ্চ শক্তিসমৃদ্ধ জৈব ফস্ফেট যৌগিক পদার্থগুলি সম্বন্ধে বর্তমান ধারণার মূল খুঁজে পাওয়া যায় মায়ারহফ ও সুব্বারাও-এর কাজের মধ্যে। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, ফস্ফোক্রিয়েটিন যৌগিকটিকে আর্দ্রবিশ্লেষিত (hydrolysis) করলে তাথেকে প্রচুর শক্তি পাওয়া যায়—

ফস্ফোক্রিয়েটিন $\xrightarrow{\text{জল}}$ ক্রিয়েটিন + ফস্ফরিক অ্যাসিড + ১২০০০ ক্যালরি।
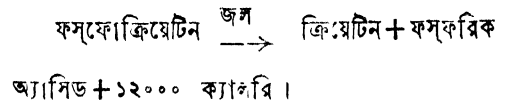
লাণ্ডস্গার্ড দেখিয়েছেন যে, কোন পেশীকে আয়োডোঅ্যাসিটেট দিয়ে বিষাক্ত করলে (যার ফলে নতুন করে আর ফস্ফোক্রিয়েটিন তৈরী হতে পারে না) সঙ্কোচন-ক্রিয়া ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সঞ্চিত সবটুকু ফস্ফোক্রিয়েটিন শেষ না হয়। এর পরেই লোম্যান আবিষ্কার করেন যে, অ্যাডেনোসিন ডাইফস্ফেট ও ট্রাইফস্ফেট (সংক্ষেপে **এডিপি** ও **এটিপি**)-এর মধ্যস্থতা ছাড়া ফস্ফোক্রিয়েটিন সোজাসুজি ভেঙ্গে গিয়ে শক্তি ছেড়ে দিতে পারে না। যথা—

ক্রিয়েটিন ফস্ফেট + এডিপি ⇌ ক্রিয়েটিন + এটিপি

এটিপি ⇌ এডিপি + ফস্ফেট + শক্তি
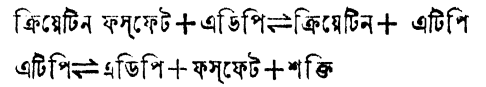
এই এটিপি (ATP—এতে অ্যাডেনিন, রাইবোজ ও তিনটি ফস্ফরিক অ্যাসিডের অণু যুক্ত আছে) হচ্ছে জীবদেহে সর্বশক্তির আধার। দরকারমত এটা ভেঙ্গে গিয়ে এডিপি হয় ও একটা ফস্ফেট ছেড়ে দেয় এবং ঐ সঙ্গে অনেকটা শক্তিও মুক্ত করে। এই শক্তিই পেশীর সঙ্কোচন ঘটায়, কোন কোন প্রাণীর দেহে আলো, কোথাও বা বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে (যেমন, বৈদ্যুতিক বাণমাছ)।

যখন কোন মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়, তখন এটিপি, এডিপি ও ফস্ফেটে ভেঙ্গে গিয়ে সঙ্কোচনের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়। এডিপি আবার

ক্রিয়েটিন ফস্‌ফেটের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে এটিপি তৈরী করে। বিশ্রামের সময় খাদ্যবস্তুর জারনের সঙ্গে সঙ্গে এডিপি এটিপি-তে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে জারনঘটিত ফস্‌ফেট বন্ধন বা Oxidative Phosphorylation বলে। এটিপির পরিমাণ বেড়ে গেলে তা আবার ক্রিয়েটিনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় ক্রিয়েটিন ফস্‌ফেট তৈরী করে। তাই দেখা যায়—সুপরিপুষ্ট ও বিশ্রাম প্রাপ্ত পেশীতে এটিপি ও ক্রিয়েটিন ফস্‌ফেট উভয়েরই পরিমাণ খুব বেশী থাকে এবং এই অবস্থায় পেশী যে কোন কাজের জন্যে প্রস্তুত থাকে। আরও দেখা যায় যে, ঐচ্ছিক মাংসপেশীকে যে কোন সময় কঠোর কাজের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয় বলে এতে ক্রিয়েটিন ফস্‌ফেটের পরিমাণ এটিপির চারগুণ, অপর পক্ষে হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস প্রভৃতি পেশী, যেগুলি সব সময়েই কাজ করে চলেছে, তাদের মধ্যে ঐ উভয়ের পরিমাণ প্রায় সমান।

যখন কোন পেশী হাল্কা পরিশ্রমের কাজ করে, তখন যে পরিমাণে এটিপি ব্যয়িত হয়, সেই পরিমাণে আবার খাদ্যবস্তুর জারনের ফলেও তৈরী হয়। কিন্তু হঠাৎ কঠোর পরিশ্রম করতে থাকলে যে হারে এটিপি দরকার হয়ে পড়ে, জারন প্রক্রিয়ায় সে হারে তৈরী হয় না। কাজেই অন্য কোন উপায়ে দ্রুত এটিপি তৈরী করা একান্ত দরকার হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় পেশীতে যে শর্করা (গ্লাইকোজেন) সঞ্চিত থাকে, তা দ্রুতগতিতে অক্সিজেনবিহীন গ্লাইকোলিসিস (Anaerobic glycolysis) প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে গিয়ে অ্যাসিডে পরিণত হয় ও এটিপি সরবরাহ করে। এই অবস্থায় যখন এটিপি, ক্রিয়েটিন ফস্‌ফেট ও গ্লাইকোজেন—এই তিনটিই ফুরিয়ে যায়, তখন পেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং রক্তে ল্যাকৃটিক অ্যাসিড জমা হয়। মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা যায়:
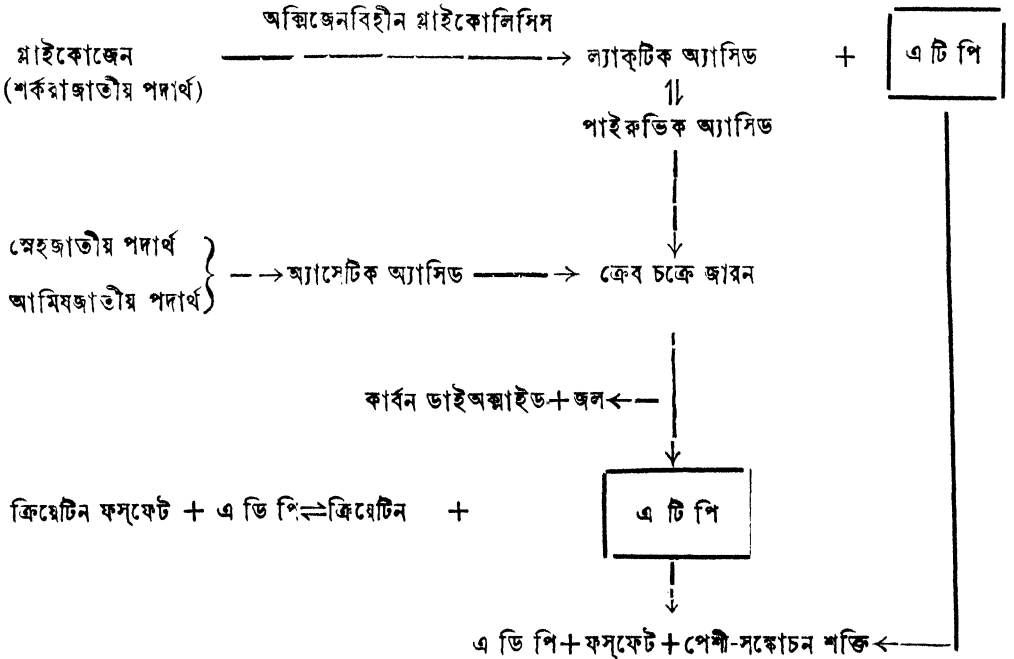
এ তো গেল শক্তির উৎসের কথা। এখন দেখতে হবে, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক শক্তির যোগসূত্রটি (Mechano-chemical coupling) কোথায়। ধরা যাক, টেবিলের উপর থেকে একটা কলম তুলতে

হবে হাতে করে। তার জন্যে হাতের পেশীগুলিকে সঙ্কুচিত করে আঙ্গুলগুলিকে বাঁকিয়ে কলমটা ধরা দরকার। এখন এ টি পি ভেঙ্গে গিয়ে এ ডি পি না হয় হলো, তার সঙ্গে খানিকটা শক্তিও পাওয়া গেল, কিন্তু সেই শক্তিটা কি ভাবে হাতের পেশী-গুলিকে সঙ্কুচিত করবে? এই রহস্য সমাধানের জন্যে সেণ্ট জর্জি ও তাঁর সহকর্মিগণ অনেক কাজ করেছেন। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন পেশীকে পরীক্ষা-নলে নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, মায়োসিন ও অ্যাক্টিন নামের দুটি প্রোটিন সঙ্কোচন-ক্রিয়ার জন্যে দায়ী। অনেকগুলি অ্যাক্টিন অণু এক হয়ে (Polymerised) তন্তুর মত এফ-অ্যাক্টিন তৈরী করে। তার জন্যেই দরকার হয় এ টি পি। সঙ্কোচনের সময় এফ-অ্যাক্টিন মায়োসিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এফ্-অ্যাক্টোমায়োসিন তৈরী করে। এই অ্যাক্টো-মায়োসিনের তন্তুগুলি সঙ্কোচনশীল। এগুলি লম্বায় ছোট হয় এবং প্রস্থের দিকে বাড়ে। তার ফলেই কোন কোন পেশী সঙ্কুচিত হয়। পেশীর বিশ্রামের সময় অ্যাক্টিন ও মায়োসিন আলাদা হয়ে যায়। অ্যাক্টোমায়োসিন তন্তু দ্বারা গঠিত প্রোটোফাইব্রিল-এর মধ্যে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক আধানের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, তার সঙ্গে সংবদ্ধ এ টি পি ও ম্যাগ্‌নেশিয়াম আয়নের ক্রিয়া—এই সব মিলে সমগ্র পেশীসঞ্চালন-প্রক্রিয়াটিকে পরিচালিত করে।

পেশীসঞ্চালন-ক্রিয়া এত জটিল যে, অনেক কিছু জানবার পরেও আজ পর্যন্ত অনেক কিছুই জানবার বাকী রয়ে গেছে। আসলে সঙ্কোচন-ক্রিয়া শুরু হয় কি ভাবে, ইচ্ছা করা মাত্র কি ভাবে কোন পেশীর সঙ্কোচন ঘটে, অর্থাৎ মানস-রাসায়নিক সংযোগটি (Psycho-chemical coupling) কোথায়, এ টি পি ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে উদ্ভূত তাপশক্তি কি ভাবে সঙ্কোচনের কাজে লাগে—ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে এখনও সঠিকরূপে কিছু জানা যায় নি।

নিউ ইয়র্কের জেনারেল ইলেকট্রিক রিসার্চ লেবরেটরীর ডাঃ উইলিয়াম ই. গ্লেন থার্মোপ্লাষ্টিক রেকর্ডিং পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে ২৪ খণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটেনিকার তথ্যাদি ২৩ মিনিটে একটি থার্মোপ্লাষ্টিক ফিতাতে রেকর্ড করা যায়। রেকর্ড করা ফিতা থেকে তথ্য ও ছবিগুলি (সাদা-কালো ও রঙীন) ছাপানো যায় এবং পূর্বের রেকর্ড মুছে ফেলে আবার নতুন রেকর্ড করা যায়।

মেদবৃদ্ধি ও তার প্রতিকার

শ্রীসতী রায়

মানুষমাত্রেই চায় তার দেহ সুন্দর ও সুস্থ হোক। স্বাস্থ্যই সকল সুখ ও সৌন্দর্যের মূল। বেশী কৃশতা যেমন অস্বাস্থ্যের লক্ষণ, তেমনি অধিক স্থূলতা ও মেদবৃদ্ধি স্বাস্থ্যহীনতার পরিচায়ক। মেদবৃদ্ধি বা অতিরিক্ত ওজন তো হামেশাই দেখা যায়। এই সমস্যা বড় কম নয়, কারণ মেদবৃদ্ধি শুধু সৌন্দর্যহানিই করে না, অনেক সময় শারীরিক সুস্থতার পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। শরীরের চাহিদার অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের জন্যে মেদবৃদ্ধি হয়, তাছাড়া অলস ও দিবা-নিদ্রাপ্রিয় লোকের অতিভোজনের জন্যে মেদের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। কোন ব্যক্তিকে তখনই স্থূলকায় বা মোটা বলা হয়, যখন তার দেহের প্রয়োজনীয়তার চেয়ে অধিক মেদ শরীরে সঞ্চিত হয়।

অতিরিক্ত ওজনের কারণ

(১) অতিভোজন—অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ফলে শরীরে মেদ বাহুল্য ঘটে। একে 'সিম্পল ওবেসিটি' বা সাধারণ মেদবাহুল্য বলে।

(২) আলস্য—আলস্যের জন্যে পেশীর কার্য-কারিতা হ্রাস পায়। অলস ব্যক্তিদের তাই অযথা মেদবৃদ্ধি হয়ে থাকে।

(৩) শরীরের গ্রন্থিসমূহের অস্বাভাবিকতার জন্য মেদবৃদ্ধি পায়।

(ক) যৌনগ্রন্থি কেটে দিয়ে দেখা গেছে যে, দেহের স্থূলত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে; দেহের কার্যক্ষমতার হ্রাসপ্রাপ্তিই এর কারণ বলে অনুমিত হয়।

(খ) থাইরয়েডজনিত মেদবৃদ্ধি—থাইরয়েডের ক্ষরণ হ্রাস পেলে শরীরের দহন-ক্রিয়াও হ্রাস পায়। দেহের সঞ্চয়ের সব কিছুই ক্রমশঃ জমে গিয়ে দেহকে স্ফীত করে তোলে।

(গ) পিটিউটারী—পিটিউটারীর ক্ষরণের অভাবে শরীরে স্নেহজাতীয় পদার্থের অস্বাভাবিক বণ্টন দেহকে মেদবহুল করে তোলে।

(ঘ) অগ্ন্যাশয়—অগ্ন্যাশয় থেকে ক্ষরিত ইনসুলিনের অতিক্ষরণের জন্যে যে মেদবৃদ্ধি ঘটতে দেখা যায়, তার কারণ হচ্ছে, ইনসুলিনের জন্যে অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া।

(ঙ) অ্যাড্রিন্যাল কর্টেক্স—এই গ্রন্থির অতি-ক্ষরণের জন্যে যে Cushing Syndrome দেখা দেয়, তাতে সর্বশরীর মেদে স্ফীত হয়ে পড়ে।

(চ) মস্তিষ্ক—মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত হাইপোথ্যালামাস ক্ষুধাবোধ নিয়ন্ত্রিত করে। কোন কারণে এই অংশের ক্ষতি হলে খুব বেশী ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ার জন্যে শরীরে মেদ বৃদ্ধি হয়।

এন্‌সেফালাইটিস-গ্রস্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত মস্তিষ্ক কিংবা মেরুস্নায়ুর মধ্যে টিউমার হওয়ার পর অপারেশনের সময় যদি হাইপোথ্যালামাস অতিক্রম করে যায়, তাহলে উপরিউক্ত কারণের জন্যে মেদের বাহুল্য দেখা যায়।

(৫) মানসিক কারণেও মেদবৃদ্ধি ঘটতে দেখা যায়। অনেক সময় উদ্দেশ্যহীন জীবনে স্ত্রীলোকেরা খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে অতিমাত্রায় মনোযোগী হয়ে পড়ে এবং অচিরেই তারা স্থূলাঙ্গী হয়ে ওঠে। আবার যে সব মহিলা স্ত্রী-পুরুষের মিলন অপছন্দ করে, তাদের অনেকে অতিভোজনে মনোযোগী হয়ে নিজেদের অসুন্দর করে তুলে পুরুষের আকর্ষণ থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা

করে। যে সব ব্যক্তি জীবনে প্রতারিত এবং অসুখী, যাদের জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে, তারা ভোজনের দিকে আকৃষ্ট হয়ে সব দুঃখ ভুলে থাকবার চেষ্টা করে এবং তার ফলে স্থূলাঙ্গ হয়ে পড়ে।

(৬) বৃদ্ধ বয়সে মানুষের দেহ সাধারণতঃ মেদবহুল হয়ে পড়ে। ৪০ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে সাধারণতঃ অনেকেরই দেহের ওজন বৃদ্ধির প্রয়াস দেখা যায়। এর কারণ হচ্ছে—অল্প ব্যায়াম, পেশীর 'টোন' ও গ্ল্যাণ্ডসমূহের কর্মক্ষমতার হ্রাসপ্রাপ্তি, বিশেষ করে যৌনগ্রন্থি ও থাইরয়েড গ্রন্থির ক্ষরণে প্রাচুর্যের অভাব।

(৭) মেদবৃদ্ধি বংশানুক্রমিকও হয় এবং এর দৃষ্টান্তও খুব বিরল নয়।

মেদবৃদ্ধির অপকারিতা

(১) অধিক পরিচ্ছদের প্রয়োজন হয়, ওঠা-বসা করতে অসুবিধা ও কষ্ট হয়।

(২) চেহারা নষ্ট হয় এবং সৌন্দর্যহানি ঘটে।

(৩) কর্মকুশলতা হ্রাস পায়, পেশীর শক্তি ক্ষয় হয়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং উচ্চাকাঙ্খা লোপ পায়।

(৪) দেহে অতিরিক্ত মেদ সঞ্চিত হওয়ার ফলে দেহের তাপনির্গম কম হয়; ফলে তাপ নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে প্রভূত পরিমাণে ঘাম হয়ে থাকে এবং তার ফলে শরীর থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

(৫) হৃৎপিণ্ড, রক্ত সংবহন-তন্ত্র, বৃক্ক ও অগ্ন্যাশয়ের রোগ দ্রুত প্রকাশ পায়।

(৬) সাধারণ লোকের চেয়ে স্থূলকায় ব্যক্তি-দের মধ্যে মধুমেহ রোগটি বেশী দেখা যায়।

(৭) মেদবহুল ব্যক্তিদের মধ্যে পাথরী রোগ খুব বেশী দেখা যায়। Bauman-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে স্থূলকায় ব্যক্তিদের শতকরা ৮৮ জনের পাথরী রোগ দেখা যায়।

(৮) স্থূলকায় ব্যক্তি কতকগুলি কারণে অস্ত্রোপচারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

(ক) তাদের ক্ষতসমূহ সহজে সংক্রামিত হয়ে থাকে।

(খ) স্থূলকায় ব্যক্তিদের মধ্যে Incisional Hernia অধিকাংশ সময়ে লক্ষ্য করা যায়।

(গ) এই ধরণের লোকের মধ্যে সহজেই থ্রম্বোএমবলিজিম (Thromboembolism) দেখা দেয়।

(ঘ) অস্ত্রোপচারের ফলে যে সব রোগে বিপদের সম্ভাবনা আছে, স্থূলকায় ব্যক্তি সে সব রোগে সহজে আক্রান্ত হয়ে পড়ে; যেমন—করোনারী ধমনীর রোগ, হৃৎপিণ্ডের শিরা-ধমনীর চাপাধিক্য ও বৃক্কের রোগ প্রভৃতি।

(৯) জীবনবীমা-পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ৩৫ বছর বয়সোত্তীর্ণ মেদবহুল ব্যক্তিদের মৃত্যুর হার, ঐ বয়সের শীর্ণ লোকের চেয়ে অনেক বেশী।

মেদের উপকারিতা

দেহে অতিরিক্ত মেদ জমা হওয়া খারাপ হলেও মেদশূন্য দেহ ভাল নয়। মেদ শরীরকে নরম রাখে, দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি করে, উপবাসের সময় সঞ্চিত মেদ দেহকে শক্তি দান করে, দেহের মধ্যে তাপ সংরক্ষণ করে এবং বৃক্ক ও অন্যান্য প্রধান প্রধান যন্ত্রের উপরে থেকে সেগুলিকে রক্ষা করে।

এখনকার দিনে স্থূলতা সৌন্দর্যের অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয় না, হয়তো কোন কালেই হতো না। রুবেন্‌স্ তাঁর চিত্রে যে সব দেবী ও সুন্দরীদের সৃষ্টি করেছিলেন, তারা এখনকার হলিউডের সুন্দরীদের সমকক্ষ না হলেও তাঁর সময়ের রুচির আদর্শরূপে পরিগণিত ছিল। এখনও প্রাচ্যের অনেক দেশে ও দ্বীপপুঞ্জে মোটা স্ত্রীলোকেরা সমাজে বেশী সমাদর লাভ করে থাকে।

মেদবৃদ্ধির চিকিৎসা

মেদ অপসারণের জন্যে নানারকম ওষুধ বাজারে পাওয়া যায়। এতে হয়তো অস্থায়ী কিছু উপকার পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু পরে এ-থেকে অনেক রকম জটিল অবস্থার উৎপত্তি হয়।

প্রচলিত ওষুধগুলির মধ্যে থাইরয়েড তন্তু বা তার গ্রন্থিনির্যাস অন্যতম। থাইরয়েড-নির্যাস ব্যবহারের ফলে দেহের দহনক্রিয়া বর্ধিত হয় ও দেহের স্থূলত্ব দূর হয়। অতিরিক্ত মাত্রায় থাইরয়েড ব্যবহারে বিপত্তির উদ্ভব হয়। এর ফলে ধমনীর দ্রুতগতি, হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন, হাত-পায়ের কম্পন, ঘর্মবৃদ্ধি, ক্লান্তি, জ্বর ও মধ্যে মধ্যে রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায়। অতিরিক্ত ভীতি ও নিদ্রালুতা দেখা দেয়; কাজেই চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিরেকে এসব জিনিষ ব্যবহার না করাই সঙ্গত। অনেকের মতে, থাইরয়েডের সত্যিকারের মেদ অপসারণের কোন ক্ষমতা নেই। যখন শুধু থাইরয়েডের কর্মক্ষমতা হ্রাসজনিত মেদবাহুল্য দেখা দেয়, তখনই থাইরয়েডের ব্যবহার ফলপ্রসূ হয়, নচেৎ বিপদের সম্ভবনা থাকে।

ব্যায়াম ও স্নানের দ্বারা মেদ অপসারণ

পেশী-সঞ্চালন ও কর্মবৃদ্ধিতে দেহের স্থূলতা হ্রাস পায়। পরিমিত ব্যায়ামে প্রায় ৫০০ ক্যালোরি ও কঠিন ব্যায়ামে প্রায় ১০০০ ক্যালোরির অতিরিক্ত প্রয়োজন হয়। ব্যায়ামে দেহের সঞ্চিত মেদ শক্তি সরবরাহ করে এবং শরীরকে যথাযথভাবে গড়ে তোলে। অতিরিক্ত পরিশ্রম, পর্যটন, রাত্রি জাগরণ ও চিন্তার ফলে স্থূলতা হ্রাস পায়।

পরিমিত ব্যায়ামই নিয়মিত অভ্যাস করা ভাল। অতিরিক্ত ব্যায়াম ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। ভ্রমণ, গল্‌ফ্ খেলা, সাঁতার কাটা, ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদি ওজন হ্রাসের প্রকৃষ্ট পন্থা। অন্ততঃ যাদের বয়স চল্লিশের ঊর্ধ্বে, তাদের পক্ষে। যদি হৃৎপিণ্ডের দোষ বা রক্তসংবহন-তন্ত্রের গোলযোগ থাকে, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শমত ব্যায়াম ইত্যাদি করা ভাল। বিশেষ বিশেষ স্থানের মেদ অপসারণের জন্যে বিশেষ বিশেষ ব্যায়াম আবশ্যক। সাধারণ ব্যায়ামের সঙ্গেই অবশ্য এগুলি থাকা উচিত।

ঠাণ্ডা জলে অবগাহন স্নান স্থূলকায় ব্যক্তির পক্ষে খুবই ভাল। এতে শরীরের বিপাক-ক্রিয়া বর্ধিত হওয়ার ফলে মেদ অপসারিত হয়। সমুদ্র-স্নান, অর্থাৎ লবণাক্ত জলে স্নান করলে সাময়িকভাবে ঘর্ম বৃদ্ধি হয়ে শরীরের জলীয়াংশ হ্রাস পায় এবং শারীরিক আয়তন অপেক্ষাকৃত কমিয়ে দেয়। এর ফলে কঠিন তন্তুর প্রকৃত পক্ষে কোন ক্ষয় সাধিত না হওয়ায় কিছু পরে শরীর প্রায় পূর্বের মতই হয়ে পড়ে।

মেদ-হ্রাসের জন্যে দেহমর্দন খুবই প্রয়োজনীয়। মর্দনে শরীরের সর্বত্র রক্তপ্রবাহ দ্রুত সঞ্চালিত হয়, পেশীর 'টোন' বাড়িয়ে তোলে এবং পরোক্ষভাবে শরীরের ব্যায়াম করবার শক্তিও বর্ধিত হয়। এর ফলে মেদ হ্রাস পেয়ে শরীর সুঠাম হয়।

মেদ-অপসারণে বিশেষ খাদ্যতালিকা নিরূপণ

দেহের মেদ অপসারণের জন্যে খাদ্যের পরিমাণ হ্রাসই হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়। এর জন্যে বিশেষ খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। হ্রাসপ্রাপ্ত তালিকা গঠনে কতকগুলি বিষয়ে নজর রাখতে হবে। যেমন—ক্যালোরির মান কম, এমন খাদ্যদ্রব্য, প্রোটিন-প্রধান খাদ্যদ্রব্য, মাঝামাঝি পরিমাণ, শর্করা, পরিমিত স্নেহ ও রুচিকর খাদ্য-দ্রব্যই তালিকায় থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া হাল্‌কা ধরণের ঝোল, চা, কফি, মাটাতোলা দুধ, টাট্‌কা ফল, সব্জি, মাংস ইত্যাদি তালিকাভুক্ত করা দরকার। ঘি, মাখন, মিষ্টান্ন, বাদাম ও বিশেষ শর্করা-প্রধান খাদ্যগুলি বর্জনীয়। একমাত্র

প্রোটিনের ভাগই এই তালিকায় বেশী থাকবে। কার্বোহাইড্রেট একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করা দরকার, কারণ দেহে শর্করার মাধ্যমে দহন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। শরীরের তন্তুসমূহে সঞ্চিত মেদ হ্রাস পায়; কারণ, শর্করার অভাবে মেদ ব্যয় হতে থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অক্সিডাইজ্‌ড্‌ হতে পারে না। কারণ মেদ শর্করার সহায়তায়ই শরীরে শক্তি প্রদানে সক্ষম হয়, কিন্তু শর্করার অভাব ঘটলে তা হতে পারে না। এই কারণে শরীরে আবার অম্লের প্রাচুর্য ঘটে এবং অ্যাসি-ডোসিস রোগ উৎপন্ন হয়। কাজেই খাদ্য-তালিকায় আলু, রুটি ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেটও কিছু পরিমাণে রাখতে হবে। স্নেহজাতীয় পদার্থ প্রায় বাদ দিলেও তালিকায় এর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকা আবশ্যক। তা না হলে স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলি সম্পূর্ণরূপে শোষিত হতে পারে না। তাছাড়া পরিমাণ বাড়াবার জন্যে প্রচুর সব্জির দরকার। তালিকাটিতে প্রচুর জল, পরিমিত ভিটামিন ও লবণ থাকবে। তালিকার খাদ্যদ্রব্য যাতে বেশ সুস্বাদু ও রুচিকর হয়, সেদিকে নজর রাখাও দরকার।

খাদ্য যখন শরীরের মধ্যে জীর্ণ হয়, তখন উত্তাপের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং শরীর তাথেকেই শক্তি পায়। খাদ্যকে মাপা হয় তার ঐ উত্তাপ উৎপন্ন করবার ক্ষমতা থেকে। একে বলা হয় খাদ্যের উত্তাপের পরিমাণ বা ক্যালোরি ভ্যালিউ।

স্থূলকায় ব্যক্তির খাদ্য-তালিকায় ক্যালোরির পরিমাণ প্রায় ১০০০ থেকে ১৮০০ ক্যালোরির মত থাকা উচিত।

হ্রাসপ্রাপ্ত খাদ্য-তালিকায় কত ক্যালোরি থাকবে, তা নির্ধারণ করবার পন্থা:

প্রথমতঃ জীবনধারণ করবার উপযোগী ক্যালোরি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই ক্যালোরি নির্ধারণ করা হয় ডুবয়েসের ফর্মুলা অনুসরণ করে, অন্যান্য নিয়ম অনুসারে এবং দৈনিক পরিশ্রমের অনুপাতে।

স্থূলকায় ব্যক্তির স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে ৪০০ থেকে ১০০০ ক্যালোরি কমিয়ে ফেলতে হবে তার দৈনিক গৃহীত ক্যালোরি থেকে।

দেহের এক আউন্স মেদ খাদ্যের ২৭১ ক্যালোরির সমান। যদি দৈনিক খাদ্য-তালিকা থেকে ৫০০ ক্যালোরি বাদ দেওয়া যায়, তাহলে দেহকে যথাযথভাবে রক্ষার জন্যে দেহের কিছু মেদ ব্যয় হয়ে সপ্তাহে ¾ পাউণ্ড, অথবা মাসে ৩ পাউণ্ড করে ওজন কমে যায়। যদি দৈনিক তালিকার ৭০০ ক্যালোরি থেকে কম গ্রহণ করা হয়, তাহলে সপ্তাহে ১ পাউণ্ড ও মাসে ৪ পাউণ্ড কমে। ১০০০ ক্যালোরি কম গ্রহণে সপ্তাহে ১ পাউণ্ড ৯ আউন্স বা প্রতিমাসে প্রায় ৬½ পাউণ্ড কমে। এভাবে হিসাব করে ইচ্ছামত যে কোন হারে ওজন কমিয়ে ফেলা যেতে পারে। প্রতি সপ্তাহেই ওজন নেওয়া উচিত।

স্থূলকায় ব্যক্তির শরীর স্বাভাবিক ওজনে ফিরে না আসা পর্যন্ত উপরিউক্ত খাদ্য-তালিকা চালু থাকা দরকার। স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে দেহের ওজন কিছু কম হওয়া উচিত। এই খাদ্য-তালিকায় শরীর যদি খুব দুর্বল বোধ হয়, তাহলে মধ্যে মধ্যে নিয়মের ব্যতিক্রম করা যেতে পারে। মেদবহুল শরীরের পক্ষে মাঝে মাঝে উপবাস খুবই হিতকর।

যাদের ওজন স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে সামান্য কিছু বেশী, যাদের রোগ-প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা কম এবং যারা দুর্বল, তাদের ওজন কমাবার দিকে ঝোঁক না থাকাই ভাল। যাদের গড়ন স্বভাবতঃই মোটা, তাদেরও ওজন কমাবার চেষ্টা করা উচিত নয়। অতিরিক্ত স্থূলকায় ব্যক্তি—যারা হৃৎপিণ্ড, কিড্‌নী কিংবা অন্যান্য গ্ল্যাণ্ডের গোলমালে পীড়িত, তাদের মেদ কমাবার ব্যবস্থা অবলম্বন করবার আগে সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

খাদ্যগ্রহণ অতিরিক্ত মাত্রায় কমিয়ে দিলে শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পেয়ে শরীরে নানারকম

গোলযোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে—হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রপাতির ক্রিয়ায় অক্ষমতা দেখা দেয়। দেহের ত্বক কুঁচ্‌কে যায় ও ত্বকের নীচেকার স্নেহজাতীয় পদার্থ দ্রুত অপসৃত হয়। সুতরাং তাড়াতাড়ি ওজন কমাবার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত। মাঝামাঝিভাবে খাদ্য-গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করে ধীরে ধীরে ওজন কমিয়ে স্বাভাবিক ও সুন্দর দেহ গড়ে তোলাই বিধেয়।

তিন আর একে চার

কমল সরকার

ছোটবেলা থেকেই তো আমরা যোগ শিখেছি, বিয়োগ শিখেছি। জীবনভোর প্রতিটি হিসাব-নিকাশে যোগ-বিয়োগ করে চলেছি। সুতরাং তিন আর একে যে চার হয়, একথা আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। এ-তো আমরা জানি অন্য ভাবেও, চার সংখ্যাটি গঠিত হতে পারে শুধু তিন আর এক দিয়ে নয়। কিন্তু আমাদের আজকের আলোচনায় অন্য হিসেব খাটবে না। এখানে শুধু তিন আর একে চার।

আমাদের আলোচনা জীব-বিজ্ঞান নিয়ে। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, জীব-জগতেও ছোটবেলায় শেখা যোগ-বিয়োগের খেলা চলছে। কত লোক রোজ মারা যাচ্ছে, আবার কতলোক জন্মাচ্ছে। কত জীব বংশবৃদ্ধি করে চলছে, আবার কত জীবের বংশ লোপ হয়ে গেছে। এই জীবন আর মৃত্যু, যোগ আর বিয়োগ—এই নিয়েই সৃষ্টি-সংসার।

তাই নতুন শিশু যখন জন্মায়, প্রাণী-জগতে তখন অত্যন্ত শুভলগ্ন। সেই শিশুকে অভ্যর্থনা জানাই আমরা নানা অনুষ্ঠান-উপচারে। দেবতার কাছে প্রার্থনা করি—শিশুর মঙ্গল, আর দীর্ঘায়ু। কারণ নতুন শিশুই তার পিতা, পিতামহ, মাতা, মাতামহের বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলি বহন করবে—ভবিষ্যতে সেগুলি সঞ্চারিত করে দেবে উত্তরাধিকারীদের রক্তের ভিতরে। এইভাবে বিগত দিনের মানুষ তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভাবীকালের মানুষের মধ্যেও বেঁচে থাকবে!

সুতরাং প্রত্যেকেরই জানবার আগ্রহ আছে যে, নতুন যে শিশুর জন্ম হলো, সে কতখানি তার পিতার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলছে, কতখানিই বা তার মাতার। কেন একটি ছেলে তার পিতার মত বা তার মাতার মত দেখতে হয়, কিংবা তাদের কারোর মত না হয়ে ঠিক তার দাদামশাইয়ের মত হয়? জীব-বিজ্ঞানের উত্তরাধিকার-তত্ত্ব এই রহস্য ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছে বৈজ্ঞানিক রীতিতে। এটিই আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়।

আজ থেকে প্রায় নব্বুই বছর আগে অষ্ট্রিয়ার এক খৃষ্টীয় মঠের যাজক মঠের বাইরে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে লক্ষ্য করলেন, নানারকমের সুইট পি-এর ফুল ফুটে রয়েছে। কি খেয়াল হলো তাঁর, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ফুলের গাছগুলি। দেখলেন—ফুলের যেমন নানা রকম রং আছে, নানা রকমের আকার বা বিভিন্ন সংখ্যার পাপড়ি আছে, ছোটবড় ভেদ আছে, গাছগুলিরও মধ্যেও তেমনি. চারিত্রিক গুণ হিসাবে—দু-ভাগ, দীর্ঘাকৃতির আর এক ভাগ খর্বাকৃতির গাছ আছে।

ছোট বেলায় ভাল ছাত্র ছিলেন তিনি

—নাম তাঁর গ্রেগর জন মেণ্ডেল। পড়বার ধারা, আর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে অধ্যাপকদের কাছে আদর ছিল তাঁর; কিন্তু জীবন বীণায় সুর বাজলো ভিন্ন তারে। সাহিত্য আর বিজ্ঞানের রাজ্য ছেড়ে মেণ্ডেল হলেন সন্ন্যাসী। আশ্রয় নিলেন ব্রুণ-এর খৃষ্টীয় মঠে। কিন্তু সব ছাড়লেও স্বভাব কি ছাড়তে পারে মানুষ! ছোট বেলার সেই তীব্র অনুসন্ধিৎসা, পৃথিবীর যা কিছু রহস্যে ঢাকা, তাকে মুক্তির আলোয় আলোকিত করে তোলবার স্পৃহা যাবে কোথায়? কোথায় পড়ে রইলো তপ-জপ-সাধনা। মেণ্ডেল মেতে উঠলেন সুইট-পি'র গাছগুলিকে নিয়ে।

এসব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গাছগুলির চারিত্রিক গুণ মেণ্ডেলের কাছে ধরা পড়লো। তিনি দেখলেন, বংশানুক্রমে এই গাছগুলি গুণ বা বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলে; অর্থাৎ খর্বাকৃতি গাছের বীজ থেকে খর্বাকৃতি গাছই জন্মায়, আবার দীর্ঘাকৃতি গাছের সন্তানসন্ততি পিতা-মাতার মতই দীর্ঘ হয়ে ওঠে। মেণ্ডেল জানতেন, গাছের বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে ফুল একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। ফুল থেকেই দেখা দেবে ফল, ফল থেকে আবার বেরিয়ে আসবে বীজ। তিনি ভাবলেন—খর্ব আর দীর্ঘ, এই দুই জাতের গাছের মিশ্রণ করলে কেমন হয়? তিনি স্থির করলেন, এ-ভাবের চারিত্রিক সংমিশ্রণ শুধু ফুলের মাধ্যমেই করা সম্ভব।

বছরের পর বছর যেতে লাগলো—বসন্ত এলে অসংখ্য সুইট-পি'র গাছে ভরে উঠলো অষ্ট্রিয়ার খৃষ্টীয় মঠের উদ্যান। সুদূর-প্রসারী আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে মেণ্ডেল লক্ষ্য করে চললেন, স্বহস্তে রোপিত গাছগুলিকে। এদের কয়েকটি গুণ বেছে নিয়ে সুরু করলেন হাতে-কলমে পরীক্ষা। গাছের দৈর্ঘ্য তাঁর মনে বেশী দাগ কেটেছিল বলেই এই নিয়ে কাজ সুরু করলেন আগে।

একটি খর্বাকৃতি আর একটি দীর্ঘাকৃতি, তাঁর পরীক্ষার গোড়ায় ছিল এই রকম চরিত্রের বিপরীত লক্ষণযুক্ত দুটি গাছ। এদের মধ্যে মিশ্রণ ঘটাতে হবে। পি অর্থাৎ মটরশুঁটির গাছের আবার একটা সমস্যা হচ্ছে—সাধারণ সব গাছের মতই ওদের ফুলগুলি উভলিঙ্গ এবং পুং-কেশর ও গর্ভকেশর, উভয়েরই প্রজনন ক্ষমতা আছে; অর্থাৎ খর্বাকৃতি গাছের বেলায় যেমন দুটি জননেন্দ্রিয়ই কার্যকরী, দীর্ঘাকৃতির ক্ষেত্রেও তেমনি। সে জন্যে তার প্রথম কাজ হলো—উভলিঙ্গ ফুলকে একলিঙ্গ ফুলে পরিবর্তিত করা; অর্থাৎ একটিকে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ও অপরটিকে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ ফুলে রূপান্তরিত করবার ব্যবস্থা করা। এর জন্যে দরকার—পুরুষ ফুলের রেণু নিয়ে খর্বাকৃতি স্ত্রী-ফুলে এবং কতকগুলি দীর্ঘাকৃতি গাছের ফুলকে স্ত্রী-ফুলে পরিবর্তিত করে খর্বাকৃতি গাছের রেণু নিয়ে পরাগ-সংযোগ করা।

পরাগ-সংযোগের ফলে ফুল থেকে ফলের উৎপত্তি হলো। ফল থেকে সাধারণ নিয়ম মেনেই বীজ গড়ে উঠলো। তারপর মেণ্ডেল এই বীজ থেকে গাছ উৎপাদন করলে। তখন দেখা গেল, সব গাছই দীর্ঘাকৃতির হয়েছে। মেণ্ডেল তো অবাক! সম্ভবতঃ তিনি আশা করেছিলেন যে, তাঁর হাতে তৈরী বীজের গাছ দীর্ঘাকৃতি ও খর্বাকৃতির মাঝামাঝি অবস্থায় থাকবে। অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হলো না। গাছের বেলায় কি তাহলে চারিত্রিক উত্তরাধিকার নেই!

মেণ্ডেলও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি এই নিজের হাতে গড়া দীর্ঘাকৃতি গাছের নাম দিলেন "মিশ্রিত দীর্ঘাকৃতি।" প্রকৃতপক্ষে এতে দীর্ঘ ও খর্বাকৃতির সংমিশ্রণ হয়েছে। এই 'মিশ্রিত দীর্ঘাকৃতি'র গাছগুলিও প্রাকৃতিক নিয়মে বেড়ে উঠলো। ফুলও সময়মত দেখা দিল এবং যথাসময়ে বীজ পৃথিবীর বুকে হাজির হলো। মেণ্ডেল এই মিশ্রিত দীর্ঘাকৃতির বীজগুলি সযত্নে রেখে দিলেন, সময়মত তা থেকে গাছ তৈরী করবার জন্যে।

অঙ্কুরোদ্গমের পর গাছ বেড়ে উঠতে লাগলো। মেণ্ডেলের মনে নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা।

এবার কিন্তু সবগুলি গাছই দীর্ঘকৃতির হয় নি। গাছগুলির মধ্যে গড়ে প্রতি ৪টি গাছের মধ্যে ৩টি হয়েছে দীর্ঘাকৃতি ও একটি খর্বাকৃতি।

এ যেন আর্কিমিডিসের 'ইউরেকা'রই' মত। অসম্ভব ও কল্পনাতীতকে হঠাৎ মুঠার মধ্যে পেয়ে গেছেন মেণ্ডেল।

এখানে আবার এসে পড়ছে সেই যোগ-বিয়োগের খেলা। দুটি লক্ষণ একটা গাছের মধ্যে সংযোজন করা হয়েছে সত্য, কিন্তু পরে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এভাবে যুক্ত আর বিযুক্ত হয়েই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্ভব হয়েছে। মেণ্ডেল সুরু করলেন এই যোগ-বিয়োগের মাধ্যমেই চারিত্রিক উত্তরাধিকার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং এর বৈজ্ঞানিক সূত্রের ব্যাখাও দিয়েছেন তিনি ঐ যোগ-বিয়োগের ফলাফলের উপর নির্ভর করেই।

মেণ্ডেলের যুগে বিজ্ঞানের এই শাখাটি শৈশব অবস্থায় ছিল। তাই সম্যকভাবে বুঝিয়ে বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবু বহুদিন আগে তিনি যা বলে গেছেন, তার খুব বেশী অদলবদল করা আজকের দিনেও সম্ভব হয় নি। তাঁর কথায়—

যদি একটি গাছের মধ্যে বিপরীত লক্ষণযুক্ত বিভিন্ন চরিত্রের সংমিশ্রণ ঘটানো যায়, তাহলে—

(১) দুটি চরিত্র একই সঙ্গে প্রথম বংশে প্রকাশ পায় না।

(২) একটি চরিত্র অপরটিকে চাপা দিয়ে প্রকাশ পায়।

(৩) চাপাপড়া চরিত্রটি নষ্ট হয় না—সুবিধামত তার বাহ্যিক অভিব্যক্তি ঘটে।

(৪) মিশ্রিত গুণযুক্ত বীজ প্রত্যেকে নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং এই বীজ তিন আর এক—এই অনুপাতে আত্মপ্রকাশ করে।

আজকের দিনে মেণ্ডেলের তিন আর এক অনুপাত নিয়ে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। মেণ্ডেলের দিনে অণুবীক্ষণ বা অন্যান্য যন্ত্রপাতির সুবিধা না থাকায় গাছের বাহ্যিক লক্ষণের উপর জোর দিতে হয়েছে। তাতে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হয় নি। বর্তমান জগতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি জীবের অন্তরে গিয়ে পৌঁচেছে। তাই বিজ্ঞানীরা জীব-কোষের আভ্যন্তরীণ গঠনের উপর জোর দিয়েছেন বেশী। ফলে সূত্র হয়েছে নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ। আজ আমরা চলে গেছি—পরাগ বা ডিম্বের যে প্রজনন-একক (gamete) থাকে, তার গঠন-বৈচিত্র্য ও কার্যকারিতার দিকে। প্রজনন-এককে রয়েছে ক্রোমোজোম ও তার উপর আছে জিন। এই জিনই হচ্ছে একক ধর্মের বংশানুক্রমিক ধারক ও বাহক।

এখন ধরা যাক, দুটি গাছ—দীর্ঘাকৃতি ও খর্বাকৃতি। যারা দীর্ঘাকৃতি তাদের 'ক ক' নামাঙ্কিত করা হলো, আর যারা খর্বাকৃতি তাদের 'খ খ' এই নাম দেওয়া গেল।

এই অঙ্কন থেকে দেখা যায়, বিভিন্ন গুণ-মিশ্রিত বীজে 'ক' এবং 'খ' পরস্পর পাশাপাশি আছে। এই মিশ্রিত গুণযুক্ত বীজ সব সময়েই দীর্ঘাকৃতির হয়।

এই বিপরীত ধর্মী দুটি গুণের মিশ্রণ এবং তাদের মধ্যে একটির বাহ্যিক প্রকাশের মধ্যে রয়েছে—কয়েকটি ঘটনা পারম্পর্য। দুটি গুণ বা চরিত্র বাইরে আত্মপ্রকাশে ব্যস্ত, কিন্তু বিপরীত ধর্মী বলে দুটি গুণের একই সময়ে একই গাছের মধ্যে প্রকাশ সম্ভব নয়। তাই তাদের মধ্যে চলে অন্তর্দ্বন্দ্ব—একে অপরকে চাপা দিতে চায়। ক্ষমতা যার বেশী সেই

তো অপরকে দাবিয়ে রাখতে পারে! সুতরাং পরাক্রমশালী চরিত্রটিই প্রকাশ পাবে, আর অপেক্ষাকৃত দুর্বল লক্ষণটি চাপা পড়ে যাবে; যথা:

মিশ্রণ দীর্ঘাকৃতি (স্ত্রী) মিশ্রণ দীর্ঘাকৃতি (পুং)
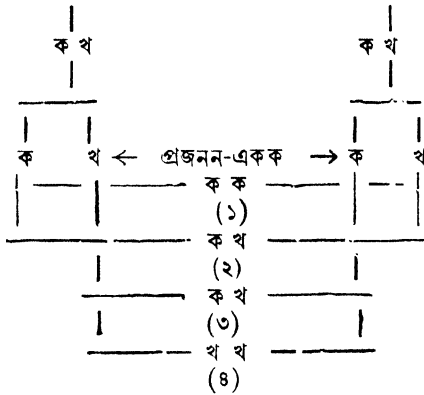
এখানে পুরুষ বা স্ত্রী গাছে—উভয় ক্ষেত্রেই মিশ্রিত গুণ বর্তমান। প্রজনন একক তৈরী হওয়ার সময় মিশ্রিত গুণ আর মিশ্রিত অবস্থায় থাকে না, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্বীয়ধর্ম বা গুণ নিয়ে গড়ে তোলে আপন আপন প্রজনন-একক। কিন্তু পরে প্রজনন-একক-এর মিলনে খুব অল্পক্ষেত্রেই স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বা বজায় থাকে; তবে ধীরে ধীরে তারা পৃথক হতে পারে।

উপরের অঙ্কনে দেখা যায়, ৪টি গাছের মধ্যে একটি হয়েছে খাঁটি দীর্ঘাকৃতি (১)। তার কোষের মধ্যে সেই একই উপাদান আছে, যা তার পূর্ব-পুরুষের ছিল। আর একটি হয়েছে সম্পূর্ণ খর্বাকৃতি তার পূর্বপুরুষের চরিত্র নিয়ে—(২)। মাঝখানে পড়ে রয়েছে—সেই মিশ্রিত গুণসম্পন্ন বীজ, যার পরবর্তী জীবনে সম্ভাবনা রয়েছে পৃথকীভূত হবার।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ৪টি গাছের মধ্যে যদিও ৩টি বাহিক দৃষ্টি ও আচরণে দীর্ঘাকার, তথাপি তাদের আভ্যন্তরীণ কোষের গঠন-বিন্যাসে তারা এক রকমের নয়।

এখন তাহলে মেণ্ডেলের সেই ৩:১ অনুপাত নিম্নরূপ দাঁড়ায়:
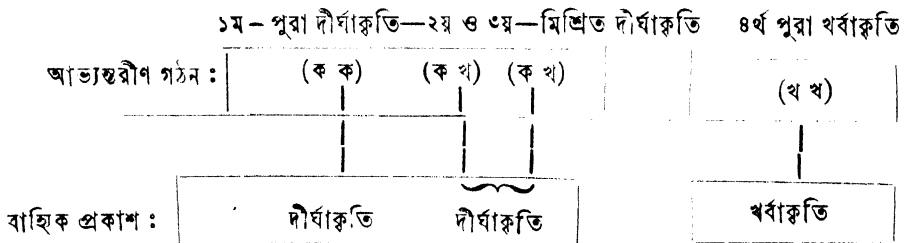
নব্বুই বছর আগেকার তিন আর একে চার—এতদিনের অধ্যবসায় ও সাধনার ফলে—তিন থেকে আর কিছুটা বিয়োগ কাটা হয়েছে এবং তাতে দাঁড়িয়েছে এক আর দুই-এ তিন এবং পরিশেষে সেই তিন আর একে চার।

সেমিকণ্ডাক্টর

শ্রীসরোজকুমার দে

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে সেমিকণ্ডাক্টর এক নবজাতক। সেমিকণ্ডাক্টরের নব-আবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রকার কার্যকারিতা ও গুণাগুণ তাত্ত্বিক ও ফলিত বিজ্ঞানে এক বিপুল সম্ভাবনার আলোকপাত করেছে। বৈদ্যুতিক কারিগরী বিষয়ে এতদিন আমরা দু-রকম বস্তুর কথা জেনে এসেছি—মেটাল বা ধাতু এবং ইনসুলেটর বা অন্তরক। ধাতু বিদ্যুৎ-পরিবাহী এবং ইনসুলেটর বিদ্যুৎ-অপরিবাহী; অর্থাৎ একটির মধ্য দিয়ে অতি সহজেই বিদ্যুৎ-শক্তি প্রবাহিত হতে পারে, আর অপরটিতে তা পারে না। পরিবাহী ও অপরিবাহী বস্তুর মাঝামাঝি আর একপ্রকার বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে, যা সহজলভ্য অথচ এতদিন নিষ্প্রয়োজনীয় বলে পরিগণিত হয়েছে। এই বস্তুর মাধ্যমে বিশেষ অবস্থায় বৈদ্যুতিক প্রবাহ সম্ভব—একে বলা হয় ঈষৎ পরিবাহী বস্তু বা সেমিকণ্ডাক্টর।

যাবতীয় বস্তুর গঠনের মূলে আছে পরমাণু। পরমাণুর মোটামুটি দুটি অংশ—নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রক, যা প্রোটন ও নিউট্রন কণিকার সমন্বয়ে গঠিত এবং কেন্দ্রকের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান প্রোটনের সমসংখ্যক ইলেকট্রন। ইলেকট্রনগুলি সাধারণ অবস্থায় এক একটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে (কেন্দ্রকের সবচেয়ে নিকটে অবস্থিত K-স্তরে ২টি, তারপর L-স্তরে ৮টি, M-স্তরে ১৮টি—ইত্যাদি) পর পর পারমাণবিক সংখ্যানুযায়ী অবস্থান করে। বহিস্তরে যে ইলেকট্রন থাকে, তাদের যোজ্যতা-ইলেকট্রন (Valency Electron) বলে এবং তারা অন্যান্য পরমাণুর ইলেকট্রনের সঙ্গে যোজ্যতা-বন্ধনীতে (Valency bond) আবদ্ধ হয়ে অণু ও পরে স্ফটিকের রূপ ধারণে সাহায্য করে। কোন বস্তুর বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা, রাসায়নিক ধর্ম ও আরও অন্যান্য জিনিষ এই বহিস্তরের ইলেকট্রনের কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে।

জার্মেনিয়াম ও সিলিকন সেমিকণ্ডাক্টরের কথা ধরা যাক। জার্মেনিয়াম বা সিলিকন পরমাণুকে বলা হয় চতুর্যোজী, অর্থাৎ এর বহিস্তরে চারটি ইলেকট্রন থাকে। এরা অন্যান্য একই প্রকার পরমাণুর ইলেকট্রনের সঙ্গে অদৃশ্য শক্তির মাধ্যমে যুক্ত হয়—যাকে বলা হয় যোজ্যতা-বন্ধনী এবং এভাবে স্ফটিকের রূপ ধারণ করে। একটা খাঁটি জার্মেনিয়াম স্ফটিকের বহিস্তরের চারটি ইলেকট্রনের প্রতিটি যোজ্যতা-বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত থাকে। এ-ক্ষেত্রে কোন মুক্ত ইলেকট্রনের অস্তিত্ব থাকে না এবং যেহেতু মুক্ত ইলেকট্রনই কোন বস্তুতে বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা সৃষ্টি করে, কাজেই স্ফটিকটি বিদ্যুৎ-পরিবাহী হয় না। এখন যদি কোন প্রকারে এই যোজ্যতা-বন্ধনী থেকে কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে মুক্ত হয়, তাহলে স্ফটিকটি বিদ্যুৎ-পরিবাহী হবে। এজন্যে শক্তির প্রয়োজন, যা জার্মেনিয়াম ধাতুর ক্ষেত্রে প্রায় ০·৭৫ ইলেকট্রন-ভোল্ট। সাধারণ উষ্ণতায় তাপীয় শক্তির প্রভাবে প্রত্যেকটি স্ফটিক-ল্যাটিসের সর্বদাই ইতস্তত: কম্পন হয়ে থাকে। এর ফলে কিছু ইলেকট্রন প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করে' যোজ্যতা-বন্ধনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং স্ফটিক-ল্যাটিসের মধ্যে ইতস্তত: বিচরণ করে থাকে; কারণ তারা স্ফটিকের কোন ইলেকট্রন বা কেন্দ্রকের দ্বারা আকর্ষিত বা বিকর্ষিত হয় না। এখন যদি এর উপর বাইরে থেকে বৈদ্যুতিক

ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয়, তাহলে মুক্ত ইলেকট্রন-গুলি ধন-তড়িদ্দ্বারের দিকে নিয়ন্ত্রিতভাবে চালিত হয়। একে ইলেকট্রন-বাহিত বিদ্যুৎ-প্রবাহ বলা হয়।

আবার যে ইলেকট্রন যোজ্যতা-বন্ধনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুক্ত হয়, সেটি স্ফটিকে একটি 'শূন্যস্থান' সৃষ্টি করে যায়, যাকে বলা হয় 'হোল্' (Hole)। এই অবস্থায় নিকটস্থ একটি ইলেকট্রন এসে শূন্যস্থানটি পূরণ করে। সুতরাং হোল্‌টি আর একটি স্থানে অবস্থান্তরিত হয়। আবার আর একটি ইলেকট্রন এসে হোল্‌টি পূর্ণ করে এবং এভাবে প্রক্রিয়াটি পর পর অগ্রসর হয়। সুতরাং একবার একটি হোল্ সৃষ্টি হলে সেটি মুক্ত ইলেকট্রনের মত স্ফটিকের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। 'হোল্' একটি ধন-তড়িৎবিশিষ্ট ইলেকট্রনের ন্যায় কাজ করে। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে হোল্‌গুলি ধন-তড়িদ্দ্বারের দিকে চালিত হয় এবং একে হোল্-বাহিত বিদ্যুৎ-প্রবাহ বলা হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, একটা খাঁটি বা 'ইন্‌ট্রিন্সিক' সেমিকণ্ডাক্টরে ইলেকট্রন ও হোল্—এই দু'প্রকার বাহকের দ্বারা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সর্বদাই সমসংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন ও হোল্ বিরাজ করে এবং তাদের সংখ্যা উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু মূল সেমিকণ্ডাক্টরের সঙ্গে খুব সামান্য পরিমাণ অন্য কোন ধাতু খাদ (impurity) হিসাবে (প্রতি দশ লক্ষ জার্মেনিয়াম পরমাণুর সঙ্গে একটি মাত্র অন্য পরমাণু) মিশ্রিত করলে সেমিকণ্ডাক্টরে ইলেকট্রন বা হোল্ কারেণ্টের বাহকের ঘনত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়। ফস্‌ফরাস, অ্যাণ্টিমনি বা আর্সেনিক—এই পঞ্চযোজী পরমাণুর কথা ধরা যাক। এসব পরমাণুগুলি জার্মেনিয়ামের পরমাণুর প্রায় সমান আকারের এবং এরা জার্মেনিয়াম পরমাণুর দখলীকৃত স্থানে অবস্থান করতে পারে। ইমপিউরিটি পরমাণুর সংখ্যা অতি অল্প হওয়ার দরুণ এর প্রতিটি জার্মেনিয়াম পরমাণুর দ্বারা ঘেরা থাকে। তখন নিকটস্থ চারটি জার্মেনিয়াম পরমাণু পাঁচটি যোজ্যতা-ইলেকট্রনের চারটির সঙ্গে যোজ্যতা-বন্ধনীতে যুক্ত হয়, কিন্তু পঞ্চম যোজ্যতা-ইলেকট্রনটি একাকী পড়ে থাকে। এটিকে মূল ইমপিউরিটি পরমাণু থেকে সামান্য শক্তির দ্বারাই বিচ্ছিন্ন করা যায় (জার্মেনিয়ামের ক্ষেত্রে এই শক্তি হলো ০'০১ ই. ভো.)। তখন মুক্ত পঞ্চম যোজ্যতা-ইলেকট্রনটি স্ফটিকের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। কিন্তু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে ধন-তড়িদ্দ্বারের দিকে নিয়ন্ত্রিতভাবে চালিত হয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে।

ইমপিউরিটি পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হলে পরমাণুটি ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়। এই ধনাত্মক আয়ন নিশ্চল; কারণ এটি পার্শ্বস্থ জার্মেনিয়াম পরমাণুর সঙ্গে চারটি যোজ্যতা-বন্ধনীর দ্বারা সংযুক্ত থাকে এবং সে জন্যে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না। যেহেতু এই ইমপিউরিটি পরমাণু মুক্ত ইলেকট্রন সৃষ্টি বা দান করে, সেহেতু তাদের 'ডোনার' বা দাতা বলা হয়। যে সেমিকণ্ডাক্টরে 'ডোনার' থাকে তাকে n-type বা ঋণাত্মক সেমিকণ্ডাক্টর বলা হয় এই কারণে যে, 'ডোনার' ঋণাত্মক আধান-যুক্ত বাহক মুক্ত ইলেকট্রন দান করে।

আবার যদি ইমপিউরিটি পরমাণু ত্রিযোজী হয়, যেমন—বোরন, গ্যালিয়াম, ইনডিয়াম বা অ্যালুমিনিয়াম—তাহলে সেমিকণ্ডাক্টরে 'হোল্' বিদ্যুৎ-প্রবাহের বাহক হিসাবে কাজ করে। এ-ক্ষেত্রে নিকটস্থ তিনটি জার্মেনিয়াম পরমাণু ত্রিযোজী পরমাণুর তিনটি যোজ্যতা-ইলেকট্রনের সঙ্গে যোজ্যতা-বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত হয়। জার্মেনিয়াম অপেক্ষা ত্রিযোজী পরমাণুর একটি ইলেকট্রন কম থাকে। এই ইলেকট্রন-শূন্য স্থানটিও অর্থাৎ হোল্‌টি পার্শ্বস্থ জার্মেনিয়াম পরমাণু থেকে

এসে পূরণ করে। এভাবে প্রক্রিয়াটি অগ্রসর হয় এবং হোল্‌টি স্ফটিকের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হলে হোল্‌টি ঋণ-তড়িদ্দ্বারের দিকে বাহিত হয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে। এ-ক্ষেত্রে ইমপিউরিটি পরমাণু একটি ইলেকট্রন আহরণ করবার দরুণ ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয় এবং বিদ্যুৎ-পরিবাহিতায় অংশ গ্রহণ করে না। এই ইমপিউরিটি পরমাণুকে গ্রহীতা বা 'অ্যাক্‌সেপ্টর' বলা হয়। যে সেমিকণ্ডাক্টরে অ্যাক্‌সেপ্টর থাকে, তাকে p-type বা ধনাত্মক সেমিকণ্ডাক্টর বলা হয়; কারণ অ্যাক্‌সেপ্টর ধনাত্মক আধানের সমতুল্য 'হোল্‌' এই বিদ্যুৎ-বাহককে দান করে।

মেটাল, ইনসুলেটর ও সেমিকণ্ডাক্টরের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কোয়াণ্টাম তত্ত্বের সাহায্যে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, একটি পরমাণুর কেন্দ্রকের বিভিন্ন কক্ষে ইলেকট্রন আবর্তন করে। এই কক্ষগুলিকে বলা হয়, 'এনার্জি লেভেল' এবং প্রতিটি কক্ষে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ শক্তিবিশিষ্ট ইলেকট্রন বিরাজ করতে পারে। পাউলি তাঁর সুবিখ্যাত 'এক্সক্লুশন প্রিন্সিপল'-এর সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, একই এনার্জি লেভেলে কখনও বিপরীত স্পিন্‌ (spin) বিশিষ্ট দুটির অধিক ইলেকট্রন অবস্থান করতে পারে না। সাধারণ অবস্থায় একটি পরমাণুতে তার ইলেকট্রনগুলি নিম্নতর এনার্জি লেভেলে অবস্থান করে এবং উচ্চতর এনার্জি লেভেলগুলি অপূর্ণ অবস্থায় থাকে। এখন যদি একই প্রকার অধিক সংখ্যক পরমাণুকে (যেমন—একটি কঠিন পদার্থ) খুব কাছাকাছি আনা যায়, তাহলে তাদের ইলেকট্রন-কক্ষগুলির মধ্যে একটি পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে এনার্জি লেভেলগুলি দুটি ঈষৎ ভিন্ন শক্তিসম্পন্ন ব্যাণ্ড বা পটির সৃষ্টি করে। নিম্নতর ব্যাণ্ডটি সাধারণতঃ ইলেকট্রনের দ্বারা পূর্ণ থাকে এবং উচ্চতর ব্যাণ্ডটি সম্পূর্ণ খালি থাকে। উভয় ব্যাণ্ডের মধ্যের ফাঁকটি একটি শক্তি নির্দেশ করে। একটি পূর্ণ ব্যাণ্ডে কোন মুক্ত ইলেকট্রন বা হোল্‌ থাকে না; অর্থাৎ প্রতিটি যোজ্যতা-ইলেকট্রনই যোজ্যতা-বন্ধনীতে আবদ্ধ থাকে। সে জন্যে পদার্থটি বিদ্যুৎ অপরিবাহীর কাজ করে। এখন যদি পূর্ণ ব্যাণ্ডের কোন ইলেকট্রন তাপীয় কম্পন, বহিরাগত আলোক-শক্তি বা অন্য কোন প্রকারে প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করে, তাহলে ইলেকট্রনটি মুক্ত হয়ে পূর্ণ ব্যাণ্ড থেকে ফাঁকটুকু লাফিয়ে অপূর্ণ-ব্যাণ্ডে চলে যায়। তখন মুক্ত ইলেকট্রনটি অপূর্ণ ব্যাণ্ডে অতি সহজেই ঘোরা-ফেরা করতে পারে এবং বিদ্যুৎ-পরিবাহিতায় অংশ গ্রহণে সক্ষম হয়। একই সঙ্গে নিম্নতর ব্যাণ্ডটি একটি ইলেকট্রন হারাবার দরুণ সেখানে একটি হোলের সৃষ্টি হয়, যা সেই ব্যাণ্ডে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে পারে ও বিদ্যুৎ-পরিবহনে অংশ গ্রহণ করে।

কোন পদার্থে উপরিউক্ত ফাঁকটুকুর শক্তি বেশ অধিক হলে (যেমন—৫ বা ১০ ভোল্ট) খুব কম ক্ষেত্রেই ইলেকট্রন অপূর্ণ ব্যাণ্ডে লাফিয়ে যেতে পারে। সেই পদার্থটি ইনসুলেটরের কাজ করে। যদি ঐ শক্তি এক ভোল্ট বা তারচেয়ে কম হয়, তাহলে যথেষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন ফাঁকটি লাফিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং পদার্থে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা সৃষ্টি করে। এরূপ বস্তুকে সেমিকণ্ডাক্টর বলা হয়। যেমন, জার্মেনিয়াম ও সিলিকনের ক্ষেত্রে এই শক্তি যথাক্রমে ০·৭৫ ভোল্ট ও ১·১২ ভোল্ট।

ইম্‌পিউরিটি মিশ্রিত সেমিকণ্ডাক্টরে 'ডোনার' একটা অন্তরিত (isolated) এনার্জি লেভেলের কাজ করে। এটি অপূর্ণ ব্যাণ্ডের এত কাছাকাছি থাকে যে, ডোনার থেকে একটা ইলেকট্রন অপূর্ণ ব্যাণ্ডে যেতে খুব কম শক্তির প্রয়োজন হয়। একইভাবে, 'অ্যাক্‌সেপ্টর' পূর্ণ ব্যাণ্ডের অতি কাছাকাছি অবস্থিত অন্তরিত এনার্জি লেভেলের

কাজ করে এবং অ্যাক্সেপ্টর থেকে পূর্ণ ব্যাণ্ডে একটি ইলেকট্রন যেতে খুব কম শক্তির প্রয়োজন হয়।

মেটাল বা ধাতুর ক্ষেত্রে পূর্ণ ও অপূর্ণ ব্যাণ্ড পরস্পর অধিক্রম (overlap) করে থাকে, যার ফলে কোন শক্তি ব্যয় না করেই ইলেকটন পূর্ণ ব্যাণ্ড থেকে অপূর্ণ ব্যাণ্ডে যেতে পারে। এজন্যে ধাতু খুব বেশী পরিমাণে বিদ্যুৎ-পরিবাহী হয়।

বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার সেমিকণ্ডাক্টর বহুবিধ ব্যবহারিক কার্যে প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধাতব পদার্থ অপেক্ষা সেমিকণ্ডাক্টর কল্পনাতীতভাবে কার্যকরী। উষ্ণতার পরিমাপ নির্ধারণ, তাপীয় শক্তিকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিতকরণ, উত্তপ্ত ও শীতলীকরণে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার, পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহকে অপরিবর্তী প্রবাহে রূপান্তরিতকরণ, উচ্চ-কম্পনাঙ্কের বেতার-তরঙ্গ উৎপাদন ও পরিবর্ধন, বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তির একীকরণ, শব্দকে বৈদ্যুতিক-শক্তিতে রূপান্তরিতকরণ, বৈদ্যুতিক শক্তিকে শব্দে রূপান্তরিকরণ, অতিবেগুনী রশ্মিকে সাধারণ আলোকে পরিবর্তন, এক বর্ণের আলো-কে অন্য বর্ণের আলোতে রূপান্তরিতকরণ, সূর্যরশ্মি ও পরমাণু শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিতকরণ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অনুঘটকের কাজ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপারে সেমিকণ্ডাকটর অশেষ কার্যকারিতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে।

থারমিষ্টর

উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন সেমিকণ্ডাক্টরের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সেমিকণ্ডাক্টরের এই ধর্মকে তাপমান যন্ত্র নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে। এই তাপমান যন্ত্র, অর্থাৎ থারমিষ্টর নির্মাণে সাধারণ থার্মো-মিটারের ন্যায় অ্যালকোহল বা পারদ জাতীয় কোন পদার্থ ব্যবহৃত হয় না। একটা ফিলামেণ্ট, ছোট বল বা প্লেটের আকারের সেমিকণ্ডাক্টরের দুটি পার্শ্ব ধাতব তারের দ্বারা যুক্ত করা থাকে। তার দুটির একটিকে গ্যালভ্যানোমিটার ও অপরটিকে ব্যাটারীর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ঠাণ্ডা অবস্থায় সেমিকণ্ডাকটরটির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের মাত্রা কম থাকে, কিন্তু তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং থারমিষ্টরের রোধ নির্ণয় করে এর উষ্ণতা মাপা যায়, অর্থাৎ এটি তাপমান যন্ত্রের কাজ করে। থারমিষ্টরের সাহায্যে -৭০° সে. থেকে ২৫০° সে. পর্যন্ত খুব সূক্ষ্মভাবে তাপমাত্রার পরিমাপ সম্ভব। বর্তমান যুগে বড় বড় কারখানা, হাসপাতাল, বিজ্ঞানাগার, ফলমূল রাখবার বৃহদাকারের ষ্টোর, ইন্‌কিউবেটর প্রভৃতির মধ্যে থারমিষ্টর রেখে একটি মাত্র স্থান থেকে স্বয়ংক্রিয় পন্থায় উষ্ণতা নির্ণয় করা হচ্ছে। যন্ত্রপাতির সূক্ষ্ম অংশের তাপ নিয়ন্ত্রণ, ভূ-গর্ভের উষ্ণতা, আকাশে ভাসমান মেঘের উষ্ণতাও থারমিষ্টরের সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব।

থারমো-ইলেক্‌ট্রিক জেনারেটর বা তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র

১৮২১ সালে সিবেক আবিষ্কার করেন যে, যদি পৃথক ধাতুনির্মিত দুটি তারের দু'দিক সংযুক্ত করে একটা দিক ঠাণ্ডা রেখে অপর দিকটা উত্তপ্ত করা যায়, তাহলে সেই তারের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় থারমোকাপল। কিন্তু ধাতুনির্মিত থারমো-কাপলে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির কিছুটা আবার তাপীয় শক্তিতে পরিণত হয়; তাছাড়া তাপের বেশ কিছুটা অংশ তাপীয় পরিবাহিতার মাধ্যমে বাহিত হওয়ার দরুণ কোন কাজে লাগে না। সুতরাং তাপীয় শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরের হার কম হয়। কিন্তু সেমিকণ্ডাক্টরের ক্ষেত্রে এই হার অনেক বেশী। ধাতুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সব উষ্ণতাতেই, এমন কি—অ্যাবসলিউট জিরো বা চরম

শূন্য ডিগ্রিতেও মুক্ত ইলেকট্রনের অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু অ্যাবসলিউট জিরোতে একটা সেমিকণ্ডাক্টর ইন্‌সুলেটর হিসাবে কাজ করে এবং উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, তাতে মুক্ত ইলেকট্রন বা হোলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যে ক্ষেত্রে ধাতুনির্মিত থারমোকাপলে প্রতি ডিগ্রি উষ্ণতার পার্থক্যের জন্যে ১০^{-৫} ভোল্টেরও কম তাপীয়-তড়িচ্চালক বল (Thermo-electromotive force) উৎপন্ন হয়, সে ক্ষেত্রে সেমিকণ্ডাক্টর থারমোকাপলে হয়ে থাকে ১০^{-৩} ভোল্ট অপেক্ষাও অধিক।

পূর্বে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক সেমিকণ্ডাক্টরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঋণাত্মক ও ধনাত্মক সেমিকণ্ডাক্টরের একটা দিক উত্তপ্ত করলে তাদের অপর দিকগুলি যথাক্রমে ঋণ ও ধন-তড়িতাধান-যুক্ত হয়। এরূপ দু'প্রকার সেমিকণ্ডাক্টর একটি ধাতুর পাতের দ্বারা যুক্ত করে একটি থারমোকাপল তৈরী হয় এবং এই ধাতুর পাতটি উত্তপ্ত করলে সেমিকণ্ডাক্টর দুটির অপর দিকগুলি ঠাণ্ডা জল বা বাতাস দিয়ে শীতল করা হলে, সে স্থলে যথাক্রমে ঋণ ও ধন তড়িতাধানের সমাবেশ হবে। সেমিকণ্ডাক্টর দুটির উভয় দিকের উষ্ণতার পার্থক্য যত বৃদ্ধি পাবে, তড়িতাধানের পরিমাণও তত বেশী হবে। সুতরাং সেমিকণ্ডাক্টরদ্বয়ের এই ঋণ ও ধন-তড়িৎবিশিষ্ট দিক দুটি ধাতব তারের সাহায্যে সংযুক্ত করলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হবে। সেমিকণ্ডাক্টর থারমোকাপলের কর্মদক্ষতা শতকরা সাত ভাগেরও বেশী—যে স্থলে ধাতু-নির্মিত থারমোকাপলের কর্মদক্ষতা শতকরা ০'৫ ভাগ মাত্র। বেশী ভোল্টেজের প্রয়োজন হলে কয়েকটি সেমিকণ্ডাক্টর থারমোকাপলকে পর পর শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত করে অধিক বিদ্যুৎ-প্রবাহের জন্যে সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করা হয়।

তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র নির্মাণে এমন সেমিকণ্ডাক্টর ব্যবহার করা হয়, যার বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা অধিক এবং তাপীয় পরিবাহিতা কম। এ-রকম কয়েকটি সেমিকণ্ডাক্টর শ্রেণীবদ্ধভাবে সমান্তরালে যুক্ত করে যদি একটি কেরোসিন বাতির চিম্‌নির চতুষ্পার্শ্বে এমনভাবে স্থাপন করা হয়, যাতে তার ভিতরের দিকটা চিম্‌নির তাপ ও গরম গ্যাসে উত্তপ্ত হয় এবং বাইরের দিকটা ঘরের বাতাসের দ্বারাই শীতল থাকে, তাহলে প্রায় ২৫° থেকে ৩০০° পর্যন্ত উষ্ণতার পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে যে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে, তার দ্বারা রেডিও, বৈদ্যুতিক মোটর চালানো যেতে পারে—এমন কি, ফ্লোরেসেন্ট আলোও জ্বালানো যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলে, যেখানে বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যায় না, সেখানে এরূপ 'তাপ-বিদ্যুৎ-উৎপাদন' ব্যবস্থা খুবই কার্যোপযোগী হবে।

সেমিকণ্ডাক্টর যে দিন পর্যাপ্ত পরিমাণে সহজলভ্য হবে, সে দিন বিদ্যুৎ-শক্তি বিভিন্ন উপায়ে উৎপন্ন করা যাবে। ব্লাষ্ট-ফার্নেস বা কারখানার চিম্‌নি যদি ইটের পরিবর্তে সেমিকণ্ডাক্টরের দ্বারা নির্মিত হয়, তাহলে ফার্নেস বা চিম্‌নির ভিতরের দিকটা উত্তপ্ত ও বাইরের দিকটা বাতাসের দ্বারা শীতল রাখবার ব্যবস্থা হলে যা উষ্ণতার পার্থক্য হবে, তাতেই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে। এমন কি, মোটর ইঞ্জিন থেকে নির্গত উত্তপ্ত গ্যাসকেও সেমিকণ্ডাক্টরের মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতে উত্তপ্ত গেসিয়ার, উষ্ণ-প্রস্রবণ ও সূর্যের তাপ থেকেও এভাবে বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ

ফরাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী পেল্‌তিয়ার ১৮৩৪ সালে 'সিবেক এফেক্টের' অনুরূপ আর একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। সিবেক প্রক্রিয়ায় থারমোকাপলের এক দিক গরম ও অপর দিক ঠাণ্ডা করলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। পেল্‌তিয়ার আবিষ্কার করেন যে, যদি ঐ থারমোকাপলে বিদ্যুৎ

প্রবাহিত করা যায় (সিবেক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহের একই দিকে), তাহলে থারমোকাপলের এক দিক শীতল ও অপর দিক উত্তপ্ত হয় (সিবেক প্রক্রিয়ার গরম দিকটা ঠাণ্ডা ও ঠাণ্ডা দিকটা গরম হয়) ; অর্থাৎ 'পেলতিয়ার একেক্ট' ঠিক 'সিবেক এফেক্টের' বিপরীত প্রক্রিয়া। বিদ্যুৎ-প্রবাহের দিক পরিবর্তন করলে শীতল ও উত্তপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াও দিক পরিবর্তন করে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, এই পেল্‌তিয়ার প্রক্রিয়াও ধাতুনির্মিত থারমোকাপল অপেক্ষা সেমিকণ্ডাক্টর থারমোকাপলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুত ও অধিকতর কার্যকরী হয়।

পেলতিয়ার প্রক্রিয়াকে বর্তমানে কৃত্রিমভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কার্যে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হচ্ছে। কয়েকটি সেমিকণ্ডাক্টর থারমোকাপলকে পর পর সজ্জিত করে তার মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহিত করলে তার এক দিক শীতল হবে ও অপর দিকে উত্তাপের সৃষ্টি হবে। সাধারণ রেফ্রিজারেশন বা এয়ার-কণ্ডিসনিং-এর ক্ষেত্রে, যেমন—পাম্প, মোটর ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয়, এ-ক্ষেত্রে তা হয় না। আবার বিদ্যুৎ-প্রবাহের দিক পরিবর্তন করে প্রয়োজন অনুযায়ী ঠাণ্ডার স্থলে উত্তাপের সৃষ্টি করাও যেতে পারে। সুতরাং বাড়ীঘর, কারখানা, সিনেমা হাউস ইত্যাদি শীত ও গ্রীষ্মে একই ব্যবস্থায় যথাক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা করা যেতে পারে। আজকাল সেমিকণ্ডাক্টর নির্মিত রেফ্রিজারেটরও তৈরী করা হচ্ছে। সেমিকণ্ডাক্টরের মাধ্যমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সহজ ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য।

ফটোইলেকট্রিক বা আলোক-তড়িৎ সেল

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন কোন পরমাণুর নিজস্ব তাপীয় শক্তির দরুণ অনেক ক্ষেত্রে ইলেকট্রন মুক্ত হয়। উপরন্তু বহিরাগত আলোক শক্তি বা শক্তিশালী বেন্দ্রক কণিকার আপতনে উচ্চ শক্তি আহরণের ফলে ইলেকট্রন মুক্ত হয়। আলোক-তরঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফটোনের সমন্বয়ে গঠিত, যার প্রতিটির শক্তি হলো $E=h\nu$, যেখানে E=শক্তি (ইলেক্‌ট্রন ভোল্ট), h=প্লাঙ্কের ধ্রুবক, ν=প্রতি সেকেণ্ডে আলোক-তরঙ্গের কম্পনাঙ্ক। কয়েক প্রকার সেমিকণ্ডাক্টর আছে; যেমন, ক্যাডমিয়াম সালফাইড, থ্যালিক সালফাইড, লেড সালফাইড, লেড সেলেনাইড, লেড টেলুরাইড ইত্যাদি, যাদের ইলেক্‌ট্রন মুক্ত করতে এক ইলেক্‌ট্রন ভোল্টের কয়েক শতাংশ মাত্র শক্তির প্রয়োজন হয়। এই ইলেক্‌ট্রনগুলি সেমিকণ্ডাক্টরের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা বহুগুণ বর্ধিত করে। অনেক ক্ষেত্রে ইনফ্রা-রেড রশ্মির প্রভাবেও এই পরিবাহিতার বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। এমন কি, বহুদূরে অবস্থিত কোন উত্তপ্ত বস্তুর বিকিরণও সেমিকণ্ডাক্টরের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়। এছাড়া আল্‌ফা, বিটা, ও গামা-রশ্মি, প্রোটন, ডয়টেরন ইত্যাদি কণিকা সেমিকণ্ডাক্টরে অধিক সংখ্যায় মুক্ত ইলেক্‌ট্রন সৃষ্টি করতে ও সঙ্গে সঙ্গে তার বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

আলোক-শক্তির বলে অনেক সময় ইলেক্‌ট্রন পরমাণু থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। একে বলে 'বহিঃস্থ আলোক প্রক্রিয়া' (External photo-effect)। যেখানে আপতিত আলোক-শক্তির ফলে মুক্ত ইলেক্‌ট্রনগুলি বিচ্ছিন্ন না হয়ে বস্তুর বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা বৃদ্ধি করে, তাকে 'অন্তঃস্থ আলোক প্রক্রিয়া' বলে। এই অন্তঃস্থ আলোক প্রক্রিয়া বর্তমানে চলচ্চিত্রের ফিল্মে শব্দ-ধারণে প্রয়োগ করা হয়। আলোক-তড়িৎ সেল বর্তমানে বিবিধ কার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন বই ছাপাবার কাজ, যাতে ছাপবার সময় কোন পৃষ্ঠা বাদ না পড়ে; কারখানায় কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা, অন্ধ ব্যক্তিদের পড়বার যন্ত্র নির্মাণ ইত্যাদি কাজ। আকৃতি ও বর্ণানুযায়ী বস্তুর গণনা ও বাছাইয়ের কাজ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় এই সেলের সাহায্যে অতি সুন্দর ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায়।

সুপারসনিক বা উচ্চ-কম্পনের শব্দ উৎপাদন

কয়েক প্রকার সেমিকণ্ডাক্টর বৈদ্যুতিক শক্তিকে শব্দ-শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। দেখা গেছে, কোয়ার্টজ্ স্ফটিককে যদি সঙ্কুচিত করা যায়, তাহলে তার দু'দিকে বিপরীত-ধর্মী বৈদ্যুতিক আধানের সৃষ্টি হয়। আবার স্ফটিককে প্রসারিত করলেও বিপরীত-ধর্মী বৈদ্যুতিক আধানের সৃষ্টি হয়, কিন্তু পূর্বের ঠিক বিপরীতভাবে। একে বলা হয় 'পিয়েজো ইলেকৃট্রিক'। এখন যদি স্ফটিকটির উভয় পার্শ্ব পর্যায়ক্রমে ঋণ ও ধন তড়িতাধান-যুক্ত করা যায়, তাহলে স্ফটিকটিও পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হবে। এর ফলে স্ফটিকের আশেপাশের বাতাসে সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে শব্দ উৎপন্ন হবে। স্ফটিকের অনুনাদ কম্পনাঙ্কের সমহারে যদি তার উভয় পার্শ্বে উচ্চ-কম্পনাঙ্কের পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রয়োগ করা হয়, তাহলে উচ্চ-কম্পনাঙ্কের শব্দ উৎপন্ন হবে। এই কাজে রোসেল সল্ট, বেরিয়াম টাইটানেট ইত্যাদি সেমিকণ্ডাক্টর খুবই কার্যকরী।

বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, ভবিষ্যতে মানুষের কণ্ঠস্বরকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত করা যাবে এবং এই বিদ্যুৎ-শক্তিকেই মাইক্রোফোন, টেলিফোন ইত্যাদিতে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

ফটো-সেল

ফটো-সেল হলো এমন এক বস্তু, যা আলোক-শক্তিকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। পূর্বে ঋণাত্মক বা ইলেকট্রন-পরিবাহী ও ধনাত্মক বা হোল্-পরিবাহী, এই দু'প্রকার সেমিকণ্ডাক্টরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই দু'প্রকার সেমি-কণ্ডাক্টর বা একটি ধাতু ও একটি সেমিকণ্ডাক্টরের মিলনের ফলে সম্পূর্ণ অন্যরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। একটি ইলেকট্রন-পরিবাহী জার্মেনিয়াম স্ফটিকের উপর একফোটা ইণ্ডিয়াম প্রয়োগ করা হলে ইণ্ডিয়াম জার্মেনিয়াম স্ফটিকের মধ্যে সামান্য প্রবিষ্ট হয়ে একটা হোল্-পরিবাহী স্তর সৃষ্টি করে। এই ইলেকট্রন-পরিবাহী ও হোল্-পরিবাহী স্তরের সংযোগ-স্থলে একটা সূক্ষ্ম স্তর উৎপন্ন হয়—যাকে বলা হয় প্রতিবন্ধক-স্তর।

ফটো-সেল নির্মাণে এই প্রতিবন্ধক-স্তর ও প্রয়োজনমত তড়িদ্দ্বারের সাহায্য নেওয়া হয়। ধরা যাক, এরূপ ইলেকট্রন ও হোল্-পরিবাহী সেলেনিয়ামের সংযোগ-স্থলে একটি প্রতিবন্ধক-স্তর সৃষ্টি করা হলো। এই সেলেনিয়ামটিকে একটি ইস্পাত নির্মিত পাতের উপর রেখে সেলেনিয়ামের উপরি-ভাগে সোনার একটি পাত্‌লা আবরণ দেওয়া হলো। এভাবে নির্মিত ফটো-সেলের উপর আলোক-শক্তি প্রয়োগ করলে ইলেকট্রন-পরিবাহী সেমিকণ্ডাক্টরের কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে সোনার স্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং তাকে ঋণ-তড়িৎসম্পন্ন করে। ইলেকট্রন-পরিবাহী সেমিকণ্ডাক্টরে ইলেকট্রন মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কিছু সংখ্যক হোল্ উৎপন্ন হয় এবং সেগুলি প্রতিবন্ধক-স্তর ভেদ করে হোল্-পরিবাহী সেলেনিয়ামে প্রবিষ্ট হয়। এই হোল্‌গুলি ইস্পাতের পাত্‌কে ধন-তড়িৎসম্পন্ন করে। এখন এই ইস্পাতের পাত্ ও সোনার পাত্‌লা স্তরটির সঙ্গে একটি গ্যালভ্যানোমিটার যুক্ত করলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের অস্তিত্ব প্রদর্শন করবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আলোক-তড়িৎ সেলের ন্যায় ফটো-সেলের ক্ষেত্রে কোন বহিঃস্থ বিদ্যুৎ-প্রবাহের প্রয়োজন হয় না। ফটো-সেলের তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে সৌর-ব্যাটারী নির্মিত হচ্ছে, সিলিকন, জার্মেনিয়াম, অ্যাণ্টিমনি ইত্যাদি ব্যবহারের দ্বারা। দেখা গেছে, একবর্গ মিটার পরিমিত ফটো-সেলের উপর উজ্জ্বল সৌরালোক পড়লে প্রায় ১২০ ওয়াট পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। তবুও বর্তমানে সৌরশক্তির শতকরা দশ-বারো ভাগ মাত্র বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আরও উন্নত ধরণের

ফটো-সেল একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করবে। একটা বাড়ীর ছাদে ছয়বর্গ মিটার পরিমিত ফটো-সেল রাখলে সব রকমের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারবে এবং ফলে আলো জ্বালানো, রন্ধন, রেডিও, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদির কাজে ঐ বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহার করা যাবে। এমন কি, মোটরের ছাদের উপর ফটো-সেল রেখে দিলে সূর্যালোকে বিদ্যুৎ-শক্তি সঞ্চয়কে (accumulator) সঞ্চয় করে রেখে প্রয়োজনমত ব্যবহার করাও যাবে। বর্তমানে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহে এই সৌর-ব্যাটারীর ব্যবহার হচ্ছে।

আর এক ধরণের সেমিকণ্ডাক্টর আছে, যা আলোয় রেখে দিলে সেই আলোক-শক্তি সঞ্চয় করে রেখে দিতে পারে, যতক্ষণ না তাতে সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়। অতএব ভবিষ্যতে সহর ও গ্রামের রাস্তায় এমন আলোর ব্যবস্থা হবে, যা দিনের বেলায় সূর্যালোকের শক্তি সঞ্চয় করে রাখবে এবং আঁধার নামবার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য বিদ্যুৎ-প্রবাহের বলে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

ট্র্যানজিষ্টর

আজকাল ঘরে বাইরে ট্র্যানজিষ্টর-রেডিওর খুব প্রচলন হয়েছে। ট্র্যানজিষ্টর সেমিকণ্ডাক্টরেরই এক বিশেষ রূপ, যা রেডিও-ভাল্‌ভের অনুরূপ কাজ করে। সাধারণ ইলেক্‌ট্রনিক ভাল্‌ভ, যা বেতার-যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়—বেশী নাড়াচাড়া করলে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। উপরন্তু ভাল্‌ভের ক্যাথোডকে গরম করবার জন্যে একটা বাড়্‌তি বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন হয়। তাছাড়া অতি সূক্ষ্ম গঠনের জন্যে ভাল্‌ভের আকৃতি ছোট করবারও বিশেষ অসুবিধা। বাড়ীতে ব্যবহারের জন্যে রেডিও বা টেলিভিশনে ভাল্‌ভের আকার বড় কি ছোট, তাতে বিশেষ কিছু আসে-যায় না। কিন্তু এরোপ্লেন, রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্যে বেতার-যন্ত্র আকার ও ওজনে যত কম অথচ শক্তিশালী হবে, ততই তার উপযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। ট্র্যানজিষ্টর এই অসুবিধা দূরীকরণে যুগান্তর এনেছে।

ডায়োড বা দ্বিপদী, ট্রায়োড বা ত্রিপদী প্রভৃতি ইলেক্‌ট্রনিক ভাল্‌ভের যা কাজ, অর্থাৎ বেতার-তরঙ্গ নির্ধারণ (Detection), একমুখীকরণ (rectification), বিবর্ধন (amplification), স্পন্দন উৎপাদন (oscillation) প্রভৃতি সেমিকণ্ডাক্টর-নির্মিত ট্র্যানজিষ্টর করতে সক্ষম। উপরন্তু এতে অ্যানোড, ক্যাথোড বা গ্রিডের কোন পৃথক পৃথক অস্তিত্ব নেই। এমন কি, এ-ক্ষেত্রে সাধারণ ভাল্‌ভের মত ক্যাথোডকে গরম করবার জন্যে বাড়্‌তি কোন বিদ্যুৎ-শক্তিরও প্রয়োজন হয় না।

বেতার-যন্ত্রের প্রাথমিক অবস্থায় বেতার-তরঙ্গ নির্ণয়ে স্ফটিকের ব্যবহার হতো। তখন স্ফটিকের উপরিভাগে কোন সুগ্রাহী (Sensitive) স্থানে একটা সূচালো ধাতু স্থাপন করে বেতার-তরঙ্গকে একমুখী করা সম্ভব হয়।

উল্লিখিত p-টাইপ ও n-টাইপ—এই উভয় প্রকার সেমিকণ্ডাক্টরের সংযোগ স্থলে যে প্রতিবন্ধক-স্তরের সৃষ্টি হয়, তার সাহায্যেও একমুখীকরণ সম্ভব। এরূপ সংযোগ-স্থলে কোন ইলেকট্রন বা হোল্‌ থাকে না বললেই হয়। একটা ইলেকট্রনকে n-টাইপ সেমিকণ্ডাক্টর থেকে pটাইপ-সেমিকণ্ডাক্টরে বা একটি হোল্‌কে p-টাইপ থেকে n-টাইপ সেমিকণ্ডাক্টরে অবস্থান্তরিত করতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে প্রতিবন্ধক-শক্তি (barrier energy) বলে। সাধারণ অবস্থায় বাইরে থেকে কোন ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় না, তখন তাপীয় শক্তির প্রভাবে মুক্ত ইলেকট্রন p-টাইপ থেকে n-টাইপে বা হোল্‌ n-টাইপ থেকে p-টাইপ সেমিকণ্ডাক্টরে সংযোগ-স্থল ভেদ করে অবাধে যেতে পারে।

এখন যদি p-টাইপ সেমিকণ্ডাক্টরটিকে n-

টাইপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধনাত্মক তড়িৎ-যুক্ত করা হয়—যাকে বলে 'ফরওয়ার্ড বায়াস'—তাহলে p-টাইপ সেমিকণ্ডাক্টরের হোল্ ও n-টাইপ সেমিকণ্ডাক্টরের ইলেকট্রনগুলি সংযোগ-স্থলের খুব কাছাকাছি এসে জড়ো হয়। এর ফলে প্রতিবন্ধক-স্তরের বেধ হ্রাস পায়—সুতরাং রোধও হ্রাস পায়; কাজেই তখন সেমিকণ্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে অনেক বেশী পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। আবার 'রিভার্স বায়াসে' হোল্ ও ইলেকট্রনগুলি সংযোগ-স্থল থেকে দূরে সরে যায়। তার ফলে প্রতিবন্ধক-স্তরের রোধ বৃদ্ধি পায় ও বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিমাণও হ্রাস পায়। এখন যদি এরূপ n-p সেমিকণ্ডাক্টরের দু'দিকে পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রয়োগ করা হয়, তাহলে প্রতিবন্ধক-স্তর পর্যায়ক্রমে একবার বৃদ্ধি পাবে ও একবার হ্রাস পাবে। এর ফলে ঐ স্তরের রোধও পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে ও হ্রাস পাবে। তখন সেমিকণ্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পর্যায়ক্রমে খুব অল্প ও খুব বেশী হবে। এভাবে সেমি-কণ্ডাক্টরটি পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহকে একমুখী করে সমপ্রবাহে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়। এরূপ n-p সেমিকণ্ডারক্টরকে 'জংসন-ডায়োড' বলা হয়।

জংসন-ডায়োডের আরও উন্নত সংস্করণ হলো সেমিকণ্ডাক্টর বা ট্র্যানজিষ্টর। ট্র্যানজিষ্টর মোটামুটি দু-প্রকার—পয়েণ্ট কন্ট্যাক্ট ও জংসন-ট্র্যানজিষ্টর। জংসন-ট্র্যানজিষ্টর ঠিক একটা স্যাণ্ডউইচের মত—মাঝে থাকে ০.১ মিলিমিটার পরিমিত বেধের একটি p-টাইপ সেমিকণ্ডাক্টর এবং দু-পাশে দুটি n-টাইপ সেমিকণ্ডাক্টর যুক্ত থাকে (n-p-n)। বিপরীতভাবেও, অর্থাৎ মাঝে n-টাইপ ও দু-পাশে p-টাইপ সেমিকণ্ডাক্টর যুক্ত করা যায় (p-n-p)। মাঝের অংশটিকে বলা হয় 'বেস্' এবং দু-পাশের একটিকে 'এমিটার' ও অপরটিকে 'কলেক্টর' বলা হয়। এমিটার ক্যাথোড ও কলেক্টর অ্যানোডের কাজ করে। 'এমিটার—বেস' এবং 'বেস—কলেক্টর' দুটি জংসন-ডায়োডের ন্যায় কাজ করে। একটি ট্র্যানজিষ্টরে বেসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমিটারকে ফরওয়ার্ড ও কলেক্টরকে 'রিভার্স বায়াসে' যুক্ত করা হয়। অর্থাৎ n-p-n ট্রানজিষ্টরে বেসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমিটারকে ঋণাত্মক ও কলেক্টরকে ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত করা হয় (p-n-p ট্র্যানজিষ্টরে এর বিপরীতভাবে)। জংসন-ট্র্যানজিষ্টর এমনভাবে তৈরী করা হয়, যাতে কলেক্টরে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা বেসের চেয়ে কম ও বেসের পরিবাহিতা এমিটারের চেয়ে কম হয়। ট্র্যানজিষ্টর বিবর্ধক ও অসিলেটরের কাজ করতে পারে।

পয়েণ্ট কন্ট্যাক্ট ট্র্যানজিষ্টরে একটি n-টাইপ সেমিকণ্ডাক্টর স্ফটিকের উপর দুটি সূচালো টাংষ্টেন তার খুব কাছাকাছি রাখা হয়। টাংষ্টেন তার দুটির ঠিক নীচেই p-টাইপ সেমিকণ্ডাক্টর থাকে। দুটি তারের একটিকে 'এমিটার' ও অপর-টিকে 'কলেক্টর' এবং স্ফটিকটিকে 'বেস্' বলা হয়। অর্থাৎ সব কিছু মিলিয়ে জিনিষটি একটি জংসন-ট্রায়োডের ন্যায় কাজ করে। বর্তমানে আরও উন্নত ধরণের p-n-i-p জংসন-ট্রায়োড ট্র্যানজিষ্টর ও জংসন-টেট্রোড নির্মিত হয়েছে।

অতি ক্ষুদ্র আকারের সেমিকণ্ডাক্টর ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভের ন্যায় গুণসম্পন্ন হওয়ার দরুণ বেতার-যন্ত্রকে আকারে ছোট করায় অনেক অসুবিধা দূর হয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে বেতার-যন্ত্রের অন্যান্য আনুসঙ্গিক বস্তু, অর্থাৎ অ্যাণ্টিনা, আবেশ কুণ্ডলী, কণ্ডেন্সার ইত্যাদিও আকারে যথাসম্ভব ছোট করা প্রয়োজন। এই ব্যাপারেও সেমিকণ্ডাক্টর সাহায্য করেছে। ফেরাইট নামক এক বস্তু (অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক ইত্যাদির অক্সাইড) সামান্য চৌম্বক ক্ষেত্রেও অত্যন্ত দ্রুত চৌম্বকিত হতে পারে এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চৌম্বকত্বও দ্রুত পরিবর্তিত হয়। সাধারণতঃ ট্র্যান্স-ফরমার কোর, তড়িৎ-চুম্বক ইত্যাদিতে যেখানে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োজন, সেখানে

আয়রন, কোবাল্ট, নিকেল প্রভৃতি ফেরোম্যাগনেটিক বস্তু ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহের ক্ষেত্রে ফেরোম্যাগ্‌নেটিক বস্তু ব্যবহার করলে দেখা যায়, 'হিস্‌টেরিসিস্‌' ও 'আবিষ্ট ফুকো-কারেন্টের' জন্যে বেশ খানিকটা শক্তি ক্ষয় হয় এবং তার ফলে অযথা তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে। পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহের কম্পনাঙ্ক ও বস্তুর বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা বৃদ্ধির সঙ্গে ঐ শক্তিক্ষয়ও বৃদ্ধি পায়। সে জন্যে উচ্চ-কম্পনাঙ্কের বিদ্যুৎ-তরঙ্গের ক্ষেত্রে ফেরোম্যাগ্‌নেটিক পদার্থ বিশেষ কার্যকরী হয় না। কিন্তু ফেরাইটের আপেক্ষিক রোধ (Specific resistance) অধিক এবং উচ্চ কম্পনাঙ্কের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে সামান্য মাত্র আবিষ্ট ফুকো-কারেন্টের সৃষ্টি করে—সে জন্যে শক্তিক্ষয়ও হয় কম। বর্তমানে ফেরাইট-নির্মিত তারের দ্বারা একটি পেন্সিল বা দেশলাই কাঠির ন্যায় ক্ষুদ্র আকারের অ্যান্টিনা তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। উপরন্তু ট্র্যানস্‌ফরমার, নিরোধ (choke), কুণ্ডলী ইত্যাদির কোর হিসাবে ফেরাইট ব্যবহার করলে সুন্দরভাবে কাজ করে এবং সেগুলিকে অতি ক্ষুদ্র আকারে নির্মাণ করাও সম্ভব।

এছাড়া, রোসেল সল্ট নামক সেমিকণ্ডাক্টর স্ফটিক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে দ্রুত বিদ্যুৎ-শক্তি আহরণ করতে পারে। সে জন্যে কণ্ডেন্সারের ডাই ইলেকট্রিক হিসাবে বাতাসের পরিবর্তে রোসেল সল্ট ব্যবহার করে দেখা গেছে, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে কণ্ডেন্সারের আধান কয়েক হাজার গুণ বৃদ্ধি পায়।

আজকাল পকেট ডায়েরী বা তার অপেক্ষাও ছোট আকারের ট্র্যানজিষ্টর-রেডিও নির্মিত হচ্ছে। এই রেডিওতে যে ব্যাটারী ব্যবহার করা হয়, তার আকারও খুব ছোট। বর্তমানে অ্যাটমিক ব্যাটারীও তৈরী করা সম্ভব হয়েছে—যা বিশ বছর পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য থাকতে পারে। একটা সেমিকণ্ডাক্টর স্ফটিকে বিশেষ ব্যবস্থায় ইলেকট্রনিক ও 'হোলি' অবস্থার সৃষ্টি করে তার উপর স্ট্রনসিয়াম ধাতুর একটা পাত্‌লা স্তর প্রয়োগ করা হয়। স্ট্রনসিয়াম-নির্গত ইলেকট্রন সেমিকণ্ডাক্টর থেকে সহস্র সহস্র বিদ্যুৎ-পরিবাহী মুক্ত ইলেকট্রন উৎপন্ন হয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে। আমেরিকায় একপ্রকার 'ট্র্যানজিষ্টর সোলার রেডিও' সিগারেট কেসের আকারে নির্মিত হয়েছে, যা সূর্যের আলোয় কিছুক্ষণ রেখে দিলে অন্ধকারেও পাঁচ শত ঘণ্টা পর্যন্ত কার্যক্ষম থাকে।

ছোট ছোট আকারের বেতার-গ্রাহক যন্ত্র, প্রেরক যন্ত্র, টেলিভিসন অদূর ভবিষ্যতে অধিক প্রচলিত হবে, আশা করা যায়। একটা 'ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটিং মেসিন' নির্মাণে সহস্রাধিক ভাল্‌ভের প্রয়োজন হয়, উপরন্তু এক বিরাট জায়গা জুড়ে থাকে এই যন্ত্র। ভবিষ্যতে সেমিকণ্ডাক্টর এই যন্ত্র নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে, যার ফলে এই যন্ত্র স্থাপনের জন্যে সামান্য স্থানই লাগবে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে সুন্দরভাবে কাজ করবে।

সেমিকণ্ডাক্টর বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে এক নতুন দিকের সন্ধান দিয়েছে। একদিন যে সেমিকণ্ডাক্টর বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিদ্যায় নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলে গণ্য হতো, আজ সেখানে সেমিকণ্ডাক্টর গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। আজও সেমিকণ্ডাক্টর সম্বন্ধে সব কথা জানা সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানের এই নবজাতকের অন্তঃস্থলে যে অভাবনীয় সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তা অনাগত ভবিষ্যতে ক্রমে ক্রমে উদ্ঘাটিত হবে এবং তার ফলে ব্যবহারিক বিজ্ঞান সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে।

আবহাওয়া-পর্যবেক্ষক পোত

কে. রামপেভিন

কৃষ্ণসাগরে প্রভাত হইয়াছে।

গবেষণা-জাহাজ "ওয়াই. এম. শোকাল্‌স্কি" ঢেউ তুলিয়া ক্রিমিয়ার উপকূল হইতে যাত্রা করিল।

ওয়াই. এম. শোকাল্‌স্কির সম্মুখের ডেকে একটি রকেট নিক্ষেপের প্যাড আছে। আবহাওয়া সম্পর্কিত এই রকেটের মোচাকৃতি অগ্রভাগে সংযুক্ত
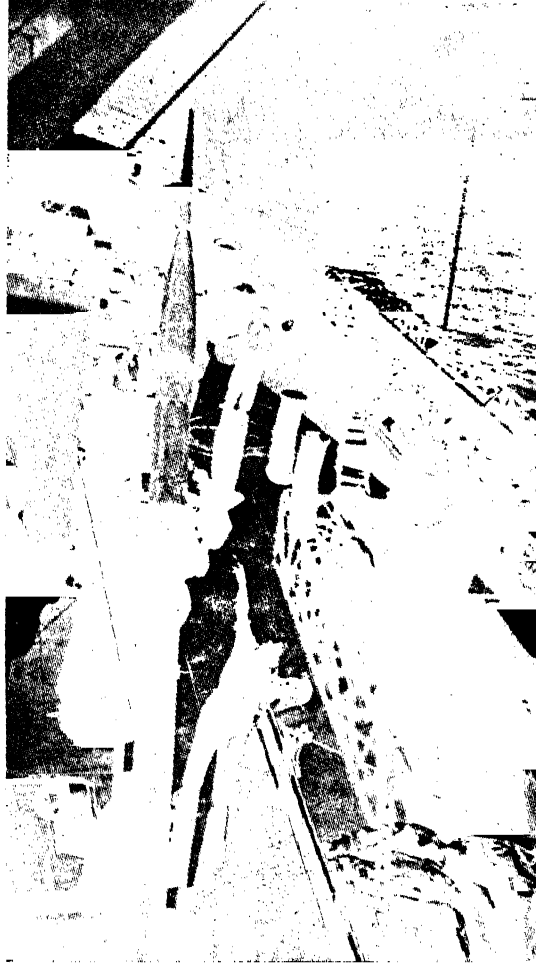
আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী জাহাজের মালপত্র রাখিবার জায়গা হইতে রকেটটিকে জাহাজের ডেকের উপর আনা হইয়াছে।

সোভিয়েটের নূতন আবহাওয়া-পর্যবেক্ষক জাহাজের ইহা প্রথম সমুদ্রযাত্রা। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের জন্য এই জাহাজ ষোলটি গবেষণাগারে সুসজ্জিত।

যন্ত্রগুলি ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চাকাশের আবহাওয়ার সন্ধান দিতে পারে।

জাহাজের রেডিও ব্যবস্থায় ঘোষিত হইল—

"রকেট ছুঁড়িবার ব্যবস্থা কর।"

ডেকের নীচে মালপত্র রাখিবার জায়গাটার ঠিক মাঝখানে বিশেষ ফ্রেমে শায়িত রকেটের ধারকটির গায়ে মোচাকৃতি অগ্রভাগের যন্ত্রগুলি আসিয়া লাগিল। ইহারা বায়ুমণ্ডলের উপর হইতে সঙ্কেত পাঠাইবে; সেখানকার বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপের পরিবর্তন এবং সৌর-বিচ্ছুরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি তাহারা জনসাধারণকে জানাইয়া দিবে।

কুড়ি কিলোমিটার-ব্যাপী আর একটি উষ্ণমণ্ডল; সেখানকার তাপ শূন্যের ১৫° সি. উর্ধ্বে। আমাদের এই গ্রহের অদ্ভুত আবরণ "ওজোন" এই ভাবেই কাজ করিয়া থাকে। ওজোনের আবরণ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে অতিবেগুনী রশ্মি হইতে রক্ষা করে। এই আবরণ যদি অপসৃত হয়, তাহা হইলে আমাদের এই গ্রহ কয়েক মিনিটের মধ্যে ঝল্‌সানো মরুভূমিতে পরিণত হইবে।
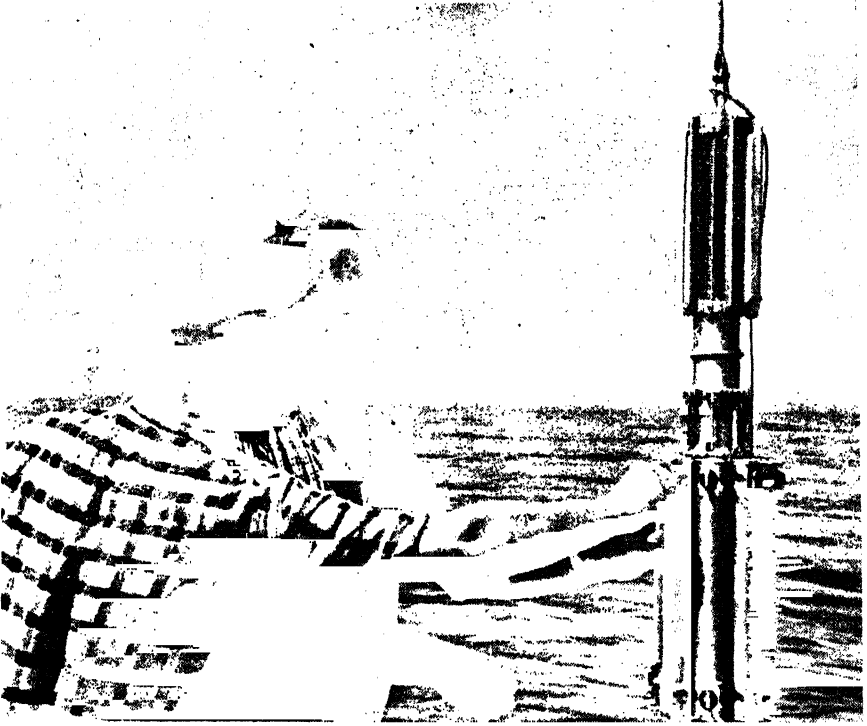
আবহাওয়া-পর্যবেক্ষণকারী জাহাজের দুইজন গবেষণা-কর্মী সমুদ্র-জলের নমুনা পরীক্ষা করিতেছেন।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন যে, পর্যবেক্ষক-রকেটের সাহায্যে জানা গিয়াছে পৃথিবী পরিবেষ্টনকারী বায়ুর চাপ, উচ্চতা অনুসারে যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়।

প্রথমে তাপ আস্তে আস্তে কমিতে থাকে—ভূ-পৃষ্ঠে শ্বাস-প্রশ্বাসের যে উষ্ণতা, তাহা আর বোঝা যায় না। উহার পরবর্তী হিমমণ্ডলে পারা-৫৫° অথবা-৬৫° সেন্টিগ্রেডে নামিয়া যায়। তাহার পর

রকেটের নাবিকেরা দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে কাজ করিল। রকেটটি এখন প্রস্তুত।

সিগারের মত ইহার দীর্ঘ দেহটি ধীরে ধীরে ফ্রেমের উপরে তুলিবার পর সামনের ডেকে নেওয়া হইল।

আর ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই রকেটটি ছোঁড়া হইবে। রকেটের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির সুইচ

ঘুরাইয়া দেওয়া হইল। বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শেষবার সেগুলি পরীক্ষা করিলেন। নিক্ষিপ্ত হইবার পনেরো মিনিট পূর্বে রকেটটি প্যাডের উপর স্থাপিত হইল।

রকেট নিক্ষিপ্ত হইতে আর পাঁচ মিনিট বাকী। নিক্ষেপকারী যন্ত্রটি ধীরে ধীরে উঠিয়া নভোবিন্দুর দিকে সংস্থাপিত হইল।

স্বরযন্ত্রটি গণনা করিতে আরম্ভ করিল, হুসিয়ার! রকেট নিক্ষিপ্ত হইতে আর এক মিনিট বাকী। ত্রিশ সেকেণ্ড! পনেরো সেকেণ্ড—রেকর্ড ঠিক কর।

ইহা হইল রকেটের যন্ত্রপাতির সঙ্কেতগুলি অসিলোস্কোপের মধ্য দিয়া ফিল্মের উপর রেকর্ড করিবার আদেশ।

"পাঁচ সেকেণ্ড ··দুই···এক···ছোঁড়ো!"

কুণ্ডলীকৃত ধূমে আবৃত জাহাজের অগ্রভাগ হইতে কর্ণপটহ-বিদারী গর্জন শোনা গেল। অগ্নি-গোলকটি উচ্চ আকাশে উঠিতেছে। ঐ নীল আকাশে রকেটটি দেখা যাইতেছে।

রেডারের বিশাল ধাতব রিফ্লেক্টরটি ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে। আবহাওয়া সন্ধানকারী—স্কাউটের প্রতি তাহার দৃষ্টি রহিয়াছে। সত্তর কিলো-মিটারেও বেশী উচ্চ হইতে উহার সঙ্কেতগুলি আসিতেছে। তাহার মোচাকৃতি অগ্রভাগটি পৃথক হইয়া পড়ে এবং সমুদ্রের মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবিয়া যায়। কিন্তু মোচাকৃতি বস্তুটির ভিতরের যন্ত্রপাতি-গুলি তাহাদের পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য পাঠাইতে থাকে।

আজ পর্যন্ত ওয়াই. এম. শোকালস্কি জাহাজ হইতে পাঁচ বার কৃষ্ণসাগরে রকেট নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেকবারই উহা সফল হইয়াছে এবং বিপুল তথ্যসম্পদ পাওয়া গিয়াছে।

ওয়াই. এম. শোকাল্স্কি শীঘ্রই প্রশান্ত মহাসাগরে যাইবে এবং আবহাওয়া সম্বন্ধে ব্যাপক সন্ধান কার্য চালাইবে।

সমুদ্রের উপরে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক মূল্য খুবই বেশী। ওয়াই. এম. শোকাল্স্কি ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অক্ষরেখায় পর্যবেক্ষণ চালাইতে পারে। উহা চলমান গবেষণা-কেন্দ্রের মত কাজ করিবে। তীর হইতে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকিবে বটে, কিন্তু লব্ধ তথ্যগুলি সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া বিভাগকে জানাইয়া দিবে।

সত্যের অপলাপ

নৃসিংহ কুমার

চরিত্র, ব্যক্তিত্বের অন্যতম অচ্ছেদ্য অংশ। চরিত্র কথাটির অর্থ এক কথায় বোঝানো সম্ভব নয়। চরিত্র কথাটির দু'রকম অর্থ আমরা পেয়ে থাকি। চরিত্র বলতে সাধারণতঃ আমরা সামাজিক শাসন ও নীতির অনুগামী হওয়া বা না হওয়া-জনিত ব্যবহার বুঝে থাকি। অন্য ক্ষেত্রে চরিত্র বলতে কোন ব্যক্তির সমগ্র ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যকে ইঙ্গিত করা হয়। সুতরাং অর্থের পার্থক্য থাকলেও এ-কথা বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কাজেই আদর্শ ব্যক্তিত্বের জন্যে প্রয়োজন, আদর্শ চরিত্র গঠন। তাই শিশুদের শিক্ষার সুরু থেকে আদর্শ চরিত্র গঠনের দিকে অভিভাবক এবং শিক্ষক উভয়েরই বিশেষ সচেতন থাকতে হবে।

শৈশবই চরিত্র গঠনের প্রথম ও প্রধান সোপান।

এই সময়টিতে শিশু অনুকরণপ্রিয় থাকে এবং প্রধানতঃ অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে' থাকে। অনুকরণপ্রিয় শিশুর চরিত্র গঠনের কালে প্রাপ্তবয়স্কদের যে ব্যবহারগুলি বিশেষভাবে নেতি-মূলক প্রভাব বিস্তার করে থাকে, "মিথ্যা কথা" তার মধ্যে অন্যতম। বর্তমান প্রবন্ধে চরিত্র গঠনের সময় মিথ্যার বিষময় ফল সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

মিথ্যা অর্থে সত্যের অপলাপ। "মিথ্যা কথা বলা পাপ"—এই সুপরিচিত নীতিবাক্যটি পুঁথিগত-ভাবে শিশুদের শেখানো হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের অনেক সময়ে মিথ্যার আশ্রয় নিতে দেখে এবং তা অনুকরণ করে। বাস্তব-জ্ঞানরহিত শিশু-জীবনের চলবার পথে ত্রাণ পাবার সহজ উপায় হিসাবে মিথ্যার সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে তোলে এবং নিজের অজ্ঞাতসারে মিথ্যাকে উত্তর জীবনের ব্যক্তিত্বের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গড়ে তোলে। মিথ্যভাষীকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ সাময়িক মিথ্যাভাষী, দ্বিতীয়তঃ স্বভাব মিথ্যাভাষী। প্রথম ধরণের মিথ্যভাষী উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সাময়িকভাবে মিথ্যা কথা বলে এবং দ্বিতীয় ধরণের মিথ্যাভাষী বিনা কারণে সব বিষয়েই মিথ্যাকথা বলে থাকে। মিথ্যার মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে আনন্দের মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সাধারণতঃ চার বা পাঁচ বছর বয়স থেকে শিশুরা মিথ্যা কথা বলতে শেখে। এর আগে সে আধো আধো বুলিতে মিথ্যা কথা বললেও অপরকে প্রতারণা করবার জন্যে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কথা বলে না। পাঁচ বছর বয়স থেকে দশ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা-মা ও যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মধ্যে মানুষ হয়, তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে ওঠে সেগুলির উপর নির্ভর করে। কি করে এই বয়সের ছেলেমেয়েরা মিথ্যা কথা বলে, তার উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—কোন লোকের বাড়ীতে যদি কোন পাওনাদার আসে পাওনা আদায়ের জন্যে এবং সেই লোকটি বাড়ীতে উপস্থিত থেকেও কোন ছোট ছেলেকে শিখিয়ে দেয়—বল্, আমি বাড়ী নেই। সে সেই কথা বলে এবং তার শিশুমনে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যে, বাড়ীতে থেকেও কেন তাকে দিয়ে বলানো হলো যে, সে বাড়ী নেই। এরূপ অবস্থায় সে মিথ্যা যে কি জিনিষ, তা জানতে পারে এবং সে শিখে নেয় মিথ্যাকথার সাহায্যে সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। মিথ্যার সাহায্যে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়টি শিশুর ব্যক্তিত্বে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সাময়িক মিথ্যাভাষী থেকে সে স্বভাব-মিথ্যা-ভাষী হয়ে ওঠে। ছেলেবেলা থেকে শিশু যদি এই ধরণের মিথ্যাভাষণ দেখে বা শোনে অথবা শিক্ষা পায়, তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ বিড়ম্বিত হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

নিন্দা বলতে সামাজিক অপবাদ বুঝায়। শিশু অবস্থা থেকে আমরা যখন বড় হই, তখন আমাদের মনে এই চিন্তা জাগে। সমাজের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন না হওয়ার জন্যে এবং পারিবারিক শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষকে বাধ্য হয়ে মিথ্যা কথা বলতে হয়। এই ধরণের ঘটনার প্রভাব অনুকরণপ্রিয় শিশুর মনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটা নেতিমূলক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মতে, মানসিক পরিপূর্তির কালে এই ধরণের নেতিমূলক প্রভাব শিশুর ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

চক্ষুলজ্জা অথবা ভদ্রতার খাতিরে অনেক সময় মিথ্যাকথা বলতে দেখা গেছে। অধস্তন কর্ম-চারীকে উপরওয়ালার মনস্তুষ্টির জন্যে নিজের প্রকৃত মনোভাব গোপন রাখতে হয়, অন্ততঃ ভদ্রতা রক্ষার জন্যেও। শিশু যদি বোঝবার বয়স থেকে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখে বা শোনে, তাহলেই ভবিষ্যৎ

জীবনে সে ঠিক ঐরূপভাবে গড়ে উঠবে এবং পিতা-মাতার কাছেও ছলনা ও প্রতারণার আশ্রয় নেবে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শাস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সহজ উপায় হিসাবে শিশু মিথ্যা কথা বলতে শেখে। এই প্রসঙ্গে একটা খুব সাধারণ ঘটনা উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে। অনেক অভিভাবক অবুঝের মত তাঁদের ছেলেমেয়েদের খেলার সময় খেলতে দেন না। এই শ্রেণীর অভি-ভাবকদের ধারণা যে, খেলার জন্যে সময় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন এবং ঐ সময় তাঁরা জোর করে ছেলে-মেয়েদের পড়াবার চেষ্টা করেন। এমন কি, বিকাল-বেলায় পড়বার ঘরে ছেলেমেয়েকে আটকে রাখবার জন্যে মাষ্টারমশায়কে বিকেলে আসতে নির্দেশ দেন। স্বভাবচঞ্চল ও ক্রীড়ামোদী শিশুমন খেলার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে চায় না, অথচ অভি-ভাবকের কড়া শাসনের জন্যে সহজভাবে খেলাধূলায় যোগ দেওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই এরূপ ক্ষেত্রে শিশুরা অভিভাবকদের ফাঁকি দেবার জন্যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বা মিছামিছি অসুস্থ হওয়ার ভান করে। ব্যক্তিত্ব গঠনের সুরুতে এই ধরণের প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে আরম্ভ করলে উত্তর জীবনে সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যে কোন পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে।

মনোবিজ্ঞানীরা নানাপ্রকার পরীক্ষার সাহায্যে দেখেছেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেয়েরা, ছেলেদের চেয়ে অধিক পরিমাণে মিথ্যা কথা বলে। কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ছেলেরা এই বিষয়ে মেয়ে-দের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর হয় এবং এই সময়েই তারা অধিক মিথ্যাকথা বলে থাকে। পরিণত বয়সেও পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের চেয়ে বেশী মিথ্যা কথা বলে। তাঁরা আরও বলেন যে, অল্পে উত্তেজিত ও ভীরু প্রকৃতির লোকের মধ্যেই মিথ্যাভাষীর সংখ্যা অধিক। মিথ্যা বলবার সময় সব লোকের দৃষ্টিতেই একটা চাঞ্চল্যের ভাব ফুটে ওঠে। শুধু তাই নয়, মিথ্যা কথা বলবার সময় মানসিক উত্তেজনা চোখের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, ফলে চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয় এবং তার-পরেই আবার তাড়াতাড়ি সঙ্কুচিত হয়ে যায়। কিন্তু সত্যবাদীদের ক্ষেত্রে চোখের চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না। এগুলি তাঁরা অপ্থ্যাল্মোগ্রাফের সাহায্যে ধারাবাহিকভাবে মিথ্যাভাষীর চোখের প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করে প্রমাণ করেছেন। মিথ্যাভাষণের ফলে শরীরের উপর একটা প্রতিক্রিয়া হয়। এর প্রমাণ শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন, রক্তের চাপ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। শুধু তাই নয়, মিথ্যাকথা বলবার সময় শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, ফলে আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক কার্যকারিতা ব্যাহত হয়। মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের Psycho-galvanometer-এর সাহায্যে এর সত্যতা প্রকাশ করেছেন।

কল্পনাবিলাসী শিশুমনের কার্যকলাপ বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় অন্যায় বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। বয়স্কেরা বাস্তব জ্ঞান অর্জন করবার পর তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি শিশুদের কোন কার্যকলাপ অন্যায় বলে মনে করেন, তাহলে সাধারণ ক্ষেত্রে তাঁরা শিশুদের বাস্তব জ্ঞান অর্জনের জন্যে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শিক্ষা শাস্তির মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে। ফলতঃ শাস্তির উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে শিশু মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। সুতরাং অভিভাবকদের এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করা উচিত, যাতে শিশু অন্যায় কাজ করবার পরেও সত্যকথা বলতে পশ্চাদপদ না হয়। শিশুকে বাস্তব শিক্ষা দেবার সময় অভিভাবকদের বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, অকপট স্বীকৃতির ফলে যে কোন অন্যায় ক্ষমা করা যায়, কিন্তু মিথ্যা উক্তির সাহায্যে সাময়িকভাবে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেলেও তার ভবিষ্যৎ ফল অত্যন্ত ক্ষতিকর ও বিষময় হয়ে থাকে।

অধুনা শিক্ষাপদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, শিশুকে

ভবিষ্যৎ জীবনে সু-নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা—যে নিজেকে সুখী রেখে অপরকে সুখী করে আদর্শ সমাজ-জীবন যাপন করতে পারবে। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয় প্রবর্তন করা হয়েছে—যেমন, গল্পচ্ছলে শিক্ষা, খেলার মাধ্যমে শিক্ষা, Audio-visual technique ইত্যাদি। শিক্ষার প্রাথমিক সোপান থেকে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের এই সব আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি ছাত্রকে সত্যানুরাগী ও সত্যসন্ধ করে গড়ে তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত দেশের সমাজ-বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ্‌গণ এই বিষয়ে বহুবিধ গবেষণা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের গবেষণালব্ধ ফল শিক্ষায়তনে প্রয়োগ করে বিশেষ সুফল লাভ করেছেন। আমাদের দেশেও অনুরূপ চিন্তাধারার বহুল প্রসার ভবিষ্যতের আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলবার পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন।

সঞ্চয়ন

অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিদের জন্যে আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা

এই সম্বন্ধে এলিজাবেথ গিলজিন লিখেছেন—স্বনামধন্য প্লাষ্টিক সার্জন স্বর্গত স্যার আর্চিবল্ড ম্যাকিনডোর ভবিষ্যদ্বাণী আজ সত্যসত্যই সার্থক হতে চলেছে। তিনি বলেছিলেন—আর একজনের শরীর থেকে চামড়া নিয়ে গ্র্যাফ্‌টিংয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়তো একদিন সম্ভব হবে। তিনি একথাও বিশ্বাস করতেন যে, বাইরের একজনের শরীরের চামড়া গ্রহণে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তার বিরুদ্ধে "টীকার" ব্যবস্থাও হতে পারবে। বর্তমানে রোগীর নিজের দেহের বা যমজ আর একজনের দেহের চামড়া নিয়ে গ্র্যাফটিংয়ের কাজ সম্ভব না হলে বাইরের লোকের শরীরের যে চামড়া নিয়ে গ্র্যাফটিংয়ের কাজ হয়, তা দুই বা তিন সপ্তাহ পরে পরিত্যাগের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

বর্তমানে যে ব্যক্তি আগুনে সাংঘাতিকভাবে পুড়ে গেছে তাকে প্রথম দিকে ডোনর গ্র্যাফ্‌ট (donor grafts) দিয়েই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করতে হয়। এই ডোনর স্কিন গ্র্যাফট 'স্কিন গ্র্যাফট ব্যাঙ্ক' থেকে কিংবা অন্য কোন দাতার কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

কোন কোন চিকিৎসক যখন রোগীর নিজের চামড়া নিয়ে রোগীর দেহের উপর ব্যাপক গ্র্যাফটিংয়ের কাজ করেন, তখন তিনি গ্র্যাফটিংয়ের উপযোগী যে অতিরিক্ত চামড়া রোগীর দেহ থেকে সংগ্রহ করেন, তা নষ্ট না করে রেখে দেন ডিপ-ফ্রীজ রেফ্রিজারেটরে। এখানে অন্য ধরণের গ্র্যাফ্‌ট, যথা—বিভিন্ন দাতার কাছ থেকে সংগৃহীত ধমনী এবং অস্থিও রাখা হয়। এই ডোনর স্কিন গ্র্যাফট পরে অন্য কোন অগ্নিদগ্ধ রোগীর দেহে গ্র্যাফটিংয়ের কাজে লাগানো হয়।

শরীরের, বিশেষভাবে শিশুদের শরীরের, অনেকখানি অংশ যদি আগুনে পুড়ে যায়, তাহলে তা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। তার কারণ হলো শরীরের জলীয় পদার্থের অস্বাভাবিক ক্ষয়। প্রেসার ড্রেসিং এই ক্ষয় কিছুটা রোধ করতে পারলেও ডোনর স্কিন গ্র্যাফ্‌ট যে ভাবে এই মূল্যবান জলীয় পদার্থের ক্ষয় রোধ করতে পারে, সে ভাবে পারে না। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে শিরার মধ্য দিয়ে জলীয় পদার্থ সরবরাহ করে প্রায় তিন সপ্তাহ

পর্যন্ত শরীরের প্রয়োজনীয় জলীয় পদার্থের পরিমাণ ঠিক রাখা সম্ভব হয়।

রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে চিকিৎসকগণ এই তরল পদার্থের প্রকৃতি স্থির করে থাকেন। তারপর তাঁরা অতি সূক্ষ্ম প্লাষ্টিক টিউব শিরার মধ্যে ঢুকিয়ে এই তরল পদার্থ সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এতে রোগীর শরীরে কষ্ট অনেক কম হয়।

বার্মিংহামে দুর্ঘটনার জন্যে যে হাসপাতালটি রয়েছে, তার একটি বিশেষ ইউনিট আছে। এটি হলো বার্ণস্ ইউনিট, এখানে আগুণে পোড়া ক্ষতের চিকিৎসা প্রথম থেকে এত ভালভাবে হয়ে আসছে যে, দেশের অন্যান্য অংশের চিকিৎসক এবং নার্সেরা এখানে নিয়মিত চিকিৎসার আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্যে আসেন। বিদেশ থেকেও বহু চিকিৎসক এখানে আসেন।

শরীরের দগ্ধ স্থানের সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে সম্ভবমত সব কিছুই করা হয়ে থাকে। বার্ণস্ ইউনিটের আভ্যন্তরীণ বায়ু পরিশুদ্ধ করা হয় এবং চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয় ড্রেসিং ইত্যাদি কোন কিছুই হাত দিয়ে ধরা হয় না, ধরবার জন্যে ব্যবহৃত হয় ফরসেপস্।

পরিচ্ছন্ন ক্ষত যেমন দ্রুত সারানো সম্ভব তেমনই সম্ভব দ্রুত গ্র্যাফটিং।

এখন সাধারণ লোকও বুঝতে শিখেছে যে, অগ্নি-দগ্ধ ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠাতে পারলে চিকিৎসার সুব্যবস্থা হতে পারে। তারা এখন বুঝতে শিখেছে যে, বড় রকমের অগ্নিদগ্ধ ক্ষতের সব-চেয়ে ভাল প্রাথমিক চিকিৎসা হলো চিকিৎসা না করা; রোগীকে সরাসরি একটি পরিচ্ছন্ন চাদরে জড়িয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে কেবল হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে হবে।

তারপর হাসপাতালে শরীরের দগ্ধ অংশ পরিষ্কার করে প্রাথমিক চিকিৎসা সুরু হবে।

বার্মিংহাম বার্ণস্ ইউনিটের কাজকর্ম থেকে মনে হয়, প্রত্যেক শহরে কিংবা এলাকায় এই ধরণের ইউনিট থাকা প্রয়োজন। সেখানে কেবল অগ্নিদগ্ধ ক্ষতের চিকিৎসা হবে, কারণ যে ধরণের চিকিৎসার সুযোগ এই সব ইউনিটে থাকবে, তা অন্য কোন সাধারণ হাসপাতালে থাকতে পারে না। অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, প্রথম দিকে ভাল চিকিৎসার সুযোগ পেলে রোগীর দুর্ভোগও অনেক কম হয়।

দেশের সর্বত্র বার্ণস্ ইউনিট স্থাপন সম্ভব হলে স্কিন-গ্র্যাফট ব্যাঙ্ক স্থাপনও সম্ভব হতে পারে। এই ব্যাঙ্ক পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে নিকটস্থ বড় হাসপাতালের।

ডোনর গ্র্যাফট 'গ্রহণ' রোগীর পক্ষে যখন পূর্ণ মাত্রায় সম্ভব হবে, তখন স্কিন-গ্র্যাফট ব্যাঙ্ক খোলবার প্রয়োজনও বেশী করে দেখা দেবে।

এখন পর্যন্ত রোগীকে স্কিন-গ্র্যাফট ব্যাঙ্কের উপরই অনেকটা নির্ভর করে থাকতে হয়। তাদের অনেক সময় আবার ডোনর বা দাতাদের দয়ার উপরও নির্ভর করতে হয়। এই দাতাদের মধ্যে অনেকে আবার হাসপাতালেরই রোগী। ব্যক্তিগত আবেদনে তাঁরা প্রায় সব সময়েই সাড়া দিয়ে থাকেন; বিশেষ করে এই আবেদন যদি কোন শিশুর পক্ষ থেকে এসে থাকে।

জল ও স্থলভাগের বিন্যাস

মিহির বসু

মে, (১৯৬০) সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ ভূ-পৃষ্ঠে জল ও স্থলভাগের বিন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার প্রারম্ভে স্থলভাগ ও জলভাগের যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই জলভাগ ও স্থলভাগ সৃষ্টির প্রশ্ন এসে পড়ে। আসল কথা, এই আলোচনার দুটি দিক আছে, একটি স্থল ও জলভাগের বিন্যাস, অপরটি এর গোড়ার কথা—জল ও স্থলভাগের সৃষ্টি-রহস্য। এই দুটি প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হলেও অবশ্যই এক নয়।

স্থল ও জলভাগের যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, সেগুলির কোন্‌টির উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত, অর্থাৎ কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলি এদের সৃষ্টি-রহস্যকে জানবার পক্ষে বেশী সহায়ক বা আদৌ সহায়ক কিনা—সেটা ভাববার কথা। প্রধানতঃ ঐ বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামনে রেখে লোথিয়ান গ্রিন তাঁর চতুস্তলক প্রকল্পকে তুলে ধরেছিলেন। স্থলভাগ সৃষ্টির সমস্যাকে তিনি আদৌ গুরুত্ব দেন নি। তাঁর মতবাদ শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি লাভ করে নি। দেখা যাচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞানী-সমাজ এই ধারণাকে মেনে নিতে রাজী নন।

ওয়েগ্‌নার তাঁর মতবাদের মাধ্যমে এই ভূ-বিন্যাসেরই ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। প্রাচীন সুবিশাল ভূখণ্ড ভেঙ্গে, ছড়িয়ে জন্ম দিল ছোট ছোট মহাদেশের—এই তার মূল কথা। যদিও এই মতবাদ বহুদিন ধরে ভূ-বিজ্ঞানীদের আকৃষ্ট করেছিল, তবুও দিনে দিনে, দেশে দেশে যতই ভূতাত্ত্বিক তথ্যাদি জড়ো হচ্ছে, ততই ওয়েগ্‌নারের মতবাদ তার স্বীকৃতি হারাচ্ছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, প্রাচীন ভূখণ্ডের সৃষ্টি কি করে হয়েছিল, সে বিষয়ে ওয়েগ্‌নারও বিস্তৃত আলোচনা করেন নি।

এর আগে, জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯) ভূত্বকের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, ভূ-পৃষ্ঠে দেশ ও মহাদেশগুলি গঠিত হয়েছে পুরু গ্র্যানিট পাথরে। অপর পক্ষে সাগরতলে রয়েছে বেসাল্ট গোত্রের পাথর। সাগরতলে গ্র্যানিটের অস্তিত্বে কারণ দর্শাতে গিয়ে বহুদিন আগে কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে, পৃথিবীর দেহ থেকে চাঁদ যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন এই গ্র্যানিটের এক বৃহদাংশ বেরিয়ে যাওয়ার ফলে এক বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি হয়।

ভূ-পৃষ্ঠের অন্যান্য অংশ থেকে ভূখণ্ড সরে এসে এই বিরাট গহ্বরকে চাপা দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তবুও যে গভীর নিম্নভূমি রয়ে গেল; তাই হলো আজকের প্রশান্ত মহাসাগর। ভূখণ্ড সরে আসবার দরুণ বিপর্যয়ে ছোট-বড় সাগর ও মহাসাগরের সৃষ্টি হয়েছিল। এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে যে, গ্র্যানিট-স্তরের সৃষ্টির পর পৃথিবীর কঠিন দেহ থেকে চাঁদের সৃষ্টি হতে পারে না।

লওসনের লেখায় আমরা দেখি—তিনি বলছেন, সাগরাঞ্চল থেকে গ্র্যানিট অপসারিত হয় নি, অপর পক্ষে বেসাল্ট-স্তরের উপর একটি গ্র্যানিটের স্তর সৃষ্টি হয়ে মহাদেশের জন্ম হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, পৃথিবীটা এককালে আগা-গোড়াই বেসাল্ট-স্তরে গড়া ছিল। এই বেসাল্টের ক্ষয়ীভবনের ফলে যে পলি সঞ্চিত হয়েছিল—সাগর-কিনারায় তা থেকে লোহা, ম্যাগ্‌নেসিয়াম প্রভৃতি কতকগুলি উপাদান জলে ধুয়ে যাওয়ায় সেই পলি হয়ে উঠলো সিলিকা ও অ্যালুমিনিয়াম-প্রধান, আর

তাথেকে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হলো গ্র্যানিটের স্তর। ভূ-পৃষ্ঠে জল ও স্থলভাগের অসম বিন্যাসের এ-ও একটি ব্যাখ্যা।

জল ও স্থলভাগের অসম বিন্যাসের ব্যাখ্যা হিসাবে যে পরিচলন-প্রবাহ প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে, তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন Vening Meinesz। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর প্রাথমিক অবস্থা থেকে সুরু করে পর পর কতকগুলি বিভিন্ন-মুখী পরিচলন-প্রবাহ-বৃত্তের সৃষ্টি হয় ভূ-অভ্যন্তরে। প্রথম পরিচলন-প্রবাহ উত্তর মেরুতে পৃথক হয়ে ভূ-পৃষ্ঠ ধরে প্রবাহিত হয়ে আবার মিলিত হয় দক্ষিণ মেরুতে। এর ফলে দক্ষিণ মেরুকে ঘিরে গড়ে ওঠে বিশাল গ্র্যানিট-স্তর। এরপর এই গ্র্যানিট-স্তরে তেজস্ক্রিয় তাপ সঞ্চিত হওয়ার ফলে আগেকার প্রবাহ ভেঙ্গে যায়। নতুন যে প্রবাহ-বৃত্ত গড়ে ওঠে, তা পরিচালিত হলো গ্র্যানিট-স্তরের তলা থেকে উত্তর মুখে। এই প্রবাহের ফলে বিশাল গ্র্যানিটের স্তর ভেঙ্গে যায়; তবে একটি টুক্‌রা দক্ষিণ মেরুতে থেকে যায়, যেমন আজও আছে। পরবর্তীকালে স্রোতের আরও পরিবর্তনের ফলে গ্র্যানিট-স্তর আরও ভেঙ্গে যায়, সৃষ্টি হয় উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আর ইউরেশিয়া ও আফ্রিকা। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই প্রকল্পে মহাদেশের ত্রিকোণাকৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন দেশে তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে পাথরের বয়স নির্ণয়ের ফলে ক্রমশঃ এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দেশ বা মহাদেশের বিভিন্ন অংশের বয়স বিভিন্ন; অর্থাৎ সমগ্র দেশ বা মহাদেশটি একই সময়ে গড়ে ওঠে নি, ধীরে ধীরে আংশিকভাবে গড়ে উঠেছে। এই গড়ে-ওঠার সূচনা হয় একটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টির মধ্যে। নিউক্লিয়াসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের প্রাধান্য। ভারতবর্ষে নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়েছিল মহীশূর অঞ্চলে। দাক্ষিণাত্যের ধারওয়ার অঞ্চল ও উত্তর ভারতের আরাবল্লী অঞ্চল ভারতের প্রাচীনতম অংশ। এরপর গড়ে উঠেছে, পূর্বঘাট ও আরও পরে সাতপুরা অঞ্চল। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, ভারতখণ্ড ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে একের পর এক গিরিজনি বা পর্বত অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। এই মতবাদের সূত্র ধরে বলা যায় যে, পৃথিবীর আদি অবস্থায় কোন মহাদেশের অস্তিত্ব ছিল না। এক-দিকে স্থলভাগ যেমন সবসময়ে ক্ষয় পাচ্ছে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তেমনি স্থলভাগ গড়ে উঠছে সাগর-সঞ্চিত পলল থেকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, জল ও স্থলভাগের বিন্যাসের ব্যাখ্যা দিতে গেলেই আগে তাদের সৃষ্টির প্রশ্ন। তাই এই প্রশ্নের উপর জোর দিতে হবে বেশী। এই মূল প্রশ্নের সমাধানে ভূ-বিন্যাস হয়তো কিছুটা সাহায্য করতে পারে।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত পঞ্চম বার্ষিক (১৯৬০) প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় নিম্নোক্ত লেখক-লেখিকা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম স্থানীয় প্রবন্ধটির নাম, লেখকের নাম ও ঠিকানা দেওয়া হইল। ইঁহাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশ টাকা হিসাবে পুরস্কার দেওয়া হইবে। পুরস্কার-প্রাপ্ত এই প্রবন্ধগুলি তারকা-চিহ্নিত করিয়া যথাসময়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইবে।

১। **পদার্থ-বিদ্যা :** পারমাণবিক শক্তির মূল কথা—শ্রীসুবিমল বসু, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১

২। **রসায়ন-বিদ্যা :** রসায়ন—শ্রীসোমেশ চক্রবর্তী, চুঁচুড়া, হুগলী

৩। **জীব-বিদ্যা :** সজীব আলোর রহস্য—শ্রীআশীষকুমার মাইতি, হাজরা রোড, কলিকাতা-১৯

৪। **গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান :** উল্কা—শ্রীশচীনাথ মিত্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৩২

৫। **শারীরবৃত্ত ও চিকিৎসা :** জরা সম্বন্ধে দু'চার কথা—শ্রীসতী রায়, খিদিরপুর, কলিকাতা-২৩

৬। **ভূ-বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ও বিবিধ :** নির্মল বায়ুমণ্ডল—শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল, বনগ্রাম, ২৪ পরগণা

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর—১৯৬০

১৩শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

ঝিঁঝিঁ পোকা ও তার পরিত্যক্ত খোলস।

উপরে ঝিঁঝিঁ পোকা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে ডানা শক্ত হবার জন্যে কিছু সময়ের জন্যে অপেক্ষা করছে।

হীরকের কথা

হীরক কি, তা তোমরা নিশ্চয়ই জান! অনেকে হয়তো হীরা দেখেও থাকবে! প্রথমেই তোমাদের বলে রাখছি—হীরা, গ্র্যাফাইট (যা থেকে পেন্সিলের সীস তৈরী হয়), কাঠকয়লা, কয়লা ইত্যাদি মূলতঃ একই পদার্থ; অর্থাৎ সবগুলিই কার্বন শ্রেণীভুক্ত। কার্বনের বিভিন্ন রূপান্তরই হলো এসব বিভিন্ন পদার্থ।

হীরক ও কয়লা যে আসলে একই পদার্থ, তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে তৈরী হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড। সমান ওজনের হীরা ও কয়লা নিয়ে—এদের ছুটির সঙ্গেই অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটানো হয়। এর ফলে উভয় ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড। সেই উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড ওজন করে দেখা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রেই সমান ওজনের কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরী হয়েছে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, হীরা আর কয়লা আসলে একই পদার্থের বিভিন্ন রূপ মাত্র।

হীরা সাধারণতঃ স্বচ্ছ, নীল, সবুজ, ধূসর ও লাল রঙের হয়। কতকগুলি হীরা আছে, যেগুলি একেবারে বর্ণহীন স্বচ্ছ। আবার অনেক সময় কালো রঙের হীরাও দেখা যায়। অবশ্য এই হীরাগুলির কালো রং বাইরের কোন পদার্থের উপস্থিতির জন্যেই হয়ে থাকে।

হীরা খনি থেকে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে হীরা পাওয়া যায় গোলকুণ্ডায়। পূর্বে আমাদের দেশ হীরার জন্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। বাইরে থেকে যে সব বণিক এদেশে আসতো, তারা অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে নিয়ে যেত মূল্যবান হীরা। দক্ষিণ আফ্রিকায় সবচেয়ে বেশী পরিমাণে হীরা পাওয়া যায়। পৃথিবীর মোট হীরক উৎপাদনের প্রায় অধিকাংশই পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকার খনিগুলি থেকে। তাছাড়া ব্রেজিল, ইউরাল পর্বত প্রভৃতি স্থানেও হীরা পাওয়া যায়।

হীরার ওজনের একক হলো ক্যারাট (১ ক্যারাট=·২ গ্রাম বা $\frac{১}{৬০}$ তোলা)। পৃথিবীর বিখ্যাত হীরক কোহিনুর ছিল এই ভারতবর্ষে। তার ওজন ছিল ১৮৬ ক্যারাট। এই কোহিনুর অনেকদিন ধরে বিভিন্ন হাত ঘুরে এসেছিল ভারতের বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর হাতে। তারপর সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইংল্যাণ্ডে। কোহিনুরকে কেটে কয়েক টুক্‌রা করা হয়েছিল। তারই এক বৃহৎ টুক্‌রা বসানো আছে ইংল্যাণ্ডের রাজমুকুটে। ভারতের কোন কোন নদীর বালিতেও হীরা পাওয়া যায়। পৃথিবীর কয়েকটি বিখ্যাত হীরক হলো—দি হোপ—৪৪·৫ ক্যারাট; কুলিনান—৩০৩২ ক্যারাট; পিট ১৩৬·২ ক্যারাট।

হীরা সাধারণতঃ বড় আকারের পাওয়া যায় না। ১৯০৫ সালে আফ্রিকায় ৩/৪ পাউণ্ড ওজনের যে বৃহৎ হীরক পাওয়া গিয়েছিল, সেটাই এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বড় হীরা। যে কয়েকটি বড় আকারের হীরা আছে, সেগুলি যে সব খনি থেকে পাওয়া গিয়েছিল, সেই সব খনির ইতিহাসে এ-সব হীরক প্রাপ্তি এক-একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে রয়েছে।

খনি থেকে যে হীরা পাওয়া যায়, তা আমাদের পরিচিত হীরকের চেয়ে ভিন্ন জিনিষ। খনি থেকে তুলে হীরা কাটাই করতে হয়; তবেই আমাদের পরিচিত হীরা পাওয়া যায়। ইউরোপে হল্যাণ্ডের আমষ্টার্ডাম শহর এই হীরক কাটাইয়ের ব্যবসায়ের জন্যে খুব খ্যাতিলাভ করেছে। হীরকের ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে কাটাইয়ের উপর। সব হীরাই সমান উজ্জ্বল হয় না। আবার ঔজ্জ্বল্যের উপরই নির্ভর করে হীরার মূল্য। সামান্য ভুলের জন্যে এক-একটা হীরা, যা থেকে একটা বহুমূল্য হীরা তৈরী হতে পারতো—সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই হীরক কাটাইয়ের জন্যে প্রয়োজন হয় খুব দক্ষ শিল্পীর এবং তাদের পারিশ্রমিকও হয় খুব বেশী।

হীরকের ঔজ্জ্বল্যের কারণ এই যে, তার ভিতরে যে আলো প্রবেশ করে, তা হীরার ভিতরেই চারদিকে বারংবার প্রতিফলিত হয়ে আবার একই দিকে ফিরে আসে। তাই কোন দিক থেকে হীরাকে দেখলে মনে হয়, যেন তাথেকে আলো বেরিয়ে আসছে।

হীরার আকার সম্পূর্ণ নিয়মিত; অর্থাৎ পরিমার্জিত হীরা কখনই আঁকাবাঁকা আকারের হয় না। এরূপ নিয়মিত আকার দেবার সময় কাটাইয়ে কিছুটা অংশ বাদ যায়। যাবতীয় জিনিষের মধ্যে হীরাই সবচেয়ে শক্ত। হীরা জল থেকে সাড়ে তিনগুণ ভারী। প্রায় কোন রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গেই এর রাসায়নিক সংযোগ হয় না। হীরার তাপ-পরিবহন ক্ষমতাও নেই। হীরাকে অনেক উচ্চ মাত্রার তাপে আস্তে আস্তে গরম করলে একটা কালো বস্তুর মত হয়ে ফুলে ওঠে। বাতাস বা অক্সিজেনে রেখে গরম করলে রাসায়নিক সংযোগে তৈরী হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড।

কাচ থেকেও আসল হীরার মত নকল হীরা তৈরী করা যায়। তবে আসল হীরা রঞ্জেন-রশ্মির সামনে স্বচ্ছ; কিন্তু নকল হীরা তার কাছে অস্বচ্ছ। তাই রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যে নকল থেকে আসল হীরা সহজেই আলাদা করা যায়।

কৃত্রিম উপায়েও হীরা তৈরী করা যায়। ১৮৯৩ সালে বিজ্ঞানী ময়সন কৃত্রিম উপায়ে হীরা তৈরী করেছিলেন। চিনি পুড়িয়ে একরকম কয়লা পাওয়া যায়। সেই কয়লা ও লোহা একটা কার্বনের পাত্রে রেখে অনেক উচ্চ তাপে গরম করা হয়। এর ফলে লোহা ও কয়লা গলে যায়। তখন সেই উত্তপ্ত গলিত পদার্থকে হঠাৎ

ঠাণ্ডা করা হয়। ঠাণ্ডা করবার পর কয়লা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকে পরিণত হয়। তখন রাসায়নিক উপায়ে সেই হীরকগুলিকে আলাদা করা হয়। কিন্তু এভাবে হীরা তৈরী করা মোটেই লাভজনক নয়। কারণ এই ভাবে যে হীরা তৈরী হয়, সেগুলি আকারে অতি ক্ষুদ্র।

হীরা আমাদের বিশেষ কোন কাজে লাগে না। মূল্যবান প্রস্তর হিসাবেই তার দাম। কাচ কাটবার জন্যে হীরক ব্যবহার করা হয়। অস্বচ্ছ ও কালো হীরা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান; তাই সেগুলি হীরক-কাটাই ও পালিশের কাজের জন্যে বা অন্যান্য প্রস্তর পালিশের জন্যে ব্যবহার করা হয়। হীরাকে হীরা দিয়েই কাটা যায়। মোটামুটি তোমাদের হীরার কথা বলা হলো। পরে তোমরা এই সম্বন্ধে আরো অনেক কথা জানতে পারবে।

শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী

বাজ-পড়া

ঘন মেঘ সমাবেশে অনেক সময়েই দেখা যায়, আকাশটা যেন মাঝে মাঝে হঠাৎ একটা আঁকাবাঁকা তীব্র আলোকরেখায় ভীষণ গর্জনে চিড়্ খেয়ে ফেটে যায়। একেই বলা হয়—বাজ-পড়া।

ঘরের মধ্যে যদি থাক, তাহলে অবশ্য কথা নেই; কিন্তু খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ যদি বিদ্যুতের ঝল্‌কানিতে চোখ ধাঁধিয়ে কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ে, তখন কার না বুকটা দুর্‌দুর্ করে ওঠে! বজ্রপাত সহ ঝড়বৃষ্টির পর অনেক সময় খবর পাওয়া যায়—অমুক গাছটা বাজ পড়ে ভেঙে গেছে, অমুক গাছটা পুড়ে গেছে অথবা বাজ পড়ে অমুক লোকটা মারা পড়েছে।

এই ধরণের অনেক কথাকে রূপকথা বা উপকথার মধ্য দিয়ে একটা কিছু বুঝিয়ে দেবার রীতি অনেক কাল ধরেই চলে আসছে। বিজ্ঞানের এই ডামাডোলের দিনেও তার অবসান ঘটে নি, অবশ্য প্রভাব অনেক কমেছে। ঠাকুরমারা বলতেন, বৃষ্টি-পড়া মানে হলো, স্বর্গে ইন্দ্রের হাতী ঐরাবত শুঁড়ে করে পৃথিবীতে জল ছড়াচ্ছেন। বাজ পড়লে বলতেন, স্বর্গে দেবতা আর দৈত্যদের লড়াই হচ্ছে; তাতে যে অস্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে, তাই হলো বাজ। এগুলি হলো সব মন-গড়া কথা। এবার সত্যি কথা, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা কি, তা বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

বাজ পড়বার সময়ে লক্ষ্য করবে—আকাশে তখন বড়-বড়, কালো-কালো

মেঘ থাকে। একটা মেঘ থেকে আর একটা মেঘে অথবা মেঘ থেকে পৃথিবীতে বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা একটা প্রচণ্ড ঝল্‌কানি দেখা যায় এবং একটু পরেই কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে খুব একটা জোর গড়ানো আওয়াজ এসে যেন কান ফাটিয়ে দেয়।

এই বিদ্যুৎ জিনিষটা কি? আসলে এটা কোন জিনিষই নয়; এটাকে বলা যায় একটা শক্তি। এই শক্তির ব্যাখ্যা খুব জটিল হলেও আমরা কিন্তু ঘরে বসেই সামান্য পরিমাণে এই শক্তি উৎপাদন করতে পারি। এতে বাজ পড়বার কারণও সহজে বোঝা যাবে।

দু-টুক্‌রা মোটা কাগজ আগুনে তাতিয়ে শুক্‌নো আর মচ্‌মচে করে এক টুক্‌রা শুক্‌নো সিল্কের কাপড় দিয়ে বেশ ভাল করে ঘষে নেওয়া হলো। দেখা যাবে, কাগজ দুটার প্রকৃতি বদ্‌লে গেছে। কাগজ দুটা পরস্পরকে আকর্ষণ করছে, কেউ কাকে ছাড়তে চাইছে না। খুব ছোট্ট হাল্‌কা কাগজের টুক্‌রা কাছে আনলে তাদের টেনে নেবে, চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে। একমাত্র ঘর্ষণ ছাড়া কাগজের টুক্‌রা দুটিতে নতুন কোন কিছুই যোগ করা হয় নি। কাগজের টুক্‌রাতে এভাবে যে শক্তি উৎপাদন করা গেল, তাই হলো বৈদ্যুতিক শক্তি।

মেঘের মধ্যেও এই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। কিভাবে হয়, তা সঠিক বলা যায় না। বিজ্ঞানীরা বলেন, মেঘে যে জলীয় বাষ্পকণা ঘনীভূত হয়, তার ফলেই তাতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। মেঘে যেভাবেই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হোক না কেন, আমরা জানলাম—মেঘে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়।

আমরা জানি, বৈদ্যুতিক শক্তিতে ভরা দুটি মেঘ যখন পরস্পরের কাছাকাছি আসে বা এই ধরণের কোন একটা মেঘ যখন পৃথিবীর কাছাকাছি আসে, তখন হঠাৎ আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে আঁকাবাঁকা বা সোজাসুজি পথে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ দেখা যায় এবং তার একটু পরেই কড়-কড়-কড়াৎ করে গড়ানো শব্দ কানে এসে পৌঁছায়।

আলোর ঝলক্‌টা কেন হয়?

এই ধরণের ঝলক বিদ্যুতের ব্যবহার আমরা অহরহই দেখে থাকি। টেবিল-ল্যাম্পের প্লাগ পরাতে গেলে অনেক সময়ে এমনি ঝলক দেখা যায়। ট্রামের তারের সঙ্গে ট্রামের লম্বা ডাণ্ডাটা চলতে চলতে অনেক সময় বিদ্যুতের ঝলক দেয়। কেন?

যে-কোন জিনিষের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ যাতায়াত করতে পারে না। যেমন কাঠের ভিতর দিয়ে পারে না। ধাতুর ভিতর দিয়ে ভালভাবেই পারে। হাওয়ার ভিতর দিয়েও কতকটা পারে। প্লাগ লাগাবার সময়ে গর্ত দুটির ধাতুর সঙ্গে পিন দুটি ভালভাবে না লাগাবার দরুণ মাঝে ফাঁক থেকে যায়; সেই ফাঁকের হাওয়ার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলে যেতেই হাওয়া দারুণ উত্তপ্ত হয়ে আলোর ঝলক দেয় এবং সেই সঙ্গেই

হাওয়ায় হঠাৎ দারুণ চাপ পড়বার প্রচণ্ড শব্দ উৎপন্ন হয়। ট্রামের ডাণ্ডাটির ডগায় যে চাক্‌তিটা তারের গায়ে ঘুরে ঘুরে যায়, সেখানেও চাক্‌তির সঙ্গে তারের গা ভালভাবে না লাগলে ফাঁকের হাওয়ার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলে যায় এবং আলোর ঝলক ও শব্দ উৎপন্ন করে।

বাজ পড়বার সময় আমরা যে আলোর ঝলক দেখি ও আওয়াজ শুনি, তা ওই একই ভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে। শব্দ একবারই উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেটা অনেক দূরে উৎপন্ন হয় বলে মেঘে মেঘে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমাদের কানে গড়ানো শব্দের মত এসে পৌঁছায়। বিদ্যুৎ চলবার বা পরিবাহিত হওয়ার পথটা কোথাও সোজা আবার কোথাও আঁকাবাঁকা হয় এই কারণে যে, সব রকম হাওয়ার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ সমানভাবে পরিবাহিত হয় না—যেমন ঠাণ্ডা শুক্‌নো হাওয়া পরিবাহী নয়, কিন্তু গরম ও ভিজা হাওয়া বিদ্যুৎ-পরিবাহী। বিদ্যুৎ সব সময়ে সহজ পথটাই নেয়, তা সে সোজাই হোক বা আঁকাবাঁকাই হোক।

বিদ্যুতের পক্ষে ধাতু হলো উত্তম পরিবাহী। যদি কোন উঁচু বাড়ীর চূড়ায় সূক্ষ্মাগ্র একটা ধাতু-নির্মিত রড্‌ বসানো থাকে এবং তার সঙ্গে বিদ্যুৎ-পরিবাহী কোন উপযুক্ত মোটা ধাতুর তার দিয়ে মাটির সঙ্গে যোগ করে দেওয়া থাকে, তাহলে বিদ্যুৎ হাওয়ার মধ্যে দিয়ে না গিয়ে ওই তারের মধ্যে দিয়েই পরিবাহিত হয়ে যায়। তার ফলে বাজ পড়বার দরুণ কোন অনিষ্ট হয় না।

জলের ভিতর দিয়েও বিদ্যুৎ পরিবাহিত হতে পারে। জলের বিস্তৃতি বা পরিমাণ বেশী হলে বেশী উত্তাপের সৃষ্টি না করেই বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয়ে থাকে। কিন্তু যদি জলের পরিমাণ কম থাকে, তাহলে এত উত্তাপের সৃষ্টি হয় যে, তৎক্ষণাৎ জল বাষ্পে পরিণত হয়। জীবন্ত গাছের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিচালিত হতে পারে বটে, কিন্তু গাছ উত্তম পরিবাহী নয়। কাজেই জীবন্ত গাছের উপর বাজ পড়লে গাছের মধ্যের জলকণা এত দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয় যে, গাছ ভেঙে যায় বা চিড় খেয়ে ফেটে যায়। বাড়ী-ঘরের ব্যাপারেও তাই, সহজেই দেওয়াল বা ছাত ফেটে যায়। বাজ পড়বার সময় বৃষ্টিপাতের ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাড়ী-ঘর ভিজা থাকে।

ঝড়-বৃষ্টির সময় উন্মুক্ত প্রান্তরে থাকলে বজ্রাহত হওয়ার দারুণ সম্ভাবনা। কারণ উঁচু জায়গাতেই বিদ্যুতের বেশী আকর্ষণ। তাই বাজ পড়বার সময় গাছের নীচে দাঁড়াতে নেই। গাছ উঁচু বলে তার উপর বিদ্যুৎ পাতের সম্ভাবনা বেশী। গাছের কাছে দাঁড়ালে, গাছের চেয়ে মানুষের শরীর অপেক্ষাকৃত বেশী পরিবাহী বলে গাছের পথ বদ্‌লে শরীরের পথ দিয়েও বিদ্যুৎ চলে যেতে পারে। ঘরের ভিতরেও খোলা জানলার কাছে দাঁড়ানো বা বসে থাকা নিরাপদ নয়। কারণ ভিজা হাওয়া বিদ্যুৎ-পরিবাহী। কাজেই বাজ পড়বার সময়ে নিরাপদ হলো বিছানায় শুয়ে থাকা।

অনেক বাড়ীর ছাতের উপর শিকের মত লোহার রড্ উঁচু করে বসানো থাকে এবং সেই লোহার রডটা মাটির সঙ্গে ভাল করে সংলগ্ন থাকে। লোহার রড্ ভাল বিদ্যুৎ-পরিবাহী বলে তাড়াতাড়ি ওই রডের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ মাটিতে পৌঁছায়; তাতে বাজ পড়বার বিপদ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

অনেকের ধারণা, বাজ বুঝি একটা ধাতব জিনিষ—আকাশ থেকে আলোর ঝলক দিয়ে শব্দ করে পড়ে। তা যে মোটেই সত্য নয়, সেকথা নিশ্চয়ই বুঝেছ। তবে এই ধারণার উৎপত্তির একটা কারণ আছে। অনেক সময়ে মহাকাশের উল্কা এসে পৃথিবীতে পড়ে। এই উল্কা হলো ধাতব পদার্থ। কাজেই অনেকে উল্কাপাতের সঙ্গে বাজ-পড়ার ব্যাপারটাকে গুলিয়ে ফেলে ওই ধরণের ভুল ধারণা করে বসে। এমনও হতে পারে যে, কোন উল্কাপিণ্ড কাদামাটির মধ্যে আগে থেকেই চাপা পড়েছিল, লোকের চোখে পড়ে নি। বজ্রপাতের সঙ্গে বৃষ্টির জলে তা ধুয়ে গিয়ে ধাতব উল্কা লোকের চোখে পড়েছে। হয়তো ভুল করে ওই ধাতব উল্কাপিণ্ডকে তারা বাজ বলে ধরে নিয়েছে।

শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ

সংখ্যাতত্ত্ব

সংখ্যাতত্ত্বের বহু শাখা।

এখানে বিশেষ করে বৃহৎ সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করবো। তবে কেবল মাত্র বৃহৎ সংখ্যার জন্যে এ-প্রবন্ধ নয়।

বর্তমান যুগে আমরা যে সংখ্যা ভাবতে পারি, তাকেই কাগজের উপর অক্ষরে রূপ দিতে পারি। সংখ্যাটি অতি ক্ষুদ্রও হতে পারে, আবার খুব বড়ও হতে পারে; কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। আমরা শুধু এইটুকুর অপেক্ষায় থাকি, কখন সংখ্যাটিকে লিখতে বলা হবে। কিন্তু আগে মানুষ আমাদের মত অনায়াসে সংখ্যার রূপ দিতে পারতো না। খুব বড় সংখ্যা লেখা দূরে থাকুক, তার কথা তারা ভাবতেও পারতো না। কথিত আছে, এমন অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকও ছিলেন যাঁরা তিন-এর বেশী কল্পনা করতে পারতেন না; অর্থাৎ তাদের চোখে তিনের বেশী—মানেই অনেক। যদি তাদের বলা হতো—ভাই হে তোমার বাড়ীতে ক'জন লোক? সে উত্তর দিত চার কি পাঁচ বলে নয়, শুধু বলতো—অনেক। সংখ্যা সম্বন্ধে এমনই ছিল তাদের জ্ঞান। ধীরে ধীরে মানুষ বড় সংখ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝতে পারলো। সেই সময় থেকেই বহু অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ সংখ্যাতত্ত্বের উন্নতি সাধন করেন। এক থেকে নয় পর্যন্ত পৌঁছুতে মানুষের বহুদিন লেগেছে। তারপর মানুষের একক, দশক, শতকের

জ্ঞান হলো। কে যে সংখ্যাগুলিকে পর পর সাজিয়ে একটা ক্রমিক রূপ দিয়েছিলেন, সে কথা বলা যায় না, তবে তিনি যে মানুষের একটা বিরাট কাজ করে দিয়ে গেছেন, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

সংখ্যাতত্ত্বের একটা খুব বড় আবিষ্কার হলো—শূন্য। শূন্য আবিষ্কারের ফলে বৃহৎ সংখ্যা লেখবার একটা দরজা খুলে গেল। আমরা যে কোনও সংখ্যার পিছনে ক্রমাগত শূন্য বসিয়ে এমন একটা বিরাট সংখ্যার সৃষ্টি করতে পারি, যার মান হয়তো আমরাই বলতে পারবো না।

আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা সংখ্যাতত্ত্বের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশ থেকেই সংখ্যাতত্ত্ব একটা পূর্ণরূপ পেয়েছে। গুপ্ত যুগেই সংখ্যাতত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ। এই সময়েই দশমিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। পরে আরব প্রভৃতি দেশে এবং তার পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে সংখ্যাতত্ত্বের প্রচলন হয়েছিল।

পূর্বকালেও মানুষ বড় সংখ্যা লিখতে জানতো। কিন্তু সে লিপি এখনকার লোকের কাছে হাস্যকর। সে যুগে সংখ্যা প্রকাশের এত বৈচিত্র্য ছিল যে, তা পণ্ডিতদের এখন গবেষণার বিষয়। একজন ইজিপ্টবাসী সে যুগে সংখ্যাকে যে লিপিতে প্রকাশ করতো, তা এখন আমাদের কাছে পাতা-ভর্তি ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। গ্রীকরা এক-একটি সংখ্যার নামকরণ করেছিলেন বর্ণমালার এক-একটি অক্ষর দিয়ে। সেই জন্যে কোনও সাধারণ বড় সংখ্যা লিখতে গেলেই তা হয়ে পড়তো বিরাট ও পড়বার পক্ষে বহু সময় সাপেক্ষ। গ্রীকরা 8732 সংখ্যাটিকে প্রকাশ করতো এই ভাবে—MMMMMMMM-DCCXXXII, এক কোটি লিখতে হলে তো কথাই নেই। 1000,000,000-টি M লিখলে তবে এক কোটি লেখা হতো। আর সময় লাগতো ৩২ বছর।

বিখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস খুব বড় সংখ্যা ভাববার এবং তাকে অক্ষরে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। সেই সময় থেকেই বড় সংখ্যার নামকরণ হতে থাকে ; যেমন—মিরিয়াড বললে বোঝাতো দশ হাজারকে। আর্কিমিডিস বের করতে চেষ্টা করেছিলেন, এই বিশ্বজগতে কতগুলি বালিকণার স্থান হতে পারে? তাঁর হিসাবমত সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছিল 10^{63} (অর্থাৎ একের পর ৬৩টা শূন্য)। কিন্তু এ-যুগে এটা ভুল, যদিও আর্কিমিডিসের হিসাবে কোন ভুল নেই। সেই সময় বিশ্বের সীমারেখা ছিল আকাশ মাত্র; অর্থাৎ যতদূর দৃষ্টি যায় সেটুকুই মাত্র এবং বিশ্বের ব্যাসার্ধ স্থির হয়েছিল 1000,000,000 মাইল। এই হিসাবে আর্কিমিডিসের গণনা নির্ভুল। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বের ব্যাসার্ধ স্থির করেছেন 5000,000,000,000,000,000,000 মাইল। এই হিসাবে বিশ্বকে বালি দিয়ে পূর্ণ করতে লাগবে 10^{100}টি বালিকণা।

বর্তমান কালে বিরাট বিরাট সংখ্যার নামকরণ হয়েছে। অবশ্য ক্ষুদ্র সংখ্যারও

নামকরণ হয়েছে। যেমন 'মিলি' মানে হাজার ভাগের এক ভাগ এবং 'মিলিয়ন' মানে দশলক্ষ। তারপর আসে বিলিয়ন, অর্থাৎ দশ লক্ষের হাজার গুণ। তারপর আসে ট্রিলিয়ন, অর্থাৎ বিলিয়নের হাজার গুণ। ট্রিলিয়নের হাজার গুণ হচ্ছে কোয়াড্রালিয়ন। খুব বেশী বড় সংখ্যা হলে আর নামকরণ করা হয় না। 10-এর ঘাত (Power) রূপে তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়। যেমন আগেই বলা হয়েছে যে, এক-এর পর 100টি শূন্য থাকলে তাকে লেখা হয় 10^{100}—এই ভাবে। অবশ্য সংখ্যার পিছনে যদি কেবল শূন্য থাকে তবে এই ব্যবস্থা করা হয়। অন্যথা অন্য ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

সংখ্যার ডান দিকে এবং বাঁ দিকে শূন্য বসাবার পার্থক্য আমাদের জানা আছে। বাঁ দিকে শূন্য বসাতে হলে আগে একটি দশমিক চিহ্ন বসাতে হয়। যেমন ·00001 এবং 10000 এই সংখ্যা দুটি। প্রথমটা হলো এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ এবং দ্বিতীয়টা দশ হাজার। দশমিকের বহু শূন্য এবং তারপর যদি কোন সংখ্যা থাকে তবে তাকে প্রকাশ করা হয় আগের মতই ঘাত ব্যবহার করে। কিন্তু এই ব্যাপারে ঘাত বা Powerকে ঋণাত্মক করা হয়।

সংখ্যাতত্ত্বের এখন খুব উন্নতি হয়েছে। অনেকেই সংখ্যা নিয়ে বহু ভেল্কী দেখাতে পারেন। যেমন—অতি সাধারণ একটা বিষয়—কাউকে বলা হলো, মাটিতে 100টি বর্গক্ষেত্র আঁকা আছে। প্রতি ক্ষেত্রে আগের ক্ষেত্রের দ্বিগুণ সংখ্যক মার্বেলের গুলি রাখতে হবে। প্রথম ক্ষেত্রে যদি একটি গুলি রাখা হয়, তবে সবগুলি ক্ষেত্রে ঐ হিসাবে মার্বেল রাখতে ক'টা গুলির প্রয়োজন হবে? মনে হয়, খুব বেশী হবে না। কিন্তু আসলে প্রয়োজন হবে 338350টি মার্বেলের। সংখ্যা সম্বন্ধীয় আর একটি অত্যন্ত কৌতূকজনক ব্যাপার আছে। এতে অবশ্য বীজগণিতের সাধারণ সূত্রের প্রয়োগ করতে হবে। মনে করা যাক $a=b$

$\therefore a^2=ab$···উভয় পক্ষকে a দিয়ে গুণ করে।

অথবা $a^2-b^2=ab-b^2$···উভয় পক্ষ থেকে b^2 বিয়োগ করে।

অথবা $(a+b)(a-b)=b(a-b)$

অথবা $a+b=b$...উভয় পক্ষকে $(a-b)$ দিয়ে ভাগ করে।

কিন্তু আগেই বলা হয়েছে $a=b$

$\therefore b+b=b$

অথবা $2b=b$

অথবা $2=1$···উভয় পক্ষকে b দিয়ে ভাগ করে।

কিন্তু এটা কেমন করে সম্ভব? 1 কি কখনও 2-এর সমান হয়? নিশ্চয়ই কোথাও

ভুল আছে। ভুলটা হলো $\because a=b \therefore a-b=0$। এই হলো ভুল। তোমরা অনেকে হয়তো ভেবেছিলে $1=2, 2=4$ ইত্যাদি করে কিছু টাকা ডবল করে নেবে। কিন্তু সে সদিচ্ছা মাঠেই মারা গেল। এখন খুব অভিশাপ দেওয়া হচ্ছে, বুঝতেই পারছি।

শ্রীঅশেষকুমার দাশ

জানবার কথা

১। ঈগল ছোঁ মেরে শিকার করতে খুব ওস্তাদ। চোখের নিমেষে উপর থেকে নীচে নেমে এসে শিকারকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে সোনালী ঈগলকে
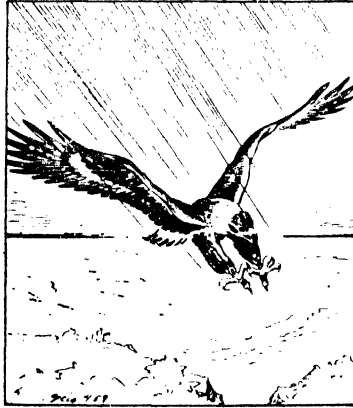
১নং চিত্র

পাখীদের রাজা বলা যেতে পারে। অন্যান্য শিকারী পাখীদের তুলনায় এদের গায়ের জোরও খুব বেশী। অনেক সময় এরা প্রবল বেগে উপর থেকে নেমে এসে পূর্ণ-বয়স্ক হরিণদের আক্রমণ করে মেরে ফেলে।

২নং চিত্র

২। নেপালে নতুন পনির তৈরীর কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এখানে চমরী

গরুর দুধ থেকে চাকা চাকা স্বর্ণাভ পনির প্রস্তুত হয়। উৎকর্ষতার দিক থেকে এই পনির সুইস পনিরের সঙ্গে তুলনীয়। সুইস পনির অন্যান্য পনিরের চেয়ে উৎকৃষ্ট।

৩। রক্ত যদি জমাট বেঁধে যায় তাহলে মৃত্যু অবধারিত। সে জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা রক্তের জমাট-বাঁধা বন্ধ করবার বিষয়ে গবেষণা করছেন। এ-বিষয়ে গবেষণার

৩নং চিত্র

ফলে তাঁরা রক্ত থেকে একটি পদার্থ পৃথক করতে সক্ষম হয়েছেন, যা রক্তের জমাট-বাঁধা প্রতিরোধ করতে পারে। পরীক্ষামূলক ক্ষেত্রে এই পদার্থটি প্রয়োগ করে অতি চমৎকার ফল পাওয়া গেছে। থ্রম্বোসিস রোগের চিকিৎসায় এই পদার্থটি ব্যবহার করা হবে।

৪। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু
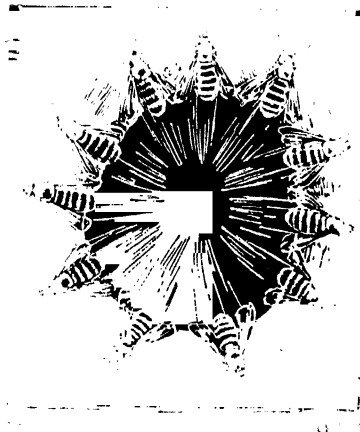
৪নং চিত্র

তারও বহু পূর্ব থেকেই কোন কোন কীত-পতঙ্গ বিশেষ কৌশলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। এই সব কীট-পতঙ্গকে বলা যায় প্রকৃতির ইঞ্জিনিয়ার। মৌমাছিরা

স্মরণাতীত কাল থেকেই বিশেষ ব্যবস্থায় তাদের মৌচাকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। গ্রীষ্মকালে মৌমাছিরা তাদের ডানার সাহায্যে হাওয়া করে চাক ঠাণ্ডা রাখে এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতা বের করে দেয়। আর্দ্রতা বের করে না দিলে চাকের মধু গেঁজে নষ্ট হয়ে যায়। শীতকালে তারা এক জায়গায় ঠাসাঠাসি করে থেকে দৈহিক কসরৎ করে' উত্তাপ সৃষ্টি করে।

৫। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মানুষ পশু-পাখী পুষতে ভালবাসে। এ-সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের একটা সমীক্ষার হিসাব পাওয়া গেছে। তাতে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৫৬টি পরিবারই কোন না কোন পশু-পাখী পুষে থাকে। বেশীর ভাগ লোকেই রং বেরঙের ছোট ছোট মাছ পোষে এবং পোষা মাছের সংখ্যাও হবে মোটামুটি

৫নং চিত্র

প্রায় ১২০ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন=১০ লক্ষ)। এর পরেই বিড়ালের স্থান ; সংখ্যা হলো মোটামুটি ২৭ মিলিয়ন। অন্যান্য পোষা পশু-পাখীর মধ্যে ১৫,০০০,০০০ টিয়া জাতীয় পাখী ; ৬,০০০,০০০ ক্যানারী পাখী ; ৩,০০০,০০০ কচ্ছপ ; ১২,০০০,০০০ গোল্ডফিস এবং প্রায় ১০,০০০ ভোদড় জাতীয় প্রাণী। যুক্তরাষ্ট্রে পোষা বিড়ালের তুলনায় পোষা কুকুরের সংখ্যা প্রায় ২,০০০,০০০ কম। কিন্তু অন্যান্য পোষা পশু-পাখীদের জন্যে যে খরচ হয়, তার অনেক বেশী খরচ হয় পোষা কুকুরদের জন্যে।

৬। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি কোন লোক প্যাঁচার মত জ্ঞানী, মৌমাছির মত কর্মী, ইঁদুরের মত নিরীহ এবং পিঁপড়ের মত সঞ্চয়ী হতে ইচ্ছুক হয়, তবে এই হিসাবে সে সাংঘাতিক ভুল করবে। কারণ জ্ঞানী বলে পরিচিত হলেও প্যাঁচা খুবই নির্বোধ, আর মৌমাছি খুব কম সময়ই কাজ করে ; সুতরাং তাদের নিরলস বলা যায় না। ইঁদুর কখনই শান্ত স্বভাবের পরিচয় দেয় না, তারা ছিচ্‌কে চোর বলে কুখ্যাত

এবং পিঁপড়েরা সঞ্চয়ী বলে পরিচিত হলেও তারা যে খাদ্য সঞ্চয় করে, তা দিয়ে
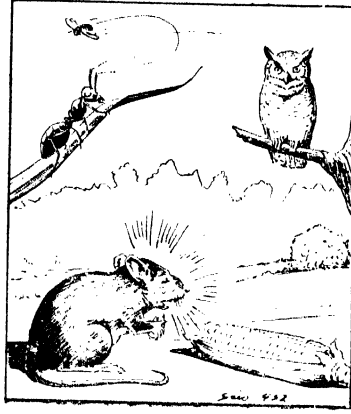
৬নং চিত্র

একটা বাদ্‌লা দিনেও তাদের অভাব মেটে না।

৭। যুক্তরাষ্ট্রের গাড়ী তৈরীর কারখানায় বিভিন্ন অংশ জুড়তে অনেক সময় নষ্ট হয়। তার প্রধান কারণ হলো, গাড়ীর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দেখতে প্রায় একই রকমের। সে জন্যে মিস্ত্রীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে ইলিনয়েস

৭নং চিত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক একটা কার্যকরী উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করেছেন। তাড়াতাড়ি চেনবার সুবিধার জন্যে তিনি গাড়ীর বিভিন্ন অংশগুলিকে বিভিন্ন রঙে চিহ্নিত করবার কথা বলেছেন।

৮। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল হেল্‌থ ইনষ্টিটিউটে চিনির তুলনায় ৩০০ গুণ মিষ্টি একটি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থ নিয়ে জোর গবেষণা চলছে। এই যৌগিক পদার্থটি

ষ্টিভিওসাইড (Stevioside) নামে পরিচিত। পদার্থটি একজাতের গাছ থেকে পাওয়া যায় এবং এই গাছ প্যারাগুয়ের বনে-জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। বহু

৮নং চিত্র

শতাব্দী যাবৎ সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা এই গাছের পাতা শুকিয়ে গুঁড়া করে চায়ের সঙ্গে মিষ্টি হিসাবে ব্যবহার করে আসছে।

৯। বিজ্ঞানীরা বলেন—অনেকক্ষণ রোদে থাকলে সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মিতে মানুষের গায়ে চামড়া পুড়ে যায়—ঠিক আগুনে পোড়ার মত। মানুষের চামড়ায় একরকম রঞ্জক পদার্থ থাকে—তা আলট্রাভায়োলেট রশ্মির পোড়া থেকে চামড়াকে রক্ষা করে। কিন্তু বেশীক্ষণ রোদে থাকলে—রঞ্জক পদার্থের এই সংরক্ষণ-

৯নং চিত্র

ক্ষমতার চেয়ে আলট্রাভায়োলেটের ক্ষমতা প্রবলতর হয়ে পড়ে; ফলে, রোদে চামড়া পুড়ে যায়। কালো রঙের চামড়ার চেয়ে কটা রঙের চামড়া সূর্যালোকে অতি

সহজেই পুড়ে যায়। আরও দেখা গেছে, নিগ্রোদের তুলনায় ককেশিয়ানদের গায়ের চামড়া সহজেই রোদে পুড়ে যায়।

১০। যুক্তরাষ্ট্রের মোটর গাড়ীর চালকেরা ১৯৫৯ সালে মোট যত মাইল
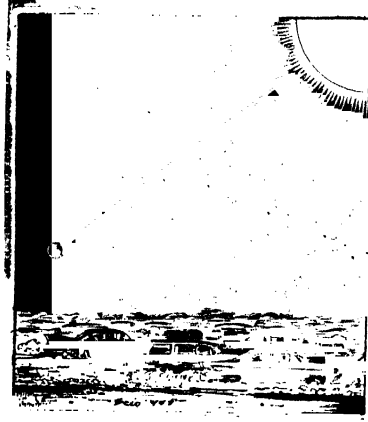
১০নং চিত্র

পথ পরিক্রমা করেছে—তার পরিমাপ হলো পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের ৬,২৩৬ গুণ বেশী। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হলো গড়ে প্রায় ৯৩,০০০,০০০ মাইল।

১১। পাখীরা স্যাঁৎসেতে আবহাওয়ায় ভূমি থেকে খুব বেশী উঁচুতে ওঠে না—ভূমির কাছাকাছিই উড়ে বেড়ায়। বিজ্ঞানীদের মতে, এর কারণ হলো—স্যাঁৎসেতে

১১নং চিত্র

বা ভিজা আবহাওয়ায় কীট-পতঙ্গের ডানা ভিজে গিয়ে ভারী হওয়ার ফলে তারা বেশী উঁচুতে উড়তে পারে না। কাজেই পাখীরা ওই সব কীট-পতঙ্গ শিকার করবার উদ্দেশ্যে ভূমির কাছাকাছিই উড়ে বেড়ায়।

১২। গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroid) হলো কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের সমষ্টি। এক-একটা গ্রহাণুপুঞ্জে ৩,০০০ বা তারও বেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ একসঙ্গে বিচরণ করে।

১২নং চিত্র

কিন্তু এরূপ ক্ষুদ্র গ্রহগুলির কোনটিরই ব্যাস ৪৮০ মাইলের বেশী নয়। এরা মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে অবস্থান করে' সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

১৩। গ্রহান্তরবাসী বুদ্ধিমান জীবের খোঁজে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন-এর বৈজ্ঞানিকেরা সম্প্রতি প্রণালীবদ্ধ গবেষণা চালিয়েছিলেন। এই গবেষণার আগে এরূপ সুপরিকল্পিতভাবে এই সম্পর্কে আর কোন কাজ হয় নি। টাউ সেটি এবং

১৩নং চিত্র

এপ্‌সিলন এরিড্যানি নক্ষত্রের সঙ্গে বিশেষ রকমের রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের অনুমান, এই নক্ষত্র দুটির সঙ্গে পৃথিবীর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

১৪। বজ্রপাতে বিদ্যুৎস্ফুরণের সময় নানারকম রং দেখা যায়। সাধারণ সাদা

রং অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের দ্বারা সৃষ্ট হয়। জলীয় বাষ্প থাকলে হাইড্রোজেন সংযুক্ত হয়ে লাল বা পাটল বর্ণ খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধূলাবালিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে

১৪নং চিত্র

হলুদে বা লাল রঙের বিদ্যুৎ-স্ফুরণ দেখা যায়। এছাড়া কখনও কখনও বাজ পড়বার সময় বেগুনী এবং সবুজ রঙের বৈদ্যুতিক ঝিলিকের কথাও জানা গেছে।

১৫। ক্যানাডার দু'জন বিজ্ঞানী মাছের পেশী থেকে স্নেহজাতীয় পদার্থ-বর্জিত প্রোটিনবহুল একপ্রকার পদার্থ বের করতে সক্ষম হয়েছেন। এই পদার্থটিকে সাধারণ-ভাবে মাছের ময়দা বলা হয়। এই ময়দা খেলে প্রোটিনের অভাব অনেক পরিমাণে পূর্ণ

১৫নং চিত্র

হয় এবং এর দ্বারা জনস্বাস্থ্যেরও উন্নতি সাধিত হতে পারে। এই ময়দা কড্ মাছ থেকে তৈরী হয়। কড্ মাছ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

১৬। যুক্তরাষ্ট্রে এক রকম বিস্ময়কর আঠা তৈরী হয়েছে। এই আঠার জোড়

এতই শক্তিশালী যে, প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে ৭০০০ পাউণ্ডেরও বেশী টান প্রতিরোধ করতে পারে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের এক কোম্পানী এক ফোঁটা এই আঠার সাহায্যে চারজন
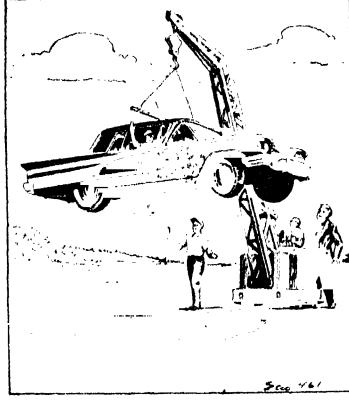
১৬নং চিত্র

আরোহী সমেত একটা মোটর গাড়ীকে একটা লোহার রডের সঙ্গে জুড়ে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।

১৭। বিশেষজ্ঞদের মতে—উদ্ভিদের মধ্যে একমাত্র বাঁশই পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর সব দেশেই বাঁশ জন্মায়। তৃণজাতীয় উদ্ভিদের

১৭ নং চিত্র

মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে বাঁশ। বাঁশ ঝাড় অনেক বড় বড় বন-জঙ্গলের সৃষ্টি করে।

১৮। আমাদের ধারণা—দৈহিক বিশ্রামের জন্যেই আমরা ঘুমাই। বিজ্ঞানীরা কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন। বিজ্ঞানীরা বলেন—মানুষ প্রধানতঃ মস্তিষ্ক, বিশেষতঃ

সেরিব্র্যাল কর্টেক্সকে বিশ্রাম দেবার জন্যেই ঘুমিয়ে থাকে। সেরিব্র্যাল কর্টেক্সেই

১৮নং চিত্র

মানুষের উন্নত বৃত্তিগুলি, যেমন—কথা বলবার ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, দর্শনশক্তি, যুক্তি, কল্পনাশক্তি প্রভৃতির কেন্দ্র অবস্থিত।

বিবিধ

পৃথিবীতে বৎসরে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ লোক বৃদ্ধি

২৮শে অগাষ্ট রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে জন-পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, পৃথিবীর লোকসংখ্যা হইতেছে, প্রায় ২৯০ কোটি এবং প্রতি বৎসরে প্রায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ করিয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশ্বের লোকসংখ্যার অর্ধেকের বেশী বাস করে চারিটি রাষ্ট্রে—চীন (৬৬ কোটি), ভারত (৪০ কোটি ৩০ লক্ষ), সোভিয়েট ইউনিয়ন (২০ কোটি ৯০ লক্ষ) এবং যুক্তরাষ্ট্র (১৭ কোটি ৮০ লক্ষ)। লোকসংখ্যার দিক হইতে বৃটেনের স্থান দশম। বৃটেন অপেক্ষা জাপান (৯ কোটি ২০ লক্ষ), পাকিস্থান, ইন্দোনেশিয়া, ব্রেজিল এবং পশ্চিম জার্মেনীর লোকসংখ্যা বেশী। এই রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটির লোকসংখ্যা ৫ কোটির অধিক। গড় পরমায়ুর দিক হইতে ভারতেই গড় পরমায়ু সর্বাপেক্ষা কম। ভারতে গড় পরমায়ু হইতেছে ৩২। যে কয়েকটি অঞ্চলে নারী অপেক্ষা পুরুষের পরমায়ু বেশী, ভারত তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম অঙ্গ

বৃটেনে এমন একটি উপকরণ উদ্ভাবিত হইয়াছে, যাহার সাহায্যে হস্তহীন ব্যক্তিরা পেশী সঞ্চালন করিয়া তাহাদের কৃত্রিম অঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারিবে। এই সমস্ত পেশীর সহিত যুক্ত ইলেক্‌ট্রোডগুলি ঘনীভূত বায়ুর দ্বারা চালিত যান্ত্রিক উপকরণগুলিতে শক্তি সঞ্চার করিবে। রোগী তাহার অঙ্গ-সঞ্চালনের গতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে এবং কৃত্রিম হাতের সাহায্যে কোন কিছু ধরা বা তোলার কাজও করিতে পারিবে।

এই যান্ত্রিক উপকরণটির উদ্ভাবক হইলেন একদল বৃটিশ কারিগর এবং লণ্ডনের নিকটে অবস্থিত ওয়েষ্ট হেন্ডন হাসপাতালের চিকিৎসকগণ।

আশা করা যায়, দুই বৎসরের মধ্যে এই উপকরণটি ব্যাপকভাবে নির্মাণ করা সম্ভব হইবে। হেন্ডন ইউনিটটি এক্ষণে ইহার সাজসরঞ্জামের আকার ক্ষুদ্রতর করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। প্রকাশ, ইহাতে ব্যবহৃত ব্যাটারী এবং এয়ার-সিলিণ্ডারের আকার ক্রমশঃ পকেট-সাইজের হইবে। পদহীন ব্যক্তিদের জন্য এই ধরণের উপকরণ উদ্ভাবন সম্ভব নয়, বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই বৃটিশ উদ্ভাবন সম্পর্কে বিশদ বিবরণ ২১শে জুলাই হইতে ২৭শে জুলাই লণ্ডনের অন্তর্গত অলিম্পিয়ায় মেডিক্যাল ইলেকট্রনিক্স্ সম্পর্কে যে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে উপস্থাপিত একটি প্রবন্ধ হইতে জানা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন অংশের সহস্রাধিক প্রতিনিধি উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ইলেক্‌ট্রনিকসের ব্যবহার সম্পর্কে একটি প্রদর্শনীও এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

চন্দ্র মারফৎ যোগাযোগ

পাই টেলিকমিউনিকেশন্‌স্ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ জে. আর. ব্রিংকলি সম্প্রতি লণ্ডনে বলেন যে, তাঁহার প্রতিষ্ঠান জড্রেল ব্যাঙ্ক (চেশায়ার) রেডিও-টেলিস্কোপ কেন্দ্রে অধ্যাপক এ. সি. বি. লভেল ও তাঁহার কর্মচারীদের সহায়তায় চন্দ্রের মারফৎ যোগাযোগ স্থাপনের সম্ভাবনা সম্পর্কে পরীক্ষার কাজ চালাইয়াছেন।

কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে ভাষণদান কালে মিঃ ব্রিংকলি বলেন, জড্রেল ব্যাঙ্ক কেন্দ্রে কাজ করিবার সময় তিনি চন্দ্র হইতে প্রতি-ফলিত সাঙ্কেতিক ধ্বনি স্পষ্টভাবে শুনিতে পান এবং ১৮ মাসের পরীক্ষার ফলে তাহা সম্ভব হয়।

প্রসঙ্গতঃ তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার আজ আর সন্দেহ নাই যে, চন্দ্রের মারফৎ শব্দ প্রেরণ সম্ভব হইবে।

সম্মেলনে জড্রেল ব্যাঙ্কে চন্দ্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া যে সঙ্কেত ফিরিয়া আসে, তাহার টেপ-রেকর্ডিং শোনানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ম্যাসাচুসেট্‌স্ হইতে চন্দ্রের মারফৎ যে সঙ্গীত জড্রেল ব্যাঙ্কে প্রেরিত হয়, তাহার টেপ-রেকর্ডিংও এই সঙ্গে শোনানো হয়।

ট্র্যান্‌সমিটার

শেফীল্ড (লণ্ডন) রেডিও-থেরাপি কেন্দ্রে আন্ত্রিক রোগের চিকিৎসার সুবিধার জন্য ক্যাপসুলের মধ্যে গলাধঃকরণের উপযোগী একটি অতি ক্ষুদ্র রেডিও ট্র্যান্‌সমিটার উদ্ভাবনের চেষ্টা চলিয়াছে। এই রেডিও পিলটি রোগী গলাধঃকরণ করিলে পিলের অভ্যন্তরস্থ ট্র্যান্‌সমিটারটি পাকস্থলীর অম্লতা সম্পর্কে সমস্ত খবরাখবর রোগীর শয্যাপার্শ্বস্থিত সূক্ষ্ম রিসিভারটিকে জানাইয়া দিতে পারিবে।

ক্যাপসুলটি আকারে ½ ইঞ্চি ¼ ইঞ্চির অধিক হইবে না। উদরস্থ তাপ ও চাপ পরিমাপের জন্য এই ধরণের ক্যাপসুল ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কোথাও কোথাও প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বৃটিশ মানমন্দির কর্তৃক দূরতম নক্ষত্রপুঞ্জ আবিষ্কার

কেম্ব্রিজের মুলার্ড রেডিও-অ্যাষ্ট্রনোমি অবজার-ভেটরিতে গবেষণামূলক কাজকর্মের ফলে ৫,০০০ মিলিয়ন আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত একটি নক্ষত্র-পুঞ্জ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই নেবুলা বা নক্ষত্র-পুঞ্জের নাম হইয়াছে "৩ সি-২৯৫", ব্রহ্মাণ্ডের ইহাই বোধ হয় সুদূরতম বস্তু। অবজারভেটরি কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাবলী হইতে মাউণ্ট প্যালোমার (যুক্তরাষ্ট্র) অপটিক্যাল টেলিস্কোপের সাহায্যে এই নক্ষত্রপুঞ্জের আলোকচিত্র গৃহীত হয়।

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত রয়্যাল সোসাইটির ত্রিংশৎবার্ষিকী প্রদর্শনীতে এই আবিষ্কার কি ভাবে সম্ভব হইয়াছে, তাহা নানা তথ্যের মধ্য দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভিসিওফোন

টেলিফোনের আরও উন্নত এক পর্যায় হলো ভিসিওফোন ছোট বাক্সের মত একটি যন্ত্র—টেলিভিশন সেটের মতই একটি ছোট্ট পর্দা আছে সামনে। এক পাশে আছে একটি ডায়াল, আর কয়েকটি বোতাম। যার সঙ্গে কথা বলতে চান, তার সঙ্গে যোগস্থাপন করুন। তারপর একটি বোতাম টিপুন। তৎক্ষণাৎ আপনার ভিসিওফোনের পর্দায় ফুটে উঠবে আপনার সঙ্গে কথা বলায় রত ব্যক্তির চেহারা। তিনিও তার ভিসিওফোনের পর্দায় আপনাকে দেখতে পাবেন। অর্থাৎ এই ভিসিওফোন হলো টেলিফোন আর টেলিভিশনের সমন্বয়।

অল্প দূরত্বের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে এই ভিসিওফোনের ব্যবহার সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে অনেক দিন থেকেই চালু আছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ইদানীং ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও একে প্রয়োগ করেছেন। সম্প্রতি সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ারেরা মস্কো-লেনিনগ্রাড ভিসিওফোন-লাইন স্থাপনের এক পরিকল্পনা রচনা করেছেন এবং শীঘ্রই এর কাজ সুরু হবে।

এত দীর্ঘ ভিসিওফোন-লাইন স্থাপিত হতে চলেছে এই প্রথম।

কাঠের পরিত্যক্ত অংশ থেকে রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা কাঠের পরিত্যক্ত অংশ, কাঠের গুঁড়া, গাছের বাকল, টুক্‌রা কাঠের মণ্ড প্রভৃতি থেকে নানা জিনিষ তৈরী করছেন। গাছের বাকল, ওক গাছের গুঁড়া থেকে সায়েনাইড প্রভৃতি বহু রাসায়নিক পদার্থ তৈরী হয়েছে। কাপড়চোপড় রং করায়, চামড়া ট্যানিং এবং ব্লুপ্রিণ্ট কাগজ তৈরীতে এসব দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। ফার গাছের বাকল থেকে তৈরী হয়েছে কোয়েরসেটিন নামে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ। এই জিনিষটি মাখন প্রভৃতি স্নেহজাতীয় পদার্থ সংরক্ষণের কাজে লাগে। আর এক ধরণের গাছের বাকল থেকে আঁঠা তৈরী হয়ে থাকে। এই আঁঠা ওয়াটার-প্রুফ কাপড় তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। প্লাষ্টিক ও রং তৈরীতে, কৃষিকার্যে এবং বড় বড় রাস্তা নির্মাণের কাজেও কাঠ থেকে উৎপন্ন রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ প্রয়োগ করা হচ্ছে।

চন্দ্রে পদার্পণের তোড়জোড়

চাঁদে দিনের বেলার তাপমাত্রা ২১৪° ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং রাত্রির তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ২৫০° ডিগ্রী পর্যন্ত নেমে যায় বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান। এই অবস্থায় মহাশূন্যযানের সাহায্যে সেখানে পৌঁছাতে পারলে কোথায় যে তাঁরা অবতরণ করবেন, সে বিষয়ে পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে। চাঁদের উপরিভাগ এবড়ো-খেবড়ো—তাতে আবার বিরাট গহ্বর রয়েছে। এই সব বিরাট গহ্বরের নীচের দিকটি সমতল। শীতাতপ থেকে আত্ম-রক্ষার জন্যে ঐ সব গহ্বরের অভ্যন্তর ভাগই চন্দ্র উপগ্রহে যাত্রীদের অবতরণের প্রকৃষ্ট স্থান—যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগের বিজ্ঞানীরা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বহু তথ্যসমৃদ্ধ তিনটি মানচিত্র তৈরী করেছেন। উল্কা ও আগ্নেয়গিরির জন্যে এসব বিরাট গহ্বর এবং আগ্নেয়গিরির লাভা-স্রোতে অন্তহীন বালির সাগর সৃষ্টি হয়েছে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োদশ বর্ষ | অক্টোবর, ১৯৬০ | দশম সংখ্যা

জরা সম্বন্ধে দু-চার কথা *

শ্রীসতী রায়

কালের নিয়মে দেহীমাত্রেই বার্ধক্যের অধীন। প্রৌঢ়ত্বের পর বার্ধক্য আসে, বার্ধক্যে দেহ জরায় আক্রান্ত হয়। জরা দেহের গঠন, আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়, দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রের কর্মকুশলতা হ্রাস করে। তবুও বার্ধক্য বলতে সব সময় জীবনের কোন অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি, বিশেষ রোগের আবির্ভাব বা দেহের বিকৃতিকে বোঝায় না। বয়সের হিসাবে বার্ধক্য আসে না, অর্থাৎ বছরের সংখ্যা হিসাবে মানুষকে বৃদ্ধ বলা চলে না। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য যতদিন জীবনকে ঘিরে থাকে, দেহ যতদিন সবল ও সুস্থ থাকে, বয়সের মাপকাঠিতে তাকে বৃদ্ধ বলা যায় না।

বিভিন্ন মানুষের জীবনে বিভিন্ন সময়ে বার্ধক্য আসে। কেউ কেউ চল্লিশ বছর বয়সেই জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, আবার কেউ কেউ নব্বই বছর অতিক্রম করেও যুবকের মত সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে, মৃত্যুর ফতোয়াকে তারা ভয় করে না।

বার্ধক্যে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম পরিবর্তন ঘটে। কেউ হয় শুভ্রকেশ কেউ হয় বিরল কেশ—মসৃণ চিক্কণ টাকের অধিকারী। অনেকের মধ্যে আবার উভয়ের একত্র সমাবেশও দেখা যায়। কেউ হয় দন্তহীন, কেউ বা দন্তরোগে কাবু। দেহ হয় অবনত—কুব্জ। দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে—অক্ষিগোলক ঠিকমত নড়াচড়া করতে পারে না; কাজেই মানুষ বার্ধক্যে সব সময় সব দিকে দৃষ্টি রাখতে পারে না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চোখে ছানি পড়ে, চোখের তারা ছোট হয়ে যায়, চোখের পাতা ঝুলে পড়ে। কপাল ও চোখের কোণে বলিরেখা দেখা দেয়। শ্রবণশক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে। চামড়া ঢিলা হয়ে পড়ে—কুঁচকে যায়। এই রকম ঘটবার কারণ হচ্ছে, মাংসপেশীর কোলাজেন ফাইবারের প্রকৃতি ও উপাদানের পরিবর্তন। মাংসপেশীর জোর কমে যায়। পেশীগুলির সমবেতভাবে সমতালে কাজ করবার ক্ষমতা ব্যাহত হয়। মাংসপেশী বেশী সঙ্কুচিত হয়। শরীরের অধিকাংশ যন্ত্রপাতিই সংযোগকারী তন্তু দিয়ে গঠিত। বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে এই তন্তুগুলিও শিথিল হয়ে পড়ে। কোলাজেন ফাইবার সংযোগকারী তন্তুর প্রধান উপাদান; কোলাজেন ফাইবারের

তাই অবস্থান্তর ঘটে, আর জড়িত হয়ে পড়ে বার্ধক্যের কয়েকটা রোগের সঙ্গে, যেমন—আর্থ্রাইটিস, ক্রনিক রিউম্যাটিজম, চামড়ার পরিবর্তন, এমন কি আর্টারিওস্ক্লেরোসিস্ও (arteriosclerosis)। এগুলি সব 'কোলাজেন রোগ' নামে পরিচিত।

কোলাজেন ফাইবার গ্লাইসিন্, হাইড্রক্সিপ্রোলিন ইত্যাদি অনেকগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিডে প্রস্তুত পেপটাইড শৃঙ্খল দ্বারা গঠিত। এর ফাইবারের অণুগুলি জড়াজড়ি করে অবস্থিত। উত্তাপ দিলে ফাইবারগুলি সঙ্কুচিত হয়, আর তা থেকে হাইড্রক্সিপ্রোলিন ও মিউকোপলিস্যাকারাইড নিঃসৃত হয় এবং স্থিতিস্থাপক তন্তুর ধর্মপ্রাপ্ত হয়। উত্তাপ দেবার ফলে কোলাজেনের যে রকম সঙ্কোচন ঘটে, বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে এই প্রক্রিয়া দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নিরূপিত হয়েছে যে, মানবদেহের এই পরিবর্তন ঘটে সমগ্র জীবন ধরে, যখন তাপমাত্রা পৌঁছায় ৩৮° সেন্টিগ্রেডে। এজন্যে যুবকের চেয়ে বৃদ্ধের কোলাজেন ফাইবার বেশী সঙ্কুচিত হয়। একটা ছোট পরীক্ষায় এই সিদ্ধান্তকে আরো পরিস্ফুট করা হয়েছে। এই পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, অল্প বয়স্ক ও অধিক বয়স্ক ইঁদুরের লেজ থেকে নেওয়া ফাইবারে উত্তাপ দেবার ফলে সঙ্কুচিত হয়েছে। উভয়ের ফাইবারের সঙ্কোচনের সমান সমান ওজনও নির্ধারণ করা হয়েছে। বৃদ্ধ ইঁদুরের সঙ্কুচিত ফাইবারের ওজন অল্প বয়স্কের ফাইবারের চেয়ে অনেক বেশী; কারণ বৃদ্ধ ইঁদুরের ফাইবার বেশী সঙ্কুচিত হয়।

বার্ধক্যে ফাইবারের মধ্যে পলিপেপটাইডের শৃঙ্খলগুলি সোজাসুজি জড়িয়ে না থেকে আড়াআড়িভাবে থাকে। ফলে কোলাজেন ফাইবারগুলি শক্ত হয়ে পড়ে এবং বেশী সঙ্কুচিত হয়। দেহের অধিকাংশ যন্ত্রপাতিই সংযোজক তন্তুর প্রধান উপাদান কোলাজেন দিয়ে প্রস্তুত; তাই সব দেহেরই পরিবর্তন সংঘটিত হয় বৃদ্ধ বয়সে।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া, অর্থাৎ রিফ্লেক্স ক্রিয়া যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয় না। শতকরা পঁচাত্তর ভাগ হাঁটুর সন্ধির প্রতিক্রিয়া (Knee jerk), আর শতকরা বারো ভাগ গোড়ালির সন্ধির প্রতিক্রিয়া (Ankle jerk) আশী বছর বয়স পর্যন্ত অপ্রতিহত থাকে। উদরের মাংসপেশীসমূহের সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্ষমতা কিছু পরিমাণে হ্রাস পেতে চায়। অনুভূতি সংজ্ঞাবাহী পথের (Sensory pathway) গোলযোগই এসব প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার উপযুক্ত পরিমাণে সাড়া না দেবার কারণ বলে অনুমিত হয়। বার্ধক্যের সঙ্গে মস্তিষ্কের তড়িৎ-অনুলেখের (Electro-encephalogram) পরিবর্তন ঘটে। মস্তিষ্কের আচ্ছাদনের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ মৃদুভাবে চলাচল করে।

এরপর রক্তসংবহন-তন্ত্রের পরিবর্তনের কথায় আসা যাক। হৃৎপিণ্ড, শোণিত সরবরাহকারী ধমনী ও শিরার অবস্থান্তর লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ ব্র্যাডিকার্ডিয়া প্রকাশ পাওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। এর কারণ হচ্ছে, ভেগাস স্নায়ুর ঠিকমত টানভাব না থেকে শিথিল হয়ে যাওয়া। সিস্টোলিক হাইপারটেনসন, অর্থাৎ রক্তচাপাধিক্য অধিকাংশ সুস্থ বয়স্ক লোকের মধ্যে দেখা যায়। তাছাড়া আকৃতিতে ছোট, বয়স্ক ব্যক্তির ধূসর হৃৎপিণ্ড তরুণের তুলনায় অনুপযোগী মনে হয়। কিন্তু কুড়ি বছর বয়স্ক যুবকের বড় আকারের রক্তাভ হৃৎপিণ্ডের চেয়ে বৃদ্ধের হৃৎপিণ্ড অনেক সময় অনেক বেশী যোগ্যতা দেখিয়ে থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে করোনারী রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা প্রসারিত হয়। একটি ষাট বছরের বৃদ্ধ হৃৎপিণ্ড কুড়ি বছর বয়স্কের হৃৎপিণ্ডের চেয়ে কম আয়াসে করোনারী রক্তনালীর প্রতিবন্ধকতার প্রাবল্য (Coronary occlusion) ঠেকাতে সক্ষম হয়।

বৃদ্ধদের হৃৎপিণ্ডে পিগমেণ্ট গ্র্যানিউল বা রঞ্জক-কণা জমা হয়। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর সঙ্কোচনশীলতা ও উত্তেজনাপ্রবণতার হ্রাস পরিদৃষ্ট হয়। এ-ছাড়া আর কোন বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয় না, যার ফলে বৃদ্ধ বয়সে সুস্থভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তবে হৃৎপিণ্ডের উপর অযথা অস্বাভাবিক চাপ না দেওয়াই কর্তব্য।

বার্ধক্যে শোণিতের উপাদানের কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। পঁচাত্তর বছর বয়সের পর পূর্ণবয়স্ক যুবকের তুলনায় হিমোগ্লোবিন ও প্যাক্ট সেল ভলিউমের পরিমাণ শতকরা এক থেকে দু'ভাগ হ্রাস পায়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরিথ্রোসাইট সেডিমেণ্টেসন রেট কিছু বেড়ে যায় এবং কালার-ইন্‌ডেক্স একের অতিরিক্ত হয়। পঞ্চাশোত্তীর্ণ ব্যক্তির রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ শতকরা প্রায় ১০১ মিলিগ্র্যাম। রক্তরসের প্রোটিনের ভাগ যুবকের চেয়ে শতকরা ১০ থেকে ১৬ ভাগ হ্রাস পায়। বৃদ্ধদের নন্‌প্রোটিন নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইউরিক অ্যাসিড শতকরা ২৮ মিলিগ্র্যাম বাড়ে। রক্তের ইউরিয়াও শতকরা ১৫ থেকে ৬০ মিলিগ্র্যাম বর্ধিত হয়। এই ইউরিয়া বৃদ্ধি স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যেই বেশী দেখা যায়।

ঋতুবন্ধের পর পঞ্চাশোত্তীর্ণা স্ত্রীলোকদের রক্তরসের কোলেস্টেরলের পরিমাণ হ্রাস পায়। বার্ধক্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই ভিটামিন-এ ও ক্যারোটিনের পরিমাণ হ্রাস পায়। ধমনীর প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ্য বস্তু অধিক পরিমাণে বাহিত হয়। বয়েড বলেছেন, "Man is as old as his artery"—মানুষের ধমনী যত পুরনো হয়ে আসে মানুষও তত বার্ধক্যে উপনীত হয়। ধমনীর প্রাচীরের মধ্য স্তরের স্থিতিস্থাপক তন্তুগুলি কঠিন ও স্থির হয়ে যায়। এর ফলে ধমনীতে স্পন্দনের গতি দ্রুততর হয় এবং রক্তস্রোতের চলাচল ব্যাহত হয়। ধমনীর প্রাচীরের উপাদানের পরিবর্তন ঘটে ও আর্টারিওস্ক্লেরোসিস রোগ উৎপত্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বক্ষ-প্রাচীরের গতিশীলতা কমে আসে। ফুস্‌ফুসের স্থিতিস্থাপকতা এবং জোরে নিঃশ্বাস নেবার ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফুস্‌ফুসের আয়তন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ফুস্‌ফুসের সম্পূর্ণরূপে রক্ত পরিশোধন প্রক্রিয়া কিছুটা ব্যাহত হয়।

বৃদ্ধ বয়সে খাদ্য পরিপাকের শক্তি কমে যায়। অনেক সময় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিঃসরণ কম হয়। ক্ষুধাবোধ ও বিপাক প্রক্রিয়ার তীব্রতা হ্রাস পায়। বার্ধক্য বিপাক-ক্রিয়ার উপর বিশেষরূপে প্রতিফলিত হয়।

শরীরাভ্যন্তরের যন্ত্রসমূহের কিছু কিছু আকৃতিগত পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হয়। প্রাণীদের দেহবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কোষের আয়তনও বৃদ্ধি পায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যকৃতের কোষের অন্তর্বর্তী ইনট্রাসেলুলার স্পেসের পরিমাণও বর্ধিত হয়। গলবিলের কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু তার অন্তঃক্ষরণ পরিমিত হয় না এবং এজন্যে বিপাক-ক্রিয়ার তীব্রতাও হ্রাস পায়। তাছাড়া অধিকাংশ গ্রন্থি থেকে অন্তঃক্ষরণ উপযুক্তভাবে হয় না। স্বাভাবিক অবস্থায় বীর্যবাহী নল থেকে ইন্‌হিবিন নামক একটি হর্মোন নিঃসৃত হয়। এই ইন্‌হিবিন পিটিউটারী থেকে অতিরিক্ত পুংগ্রন্থি-উদ্দীপক হর্মোন নিঃসরণে বাধা প্রদান করে। বৃদ্ধ বয়সে বীর্যবাহী নলগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হলে বেশী ইন্‌হিবিন নিঃসৃত হতে পারে না; ফলে প্রচুর পুংগ্রন্থি-উদ্দীপক হর্মোন নিঃসৃত হয়ে প্রস্টেটের অতিরিক্ত বৃদ্ধি সাধন করে। একে Klinefelter syndrom বলে। অনেকের ধারণা, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট্রোজেন নামক হর্মোনটির ক্ষরণ বেড়ে যায় ও টেস্টোস্টেরোন নামক পুং-হর্মোনটির নিঃসরণ হ্রাস পায়। সেই কারণেও প্রস্টেটের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

লুইস এবং এলভিং বিভিন্ন বয়সের কিড্‌নি পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অধিকাংশ বয়স্ক লোকের ইউরিয়া ক্লিয়ারেন্স, ডাই-ওড্রাস্ট ক্লিয়ারেন্স ও ইনডলিন ক্লিয়ারেন্সের অবনতি অবধারিত। তাছাড়া রক্তে ইউরিয়া নাইট্রোজেনের ভাগে প্রাচুর্য দেখা যায়। বৃদ্ধ বয়সে কিড্‌নির শিরাসমূহ শক্ত ও দৃঢ় হয়ে পড়ে। এই কারণে শিরা ও কিড্‌নির ভিতর দিয়ে ইলেকট্রোলাইট (জলীয় পদার্থ) ভালভাবে বের হতে পারে না বলে জন্য অসাম্যতা প্রকাশ পায় এবং অনেক অবাঞ্ছিত আয়নায়িত পদার্থ শরীরের মধ্যে সঞ্চিত থেকে যায়। কিড্‌নির শোষণ ক্ষমতা ব্যাহত হয়। কিড্‌নির মধ্যে রেনিন ও হাইপারটেনসিন নামক দুটি হর্মোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলেই রক্তের চাপাধিক্য ও মূত্রাধিক্য ঘটে। মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূত্রত্যাগের পরিমাণও কমে যায়। আবার বৃদ্ধ বয়সে কোন কোন পুরুষের মূত্রাশয় ও মূত্রনালীর সংযোগ-স্থলে প্রস্টেট নামক যে গ্রন্থিটি মূত্রনালীকে ঘিরে থাকে, তার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যেই মূত্রকৃচ্ছ্রতা ঘটে।

বৃদ্ধ বয়সে শরীরের বিষাক্ত পদার্থ দূরীকরণের শক্তি মন্দীভূত হয়ে আসে, হিপিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতিকরণ অনেক কমে যায় এবং রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করবার শক্তি হ্রাস পায়।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যৌনগ্রন্থির আকৃতি ও শক্তি অব্যাহত থাকে না। শারীরতত্ত্ববিদ ব্রাউন সিকোয়ার্ড এটা লক্ষ্য করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি নিজের শরীরে পুং-গ্রন্থির নির্যাস প্রবেশ করিয়ে হৃতশক্তি অনেক পরিমাণে ফিরে পেয়েছিলেন। ফ্রান্সের ডাঃ ভরোনফ্‌ এবং জার্মেনীর স্টাইনাকেরও ধারণা ছিল যে, বার্ধক্যের প্রভাবে পুং-গ্রন্থির ক্ষয় হয় এবং তার ফলে ঐ গ্রন্থির অন্তঃক্ষরণও হ্রাস পায়। বৃদ্ধের ক্ষয়প্রাপ্ত পুং-গ্রন্থির স্থলে বনমানুষের টেষ্টিস সংস্থাপিত করে তাঁরা দেখেছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে ঐ গ্রন্থি সংযোজনের ফলে যৌবনের প্রাণশক্তি ও নবজীবনের উদ্দীপনা পুনরুজ্জীবিত হয়। অবশ্য এই নবজীবন সঞ্চারকারী তন্তু, গ্রহণকারীর শরীরে অধিক কাল জীবিত থাকে না।

পুং-গ্রন্থির ক্ষয় প্রাপ্তির সঙ্গে বার্ধক্যের সম্বন্ধ সব সময় না-ও থাকতে পারে। একটা নির্দিষ্ট বয়স পেরিয়ে যাবার পর স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষের পরিবর্তন সাধিত হয়। তবুও এই ঘটনা বার্ধক্যের একটা অবধারিত ফল নয়। ওভারির অপারেশনও বার্ধক্য আনয়ন করে না। বৃদ্ধ বয়সে যে সব ক্ষয়-ক্ষতি দেখা যায়, তা অপরিবর্তনীয়। সংযোজনকারী টেষ্টিকুলার তন্তু দিয়ে পুনর্যৌবন আশা করা বাতুলতা। শরীরে ঐ তন্তু-নিঃসৃত হর্মোন অস্থায়ী এবং ঐ তন্তু ক্ষীণজীবী। ফলে শরীরে যে সক্রিয়তা দেখা দেয়, সেটা সাময়িক।

পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যেক জীবকে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বেঁচে থাকতে হয়। মাতৃজঠরে ভ্রূণ বেড়ে উঠতে থাকে, সেই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে পৃথিবীর আলো-বাতাসের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। শ্বাসক্রিয়া, রক্তসংবহন, পুষ্টিসাধন প্রভৃতি সব কিছুই নতুন খাতে প্রবাহিত হয়ে তাকে পৃথিবীতে বাঁচবার উপযোগী করে তোলে। কিন্তু যতই সে বড় হয়ে ওঠে, পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাওয়াবার ক্ষমতা তার ততই হ্রাস পায়। তাই বার্ধক্যে এই ক্ষমতা সব চেয়ে কমে যায়।

বৃদ্ধদের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করবার জন্যে সুলভ ও স্বল্পজীবী প্রাণী নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে "উত্তাপ-নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা", সম্পাদন করা হয়েছে। এই পরীক্ষায় অল্পবয়স্ক ও অধিক বয়স্ক সাদা ইঁদুরকে এক ঘণ্টাকাল –৩° থেকে –৭° সেন্টিগ্রেড নিম্ন উত্তাপের মধ্যে রাখা হয়েছে। দেখা গেছে, প্রথমোক্ত ইঁদুরগুলি উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত করে দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায়

রাখে। কিন্তু বৃদ্ধ ইঁদুরগুলির দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কমে যায়। দেহের তাপ সুনিয়ন্ত্রিত করবার অক্ষমতার জন্যে দুটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে—(১) হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র বার্ধক্যের দরুণ অনুপযুক্ত হয়ে পড়া, (২) বার্ধক্যে মাংসপেশীর সমভাব হ্রাস পাওয়া। তাই জরাগ্রস্ত দেহের তাপ হ্রাস পেলে মাংসপেশী সে ক্ষতিপূরণে অক্ষম হয়ে পড়ে। তাছাড়া কম চাপবিশিষ্ট (৩৫০ মিলিমিটার পারা) প্রকোষ্ঠে সাদা ইঁদুর রেখে দেখা গেছে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ইঁদুর ঐ নিম্নচাপের মধ্যে নিজেদের শারীরিক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গতি দু-এক দিনের মধ্যে এনে ফেললেও বৃদ্ধ ইঁদুরের ঐ সঙ্গতি আনতে অনেক বেশী সময় লাগে।

বার্ধক্যে মনের পরিবর্তন ঘটে অনেকখানি। জরাগ্রস্ত অবসন্ন মন ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে অতীতের মধ্যে বেঁচে থাকতে চায়। অতীতের স্মৃতি, অতীতের আনন্দ, বেদনাই তার সর্বস্ব—সেই তার মূলধন। তাকে ভাঙ্গিয়েই জীবনের বাকী দিন কটা টিকে থাকতে চায়। 'বর্তমান' তাকে নাড়া দেয় না, স্মৃতিপটে তার স্থায়িত্ব তাই স্বল্প। অস্থিরচিত্ত বৃদ্ধদের নিদ্রা হয় অল্প আর দুঃস্বপ্নময়। বৃদ্ধদের প্রকৃতি হয়ে পড়ে অতিরিক্ত সাবধানী আর ভীরু। সোজা কাজের সহজ পন্থা জটিলতর হয়ে ওঠে। অহেতুক ভয় ও ভ্রান্তি এসে বাসা বাঁধে মনে। ধীশক্তি আর স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়। মানুষ তাই জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। সংসারে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। নিজেদের তারা অসহায় মনে করে।

সব মানুষেরই বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধিভ্রংশ হয় না, এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কোন কোন বৃদ্ধলোক পূর্ণব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন।

শরীর ও মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বার্ধক্যে খাদ্যগ্রহণের প্রবৃত্তিও স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। পৃথিবীতে মানুষ যে ক'দিন বাঁচবে, সে ক'দিন সুস্থ ও সবল হয়ে বেঁচে থাকবার জন্যে চাই তার পুষ্টিকর খাদ্য। মধ্য বয়স্কদের চেয়ে বৃদ্ধদের খাদ্যতালিকায় খুব একটা পার্থক্য থাকে না। তবুও পরিপাক-তন্ত্রের কার্যক্ষমতা হ্রাস, দন্তহীনতা ইত্যাদির জন্যে খাদ্যতালিকা কিছু পরিবর্তিত হবে বৈকি! বৃদ্ধদের জন্যে খাদ্যতালিকা প্রস্তুতে নানাদিকে নজর রাখতে হবে; যেমন—(১) অর্থনৈতিক দিক, (২) বৃদ্ধদের পছন্দ ও অপছন্দ এবং (৩) শরীরের উপযোগিতা।

ম্যাকে বলেছেন, ইচ্ছামত বেশী না খেয়ে যারা বিবেচনামত কম খায়, তারাই দীর্ঘজীবী হয়। মাত্রাতিরিক্ত কম খাদ্যগ্রহণে অবশ্য বার্ধক্যের অবস্থা বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধদের শক্তি অযথা কমিয়ে তোলে, ব্যক্তিত্বের হানি ঘটায়। তাছাড়া অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ, বয়সকালীন রোগগুলিকে আমন্ত্রণ করে আনা ছাড়া আর কিছু নয়।

ফুড অ্যাণ্ড নিউট্রিসন বোর্ড থেকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া ক্যালোরিই প্রত্যেকের গ্রহণ করা উচিত। অবসরপ্রাপ্ত ৭০ কিলোগ্র্যাম ওজনবিশিষ্ট বৃদ্ধদের জন্যে ২৪০০ ক্যালোরি, আর ৫৬ কিলোগ্র্যাম ওজনের বৃদ্ধদের জন্যে ২০০০ ক্যালোরি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ঐ ক্যালোরির বেশীর ভাগই প্রোটিন হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশিষ্ট অংশ শর্করা ও স্নেহ থেকে নিয়ে ক্যালোরি ঠিক করা প্রয়োজন। এভাবে ঠিকমত ক্যালোরি গ্রহণ করে দেহের ওজন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

স্নেহ, বিশেষ করে জান্তব স্নেহ বর্জনীয়। জান্তব স্নেহ রক্তরসের কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং গ্রহণের ফলে আর্টারিওস্ক্লেরোসিস রোগটি দেখা দেয়। উপযুক্ত পরিমাণে ভিটামিন, লবণ ও প্রচুর জল, বিশুদ্ধ বাতাস ও পরিমিত ব্যায়াম দরকার। ক্লান্তিকর কঠিন ব্যায়াম বৃদ্ধদের পক্ষে অনুপযোগী। এতে অকারণ শরীরের অনিষ্ট ঘটে।

এই সময়ে মনের স্বাভাবিক উৎফুল্লতার দরকার এবং প্রচুর বিশ্রাম ও আনন্দের প্রয়োজন। উত্তেজনা ও মানসিক শ্রম পরিহার করা উচিত।

রাইবোফ্ল্যাভিন বা বি$_2$ আসন্ন জরাকে বিলম্বিত করে। তাই এই ভিটামিনটি অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত। ভিটামিন-সি-এর অভাবে বৃদ্ধ বয়সে চোখে ছানি পড়ে; তাই উপযুক্ত পরিমাণে এই ভিটামিনটিও গ্রহণ করা কর্তব্য।

ডাঃ বিশপ, বয়োবৃদ্ধির সময় যে সব ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাতে টেস্টোস্টেরোন ফিনাইল প্রোপিওনেট, মিথাইল টেস্টোস্টেরোন, প্রজেস্টেরোন, ইস্ট্রোজেন ইত্যাদি হর্মোন ব্যবহার সমর্থন করেন। কারণ এর ফলে দেহের সুস্থতা ফিরে আসে।

মোট কথা, শরীর-গঠনে সেই একই প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্যসমূহ পরিমিত পরিমাণে দরকার হয় এবং এদের একের অভাবে বৃদ্ধ বয়সেও সমূহ ক্ষতির অবকাশ ঘটায়।

আজকাল মানব-জীবনে বার্ধক্য সমস্যা সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা চলছে। গবেষণার উদ্দেশ্য—মানব-জীবনকে অকারণ দীর্ঘতর করা নয়, অকাল বার্ধক্য দূর করে জীবনকে ক্রনিক রোগের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি দেবার সুচিন্তিত পন্থার উদ্ভাবন। বৃদ্ধেরা সংসারের বোঝা স্বরূপ হবে না, সুস্থ দেহ নিয়ে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব বহন করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে। বার্ধক্য কেন হয়—কিভাবে বার্ধক্য আসে—মানুষের মনে এসব প্রশ্ন জাগবার ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সুরু হয়েছে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবকোষ কি ভাবে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে, সে সম্বন্ধে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি।

ইদানীং বয়সের অনুপাতে মৃত্যুর হার কমে গেছে। বৃদ্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বার্ধক্যে উপনীত ব্যক্তিরা যাতে সুস্থ ভাবে জীবনযাপন করতে পারে, তার জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

পীডায়াট্রিক্স (Paediatrics) অপরিণত শিশুদের রক্ষা করে, আর জিরিয়াট্রিক্স (Geriatrics) মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধদের বাঁচিয়ে তোলে। অবশ্য কালের গতিতে জরা আসবেই, আর তারপর আসবে মৃত্যু। এর হাত থেকে অব্যাহতি নেই।

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং তু জীবিতম্‌॥

—সব সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সব উন্নতিরই অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়।

ইস্পাত-শিল্পে অ্যাসিড বেসিমার কনভার্টার

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশে ইস্পাত প্রস্তুত করিবার সময় কমাইবার জন্য অ্যাসিড বেসিমার কনভারর্টারের সাহায্য লওয়া হয়। ইহা চালাইবার জন্য প্রথম দরকার মিক্সচার। ইহা মারুৎ-চুল্লীর গলিত লোহার সংগ্রহশালা। বিভিন্ন মারুৎ-চুল্লীর বিভিন্ন সময়ের ঢালাই-করা গলিত লোহা ইহাতে জমা করা হয়। মিক্সচার একটি বেলনাকৃতি ইস্পাতের পাত্র-বিশেষ। ইহার ভিতরের দিকে দুর্গল পদার্থের আস্তরণ থাকে। সমগ্র উচ্চতার ⅔ অংশে প্রথমে ১½" ইঞ্চি অ্যাস্‌বেস্‌টস, ইহার উপরে ১৮" ইঞ্চি ম্যাগ্‌নেসাইট ইট এবং সর্বোপরি ৯" আগ্‌মাটির (Fire-clay) ইটের আস্তরণ থাকে। ইহার মধ্যে গলিত লৌহ এবং ভাসমান কিছু গাদ থাকে।

উপরিভাগে, অর্থাৎ ছাদে ৪½" অ্যাস্‌বেস্‌টস এবং ইহার উপরে ১২½" আগ্‌মাটির ইটের আস্তরণ থাকে। ইহা কয়েক শত টন লৌহ ধারণ করিতে পারে এবং ৪০-৫০ ফুট উপরে অবস্থিত থাকে। দুই পাশে অবলম্বনের সাহায্যে এমন ভাবে স্থাপিত যে, ইহাকে বিজলী অথবা প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে ১০০ পাউণ্ড বাতাসের চাপ দ্বারা ঘুরাইয়া বাল্‌তিতে ঢালিয়া কনভার্টারে নেওয়া হয়। গলিত লৌহের তাপমাত্রা যাহাতে ১২৭৫° সে.—১৩০০° সে. হইতে কমিয়া না যায় এবং উপরের ভাসমান গাদ যাহাতে ঠাণ্ডা হইয়া পাতলা হয়, সেই জন্য ইহাতে আলকাত্‌রা অথবা কয়লার গ্যাস জ্বালাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ইহা থাকিবার সুবিধা এই যে, মারুৎ-চুল্লীর গলিত লৌহ দরকার মত ও সময়মত পাওয়া যায়। ইহা হইতে প্রাপ্ত গলিত লৌহ কিছু সময় পর্যন্ত একই প্রকারের হইয়া থাকে এবং এই জন্য কনভার্টারের লোকদের কিছু সুবিধা হইয়া থাকে।

কনভার্টার একটি ঢালাই ইস্পাতের পাত্র-বিশেষ। ইহার আকৃতি ডিমের মত, পেট মোটা। ইহার তিনটি অংশ। উপরের অংশকে নাক, মধ্যের অংশকে শরীর এবং নীচের অংশকে তল বলা হয়। তিনটি অংশেই এমন ব্যবস্থা আছে যে, যে কোন একটি খারাপ হইলে তাহাকে খুলিয়া নূতন আর একটিকে কয়েক মিনিটের মধ্যে লাগাইয়া দেওয়া যায়।

ইহার ভিতরের দিকে গ্যানিষ্টার নামক এক-প্রকার (সিলিকা) পাথরের আস্তরণ থাকে। ইহা একপ্রকার অম্লজাতীয় দুর্গল পদার্থ। কাজেই ইহাকে অ্যাসিড কনভার্টার বলে। আজকাল গ্যানিষ্টারের বদলে সিলিকা ইটও ব্যবহার করা হয়। ইট ব্যবহার করিলে কনভার্টারকে আস্তে আস্তে ৬০০° সে. তাপমাত্রা পর্যন্ত গরম করিয়া লইতে হয়।

নাকের অংশেই থাকে কন্‌ভার্টারের মুখ। ইহা শরীরের অংশের সহিত এক বিশেষ কোণে অবস্থিত। এই মুখ দিয়াই লোহা ঢালিয়া কনভার্টারে লওয়া হয়। আবার কনভার্টার হইতে যখন বাল্‌তিতে ঢালা হয়, তখন ইহা নালীর কাজ করে। কন-ভার্টারকে বিশেষভাবে দাঁড় করাইয়া মুখ দিয়া ২০-২৫ টন গলিত লৌহ লইলে শরীরের অংশের পেটই তাহা ধারণ করিতে পারে। তলের অংশে লোহা পৌছায় না।

নাকের অংশের মুখ বিশেষ আকারের হওয়া উচিত। বেশী বড় হইলে তাপ নষ্ট হয়, আবার

বেশী ছোট হইলে কনভার্টার হইতে যে গ্যাস বাহির হয়, তাহা তাড়াতাড়ি বাহির হইতে না পারিয়া উচ্চ চাপের সৃষ্টি করিবে এবং সময় বেশী লাগিবে।

কনভার্টারের শরীরের অংশকে একটি গোলাকার চাকার মধ্য দিয়া ঢুকাইয়া ভাল করিয়া আট্‌কাইয়া দেওয়া হয়। এই চাকাটি একটি মোটরের সাহায্যে ঘূর্ণায়মান থাকে এবং তাহাতেই কনভার্টারকে ইচ্ছামত এদিক-ওদিক ঘুরাইতে পারা যায়। বাহিরের অবলম্বনের সাহায্যে ইহাকে ৩৬০° পর্যন্ত ঘুরানো যাইতে পারে। ইহার একপাশ দিয়া রাজহাঁসের গলার মত দেখিতে একটি পাইপ তলের অংশের নীচে বাতাসের বাক্সে ঢুকিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়াই বাতাস সজোরে কনভার্টারে ঢুকিয়া থাকে। এই পাইপকে Goose neck বলে। কনভার্টারের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঘুরিতে থাকে। শরীরের অংশের পেটের ধারণ-ক্ষমতাকেই কনভা-র্টারের ধারণ-ক্ষমতা বলে। এই ধারণ-ক্ষমতা বিশেষ-ভাবে কমিয়া গেলে কন্‌ভার্টার অচল হয়। একটি শরীরের অংশ ১০০০ হইতে ১১০০ বার ঢালাই দিয়া থাকে। কন্‌ভার্টারের তলের অংশটিই প্রধান। ইহার ক্ষয়-ক্ষতি খুব বেশী হয়। ৪০ বারের বেশী ইহা ঢালাইয়ের কাজে ব্যবহার করা যায় না। কাজেই দরকারমত নূতন তলের অংশ লাগাইতে হয়। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। সবচেয়ে নীচে থাকে বাতাসের বাক্স (Wind box) বাতাসের পাইপ (Goose neck) ইহার সহিত সংযুক্ত। ইহা একটি গোলাকার ইস্পাতের বাক্স ছাড়া কিছুই নয়। প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে ইহার ২৫ পাউণ্ড বাতাসের চাপ ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে। বাতাসের বাক্স হইতে তলের অংশের-ভিতর দিয়া শরীরের অংশে মারুৎ-চুল্লীর বা মিক্সারের গলিত লোহের ভিতর দিয়া বাতাস যাহাতে সমান চাপে এবং সর্বত্র সমানভাবে যাইতে পারে, তাহার জন্য তলের অংশে অনেকগুলি সরু রাস্তা আছে। বাতাসের বাক্সের ঠিক উপরে ৪½" ইঞ্চি মোটা একটি ঢালাই ইস্পাতের গোল প্লেট আছে। এই প্লেটের মধ্যে ২৫টি গর্ত আছে। এই গর্তগুলি বিশেষভাবে তৈয়ারী। ইহার নীচের দিকের ব্যাস ৮½" ইঞ্চি, উপরের দিকের ব্যাস ৬⅝" ইঞ্চি। এই গর্তগুলিতে একপ্রকার বিশেষ ধরণের আগমাটির ইট ঢুকাইয়া দাঁড় করানো হয়। প্লেটের বাইরে ৩১" ইঞ্চি —৬" ইঞ্চি ব্যাস যুক্ত হইয়া থাকে। নীচের অংশ ক্রমশঃ এমন মোটা হয় যে, প্লেটের গর্তের মধ্যে ভালভাবে আটকাইয়া থাকে। এই বিশেষ ইটের নাম টুয়ার ইট। ইহার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেকটি ইটের মধ্যে ৭টি করিয়া লম্বালম্বিভাবে ⅝" ব্যাসের গর্ত রহিয়াছে। এই প্লেটের নাম টুয়ার প্লেট। এই টুয়ার প্লেটের ২" ইঞ্চি উপরে ২৫টি গর্তবিশিষ্ট আর একটি সাধারণ ঢালাই ইস্পাতের প্লেট দেওয়া হয় এই কারণে যে, দামী টুয়ার প্লেট ক্ষতিগ্রস্ত হইবার পূর্বেই যেন কনভার্টারের লোকেরা বুঝিতে পারে। এই দুইটি প্লেটের মধ্যে ২" ইঞ্চি খালি স্থান থাকে। উপরেরটি খারাপ হইবা মাত্র কনভার্টারের লোকেরা কনভার্টার কাৎ করিয়া প্লেট রক্ষা করে। ২৫টি টুয়ার ইটের মধ্যবর্তী স্থান সিমেণ্ট ও অম্লজাতীয় দুর্গল পদার্থ ৮" ইঞ্চি করিয়া ঢালিয়া পিটাইয়া বসাইয়া দেওয়া হয়। টুয়ার ইটের মুখ পর্যন্ত ভর্তি করিয়া শুকাইয়া লওয়া হয়। তলের অংশ অনেকটা বাটির মত দেখিতে। পার্শ্বদেশ ঢালাই ইস্পাতের এবং নীচে টুয়ার প্লেট। এই প্লেটের নীচের দিকে এমন এক ব্যবস্থা আছে, যাহার সাহায্যে প্রত্যেকটি টুয়ার ইট ধরিয়া রাখা যায়। আবার টুয়ার ইট খারাপ হইয়া থাকিলে এবং তাহার ভিতর দিয়া বাতাস পাঠাইলে আরও খারাপ হইতে পারে, এইরূপ মনে করিলে ছোট একটি ইস্পাতের প্লেটের দ্বারা ইটের নীচের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং মুখের অংশের ভিতর দিয়া গ্যানিষ্টারের কাদা ছুড়িয়া বন্ধ করা হয়। নাক, শরীর, তলের অংশ এবং বাতাসের বাক্সের নীচের প্লেট লাগাইয়া কনভার্টার কার্যোপযোগী করা হয়।

প্রথমে কয়লার গ্যাসের সাহায্যে ইহাকে আস্তে আস্তে গরম করিতে হয়। ৬০০° সে.-এর উপরে তাপ উঠাইয়া ইহাতে ৫ টন গলিত লৌহ লওয়া হয়। ইহার ভিতর দিয়া বাতাস চালাইয়া দেখা হয়, কনভার্টার কাজের উপযুক্ত হইয়াছে কিনা। উপযুক্ত মনে হইলে ধারণ-ক্ষমতা অনুযায়ী পরিমাণ-মত গলিত লৌহ লইয়া সেই বিশেষভাবে কাৎ করা অবস্থায়ই প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ২৫ পাউণ্ড চাপের বাতাস চালিত করিয়া কনভার্টার সোজা করিতে হয়। পূর্বে বাতাস চালিত না করিলে গলিত লোহা তলদেশে পৌঁছিয়া বাতাস যাইবার রাস্তা বন্ধ করিয়া দিতে পারে। কাজেই পূর্বে বাতাস চালিত করিলে বাতাসের চাপে লোহা তলদেশে পৌঁছিতে পারে না।

এই সময় প্রথম ৫-৬ মিনিট ক্রমশঃ ছোট হইয়া যাওয়া একপ্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি, ম্যাট্‌মেটে লাল শিখা কনভার্টারের মুখ হইতে নির্গত হয়। এই সময় সিলিকন এবং ম্যাঙ্গানিজ জারিত হয়। তারপরে শিখাটি ক্রমশঃ দ্রুতগতিতে বাড়িয়া প্রচণ্ড আকার ধারণ করে এবং শিখার ঔজ্জ্বল্যও বৃদ্ধি পায়। লাল ধোঁয়ায় উপরিভাগ ছাইয়া যায়। এই সময় কার্বন জারিত হয়। কার্বন কমিয়া ০'৫-০'৬ নামিয়া গেলে শিখা হঠাৎ ছোট হইয়া যায়।

স্ফুলিঙ্গ এবং শিখার আকৃতি ও প্রকৃতি দেখিয়া কনভার্টারের লোকেরা বুঝিতে পারে, লোহাতে কত কার্বন রহিয়াছে। যতটা কার্বন রাখা দরকার ততটা রাখিয়া বাতাসের চাপ কমাইয়া (প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ২০ পাউণ্ড করিয়া) কনভার্টার কাৎ করিয়া দেয়। যখন লোহার পক্ষে তলের অংশে যাইবার আর সম্ভাবনা থাকে না, তখন বাতাস সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া নীচে রক্ষিত বাল্‌তিতে ঢালিয়া নেওয়া হয়। বাল্‌তির ধারণ-ক্ষমতা সাধারণতঃ বেশী থাকে; কাজেই এক বাল্‌তিতে কনভার্টারের ২-৩ ঢালাই লইয়া বেসিক ওপেন হার্থে নেওয়া হয়। সাধারণতঃ কনভার্টারে যে লোহা ব্যবহৃত হয়, তাহাতে সিলিকন থাকে শতকরা ০'৮৫-১'২ ভাগ,

ম্যাঙ্গানিজ শতকরা ০'৫-০'৮ ভাগ,

গন্ধক শতকরা ০'০৫০ ভাগ।

নিম্নলিখিত রাসায়নিক ক্রিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, কনভার্টারে লোহা তাপ কোথা হইতে পায়। প্রথম ৫-৬ মিনিট

১। $Fe+O=FeO+$ ৬৫০০০ ক্যালোরি।

২। $Si+2\,FeO=SiO_2+2Fe+$ ৬৪২০০ ক্যালোরি।

৩। $Mn+FeO=MnO+Fe+$ ২৫০০০ ক্যালোরি।
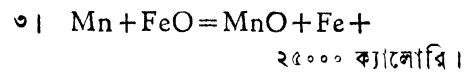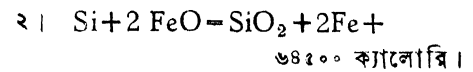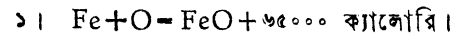
এই তিন প্রকার ক্রিয়া হইতে প্রথম তাপের সৃষ্টি হয়।

৪। $C+O=CO+$ ২৯০০০ ক্যালোরি।

৫। $2\,FeO+CO=2\,Fe+2\,CO_2+$ ২৩৪০ ক্যালোরি।
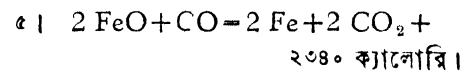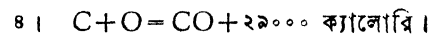
কার্বন জারিত হইবার সময় যদিও কিছু তাপ দিয়া থাকে, কিন্তু অন্য প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া তাপ কিছু কমাইয়া দেয়।

৬। $C+FeO=CO+Fe-$ ৩৬২০০ ক্যালোরি।

৭। $FeO+Fe_3C=4Fe+CO-$ ৪৫০০০ ক্যালোরি।

৮। $FeO+SiO_2=FeO\,SiO_2+$ ৯০০০ ক্যালোরি।

৯। $MnO+SiO_2=MnO\,SiO_2+$ ৫০০০ ক্যালোরি।
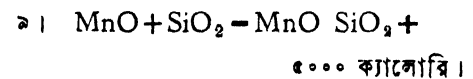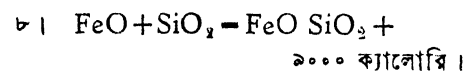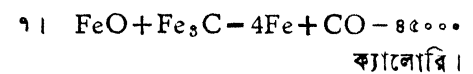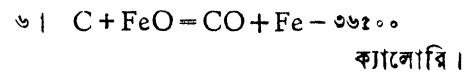
এই ৮ ও ৯ নম্বর রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে প্রাপ্ত $FeOSiO_2$ এবং $MnOSiO_2$ কনভার্টারের গাদ। খুব সম্ভব অভ্যন্তরস্থ SiO_2 হইতে ইহার সৃষ্টি হয়। কাজেই প্রত্যেক বারের শেষে কনভার্টারের ক্ষয়-ক্ষতি হইয়া থাকে। কাজেই দেখা যায়, বিশেষ ভাবে সিলিকন এবং ম্যাঙ্গানিজ জারিত হইয়া কনভার্টারের লৌহকে উত্তপ্ত করিয়া থাকে।

কিন্তু যদি সিলিকন ১'২ হইতে বেশী হয়, তবে সব সিলিকন জারিত হইবার পূর্বেই লোহা এমন উত্তপ্ত হয় যে, সিলিকন জারিত হওয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং কার্বন জারিত হইতে আরম্ভ করে। কার্বন থাকা পর্যন্ত আর সিলিকন জারিত হইবে না। কাজেই সমস্ত সিলিকন জারিত না হইলে লোহাতে যে সিলিকন থাকিয়া যাইবে, তাহা বেসিক ওপেন হার্থে যাইয়া নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করিবে। সুতরাং এই সময় লোহাকে ঠাণ্ডা করা প্রয়োজন। দুই প্রকারে ইহা করা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, বাতাসের সঙ্গে কিছু বাষ্পও চালিত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, কাৎ করিয়া বাতাস চালনা বন্ধ রাখিয়া লৌহ প্রস্তর অথবা লোহার ছাট কনভার্টারের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই ভাবে ঠাণ্ডা করা সময়-সাপেক্ষ; কাজেই লোহাতে শতকরা ১'২ ভাগের বেশী সিলিকন না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

সিলিকন কম হইলে তাপ কম হয়, তাহাতে লৌহ উপযুক্ত গরম না হইলে বাল্তি এবং কনভার্টারে জমিয়া গিয়া ধারণ ক্ষমতা কমাইয়া দেয়। কার্বন জারিত হইবার সময় যখন CO গ্যাস বাহির হইতে থাকে, তখন কনভার্টার সামান্য কাৎ করিয়া তলের অংশের ২-১টি টুয়ার ইট হইতে বাতাস সোজাসুজি আনিয়া CO গ্যাসকে কনভার্টারের মধ্যে জ্বালাইয়া লোহাকে তাপ সরবরাহ করে। তাহাতে কিছুটা উত্তপ্ত হয়। ম্যাঙ্গানিজ বেশী হইলে দুর্গল পদার্থের ক্ষয়-ক্ষতি বেশী হয়। গাদ খুব পাত্‌লা হয় এবং বাতাসের সহিত গাদ এবং লোহার ক্ষুদ্র অংশসমূহ উড়িয়া গিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ম্যাঙ্গানিজ কম হইলে গাদ ভারী হয়।

রাসায়নিক ক্রিয়াগুলির দিকে তাকাইলে বুঝা যায় যে, ফস্‌ফরাস এবং গন্ধক জারিত হয় না। ফস্‌ফরাস সাময়িকভাবে জারিত হইয়া ($2P+5O=P_2O_5$) P_2O_5-এর সৃষ্টি হয়।

এই P_2O_5 বড়ই দুর্বল জারিত পদার্থ। ইহাকে লোহা হইতে গাদে না লইয়া গেলে লোহা হইতে ফস্‌ফরাস কমে না, আবার বিজারিত হইয়া লোহাতেই চলিয়া যায়। কাজেই চুনের সাহায্যে ইহাকে $CaOP_2O_5$ করিয়া গাদে নিতে হয়। তাহা হইলে ফস্‌ফরাসের পক্ষে লোহাতে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু অ্যাসিড কনভার্টারে চুন দেওয়া যায় না। কারণ তাহা হইলে অম্লজাতীয় দুর্গল পদার্থের আস্তরণই গাদে পরিণত হইতে থাকিবে।

বেসিক কনভার্টারে এবং L-D নিয়মে যে ইস্পাত তৈয়ারী হয়, তাহাতে চুন দেওয়া চলে। কারণ ইহাদের আস্তরণও ক্ষারজাতীয় হইয়া থাকে। বেসিক কনভার্টারে লোহাতে সিলিকন এবং ম্যাঙ্গানিজ কম থাকিবার দরুণ ইহারা জারিত হইয়া কম তাপ লোহাতে দিয়া থাকে; কাজেই প্রয়োজন-মত তাপ পাইতে হইলে লোহার ফস্‌ফরাস অন্ততঃ শতকরা ২-৩ ভাগ হওয়া দরকার। এই ফস্‌ফরাস জারিত হইবার সময় যে তাপ দেয়, তাহাই লোহাকে উত্তপ্ত করে।

$2P+5O=P_2O_5+$৫৯৬৫০০ ক্যালোরি।

আমাদের দেশে যে রকম লোহা মারুৎ-চুল্লীতে হইয়া থাকে, তাহাতে কম সিলিকন হয় না এবং এত বেশী ফস্‌ফরাসও থাকে না। কাজেই বেসিক কনভার্টার দ্বারা আমাদের দেশে ইস্পাত প্রস্তুত হয় না। বেশী সিলিকনের লোহা লইয়া বেসিক কনভার্টার চালাইলে বেশী তাপের সৃষ্টি হইবে। বেশী চুন ব্যবহার করিবার জন্য বেশী গাদ উৎপন্ন হইবে এবং নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।

L-D নিয়মেও অবশ্য তাপ বেশী হইবে, কিন্তু উহাতে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ; কারণ বাল্তিতে ইহা তৈয়ারী হয়। গাদ অবশ্য বেশী হইবেই। আমাদের দেশে রৌরকেল্লায় এই নিয়মে ইস্পাত প্রস্তুত করিতে আরও কি কি অসুবিধা হইতে পারে, তাহা কিছু দিনের মধ্যেই জানা যাইবে, যখন পূর্ণোদ্যমে এই নিয়মে ইস্পাত প্রস্তুত হইবে।

অ্যাসিড কনভার্টারেও সাধারণভাবে বিশেষ অসুবিধা দেখা যায়। কনভার্টার পুরাতন হইলে তাহার শরীরের অংশের ধারণ ক্ষমতা কমিয়া যায়; কাজেই তখনও কনভার্টার চালাইতে হইলে টুয়ার ইটের মধ্যে লোহা চলিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। যখন গলিত লোহা কনভার্টারে নেওয়া হয়, তখন ইহা খানিকটা কাৎ অবস্থায় নাকের অংশের মুখ উপরের দিকে থাকে। সেই অবস্থায় যে টুয়ারগুলি নীচের দিকে থাকে তাহার মধ্যে যাহাতে লোহা না ঢুকিতে পারে, সেই জন্য মুখ দিয়া গ্যানিষ্টার গুঁড়ার কাদা ছুড়িয়া টুয়ারের ইটের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয় এবং বাতাসের বাক্সের নীচের প্লেট খুলিয়া টুয়ার ইটের নীচের মুখ ও ছোট ইস্পাত প্লেটের দ্বারা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক বার ঢালাইয়ের পরে কনভার্টারের লোকেরা কনভার্টারের ভিতরের দিক পরীক্ষা করিয়া দেখে, কোনও প্রকার ক্ষয়-ক্ষতি হইয়াছে কিনা—বিশেষ করিয়া তলের অংশের যে কোনও টুয়ার ইটের ক্ষয়-ক্ষতি বেশী হইলে একই ভাবে তাহাকেও বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

তাহা ছাড়া চালিত অবস্থায় টুয়ার প্লেটের উপরের প্লেট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মাত্র বাতাস কমাইয়া কনভার্টার কাৎ করিয়া বাতাস যে কোনও অবস্থায় বন্ধ করিয়া ঢালাই করিয়া দিতে হয়।

মাঝে মাঝে সামান্য কিছু লোহা লইয়া কনভার্টার চালাইয়া ভিতরের জমাট গাদ গলাইয়া দেওয়া হয় এবং কনভার্টারকে ৩৬০° ডিগ্রি ঘুরাইয়া একটি পাত্রে গাদ ঢালিয়া কনভার্টার পরিষ্কার করা হয়।

সীমার মাঝে অসীম

শ্রীরমেন কর

একটা বড় সংখ্যা আমরা সহজে বলতে পারি—এক হাজার, এক লক্ষ ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার বলবেন অর্বুদ, শঙ্খ, পদ্ম ইত্যাদি। কিন্তু এরা সবাই সসীম সংখ্যা। তবে অসীম সংখ্যা কাকে বলবো? যে সংখ্যা যে কোন সসীম সংখ্যা থেকে বড়, তাকেই বলা হয় অসীম সংখ্যা। কিন্তু এক, দুই কিংবা চার, পাঁচ—এরাও সবাই সসীম সংখ্যা। কিন্তু এক আর দুই—এই দুটা অতি পরিচিত ছোট সসীম সংখ্যার মধ্যে কত সংখ্যা আছে, বলতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আবার সেই শঙ্খ, পদ্ম এসে পড়ে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, এক আর দুয়ের মধ্যে আরো অনেক অনেক সংখ্যা আছে, যাকে এক কথায় বলা যায় অসংখ্য। এখন দেখতে পাচ্ছি, দুটা সীমিত সংখ্যার মধ্যে আছে অসীম সংখ্যা।

এবার কতকগুলি উদাহরণ দেবো, যার অর্থ করা যায়—সীমার মাঝে অসীম, অর্থাৎ দেখতে এত ছোট, অথচ এত বড়। অণু-পরমাণুর কথা সবাই জানেন, আর দেশলাইয়ের খোল সবাই দেখেছেন। এক দেশলাই পরিমাণ বাতাসের পরমাণুর সংখ্যা কত জানেন? অঙ্কের ভাষায় খুব ছোট—৩×১০^{১৮}, অর্থাৎ তিনের পিঠে আঠারোটা শূন্য। প্রকৃত পক্ষে সংখ্যাটি বড়; কিন্তু কত বড় তা সবাই অনুমান করতে পারেন না। উদাহরণ দিলে কিছুটা অনুমান করা যায়। মনে করুন, দেশলাইয়ের খোলটিকে বাড়াতে আরম্ভ করা হলো

এবং সেই অনুপাতে পরমাণুগুলোও বেড়ে যেতে লাগলো। দেশলাইয়ের খোলটিকে এত বড় করা হলো, যাতে পরমাণুগুলির আয়তন হয় এক একটা কমলালেবুর মত। সেই কমলালেবুর মত পরমাণু-গুলিকে এবার তুলে ফেলবার জন্যে একটি লোক লাগানো হলো। তাদের বলা হলো, প্রত্যেকে যেন প্রতি সেকেণ্ডে একটি করে তোলে। এভাবে এক কোটি লোক যদি সেকেণ্ডে এক কোটি করে তোলে তবে ওই এক কোটি লোকের সবগুলি পরমাণু তুলে ফেলতে লাগবে তিন লক্ষ বছর। অর্থাৎ ভগবান প্রথম যেদিন মনু আর শতরূপাকে পাঠিয়েছিলেন, সেদিন দুজনকে না পাঠিয়ে যদি এক কোটি লোককে পাঠাতেন তবে ওই কাজ তাদের এতদিনে শেষ হতো!

এবার একটা উদাহরণ দেবো, যাতে একই সঙ্গে খুব বড় আর খুব ছোট সম্বন্ধে একটা ধারণা হতে পারে। বলতে পারেন নায়েগ্রা জলপ্রপাতে একশ' বছরে কত ফোঁটা জল পড়ে, আর ঝর্ণা কলমের ডগায় কত ইলেকট্রন আছে? অঙ্ক কষে দেখা গেছে, দুটার সংখ্যাই সমান।

আমাদের মাষ্টারমশাই একদিন একটি গল্প বলেছিলেন। তখন স্কুলে পড়ি, বুদ্ধি ও চিন্তার দৌড় ছিল কম, তাই বিশ্বাস করি নি। তিনি বলেছিলেন, একবার কোন এক রাজাকে উজীর দাবা খেলার ঘর তৈরী করে দিয়েছিলেন। রাজা তাতে খুশী হয়ে উজীরকে পুরস্কার দিতে চাইলেন। উজীর বললেন, মহারাজ আমাকে দাবার ছকের প্রথম ঘরে একটি, দ্বিতীয় ঘরে দুটি, তৃতীয় ঘরে চারটি, চতুর্থ ঘরে আটটি... অর্থাৎ প্রথম ঘরে যা দেবেন দ্বিতীয় ঘরে তার দ্বিগুণ, তৃতীয় ঘরে দ্বিতীয় ঘরের দ্বিগুণ...... এভাবে যত ধান লাগে দিন। রাজা উজীরের বিনয়ে খুশী হয়ে বললেন, তুমি অনেক কম চেয়েছ—যাহোক তোমার আশাতীত পুরস্কার তোমাকে দেব। এই বলে এক বস্তা ধান তাকে দিয়ে দিলেন। উজীর বললেন, না—আমার কথা অনুসারে দিন।

তখন গণনা আরম্ভ হলো এবং তদনুযায়ী ধান আসতে লাগলো। কুড়িটা ঘর পেরোতেই তাঁর বস্তার ধান শেষ হয়ে গেল। আরও কয়েক বস্তা আনা হলো। তাতেও হলো না। এরপর ধানের সংখ্যা যে অনুপাতে বাড়তে লাগলো তাতে সবাই বুঝলো, রাজ্যের সব ধান দিয়েও রাজা তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারবেন না।

এই গল্প তখন বিশ্বাস করি নি। ভেবেছিলাম মাষ্টার মহাশয়ের হিসেবে ভুল। পরে এই বিশ্বাস ভেঙ্গেছিল। যাহোক, অঙ্ক কষে দেখা যাক।

দাবার ছকে ৬৪টি ঘর আছে। এখন উজীরের কথা অনুযায়ী প্রথম রাখতে হবে ১টি, ২য় ঘরে ২টি, তৃতীয় ঘরে তার দ্বিগুণ, অর্থাৎ $২^২$টি, চতুর্থ ঘরে তার দ্বিগুণ, অর্থাৎ $২^৩$...। সুতরাং মোট ধানের সংখ্যা $= ১+২+২^২+২^৩+২^৪+ \cdots\cdots +২^{৬৩}$ গুণোত্তর শ্রেণীটির যোগফল—

$$= \frac{২ \times ২^{৬৩} - ১}{২ - ১} = ২^{৬৪} - ১$$

$২^{৬৪}$কে ভাঙলে পাওয়া যায় ১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩, ৭০৯,৫৫১,৬১৬। অতএব মোট ধানের সংখ্যা= ১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৫।

আমাদের জানা আছে যে, ৪ ধানে ১ রতি
৮০ রতিতে ১ তোলা
৮০ তোলায় ১ সের
৪০ সেরে ১ মণ

$\therefore$ ১ মণ ধানের সংখ্যা $= ৪ \times ৮০ \times ৮০ \times ৪০$
$= ১০২৪০০০$

সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ১৩ কোটি টন (১৯৫৪ সালে), অর্থাৎ ৩৫০ কোটি মণ ধান উৎপন্ন হয়। সুতরাং বছরে উৎপন্ন ধানের

সংখ্যা $= ১০২৪০০০ \times ৩৫০,০০০,০০০,০$
$= ৩৫৮৪ \times ১০^{১২}$

সুতরাং অনায়াসে বুঝা যাচ্ছে যে, সমগ্র

পৃথিবীতে ১৮,৪১৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৫টি ধান উৎপন্ন হতে প্রায় পাঁচ হাজার বছর লাগবে।

আর একটি সুন্দর গল্প আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। কাশীতে বিরাট ব্রহ্মার মন্দিরে একটি পিতলের প্লেট আছে। তাতে বসানো আছে আঙুলের মত মোটা তিনটি হীরকের দণ্ড, প্রায় এক হাত করে লম্বা। বিশ্ব-সৃষ্টির আদিতে এই দণ্ড-গুলির একটিতে ভগবান ৬৪টি সোনার চাকৃতি এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছিলেন, যাতে সবচেয়ে বড় চাকৃতিটি থাকে সবাইর তলায়, তার উপরে আর একটু ছোট চাকৃতি, তার উপরে আরো ছোট··· এইভাবে। অর্থাৎ এক সেরের উপর আধসের, তার উপর এক পোয়া···ইত্যাদি ক্রমে রাখলে যেমন দেখায়। তিনি মন্দিরের পুরোহিতকে বললেন যে, ওই চাকৃতিগুলি একটি দণ্ড থেকে আর একটি দণ্ডে এমনভাবে সরাতে হবে, যেন কোন ছোট চাকৃতির পর কোন বড় চাকৃতি না পড়ে এবং একবারে একটির বেশী চাকৃতি সরানো চলবে না। এই ভাবে যেদিন সবগুলি চাকৃতি একটা দণ্ড থেকে আর একটা দণ্ডে সরানো হবে, সেই দিন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে যাবে।

উৎসাহী পাঠক-পাঠিকা, কার্ডবোর্ডের চাকৃতি আর লোহার দণ্ড নিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তিনি অনায়াসে এটুকু লক্ষ্য করবেন যে, প্রথম চাকৃতি একটি দণ্ড থেকে আর একটি দণ্ডে নিয়ে যেতে মাত্র একবার সরালেই চলবে। কিন্তু দ্বিতীয় চাকৃতি আর একটি দণ্ডে নিয়ে যেতে দু'বার সরাতে হবে। তৃতীয়টি নিয়ে যেতে চার বার, চতুর্থটি নিয়ে যেতে আটবার···এইভাবে সরাতে হবে। অর্থাৎ প্রথমটি সরাতে যা সময় লাগবে, দ্বিতীয়টি সরাতে তার দ্বিগুণ সময় লাগবে। তৃতীয়টি সরাতে দ্বিতীয়টির দ্বিগুণ, অর্থাৎ $২^{২}$ গুণ সময় লাগবে। সুতরাং শেষ চাকৃতি সরাতে প্রথমটির $২^{৬৩}$ গুণ সময় লাগবে। তাহলে সবগুলি চাকৃতি সরাতে মোট কত সময় লাগবে, তা অনায়াসে হিসেব করা যায়। যদি ধরা যায়, একটি চাকৃতি একবার মাত্র সরাতে এক সেকেণ্ড সময় লাগে, তবে ৬৪টি চাকৃতি সরাতে মোট সময় লাগবে?

$$(১+২+২^{২}+২^{৩}+\cdots+২^{৬৩}) \text{ সেকেণ্ড}$$

$$=২^{৬৪}-১=১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৫ \text{ সেকেণ্ড}$$

$$\text{এক বছর}=৬০\times৬০\times২৪\times৩৬৫ \text{ সেকেণ্ড}$$

$$=৩১,৫৩৬,০০০ \text{ সেকেণ্ড}$$

সুতরাং সবগুলি চাকৃতি সরাতে সময় লাগবে

$$\frac{১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৫}{৩১,৫৫৮,০০০} \text{ বছর}$$

$$=৫৮৪,৫৪৩,৬৩৬,৯৭৬,৬৫৭ \text{ বছর।}$$

আমরা জানি, পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়স তিনশ' কোটি বছরের বেশী নয়। একথা আধুনিক বিজ্ঞানে প্রমাণিত এবং "তারকার আত্মত্যাগ" অর্থাৎ তার নিবে যাওয়ার হার থেকে গাণিতিক হিসেবে দেখানো হয়েছে যে, বিশ্বের বয়স আর মাত্র পনের-শ' কোটি বছরের বেশী নয়। এখন বিশ্ব সৃষ্টির আদি থেকে যদি ধরা যায়, তবে তার বয়স দাঁড়ায় আঠারো-শ' কোটি বছর। কিন্তু উক্ত প্রবাদ থেকে দেখানো হয়েছে যে, বিশ্বের বয়স প্রায় আঠারো হাজার কোটি বছর। একথা ভাবতে অবাক লাগে যে, এই প্রবাদ যখন প্রচলিত হয়, তখনকার লোকেরা কি ভাবে বিশ্বের বয়স হিসেব করেছিল? তারা যদি ৬৪টি চাকৃতির পরিবর্তে ৬১টি চাকৃতির কথা বলতো, তবে তাদের হিসেবের সঙ্গে আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের হিসেব নিখুঁতভাবে মিলে যেত।

জার্মেনিয়াম

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ট্র্যানজিষ্টর কথাটি আজকাল প্রত্যেকের নিকটই পরিচিত। আকারে ছোট, ওজনে হাল্কা ট্র্যানজিষ্টর রেডিওর জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ট্র্যানজিষ্টরের মূলে যে পদার্থটি রহিয়াছে, তাহার নাম জার্মেনিয়াম।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মেণ্ডেলিফ মৌলিক পদার্থগুলিকে তাহাদের গুণানুযায়ী বিন্যস্ত করিবার চেষ্টা করেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মৌলিক পদার্থগুলি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত। একই শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের ধর্ম একই প্রকার। তাঁহার এই আবিষ্কারের ফলে রসায়নশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, মৌলিক পদার্থের বিন্যাসে কয়েকটি স্থান অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ঘোষণা করেন যে, অপূর্ণ স্থানগুলির উপযোগী মৌলিক পদার্থ ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবে। তখনও অনাবিষ্কৃত ঐ পদার্থগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধেও শ্রেণীর ভিত্তিতে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। উপরে সিলিকন (মাটির একটি উপাদান) ও নীচে টিনের (এই টিন একটি নরম ও ভঙ্গুর ধাতু) মধ্যবর্তী একটি অপূর্ণ স্থানের অজ্ঞাত মৌলিক পদার্থকে মেণ্ডেলিফ একা-সিলিকন নামে অভিহিত করেন। সিলিকন ও টিনের বিভিন্ন গুণের ভিত্তিতে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন—ঐ পদার্থটির কি কি বৈশিষ্ট্য দেখা যাইবে।

মেণ্ডেলিফের ভবিষ্যদ্বাণীর পনেরো বছর পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী সি. এ. উইঙ্কলার এই মৌলিক পদার্থটি আবিষ্কার করেন এবং স্বদেশের নাম অনুসারে ইহার নাম দেন জার্মেনিয়াম। জার্মেনিয়াম আবিষ্কৃত হইবার পর মেণ্ডেলিফের 'পর্যায় সারণী' (Periodic Table) সম্বন্ধে আর কোন সংশয় রহিল না।

এই ধাতব পদার্থটি যে অনেক কাল আমাদের অগোচরে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ, ইহার পরিমাণের স্বল্পতা। আমেরিকার দস্তার খনিতে প্রতি একশত পাউণ্ডে এক পাউণ্ডের চার ভাগের এক ভাগ জার্মানিক অক্সাইড পাওয়া যায়। অন্যান্য পদার্থ, যেমন—গন্ধকের সঙ্গে যুক্ত ভাবেও ইহাকে দেখা যায় বটে, কিন্তু পরিমাণ খুবই কম।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, জার্মেনিয়ামের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সিলিকন ও টিনের অনুরূপ। জার্মেনিয়াম দেখিতে রূপার মত ঝক্ঝকে সাদা, কিন্তু ইহার গুঁড়ার রং ছাই-এর মত। জার্মেনিয়াম ভঙ্গুর ধাতু। ইহা জলের তুলনায় সাড়ে পাঁচগুণ ভারী। ইহা ৯৫৮·৫° সেন্টিগ্রেডে তরল অবস্থায় এবং ২৭০০° সেন্টিগ্রেডে বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত হয়।

অক্সিজেনের ভিতর ৭৩০° সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করিলে ইহা সামান্য পরিমাণে ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। সাধারণ অ্যাসিড বা ক্ষারজাতীয় পদার্থের কোন প্রভাব ইহার উপর লক্ষিত হয় না। তবে ক্লোরিন, গন্ধক, হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হইয়া ইহা বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ গঠন করিয়া থাকে।

প্রায় চুয়াত্তর বছর আগে জার্মেনিয়াম আবিষ্কৃত হইলেও ইহার বিরাট সম্ভাবনা মাত্র এক যুগ পূর্বে ধরা পড়িয়াছে। ইতিপূর্বে জানা ছিল, সিলিকন ও জার্মেনিয়াম অন্যান্য ধাতু, যেমন—সোনা, রূপা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির মত ভাল তড়িৎ-পরিবাহক নয়; আবার কাচ, অভ্র প্রভৃতির মত

ভাল অন্তরকও (Insulator) নয়—দুই সীমানার মাঝামাঝি ইহার স্থান। তাই ইহাকে বলা হইত অর্ধ পরিবাহক (Semi-conductor)। আচার্য জগদীশচন্দ্র, মার্কনি ও পোপোভ যখন বেতার-তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা করেন, তাহার কিছু-কাল পর বেতার-তরঙ্গ গ্রহণের কাজে সিলিকনের উপযোগিতা বিজ্ঞানীদের নজরে পড়ে। কয়েক বছর পরে জার্মেনিয়াম ও ক্রিষ্ট্যাল বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। এই অবস্থাটা প্রায় চল্লিশ বৎসর চলিয়াছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কি ভাবে জার্মেনিয়াম ক্রিষ্ট্যালকে রেডিও-ভাল্‌ভের মত কার্যকরী করা যায়। অবশেষে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বেল টেলিফোন লেবরেটরীতে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত) ডাঃ জন বার্ডিন ও ডাঃ ওয়াল্টার ব্রাট্টাইন জার্মেনিয়াম ধাতুর ট্র্যানজিষ্টর প্রস্তুত করেন। একটি জার্মেনিয়াম টুক্‌রার মধ্যে তাঁহারা দুইটি তার পাশাপাশি যুক্ত করেন—ঐ তারের সংযোগস্থল দুইটির ব্যবধান হইল, এক সেন্টিমিটারের এক শতাংশের মত। অতি ছোট এই বস্তুটি রেডিও-ভাল্‌ভের সমস্ত কাজই করিতে পারে, অবশ্য পুরামাত্রায় নয়। এই জাতীয় ট্র্যানজিষ্টরের নাম হইল বিন্দু-স্পর্শ (point-contact) ট্র্যানজিষ্টর।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ডাঃ সক্‌লী (ইনিও বেল টেলিফোন লেবরেটরীর বিজ্ঞানী-কর্মী) নূতন ধরণের জাংশন ট্র্যানজিষ্টর সম্বন্ধে ভবিষ্যবাণী করিয়াছিলেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দেই তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের দুই পাশে অন্য পদার্থের দ্বারা মিশ্রিত জার্মেনিয়ামের দুইটি স্তর লাগান হয়—অনেকটা স্যাণ্ডউইচের মত। অন্য পদার্থগুলি হইল—ফস্‌ফরাস, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, বোরন, ইণ্ডিয়াম প্রভৃতি।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এই পর্যন্ত অনেক রকমের ট্র্যানজিষ্টর প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার কর্মক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে অতি উচ্চ তরঙ্গ-সংখ্যার উপযোগী ট্র্যানজিষ্টরও দুর্লভ নয়। ইহার ব্যবহারও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশগুলিতে ট্র্যান-জিষ্টর প্রস্তুত হইতেছে। এই ব্যাপারে জাপানের অগ্রগতি সত্যই বিস্ময়কর এবং বিশেষ প্রশংসনীয়। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে আমরা ভারতে প্রস্তুত জার্মেনিয়াম ট্র্যানজিষ্টর দেখিতে পাইব।

ট্র্যানজিষ্টরের ব্যাপারে জার্মেনিয়ামের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিয়াছে সিলিকন। সিলিকনের সুবিধা এই যে, অধিক তাপমাত্রায়ও ইহার কর্মক্ষমতা অটুট থাকে। কিন্তু জার্মেনিয়াম যত বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তুত করা যায়, সিলিকন ততটা বিশুদ্ধ পাওয়া যায় না। ট্র্যানজিষ্টরে ব্যবহারের উপযোগী জার্মেনিয়ামের বিশুদ্ধতা সত্যই এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার। প্রতি হাজার কোটি জার্মেনিয়াম পরমাণুর ভিতর মাত্র একটি অন্য পরমাণু থাকে। এত বিশুদ্ধ পদার্থ প্রস্তুত করা কোন রাসায়নিক পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। এই জন্য

বিন্দুস্পর্শ ট্র্যানজিষ্টর

যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, তাহার নাম স্থানীয় তরলীকরণ (Zone melting)। দেখা যায়, যদি কোন পদার্থ তরল অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থায় পরিণত হইতে থাকে, তবে উহার কঠিন অংশে দূষিত পদার্থের পরিমাণ তরল অংশের দূষিত tion) দরুণ ঐ পদার্থে তাপ উদ্ভূত হয়। এই তাপ ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এক খণ্ড জার্মেনিয়ামের এক সীমা হইতে তাপ ধীরে ধীরে আর এক সীমা পর্যন্ত এমন ভাবে চালিত করা যায় যে, সমস্ত জার্মেনিয়াম খণ্ডটিই ক্রমে তরল হইয়া
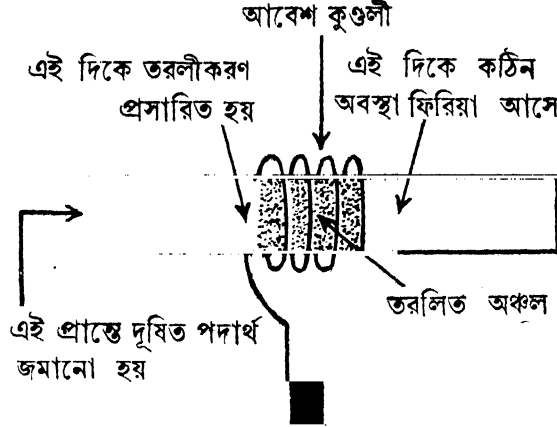
স্থানীয় তরলীকরণ।

পদার্থের চেয়ে কম থাকে; অর্থাৎ দূষিত পদার্থগুলি তরল অংশে যাইয়া ভীড় করে। পদার্থটির চারিদিকে তারের কুণ্ডলী বেষ্টিত থাকে এবং ঐ কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়া উচ্চ তরঙ্গ-সংখ্যার বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত করা হইলে বিদ্যুৎ-আবেশের (induc- আবার কঠিন অবস্থায় ফিরিয়া আসে—এই উপায়ে অধিকাংশ দূষিত পদার্থ এক দিকে জমানো যাইতে পারে। এই ভাবে কয়েকবার তাপ প্রয়োগ করিলে অতিশয় বিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম প্রস্তুত করা সম্ভব।

প্রজনন-বিদ্যার ক্রমবিকাশ

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

কথায় বলে, Like begets like—মানুষের এই সাধারণ অভিজ্ঞতার কথাটিই আছে বংশগতির মূলে। এই বংশগতির রীতিনীতি অনুশীলনের ফলেই জীববিদ্যার একটি বিশেষ শাখা উৎপন্ন হয়েছে, যাকে বলা হয় প্রজনন-বিদ্যা। এই বিদ্যা অতি আধুনিক এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এর সূচনা হয়। এর সূচনা করেন গ্রেগর মেণ্ডেল নামক একজন অষ্ট্রীয় মঠাধ্যক্ষ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে, বিভিন্ন প্রকৃতির মটরশুঁটির গাছের মধ্যে বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির পরীক্ষার ভিতর দিয়ে। মেণ্ডেলের আবিষ্কৃত তথ্য এবং প্রজনন সম্পর্কে আলোচনা করবার পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ বংশগতি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

বংশগতির ধারা খুব হাল্কাভাবে পর্যবেক্ষণ করলেও দুটা প্রধান জিনিষ প্রত্যেকেরই চোখে পড়বে। একটা হচ্ছে, সদৃশ প্রাণী সদৃশ প্রাণীরই জন্ম দেয়; যেমন—কুকুরের বাচ্চা কুকুরই হয়, কখনো বিড়াল হতে দেখা যায় না। আর একটা জিনিষ হলো, যদিও সদৃশ প্রাণী থেকে সদৃশ প্রাণীর জন্ম হয় তথাপি এই সাদৃশ্য একেবারে নিখুঁত নয়। কোন জীবেরই দুটি সন্তান ঠিক একরকম হয় না। এই দুটি তথ্যই বংশগতির প্রধান নিয়ম। কিন্তু কেন এমন হয়? এই সম্বন্ধে প্রথম মোটামুটি একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিলেন গ্যালটন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে। তিনি দেখলেন, পিতামাতার কাছ থেকে সন্তান যা পায়, তা তাদের জনন-পদার্থ ছাড়া আর কিছু নয়। জীবের ডিম্বকোষরূপে প্রথম সৃষ্টির কিছু পরে যখন কোষ-বিভাজনের ফলে তার দেহ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখনই কয়েকটি কোষ সাধারণ দেহকোষ থেকে পৃথক হয়ে যায়। এদের নাম জনন-কোষ। এভাবে পুরুষ ও স্ত্রী-জাতীয় জীবের মধ্যে যে দুই জাতীয় জনন-কোষ পৃথকভাবে অবস্থান করে তারাই পরিণত অবস্থায় মিলিত হয়ে নতুন জীবের ডিম্বকোষ সৃষ্টি করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পিতামাতার জনন-কোষই ধারাবাহিক-ভাবে সন্তানের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে চলে—এই হলো বংশগতির মূল রহস্য। এই কারণেই সদৃশ জীব থেকে সদৃশ জীবেরই সৃষ্টি হয়। এই সম্বন্ধে গ্যালটন আরও অনুসন্ধান করেছিলেন যে, সন্তান যে কেবল তার পিতামাতারই দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি লাভ করে থাকে তা নয়, সে তার পিতামহ, মাতামহ এবং আরও উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্যও লাভ করে, কিন্তু এই প্রাপ্তির অনুপাতটা উর্ধ্বতন পুরুষের দিকে ক্রমশঃ কমে যায়। তাঁর ধারণা, এই অনুপাতটা পিতা-মাতা থেকে আরম্ভ করে গড়পড়তা হিসাবে দাঁড়াবে এইভাবে—$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$,..... ইত্যাদি। এটা একটা অসীম শ্রেণী।

উপরের আলোচনা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের সন্তানদের মধ্যে অবিকৃতভাবে চলে যায়; কিন্তু আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে, কোন জীবেরই সন্তানেরা ঠিক তাদের পিতামাতার মত হয় না। বৈসাদৃশ্যটা কখনো বা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন দেখা যায় যে, দীর্ঘকায় পিতামাতার একেবারে খর্বাকায় সন্তান বা বুদ্ধিমান পিতামাতার জড়বুদ্ধি সন্তান হচ্ছে। সুতরাং বংশগতির মধ্যে বৈচিত্র্য ও বৈসাদৃশ্যও স্বীকার করে নিতে হবে।

বংশগতির মধ্যে এই ক্ষুদ্র, বৃহৎ বা অন্যান্য

পরিবর্তন কেন হয়, সে সম্বন্ধে জীব-বিজ্ঞানীরা এ-পর্যন্ত একেবারে নিখুঁত ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে পারেন নি, তবে এই সম্বন্ধে তিনটি মতবাদ প্রচলিত হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, লামার্কের 'ব্যবহার ও অব্যবহার' সংক্রান্ত মতবাদ। ফরাসী বৈজ্ঞানিক জে. বি. লামার্ক ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে এই মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতে, জীবন্ত প্রাণীর কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি বিশেষ কাজে ক্রমাগত ব্যবহৃত হতে থাকে, তবে তা বংশানুক্রমে পরিপুষ্ট হতে থাকবে। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি বললেন—জিরাফের পূর্বপুরুষের এক কালে সাধারণ গলাই ছিল, প্রতিকূল পরিবেশে গলা বাড়িয়ে উঁচু ডালের পাতা খাবার চেষ্টা করবার ফলে একটু একটু করে অনেক পুরুষ পরে তাদের গলা এমন লম্বা হয়ে গেছে। এমনি করে জীব-জগতের মধ্যে বিচিত্র অভিব্যক্তি ঘটেছে। এই মতবাদটি বিশেষ কৌতূহলজনক হলেও এর অসারত্ব প্রমাণিত হয়েছে। বহু পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, অর্জিত বৈশিষ্ট্য কখনো বংশধারায় পরিচালিত হয় না। চীনা মেয়েরা অতি প্রাচীন কাল থেকেই সৌন্দর্য বৃদ্ধির খাতিরে কাঠের জুতা পরে পা ছোট করে এসেছে, কিন্তু তাদের সন্তানেরা কোনদিনই খাটো পা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে নি।

এরপর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরেজ প্রকৃতি-তত্ত্ববিদ চার্লস ডারউইন তাঁর বিখ্যাত প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদ প্রকাশ করেন। এর পিছনে তাঁর দীর্ঘ ২৮ বছরের সাধনা ও পর্যবেক্ষণ ছিল। তাঁর মতবাদের সারাংশ হলো, প্রত্যেক জীবকে প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। এরই নাম জীবন-সংগ্রাম। জীবন-সংগ্রামের রহস্য হচ্ছে, প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান। এর জন্যে জীবেরা স্বাভাবিক-ভাবেই নানারকমের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। এভাবে যে সব জীব জীবনধারণের উপোযোগী খাদ্য ও অন্যান্য সুযোগ লাভের অনুকূল পরিবর্তন করে নিতে পারে, তারাই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করে, বাকীরা ধ্বংস হয়ে যায়। ডারউইনের ভাষায় এর নাম যোগ্যতমের উদ্বর্তন। এই উদ্বর্তন থেকে জীব-জগতে নতুন নতুন জাতি ও প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। আবার কোন কারণে মধ্যবর্তী ধারা লুপ্ত হয়ে গেলে পরবর্তী জীবদের একেবারে অভিনব বলে মনে হয়। ডারউইনের এই অভিব্যক্তিবাদ বর্তমানে জীব-জগতের বিবর্তনের আংশিক ব্যাখ্যারূপেই গৃহীত হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তনজনিত বৈশিষ্ট্যগুলি কেমন করে বংশানুক্রমে পরিচালিত হয়, এর মধ্যে তার কোন ব্যাখ্যা নেই।

এরপর ১৯০১ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের এক উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ ডি-ভ্রিজ তাঁর 'মিউটেশন' বা পরিব্যক্তি মতবাদ প্রচার করেন। ডারউইন ধারণা করেছিলেন, দীর্ঘকাল ধরে সামান্য সামান্য পরিবর্তন হতে হতে জাতি বা প্রজাতির মধ্যে অভিনব অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। ডি-ভ্রিজ আমেরিকার সাধারণ এক জাতের প্রিমরোজের বীজ থেকে গাছ উৎপাদন করতে গিয়ে দেখলেন, তাদের মধ্যে এক-একটা গাছ সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির হয়েছে এবং তার বীজ থেকে সেই অভিনব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গাছ বংশানুক্রমেই উৎপন্ন হচ্ছে। এভাবে এক পুরুষের মধ্যেই এক অভিনব প্রজাতির উৎপত্তি হতে দেখা গেল। আকস্মিকভাবে এরূপ নতুন প্রজাতি উৎপত্তির ব্যাপারটাকে তিনি 'মিউটেশন' নাম দিয়েছেন ডি-ভ্রিজ বললেন, সমগ্র জীব-জগতে গোড়া থেকেই এই 'মিউটেশন' কাজ করে আসছে, অর্থাৎ পরিবর্তনটা আসে হঠাৎ এবং খামখেয়ালীভাবে। আধুনিক জীব-বিজ্ঞানীদের মতে, 'মিউটেশন' মতবাদও জীব-জগতের বৈচিত্র্যের আংশিক ব্যাখ্যা করতে পারে মাত্র। 'মিউটেশন' নানাপ্রকারের হয়, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জীবন-সংগ্রামের অনুকূল নয়। অনুকূল 'মিউটেশন' দু-চারটা মাত্র হয়ে থাকে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে এরাই টিকে

থাকে। আধুনিক জীব-বিজ্ঞানীরা বিবর্তনকে মূলতত্ত্বরূপে স্বীকার করে নিয়ে 'মিউটেশন' ও প্রাকৃতিক নির্বাচন উভয়কেই পরিপূরক মতবাদরূপে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু ডারউইনেরও প্রজনন-বিদ্যা সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না। এই বিদ্যার প্রথম পত্তন করেন মেণ্ডেল। গ্রেগর মেণ্ডেল ছিলেন একজন অষ্ট্রীয় মঠাধ্যক্ষ। তিনি বহুকাল ধরে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মটরশুঁটির গাছের মধ্যে বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর বংশানুক্রম ও বর্ণসঙ্কর সংক্রান্ত সূত্রগুলি প্রকাশ করেন। কিন্তু তখন সমগ্র জগতের দৃষ্টি ডারউইনের যুগান্তকারী অভিনব মতবাদের দিকে এতই অভিনিবিষ্ট ছিল যে, দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে এর উপর বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়ে নি। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ডি-ভ্রিজ এবং অন্য দু-জন বিজ্ঞানী এই সূত্রগুলি পুনরুদ্ধার করেন। তখন থেকেই মেণ্ডেলীয় মতবাদ জীব-বিজ্ঞানে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে। মেণ্ডেল মসৃণ খোসাযুক্ত এবং কোঁচকানো খোসাযুক্ত মটরশুঁটির গাছের মধ্যে বর্ণসঙ্কর উৎপাদনের পরীক্ষা করেছিলেন এবং কয়েক পুরুষ ধরে তাদের বংশবিস্তার লক্ষ্য করে প্রত্যেক পুরুষে তাদের পিতামাতা থেকে আগত বৈশিষ্টগুলির সংখ্যাগত অনুপাত নির্ধারণ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি বংশানুক্রমের কারণ ও রীতিনীতি সম্পর্কে কয়েকটি সূত্রও উপস্থাপিত করেন। মেণ্ডেল প্রদর্শিত পথে উদ্ভিদ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের উপর বর্ণসঙ্কর উৎপাদনের পরীক্ষা করে তাঁর সূত্রগুলির সত্যতা মোটামুটি প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে পরবর্তীকালে বহু জটিলতা দেখা দেয়, যার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেণ্ডেলীয় সূত্রগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন করা দরকার হয়েছে। অবশেষে বিংশ শতাব্দীতে এসে আধুনিক 'গ্যামিটোজেনেসিস' প্রক্রিয়া এবং ক্রোমোজম সংক্রান্ত আবিষ্কার ও জ্ঞানের আলোকে মেণ্ডেলীয় মতবাদের সমাদর কমে গেলেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব হ্রাস পায় নি।

আধুনিক প্রজনন-বিদ্যার বিশেষ উন্নতি দেখা দিল বিশিষ্ট আমেরিকান জীব-বিজ্ঞানী মর্গ্যান ও তাঁর শিষ্যদের হাতে। ফলের মাছি 'ড্রোসোফিলার' বংশানুক্রম পরীক্ষা করতে গিয়ে মর্গ্যান ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁর অধুনা প্রচলিত 'ক্রোমোজম' ও 'জিন' সম্পর্কিত মতবাদ প্রচার করেন। এই ড্রোসোফিলা মাছিগুলি যেমন দ্রুত বংশবিস্তার করে, তেমনি এদের মধ্যে নানা ধরণের 'মিউটেশন'ও লক্ষিত হয়। তাছাড়া গবেষণাগারে এদের প্রজনন ও পরীক্ষার ব্যাপারে অনেক সুবিধা আছে। মর্গ্যানের মতবাদই এখন পাশ্চাত্য জীব-বিজ্ঞানের প্রধান অবলম্বন হয়ে আছে।

'ক্রোমোজম' হলো জীবকোষের নিউক্লিয়াসের অন্তর্গত সূত্রবৎ একপ্রকার রহস্যময় পদার্থ। ক্রোমোজম আবিষ্কার হয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে অ্যাণ্টন, ফ্লেমিং এবং অন্যান্য কয়েকজন বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টার ফলে। এই নামটি প্রথম ব্যবহার করেন জার্মান বিজ্ঞানী উইলহেল্‌ম্‌ ফন ওয়ালডেয়ার হার্টজ্‌ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু এর প্রকৃতি সম্পর্কে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তেমন কিছু জানা যায় নি। আধুনিক আবিষ্কারের ফলে ক্রোমোজম সম্পর্কে যে সব জ্ঞানলাভ হয়েছে, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

পূর্বেই বলেছি উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহকোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রোমোজম অবস্থান করে। বিশ্রামের অবস্থায় এগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তখনও তারা বর্তমান থাকে। এরা তখন জালের মত সূত্রাকারে জড়িয়ে থাকে; তার নাম নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম। কোষ-বিভাজনের সময় জালের বন্ধন খুলে যায় এবং ক্রোমোজমগুলি সরল সূত্রাকারে দেখা দেয়। এদের উপর কতকগুলি অতিসূক্ষ্ম দানাদার পদার্থ লাইন ধরে সাজানো থাকে। সেগুলিকে বলা হয় 'জিন'। এই জিনকেই বংশগতির

বাহক মনে করা হয়। প্রত্যেকটি জিনই এক-একটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং এদের সমষ্টিই হলো জীবের পূর্ণ চরিত্র। এই ক্রোমোজম এবং জিন কি পদার্থের দ্বারা গঠিত, তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নি, তবে এর মধ্যে কয়েক শ্রেণীর নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন আছে বলে মনে করা হয়। এদের মধ্যে এক শ্রেণীর নিউক্লিক অ্যাসিড সম্ভবতঃ বংশগতির ধারক ও বাহক এবং একরকম জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জিনগুলি বংশগত বৈশিষ্ট্য সংক্রমণ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রত্যেকের ক্রোমোজমের সংখ্যা বিভিন্ন ও নির্দিষ্ট; যেমন—পেঁয়াজের ১৬, গমের ১৪, ভুট্টার ২০, ব্যাঙের ৪, পায়রার ১৬, কুকুরের ২২ এবং মানুষের ৪৮ ইত্যাদি। কোন কোন জীবের ক্রোমোজমের সংখ্যা ২০০ বা তারও অধিক। সর্বদাই এরা জোড় সংখ্যায় থাকে।

উপরে যে ক্রোমোজমের সংখ্যাগুলি দেওয়া হলো, সেগুলি সাধারণ দেহকোষের ক্রোমোজমের সংখ্যা। এই সংখ্যাকে বলা হয় 'ডিপ্লয়েড', অর্থাৎ দ্বিগুণিত সংখ্যা। কিন্তু পরিণত যৌনকোষের ক্রোমোজমের সংখ্যা ঠিক এর অর্ধেক। তার নাম 'হ্যাপ্লয়েড', অর্থাৎ অর্ধসংখ্যা। যে জটিল প্রক্রিয়ায় যৌনকোষগুলির ক্রোমোজম-সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়, তাকে বলা হয় হ্রাস-বিভাজন (Reduction division)। পরিণত পুং-বীজকোষকে বলা হয় শুক্রাণু এবং স্ত্রী-বীজকোষকে বলা হয় ডিম্বাণু। এই শুক্রাণু ও ডিম্বাণু থেকে যে নতুন জীবের নিষিক্ত ডিম্বকোষের সৃষ্টি হয়, তার নাম 'জাইগোট'। এই জাইগোটের মধ্যে উভয় পক্ষ থেকে 'অর্ধসংখ্যার' ক্রোমোজম এসে আবার 'দ্বিগুণিত সংখ্যা' হয়ে যায়। এভাবে ক্রোমোজমের নির্দিষ্ট সংখ্যাটি বংশের পর বংশ ধরে অব্যাহতই থেকে যায়। জননকোষের মধ্যে ক্রোমোজমের অর্ধসংখ্যায় পরিণত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি তা না হতো তবে পরবর্তী বংশে ক্রোমোজমের স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বিগুণিত হয়ে যেত। তাতে জাতিগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে গিয়ে এক জীব থেকে ক্রমশঃ বিরাট আকারের জীবের উৎপত্তি হতে থাকতো।

একটা জিনিষ উল্লেখযোগ্য যে, জাইগোটের মধ্যে যখন উভয় পক্ষ থেকে সমান সংখ্যক ক্রোমোজম মিলিত হয়, তখন তারা এক-একটি যুগ্ম পদার্থ সৃষ্টি করে। এই যুগ্ম বস্তুটি পরে হ্রাস-বিভাজনের সময় পৃথক হয়ে যায়, কিন্তু তখন তারা ঠিক আর পূর্বের জিনিষটি থাকে না। কারণ জোড়া বাঁধবার সময় তারা সমান্তরালভাবে না থেকে এক বিশেষ ব্যবস্থায় এমন ভাবে মোচড় খেয়ে যায় যে, তাদের মধ্যে 'জিনে'র পারস্পরিক অদলবদল হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার নাম 'ক্রসিং ওভার'। এর ফলে নতুন জীবের যে ক্রোমোজমগুলি সৃষ্ট হয়, তারা পিতা বা মাতা কারও ক্রোমোজমের ঠিক অনুরূপ থাকে না। 'জিনের' অদলবদলের জন্যে তাদের মধ্যে প্রকৃতিগত নানারূপ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। এভাবে জীবজগতের বৈচিত্র্য বজায় থাকে।

জননীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে পুরুষ হবে, কি স্ত্রী হবে—সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে তা কেমন করে জানা যেতে পারে? এই বিষয়ে মানুষের অনুসন্ধানের অন্ত নেই। এই সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক আবিষ্কার এখনও হয় নি, তবে ক্রোমোজম-মতবাদের মধ্যে পুরুষ বা স্ত্রী হওয়ার কারণ সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ডিম্বাণুর যুগ্ম ক্রোমোজোমের প্রত্যেকটি পরস্পরের অনুরূপ। এদের বলা হয় XX; কিন্তু কতকগুলি শুক্রাণুর এক জোড়া ক্রোমোজমের মধ্যে একটা বিশেষ ধরণের ক্রোমোজম থাকে, যার আকৃতি, জোড়ার অপটি থেকে পৃথক। এর নাম যৌন-ক্রোমোজম বা Y-ক্রোমোজম। কাজেই XX ডিম্বাণু XY শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হলে সন্তান হবে পুরুষ, আর XX ডিম্বাণু XX শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হলে সন্তান হবে স্ত্রী। সুতরাং ভ্রূণের

সৃষ্টির একেবারে প্রথম পর্যায়েই তার লিঙ্গত্ব নির্ধারিত হয়ে যায়।

এখন আমরা জিন মতবাদ থেকে মিউটেশন বা আকস্মিক পরিবর্তনের একটা কারণ খুঁজে পেতে পারি। ইতিপূর্বে ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনের পুনর্বিন্যাসের কথা উল্লেখ করেছি। তাতে জীব-জগতের সাধারণ বৈচিত্র্যগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু মিউটেশন হলো আকস্মিক একটা বড় রকমের পরিবর্তন। এটা সম্ভব হয় ক্রোমোজম বা জিনের মধ্যে আকস্মিক বিপর্যয়ের ফলে। এই বিপর্যয় হতে পারে জিনগুলির প্রকৃতি বদ্‌লে গেলে অথবা জিন বা ক্রোমোজমের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি হলে। এগুলি অবশ্য স্বাভাবিক পরিব্যক্তি। মর্গ্যান সম্প্রদায়ের মতে, এরূপ পরিব্যক্তি একেবারে খামখেয়ালী, কোন বাহ্য পরিবেশের প্রভাবে এদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। আবার কৃত্রিম উপায়ে, যেমন—বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, এক্স-রে ও অন্যান্য পারমাণবিক বিকিরণের ফলে জিন বা ক্রোমোজমের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন হতে পারে। তাছাড়া বাহ্য পরিবেশের প্রভাবেও এক ধরণের পরিবর্তন আসতে পারে; কিন্তু এরূপ পরিবর্তন কখনও বংশানুক্রমিক হয় না, এক পুরুষেই এর শেষ হয়ে যায়। এরূপ পরিবর্তনকে বলা হয় 'মডিফিকেশন'। মর্গ্যানের মতে, স্বাভাবিক মিউটেশনগুলি সাধারণতঃ ছোটখাটো কোন কোন বৈশিষ্ট্যের। কখনও যদি বা কোন কোন জিনের মধ্যে বড় রকমের পরিব্যক্তি হয়, অন্যান্য জিনের ক্রিয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত সেই পরিব্যক্তির প্রকাশ তেমন উগ্র হতে পারে না।

এবার প্রজনন-বিস্তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলবো। বর্ণসঙ্কর উৎপাদনের পথপ্রদর্শক হলেন মেণ্ডেল। মেণ্ডেলের প্রদর্শিত পন্থায় উদ্ভিদ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণী নিয়ে অনেকে বহুবিধ পরীক্ষা করেছেন। তবে বর্ণসঙ্কর বা অন্য প্রণালীতে উদ্ভিদের বিচিত্র প্রজাতির সৃষ্টি যাঁরা করেছেন, তাঁদের মধ্যে লুথার বার্বাঙ্কের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার মাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশের অন্তর্গত ল্যাঙ্কাষ্টারে জন্মগ্রহণ করেন। নতুন নতুন ফলমূল এবং বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ সৃষ্টিতে তাঁর অপূর্ব সাফল্যের জন্যে তাঁকে 'উদ্ভিদের যাদুকর' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীতে কোনকালে ছিল না, এমন সব ফুল, ফল, বৃক্ষলতা উৎপাদন করে তিনি প্রজনন-বিস্তার ইতিহাসে এক যুগান্তর এনেছেন। তাঁর অবলম্বিত উপায়গুলির মধ্যে কয়েকটি হলো—প্রকৃতি অনুসারে নির্বাচন, দূর ও নিকট সম্পর্কিত প্রজাতির মধ্যে কৃত্রিম পরাগনিষেক এবং স্থলবিশেষে কলম ও জোড়কলম প্রভৃতি অযৌন উপায়ে বংশবিস্তার। এসব উপায়ে তিনি অসংখ্য রকমের গোলাপ, লিলি, ডোজ, আলু, টোম্যাটো, বাদাম, পিচ, শশা প্রভৃতি বিচিত্র গুণসম্পন্ন ফুল ও ফল উৎপাদন করেছেন। এদের মধ্যে সবগুলি অবশ্য বংশানুক্রমিক গুণাবলী পায় নি। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি তাদের ধ্বংস করে যেগুলির বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিক কেবল তাদেরই বাঁচিয়ে রেখেছেন। এরা স্থায়ীভাবে এখনও বংশবিস্তার করছে। তবে একটা জিনিষ তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, যৌন-মিলনে উৎপন্ন বীজ থেকে উৎপাদিত উদ্ভিদের মধ্যে কোন নতুন বৈশিষ্ট্য দীর্ঘকাল অবিকৃত রাখা যায় এবং তাদের তেজ ও শক্তির উৎকর্ষতা বহু পুরুষ ধরে বজায় থাকে। কিন্তু কলমের প্রথায় এরূপ প্রায়ই সম্ভব হয় না। আর একটি বিষয় এই যে, নিকট সম্পর্কযুক্ত সমজাতীয়ের মিলন অপেক্ষা অসম মিলনের ফল সর্বদাই উৎকৃষ্ট হয়।

পরিশেষে রাশিয়ার জীববিজ্ঞানী মিচুরিন এবং প্রজনন-বিস্তা সম্পর্কিত তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে দু-চার কথা বলছি। মিচুরিন এবং তাঁর সম্প্রদায় 'জিন' মতবাদে বিশ্বাসী নন। তাঁদের মতে, বংশগত বৈশিষ্ট্যবাহী কোন বিশেষ পদার্থ নেই। তাছাড়া লব্ধগুণও বংশগতির ধারায় পাওয়া সম্ভব এবং

উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করলে বংশগতির ধারা বদলে দেওয়া যায়। দেহের খাদ্য-আত্তীকরণ ও বিপাক-ক্রিয়ার মধ্যেই নাকি বংশগতির মূল রহস্য নিহিত আছে এবং জীবনীশক্তি ও বংশগত চরিত্র উভয়ের সামঞ্জস্যে বিভিন্ন বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। এই হলো সংক্ষেপে মিচুরিন সম্প্রদায়ের মতবাদ। এই মতবাদ সত্য প্রমাণিত হলে অবশ্য এক যুগান্তকারী আবিষ্কার বলে পরিগণিত হতে পারে; কিন্তু পাশ্চাত্তের জীব-বিজ্ঞানীরা এর ঘোর পরিপন্থী। তাঁদের মতে, এর পিছনে বিজ্ঞান যত না আছে, সোভিয়েট দেশের বিশেষ রাষ্ট্রীয় মতবাদ ও কাঠামো এর পিছনে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। যাহোক স্বয়ং মিচুরিন এবং তাঁর মতানুবর্তী আধুনিক সোভিয়েট জীব-বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম ব্যবস্থায় সোভিয়েট উদ্ভিদ ও প্রাণী-বিদ্যায় যুগান্তর সৃষ্টি করবার দাবী করেছেন। তাঁরা নাকি প্রকৃতিকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করবার সামর্থ্য রাখেন। এখন নাকি সাইবেরিয়ার অতি শীতল মরুভূমিতে এমন সব উন্নত ধরণের ফুল ও ফলের চাষ হচ্ছে, যা পূর্বে একমাত্র দক্ষিণের উষ্ণাঞ্চলে জন্মাতো। তাছাড়া এমন সব উন্নত ধরণের হাঁস-মুরগী ও গো-মহিষাদির প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে, যাদের ডিম বা দুধ উৎপাদনের ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে গেছে। তাঁরা নাকি এসব কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা, উন্নত খাদ্য-প্রয়োগ এবং উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করে পেয়েছেন! সব-চেয়ে মজার কথা এই যে, সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা মেণ্ডেল ও মর্গ্যান সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধী হলেও, ডারউইনের মতবাদে বিশ্বাসী। ডারউইন কিছুটা বিশ্বাস করতেন যে, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বংশগতির বিকাশ বদলে যেতে পারে। এই মতবাদ বিস্তারের ফলে মিচুরিন তাঁর মতবাদ গড়ে তুলেছেন। এজন্যে এর নাম দিয়েছেন, সৃজনধর্মী ডারউইন বাদ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা এখন একটা কথা বলছেন যে, জিনের প্রকৃতি নমনীয় এবং বাহ্যিক নানা কারণে এর মধ্যে নানা পরিবর্তন আসতে পারে। বিশেষ করে আধুনিক কালে যে সব আণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে, তাদের মারাত্মক রশ্মি বিকিরণের ফলে জীবকোষের, বিশেষ করে মানুষের যৌন-কোষের জিনের মধ্যে গুরুতর অনিষ্টকর পরিবর্তন আসতে পারে। এর ফলে অদ্ভুত রোগগ্রস্ত, জন্মান্ধ, দৈহিক ও মানসিক বৈকল্যযুক্ত মানব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়!

সংশ্লেষিত রবার

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মেনীতে প্রাকৃতিক রবারের আমদানী বন্ধ হওয়ার পর ঐ দেশের রসায়নবিদেরাই সর্বপ্রথম অধিক পরিমাণে কৃত্রিম রবার উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করেন। ডাইমিথাইল বিউটাডাইনের অণু সংযোজন করে বৃহদাকার অণুসমন্বিত একটি পদার্থ গঠিত হয়—তাকেই বলা হয় মিথাইল রবার। এই সংশ্লেষিত রবার তৈরীর বিভিন্ন উপাদান পাওয়া গেল পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে। কিন্তু এই কৃত্রিম রবারের গুণাবলী বিশেষ সন্তোষজনক ছিল না। তাছাড়া খরচও বেশী হতো। কাজেই যুদ্ধের অবসানে জার্মেনীতে প্রাকৃতিক রবারের আমদানী আবার শুরু হবার পর কৃত্রিম রবারের উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হলো।

কিন্তু বিভিন্ন দেশের রসায়নবিদেরা প্রাকৃতিক রবারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে, এরূপ কৃত্রিম রবার উৎপাদনের জন্যে গবেষণা করতে লাগলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই জার্মেনীর রসায়নবিদেরা উন্নততর গুণসম্পন্ন একটি পদার্থ আবিষ্কার করেন। এটির নাম হলো বুনা-এস। বিউটাডাইন এবং স্টাইরিনের সঙ্গে আরও কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ মিলিত করে এই পদার্থটি উৎপাদন করা হয়। এর গুণাবলী অনেকাংশেই প্রাকৃতিক রবারের গুণাবলীর মত। গাড়ীর টায়ার তৈরীর জন্যে এই কৃত্রিম রবার নিয়োগ করা হয়। এখনও এই পদার্থটির যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

১৯৩১ সালের ২রা নভেম্বর ডিউ পণ্ট কোম্পানীর রসায়নবিদেরা একপ্রকার কৃত্রিম রবার আবিষ্কার করে' তার নামকরণ করেন ডিউপ্রিন। পরে এই দ্রব্যটিই নিওপ্রিন নামে পরিচিত হয়। নিওপ্রিনেব উৎপাদন-প্রক্রিয়া খুবই জটিল; একে খুব সাবধানতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। বৈদ্যুতিক চুল্লীতে কোক কয়লা ও চুন এক সঙ্গে উত্তপ্ত করে তৈরী হয় ক্যালসিয়াম কার্বাইড। অনুঘটকের বর্তমানে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও জল মিলিত হলে তৈরী হয় অ্যাসিটিলিন গ্যাস—যা থেকে পরে পাওয়া যায় মনোভিনাইল অ্যাসিটিলিন। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে মনোভিনাইল অ্যাসিটিলিনের বিক্রিয়ার ফল হলো ক্লোরোপ্রিন। ক্লোরোপ্রিনের অণু সংযোজন করে গঠিত হয় নিওপ্রিন। প্রাকৃতিক রবারের গুণাবলী ছাড়া নিওপ্রিনের আরও কয়েকটি বহুমূল্য গুণ আছে—তেল, চর্বি, অক্সিজেন এবং আরও কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়ায় এটি বিকৃত হয় না এবং ঘর্ষণজনিত ক্ষয় রোধ করতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের অনেক কাজেই নিওপ্রিন ব্যবহার করা হতো—বিশেষতঃ ব্যারাজ বেলুনের বস্ত্র তৈরীতে। ঐ সময়ে আমেরিকায় বিউটাইল নামক আর একটি সংশ্লেষিত রবারের প্রচলন হয়। এই দ্রব্যটি প্রাকৃতিক রবারের চেয়ে কয়েকটি গুণে উৎকৃষ্টতর—বিশেষতঃ এটি কম রন্ধ্রময়। এই গুণের জন্যে টায়ারের ভিতরের টিউব তৈরীর পক্ষে এই কৃত্রিম রবার অধিকতর উপযোগী। এই দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করতে গিয়ে যান্ত্রিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একটি কামরার ভিতরের তাপমাত্রা রাখতে হয় শূন্য ডিগ্রীর নীচে -১৪০° ডিগ্রী ফারেনহাইট। বিউটাইলের প্রধান উপাদান হলো দুটি গ্যাস—আইসোবিউটাইলিন ও আইসোপ্রিন। কামরার অতি নিম্ন তাপমাত্রায় অনুঘটক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের বর্তমানে গ্যাস দুটি মিলিত হলে অতিদ্রুত তীব্র বিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিউটাইল উৎপন্ন হতে থাকে। যথোপযুক্ত আকারের উপকরণ তৈরীর জন্যে ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি পরিস্রাবণ এবং শুষ্ক করবার পর উত্তপ্ত অবস্থায় চাপ দিতে হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রাকৃতিক রবারের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে মিত্রশক্তিবর্গকে কৃত্রিম রবারের উপরই নির্ভর করতে হতো। ঐ সময়ে বুনা-এস, বিউটাইল ও নিওপ্রিনের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃত্রিম রবারের উপর এতটা নির্ভর করতো যে, দেশের মোট রবারের চাহিদার শতাংশের প্রায় সত্তর ভাগই পূরণ করা হতো সংশ্লেষিত রবারের সাহায্যে। বর্তমানে অধিক পরিমাণে অনেক প্রকার কৃত্রিম রবার উৎপন্ন হচ্ছে।

আমেরিকায় বুনা-এস-এর নামকরণ হয়েছে, জি-আর-এস (গবর্ণমেণ্ট রবার—স্টাইরিন)। গত দশ বছরে বুনা-এস বা জি-আর-এস-এর উৎপাদন প্রণালীর অনেক উন্নতি সাধন করা হয়েছে। বর্তমানে এই পদার্থটি তৈরী হয় ঠাণ্ডা প্রক্রিয়ায়। পূর্বে উপাদানগুলির বিক্রিয়ার জন্যে ১২২° ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা দরকার হতো। কিন্তু এখন ৪১° ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা রাখলেই

চলে। পূর্বের চৌদ্দ ঘণ্টার পরিবর্তে এখন মাত্র-তিন ঘণ্টাতেই মাল তৈরী হয়। এই কৃত্রিম রবারে তৈরী টায়ার প্রাকৃতিক রবারে তৈরী টায়ারের চেয়ে বেশী টেকসই।

এই শ্রেণীর আর একটি সংশ্লেষিত রবার হলো বুনা-এন; এর উপাদান হলো বিউটাডাইন অ্যাক্রিলোনাইট্রাইল। প্রাকৃতিক রবারের চেয়ে কয়েকটি গুণে নিকৃষ্ট হলেও কোন কোন গুণে এটিই শ্রেষ্ঠ। এটি তাপ, ঘর্ষণজনিত ক্ষয় ও তেলের সংস্পর্শে বিকৃত হওয়া প্রতিরোধ করতে পারে। এই সব গুণের জন্যে কৃত্রিম রবারটি গ্যাসোলিনের জন্যে হোজ-পাইপ এবং মোটরের জন্যে গাসকেট তৈরীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। হাইকার এবং চেসিগামও বুনা শ্রেণীর সংশ্লেষিত রবার। বিশেষ গুণের জন্যে এরা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক রবারের জায়গা দখল করেছে।

নিওপ্রিনের অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। এখন এই শ্রেণীর কয়েক প্রকার রবার পাওয়া যায়। এদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়েছে। রাসায়নিক পদার্থ রাখবার পাত্রের ভিতরের আচ্ছাদন, অধিককাল স্থায়ী মোটরের গাসকেট, শিল্পে মাল বহন করবার বেল্ট এবং বিশেষ গুণসম্পন্ন কাগজ তৈরীতে নিওপ্রিন ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম রবারটি দ্রবীভূত অবস্থায় রঙের সঙ্গে মিশিয়ে রাসায়নিক কারখানায় ইস্পাত প্রভৃতির উপকরণ রং করলে ক্ষয়কারক আবহাওয়া থেকে এরা রক্ষা পায়।

সম্প্রতি বিউটাইলের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এটি আর কেবল টায়ারের ভিতরের টিউব তৈরীর কাজেই লাগে না, আবহাওয়ার অক্সিজেন এবং ওজোনের বিক্রিয়া নিবারণ করতে পারে বলে এটি মোটর গাড়ীর টিউব ব্যতীত অন্যান্য অংশেও ব্যবহার করা হয়। উপরিউক্ত গুণের জন্যে এই পদার্থে নির্মিত টায়ার অনেক দিন গুদামে রাখলেও বিকৃত হয় না। অনেক শিল্পেই এই কৃত্রিম রবারে তৈরী হোজ-পাইপ, মাল বহনের বেল্ট এবং বৈদ্যুতিক অন্তরক ব্যবহৃত হয়।

আর একটি অভিনব সংশ্লেষিত রবার হলো থিয়োকল। এটিতে রবার ও প্লাষ্টিক উভয়ের গুণই উৎপন্ন করা যায়। রবার হিসাবে থিয়োকল যথেষ্ট কোমল, নমনীয় এবং টেকসই। এই রবার দিয়ে সমুদ্র-গর্ভস্থ টেলিগ্রাফ তারের আবরণ, ছাপার প্লেট এবং গ্যাসোলিনের হোজ-পাইপ তৈরী হয়। কোরোসিলও আর একটি আধুনিক সংশ্লেষিত রবার, যাতে রবার ও প্লাষ্টিকের উভয় ধর্মই আরোপ করা যায়। এই রবারে উৎপন্ন দ্রব্যাদি অনেক কাজেই লাগে; যেমন—বেলুন তৈরীর বস্ত্র, ঘরের আসবাবের ঢাকুনি, বর্ষাতি, গাসকেট এবং বৈদ্যুতিক উপকরণের আচ্ছাদনী প্রভৃতি।

অধুনা হাইপেলন নামক আর একটি নতুন কৃত্রিম রবার আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি উৎপন্ন হয় পলিইথিলিন প্লাষ্টিকের সঙ্গে ক্লোরিন ও সালফার ডাইঅক্সাইডের বিক্রিয়ার ফলে। এটি তাপ, আবহাওয়া, ওজোন এবং অনেক রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া প্রতিরোধ করতে পারে বলে শিল্পের অনেক উপকরণেই ব্যবহার করা যাবে।

এসব উন্নত গুণসম্পন্ন সংশ্লেষিত রবারের আবিষ্কার, শিল্পের পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে—ত্রিশ বছর পূর্বেও একটি টায়ারের জীবন-কাল ছিল প্রায় বারো হাজার মাইল। কিন্তু বর্তমানে কৃত্রিম রবার আবিষ্কারের ফলে টায়ারের আয়ুষ্কাল তিন গুণেরও অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

রসায়নবিদেরা কেবল মাত্র উন্নত গুণসম্পন্ন সংশ্লেষিত রবার আবিষ্কারেরই চেষ্টা করছেন না, তাঁরা প্রাকৃতিক রবারের অনুরূপ গুণসম্পন্ন কৃত্রিম রবার সংশ্লেষণ করবার জন্যেও গবেষণা করছেন। সম্প্রতি এরূপ একটি দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে—যার নাম দেওয়া হয়েছে, আমেরিপল-এস-এন।

১৯৫৮ সালে সিলিকন রবারের যথেষ্ট উন্নতি

সাধন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে আছে—নাই-ট্রাইল সিলিকন রবার (এদের সাধারণ আবহাওয়ার তাপমাত্রায় ভালক্যানাইজ করা যায়) এবং দ্রবণনীয় সিলিকন রবার।

সাম্প্রতিক দুটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হলো—ডয়টেরিও (গুডরীচ কোম্পানী) এবং ডাইন (ফায়ারস্টোন কোম্পানী)। ডয়টেরিও বা পারডয়-টেরিও আইসোপ্রিন প্রাকৃতিক রবারের মতই। তবে এই দ্রব্যটির শতাংশের পঁচানব্বই ভাগ সাধারণ হাল্কা হাইড্রোজেনের স্থান দখল করেছে ভারী জল থেকে প্রাপ্ত ভারী হাইড্রোজেন, অর্থাৎ ডয়-টেরিয়াম। ডাইন হলো অভিনব পলিবিউটাডাইন রবার—যার উদ্ভব হয়েছে লিথিয়াম ধাতুঘটিত অনুঘটকের সাহায্যে। কম তাপমাত্রায় দ্রব্যটি খুবই নমনীয়, লরীর টায়ারে ব্যবহারের উপযোগী।

ডিউ পন্ট কোম্পানী কর্তৃক ফ্লোরিনযুক্ত অভিনব রবার; ভিটন-এ তৈরীর কারখানা স্থাপিত হয়েছে।

পৃথিবীতে প্রাকৃতিক এবং সংশ্লেষিত রবারের সাম্প্রতিক খরচার সঙ্গে দশ বছর পুর্বের খরচার তুলনা :

	১৯৪৮ (টন)	১৯৫৮ (টন)
প্রাকৃতিক রবার	১,৪২০,০০০	১,৮৩০,০০০
সংশ্লেষিত „	৪৮০,০০০	১,৩০০,০০০
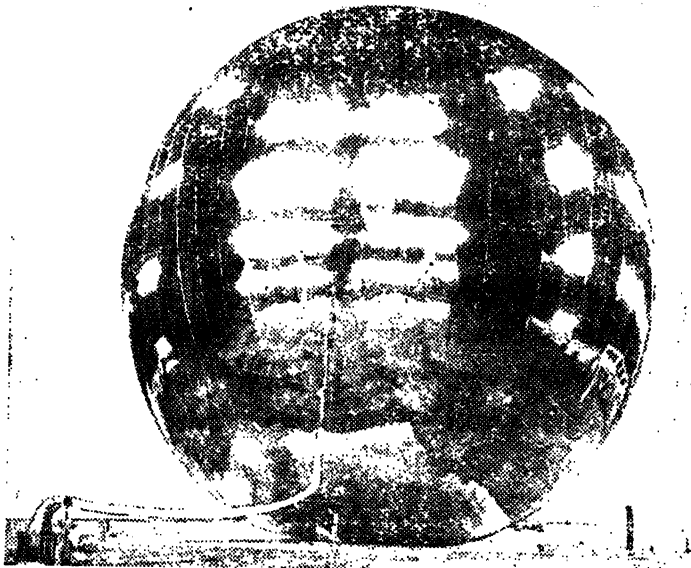
যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম উপগ্রহ একো—১। এই উপগ্রহের সাহায্যে মহাশূন্যের সঙ্কেত আদান-প্রদানে যোগাযোগ রক্ষা করা যাইবে।

সূর্যশক্তি প্রসঙ্গে

শ্রীদীপ্তিকুমার সেন

সূর্য থেকে আমরা আলোক-রশ্মি ও তাপ-রশ্মি পাই। এই আলোক ও তাপ আমাদের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য। এই দু-রকমের শক্তি ছাড়াও সূর্য থেকে অতিবেগুনী-রশ্মি এবং তড়িতাবিষ্ট বস্তুকণা উৎক্ষিপ্ত হয়। এই রশ্মি ও কণিকা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে প্রবেশ করে' নানারকম আশ্চর্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটায়। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের আকাশে মাঝে মাঝে বিচিত্র রঙের আলোর খেলা দেখা যায়, যাকে বলা হয় মেরুপ্রভা। পৃথিবীর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বেতার-বার্তা প্রেরণের কাজে আয়নমণ্ডল নামে একটি বিশেষ বায়ুস্তর অপরিহার্য। মাঝে মাঝে পৃথিবীতে চুম্বক-ঝটিকার আবির্ভাবে বেতার-বার্তা প্রেরণে খুবই বিঘ্ন ঘটে। এই মেরুপ্রভা, আয়নমণ্ডল এবং চুম্বক-ঝটিকা ইত্যাদি সব কিছুরই কারণ—পৃথিবীর উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের উপর সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনী-রশ্মি ও পদার্থ-কণিকার প্রতিক্রিয়া।

ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৫ মাইল উচ্চতায় বায়ুর যে স্তর আছে, তার চাপ ও ঘনত্ব খুবই কম। বায়ুর উর্ধ্বস্তরের ঘনত্বের স্বল্পতার দরুণ সূর্যের অতিবেগুনী-রশ্মি ও তড়িতাবিষ্ট পদার্থ-কণিকা সহজেই বায়ুর অণু-পরমাণুগুলিকে আক্রমণ করতে পারে ও প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটায়। এসব আশ্চর্য ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করবার আগে সূর্যের শক্তির উৎস সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার।

সূর্যশক্তির উৎস

সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে ৩'৮×১০^৩৩ আর্গ পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে। এই শক্তির পরিমাণ এত বেশী যে, আমাদের পক্ষে ধারণা করাও অসম্ভব। দু-একটি উদাহরণ দিলে কিছুটা পরিষ্কার হবে। সূর্যের মাত্র এক বর্গগজ ক্ষেত্র থেকে যে হারে শক্তি বিকিরিত হয়, তার সাহায্যে ৭২০০০ অশ্বশক্তির একটি যন্ত্র চালানো যেতে পারে। সূর্যের মাত্র এক পাউণ্ড পরিমাণ বস্তু মোট যে শক্তি বিকিরণ করে, তাকে কাজে লাগাতে পারলে একটি ১০০০ ওয়াটের বৈদ্যুতিক চুল্লীকে ৩০ লক্ষ ঘণ্টা, অর্থাৎ ৩৪ থেকে ৩৫ বছর সমানে জ্বালিয়ে রাখা যেতে পারে। তুলনা হিসাবে বলা যেতে পারে—এক পাউণ্ড কয়লা জ্বালিয়ে মোট যে শক্তি পাওয়া যায়, তার সাহায্যে ওই চুল্লীটি মাত্র তিন ঘণ্টা জ্বলতে পারবে। সূর্যের এক পাউণ্ড বস্তু যে এক পাউণ্ড কয়লার চেয়ে ১০ লক্ষ গুণ বেশী শক্তি দিতে সক্ষম—এর কারণ কি?

সূর্যের বাইরের দিকে তাপমাত্রা ৬০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। যতই সূর্যের কেন্দ্রের দিকে যাওয়া যাবে, ততই তাপমাত্রা বাড়বে। কেন্দ্রের তাপমাত্রা ২ কোটি ডিগ্রীর চেয়েও বেশী। জল ১০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ফুটতে থাকে। লোহা ১২০০° থেকে ১৫০০° ডিগ্রী উত্তাপে গলে তরল হয়। কাজেই ২ কোটি ডিগ্রী তাপমাত্রা সম্বন্ধে কোনও পরিষ্কার ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সূর্যের কেন্দ্রের এই প্রচণ্ড শক্তি—এই 'অন্তবিহীন অগ্নিধারার' উৎস কোথায়? সাধারণ বুদ্ধিতে প্রথমেই মনে হয়, কয়লা যেমন জ্বলে, অর্থাৎ অক্সিজেনের সঙ্গে কয়লার যেমন রাসায়নিক সংমিশ্রণ হয়, তেমনি সূর্যের বস্তুও হয়তো দহনক্রিয়ার সাহায্যে শক্তি উৎপাদন করে।

এই অনুমান প্রথমেই বাতিল করতে হয় এই কারণে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনও বস্তু নেই, যা সাধারণ দহন-ক্রিয়ার সাহায্যে ২ কোটি ডিগ্রী তাপমাত্রা বা কয়লার চেয়ে ১০ লক্ষ গুণ বেশী তাপশক্তি উৎপন্ন করতে পারে।

সূর্যশক্তির উৎস সম্বন্ধে ১০০ বছর আগে একটি মত প্রচলিত ছিল। হেল্‌মো ও কেল্‌ভিনের মতে, সূর্যের ক্রমাগত সঙ্কোচনই এই শক্তি উৎপত্তির মূল কারণ। গাণিতিক হিসাবে দেখা গেছে যে, সূর্য যে হারে শক্তিক্ষয় করে, সে হারে সঙ্কুচিত হয়ে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে দু-কোটি বছর লাগা উচিত। ভূতাত্ত্বিকেরা হিসেব করে দেখেছেন, পৃথিবীর বয়স ৩৩০ কোটি বছরের কম নয়—কাজেই সূর্যের বয়স আরও বেশী। "সঙ্কোচন-বাদ" সত্য হলে দু-কোটি বছরেই সূর্য লোপ পেয়ে যেত। এখানেই হেল্‌মো ও কেল্‌ভিনের অনুমানের অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়।

আধুনিক মতে, সূর্যের শক্তির উৎস হলো পারমাণবিক প্রক্রিয়া বা আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে, পরমাণু-কেন্দ্রক সম্পর্কিত প্রক্রিয়া। আইন-স্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে বস্তু ও শক্তি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দুটি সত্তা নয়—বিশেষ ক্ষেত্রে বস্তু শক্তিতে এবং শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হতে পারে। এই রূপান্তর হয় আইনস্টাইনের সূত্র অনুসারে :—

$$E = mc^2$$

(E = শক্তির পরিমাণ ; c = আলোর গতিবেগ ; এবং m = বস্তুর ভর। যে পরিমাণ বস্তু অন্তর্হিত হয়ে E পরিমাণ শক্তিরূপে আবির্ভূত হচ্ছে।)

এখানে দহন-ক্রিয়া সম্বন্ধে সাধারণের একটা ভুল ধারণার কথা বলা দরকার। অনেকে মনে করেন, দহন-ক্রিয়াতেও বস্তু লোপ পেয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। আসলে দহন-ক্রিয়ায় বস্তু মোটেই লোপ পায় না। কয়লার দহনের কথাই ধরা যাক। কয়লা ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলে পাওয়া যায়—কিছু ছাই, কিছু ধোঁয়া, আর কিছু তাপশক্তি। কয়লা ও অক্সিজেনের যা মোট ওজন, তা ছাই আর ধোঁয়ার মোট ওজনের সমান। কাজেই দেখা যাচ্ছে, রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই তাপ-শক্তি পাওয়া যায়। বস্তুর ওজন কম-বেশী হয় না। এখানে আইনষ্টাইনের সূত্র প্রয়োগ করা যাবে না।

পারমাণবিক কেন্দ্রকের প্রক্রিয়ার ফলে কিছু পরিমাণ বস্তু লোপ পায় এবং তাই দেখা দেয় উদ্ভূত শক্তিরূপে। পারমাণবিক বোমার এই মূলকথা আজকাল অনেকেই জানেন। পদার্থ-মাত্রেই পরমাণুর দ্বারা গঠিত। প্রত্যেকটি পরমাণু আবার এক-একটি ক্ষুদ্র সৌরজগৎবিশেষ। মধ্যে আছে ধনাত্মক তড়িৎসম্পন্ন কেন্দ্রক (nucleus), তাকে পরিক্রমা করছে এক বা একাধিক ঋণ-তড়িৎসম্পন্ন ইলেকট্রন। কেন্দ্রকের ধন-তড়িতের পরিমাণ পরিক্রমণশীল ঋণ-তড়িতের সমান—কাজেই পরমাণুটি নিরপেক্ষ। তড়িতের পরিমাণ অসমান হলেই পরমাণুটি হয় তড়িতায়িত; তখন তাকে বলা হয় আয়ন। এই কেন্দ্রকের ভর এবং তার তড়িতের পরিমাণের উপরেই সেই মৌলিক পদার্থের প্রকৃতি নির্ভর করে। একটি ভারী কেন্দ্রক নিয়ে যদি কৃত্রিম উপায়ে ভেঙে ফেলা যায়, তাহলে দেখা যাবে—সেই টুকরা কেন্দ্রক দুটির মোট ভর কেন্দ্রকের ভরের চেয়ে কম; অর্থাৎ কিছু বস্তু অন্তর্হিত হয়েছে। এই বস্তু পরিবর্তিত হয়ে দেখা দেয় প্রচণ্ড শক্তিরূপে। এই প্রক্রিয়ার নাম কেন্দ্রক-বিভাজন। পারমাণবিক বোমার মূলে আছে এই প্রক্রিয়া।

সূর্যের মধ্যে যে পরমাণু-কেন্দ্রকের প্রক্রিয়া চলছে, তার প্রকৃতি অন্য রকম। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় কেন্দ্রক-সংযোজন। এই প্রক্রিয়ায় কয়েকটি হাল্কা কেন্দ্রক একত্রিত হয়ে অপেক্ষাকৃত একটি ভারী কেন্দ্রক তৈরী হয়। হাইড্রোজেন-কেন্দ্রক সবচেয়ে হাল্কা। চারটি হাইড্রোজেন-কেন্দ্রক একত্রিত করতে পারলে একটি হিলিয়াম-কেন্দ্রক তৈরী হবে।

হাইড্রোজেন-কেন্দ্রকের ভর যদি ধরা যায় ১·০০, তবে হিলিয়াম-কেন্দ্রকের ভর হবে ৩·৯৭। কাজেই চারটি হাইড্রোজেন-কেন্দ্রক (যাকে বলা হয় প্রোটন) একত্রিত হয়ে একটি হিলিয়াম-কেন্দ্রক তৈরী করলে ০·০৩ পরিমাণ বস্তু অন্তর্হিত হয়। এই বস্তু আইনষ্টাইনের সূত্র অনুসারে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। হাইড্রোজেন-বোমার মূলেও আছে এই প্রক্রিয়া।

সূর্যের কেন্দ্রে ঠিক এ-রকম সোজাসুজিভাবে কেন্দ্রকের মিলন হয় না। এ-সম্বন্ধে যে মতবাদ সর্ববাদীসম্মত, সেটি হলো হান্‌স্ বেথের 'কার্বন-চক্র'-এর তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি সাঙ্কেতিক নিয়মে এভাবে ধাপে ধাপে লেখা যেতে পারে :—

কার্বন (১২) + হাইড্রোজেন (১) → নাইট্রোজেন (১৩) + গামা-রশ্মি

নাইট্রোজেন (১৩) → কার্বন (১৩) + পজিট্রন

কার্বন (১৩) + হাইড্রোজেন (১) → নাইট্রোজেন (১৪) গামা-রশ্মি

নাইট্রোজেন (১৪)+হাইড্রোজেন (১) →অক্সিজেন (১৫) + গামা-রশ্মি

অক্সিজেন (১৫) → নাইট্রোজেন (১৫) + পজিট্রন

নাইট্রোজেন (১৫) + হাইড্রোজেন (১) → কার্বন (১২) + হিলিয়াম (৪) + গামা-রশ্মি

(এ-ছাড়া দ্বিতীয় এবং পঞ্চম ধাপে যে নিউট্রিনো নির্গত হচ্ছে, তা নিষ্প্রয়োজনবোধে ডানদিকে দেখানো হয় নি)।

উপরে যে নাম কয়টি লেখা হয়েছে, তারা ওই মৌলিক পদার্থগুলির পরমাণুর কেন্দ্রকের পরিচায়ক —পরমাণুর নয়। বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রকের ভরের আসন্ন মানের নির্দেশক। প্রথম ধাপে দেখা যাচ্ছে, একটি ১২ পরিমাণ ভরের কার্বন-কেন্দ্রকের সঙ্গে একটি ১ পরিমাণ ভরের হাইড্রোজেন-কেন্দ্রকের (অর্থাৎ প্রোটনের) মিলনের ফলে ১৩ ভরের একটি নাইট্রোজেন-কেন্দ্রকের সৃষ্টি হয় এবং কিছু শক্তি গামা-রশ্মি-রূপে নির্গত হয়ে যায়। এই নাইট্রোজেন-কেন্দ্রক সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গিয়ে তৈরী হয় একটি ১৩ ভরের কার্বন-কেন্দ্রক। তাছাড়া একটি ধন-তড়িৎ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম কণিকা পজিট্রনও নির্গত হয়। তৃতীয় ধাপে এই কার্বন-কেন্দ্রক আর একটি প্রোটনের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি ১৪ ভরের নাইট্রোজেন-কেন্দ্রক সৃষ্টি এবং গামা-রশ্মিরূপে কিছু শক্তি বিকিরিত হয়। চতুর্থ ধাপে এই নাইট্রোজেন-কেন্দ্রক আর একটি প্রোটনের সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে একটি ১৫ ভরের অক্সিজেন-কেন্দ্রক এবং আরও কিছু গামা-রশ্মি বিকিরিত হয়। এই নতুন কেন্দ্রকটি সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে গিয়ে তৈরী হয় একটি ১৫ ভরের নাইট্রোজেন-কেন্দ্রক এবং আর একটি পজিট্রন সৃষ্টি হয়। শেষ ধাপে এই কেন্দ্রকটি আর একটি প্রোটনের সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে একটি ১২ ভরের কার্বন-কেন্দ্রক, একটি ৪ ভরের হিলিয়াম-কেন্দ্রক ও গামা-রশ্মি। বিভিন্ন কেন্দ্রকের ভরের পরিমাণ যা লেখা হয়েছে, তা সবই আসন্ন বা স্থূল। তাই বস্তুর পরিমাণ লাঘব হয়ে যে শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে, তা ওই সংখ্যাগুলি থেকে বোঝা যাবে না। মোটের উপর একটি কার্বন-কেন্দ্রক চারটি প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে একটি কার্বন-কেন্দ্রক ও একটি হিলিয়াম-কেন্দ্রক; নির্গত হয় গামারশ্মি ও পজিট্রন। যে কার্বন-কেন্দ্রকের সৃষ্টি হয়, সে বারবার একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে এবং প্রতিবারেই চারটি প্রোটন অন্তর্হিত হয়ে একটি হিলিয়াম-কেন্দ্রকের সৃষ্টি হবে ও গামা-রশ্মিরূপে শক্তি নির্গত হবে। এরই নাম কার্বন-চক্র। হান্‌স্ বেথের এই মতবাদ শুধুমাত্র অনুমান বা কল্পনা নয়। গবেষণাগারে পরীক্ষার দ্বারা প্রত্যেকটি ধাপের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় অবশ্য এই প্রক্রিয়া সম্ভব নয়। এর জন্যে দরকার খুব উচ্চ তাপমাত্রা। সূর্যে এই স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার জন্যে

দরকার হয় দু-কোটি ডিগ্রি তাপমাত্রা। সূর্যের কেন্দ্রে উপযুক্ত তাপমাত্রা থাকবার দরুণ সেখানে এই কার্বন-চক্র কার্যকরী হচ্ছে। সূর্যে তাই হাইড্রোজেন গ্যাস ক্রমাগত কমে আসছে, আর হিলিয়াম গ্যাস বেড়ে চলেছে।

কার্বন-চক্রের ফলে যে গামা-রশ্মি সূর্যের কেন্দ্র থেকে নির্গত হয়—সে রশ্মি সূর্যের বহির্মণ্ডলে এসে রূপান্তরিত হয় আলোক-রশ্মি, তাপ-রশ্মি এবং অতিবেগুনী-রশ্মি ইত্যাদিতে। সূর্য যে শক্তি বিকিরণ করছে, তার ১২ কোটি ভাগের একভাগ মাত্র এসে পড়ছে সূর্যের নয়টি গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহগুলিতে। বাকী যা রইলো, তা ছুটে চলেছে অবিরত ধারায়—কোথায় এবং কতদূরে কে জানে?

সৌরকণিকা

নানারকম রশ্মি ছাড়া সূর্য থেকে কয়েক রকম বস্তুকণিকাও নির্গত হয়; যেমন—ঋণ-তড়িৎসম্পন্ন ইলেকট্রন, ধন-তড়িৎসম্পন্ন প্রোটন ইত্যাদি। সূর্যের গায়ে মাঝে মাঝে কালো কালো দাগ দেখা যায়। এগুলিকে বলা হয় সৌরকলঙ্ক। সাদা চোখেও কখন কখন এই সৌরকলঙ্ক দেখা যায়। মাঝে মাঝে ঘূর্ণীর ফলে সূর্যের বহির্মণ্ডলের গ্যাস জায়গায় জায়গায় এত সম্প্রসারিত হয় যে, তাপমাত্রা ৬০০০° ডিগ্রী থেকে ৫০০০° ডিগ্রী বা আরও নীচে নেমে আসে। ফলে সেই সব অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গাগুলির ঔজ্জ্বল্য সূর্য-পৃষ্ঠের বাকী জায়গার তুলনায় কম হয় এবং সেই জায়গাগুলি কালো দেখায়। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, এই সৌরকলঙ্কের এলাকা ও সংখ্যার পরিবর্তন হয় বেশ নিয়মিতভাবে। প্রতি ১১ বছর অন্তর সৌরকলঙ্ক সবচেয়ে বেশী হয়। ১৯৫৯ সালে সৌরকলঙ্ক ছিল খুব বেশী; তারপর থেকে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা ও পরিমাণ ক্রমশঃ কমেছে। কয়েক বছর পর্যন্ত হ্রাস পাবার পর আবার এদের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়তে থাকবে এবং বৃহত্তম হবে ১৯৭০ সালে। সৌরকলঙ্ক ছাড়া সূর্যপৃষ্ঠের আর একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। মাঝে মাঝে সূর্যের বহির্মণ্ডলে ভীষণ বিস্ফোরণ হয়, যার ফলে জ্বলন্ত বস্তু সূর্য থেকে প্রচণ্ড বেগে চারদিকে নিক্ষিপ্ত হয়। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, এই সৌরকলঙ্ক ও সৌরোৎপাতের সময় তীব্র শক্তিসম্পন্ন অতিবেগুনী-রশ্মি ও তড়িতাবিষ্ট পদার্থ-কণিকা প্রচণ্ড বেগে সূর্য থেকে নির্গত হয় ও পৃথিবীর ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সূর্যের সবরকম রশ্মির গতিবেগই সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল; কণিকাগুলির গতিবেগ অনেক কম—সেকেণ্ডে এক হাজার মাইলের মত—কারও বেশী কারও বা কম। সূর্য থেকে এই কণিকাগুলির পৃথিবীতে এসে পৌছোতে এক দিন বা দু-দিন সময় লাগে। রশ্মি এসে পৌছাতে লাগে আট মিনিট।

পৃথিবীর ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে সূর্যের অতিবেগুনী-রশ্মির ক্রিয়া

সূর্যের বিভিন্ন প্রকার রশ্মির মধ্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্ব স্তরের উপর অতিবেগুনী-রশ্মির প্রভাবই সবচেয়ে বেশী। সূর্যের আলোক ও তাপ-রশ্মিকে আমাদের বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্ব স্তর একরকম বাধা দেয় না বললেই চলে। কিন্তু অতিবেগুনী-রশ্মিকে বায়ুর ঊর্ধ্ব স্তর প্রায় সম্পূর্ণভাবেই শোষণ করে নেয়—এর ফলেই আয়নমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, পরমাণু সাধারণতঃ তড়িৎ-নিরপেক্ষ; কারণ পরমাণুর কেন্দ্রক ও ইলেকট্রনের পরস্পর বিপরীত-ধর্মী তড়িতের পরিমাণ সমান। সূর্যের অতিবেগুনী-রশ্মি যখন বায়ুর ঊর্ধ্ব স্তরে প্রবেশ করে, তখন তারা অতি সহজেই বায়ুর পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বিচ্যুত করে। যে ইলেকট্রনটি ছাড়া পেল সেটি হলো ঋণ-তড়িৎসম্পন্ন। কাজেই পরমাণুর যে অংশটি অবশিষ্ট রইলো, সেটি হবে ধন-তড়িৎসম্পন্ন আয়ন।

মুক্ত ইলেকট্রনের কোনটি যদি একটি তড়িৎ-নিরপেক্ষ পরমাণুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তবে একটি ঋণ-তড়িৎসম্পন্ন আয়নের সৃষ্টি হবে। অতিবেগুনী-রশ্মির তেজ বেশী হলে অনায়াসে আয়নন ক্রিয়া চলতে পারে। তাই বায়ুর উর্ধ্ব স্তর হলো একটি আয়নায়িত স্তর—যাকে বলা হয় আয়নমণ্ডল। বায়ুকে আয়নায়িত করবার ফলে অতিবেগুনী-রশ্মির শক্তিক্ষয় হয়। তাই ওই রশ্মি যখন নীচের বায়ুস্তরে এসে পৌঁছায়, তখন তার তেজ অনেকটা কমে যায়; কাজেই এই স্তরে আর আয়ন পাওয়া যায় না।

আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি

সূর্যের অতিবেগুনী-রশ্মির মধ্যেও রকমফের আছে—কোনও রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশী, কোনটার কম। বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এই অতিবেগুনী-রশ্মি যখন পৃথিবীর উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে ভূপৃষ্ঠের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, তখন বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি কার্যকরী হয়। তাই বায়ুর উর্ধ্বস্তরে আয়নন-ক্রিয়া সব উচ্চতায় সমান হয় না। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৫০ মাইল বা তারও বেশী উচ্চতায় একরকম রশ্মির ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় একটি আয়নায়িত স্তর—এর নাম এফ (২) স্তর (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। অতিবেগুনী-রশ্মি পৃথিবীর দিকে আরও এগিয়ে এসে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২০ মাইল উচ্চতায় আর একটি আয়নায়িত স্তরের সৃষ্টি করে—এর নাম এফ (১) স্তর। আরও নীচে, ৭০ মাইল উচ্চতায় ই-স্তর এবং ৩৫ থেকে ৪০ মাইল উচ্চতায় ডি-স্তর সৃষ্টি করবার পর অতিবেগুনী-রশ্মির আয়ননক্রিয়া ঘটাবার শক্তি আর থাকে না। তাই ৩৫ মাইল উচ্চতার নীচে থাকে সাধারণ বায়ু।

সূর্যরশ্মির দ্বারা আয়নন-ক্রিয়ার কাজ চলবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ঘটনাও ঘটতে থাকে—সেটা হচ্ছে আয়ন এবং ইলেকট্রনের পুনর্মিলন। বাতাসের মধ্যে আয়ন এবং ইলেকট্রন সব সময় ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। কাজেই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। এই সংঘর্ষের ফলে ধন-বিদ্যুৎসম্পন্ন আয়ন ও ঋণ-বিদ্যুৎসম্পন্ন ইলেকট্রন অথবা বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুৎসম্পন্ন দুটি আয়ন পরস্পর সংযুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ পরমাণুর সৃষ্টি করবে।
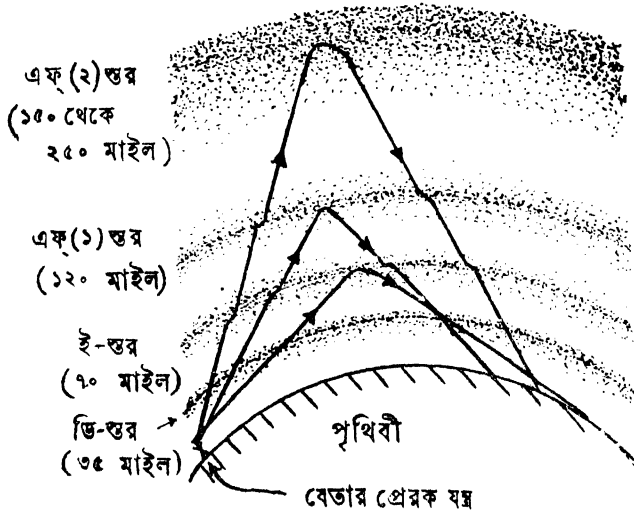
১নং চিত্র
আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর ও বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন।

এই পুনর্মিলনের ফলে আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে আয়নের পরিমাণের ভারসাম্য রক্ষা পায়; অর্থাৎ অতিবেগুনী-রশ্মির ক্রিয়ায় একদিকে আয়ন সৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে পুনর্মিলনের ফলে কিছু আয়ন সাধারণ পরমাণু হয়ে যাচ্ছে। কাজেই বিভিন্ন স্তরে আয়নের পরিমাণ প্রায় স্থিরই থেকে যাচ্ছে। রাত্রিবেলায় ব্যাপার হয় অন্যরকম। তখন সূর্যের অনুপস্থিতিতে অতিবেগুনী-রশ্মির অভাব হয়—অথচ পুনর্মিলনের কাজটা চলতে থাকে। তাই বিভিন্ন স্তরে আয়নের পরিমাণ কমে আসে। মনে হয় যেন আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরগুলি ক্রমশঃ উপরের দিকে সরে যাচ্ছে। এফ (১) ও এফ (২) স্তর এই কারণেই সংযুক্ত হয়ে একটি এফ-স্তরে পরিণত হয়। বায়ুমণ্ডলের নীচের স্তরে বায়ুর ঘনত্ব ও চাপের পরিমাণ বেশী হওয়ায় পুনর্মিলনের কাজটাও হয় দ্রুত; এর ফলে রাত্রিবেলায় ডি-স্তরটি সম্পূর্ণ লোপ পায়।

এই আয়নমণ্ডল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই আয়নমণ্ডলের সাহায্যে বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলের মধ্যে বেতার-বার্তা প্রেরণ সম্ভব হয়। আয়নমণ্ডলের সাহায্য ছাড়া বেতার-তরঙ্গ বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। তার কারণ, বেতার-তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠ বরাবর চলবার সময় ক্রমাগতই তার শক্তিক্ষয় হতে থাকে। তাই বেতার-তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র থেকে ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ আকাশের দিকে প্রেরণ করা হয়। বাতাসের নিম্ন স্তর ভেদ করে বেতার-তরঙ্গ আয়নমণ্ডলের ই, এফ (১) বা এফ (২) স্তরে আঘাত করে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে পৃথিবীর বুকে (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। কখনও এই তরঙ্গ আবার পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয় এবং পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে। এভাবে বহুদূরের প্রেরক-যন্ত্র থেকে অনায়াসে বেতার-তরঙ্গ বা বেতার-বার্তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, আয়নমণ্ডলের ডি-স্তরটির কোনও প্রতিফলন-ক্ষমতা নেই। বেতার-তরঙ্গ যখন ডি-স্তর ভেদ করে ই বা এফ-স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে ডি-স্তরের মধ্য দিয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে, তখন ডি-স্তর বেতার-তরঙ্গের শক্তি বা তেজ কিছুটা শোষণ করে নেয়। রাত্রিবেলায় ডি-স্তরটি লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় বেতার-তরঙ্গের শক্তিক্ষয় করতে পারে না। তাই রাত্রিবেলায় বেতার-বার্তা গ্রহণ বেশী কার্যকরী হয়; সাধারণ বেতার-যন্ত্রেও এই সুবিধা লক্ষণীয়।

রাত্রির আলো

আয়নমণ্ডল সৃষ্টি করা ছাড়াও সূর্য-রশ্মি উর্ধ্বতর বায়ুমণ্ডলের আরও একটি কাজ করে। অমাবস্যার রাত্রে যে আলো পাওয়া যায়, তাকে আমরা সাধারণতঃ তারার আলো বলেই জানি। কিন্তু হিসেব করে দেখা গেছে যে, চন্দ্রহীন রাত্রে গ্রহ-নক্ষত্রাদি থেকে যে আলো পাওয়া যায়, তার চেয়ে বেশী আলো আমরা পৃথিবীর বুকে পেয়ে থাকি। এর উৎসও পৃথিবীর উর্ধ্বতর বায়ুমণ্ডল। সূর্যরশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে' বায়ুর অণুগুলিকে পরমাণুতে বিভক্ত করে দেয়। এজন্যে অণুগুলি রশ্মির শক্তি কিছুটা অপহরণ করে। রাত্রিবেলায় যখন এই পরমাণুগুলি পুনঃসংযোজিত হয়ে আগেকার অণু সৃষ্টি করে, তখন সেই শক্তিটুকু' আলোর আকারে বিকিরিত হয়। এই আলোর বর্ণালী-বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে, বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরও প্রধানতঃ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে তৈরী—সেখানে হাল্কা গ্যাস, অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম নেই বললেই চলে।

আয়নমণ্ডলের উপর সৌরকলঙ্ক ও সৌরোৎপাতের প্রতিক্রিয়া

সৌরকলঙ্ক ও সৌরোৎপাতের সময় অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন অতিবেগুনী-রশ্মি সূর্য থেকে নির্গত হয়। এই রশ্মি আয়নমণ্ডলের উর্ধ্বস্তর ভেদ করে

ডি-স্তরে এসে খুব দ্রুত আয়নন-ক্রিয়া ঘটায়। ফলে ডি-স্তরে আয়ন ও ইলেকট্রনের পরিমাণ খুব বেড়ে যায়। আগেই বলা হয়েছে—ডি-স্তর বেতার-তরঙ্গের শক্তি শোষণ করে বেতার-বার্তা পাঠাবার কাজে শুধু বিঘ্নই সৃষ্টি করে। সৌরকলঙ্ক ও সৌরোৎপাতের সময় এই ডি-স্তরের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেতার-বার্তা পাঠাবার কাজে আরও বেশী অসুবিধার সৃষ্টি হয়; এমন কি—বিভিন্ন স্থানের মধ্যে বেতার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও হয়ে যেতে পারে। সৌরকলঙ্ক ও সৌরোৎপাতের সময় যে তড়িতাবিষ্ট পদার্থ-কণা নির্গত হয়, তার ফলাফল সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

পৃথিবীর উর্ধ্ববায়ুমণ্ডলে সৌরকণিকার ক্রিয়া

(ক) **মেরুপ্রভা**ঃ পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের আকাশে মাঝে মাঝে বিভিন্ন আকৃতির বিচিত্র বর্ণের আলোর খেলা দেখা যায়। কখনও অর্ধবৃত্তের আকারে, কখনও সরলরেখায়, কখনও বা রেশমী ঝালরের মত আলোর বিচিত্র অভিব্যক্তি দেখা যায়। কখনও এই আলোর পর্দাগুলি কিছুক্ষণ স্থির-ভাবে থাকে, কখনও দ্রুতবেগে একদিক থেকে আর একদিকে সরে যায়, আবার কখনও বা এক ঝিলিক দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। এই আলোর দৃশ্য ভূপৃষ্ঠের উর্ধ্বে ৫৫ মাইল থেকে ৮০ মাইলের মধ্যে হয়ে থাকে। ওই উচ্চতায় বায়ুর ঘনত্ব ও চাপ কম থাকে; সূর্য থেকে নিক্ষিপ্ত পদার্থ-কণিকা এই স্তরের বায়ুর সংঘর্ষ ঘটিয়ে এই মেরু-প্রভার সৃষ্টি করে।

একটি কাচের নলের মধ্যে বায়ুর চাপ কমিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে পরীক্ষাগারেও এই আলোর সৃষ্টি করা যায়। আজকাল নিয়ন-টিউবের সাহায্যে যে আলোর সমারোহ দেখা যায়, তার মূলেও আছে এই তথ্য। ঘরে ঘরে আজকাল যে টিউব আলোর প্রচলন হয়েছে, তারও মূলে আছে বিরলীকৃত গ্যাসের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের গতি। উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলেও একই ব্যাপার চলে। সূর্য থেকে যে সব পদার্থ-কণিকা ছুটে আসে, সেগুলি বিদ্যুৎসম্পন্ন। বিদ্যুৎ-সম্পন্ন কণিকা-প্রবাহ আর বিদ্যুৎ-প্রবাহ একই জিনিষ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবার আগেই পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র এই কণাগুলির গতিপথ পরিবর্তন করে' উত্তর ও দক্ষিণ-মেরুর দিকে সেগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। ফলে মেরুঅঞ্চলের বায়ুর উর্ধ্বস্তরকে এই দ্রুতগতিসম্পন্ন বিদ্যুতান্বিত বস্তুকণা-প্রবাহ
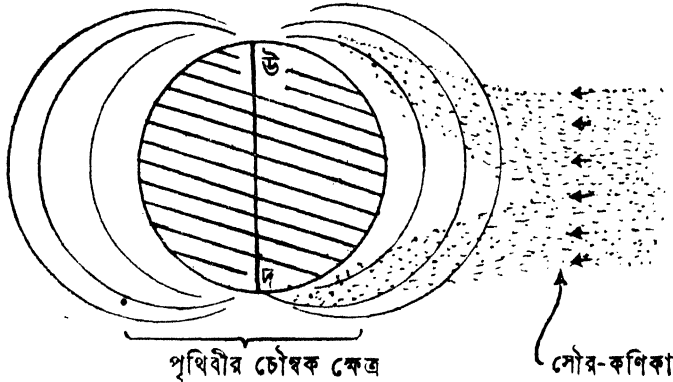
২নং চিত্র
পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে সৌরকণিকা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

(অর্থাৎ বিদ্যুৎ-প্রবাহ) ভাস্বর করে তোলে। এরই নাম মেরুপ্রভা। সৌরকলঙ্ক ও সৌরোৎপাতের সময় সূর্য থেকে এসব বস্তুকণা বেশী বিচ্ছুরিত হয়, কাজেই ওই সময়ে মেরুপ্রভা খুব বেশী দেখা যায়।

(খ) **পৃথিবীতে চৌম্বকঝটিকা**ঃ একটি তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলবার সময় একটি চুম্বক-শলাকা এই তারের কাছে আনলে শলাকাটি দিক পরিবর্তন করে। এর কারণ—বিদ্যুৎ-প্রবাহ চারদিকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। সূর্য-থেকে নিক্ষিপ্ত বিদ্যুতায়িত বস্তুকণা পৃথিবীর কাছে এলে ঠিক একই কারণে পৃথিবী-পৃষ্ঠে (পৃথিবীর নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র বাদেও) একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুতায়িত কণার কোনটির গতিবেগ বেশী, কোনটির বা কম। ক্রমাগত এই কণাগুলি যখন পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে থাকে, তখন চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি ও দিক দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। চৌম্বক ক্ষেত্রের এই অনিয়মিত ও অকস্মাৎ দিক পরিবর্তন ও শক্তি পরিবর্তনের নামই চৌম্বক-ঝটিকা। এর ফলে বেতার-বার্তা প্রেরণে অসুবিধার সৃষ্টি হয়; এমন কি —বেতার, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। সৌর-কলঙ্ক ও সৌরোৎপাতের সময় চৌম্বক-ঝটিকার আবির্ভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে আমাদের চারদিকে কত আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, যার সুযোগ আমরা প্রত্যক্ষভাবে নিচ্ছি, অথবা যা আমাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে, তাদের সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা ভাবি!

তারার কথা

সলিল বসু

আঠারো-শ' বছর আগে আলেকজ্যাণ্ড্রিয়ার দার্শনিক টলেমি আকাশের তারা গুণতে আরম্ভ করেন, হয়তো কোন কাজ ছিল না বলেই! শেষ অবধি তিনি দেখলেন—সবসমেত ১,০২২টা তারা আছে। আজকের বিজ্ঞান বলছে—খালিচোখেই প্রায় ৩০০০ তারা দেখা যায়, দূরপাল্লার দূরবীণে কয়েক কোটি। এ-ছাড়া অধুনা প্রচলিত রেডিও-জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে আবার চোখে দেখতে-না-পাওয়া তারার কথাও জানা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে আকাশের তারার সংখ্যা গুণতে যাওয়া একটা নিছক পাগলামি বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

সাধারণভাবে আমরা জানি—আকাশে যত জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, তাদের সবগুলিই কিন্তু তারা নয়, গ্রহও আছে। তারার নিজস্ব আলো আছে, কিন্তু গ্রহদের নেই। গ্রহ বলতে আমরা শুধু সৌরমণ্ডলের গ্রহই বুঝি, কারণ তার বাইরের কোন গ্রহ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান আজকের বিজ্ঞান এখনও দিতে পারে নি। পৃথিবীকে বাদ দিয়ে সৌরমণ্ডলের গ্রহের সংখ্যা আটটি—বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটো। এর মধ্যে প্রথম পাঁচটি গ্রহ সম্বন্ধে বহুদিন আগেই মানুষ জেনেছিল, আর শেষের তিনটিকে দূরবীণ দিয়ে দেখতেই বিজ্ঞানীরা হিমসিম খাচ্ছেন, খালিচোখে দেখা তো দূরের কথা। প্রথম পাঁচটির মধ্যে শুক্রগ্রহটিই আমাদের বেশী পরিচিত; কারণ

এটিই সাঁঝের আকাশের সন্ধ্যাতারা, আবার ভোরের আকাশের শুকতারা। মঙ্গলগ্রহের লাল্‌চে রূপের সঙ্গেও অল্পবিস্তর পরিচয় রাখা যায়, কিন্তু বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের অবস্থান নির্ণয় করা বেশ কিছুটা শক্ত। আর বুধগ্রহের আসা-যাওয়ার তো ভাল রকম হদিশই মেলে না—কোপার-নিকাসের মত লোকও তিরিশ বছর ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে তার অস্তিত্বের সন্ধান পান নি। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি, তারাগুলি ঝিক্‌মিক করে এবং গ্রহগুলি স্থির আলো দেয়। এর কারণ—পৃথিবীর উপরের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে যখন আলো আসে, তখন বিভিন্ন স্তরের কম্পনের জন্যে আগত আলোটাও কম্পিত হয়, তাই তারার এই ঝিকিমিকি। কিন্তু গ্রহের আলোও তো বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসে, তাদের আলোই বা স্থির কেন? এর কারণ, তারাগুলির নিজস্ব আলো আছে এবং বিভিন্ন কারণে আলোক-উৎসের দীপ্তির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। তাছাড়া তারাগুলি পৃথিবী থেকে অনেক কোটি মাইল দূরে আছে; তাই আমাদের চোখে সেগুলির আকৃতি সামান্য একটি বিন্দুর মত দেখায়। এই বিন্দুর আকৃতি থেকে দু-চারটা আলোর রেখা বায়ুস্তর ভেদ করে আসবার সময় যে কম্পন সৃষ্টি করে, তার অনুভূতি আমাদের চোখে ধরা পড়ে। কিন্তু গ্রহগুলি রয়েছে অনেক কাছে, তাই তাদের দেখায়ও অনেকটা বড়। তার ফলে সেগুলি থেকে বেশ কিছুটা আলোক-রশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসে, আর সব কটা আলো রেখাই কিছু না কিছু দিক পরিবর্তন করে। কিন্তু এই পরিবর্তনের মোট যোগফল পরস্পরের মধ্যে কাটা-কাটি করে যায়, যার ফলে আমরা খালি চোখে তাদের স্থির আলোর উৎস বলেই মনে করি।

আজকের বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, সূর্য একটা তারা, আর পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের তারা। পৃথিবীর থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। আর তারপরেই যেটা সবচেয়ের কাছের, তার নাম প্রক্সিমা সেণ্টোরি। এর দূরত্ব হলো ২৫ লক্ষ কোটি মাইল। অন্য তারাগুলি আরো অনেক দূরে আছে। এত বেশী দূরত্বের হিসাব রাখবার সুবিধার জন্যেই আলোর গতিকে ভিত্তি করে আলোক-বছর নামে একটা নতুন রকম দূরত্বজ্ঞাপক মাপ ঠিক করা হয়েছে। আলোর গতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। এই হিসাবে এক বছরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব, সেই দূরত্বটাই হলো এক আলোক-বছর। এই হিসাবে প্রক্সিমা সেণ্টোরির দূরত্ব প্রায় সাড়ে চার আলোক-বছর, লুব্ধকের দূরত্ব প্রায় সাড়ে আট আলোক-বছর···ইত্যাদি।

খালি চোখেই বোঝা যায় যে, সব তারার রং এক নয়—দূরবীক্ষণের দৃষ্টিতে এই পার্থক্যটা আরও অনেক বেশী ধরা পড়ে। এই পার্থক্যের কারণ, তারাগুলির তাপমাত্রার তারতম্য। আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে আলোর উৎস সম্বন্ধে অনেক রকম খবর পাওয়া যায়। প্রথমে বর্ণালী-বিশ্লেষণ করা হলো সূর্যের আলোর। দেখা গেল, বর্ণালী-গুলি অবিচ্ছিন্ন নয়, মাঝে মাঝে কতকগুলি কালো কালো রেখা রয়েছে। এই রেখাগুলির অবস্থান প্রভৃতি নিয়ে অনুসন্ধান করে আলোক-উৎসের তাপমাত্রা সম্বন্ধে নানারকম সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া গেল। বিভিন্ন তারার বর্ণালী বিশ্লেষণ করেও কালো রেখার উপস্থিতি দেখা গেল এবং তাথেকে তারাগুলির তাপমাত্রা সম্বন্ধেও ধারণা করা সম্ভব হলো। এ-পর্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ তারা নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাপমাত্রা অনুসারে তারাগুলিকে সাধারণতঃ দশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—O, B, A, F, G, K, M, R, N এবং S। এই পর্যায়ক্রমটা মনে রাখবার সুবিধার জন্যে অক্ষরগুলি দিয়ে ইংরেজীতে একটা ছড়া তৈরী করা হয়েছে—Oh Be A Fine Girl, Kiss Me Right Now, Sweet।

O শ্রেণীর তারাগুলিই সবচেয়ে বেশী উত্তপ্ত।

এদের রং নীল, আর পৃষ্ঠদেশের উষ্ণতা ২৩০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশী ; B শ্রেণীর রং হলো নীলাভ সাদা, আর পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা প্রায় ২৩০০০° ডিগ্রী। A শ্রেণীর রং সাদা, তাপমাত্রা ১১০০০° ডিগ্রী ; F শ্রেণীর রং হরিদ্রাভ সাদা, উষ্ণতা ৭৫০০° ডিগ্রী ; G শ্রেণীর রং হলুদে, উষ্ণতা ৬৫০০° ডিগ্রী ; K শ্রেণীর রং কমলা, তাপমাত্রা ৫০০০° ডিগ্রী ; M R N S শ্রেণীর রং লাল, উষ্ণতা ৩৫০০° ডিগ্রী বা তারও কম। আমাদের সূর্য হলো G শ্রেণীর তারা ; তার রং হলুদে এবং পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা ৬০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। অবশ্য এই রং-বেরঙের পার্থক্যটা খালিচোখে দেখা নয়, দূরবীক্ষণের মারফৎ দেখা। তারাগুলির রং ও উষ্ণতা ছাড়া আরও একটা জিনিষের সঙ্গে বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে পরিচিত। সেটা হলো, তারার দীপ্তি। দীপ্তি সাধারণতঃ নির্ভর করে উষ্ণতা ও আয়তনের উপর। সূর্যের আয়তন, দীপ্তি ও তাপমাত্রা জানা আছে। তারই সঙ্গে তুলনামূলক পরীক্ষা করে যে কোন তারার আয়তন, দীপ্তি ও তাপমাত্রা জানা যেতে পারে। এভাবে পরীক্ষা করবার সময় এক রকমের তারা দেখা গেল, যাদের তাপমাত্রা বেশ কম, কিন্তু দীপ্তি খুবই বেশী। কারণ অনুসন্ধানে জানা গেল, সেগুলি আয়তনে খুবই বড়, এমন কি, সূর্যের চেয়ে চার-পাঁচ-শ' গুণ বড় ; কিন্তু তাপমাত্রা সূর্যের চেয়ে অনেক কম। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞায় এই জাতীয় তারার নাম 'লাল-দৈত্য' (Red Giant)। এর বিপরীত শ্রেণীর তারারও দেখা পাওয়া গেছে। সেগুলির তাপমাত্রা খুবই বেশী, কিন্তু দীপ্তি কম ; কারণ তাদের আয়তন খুবই কম। অবশ্য আয়তন ছোট হলেও এগুলির ওজন কিন্তু খুবই বেশী। সূর্যের চেয়ে অনেক ছোট—এই রকম একটি তারার ওজন সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বেশী হতেও দেখা গেছে। বিজ্ঞানীরা এই জাতীয় তারার নাম দিয়েছেন 'সাদা-বামন' (White dwarf)। আরও অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে, লাল-দৈত্য অবস্থাটা তারার জীবনের শৈশব ও কৈশোরের বয়ঃসন্ধি এবং সাদা-বামনের 'তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা' অবস্থা।

তারার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বহুকাল ধরেই নানা-রকম গবেষণা চলে আসছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলছেন, সৃষ্টির আদিতে বিশ্বচরাচর জুড়ে ছড়ানো ছিল শুধু সূক্ষ্ম গ্যাস ও কিছু কিছু ধূলিরাশি। এই অবস্থায় তাপমাত্রা ছিল মাত্র কয়েক-শ' ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং ঘনত্ব ছিল খুবই সামান্য। ক্রমাগত তাপ বিকিরণের ফলে গ্যাসমণ্ডলটি ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হতে লাগলো। প্রাথমিক বিজ্ঞানের সূত্র বলে যে, কোন বস্তুকে তাপ দিলে আয়তনে বাড়ে, আর ঠাণ্ডা করলে আয়তন কমে। এই নিয়মেই সেই গ্যাসসমষ্টির আয়তন কমতে লাগলো। এই আয়তন হ্রাস পাওয়ার ফলে মহাকর্ষের নিয়মেই সেই গ্যাসসমষ্টি আস্তে আস্তে ঘুরতে সুরু করলো। সঙ্কোচন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণনগতিও ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো এবং তার ফলে গ্যাসমণ্ডলীর বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে সুরু করলো। এই গ্যাস-মণ্ডলীর বিচ্ছিন্ন অংশগুলিও তাপ-বিকিরণের ফলে সঙ্কুচিত হতে লাগলো। নিয়ত এরূপ সংকোচন বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রে চাপও ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। কিন্তু চাপ বাড়লে তাপও বাড়বে। কেন্দ্রে চাপ ও তাপ বৃদ্ধির দরুণ এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হলো, যা থেকে সুরু হলো পরমাণু শক্তির প্রক্রিয়া এবং আরও বেশী উত্তাপ। বিভিন্ন গঠন ও ওজনের পরমাণু-কেন্দ্রক ভাঙ্গা-গড়ার পথে আরও বিভিন্ন গঠন ও ওজনের পরমাণু তৈরীর কাজ চলছে অবিরাম। এরূপ এক-একটি উত্তপ্ত জ্যোতিষ্কই হচ্ছে তারা এবং আমাদের সূর্যও এই রকমের একটি তারা। প্রত্যেকটি তারাই M শ্রেণীর অবস্থা থেকে সুরু করে ক্রমশঃ তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে O শ্রেণীর সব-চেয়ে উত্তপ্ত তারায় পরিণত হয়। এই M শ্রেণীর অল্প তাপমাত্রার বেশী আয়তনের তারাগুলি লাল-দৈত্য গোষ্ঠীভুক্ত।

সাদা-বামন তারাগুলির রহস্য জানতে হলে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা দরকার। পরমাণুর গঠন ভঙ্গিমা নির্ধারিত হয়েছে, ইলেকট্রন মতবাদের উপর। এই মতানুসারে কোন পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু হলো ধনাত্মক তড়িতাবেশযুক্ত নিউক্লিয়াস, যার মধ্যে থাকে ধনাত্মক প্রোটন, আর বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রন। সৌরমণ্ডলে যেমন সূর্যের চারদিকে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহাদি ঘোরাফেরা করে, ঠিক তেমনি এই নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরে বেড়ায় ঋণাত্মক তড়িতাবিষ্ট ইলেকট্রনসমূহ। বিভিন্ন পদার্থ এদের সংখ্যাও বিভিন্ন। এই ইলেকট্রনসমষ্টিই হলো পরমাণুর বাইরের খোলস। মূল পরমাণুর মোট আয়তনের তুলনায় নিউক্লিয়াস বা ইলেকট্রন-সমষ্টির আয়তন খুবই কম, কিন্তু পরমাণুর ওজন নির্ভর করে নিউক্লিয়াসের উপর, ঘূর্ণয়মান ইলেকট্রনগুলির উপর নয়। এখন দেখা যাক, এই তথ্যানুযায়ী সাদা-বামন তারাগুলির অবস্থা কেমন দাঁড়ায়। তারাসমূহের সৃষ্টি প্রসঙ্গে আগেই বলেছি যে, গ্যাসের সঙ্কোচনের ফলে চাপ, তাপ ও পরমাণু-সংযোজন প্রক্রিয়া চলে। কিন্তু চাপ ও তাপ একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়ালেই তারার মধ্যেকার বেশীর ভাগ পরমাণুরই বাইরের ইলেকট্রনের খোলস ভেঙ্গে পড়ে, সেগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নিউক্লিয়াস থেকে। এই বিপর্যয়ের ফলে আয়তন খুবই ছোট হয়ে পড়ে এবং এই দ্রুত আয়তন হ্রাসের ফলে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং নিউক্লিয়াসের জন্যে ওজনটাও থাকে যথেষ্ট। তাই সাদা-বামন তারাগুলির আয়তন ছোট হলেও উষ্ণতা ও ওজন খুবই বেশী। অবশ্য এর পরেই পরমাণু প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারাটির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

এই সাদা-বামন তারা সৃষ্টির গোড়াতে যখন ইলেকট্রন খোলস ভেঙ্গে হঠাৎ আয়তন কমে যায়, তখন সঙ্কোচনটা ঘটেও খুব দ্রুত; কাজেই তারাটি হঠাৎ খুব বেশী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই রকমের জ্বলে ওঠা তারাকে ইংরেজীতে 'নোভা' বলে। যে জাতীয় তারার বিস্ফোরণে সূর্যের চেয়ে ২ লক্ষ গুণ পর্যন্ত দীপ্তি হয়, সেগুলিকেই বলে নোভা, আর নোভার চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশী দীপ্তিযুক্ত বিস্ফোরিত তারাকে বলে সুপার-নোভা। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, প্রতি বছরে প্রায় ২০টি তারা নোভা অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে। অবশ্য এই রকমের ঔজ্জ্বল্য খুব কমই খালি চোখে দেখা যায়। ওলন্দাজ জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহী ১৫৭২ সনে এবং কেপলার ১৬০৪ সনে এরূপ দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে গেছেন। একাদশ শতাব্দীতে চৈনিক বিজ্ঞানীরা একটা নোভা দেখেছিলেন, আর যীশুখৃষ্টের জন্মের সময় দেখা Star of Nativity-এর ব্যাপারটাও এমনি একটা নোভা ছাড়া আর কিছু নয়।

এখন প্রশ্ন হলো—তারা না হয় এখনও ধ্বংস হচ্ছে, কিন্তু তারা সৃষ্টি কি এখনও চলছে? বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। ক্যালিফোর্ণিয়া লিক মানমন্দিরের বিজ্ঞানীরা ১৯৩৭ সনে কালপুরুষ গোষ্ঠীর নীহারিকার একটি ছবি তোলেন। তারপর আবার ১৯৫৪ সনে সেই একই জায়গার ছবি নেন। তখন দেখা গেল, আগের বারে দেখা তারার চেয়ে এবারে দুটা বেশী তারা দেখা যাচ্ছে এবং অন্য তারাগুলির দীপ্তিও কিছু কিছু বেড়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল, এই দুটা নতুন সৃষ্ট তারা; অর্থাৎ নতুন তারার সৃষ্টি আজও চলছে। অবশ্য এই তারা দুটার এখন সৃষ্টি হয় নি, হয়েছিল আজ থেকে ১৬০০ বছর আগে। কারণ কালপুরুষ নীহারিকার দূরত্ব পৃথিবী থেকে ১৬০০ আলোক বছর মাইল; অর্থাৎ তারা দুটির যখন সৃষ্টি হয়েছিল, তখন ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব চলছে। কিন্তু এভাবে তারা সৃষ্টির পর ধ্বংসেই কি তাদের পরিসমাপ্তি? বিজ্ঞানীরা বলেন, বিভিন্ন তারায় ভারী পদার্থ উৎপাদনের ফলে বিশ্বচরাচরে নিয়ত যে শক্তি বিকিরিত হচ্ছে, তাই হয়তো আবার একদিন বস্তুর আকার পরিগ্রহ করছে।

সঞ্চয়ন

কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে খাদ্য রক্ষার ব্যবস্থা

কীট-পতঙ্গ বিশ্বের সর্বত্র একটা বড় রকমের সমস্যা হয়ে আছে। মশা ও মাছির ক্ষেত্রেই এই সমস্যাটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। এমন এক সময় ছিল যখন ডিয়েলড্রিন নামক কীটঘ্ন ভেষজ এসব পোকা-মাকড় ব্যাপকভাবে ধ্বংস করতে পেরেছে, কিন্তু এখন এসব পোকা-মাকড় এই ভেষজ প্রতিরোধ করবার শক্তি অর্জন করেছে। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে যেখানে এসব পোকা-মাকড়ের উপদ্রব বেশী, সেখানেই তারা বেশী তাড়াতাড়ি প্রতিরোধ করবার শক্তিলাভ করতে পারে বলে মনে হয়। এখন প্রশ্ন হলো—কেমন করে এসব পোকা-মাকড় এই রাসায়নিক পদার্থ প্রতিরোধ করবার শক্তি অর্জন করলো?

এই সম্বন্ধে পিটার গাইল্‌স্ লিখেছেন—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে স্থাপিত লণ্ডনের নিকটে অবস্থিত স্লাফ-এর পেস্ট ইনফেস্টেশন লেবরেটরির জৈবরসায়ন বিভাগের কর্মীরা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন। তাঁরা দেখেছেন, কতকগুলি পোকা-মাকড় কীটঘ্ন ভেষজ নিজেদের শরীরে গ্রহণ করে ভেষজের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দিতে পারে। কিন্তু ডিয়েলড্রিন সম্পর্কে সে কথা বলা চলে না বলেই তাঁরা মনে করেন।

লেবরেটরির কর্মীরা আরও দেখেছেন যে, মাছি কিংবা মশা ডিয়েলড্রিনের কার্যক্ষমতা নষ্ট করতে পারে না। তবে কেমন করে এই বিশেষ ভেষজ প্রতিরোধের ক্ষমতা তারা লাভ করতে পারে? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে গবেষণা-কর্মীগণ এখন মাছি এবং মশার স্নায়বিক ঝিল্লীর অণুপ্রবেশ-ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখছেন। এই পরীক্ষার কাজে তাঁরা তেজস্ক্রিয় ট্রেসার পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন। তাঁরা আশা করেন, পৃথিবীব্যাপী এই সমস্যা তাঁরা শীঘ্রই সমাধান করতে পারবেন।

পেস্ট ইনফেস্টেশন লেবরেটরির এটি হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু তাছাড়া আরও অনেক কাজ আছে। তার মধ্যে একটি প্রধান কাজ হলো, মজুত খাদ্যদ্রব্যকে পোকা-মাকড়ের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা। ১০ বছর পূর্ব পর্যন্ত এর প্রধান কাজ ছিল—কারখানা, মিল এবং গুদাম থেকে পোকা-মাকড়ের বংশ ধ্বংস করা। এই কাজ সম্পূর্ণভাবে করা সম্ভব না হলেও একথা এখন জোর করে বলা যেতে পারে যে, মজুত খাদ্যশস্যকে আগের তুলনায় অনেক বেশী পোকা-মাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এখন এখানে আমদানী খাদ্যদ্রব্য রক্ষার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।

গুব্‌রেপোকার মত ছোট ছোট বীট্‌ল্‌, যেমন—তণ্ডুল জাতীয় শস্যের পোকা, ময়দার পোকা এবং ছোট ছোট মথ্‌ জাতীয় পোকা নিয়ে এখানে কাজ করা হয়। এরা শস্যের যে ক্ষতি করে, তার পরিমাণ কম নয়। কোন কোন পোকা খাদ্যের, (যেমন চীনাবাদাম ইত্যাদির) রাসায়নিক পরিবর্তনেরও কারণ হয়ে থাকে। এই কীটের দ্বারা আক্রান্ত চীনাবাদাম চূর্ণ করে তাথেকে যে তেল পাওয়া যায়, সেই তেলে ফ্যাটি অ্যাসিডের (Fatty acid content) পরিমাণ অনেক বেশী হওয়ায় তা কেবল সাবান তৈরির কাজে লাগে, মার্জারিন তৈরির কাজে লাগে না। তাছাড়া পোকা-মাকড়ের আক্রমণের ফলে অনেক সময় খাদ্যের বাইরের রূপ ও স্বাদের পরিবর্তন ঘটে।

এখন প্রশ্ন হলো—এই সব কীট ধ্বংস করা

যায় কি করে? লেবরেটরির ডিরেক্টর মিঃ জি. ভি. বি. হারফোর্ড বলেছেন, নতুন নতুন ভেষজ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়তো হতে পারে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে এই ভেষজ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় এবং গুদাম ঘরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষাও এ-সম্পর্কে একটা বড় কথা।

যাহোক, যে কীট-পতঙ্গ খাদ্যশস্যের পক্ষে এত বড় সমস্যার সৃষ্টি করেছে, সেই সমস্যা দূর করবার জন্যে শ্লাফ-এর পেস্ট ইন্‌ফেস্টেশন লেবরেটরি আজ যে কোন ব্যবস্থায় কমনওয়েলথের বিভিন্ন লেবরেটরির সহায়তায় খাদ্যের এই ক্ষতি যথাসম্ভব বন্ধ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর।

অগ্নি-নির্বাপণের আধুনিক ব্যবস্থা

এই সম্পর্কে জি. ডবলিউ. ল্যাংষ্টন ডে লিখেছেন —বৃটেনের অগ্নি-নির্বাপক সংস্থাটির কর্মদক্ষতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে বিগত তিন বছরে আগুন থেকে তার ক্ষতির পরিমাণ লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে, যদিও অন্যান্য দেশে এই সময় তা বৃদ্ধি পায়। এই কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো, অগ্নি-নির্বাপণ সম্পর্কে আধুনিক পদ্ধতি ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার।

১৯৪৭ সালে অগ্নি-নির্বাপক সংস্থাটি, (যা যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রায়ত্ত হয়) কাউন্টি কর্তৃপক্ষের হাতে আসে এবং এই সময় ফায়ার সার্ভিসের (কলেজ সহ) বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংগঠন স্থাপিত হয়। এই সব সংগঠনের কাজ হয় ১৬৫টি ফায়ার ব্রিগেডের কাজকর্মের সমন্বয় করা। এখন এই সংস্থাটিতে কাজ করছে প্রায় ২০,০০০ পুরুষ এবং ৫০০ মহিলা। তাছাড়া এদের সঙ্গে আছে আংশিক সময়ের জন্যে ১৪,০০০ জন কর্মী, যাদের মধ্যে অধিকাংশই পুরুষ।

বর্তমান কালের অগ্নি-নির্বাপক কেন্দ্রগুলির সিগন্যালিং সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন কারখানার সঙ্গে যুক্ত স্বয়ংক্রিয় অগ্নি-সন্ধান ব্যবস্থাদি নিঃসন্দেহে কেন্দ্রগুলির বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া কেন্দ্রগুলিতে আছে হোজ-পাইপ শুষ্ককরণের জন্যে বৈদ্যুতিক ফ্যান-যুক্ত টাওয়ার, কাঠের কাজ ও পেইণ্ট স্প্রে করবার কারখানা এবং আরামপ্রদ বাসস্থানের ব্যবস্থা।

বৃটেনের একটি সর্বাধুনিক অগ্নি-নির্বাপক প্রতিষ্ঠান হলো, ল্যাঙ্কাশায়ারের অন্তর্গত সেণ্ট হেলেন্‌সের নতুন "যান্ত্রিক" কেন্দ্রটি। আগুন লাগবার সংবাদ পাওয়া মাত্র, ওয়াচ-রুমে যে লোকটি ডিউটিতে থাকে, সে একটি সুইচ টিপে দেয়। সুইচ টিপে দেওয়া মাত্র কেন্দ্রের সর্বত্র বিপদ-সঙ্কেত বেজে ওঠে। এরপর পড়ে যায় তাড়াহুড়া, আধুনিক অগ্নি-নির্বাপণের সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়বার জন্যে।

সমগ্র কেন্দ্রটিতে আছে প্রায় ৩½ মাইল দীর্ঘ তার এবং ১৫,০০০টি বৈদ্যুতিক কনেকশন। কেন্দ্রটি নির্মিত হয় প্রায় ১১৫,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে। এটিকে এখন ইউরোপের সর্বাধুনিক অগ্নি-নির্বাপক কেন্দ্র বলা হয়।

১৯৩০ সাল পর্যন্ত ফায়ারম্যানদের মইটি ছিল কাঠের তৈরী, তার দৈর্ঘ্য ছিল—খুব বেশী হলে ৯০ ফুট। তারপর দেখা দেয় ইস্পাতের মই, যার দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা চলে। আজকাল ফায়ারম্যানরা ব্যবহার করছে হাইড্রোলিক কণ্ট্রোল সহ ঘূর্ণনশীল মই, যার ফলে ইচ্ছামত মইটির দিক পরিবর্তন করা সম্ভব। বহু ফায়ারব্রিগেড অ্যালুমিনিয়ামের মই ব্যবহার করে। এই মইগুলি হাল্‌কা হওয়ায় বহন করা সহজ। হোজকাপ্‌লিং-এ তারা এই কারণেই অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্কর ধাতু ব্যবহার করছে।

ফায়ার-হোজ নির্মাণের দিক দিয়েও যথেষ্ট

উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫২ সালে এক ধরণের নতুন পচন-নিরোধক কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার লক্ষণীয়। দু-বছর পরে প্লাষ্টিক হোজের ব্যবহার প্রবর্তিত হয় এবং সম্প্রতি হোজ নির্মাণে ব্যবহৃত হচ্ছে কৃত্রিম তন্তু-নির্মিত জ্যাকেট ও প্লাষ্টিক লাইনিং।

বর্তমান কালে ফায়ারম্যানদের জন্যে রক্ষা-ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। যে ডিফিউজার নজোল উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলি ৩০° থেকে ১২০° পর্যন্ত জল বিস্তার করে' দুর্ভেদ্য যবনিকা তৈরী করে। যখন প্রয়োজন হয়, তখন ফায়ারম্যানরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারে। এই সরঞ্জামগুলি দু'রকমের—একটি হলো অক্সিজেন ক্লোজ্‌ড সার্কিট, যা অপেক্ষাকৃত ভারী, কিন্তু বহুক্ষণ ব্যবহার করা সম্ভব এবং অপরটি হলো কম্প্রেস্‌ড্‌ এয়ার ওপেন সার্কিট।

ফায়ারম্যানদের পোষাক-পরিচ্ছদও অনেক উন্নত ধরণের হয়েছে। ফায়ারম্যানদের যে নতুন ধরণের জুতা এখন ব্যবহার করতে হচ্ছে, তার বাইরের ও ভিতরের সোলের মধ্যে আছে টেম্পার-করা ইস্পাতের স্প্রিং প্লেট এবং জুতার অগ্রভাগে আছে একটি ইস্পাতের অঙ্গুলিত্রাণ। সাম্প্রতিক এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, ২৩৮ পাউণ্ড ওজনের একটি লোক চার ফুট উপর থেকে ধারালো কোণাকৃতি লৌহখণ্ডের উপর লাফিয়ে পড়লেও তার কোন আঘাত লাগে না।

বৃটেনে এখন আছে প্রায় ৯০,০০০ হাইড্র্যাণ্ট। তাছাড়া এখন একটি নতুন ধরণের প্রি-কাস্ট কংক্রিট হাইড্র্যাণ্ট পিট্‌ নিয়েও পরীক্ষা চলেছে; শীঘ্রই তার ব্যবহার সুরু হবে। যুদ্ধের পর যে দুটি উল্লেখযোগ্য সরঞ্জাম উদ্ভাবিত হয়েছে, সেটি হলো নতুন পোর্টেবল পাম্প এবং "বি-বি পি" নামে পোর্টেবল ওয়াটার ইউনিট।

অগ্নি-নির্বাপণের জন্যে এখন ব্যবহার করা হচ্ছে —জল, গ্যাস, রাসায়নিক পদার্থ ও শুষ্ক চূর্ণ। Edhol নামক একপ্রকার নতুন গ্যাস মালবাহী জাহাজে আগুন নিবানোর জন্যে পাইপের মধ্য দিয়ে নিক্ষেপ করা হয়। তেলের আগুন নিবানোর জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে 'ফোম' বা ফেনা। এই বছর একটি নতুন ৯০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ফায়ার-মাষ্টার পোত নিয়ে পরীক্ষাকালে দেখা যায়, তার সাতটি নজোল এক সঙ্গে পাম্প করতে পারে মিনিটে ৪,০০০ গ্যালন জল ও ১২,৫০০ গ্যালন ফেনা। এই জলযানটি সম্পর্কে বিশ্বের প্রায় সব দেশ থেকেই আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরও নানারকমের সহজ বহনযোগ্য সরঞ্জামাদির উল্লেখ করা যেতে পারে; যথা—জোর করে দরজা ইত্যাদি খোলবার জন্যে হাইড্রলিক ইউনিট, ফায়ারম্যানের কাটার ও বোল্ট-ক্রপার এবং হাল্‌কা ফ্রেম কাটার।

বর্তমানে সম্পূর্ণ নতুন উপায়ে অগ্নি-নির্বাপণের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এই নতুন উপায়টি হলো জলন্ত গৃহ থেকে বাতাস বের করে আনা এবং তার স্থলে নিষ্ক্রিয় গ্যাস প্রবেশ করাবার জন্যে জেট-ইঞ্জিনের ব্যবহার। বাতাসে অক্সিজেন না থাকলে আগুনের জলবার শক্তি থাকে না। হার্টফোর্ডশায়ারের (ইংল্যাণ্ড) অন্তর্গত বোরহামউড-এর অগ্নি-গবেষণা কেন্দ্রে যে সাধারণ টার্বো-জেট ইঞ্জিন স্থাপনের পরিকল্পনা হয়েছে, সেটি কার্যকরী হলে অবস্থার অনেক উন্নতি হবে। ইঞ্জিনটি মিনিটে ৫০,০০০ ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করতে পারবে।

বিজ্ঞান বার্তা

৩ হাজার আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত তারকা ও শনিগ্রহ হইতে আগত বেতার-তরঙ্গ

জ্যোতিবিজ্ঞানীরা এই প্রথম শনিগ্রহ ও নীহারিকাপুঞ্জ হইতে আগত বেতার-তরঙ্গ ধরিতে পারিয়াছেন। ৩ হাজার আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত এই নীহারিকাপুঞ্জের একটি মুমূর্ষু নক্ষত্র হইতে এই তরঙ্গ ভাসিয়া আসিয়াছে, তবে বাষ্পে আবৃত ছিল বলিয়া ইহা দূরবীক্ষণে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশন্যাল সায়েণ্টিফিক রেডিও ইউনিয়নের ত্রয়োদশ অধিবেশনে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ফ্রেডটি হ্যাডকের বিবরণী হইতে ইহা জানা গিয়াছে। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও জানাইয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৫ ফুট ব্যাসের একটি নূতন ধরণের রেডিও-টেলিস্কোপে ইহা ধরা পড়িয়াছে। এই দূরবীক্ষণে অতি সূক্ষ্ম একটি পরিবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে বেতার-তরঙ্গকে হাজার-গুণ বড় করিবার ব্যবস্থা আছে।

শনিগ্রহ পৃথিবী হইতে ৭৫ কোটি মাইল এবং ঐ নীহারিকাটি ৩০০০ আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত। আলোর গতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল।

নক্ষত্রের পরমায়ু সম্পর্কে এই তথ্য নূতন আলোকপাত করিবে এবং ইতিপূর্বে শনিগ্রহ সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও বর্তমান গবেষণার দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

নক্ষত্রের গ্রহ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

ওয়াশিংটন জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার জনৈক বিজ্ঞানী জানাইতেছেন যে, কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত নক্ষত্রের গ্রহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের একটি উপায় নির্ধারণ করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, চন্দ্রে কোন আবহমণ্ডল না থাকায় চন্দ্র হইতে বৃহদাকার দূরবীক্ষণের সাহায্যে এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। আবহাওয়াই পৃথিবী ও মহাশূন্যের তারকার মধ্যে যবনিকা সৃষ্টি করিয়া থাকে।

তিনি এই প্রসঙ্গে আরও জানাইয়াছেন যে, সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র প্রোক্সিমা সেণ্টোরী (Proxima Centauri) পৃথিবী হইতে ২১০০০০০০০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা ব্যতীত সিরিয়াস (Sirius), প্রোসিয়ন (Procyon), আলটেয়ার (Altair) এবং আর্কটিউরাস (Arcteurus)—এই কয়টির গ্রহ আছে বলিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনুমান করিতেছেন। প্রত্যেকটি নক্ষত্রই উজ্জ্বল এবং খালি চোখে দেখা যায়।

বিমানের গতিবেগ বৃদ্ধির অভিনব উপায়

যুক্তরাষ্ট্রের বিমান-বিজ্ঞানীরা বাতাসকে জেট বিমানের গতিবেগ বৃদ্ধির সহায়করূপে ব্যবহার করিবার একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। উপায়টি হইল, বিমানের ডানায় ছোট ছোট ছিদ্রের ব্যবস্থা করা। এই সকল ছিদ্রের সাহায্যে বাতাসকে ইঞ্জিনে প্রবেশ করাইবার ব্যবস্থা থাকিবে। ইহার ফলে বিমানের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইবে। এই জন্য অতিরিক্ত জ্বালানী খরচও হইবে না। সাধারণতঃ যে পরিমাণ জ্বালানীর সাহায্যে জেট বিমান না থামিয়া একটানা ৪০০০ মাইলেরও বেশী যায়, এই ব্যবস্থায় তাহা ৭০০০ মাইল পর্যন্ত যাইতে পারিবে। বর্তমানে নথ্‌্প কর্পোরেশন পরীক্ষামূলকভাবে এই ধরণের দুইটি জেটবিমান নির্মাণ করিতেছেন। সকল রকম বৃহৎ বিমানেই যাহাতে এই নূতন

ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যাইতে পারে, সে জন্যই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

গ্রহান্তরে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বের সন্ধান

টোসেটি এবং এপ্সিলন অ্যারিড্যানি—এই দুইটি নক্ষত্র পৃথিবীর অনুরূপ বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। ঐ সকল নক্ষত্রে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব রহিয়াছে কিনা, তাহার সন্ধান করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়মিতভাবে চেষ্টা হইতেছে। ইউ. এস. ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন বিশেষ ধরণের রেডিও যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতেছে।

বিশ্বের প্রথম অটোমোবাইল নির্মাণের পরিকল্পনা

ইতালীর বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে প্রথম অটোমোবাইল নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। স্প্রিং-এর সাহায্যেই তাহাতে গতিবেগ সঞ্চারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। এই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কেবল তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রতিভাবান ভাস্কর স্থপতি এবং ইঞ্জিনীয়ার।

সর্বাধিক শক্তিসম্পন্ন পেশী

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, মানুষের পেশীর শক্তির অনুপাতে ফড়িং-এর পায়ের পেশীর শক্তি ১০ গুণ বেশী। কীট-পতঙ্গ ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র শামুক ও ঝিনুকের পেশীর শক্তিই ফড়িং-এর পেশীর শক্তির অনুপাতে অধিক।

গ্রহান্তরগামী মহাশূন্যযান

আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাশ-বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার ক্র্যাফট্ এরিক মঙ্গল ও শুক্রগ্রহ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন গ্রহের মধ্যে চলাচলকারী পরমাণুশক্তি-চালিত একটি বৃহদাকার মহাশূন্যযানের বর্ণনা দিয়াছেন। এই মহাশূন্যগামী বিমানে আটজন বৈমানিক থাকিবে এবং ইহা একটানা এক হইতে দেড় বৎসর পর্যন্ত চলিতে পারিবে। ১৯৭০-'৭১ সালের মধ্যে এই পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত হইতে পারে বলিয়া তিনি অনুমান করিতেছেন।

এরিকের পরিকল্পনা অনুসারে মহাশূন্যযাত্রী বৈমানিকদের শুক্রগ্রহে পৌছিতে ২২৫ দিন লাগিবে। সেখানে তথ্যানুসন্ধানের জন্য ২৪ দিন থাকিয়া ২৩৫ দিনে আবার তাঁহারা পৃথিবীতে ফিরিয়া আসবেন। আবার তাঁহারা ১৩৮ দিনে মঙ্গলগ্রহে পৌছিবেন। সেখানে থাকিবেন ৩৪ দিন। তারপর ১৭৫ দিনে তাঁহারা পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবেন।

এই ব্যাপারে কারিগরি ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল উন্নতি হইয়াছে, তাহারও তিনি বর্ণনা দেন। তিনি বলিয়াছেন, এই ধরণের যানের পরমাণু শক্তি-চালিত ইঞ্জিন ১৯৬৫ সালের মধ্যে তৈয়ার হইবে এবং ১৯৬৫ হইতে ১৯৭০ সালের মধ্যে চন্দ্র উপগ্রহে যাতায়াত করা সম্ভব হইবে।

বাঁচিয়া থাকিবার ব্যবস্থাদি এবং এই জন্য যে সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও মহাশূন্যযান সম্পর্কে সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন, তাহা লইয়া ১৯৬০ হইতে ১৯৬৩ সালের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইবে।

১৯৬০ হইতে ১৯৭০ সালের মধ্যে কৃত্রিম উপগ্রহের সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই সম্বন্ধে আরও বহুবিধ তথ্যাদি সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা আছে।

এরিক যে মহাশূন্যযানের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা ৪৬০ হইতে ৪৮০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হইবে। ইহার উপরের দিকে থাকিবে শোবার ঘর, স্নানের ঘর, রান্নাঘর, খেলাধুলা করিবার ঘর, গ্রন্থাগার, ব্যায়ামশালা এবং মেডিক্যাল রুম। অন্য দিকে

থাকিবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কারখানা এবং হাইড্রোজেনকে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করিবার সাজসরঞ্জাম।

হাইড্রোজেন পারক্সাইডের সাহায্যে দুগ্ধ সংরক্ষণ

রেফ্রিজারেশন বা হিমায়িত করা ছাড়াও দুধ বহুক্ষণ সংরক্ষণ এবং বহু দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করবার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে বলে আমেরিকার ডাঃ ইও এণ্ডারসন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার সদর দপ্তরে জানিয়েছেন। বর্তমানে ডাঃ অ্যাণ্ডারসন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। হাইড্রোজেন পারক্সাইড প্রয়োগ করে দুধ-সংরক্ষণ সম্বন্ধে তিনি পরীক্ষা করে সাফল্য লাভ করেছেন। বহুদূরবর্তী স্থানে এই ব্যবস্থায় সংরক্ষিত প্রচুর পরিমাণ দুধ নিয়ে যাওয়া যায়, দুধ কেটে যায় না।

ডাঃ অ্যাণ্ডারসন বলেছেন, দুধ দুইবার ঠিক পরেই হাইড্রোজেন পারক্সাইড প্রয়োগ করতে হয়। এর ফলে দুধে জীবাণু জন্মাতে পারে না; কাজেই দুধ নষ্ট হয় না।

স্বয়ংক্রিয় পোষ্ট অফিস

এমন দিন আসছে, যখন চিঠি ডাকবাক্সে ফেলবার পর এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে প্রাপকের কাছে পৌছে যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাক বিভাগ এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করছেন। ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই এটা সম্পন্ন হবে এবং অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটন থেকে মিশিগানের ল্যানসিং-এ এই ব্যবস্থা সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখাবার কথা আছে। বর্তমানে কেবলমাত্র সরকারী কাগজপত্র এভাবে প্রেরণ করা হবে।

এই প্রক্রিয়ায় বন্ধ চিঠি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় খোলা হবে এবং ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় চিঠির মর্ম এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে গন্তব্য স্থানে পৌছে দেওয়া হবে। সেখানে এর আলোকচিত্র গৃহীত হবে এবং যান্ত্রিক ব্যবস্থায় খাম বন্ধ হয়ে যাবার পর প্রাপকের কাছে পৌছে দেওয়া হবে।

আমেরিকার পোষ্টমাষ্টার জেনারেল আর্থার ই. সামারফিল্ড জানিয়েছেন যে, রোড আয়ল্যাণ্ডের প্রভিডেন্সে একটি স্বয়ংক্রিয় পোষ্ট অফিস নির্মিত হচ্ছে। এতে চিঠি প্রাপকের কাছে পৌছে দেবার ব্যাপারটি সহজতর হবে। এই উপলক্ষে এক প্রকার নতুন ডাক টিকিট প্রবর্তিত হবে।

ভারতে সঙ্কর ভুট্টা উৎপাদনের তোড়জোড়

মরিস অষ্টিন পুয়েশ নামে জনৈক ভারতীয় কৃষি-বিজ্ঞানী সঙ্কর ভুট্টা উৎপাদন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। ইনি নয়াদিল্লী থেকে মাইলখানেক দূরে আগরওয়ালমণ্ডী নামে একটি খামারে কাজ করেন।

সঙ্কর ভুট্টার ফসল সাধারণ ভুট্টার তুলনায় অনেক বেশী হয়ে থাকে। দুই জাতের ভুট্টার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এই ধরণের ভুট্টা জন্মানো হয়। এর ব্যাপক চাষের ব্যবস্থা হলে ভারতের খাদ্যাভাব দূরীকরণে অনেকটা সাহায্য করবে।

তাছাড়া আমেরিকায় হাঁস-মুরগীর চাষ যে ভাবে হয়ে থাকে, যান্ত্রিক উপায়ে যে ভাবে হাজার হাজার হাস-মুরগীকে খাওয়ানো হয়, তাকে বলা হয় 'এসেম্বলি লাইন'। ভারতে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে একটি লোক বহু হাঁস-মুরগীর তদারক করতে পারবে।

সংক্রামক ব্যাধি থেকে শিশুদের রক্ষা করবার জন্যে কৃত্রিম টীকা

পশ্চিম জার্মেনীর ফ্রীবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ো-কেমিষ্ট্রী ও ইমিউনো কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপক এবং ওরাণ্ডার রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের প্রধান ডাঃ অটো ওয়েষ্টফল, প্যারিসের পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের ডাঃ অ্যামি মেরী স্টার এবং কোপেনহেগেনের ষ্টিনিস্-

সিরাম ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক এফ. কাফমার শিশুদের অতি সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা করবার একপ্রকার কৃত্রিম টীকা আবিষ্কার করেছেন। এই টীকা শিশুর দেহে রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা জন্মায়। রোগবাহক কোন জীবন্ত বা মৃত জীবাণু থেকে এই টীকা তৈরী করা হয় নি—কোন প্রকার বিষ এতে না থাকায় জর অথবা অন্য কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়াও হয় না। গবেষণাগারে প্রাণীদেহে পরীক্ষার ফলে এই তথ্য জানা গেছে।

অল্প খরচে লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিণত করবার ব্যবস্থা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ দপ্তরের লবণাক্ত জল বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ এ. এল. মিলার সমুদ্রের জলকে বিশুদ্ধ পানীয় জলে পরিণত করা সম্পর্কে বলেছেন যে, লবণাক্ত জলকে বরফে পরিণত করে তাথেকে বিশুদ্ধ জল তৈরী করবার প্রক্রিয়ার খরচ অন্যান্য প্রক্রিয়ার তুলনায় খুবই কম। ১৯৫২ সালের আগে যে প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ জল উৎপাদন করা হতো, তাতে প্রতি গ্যালন পিছু খরচ পড়তো ৪ ডলার। বর্তমানে তা হ্রাস পেয়ে ২ ডলারে এসে পৌঁচেছে। ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যান ডিয়াগোতে দশ লক্ষ ডলার ব্যয়ে যে কারখানাটি তৈরী হচ্ছে—তাতে দিনে সমুদ্র-জলকে হাজার গ্যালন বিশুদ্ধ পানীয় জলে পরিণত করবার খরচ এক ডলার পর্যন্ত পড়তে পারে বলে তাঁরা অনুমান করেছেন।

তিনি বলেন, পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ার তুলনায় এই প্রক্রিয়ায় অনেক রকম সুবিধাও আছে।

৭০ হাজার বছরের প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল

ইরাকের উত্তরাঞ্চলের পর্বত-গহ্বরে মার্কিন নৃতত্ত্ববিদেরা আদিম প্রস্তর যুগের নিয়্যাণ্ডারথ্যাল মানবের তিনটি কঙ্কাল এবং একটি কবরস্থানের সন্ধান পাইয়াছেন। এই কবরস্থানেও ঐ প্রাগৈতিহাসিক যুগেরই ২৬টি কঙ্কাল রহিয়াছে।

পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে যে ধরণের মানুষ বিচরণ করিত, তাহাদের অনেকগুলি কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনার দিক হইতে এই আবিষ্কার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—এই সকল নিদর্শন তুলনামূলক আলোচনায় অনেকখানি আলোকপাত করিবে।

আমেরিকায় ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন সম্প্রতি এক ঘোষণায় ইহা জানাইয়াছেন। ফাউণ্ডেশনের অর্থ-সাহায্যেই এই অনুসন্ধান-কার্য পরিচালিত হয়। গত গ্রীষ্মকালে এই সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই গুহাটি বাগদাদের ২৫০ মাইল উত্তরে শানিদার নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে অবস্থিত। এখানেই ১৯৫৭ সালে প্রাগৈতিহাসিক মানবের আরও তিনটি কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মেষপালকেরা এখনও এই গুহাটি ব্যবহার করিয়া থাকে। তিনটি কঙ্কালই নিখুঁত ও সুসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

এই তথ্যানুসন্ধানী বিজ্ঞানীদলের নেতৃত্ব করেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ র‍্যালফ সোলেকী। ডাঃ সোলেকী ব্যতীত এই দলে আছেন তাঁহার পত্নী ডাঃ রোজ. এল. সোলেকী, স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউশন এবং ফিলাডেলফিয়া অ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্সের প্রতিনিধিবর্গ। ডাঃ সোলোকী তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪-এর সাহায্যে ইহাদের বয়স নির্ধারণ করিয়াছেন। কঙ্কালগুলি ৪৫ হাজার হইতে ৭০ হাজার বছরের পুরাতন বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বিজ্ঞানীরা এখানে ঐ আদিম যুগের খেজুরের পরাগ এবং বুনো গমেরও সন্ধান পাইয়াছেন। এই অঞ্চলে যে কৃষি-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহা ইহতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ঐ সকল ব্যক্তির পাথর চাপা পড়িয়া মৃত্যু ঘটিয়াছিল বলিয়া তাঁহার অনুমান।

জ্যামিতির ক্রমবিকাশ

শ্রীননীগোপাল কর্মকার

'জ্যামিতি' শব্দটি ইংরেজী Geometry শব্দেরই হুবহু অনুবাদ। দুইটি কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থও এক। ভূমির পরিমাপ সংক্রান্ত সমস্যার চর্চা করিতে গিয়াই প্রথমে এই শাস্ত্রের উৎপত্তি। গণিত শাস্ত্রের এই শাখাটির প্রথম চর্চা হয় গ্রীসদেশ, মিশর ও ভারতবর্ষে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কতকগুলি বাস্তব সমস্যার সমাধান করিতে গিয়াই প্রত্যেক দেশে এর চর্চা সুরু হয়। অবশ্য গ্রীসদেশে বিশুদ্ধ জ্যামিতির চর্চাও কিছুটা হইয়াছিল; কারণ গ্রীসদেশে দার্শনিক প্লেটো জ্যামিতিকে দর্শনশাস্ত্রেরই অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করিতেন এবং ইহার ফলে জ্যামিতি আধ্যাত্মচর্চার একটি বিশেষ ধাপে পরিণত হইয়াছিল। বাস্তব জগৎ হইতে জ্যামিতিকে সরাইয়া নেওয়ার ফলে গ্রীক-জ্যামিতির সমূহ সর্বনাশ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

মানব-চিন্তার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জ্যামিতির অর্থ ও তাহার চিন্তার ধারা অনেক পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। জ্যামিতিতে পরিমাপের প্রয়োজন যে থাকিবেই, এমন কোন কথা নাই। জ্যামিতি যদি পরিমাপগত হয়, তবে অবশ্য পরিমাপ করিবার প্রয়োজন থাকিবে; কিন্তু গুণগত জ্যামিতিতে পরিমাপের প্রয়োজন হয় না। গুণগত জ্যামিতিতে কেবল গুণ, ধর্ম ও অবস্থিতির আলোচনা করা হয়। এই জাতীয় জ্যামিতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ "Projective Geometry"। জ্যামিতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে এই জ্যামিতি এক অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

আমরা প্রথমে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির আলোচনা করিব। কারণ ইউক্লিডের পূর্বে যদিও জ্যামিতির চর্চা হইয়াছে, তথাপি ইউক্লিডীয় স্কুলই প্রথমে জ্যামিতিকে সুসংহত রূপদান করে। ইউক্লিডের চিন্তাধারার মূলে ছিল, বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য। এই স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্যের উপর ভিত্তি করিয়া যুক্তির সাহায্যে তিনি নূতন নূতন সত্যের সন্ধান দিয়াছেন। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়—ইউক্লিডের যুক্তি আধুনিক বিশুদ্ধ গাণিতিকদের Formal Logic নয়; ইহা বাস্তব অভিজ্ঞতারই রূপায়ণ-বিশেষ। ইউক্লিডের চিন্তার ভিতরে Logic, Intuition ও Sensible experience-এর এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইউক্লিডের সত্যানুসন্ধানের প্রণালী আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানীদের প্রণালীর অনুরূপ। আধুনিক গণিতশাস্ত্র ইউ-ক্লিডের প্রণালী হইতে অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বিজ্ঞানাচার্য আলবার্ট আইনষ্টাইনও Intuition, Sensible experience ও Experimentation হইতে লব্ধ জ্ঞানকে Logical analysis-এর দ্বারা সুসংহত রূপদানকেই তত্ত্বানুসন্ধানের উপায় বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

এইবার আমরা ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য সম্পর্কে আলোচনা করিব। Axiom of free mobility বা Principle of superposition, অর্থাৎ 'উপরিপাতন'-এর প্রয়োগ প্রাথমিক জ্যামিতির পুস্তকে অনেক দেখা যায়। এর দ্বারা দুইটি চিত্রের সর্বসমতা প্রমাণ করা হয়। কিন্তু কোন বস্তুকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গেলে তাহা অপরিবর্তিত থাকিবে কিনা, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে

ইউক্লিডের 'দেশ' ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতার 'দেশ' এবং সেই 'দেশে' (Physical Space) তাঁহার স্বতঃসিদ্ধের বিরোধী কোন ঘটনা পরিলক্ষিত হয় নাই। পরবর্তীকালে রিমানীয়ান স্পেস বা 'দেশ' সম্পর্কিত গবেষণার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ধ্রুবক বক্রতাবিশিষ্ট 'দেশে'ই (Space of Constant Curvature) "Axiom of free mobility" প্রযোজ্য; 'দেশে'র বক্রতা বিন্দুতে বিন্দুতে পরিবর্তিত হইলে ইহা মোটেই প্রযোজ্য নয়। ইউক্লিডের 'দেশ' শূন্য বক্রতাবিশিষ্ট; তাই উক্ত স্বতঃসিদ্ধটি ইউক্লিডের 'দেশে' প্রযোজ্য। উন্নততর গাণিতিক বিশ্লেষণেও ইউক্লিডের চিন্তা বাতিল হইল না; কারণ তাঁহার চিন্তা ছিল মাটির পৃথিবীতে নিবদ্ধ। ইউক্লিডের জ্যামিতির আর একটি ত্রুটি এই যে, তিনি বস্তুর গতির (Rigid Motion) ধারণা জ্যামিতিতে আমদানী করিয়াছেন, কিন্তু তার জ্যামিতিক ভিত্তি স্থাপন করেন নাই। পরবর্তীকালে ডেভিড হিলবার্ট তাঁহার Foundations of Geometry-তে ইহার ভিত্তিস্থাপন করিয়া ইউক্লিডের জ্যামিতিকে সুসংহত রূপ দিয়াছেন।

ইউক্লিডের আর একটি স্বতঃসিদ্ধ এই যে, কোন সরলরেখাকে বর্ধিত করিতে করিতে অনন্ত পর্যন্ত লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু Projective Space ও Riemannian Space-এ এই স্বতঃসিদ্ধের কোন অর্থ থাকে না। প্রথমতঃ, এই শেষোক্ত 'দেশ' দুইটির এমন কোন অংশ নাই, যাহাকে "অনন্ত" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, Projective space-এ সরলরেখা তাহার সরলত্ব হারাইয়া একটি Closed figure-এ পরিণত হয় এবং রিমানের Spherical space "Finite and unbounded" হওয়ায় রেখাও "Finite and unbounded" হইতে বাধ্য।

ইউক্লিডের "Parallel Postulate" বা সমান্তরালতার স্বীকার্য এই জ্যামিতির এক শক্তিশালী অস্ত্র। ইহা হইতেই সদৃশ ত্রিভুজের ধারণা ও ত্রিভুজের কোণত্রয়ের সমষ্টি যে দুই সমকোণের সমান, এই ধারণা জ্যামিতিতে উদ্ভূত হয়। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, ফলিত বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞানে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির যে অপ্রতিহত প্রভাব—তাহার মূলেও রহিয়াছে Parallel Postulate। এই স্বীকার্যটিকে প্রমাণ করিবার চেষ্টা চলিয়াছে বহুদিন যাবৎ—গ্রীক জ্যামিতিবিদ্ Proclus হইতে আরম্ভ করিয়া পারস্যের Nasir-Eddin, ইটালীর Sacheri, ফরাসীদের Legendre, জার্মেনীর Gauss প্রভৃতি—সকলেই ব্যর্থকাম হইয়াছেন। জার্মান দার্শনিক Immanuel Kant এই সত্যটিকে তাঁহার "Things-in-themselves"-এর পর্যায়ে ফেলিয়াছিলেন এবং এই সত্যটিকে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। Gauss এই সত্যটিকে অস্বীকার করিয়া নূতন জ্যামিতি সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। হাঙ্গেরীর Bolyai Janos ও রাশিয়ার Nicholi Lobatchewsky, "Parallel Postulate" সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়াই নূতন জ্যামিতির সৃষ্টি করেন এবং ইহাই Non-Euclidean Geometry বলিয়া পরিচিত।

গ্রীক জ্যামিতির একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে, ইহাতে বীজগণিতের প্রয়োগ মোটেই নাই। তাহার ফলে বক্ররেখা ও বক্রতল সম্পর্কিত সাধারণ আবিষ্কার করাও গ্রীকদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাহারা খাপছাড়াভাবে বিশেষ কতকগুলি রেখা ও তল সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, জ্যামিতির সহিত বীজগণিতের, বিশেষ করিয়া সংখ্যাতত্ত্বের যোগসূত্র না থাকায় জ্যামিতির অঙ্কনেও তাহাদের দুর্বলতা ছিল। রুলার ও কম্পাসের সাহায্যে কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব কিনা, তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। তাই গ্রীক জ্যামিতিবিদেরা সমস্যায়

পড়িয়াছিলেন যে, Duplication of the cube, Trisection of an angle এবং Quadrature of a circle সম্ভব কিনা। জ্যামিতিক সমাধান করিতে না পারিয়া তাঁহারা যান্ত্রিক উপায়ে সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বেশ কিছুটা কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। দুই হাজার বৎসর ব্যাপিয়া সকল যুগেই প্রখ্যাতনামা গাণিতিকগণ উপরিউক্ত সমস্যাত্রয়ের জ্যামিতিক সমাধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই বিফল হইয়াছেন। আধুনিক বীজগণিত ও গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, রুলার ও কম্পাসের সাহায্যে উক্ত সমস্যাত্রয়ের সমাধান অসম্ভব; উহারা অমীমাংসিত সমস্যা নয়। Theory of Galois Field বীজগণিতের এক অভিনব আবিষ্কার। ইহার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, রুলার ও কম্পাসের সাহায্যে Duplication of the cube ও Trisection of an angle সম্ভব নহে। Hermite ও Lindemann-এর **e** এবং π সংক্রান্ত গবেষণা হইতেই আমরা প্রমাণ করিতে পারি যে, রুলার ও কম্পাসের সাহায্যে Squaring of a circle সম্ভব নহে।

ফরাসী দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ René Descartes জ্যামিতি ও বীজগণিতের সমন্বয় ঘটাইয়া জ্যামিতির গবেষণার এক নূতন দিক খুলিয়া দিলেন। তিনিই Continuum (সন্ততি) ও Cartesian Co-ordinates-এর আবিষ্কর্তা। ইউক্লিডের জ্যামিতির সমস্ত সত্যগুলিকে তিনি বীজগণিতের সূত্র ও সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করেন। শুধু তাহাই নহে, জ্যামিতিকে বীজগণিতের পোষাক পরাইবার ফলে জ্যামিতির গবেষণা ও প্রয়োগ অনেক সরল ও দ্রুততর হইতে থাকে। দেকার্তের এই পদ্ধতিই Analytical Geometry নামে অভিহিত। রেখা ও তল সম্বন্ধে সাধারণ তত্ত্ব ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গবেষণা করা Analytical Geometry-তে সহজ হইয়া গেল।

ইংল্যাণ্ডে নিউটন ও জার্মেনীতে লাইব্‌নিৎস্‌ Calculus বা Mathematics of the continuous আবিষ্কার করিবার পর জ্যামিতিতে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। Theory of Functions, Differentiation ও Integration-এর ধারণা যতই দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল, গাণিতিক বিশ্লেষণ ততই সমৃদ্ধশালী হইতে লাগিল। কতকগুলি জ্যামিতিক ধারণা, যেমন—রেখা, তল, ক্ষেত্রফল, আয়তন ও দৈর্ঘ্য—অনেকদিন পর্যন্ত গাণিতিকদের কাছে অস্পষ্ট ছিল কিন্তু গাণিতিক বিশ্লেষণের দ্বারা ইহাদের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হইল এবং ঐ ধারণাগুলি Intuition-এর রাজ্য হইতে Logical rigour-এর মধ্যে ধরা দিল।

এতকাল জ্যামিতিতে রেখা ও তলগুলির আলোচনা হইত সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে। কিন্তু জার্মান বৈজ্ঞানিক Gauss স্থানীয় বা সূক্ষ্ম দৃষ্টি-ভঙ্গীতে রেখা ও তলের গবেষণা সুরু করেন। ইহা হইতেই Differential Geometry-র উৎপত্তি হইল। কোন রেখার বক্রতা ও মোচড় সেই রেখার অতি প্রয়োজনীয় ধর্ম। এই দুইটি জ্যামিতিক ধারণার গুরুত্ব আরও বেশী এই জন্য যে, ইহারা Rigid motion-এ অপরিবর্তিত (Invariant) থাকে। তলেরও এই রকম একটি বিশেষ ধর্ম আছে, যাহাকে বলা হয় গসীয় বক্রতা (Gaussian Curvature) বা পূর্ণ বক্রতা। ইহা সর্বপ্রকার বিকৃতিতেও (Deformation) নিত্য অপরিবর্তিত (Invariant) থাকে। Gauss-এর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়াই বিশ্ববিখ্যাত জার্মান গাণিতিক রিমান Riemannian Geometry (Generalised metric differential Geometry)-এর আবিষ্কার করেন। রিমানের জ্যামিতি গণিতশাস্ত্রের এক অভিনব আবিষ্কার। রিমানের চিন্তার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার Spherical

space "Finite and unbounded" এবং তাঁহার 'দেশে'র মধ্যে সমসত্ত্বের (Homogeneity) অস্তিত্ব নাই; 'দেশে'র মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে ভিন্ন ভিন্ন metric বা দৈর্ঘ্যের পরিমাপ এবং বক্রতাও এক এক জায়গায় এক এক রকম। Variable metric ও Variable curvature of space রিমানীয়ান 'দেশে'র প্রধান বৈশিষ্ট্য। Gauss শুধু Surface Curvature-এর গাণিতিক সূত্র (Gauss-Cadazzi Formula) আবিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু রিমান 'দেশে'র বক্রতার গাণিতিক সূত্র (Riemann-Christoffel tensor) বাহির করিয়াছেন।

আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইউক্লিডের জ্যামিতি ও তথাকথিত নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ও রিমানের জ্যামিতির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। রিমানীয়ান 'দেশ' বা স্পেস-এর Curvature tensor যদি সর্বত্রই শূন্য হয়, তবে তাহা Eucledean Space-এ পর্যবসিত হইবে। Curvature-tensor যদি সর্বত্রই ধনাত্মক ও ধ্রুবক হয়, তবে উহা Spherical space বা Elliptical space-এ পর্যবসিত হইবে এবং Curvature tensor যদি সর্বত্রই ঋণাত্মক ও ধ্রুবক হয়, তবে উহা Hyperbolic space-এ পর্যবসিত হইবে।

রিমানের জ্যামিতিতে Variable metric-এর ব্যবহার করায় অনেকে এই জ্যামিতির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন; এমন কি, বারট্রাণ্ড রাসেলের মত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিও রিমানের এই চিন্তাধারাকে প্রথমে আঘাত করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু এই রিমানের জ্যামিতির উপর ভিত্তি করিয়াই আইনষ্টাইন যখন তাঁহার আপেক্ষিকতাবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন রিমানের চিন্তাধারা গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক-মহলে প্রথম সমাদৃত হয়। আইনষ্টাইন রিমানীয়ান স্পেস-কে গ্রহণ করিলেও তাঁহার একটু পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। রিমানীয়ান স্পেস-এ Relation of parallelism-এর সংজ্ঞা খুঁজিয়া পান নাই, অথচ Parallelism-এর ধারণা বাস্তব ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজন। কাজেই আইনষ্টাইনকে নূতন করিয়া Parallelism-এর সংজ্ঞা তৈয়ার করিতে হইয়াছে। ফলে আইনষ্টাইনের 'দেশ' ইউক্লিড ও রিমানের 'দেশের' মাঝামাঝি একটা রূপ পরিগ্রহ করে। তবে মূলতঃ রিমানের 'দেশ'ই আইনষ্টাইনের প্রধান সহায়ক; কারণ বস্তুসাপেক্ষ 'দেশ'ই ছিল আইনষ্টাইনের কাম্য। তাহা ছাড়া স্থানীয় বা সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীতে 'দেশ'কে দেখা Gauss ও Riemann-ই প্রথম আরম্ভ করেন, আর আপেক্ষিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গীও স্থানীয় (Local), সার্বিক (Global) নহে। রিমানই একদিন দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

"*It is upon the exactness with which we follow phenomena in the infinitely small that our knowledge of the causal relations essentially depends. Questions of the measure-relations of space in the infinitely small are not, therefore, superfluous ones*".

জ্যামিতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে আর এক বিস্ময়কর অধ্যায় হইল Projective Space ও Projective Geometry। Projective Geometry গুণগত জ্যামিতি; পরিমাপ এই জ্যামিতিতে নাই। Projective Space-এ Homogeneity, অর্থাৎ সমসত্ত্ব বর্তমান; এই 'দেশের' সকল অংশই সমান গুণসম্পন্ন। প্রথমতঃ Projective Geometry-এর উৎপত্তি হয় Homogeneous Co-ordinates-এর দ্বারা, ইউক্লিডীয় জ্যামিতির কতকগুলি ব্যতিক্রমের নিরসন করিতে গিয়া। জ্যামিতিতে যে প্রক্রিয়াকে Projection ও Section বলা হয় বীজগণিতে তাহাকে Projective transformation বা Collineation-এর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যে সকল জ্যামিতিক ধর্ম Collineation-এর দ্বারা অপরিবর্তিত থাকে,

তাহাদিগকে Projective properties বলা হয়। চারি বিন্দুর মধ্যে Cross-ratio বা Anharmonic ratio থাকে, যাহা Collineation-এ অপরিবর্তিত থাকে। এই Cross-ratio ও Collineatoin-এর উপর ভিত্তি করিয়াই Projective Geometry গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রথমে Cremona প্রমুখ গণিতজ্ঞদের Cross-ratio-এর সংজ্ঞায় পরিমাপের প্রশ্ন জড়িত ছিল। তাই এই হিসাবে Projective Geometry-কে পরিমাপবর্জিত জ্যামিতি বলিবার যৌক্তিকতা থাকে না। কিন্তু Hilbert-এর "Foundations of Geometry"-তে আমরা দেখি যে, Von Standt-এর Quadrilateral Construction-এর উপর ভিত্তি করিয়া Cross-ratio ও Projective Co-ordinates-এর পরিমাপ-নিরপেক্ষ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয়। সংখ্যার প্রয়োগ করা হয় প্রতীক হিসাবে, পরিমাপ হিসাবে নহে। এই জ্যামিতিতে দূরত্ব, কোণ, আয়তন, ক্ষেত্রফল, সমান্তরালতা প্রভৃতি কোন পরিমাপজ্ঞাপক ধারণারই অস্তিত্ব থাকে না।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইউক্লিডের "Parallel Postulate"-কে অস্বীকার করিয়া Lobachewsky সৃষ্টি করিলেন Hyperbolic Geometry এবং Riemann সৃষ্টি করিলেন Spherical Geometry। Hyperbolic Geometry-তে কোন কিছু দিয়া একটি সরলরেখার সমান্তরাল দুইটি সরলরেখা টানা যাইতে পারে; Spherical Geometry-তে কোন বিন্দু দিয়া একটি সরলরেখার সমান্তরাল কোন সরলরেখাই টানা যাইতে পারে না। Riemann-এর Speherical Geometry ও Felix Klein-এর Elliptic Geometry প্রায় এক। Hyperbolic Space-এ কোন ত্রিভুজের কোণসমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। Spherical space-এ ত্রিভুজের কোণসমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর এবং সদৃশ ত্রিভুজের অস্তিত্ব নাই। Hyperbolic space-এ একটি সরলরেখাকে বর্ধিত করিয়া অসীম পর্যন্ত নেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু Spherical space-এ একটি সরলরেখাকে ইচ্ছামত বর্ধিত করিলে পুনরায় পূর্বোক্ত স্থানে ফিরিয়া আসিবে। Spherical space হবে শান্ত, কিন্তু অসীম (Finite but unbounded)।

পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, Differential Geometry-এর দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে Riemannian space-এর বিশেষ রূপ হিসাবে Euclidean ও Non-Euclidean space পাইতে পারি। কিন্তু ইংরেজ গণিতজ্ঞ Arther Cayley, জার্মান গণিতজ্ঞ Felix Klein এবং ইংরেজ দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ W. Clifford-এর Projective mentality থাকিবার ফলে Projective Geometry হইতেই Non-Euclidean Geometry সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পান এবং তাঁহারা এই দিকে বিশেষ সাফল্যও লাভ করেন। তাঁহারা Projective plane-এর মধ্যে Absolute বা Fundamental Conic এবং Projective space-এর মধ্যে Absolute বা Fundamental Quadric ধরিয়া লইয়া সেই Absolute-এর প্রকৃতিভেদে জ্যামিতির প্রকারভেদ করিয়াছেন। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, Arther Cayley প্রমাণ করেন—ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে শুধু Distance-function-এর রূপ বদলাইয়া দিলেই ননইউক্লিডীয় জ্যামিতির সমস্ত সত্যগুলি পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সুসঙ্গতি আরও প্রকট হইয়া উঠিল। Absolute-এর প্রকারভেদ করিয়া Cayley দেখাইয়াছেন যে, ইউক্লিডীয় ও ননইউক্লিডীয় সকল প্রকার জ্যামিতিই Projective Geometry-র মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। Cayley তাই গর্ব করিয়া বলিয়াছেন—"Projective Geometry is all of Geometry"। Cayley-র এই উক্তি খুবই সত্য। কারণ Cross-ratio-এর Logarithm-

এর সাহায্যে কোণ ও দূরত্বের সংজ্ঞা দেওয়ার পর পরিমাণ-জ্ঞাপক ধারণাগুলিও Projective Geometry-র আওতায় আসিয়া পড়ে।

Cayley-র উক্তির যাথার্থ্য আরও ভালভাবে প্রতিপন্ন হয় Felix Klein-এর Classification of geometrics হইতে। জ্যামিতির প্রকারভেদ করিতে গিয়া Klein বীজগণিতের Transformation Group ও Invariance-এর সাহায্য নিলেন। কোন্ কোন্ বিবর্তনে (Transformation) কোন্ কোন্ জ্যামিতিক বস্তু ও সম্পর্ক নিত্য থাকে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তিনি দেখিলেন যে, Projective transformation-এ Collinearity, Concurrency, Cross-ratio, Pole-polar relation ইত্যাদি গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলি নিত্য থাকে, কিন্তু কোন পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য নিত্য থাকে না এবং সমান্তরাল হওয়ার ধর্মও বজায় থাকে না। কিন্তু Projective transformation-এ যদি *"Plane at infinity"*-কে স্থির রাখা হয়, তবে উহা Affine transformation-এ পরিণত হয়। এই বিবর্তনে Projective ধর্ম ছাড়াও সমান্তরাল হওয়ার ধর্ম ও দূরত্বের অনুপাত অপরিবর্তিত থাকে। Affine transformation-এ যদি *"Circular points at infinity"* অর্থাৎ (1, i, o) ও (1,-i, o) নিত্য থাকে তাহা হইলে উহা Rigid motion-এ পরিণত হয়। ইহাতে গুণগত ও পরিমাণগত সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই অপরিবর্তিত থাকে এবং সমান্তরাল হওয়ার ধর্মও নিত্য থাকে। এই বিবর্তনে কোণ, দূরত্ব, আয়তন, ক্ষেত্রফল সবই নিত্য থাকে। Projective Geometry-র উপজীব্য বিষয় সেই সমস্ত ধর্মাবলী, যাহা Projective transformation-এ নিত্য থাকে; Affine Geometry-র উপজীব্য বিষয় সেই ধর্মাবলী, যাহা Affine transformation-এ নিত্য থাকে; আর Metric Geometry-র উপজীব্য বিষয় সেই সমস্ত ধর্মাবলী, যাহা Rigid motion-এ নিত্য থাকে।

"Foundations of Geometry"-তে ফর্ম্যালিষ্ট-স্কুলের ঋত্বিক জার্মান গণিতজ্ঞ David Hilbert বিশুদ্ধ জ্যামিতিতে (Abstract Geometry) এক অভিনব চিন্তাধারার উদ্বোধন করেন। তাঁহার মতে, কতকগুলি "Undefined objects" ও "Undefined relations" দেওয়া থাকিলে কতকগুলি ন্যূনতম স্বতঃসিদ্ধের সাহায্যে আমরা জ্যামিতি তৈয়ার করিতে পারি, যদি স্বতঃসিদ্ধগুলি (১) স্বাধীন (Independent) হয়., (২) সঙ্গতিপূর্ণ (Consistent) হয় এবং (৩) অবিসম্বাদী (Free from contradiction) হয়, অর্থাৎ স্ববিরোধী না হয়। স্বাধীন হওয়ার অর্থ এই যে, একটি স্বতঃসিদ্ধ অন্য একটি স্বতঃসিদ্ধের উপর নির্ভরশীল হইবে না। হিলবার্ট এই নীতিতেই ইউক্লিডীয় জ্যামিতি, Projective জ্যামিতি ও নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। স্বতঃসিদ্ধগুলি স্বাধীন থাকিবার জন্যই "Parallel Postulate"-কে অস্বীকার করিয়া নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ও Desargues Theorem-কে অস্বীকার করিয়া Non-Desarguesian Geometry সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে এবং আর্কিমিডিসের স্বতঃসিদ্ধকে অস্বীকার করিয়া Non-Archimedean Geometry-র উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানেও ন্যূনতম স্বতঃসিদ্ধের উপর ভিত্তি করিয়া কোন তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে প্রয়াস দেখা যাইতেছে, ফর্ম্যালিষ্ট স্কুলের গণিতবিদেরাই তাহার অগ্রদূত। Veblen ও Young ন্যূনতম স্বতঃসিদ্ধের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের জ্যামিতি সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশুদ্ধ জ্যামিতির এই রকমের অগ্রগতির বাস্তব প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, বিশুদ্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহারা যে মানবচিন্তার অনবদ্য সৃষ্টি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জ্যামিতিতে বীজগণিত ও বিশ্লেষণ (Analysis) প্রয়োগের আর এক সুফল হইল, বহুমাত্রিক 'দেশ' ও বহুমাত্রিক জ্যামিতির (Multidimensional space) উদ্ভব। মানুষের অভিজ্ঞতার 'দেশ' ত্রিমাত্রিক এবং তিনের অধিক মাত্রাবিশিষ্ট 'দেশের' কল্পনা মানুষের পক্ষে স্বভাবতঃই কঠিন। কিন্তু বিশুদ্ধ গণিতে "n-dimensional space"-এর সমস্ত ধর্ম অতি নিখুঁতভাবে আলোচনা করা হয়। এই n-dimensional space-এর মানসচিত্র তৈয়ার করা মোটেই সম্ভব নয়। Algebra ও Analysis-এর সাহায্যেই গাণিতিকেরা এই অচেনা 'দেশে'র সমস্ত খবর নিখুঁতভাবে জানিতে পারেন। Algebra ও Analysis গণিতজ্ঞদের নিকট একাধারে Microscope ও Radio-telescope। আধুনিক বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিকেরা বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মহাশূন্যের বহু অচেনা ও অজানা স্থানের সংবাদ আহরণ করিয়া থাকেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিখুঁত সামগ্রিক চিত্র বৈজ্ঞানিকদের নিকট অজ্ঞাত, কিন্তু বেতার-দূরবীক্ষণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহু খবর তাঁহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতেছে। সেইরূপ Algebra ও Analysis-এর সাহায্যে n-dimensional Euclidean space, n-dimensional Projective space ও n-dimensional Riemannian space-এর বহু তথ্য আহরণ করা যাইতে পারে। বহুমাত্রিক 'দেশে'র গবেষণা প্রকৃতপক্ষে System of linear homogeneous and non-homogeneous Equation-এর গবেষণা ছাড়া আর কিছুই নয়। Tensor-analysis-ই n-dimensional Riemannian Space-এর ভিতরে প্রবেশ করিবার একমাত্র বাহন। বহুমাত্রিক 'দেশের' গবেষণা বহুদিন পর্যন্ত "Mathematician's delight"-এর পর্যায়ভুক্ত ছিল। ত্রিমাত্রিক ইউক্লিডীয় 'দেশে'র অনুকরণে গাণিতিকেরা চতুর্মাত্রিক ইউক্লিডীয় 'দেশে'র কল্পনা করেন; ইহার জ্যামিতিক ধর্মগুলিও বীজগণিতের সাহায্যে বাহির করেন। ত্রিমাত্রিক ইউক্লিডীয় 'দেশে'র গোলক (Sphere) ও ঘনকের (Cube) মত চতুর্মাত্রিক ইউক্লিডীয় 'দেশে' Hypersphere ও Hypercube (Tesseract)-এর কল্পনা করেন। চতুর্মাত্রিক ইউক্লিডীয় 'দেশে'র বহু রোমাঞ্চকর ধর্ম ও ঘটনাবলীর দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া জার্মান আধ্যাত্মবাদী গণিতজ্ঞ Zöllner চতুর্মাত্রিক 'দেশে'র ধারণাকে তাঁহার আধ্যাত্মবাদ প্রচারে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিশুদ্ধ জ্যামিতির দিক দিয়া বিচার করিলে বহুমাত্রিক 'দেশে'র ধারণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ 'দেশে'র মাত্রা যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই নূতন নূতন রেখা ও তলের ধারণা জন্মিবে এবং নূতন নূতন জ্যামিতিক ধর্ম আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। জ্যামিতির পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভে বহুমাত্রিক 'দেশে'র ধারণা অপরিহার্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বহুমাত্রিক 'দেশে'র ধারণার বাস্তব প্রয়োজনও আছে। আইনষ্টাইন চতুর্মাত্রিক রিমানীয়ান 'দেশে'র ব্যবহার করিবার পর সমস্ত বৈজ্ঞানিক-মহলে আলোড়নের সৃষ্টি হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, বহুমাত্রিক 'দেশে'র ব্যবহার করিলে হয়তো আরও অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হইবে। সত্য সত্যই তাহা ঘটিল। রসায়নশাস্ত্রে পারমাণবিক বিন্যাস ব্যাখ্যা করিতে চতুর্মাত্রিক 'দেশে'র ব্যবহার প্রয়োজন; কারণ এই 'দেশে' পাঁচটি বিন্দুকে পরস্পর সমান দূরত্বে রাখিয়া সজ্জিত করা যাইতে পারে। পদার্থ-বিজ্ঞানে Polarisation of light-এর ব্যাখ্যা করিতেও অনেক সময় চতুর্মাত্রিক 'দেশে'র ধারণা দরকার। তাহা ছাড়া, বলতরঙ্গ-বাদে দুইটি তরঙ্গের intersection-এর চিত্ররূপ দিতে হইলে ত্রিমাত্রিক 'দেশে' কাজ চলে না, ষড়মাত্রিক 'দেশের' ধারণার প্রয়োজন। তাই আজ বৈজ্ঞানিকদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বহুমাত্রিক

'দেশে'র -গবেষণা হইতেই অনেক ঘটনার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হইবে।

আধুনিক বিশুদ্ধ গণিতের এক উচ্চতম শাখা Topology। ইহা Algebra, Geometry ও Analysis-এর অপূর্ব সংমিশ্রণ। জ্যামিতির সহিত ইহার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়াই আমরা এখানে ইহার চিন্তাধারার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দিব। যে সমস্ত জ্যামিতিক ধর্ম Group of continuous transformation-এ নিত্য থাকে, তাহাই এই বিজ্ঞানের উপজীব্য বিষয়। এই নব্যবিজ্ঞান যদিও সম্প্রতি গণিতজ্ঞদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, ইহার উৎপত্তি কিন্তু রিমানের সময়ে। রিমান Theory of Function-সংক্রান্ত গবেষণার সময় "Reversibly unique continuous point transformation"-সম্বন্ধে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার এই গবেষণা হইতে যে শাস্ত্র গড়িয়া উঠিল, তাহার নাম "Analysis Situs"। ইহার উপজীব্য বিষয় হইল, কোন্ কোন্ জ্যামিতিক ধর্মসমূহ শুধু অবস্থানের উপর নির্ভর করে, আকৃতির উপর নহে। রিমানের হাতে শাস্ত্রটি Analysis-এর পর্যায়েই রহিয়া গেল। ইহার জ্যামিতিক গবেষণা আরম্ভ হইল জার্মান গাণিতিক Mobius-এর হাতে পড়িয়া। তিনি "Reversibly unique continuous distortion"-এ কোন্ কোন্ জ্যামিতিক ধর্মসমূহ নিত্য থাকে, সেই সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং "Elementarily related figures বা "Homeomorphic" figures-এর ধারণার সৃষ্টি করেন। তলসম্পর্কিত গবেষণায় তিনি "One-sided" ও "Two-sided" Surface-এর পার্থক্য বাহির করেন। Euler-এর Polyhedron Theorem Topology-তে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার বক্তব্য এই যে, কোন Polyhedron-এ $E+F=K+2$, যেখানে $E \equiv$ Corners, $K \equiv$ edges, $F \equiv$ Faces। Analysis situs-এর প্রয়োগ পদার্থ-বিজ্ঞানে, বিশেষ করিয়া Potential Theory-তে অপরিহার্য। Topology-কে সমস্ত গণিত-শাস্ত্রের সর্বোচ্চ শিখর বলা যাইতে পারে। ইহার গবেষণা আজকাল অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। ফলিত বিজ্ঞানে ইহার প্রয়োগের সম্ভাবনা আছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের দৃঢ় ধারণা।

মেট্রিক পদ্ধতির নূতন মানদণ্ড

'ভারত সহ পৃথিবীর প্রায় ৮০টি দেশে যে মেট্রিক পদ্ধতি চালু রয়েছে, তার গোড়ায় ছিল প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়ামের একটি বাট। ১৮৮৯ সালে প্রায় সমগ্র পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা প্যারিসের এক বৈঠকে মিলিত হয়ে স্থির করেন যে, এই বাটের যা দৈর্ঘ্য, তাই এক মিটার বলে মেনে নেওয়া হবে। এ-থেকে ইঞ্চির হিসাবও করা যাবে।

বাটখানা রাখা হলো প্যারিসের নিকটবর্তী সেভার্স বিজ্ঞান মন্দিরে—শূন্য ডিগ্রী (সেন্টিগ্রেড) তাপমাত্রায়। বায়ুমণ্ডলের তাপের পরিবর্তনে যাতে এর দৈর্ঘ্যের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি না ঘটে, সে জন্যে এই সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। তদবধি দৈর্ঘ্যের মান হিসাবে এই বাটখানাই পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত হয়ে এসেছে।

৭১ বছর ঠাণ্ডাঘরে কাটিয়ে এবং পৃথিবীর সর্বত্র দৈর্ঘ্যের আদিগুরুরূপে গণ্য হয়েও আজ সেই প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়ামের বাটখানা কোন যাদুঘরে আশ্রয় নিতে চলেছে।

ওজন-বাটখারা ও দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন গত ১৫ই অক্টোবর প্যারিসে ঘোষণা করেছেন যে, মহাকাশ-পরিক্রমার যুগের প্রয়োজন মিটাতে হলে দৈর্ঘ্য ও সময়ের নতুন মান স্থির করতে হবে। সে মানও তাঁরা স্থির করে ঘোষণা করেছেন যে, অতঃপর বায়ুহীন আধারে রাখা ক্রিপ্‌টন-৮৬ গ্যাসের একটি পরমাণু থেকে বিচ্ছুরিত ১৬৫০৭৬৩.৭৩টি তরঙ্গই হবে এক মিটারের অবিসম্বাদিত মান।

সময়ের মান সেকেণ্ড সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেছেন যে, একদিনের ৮৬৪০০তম অংশকে একটি সেকেণ্ড বলে গণ্য করবার রীতি বদলে দেওয়া হচ্ছে এবং ১৯০০ সালের মোট সময়ের ৩১৫৫৬৯২৫.৯৭৪তম অংশকেই একটি সেকেণ্ড বলে গণ্য করা হবে।

সাধারণ লোকের জন্য মিটার ও সেকেণ্ড অপরিবর্তিত রয়ে গেল—কিন্তু, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সিদ্ধান্তটি ঐতিহাসিক বলে তাঁরা ঘোষণা করেছেন।

তাঁরা বলেছেন, মহাকাশে রকেট প্রেরণের কালে যদি এক ইঞ্চির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগও ভুল থাকে, তবে সে রকেট চন্দ্রলোকে না গিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরে চলে যাবে।

মেরুমণ্ডলের তুষারস্তূপের নীচ দিয়ে সাবমেরিন চালিয়ে যাবার কালে এই ধরণের ভুলের ফল আরও মারাত্মক হবে। এক ইঞ্চির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগই হলো ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্য, যা প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম বাট দিয়ে নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা সম্ভব।

কিন্তু, ক্রিপ্‌টন-৮৬ পরমাণুর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সহায়তায় এক ইঞ্চির দশ কোটি ভাগের এক ভাগও পরিমাপ করা সম্ভব হবে। ক্রিপ্‌টনের একটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলতে বুঝায় এক ইঞ্চির দু-কোটি ভাগের এক ভাগ।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অক্টোবর—১৯৬০

১৩শ বর্ষ ঃ ১০ম সংখ্যা
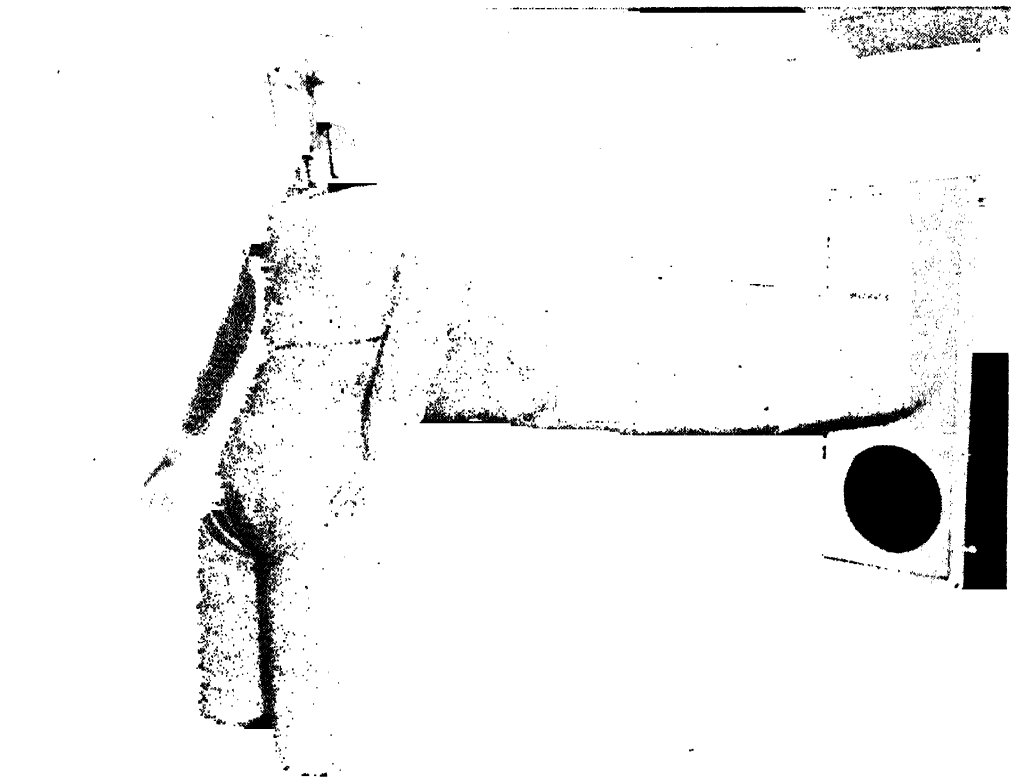
তেজস্ক্রিয় পদার্থ লইয়া কাজ করিবার সময় কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য হারওয়েলের (ইংল্যাণ্ড) পরমাণু-বিজ্ঞানীরা এই অদ্ভুত পোষাকটি প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পোষাকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ করিলে তেজস্ক্রিয়তা হইতে কোন দৈহিক ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকে না।

জীব-জগতে অভিযোজন

উদ্ভিদ এবং প্রাণী—এদের নিয়েই জীব-জগৎ। এই জীবজগতের সবাইকেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে, অর্থাৎ মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়। এভাবে চলবার নামই অভিযোজন। জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে অভিযোজন একান্ত প্রয়োজন। যে প্রাণী অথবা যে উদ্ভিদ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে অভিযোজন করতে পারে না, জীবন সংগ্রামে সেই সব প্রাণী বা উদ্ভিদের টেঁকা দায়। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্য বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

প্রথমে প্রাণী-জগতের অভিযোজনের কথা বলি। কত রকমের প্রাণী যে এই পৃথিবীতে বিচরণ করছে, তার ইয়ত্তা নেই। কেউ ডাঙ্গায় বাস করছে, কেউ জলে বিচরণ করছে, কেউ বা আবার দিব্যি আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। জলে, স্থলে, আকাশে—যেখানেই প্রাণীরা বাস করুক না কেন, তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই পরস্পরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি পার্থক্য লক্ষিত হয়। অভিযোজনের জন্যেই এসব পার্থক্য।

জলে বাস করে মাছ। জলের মধ্যে চলবার জন্যে মাছের আছে পাখ্‌না। জলের মধ্যে দ্রুতগতিতে চলবার সুবিধা হবে বলে মাছের আকৃতি অনেকটা টর্পেডোর মত। বাতাসের অক্সিজেন গ্যাস জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। নিঃশ্বাসে সেই দ্রবীভূত অক্সিজেন নেবার জন্যে মাছের আছে ফুল্‌কা। মাছের এই আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণ আর কিছুই নয়—অভিযোজন।

পাতিহাঁস ডাঙ্গায় ঘুরে বেড়ায় আবার জলেও চরে বেড়ায়। জলের মধ্যে সাঁতার কাটবার সুবিধা হবে বলে পাতিহাঁসের পায়ের আঙুল পাত্‌লা চামড়া দিয়ে জোড়া। এদের গায়ের পালক বেশ তৈলাক্ত। কারণ আর কিছুই নয়—জলে যাতে না ভিজে, তার জন্যেই অভিযোজনের ফলে এই অবস্থা হয়েছে।

ব্যাং, কুমীর—এরা মাছ না হলেও জলে বাস করে। এরা ফুস্‌ফুসের সাহায্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। নিঃশ্বাস নেবার জন্যে এদের নাকের গর্ত মুখের ডগার উপরের দিকে অবস্থিত। এরা যখন জলে ডুবে থাকে, তখন এদের নাকের ছিদ্র দুটি জলের উপরে বের করে রাখে। এদের নাকের ছিদ্রের মধ্যে আবার কপাটিকা আছে। জলে ডুবে থাকবার সময় কপাটিকা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নাকের মধ্যে জল ঢুকতে পারে না।

পাখীরা আকাশে ওড়ে। উড়তে হলে দেহ হাল্কা হওয়া চাই। তাই ওদের দেহের হাড়গুলি ফাঁপা। পায়ের আঙুলে তীক্ষ্ণ নখ। ঐ নখের সাহায্যেই ওরা গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে বসে থাকে।

ডাঙ্গার প্রাণীদের মধ্যেও অভিযোজনের জন্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেক। অভিযোজনের ফলেই এসব পার্থক্য বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করেছে। ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি প্রাণীর পায়ের ক্ষুর, মাংসাশী প্রাণীদের মুখে মাংস কাটবার উপযোগী শ্বদন্ত, তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য পেষণের জন্যে ভোঁতা ও চওড়া দাঁত, গরু, মোষ, হরিণ প্রভৃতি প্রাণীদের শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শিং, অভিযোজন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই ফল।

মরুভূমিতে জল কদাচিৎ পাওয়া যায়। উটের বাস মরুভূমিতে। তাই উটের পাকস্থলীতে জল সঞ্চয় করে রাখবার ব্যবস্থা আছে। আবার মরুভূমির বালির উপর দিয়ে যাতে চলতে কোন অসুবিধা না হয়, সে জন্যে উটের পা চ্যাপ্টা। মরুভূমিতে মাঝে মাঝে বালির ঝড় ওঠে। বালির ঝড় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে উটের নাকে থাকে ঢাক্‌না।

গাছের পাতা খেয়েই জিরাফ বেঁচে থাকে। উঁচু গাছের পাতা সহজেই নাগাল পাওয়া যায়, সে জন্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন ও অভিযোজনের ফলে হয়েছে জিরাফের গলাটি খুবই লম্বা। ইঁদুর, ছুঁচো প্রভৃতি প্রাণীরা বাস করে গর্তে। তাই এদের পায়ের নখগুলি বেশ বড় এবং গর্ত খোঁড়বার উপযোগী।

আবার অনেক প্রাণী আছে, যারা ইচ্ছামত নিজের দেহের রং বদ্‌লে অথবা পরিবেশের রঙের সঙ্গে নিজের দেহের রং মিলিয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। বহুরূপী সরীসৃপ ইচ্ছামত দেহের রং বদ্‌লাতে পারে। আবার জেব্রা, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার প্রভৃতি জন্তুরা যখন বনের মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করে, তখন আলোছায়ার ফাঁকে তাদের অস্তিত্ব বোঝাই দায়।

শামুক, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীদের দেহ নরম। নরম দেহটাকে বাঁচাবার জন্যে তাদের দেহের উপরে আছে শক্ত একটা আবরণ। আত্মরক্ষার দরকার হলে নরম দেহটাকে ওরা ওই শক্ত খোলের মধ্যে গুটিয়ে নেয়। প্রাণী-জগতের এমনি আরও অনেক বিচিত্র অভিযোজনের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

এবার বলি উদ্ভিদ-জগতের অভিযোজনের কথা। উদ্ভিদের পরম শত্রু হচ্ছে তৃণভোজী প্রাণী। এসব প্রাণীদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্ভিদের দেহে বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা আছে। কারুর গায়ে কাঁটা, কারুর ছাল তেতো, কারুর দেহ দুর্গন্ধ যুক্ত, আবার কারুর দেহে আছে বিষাক্ত লোম। সিনকোনা গাছের (যার ছাল থেকে তৈরি হয় ম্যালেরিয়া জ্বরের ওষুধ কুইনাইন) ছাল খুব তেতো। তাই প্রাণীরা ঐ গাছ খেতে চায় না। ফণিমনসার দেহ কাঁটায় ভরা; প্রাণীরা তাই ভয়ে ফণিমনসার কাছে ঘেঁষে না। শিয়ালকাঁটা, বাব্‌লা, বেল প্রভৃতিরও তাই। গ্যাঁদাল, তুলসী, পুদিনা প্রভৃতি গাছের নিজস্ব গন্ধের জন্যে প্রাণীরা তাদের কাছে যায় না। আকন্দ,

ভেরেণ্ডা প্রভৃতি গাছের ভিতরে আছে বিষাক্ত রস। ঐ বিষাক্ত রসই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে প্রাণী-শত্রুদের হাত থেকে।

জীবন-সংগ্রামে বেঁচে থাকতে হলে উদ্ভিদের দুটি জিনিষ চাই-ই—জল আর আলো। এই দুটি জিনিষ পাওয়ার জন্যেও উদ্ভিদকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তাই উদ্ভিদকে মাটির নীচে মূল চালিয়ে দিয়ে জল সংগ্রহ করতে এবং আলো পাওয়ার জন্যে কাণ্ডটিকে উপরের দিকে চালিয়ে দিতে হয়েছে।

প্রাণীদের মত বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যেও অভিযোজনের ফলে বহুবিধ বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন, জলজ উদ্ভিদ জলে ভেসে থাকবার জন্যে দেহের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বায়ু আটকে রাখে। এদের পাতার রন্ধ্রগুলি থাকে পাতার উপরের ত্বকে। এদের কাণ্ড সাধারণতঃ নরম ও ফাঁপা হয়ে থাকে।

ডাঙ্গার উদ্ভিদের অনেকের অতিরিক্ত মূল বেরোয় কাণ্ড থেকে। এই মূলের নাম অস্থানিক মূল। অস্থানিক মূলের কাজ হচ্ছে, উদ্ভিদের শাখা-প্রশাখার ভার বহন করা। বট ও কেয়ার অস্থানিক মূল দেখা যায়। ডাঙ্গায় অনেক লতানে উদ্ভিদ আছে, যারা আকর্ষের সাহায্যে অন্য বড় গাছকে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে উপরে ওঠে—আলো ও বাতাসের সন্ধানে। যেমন লাউ বা কুমড়োর আকর্ষ। অর্কিড জাতীয় অনেক উদ্ভিদ বায়বীয় মূলের সাহায্যে বাতাস থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে। মরুভূমির উদ্ভিদের মূল সাধারণতঃ খুব লম্বা হয়ে থাকে। কারণ জলের সন্ধানে এদের মূলকে মাটির নীচে অনেক দূরে পাঠাতে হয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা ভিন্ন জীব-জগতের কারুরই বেঁচে থাকবার কোন উপায় নেই। জীব-সৃষ্টির পথে অনেক জীব—যারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে নি, তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এমন অবলুপ্তির দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

শ্রীঅমরনাথ রায়

ঘড়ির কাহিনী

(কথায় ও চিত্রে)

১। ঘড়ি—ঠিকভাবে সময় জানবার বাসনা মানুষের বহুকাল থেকেই ছিল। সময় স্থির করবার জন্যে চেষ্টাও করেছে সে নানাভাবে। তাদের সেই চেষ্টা আংশিক সাফল্য লাভ করেছিল—তবে তার মধ্যে ত্রুটি ছিল অনেক। কিন্তু মানুষ সহজে কোন কিছুতেই হার মানে নি কোন দিন। সময়ের সূক্ষ্ম হিসাব রাখবার চেষ্টা

চলতে থাকে। ১৮০০ সালের শেষের দিকে মানুষের এই আশা বাস্তবে রূপায়িত হয়। রবার্ট এইচ. ইঙ্গারসল নামক একজন আমেরিকান পকেট ঘড়ি তৈরী করে বাজারে ছাড়েন। ইঙ্গারসল ছিলেন দোকানের একজন বিক্রেতা। একটা কথা প্রচলিত

১নং চিত্র

আছে যে, ইঙ্গারসলের ঘড়ির জন্যেই নাকি ডলারের খ্যাতি বেড়ে গিয়েছিল এবং তাঁর চেষ্টার ফলেই প্রত্যেক মানুষের পকেটে তখন একটা করে ঘড়ি রাখা সম্ভব হয়েছিল।

২। আদিম মানবের সময় নিরূপণ—আদিম মানব সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে একটা দিন হিসাবে গণ্য করতো। এটাই ছিল তাদের সোজা হিসাব। তারা

২নং চিত্র

আরও জানতো যে, সারা বছরে আবহাওয়ার কয়েকবার পরিবর্তন হয় এবং দিনের দৈর্ঘ্যের পরিমাণও কম-বেশী হয়। এই আবহাওয়ার পরিবর্তনকে তারা ঋতু হিসাবে গণ্য করতো। সময়ের বিভাগ, যেমন—ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিল না; তাছাড়া এসবের কোন প্রয়োজনও তাদের তখন ছিল না। রাত্রি

হলেই তারা ঘুমাবার জন্যে শুয়ে পড়তো এবং দিনের বেলায় খাদ্যের সন্ধানে শিকারে বেরিয়ে পড়তো।

৩। সময় নিরূপণের প্রথম প্রচেষ্টা—মানব-সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শুধু দিন-রাত্রির হিসাব ধরে কাজ চালাতে গিয়ে নানারকম অসুবিধা হতে থাকে। সে জন্যে সময়কে ভাগ করা এবং তা নিরূপণ করবার প্রয়োজন দেখা দেয়। তারা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় মাপবার চেষ্টা করতে থাকে। দিন মাপবার জন্যে তারা যে সব পন্থা প্রথম বের করেছিল, তার মধ্যে ছড়ি বা লাঠির সাহায্যে সময় নিরূপণ করাই ছিল

৩নং চিত্র

প্রধান। একটা লাঠিকে খাড়াভাবে পুঁতে তার ছায়া দেখে সময় স্থির করতো। আকাশে সূর্যের অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লাঠির ছায়ার স্থানেরও পরিবর্তন হতো। মধ্যাহ্নের পূর্বে লাঠির ছায়া হতো ছোট এবং পরে হতো লম্বা। অনেক সময় নির্দিষ্ট ব্যবধানে পর পর পাথর বসিয়েও সময় নিরূপণ করা হতো।

৪নং চিত্র

৪। ঘণ্টা—খৃষ্টপূর্ব ১২০০ বছরেরও কিছু আগে ব্যাবিলোনিয়ার অধিবাসীরা

দিনকে ঘণ্টার হিসাবে ভাগ করে নিয়েছিল। তারা ছায়াঘড়ি বা সূর্যঘড়ি নামে এক ধরণের ঘড়ি তৈরী করে। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে বা মেঘাচ্ছন্ন দিনের বেলায় এই ঘড়ি দিয়ে কাজ চলতো না। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে মানুষ চেষ্টা করতে থাকে—অন্য কোন কায়দায় সময় নিরূপণ করা সম্ভব কিনা। এই চেষ্টার ফলে মানুষ দাগকাটা মোমবাতি এবং গেঁড়োবাঁধা দড়ির সাহায্যে ঘণ্টা হিসাবে সময় মাপবার কৌশল আবিষ্কার করে। মোমবাতি বা দড়ি জ্বালিয়ে তারা ঘণ্টার হিসাব করতো, অর্থাৎ এক দাগ বা এক গেঁড়ো থেকে আর এক দাগ বা গেঁড়ো পর্যন্ত পুড়ে যাওয়ার সময়কে এক এক ঘণ্টা হিসাবে ধরতো।

৫। জলঘড়ি—আরও সহজভাবে সময় নিরূপণ করবার জন্যে মানুষ তৈরী করলো জলঘড়ি। জলঘড়ির সাহায্যে মানুষ বহু দিন ধরে সময় নিরূপণ করেছে। একটা ছোট পাত্র গামলায় জলের উপর ভাসিয়ে দেওয়া হতো, আর ঐ পাত্রের তলায় থাকতো ছোট্ট একটা ছিদ্র। ঐ ছিদ্র দিয়ে জল ধীরে ধীরে ছোট পাত্রটার মধ্যে ঢুকতো এবং জলে ভর্তি হয়ে গেলে পাত্রটা গামলার জলে ডুবে যেত। পাত্রটার জলে ভর্তি হওয়া থেকে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত সময়ের একটা নির্দিষ্ট হিসাব ছিল। নানারকমের জলঘড়ির প্রচলন ছিল।

৫নং চিত্র

সব চেয়ে ভাল জলঘড়ি তৈরী হতো এভাবে—একটা জলপূর্ণ গামলায় ছিদ্রযুক্ত একটা ছোট পাত্র ভাসিয়ে দেওয়া হতো। ছোট পাত্রটার মধ্যে থাকতো সময় নির্দেশক একটা কাঁটাযুক্ত ভাসমান বস্তু, আর কতকগুলি নির্দিষ্ট দাগকাটা থাকতো সময় নিরূপণের জন্যে। ছোট পাত্রটায় জল ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটাটাও এক দাগ থেকে আর এক দাগে পৌঁছাতো। এক দাগ থেকে আর এক দাগে পৌঁছাবার সময়টা নির্দিষ্ট থাকতো।

৬। কাচঘড়ি বা আওয়ার গ্লাস—তারপর নির্মিত হলো কাচঘড়ি বা আওয়ার গ্লাস। আওয়ার গ্লাস তৈরী করা হতো পরস্পর সংযুক্ত দুটা কাচপাত্র দিয়ে। কাচপাত্র দুটার সংযোগ-স্থল হতো খুব সরু। উপরের পাত্রটা বালি দিয়ে ভর্তি করা হতো। সেই বালি সরু ছিদ্রপথে আস্তে আস্তে নীচের পাত্রে গিয়ে জমা হতো। উপরের পাত্র থেকে বালি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সময়টাও নির্দিষ্ট থাকতো।

উপরের পাত্রের বালি একেবারে শেষ হয়ে গেলে—তা দেখে সময় নির্ণীত হতো।

৬নং চিত্র

এই আওয়ার গ্লাস বা কাচঘড়ি বহুদিন প্রচলিত ছিল। উপরের পাত্রের বালি ফুরিয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে পাত্রটিকে উল্টে দিতে হতো।

৭। প্রথম ঘড়ি—অনেকের মতে, ৯৯০ খৃষ্টাব্দে অরিল্যাকের গারবার্ট নামে একজন ফরাসী ধর্মযাজক প্রথম যান্ত্রিক ঘড়ি তৈরী করেন। তিনি পরে দ্বিতীয় পোপ সিলভেষ্টার নামে পরিচিত হন। এই ঘড়িতে একটা ভারবাহী শিকল সংযুক্ত থাকতো।
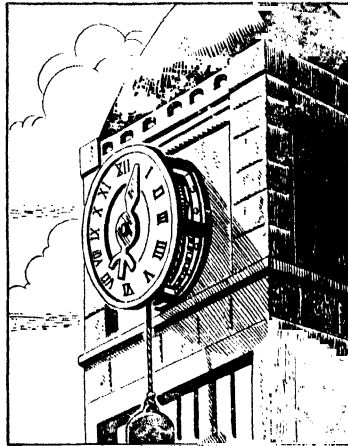
৭নং চিত্র

ভারের টানে ঘড়ির যন্ত্র কাজ করতো। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও গারবার্টের ঘড়ির নির্মাণ-কৌশল জানা সম্ভব হয় নি। গারবার্টের ঘড়ির সাহায্যে নিখুঁতভাবে সময় জানা যেত না। কিন্তু ঘড়ির ক্রমোন্নতির ইতিহাসে গারবার্টের দান অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময়ে বহু মঠে এই যান্ত্রিক ঘড়ি ব্যবহৃত হতো।

৮। পেণ্ডুলাম—১৫৮১ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও একদিন এক গীর্জার বারান্দায়

অপেক্ষা করছিলেন। তখন তিনি লক্ষ্য করেন যে, একটা ঝুলন্ত বাতির ঝাড় মৃদু বাতাসে দুল্‌ছে এবং প্রত্যেক বারই দোলনের গতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়। প্রায় ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও এই দোলক বা পেণ্ডুলামের সূত্র ঘড়ি নির্মাণে প্রয়োগ করেন। ঘড়িতে পেণ্ডুলাম ব্যবহারের ফলে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয় এবং

৮নং চিত্র

প্রায় সূক্ষ্মভাবে সময়ের পরিমাপ করা সম্ভব হয়। ঘড়ির যন্ত্রের চাকা যাতে প্রতি বার দোলনে এক খাঁজের বেশী ঘুরতে না পারে—তার জন্যে Excapement-এর ব্যবস্থা করা হয়। মোটের উপর পেণ্ডুলাম ঘড়িকে নিখুঁত সময় নির্দেশক বলা যায়।

৯। হেন্‌লিনের ঘড়ি—ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মেনীর পিটার হেন্‌লিন প্রথম স্প্রিং-চালিত ঘড়ি তৈরী করেন। হেন্‌লিনের ঘড়িকে বলা হতো 'ন্যুরেমবার্গের ডিম'।

৯নং চিত্র

এই ঘড়ি ছিল ডিম্বাকৃতিম্, আর হেন্‌লিন বাস করতেন ন্যুরেমবার্গ সহরে। সে জন্যেই ঘড়ির এই অদ্ভুত নাম দেওয়া হয়েছিল। হেন্‌লিনের ঘড়ি একেবারে নিখুঁত না

হলেও—ঘড়ির ক্রমোন্নতিতে এর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরে অনেকের চেষ্টার ফলে স্প্রিং-চালিত স্বয়ংক্রিয় ঘড়ির আরও উন্নতি সাধিত হয়।

১০। ঘড়ি-শিল্প—ছোট-বড় নানা রকমের ঘড়ি ক্রমশঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তৈরী হতে থাকে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড এবং পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রে ঘড়ির কারখানা স্থাপিত হয়। প্রথম দিকে কারখানায় যে সব ঘড়ি তৈরী হতো, সেগুলি

১০নং চিত্র

নিখুঁত ছিল না এবং তার দামও ছিল খুব বেশী। কেবল ধনীরাই ঘড়ি ব্যবহার করতো। প্রায় ১৮২০ খৃষ্টাব্দে সুইস্‌রা অন্যান্য দেশের তুলনায় ব্যাপক হারে ছোট-বড় নানা রকমের ঘড়ি তৈরী করতে আরম্ভ করে এবং ঘড়ির নানা দোষ-ত্রুটিও ক্রমে ক্রমে দূর করা সম্ভব হয়।

১১নং চিত্র

১১। যুক্তরাষ্ট্রে ঘড়ির কারখানা—১৮৫০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ঘড়ি তৈরীর কারখানা

স্থাপিত হয়। এর আগেও অবশ্য কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছিল—কিন্তু সে চেষ্টা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নি। বিভিন্ন ঘড়ি-নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কম দামের নানারকম ঘড়ি তৈরী করতে থাকে।

১২। ইঙ্গারসল—যাঁদের দ্বারা ঘড়ির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রবার্ট এইচ. ইঙ্গারসলের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮৫৯ সালে এক আমেরিকান কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি পৈত্রিক খামারের

১২নং চিত্র

কাজ ছেড়ে নিউইয়র্ক সহরে একটা ছোট রবার ষ্ট্যাম্প তৈরীর দোকান স্থাপন করেন। পরে সস্তা দামে ব্যবহারোপযোগী ঘড়ি তৈরীর চেষ্টা করতে থাকেন এবং তার চেষ্টা সাফল্য লাভ করে।

১৩নং চিত্র

১৩। ইঙ্গারসলের উদ্দেশ্য, সততা ও অধ্যবসায়ের গুণে খুব তাড়াতাড়ি তাঁর

ব্যবসায় প্রসার লাভ করে এবং ১৮৮০ সালের মধ্যেই প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর চেষ্টা চলতে থাকে কম দামের ভাল ঘড়ি তৈরী করবার জন্যে। যদি এই চেষ্টায় তিনি সফল হন—তাহলে সেই ঘড়ির বাজার হবে পৃথিবীব্যাপী। তিনি জানতেন যে, কোন কোন আমেরিকান ঘড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সস্তা দামের ভাল ঘড়ি তৈরীর ক্ষমতা আছে, কিন্তু এ-রকম কোন উদ্দেশ্য তাদের ছিল না।

১৪। ইঙ্গারসলের ঘড়ি—১৮৯২ ইঙ্গারসল এক নতুন ধরণের ঘড়ি (Watch-clock) তৈরী করেন এবং তার বিক্রয়ও হয় খুব। তারপর তিনি তৈরী করেন বিশ্ববিখ্যাত 'ইঙ্গারসল পকেট ঘড়ি।' এই ঘড়ি আকৃতিতে ছোট, দামে সস্তা এবং সময়ও জানা
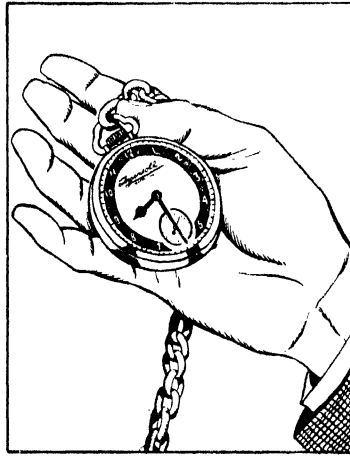
১৪নং চিত্র

যেত সঠিকভাবে। সারা পৃথিবীতে ৭০,০০০,০০০-এরও বেশী এই ঘড়ি বিক্রীত হয়।

১৫নং চিত্র

১৫। ঘড়ির বর্তমান যুগ—বর্তমানে ঘড়ির উন্নতি হয়েছে কল্পনাতীত। মান-

মন্দিরের ঘড়ির সময় নিরূপিত হয় নক্ষত্রের সাহায্যে—যা বিশ্বাস করাই কঠিন। সময়ের পরিমাপও একেবারে নিখুঁত। রেডারের সাহায্যে সেকেণ্ডের $\frac{১}{৩০,০০০,০০০}$ ভাগ সময়ও পরিমাপ করা সম্ভব হচ্ছে। প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের মধ্যে 'সময় জ্ঞানে'র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে এবং সে জন্যে সে চেষ্টাও করেছে নানাভাবে। যুগ যুগ ধরে তার সে চেষ্টাই রয়েছে বর্তমানে সাফল্যের মূলে।

বিবিধ

ভেষজ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

লণ্ডনের অধ্যাপক পিটার ব্রায়ান মেডাওয়ার ও অষ্ট্রেলিয়ান অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক ম্যাকফার্লিন বার্নেটকে যুক্তভাবে ভেষজ-বিজ্ঞানে ১৯৬০ সালের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

অধ্যাপক বার্নেট মেলবোর্নের ভেষজ গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ওয়াল্টার অ্যাণ্ড এলিজা হল ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর।

এই বৎসর এই পুরস্কারের পরিমাণ প্রায় ১৫,৫৮৫ পাউণ্ড স্টার্লিং।

আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকী দিবস আগামী ১০ই ডিসেম্বর তারিখে এই পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে।

মহাশূন্যে ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা

গ্রহান্তরে যাত্রার পথে মহাশূন্যে ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা রচনার তোড়জোড় অনেক দিন থেকেই চলছে। সম্প্রতি আমেরিকায় এর একটি পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে। পরিকল্পনাটি রচনা করেছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ক্র্যাফ্‌ট্‌ এ-এন্‌রিকো। এই ঘাঁটি নির্মাণের উপকরণসমূহ স্যাটার্ণ রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে প্রেরণ করবার পর সেগুলি একত্রিত করে চারটি কামরা তৈরী করা হবে। এদের মোট দৈর্ঘ্য হবে ১৪০ ফুট, ব্যাস ১০ ফুট এবং ওজন ৫০০০০ পাউণ্ড। সেখানে পরমাণু-শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হবে ও মহাশূন্য যাত্রী আটজন বৈমানিকের থাকবার জায়গা হবে। সূর্যে বিস্ফোরণ ঘটবার ফলে যে সব মারাত্মক রশ্মি নির্গত হয়, তা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এর একটি কামরাকে বিশেষভাবে সুরক্ষিত করা হবে।

মহাশূন্যের এই মানমন্দিরটি হবে একটি দ্বীপ বা মরুদ্যানের মত। এখানে গ্রহান্তর যাত্রী বৈমানিকদের নির্বাচন, তাদের বায়ু ও খাদ্য সরবরাহ এবং জীবন রক্ষার অন্যান্য ব্যবস্থাদি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হবে।

রক্তক্ষরণ বন্ধ করবার অভিনব ভেষজ

ক্যালিফোর্ণিয়া—কোন কোন লোকের শরীর থেকে সামান্য আঘাতেই প্রচুর রক্তপাত হয়ে থাকে এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ করাও কঠিন হয়। ওয়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন চিকিৎসক এই রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে গবেষণা করে সম্প্রতি গবাদি পশুর রক্ত থেকে রক্ত জমাট করবার একটি পদার্থ পৃথক করতে সক্ষম হয়েছেন। মাত্র এক ধরণের রক্তক্ষরণ বা হিমোফেলিয়ার ব্যাপারেই এই জিনিষটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে গবাদি পশুর রক্ত থেকে তৈরী করা হয়েছে বলে মানুষের ক্ষেত্রে এই জিনিষটি প্রয়োগ করা না গেলেও, কি প্রকার পদার্থ যে মানুষের বেলায় প্রয়োগ করা যেতে পারে, এই আবিষ্কারের ফলে তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

সম্পাদক - শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োদশ বর্ষ | নভেম্বর, ১৯৬০ | একাদশ সংখ্যা

নির্মল বায়ুমণ্ডল

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

সারা বছরের হাড়ভাঙা খাটুনির পর যখনই একটু ছুটিছাটার অবসর মেলে, সঙ্গতিশীল অনেকেরই মন তখন চঞ্চল হয়ে ওঠে, বাইরে কোথাও বেরিয়ে পড়বার জন্যে—বিশেষতঃ সমুদ্রের বেলাভূমি বা শৈলশিখরের নৈসর্গিক শোভার মধ্যে ছুটে গিয়ে অনেকেই একটু বিরাম ও শান্তি উপভোগ করতে চায়। অনেকেরই অবচেতন মনে স্বাস্থ্য-পরিচর্যার কথাটাও উঁকিঝুঁকি মারে বৈকি! সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয়ের মনোমুগ্ধকর কিরণ-ধারায় স্নান করবার জন্যে অনেকেই উন্মুখ হয়ে উঠে। সূর্যের কিরণের সঙ্গে প্রাণচাঞ্চল্যের যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান, সে কথা জানতে হলে সেই কিরণের স্বরূপ বিচার করতে হবে সুরুতেই।

ধরিত্রীর বুকে যাবতীয় শক্তির উৎস হচ্ছে সূর্য—তার কিরণধারায় নেমে আসছে সেই শক্তির প্রবাহ। এই কিরণধারার যাবতীয় শক্তি-তরঙ্গ আমাদের চোখে প্রতিভাত হয় না; দৃশ্য আলোক-তরঙ্গগুচ্ছ প্রত্যক্ষ হয় মাত্র। কিন্তু সেই তরঙ্গগুচ্ছের উভয় পার্শ্বে যে সব বৃহৎ ও ক্ষুদ্র তরঙ্গসমূহ অবস্থান করে, সেগুলি আমাদের কাছে অপ্রত্যক্ষ রয়ে যায়; কাজেই সেগুলিকে অদৃশ্য তরঙ্গ বলে অভিহিত করা হয়। দৃশ্য শ্বেত আলোকের বর্ণালী বিশ্লেষণ করলে তার এক প্রান্তে লোহিত ও অপর প্রান্তে বেগুনী বর্ণের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। লোহিত তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ ছোট হতে হতে রামধনুর মত বিভিন্ন বর্ণের ভিতর দিয়ে ক্ষুদ্রতর বেগুনী বর্ণের প্রান্তে এসে পৌঁছায় দৃশ্য আলোকের বর্ণালী। লোহিত তরঙ্গ উজিয়ে গেলে তদপেক্ষা বৃহৎ বৃহৎ শক্তিতরঙ্গের উপস্থিতি যন্ত্রযোগে ধরা পড়ে এবং এদের বলা হয় অবলোহিত রশ্মি-তরঙ্গমালা বা লাল-উজানী আলো (Infra-red rays)। রেডিও-তরঙ্গ ও সাধারণ তাপ-তরঙ্গ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অবলোহিত রশ্মির তরঙ্গ-মালা বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পে শোষিত হয়ে জীবনধারণের উপযোগী সাধারণ তাপমাত্রা অক্ষুণ্ণ রাখে। অবলোহিত অলোক-তরঙ্গ কেবল মাত্র আমাদের দেহের ত্বকের উপরিভাগেই প্রভাব বিস্তার করে, তার নীচে দেহের অভ্যন্তরে তার অনুপ্রবেশ ঘটে না। দৃশ্য আলোক-রশ্মি কিন্তু ত্বক ভেদ করে দেহাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে

রক্তস্রোত ও তন্তুসমূহের মধ্যে শোষিত হতে পারে—যার ফলে আলোকস্পর্শে আমরা একটা সুখপ্রদ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাভাবিক সুস্থতা বোধ করি। জীবন্ত কোষের মধ্যে যখন শক্তি শোষিত হয়, তখন জীব-কোষের মধ্যেকার ইলেকট্রন-কণিকাগুলি একটা নতুন সন্নিবেশ বা একটা নতুন ভঙ্গিমায় সজ্জিত হয়—যার পরিণতিতে জৈব-রাসায়নিক যে সব প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়, প্রাণ-চাঞ্চল্যের স্পন্দনের মধ্যে তাদের উচ্ছলতা ধরা পড়ে এবং সেই উচ্ছলতার অনুভূতিতেই আমরা স্বাচ্ছন্দ্য ও সুস্থতা বোধ করি। দৃশ্য আলোকের বর্ণালীতে এক প্রান্তস্থিত বেগুনী আলোক-তরঙ্গ পার হয়ে গেলে যন্ত্র সহযোগে তদপেক্ষা যে সব ক্ষুদ্র তরঙ্গের সন্ধান মেলে, তাদের বলা হয় অতিবেগুনী বা বেগুনীপারের আলোক-তরঙ্গ (Ultraviolet rays)। রঞ্জেনরশ্মি বা এক্স-রে এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। অতিবেগুনী আলোক-তরঙ্গ ফটোগ্রাফীর ফিল্মের উপর তার প্রভাব আঁকতে পারে। এই তরঙ্গের সান্নিধানে বহুক্ষণ থাকলে ত্বকের উপর তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যাকে 'রোদে-পোড়া' (Sun-tan) বলা হয়। এর ফলে সাধারণতঃ উপরিভাগের কোষগুলি পুড়ে ধ্বংস হবার জন্যে সেখানে সূক্ষ্ম ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং তাথেকে খোসা উঠে আসে। কিন্তু এই অতিবেগুনী আলোক-তরঙ্গের প্রভাবেই রক্তকণিকাগুলি দেহাভ্যন্তরস্থিত বহুবিধ রোগ-জীবাণু ধ্বংসের ক্ষমতা অর্জন করে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, অতিবেগুনী আলোর প্রভাবেই অস্থি-র গঠন সুচারুরূপে গড়ে ওঠে এবং তা না হলে সূর্য-কিরণের অভাবে শিশুদের মধ্যে রিকেট্স্ রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। আবার এই অতিবেগুনী আলোর প্রভাবেই রক্তস্রোতে ভিটামিন-ডি-এর সৃষ্টি ত্বরান্বিত হয়ে থাকে। এই আলোক-তরঙ্গের প্রভাবে গাছপালার বৃদ্ধিও উদ্দীপিত হয় এবং পদার্থের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত নানাপ্রকার জীবাণুর বিনাশ সাধিত হয়ে থাকে। অধিকক্ষণ সংস্পর্শজনিত সামান্য একটু কোষধ্বংসী ক্ষমতা ভিন্ন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সব দিক থেকেই আমাদের জীবনধারণের পক্ষে অতিবেগুনী আলোর সৃজনশীল ও জীবাণু-ধ্বংসী প্রভাব বিশেষভাবেই কল্যাণজনক। বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা বা অন্যান্য আবর্জনা মল প্রভৃতি অতিবেগুনী আলোকের আগমন পথে বাধা সৃষ্টি করে। কাজেই সে অবস্থায় তার পরিমাণ ও গুণাবলী বিশেষ মাত্রায় হ্রাস পায়। মুক্ত আকাশতলে, সমুদ্রোপকূলে এবং শৈলশীর্ষের এলাকায় বায়ুমণ্ডলে সাধারণতঃ মলের পরিমাণ কম এবং সূর্যকিরণের প্রাচুর্যের দরুণ সে সব এলাকার অধিবাসীদের স্বাস্থ্য যথোপযুক্ত অতিবেগুনী আলোর সংস্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ইংল্যাণ্ড বা ইউরোপ ও আমেরিকায় পর্যটকদের আকর্ষণ করবার জন্যে সেখানকার অবসর-বিনোদন বা স্বাস্থ্য-উদ্ধারের অঞ্চলগুলিতে সারা বছরে সাধারণতঃ যে পরিমাণ নির্মল সূর্যকিরণ প্রত্যক্ষ করা যায় (যা ঘণ্টায় নির্দেশিত হয়), তার উল্লেখ করে বিজ্ঞাপন দেবার রেওয়াজ আছে।

অবসরান্তে যখন নাগরিকগণ শিল্পাঞ্চলের মেখলা-পরা মহানগরীর বুকে আপন আপন আবাস-স্থলে ফিরতে থাকে, দূর থেকে আকাশ-চুম্বী বিরাটকায় চিম্নী-নিঃসৃত কুণ্ডলী-পাকানো ধূম্রজাল তাদের প্রত্যাবর্তনকে সাদর অভিনন্দন জানায়। এখানে ফিরে যত খুসী স্বাচ্ছন্দ্য আর স্বাতন্ত্র্যের বড়াই করুক না কেন, একটি বিষয়ে কিন্তু নাগরিক অধিবাসিবৃন্দের স্বাধীনতা নেই—বায়ুমণ্ডলের যে বায়ু তারা প্রতিনিয়ত শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে, তার আবিলতা বা নির্মলতার উপর কোনই হাত নেই এখনও পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় জ্বালানী-গবেষণাগারের সাম্প্রতিক এক নিরীক্ষাতে নাকি প্রকাশ পেয়েছে যে, কলকাতার বায়ুমণ্ডলে প্রতিদিন গড়ে দুই টন ধূলি ও ভূষার কণিকা (অদগ্ধ কয়লার গুঁড়া বা soot) নিক্ষিপ্ত হচ্ছে

কলকারখানার চিম্‌নীর মুখে ও গৃহস্থালীতে কয়লা পোড়ানোর জন্যে। ইচ্ছা-অনিচ্ছার মাথা খেয়ে এই পরিমাণ মলের অধিকাংশই কলকাতাবাসীর শ্বাস-প্রণালীর পথে প্রতিদিন তাদের দেহাভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে ফুস্‌ফুসের উপর অযথা একটা ধূলির প্রলেপ জমে উঠছে, যার পরিণতি বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন নেই। বিগত ১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ডের টাইন নদীর তীরবর্তী নিউক্যাসল নগরীর বায়ুমণ্ডল থেকে সংগৃহীত ধূম্রজালের বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক ক্লেমো বহুবিধ জৈব পদার্থের সন্ধান পান, যার একটি হচ্ছে পাইরিন। পাইরিন থেকে ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার হতে দেখা গেছে। এসব ছাড়াও ভূষা-কণিকার অবস্থিতিতে অতিবেগুনী আলোক-তরঙ্গের আগমন পথে অন্তরায় ঘট্‌বার ফলে তার পরিমাণ সবিশেষ হ্রাস পায়। ধূম্রজালের কি মারাত্মক মহিমা!

কুয়াশা আর ধূম্রজালের সম্মিলনে যে অবস্থার উদ্ভব হয়, ইংরেজিতে তাকে বলা হয় 'স্মগ', অর্থাৎ 'স্মোক' ও 'ফগে'র সন্ধি করলে যা হয় আর কি! যাহোক, ইংল্যাণ্ডের মত শীতপ্রধান দেশে এই 'স্মগ' যে কাণ্ডটা বাঁধিয়েছিল বিগত ১৯৫২ সালে, অনেকেরই হয়তো তা স্মরণ আছে। একমাত্র লণ্ডন নগরীর বুকের উপর সেবারের সেই শীতকালীন স্মগ প্রকোপে মন্থর গতিতে চার হাজার মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। শুধু এখানেই তার শেষ নয়, মানুষের অবিবেচনা আর প্রাকৃতিক খেয়ালে এরূপ কুৎসিত ও মারাত্মক কুয়াশার (স্মগ) পুনরায় আবির্ভাব ঘটা কিছু অসম্ভব নয়।

গাছপালার রাজ্যও ধোঁয়াচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডলের হাত থেকে নিস্তার পায় না। ধূম্রজাল-বাহিত গন্ধকাম্ল বা অ্যাসিড বাষ্প জলীয় বাষ্পে শোষিত হয়ে সবুজপাতার উপর নেমে আসে, তাতে শস্যের অনিষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে—একটি রাতের অবসরে এরূপ অ্যাসিড বাষ্পের সংস্পর্শে ফুল ও পাতা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাছাড়া ভূষার-কণিকা গাছের পাতার উপরে জমে থাকলে পাতার ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে গাছপালার শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে এবং বায়ুমণ্ডল আরও কলুষিত হয়ে ওঠে। কেন না, বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাতার ছিদ্রপথে অনুপ্রবেশ করতে না পারায় যেমন শ্বাসক্রিয়ার প্রতিরোধ ঘটে, তেমনি আবার প্রশ্বাসে নির্গত অক্সিজেন গ্যাস ছিদ্রপথে বহির্গত হতে না পারায় গাছপালার শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত তো ঘটেই, অধিকন্তু বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ অবাঞ্ছিতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অক্সিজেনের পরিমাণও হ্রাস পায়। এর পরিণাম খুবই বিষময়—এর ফলে পরোক্ষভাবে মানুষ ও পশুপক্ষীর শ্বাস-প্রশ্বাসেরও অসুবিধা ঘটে।

নির্জীব জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আরও অবাক হতে হয়। ধূম্রজাল-বাহিত তৈলাক্ত তুষারের সংস্পর্শে বড় বড় অট্টালিকার বর্ণ-সুষমা বিলুপ্ত হয়ে ধূম্রমলিন চেহারা ধারণ করে। অনেক ক্ষেত্রে রঙের নীচেই যে কাঠ, পাথর বা ইট আছে, তাদের উপরও অ্যাসিড-বাষ্পের ক্রিয়া প্রকট হয়—চুনাপাথর বিশেষভাবে ক্ষয়ে যায়। গ্যালভ্যানাইজড আয়রন শিট—এমন কি, শ্লেটের মত পাথরের চেহারাও বিকৃত হতে দেখা গেছে। ধূম্রজালের সংস্পর্শে পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণ, চাকচিক্য বা ঘর-দরজার চিত্রিত পর্দা ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের আবরণসমূহের বর্ণগৌরব শুধুমাত্র যে ম্লান হয়ে যায় তাই নয়, বরং ঘন ঘন ধোয়া-মোছার জন্যে অর্থব্যয়ও বড় কম হয় না।

ইংল্যাণ্ডের মত দেশে—যেখানে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রথায় কয়লাকে সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ করবার প্রণালী অনুসরণ করা হয়, সেখানেই প্রতি বছর ২ মিলিয়ন (২০ লক্ষ) টন কয়লা অদগ্ধ অবস্থায় ভূষা-কণিকারূপে বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে;

জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধন ছাড়াও শুধু কয়লা হিসাবেই বিরাট অপচয়। হিসাব করে টাকার অঙ্কটা একবার চিন্তা করলেই প্রত্যয় হবে।

সুদীর্ঘ পথ ট্রেনে অতিক্রম করবার সময়ে প্রায়ই একটা বহু দূরাগত হৈ-হল্লার মত আওরাজ কানে এসে বাজে, যাতে সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপের ব্যাঘাত ঘটে এবং সজোরে কথা চালাচালি করতে হয়। বায়ুমণ্ডলস্থিত অ্যাসিড-গ্যাসের সংস্পর্শে রেলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গায়িত যে ক্ষয় ঘটে, তার উপর জোরে ট্রেন চলবার সময় নাকি ঐরূপ হৈ-হল্লার মত আওয়াজের সৃষ্টি হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ধূম্রজাল একটা আতঙ্কের মত নিত্য অনুসরণ করে সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে—কি জীবনের দৈর্ঘ্য হ্রাস করতে, কি শস্য হানি ঘটাতে, কি প্রাসাদ, পোষাক ও পরিচ্ছদের বর্ণসুষমা ম্লান করতে, কি শিল্পক্ষেত্রে —যেমন ভবনের গঠনমূলক রসদের বিকৃতি সাধনে বা রেলপথের রেলের ক্ষয় সাধনে—সর্বব্যাপারেই ধূম্রজালের কুৎসিত মলিনতা ও কদর্য হানিকার্য রাহুর মত মানুষের জীবনকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে যেন। বৈজ্ঞানিক সভ্যতার একি নিদারণ অভিশাপ। যখন মহা-শূন্যের বুকে বিচরণের স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করছে, সেই উন্নত অবস্থায় উপনীত হয়েও ধূম্রজালের বিভীষিকা থেকে কি নিস্তার নেই? আছে বৈকি! বিজ্ঞানের অফুরন্ত বিচিত্র ভাণ্ডারে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা অবশ্যই সঞ্চিত আছে। কিন্তু ধূম্রজালের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্যে তাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বাস্তবে পরিণত করবার উদ্যোগ থাকা চাই।

গৃহস্থালীতে না পুড়িয়ে কেন্দ্রীয় একটি স্থানে বিরাট আকারে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কয়লাকে অন্তর্ধূমপাতনের (Destructive distillation) মাধ্যমে কোকে পরিণত করলে কয়লার যে গ্যাস পাওয়া যায়, তাকে জ্বালানী হিসাবে পোড়ানো যায়। এভাবে সেই জ্বালানী পোড়ানো যেমন সহজ, তেমনি নির্মল—ধূম্রজালের রচনা হবে না এবং পুড়ে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যাবে। পাইপ-লাইনের 'ট্যাপ' বা 'ভাল্‌ভের' হাতল ঘুরিয়ে পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার করলে খরচ খুবই কম পড়বে। তাছাড়া কয়লা গ্যাসের মধ্যে আর রাসায়নিক বহুমূল্য পদার্থ-গুলিকে পৃথকভাবে উদ্ধার করে নিয়ে কতরকমে যে ব্যবহার করা যাবে, তার ইয়ত্তা নেই। কোক—লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের একটা মৌলিক রসদ হিসাবে ব্যবহৃত হবে। শিল্প-ক্ষেত্রে যেখানে বৈদ্যুতিক শক্তিতে কাজ চলে, সেখানে অযথা কয়লা না পুড়িয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয় হবে। আর যে সব ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়, সেখানে কয়লা পোড়াবার দরুণ যে ধূম্রজালের সৃষ্টি হবে, তাকে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে দেবার আগে কট্রেল ফিল্টারের (বা যথোপযুক্ত অন্য ফিল্টার) সাহায্যে তুষার-কণিকা ও অন্যান্য কঠিন মল ছেঁকে নিয়ে উপযুক্ত শোধন-স্তম্ভের (Was.ing tower) মাধ্যমে অ্যাসিড-বাষ্প ও অন্যান্য বিষময় বাষ্পকে শোষণ করে নেবার পর নির্মল যে বায়বীয় পদার্থ পরিত্যক্ত হবে, তা চিম্‌নীর মুখে বায়ুমণ্ডলে নিক্ষেপ করা যেতে পারে। তাহলে বায়ুমণ্ডল অনায়াসেই নির্মল থাকতে পারবে। দীর্ঘ পরমায়ু, বাসভবন, পোষাক-পরিচ্ছদের ঔজ্জ্বল্য, সবুজ পত্রদলের মধ্যে বিচিত্র বর্ণের পুষ্পের সমারোহ নিয়ে মহানগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী তখন সেই নির্মল বায়ুমণ্ডলের চন্দ্রাতপ-তলে খুশীর হাসিতে ঝল্‌মলিয়ে উঠবে।

ভূগর্ভের অতলে

শ্রীপূর্ণেন্দু সেন

অচেনা, অদেখার রহস্য উন্মোচনে বিজ্ঞানীদের স্বাভাবিক আগ্রহ অনেক ক্ষেত্রেই উদগ্র হয়ে প্রকাশ পায়। ভূগর্ভের আভ্যন্তরীণ রূপ ও প্রকৃতি জানবার জন্যেও তাঁরা সুরু ক'রেছেন নানারকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তাঁদের প্রচেষ্টা আজ মাত্র আংশিকভাবে সাফল্যলাভ করেছে।

পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ রূপ ও প্রকৃতির বিষয় যে সব তথ্যাদির মাধ্যমে জানা যায়, সেগুলি অনেকাংশেই পরস্পর-বিরোধী। এর মূল কারণ এই যে, ভূগর্ভের স্তরবিন্যাস ও বিভিন্ন শিলা-স্তরের গভীরতা নিরূপণে বৈজ্ঞানিকমহলে আজও যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ভূ-কম্পন সম্পর্কিত গবেষণা থেকে প্রধানতঃ অদৃশ্য এই অন্তঃস্তরের শিলার উপাদান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায় মাত্র। গ্রহাদি সম্পর্কিত গবেষণা থেকেও এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যেতে পারে।

ভূ-পৃষ্ঠের সাধারণ কোন শিলার দ্বারা যদি পৃথিবী গঠিত হতো, তবে ভূ-কম্পনজাত তরঙ্গের গতি গভীরতার সঙ্গে সমপর্যায়ে বৃদ্ধি পেত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভূ-কম্পনজাত তরঙ্গের গতির পরিবর্তন এতই আকস্মিক যে, বিভিন্ন গভীরতায় বিভিন্ন শিলাস্তরের অবস্থিতি সহজেই অনুমান করা যায়।

ভূগর্ভের অকেলাসিত স্তরের উপরের কঠিন, ক্ষীণ ও কেলাসিত বহিরাবরণকে বলা হয় ভূত্বক। এই ত্বকের প্রধান উপাদান আগ্নেয়শিলা; কিন্তু স্থানে স্থানে পাললিক শিলার ক্ষীণ ও বিচ্ছিন্ন আবরণও আছে। চাপ ও তাপের প্রভাবে এসব শিলা পরিবর্তিত শিলায় রূপান্তরিত হয়েছে। ৩০ কিলোমিটার থেকে ৪০ কিলোমিটার গভীরতা-বিশিষ্ট ভূত্বকের নিম্নভাগ সিমা (সিলিকা ও ম্যাগনেসিয়াম জাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণ). ও উপরিভাগ সিয়াল-এর (সিলিকা-অ্যালুমিনিয়াম) দ্বারা গঠিত। ভূকম্পন-তরঙ্গ বিভিন্ন শিলা-স্তরের মধ্য দিয়ে প্রেরণ করে দেখা গেছে যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত শিলাস্তর গ্র্যানিট জাতীয় আগ্নেয়শিলার দ্বারা গঠিত। এই শিলাস্তরের ঘনত্ব ২·৭। পৃথিবীর যাবতীয় শিলাস্তরের ঘনত্ব গড়ে প্রায় ৫·৫২। সুতরাং পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে এমন শিলাস্তর আছে, যাদের ঘনত্ব প্রায় ৬। অতএব শিলা-স্তরের ঘনত্ব গভীরতার সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পৃথিবীর অন্তঃস্থলে ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী—প্রায় ৯ অথবা ১০।

জেফ্রীর মতে, ভূপৃষ্ঠের বহির্ভাগ গ্র্যানিট, নিম্নভাগ ডিউনাইট ও মধ্যভাগ ডাইওরাইট অথবা কাচীয় ব্যাসাল্ট জাতীয় আগ্নেয়শিলার দ্বারা গঠিত। কিন্তু হোমস্ ভূকম্পনজাত তরঙ্গের গতি পরীক্ষা করে স্থির করেন—ভূত্বকের বহির্ভাগ থেকে নিম্নভাগ পর্যন্ত যথাক্রমে গ্র্যানোডাইওরাইট, অ্যাম্ফিবো-লাইট, গ্র্যানুলাইট ও কাচীয় পেরিডোটাইট প্রভৃতি আগ্নেয় ও পরিবর্তিত শিলার দ্বারা গঠিত। বৈজ্ঞানিক কোটা'র মতে, ভূত্বকের নীচে ব্যাসাল্ট নামক আগ্নেয়শিলার এক নিরবচ্ছিন্ন স্তর আছে। পরবর্তীকালে ড্যালী ও গ্রীন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তের পক্ষে মত দেন। তাঁদের মতে, ব্যাসাল্ট শিলাস্তর সম্পূর্ণভাবে অকেলাসিত ও কাচীয়। এই ব্যাসাল্ট অন্তঃস্তরের নীচে ভূ-কম্পন-বিশেষজ্ঞেরা অ্যাক্লোগাইট নামক শিলাস্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ভূত্বকের স্তর-

বিন্যাসের নিম্নোক্ত ধারাটি অনুমান করা যেতে পারে :

(১) বিচ্ছিন্ন পাললিক শিলাস্তর
(২) নিরবচ্ছিন্ন (?) গ্র্যানিট নামক একপ্রকার আগ্নেয়শিলার স্তর
(৩) নিরবচ্ছিন্ন (?) পরিবর্তনশীল শিলার স্তর।
(৪) নিরবচ্ছিন্ন কঠিন ব্যাসাল্ট নামক আগ্নেয়-শিলার অন্তঃস্তর।

ভূত্বকের প্রথম দশ মাইল পর্যন্ত শিলার উপাদান সম্পর্কে ক্লার্ক এক তালিকা দিয়েছেন :

আগ্নেয়শিলা	৯৫%
কর্দম-প্রস্তর (Shale)	৪%
বেলে পাথর (Sandstone)	০·৭৫%
চুনাপাথর (Limestone)	০·২৫%
	১০০·০০%

ভূপৃষ্ঠ শীতল হলেও ভূগর্ভে এখনও যথেষ্ট উত্তাপ আছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, ভূগর্ভে প্রতি ৫০-৮০ ফুটে এক ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ৪০ কিলোমিটার নীচে কোন পদার্থই সম্পূর্ণ কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে না। কিন্তু ভূ-পদার্থবিদেরা বলেন—এই গভীরতায় কোন শিলাস্তর নেই। উপরের শিলাস্তরের প্রবল চাপে গলিত এই সব শিলাস্তর কঠিন অবস্থায় আছে। কোন কারণে চাপ হ্রাস পেলে গলিত শিলা উৎপন্ন হয়।

ভূকম্পন-তরঙ্গ পৃথিবীর অভ্যন্তরে শিলাস্তরের মধ্য দিয়ে প্রেরণ করে দেখা গেছে—এই তরঙ্গের গতি ৮০ কিলোমিটার গভীরতায় কিছুটা হ্রাস পায় এবং ১৬০ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত গতির সমতা বজায় রেখে আরও অধিক গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ গতি বৃদ্ধি পায়। ১৬০ কিলোমিটার থেকে তরঙ্গের গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫০ কিলোমিটারে হ্রাস পায় এবং এই গভীরতা থেকে ২৯০০ কিলোমিটারের মধ্যবর্তী শিলা-স্তরকে Mantle বা আবরণ বলে। ২৯০০ কিলোমিটারের নীচ থেকে পৃথিবীর অন্তঃস্থল (Core) সুরু হয়েছে। ভূত্বক ও আবরণ এবং আবরণ ও অন্তঃস্থলের মধ্যে দুটি বিরতি বা Discontinuity-র অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা একমত। এই বিরতির উপরে ও নীচে পদার্থের প্রকৃতির যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। অন্তঃস্থলের মধ্যে একটি বিরতির অস্তিত্ব কল্পনা করা হলেও এই বিষয়ে ভূতাত্ত্বিকদের মধ্যে এখনও মতভেদ আছে। ৭০০ কিলোমিটার গভীরতায় বিদ্যুৎ-পরিচালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ভূকম্পন-তরঙ্গের বেগ অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। এই গভীরতায় পদার্থের প্রকৃতির যে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ৪০০ কিলোমিটার গভীরতায়ও পদার্থের প্রকৃতির এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। দুই গভীরতায় এই আকস্মিক পরিবর্তন, উপাদানের তারতম্য বা পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনের ফলে হয় কিনা, সে কথা জানা যায় নি।

ভূত্বকের সীমারেখা অতিক্রম করে যখন আরও গভীরে প্রবেশ করা যায়, তখন শিলাস্তরের ঘনত্ব ও কাঠিন্য গভীরতার সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। অনেকের মতে, পেরিডোটাইট নামক আগ্নেয়শিলাই ম্যাণ্টল বা আবরণের বহির্ভাগের প্রধান উপাদান। এই আবরণের নিম্নভাগ সালফাইড-অক্সাইড ও লোহা-নিকেলের সংমিশ্রণে গঠিত। লোহা ও নিকেলের ভাগ ক্রমশঃ পৃথিবীর অন্তঃস্থল বা কেন্দ্রের দিকে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূকম্পনের গবেষণায় স্থির হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠের নীচে ২৯০০ কিলোমিটার পর্যন্ত যাবতীয় শিলাস্তর কঠিন এবং অনমনীয় অবস্থায় আছে। আরও গভীরে শিলা ক্রমশঃ কাঠিন্য হারিয়েছে। ১৯০৬ সালে ওল্ডহাম অনুমান করে-ছিলেন যে, পৃথিবীর একটি অন্তঃস্থল আছে। এই অঞ্চলের শিলাস্তরে ভূকম্পন-তরঙ্গের গতি পারি-পার্শ্বিক শিলাস্তরের গতি অপেক্ষা কম। পৃথিবীর

এই অন্তঃস্থলে শিলাস্তরের গড় ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ৫½ গ্র্যাম নির্ধারিত হয়েছে

১৯০৯ সালে সুয়েস্ নামে এক বৈজ্ঞানিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক গবেষণার সাহায্যে স্থির করেন যে, পৃথিবীর অন্তঃস্থল লোহা ও নিকেলের সমষ্টি এবং আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ⅛ অংশ। ১৯২২ সালে গোল্ডস্মিথ পৃথিবীর অভ্যন্তরের এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেন। তাঁর মতে, অন্তঃস্থল লোহা ও নিকেলের সমন্বয়ে গঠিত বটে, কিন্তু এই অন্তঃস্থলকে বেষ্টন করে আছে ১৭০০ কিলোমিটার বেধের এক সালফাইড-অক্সাইড মিশ্রিত শিলাস্তর। এর উপরিভাগের স্তর ১১০০ কিলোমিটার বেধবিশিষ্ট এক্লোগাইট জাতীয় আগ্নেয়শিলার দ্বারা গঠিত। এই স্তরকে বেষ্টন করে আছে, ১২০ কিলোমিটার বেধবিশিষ্ট ভূত্বক, যার প্রধান উপাদান সাধারণ সিলিকেট। নানারকম গবেষণার ফল অনুসন্ধান করে অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অন্তঃস্থলে লোহা-নিকেলের তরল অবস্থার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একমত। জোয়ার-ভাটার পরীক্ষা এই ধারণাকে দৃঢ়তর করেছে। পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলের স্তরের উপাদান অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় আছে বলে তরল অবস্থায় থাকবার কথা; কিন্তু উপরের অপরিমিত শিলাস্তরের প্রবল চাপের ফলে ঐ সব পদার্থ ইস্পাতের মত কঠিন ও স্থিতিস্থাপক অবস্থায় রয়েছে বলে ভূতাত্ত্বিকদের অনুমান।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রাথমিক তরঙ্গের গতি হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায় এবং প্রথম অনুগামী তরঙ্গের কোন প্রভাবই থাকে না। যেহেতু এটি তরল পদার্থের বৈশিষ্ট্য, সেহেতু পৃথিবীর অন্তঃস্থলের যাবতীয় শিলার তরল অবস্থায় থাকাটাই যুক্তিযুক্ত। ভূকম্পন-তরঙ্গের পরীক্ষা থেকে বুলেন (১৯৪৭) স্থির করেন যে, পৃথিবীর অন্তঃস্থলে দুটি লোহা-নিকেলের স্তর আছে। ২৯০০ কিলোমিটার থেকে ৫০০০ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত শিলাস্তর তরল এবং তার নিম্নভাগ কঠিন অবস্থায় আছে।

বৈজ্ঞানিক ড্যালীর মতে, গ্যাস ও তরল পদার্থের অন্তরীকরণের (Differentiation) ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর মতানুসারে ভূপৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত স্তরক্রমের নিম্নোক্ত রূপটি অনুমান করা যেতে পারে:

(১) ৭০ কিলোমিটার বেধবিশিষ্ট ভূত্বক।

(২) ৩৫০ কিলোমিটার বেধবিশিষ্ট অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার।

(৩) ২৫০০ কিলোমিটার বেধবিশিষ্ট কেলাসিত স্তর।

(৪) নিকেল-লোহা মিশ্রিত তরল অন্তঃস্থল, যার ব্যাসার্ধ ৩৫০০ কিলোমিটার। ১৯৪৩ সালে ড্যালী স্থির করেন যে, ৩১০ কিলোমিটার বেধবিশিষ্ট দ্বিতীয় স্তর কাচীয় ও জলীয় পেরিডোটাইট দ্বারা গঠিত। বার্চ, ব্রিজ্‌ম্যান প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে ড্যালী অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের উপাদান হিসাবে স্ফটিক (Crystal) ও কাচের এক পেরিডোটাইট জাতীয় সংমিশ্রণ অনুমোদন করেন।

গ্রহসমূহের পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর অন্তঃস্থল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যেতে পারে। যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহের উপাদান এক—এটা অনুমান করা হয়েছে। সুতরাং ভূপৃষ্ঠে পাওয়া উল্কা পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উপাদানের কিছুটা আভাস দেবে, আশা করা যায়। দেখা গেছে, পৃথিবীর অন্তঃস্থল এবং সিডেরাইটিস্ নামক উল্কার উপাদান এক – লোহা ও নিকেলের রাসায়নিক সংমিশ্রণ।

বহু বছর ধরে উইকার্ট (১৮৯৭), ওল্ডহাম (১৯০৬), গুটেনবার্গ (১৯১৩), ড্যালী প্রমুখ ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানী ও ভূ-রসায়নবিদেরা পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভূকম্পন-তরঙ্গের তারতম্য ও শিলাস্তরের ঘনত্বের বণ্টনকরণ থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তরের এক

চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতামতের মধ্যে কিছুটা মিল থাকলেও, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা একমত নন। বিভিন্ন গবেষণার বিভিন্ন ফল এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

মনে হয়, ভূকম্পন-তরঙ্গের পরীক্ষা, অত্যধিক চাপ ও উত্তাপে পদার্থের প্রকৃতি-বিশ্লেষণ, পৃথিবীর উত্তাপ, উৎস ও ঘনীভবনের ইতিহাস এবং আগ্নেয়শিলার গবেষণার মাধ্যমে হয়তো পৃথিবীর সর্বজনসম্মত স্তরবিন্যাসের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে।

ভারতের পারমাণবিক মণিক-সম্পদ

শ্রীশচীনাথ মিত্র

পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টিতে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, বেরিলিয়াম, লিথিয়াম, জারকোনিয়াম এবং গ্র্যাফাইট প্রভৃতি খনিজের প্রয়োজন হয়। এসব খনিজ ছাড়া আরও কতকগুলি খনিজ নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর গঠনে ব্যবহৃত হয়। ভারতে এসব পারমাণবিক খনিজের লভ্যতা ও পরিমাণ সম্বন্ধে কিছু বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ইউরেনিয়াম

ভারতে ইউরেনিয়াম-সম্পন্ন খনিজ প্রধানতঃ আগ্নেয় এবং রূপান্তরিত শিলায় পাওয়া যায়। নাইস্ ও গ্র্যানিট পাথর এবং চ্যুতি অঞ্চলেই বেশী দেখা যায়। স্বাধীনতার কয়েক বৎসর পরেই দুইটি নূতন ইউরেনিয়াম-অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়েছে। (ক) দক্ষিণ বিহারে প্রায় আট মাইল দীর্ঘ অঞ্চল এবং (খ) মধ্য রাজপুতনায় কতকগুলি পরিত্যক্ত খনির আশেপাশের অঞ্চল। এই দুই অঞ্চলের পাথরে নিম্নশ্রেণীর ইউরেনিয়াম আকরিকের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ভারতে ইউরেনিয়াম আকর প্রধানতঃ তিন প্রকার।

(১) নিম্নশ্রেণীর আকর—এই শ্রেণীর আকরে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ '০৩ থেকে '১ শতাংশ পর্যন্ত থাকে এবং অনেক সময় এক টন পাথর থেকে ২'২৫ পাউণ্ড ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়। শুধু মাত্র অ্যাসিড অথবা কার্বনেট প্রক্রিয়ায় এই প্রাথমিক ধরণের ইউরেনিয়ামকে রাসায়নিক লিচিং করা সম্ভব। সিংভূম এবং রাজপুতনায় আর্কিয়ান ও ধারোয়ার অঞ্চলে এই ধরণের শিলা প্রচুর পরিমাণে আছে। উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় দেখা গেছে যে, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের মত কম খরচে ইউরেনিয়াম পাওয়া সম্ভব। স্থল ও নভোঃ-সমীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, আরাবল্লী অঞ্চলে ইউরেনিয়ামের প্রাচুর্য খুবই আশাপ্রদ। এই নিম্নশ্রেণীর ইউরেনিয়াম খনিজ সালফাইডযুক্ত তাম্র এবং লৌহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে।

(২) মিশ্র ইউরেনিয়াম আকর—এই ধরণের আকরে পেগ্‌মেটাইট এবং অন্যান্য শিরা-শিলায় ইউরেনিয়ামের নায়োবেট, ট্যাণ্টালেট এবং টাইটানেট অবস্থায় পাওয়া যায়। এই আকরে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ খুবই বেশী থাকে; কিন্তু এদের অবস্থান খুবই অসংলগ্ন এবং রাসায়নিক ও মেটালার্জির প্রথায় ব্যবহারযোগ্য করাও কঠিন। উত্তর বিহারে, অন্ধ্রের নেল্লোর মাইকা খনিতে এবং মধ্য রাজপুতনায় ইউরেনিয়াম-সম্পন্ন পেগ্‌মেটাইট আছে। এই ধরণের ইউরেনিয়াম মণিকের মধ্যে সামারস্কাইট, ফেরগুসোনাইট, এনেরোডাইট, বেটাফাইট (?), ড্যাভিডাইট, ইউরেনিনাইট,

পিচব্লেণ্ড প্রধান। এদের পরিবর্তিত অবস্থা, যেমন—এলানাইট, টি্পলাইট, চেরালাইট এবং মোনাজাইট ইউরেনিয়াম মণিক হিসাবে উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই U_3O_8-এর পরিমাণ ১০ থেকে ৩৯ শতাংশ পর্যন্ত থাকে।

(৩) মোনাজাইট—ত্রিবাঙ্কুর ও মাদ্রাজের সমুদ্রোপকূলে কৃষ্ণ বালুকায় প্রচুর পরিমাণে ইল্‌মেনাইট (টাইটেনিয়াম-মণিক) ও মোনাজাইট পাওয়া যায়। এই বালুকায় ২ থেকে ৫ শতাংশ মোনাজাইট থাকে এবং এথেকে অতি সহজেই প্রচুর পরিমাণে থোরিয়াম ও অন্যান্য রেয়ার আর্থ মৌল পাওয়া যায়। সাধারণ মোনাজাইট ০·২ থেকে ০·৪৩ শতাংশ U_3O_8 এবং ৮ থেকে ১০ শতাংশ ThO_2 উৎপন্ন করে। এ-ছাড়া নবাবিষ্কৃত এক ধরণের মোনাজাইট, যথা—চেরালাইটে ৪ থেকে ৩ শতাংশ U_3O_8 এবং ১৯ থেকে ৩৩ শতাংশ ThO_2 পাওয়া গেছে। মালাবার ও করমাণ্ডেল উপকূলের মোনাজাইট বালুকা হিসাব করে দেখা গেছে—সেখান থেকে কয়েক শত টন ইউরেনিয়াম পাওয়া যাবে। গত ১৯৫২ সাল থেকে এই উপকূলব্যাপী ইউরেনিয়ামের অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, অর্থাৎ পশ্চিম উপকূলের অর্ধাংশে ১০ লক্ষ টনেরও বেশী মোনাজাইটের হিসাব পাওয়া গেছে।

থোরিয়াম

তেজস্ক্রিয়তায় ইউরেনিয়ামের পরেই থোরিয়ামের স্থান। থোরিয়ামেরও প্রধান উৎস-মণিক হলো মোনাজাইট। ভারতের মোনাজাইট মণিকগুলি থোরিয়াম ও চৌদ্দটি অন্যান্য রেয়ার আর্থসমন্বিত। ত্রিবাঙ্কুরের মোনাজাইটে থোরিয়ামের পরিমাণ ৮ থেকে ১০·৫ শতাংশ, যেখানে ব্রেজিল ও অন্যান্য স্থানের উৎকৃষ্ট মোনাজাইটে এর পরিমাণ ৫ থেকে ৬ শতাংশ মাত্র। উপকূলের বালুকা ছাড়াও মোনাজাইট হাজারিবাগ, মেওয়ার, পশ্চিম ঘাট ও মাদ্রাজের গ্র্যানিট পাথরে কেলাসিত অবস্থায় পাওয়া যায়। পূর্বোল্লিখিত ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন অঞ্চল ছাড়াও কেপ-কমোরিন থেকে নর্মদার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত জায়গা জুড়ে পারমাণবিক খনিজ ছড়িয়ে আছে। পূর্ব উপকূলে টিনেভ্যালি থেকে মহানদী পর্যন্ত অঞ্চল ছড়িয়ে এই পদার্থ পাওয়া যায়।

আজ পর্যন্ত ভারতীয় অ্যাটমিক এনার্জি ডিপার্টমেণ্ট মোটামুটিভাবে ২০ লক্ষ টন মোনাজাইটের সন্ধান পেয়েছে। এ-থেকে ১৫০ থেকে ১৭০ হাজার টন ThO_2 পাওয়া যাবে।

বেরিলিয়াম

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পেগ্‌মেটাইট পাথরে প্রাপ্ত বেরিল নামক মণিকই বেরিলিয়ামের প্রধান উৎস। রাজপুতানা ও উত্তর বিহারে পেগ্‌মেটাইট বেরিল সমন্বিত। এই দুই জায়গা ছাড়াও মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, কাশ্মীর ও সিকিমে বেরিলের অনুসন্ধান চলছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বেরিলের চেয়ে ভারতীয় এই মণিকে বেরিলিয়ামের পরিমাণ খুব বেশী। এ-জন্যে বিদেশে খুব চাহিদা থাকায় প্রচুর পরিমাণে বেরিল ভারত থেকে রপ্তানী হতো, বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। ১৯৪৩ সাল থেকে এই রপ্তানী কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, রোডেশিয়া, মাদাগাস্কার এবং যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্থানে বেরিল আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় বেরিলের চাহিদা কমে নি এবং এখনও বেরিল উৎপাদনে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

জারকোনিয়াম

সম্প্রতি মৌলিক ও যৌগিক জারকোনিয়াম মেটালার্জি, সিরামিক এবং পারমাণবিক রিয়্যাক্টর নির্মাণে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়ায় পৃথিবীতে এর চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে। ভারত এই মণিকে সমৃদ্ধ, ত্রিবাঙ্কুরের কালো ইল্‌মেনাইট

বালুকার প্রায় ৩ শতাংশ এই জারকন মণিকে গঠিত। ভারতীয় জারকনে ৫·০৮ শতাংশ হাফনিয়াম থাকে। এই হাফনিয়াম পারমাণবিক কাজে অবাঞ্ছিত বলে একে প্রথমে বাদ দিয়ে নিতে হয়। প্রচুর পরিমাণে এই মণিক থাকায় ভারত বিদেশে রপ্তানী করতে সক্ষম।

গ্র্যাফাইট

পারমাণবিক রিয়্যাক্টরে (রিফ্লেক্টর বা মডারেটর তৈরীর জন্যে) যে গ্র্যাফাইটের দরকার, সেটা প্রথমতঃ বিশুদ্ধ এবং নির্ভেজাল, বিশেষতঃ বোরোন-মুক্ত হওয়া দরকার। সাধারণতঃ ভারতে এই ধরণের বিশুদ্ধ গ্র্যাফাইট না থাকায় পেট্রোলিয়াম কোক থেকে কৃত্রিম গ্র্যাফাইট উৎপন্ন করে কাজ চালানো হয়। দেশে চারটি পেট্রোলিয়াম শোধনাগারে বছরে প্রায় ৪০লক্ষ টন খনিজ তেল ব্যবহৃত হচ্ছে। এখান থেকে যে কোক পাওয়া যায়, তাথেকে কৃত্রিম গ্র্যাফাইট তৈরী করে পারমাণবিক রিয়্যাক্টরের মডারেটরে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এখন পারমাণবিক খনিজের মধ্যে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম প্রধান। ভারতে এটি দুই প্রয়োজনীয় খনিজের পরিমাণ নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হলো।

ভারতে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের পরিমাণ

ইউরেনিয়াম	থোরিয়াম
১। ৩,০০০ থেকে ৭,০০০ টন মোনাজাইট বালুকা, যার জন্যে খননের দরকার হয় না।	১৫০ হাজার থেকে ১৮০ হাজার টন মোনাজাইট বালুকা, যা সহজলভ্য এবং খননের দরকার হয় না। শুধু মাত্র বৈদ্যুতিক চুম্বকের সাহায্যে শতকরা ৯৯ভাগ শোধন করা যায়।
২। ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ টন সিংভূম অঞ্চল থেকে লাভজনকভাবেই আহরণ করা সম্ভব।	
৩। কমপক্ষে ৩,০০০ টন ইউরেনিয়াম সমন্বিত খনিজ আরাবল্লী অঞ্চল, ক্ষেত্রি, দারিবো, কাস্তালা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পাওয়া যেতে পারে।	
মোট—১২,০০০ থেকে ১৪,০০০ টন ইউরেনিয়াম	১৫০ থেকে ১৮০ হাজার টন থোরিয়াম

এই দুটি খনিজের মোট শক্তির পরিমাপে ৩,০০০,০০০ লক্ষ টন উৎকৃষ্ট কয়লার সমান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের সুপ্ত-শক্তির সম্ভাবনা অপরিসীম এবং তার সদ্ব্যবহারে ভারত অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি-উৎপাদক রাষ্ট্র হিসাবে পৃথিবীতে অনায়াসেই স্থান অধিকার করতে পারে।

বাতাসের বিরল গ্যাস

শ্রীজয়া রায়

দিনের আলো নিবে আসবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার পথেঘাটে, সিনেমা, রেস্তোঁরায়, বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে স্তম্ভে সুন্দর আলো জ্বলে ওঠে। সেই নয়নাভিরাম আলোর ঝলক দেখলে মন খুশীতে ভরে ওঠে। নানা ছাঁদের আলোর অক্ষর আর ছবিতে চলতে থাকে নানা রঙের খেলা। যে বস্তু সহরে সহরে নিত্যরাত্রে এ-রকম দীপালি উৎসবের মত আলো জ্বালায়, তার সম্বন্ধে জানতে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। আজ অবশ্য অনেকেই জানেন যে, এর মূলে রয়েছে কয়েকটি বিশেষ ধরণের বায়বীয় পদার্থ বা গ্যাস।

কিন্তু ৬৮ বছর আগে এ-রকম গ্যাসের অস্তিত্বের কথা কেউ জানতো না। ১৮৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরেজ পদার্থবিদ্ লর্ড র‍্যালে নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য গ্যাসের ঘনত্ব নিখুঁতভাবে জানবার জন্যে গবেষণা আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি লক্ষ্য করেন—বাতাস থেকে সংগৃহীত নাইট্রোজেনের ঘনত্ব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন নাইট্রোজেনের ঘনত্বের চেয়ে কিছু বেশী। তারপর বিখ্যাত ইংরেজ রসায়নবিদ্ উইলিয়াম র‍্যামজে, লর্ড র‍্যালের গবেষণায় যোগ দেন। দু-জনেই বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে ভারী উপাদানগুলিকে পৃথক করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা ম্যাগনেশিয়াম ধাতুর টুকরা উত্তাপের সাহায্যে লাল করে তুলে তার ভিতর দিয়ে নাইট্রোজেন পরিচালিত করেন। গ্যাসের আয়তন যতদূর সম্ভব কমে না আসা পর্যন্ত তাঁরা এই পরীক্ষা বার বার চালাতে লাগলেন। এই পরীক্ষার পরে যে গ্যাস অবশিষ্ট রইলো, তার আয়তন দাঁড়ালো আগের আয়তনের শতকরা ১.২ ভাগ, আর তার ঘনত্ব দাঁড়ালো ১৯.০৮৬। ১৮৯৪ সালে তাঁরা উভয়েই লক্ষ্য করলেন যে, এই গ্যাস রাসায়নিক ক্রিয়ায় মোটেই যোগ দেয় না। এই গ্যাসের নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য করে তাঁরা এর নাম দিলেন আর্গন। আর্গন একটি জার্মান শব্দ, যার অর্থ নিষ্ক্রিয় বা অলস।

উইলিয়াম র‍্যামজে এবং এম. ডব্লিউ. ট্র্যাভার্স এর পর আর্গনকে তরলীকৃত অবস্থায় আংশিক বাষ্পীভূত করেন। এর মধ্য থেকে হিলিয়াম গ্যাস বেশী উদ্বায়ী হওয়ার ফলে আগে বেরিয়ে এলো। তার কিছুদিন পূর্বে বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে সূর্যমণ্ডল থেকে এই গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। গ্রীক Helios শব্দের অর্থ, সূর্য এবং তাথেকেই হিলিয়াম নাম হয়েছে।

আবার র‍্যামজে ও ট্র্যাভার্সের যুক্ত প্রচেষ্টায় তরল আর্গন থেকে আরও একটা নতুন গ্যাস বেরিয়ে এলো। তার নাম দেওয়া হলো নিয়ন। জার্মান নিয়ন শব্দের অর্থ, নতুন।

তরল আর্গনকে যখন আবার বাষ্পীয় অবস্থায় আনা হলো, তখন আরও একটা গ্যাস বেরিয়ে এলো। তাঁরা এই গ্যাসের নাম দিলেন ক্রিপ্টন। ক্রিপ্টন শব্দের জার্মান অর্থ, 'লুকিয়ে থাকা'। সবচেয়ে শেষে যে গ্যাস বেরুলো তার নাম হলো জেনন। জেননও জার্মান শব্দ; এর অর্থ হলো—আগন্তুক। এ তো গেল পাঁচটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কারের ইতিকথা।

এই পাঁচটি গ্যাস রাসায়নিক ক্রিয়ায় নিশ্চেষ্ট থাকে বলে এদের যেমন নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলে, তেমনি সহজে পাওয়া যায় না বলে দুর্লভ গ্যাসও বলা হয়। নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কয়েকটি গুণ আছে। এগুলি বিদ্যুৎ-পরিবাহী, দ্বিতীয়তঃ এসব গ্যাসের মধ্য দিয়ে

বিদ্যুৎ প্রেরণ করলে নানারকম রঙীন আলো নির্গত হয়। অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য বা গ্যাসের সঙ্গে এদের কোন ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া ঘটে না। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সঙ্গে যদিও এরা ঘন সন্নিবিষ্টভাবে বাতাসের মধ্যে থাকে, তথাপি রাসায়নিকভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় না। এই পাঁচটি গ্যাস প্রত্যেকে মাত্র একটি অণু দিয়ে তৈরী। এদের বন্ধনশক্তি বা ভ্যালেন্সিও শূন্য।

আর্গন ও নিয়ন যথাক্রমে ফ্লোরেসেণ্ট আলো এবং রঙীন আলো তৈরীর উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হিলিয়াম অদাহ্য ও হাল্কা বলে বেলুন ও এয়ারশিপ ভরতি করবার কাজে লাগে। হিলিয়াম ও শতকরা ১৫ ভাগ হাইড্রোজেন দিয়ে এই কাজ হয়। ব্যোমযানকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখবার জন্যে বাতাসের চেয়ে হাল্কা হিলিয়াম দরকার হয়। এছাড়া আজকাল জেনন এবং ক্রিপ্‌টনও নানারকম কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। দিনের পর দিন এসব বিরল গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। যে বাতাসে আমরা নিঃশ্বাস গ্রহণ করি তাতে এদের সমবেত পরিমাণ শতকরা ১ ভাগ থাকে। বাকী ২১ ভাগ অক্সিজেন ও ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন।

আর্গন, নিয়ন, জেনন ও ক্রিপ্‌টন ইত্যাদি গ্যাসগুলি বাতাস থেকেই পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিক্সবার্গের একটি কারখানায় এসব গ্যাস তৈরী করা হয়। হেবারের প্রক্রিয়ায় বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া তৈরির পরে বাতাসের যে অবশিষ্টাংশ থাকে তাথেকে আর্গন তৈরী করা হয়। যে অল্প কয়েকটি স্বাভাবিক গ্যাস-কূপ আছে, সেখান থেকেও হিলিয়াম সহজে বের করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে কলোরেডো, টেক্সাস ইত্যাদি জায়গায় এই ধরণের কূপ আছে।

আমেরিকার রিভারটন সহরেও এয়ার রিডাকসন করা হয়। প্রধানতঃ অক্সিজেন তৈরিই উদ্দেশ্য, কিন্তু আর্গন, নিয়ন, জেনন ও ক্রিপ্‌টনও তৈরী করা হয়। উৎপাদক যন্ত্রটির গায়ে দুটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র লাগানো আছে। সেগুলি দিয়ে মিনিটে ১১,০০০ কিউবিক ফুট বাতাস প্রবেশ করতে পারে। সেই বাতাস, উৎপাদক যন্ত্রের ভিতরকার দুটি চাপ-যন্ত্রে, অর্থাৎ কমপ্রেসার যন্ত্রে চলে যায়। বাতাস সঙ্কুচিত হয়ে এলে তাকে নলের মধ্য দিয়ে -৩৪০° ফা. তাপাঙ্কের শীতল নাইট্রোজেনের ভিতর দিয়ে চালানো হয়। তখন বাতাস তরল হয়ে যায়।

তারপর সেই তরল বাতাস তিনটি বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে চলে যায়। সেখানকার তাপমাত্রা সামান্য কিছু বেশী। তাপমাত্রা বেশী হওয়ায় অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং আর্গন আবার বাষ্পীভূত হয়ে পড়ে। নাইট্রোজেন -৩২০° ফা. তাপাঙ্কে, আর্গন -৩০২° ফা. তাপাঙ্কে এবং অক্সিজেন -২৯৭° ফা. তাপাঙ্কে বাষ্পীভূত হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি গ্যাসকে আলাদা আলাদা নল দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। এর পরের কাজ হলো গ্যাসগুলিকে বিশেষভাবে পরিশুদ্ধ করে দেওয়া, যাতে অন্য কোন গ্যাস সেই গ্যাসের সঙ্গে মিশে না থাকে। এই কাজটিও আগের মত ব্যবস্থাতেই করা হয়। এভাবে জেনন, নিয়ন ও ক্রিপ্‌টন আর খুব অল্প পরিমাণ হিলিয়াম ধরে রাখা হয়।

ছোট ছোট বিজলি-বাতির মধ্যে এই ধরণের নিষ্ক্রিয় গ্যাস পুরে বিশেষ কাজের জন্যে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। আগে সে সব কাজে দামী ভ্যাকুয়াম নল ও যান্ত্রিক সুইচের ব্যবস্থা চালু ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়েসের একটি ইলেকট্রিক কোম্পানী পরীক্ষামূলকভাবে নিয়ন গ্যাস ভর্তি টিউব টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। এই নিয়নপূর্ণ নলগুলি টেলিফোনের ডাক পরিচালন করবে।

এই ধরণের ২০,০০০টি নল সুইচের মত কাজ করবে ও দিনে প্রায় ৮,০০০ ফোনের ডাক বহন করবে। বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন, একটি টেলি-

ফোনের ডাক ৮টি নলের মধ্য দিয়ে যাবে। এই ব্যবস্থা পাকাভাবে চালু হলে খরচ কমে যাবে। তাছাড়া টেলিফোনে যে একটু এলোমেলো আওয়াজ হয়, তাও আর হবে না; কারণ যান্ত্রিক সুইচের ধাতুর উপরে ময়লা পড়ে এবং সেই ময়লা আর্দ্র থাকলে ঐ রকম শব্দ হয়। নিয়ন গ্যাসে ভর্তি নল ব্যবহার করলে এই শব্দ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

নিষ্ক্রিয় গ্যাসের আলোক-প্রদায়ী গুণটি বিজ্ঞানীরা অন্য কাজেও লাগিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ষ্ট্যানফোর্ড গবেষণাগারে কোন বিস্ফোরণে উৎপন্ন শক্-ওয়েভের ছবি তোলবার সময় তাঁরা নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে আলোকের উৎস হিসাবে ব্যবহার করেছেন। শক-টিউবে একদিকে বিস্ফোরক দ্রব্য রেখে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেই শক-ওয়েভগুলি নলের মধ্যে অবস্থিত হাল্কা একটি পর্দা ভেঙ্গে নলের অপর প্রান্তে চলে যায়। সেখানে একটি নলের মধ্যে আর্গন ও জেনন গ্যাস থাকে। শক-ওয়েভ নলের ভিতরে গেলে এই গ্যাসগুলি তরঙ্গের আকারে জ্বলে ওঠে এবং নলের অপর প্রান্তে যে ক্যামেরা লাগানো থাকে, তাতে শক-ওয়েভের নিখুঁত ছবি উঠে যায়।

বিদ্যুৎ-স্রোত যে কারণে আলো জ্বালিয়ে তোলে, শক-ওয়েভ সেই একই কারণে গ্যাসকেও জ্বালিয়ে তোলে। কারণ শক-ওয়েভ গ্যাসকে আয়নায়িত করে দেয়, অর্থাৎ গ্যাসের অণু থেকে তাদের উপাদানভূত এক-একটি ইলেকট্রন আলগা করে দেয়। এর ফলে গ্যাসটি তড়িতাবিষ্ট হয়ে পড়ে। ষ্ট্যানফোর্ডের বিজ্ঞানীরা আশা করেন, এই উপায়ে তাঁরা সামরিক এবং বাণিজ্যিক প্রয়োজনের উপযোগী বিস্ফোরক তৈরী করতে পারবেন।

যে সব কাজে রাসায়নিক নিষ্ক্রিয় পরিবেশের প্রয়োজন, তার জন্যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের বিশেষ দরকার। যেমন ট্রানজিস্টর তৈরীর সময় তার চারদিকে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের আবরণ থাকলে কোন ক্ষতি হয় না। বাতাস বা অক্সিজেন থাকলেই তার সমূহ ক্ষতি হয়। এই কাজে আর্গনের ব্যবহার আছে। আর্গন মোটামুটি সস্তা গ্যাস; পাঁচ আনায় এক কিউবিক ফুট পাওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের X-১৫ রকেটের জারকোনিয়াম ও টাইটানিয়াম ধাতুর তৈরি যন্ত্রগুলি আর্গনের পরিবেশে জোড়া লাগানো হয়েছে। ধাতুগুলি যাতে বাতাস বা অন্য কোনও গ্যাসের সংস্পর্শে এসে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা।

আমেরিকান এভিয়েশন কর্পোরেশন বা সংক্ষেপে অ্যাভ্‌কো জানিয়েছেন একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে গরম আর্গন গ্যাস চালিয়ে তাঁরা প্রায় ১১ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পেরেছেন। এই বিদ্যুৎ-শক্তি ৬০ ওয়াটের প্রায় দু-শ' বাতি জ্বালাতে পারে। এই পরীক্ষায় আর্গন গ্যাসকে প্রায় কয়েক হাজার ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তপ্ত করে চৌম্বক ক্ষেত্রে চালনা করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় গ্যাসের প্রতিটি অণু একটি করে ইলেকট্রন হারায়। তখন এক জোড়া শক্তিশালী চুম্বক দিয়ে সেই মুক্ত ইলেকট্রনগুলিকে আকর্ষণ করে বৈদ্যুতিক সার্কিটে নিয়ে আসা হয়। এই ভাবে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তি হয়তো একদিন সব কারখানা ও বাড়ী ঘর আলোকিত করবে।

ষ্ট্যানফোর্ড গবেষণাগারে শক-ওয়েভের পরীক্ষায় যেমন আর্গন ব্যবহৃত হয়েছে, অ্যাভ্‌কোর বিজ্ঞানীরা, নিয়ন্ত্রিত মিজাইলকে (Guided missile) যে প্রবল শক্তির সঙ্গে পুনরায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসতে হয়, সেই ধরণের শক্-ওয়েভ আর্গন গ্যাসের ভিতর দিয়ে চালিয়ে দেখছেন। আর্গনের উপর পরীক্ষা, মিজাইলের নাকের ডগা তৈরী করবার জন্যে উপযুক্ত উপাদান বেছে নিতে সাহায্য করেছে।

এক্সপ্লোরার-৭-এ একটি ছোট ট্যাঙ্কে আর্গন আছে। যখন আর্গনের ভিতরকার তেজ-

বিকিরণ হয়, তখন তাথেকে বৈদ্যুতিক স্রোত উৎপন্ন হয়। তেজ-বিকিরণ যত বেশী হবে, উৎপন্ন বিদ্যুতের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাবে। এক্সপ্লোরারের ভিতরে স্থাপিত একটি বেতার-যন্ত্র পৃথিবীতে বেতার সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। বার্টল গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা আর্গনের ট্যাঙ্ক তৈরী করেছিলেন। তাঁরা বেতার সঙ্কেত অনুসারে পৃথিবীর চারদিকের তেজ-বিকিরণের শক্তি ও তার গভীরতা কতখানি, তা নিরূপণের চেষ্টা করছেন।

এবার জেননের কথায় আসা যাক্। এই গ্যাস ১২ কোটি ভাগ বাতাসে মাত্র ১ ভাগ থাকে। দুর্লভ বলেই এর দামও খুব বেশী। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে এর প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট।

পেন্‌সিলভেনিয়া মেডিক্যাল স্কুলের চিকিৎসকেরা জেনন নিয়ে পরীক্ষা করছেন। মানুষের ফুস্‌ফুসে কি ভাবে বাতাস সঞ্চালিত হয়, জেনন সেই পরীক্ষায় সাহায্য করছে। বিশেষ বিশেষ রোগীকে জেননের পরিবেশে নিঃশ্বাস নিতে বলা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুসের X-ray নেওয়া হয়ে থাকে। জেনন এই কাজের উপযোগী; কারণ এই গ্যাস শরীরের রাসায়নিক বস্তুর কোনও ক্ষতি করে না। তাছাড়া অন্য গ্যাসের চেয়ে X-ray-র ছবি নেওয়ার পক্ষে জেনন গ্যাসই বেশী উপযোগী। ডাক্তারেরা বিশ্বাস করেন, এই পরীক্ষা সফল হলে যক্ষ্মাজীবাণু কি ভাবে ফুস্‌ফুসে ঢুকে সংক্রমণ ঘটায়, তা সঠিকভাবে জানা যাবে।

জেনন খুব সুন্দর আলো দেয় বলে নিউইয়র্কের একটি বিমান ঘাঁটিতে বহু ব্যয় করে জেননের সাহায্যে রানওয়ের আলোকমালা তৈরী করা হয়েছে। ফ্ল্যাশ বাল্বের চেয়ে এই আলোর ঔজ্জ্বল্য বেশী বলে তুষারপাত বা প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও বৈমানিক আলোগুলি দেখতে পারে।

রেফ্রিজারেটরের মধ্যে অবস্থিত নলের ভিতরে যে শোষক পদার্থ থাকে, তার মধ্য দিয়ে এই গ্যাস পাঠানো হয়েছে। এই নলগুলির ভিতরকার শোষক পদার্থ আর্দ্রতা শোষণ করে কি না, তা জানবার জন্যে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা। রেফ্রিজারেটরে প্রেরিত গ্যাস যাতে আর্দ্র না হয়, তার জন্যে এই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। জেনন নিষ্ক্রিয় বলেই নিরাপদে এই সব কাজে লাগানো যায়। ব্যয়সাধ্য হলেও হয়তো ভবিষ্যতে ভাল রেফ্রিজারেটর তৈরী করবার ব্যাপারে এই গ্যাসের দরকার হবে।

'উইণ্ড ট্যানেলে' হিলিয়াম ব্যবহৃত হয়। এর ফলে যে দ্রুত গতি পাওয়া যায়, সেই আরামের জন্যে বেশী খরচ করতেও অনেকে পশ্চাদপদ হয় না। হিলিয়াম বাতাসের চেয়েও হাল্‌কা এবং কম তাপে আর্দ্র হয়ে যায় না।

তেজস্ক্রিয় নিষ্ক্রিয় গ্যাসের প্রকৃতি সাধারণ নিষ্ক্রিয় গ্যাসেরই মত। পারমাণবিক শক্তি কমিশন বহু টাকার তেজস্ক্রিয় আর্গন, জেনন ও ক্রিপ্‌টন বিক্রয় করছেন। অবশ্য এর মধ্যে ক্রিপ্‌টন-৮৫-এর তেজস্ক্রিয়তা সবচেয়ে বেশীক্ষণ বজায় থাকে।

ওহিওর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল নিউক্লিওনিক্স প্রতিষ্ঠান বৃহৎ শিল্পজাত দ্রব্যের বেধ মাপবার জন্যে তেজস্ক্রিয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস কাজে লাগাচ্ছেন। তামাক কোম্পানী সিগারেটের কাগজ এবং ইস্পাত কোম্পানী ইস্পাতের পাতের বেধ মাপবার জন্যে ব্যগ্র। তারা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল নিউক্লিওনিক্স প্রতিষ্ঠানের কাছে এই গ্যাস ক্রয় করছেন।

এই বেধ মাপবার কাজ কি ভাবে হয়, দেখা যাক্। ইস্পাতের পাতের এক প্রান্তে তেজস্ক্রিয় ক্রিপ্‌টন তার শক্তি প্রয়োগ করতে থাকে। এই শক্তি ইস্পাতের অপর প্রান্তে অবস্থিত অন্য একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে তড়িতাবিষ্ট করে। ইস্পাতের টুকরাটি পাতলা হলে এই প্রক্রিয়াটি অতিমাত্রায় জোরালো হয়। তখন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে পাতটির বেধ নির্ণীত হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানীরা নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে কেবল আলোর

ব্যাপারেই নয়—শিল্প, তড়িৎ-স্থাপত্য, আরামের উপকরণ তৈরীর কাজ, এমন কি—মহাশূন্য-যাত্রার নানারকম বিষয়ে কাজে লাগিয়েছেন এবং বিভিন্ন কাজে এই গ্যাসের প্রয়োগ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে এই নিষ্ক্রিয় গ্যাস জনকল্যাণে নিয়োজিত হবে।

পৃথিবীর উত্তাপ

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

রোগীকে পরীক্ষা করবার সময় ডাক্তার তার শরীরের উত্তাপ নেন। অন্যান্য পরীক্ষার সঙ্গে উত্তাপ থেকেও ডাক্তার রোগীর দেহের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ধারণা করতে পারেন। ভূতাত্ত্বিকেরাও তেমনি উত্তাপ পরীক্ষা করে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ক্রিয়া-কলাপের রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেন। মানুষের সুব্যবস্থিত দেহের উষ্ণতা সর্বত্র সমান; কিন্তু পৃথিবীর সমস্যা অধিকতর জটিল। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের উত্তাপ সমান নয়। মানুষ এখনও কুড়ি মাইলবিশিষ্ট ভূত্বকের নীচে পৌছাতে পারে নি। বড় জোর তেল ও ধাতব পদার্থের গভীর খনি, রেলের সুড়ঙ্গ প্রভৃতি স্থানে তাপ-মাত্রা পরীক্ষা করা যেতে পারে। মনুষ্যকৃত সবচেয়ে নীচু কূপের গভীরতা হবে মাত্র চার মাইল। কাজেই চার হাজার মাইল গভীরে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল বিদ্ধ করবার উপায় উদ্ভাবনের পূর্বেই হয়তো আমরা নিকটবর্তী গ্রহে পৌছে যেতে পারবো।

তাহলেও পৃথিবীর উত্তাপ সম্বন্ধে আমরা যা কিছু আভাস পাই, তাতেই আমাদের খানিকটা কাজ হতে পারে। হয়তো এ-থেকে পৃথিবীর অগম্য অভ্যন্তর ভাগ সম্বন্ধে এরূপ জ্ঞানলাভ হতেও পারে, যাতে কয়েকটি সমস্যার সমাধান করা যায়; যেমন—পাহাড়ের উৎপত্তি, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি, মহা-সমুদ্রের উৎপত্তি প্রভৃতির কারণ এবং এরূপ আরও অনেক সমস্যা।

পৃথিবীর যত গভীরে যাওয়া যায়, উত্তাপ তত বাড়তে থাকে। এরূপ হবার কারণ সম্বন্ধে অনেক দিনের অনুমান এই যে, পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছে সূর্য কিংবা কোন তারকার অংশ থেকে। কালক্রমে উপরিভাগ ঠাণ্ডা হয়েছে; কিন্তু অন্তস্তলের উত্তাপ প্রায় আগের মতই রয়েছে। আর এক মতে, পৃথিবীর জন্মের কারণ হলো তারকাসমূহের মধ্যাঞ্চলবর্তী ধূলিকণার সংযোগ। সংযোগের ফলে যে বস্তুপিণ্ড গঠিত হয়েছে, তার উপরিভাগে আরও বস্তু-কণিকার পতনের ফলে ক্রমবর্ধমান বস্তুর অত্যধিক চাপের দরুণ অন্তস্তল উত্তপ্ত হয়েছে। ভূত্বকে মৌলিক পদার্থের প্রাচুর্যের জন্যে এরূপও মনে করা হয় যে, জন্মের সময় পৃথিবী বিশেষ উষ্ণ ছিল না—হয়তো ভূত্বক আগের চেয়ে ঠাণ্ডা না হয়ে বরং অধিকতর উষ্ণ হচ্ছে।

অনেক নীচে গিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করতে পারলে হয়তো পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হতো। কিন্তু মুস্কিল হলো এই যে, অনেক গভীরে গিয়ে তাপমাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত তরল লাভার তাপমাত্রা নেওয়া যায়। কিন্তু লাভা কত গভীর থেকে এসেছে এবং উপরে আসবার সময় উত্তাপের কতটা পরিবর্তন হয়েছে—তা আমরা

বলতে পারি না। আগে মনে করা হতো, লাভা বেশী নীচ থেকে আসে না। কিন্তু বর্তমানে এরূপ অনুমান করা হয় যে, লাভার উৎপত্তি ম্যাণ্টলের গভীর স্তর থেকে।

ভূত্বকের প্রবেশযোগ্য স্থানে উত্তাপ পরীক্ষা করে জানা গেছে, বিভিন্ন স্থানের গভীরতা অনুযায়ী তাপমাত্রা বৃদ্ধির হারে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। আগ্নেয়গিরি অথবা উষ্ণ প্রস্রবণ এলাকায় উত্তাপ বৃদ্ধির হার স্বভাবতঃই অনেক বেশী। এসব সীমানার অনেক দূরে, সাধারণ স্থানেও অনেক পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণ জায়গায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার প্রতি কিলোমিটারে ১০° ডিগ্রীর নীচ থেকে ৫০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হতে পারে। এমন কি, একই স্থানে বৃদ্ধির হার সমান নয়—কোন কোন গভীরতায় হঠাৎ অসাধারণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন স্থানে উত্তাপের পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয় যে, পৃথিবীর গভীর থেকে তাপ-প্রবাহের পরিমাণ বিভিন্ন-স্থানে বিভিন্ন রকম হয়। অবশ্য এটি হলো আংশিক সত্য। কারণ আমরা এখন জানি যে, কোন স্থানের বিশেষ প্রস্তর-স্তরের তাপ পরিবহন ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যের জন্যেই প্রধানতঃ এরূপ প্রভেদ হয়। এই কারণে একই স্থানে বিভিন্ন গভীরতায় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন প্রকার প্রস্তরের তাপ-পরিবহন ক্ষমতার পার্থক্য আছে। প্রস্তরের তাপ-পরিবাহিতা বেশী হলে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার কম হবে। অপর পক্ষে, প্রস্তরের তাপ-পরিবাহিতা কম হলে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার বেশী হবে।

পৃথিবীর গভীর থেকে কত উত্তাপ এসে সমুদ্রে মিশে যায়, তা আমাদের অজ্ঞাত। পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগই জলে আবৃত। কাজেই ভূগর্ভ থেকে মোট কত উত্তাপ বেরিয়ে আসে, তার হিসাব করতে হলে পূর্বোক্ত বিষয়টি আমাদের জানা দরকার। পৃথিবী থেকে নির্গত তাপের পরিমাণ খুবই কম। মহাদেশের নানাস্থানে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, নির্গত তাপের পরিমাণ হবে প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটারে প্রতি সেকেণ্ডে এক ক্যালোরির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। সূর্য থেকে যে পরিমাণ উত্তাপ পৃথিবীতে আসে, তার তুলনায় এই সংখ্যাটি কয়েক সহস্র গুণ কম। স্পষ্টতঃ, সূর্যের উত্তাপই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা এবং জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে।

ভূপৃষ্ঠে যে তাপ নির্গত হয়, তার অধিকাংশই পৃথিবীর উত্তপ্ত অন্তস্তল থেকে না আসতে পারে; হয়তো তার উৎপত্তি ভূত্বক থেকে। এরূপ অনুমান সম্ভব হয়েছে—তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের পর। এই অনুমানের জন্যেই পৃথিবীর বয়ঃক্রম সম্বন্ধে পুরনো ধারণার সংশোধন করতে হয়েছে। এই মতবাদই সমর্থন করে যে, ঠাণ্ডা না হয়ে পৃথিবী ক্রমেই উষ্ণ হচ্ছে।

রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি মৌলিক পদার্থসমূহের পরমাণুর তেজস্ক্রিয়তার জন্যে সাধারণ সব প্রস্তরে অনবরত তাপের উদ্ভব হয়। গ্র্যানিটজাতীয় প্রস্তরে তেজস্ক্রিয়তা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। মহাদেশের অধিকাংশই এই জাতীয় প্রস্তরে গঠিত। মহাদেশের গ্র্যানিট-জাতীয় প্রস্তর-স্তরের গভীরতা হবে প্রায় ছয় মাইল। ভূপৃষ্ঠে যে উত্তাপ নির্গত হয়, তার অর্ধেকই হবে এই জাতীয় বিস্তৃত প্রস্তর-স্তরের তেজস্ক্রিয়তা থেকে উদ্ভূত তাপের জন্যে। অধিকন্তু এই উত্তাপের সঙ্গে সংযোগ হয় বেসাল্ট জাতীয় প্রস্তরের তেজস্ক্রিয়তা থেকে উদ্ভূত তাপের। বেসাল্টজাতীয় প্রস্তর মহাদেশ ও মহাসমুদ্র, উভয়ের তলদেশেই রয়েছে। তবে গ্র্যানিটের তুলনায় বেসাল্ট থেকে নির্গত তাপের পরিমাণ হবে অর্ধেক কিংবা তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র। মহাদেশের গ্র্যানিট-স্তরের চেয়ে তার নিম্নস্থ বেসাল্ট-স্তরের বিস্তৃতি হবে দ্বিগুণ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, পর্বতশ্রেণীতে গ্র্যানিটের স্তর খুবই ঘনীভূত। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এসব পর্বতশ্রেণীর তাপ-

প্রবাহ নীচের সমতল ভূমির তুলনায় শতাংশের ষাট ভাগ বেশী।

ভূগর্ভের তেজষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে আমাদের সঠিক জ্ঞান নেই। তবে এ-সম্বন্ধে আমরা খানিকটা প্রমাণ পাই—অন্য গ্রহের ভগ্নাংশ, উল্কাপিণ্ডের তেজষ্ক্রিয়তা থেকে। তেজষ্ক্রিয়তার পরিমাণ জানি না বলেই পৃথিবীর অভ্যন্তরের তাপমাত্রা নিরূপণ করা কষ্টকর। তবুও এ-কথা খুব সম্ভব বলেই মনে হয় যে, পৃথিবীর যে পরিমাণ তাপ শূন্যে বিকিরিত হয়, তার চেয়ে অধিক তাপ তেজষ্ক্রিয়তা থেকে উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় পৃথিবী নিশ্চয়ই ক্রমশঃ অধিকতর উষ্ণ হবে। এরূপ বলা হয় যে, তেজষ্ক্রিয়তাই আগ্নেয়গিরির উত্তাপের জন্যে দায়ী; কিন্তু লাভাতে বিশেষ তেজষ্ক্রিয়তা দেখা যায় না। পৃথিবীর তরল অন্তস্তলে তেজষ্ক্রিয়তা থাকতে পারে। এই তেজষ্ক্রিয়তার জন্যেই হয়তো অন্তস্তলে তাপজনিত পরিচলন হয়—যার ফলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি!

পৃথিবীর ম্যাণ্টলেও মাঝে মাঝে মন্দগতির পরিচলন-স্রোত প্রবাহিত হতে পারে। ভূত্বক ও অন্তস্তলের মধ্যবর্তী দু-হাজার মাইল বিস্তৃত অঞ্চলকেই ম্যাণ্টল বলে। ভূকম্প-তরঙ্গ থেকে পরীক্ষা করলে ম্যাণ্টলকে কঠিন পদার্থে গঠিত বলেই মনে হয়। কিন্তু স্ফটিকতুল্য কঠিন পদার্থের চেয়ে এই অঞ্চলের উপাদান গাঢ় আঠালো পদার্থের অনুরূপ হতে পারে। ম্যাণ্টলের ভিতরে তাপ-জনিত পরিচলন-প্রবাহের জন্যেই হয়তো পর্বত-শ্রেণীর উৎপত্তি এবং মহাসাগরের গভীরে মাধ্যা-কর্ষণের বিশেষ ব্যতিক্রম।

অন্তস্তলের নিকটবর্তী ম্যাণ্টলের অধোভাগের উপাদান উত্তপ্ত হয়ে স্ফীত ও হালকা হয় এবং উপরে উঠতে থাকে। উপরের অধিকতর ঠাণ্ডা পদার্থ নীচে নেমে এসে পূর্বের স্থান অধিকার করে। এভাবে ক্রমে ভূত্বকের তলদেশ পর্যন্ত এসে পরিচলন-প্রবাহ ঐ স্থানের খানিকটা অংশ টেনে নীচে নামায়। ভূত্বকের শূন্য স্থান পলির মত হাল্‌কা পদার্থে পূর্ণ হয়। এরূপেই হয়তো মহাসমুদ্রের কোন কোন স্থানে মাধ্যাকর্ষণের ব্যতিক্রম দেখা যায়। অবশেষে যথেষ্ট উত্তপ্ত পদার্থ নীচে থেকে উপরে নীত হলে পরিচলন-প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, ভূত্বকের উপাদান নীচে টেনে নামাবার শক্তি আর থাকে না। এভাবে চাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভূত্বকের নিমজ্জিত অংশ উর্ধ্বে প্রতিক্ষিপ্ত হবে—যেমন, একখণ্ড বরফকে জলের তলায় চেপে রেখে পরে চাপমুক্ত করে দিলে সেটি জলের উপরে ভেসে ওঠে। এই উৎক্ষিপ্ত ভাসমান ভূত্বকের অংশটিই পর্বতশ্রেণী সৃষ্টি করতে পারে।

পৃথিবীর উত্তাপ সম্বন্ধে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রস্তর ও ভূমির ভিতর দিয়ে তাপ খুব আস্তে আস্তে পরিবাহিত হয় এবং ভূগর্ভের তাপমাত্রা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ভূপৃষ্ঠের দু'এক ফুট নীচে বায়ুমণ্ডলের দৈনিক তাপমাত্রার পরিবর্তন একই সময়ে অনুভব করা যায় না, কালক্রমে এরূপ পরিবর্তন কার্যকরী হয়। ভূপৃষ্ঠে পূর্বদিনের তাপ কিংবা শৈত্যের দরুণ হয়তো আগামী দিন মাটির দু'এক ফুট নীচে এক ডিগ্রী তাপমাত্রার পরিবর্তন হতে পারে, তা অবশ্য নির্ভর করবে ভূমির তাপ-পরিবহন ক্ষমতার উপর। আরও কয়েক ফুট নীচে তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে কয়েক মাস পূর্বের শীত-গ্রীষ্ম ঋতুর দরুণ, অর্থাৎ এরূপ গভীরের প্রস্তর শীতকালে গরম এবং গ্রীষ্ম-কালে ঠাণ্ডা হবে। ঋতু পরিবর্তনের জন্যে পঞ্চাশ ফুট গভীরে অবস্থান্তর হবে এক বছর পরে। তাহলেও এই অঞ্চলে তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে খুব কমই।

ভূগর্ভে তাপমাত্রা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। প্রায় ২০,০০০ বছর পূর্বের, গত হিমযুগের নিদর্শন এখনও পাওয়া যাবে কয়েক হাজার ফুট গভীরে। বস্তুতঃ তাপ-পরিবহন এত মন্থর গতিতে চলে যে, পৃথিবীর বয়সের মোট তিন শ' কোটি বছরেও দু-শ' মাইল গভীরের তেজষ্ক্রিয়তা-সম্ভূত উত্তাপ এখনও ভূপৃষ্ঠে

পৌছুতে পারে নি। দু-শ' মাইলের আরও নীচে তেজস্ক্রিয়তার দরুণ তাপ এখনও জমা হচ্ছে। হয়তো আরও কয়েক কোটি বছর পরে এই উত্তাপ ভূপৃষ্ঠে অনুভূত হবে।

জীবনের উৎস-সন্ধানে

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পৃথিবীতে কেমন করিয়া প্রথম জীবনের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল—এই প্রশ্নের আজও কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। এতদ্ব্যতীত জীবনের প্রথম আবির্ভাবের পর লক্ষ লক্ষ যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে। সেই সুদূর অতীতে ভূপৃষ্ঠের অবস্থা ছিল বর্তমানের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক। তখনকার অবস্থার কথা কল্পনা করাই কঠিন—তখন পৃথিবীতে কি করিয়া জীবনের সূত্রপাত হইল, সেই কথা চিন্তা করা আরও কঠিন। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, পৃথিবীর উদ্ভবের পরে অনেক দিন বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন এবং উহার যৌগিক পদার্থ জলীয় বাষ্প, অ্যামোনিয়া, মিথেন প্রভৃতির প্রাচুর্য ছিল। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে—এই বায়বীয় পদার্থগুলির ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক ডিস্চার্জ প্রেরণ করিলে কয়েকটি অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। আমরা জানি যে, জীবনের একটি প্রধান উপাদান হইল প্রোটিন। ইহা বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের সাহায্যে গঠিত। এই জন্য অনেকেই মনে করেন যে, হাইড্রোজেন-প্রধান বায়ুমণ্ডলেই সর্বপ্রথম জীবনের আবির্ভাব হইয়াছিল; তারপর ধীরে ধীরে পৃথিবী গাছপালায় শ্যামল হইয়া উঠিয়াছিল। এই গাছপালাই আমাদের আধুনিক নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে প্রায় পরিপূর্ণ বায়ুমণ্ডল উৎপত্তির একটি প্রধান কারণ। যাহা হউক, হয়তো বা পৃথিবীর বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রথম নিদর্শন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষা অপরিসীম, জীবনের প্রথম আবির্ভাবের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় তার সাধনায় অন্ত নাই। জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে মানুষ অনেক ভাবিয়াছে। প্রাচীন কালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রপাতি ছিল না এবং তথ্য-সম্ভারও ছিল অপ্রতুল। তথ্য অপেক্ষা কল্পনা, যুক্তি অপেক্ষা উপমার উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন মানুষের মতামত গড়িয়া উঠিত। নিষ্প্রাণ জড়পদার্থ কত ক্ষুদ্র হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া প্রাচীন কালের চিন্তানায়কেরা পরমাণুর ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, ক্ষুদ্রতারও একটা সীমা আছে—ঐ সীমাকে অতিক্রম করা সম্ভব নহে। ঠিক একই ভাবে তাঁহারা কল্পনা করিয়াছিলেন যে, সমস্ত জৈব-পদার্থের মূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ রহিয়াছে। তাঁহাদের ধারণা ছিল, বাহির হইতে জীবন্ত কণিকা পৃথিবীতে বিস্তৃত হয় অথবা কোন অপ্রাকৃতিক নিয়মে জড়পদার্থে প্রাণের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে।

এই ধারণাকে পরীক্ষার সাহায্যে সঠিক কিংবা ভুল প্রমাণিত করিবার উপায় ছিল না বলিয়া অনেক কাল পর্যন্ত ইহা প্রচলিত ছিল। স্বতঃস্ফূর্ত জীবনের এই কল্পনা বৈজ্ঞানিক-মহলেও সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বিজ্ঞানীরাও ভাবিতেন যে, কীটপতঙ্গ আপনা-আপনিই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হল্যাণ্ডে লির্ডয়েনহোয়েক অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন

এবং তাহার সাহায্যে সর্বপ্রথম ব্যাক্টিরিয়া ও প্রোটোজোয়ার অস্তিত্বের কথা জানিতে পারেন। এতকাল ধারণা ছিল, জীবকোষই (সেল) প্রাণ-সৃষ্টির প্রথম অধ্যায়। দেখা গেল, ব্যাক্টিরিয়া জীবকোষ অপেক্ষা কেবল ক্ষুদ্রতরই নহে, উহার গঠন ও ক্রিয়া পদ্ধতিও অপেক্ষাকৃত সরল।

উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর কোষে প্রধানতঃ দুইটি অংশ আছে—একটি হইতেছে নিউক্লিয়াস এবং অপরটি সাইটোপ্লাজম, যাহা নিউক্লিয়াসকে ঘিরিয়া থাকে। এইগুলিই মিলিতভাবে হইল একটি জীবন্ত ইউনিট। সংখ্যাবৃদ্ধি, বংশধারা রক্ষা এবং পরিব্যক্তি প্রভৃতি জীবনের প্রধান লক্ষণ। কোষ-বিভাজনের ফলে সংখ্যাবৃদ্ধি সম্ভব হয়, আর নিউ-ক্লিয়াসে অবস্থিত ক্রোমোজোমের সাহায্যে বংশধারা অব্যাহত থাকে।

প্রতিটি ব্যাক্টিরিয়া হইতেছে একটি কোষে গঠিত অতি ক্ষুদ্র জীবাণু। কিন্তু উদ্ভিদ ও জীব-জন্তুর কোষে যেমন নিউক্লিয়াস আছে, ব্যাক্টিরিয়ার কোষে নিউক্লিয়াস তেমন স্পষ্ট দেখা যায় না। ব্যাক্টিরিয়ার আকৃতি-প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ব্যাক্টিরিয়ার কোষে প্রোটোপ্লাজমের অস্তিত্বও প্রমাণিত হইয়াছে। খুব সরল নিউক্লিয়াসও দেখা গিয়াছে। কোষ-বিভাজনের ফলেই ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে বটে, তবে বৃদ্ধির হারটা অত্যন্ত বেশী। ব্যাক্টিরিয়া কেবল সংখ্যাবৃদ্ধিই নয়, বংশলক্ষণও স্থির রাখিতে পারে এবং পরিবেশ অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তন করিতে পারে। এই কথা আজ সকলেই জানে যে, কোন একটি ঔষধ কোন ব্যাক্টিরিয়ার বিপক্ষে প্রথমে যতটা কার্যকরী হয়, কিছুকাল ঐ ঔষধ প্রয়োগের পর আর ঠিক ততটা কার্যকরী থাকে না। কারণ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য ব্যাক্টিরিয়া নিজের মধ্যে প্রতিরোধ-ক্ষমতা গড়িয়া তোলে। ব্যাক্টিরিয়াকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—স্যাপ্রোফাইট এবং প্যারাসাইট। মৃত জৈব পদার্থে স্যাপ্রোফাইট অতি দ্রুত বর্ধিত হইয়া এই পদার্থকে সরল রাসায়নিক পদার্থে পরিণত করে—রূপান্তরিত পদার্থগুলিকে গাছপালা তখন খাদ্য-হিসাবে গ্রহণ করে। অতএব স্যাপ্রোফাইট পরোক্ষ-ভাবে উদ্ভিদ-জীবন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী-জীবনেও এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ স্যাপ্রোফাইট জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া মানুষের দেহে কোন রোগসৃষ্টি করে না। প্যারাসাইট জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া উদ্ভিদ বা জীবজন্তুর দেহে পুষ্ট হয় এবং তাহাদেরই অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই দুই জাতীয় ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যেও আবার অনেক উপবিভাগ রহিয়াছে। বিভিন্ন পরিবেশে, অর্থাৎ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলোক, অক্সিজেন এবং খাদ্য প্রভৃতির বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়ার প্রতিক্রিয়া এক রকমের হয় না।

জীবনের প্রাথমিক আধার জীবকোষ অপেক্ষা ব্যাক্টিরিয়া অনেক ক্ষুদ্রতর প্রমাণিত হইলেও প্রাচীন ধারণা রহিয়া গেল যে, ব্যাক্টিরিয়াও স্বতঃ-স্ফূর্তভাবেই জীবন্ত হইয়া উঠে। পচা মাছ-মাংসে ব্যাক্টিরিয়া নিজে নিজেই উদ্ভূত হয়—এই ধারণা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইতালীয় বিজ্ঞানী স্প্যালান-জেনী এই ধারণার বিরোধিতা করেন। একটি পাত্রকে অনেকক্ষণ ধরিয়া গরম করিবার পর তাহাতে সিদ্ধ মাংস ভরিয়া তিনি পাত্রটির মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। বহুদিন পর্যন্ত ঐ পাত্রের মাংস অবিকৃত রহিয়া গেল এবং তাহাতে কোন ব্যাক্টিরিয়াও পাওয়া গেল না। ইহার দ্বারা তিনি প্রমাণ করিলেন যে, ব্যাক্টিরিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হয় না। বিরুদ্ধবাদীরা কিন্তু স্প্যালানজেনীর এই পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহাদের মতে, পাত্রটি গরম করিবার ফলে স্বতঃস্ফূর্ত জীবনধারাকে ব্যাহত করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাক্টিরিয়ার উদ্ভব হইল না।

প্রায় এক শতাব্দী পরে লুই পাস্তর তিনটি পরীক্ষার সাহায্যে জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাবের ধারণাকে একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া দিলেন। প্রথম পরীক্ষায় পাস্তর দেখাইলেন যে, তাপ প্রয়োগে কোন পদার্থে বিদ্যমান ব্যাক্টিরিয়া যদি মারিয়া ফেলা যায় এবং কেবল মাত্র জীবাণুমুক্ত বাতাস যদি ঐ পদার্থে প্রবেশ করিতে পারে, তবে সেখানে ব্যাক্টিরিয়া আর আবির্ভূত হয় না এবং জিনিষটিও পচে না। পাস্তরের দ্বিতীয় পরীক্ষায় দেখা গেল—ধূলার সংস্পর্শে ঐ পদার্থে আবার ব্যাক্টিরিয়ার আবির্ভাব ঘটে। তৃতীয় পরীক্ষায় পাস্তর জীবাণুমুক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করিয়া দেখাইলেন—ধূলিহীন নির্মল বায়ু ঐ দ্রবণে প্রবেশ করিলেও কোন ব্যাক্টিরিয়ার আবির্ভাব ঘটে না। লুই পাস্তরের পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল যে, পচা মাংস ব্যাক্টিরিয়া উৎপত্তির কারণ নয়, বরং ব্যাক্টিরিয়াই মাংস পচিবার কারণ। পাস্তরের এই তিনটি পরীক্ষার ফলে জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাবের ধারণা দূরীভূত হইয়া গেল।

পাস্তরের পরীক্ষার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে ভাইরাস নামক জীবাণু আবিষ্কৃত হইল। ভাইরাস এতই ক্ষুদ্র যে, খালি চোখে তো দূরের কথা, সর্বাধিক শক্তিশালী মাইক্রস্কোপেও ইহাকে দেখা যায় না। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে অবশ্য ভাইরাসের কতকগুলি বর্ধিত আকারের আলোকচিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে। বসন্ত, জলবসন্ত, হাম, টাইফাস প্রভৃতি রোগ ভাইরাস-জীবাণু কর্তৃক উৎপন্ন হয়। ব্যাক্টিরিয়া জীবিত বা মৃত উভয়-বিধ পদার্থেই বাঁচিতে পারে। ভাইরাস কিন্তু উদ্ভিদ অথবা জীবজন্তুর কেবল জীবন্ত কোষেই বাঁচিতে পারে।

বিস্তৃত গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, ভাইরাসের গঠন ব্যাক্টিরিয়ার গঠন অপেক্ষা অনেক সরল। ভাইরাসের প্রজনন-ক্ষমতা রহিয়াছে এবং অতি দ্রুত ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভাইরাস বংশধারাও অব্যাহত রাখিতে পারে এবং প্রতিকূল অবস্থা অনুযায়ী ইহাদের পরিব্যক্তি, অর্থাৎ মিউটেশনও হইয়া থাকে। এই সকল কাজ ছাড়া ভাইরাসকে অন্য কোন কাজ করিতে দেখা যায় না।

তামাকের গাছে একপ্রকার ভাইরাস পাওয়া যায়—বস্তুতঃ এই ভাইরাসই প্রথম আবিষ্কৃত হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ইহাদের দেহের অভ্যন্তরে নিউক্লিক অ্যাসিড এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের চারিদিকে প্রোটিন রহিয়াছে। সম্প্রতি ভাইরাসের এই অংশ দুইটিকে পৃথক করা সম্ভব হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, পৃথক অংশ দুইটিকে মিলিত করিয়া পুরাতন ভাইরাসকে পুনর্জীবিত করাও সম্ভব হইয়াছে।

কার্বোহাইড্রেটের অবস্থান অনুসারে নিউক্লিক অ্যাসিডকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যে সমস্ত নিউক্লিক অ্যাসিডে D-ribose নামক পদার্থটি রহিয়াছে, তাহাদের নাম হইয়াছে রিবো-নিউক্লিক অ্যাসিড অথবা সংক্ষেপে RNA, আর যে সমস্ত নিউক্লিক অ্যাসিডে D-2-desoxy-ribose পাওয়া গেছে, তাহাদের নাম হইয়াছে ডেসোক্সিরিবো-নিউক্লিক অ্যাসিড বা DNA। কখনও কখনও DRNA-ও বলা হইয়া থাকে।

স্বভাবতঃই বৈজ্ঞানিকদের মনে কৌতূহল হইল, প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে কোন্‌টি জৈবধর্মের জন্য দায়ী? ভাইরাস হইতে বিচ্ছিন্ন প্রোটিন দ্রবণে ভাইরাসের ক্রিয়াকলাপের কোন লক্ষণই দেখা গেল না, কিন্তু নিউক্লিক অ্যাসিড দ্রবণে ভাইরাসের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইল। অতএব ভাইরাসের জীবন-ধর্ম নিউক্লিক অ্যাসিডে সীমাবদ্ধ। নিউক্লিক অ্যাসিড সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের ঔৎসুক্য অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। এবার দেখা গেল যে, নিউক্লিক অ্যাসিড কেবল ভাইরাসেই নয়, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর কোষের ক্রোমোজোমে, পুরুষ ও স্ত্রী বীজে এবং ব্যাক্টিরিয়াতেও বর্তমান রহিয়াছে। যেখানেই

জীবনের প্রাথমিক অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, সেখানেই নিউক্লিক অ্যাসিডের সন্ধান পাওয়া গেল।

স্বাভাবিক কোষের ক্রোমোজোমে DNA জাতীয় নিউক্লিক অ্যাসিড দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতীয় যে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সর্বদা সমান। অতএব একই জাতীয় যে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষে DNA-এর পরিমাণও সমান থাকিবে এবং পরীক্ষার ফলেও ইহাই সমর্থিত হইয়াছে।

RNA প্রধানতঃ জীবকোষের সাইটোপ্লাজমে, সামান্য পরিমাণে নিউক্লিয়াসে এবং ক্রোমোজোমেও পাওয়া যায়। একই জীবের বিভিন্ন রকম কোষে RNA-এর মাত্রা সমান থাকে না। বিভিন্ন তন্তুর পুষ্টি ও ক্ষুধার বিভিন্ন অবস্থায় RNA সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে বলিয়া ইহার মাত্রারও পার্থক্য ঘটে।

উপরের বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, DNA জীবের বংশধারাকে রক্ষা করে এবং RNA জীব-কোষের প্রোটিন উৎপাদনের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

নিউক্লিক অ্যাসিড যদিও ব্যাক্টিরিয়া অপেক্ষা অনেক সরল, তথাপি ইহার গঠনপ্রণালী ও প্রকৃতি সম্যক উপলব্ধি করিতে আরও অনেক গবেষণার প্রয়োজন হইবে। ইহার আণবিক ওজন হইতে সমস্যার গুরুত্ব কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। হাইড্রোজেনের আণবিক ওজন ২, খুব সূক্ষ্মভাবে বলা চলে ২·০১৬। আর RNA-এর আণবিক ওজন এক ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে, তিন লক্ষের কাছাকাছি এবং DNA-এর আণবিক ওজন দশ অথবা বিশ লক্ষের মত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে নিউক্লিক অ্যাসিডের অণুর গঠন অনেকটা প্রোটিন অণুর মতই।

কোন কোন বিজ্ঞানীর ধারণা, জীবসৃষ্টির প্রথম প্রভাতে নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের মিলনে জীবনের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু কি ভাবে নিউক্লিক অ্যাসিড বা প্রোটিন গড়িয়া উঠিয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আজও সম্ভব নয়। তবে আমরা যদি মনে রাখি যে, পৃথিবীর আবির্ভাবের পর কোটি কোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেলে এখানে জীবনের সূচনা হয়, তবে এই সুদীর্ঘকালে অনেক বিচিত্র ব্যাপার ঘটা খুব অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে না।

আর একটি পর্যবেক্ষণে প্রাথমিক জীবন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের এই অনুমানের পক্ষে সমর্থন পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন অজৈব পদার্থ, যেমন—চিনি, লবণ, সোডা প্রভৃতি উত্তপ্ত জলে অধিক পরিমাণে দ্রবীভূত হয় এবং সেই দ্রবণের তাপমাত্রা হ্রাস পাইলে তাহা হইতে অতিরিক্ত চিনি, লবণ, সোডা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ আকারে পৃথক হইয়া পড়ে। জড়পদার্থের এই বিশেষ বিন্যাসকে আমরা ক্রিষ্টাল বা কেলাস বলিয়া থাকি। কেলাস শুধু জড়-পদার্থেই দেখা যায়। কোন জীবন্ত পদার্থে কেলাস দৃষ্ট হয় না। এই জন্য কেলাসিত বিন্যাস জড়-পদার্থের একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা হয়। বিস্ময়ের কথা এই যে, ভাইরাসকে কখনও কখনও কেলাসের আকারে দেখা যায়। আবার ভাইরাসের জীবন্ত রূপও প্রমাণিত হইয়াছে। ভাইরাসের দ্বৈতরূপের জন্য ইহাকে জড় ও জঙ্গমের যোগসূত্ররূপে মনে করা হয়।

সুদূর অতীতে এই পৃথিবীতে যে সকল মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ বিদ্যমান ছিল, তাহার সব কিছুই ছিল জড় ও নিষ্প্রাণ। তারপর একদিন কেমন করিয়া যেন 'জীয়নকাঠির' স্পর্শ লাগিল। জড় প্রাণময় হইল। তারপর সেই ক্ষুদ্র জীবন-কণিকা হইতে বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের বিবর্তন—অনেক কালের কথা। এক প্রায়ান্ধকার গুহায় জীবন-ধারার উৎসের উৎপত্তি। তারপর সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আজ সে স্রোতধারা সাগর-সঙ্গমের সন্নিহিত হইয়াছে। মনে হইতেছে, জীবনের উৎসের খুবই নিকটে আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি, কিন্তু না পৌঁছা পর্যন্ত আশ্বস্ত হইবার কারণ নাই।

ঘামের কথা

শ্রীসুব্রতকুমার পাল

কর্মের সঙ্গে ঘর্মের সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট, বিশেষতঃ আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমরা জীবিকা অর্জন করি। জনৈক মনীষী বলে গেছেন—জীবনের অধিকাংশ সাফল্যের মূলে ৯০ ভাগ ঘর্ম (Perspiration), আর দশভাগ প্রেরণা (Inspiration)। এখানে 'ঘর্ম' বলতে মনস্বী লেখক অবশ্য পরিশ্রমের আতিশয্যকেই বুঝাতে চেয়েছেন। তবু অফিস-যাত্রীর ভিড়ে ট্রামে-বাসে কিংবা অসহ্য গুমোটে শিথিল শয্যায় যখন অঝোরে ঘামতে থাকি, তখন মনটা যেন কেমন একটা ঘৃণাভরা বিরক্তিতে ভরে ওঠে। একটা লবণাক্ত ঈষৎ আঠালো নোংরা জলস্রাবে দেহটা যেন ক্লেদাক্ত হয়ে পড়ে। অথচ সেই ঘর্মস্রোত যখন কিছুক্ষণের মধ্যে শুকিয়ে যায়, তখন যেন কেমন একটা মৃদু-মধুর স্নিগ্ধতায় দেহমন ভরে ওঠে।

কিন্তু কি এই ঘর্ম? এর রাসায়নিক রূপ কি? দেহের ক্রিয়াকলাপে এর ভূমিকাই বা কি? এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

'ঘর্ম' হচ্ছে এক শ্রেণীর গ্রন্থি-নিঃসৃত রস। এদের বলা হয় ঘর্মগ্রন্থি (Sweat gland)। মানব-দেহের গ্রন্থি সাধারণতঃ দু' রকম—অন্তর্নিঃস্রাবী (Endocrine) এবং বহির্নিঃস্রাবী (Exocrine)। অন্তর্নিঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির নিজস্ব কোন নালী নেই এবং তাদের অন্তঃক্ষরণ, যাকে হর্মোন বা উত্তেজক রস বলে, সরাসরি রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। বহির্নিঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির নিজস্ব নালী আছে; সেই নালীপথে ক্ষরিত রস অভীষ্ট স্থানে গিয়ে পড়ে। ঘর্মগ্রন্থি বা স্বেদগ্রন্থি শেষোক্ত শ্রেণীতে পড়ে; অর্থাৎ এগুলি বহির্নিঃস্রাবী (Exocrine)। পায়ের পাতা এবং হাতের তালুতে স্বেদগ্রন্থি সর্বাধিক সংখ্যায় দেখা যায়।

স্বেদগ্রন্থিগুলি ত্বকের নীচে থাকে। প্রত্যেকটি গ্রন্থি একটি কুণ্ডলী-পাকানো সরু টিউব দিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি টিউব থেকে এক-একটি সরু নালী ত্বকের ভিতর দিয়ে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে। এই নালীগুলি ছিপিখোলবার স্ক্রুর মত প্যাঁচানো। ঘর্মগ্রন্থিগুলি সাধারণতঃ এপিক্রিন (Epicrine) শ্রেণীর; কারণ ক্ষরণের সময় গ্রন্থির কোষগুলির কোনও উল্লেখযোগ্য ক্ষয় হয় না। বাংলায় এগুলিকে অকোষক্ষয়ী স্বেদগ্রন্থি বলা যেতে পারে। বগল (Axilla), শ্রোণী, স্তনবৃন্ত এবং যোনি-সংলগ্ন বিশেষ কয়েকটি স্থানে অ্যাপোক্রিন (Apocrine) বা কোষক্ষয়ী স্বেদগ্রন্থি আছে। ক্ষরণের সময় এসব গ্রন্থির ক্ষরণকারী কোষের কিয়দংশ বিশ্লিষ্ট হয়ে ক্ষরিত ঘর্মের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। এই গ্রন্থিগুলি থেকে নিঃসৃত ঘর্মে কেমন একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ থাকে। শারীরতত্ত্ববিদ্ কুনো 'Physiology of Human Perspiration' নামক গ্রন্থে এই গন্ধের যৌন-তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, দক্ষিণ ইউরোপের নারীরা নাকি বগলের ঘামে রুমাল ভিজিয়ে তাঁদের দয়িতকে উপহার দেন। কানের খোলও (Cerumen) এক বিশেষ রকমের স্বেদ-গ্রন্থির ক্ষরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেকের মতে, স্তনও বিশেষ ধরণের স্বেদগ্রন্থির সমাহার মাত্র।

স্বেদগ্রন্থি-নিঃসৃত রসকেই আমরা বলি ঘর্ম। অবশ্য আমাদের তথাকথিত ঘামের সবটাই স্বেদ-

গ্রন্থির বিশুদ্ধ ক্ষরণ নয়। এই ঘামের সঙ্গে 'সিবাম' (Sebum) নামক একপ্রকার তৈল জাতীয় পদার্থ এবং অন্য উৎস থেকে জাত জল মিশ্রিত থাকে। সিবামক্ষরী গ্রন্থির দ্বারা সিবাম ক্ষরিত হয় এবং ঘর্ম-ক্ষরণ ছাড়া অন্যভাবেও আমাদের অগোচরে শরীর থেকে জল বেরিয়ে যায়। একে বলা হয়, অনুভূতি বহির্ভূত স্বেদন। উৎসান্তর-জাত সিবাম এবং জলও ঘামের সঙ্গে মিশে থাকে। স্বেদগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত অবিমিশ্র ঘর্মের রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এর শতকরা ৯৯·৭ ভাগই জলীয় উপাদান। কঠিন পদার্থের মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে লবণ। 'গলদ্‌ঘর্ম' অবস্থায় তিন ঘণ্টায় ১০ গ্র্যাম লবণ শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ঘামে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড, ইউরিয়া প্রভৃতি অল্প পরিমাণে থাকে। এপিক্রিন অর্থাৎ অকোষক্ষয়ী গ্রন্থির ঘাম অপেক্ষাকৃত তরলতর। অ্যাপোক্রিন অর্থাৎ কোষক্ষয়ী গ্রন্থির ক্ষরিত ঘাম অপেক্ষাকৃত গাঢ় এবং ঝাঁঝালো। নারীদের মাসিক ঋতুচক্রের (Menstrual Cycle) বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে এই সব গ্রন্থির গঠনাকৃতি ও ক্ষরণ-ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে।

বেশী জল খেলেই বেশী ঘাম হয়—এই ধারণা শারীরতত্ত্বের দিক থেকে কিঞ্চিৎ ভ্রান্ত। কারণ ঘামের পরিমাণগত হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে বাইরের আবহাওয়া এবং শরীরের আভ্যন্তরীণ তাপের তারতম্যের উপর। কাউকে বন্ধ ঘরে রেখে তার ভিতর দিয়ে বায়ু চালনা করে দেখা গেছে, বাতাসের তাপ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ঘামের পরিমাণও বাড়তে থাকে। শরীরের ভিতরকার তাপ বাড়লেও ঘামের পরিমাণ বাড়তে থাকে। পায়ের পাতা এবং হাতের তালুতে অবস্থিত স্বেদগ্রন্থির উপর তাপের এই তারতম্যের প্রভাব নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

স্বেদন সাধারণতঃ দু-রকমের : (ক) তাপজ ও (খ) মানসিক। তাপজ স্বেদন ঘটে বাইরের আবহাওয়া কিংবা দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থার তাপ বৃদ্ধির জন্যে। এই তাপ ত্বকের তাপ-সুবেদী (warm-sensitive) স্নায়ু-প্রান্ত এবং মস্তিষ্কের তাপ-পরিচালক কেন্দ্রকে উত্তেজিত করে ; ফলে প্রভূত ঘর্মক্ষরণ ঘটে।

মানসিক স্বেদন সাধারণতঃ বগল, হাতের তালু ও পায়ের পাতায় ঘটে থাকে। মস্তিষ্কের উর্ধ্বতর তাপকেন্দ্রসমূহ থেকে প্রেরণার ফলেই এরূপ মানসিক স্বেদন হয়ে থাকে।

অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম অথবা ব্যায়ামের সময় উভয় প্রকার স্বেদনই ঘটে থাকে। স্বেদগ্রন্থিগুলি Cholinergic, অর্থাৎ কোলিন সহায় স্বতন্ত্র বা Sympathetic স্নায়ুর দ্বারা পরিচালিত হয়। সুষুম্নাকাণ্ড, মেডালা, গুরুমস্তিষ্কের বহিরাংশে স্বেদন-কেন্দ্র আছে। এদের প্রত্যক্ষ বা প্রত্যাবর্তী (Reflex) উদ্দীপনার দ্বারা ঘর্মক্ষরণ হয়। স্বেদগ্রন্থিগুলির জন্যে বিশেষ শ্রেণীর স্নায়ুর ব্যবস্থা আছে এবং তাদের জন্যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্তরে স্বতন্ত্র কেন্দ্রও রয়েছে। এথেকে অনুমান করা যায়, দেহের ক্রিয়াকলাপে ঘর্মক্ষরণের নিশ্চয়ই কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

থার্মোস্ ফ্লাস্কে গরম দুধ রাখলে সেটা সহজে ঠাণ্ডা হয় না, আবার থার্মোস্ ফ্লাস্কে ঠাণ্ডা জল রাখলেও সহজে গরম হয় না ; কারণ বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে দুধ বা জলের তাপ আদান-প্রদান বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা বন্ধ রাখা হয়েছে। আমাদের শরীরটাও যেন একটা থার্মোস্ ফ্লাস্ক। বাইরের তাপমাত্রা অনেক বেড়ে গেলেও আমাদের দেহের তাপমাত্রা বিশেষ কিছুই বাড়ে না ; আবার বাইরের আবহাওয়ার তাপ অনেক কমে গেলেও দেহের তাপ প্রায় কিছুই কমে না। কিন্তু থার্মোস্ ফ্লাস্কের মত আমাদের দেহ জড় বা নিষ্ক্রিয় নয়। আমাদের দেহ সক্রিয়, সচেতন এবং বিচারশীল থার্মোস্ফ্লাস্কে তাপের সমতা রক্ষা করা হয় নিছক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে, কিন্তু আমাদের দেহের তাপসাম্য রক্ষিত হয় জৈব উপায়ে।

মানব-শরীরে তাপসাম্য রক্ষার কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এসব ব্যবস্থার কতকগুলি নিছক যান্ত্রিক বা ভৌত এবং কতকগুলি আবার রাসায়নিক। শরীরের অভ্যন্তরে অহরহ রাসায়নিক ভাঙা-গড়া চলছে। এর ফলে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই বিপাক-ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন তাপ শরীরকে গরম রাখে। আবার বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে তাপবিনিময় করেও দেহের তাপ-সাম্য সংরক্ষিত হয়। দেহের আভ্যন্তরীণ তাপসাম্য রক্ষায় মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্র এবং অন্তর্নিঃস্রাবী (Endocrine) গ্রন্থিগুলির অবদানও কম নয়।

ঘর্মক্ষরণ দেহের তাপ হ্রাসের অন্যতম প্রধান উপায়। আগেই বলেছি, ঘামে প্রায় ৯০ ভাগ জল আছে এবং এই জল শরীরের ভিতর থেকে নেওয়া হয়। এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, জলের বাষ্পীভবনের জন্যে তাপের প্রয়োজন। ঘাম যখন শরীরের বাইরে আসে, তখন ঘামের জল বাষ্পীভূত হতে থাকে। এই বাষ্পীভবনের জন্যে যে তাপ প্রয়োজন তা শরীর থেকে টেনে নেয় ও তার ফলে শরীর স্নিগ্ধ ও শীতল হয়। শরীরের তাপ যখন কোন কারণে বেড়ে যায়, তখন প্রচুর ঘর্মক্ষরণ হতে থাকে এবং সেই ঘাম বাষ্পীভূত হবার ফলে শরীরের অতিরিক্ত উত্তাপটুকু বেরিয়ে যায়। এই বাষ্পীভবন বাইরের আবহাওয়ার তাপ এবং অবস্থার উপরও কিছুটা নির্ভর করে। বাতাস শুষ্ক থাকলে বাষ্পীভবন ত্বরান্বিত হয়। এজন্যে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের দারুণ গরমেও আমরা অতটা অস্বস্তি বোধ করি না, যতটা করি বর্ষার গুমোট গরমের দিনে। গুমোট আবহাওয়ায় বাতাস উষ্ণ এবং জলীয় বাষ্পসম্পৃক্ত থাকে বলে বাষ্পীভবন, তাপ-পরিবহন এবং তাপ-পরিচলন প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা যথেষ্ট তাপক্ষয় হয় না। শীতকালে শরীরের প্রধান লক্ষ্য তাপ-সংরক্ষণ; তখন ঘর্মক্ষরণ অত্যন্ত হ্রাস পায়। এভাবে ঘর্মক্ষরণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়। এজন্যে দেহের তাপসমতা সংরক্ষণে ঘামের গুরুত্ব এত বেশী।

উপসংহারে সর্বসাধারণের অবশ্য-জ্ঞাতব্য আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঘামের সঙ্গে রক্ত থেকে প্রচুর পরিমাণ লবণ বেরিয়ে যায়। লবণ-ক্ষয় ঘর্মক্ষরণের সমানুপাতিক; অর্থাৎ ঘর্মক্ষরণ যত বাড়ে, লবণ-ক্ষয়ও সেই অনুপাতে বেড়ে যায়। সে জন্যে অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য কোনও কাজ করবার পরেই ঢক্‌ঢক করে জল পান করা কদাচ উচিত নয়। কারণ অত্যধিক শারীরিক শ্রমের ফলে দেহের অভ্যন্তরে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় এবং তার ফলে মস্তিষ্কের ঘর্মকেন্দ্রগুলি উত্তেজিত হয়ে ঘর্মক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। ঘর্মক্ষরণের পরিমাণের সঙ্গে লবণ-ক্ষরণও বেড়ে যায়। এর উপর যদি আবার জল-পান করা হয়, তাহলে ঘর্মক্ষরণ আরও বাড়বে এবং শরীর থেকে আরও লবণ বেরিয়ে যাবে। এর ফলে রক্তে লবণের মাত্রা আরও হ্রাস পাবে। তাছাড়া জলপানে রক্ত বেশী তরল হয়ে যাওয়াতেই রক্তে লবণের আনুপাতিক মাত্রা কমে যায়। রক্তে লবণের পরম (Absolute) এবং আনুপাতিক, এই উভয় মাত্রাই হ্রাস পায় বলে হিট-ক্র্যাম্পের অবাঞ্ছিত উপসর্গগুলি, যেমন—ব্যাপক বেদনাদায়ক পেশী-সংকোচন, অবসাদ, স্নায়ুদৌর্বল্য, মাথাধরা, মাথাঘোরা, বমনের ইচ্ছা প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

ভারতবর্ষের লৌহ-আকরিক

শ্রীকানাইলাল চক্রবর্তী

পৃথিবীর লৌহ-শিল্প প্রসারে ভারতের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লৌহ-আকরিক রপ্তানী করে ভারতবর্ষ বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে আজ পর্যন্ত অবিরত যে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চলেছে, তার ফলে এদেশের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই কিছু না কিছু লৌহ-আকরিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিশিষ্ট ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক প্রমথনাথ বসু ছিলেন এই সন্ধানকার্যের অগ্রণী। ১৯০০ শতকে উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ অঞ্চলের অফুরন্ত লৌহভাণ্ডার আবিষ্কার করে তিনি ভারতবর্ষের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় এক নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন। আজ ভারতের আভ্যন্তরীণ শিল্প উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। এই শিল্পের প্রধান রসদ হচ্ছে লৌহ-আকরিক। তাই এদেশে লৌহ-আকরিকের সন্ধানকার্য এবং উৎপাদনও বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন।

ভারতবর্ষে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লৌহ-আকরিকের সন্ধান পাওয়া যায়; যথা—প্রাককেম্ব্রিয় যুগের স্তরীভূত লৌহ-আকরিক, আগ্নেয় লৌহ-আকরিক ও রূপান্তরিত লৌহ-আকরিক (জ্ঞান ও বিজ্ঞান—৮ম সংখ্যা, ৪৫০-৫১ পৃঃ, ১৯৬০)। এই-গুলির ভিতর প্রথম শ্রেণীর লৌহ-আকরিকের পরিমাণই সবচেয়ে বেশী। পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এগুলিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সুপিরিয়র হ্রদ অঞ্চলের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ-আকরিকের সঙ্গে অনায়াসেই তুলনা করা চলে। তাছাড়া ব্রেজিল, চীন, জাপান, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি দেশেও রয়েছে এই শ্রেণীর লৌহ-সম্পদ। এই আকরিকে লৌহের পরিমাণ থাকে শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী। ভারতবর্ষে এই জাতীয় লৌহের প্রাচুর্য থাকায় আগ্নেয় ও রূপান্তরিত লৌহ-আকরিকের ব্যবহার আজও সুরু হয় নি। তাছাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর উভয় আকরিকে লৌহের পরিমাণও কম থাকে এবং তাতে লৌহ ছাড়াও থাকে—ভেনাডিয়াম, টাইটানিয়াম, সিলিকা প্রভৃতি পদার্থ। এসব লৌহ-আকরিক সাধারণতঃ হিমাটাইট ও ম্যাগ্‌নেটাইট মণিক দ্বারা গঠিত।

ভৌগোলিক বিস্তৃতি

এখন ভারতবর্ষে লৌহ-আকরিকের বিস্তৃতি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। আগেই বলেছি যে, ভারতীয় যুক্তরাজ্যের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই কিছু না কিছু লৌহ-আকরিক পাওয়া যায়। এদের ভিতর কতকগুলি মোটেই কার্যোপযোগী নয়; যথা—আসামের লৌহ-আকরিক, বাংলাদেশের বর্ধমান, রাণীগঞ্জ ও মেদিনীপুর জেলার লৌহ-আকরিক, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের লৌহ-আকরিক প্রভৃতি। ভারতবর্ষের লৌহ-আকরিকের যেগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য, তাদের ভিতর বিহারের সিংভূম জেলার লৌহ-আকরিক, মধ্যপ্রদেশের বাস্তার ও বৈলাডিলা অঞ্চল, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও কেওঞ্জর জেলা এবং মহীশূর, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যের লৌহ-আকরিক। এই সবগুলিই স্তরীভূত লৌহ-আকরিকের শ্রেণীভুক্ত। তাছাড়া বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ল্যাটেরাইট নামে যে লৌহ-আকরিক পাওয়া যায়, তাতে লৌহের পরিমাণ হচ্ছে, শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ। বর্তমানে ভারতবর্ষের লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলিতে

এই লৌহ-আকরিকই প্রধান রসদ যোগাচ্ছে। কিন্তু প্রাচীনকালে লৌহের প্রধান উৎপত্তি-স্থল ছিল উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ, মধ্যভারত ও বাংলা-দেশ প্রভৃতি অঞ্চল। এসব অঞ্চলে সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে লৌহ প্রস্তুতের ছোটখাটো কারখানা ছিল এবং লৌহ প্রস্তুত করাই ছিল এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। বাংলা দেশের বীরভূম অঞ্চলে এই লৌহ-শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করেছিল বলে জানা যায়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চলে মোট সত্তরটি লৌহ গলাবার চুল্লী ছিল এবং তাতে বছরে মোট ২,৪০০ টন লৌহ প্রস্তুত হতো। এই লৌহ অবশ্য খুব উন্নত-স্তরের ছিল না এবং তার দাম ছিল মণ প্রতি পাঁচ থেকে দশ টাকা। বাংলা দেশের বর্ধমান জেলাও সেই সময়ে লৌহ-শিল্পে ভারতবর্ষে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। এখানেই পরে বার্নপুরের বিখ্যাত লৌহ-নগরীর সৃষ্টি হয়েছে। ১৮৫০ থেকে সুরু করে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাজ অঞ্চলে কাঠকয়লা পুড়িয়ে যে লৌহ তৈরী হতো, তা পাশ্চাত্য দেশসমূহেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল।

আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুতের নানাবিধ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। তাই দেশীয় পদ্ধতিগুলিও ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মাদ্রাজ, মধ্যভারত ও বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আজও সেই সব স্থানীয় শিল্পের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

মানচিত্রে লৌহ-আকরের অবস্থান-স্থল চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই সঙ্গে প্রধান লৌহ-আকরের অবস্থানসহ ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র দেওয়া হলো।

ভূতাত্ত্বিক অবস্থান

প্রাককেম্ব্রিয় যুগ থেকে সুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ভারতে সব যুগের প্রস্তর-শ্রেণীতেই লৌহের অবস্থান নিরূপিত হয়েছে। এদের ভিতর প্রাক-কেম্ব্রিয় যুগের লৌহ-আকরিকের পরিমাণই সর্বাধিক। এগুলির পরিমাণ অবশ্য আজও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নি। তাই দেশের সর্বাত্মক শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ভারতে লৌহ-আকরিকের ভূতাত্ত্বিক অবস্থান ও পরিমাপের একটি মোটামুটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো।

ভূতাত্ত্বিক যুগ ও লৌহ-আকরিক	অবস্থান	পরিমাণ
প্রাককেম্ব্রিয় যুগ		
স্তরীভূত লৌহ-আকরিক	বিহার—সিংভূম	৮০০ কোটি টন
	উড়িষ্যা—ময়ূরভঞ্জ, কেওঞ্জর	৮০ „ „
	মধ্যপ্রদেশ—বাস্তার, দ্রুগ,	১২৪৮০ লক্ষ টন
	চান্দা	১৩৬ „ „
	মহীশূর—সিমোগা	৭৬৪০ „ „
	মাদ্রাজ—সান্দুর	
	বোম্বাই—রত্নগিরি	১৫০ „ „
আগ্নেয় লৌহ-আকরিক	বিহার—সিংভূম	
	উড়িষ্যা—ময়ূরভঞ্জ, কেওঞ্জর	
	মহীশূর—হাসান, টুমকর	১৩১০ „ „
রূপান্তরিত লৌহ-আকরিক	বোম্বাই—নাগপুর	
	মাদ্রাজ—সালেম, ত্রিচিনোপল্লী	৩০৪০ লক্ষ টন
	মহীশূর—সিমোগা	৮৪০ „ „
	বিহার—পালামৌ	৬ „ „
কুডাপ্পা যুগ		
স্তরীভূত লৌহ-আকরিক	মাদ্রাজ—কুডাপ্পা জেলা	৪০,০০০ টন
	মধ্যপ্রদেশ—গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বিজাওয়ার	৬৫০ „ „
গণ্ডোয়ানা যুগ		
স্তরীভূত লৌহ-আকরিক	বাংলা দেশ—রাণীগঞ্জ	৬২,০০০ টন
	বিহার—রাজমহল ও আওরঙ্গা জেলা	

টার্শিয়ারী যুগ

স্তরীভূত লৌহ-আকরিক	আসাম—জয়ন্তিয়া
	উত্তর প্রদেশ—কুমায়ুন জেলা
	হিমাচল প্রদেশ—মান্দি
রূপান্তরিত লৌহ-আকরিক	বাংলা দেশ—মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলা
	দাক্ষিণাত্যের ল্যাটেরাইট প্রস্তর

এসব আকরিকের মধ্যে প্রাককেম্ব্রিয় যুগের স্তরীভূত লৌহ-আকরিকে লৌহের ভাগ শতকরা ৬০-এরও অধিক। সে জন্যে একে প্রথম শ্রেণীর আকরিক হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এগুলি লৌহ নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আগ্নেয় ও রূপান্তরিত আকরিকে লৌহ ছাড়াও থাকে—টাইটানিয়াম, ভেনাডিয়াম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ। কুডাপ্পা ও গণ্ডোয়ানা যুগের স্তরীভূত লৌহ-আকরিকের কোনটাতেই লৌহের পরিমাণ শতকরা ৪৫ ভাগের বেশী নয়। তাছাড়া এতে অধিক পরিমাণ সিলিকা থাকায় লৌহ প্রস্তুতের কাজে ব্যবহৃত হয় না।

ব্যবহার

লৌহ প্রস্তুতের কাজে লৌহ-আকরিকের ব্যবহার কারও অজানা নয়। এই লৌহকে একপ্রকার বিশেষ চুল্লীতে পুড়িয়ে ইস্পাত তৈরী করা হয়। সাধারণ ইস্পাত ছাড়াও কয়েক প্রকার বিশেষ গুণসম্পন্ন ইস্পাত আছে, যা সহজে ভেঙ্গে যায় না বা মরচে ধরে না। এসব ইস্পাত তৈরীর কাজে লৌহ ছাড়া আরও কয়েকটি ধাতুর প্রয়োজন হয়; যথা—ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, টাইটানিয়াম প্রভৃতি। এসব ইস্পাত আবার ব্যবহৃত হয় উড়োজাহাজ, মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী, সাইকেল প্রভৃতি এবং নানাপ্রকার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরির কাজে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ প্রথম দুই প্রকার ইস্পাতই তৈরী হয়ে থাকে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতবর্ষে প্রতি বছর ৬০ লক্ষ টন লৌহ ও ইস্পাত তৈরী হবে। এর ভিতর বিহারের জামসেদপুরের কারখানায় ২০ লক্ষ টন, উড়িয়্যার রাউলকেল্লায় ১০ লক্ষ টন এবং বাংলা দেশের বার্নপুর, দুর্গাপুর ও মধ্যপ্রদেশের ভিলাই কারখানার প্রতিটিতে ১০ লক্ষ টন করে লৌহ ও ইস্পাত তৈরী হওয়ার কথা আছে। এই লৌহের অধিকাংশই দেশের আভ্যন্তরীণ শিল্পে ব্যবহৃত হবে, আর কিছু পরিমাণ বিদেশেও রপ্তানী করা হবে। লৌহ-ইস্পাত তৈরীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে লৌহ-আকরিকের উৎপাদনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রতি বছর প্রায় ৭০ লক্ষ টন লৌহ-আকরিক উৎপন্ন হচ্ছে। এই লৌহ-আকরিক একদিকে যেমন দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাচ্ছে, অপরদিকে আবার জাপান, পোল্যাণ্ড, জার্মেনী, চেকোশ্লোভিয়া, যুগোশ্লোভিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানী করে ভারতবর্ষ প্রতি বছর প্রায় দশ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী মুদ্রাও অর্জন করছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে বলেই আশা করা যায়। কাজেই লৌহ-আকরিকের উৎপাদনও বেড়ে যাবে যথেষ্ট। কিন্তু লৌহ ও ইস্পাতের প্রচুর উৎপাদন সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে প্রতি বছর প্রায় দেড়-শো কোটি টাকা মূল্যের লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্যাদি আমদানী করতে হয়। এদেশে উৎপন্ন লৌহ ও ইস্পাত বিদেশে রপ্তানী করে ভবিষ্যতে এর খানিকটা ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা আছে।

ভারতবর্ষে লৌহ ও ইস্পাত তৈরির কাজে

কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর আকরিকই ব্যবহার করা হয়। এই শ্রেণীর আকরিকের অপর্যাপ্ত সঞ্চয় থাকায় আজও নিম্ন শ্রেণীর আকরিকের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এমনও হতে পারে, যখন এই উচ্চ শ্রেণীর লৌহের পরিমাণ হ্রাস পাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম শ্রেণীর লৌহ-আকরিকের সঞ্চয় যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তারা বাধ্য হয়ে নিম্ন শ্রেণীর লৌহ আকরিক শোধন করে দেশের লৌহ ও ইস্পাত তৈরির কাজ চালু রেখেছিল। জাপান বর্তমানে একই প্রথায় সাধারণ ল্যাটেরাইট প্রস্তরকে শোধন করে লৌহ-শিল্পে ব্যবহার করছে। কাজেই ভারতবর্ষে লৌহ-ইস্পাত শিল্পের প্রভূত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর আকরিকগুলিকে শোধন করে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, সে কথা বিশেষভাবে আলোচনা করে আগে থেকেই ভেবে রাখা উচিত।

কৃষি-বিজ্ঞানে পারমাণবিক শক্তি

শ্রীমুরারী চক্রবর্তী

পারমাণবিক শক্তির কথা শুনলেই সর্বাগ্রে তার সংহার মূর্তিটিই চোখের সামনে ভেসে উঠে। কত বাদ-বিতণ্ডা, কত শীতল যুদ্ধই না চলেছে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে—পারমাণবিক শক্তিতে ক্ষমতা কার কত বেশী, কে কত সহজে অন্য একটা দেশকে ধ্বংস করে দিতে পারে। কৃষি-বিজ্ঞানের সঙ্গে এই পারমাণবিক শক্তির আবার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

পারমাণবিক শক্তি একদিকে যেমন ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত হতে পারে, অন্য দিকে তেমনই আবার এই শান্তি প্রতিষ্ঠা, সৃষ্টির পূর্ণতা সাধন ও মানব-কল্যাণে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এই শক্তিকে শিল্প-বিজ্ঞানে, চিকিৎসা ও জীব-বিদ্যায় নিয়োগ করবার ফলে মানুষের সমৃদ্ধির পথ আজ প্রশস্তর হতে চলেছে। অপরিমিত অর্থব্যয় করে পারমাণবিক শক্তিকে ধ্বংসাত্মক কাজে না লাগিয়ে যদি মানব-কল্যাণের উদ্দেশ্যে লাগানো হতো, তবে হয়তো বা এতদিনে মানুষের অনেক দুঃখ-কষ্টেরই অবসান ঘটতো—রোগ-শোক মানুষের করায়ত্ত হতো, মানুষ সর্বত্র স্বচ্ছলতার মধ্যেই বাস করতো।

কৃষি-বিজ্ঞানও পারমাণবিক শক্তির প্রভাব থেকে বাদ পড়ে নি, ইতিমধ্যেই যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে কৃষি-বিজ্ঞানে এক দ্রুত পরিবর্তনের সূচনা দেখা যাচ্ছে। উদ্ভিদ-জগতে এতদিন প্রকৃতি দেবীর একাধিপত্য ছিল। এই পারমাণবিক শক্তির প্রভাবে মানুষ এ-ক্ষেত্রেও হয়তো একদিন বিরাট সাফল্য অর্জন করবে।

পারমাণবিক শক্তি ও আইসোটোপ

ইউরেনিয়াম-২৩৫-কে (থোরিয়াম বা প্লুটো-নিয়াম) নিউট্রন দিয়ে বিভাজিত করলে কিছুটা ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং এর ফলে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়। এই তাপে জলকে উচ্চ চাপের বাষ্পে পরিণত করে তার সাহায্যে টারবাইন চালিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়। পারমাণবিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিবর্তিত করে বিভিন্ন প্রয়োজনে নিয়োজিত করবার ব্যাপারের এই হলো মূল কথা। রিয়্যাক্টরে এরূপ ইউরেনিয়ামের বিভাজন সুসংবদ্ধভাবে হয়ে থাকে। বিভাজনের ফলে প্রচণ্ড তাপ ছাড়াও তীব্র গতিসম্পন্ন নিউট্রন নির্গত হয়। বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে নিউট্রনের

সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। নিউট্রনের গতি কিছুটা মন্থর করবার পর তাকে দিয়ে মৌলিক পদার্থকে আঘাত করলে নিউট্রনটি কেন্দ্রীনে ঢুকে যায়। এর ফলে মৌলিক পদার্থের ভর একক বেড়ে গিয়ে সেটি একটি অস্থায়ী আইসোটোপে পরিণত হয়। রাসায়নিক প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও আইসোটোপের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্যে বিভিন্ন কাজে আজ এর ব্যাপক ব্যাবহার চলছে।

অস্থায়ী আইসোটোপ তেজস্ক্রিয়। নানারূপ রশ্মি বিকিরণ করে এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ ক্রমশঃ স্থায়ী কোন পদার্থে পরিণত হয়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের অন্য কোন পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগ হলেও গাছপালা বা প্রাণীদেহে প্রবেশ করালে তার রশ্মি বিকিরণের ক্ষমতা নষ্ট হয় না। বাইরে থেকে গাইগার-মুলার কাউন্টারের সাহায্যে এর গতিপথ নির্ণয় করা যায়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপকে পারমাণবিক শক্তির উপজাত বস্তু বলা যেতে পারে। কাজেই উৎপাদনের খরচাও সামান্য। রিয়্যাক্টরের সাহায্যে প্রায় যে কোন মৌলিক পদার্থের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া যেতে পারে। এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপই আজ নিত্য নতুন জ্ঞানের সন্ধান দিচ্ছে, প্রকৃতির রহস্য ভেদ করতে এই আইসোটোপই বিজ্ঞানীদের প্রধান অবলম্বন।

বংশ-প্রকৃতির পরিবর্তন
(Gene Mutation)

যাবতীয় প্রাণীরই বংশানুক্রমিক আকার ও প্রকৃতির বাহক জৈবসূত্র বা ক্রোমোজোম। এই ক্রোমোজোমের জন্যেই বিভিন্ন ফলের বিভিন্ন রূপ। আসলে ক্রোমোজোমের মধ্যে ডেসোক্সি রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড (Desoxi ribonuclic acid অর্থাৎ DNA) বলে একরকম পদার্থ আছে; সেটিই বংশের ধারা বহন করবার জন্যে দায়ী। সব উদ্ভিদের DNA একই মৌলিক পদার্থ সমন্বিত, শুধু গঠন-বিন্যাস প্রভেদ।

বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের এক একটা নিজস্ব DNA আছে। গঠন-বিন্যাসে একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই। এই গঠন-বিন্যাসকে পরিবর্তন করে দিতে পারলেই ফুল-ফলের আকৃতি-প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়ে যায়। এক্স-রে অথবা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বিটা রশ্মির দ্বারা DNA-এর গঠন-বিন্যাস পরিবর্তন করা সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এমন কি, নতুন কোন গঠনের DNA কৃত্রিম উপায়ে মৌলিক উপাদান থেকে উৎপন্ন করাও বোধ হয় একদিন অসম্ভব হবে না! এই DNA কোন গাছে প্রয়োগ করে নতুন ধরণের ফল-ফুল উৎপন্ন করা যাবে। শাক-সব্জী, ফল-মূল ইচ্ছামত বড়, ছোট, মিষ্টি বা টক, যেমন খুসী করা যাবে।

ফটোসিন্থেসিস

সামান্য বীজ থেকে উদ্ভূত উদ্ভিদ-শিশু বিরাট মহীরুহে পরিণত হচ্ছে। কোন্ উপাদানের সাহায্যে সে তার কলেবর বৃদ্ধি করছে? উদ্ভিদের খাদ্যের শতকরা ৯৫ ভাগ আসে বায়ুমণ্ডল থেকে; আর ৫ ভাগ মাটি থেকে। বাতাস থেকে উদ্ভিদ কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে এবং সূর্য-রশ্মির সংস্পর্শে এই উপাদান পাতার ক্লোরোফিলের সাহায্যে শর্করাতে পরিণত হয়। শর্করা প্রধানতঃ সেলুলোজ, ষ্টার্চ ইত্যাদি বিভিন্নরূপে উদ্ভিদের দেহ, ফল ও শস্যের মধ্যে বর্তমান।

কথা হলো, গাছ কেমন করে এই সাধারণ কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্পকে সূর্যকিরণের সাহায্যে নিজের এবং প্রাণীদের জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্য উৎপন্ন করে? উদ্ভিদ-জগৎ যেন খাদ্য উৎপাদনের একটা বিরাট কারখানা। এখানে শুধু খাদ্যই প্রস্তুত হচ্ছে না, আমাদের জ্বালানী শক্তির উৎস—কয়লা ও তেলের উৎপত্তি এই উদ্ভিদ

থেকেই। এই উদ্ভিদই পৃথিবীকে প্রাণীদের জীবন-ধারণের উপযোগী করে রেখেছে। উদ্ভিদই বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে প্রাণীদের জীবন রক্ষাকারী অক্সিজেন গ্যাস বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছে। তা না হলে সমগ্র বায়ুমণ্ডল কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে পরিপূর্ণ হয়ে থাকতো এবং পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ঘটতো কিনা সন্দেহ।

গাছপালা যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প থেকে সূর্যকিরণের সহায়তায় খাদ্য উৎপাদন করছে—তাকে বলা হয় ফটোসিন্থেসিস। এই ফটোসিন্থেসিসের কার্য-প্রণালী কোন প্রকারে একবার সম্পূর্ণরূপে জানতে পারলে উদ্ভিদ-জগৎ ছাড়াই মানুষের পক্ষে প্রকৃতির কারখানায় চাউল, গম ইত্যাদি প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। তখন হয়তো লোহা, ইস্পাত দিয়ে মানুষ খাদ্য উৎপাদনের কারখানা করবে। একদিকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প কাচামাল হিসাবে দিলে হাজার হাজার টন খাদ্যশস্য অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

এতটা বিশ্বাস করতে না পারলেও এটা হয়তো মোটেই অসম্ভব হবে না যে, ফটোসিন্থেসিসের কৌশলটি আয়ত্ত করতে পারলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমাধা করা যাবে। ক্লোরোফিল, যা ফটোসিন্থেসিসের প্রক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে, তা যথেষ্ট কার্যক্ষম নয়; ফলে বেশী সূর্যকিরণ ও অন্যান্য উপাদান কাজে লাগাতে পারে না। পৃথিবীতে সূর্যের সমস্ত আপতিত রশ্মির দশ হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম উদ্ভিদ শক্তিরূপে সঞ্চিত করছে। এই সঞ্চিত শক্তিই কয়লা ও তেল থেকে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কাজে লাগছে। ক্লোরোফিল অনুঘটককে যদি কোন প্রকারে অধিকতর কার্যক্ষম করা যায়, তাহলে উদ্ভিদের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে বেড়ে উঠা কিছুই কঠিন হবে না।

তেজস্ক্রিয় কার্বন থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরী করে ফটোসিন্থেসিসের কৌশল সম্বন্ধে গবেষণা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আশাপ্রদ ফলও পাওয়া গেছে। আগে মনে করা হতো, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প সূর্যকিরণের সংস্পর্শে ফরম্যালডিহাইড-এ পরিণত হয়। ফরম্যাল-ডিহাইড পলিমেরাইজ করে শর্করা জাতীয় উপাদানে রূপান্তরিত হয়।

তেজস্ক্রিয় কার্বনসহ কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে দেখা গেছে, পাতার রিবুলোজ ডাইফস্‌ফেট কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প শোষণ করে ফস্‌ফো-গ্লিসারিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এটি পরে সূর্যকিরণের সাহায্যে অন্যান্য ফস্‌ফেটে পরিবর্তিত হয়ে অবশেষে শর্করায় পরিণত হয়। ফটো-সিন্থেসিসের প্রাথমিক সোপান জানা গেলেও এখন পর্যন্ত অধিকাংশই রহস্যাবৃত। কেমন করে সূর্যরশ্মি সংরক্ষিত এবং রূপান্তরিত হচ্ছে—আজও তা জানা যায় নি।

উদ্ভিদের ক্লোরোফিল অনুঘটক উৎপন্ন করবার ক্ষমতা ব্যাহত করে অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ বিনষ্ট করবার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হচ্ছে। অ্যামাইনো-ট্রাইয়েজোল এরূপ একটি বনজ উদ্ভিদ ধ্বংসকারী রাসায়নিক দ্রব্য। আবার আশাতীত অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ভিদকে আকারে দ্বিগুণ বা তিন গুণ বাড়িয়ে দেওয়া যায়। জিবারিলিক অ্যাসিড নামে এরূপ একটি রাসায়নিক দ্রব্য সম্প্রতি জাপানে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন গবেষণাগারে এ নিয়ে গবেষণা চলছে।

মাটির কার্বন ডাইঅক্সাইড

মাটিতে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে, তাও উদ্ভিদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তেজস্ক্রিয় কার্বন সমন্বিত কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে—মাটির কার্বন ডাইঅক্সাইড শিকড়ের পাইরোভিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিশে অন্যান্য পদার্থে পরিণত হয়ে অবশেষে সাইট্রিক,

কিটোগ্ন টারিক অ্যাসিড ইত্যাদি অ্যাসিড হিসাবে পাতার ফটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে' মাটির কার্বন ডাই-অক্সাইডকে শর্করায় পরিণত করে। নাইট্রেট্ও অনেকটা এই প্রকারে শিকড়ের মধ্য দিয়ে পাতায় গিয়ে ফটোসিন্থেসিসের ফলে প্রোটিনে পরিণত হয়। জীবাণুর দ্বারা মাটিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইডের অম্লাত্মক প্রকৃতির জন্যে অনেক খনিজ পদার্থ (যা সাধারণতঃ অদ্রবণীয়) এর প্রভাবে দ্রবীভূত হয়ে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হয়। সুতরাং উদ্ভিদের সন্তোষজনক পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে যাতে মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হতে পারে, এমন অনুকূল ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার।

ট্রেস্ এলিমেণ্ট

উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও পটাসিয়াম ছাড়াও বোরন, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, গন্ধক ইত্যাদি সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হয়ে থাকে। এগুলির পরিমাণ এত অল্প যে, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ছাড়া অন্য উপায়ে সঠিক-ভাবে অস্তিত্ব বিশ্লেষণ করে বের করা খুবই কঠিন। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে এসব ট্রেস্-এলিমেণ্টের প্রয়োজনীয়তা নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তেজস্ক্রিয় লোহা ও ফস্‌ফরাস দিয়ে দেখা গেছে, ক্লোরোসিস রোগের সময় লোহাও উদ্ভিদ-দেহে প্রবেশ করতে পারে না, ফস্‌ফরাস লোহার প্রবেশ পথে বাধা সৃষ্টি করে। যথেষ্ট লোহার অভাবে উদ্ভিদে ক্লোরোফিলের পরিমাণ কমে যায় এবং ফটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে; ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

রাসায়নিক সার

তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস দিয়ে সার তৈরী করে অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে। কোন্ গাছ কোন্ সময়ে কতটা ফস্‌ফরাস মাটি থেকে বা প্রদত্ত রাসায়নিক সার থেকে নেয়, তা বের করা যায়। এই তথ্য থেকে যথাযথ সার প্রয়োগ করে অপচয় বন্ধ করা সম্ভব। অন্যান্য সারের বেলায়ও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দিয়ে এসব প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যেতে পারে।

নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও পটাসিয়ামের লবণ মিলিয়ে সুষম সার তৈরী করা হয়। এই উপাদান-গুলি কোন্ অনুপাতে থাকলে বিশেষ কোন্ শ্রেণীর গাছের বেলায় সবটা ব্যবহৃত হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে বা ধুয়ে চলে যাবার মত বেশী থাকবে না, তা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। সার বা ট্রেস্ এলিমেণ্টের কোন কোন যৌগিক পদার্থের দ্রবণ পাতায় 'স্প্রে' করে দিলেও গাছ গ্রহণ করতে পারে।

কীটপতঙ্গ-নাশক রাসায়নিক দ্রব্য

শস্য নষ্ট করবার ব্যাপারে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো নানাপ্রকার কীটপতঙ্গ। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দিয়ে এদের প্রকৃতির খুঁটিনাটি বিষয় জেনে প্রতিরোধমূলক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। অনেক পোকা আছে, যারা D.D.T-কে অন্য একটা প্রভাবহীন বস্তুতে পরিণত করে ফেলতে পারে। তাছাড়া D.D.T-তে কেবল পোকারই নয়, উদ্ভিদেরও ক্ষতি হতে পারে। ফলে, কোন কোন দেশে D.D.T-এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। আরও বেশী ফলপ্রদ এবং শক্তিশালী অথচ উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, এরূপ ইন্‌সেক্টিসাইড তৈরী করা হয়েছে।

ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল ইথিনিল কার্বিনল ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রিত দ্রবণে শস্যবীজ ডুবিয়ে নিলে কীটপতঙ্গ গাছের আর অনিষ্ট করতে পারে না।

শুধু উদ্ভিদই নয়, অনেক মজুত শস্যও পোকায় নষ্ট করে ফেলে। সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন শস্যের

৫ ভাগ পোকায় নষ্ট করে বলে অনুমান করা হয়। এই শস্য রক্ষা করতে পারলে একটা ছোটখাটো দেশের অধিবাসীদের কয়েক বছর ধরে খাদ্যের যোগান দেওয়া চলতো। মিথাইল ব্রোমাইডের বাষ্প দিয়ে মজুত শস্য পোকার হাত থেকে রক্ষা করবার উপায় সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগানো হচ্ছে।

খাদ্য-সংরক্ষণ

খাদ্য-সংরক্ষণে তেজস্ক্রিয় পদার্থের আর একটা উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ হয়ে থাকে শস্যাদির পচন-নিরোধক ব্যবস্থায়। খাদ্যদ্রব্যাদির পচন হলো ব্যাক্টিরিয়া ও ছত্রাকের প্রতিক্রিয়াজনিত। খাদ্য-দ্রব্যকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত পরিমিত রশ্মির মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে রাখলে খাদ্যের পচনক্রিয়া বন্ধ করা যায়। রিয়্যাক্টরে যে সব দগ্ধাবশিষ্ট পদার্থ পাওয়া যায়—সেগুলিও অত্যন্ত তেজস্ক্রিয়। জনস্বাস্থ্যের ক্ষতির আশঙ্কায় সেগুলিকে জলে বা স্থলে কোথাও ফেলা যায় না। এই সমস্যা পারমাণবিক চুল্লী সম্প্রসারণের এক বিরাট প্রতিবন্ধক। পারমাণবিক চুল্লীর দগ্ধাবশিষ্ট ভস্ম থেকে নির্গত রশ্মিকে অহিতকর প্রভাবশূন্য করে ভবিষ্যতে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের কাজে লাগানো সম্ভব হতে পারে।

পারমাণবিক শক্তি সত্যই এক নতুন যুগের সূচনা করছে—যেখানে অভাব, অনাহার হবে ইতিহাসের পাঠ্য-বিষয়। অবশ্য ততদিনে পারমাণবিক শক্তির ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা দিয়ে পৃথিবীকে মানবশূন্য না করে ফেললেই হয়!

জলৌকা

শ্রীকনক চক্রবর্তী

চিকিৎসা-কার্যে জলৌকার সাহায্যে রক্ত-মোক্ষণের ব্যবস্থা প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। বর্তমান শতাব্দীতেও বিজ্ঞানে উন্নত রাশিয়ার মত দেশেও জলৌকার ব্যবহার দেখতে পাই। ১৯৫৩ সালে ষ্ট্যালিন যখন মস্তিষ্কের রক্ত-ক্ষরণে ভুগছিলেন, তখন রুশ দেশীয় চিকিৎসকেরা রক্তচাপ কমাবার জন্যে তাঁর শরীরে দু'বার জলৌকা প্রয়োগ করেন।

এভাবে জুলিয়াস সিজার, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, লর্ড নেলসন, ডিউক অব ওয়েলিংটন প্রভৃতির সঙ্গে ষ্ট্যালিনের নামও যুক্ত হলো। জলৌকার দ্বারা চিকিৎসিত লক্ষ লক্ষ রোগীর নাম আজ আমরা ভুলে গেছি; কিন্তু তাদের সঙ্গে এই দেশবিশ্রুত ব্যক্তিরাও যে জলৌকারূপ প্রকৃতির ছুরিকার দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন, সে কথা বিস্মৃত হবার নয়।

জলৌকার চলিত নাম জোঁক। দু'হাজার বছরের বেশী সময় ধরে রক্তমোক্ষণের জন্যে জলৌকা প্রয়োগের ব্যবস্থা চলে আসছে। প্রায় যাবতীয় প্রাচীন সভ্য দেশেই জলৌকার ব্যবহার হতো। জলৌকা সম্বন্ধে সুশ্রুত (১০০-২০০ খ্রীঃ অঃ) বিশেষ আলোচনা করে গেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র প্যারিসেই জলৌকার দ্বারা প্রতি বছর প্রায় ২০০০০০ পাউণ্ড মানুষের রক্ত শোষণ করানো হতো।

ব্যাক্টিরিয়া প্রভৃতি আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল; বিভিন্ন রোগের কারণ হলো ভূত-প্রেত ইত্যাদি অলৌকিক কিছু অথবা শরীরের

কোন প্রকার রসাধিক্য। সুতরাং রোগ নিরাময়ের জন্যে তারা রোগের কারণ দূর করবার চেষ্টা করতো। সে জন্যে তারা ব্যথার স্থান চিরে সেখানকার রক্তের সঙ্গে ব্যথা উৎপাদনকারী রস বের করে নিত।

রক্তমোক্ষণের দ্বারা হয়তো সাময়িক আরামের ব্যবস্থা করা যেতে পারে; কিন্তু প্রাচীন সভ্যতার বিষয় আলোচনা করলে দেখা যাবে, চীন প্রভৃতি দেশে স্ত্রী-পুরুষ সবাই রোগ উপশমের জন্যে সানন্দে রক্তমোক্ষণ করতো। রক্তমোক্ষণের জন্যে প্রাচীন গ্রীকরা শরীরের অংশবিশেষ কেটে সেখান থেকে রক্ত শুষে নিত। চীন দেশে লৌহ অথবা রৌপ্য সূচের দ্বারা গভীর ক্ষত উৎপাদন করে বেদনার স্থান নিংড়ে রক্ত বের করা হতো। পরবর্তী কালে এই কাজে Exhausting syringe ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এর কোনটাই বিশেষ ফলপ্রদ ছিল না।

আবার বিভিন্ন প্রকার ব্যথা-বেদনায় সঠিক ভাবে ক্ষত উৎপন্ন করাও এক সমস্যার বিষয় ছিল এবং এই সব কাজে ব্যবহৃত ছুরিকায় সহজে মরচে পড়তো। ফলে ভাল ছুরির সাহায্যে যন্ত্রণাহীন-ভাবে রক্তমোক্ষণ করানো বেশ ব্যয়সাধ্য ছিল।

খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে লিখিত Nicander of colophon-এর বিবরণ থেকে চিকিৎসা-কার্যে জলৌকা ব্যবহারের কথা জানা যায়। তিনি সম্ভবতঃ ভারত অথবা আরবের ব্যবসায়ীদের মারফত এ-কথা জানতে পারেন। অগাষ্টাস সিজারের সময় ইউরোপের নামজাদা প্রত্যেক চিকিৎসকই এই প্রাণীটির বিষয় অবগত হন।

অনেকদিন পর্যন্ত জলৌকার সাহায্যে চিকিৎসা কেবল ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ তখন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে জলৌকা সুলভ ছিল না। এ-জন্যে সাধারণ মানুষকে ক্ষৌরকার সার্জনের ছুরির উপরই নির্ভর করতে হতো। কিন্তু তথাপি ক্ষেত্রবিশেষে জলৌকার ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। যে সব রক্তমোক্ষণের জন্যে Exhausting cup ব্যবহার করা সম্ভব হতো না, সেখানে জলৌকাই ব্যবহার করা হতো। আরবের দশম শতাব্দীর চিকিৎসক Razes-এর মতে, কান অথবা নাকের স্ফোটকে জলৌকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় রাখবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

জলৌকার সাহায্যে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়ায় দিন দিন এদের চাহিদা বেড়ে ওঠে। খোস-পাঁচড়া থেকে আরম্ভ করে শিরোঘূর্ণন পর্যন্ত প্রায় সব ক্ষেত্রে এদের উপযোগিতা প্রমাণিত হয়।

তখনকার দিনে চিকিৎসকেরা রোগের উপ-সর্গের বিষয় জানলে জলৌকার সংখ্যা ও তাদের প্রয়োগ স্থানের বিষয় বলে দিতেন। যেমন—অজীর্ণ রোগে পাকস্থলীর উপর ২০-৩০টি এবং ঠাণ্ডা লাগবার জন্যে কপালের উভয় পার্শ্বে দুটি করে জলৌকার ব্যবস্থা করা হতো। ছোটদের দাঁতের ব্যথায় কানের পিছনে জলৌকা প্রয়োগ করা হতো। মৃদু বাতরোগে প্রতি গাঁটে ৪টি করে এবং কানের পিছনে একটি করে এবং অত্যধিক জ্বরে মাথার চতুর্দিকে জলৌকা প্রয়োগ করা হতো।

নেপোলিয়নের রাজ্যলাভের পর ফ্রান্স ইউ-রোপে চিকিৎসা-বিদ্যার কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। প্যারিস মেডিক্যাল স্কুলের তৎকালীন রোগ-নির্ধারণ-বিদ্যার (Pathology) অধ্যাপক Broussais-এর জলৌকা-চিকিৎসা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁর মতে, গুরুভোজনই ছিল সব রকম রোগের মূল। এ-জন্যে সব রোগে তিনি পাক-স্থলীতে জলৌকা প্রয়োগের ব্যবস্থা দিতেন। তিনি চিকিৎসাকার্যে প্রত্যহ শত শত জলৌকা ব্যবহার করতেন এবং তাঁর ছাত্রদের সেরূপ করতে শিক্ষা দিতেন। এ-জন্যে কেউ কেউ তাকে 'Bloodiest Physician in History' আখ্যা প্রদান করেন।

ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্যে ক্রমে ফ্রান্স, স্পেন,

ইটালী জলৌকাশূন্য হয়ে ওঠে। জলৌকা আমদানীর জন্যে পোল্যাণ্ড, রাশিয়া, সিরিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে লোক প্রেরিত হয়। ষ্ট্রাস্‌বার্গ এই সব দেশের জলৌকা-সংগ্রহের কেন্দ্র হয়। সেখান থেকে প্রতিদিন ৬০ থেকে ৮০ হাজার জলৌকা প্যারিসে চালান হতো। ১৮০৬ সালে যে জলৌকার দাম ছিল ১২ থেকে ১৫ ফ্রাঙ্ক, ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্যে অর্ধশতাব্দী পরে তার দাম হয় ১৫০ থেকে ১৮০ ফ্রাঙ্ক।

ক্রমে ব্রিটেনেও ফ্রান্সের মত জলৌকা-চিকিৎসার প্রতি ঝোঁক দেখা দেয়। ১৮২৩ সালে ইউরোপ থেকে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় ১,৫০০,০০০ জলৌকা আমদানী করা হয় এবং দশ বছরের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের হাসপাতালের মোট ব্যয়ের শতকরা ৫ ভাগ জলৌকার জন্যে ব্যয় হতে থাকে।

১৮৬৩ সালে একমাত্র লণ্ডন হাসপাতালেই ৭০,০০০০০ জলৌকা ব্যবহৃত হয়। নির্বিচারে ধরবার জন্যে ব্রিটেনে জলৌকার অস্তিত্ব ক্রমে লোপ পেয়ে গেল। রাশিয়াতেও প্রায় একই অবস্থা ঘটবার উপক্রম হলো। তখন রাশিয়ায় ১৮৪৮ সালে মে মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত জলৌকা ধরা এবং ২½ ইঞ্চির কম দৈর্ঘ্যের জলৌকা রপ্তানী নিষিদ্ধ হয়।

১৮৪৩ খৃঃ থেকে পরবর্তী ৫০ বছরে আমেরিকায় প্রতি বছর ১৫০০,০০০ স্বদেশজাত ও ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত জলৌকা ব্যবহৃত হতো। এর দাম ছিল প্রতি হাজারে ১০০ ডলার।

১৭০০ থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জলৌকা ও তাদের জীবনযাত্রাপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে এবং এ-সম্বন্ধে শত শত গবেষণা-পত্রও প্রকাশিত হয়। ইউরোপে ব্যবহৃত প্রায় ছয় প্রকার জলৌকার মধ্যে Hirudo medicinalis-ই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। প্রাপ্তবয়স্ক জলৌকা ২-৪ ইঞ্চি বড় হয়, কিন্তু টানলে এদের শরীর ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয় এবং সঙ্কুচিত হলে জলপাইয়ের মত হতে পারে।

আমেরিকার জলৌকা এক বারে ½ আউন্স রক্ত শোষণ করতে পারে। ইউরোপের জলৌকা ৩—৬ আউন্স পর্যন্ত রক্ত শোষণ করে থাকে। আমাদের শরীরের লাল রক্ত-কণিকা কয়েক সপ্তাহ বেঁচে থাকে, কিন্তু জলৌকা-শোষিত রক্ত-কণিকা কয়েক মাস পর্যন্ত অবিকৃত থাকে। এক বার পরিপূর্ণ ভোজনের পর জলৌকার কয়েক মাস—এমন কি, এক বছর পর্যন্ত আহার ব্যাতিরেকে চলতে পারে।

চিকিৎসা-জগতে আজকাল জলৌকার ব্যবহার অনেক কমে গেছে; তথাপি পাশ্চাত্যের বড় বড় শহরে কোন কোন ঔষধালয়ে আজও জলৌকা বিক্রয় হয়ে থাকে। তবে এখনো দাঁতের ফোঁড়া ইত্যাদিতে অন্য ঔষধ অপেক্ষা জলৌকার ব্যবহার অধিক ফলপ্রদ বলে অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা।

ভারতবর্ষে প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসকেরা ও জলৌকা ব্যবহার করতেন। জলৌকা সম্বন্ধে সুশ্রুতে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। সুশ্রুতের মতে, জলৌকা সবিষ ও নির্বিষ-দু'রকমের। প্রত্যেকে আবার ছয় ভাগে বিভক্ত। তুরস্ক, পাণ্ড্য, ইন্দ্রপ্রস্থ, নর্মদা তীর, মথুরা প্রভৃতি স্থানে তখন নির্বিষ জলৌকা পাওয়া যেত। জলৌকা ধরা ও রক্ষা করবার জন্যে সুশ্রুতে আলোচনা আছে। সে সময়ে যে সব রোগী অধিক রক্তচাপে ভুগতো, চিকিৎসকেরা জলৌকার সাহায্যে তাদের বাড়তি রক্ত বের করে দিতেন। এ-জন্যে তৎকালীন চিকিৎসকেরা স্বগৃহে নির্বিষ জলৌকা পুষে রাখতেন।

পুরনো পৃথিবী

শ্রীপ্রদীপকুমার চক্রবর্তী

পৃথিবীর বয়স কত হলো, সে কথা ভাবতে গেলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। কারণ এ-সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি। তবে বিশেষ চেষ্টায় যতটা জানা গেছে, তাতে বুঝা যায়—আমাদের পৃথিবী অনেক—অনেক বছরের পুরনো—এত পুরনো যে, তা ধারণা করাই যায় না। বিভিন্ন তথ্য থেকে এ-সম্বন্ধে যতটা জানা গেছে, সে কথাই বলছি।

এস্থলে পৃথিবীর জন্মরহস্যের আলোচন করবো না। কারণ, সে আর এক মহাভারত। এই প্রসঙ্গে শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, কোন এক সুদূর অতীতে সূর্যের গা থেকে কিছুটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল এবং কালক্রমে সেই ছিটকে-আসা জ্বলন্ত পিণ্ডটা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন রূপ ধারণ করেছে। এ যে কতকাল আগের ঘটনা, তা আজও কেউ ঠিক করে বলতে পারে না।

খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে ৪০০৪ খৃঃ-পূর্বাব্দ বলে একটা তারিখের উল্লেখ আছে। এই সময়েই নাকি জন্মেছিল আমাদের পৃথিবী। এর পেছনে কোন যুক্তি আছে কিনা—জানি না, তবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিভিন্ন উপায়ে পৃথিবীর যে একটা বয়ঃক্রম নির্ণয় করা হয়েছে, তাতে বাইবেলে লিখিত তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত এই কয়েক হাজার বছরকে একটা সামান্য মুহূর্ত ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। জেম্‌স্ হাটন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন যে, তিনি পৃথিবীর জন্মের আদি কিছুই কল্পনা করতে পারেন না।

সে কত দিন আগে?

মানুষের জ্ঞান-পিপাসা কোনদিন তৃপ্ত হয় নি, কোনদিন হবেও না। দুরধিগম্য, দুর্জ্ঞেয় রহস্যোন্মোচনে তার এই অনুসন্ধিৎসা চিরদিন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এই অনুপ্রেরণার বলেই সম্ভব হয়েছে, প্রকৃতির নানাবিধ রহস্যোদ্ঘাটন এবং বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার।

পৃথিবীর কবে কেমন করে জন্ম হলো, কেমন করে এর বুকে জাগলো প্রাণের স্পন্দন, কেমন করে ঘটলো জীব-জগতে বিবর্তন, আর এর ভিতরটাই বা দেখতে কেমন—ইত্যাদি দুরূহ প্রশ্ন মানুষের আজকের নয়, তার জ্ঞান বিকাশের দিন থেকেই। সে সব কথা রেখে এখন আসল কথায় আসা যাক।

যে কয়েকটি উপায়ে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করবার চেষ্টা করা হয়েছে, সেগুলি হলো মোটামুটিভাবে এরূপ: (১) জীব-জগতের বিবর্তন, (২) পাললিক শিলার ক্রমসঞ্চয়, (৩) সাগরজলে লবণের পরিমাণ, (৪) পৃথিবীর শীতলতা প্রাপ্তির হার এবং (৫) তেজস্ক্রিয়তা।

এখন দেখা যাক, কেমন করে এগুলিকে পৃথিবীর বয়স-নির্ণয়ের কাজে লাগানো হয়েছে।

জীব-জগতের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস থেকে দেখা যায়—কোন এক অজ্ঞাত সময়ে সূর্যের তাপেই পৃথিবীর বুকে প্রাণের বিকাশ ঘটেছিল। সে প্রাণ-প্রবাহ আজকের এই প্রাণপ্রবাহের অনুরূপ নয়। যদিও সেদিনকার বিশেষ কিছুই আমরা জানতে পারি নি, তবুও যতটুকু জেনেছি, তা হলো এই যে, প্রথম প্রাণের স্বাক্ষর যারা রেখে গেছে, তারা ছিল জেলিফিসের মত একরকম প্রাণী। তার পরেই আরম্ভ হলো সেই প্রাণীদের জয়যাত্রা—বিবর্তন। বিশেষজ্ঞেরা এই বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করেছেন। কিন্তু কখন, কি ভাবে বিবর্তন এলো এই প্রাণের অভিযানে? ভূ-বিদ্যায় সময়কে

কতকগুলি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং এই প্রত্যেকটি বিভাগে দেখা গেছে বিশেষ বিশেষ প্রাণীর অস্তিত্ব। সেগুলি সবই ক্রমবিবর্তনের ফল। সবচেয়ে পুরনো প্রাক-কেম্ব্রিয়ান (Precambrian) যুগের পাহাড়-পর্বতে দেখতে পাওয়া গেছে, প্রাচীন সামুদ্রিক উদ্ভিদ এবং আগাছার চিহ্ন; আর পর্বতের বুকে আঁচড়কাটা দাগ ও বসবাসের গর্ত —সে যুগের প্রাণী-জীবনের পরিচয়-লিপি। তারপর এলো প্রাচীন জীবপূর্ণ যুগ—সে সময়ে মেরুদণ্ডহীন প্রধান প্রধান প্রাণীর পূর্বপুরুষদের চিহ্ন দেখা যায়।

তারপর সিলিউরিয়ান যুগে এলো মৎস্য জাতীয় প্রাণী; আর সে সময়েই মাটির বুকে প্রথম স্থলচর প্রাণীর পদচিহ্ন দেখা যায়। এরপর ডেভোনিয়ান যুগ। তখন মৎস্যজাতীয় প্রাণীরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে, আর স্থলভাগে উদ্ভিদ ছড়িয়ে পড়েছে। উদ্ভিজ্জের প্রাচুর্য নিয়ে এরপর এলো কার্বনিফেরাস যুগ। তারপর মেসোজোয়িক যুগ। এই যুগে জন্মালো সরীসৃপ প্রাণীর দল। আর তার পরবর্তী কেনোজয়িক যুগে মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটলো—যার বিবর্তনের শেষ ধাপ হলো—পৃথিবীর মানুষ। এই বিবর্তনের ধারা অপ্রতিহতভাবে চলে আসছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এককোষী থেকে ক্রমে এলো মেরুদণ্ডহীন বহুকোষী প্রাণী। এদের শরীরে কিন্তু কোন শক্ত অংশ ছিল না; কাজেই ওদের অস্তিত্বের চিহ্নস্বরূপ কোন জীবাশ্ম পাওয়া যায় নি। তবে শিলীভূত নরম মাটির বুকে এদের কারো কারোর কিছু পথরেখা পাওয়া গেছে। এরপর বিবর্তনের ধারায় যে সব প্রাণী আবির্ভূত হলো, তাদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। কাজেই জীব-জগতের এই বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করলে মোটামুটি একটা সময়ের হিসেব পাওয়া যেতে পারে। আর তাথেকে পৃথিবীর বয়সের একটা মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হয়। জীব-বিজ্ঞানীরা এই ধরণের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পৃথিবীর বয়স হয়েছে ১০০০ মিলিয়ন বছর। কিন্তু কথা হলো—প্রাণের সাড়া জেগেছিল তো পৃথিবীর জন্মের অনেক পরে! কাজেই পৃথিবীর আসল বয়স নিশ্চয় আরো বেশী!

আর একভাবে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে দেখা গেল। সেটা প্রকৃতির দিক থেকে। পৃথিবীর জন্মের পর থেকেই, অর্থাৎ তার উপরিভাগ যখন শক্ত হলো, তখন থেকেই তার বুকের উপর চলেছে দুর্জয় প্রকৃতির অবাধ ধ্বংসলীলা। এর ফলে স্থলভাগের যে তলানি জমলো, ক্রমে ক্রমে তা সঞ্চিত হতে লাগলো সাগরতলে স্তরে স্তরে। এ-কাজটা যে শুধু তখনই হতো তা নয়, আজও নদ-নদীর দ্বারা এই কাজটা নিয়মিতভাবে অহরহ চলছে। সুতরাং প্রকৃতির এই ধরণের কাজ থেকেও রহস্যোন্মোচনের চাবিকাঠি পাওয়া যেতে পারে। প্রোফেসর আর্থার হোম্‌স্ এ-সম্বন্ধে বলেছেন যে, লণ্ডনের টেম্‌স্ নদী বছরে এক থেকে দুই মিলিয়ন টন কঠিন পদার্থ সাগরে বয়ে নিয়ে যায়। সারা বছরে সাগরে উপনীত এই ধরণের পদার্থের পরিমাণ প্রায় ৬০০০ মিলিয়ন টন। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, এ-পর্যন্ত সাগরে আনীত পদার্থসমূহ প্রায় ৫ লক্ষ ফুট পুরু হয়ে সমুদ্রের তলায় জমেছে। গড়পড়তা ধরা হয়েছে—এরূপ পদার্থের ক্রমিক পলিসঞ্চয়ের হার হলো ৮৮০ বছরে এক ফুট মাত্র। কাজেই এই হিসেবে সঞ্চিত তলানি পুরু হবে প্রায় ৫১৪০০০ ফুট। এথেকে পৃথিবীর বয়স পাওয়া যায় প্রায় ৪০০ মিলিয়ন বছর। কিন্তু এক ধরণের রূপান্তরিত শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলি সবচেয়ে পুরনো তলানি থেকেই পরিণত হয়েছে, আর সেগুলি প্রায় ১১০০ মিলিয়ন বছরেরও বেশী পুরনো। এতেও কিন্তু আসল উত্তরটা পাওয়া গেল না। পৃথিবী জন্মাবার পর থেকেই তো আর রোদ-বৃষ্টিবাদলের ধ্বংসের কাজ আরম্ভ হয়ে যায় নি! সে সব আরম্ভ হয়েছে ভূপৃষ্ঠ কঠিন হবার পরে।

তাছাড়া তলানির এই ক্রমসঞ্চয় সারা বছর একই হারে হয়েছে কি না, কে জানে!

এরপর দেখা যাক, সাগর জলের লবণতা থেকে কেমন করে এই প্রশ্নের মীমাংসার সূত্র পাওয়া গেল। পৃথিবী কিছুটা ঠাণ্ডা হবার পর থেকেই কিন্তু এই বিশাল জলভাগ পৃথিবীর বুকে নিরঙ্কুশ-ভাবে বিস্তৃত হয়ে আছে। প্রথমে কিন্তু সাগর-জল আজকের সাগরজলের মত নোনা ছিল না, পরে ক্রমশঃ নদ-নদী এলো পাহাড়-পর্বত মাঠঘাট ডিঙিয়ে, সঙ্গে নিয়ে এল লবণ—সোডিয়াম ক্লোরাইড আর ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি—সব এসে মিশলো সাগরজলে। সে থেকেই আরম্ভ হলো সমুদ্রের লবণতা প্রাপ্তির ইতিহাস। বছর বছর এই লবণতা বেড়েই চলেছে। একক ঘনত্বে লবণের পরিমাণ জানা গেলে সাগর জলের মোট ঘনত্বের পরিমাণ থেকে মোট লবণের পরিমাণ বের করা যেতে পারে। অবশ্য এই দুটিই বের করা সম্ভব হয়েছে। আর পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে লবণতা বৃদ্ধির বার্ষিক হার জানা গেছে। সুতরাং এ-থেকে সমুদ্র সৃষ্টির পর এই পৃথিবীর কত বছরের ইতিহাস রচিত হয়েছে, তার মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জলি এক হিসাব পেশ করেন যে, বছরে পৃথিবীর সবগুলি নদী যে লবণ বয়ে নিয়ে সাগরে ফেলছে, তার পরিমাণ হলো ১৫৬ মিলিয়ন টন; আর সাগরজলে মোট লবণের পরিমাণ হলো—৪০,০০০,০০০,০০০ মিলিয়ন টন। যদি লবণের বার্ষিক বৃদ্ধির হারটা সমভাবেই হয়েছে বলে ধরা হয়, তাহলে পৃথিবীর বয়স ১৫০০ মিলিয়ন বছরে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু ভাববার বিষয় হলো এই যে, এই লবণতা সব স্থানে ও সব সমুদ্রে সমান নয়। লবণের এই বার্ষিক যোগের মানটাও সমান নয়। আর প্রধান কথা হলো, সাগরের সৃষ্টিও তো হয়েছিল পৃথিবী ঠাণ্ডা হবার পরে!

পৃথিবীটা ক্রমশঃই ঠাণ্ডা হচ্ছে, জন্মাবার পর থেকেই এটা চলে আসছে। কেন না, প্রথমে পৃথিবী ছিল একটা জলন্ত পিণ্ড, ঠাণ্ডা না হলে জীবসৃষ্টি সম্ভব হতো না; আর আমরাই বা আসতাম কেমন করে? ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হওয়াটাও কিন্তু পৃথিবীর বয়স বের করবার উপায় বলে দিয়েছে। লর্ড কেলভিন এভাবে বের করেছেন যে, পৃথিবীর বয়স ২৫ থেকে ৪০০ মিলিয়ন বছরের মধ্যে।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে যতই নেমে যাওয়া যায়, ততই বেশী উত্তাপ অনুভূত হয়। পৃথিবী-পৃষ্ঠের সন্নিকটে তাপমাত্রা হলো ৮০ ফুটে ১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। কাজেই অভ্যন্তর ভাগ থেকে উত্তাপ বহির্মুখে প্রবাহিত হচ্ছে। এই তাপ-প্রবাহের মান হলো প্রায় $1{\cdot}2\times10-6$ Cal/Cm^2/Sec. সে জন্যে পৃথিবী এমন একটা গোলক যা ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে চলেছে। লর্ড কেলভিন পৃথিবীকে ৪৫০০°C তাপমাত্রার একটা গোলক ধরে নিয়ে বের করেছেন—কত বছর অতিক্রান্ত হলে এই রকমের একটা গোলক আজকের পৃথিবীর এই তাপমাত্রায় এসে দাঁড়াতে পারে। তার উত্তর বের হয়েছে ১০০ মিলিয়ন বছর। কিন্তু তাঁর নির্ধারণের ত্রুটি হলো এই যে, তিনি তেজ-ক্রিয়তার ফলে সৃষ্ট উত্তাপকে তার হিসেবের বাইরেই রেখেছিলেন। সেটা ও তো আর কম নয়!

এরপর বৈজ্ঞানিকদের মনে এলো নানারকম প্রশ্ন। কিন্তু তাঁদের অনুসন্ধিৎসার বিরাম নেই। তারপর এলো তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের যুগ। কতকগুলি মৌলিক পদার্থ আছে, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে রেডিও-অ্যাক্টিভ এলিমেণ্ট। এদের বৈশিষ্ট্য হলো, এরা স্বতঃস্ফূর্ত তেজ বিকিরণ করে এবং তার ফলে রূপান্তরিত হয় আর এক পদার্থে। এই ব্যাপার সম্পর্কে বেকেরেল এবং রাদারফোর্ডের মৌলিক গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির মধ্যে ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম আর থোরিয়ামের নাম উল্লেখ করা যেতে

পারে। এগুলি স্বভাবতঃই তেজ বিকিরণ করে' একশ্রেণীর সীসকে (Pb) পরিণত হয়।

২০৬ পারমাণবিক ওজনবিশিষ্ট Pb তৈরী হয় ইউরেনিয়াম থেকে, তেজস্ক্রিয়ার ফলে। যার ওজন ২০৮, তা আসে থোরিয়াম থেকে; আর সাধারণ Pb-এর ওজন হলো ২০৭। রেডিয়াম ১৬০০ বছরে অর্ধেক রেডিয়াম আর অর্ধেক Pb-তে পরিণত হয়। আর থোরিয়ামের লাগে আরো অনেক বেশী সময়, তা প্রায় ৪৫৬০ মিলিয়ন বছর। এই তেজস্ক্রিয়তা স্বতঃস্ফুর্ত, বাইরের তাপ বা চাপের তারতম্যের ফলে এর কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

ইউরেনিয়াম নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে,

১ আউন্স ইউরেনিয়াম		১০০ বছর পরে		'০১৩ আউন্স	Pb	এবং	'৯৮৫	আউন্স ইউরেনিয়ামে পরিণত হয়		
১	„	„	১০০০ „ „	'১১৬ „	Pb	„	'৮৬৫	„	„	„
১	„	„	২০০০ „ „	'২১৯ „	Pb	„	'৭৪৭	„	„	„
১	„	„	৩০০০ „ „	'৩০৬ „	Pb	„	'৬৪৬	„	„	„

তাই যদি শিলাগাত্রের Lead-radium আর Lead-uranium-এর অনুপাত বের করা যায়, তবে ঐ শিলার বয়স এবং সেই সঙ্গে তার উৎপত্তি-স্থল এই পৃথিবীর বয়সও বের করা যাবে। প্রোফে. রাসেল এ-ধরণের অনুসন্ধানের ফলে বের করেছেন যে, পৃথিবীর বয়স সবচেয়ে বেশী ধরলে, ৩০০০ মিলিয়ন বছর। এ-ধরণের অনুসন্ধানের ফলে আর এক লাভ হয়েছে এই যে, এথেকে জানা গেছে, পৃথিবী-পৃষ্ঠের সবচেয়ে পুরনো পর্বতের বয়স ২০০০ মিলিয়ন বছরেরও বেশী। এই হিসেব নির্ণয়ে হোম্‌স্ ও লসনের সূত্র বেশ কাজে লেগেছে।

কাজেই কবির চোখে এই পৃথিবী চিরযৌবনা বলে প্রতিভাত হলেও আসলে এর বয়স হয়েছে অনেক। ইউনিফর্মিটেরিয়ান থিওরির (Uniformitarian Theory) জনক জেম্‌স্ হাটন শুধুই কি আর এত বিস্ময় প্রকাশ করেছেন! ২০০০ মিলিয়ন বছরের ইতিহাস কল্পনাতীতই বটে। তাই হাটনের মতই আমাদেরও বিস্ময় প্রকাশ না করে আর উপায় কোথায়?

সঞ্চয়ন

সমুদ্র-গর্ভের সম্পদ নির্ণয়ে মহাসাগরের অভিনব মানচিত্র

সমুদ্রগর্ভে খাদ্য, ইন্ধন ও ধাতব দ্রব্যাদির সন্ধান লইবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটি উত্তর অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের একটি অভিনব মানচিত্র রচনা করিতেছেন। নিরক্ষবৃত্ত হইতে উত্তর মেরু পর্যন্ত মহাসাগরের এই বিস্তৃত এলাকার বিভিন্ন স্থানে যে বিভিন্ন রকম জীবজন্তু, মাছ এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ গাছপালা রহিয়াছে, তাহাদের এবং সমুদ্র সংক্রান্ত রাসায়নিক ও পদার্থতাত্ত্বিক বহু তথ্যের সন্ধান এই মানচিত্রে পাওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত সমুদ্র হইতে মানুষের খাদ্যবস্তু সংগ্রহ ও খাদ্য-উৎপাদনের যে পরিকল্পনা রহিয়াছে, সে সম্পর্কেও পর্যালোচনা করিয়া ইহার মারফৎ তথ্য সরবরাহ করা হইবে।

এইভাবে ভৌগলিক তথ্যের সহিত জীব-বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিবেশনের ব্যবস্থা ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই। এই দিক হইতে ইহা একটি অভিনব প্রচেষ্টা। যে সকল বিজ্ঞানী এই পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে মিলিত হইয়া ইহার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন।

উড্‌স্‌হোল ওশেনোগ্র্যাফিক ইন্‌স্টিটিউশনের ডাঃ কলম্বাস ও ডি. আইস্‌লিন আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ সমুদ্রের সেন্ট লরেন্স উপসাগরীয় অঞ্চলের যে অংশ তুষারাবৃত থাকে, তাহাকে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থার সন্ধান দেন। ঐ সাগরের তলদেশে প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ জল রহিয়াছে। ডাঃ আইস্‌লিন বলেন যে, পাম্পের সাহায্যে ঐ উপ-সাগরের তলদেশে বায়ু পরিচালিত করিলে ঐ উষ্ণ জল উপরে উঠিয়া আসিবে। ইহার ফলে উপসাগরের তুষার গলিয়া যাইবে এবং শীতকালেও ইহা নৌ-চালনায় উপযোগী থাকিবে। ইহাতে নোভাস্কোটিয়া এবং নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটিবে এবং ঐ অঞ্চলের শৈত্য হ্রাস পাইবে। ইহার ফলে সেখানে মৎস্য-চাষ সম্ভব হইবে।

ঐ বৈঠকে আর একটি পরিকল্পনা অনুসারে আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ফ্লোরিডা এবং কিউবার মধ্যে যে ফ্লোরিডা প্রণালী আছে, তাহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহু বয়া ভাসাইয়া রাখা হইবে। বয়ার ভারী শিকলগুলি ঐ প্রণালীর তলদেশে গিয়া আঘাত করিবার ফলে ইহার তলানি উপরে ভাসিয়া উঠিবে। এই সকল তলানি উত্তর অ্যাটলান্টিকের নিকটবর্তী অঞ্চলের উর্বরতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিবে। ডাঃ আইস্‌লিন এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, এই সকল পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে কিনা, তাহা নির্ধারণে এই মানচিত্র অনেকখানি সাহায্য করিবে। তবে মহাসাগরে যে সকল প্রাণী রহিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে এবং সামুদ্রিক উদ্ভিদাদি ও জীবজন্তুর উপর তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া ও অন্যান্য বহু রকম তথ্যাদি সংগ্রহ না করিয়া এই ধরণের পরি-কল্পনা রূপায়নে ব্রতী হওয়া সম্পর্কে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

ওয়াশিংটনে অবস্থিত অ্যাটলান্টিক ফিশারী ওশেনোগ্র্যাফিক রিসার্চ লেবরেটরীর ডিরেক্টর ডাঃ লায়োনেল এ. ওয়ালফোর্ড সামুদ্রিক মৎস্য সম্পর্কে বলেন যে, ক্লোরোপথ্যালমাস নামে একপ্রকার সামুদ্রিক মৎস্য সমুদ্রের ১২০০ ফুট নীচে প্রচুর

পরিমাণে বিচরণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু বর্তমানে এই মাছ অতি অল্প পরিমাণেই সংগ্রহ করা হয়। ক্যানাডার মনট্রিয়েলে অবস্থিত ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ম্যাক্সডানবার বলেন যে, মৎস্য খাদ্যাভাব পূরণে অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে। বর্তমানে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও ইউরোপের উপকূল অঞ্চলে রেডফিশ পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, কেবলমাত্র ঐ অঞ্চলেই নহে, অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরেও ঐ সকল মাছ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরে বর্তমানে স্যামন জাতীয় যে মাছ আছে, তাহারা খাদ্যবস্তু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোন্ কোন্ স্থানে বিচরণ করে, তাহা জানা গেলে এইগুলিকেও প্রচুর পরিমাণে ধরা যাইতে পারে। কোন কোন সমুদ্র-বিজ্ঞানীর ধারণা, আইস্ল্যাণ্ডের নিকটবর্তী অঞ্চলেই ইহারা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। এই মানচিত্র রচনার পূর্বে এই সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হইবে।

এই মানচিত্র রচনায় ক্যানাডার বিজ্ঞানীরাও সাহায্য করিতেছেন। এই আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা রূপায়ণে ইউরোপের সমুদ্র-বিজ্ঞানীরাও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

আন্তর্জাতিক মহিলা-চিকিৎসক সংস্থা

প্রস্রবণের জন্য প্রসিদ্ধ জার্মেনীর বাদেন-বাদেন শহরের একটি সুসজ্জিত কক্ষে পশ্চিম জার্মেনীর প্রেসিডেণ্টের সহধর্মিণী উইলহেলমিন ল্যুইবকের সভানেতৃত্বে আন্তর্জাতিক মহিলা-চিকিৎসক সংস্থার প্রথম অধিবেশন হয়। ১৯১৯ সালে স্থাপিত এই সংস্থার বর্তমান সদস্য ২৯টি বিভিন্ন দেশের ৯০০০ মহিলা-চিকিৎসক। সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা শহরে ইহার কেন্দ্রীয় অফিস। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মহিলা-চিকিৎসক ডাঃ জেনেট আইটকেন অধিবেশনে যে প্রসঙ্গের অবতারণা করেন, সেটি এই: নারীর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি। পুরুষদের অপেক্ষা নারীরা সাধারণতঃ দীর্ঘজীবী হয়।

মার্কিন মহিলা-চিকিৎসক ডাঃ লোয়ার রাইডার বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁর মতে, এই শারীরিক প্রাধান্যের মূলে পুরুষদের উচ্ছৃঙ্খলতা, রোগ, ব্যাধি ইত্যাদি প্রতিরোধে নারীর সহজাত ক্ষমতা তাকে সাহায্য করে। আর একটি কারণ বর্তমান সভ্যতার যুগে ক্রনিক রোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সংক্রামক রোগ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। পুরুষদের আয়ুক্ষয়ের অপর কারণ, জীবনের প্রয়োজন মেটাতে তাদের নানারূপ বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। মেক্সিকোতে নারীরা ১০৯ বছর বাঁচে এবং মার্কিন মুলুকে বাঁচে ১০২ বছর।

বিগত দিনে আন্তর্জাতিক মহিলা-চিকিৎসক সংস্থা চিকিৎসা-ক্ষেত্রে তাদের স্বীকৃতি সম্পর্কে বহু আন্দোলন চালিয়েছেন, যার ফলে আজ তাঁরা হাসপাতালে অন্ততঃ প্রধান চিকিৎসকের পদ অলঙ্কৃত করতে পারেন। বেশীর ভাগ মহিলা-চিকিৎসক অবশ্য স্বাধীনভাবে ব্যবসা করেন। জার্মেনীতে পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় মহিলা চিকিৎসকদের সংখ্যা শতকরা ২০, নেদারল্যাণ্ডে শতকরা ১৫, সুইডেনে শতকরা ১২'এ, ফ্রান্সে শতকরা ৮, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৬, কিন্তু ফিন্ল্যাণ্ডে ঐ সংখ্যা শতকরা ২৩। এতে দেখা যাচ্ছে যে, মহিলারা চিকিৎসা-ক্ষেত্রেও একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছেন।

পারমাণবিক বিকিরণে মৃত্যু-প্রতিরোধকারী ট্যাবলেট

সম্প্রতি জার্মান বৈজ্ঞানিকদের এক সভায় প্রসিদ্ধ জার্মান স্ত্রীরোগ ও পারমাণবিক বিকিরণ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক স্থবার্ট বর্তমান পারমাণবিক যুগের জটিল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, কি পরিমাণ পারমাণবিক বিকিরণ মানুষের প্রজনন-কোষ এবং বংশানুগতি রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে, তার কোন সীমা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানে পরমাণু নিয়ে যে সব গবেষণা চালানো হচ্ছে এবং যে সব পারমাণবিক বিকিরণ ঘটানো হচ্ছে, তা মানুষের প্রজনন-শক্তি হ্রাস করে দিতে পারে। অধ্যাপক স্থবার্ট বলেন, স্বাভাবিক পারমাণবিক বিকিরণ, পরমাণু সম্পর্কিত পরীক্ষা এবং বিকিরণ-মূলক ওষুধ হয়তো এমন একটা বিপজ্জনক পরিবর্তন নিয়ে আসবে, যা মানুষের বংশধারাতে একটা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করবে। যাহোক বিকিরণ শক্তি প্রয়োগ করবার ক্ষেত্রে এখনই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

সকলেই যখন পারমাণবিক বিকিরণের এই কুফল সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন, তখন দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের হাইডেল-বার্গের অধ্যাপক ল্যাঙ্গেনডর্ফ বিকিরণের প্রতি-ক্রিয়া হ্রাস করবার জন্যে জৈব ও রাসায়নিক উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি তিনি যে সব বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে জানা যায়—আধুনিক বিজ্ঞান বিকিরণের কুফল হ্রাস করা সম্পর্কে ইতি-মধ্যেই কয়েক রকমের ট্যাবলেট ও হর্মোন নিয়ে কাজ সুরু করেছে। অধ্যাপক ল্যাঙ্গেনডর্ফ তাঁর গবেষণাগারে এই সম্পর্কে প্রায় ৭ লক্ষ ইঁদুরের উপর পরীক্ষা চালাচ্ছেন। বিকিরণজনিত অসুস্থতা দূর করা সম্পর্কে তিনি শত শত রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা সুরু করে এমন চারটি পদার্থ পেয়েছেন, যেগুলি এই অসুস্থতা দূর করতে সাহায্য করবে। পারমাণবিক বিকিরণের সম্মুখীন হওয়ার প্রায় দুই ঘণ্টা আগে এই ট্যাবলেটগুলি খেতে হবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নভেম্বর—১৯৬০

১৩শ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের যন্ত্রপাতি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ফোর্ড মোটর কোম্পানীর অ্যারোনটিক্যাল বিভাগে (নিউ পোর্ট বিচ—ক্যালিফোর্নিয়া) এই যন্ত্রটি স্থাপিত হয়েছে। এতে রেডার সংক্রান্ত পরীক্ষার মডেলগুলিকে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় রাখা হয়।

তারকার রেডিও-সঙ্কেত

এই অনন্ত আকাশের অগণিত নক্ষত্রসমূহ অনাদিকাল থেকে সঙ্কেত পাঠিয়ে আসছে, পৃথিবী আর মহাকাশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বার জন্যে। সেই সঙ্কেত পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তরঙ্গাকারে এবং তাকে বলা হয় রেডিও-তরঙ্গ। যে আলো আমরা দেখি, তাও তরঙ্গ। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের জন্যে আমরা বিভিন্ন রঙের আলো দেখি।

আজ থেকে সাতাশ বছর আগে ইয়ান্স্কি নামের একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর বেতার-তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করবার সময় একজাতীয় তরঙ্গের সন্ধান পেলেন, যার উৎস কোথায়, খুঁজতে গিয়ে বোঝা গেল—এই রেডিও তরঙ্গের উৎপত্তি-স্থল হচ্ছে ছায়াপথের মধ্যভাগে। এই রেডিও-তরঙ্গকে যখন শব্দে পরিণত করা হয়, তখন সেগুলিকে অতি অদ্ভুত শোনায়। এগুলিই হলো তারকার শব্দ-সঙ্কেত।
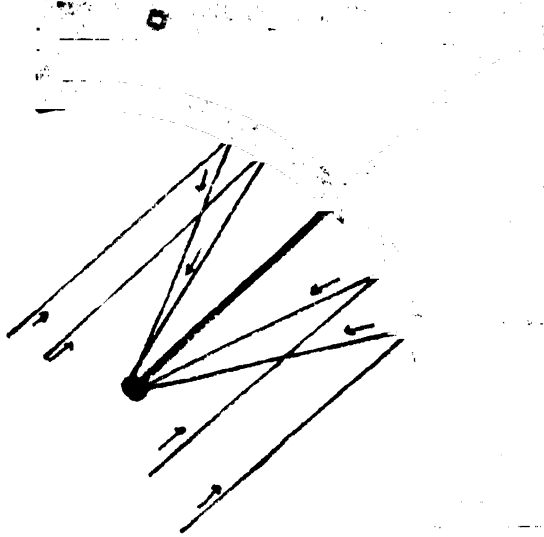
তারকার রেডিও-সঙ্কেত

মহাকাশ থেকে আগত রেডিও-তরঙ্গ বিরাট পিরিচের মত পাত্রটাতে প্রতিফলিত হয়ে মধ্যস্থলে স্থাপিত ডাইপোলে যায়। সেখান থেকে শব্দ-তরঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে।

তারকা থেকে আগত সব রেডিও-তরঙ্গই কিন্তু পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে পারে না। কুড়ি সেমি.-এর বেশী দীর্ঘ তরঙ্গের অনেকটাই পৃথিবীর আয়নোস্ফিয়ারে প্রতিফলিত হয়ে চলে যায়, আর এক সেমি. থেকে ছোট বেতার-তরঙ্গগুলিকে শোষণ করে নেয়।

নক্ষত্র থেকে আগত রেডিও-তরঙ্গ ধরতে হলে এক ধরণের যন্ত্রের প্রয়োজন। তাকে বলে রেডিও-দূরবীক্ষণ বা রেডিও-টেলিস্কোপ। সাধারণ টেলিস্কোপের চেয়ে রেডিও-টেলিস্কোপ আকারে বড় এবং বেশী কার্যক্ষম। রেডিও-দূরবীক্ষণ যন্ত্র বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। সাধারণ রেডিও-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যে দিক থেকে রেডিও-তরঙ্গ আসে, সেদিকে বিরাট একটা চায়ের পিরিচের মত রেডিও-তরঙ্গ প্রতিফলনক্ষম একটা পাত্র বসানো থাকে একটি কাঠামোর উপর। কাঠামোটিও বিরাট আকারের। জ্যোতির্বিজ্ঞানী একটা ঘরে বসে সেটিকে পরিচালনা করেন।
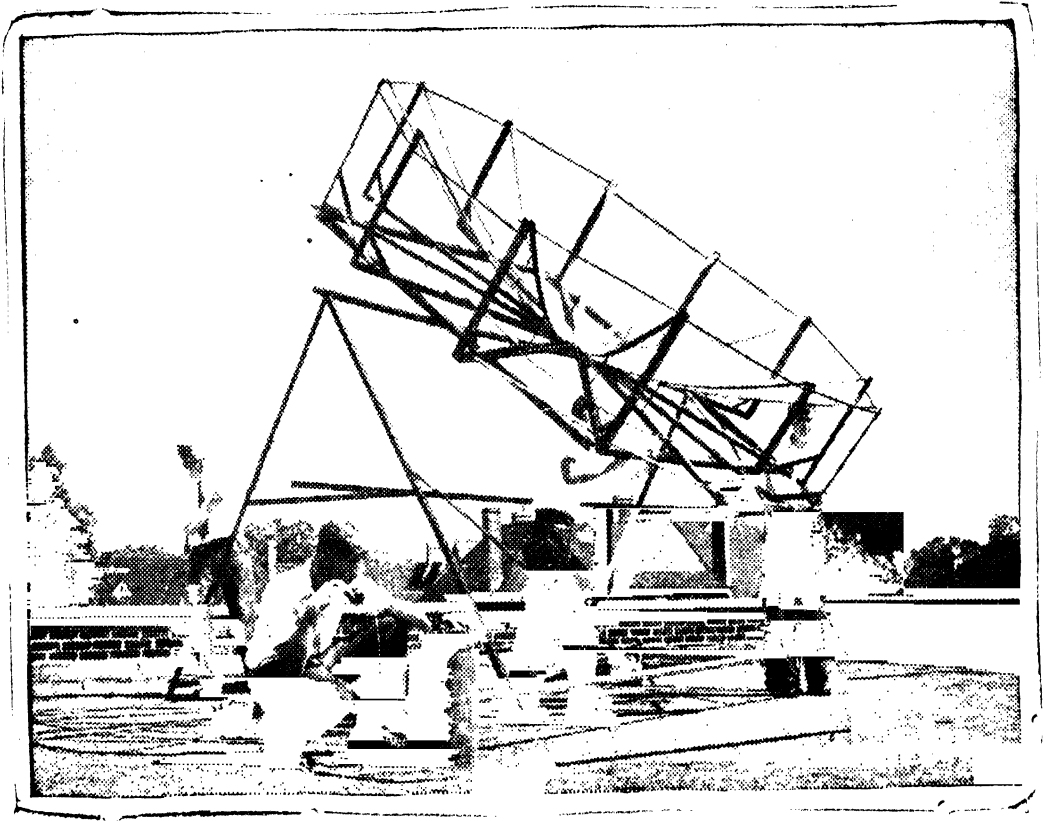
রেডিও-টেলিস্কোপ।

তারকাগুলি যে রেডিও-তরঙ্গ পাঠায়, সেগুলি এসে পড়ে প্লেটের মত সেই বিরাট পাত্রটার উপর। সেখান থেকে বেতার-তরঙ্গ যান্ত্রিক কৌশলে শব্দ-তরঙ্গে পরিণত হবার পর গ্রাহক যন্ত্রে গিয়ে পৌঁছায়।

রেডিও-তরঙ্গ থেকে যে বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায়, তার পরিমাণ খুবই কম। কাজেই তাকে বহুগুণে বাড়ানো দরকার। রেডিও-দূরবীক্ষণও দুর্বল বেতার-তরঙ্গ ধরবার পর তাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে। এজন্যে বেতার-দূরবীক্ষণ অতি সূক্ষ্ম শক্তিশালী যন্ত্রাদির সাহায্যে তৈরী হয়ে থাকে।

বেতার-তরঙ্গের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী একটা কলম পরিচালিত হয়। সেই কলমটা আঁকাবাঁকা দাগ কেটে বেতার-তরঙ্গের লেখচিত্র অঙ্কিত করে দেয়। পরে জ্যোতির্বিদ্ তার মর্মোদ্ধার করেন।

রেডিও-টেলিস্কোপের সাহায্যে সূর্যের প্রকৃত আকার নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে যে, সাধারণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে সূর্যের যে আকার ঠিক করা হয়েছিল, প্রকৃত আকার তার চেয়ে অনেক বড়।

সূর্য একটা মাঝারি গোছের তারকা। পৃথিবীতে সেও রেডিও-তরঙ্গ প্রেরণ করে থাকে। তবে সূর্য খুব জোরালো রেডিও-তরঙ্গের উৎস নয়।

নক্ষত্রপুঞ্জ নিয়ে ছায়াপথ গঠিত হলেও এর মধ্যে অনেক বাষ্পের মেঘ আছে—শীতল হাইড্রোজেন গ্যাস। মূলার, পাসেল, হিওম্যান প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এই শীতল হাইড্রোজেন গ্যাস অতি শক্তিশালী রেডিও-তরঙ্গের উৎস। এই বেতার তরঙ্গ কি রকম শক্তিশালী, তার একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে।

পৃথিবীর একটা বেতার কেন্দ্র যে বেতার-শক্তি বিতরণ করে, তার পরিমাণ ৯০,০০০ ওয়াট পর্যন্ত হতে পারে। আর ২৬০,০০০০০০০ আলোক-বছর দূরে অবস্থিত ছায়াপথ যে বেতার-শক্তি প্রেরণ করে, তার পরিমাণ ১০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০.০০০,০০০ ওয়াট।

সাধারণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যতদূর দেখা যায় (কেবল আলোকিত বস্তুই দেখা সম্ভব), বেতার-দূরবীক্ষণে তার চেয়ে বহু দূরতর স্থানে অবস্থিত বস্তুরও খোঁজ পাওয়া যায়—আলো তাদের নাও থাকতে পারে।

শ্রীঅশেষকুমার দাশ।

গাছের দাবা-কলম তৈরির কৌশল

অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন, বেলফুলের গাছ যখন মাটির উপর লতিয়ে যায়, তখন তার গাঁটে গাঁটে শিকড় ছাড়ে। গন্ধরাজ, কলম্বো প্রভৃতি লেবুগাছের ঝাঁকড়া শাখা-প্রশাখা নরম মাটির উপর এসে পড়লে, সেখান থেকে শিকড় ছেড়ে নতুন গাছ জন্মায়। মূল গাছ থেকে এই রকমের শিকড়-ছাড়া শাখা কেটে নিয়ে গোড়ার মাটি সমেত নতুন জায়গায় বসালে, সেই নতুন গাছে অল্প সময়ের মধ্যেই ফল ধরে থাকে।

গাছের মাটিতে নুইয়ে-পড়া যে সব শাখা থেকে বর্ষাকালে সহজে শিকড় জন্মায়, তাদের দাবা-কলম তৈরী করা খুবই সহজ।

মাটিতে-পড়া ডালের উপর কিছু মাটি চাপা দিলে কিম্বা একখানা ভারী ইট

চাপিয়ে রাখলে অল্পদিনেই শিকড় এসে যাবে। যে গাছে দাবা-কলম বাঁধবার দরকার, তার ডাল উঁচুতে থাকলে মাটিতে শক্ত করে খুঁটি পুতে, ডালের গোড়ার দিকে দড়ি বেঁধে, জোর করে নীচের দিকে নুইয়ে খুঁটির সঙ্গে টেনে বাঁধলে দাবা-কলম বাঁধবার কোনই অসুবিধা হবে না।

কিন্তু সব গাছেরই যে দাবা-কলম হবে, অথবা যে সব গাছের দাবা-কলমে চারা তৈরী হয়, তাদের সব গাছেই যে এই উপায়ে কলম জন্মাবে, তা নয়। বেলফুলের দাবানো শাখার শিকড় লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, শিকড়গুলি বেরিয়েছে গাঁটের আশপাশ থেকে। প্রথম শিকড়ের অঙ্কুর-উৎপত্তির স্থান হলো গাছের ছালের অন্তস্ত্বক,
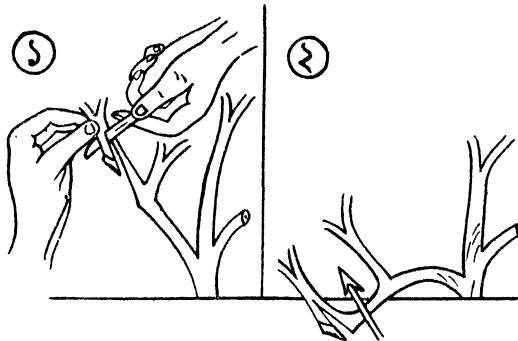
গাঁটের নীচ থেকে দাবা কলম কাটার পদ্ধতি।

যেটি ঠিক কাঠের উপর নেপ্টে থাকে। এই অন্তস্ত্বক খোলা অবস্থায় সরস বায়ু চলাচল করতে পারে, এরূপ আল্‌গা মাটির নীচে পড়ে থাকলে প্রথমে তাথেকে মূলের অঙ্কুর দেখা দেয়। অবশেষে সেটি মাটির ভিতর ছড়িয়ে পড়ে' পর্যাপ্ত শাখা-মূল তৈরী করে। সুতরাং সহজে যাদের শিকড় আসে না, তাদের দাবা-কলম বাঁধতে হলে গাঁটের নীচের দিকের ছাল (এক থেকে দু' ইঞ্চি) আংটির মত করে তুলে ফেলে মাটির ভিতর দাবিয়ে দিতে হবে। অনেক জাতের গাছেই এভাবে সহজে নতুন শিকড় বেরিয়ে পড়বে।

কিন্তু আংটির মত করে গাঁটের নীচের ছাল তোলবার সবচেয়ে বড় অসুবিধা ঘটে, দুর্বল প্রকৃতির বিভিন্ন জাতীয় গাছের বেলায়। ছাল তোলবার ফলে হয়তো সবটা ডালই শুকিয়ে যাবে, কিম্বা অন্তস্ত্বক থেকে শিকড় বের হবার পরিবর্তে ছাল-তোলা জায়গাটিতে নতুন ছাল গজিয়ে পূর্ণ করে তুলবে। সে ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল দাবানো থাকলেও আর শিকড়ের উৎপত্তি হবে না।

কিন্তু এ-রকম অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেতে হলে দাবা-কলম কাটতে হবে, গাঁটের নীচ থেকে 'জিভ' তুলে (১ ও ২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। গাঁটের নীচে ধারালো ছুরি তের্চা করে ডালের মধ্যে বসিয়ে ডালটিকে এক থেকে তিন ইঞ্চি পর্যন্ত আধাআধি চিরে বের করতে হবে। এটিই হলো জিভ। তারপর জিভটিকে নীচুদিকে মুখ করে

দাবানো জায়গায় কিম্বা দাবা-কলমের টবে বসিয়ে শাখার গোড়ার দিকে একটা খুঁটি পুততে হবে—যাতে ডালটি নড়াচড়া করতে বা উপরে উঠতে না পারে। সুনিশ্চিত ফলপ্রদ বলে চারা-ব্যবসায়ীরা অধিকাংশ গাছেরই এই উপায়ে দাবা-কলম তৈরী করেন।

যে সব গাছের শাখা অত্যন্ত মচ্‌মচে তাদের জিভ তুলতে গেলে অনেক সময় মচ্‌কে গিয়ে গোটা ডালটাই শুকিয়ে যায়। আবার কোন কোন জাতের গাছে এই জিভ্‌টাই মাটির মধ্যে গিয়ে শুকিয়ে বা পচে নষ্ট হতে পারে। এই ধরণের গাছের দাবা-কলম করতে হলে ডালটিকে গাঁটের নীচে ছুরি বসিয়ে লম্বালম্বি দু-ইঞ্চি চিরে যাতে সেটি আবার না মুড়ে যায়, তার জন্যে চেরার ফাঁকে এক টুক্‌রা ঢিল বা খোলামকুঁচি গুঁজে দিয়ে দাবিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
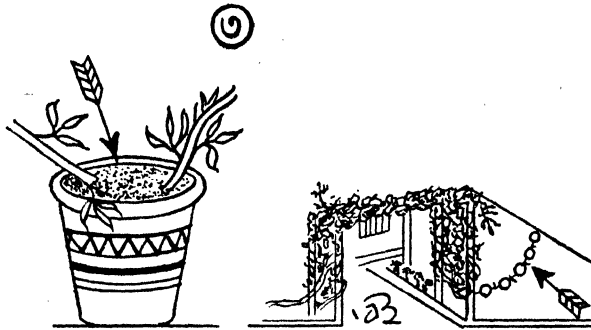
টবের উপর মূল্যবান গাছের দাবা কলম তৈয়ারীর পদ্ধতি।

মাটিতে দাবা-কলম করতে হলে মাটিটা বীজতলা বা হাপোরের মাটির মত করে ফাঁপিয়ে কুপিয়ে নিতে হবে। জল-বসা জমি, অত্যন্ত শুক্‌নো জমি বা চাপধরা জমিতে কোন গাছের বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং জমিতে যাতে জল না বসে কিম্বা একেবারে না শুকিয়ে উঠে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। আর জল দেওয়ার পর মাটিতে চাপ ধরলে নিড়েন দিয়ে আল্‌গা করে দিতে হবে।

মাটিতে কলম তৈরী করলে মাটি থেকে তুলে হাপোরে বসানো কিম্বা অন্য স্থানে নিয়ে বসানো খুব সহজ নয়। কারণ নড়াচড়ায় মূল ভাঙলে ডালটাই শুকিয়ে যেতে পারে। এজন্যে গাছ অনুসারে ছোট-বড় নানা আকারের টবের উপরই মূল্যবান গাছের দাবা-কলম বাঁধা হয় (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। মূল গাছ থেকে পৃথক করবার পর কলম-গুলিকে এই টবেই কিছুদিন বাড়িয়ে নিলে তাদের আর নড়াচড়ায় শিকড় ছিঁড়ে নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। মূল্যবান বা দুর্বল প্রকৃতির গাছের (বিশেষ করে যে সব গাছের মূল জল-বসা জমিতে সহজে নষ্ট হয়) টবের মাটি সহজে জল নিকাশের জন্যে সমান পরিমাণে চোখা-বালি, গোয়াল-ধোওয়া আবর্জনা-পচানো বা পাতা-পচানো সার, আর দোঁয়াশ মাটি মিশিয়ে তৈরী করা উচিত।

শ্রীঅমল হালদার

বিদ্যুৎ-চুম্বক (ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্‌নেট)

চুম্বক কি, তা তোমরা নিশ্চয়ই জান—আর এ-কথাও জান—চুম্বক, লোহা বা ইস্পাতকে আকর্ষণ করে। চুম্বক শুধু লোহা বা ইস্পাতই নয়, নিকেল ও কয়েকটি অ্যালয়, অর্থাৎ মিশ্র ধাতুকেও আকর্ষণ করে। তাছাড়া এক চুম্বক অন্য চুম্বককে আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণ করে থাকে। ম্যাগ্‌নেটাইট নামে একরকম খনিজ পদার্থের মধ্যেও চৌম্বক ধর্ম দেখা যায়। চুম্বককে ইংরেজীতে বলে ম্যাগ্‌নেট। ম্যাগ্‌নেটাইট থেকেই ম্যাগ্‌নেট শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

যে সব পদার্থ চুম্বকের দ্বারা আকর্ষিত হয়, তাদের বলা হয় ম্যাগ্‌নেটিক বা চৌম্বক পদার্থ। এই চৌম্বক পদার্থ থেকে কৃত্রিম উপায়ে চুম্বক তৈরী করা যায়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের দ্বারাও ম্যাগ্‌নেটিক পদার্থকে চুম্বকে রূপান্তরিত করা যায়। কিভাবে করা যায়, সে কথাই এখন বলছি—

একটা লোহার রড্ নেওয়া হলো—তাকে চুম্বকে রূপান্তরিত করতে হবে। ঐ লোহার রড্‌টিকে একটা কাচ বা কার্ডবোর্ডের নলের মধ্যে রেখে (১নং চিত্র দেখ) সেই নলটির গায়ে জড়াতে হবে বিদ্যুৎ-অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে মোড়া বিদ্যুৎ-পরিবাহী তার। এখন যদি ঐ তার দিয়ে বিদ্যুৎ-স্রোত চালানো যায়, তাহলে দেখা যাবে—ঐ লোহার রড্‌টি চুম্বকে পরিণত হয়েছে। আবার বিদ্যুৎ-স্রোত বন্ধ করে দিলেই দেখা যাবে, তার চুম্বকত্বও নষ্ট হয়ে গেছে ; অর্থাৎ যতক্ষণ বিদ্যুৎ চালানো হবে, ততক্ষণই ঐ রড্‌টির চুম্বকত্ব থাকবে। কিন্তু লোহার রডের পরিবর্তে একটি ইস্পাতের রড রেখে কিছুক্ষণ বিদ্যুৎ চালাবার পরে দেখা যাবে, ঐ ইস্পাতের রড্‌টি একটা স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়েছে। তখন তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করে দিলেও রড্‌টির চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যাবে না। এই হলো লোহার রড্ আর ইস্পাতের রডের পার্থক্য।

বিদ্যুৎ-প্রবাহের দ্বারা উৎপন্ন চুম্বকটির শক্তি নির্ভর করবে, কি পরিমাণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালানো হচ্ছে, তার উপর। বিদ্যুৎ-প্রবাহ বাড়ালে চুম্বকটি আরও শক্তিশালী হবে। আবার একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের মধ্যে জড়ানো তারটির পাকের সংখ্যা বাড়ালেও চুম্বকটি বেশী শক্তিশালী হবে। পদার্থটির বিশুদ্ধতার উপরও চুম্বকের শক্তি নির্ভর করে। প্রত্যেক চুম্বকেরই দু-দিকের দু-প্রান্তকে পোল বা মেরু বলা হয়। একটিকে বলে নর্থ-পোল বা উত্তর মেরু, অপরটিকে বলে সাউথ পোল বা দক্ষিণ মেরু। চুম্বকের আকর্ষণ-শক্তি বা নির্দিষ্টদিকে অবস্থিতির মূলই হচ্ছে, তার পোল বা মেরু দুটি। বিদ্যুৎ চালিয়ে যে চুম্বক তৈরী হয়, তারও দু-দিকে দুটি মেরু উৎপন্ন হবে। লোহার বেলায় মেরু বা পোল দুটি হবে সাময়িক, আর ইস্পাতের বেলায় হবে স্থায়ী।

চুম্বকটির একদিকে হবে নর্থ পোল আর একদিকে হবে সাউথ পোল। যদি তড়িৎ-প্রবাহকে উল্টো দিকে চালনা করা যায়, তবে পোলগুলিও উল্টে যাবে। এখন ঠিক করতে হবে, কোন্ দিকে কোন্ পোলটা হচ্ছে। এর একটা নিয়ম আছে। তোমরা নিশ্চয়ই জান, ঘড়ির কাঁটা কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে ঘোরে। এখন পূর্বোক্ত ঐ তার জড়ানো নলটির একটা প্রান্ত সামনে ধরে যদি দেখা যায় যে, সেদিক থেকে দেখলে বিদ্যুৎ-স্রোত ঘড়ির কাঁটার দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে, তাহলে চুম্বকের সেই প্রান্তে হবে দক্ষিণ মেরু। কাজেই অপর প্রান্তে হবে উত্তর মেরু। বিদ্যুতের সাহায্যে লোহা থেকে সাময়িকভাবে যে চুম্বক তৈরী হয়, তাকে বলা হয় ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেট বা তড়িৎ-চুম্বক। ঘোড়ার ক্ষুরের মত বাঁকানো লোহা দিয়ে যে চুম্বক তৈরী হয়, তাকে
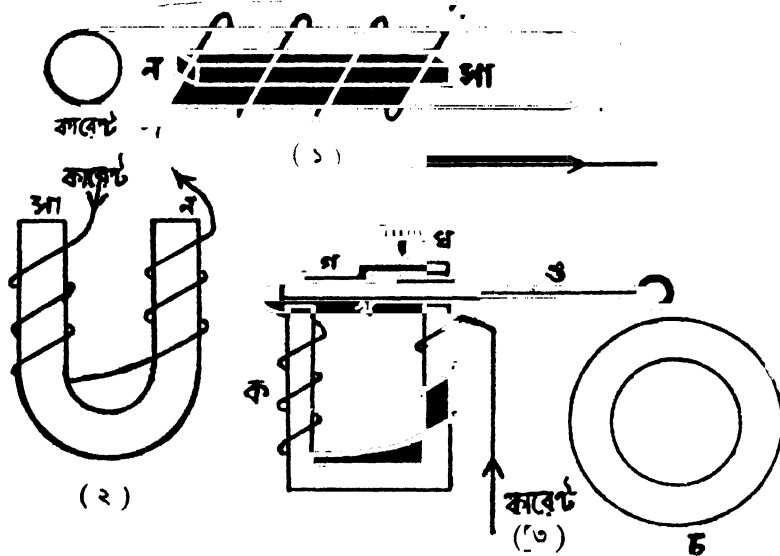
বলে হর্স-স্যু ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেট। ২নং চিত্র দেখ। হর্স-স্যু ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেট তৈরী করতে হলে তারটিকে লোহার গায়ে এমনভাবে জড়াতে হবে যেন তার বাহু দুটিকে সামনে ধরলে দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ-স্রোত একটি বাহুতে ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং অপর বাহুতে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

এই বিদ্যুৎ-চুম্বক অনেক কাজে ব্যবহার করা হয়। ইলেকট্রিক মোটর, টেলিফোন, লাউড-স্পীকার প্রভৃতি তৈরী করতে হলে প্রয়োজন হয় ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটের। লোহা তৈরীর কারখানায় বিদ্যুৎ-চুম্বকের সাহায্যে ভারী ভারী লোহা তোলা হয়। টিন ধাতু নিষ্কাশন করতে হলে এর দ্বারা আকরিককে অন্যান্য ম্যাগ্নেটিক পদার্থ থেকে আলাদা করা হয়। আবার চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সময় সময় চুম্বক ব্যবহারের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

ইলেকৃট্রিক কলিং বেল তৈরী করবার জন্যে তোমাদের প্রত্যেকেরই উৎসাহ আছে নিশ্চয়। কাজেই এই প্রসঙ্গে ঘরের ইলেকৃট্রিক বেল নির্মাণের কৌশলটা বলছি।

ধর 'ক' হলো একটা হর্স-সু ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেট (৩নং চিত্র দেখ)। তার সামনেই রয়েছে 'খ'-চিহ্নিত একটা লোহার টুক্‌রা। এই লোহার টুক্‌রাটি 'গ'-চিহ্নিত একটা স্প্রিং-এর সঙ্গে লাগানো রয়েছে। এই স্প্রিংটা দেবার তাৎপর্য হলো এই যে, লোহার টুক্‌রাটি কিছুটা সরে গেলেও আবার তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনে। এই টুক্‌রাটির সঙ্গে লাগানো রয়েছে 'ঙ'-চিহ্নিত একটা হাতুড়ির মত জিনিষ। এটা 'চ'-চিহ্নিত বেলের গায়ে ঘা দিলে শব্দ হয়। স্প্রিংটার সঙ্গে লাগানো রয়েছে 'ঘ'-চিহ্নিত একটা স্ক্রু। এই স্ক্রুটা ঐ স্প্রিং-এর সঙ্গে লেগে গিয়ে বিদ্যুৎ-পরিচলনের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

এখন যদি তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালানো যায়, তবে কি হবে? ঐ ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটটা তার সামনের ঐ লোহার টুক্‌রাটাকে আকর্ষণ করবে। এর ফলে হাতুড়িটা বেলের গায়ে ঘা দিলেই শব্দ হবে। কিন্তু লোহার টুক্‌রাটা আকর্ষিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই স্প্রিং-এর সঙ্গে স্ক্রু'র সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ফলে, বিদ্যুৎ-স্রোতের পথ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আর বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না এবং ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটের চুম্বকত্বও থাকবে না। তখন ঐ স্প্রিং-এর জন্যে লোহার টুক্‌রাটা আবার স্বস্থানে ফিরে আসবে। কিন্তু স্বস্থানে ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই বিচ্ছিন্ন পথ উন্মুক্ত হয়ে আবার বিদ্যুৎ চলতে থাকবে। কাজেই লোহার টুক্‌রাটা আবার চুম্বকের ধর্ম পাবে এবং হাতুড়িটা আবার বেলের গায়ে ঘা দিতেই শব্দ হবে। এই রকম ভাবে বিদ্যুৎ একবার বন্ধ হবে এবং আবার চালু হবে। এর ফলে হাতুড়িটা খুব তাড়াতাড়ি বেলের গায়ে ঘা দিয়ে শব্দ করতে থাকবে। ইলেকৃট্রিক বেলে শব্দ করবার জন্যে একটা বেল-পুস্ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অন্যান্য সময় ঐ বেল-পুসের জায়গায় বিদ্যুতের পথটা বিচ্ছিন্ন থাকে; কাজেই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না। ঐ বেল-পুসটা টিপ্‌লেই বিচ্ছিন্ন পথটা সংযুক্ত হয়ে যায় এবং বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে ঘণ্টা বাজতে থাকে।

শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী

জানবার কথা

১। 'ফ্রগম্যান' বা ব্যাং-মানুষের কথা তোমরা অনেকেই হয়তো শুনে থাকবে। ব্যাঙের পিছনের পায়ের পাতার মত চওড়া অথচ চ্যাপ্টা একরকম জুতা পরে জলের মধ্যে খুব দ্রুত সাঁতার কেটে এগিয়ে যাওয়া যায়। ডুবসাঁতার কাটবার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে খাড়াভাবে একটা নল লাগানো বেশ হাল্কা ও স্বচ্ছ একরকম মুখোস ব্যবহৃত হয়। সাঁতার কাটবার এই ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে আধুনিক কালে। প্রকৃত প্রস্তাবে সাঁতার কাটবার জন্যে এরূপ যান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছিল অনেক কাল পূর্বে। জিওভ্যানি বোরেলি নামে একজন ইটালীয় গণিতজ্ঞ সপ্তদশ শতাব্দীতে

১নং চিত্র

জলের নীচে অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কাটবার জন্যে অনেকটা এই ধরণেরই যান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১ নম্বরের ছবিটা থেকে তাঁর পরিকল্পনার ব্যাপারটার একটা ধারণা করতে পারবে। অনেকক্ষণ ধরে ডুবসাঁতার কাটবার জন্যে তিনি একটা বাতাস-ভর্তি পাত্র, জলের নীচে নির্দিষ্ট গভীরতায় অবস্থান করবার জন্যে নিয়ন্ত্রক যন্ত্র এবং পায়ে পরবার জন্যে খুব পাতলা অথচ চওড়া এক জোড়া পাখনা ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলি মোটেই কার্যকরী হয় নি।

২। উত্তর মেরুঅঞ্চলে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি সুবিধাজনক জলপথ খুঁজে বের করবার জন্যে অনেকদিন ধরেই চেষ্টা চলছিল। নরওয়েয় অভিযাত্রী রোয়াল্ড অ্যামুণ্ডসেন ছোট্ট একখানি মাছ-ধরা জাহাজ নিয়ে সর্বপ্রথম এই বহুআকাঙ্ক্ষিত অজানা পথের অনুসন্ধানে যাত্রা করেন। কিন্তু এই জাহাজখানি তিন-তিনটা শীত ঋতু

উত্তর মেরু অঞ্চলের বরফের মধ্যে আটক থাকবার পর ১৯০৮ সালের অগাষ্ট মাসে ফিরে

২নং চিত্র

আসতে সক্ষম হয়।

৩। জেনারেল ইলেকট্রিকের গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিকেরা সম্প্রতি আমেরিকায় রেকর্ড করবার এক অভিনব ব্যবস্থা প্রদর্শন করেছেন। এই ব্যবস্থায় সুতার কাটিমের
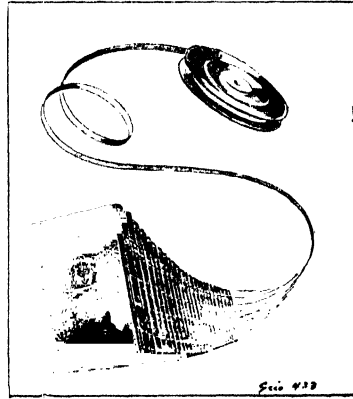
৩নং চিত্র

মত ছোট্ট একটি কাটিমে জড়ানো ফিতার উপর মাত্র ২৪ মিনিটে ২৪ ভলিউমের সম্পূর্ণ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার রেকর্ড করা যায়। এই ব্যবস্থায় যে কোন কিছুর রেকর্ড করা বা ছায়াছবি প্রদর্শন করা সম্ভব।

৪। সমুদ্রে ফেণার মত বেশ উঁচু হয়ে ভেসে বেড়ায় একপ্রকার অদ্ভূত প্রাণী। এদের বলা হয় পর্তুগীজ ম্যান-অব-ওয়ার, অর্থাৎ পর্তুগীজ যুদ্ধজাহাজ (বৈজ্ঞানিক নাম ফাইস্যালিয়া ফাইস্যালিস)। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, সমুদ্রের যাবতীয় প্রাণীদের মধ্যে

ওজন অনুপাতে এরা মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বেশী বিপজ্জনক। সাঁতারুদের রক্ষীবাহিনীর

৪নং চিত্র

অনেকেই এগুলিকে হাঙ্গর অথবা রাক্ষুসে মাছ বারাকুড়ার চেয়েও বেশী ভয় করে।

৫। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস্ সম্প্রতি ট্র্যানজিট ১-বি নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন করেছে। এই উপগ্রহটি জাহাজের নাবিক ও বৈমানিকদের পক্ষে খুবই কাজে লাগবে। সারা দিন-রাত্রি তো বটেই, খারাপ আবহাওয়ার মধ্যেও
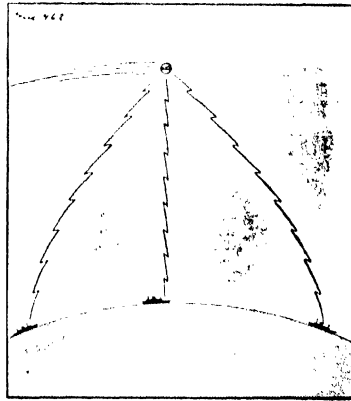
৫নং চিত্র

তাঁরা এই উপগ্রহটিকে দেখে অথবা তার রেডিও-সঙ্কেত থেকে তাঁদের অবস্থান-স্থল নির্ণয় করতে পারবেন এবং শীঘ্রই আরও যেসব যান্ত্রিক কৌশলের ব্যবস্থা হবে, তাদের সাহায্যে জাহাজ ও বিমান চালনায় অপরিসীম উন্নতি সাধিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৬। পৃথিবীর সর্বত্র ঘোড়দৌড়ে যে সব ঘোড়া অংশগ্রহণ করে, তাদের কোনটারই বয়স দশ বছরের বেশী নয়। কিন্তু জাপানে সম্প্রতি এর একটি বিপরীত ঘটনা দেখা

গেছে। সেখানে ১৪ বছর বয়স্ক একটি ঘোড়া দৌড়ের বাজী জিতে সবাইকে অবাক করে

৬নং চিত্র

দিয়েছে। এই ঘোড়াটির জকির বয়সও ৭২ বছর।

৭। ওড়বার সময় মশা এক সেকেণ্ডে গড়পড়তা ১৮০ থেকে ১৯০ বার ডানা

৭নং চিত্র

কাঁপিয়ে থাকে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—মশার ডানার পেশীর ওজন তার সম্পূর্ণ দেহের ওজনের প্রায় ২০ শতাংশ।

৮। আমাদের আশেপাশে যে কত রকমের ক্ষুদ্রকায় কীটপতঙ্গ ইতস্ততঃ বিচরণ করে, আমরা তা খুঁটিয়ে দেখি না। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি আমাদের নজরে পড়ে না। সাধারণতঃ ক্ষুদ্রকায় কীটপতঙ্গদের মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক বড়, যেমন—প্রজাপতি, গুবরে পোকা, ফড়িং প্রভৃতিই সহজে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটু মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে, আমাদের আশেপাশে অল্প পরিসর স্থানের মধ্যেই অগণিত রকমারি পোকামাকড় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ পর্যবেক্ষণের ফলে

দেখা গেছে—এক একর পরিমিত স্যাঁৎসেতে জমিতে প্রায় ৪,০০০,০০০ ক্ষুদ্রকায়

৮নং চিত্র

পোকামাকড় জীবিকানির্বাহের উদ্দেশ্যে স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছে।

৯। হাওয়াই দ্বীপে বর্শা-নিক্ষেপ ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় এক অদ্ভুত ব্যাপারের কথা জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায়, এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বর্শা-নিক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু ছিল হাওয়াই দ্বীপের রাজা কামেহামেহা। কামেহামেহার

৯নং চিত্র

প্রতি ছয়জন বর্শা-নিক্ষেপকারী এক সঙ্গে ছয়টি বর্শা নিক্ষেপ করে। কামেহামেহা নিক্ষিপ্ত বর্শার তিনটিকে ধরিয়া ফেলে, দুটির গতিপথ বাঁকিয়ে দেয় এবং বিদ্যুৎ-গতিতে ঈষৎ সরে গিয়ে ষষ্ঠটিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। ১৮১৯ সালে কামেহামেহার মৃত্যু হয়। হাওয়াই এখন আমেরিকার ৫০তম রাষ্ট্র।

১০। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় কংক্রিটের বাঁধ হলো, গ্র্যাণ্ড কোলি

ড্যাম। ওয়াশিংটন ষ্টেটে কলাম্বিয়া নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত এই বাঁধটির দৈর্ঘ্য হলো ৪,১৭৪ ফুট। এই বাঁধের সাহায্যে জল ধরে রাখবার জন্যে রুজভেল্ট হ্রদ নামে
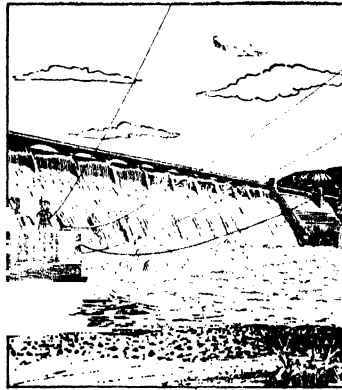
১০নং চিত্র

একটি বিস্তীর্ণ জলাধার আছে। জলাধারটি ক্যানাডার সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় ১৫১ মাইল বিস্তৃত।

১১। গ্যালিলিও এবং নিউটনের সময়ে টেলিস্কোপের সাহায্যে সম্ভবতঃ প্রায় এক মিলিয়ন (১ মিলিয়ন=১০ লক্ষ) তারকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। বর্তমান
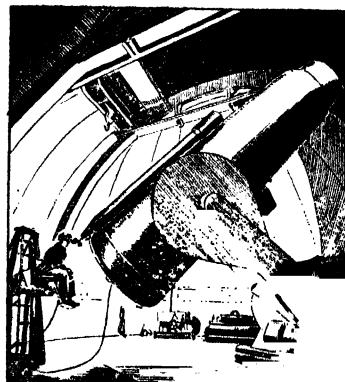
১১নং চিত্র

যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এক-শ' হাজার মিলিয়ন বিলিয়নেরও (১ বিলিয়ন=১০০ মিলিয়ন) বেশী তারকার সন্ধান পেয়েছেন।

১২। বিভিন্ন প্রাণীর আয়ুষ্কাল বিভিন্ন রকমের। মরিটাস দ্বীপের এক জাতীয় কচ্ছপ ১৫০ বছরেরও অধিক জীবিত থাকে। মে-ফ্লাই নামে মশকের মত একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গের পরিণত অবস্থায়, অর্থাৎ শেষবার খোলস পরিত্যাগের পর ডানাওয়ালা

পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ প্রায় ২০ মিনিটের বেশী বাঁচে না। আমাদের দেশেও প্রচুর মে-ফ্লাই দেখা যায়। কোন অপরিষ্কৃত জলাশয়ে একটু লক্ষ্য করিলেই দেখতে পাবে, প্রায়

১২নং চিত্র

একই সময়ে অকস্মাৎ হাজার হাজার মে-ফ্লাই-এর আবির্ভাব হলো। তার কিছুকাল বাদেই দেখবে, জলের উপরিভাগ হাজার হাজার মে-ফ্লাই-এর মৃতদেহে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

১৩। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্‌-এর বড় বড় সহরে দৈনিক পত্রিকাগুলির সাধারণতঃ পৃষ্ঠা-সংখ্যা থাকে ৪০ থেকে ১০০ বা আরও কিছু বেশী। কিন্তু বড় বড় পত্রিকাগুলির
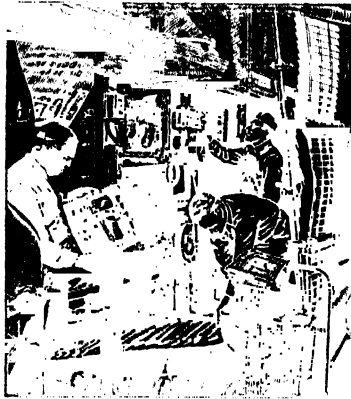
১৩নং চিত্র

প্রত্যেকেরই রবিবারের কাগজের পৃষ্ঠা-সংখ্যা হয়ে থাকে ২০০ বা আরও বেশী। নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌-এর এক রবিবারের কাগজের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫০১ পর্যন্ত দেখা গেছে।

১৪। ১৮৬০ সালে, যখন আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রেল বা টেলিগ্রাফ যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপিত হয় নি, তখন ঘোড়ার ডাকে এই উভয় অঞ্চলের

মধ্যে জরুরী চিঠিপত্র বা সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ঘোড়াগুলিকে এই উভয় অঞ্চলের প্রান্ত থেকে ২০০০ মাইলেরও বেশী সমভূমি, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি

১৪নং চিত্র

ইত্যাদি অতিক্রম করে চিঠিপত্র ও সংবাদাদি বিলির ব্যবস্থা করতে হতো। এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে প্রায় ১০ দিন লাগতো। সবচেয়ে দ্রুতগামী সংবাদ-বাহকের সময় লাগতো প্রায় সাতদিন ১৭ ঘণ্টা।

১৫। নিউজিল্যাণ্ডে সম্প্রতি এক ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় পাঁচটি ঘোড়া যোগদান করে। তাতে একটি ঘোড়া অন্য কয়টিকে দৃশ্যতঃ এক মাইল পিছনে ফেলে

১৫নং চিত্র

লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে। চারটি ঘোড়া পড়ে যায়। তাদের দুটিকে তুলে দেওয়া হয়। প্রথম ঘোড়াটির লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার ৪ মিনিট পর দ্বিতীয় ঘোড়াটি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সরকারী সিদ্ধান্ত হয়—এক মাইল অগ্রগামী হয়ে বাজী জিতেছে।

বিবিধ

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবস

৩০শে নভেম্বর, ১৯৬০, বুধবার অপরাহ্ণ ৬-১৫ মিনিটের সময় বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ্যে ভারতীয় ক্যান্সার গবেষণা-কেন্দ্রের ডিরেক্টর ডাঃ খানোলকর এম. ডি. "ক্যান্সার সমস্যার কয়েকটি বিষয়" সম্বন্ধে দ্বাবিংশতিতম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মারক বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

কলিকাতায় অভ্র গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপন

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের পরিচালকমণ্ডলীর বৈঠকে কলিকাতার কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃত্তিকা গবেষণাগারে একটি অভ্র গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রটি স্থাপন করিতে ৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। এখানে অভ্রের গুণাগুণ এবং অভ্রজাত দ্রব্যাদির উন্নয়ন ও পরিত্যক্ত অভ্রের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা চলিবে।

উক্ত বৈঠকে ৭১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ-সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়। এই বৈঠকে উক্ত পরিষদের সভাপতি জহরলাল নেহরু সভাপতিত্ব করেন।

জম্মু ও কাশ্মীরে যে সকল মূল্যবান খনিজ ও মৃত্তিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি পরীক্ষার জন্য জম্মুর আঞ্চলিক গবেষণাগারে কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃত্তিকা গবেষণাগারের একটি ইউনিট স্থাপন করা হইবে বলিয়া স্থির করা হয়। উক্ত রাজ্যের কয়লা সম্পর্কে সমীক্ষা গ্রহণের জন্য জম্মুতে একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। কাশ্মীরের লিগ্‌নাইট হইতে ব্রিকেট তৈয়ার করিবার জন্য শ্রীনগরে একটি কারখানা স্থাপিত হইবে। ইহার জন্য মূলধন ব্যয় হইবে ৬ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা।

জাতীয় ভিত্তিতে ধাতুর অবক্ষয় সম্পর্কে গবেষণার প্রস্তাবও পরিচালকমণ্ডলী অনুমোদন করিয়াছেন।

সাঁওতাল পরগণায় গার্নেটের অস্তিত্ব

সরকারী মহলের সংবাদে প্রকাশ, ভাগলপুর জেলার ভোলোয়া, ভোরসার ও বেথারিয়ায় এবং সাঁওতাল পরগণার গৌরীহাসারা নামক গ্রামে দেখিতে কাচের ন্যায় খনিজ পদার্থ গার্নেট পাওয়া গিয়াছে।

রক্তবর্ণ স্বচ্ছ গার্নেট মণিমাণিক্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মৃত্তিকার উপরে ধূলাবালির মধ্যে এগুলি ছড়ানো রহিয়াছে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যানুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সাঁওতাল পরগণায় প্রাপ্ত গার্নেট মূল্যবান প্রস্তর হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারিত, কিন্তু এগুলি এত ক্ষুদ্র যে, কোন কাজে আসিবে বলিয়া মনে হয় না। মৃত্তিকার নিম্নে বৃহত্তর গার্নেটের সন্ধান করিতে হইবে।

পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার

'সুইডিস অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স' আমেরিকার অধ্যাপক ডোনাল্ড এ, গ্লেসারকে পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দানের কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

গ্লেসার, মিচিগানের আন আরবর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। 'বাবল চেম্বার' আবিষ্কারের জন্য তাঁহাকে এই পুরস্কার দেওয়া হইতেছে।

এই পুরস্কারের মূল্য প্রায় ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। আগামী ১০ই ডিসেম্বর একটি অনুষ্ঠানে অধ্যাপক গ্লেসারকে, সুইডেনের রাজা গুস্তভ এডল্‌ফ্‌ এই পুরস্কার দান করিবেন।

সাইট্রেট, ফসফেটের সাহায্যে রক্ত সংরক্ষণ

স্যানফ্রান্সিস্কো—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ জন জিগিবসন আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব ব্লাড ব্যাঙ্ককে জানিয়েছেন যে, রোগীর দেহে রক্ত দেবার জন্যে যে সব রক্ত সংগ্রহ করা হয়ে থাকে, তা সাইট্রেট, ফস্‌ফেট ডেক্সট্রোজের সাহায্যে প্রায় একমাস পর্যন্ত টাট্‌কা রাখা যেতে পারে। রক্ত যাতে জমাট না বেঁধে যায় ও টাট্‌কা থাকে তার জন্যে বর্তমানে যে সব ব্যবস্থা আছে, তাতে মাত্র তিন সপ্তাহ পর্যন্ত এদের তাজা রাখা যেতে পারে। বর্তমানে বহু পরিমাণ সংগৃহীত রক্ত অধিক সময়ের জন্যে তাজা না রাখতে পারায় নষ্ট হয়ে যায়। তবে হিমায়িত করে সুদীর্ঘকালের জন্যে রক্ত-সংরক্ষণ সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

রক্ত-সংরক্ষণের অভিনব পন্থা

মানুষের রক্ত বর্তমানে বড় জোর তিন থেকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত তাজা রাখা যায়, তারপরেই নষ্ট হয়ে যায়। আমেরিকার নৌ-বাহিনীর বিজ্ঞানীরা মানুষের রক্ত প্রায় চার বছর পর্যন্ত টাট্‌কা রাখবার এক অভিনব পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের এই অভিমত আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের জার্ণালে প্রকাশিত হয়েছে। এই পন্থা গৃহীত হলে বর্তমানে ব্লাড ব্যাঙ্কসমূহে রক্ত-সংরক্ষণের যে উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে, তার আমূল পরিবর্তন হবে। তাঁরা বলেছেন, হিমাঙ্কের ২৪ ডিগ্রী পর্যন্ত নীচের তাপমাত্রায় রক্ত রেখে দিলে তা আর নষ্ট হয় না। ম্যাসাচুসেট্সের চেল্‌সী হাসপাতালে মার্কিন নৌ-বাহিনীর বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষা করে দেখেছেন।

গেঁটেবাত চিকিৎসার অভিনব পদ্ধতি

আরথ্রাইটিজ বা গেঁটে বাতের জন্যে হাতের বিকৃতি ঘটে ও হাত অবশ হয়ে যায়। সম্প্রতি আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ অ্যাড্রিয়ান ই. ফ্ল্যাট এই বিকৃতি দূরীকরণ ও এই রোগের চিকিৎসার এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতিতে রোগীর আঙ্গুলের গাঁটগুলি শল্য-চিকিৎসার সাহায্যে সরিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় ষ্টেনলেস-ষ্টিলে তৈরি গাঁট লাগিয়ে দেওয়া হয়।

গত ২১শে অগাষ্ট থেকে ২৭শে অগাষ্ট পর্যন্ত এখানে ভৌত ভেষজ বা ফিজিক্যাল মেডিসিন সম্পর্কে তৃতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। তিনি এই অধিবেশনে এই রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে জানিয়েছেন, এই ধরণের ৩০টি রোগীর ক্ষেত্রে কৃত্রিম গাঁটের ব্যবস্থা করে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। রোগীরা তাদের আড়ষ্ট আঙ্গুল পুনরায় চালনা করতে সক্ষম হয়েছে।

গেঁটেবাতের ঔষধ

শিকাগোর ডাক্তার এমিল ডি. ভি. হার্ডজার বাত ও গেঁটেবাতের চিকিৎসায় একটি নতুন ঔষধ প্রয়োগ করে খুবই ভাল ফল পেয়েছেন বলে আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জার্নালে লিখিত হয়েছে। হাইড্রোকর্টিসোনের বদলে তিনি এই ট্রিয়ামসিনোলোন অ্যাসিটোনিড (কেনালগ) নামে ঔষধটি ১৮ জন পুরুষ ও ৪৯ জন নারী—মোট ৬৭ জন রোগীর দেহে প্রয়োগ করেছিলেন। ৬৭ জন রোগীরই এতে বেদনার উপশম হয়েছে এবং ফোলাও কমেছে। তাছাড়া চলাফেরার ব্যাপারেও ক্রমেই উন্নতি দেখা গেছে। তিনি গ্রন্থিতে এই ঔষধের ইন্‌জেকশন দিয়েছেন। রোগীদের বয়স ছিল ১৯ থেকে ৮৫ বছর।

বাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইলেকট্রন মাইক্রস্‌কোপের সাহায্য

ব্রিটেনে বাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে নূতন

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে যে কোন বস্তুকে ১৫০,০০০ গুণ বড় করিয়া দেখা যাইতে পারে।

এই মাইক্রস্কোপটি লণ্ডনের সেণ্ট টমাস হস্পিটাল মেডিক্যাল স্কুলের একটি নূতন ইউনিটে স্থাপন করা হইয়াছে। এম্পায়ার রিউম্যাটিজম কাউন্সিলের আনুকূল্যে উক্ত ইউনিটটি স্থাপিত হয়। এই যন্ত্রটি এখন আর্থ্রাইটিস ও নানারকমের বাত সম্পর্কে গবেষণায় গবেষণা-কর্মীদের সাহায্য করিতেছে। যন্ত্রটির মূল্য কিঞ্চিদধিক ১২,০০০ পাউণ্ড।

কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ডাঃ এস. ডবলিউ. সি. কোপম্যান নূতন মাইক্রস্কোপের পরিবর্ধন শক্তি সম্পর্কে বলেন—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি বিন্দুকে এই যন্ত্রের নীচে রাখা হইলে তাহাকে ৫০ গজ ব্যাসের গোলক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এই ভাবে এক ইঞ্চির সহস্র ভাগের এক ভাগ পরিমিত একটি কোষকে দেখাইবে, ১৫ ইঞ্চি ব্যাসের কোষের মত।

ডাঃ কোপম্যান আরও বলিয়াছেন—গ্রন্থির বাত বা ওষ্টিও-আর্থ্রাইটিস সম্পর্কে কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা হয়, একমাত্র ব্রিটেনেই অন্ততঃ অর্ধ মিলিয়ন লোক এই ব্যাধিতে ভুগিতেছে। সাধারণ কম্পাউণ্ড মাইক্রস্কোপের সাহায্যে বর্তমানে উপাস্থি ১,০০০ গুণ বড় করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা সম্ভব হইতেছে। ইহা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইলেও কোষগুলকে সন্তোষজনকভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে সব রকম কোষগুলিকে বিশেষভাবে পরীক্ষার সুবিধা পাওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে যদিও বাত সম্পর্কে অনেক কিছু জানিতে পারা গিয়াছে, তথাপি এখনও স্পষ্টভাবে বলিতে পারা যায় না—এই সকল বাতের কারণ কি। মূল কারণ জানা সম্ভব না হইলে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থাও সম্ভব নহে।

আগুনে পোড়া রোগীর চিকিৎসা

শরীরের কোন অংশ আগুনে পুড়ে গেলে রোগীর দেহে বিষক্রিয়া চলতে থাকে। তবে তা প্রতিরোধ করবার ও নষ্ট করে দেবার মত শক্তি বা অ্যান্টিটক্সিনও তার দেহে জন্মায়। সম্প্রতি বেথেসডা মেরিম্যাণ্ডের ন্যাশন্যাল নেভাল মেডিক্যাল সেণ্টারে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আগুনে-পোড়া রোগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। ১৭টি রাষ্ট্রের বিশিষ্ট চিকিৎসক ও জীব-বিজ্ঞানী এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

তাঁদের অভিমত এই যে খুব বেশী পুড়ে গেলে অন্য কোন ব্যক্তির রক্ত ঐ রোগীর দেহে ইন্‌জেকশন করলে রাতারাতি ফল পাওয়া যায়। তবে যে কোন ব্যক্তির রক্ত চলবে না—যাদের শরীরের কোন অংশ কোন সময়ে পুড়ে গিয়েছিল, কেবল মাত্র তাদের রক্তই ইন্‌জেক্‌শন দেবার যোগ্য।

ঠাণ্ডা জলের সাহায্যে আগুনে-পোড়া রোগীর চিকিৎসা

শিকাগো—আমেরিকার মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকার চলতি সংখ্যায় ডাঃ অ্যালেক্স জি. শুল্‌ম্যান লিখেছেন, আগুনে-পোড়া রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসায় বরফের মত ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করে তিনি বিশেষ ফল পেয়েছেন। এতে জ্বালা-যন্ত্রণারও বেশ উপশম হয়। গত পাঁচ বছরের মধ্যে দেড়-শ' রোগীর ক্ষেত্রে তিনি এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেছেন। প্রত্যেকটি রোগী এতে আরাম পেয়েছে—দগ্ধস্থানে কোন ফোস্কাও পড়ে নি এবং ক্ষতস্থান খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়েও গেছে। শরীরের শতকরা বিশভাগ পর্যন্ত দগ্ধ হলে এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা চলতে পারে।

যোদ্ধাদের জন্যে অভিনব ভেষজ

আঘাতের চোটে শরীরের কোন জায়গা

থেঁৎলে গেলে ভ্যারিডেস বাক্যাল নামে একটি ওষুধে খুবই উপকার হয়। মুষ্টিযোদ্ধা ও কুস্তিগীরদের এই ওষুধটি খুবই কাজে লাগে। আমেরিকার লেডারলী লেবরেটরিতে এই ওষুধটি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বৃটিশ চিকিৎসক ডাঃ জোসেফ এল. ব্লনষ্টিন এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখেছেন।

কলেরা রোগে ভেদবমির কারণ

ক্যালিফোর্ণিয়া—স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জেবালডিন ফুক্স্‌ষ্ঠান ও ফ্রেডারিক ফুক্স্‌ষ্ঠান নামে চিকিৎসক-দম্পতি জানিয়েছেন—কলেরা বীজাণুর জন্যে রোগীর দেহে যে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তার ফলে রোগীর অন্ত্রসমূহ লবণ গ্রহণ করতে পারে না। এজন্যে রোগী যে জল পান করে, তা পেটে জমা হয় এবং ভেদবমি দেখা দেয়।

সস্তায় সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিণত করবার প্রক্রিয়া

ফ্রিপোর্ট, টেক্সাস—বর্তমানে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিণত করবার জন্যে প্রতি হাজার গ্যালনে এক ডলার খরচ পড়ে। সরকারী প্রচেষ্টায় দক্ষিণ ডাকোটা, ক্যালিফোর্ণিয়া, নিউ-মেক্সিকো এবং ফ্রিপোর্টে আরও সস্তায় সমুদ্রের লোনা জলকে পানীয় জলে পরিণত করবার কারখানা নির্মিত হচ্ছে। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-জন বিজ্ঞানী সমুদ্রের জলকে সস্তায় পানীয় জলে পরিণত করবার একটি অভিনব প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছেন।

জলের উপরিভাগে রাসায়নিক পদার্থ ছড়াইয়া বাষ্পীভবন হ্রাসের প্রয়াস

ব্রিটেনের জিওলজিক্যাল সার্ভের সহকারী ডিরেক্টর ডাঃ ষ্টিভেনসন বুকাননের মতে, হ্রদ এবং জলাশয়গুলিকে রাসায়নিক পদার্থ ছড়াইয়া জলের উপর আস্তরণ সৃষ্টি করিতে পারিলে বাষ্পীভবন-জনিত ক্ষয় হ্রাস করা সম্ভব হইবে এবং তাহার ফলে বিশ্বের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইবে।

ডাঃ বুকানন বলেন, পৃথিবীর কোন কোন অংশে বাষ্পীভবনের হার হইল, বৎসরে ৬০ হইতে ৭০ ইঞ্চি। এই বাষ্পীভবন যদি রোধ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেচকার্য এবং উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য প্রচুর জল পাওয়া যাইতে পারিবে।

কিন্তু এই আস্তরণ রক্ষা করা খুব সহজ কাজ হইবে না, কারণ তাহা হাওয়ার বেগে যে কোন সময় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এবং একবার ভাঙ্গিয়া গেলে আস্তরণের কোন মূল্যই থাকিবে না। তিনি বলেন—এখন এই সমস্যা সমাধানের উপায় দেখিতে হইবে।

প্যারাস্যুটের সাহায্যে সমুদ্রের স্রোতধারা নির্ণয়

আমেরিকায় প্যারাস্যুটের সাহায্যে সমুদ্র ও সমুদ্রোপকূল সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহ ও সমুদ্রের গভীরে স্রোতের পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা হচ্ছে। সমুদ্রের উপরে ভাসমান বয়ার সঙ্গে সংলগ্ন প্যারাস্যুটগুলিকে ১৬ থেকে ১০০০ ফুট পর্যন্ত জলের নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়। বয়াগুলি প্যারাস্যুটের পিছনে পিছনে ভেসে যায়। এভাবেই স্রোতের মাত্রা ও গতি নির্ণীত হয়ে থাকে।

টাইপ রাইটার মেশিনের প্লাষ্টিক ফিতা

নিউইয়র্ক—আমেরিকার ইণ্টারন্যাশন্যাল বিজিনেস মেশিন্‌স্ নামে একটি প্রতিষ্ঠান টাইপ রাইটারের এক প্রকার নতুন ধরণের ফিতা তৈরী করেছেন। কাপড়ের ফিতার মত এই ফিতা মেশিনে আট্‌কে ধরে না এবং ছাপা খুব পরিষ্কার ও ঝরঝরে হয়ে থাকে। কাপড়ের ফিতা ব্যবহারে নানারকম অসুবিধা আছে। প্লাষ্টিকের ফিতা ব্যবহারে এসব অসুবিধা অনেকটা দূর হবে এবং নতুন ধরণের অক্ষর ব্যবহারও সম্ভব হবে। এই ফিতাটি বেশ শক্ত

এবং সঙ্কোচন ও প্রসরণশীল বলেই মেশিনে আর্টকে ধরে না।

অতি দ্রুত গণনা করবার অভিনব যন্ত্র

আমেরিকার ওয়েষ্টিং হাউস কর্পোরেশন অতি দ্রুত গণনা করবার একটি অভিনব যন্ত্র তৈরী করেছেন। এই কম্পিউটরের সাহায্যে প্রতি সেকেণ্ডে ১৬,৬০০০টি অঙ্ক কষা বা হিসেব করা যাবে। বিমান চলাচল ব্যবস্থা এবং বিমানে অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে এই যন্ত্রটি বিশেষ কাজে লাগবে।

মানুষের দৃষ্টিশক্তির মূল উৎস

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে "আলোক, বর্ণ ও দৃষ্টি-শক্তি" সম্পর্কে এক ভাষণে ডাঃ সি. ভি. রামন এই প্রথম প্রকাশ করেন যে, মানুষের দৃষ্টিশক্তি ও বর্ণ সম্পর্কে তিনি বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সেগুলি শীঘ্রই প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করা হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার এই সকল নূতন আবিষ্কার দৃষ্টিশক্তি ও বর্ণ সংক্রান্ত পুরাতন ফটো-কেমিক্যাল থিওরিকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছে।

মানুষের চক্ষু কি ভাবে রং ও বর্ণ উপলব্ধি করে, ডাঃ রামন সে সকল অতি জটিল বিষয় সমবেত বিদ্বজ্জনের নিকট বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেন।

মিনিটে ৮৩,০০০ শব্দ প্রেরণ

লণ্ডনের ১৫৮ মাইল উত্তরে ক্রিউ শহরে বৃটিশ রেল কর্তৃপক্ষ যে স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক রিলে যন্ত্র স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা মিনিটে ৮৩,০০০ শব্দ সম্বলিত বার্তা প্রেরণ করিতে সক্ষম হইবে।

এই যন্ত্র—ষ্ট্রাড (Strad) নামে পরিচিত—নির্মাতা হইলেন ষ্ট্যাণ্ডার্ড টেলিগ্রাফস্ অ্যাণ্ড কেবলস্ কোম্পানী। তাঁহারা বলেন, যন্ত্রটি বিভিন্ন স্থান হইতে আগত সার্কিটের টেলিগ্রাফ-বার্তা গ্রহণ করিয়া সাময়িকভাবে একটি চৌম্বক ড্রামের গায়ে ধরিয়া রাখে, এবং ক্রমশঃ বাছিয়া লইয়া গন্তব্য স্থান অনুযায়ী বার্তাগুলিকে প্রেরণ করিতে থাকে।

সম্প্রতি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বৃটিশ রেলওয়েজ ইলেকট্রিফিকেশন একজিবিশনে এই যন্ত্রটি প্রদর্শিত হয়।

খরগোসের প্রজনন শক্তির সঙ্গে আলোর তাপমাত্রার সম্বন্ধ

বিভিন্ন ঋতুতে আলোর তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে থাকে। খরগোসের প্রজনন-শক্তি হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে যে আলোর তাপমাত্রার সম্বন্ধ রয়েছে, বিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকেই এরূপ অনুমান করছিলেন। সম্প্রতি ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ চার্লস্ সাইয়ার পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, বসন্তকালেই খরগোসের প্রজনন-শক্তি সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়।

বিহারে গন্ধকের উৎস আবিষ্কার

বিহারের আমজোর অঞ্চলে গন্ধকের সুবৃহৎ উৎস আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা হইতে দেশে গন্ধকের সমগ্র চাহিদা মিটিবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্তমানে প্রতি বৎসর কয়েক কোটি টাকার গন্ধক আমদানী করিতে হয়। জিওলজিক্যাল সার্ভে ও ব্যুরো অব মাইনস্ যুক্তভাবে এই আবিষ্কার করিয়াছেন।

চন্দ্রলোকে যান্ত্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী

সোভিয়েট বিজ্ঞানী মার্তিনোভের মতে, কাল-ক্রমে মানবরূপী যন্ত্রই চন্দ্রলোকে স্থায়ী মানমন্দিরের কাজ পরিচালনা করিবে।

মস্কো বেতারের প্রতিনিধির নিকট তিনি বলেন, মানুষ যেদিন চন্দ্রলোকে গিয়া পৌছিবে,

সেদিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সেখান হইতে পৃথিবীর আকাশের মেঘমালার গতিবিধি লক্ষ্য করিবেন এবং পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পর্কে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণীও করিতে পারিবেন।

কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে আসলে মানবরূপী যন্ত্রের কার্যকলাপের তদ্বির করা ছাড়া বেশী কিছু করিতে হইবে না। কেন না, জ্যোতির্বিজ্ঞানীর যাহা কিছু কাজ, তাহা মানবরূপী যন্ত্রই গ্রহণ করিবে।

আধুনিক বিজ্ঞান আজ এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সকল কাজ নিখুঁৎভাবে সম্পাদন করাইয়া লইবার মত মানবরূপী যন্ত্র অনায়াসেই নির্মাণ করা যায়। আমরা তাহার নাম দিতে পারি, "যান্ত্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী"।

ভাবীকালের যে মানবরূপী যন্ত্রটিকে আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাজ দিয়া চন্দ্রলোকে নিযুক্ত রাখিতে চাহিতেছি, সে গ্রহ নক্ষত্র, সূর্য চন্দ্র এবং বলিতে গেলে অনন্ত আকাশের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম হইবে।

যান্ত্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর চোখে আকাশের যাহা কিছু ধরা পড়িবে, তাহাদের সকলেরই ছবি সে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিবে—সে কি কি দেখিল, তাহার বিবরণও পৃথিবীতে আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিবে।

মঙ্গলগ্রহে যাত্রার প্রস্তুতি

মঙ্গলগ্রহে যাত্রার পূর্বে ঐ গ্রহ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। আমেরিকার মহাশূন্য-বিজ্ঞানীদের অন্যতম, মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ এস. ফ্রেড সিঙ্গার বলেছেন যে, মঙ্গলের যে দুটি উপগ্রহ আছে তাদের মধ্যে ফবোস নামে উপগ্রহটি এই তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে খুবই কাজে লাগবে। ঐ উপগ্রহটি থেকেই মঙ্গল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

এই উপগ্রহ দুটির আর একটির নাম ডিমোস। এরা হলো মঙ্গলের চাঁদ। মঙ্গল থেকে ফবোসের দূরত্ব ৫৮০০ মাইল, আর ডিমোসের দূরত্ব ১৪৬০০ মাইল। দুটিই খুব ছোট; প্রত্যেকটির ব্যাস হয়তো দশ মাইলের বেশী হবে না। পৃথিবী সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানী সিঙ্গার এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, চৌম্বক ক্ষেত্র ও আবহমণ্ডল থাকলে সেই গ্রহের চারদিকে তেজস্ক্রিয় বলয় থাকবেই। মঙ্গল ও শুক্রগ্রহকে ঘিরে তেজস্ক্রিয় বলয় রয়েছে। সুতরাং পৃথিবী থেকে যে সব মহাশূন্য-যাত্রী মঙ্গল অথবা শুক্রগ্রহে যাবেন, তাঁদের প্রথমে পৃথিবীর তেজস্ক্রিয় বলয় এবং পরে মঙ্গলের বলয় পেরিয়েই ঐ গ্রহে গিয়ে পৌঁছুতে হবে।

ডাঃ সিঙ্গার বলেছেন, তবে মঙ্গলের বলয় তেজস্ক্রিয়তার জন্যে তেমন মারাত্মক হবে না—কারণ, মঙ্গলের উপগ্রহ ফবোস এই ব্যাপারে পরিষ্কারকের কাজ করছে।

ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ

রাজকোট, ৫ই নভেম্বর—এখানে ওয়াকফহাল মহলে জানা গিয়াছে যে, ভারতও মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করিবে এবং ইহাই হইবে ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ।

আগামী বৎসর ভারত মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করিবে। একটি মার্কিন গবেষণা সংস্থা উপগ্রহ উৎক্ষেপণ সম্পর্কিত সমস্ত আয়োজন করিবে। ব্যাঙ্গালোরে ঐ সংস্থার কাজ হইবে।

এদিকে আমেদাবাদের পদার্থ বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণাগার কর্তৃক উপগ্রহ হইতে প্রেরিত সঙ্কেত গ্রহণ ও রেকর্ড করিবার আয়োজন করিতেছে।

সম্পাদক - শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োদশ বর্ষ | ডিসেম্বর, ১৯৬০ | দ্বাদশ সংখ্যা

উল্কা *

শ্রীশচীনাথ মিত্র

অন্ধকার রাতের আকাশে কখনও কখনও ক্ষণস্থায়ী দু-একটি উজ্জ্বল আলোর রেখা দেখা যায়। এই ব্যাপারকে লোকে সাধারণতঃ নক্ষত্রপাত বা তারা-খসা বলে থাকে। কিন্তু বহুকাল পূর্বেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে, এসব নক্ষত্রপাতের ব্যাপার নয় মোটেই, আসলে এগুলি হচ্ছে উল্কাপাত।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীম শূন্যতার মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণকারী কতকগুলি বস্তুপিণ্ডই হলো উল্কা। সঞ্চরণকালে এগুলি যখন মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে প্রবলবেগে পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়ে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এসে পড়ে, তখন বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে জ্বলে ওঠে। সাধারণতঃ জ্বলে ওঠবার সময় এদের গতি থাকে প্রতি সেকেণ্ডে ১০ থেকে ৭০ কিলোমিটার। জ্বলে ওঠবার কিছুক্ষণ পরেই এক একটি উল্কা কয়েকটি অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং নিবে যায়। কাজেই খুব বড় রকমের উল্কা ছাড়া ছোটগুলি পৃথিবীর বুকে পৌঁছুতে পারে না। সাধারণতঃ সমুদ্র-পৃষ্ঠের উপর ১২০ থেকে ৮০ কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যেই উল্কাগুলি জ্বলে ওঠে। উল্কাগুলি যখন ১২০ থেকে ৫০-৫৫ কিলোমিটার উচ্চতায় পৃথিবীর ঘনতর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তখন বায়ু পর্যায়ক্রমে অতিক্রত ঘনীভূত ও বিরলীভূত হওয়ার ফলে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই জন্যে উল্কাপিণ্ডের আগ্নেয় আবির্ভাবের সঙ্গে অতি তীব্র উজ্জ্বল আলো, বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ এবং তৎসহ বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ধাবমান পদার্থটির ক্ষয়িত অংশ উর্ধ্বাকাশে ধূম্রজালের মত প্রতীয়মান হয়। অতি প্রাচীন কালের মানুষেরা এই ধূম্রজালকে আগ্নেয় সর্প, ড্র্যাগন ইত্যাদি রূপে কল্পনা করেছে।

ভূতত্ত্ববিদ্ ও জ্যোতির্বিদদের কাছে কিন্তু এসব উল্কার মূল্য অপরিসীম; কারণ এদের গঠন ও প্রকৃতি গবেষণা করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক তথ্যাদি অবগত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

আমাদের সৌরমণ্ডলের আকাশ, অর্থাৎ গ্রহান্তরবর্তী মহাশূন্য অসংখ্য উল্কা-সমাকীর্ণ এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উল্কারাশির মধ্য দিয়েই পৃথিবীকে সূর্য পরিক্রমা করতে হয়। সুতরাং গ্রহান্তর অভিযানে এই উল্কার মধ্য দিয়েই কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেট প্রভৃতিকে যেতে হবে। সুতরাং বিজ্ঞানীদের

স্বয়ংক্রিয় রকেট বা গ্রহান্তর-ভ্রমণকারী যানকে এই উল্কার আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্যে উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। পৃথিবীর প্রতিবেশী এই উল্কাপিণ্ডের উপাদান ও উৎপত্তির বিষয় অনুধাবন করে সৌরমণ্ডলের অতীত ও ভবিষ্যৎ এবং গ্রহগুলির (বিশেষতঃ পৃথিবীর) সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে। কাজেই উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীতে উল্কা সম্পর্কিত গবেষণা একটি নতুন বিজ্ঞান হিসাবে খুবই উন্নতি লাভ করেছে। গত ত্রিশ বছরে ভূ-পদার্থবিদেরা উল্কা সম্বন্ধে গবেষণা করে ঊর্ধ্ব-বায়ুমণ্ডলের অবস্থা, ঐ অঞ্চলের বায়ু-প্রবাহ এবং চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণে বায়ুমণ্ডলে জোয়ার-ভাটার পরিবর্তন সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হয়েছেন।

এখন এই উল্কা সম্পর্কে গোড়ার কথায় আসা যাক। অতি প্রাচীনকাল থেকেই উল্কা মানুষের কাছে পরিচিত। মিশরে প্যাপিরাসে লিখিত ২০০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের বর্ণনাই উল্কা সম্বন্ধে প্রাচীনতম নজীর। এই নজীরটি এখনও লেলিনগ্র্যাডে সংরক্ষিত আছে। অতি প্রাচীনকালে উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা অ্যারিজোনা মরুভূমির মধ্যে এক বিশালাকৃতির উল্কার পতন দেখেছিল। সেই কাহিনী বংশানুক্রমে এভাবে চলে আসছে যে, অগ্নি-দেবতা মর্ত্যে অবতরণ করেছিলেন ঐ দিনে। আরব্য উপন্যাসেও অনুরূপ একটা গল্প আছে। ঐ গল্পে বর্ণিত দেবদূত কর্তৃক দানবের দিকে নিক্ষিপ্ত অগ্নিই হলো উল্কা।

আকাশের কোনও এক কোণ থেকে যখন উল্কার ঝাঁক পৃথিবীতে নেমে আসে, তখন তাকে বলে উল্কা-বৃষ্টি। উল্কা-বৃষ্টির সর্বপ্রাচীন নজীর মেলে চীনা পুঁথিতে। এই উল্কা-বৃষ্টি হয়েছিল ১৭৬৮ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে। অনুরূপ ঘটনার পরবর্তী নজীর পাওয়া যায় কোরিয়া, রাশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের বহু প্রামাণ্য পুস্তকে।

অ্যাপোলোনিয়ার দায়োজেনিস নামক গ্রীক দার্শনিক সর্বপ্রথম ধারণা করেন যে, উল্কাগুলি অপার্থিব এবং মহাশূন্যের বস্তু। ওই সময়ে ইগোস্‌পোটামোস্‌ নদীর ধারে পতিত পদার্থটিকে তিনি অপার্থিব বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ধারণা তৎকালে স্বীকৃত হয় নি, এমন কি অ্যারিস্টোটল প্রমুখ প্রাচীন ও মধ্যযুগের অধিকাংশ দার্শনিক ও মনীষীই একথা অস্বীকার করে সব উল্কাকেই পৃথিবী থেকে উত্থিত পদার্থ বলে মনে করতেন।

যাহোক, বর্তমান কালে রুশ-জ্যোতির্বিজ্ঞানী আই. আস্তাপেভিচ অনেক অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন যে, প্রায় হাজার বছর আগে প্রায়ই উল্কা-বৃষ্টি ঘটতো, কিন্তু তারপর থেকে এই ধরণের ঘটনা খুবই কমই ঘটে থাকে। ১২০২ খৃষ্টাব্দের লেওনিদ্‌ উল্কা-বৃষ্টির কথা রাশিয়ায় সর্বজনবিদিত। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুন তারিখে উস্তগ্‌ ভেলিকী শহরে প্রস্তর-বৃষ্টির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সেদিন উল্কা পতনের সময় তীব্র আলোক, বিকট শব্দ এবং বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। তাছাড়া কোটোভালোভ অঞ্চলের জঙ্গলে বহু গাছ উল্কাপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৪২১ সালে ১৯শে মে তারিখে নভোগেরোড ভেলিকী অঞ্চলে অনুরূপ ঘটনা ঘটে।

এ-রকমের উল্কা-বৃষ্টির দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে হামবোল্ট দক্ষিণ আমেরিকায় লেওনিদ উল্কা বৃষ্টি লক্ষ্য করেন এবং সেখানকার আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের প্রাচীন নজীর থেকে জানতে পারেন যে, ১৭৩৩ এবং ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। এই তিনটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লেওনিদ উল্কা-বৃষ্টির ব্যবধানের সময় ৩৩ বছর বলে মনে করেন। তাঁর ধারণাকে নির্ভুল প্রমাণ করে ১৮৩২ সালে প্রাচ্যে লেওনিদ উল্কা-বৃষ্টির পুনরাবৃত্তি ঘটে।

১৭৯৯ ও ১৮৩২-৩৩ সালের উল্কাবৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণা করে ফরাসী বিজ্ঞানী আরগো ও বায়ট চীন, কোরিয়া ও জাপানের প্রাচীন উল্কা সম্পর্কিত

প্রামাণ্য পুঁথির বিবরণ সংগ্রহ করে প্রমাণ করেন যে, এই উল্কাবৃষ্টি ৩ হাজার ৫ শত বছরেরও অধিক কাল ধরে ৩৩ বছর অন্তর অন্তর ঘটে আসছে। লেওসিদ উল্কাপুঞ্জের অবস্থান নির্ণয় করে দেখা গেছে যে, এদের সঞ্চরণ-পথ একটা বৃহদাকৃতির ধূমকেতুর গতিপথের মত।

১৯২০ সালের পর থেকেই উল্কা-বিজ্ঞান এক দ্রুত প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে এবং ১৯৩৫ সালে রাশিয়ায় সর্বপ্রথম ধূমকেতু ও উল্কা সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে বিজ্ঞানীদের এক অধিবেশন বসে। এই বিজ্ঞানীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, উল্কার সঙ্গে বাতাসের সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করে বায়ুমণ্ডলের অবস্থা নির্ণয় করা।

এর পরে ১৯৩৬ সাল থেকে এফ. হুইপিল-এর পরিচালনায় আমেরিকার হার্ভার্ড অবজার-ভেটরিতে দ্রুতগতি ক্যামেরার সাহায্যে নিয়মানুগ-ভাবে পরিদৃশ্যমান উল্কার ফটো নেওয়া হচ্ছে। ১৯৩২ সালে মিলম্যান প্রবর্তিত প্রিজ্‌ম্যাটিক ও ডিফ্র্যাক্‌সন স্পেকট্রোগ্রাফের সাহায্যে উল্কার গঠনের অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। গত ১৯৫৭-৫৮ সালের ইণ্টারন্যাশন্যাল জিওফিজিক্যাল ইয়ারে বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল আয়নোস্ফিয়ারে উল্কার সংঘর্ষের ফল অনুধাবন করা।

আমেরিকা ও সোভিয়েটের কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের ফলে পৃথিবীর উপরে আচ্ছাদিত উল্কা-মেঘের ঘনত্ব সম্বন্ধে ধারণা অনেকখানি স্পষ্ট হয়েছে।

প্রচণ্ড গতিবেগের ফলে উল্কাগুলি মহাশূন্যচারী যানের যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। খুব ছোট উল্কাপিণ্ডের আঘাত উড্ডীয়মান যন্ত্রের গায়ে ছোট-খাটো বিস্ফোরণ ঘটায়। মহাশূন্যে এই উল্কা-বিপত্তির পরিমাণ নির্ণয় করবার জন্যে উল্কা-অধ্যুষিত অঞ্চল ভেদ করে তদূর্ধ্বে (অর্থাৎ পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে ১০০ কিলোমিটারের ঊর্ধ্বে) আবহাওয়া-রকেট পাঠানো হয়। এই রকেটের মধ্যে পিয়েজো-ক্রিষ্ট্যালের সেল থাকে এবং রকেটের আবরণে যখন কোন উল্কা আঘাত করে তখন ঐ সেলে তড়িৎ-ত্বরণের সৃষ্টি হয়। সেই তড়িৎ-ত্বরণ পরিবর্ধিত আকারে বিশেষ ধরণের রেডিও-সঙ্কেত পৃথিবীতে প্রেরণ করে। এই রেডিও-সঙ্কেতের সাহায্যে পৃথিবীর উপরের উল্কাস্তরের ঘনত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। ১৯৫৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী সোভিয়েট দেশ থেকে প্রেরিত রকেট ১২৫ থেকে ২৫০ কিলোমিটার উচ্চতায় ৪৪ বার এবং ৩০০ কিলোমিটারের ঊর্ধ্বে মোটে ৯ বার উল্কার আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল। এথেকে বর্তমান রুশ-বিজ্ঞানীদের ধারণা হয় যে, বায়ুমণ্ডলে কিছু পরিমাণ ক্ষুদ্রাকার উল্কা আছে, যেগুলি ঘোলা জলে ধূলিকণার মত ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে।

রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে উল্কা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেছে, ক্ষণস্থায়ী উল্কা পর্যবেক্ষণ করে যা জানা সম্ভব ছিল না। প্রথম সোভিয়েট উপগ্রহ ১নং স্পুটনিক ১৯৫৮ সালের ৩রা জানুয়ারী প্রথম যখন ভেঙ্গে যায়, তখন সেটা ভেঙ্গেছিল দু-ভাগে, তারপরে আট ভাগে। ২নং স্পুটনিক ১৯৫৮ সালে ১৪ই এপ্রিল জ্বলে উঠে খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়েছিল ব্রেজিল, লেসার আনটিলেস্ ও আটলাণ্টিকের বুকে। এদের জ্বলে ওঠা এবং ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদ থেকে উল্কাগুলির ঠিক ঐ দশা প্রাপ্তির সময় চাপ, তাপ ও অন্যান্য অবস্থা কি রকম থাকে, তা জানা গেছে।

বর্তমান উল্কা-বিজ্ঞানীদের গবেষণার লক্ষ্য হলো মুখ্যতঃ তিনটি: (১) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে তীব্র গতিসম্পন্ন উল্কার অবস্থা নির্ণয়, (২) মহাশূন্যে উল্কার সৃষ্টি, অবস্থান ও গতিবিধি নির্ণয়, (৩) উল্কার সাহায্যে সৌরমণ্ডলের সৃষ্টির রহস্য-সন্ধান।

উল্কাপাত সব সময়েই হচ্ছে। নির্মেঘ চাঁদহীন রাতের আকাশে এক ঘণ্টায় গড়ে ১০টা উল্কাপাত

দেখা সম্ভব। এদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট থাকায় দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সাধারণতঃ গবেষণার জন্যে ফটো এবং রেডিও-এর সাহায্যে ঘটনার স্থান ও সময় ঠিক করে রাখা হয়। আকাশের একটি নক্ষত্র-চিত্রে যদি উল্কাগুলির গতির দিক সরল রেখায় টানা হয়, তবে দেখা যায় যে, আকাশের একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকেই সেগুলি ছুটে আসছে। আকাশে এই স্থানকে ঐ উল্কা-বৃষ্টির 'রেডিয়্যাণ্ট' বলা হয়। একই রেডিয়্যাণ্ট থেকে উদ্ভূত হলেও উল্কাগুলি আন্তগ্রহ পথে সমান্তরাল অবস্থাতেই ছুটে যায় (উপরের চিত্র দ্রষ্টব্য)।
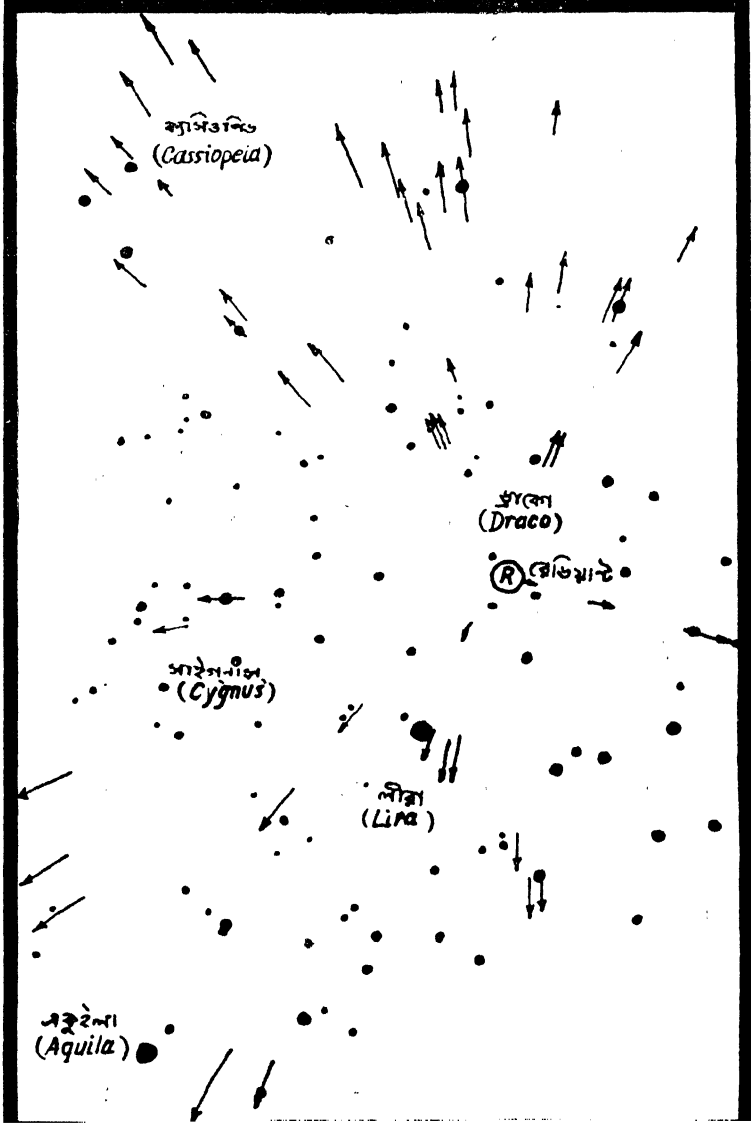
১৯৩০ সালের ৯ই অক্টোবর তারিখের ড্রাকোনিদ উল্কা বৃষ্টিতে উল্কাগুলির পথ এই নক্ষত্র-চিত্রে দেখানো হয়েছে।

উল্কা সম্পর্কিত গবেষণার সবচেয়ে সাহায্যকারী

যন্ত্র হচ্ছে রেডার। এর সাহায্যে দিনের বেলায়, কুয়াশা বা মেঘাচ্ছন্ন আকাশেও উল্কার দূরত্ব এবং অবস্থান নির্দেশ করা যায়। বাতাসের সঙ্গে প্রবল গতিসম্পন্ন (১০ থেকে ৭০ কিলোমিটার/সেকেণ্ড) উল্কার সংঘর্ষের ফলে বাতাস এবং উল্কার অণু ও পরমাণু বিভাজিত হয়ে তড়িতাবিষ্ট হয়ে পড়ে। এই তড়িতাবিষ্ট বা আয়নায়িত গ্যাস-স্তর রেডিও-তরঙ্গ প্রতিফলিত করে। রেডারের সাহায্যে এই প্রতিফলন সৃষ্টিকারীর অবস্থান ও দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হয়। ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের বাতাস যতক্ষণ না এই গ্যাস-স্তম্ভকে ভেঙ্গে দিচ্ছে, ততক্ষণ এই সঙ্কেত পাওয়া সম্ভব। চার থেকে

উল্কার গতিপথের উভয় পার্শ্বস্থ তড়িতাবিষ্ট গ্যাসের ধূম্রপুঞ্জ।

পাঁচ মিটারের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট রেডিও-তরঙ্গেই সবচেয়ে সুস্পষ্ট ফল পাওয়া যায়। সাধারণতঃ দুটি থেকে চারটি রেডার সেটের সাহায্যে আকাশের বুকে উল্কার রেডিয়্যাণ্টের স্থান নির্ণয় করা হয়।

উল্কাগুলি যখন পৃথিবীর ৮০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তখন সেই লঘু বায়ুমণ্ডলে (যেখানে বায়ুর ঘনত্ব পৃথিবী-পৃষ্ঠের বায়ুর ঘনত্বের ১০০০,০০০০০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র) সঞ্চরণশীল অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের অণু-পরমাণু গতিসম্পন্ন উল্কাকে আঘাত করে। এই অণু-পরমাণুগুলি উল্কার মধ্যেকার কেলাসের গঠনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। এর ফলে উল্কার ত্বক উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পীভূত হয়। এই বাষ্পীভবনের পরিমাণ ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে একটি সীমার পর আবার কমে যায়। বাষ্পীভূত অণু-পরমাণুগুলি তীব্র বেগে উল্কার পৃষ্ঠ থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় এবং বায়ুর অণু-পরমাণুগুলিকে প্রবলবেগে আঘাত করে উত্তপ্ত ও তড়িতাবিষ্ট করে ফেলে। এইরূপে বাষ্পীভূত ও তড়িতাবিষ্ট পরমাণুগুলিই উল্কার সঞ্চরণ-পথে জ্বলন্ত রেখার সৃষ্টি করে।

এই উল্কা যখন আরও নীচে নেমে আসে, তখন বায়ুমণ্ডলে আঘাতজনিত শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে, যার ফলে ৫৫ কিলোমিটারের উচ্চতার নীচে প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

উল্কার গতিমুখে বাতাসের মধ্যে মুহূর্তের জন্যে প্রবল চাপ উৎপন্ন হওয়ার ফলে ঐ বায়ুতে কয়েক হাজার ডিগ্রী তাপের সৃষ্টি হয় এবং উল্কার আবরণ গলে গিয়ে বাষ্পীভূত হতে থাকে। লৌহ-উল্কার ত্বকে ফুটন্ত, লৌহ বায়ু-প্রবাহে সামনের অংশ থেকে পশ্চাতে নীত হয় এবং উল্কার ত্বক লৌহ-বুদ্বুদে

আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। উল্কার সামনের অংশ গলে গিয়ে বাতাসের ঘর্ষণে মসৃণ হয়ে যায় এবং কোণাকৃতি উল্কাখণ্ড মসৃণ-ত্বকবিশিষ্ট গোলকের আকার ধারণ করে। এই কালো রঙের গলিত আবরণ দেখেই সাধারণ পার্থিব বস্তু থেকে এর পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে, উল্কা-ত্বক উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পীভূত হলেও উল্কার অভ্যন্তর ভাগ মোটেই উত্তপ্ত হয় না। তার কারণ, বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আসা ও জলে ওঠা এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে যে, ঐ তাপ উল্কার মধ্যস্থলে সঞ্চারিত হবার সময় পায় না।

উল্কা থেকে বাষ্পীভূত অবস্থায় উত্থিত বস্তু-কণা মুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে জমে যায় এবং উল্কার অতিক্রান্ত পথে একটা ধূম্রজালের সৃষ্টি করে। পূর্বোল্লিখিত ঊর্ধ্ব-বায়ুমণ্ডলের তড়িতাবিষ্ট উজ্জ্বল গ্যাসীয় পথের মতই নিম্ন-বায়ুমণ্ডলে এই ধূলি-ধূম্র পথ। এই পথ গ্যাসীয় পথের মত ক্ষণস্থায়ী নয়, আকাশের বুকে বেশ কয়েক ঘণ্টা টিকে থাকতে দেখা যায়।

অনেকে এই স্থূল সরল রেখার মত ধূম্র-পথকে পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে উল্কার আঘাতে উত্থিত ধূলিকণায় গঠিত বলে ধারণা করেন; আসলে কিন্তু এই পথ উল্কার নিজের দেহের পরমাণুর দ্বারা গঠিত। সাধারণতঃ উল্কার ৯৯ ভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এই ধূলিপথ সৃষ্টি করে এবং একভাগ মাত্র কঠিন পদার্থ-রূপে পৃথিবীতে পৌঁছুতে পারে। এই ধূলিকণা অতি ধীরে ধীরে পৃথিবীর উপর এসে জমে।

পৃথিবী বায়ুমণ্ডলের আবরণে আবৃত থাকায় অতিকায় উল্কার আক্রমণ থেকে অনেক সময় বেঁচে যায়। যেসব গ্রহ বা উপগ্রহে বায়ুমণ্ডল নেই, সেই সব স্থানে উল্কার আক্রমণ সবচেয়ে বেশী। বায়ুমণ্ডল-হীন চাঁদের পৃষ্ঠ উল্কাপাত ও তজ্জনিত বিস্ফোরণে ক্ষতবিক্ষত—খাদসঙ্কুল। সাইটিনস্কায়া চাঁদের উপর আলোক ও রেডিও-তরঙ্গের প্রতিফলন থেকে প্রমাণ করেছেন যে, চাঁদের ত্বক পুরু ধূলায় আবৃত এবং ঐ ধূলা উল্কা বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট।

অনেক সময় উল্কাপাতের পরে গহ্বর ছাড়া উল্কার আর কোনও চিহ্নই সহজে চোখে পড়ে না। উল্কার আঘাতের পরেই ছাইয়ের মত ধূলায় পরিণত হয়ে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে যায় এবং গহ্বরের মাটি পরীক্ষা করে অনেক সময় ঐ উল্কার রাসায়নিক গঠন নির্ধারণ করতে হয়।

এর কারণ, যদি কোন উল্কার গতিবেগ ভূপৃষ্ঠে আঘাত করবার সময় প্রতি সেকেণ্ডে ৪ কিলো-মিটারের বেশী থাকে, তবে ঐ গতি-শক্তি শক্ত পদার্থের গঠন ভেঙ্গে ফেলে গ্যাস সৃষ্টি করবার মত ক্ষমতা অর্জন করে। এর ফলে উল্কার উপাদান কঠিন আকার থেকে পরিবর্তিত হয়ে প্রবল চাপযুক্ত গ্যাসে পরিণত হয় এবং এই গ্যাসের পরিমাণ উল্কার আয়তনের শত-সহস্র গুণ হতে পারে। এই ক্ষণিক-সৃষ্ট গ্যাসের হঠাৎ আয়তন বৃদ্ধির জন্যে বিস্ফোরণ ঘটে এবং উল্কার ব্যাসের কয়েক শতগুণ ব্যাস বিশিষ্ট খাদ বা ক্র্যাটার সৃষ্টি করে। পৃথিবীতে এরূপ উল্কা-সৃষ্ট ক্র্যাটারগুলির অন্যতম হচ্ছে, অ্যারিজোনা ক্র্যাটার। এর ব্যাস ১২০০ মিটার এবং গভীরতা ১৭৫ মিটার। কিন্তু এই বিরাট আকৃতির উল্কার পতনের সম্ভাবনার সব তথ্য অনুসন্ধান করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সামান্য ১০ থেকে ৩০ মিটার ব্যাসযুক্ত ১০০০০০ টন ওজনের একটা লৌহপিণ্ড অ্যারিজোনা ক্র্যাটার সৃষ্টি করতে পারে।

উল্কার রসায়নিক গঠন তাদের স্পেকট্রামে লক্ষিত মৌলের দাগ নির্ণয় করে বের করা যায়। উল্কার স্পেকট্রাম প্রধানতঃ দু-রকমের। এক প্রকারে ক্যালসিয়ামের দাগগুলি সুস্পষ্ট এবং অন্য প্রকারে লৌহের দাগ স্পষ্ট দেখা যায়। প্রথম প্রকারে ক্যালসিয়ামের দাগ ছাড়াও লৌহ, ক্রোমিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল, সিলিকা, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগ্নেসিয়াম, সোডিয়াম, টাইটেনিয়াম ও কোবাল্টের দাগ দেখা যায়। সুতরাং এই প্রকারের স্পেক্ট্রাম থেকে ধারণা করা হয় যে, ঐ উল্কাগুলি

রাসায়নিক গঠনে পাথুরে। এই ধরণের উল্কাই বেশী দেখা যায়—শতকরা প্রায় ৭৫টা।

দ্বিতীয় প্রকারের শতকরা প্রায় ২৫টা উল্কায় অন্য রকমের স্পেক্ট্রাম দেখা যায় এবং এতে লৌহ ও নিকেলের দাগ দেখা যায়। এগুলি রসায়নিক গঠনে পৃথিবীতে প্রাপ্ত লৌহ-উল্কার সমগোত্রীয়। লং-দ্বীপে পতিত ৫৬৩ কিলোগ্রাম ওজনের উল্কা সবচেয়ে বড় প্রস্তর-উল্কা। আর পশ্চিম আফ্রিকায় হবা অঞ্চলে প্রাপ্ত ৬০ টনের উল্কাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লৌহ-উল্কা।

উদ্বায়ী পদার্থকে বাষ্পীভূত করে। এজন্যে সূর্যের আশেপাশের, বিশেষতঃ বুধগ্রহের আশেপাশের উল্কাগুলি সোডিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও এই ধরণের উদ্‌বায়ী মৌলবিহীন। অপরপক্ষে সূর্য থেকে বহুদূরে অবস্থিত উল্কার পারিপার্শ্বিক তাপ অনেক কম থাকায় ঘনীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি অতি-উদ্‌বায়ী গ্যাসের জমাট বরফে আচ্ছাদিত থাকে। উল্কা সম্বন্ধে আজকালকার বিজ্ঞানীদের এই হলো মোটামুটি ধারণা।

ভারতে পতিত উল্কার সংখ্যাও নিতান্ত কম
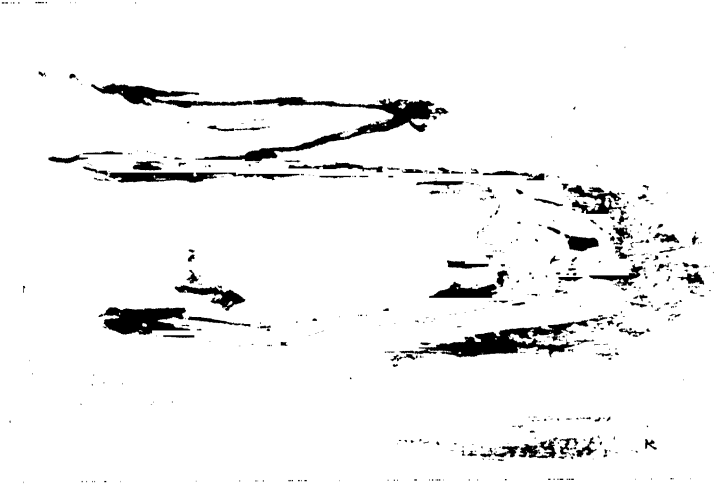
১৯৪৮ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে পতিত একটি উল্কার ধূম্রপুঞ্জ বায়ুমণ্ডলের বিক্ষোভের ফলে চিত্রে প্রদর্শিত আকৃতি ধারণ করেছে।

লৌহ-উল্কার গঠন থেকে ভূ-তাত্ত্বিকেরা পৃথিবীর অভ্যন্তরে লৌহ-নিকেলের কেন্দ্র কল্পনা করেছেন। কিন্তু ১৯৩৯ সালে রাশিয়ায় লোডোকনিকভ এবং ১৯৪৮ সালে ইংল্যাণ্ডে র‍্যামজে অনুমান করেছিলেন যে, পৃথিবীর ত্বকের ধাতু-মৌলেই কেন্দ্র গঠিত, তবে প্রবল চাপে ঐ মৌলগুলি গঠন বদলে অতি উচ্চ ঘনত্ব লাভ করেছে।

সূর্য থেকে দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে উল্কার রাসায়নিক গঠনের তারতম্য ঘটে। কারণ, সৌরতাপ অধিক

নয়, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞাত অবস্থায় রয়ে গেছে এবং তাদের সম্পর্কে কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণাও হয় নি। ভারতের বিভিন্ন মিউজিয়ামে এই রকম কতকগুলি উল্কাখণ্ড রক্ষিত আছে। যে কয়েকটি মাত্র উল্কার গবেষণা হয়েছে, তার মধ্যে ১৮৯৭ সালে (২৮শে এপ্রিল, সকাল ৮টা) কাথি-ওয়াড়ের জুনাগড় রাজ্যে পতিত একটি উল্কার বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছিলেন অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের খনিজ বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর স্বর্গতঃ

ডাঃ পি. কে. ঘোষ। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার এক সমীক্ষায় তাঁর রচিত এক রেকর্ড থেকে এর গঠন ও অন্যান্য তথ্য জানা যায়।

এই উল্কার দুটি খণ্ড মাত্র পাওয়া গিয়েছিল। বড় খণ্ডটির ওজন ছিল ১৭'৫ গ্র্যাম, আর ছোটটির ওজন প্রায় ৮'৫ গ্র্যাম। ছোটটি এখন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে (কলকাতা) এবং বড়টি বৃটিশ মিউজিয়ামে (লণ্ডন) রক্ষিত আছে।

এই উল্কাটি প্রস্তর-উল্কার পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু নিকেল ও লৌহের পরিমাণ ৮'৫ শতাংশ এবং লৌহের পরিমাণ নিকেলের ছয় গুণ।

পেট্রোলজিক্যাল মাইক্রস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করে এই উল্কায় কতকগুলি সিলিকেট মণিক পাওয়া গেছে; যথা—অলিভিন, হাইপারস্থিন, প্লাজিওক্লেস, মাস্কিলিনাইট, মেরিলাইট (?) প্রভৃতি, আর ওর-মাইক্রস্কোপের সাহায্যে পাওয়া গেছে, লৌহ-নিকেল ঘটিত ট্রয়লাইট, ক্রোমাইট এবং হেমেটাইট।

অন্যান্য উল্কার মতই এর উপরের ভাগ ছিল কালো এবং অস্বচ্ছ পদার্থে গঠিত। তার নীচের অংশ অপরিবর্তিত স্বচ্ছ মণিকপূর্ণ এবং কেন্দ্রভাগের বেশীই অস্বচ্ছ ধাতুতে গঠিত।

প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও পঞ্চসিদ্ধান্ত

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

ভারতীয় গণিতের আরম্ভ ঠিক কোন্ সময়ে, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে প্রাচীনতম যে গ্রন্থে গণিত ও জ্যোতিষের বিবিধ তত্ত্ব উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা হলো বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। ঋক্, যজুঃ এবং অথর্ব—এই তিনটি বেদেরই বেদাঙ্গ গ্রন্থে জ্যোতিষ ও গণিতের আলোচনা আছে। সমবেতভাবে এগুলিকে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ বলা হয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সংকলন কাল খৃঃ-পূঃ ৬০০ থেকে খৃঃ-পূঃ ২০০ অব্দ বলে ধরা হয়েছে। বৈদিক যুগে 'গণিত' বলতে সাধারণতঃ পাটীগণিত ও জ্যোতিষকে বুঝাতো। জ্যামিতি, রেখাগণিত বা ক্ষেত্রগণিত ছিল কল্প ও শুল্বসূত্রের অন্তর্গত। তৈত্তিরীয় সংহিতা, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ও শতপথ ব্রাহ্মণে পাটীগণিতের বিবিধ তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া বৌধায়ন, আপস্তম্ব ও কাত্যায়নের শুল্বসূত্রে পাটীগণিত ও জ্যামিতির নানাপ্রকার আলোচনা দেখা যায়। সেকালে বীজগণিত পাটীগণিতের অন্তর্গত ছিল। পূর্বোক্ত পাটীগণিতের আলোচনার মধ্যে কয়েকটি বীজগণিতের সূত্রও সন্নিবেশিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে গণিতের তিনটি প্রধান শাখাতেই ব্যাপক আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস রচয়িতা জর্জ সার্টনের মতে, বৈদিক শুল্বসূত্রগুলির রচনাকাল খৃঃ-পূঃ ৫০০ অব্দের পরে এবং খৃষ্টীয় শতাব্দীর পূর্বে এবং খুব সম্ভবতঃ বিখ্যাত গ্রীক জ্যামিতিকার পিথাগোরাসের পরবর্তী। সার্টনের এরূপ অনুমানের একটা কারণ মনে হয়, জ্যামিতির প্রখ্যাত পিথাগোরীয় উপপাদ্যটির অনুরূপ তত্ত্ব শুল্বসূত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। সার্টন সম্ভবতঃ একে পিথাগোরাসের প্রভাব মনে করতে চান। কিন্তু এরূপ অনুমানের পিছনে তেমন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না।

বৈদিক যুগের অবসান কালে হিন্দু-গণিতের একটি গৌরবময় অধ্যায় সূচিত হয়েছিল। এই সময়ে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঁচটি বিখ্যাত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। গ্রন্থগুলি হলো—পৈতামহ বা

ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, বশিষ্ট-সিদ্ধান্ত, পৌলিশ-সিদ্ধান্ত ও রোমক-সিদ্ধান্ত। এদের মধ্যে কেবলমাত্র সূর্য-সিদ্ধান্তই এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ বর্তমান আছে; অন্যগুলি সম্বন্ধে কেবল পরবর্তী গ্রন্থকার, যেমন—আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতির গ্রন্থে উল্লেখ ও উক্তি পাওয়া যায়। বিখ্যাত আরবীয় পর্যটক আল বিরুনিও (খৃঃ ১১শ শতাব্দী) এদের কয়েকটি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থগুলির রচনাকাল সঠিক নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। তবে বরাহমিহিরের বিখ্যাত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ 'পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা'র রচনাকাল ৫০৫ খৃঃ নির্ধারিত হয়েছে। এই গ্রন্থে বরাহমিহির তাঁর পূর্ববর্তী বলে উক্ত গ্রন্থগুলির উল্লেখ করেছেন এবং এদের বিষয়বস্তু কিছু সংস্কার করে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এই গ্রন্থগুলি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল, এরূপ অনুমান করা যেতে পারে। সার্টনের মতে, এগুলি সম্ভবতঃ টলেমির পরবর্তী; টলেমি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। এই গ্রন্থগুলি যে এককালে রচিত হয় নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু ও তাদের উপস্থাপনের পার্থক্যের মধ্যে। এ-সম্বন্ধে একটা জিনিষ উল্লেখযোগ্য যে, গ্রন্থগুলির প্রত্যেকের মধ্যেই জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রভাব দেখা যায়, যদিও এই প্রভাব বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত। ব্রহ্মসিদ্ধান্তে গ্রীক প্রভাব অতি সামান্য, তারপর যথাক্রমে বশিষ্ঠ, সূর্য, পৌলিশ ও রোমক সিদ্ধান্তে গ্রীক প্রভাব ক্রমবর্ধমান। শেষোক্ত গ্রন্থে রোমক জ্যোতিষেরও বিশেষ প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়। গ্রন্থগুলির নামকরণ লক্ষ্য করলেও মনে হয়—ব্রহ্ম, বশিষ্ঠ ও সূর্যসিদ্ধান্ত মূলতঃ হিন্দু-গণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরা হিন্দু জ্যোতির্বিদদের দ্বারা রচিত, যদিও তাঁরা গ্রীক গণিত ও জ্যোতিষের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু পৌলিশ ও রোমক নাম দুটি এদের গ্রীক বা রোমক মূলের পরিচায়ক। এদের রচয়িতা যদিও যথাক্রমে যবন ও রোমক, অর্থাৎ গ্রীক ও রোমান বলে কল্পিত হয়েছে, কিন্তু মনে হয় কোন হিন্দু গ্রন্থকারই গ্রীক বা রোমান গ্রন্থের মূলানুসরণে এই গ্রন্থ দুটি রচনা করেছিলেন।

সিদ্ধান্ত-গ্রন্থগুলির উপর গ্রীক প্রভাব এই সময়ের ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের দ্বারাও সমর্থিত। এই যুগটি হলো বিখ্যাত গুপ্ত সম্রাটদের আমল, যা ভারতের ইতিহাসে 'সুবর্ণ-যুগ' নামে পরিচিত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। আলেকজাণ্ডার ও সেলিউকাসের অভিযানের পর এই যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সময় ব্যাকট্রিয়-বহ্লিক গ্রীকগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিমে রাজ্য স্থাপন করে। এই সব সূত্রে ভারতবর্ষ—চীন, রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশের মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। কুষাণ যুগেও এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। গুপ্ত যুগে এই যোগাযোগ সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। এর ফলে হিন্দু-গণিতের উপর উন্নত গ্রীক গণিতের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এর পরিণাম অবশ্য সর্বাঙ্গীন শুভ হয় নি, কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞান ও গণিতের বিস্তার ও বৈচিত্র্যের পিছনে যে গ্রীক বিজ্ঞান ও গণিতের সাক্ষাৎ প্রভাব ছিল, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সিদ্ধান্ত-গ্রন্থগুলির মধ্যে এই গ্রীক প্রভাবের স্পষ্ট পরিচয় আছে। গ্রীকদের সেকালে 'যবন' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সেকালের ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের রচনার মধ্যে 'যবন জ্যোতিষের' উল্লেখ পাওয়া যায় এবং 'যবন জ্যোতিষ' যে ভারতীয় জ্যোতিষ অপেক্ষা উন্নত ছিল, বরাহমিহির তা স্বীকার করে গেছেন। এই সম্বন্ধে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের দুটি শাখা—গণিত ও ফলিত অংশের মধ্যে প্রথমটি অপেক্ষার দ্বিতীয়টির উপরেই গ্রীক ও রোমান প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছিল। এই অংশটিকে জ্যোতিষ (Astrology) নাম দেওয়া

হয়েছে। এতে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের উপর মানবের ভাগ্য বিচারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, গণিতের অংশে, বিশেষ করে গোলগণিত ও ত্রিকোণমিতিতে হিন্দুগণ গ্রীকদের অপেক্ষা উন্নত ছিলেন। এ-সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, হিন্দুরা উন্নত গ্রীক জ্যামিতি অবলম্বন করেই উন্নততর ত্রিকোণমিতি শাস্ত্র গড়ে তুলেছিলেন। হিন্দু সিদ্ধান্ত-গ্রন্থগুলিতে আমরা এই হিন্দু-ত্রিকোণমিতির সঙ্গে গ্রীক জ্যোতিষের মিশ্রণ দেখতে পাই।

পূর্বেই বলেছি, সিদ্ধান্ত-গ্রন্থগুলির মধ্যে পৈতামহ বা ব্রহ্মসিদ্ধান্তই প্রাচীনতম। একে পিতামহ ব্রহ্মার নামাঙ্কিত করবার পিছনে উদ্দেশ্য—এর অলৌকিক উদ্ভব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রমাণ করা। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থকারদের মধ্যে এরূপ একটা মনোবৃত্তি ছিল। ব্রহ্মসিদ্ধান্তের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নি, তবে পরবর্তী কালে ব্রহ্মগুপ্ত এর সংস্কার করেছিলেন, এরূপ উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এর গণিতের অংশ তেমন উন্নত ধরণের ছিল না। এরপর উল্লেখ পাওয়া যায় বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের। এরও মূল গ্রন্থ পাওয়া যায় নি, তবে পরবর্তী সিদ্ধান্তকারগণ তাঁদের গ্রন্থে কিছু বশিষ্ঠ-বচন উদ্ধার করেছেন। শ্রীচন্দ্র বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের সংস্কার করেছিলেন, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত অপেক্ষা গণিতে উন্নততর ছিল বলে মনে হয়।

সিদ্ধান্ত-গ্রন্থগুলির মধ্যে সূর্যসিদ্ধান্ত সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ। এর মূল গ্রন্থটি কিছুটা সংস্কৃত অবস্থায় আমাদের হাতে পৌঁচেছে, কিন্তু তাতে এর গৌরব বা গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি, কারণ কালক্রমে পৃথিবীর আবর্তন-বেগ ও তার কৌণিক অবনতি (declination) প্রভৃতির যে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে, সেগুলির জন্যে সংস্কারের প্রয়োজন হয়েছে; কিন্তু গ্রন্থের মূল সূত্র ও প্রতিপাদ্যগুলি এখনও অপরিবর্তিত আছে। বরাহমিহির সূর্যসিদ্ধান্তের সংস্কার করেন; তারপর ব্রহ্মগুপ্তের পরে সূর্যসিদ্ধান্তের আর একবার সংস্কার হয়। এই সংস্কৃত গ্রন্থই বর্তমানে প্রচলিত আছে। বর্তমানে ভারতীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, আর একবার সংস্কার করলেই আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গণনার সঙ্গে এর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বেদাঙ্গ জ্যোতিষে বছরের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৩৬৬ দিন, সূর্যসিদ্ধান্তে ধরা হয়েছিল ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল, অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ৫ ঘঃ ১২ মিঃ (প্রায়); আর আধুনিক পাশ্চাত্য মতে এটা দাঁড়িয়েছে ৩৬৫ দিন ৫ ঘঃ ৪৮ মিঃ ৪৭½ সেঃ (প্রায়)। পৃথিবীর কৌণিক অবনতি বৈদিক যুগে ধরা হয়েছিল ২৪°, সূর্যসিদ্ধান্তে ২৩° ৩০', আর আধুনিক কালে ধরা হয়েছে ২৩° ২৭' (প্রায়)। এর মান ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে।

সূর্যসিদ্ধান্ত সংস্কৃত শ্লোকে রচিত এবং চৌদ্দটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে গ্রন্থের ভূমিকায় সূর্যদেবের নাম করা হয়েছে। তিনি নাকি রোমক দেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এথেকে কেউ কেউ মনে করেন, গ্রন্থটি রোমক গণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল বিরুণি বলেছেন, সূর্যসিদ্ধান্ত 'লাট' কর্তৃক রচিত হয়েছিল। কিন্তু বরাহমিহির বলেছেন যে, 'লাট' ছিলেন পৌলিশ ও রোমক সিদ্ধান্তের টীকাকার। 'লাট' সম্ভবতঃ সূর্যসিদ্ধান্তেরও টীকাকার ছিলেন। আর একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, ময় নামক অসুর ছিলেন সূর্যসিদ্ধান্তের রচয়িতা। 'অসুর' কথাটি সেকালে প্রাচীন 'অ্যাসিরীয়' বা ব্যাবিলনীয় জাতির প্রতি প্রযুক্ত হতো। সূর্যসিদ্ধান্তের উপর অভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু এর উপস্থাপনার রীতিটি ভারতীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এতে যে গ্রহ ও নক্ষত্রের সংযুতির (Conjunction) কথা বলা হয়েছে, সেটা কেবলমাত্র হিন্দু-জ্যোতিষেই দেখা যায়। তাছাড়া প্রাচীন হিন্দু কাল-গণনার পদ্ধতি অনুসারে এতে 'যুগ' ও 'কল্প' শব্দ ব্যবহার করা

হয়েছে [৪,৩২০,০০০ বছরে এক যুগ এবং এরূপ ১০০০ যুগে এক কল্প হয়]। তাছাড়া পৃথিবীর সর্বোত্তর অংশে মেরুপর্বতের অবস্থিতির উল্লেখও হিন্দু-বিশ্বাস সম্ভূত। সূর্যসিদ্ধান্তের সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য বিষয় এই যে, এতে জ্যামিতির 'চাপে'র (Arc) পরিবর্তে ত্রিকোণমিতির 'জ্যা' (Sine) ও 'কোটিজ্যা' (Cosine) শব্দ দুটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এথেকে মনে হয়, তখন ত্রিকোণ-মিতি শাস্ত্রটি হিন্দুদের নিকট সুপরিচিত হয়েছে। আর একটি পরিভাষা 'উৎক্রমজ্যা' (Versine) এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয়েছে [একক ব্যাসার্ধ-বিশিষ্ট বৃত্তে উৎক্রমজ্যা = ১ − কোটিজ্যা ($\text{Versin}\ \alpha = 1 - \cos \alpha$)]।

পৌলিশ-সিদ্ধান্তও সূর্যসিদ্ধান্তের মতই মূল্যবান গ্রন্থ ছিল; কিন্তু এর মূলগ্রন্থ পাওয়া যায় নি। বরাহমিহির ও তাঁর টীকাকার ভট্টপাল এর উল্লেখ করেছেন এবং এর রচয়িতা হিসাবে 'যবন পুলিশে'র নাম করেছেন। আল বিরুণিও 'পুলিশ' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন এবং 'সৈন্র' দেশবাসী কোন গ্রীককে এর রচয়িতা বলেছেন। এই 'সৈন্র'কে আলেকজান্দ্রিয়া মনে করে কেউ কেউ আলেকজান্দ্রিয়ার পল্ কে পুলিশ-সিদ্ধান্তের রচয়িতা মনে করেছেন। ইনি চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। তবে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে এ-সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। পৌলিশ-সিদ্ধান্তকে সূর্যসিদ্ধান্তের পরবর্তী মনে করবার কারণ আছে। কারণ এতে কেবল জ্যা, কোটি জ্যা ও উৎক্রম জ্যা ই নয়, তাদের সারণিও প্রদত্ত হয়েছে। এথেকে মনে হয়, ত্রিকোণমিতিরও তখন ব্যাপক চর্চা চলেছিল। পৌলিশ-সিদ্ধান্তকে হিন্দু-ত্রিকোণ-মিতির ভিত্তি বলা যেতে পারে। এই গ্রন্থে ৩° ৪৫′ অন্তর ২৪টি জ্যা, কোটিজ্যা ও উৎক্রমজ্যা-এর সারণি প্রদত্ত হয়েছে। এই সারণিগুলি প্রস্তুত হয়েছে একটা সূত্র অবলম্বন করে। সূত্রটি আধুনিক ত্রিকোণমিতির ভাষায় দাঁড়াবে—* $\sin (n+1)\alpha = 2 \sin n\alpha - \sin (n-1)\alpha - \frac{\sin n\alpha}{\sin \alpha}$ যেখানে $\alpha = 3° 45' = \sin \alpha$। এই সারণি প্রস্তুত করতে ৩° ৪৫′-এর 'চাপ' ও 'জ্যা'কে সমান বলে ধরা হয়েছে। আধুনিক ত্রিকোণমিতিতেও কোণের পরিমাণ খুব ছোট হলে $\sin \theta = \theta$ ধরা হয়।

রোমক-সিদ্ধান্তের নামটিই এর রোমক প্রভাবের সূচক। এর মধ্যে গ্রীক ও রোমক প্রভাব এত বেশী যে, এটিকে হিন্দু-জ্যোতিষের গ্রন্থ না মনে করাই ভাল। টলেমির (খৃঃ ২য় শতক) অনুসরণে এতে বছরকে উত্তরায়ণ ১৮৬ দিন ও দক্ষিণায়ণ ১৭৯ দিন—এই দু-ভাগে মোট ৩৬৫ দিন ধরা হয়েছে। হিন্দু-জ্যোতিষে কোথাও ৩৬৫ দিনে বছর ধরা হয় নি। তাছাড়া এই গ্রন্থে ২৮৫০ সৌরবছরে এক যুগ ধরা হয়েছে। এটা হিন্দু-ঐতিহ্য বিরোধী। সূর্যসিদ্ধান্ত ও পৌলিশ-সিদ্ধান্তের তুলনায় এই গ্রন্থের গণিতের অংশ নিকৃষ্ট ছিল।

এই সিদ্ধান্ত-গ্রন্থগুলিতে গণিত ও জ্যোতিষের তত্ত্বগুলি প্রধানতঃ সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এগুলিকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে 'করণ' নামক একশ্রেণীর ব্যবহারিক গ্রন্থ রচিত হয়। এগুলিতে গ্রহগুলির গতি ও অবস্থান গণনার জন্যে নানাবিধ সারণি প্রদত্ত হয়েছে, যাদের সাহায্যে হিন্দু পঞ্চাঙ্গ বা পঞ্জিকা রচিত হয়ে আসছে।

---

* Introduction to the History of Science by George Sarton; Part I দ্রষ্টব্য।

নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ধারণ

শ্রীঅলোক মুখোপাধ্যায়

অন্ধকার রাত্রে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালে শত শত জ্যোতিষ্কের অপরূপ দৃশ্য মনকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে তোলে। নক্ষত্রময় মহাকাশের সৌন্দর্য কবি ও দার্শনিকের চিন্তার খোরাক যোগায়। বিজ্ঞানীরা কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত গ্রহ-নক্ষত্রের স্বরূপ জানতে চান; এই অনন্ত বিস্তৃত অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ভেদ করতে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন। শক্তিশালী টেলিস্কোপ তাঁদের কত অজানা জিনিষ জানিয়ে দেয়, কত অদেখা জিনিষ দেখিয়ে দেয়। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিশালতায় এবং দূরত্বে মানুষ স্তব্ধ হয়ে যায়। এই যে রহস্যময় আকাশের অগণিত নক্ষত্ররাশি—এদের স্বরূপ কি, দূরত্ব কত এবং কেমন করে তা নির্ণয় করা সম্ভব? বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা গজ, ফুট, ইঞ্চি, মাইল প্রভৃতি দিয়ে দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব নির্ণয় করে থাকি; কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রাদির দূরত্ব প্রকাশ করতে হলে আলোক-বর্ষের হিসাবের সাহায্য নিতে হয়। এক আলোক-বর্ষ = ১৮৬০০০ × ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ মাইল, অর্থাৎ আলো এক বছরে যতদূর যেতে পারে, সেই পরিমাণ দৈর্ঘ্যই এই দূরত্বের সমান।

সূর্য থেকে আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র প্রক্সিমা সেণ্টোরির দূরত্ব ৪ আলোক-বর্ষের সামান্য কিছু বেশী। কালপুরুষের কাছাকাছি উজ্জ্বল তারকা প্রভাসের (Procyon) দূরত্ব ১০ আলোক-বর্ষ। আমাদের আকাশের উজ্জ্বলতম তারকা লুব্ধকের (Sirius) দূরত্ব প্রায় ৯ আলোক-বর্ষ। বৃশ্চিক রাশির গায়ে লাল জ্যেষ্ঠা তারকাটির দূরত্ব ৩৬২ আলোক-বর্ষ। এ তো গেল আমাদের পাড়ার নক্ষত্রদের দূরত্ব। এবার দেখা যাক, দূরের নীহারিকাগুলি আমাদের কাছ থেকে কত দূরে আছে। প্রথমেই ধরা যাক, ছায়াপথের নিকটতম কুণ্ডলী নীহারিকা অ্যাণ্ড্রোমিডাকে। গণনা করে দেখা গেছে, এটির দূরত্ব ২০ লক্ষ আলোক-বর্ষ। সম্প্রতি মাউণ্ট উইলসনের ১০০ ইঞ্চি টেলিস্কোপের সাহায্যে ১০০ কোটি আলোক-বর্ষ দূরের নীহারিকা-গুলিকেও দেখতে পাওয়া গেছে। পৃথিবীতে মানুষ আবির্ভূত হবার অনেক আগে থেকে যে আলো আসতে আরম্ভ করেছে, সেই আলো আজ আমাদের এই পৃথিবীতে পৌঁচেছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আসলে এই নীহারিকাগুলি কি? এগুলি নক্ষত্র শ্রেণীর অন্তর্গত বিশাল বাষ্পের সমষ্টি। এদের বাইরের উত্তাপও বড় কম নয়! এই উত্তাপ সাধারণতঃ সত্তর থেকে পঁচাত্তর হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের বিরাট আয়তনের কথা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত। হিসাব করে দেখা গেছে যে, একটি বড় রকমের নীহারিকার ওজন সূর্যের ওজনের চেয়ে তিন হাজার পাঁচ-শ' কোটি গুণ বেশী। এবারে এদের আকারের কথা বলি। ঘণ্টায় পাঁচ হাজার মাইল গতিবেগসম্পন্ন একটা রকেটের পক্ষে এই রকম একটি নীহারিকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে পুরা নয় বছর সময় লাগবে।

তারকাগুলি কি কি পদার্থ দিয়ে গঠিত, তা জানতে হলে সেগুলি থেকে যে আলো আসে, সেই আলো-কে স্পেক্ট্রোস্কোপে পরীক্ষা করতে হবে। এই যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে যখন আলো আসে তখন ঐ আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী নানা

রঙের আলোতে বিভক্ত হয়ে যায় এবং সেই বিভক্ত আলো-রেখাগুলির রঙীন ফটোগ্রাফ তোলা হয়। ঐটিকে সেই তারকার বা ঐ আলোর বর্ণালী বলে। এখন তারাটির বর্ণালীর সঙ্গে মৌলিক পদার্থগুলির তুলনা করলেই কোন্ তারায় কি পদার্থ আছে, তা জানতে পারা যাবে। এসব পরীক্ষা করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে, ৯২টি মৌলিক পদার্থের অনেকগুলিই এসব নক্ষত্রে রয়েছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন জিনিষই স্থির নয়, প্রত্যেকেরই নিজস্ব গতি আছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, প্রতিটি নক্ষত্র প্রচণ্ড বেগে কোন এক অজানার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই দূরের নীহারিকাগুলির গতিবেগ সেকেণ্ডে পনেরো হাজার মাইল—এমন কি, আমরা যে বলি সূর্য স্থির, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্যও স্থির নয়। সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে সূর্য অভিজিৎ (Vega) নামে এক নক্ষত্রের দিকে সেকেণ্ডে বারো মাইল গতিবেগে ছুটে চলেছে। এই বিরাট মহাব্রহ্মাণ্ডকে এতদিন বিজ্ঞানীরা অসীম বলেই জানতেন, কিন্তু বিজ্ঞানের নবযুগ প্রবর্তক আইনষ্টাইনই সর্বপ্রথম এই অসীম বিশ্বের সীমারেখা টেনে দেন। তিনিই প্রথম তাঁর আবিষ্কৃত আপেক্ষিকতা-বাদের সাহায্যে বুঝিয়ে দিলেন যে, বিশ্ব অসীম নয়, সসীম; এরও সীমারেখা আছে। তাছাড়া কোন বস্তুর ভর ও শক্তির মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাও তিনি বুঝিয়ে দিলেন তাঁর ছোট একটি সমীকরণ $E=mc^2$ (E=শক্তি, m=বস্তুর ভর, c=সেকেণ্ডে আলোর গতিবেগ) দিয়ে।

এবার আমরা দেখবো, কেমন করে এই নক্ষত্রগুলির দূরত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে। বেসেলের পদ্ধতি এখানে আলোচনা করা যাক। এই পদ্ধতিতে প্রথমে তারকাগুলির 'অ্যান্যুয়েল প্যারালেক্স' বের করা হয় এবং ঐ প্যারালেক্সের সাহায্যে তারকাগুলির দূরত্ব গণনা করা হয়ে থাকে।

যে তারকাটির দূরত্ব বের করতে হবে, তার কাছাকাছি একটি বহু দূরের ক্ষীণ নক্ষত্রকে বেছে নিতে হবে। এই ক্ষীণ নক্ষত্রটি বহুদূরে থাকায় এর প্যারালেক্স নগণ্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এর অন্য সুবিধা এই যে, 'রিফ্র্যাকসন' ও 'অ্যাব্যারেসনে'র ভ্রান্তি উভয় তারকার ক্ষেত্রে সমান সমান হওয়ার ফলে সেগুলি শোধরাতে হবে না।

১নং চিত্র

উপরের ১নং চিত্রে পৃথিবীর কক্ষ পথে ক এবং খ দুটি ঠিক বিপরীত বিন্দু।

ক ত এবং খ ত, ক ও খ থেকে ত তারকাটির

দূরত্ব; ক ত' ও খ ত' ক্ষীণ তারকাটির দিকে চলে গেছে। ত' তারকাটি বহুদূরে আছে বলে ক ত' এবং খ ত' সরলরেখা দুটি সমান্তরাল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এখানে আমরা ক খ ত এবং ত' একই প্লেনে আছে বলে ধরে নিয়েছি।

ক-চিহ্নিত স্থানে যিনি আছেন, তিনি সূক্ষ্ম মাইক্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে অ-কোণটি, অর্থাৎ ∠তকত' মেপে নিলেন। এই মাপের ঠিক ছয় মাস পরে পৃথিবী যখন খ-চিহ্নিত স্থানে এলো, তিনি তখন আবার আ-কোণ, অর্থাৎ ∠তখত' মেপে নিলেন। এখন আমরা জ্যামিতির সাহায্যে সহজেই বুঝতে পারবো যে—

∠ঈ = ∠অ + ∠ই

কিন্তু ∠ঈ = ∠আ

কারণ কত' এবং খত' দুটি সমান্তরাল সরলরেখা এবং তখ তাদের ছেদ করেছে।

∴ ∠আ = ∠অ + ∠ই ;

∴ ∠ই = ∠আ − ∠অ

কিন্তু অ এবং আ কোণ দুটি জানা আছে বলে ই-কোণটি সহজেই বের করতে পারা যাবে, আর ঐ কোণটিকে অর্ধেক করলেই তারকাটির অ্যান্যুয়েল প্যারালেক্স পাওয়া যাবে। এবারে ঐ অ্যান্যুয়েল প্যারালেক্স থেকে তারকাটির দূরত্ব বের করতে হলে একটি ফর্মুলার সাহায্য নিতে হবে।

$$\text{দূরত্ব} = \frac{\text{২০৬২৬৫} \times \text{পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ}}{\text{অ্যান্যুয়েল প্যারালেক্স}}$$

পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ হলো ৯,৩০,০০০০০ মাইল।

∴ নির্ণেয় তারকার দূরত্ব

$$= \frac{\text{২,০৬,২৬৫} \times \text{৯,৩০,০০০০০}}{\text{ঐ তারকার অ্যান্যুয়েল প্যারালেক্স}} \text{ মাইল।}$$

এই পদ্ধতিতে দূরত্ব নির্ণয় করলে সাধারণতঃ কিছু ভুল হতে পারে; কারণ এখানে ধরা হয়েছে কত' এবং খত' দুটি সমান্তরাল সরলরেখা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি তা নয়; পরস্পরের সঙ্গে রেখা দুটি সামান্য কোণ করে রয়েছে—যার ফলে নির্ণেয় প্যারালেক্স সামান্য কমে যায় এবং সেই জন্যে তারকাটির প্রকৃত দূরত্ব কিছু বেশী বলে মনে হয়। আজকাল মাইক্রোমিটারের পরিবর্তে ফটোগ্রাফির সাহায্যে কোণগুলি মাপা হয়ে থাকে এবং তাতে ভুলের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

সম্ভাবনার সিদ্ধান্ত

শ্রীদেবব্রত চাটার্জি

মনে করুন, কোন ঘটনা a রকমভাবে সফল এবং b রকমভাবে বিফল হতে পারে। যেমন খেলবার সময় পয়সা 'টস্' করা হলো। এখন 'হেড' পড়লেই আপনি জিতে যাবেন, অর্থাৎ ঘটনাটা সফল হবে। ঘটনাটা ১ রকমভাবে সফল হতে পারে, অর্থাৎ এখানে a=১। কিন্তু 'টেল' পড়লেই আপনি হেরে যাবেন, অর্থাৎ ঘটনাটা বিফল হবে। ঘটনাটা ১ প্রকারে বিফল হতে পারে, অর্থাৎ b=১।

আমরা সাধারণতঃ বলি যে, যদি ঘটনাটি a প্রকারে সফল ও b প্রকারে বিফল হতে পারে, তাহলে ঘটনাটির সফল হবার সম্ভাবনা k a এবং ঘটনাটির বিফল হবার সম্ভাবনা k b। এক্ষেত্রে k একটি ধনাত্মক সংখ্যা। এখন ঘটনাটি অবশ্যই হয় সফল, না হয় বিফল হবে। সুতরাং ঐ দুই সম্ভাবনার যোগফল 'নিশ্চয়তা'র সমান হবে। যদি 'নিশ্চয়তা'কে ১-এর সমান ধরা হয়, তাহলে—

সফলতার সম্ভাবনা+বিফলতার সম্ভাবনা=১

অর্থাৎ $ka+kb=১$

$$\therefore k=\frac{১}{a+b}$$

সুতরাং সফলতার সম্ভাবনা $=ka=\frac{a}{a+b}$

এবং বিফলতার সম্ভাবনা $=kb=\frac{b}{a+b}$

আপনার 'টসে' জেতবার সম্ভাবনা=

$$\frac{১}{১+১}=\frac{১}{২};$$

এবং 'টসে' হারবার সম্ভাবনা $=\frac{১}{১+১}=\frac{১}{২}$।

সুতরাং 'টসে' আপনার জেতবার সম্ভাবনা যত, হারবার সম্ভাবনাও ঠিক তত।

কিন্তু প্রত্যেক জুয়াখেলাতেই হারবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। প্রথমতঃ মনে করুন, একটি নির্দোষ পাশা নিয়ে জুয়া খেলছেন। আপনি বাজী ধরেছেন ৩-এর উপরে, অর্থাৎ একবার পাশা ছুড়লে যদি ৩ পড়ে, তাহলেই ঘটনাটা সফল হবে। এখানে a=১। কিন্তু অন্য ৫টি সংখ্যা, অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৫ বা ৬-এর মধ্যে যে কোনও একটি পড়লেই ঘটনাটা বিফল হবে। সুতরাং b=৫।

তাহলে আপনার সফলতার সম্ভাবনা $=\frac{১}{১+৫}$ $=\frac{১}{৬}$ এবং বিফলতার সম্ভাবনা $=\frac{৫}{১+৫}=\frac{৫}{৬}$; অর্থাৎ সফলতার সম্ভাবনার চেয়ে আপনার বিফলতার সম্ভাবনা ৫ গুণ বেশী।

এবারে ধরুন দুটি পাশা নিয়ে খেলছেন। দুটি পাশা ফেললে দুটি সংখ্যার যোগফলের উপরে বাজী ধরা হয়। প্রথম পাশাটিকে A এবং দ্বিতীয় পাশাটিকে B নাম দেওয়া যাক। মনে করুন, আপনি ৯-এর উপরে বাজী রাখলেন। দুটি পাশা ফেলা হবে এক সঙ্গে। তাদের উপরে যে যে সংখ্যা থাকবে, তাদের যোগফল যদি ৯ হয়, তাহলে আপনি সফল হবেন, নইলে বিফল হবেন। এখন ৯ কত রকমভাবে পড়তে পারে? (১) A-তে ৩ এবং B-তে ৬ পড়লে, (২) A-তে ৪ এবং B-তে ৫ পড়লে, (৩) A-তে ৫ এবং B-তে ৪ পড়লে, (৪) A-তে ৬ এবং B-তে ৩ পড়লে। শুধু এই ৪ প্রকারেই ৯ পড়তে পারে, অন্য কোনও প্রকারে নয়। অর্থাৎ ঘটনাটা ৪ প্রকারে সফল হতে পারে। কিন্তু কত প্রকারে বিফল হতে পারে?

সেজন্যে আমাদের অন্যান্য প্রত্যেকটি সংখ্যা (২

থেকে ১২ পর্যন্ত) কত প্রকারে পড়তে পারে, তা দেখতে হবে। নীচের তালিকায় তা দেখানো গেল। • তালিকায় (A-৩, B-৫) অর্থে A-পাশায় ৩ এবং B-পাশায় ৫ পড়েছে বুঝতে হবে।

দুটি পাশার সংখ্যার যোগ	কত রকমে হতে পারে	মোট কবার পড়তে পারে
২	(A-১, B-১)	১
৩	(A-১, B-২), (A-২, B-১)	২
৪	(A-১, B-৩), (A-২, B-২), (A-৩, B-১)	৩
৫	(A-১, B ৪), (A-২, B-৩), (A-৩, B-২), (A-৪, B-১)	৪
৬	(A-১, B-৫), (A-২, B-৪), (A-৩, B-৩), (A-৪, B-২), (A-৫, B-১)	৫
৭	(A-১, B-৬), (A-২, B-৫), (A-৩, B-৪), (A-৪, B-৩), (A-৫, B-২), (A-৬, B-১),	৬
৮	(A-২, B-৬), (A-৩, B-৫), (A-৪, B-৪), (A-৫, B-৩), (A-৬, B-২),	৫
৯	(A-৩, B-৬), (A-৩, B-৫), (A-৫, B-৪), (A-৬, B-৩)	৪
১০	(A-৪, B-৬), (A-৫, B-৫), (A-৬, B-৪)	৩
১১	(A-৫, B-৬), (A-৬, B-৫)	২
১২	(A-৬, B-৬)	১

হিসেব করলেই দেখতে পাওয়া যাবে, ৯-এর উপরে যে বাজী রাখা হয়েছে, তাতে ৩২ রকমভাবে বিফলতা আসতে পারে। সুতরাং আপনার জেতবার সম্ভাবনা $=\frac{৪}{৪+৩২}=\frac{১}{৯}$।

আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এবারে মনে করুন, আপনি বাজী ধরলেন ৪-এর উপরে। এখন দুটি পাশার সংখ্যার যোগ ৪ কত প্রকারে হতে পারে? (১) A-তে ১ এবং B-তে ৩ পড়লে, (২) A-তে ২ এবং B-তে ২ পড়লে, (৩) A-তে ৩ এবং B-তে ১ পড়লে; অর্থাৎ তিন প্রকারে মাত্র। এই তিন প্রকার ছাড়া বাকী ৩৩ প্রকারের যে কোন এক প্রকারে ঘটনাটা ঘটলেই আপনি হেরে যাবেন। সুতরাং আপনার জেতবার সম্ভাবনা $=\frac{৩}{৩৩+৩}=\frac{১}{১২}$।

কিন্তু বাজী যদি ৭-এর উপরে রাখেন, তাহলে আপনার সফলতার সম্ভাবনা $=\frac{৬}{৩০+৬}=\frac{১}{৬}$

অন্যান্য সংখ্যার সম্ভাবনার হিসাব করে দেখতে পারেন যে, ৭-এর উপরে বাজী রাখলেই আপনার সফলতার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী।

সর্বপ্রথম ফারমাণ্ট এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেন। অন্যান্য দেশের মত মধ্যযুগে ফ্রান্সেও অভিজাত মহলে জুয়াখেলার খুব প্রচলন ছিল। তিনি এটা লক্ষ্য করে আশ্চর্যান্বিত হন যে, ৯-এর চেয়ে ৭-এর উপরে বাজী রাখলেই লোকে বেশী সাফল্য লাভ করে। এ-সম্বন্ধে তিনি লাপ্লাসের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করেন। সেই ঐতিহাসিক পত্রাবলীই "সম্ভাবনা-বাদে"র মূল ভিত্তি। লাপ্লাস সম্ভাবনার যে সংজ্ঞা প্রণয়ন করেন, সেটা এরূপ—

একই সর্তাবলীর অধীনে, সমরূপে সংঘটন যোগ্য, পরস্পর নিরোধক n এবং কেবল মাত্র n ঘটনাবলীর মধ্যে যদি m ঘটনা কোনও অভীষ্ট ফল E-এর অনুকূল হয়, তখন E-এর গাণিতিক সম্ভাবনা হবে $\frac{m}{n}$।

খুবই অদ্ভুত মনে হবে নিশ্চয়! তবে যে ভাষাতেই লেখা হোক না কেন, ঐ সংজ্ঞাটি বিশেষ শ্রুতিমধুর করা যাবে বলে মনে হয় না নীচের ইংরেজী উদ্ধৃতি থেকে একথা বুঝা যাবে—

"Under the *same set of conditions* if there are n *equally likely, mutually exclusive* and exhaustive cases, out of which m cases are favourable to the event E, then the mathematical probability that E will materialize is $\frac{m}{n}$."

উপরের উদ্ধৃতির বাঁকা অক্ষরের পদগুলির ব্যাখ্যা নিয়ে পরবর্তী কালের গণিতজ্ঞ এবং সংখ্যা-তাত্ত্বিকেরা বহু বাদানুবাদের অবতারণা করেছেন। কিছুকাল দুটি দল তৈরী হয়েছিল এবং প্রচণ্ড মসীযুদ্ধও চলেছিল এবং এখনও তা বন্ধ হয়ে যায় নি, বরং আরও কয়েকটা নতুন দল তৈরী হয়েছে এবং তাদের মধ্যে বেশ বিরোধিতাও আছে। সে সব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনেক লিখতে হবে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তা সম্ভব নয়। কাজেই শুধু ঐ কথাগুলির সাধারণতঃ যে অর্থ করা হয়, সে সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করবো।

মনে করুন—A B সমত্রিবাহু ত্রিভুজের একটি ভুজ। যদি O C, A B-এর উপরে লম্ব হয়, তবে D, A B-এর মধ্যবিন্দু হবে; কিন্তু A B সমত্রিবাহু ত্রিভুজের বাহু হবার ফলে D, OC-এরও মধ্যবিন্দু হবে। AB-এর সমান্তরাল যে কোনও জ্যা-এর মধ্যবিন্দু OC-এর উপরে হবে। যদি মধ্যবিন্দু OD-এর মধ্যে থাকে, তবে জ্যা AB-এর চেয়ে বড় হবে, নতুবা ছোট হবে। যে কোনও ব্যাসার্ধের জন্যেই এটা সত্য। সুতরাং জ্যা-এর সমত্রিবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বড় হবার সম্ভাবনা

১নং চিত্র

$$= \frac{OD}{OD+DC} = \frac{OD}{২.OD} = \frac{১}{২}$$

এই সমস্যাটিকে অন্যভাবেও সমাধান করা যায়। মনে করুন ABC সমত্রিবাহু ত্রিভুজ বৃত্তের মধ্যে আঁকা হয়েছে। ২নং চিত্র দ্রষ্টব্য। বৃত্তের A-বিন্দুতে EAD একটি স্পর্শরেখা বা ট্যাঞ্জেন্ট টানা হলো। তখন $\angle EAC = \angle CAB = \angle BAD = 60°$। বৃত্তের মধ্যে টানা যে কোনও জ্যা-এর দৈর্ঘ্য AB বা AC-এর চেয়ে বড় হবে, যদি তা A-বিন্দু
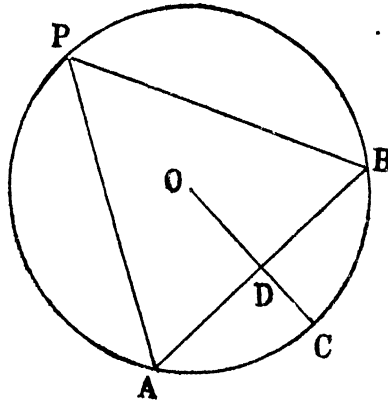
প্রথমতঃ "একই সর্তাবলীর অধীনে" কথাটির অর্থ হলো—যদি পরিবেশ পরিবর্তিত হয়, তাহলে সম্ভাবনারও পরিবর্তন হতে পারে। এর একটা ভাল উদাহরণ হলো Paradox বা বার্ট্রাণ্ডের কুট-তত্ত্ব (Bertrand's Paradox)।

একটি বৃত্তের মধ্যে একটি সমত্রিবাহু ত্রিভুজ আঁকা হয়েছে (১নং চিত্র)। বৃত্তের মধ্যে টানা যে কোনও জ্যা-এর ঐ সমত্রিবাহু ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বড় হবার সম্ভাবনা কত?

থেকে টানা হয় এবং ∠CAB-এর মধ্যে থাকে। কিন্তু যদি ∠EAC বা ∠BAD-এর মধ্যে থাকে, তবে সে জ্যা-এর দৈর্ঘ্য AC বা AB অপেক্ষা কম

২নং চিত্র

হবে। সুতরাং অভীষ্ট সম্ভাবনা

$$=\frac{\angle CAB}{\angle CAE+CAB+DAB}=\frac{১}{৩}$$
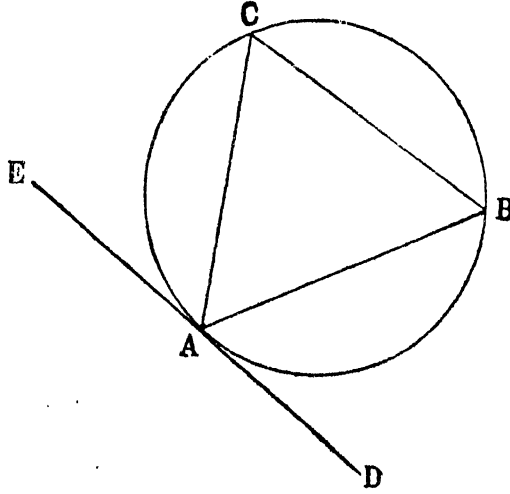
এই সমস্যার আরও একটি সমাধান আছে। AB সমত্রিবাহু ত্রিভুজের একটি বাহু। যে বৃত্তের মধ্যে ত্রিভুজ টানা হয়েছে, মনে করুন তার ব্যাসার্ধ a। $\frac{a}{2}$ ব্যাসার্ধের একটি এককেন্দ্রিক বৃত্ত টানুন। ৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য। AB ঐ বৃত্তের একটি স্পর্শরেখা হবে। যে কোনও জ্যা-এর ছোট বৃত্তটির ক্ষেত্রফলের মধ্যে মধ্যবিন্দু পড়লেই সেটির দৈর্ঘ্য AB-এর চেয়ে বড় হবে, নতুবা ছোট হবে। সুতরাং অভীষ্ট সম্ভাবনা—

৩নং চিত্র

$$=\frac{\text{বৃত্ত DEF-এর ক্ষেত্রফল}}{\text{বৃত্ত ABC-এর ক্ষেত্রফল}}=\frac{\pi\left(\frac{a}{2}\right)^2}{\pi a^2}=\frac{1}{4}$$

সর্ত পরিবর্তন হওয়ায় একই সমস্যার তিনটি উত্তর আমরা পেয়েছি।

লাপ্লাসের সংজ্ঞার দ্বিতীয় বাক্যাংশ "সমরূপে সংঘটনযোগ্য" (Equally likely) কথাটির তীব্র সমালোচনা হয়েছে। কথাটির সাধারণ অর্থ এই যে, n ঘটনাবলীর মধ্যে যদি কোনও ঘটনা সংঘটিত হবার জন্যে বিশেষ কোনও সুবিধা না পায়, তাহলে ঘটনাগুলিকে সমরূপে সংঘটনযোগ্য বলা হয়।

পরস্পর নিরোধক (Mutually exclusive) অর্থ—যদি n ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে যায়, অন্য কোনও ঘটনা আর ঘটতে পারে না, অথবা যে ঘটনাগুলির মধ্যে একাধিক এক সঙ্গে ঘটতে পারে না, তাদের 'পরস্পর নিরোধক' বলে। যেমন একটি পয়সা 'টস্' করলে যদি 'হেড' পড়ে, তাহলে ঐ একই 'টসে' আর 'টেল' পড়তে পারে না। অথবা একবার পয়সা 'টস্' করলে ঐ একই 'টসে' 'হেড' এবং 'টেল' দুটিই পাওয়া যাবে না। এজন্যে ঐ দুই ঘটনা পরস্পর নিরোধক।

আজকালকার পরিসংখ্যানবিদেরা লাপ্লাসের সংজ্ঞাকে ক্ল্যাসিকাল সম্ভাব্যতা নাম দিয়ে এক পাশে সরিয়ে রেখেছেন। আজকাল সম্ভাবনার যে সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়, তাকে এম্পিরিক্যাল সম্ভাব্যতা বলা হয়।

মনে করুন, একটি বিশেষ পয়সা 'টস্' করে তার 'হেড' পড়বার সম্ভাবনা বের করতে হবে। তার ক্ল্যাসিক্যাল সম্ভাব্যতা ১/২, কিন্তু পয়সাটা একদিকে এমনভাবে ভারী থাকতে পারে যে, শুধু 'হেড'-ই পড়বে বার বার। তখন তাকে আর 'হেড' পড়বার সম্ভাবনা ১/২ বললে ঠিক বলা হবে না। লুডো খেলবার সময় লক্ষ্য করা যায়, এক-একটা পাশা এমন থাকে যে, কয়েকটা সংখ্যা খুব বেশীবার করে পড়তে থাকে। সে রকম অবস্থায় তো আর বলা যায় না যে, প্রত্যেকটি সংখ্যার সম্ভাবনা ১/৬। এমন অবস্থায় এম্পিরিক্যাল সম্ভাব্যতা বের করতে হয়।

তখন পয়সাটিকে বাস্তবিক বহুবার 'টস্' করা হয় এবং তার মধ্যে কতবার 'হেড' পড়লো, তা দেখা হয়। ধরুন ১০০০ বার 'টস্' করাতে ৫২২ বার 'হেড' পড়লো। তখন ১০০০ ঘটনার মধ্যে ৫২২টি সাফল্য লাভ হলো। সুতরাং যে কোনও একটি 'টসে' 'হেড' পড়বার সম্ভাবনা ৫২২/১০০০। এটা কিন্তু ১/২-এর চেয়ে বেশী।

যে কেউ পয়সা 'টস্' করে দেখতে পারেন—কখনই অর্ধেক 'হেড' ও অর্ধেক 'টেল' পড়বে না। তবে যত বেশীবার 'টস্' করা যাবে, একটা স্থির রাশির দিকে পরীক্ষার ফল ততই বেশী এগিয়ে যাবে। ঐ স্থির রাশিই অভীষ্ট সম্ভাব্যতা।

এবারে সম্ভাব্যতার এম্পিরিক্যাল সংজ্ঞা দেওয়া যাক। যদি n ঘটনাবলীর মধ্যে mটি সফল ঘটনা থাকে, তাহলে সফলতার সম্ভাবনা m/n-এর সীমান্ত মানের সমান হবে, যখন n অনন্তের দিকে এগিয়ে যাবে। যদি সফলতার সম্ভাবনাকে p দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাহলে

$$p = \lim_{n \to \infty} \frac{m}{n}$$

যেহেতু এ-ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে n বের করতে হয়, সেহেতু গণিতের অনন্তে আর এই অনন্তে প্রভেদ আছে। অবস্থানুসারে n-এর যথেষ্ট বড় মানকে অনন্ত ধরা হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে লাপ্লাসের সংজ্ঞার দ্বারা কোনও সম্ভাব্যতা পাওয়া যায় না; কিন্তু এম্পিরিক্যাল সংজ্ঞার দ্বারা পাওয়া যায়। যেমন ধরুন, কলে কাপড় তৈরী হচ্ছে। যে কোনও এক গজ কাপড়ের মধ্যে দোষ পাওয়ার সম্ভাবনা বের করতে হবে। ধরা যাক, ১০০০ গজ কাপড় তৈরী করা হলো এবং তার মধ্যে ১৫টি জায়গায় দোষ পাওয়া গেল। তখন যে কোনও এক গজ কাপড়ে দোষ পাওয়ার সম্ভাবনা ১৫/১০০০ হলো। এটিই এম্পিরিক্যাল সম্ভাবনা; কিন্তু লাপ্লাসের সংজ্ঞা অনুসারে এখানে কোনও সম্ভাব্যতা পাওয়া যাবে না। কেন না, n এখানে অজানা।

ব্রঙ্কাইটিস

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

আজকাল এই শীতের দিনে রাস্তাঘাটে, ট্রামে-বাসে, সর্বত্রই খুক্ খুক্ শব্দ শুনতে পাই। কেবল তাই নয়, আমাদের অনেকেরই ভোরবেলায়, আবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত প্রায়ই কিছু না কিছু কাশি পায়। এতে যে শুধু পার্শ্ববর্তী লোকেরাই বিরক্ত হন তাই নয়, নিজেরাও নিজেদের উপর বিরক্ত বোধ করি। একবার কাশির বেগ সুরু হলে সহজে থামতে চায় না। বক্তৃতা কক্ষে বা প্রেক্ষাগৃহে একবার কেউ কাশ্‌তে আরম্ভ করলে সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'চারজন তাদের কাশির বেগ সামলাতে পারেন না,' এ-ধরণের অদ্ভুত ব্যাপার হয়তো অনেকেই 'লক্ষ্য করে থাকবেন। কাশি হলেই অনেকেরই মনে সন্দেহ জাগে—টি. বি. রোগ নয় তো? এরূপ অবশ্য সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। শীতকালে বেশীর ভাগ লোক যে কাশিতে ভোগে, তার কারণ ব্রঙ্কাইটিস। ব্রঙ্কাইটিস কথাটা আমরা অত্যন্ত হাল্‌কা ভাবে ব্যবহার করি—তার কারণ, এই রোগটি সম্বন্ধে আমরা তেমন গুরুত্ব দেই না। কিন্তু এই রোগটি অতি সাধারণ বলেই তুচ্ছ করা উচিত নয়। ব্রঙ্কাইটিস কথাটার মানে হচ্ছে, ব্রঙ্কাসের প্রদাহ। ইংরেজী 'আইটিস' শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রদাহ। শ্বাসনালী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকলেও ব্রঙ্কাইটিস রোগ নিয়ে আলোচনা করবার সময় এই বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন।

'কার্টিলেজ' এবং 'মেম্ব্রেন' দিয়ে শ্বাসনালী তৈরী হয়েছে। এটি দৈর্ঘ্যে দশ থেকে এগারো সেন্টি-মিটার লম্বা। ইংরেজিতে একে 'ট্র্যাকিয়া' বলা হয়। বক্ষপিঞ্জরের মধ্যে এই নলটি দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে দু-পাশের দুটি ফুস্‌ফুসে ঢুকে গেছে (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

শ্বাসনালীর বিভক্ত অংশ দুটির নাম ব্রঙ্কাস। ডানদিকের ফুস্‌ফুসে যে ব্রঙ্কাসটি প্রবেশ করে, তার

নাম ডান অথবা দক্ষিণ ব্রঙ্কাস এবং বাঁ-দিকের ফুস্‌ফুসে যেটি যায়, তার নাম বাম-ব্রঙ্কাস। ব্রঙ্কাস দুটি ফুস্‌ফুসের মধ্যে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। ব্রঙ্কাসের সবচেয়ে ছোট প্রশাখাকে বলা হয় ব্রঙ্কিওল বা ক্লোমশাখা। শেষ ব্রঙ্কিওলটির ব্যাস মাত্র ০'২ মিলিমিটার। এগুলিকে 'রেস্পিরেটরি ব্রঙ্কিওল' বলা হয়; কারণ এরা শ্বাসকার্যে সহায়তা করে। রেস্পিরেটরি ব্রঙ্কিওল আবার প্রায় এগারো ভাগে বিভক্ত। এদের বলা হয় 'অ্যালভিওলার ডাক্ট'। এই বর্ণনা থেকে বুঝা যাবে, নাক দিয়ে আমরা যে বাতাস গ্রহণ করি, তা শ্বাসনালী দিয়ে ফুস্‌ফুসে পৌঁছায়।

ব্রঙ্কাইটিসকে মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা যায়:

(১) Acute Forms

(২) Chronic Forms

এরাও আবার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত।

এই উভয় শ্রেণীর ব্রঙ্কাইটিসকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে।

Acute Forms-এর বিভিন্ন শ্রেণী বা ভাগের নামগুলি প্রথমে বলে নেওয়া ভাল।

(ক) Catarrhal Bronchitis

(খ) Suppurative Bronchitis

(গ) Secondary „

(ঘ) Bronchitis due to mechanical and Chemical agencies

(ঙ) Fibrinous

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, Chronic শ্রেণীকেও অনুরূপ পাঁচটি অংশে ভাগ করা হয়েছে।

এবারে এক-একটি করে আলোচনা করা হচ্ছে।

(ক) আবহাওয়া বা জলবায়ুর উপর এই ধরণের ব্রঙ্কাইটিস রোগ অনেকাংশে নির্ভর করে। কারণ, দেখা গেছে মেরুপ্রদেশে এবং বিষুবরেখার সন্নিকটস্থ এলাকায় ক্যাটার‍্যাল ব্রঙ্কাইটিস রোগ নেই বললেই চলে; কিন্তু আর্দ্র এবং কুয়াশাচ্ছন্ন এলাকায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশী। ইংল্যাণ্ডে শরৎকালের শেষাংশে, শীত এবং বসন্তকালের প্রারম্ভে এই রোগের আক্রমণ তীব্র আকারে দেখা দেয়। আমাদের দেশেও ঐ সময়ে, অর্থাৎ পূজার শেষের দিকে আরম্ভ হয়। তার পরে কার্তিক, অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত এই রোগের মরশুম।

সাধারণতঃ পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের চেয়ে এই রোগে বেশী ভুগে থাকে। তার কারণ অবশ্য খুবই সাধারণ। কারণ পুরুষদেরই বেশীক্ষণ বাড়ীর বাইরে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে হয়। বৃদ্ধ এবং শিশুরাই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হয়। তাই বলে এই ধারণা যেন কেউ না করে যে, মধ্যম বয়সে এই রোগ হয় না। অত্যধিক পরিশ্রম, গুরুত্বপূর্ণ কাজ, ঠাণ্ডা লাগানো এবং আর্দ্র জলবায়ু এই রোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। তা-ছাড়া বুকের কোন দোষ, হৃৎপিণ্ড এবং কিড্‌নীর রোগ থাকলেও এই রোগ সহজেই হয়ে থাকে।

উপরে যে সব কারণ বলা হলো, তার কোনটিই মূল কারণ নয়। এই রোগের প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায় নি। যদিও এই রোগে আক্রান্ত রোগীর থুথু পরীক্ষা করে নিউমোকক্কাই, ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাই, ষ্ট্যাফাইলোকক্কাই, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, ফ্রি-ল্যাণ্ডারস্ ব্যাসিলি প্রভৃতি পাওয়া গেছে, তথাপিও বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, এসব বীজাণু দ্বারা ক্যাটার‍্যাল ব্রঙ্কাইটিস রোগ হয় না—বরং এই রোগাক্রমণের কিছুদিন পরে এই বীজাণু দেহকে নতুনভাবে আক্রমণ করে রোগের জটিলতা বৃদ্ধি করে।

সম্প্রতি আমেরিকায় নানাপ্রকার গবেষণার ফলে বিশেষজ্ঞেরা মোটামুটিভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁচে-ছেন যে, কোন এক বিশেষ ধরণের ভাইরাসের আক্রমণে এই রোগের সূত্রপাত হয়। পরে নিউ-মোকক্কাই, ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাই ইত্যাদি বীজাণু দেহের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে' নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি করে।

এবারে উপসর্গ নিয়ে কিছু বলা যাক। রোগাক্রমণের প্রারম্ভেই গা-গরম হয়। মনে হয়, দেহের মধ্যে সব কিছুই যেন অত্যন্ত উত্তপ্ত। এর পরে হাতে-পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা, আর বুকে চাপ-ধরা ব্যথা আরম্ভ হয়।

ক্রমশঃ জ্বর এসে আক্রমণ করে। ৯৯° ফাঃ থেকে ১০৩° ফাঃ পর্যন্ত জ্বর উঠে থাকে। লেখকের মতে, এই রোগে ১০৬° ফাঃ পর্যন্ত জ্বর উঠাও বিচিত্র নয়। আমাদের দেশে এই রোগে শরীরের তাপমাত্রা ১০৬° ফাঃ পর্যন্ত উঠেছে, এমন অনেক নজীর আছে। হঠাৎ ১০৬° ফাঃ জ্বর দেখেই অনেকে ম্যালিগ্ন্যান্ট ধরণের ম্যালেরিয়া বলে সন্দেহ করেন। সব ক্ষেত্রেই যে এই সন্দেহ নিশ্চিত নয়, তা বলাই বাহুল্য।

জ্বরের প্রথম দিকে অনবরত শুক্‌নো কাশির বেগ হতে থাকে। প্রচণ্ড কাশির বেগ অথচ কিছুই বেরোয় না; যদিও দু-একদিনের মধ্যেই শুক্‌নো কাশি তরল হয়ে আসে। থুথুর পরিমাণ প্রথম দিকে বেশ কম ও চট্‌চটে ধরণের, আর তাতে রক্তের ছিটাফোটা দাগ থাকে। কয়েক দিনের মধ্যে কাশি এবং থুথুর পরিমাণ বেড়ে যায় এবং জলীয় অংশও বেশী থাকে। এতে শ্লেষ্মার পরিমাণ খুব বেশী, তাছাড়া কিছু পরিমাণে এপিথেলিয়্যাল কোষ, শ্বেতকণিকা এবং লোহিত কণিকাও থাকে। যত দিন যায় ততই আবার শ্লেষ্মার পরিমাণ কমে যায় এবং খুব ঘন ও হল্‌দে রঙের হয়। কাশির সঙ্গে শ্লেষ্মা বেরোবার আগে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সময় বুকের হাড়ের (ষ্টারনাম) নীচে ঘড়্ ঘড় শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

প্রায় তিন-চারদিন এই অবস্থা চলতে থাকে। এর পরে ক্রমশঃ অন্যান্য উপসর্গগুলি কমে গিয়ে শুধু মাত্র কাশি টিঁকে থাকে। রাতে ও সকালে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কাশির বেগ মানুষকে ভোগায়।

আগেই বলেছি, এই রোগ থেকে নিউমোনিয়া বা ঐ ধরণের জটিল রোগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কাজেই এই রোগের আক্রমণের সূত্রপাত থেকেই উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা উচিত। কারণ এই রোগ দীর্ঘকাল ধরে চললে টি. বি রোগও তার থাবা বিস্তার করে—এই কথাটি জেনে রাখা উচিত।

রোগ হলে তার চিকিৎসা আছে; কিন্তু যাতে রোগ না হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে পারলে বোধ হয় সবচেয়ে ভাল হয়।

যাদের সর্দি-কাশির ধাত, তাঁরা যদি শুক্‌নো আবহাওয়ার মধ্যে থাকতে পারেন, তাহলে খুবই ভাল থাকবেন। ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীরা ব্রঙ্কাইটিসের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে গিয়ে ঘর-বাড়ী বাঁধেন। সঙ্গতিপন্ন রোগীরা প্রায়ই শীতকালে গরম দেশে গিয়ে কাটিয়ে আসেন। আমাদের দেশে ব্রঙ্কাইটিসের রোগীরা উত্তর এবং মধ্য-প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে আরাম বোধ করেন।

জিনিষপত্রে ভর্তি অথবা আলো-হাওয়া শূন্য ঘরে থাকলে সহজেই এই রোগের আক্রমণ হয়। যতদূর সম্ভব খোলামেলা জায়গায় ঘুমানো উচিত। কলকাতার অনেক একতলা বাড়ীতে আলো-বাতাস ঢোকে না, কাজেই সে সব ঘরের বাসিন্দারা এই রোগে বেশী ভুগে থাকেন। ঠিক বিপরীত কারণে গ্রামের লোকেরা খুব বেশী কষ্ট পায় না।

ফ্যাক্টরী বা মিলের কর্মচারীরা সর্বদাই ধুলা-বালির মধ্যে কাজ করেন। অনবরত ধুলাবালির মধ্যে কাজ করলে ক্যাটার‍্যাল ব্রঙ্কাইটিস হওয়া খুব স্বাভাবিক। যতটা সম্ভব ধুলা-ময়লা এড়িয়ে চলা উচিত। বিশেষ করে কারখানাতে যদি কোন বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে কাজ করতে হয়, তখন কর্মী বা শ্রমিকদের অবশ্যই গ্যাস-প্রতিরোধক মুখোস পরা উচিত।

আজকাল ব্রঙ্কাইটিসের ভ্যাক্‌সিনও বাজারে

চালু হয়েছে। চিকিৎসকেরাও রোগীর কাশি থেকে ভ্যাক্‌সিন প্রস্তুত করতে পারেন। ঐ ভ্যাক্‌সিন পুনরায় রোগীর দেহে অথবা কোন সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করালে তাদের দেহে ঐ রোগের প্রতিরোধক ক্ষমতা বেড়ে যায়।

ব্রঙ্কাইটিস রোগ কিছুই নয়—এই ধারণা অনেকের আছে। তাই এই রোগ নিয়ে আমরা যত্রতত্র ঘুরে থাকি। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমার কাশি থেকে অতি সূক্ষ্ম ভাইরাস বীজাণু আমার পার্শ্ববর্তী লোকের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে তাকেও আক্রমণ করতে পারে। বাসে-ট্রামে গা-ঘেঁসে বসে নাকে-মুখে রুমাল চাপা না দিয়ে হাঁচি বা কাশি। আমার জন্যে আমার পাশের লোক যাতে আক্রান্ত না হন, সে বিষয়ে আমাদের যত্নবান হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

ব্রঙ্কাইটিসের রোগীকে রোগের আক্রমণের সুরু থেকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে—অন্ততঃ দু-তিন দিন। সর্দি-কাশি-জ্বর—এই তিন উপসর্গ দেখে আমরা রোগীর ঘরের জানালা যতদূর সম্ভব বন্ধ করে রাখি এই ভেবে যে, বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস এসে রোগীকে আরও বেশী অসুস্থ না করে ফেলে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ব্রঙ্কাইটিসের রোগীকে এমন ঘরে রাখা উচিত, যেখানে সব সময়েই প্রচুর আলো-বাতাস ঢুকতে পারে। রোগীর ঘরের তাপমাত্রা ৬০°—৭০° ফাঃ-এর মধ্যে রাখতে পারলে খুব ভাল হয়।

রোগীকে লঘুপাচ্য খাদ্য খেতে দেওয়া উচিত। বুকের চাপা ব্যথা বুক-পিঠ-গলায় গরম সেঁক দিলে খুব উপকার পাওয়া যায়। ওষুধের জন্যে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

বিগত প্রথম মহাযুদ্ধ, অর্থাৎ ১৯১৪-১৯১৮ সালের মধ্যে এই রোগের নানাবিধ উপসর্গ প্রথম দেখা দেয়। ১৯১৬ থেকে ১৯১৭—এই এক বছরে এই ধরণের রোগ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর মধ্যে মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছিল। ১৯১৬-১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তীব্র শীত পড়ে। ঐ সময়ে সেনাবাহিনীর ব্যারাকের প্রতিটি ঘরে সৈন্যেরা অসম্ভব গাদাগাদি করে থাকতো। কাজেই সে সময় এই রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়। অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের লোকেরা এই শ্রেণীর ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হয়ে থাকে। অতিরিক্ত পরিশ্রম, ক্লান্তি এবং অনুপযুক্ত আহার এই রোগের অন্যতম কারণ। তবে এই রোগের মূল কারণ নিউমোকক্কাস এবং হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা বীজাণুর আক্রমণ।

হঠাৎ এই রোগের আক্রমণ হয়। সর্দি-কাশি, গা-ব্যথা এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১০৪° ফাঃ জ্বর। কাশির বেগ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্টও বাড়তে থাকে। মুখ, ঠোঁট, কান নীলাভ হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। যদি চিকিৎসা না হয়, তাহলে রোগাক্রমণের দু-তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটবার সম্ভাবনা। এই ধরণের ব্রঙ্কাইটিস অত্যন্ত সংক্রামক। সে জন্যে রোগীকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে রাখা উচিত।

Mechanical—ধূলি মিশ্রিত বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করলে ব্রঙ্কাইটিস রোগ হতে পারে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কারখানাতে যারা সর্বদাই কার্বন, সিলিকন, লোহা, অ্যাস্‌বেষ্টস অথবা কেওলিনের সূক্ষ্ম অণু সমন্বিত বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তারা প্রায়ই ব্রঙ্কাইটিস রোগে ভুগে থাকে। তাদের ব্রঙ্কাইটিস রোগ ক্রমশঃ স্থায়ী হয়ে Chronic রূপ নেয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের (MnO_2) ধূলা, ফেরাস সিলিকেটের ($FeSiO_3$) ধূলা—এমন কি, কাঠের গুঁড়া থেকেও এই রোগ হয়ে থাকে।

Chemical—রসায়নাগারে উদ্ভূত অনেক গ্যাস থেকে ব্রঙ্কাইটিস রোগ উদ্ভূত হয়। ক্লোরিন, ইথার, ব্রোমিন ইত্যাদি গ্যাস নিয়ে যারা সর্বদা কাজ করে, তারা সহজেই ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত Mustard gas—যার রাসায়নিক নাম→$\beta\beta^1$-dichloro-diethyl

sulphide $[S(CH_2-CH_2Cl)_2]$ তৎকালে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। এই গ্যাস অত্যন্ত বিষাক্ত। চামড়া, চোখ এবং ব্রঙ্কাস—এই তিনটির উপর এর আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র।

এই শ্রেণীর ব্রঙ্কাইটিসের আক্রমণ ক্যাটার‍্যাল ব্রঙ্কাইটিসের মত। এর উপসর্গও অনেকটা এক। তবে এই রোগে বুকের ব্যথা খুব বেশী হয়। রোগী সর্বক্ষণ অস্বস্তি অনুভব করে। তাছাড়া কাশি প্রায় সব সময় থাকে।

এতক্ষণ Acute form নিয়ে আলোচনা করা হলো, এবারে Chronic form সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

ক্রনিক ধরণের ক্যাটার‍্যাল ব্রঙ্কাইটিস সাধারণতঃ ৩৪/৩৫ বছর বয়স থেকে ৫৫/৬০ বছর বয়স্ক লোকের হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর ব্রঙ্কাইটিস রোগ অনেক সময় বংশানুক্রমে চলতে থাকে। আর্দ্র জলবায়ুর এলাকায়, শহরের ধূলাবালি ভরা অঞ্চলে এই রোগ বেশী হয়। গ্রীষ্মের চেয়ে শীতের দিনে যে বেশী তীব্র হয়, তা বলাই বাহুল্য। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের রোগীরা সে জন্যে গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে। যাদের গেঁটে বাত, ক্রনিক নেফ্রাইটিস (কিড্‌নীর রোগ), সিফিলিস ও রক্তের রোগ আছে, তারা সহজেই ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

কাশি প্রায় সব সময়েই থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, এরা হাঁপানি বা পালমোনারি টিউবার-কিউলোসিস, অর্থাৎ সংক্ষেপে যক্ষ্মারোগেও আক্রান্ত হয়ে থাকে। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত রোগীকে যক্ষ্মা রোগের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কারণ যক্ষ্মা রোগের দরুণ কাশিও ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস রোগের কাশির মত। ব্রঙ্কাইটিসের কাশি ভেবে যক্ষ্মা রোগ উপেক্ষিত হয়ে থাকে। বিনা চিকিৎসায় হঠাৎ এক-দিন মারাত্মক অবস্থায় যক্ষ্মা রোগ আত্মপ্রকাশ করে।

ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এবং যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত রোগী, উভয়েই দিনের বেলায় ভাল থাকে, কিন্তু ভোরে আর রাত্রে প্রচণ্ড কাশির বেগে কষ্ট পেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে অল্প অল্প জ্বর হয়। শেষে এমন হয় যে, জ্বর হচ্ছে অথচ মালুম হচ্ছে না। একটু পরিশ্রমেই হাঁপ ধরে। আঙ্গুলের ডগা নীলাভ হয়ে যায়। মুখ হয় ফ্যাকাসে। ক্রমশঃই দেহ ক্ষয় হতে থাকে।

ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস একবার ভালভাবে বাসা বাঁধতে পারলে আর কথা নেই—ধীরে ধীরে ফুস্‌ফুস আক্রমণ করে তাতে ক্ষত উৎপন্ন করে দেয়। ফুস্‌ফুসের ক্ষমতা কমে গেলে হৃৎপিণ্ডও দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের রোগীরা অনেক সময় হার্টফেল করে মারা যায়।

চিকিৎসা করলে এই রোগ ভাল হয়—একথা নিশ্চিত। যদি না করা যায়, তাহলে অকাল মৃত্যু অনিবার্য। কারণ ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের রোগীদের আয়ুর পরিমাণ এমনিতেই কমে যায়।

ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের রোগীদের সামর্থ্য অনুসারে বছরের এক বিশেষ সময়, অর্থাৎ শীতকালে অন্ততঃ গরম জায়গায় কাটানো উচিত।

বৃষ্টি, কুয়াশা, ঠাণ্ডা—এই তিন তাদের কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত। যতক্ষণ সম্ভব খোলা আলো-হাওয়া পূর্ণ জায়গায় থাকা প্রয়োজন। ব্রঙ্কাসের ক্ষতিকারক গ্যাস বা ধূলা যে কারখানা বা কলে উৎপন্ন হয়, সে সব কারখানা বা রসায়নাগারে কাজ করা উচিত নয়।

পরিশ্রম কমিয়ে দেওয়া উচিত। আলো-বাতাস পূর্ণ বাড়ীতে হাল্‌কা কাজের চাকুরী করতে পারলে খুবই ভাল। এদের হাল্‌কা অথচ গরম পোষাক পরা উচিত। তাদের পক্ষে অতিরিক্ত আহার, মদ্যপান এবং অতিরিক্ত ধূমপান—সবই ক্ষতিকারক। শীতের দিনগুলিতে কড্‌লিভার অয়েল খেলে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

এতক্ষণ ধরে বিভিন্ন ধরণের ব্রঙ্কাইটিস রোগ ও তাদের উপসর্গ এবং সামান্য প্রতিষেধক সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। আমরা যেন কখনই মনে করি না যে, এই রোগ অতি তুচ্ছ। রোগ অবহেলিত হলেই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

[গত বিশেষ সংখ্যায় (রাজশেখর বসু সংখ্যা) প্রকাশের জন্য প্রাপ্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধের সবগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া আমরা একান্ত দুঃখিত। কাজেই সেই অপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলি একসঙ্গে এই সাধারণ সংখ্যায় প্রকাশ করা হইল।— স]

জারণ-বিজারণ (Redox) পলিমেরিজেসন

মুকুল বিশ্বাস

পলিমার বা হাই-পলিমার কথাটা আজকাল অনেক শোনা যাচ্ছে। যে পদ্ধতির দ্বারা একটা ছোট অণু থেকে একটা বিরাট অণু সৃষ্টি করা যায়, তাকেই বলা হয় পলিমেরিজেসন। ষ্টাইরিন বা মিথাইল মিথাক্রাইলেট প্রভৃতি কতকগুলি তরল রাসায়নিক পদার্থকে যদি একটা পাত্রে রেখে দেওয়া যায় অথবা তাপপ্রয়োগ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, ঐ তরল পদার্থ দুটি ধীরে ধীরে কঠিন পলিমারে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই এদের ধর্মগত বৈশিষ্ট্যেরও অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হবে। এই কয়েকটি অনুঘটকের সাহায্যে রূপান্তরকরণ আরো তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠিত হতে পারে। যে সব প্রাথমিক পদার্থ থেকে এই পলিমেরিজেসন করা যায় তাদের বলা হয় মনোমার (Monomer)। বাংলায় 'একক' বললে মনোমার কথাটাকে অনেকটা বোঝা যায়। ঠিক যেমন ছোট ছোট কামরা জুড়ে তৈরী হয়ে ওঠে একটা রেলগাড়ী, তেমনই শত সহস্র মনোমার অণু জুড়ে তৈরী হয়ে ওঠে একটা পলিমার। জোড়বার সময় মনোমারের কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হয় না, একই থাকে; তাই এরূপ পলিমেরিজেসনকে বলা হয় অ্যাডিসন পলিমেরিজেসন (Addition Polymerisation)। রাসায়নিক জগতে এই রাসায়নিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার অন্ত নেই। কৃত্রিম রাবার-শিল্প এবং বহু প্লাষ্টিক ও কৃত্রিম সুতা প্রস্তুতের কাজে এই পদ্ধতির প্রভূত ব্যবহার আছে।

শুধু তাপের প্রভাবেই যে পলিমেরিজেসন ঘটানো যায় তা নয়, অনুঘটকের (Catalyst) সাহায্যেও অধিকতর সুষ্ঠুভাবে পলিমেরিজেসন আরম্ভ করা যায়। একটা অনুঘটকের কার্য-ধারাকে এভাবে বোঝানো যায়:—চাপ দিলেই অনুঘটক ভেঙে গিয়ে ছোট ছোট অণুতে পরিণত হয়, যেগুলি আকৃতিগতভাবে পূর্ব অণুর সঙ্গে এক নাও হতে পারে। অধিকন্তু এদের কার্যক্ষমতাও অনেক বেশী। এই ধরণের অণু-গুলিকে বলা হয় মুক্ত র‍্যাডিক্যাল (Free radical)।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, যে অণু যত তাড়াতাড়ি বিয়োজিত হয়ে যাবে, সেটা তত তাড়াতাড়ি মুক্ত র‍্যাডিক্যাল দেবে ও পলিমেরিজেসন ঘটাবে। বেঞ্জোয়িল পেরোক্সাইড ও এ-আই-বি-এন সংক্ষেপিত নাম) প্রভৃতি কয়েকটি অনুঘটক আছে, যারা তাপের প্রভাবে সহজেই বিয়োজিত হয়ে যায় এবং র‍্যাডিক্যাল উৎপন্ন করে।

র‍্যাডিক্যাল উৎপন্ন করবার অন্যতম উল্লেখ-যোগ্য উপায় হচ্ছে, জারণ (oxidation) ও বিজারণ (reduction) পদ্ধতির ব্যবহার। এই পদ্ধতির মূল কথা হলো, যখন একটা জারণ ক্ষমতাসম্পন্ন যৌগ একটা বিজারণ ক্ষমতাসম্পন্ন যৌগের সঙ্গে সংযোজিত হয়, তখন প্রথমোক্ত

যৌগটি শেষোক্ত যৌগ থেকে ইলেকট্রন নিয়ে নেয় এবং তার ফলে ঐ দুটি পদার্থের আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে এবং অবশেষে কয়েকটি মুক্ত র‍্যাডিক্যাল তৈরী হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, ফেরাস সালফেট (বিজারক) ও জারক হাইড্রোজেন পারক্সাইড। ফেনটন্ নামে এক বৈজ্ঞানিক এই সমন্বয়টি আবিষ্কার করেন। হাবার ও উইলস্ট্যাটার এই বিশেষ সমন্বয়টি ছাড়াও অন্যান্য অনেক জারণ-বিজারণ সমন্বয় আবিষ্কার করেছেন।

জারণ বিজারণ পদ্ধতিতে পলিমেরিজেসন ঘটানোর অনেক সুবিধা আছে এবং এই পদ্ধতি প্রধানতঃ জার্মেনী, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় সমধিক ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতি ব্যবহারের বিশেষ সুবিধার মধ্যে অন্যতম হলো, খুব কম তাপের সাহায্যে পলিমেরিজেসন আরম্ভ করা যায় এবং পলিমেরিজেসনের গতি-বেগকেও ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যায়।

জারণ-বিজারণ পদ্ধতিতে পলিমেরিজেসন ঘটানোর প্রথম কৃতিত্ব কিন্তু বেকন সাহেবের। তার পূর্বে পলিমার-বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, শুধু জারণ-ক্ষমতাসম্পন্ন পদার্থগুলির দ্বারাই পলিমেরিজেসন আরম্ভ করা যায়। তার পরে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হলো বেকনের যুগান্তকারী কাজ—Reduction-activation। তিনি দেখলেন—শুধু জারণ-ক্ষমতাসম্পন্ন যৌগগুলিই যে পলিমেরিজেসন আরম্ভ করতে পারে, এমন নয়—তাদের সঙ্গে যদি বিজারণ-ক্ষমতাসম্পন্ন কয়েকটি যৌগ সংযোজিত করা যায়, তবে অতিদ্রুত র‍্যাডিক্যাল সৃষ্টি হবে। তার ফলে পলিমেরিজেসনও অতি দ্রুতগতিতে আরম্ভ হবে। জারণ-ক্ষমতাসম্পন্ন যৌগগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পটাসিয়াম পারসালফেট, হাইড্রোজেন পারক্সাইড প্রভৃতি। বিজারণ-ক্ষমতাসম্পন্ন পদার্থগুলির মধ্যে নাম করা যেতে পারে—ফেরাস সল্ট, হাইড্রাজিন, সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইট ইত্যাদির। বেকন আরো দেখলেন যে, এই সব সংযোজিত যৌগিক পদার্থগুলি কিন্তু জলের মাধ্যমে পলিমার তৈরীর পক্ষে অপরিহার্য। তাই এমন সব মনোমার নির্বাচন করতে হবে, যারা সহজেই জলে দ্রবীভূত হয়। অ্যাক্রাইলোনাইট্রাইল, মিথাইল অ্যাক্রাইলেট, মিথাইল মিথাক্রাইলেট প্রভৃতি মনোমার জলের মাধ্যমে জারণ-বিজারণ পলিমার প্রস্তুতিতে সক্ষম হয়। বেকন লক্ষ্য করেন, এভাবে প্রস্তুত পলিমারগুলি কিন্তু বাতাসের সংস্পর্শে ভিন্ন রকমে ব্যবহার করে। তবে বাতাসের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়ে সেই সময়, পলিমার যখন তৈরী হতে আরম্ভ করে। কারণ প্রথমে যে মুক্ত র‍্যাডিক্যালগুলি তৈরী হয়, সেগুলি বাতাসের সংস্পর্শে এলে বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই এসব পলিমেরিজেসন করতে হয় নাইট্রোজেনের পরিবেশে।

বেকন ছাড়া আরো অনেক বৈজ্ঞানিক এই জারণ-বিজারণ পলিমেরিজেসন সম্বন্ধে গবেষণা করে গেছেন। ইজন্স্ প্রভৃতি পলিমার-বিজ্ঞানীরা জলের মাধ্যমে পলিমেরিজসনের গতি-তথ্য (Kinetics) সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন। গবেষণালব্ধ তথ্যাবলীর সঙ্গে গতি তথ্যের সমন্বয় সাধনে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা এই কাজ করেছিলেন ১৯৪৬ সালে। তার পরে ১৯৫০-৬০ সালে জলের মাধ্যমে জারণ-বিজারণ পলিমেরিজেসন সম্বন্ধে অনেক কাজ হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের ডেণ্টন, আমেরিকার টমাস প্রভৃতি জলের মাধ্যমে অ্যাক্রাইলোনাইট্রাইল, মিথাইল মিথাক্রাইলেট প্রভৃতির পলিমেরিজেসনের গতি-তথ্য সম্বন্ধে অনেক কাজ করেছেন।

১৯৫৮-৬০ সালে কলকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণাগারে জারণ-বিজারণ পদ্ধতিতে

পলিমেরিজেসনের বিষয়টিতে নতুন ধরণের আলোকপাত হয়। পটাসিয়াম পারসালফেট ও সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইট জারণ-বিজারণ সমন্বয়টির সাহায্যে জলের মাধ্যমে অ্যাক্রাইলো-নাইট্রাইল, ভিনাইল অ্যাসিটেট, মিথাইল অ্যাক্রাইলেট ও মিথাইল মিথাক্রাইলেট প্রভৃতি মনোমারকে পলিমেরিজেসন করানো হয়। এদের গতি-তথ্যের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এমন কয়েকটি বিষয় আবিষ্কৃত হয়, যার উপর পূর্বেকার বিজ্ঞানীরা এত গুরুত্ব আরোপ করেন নি। দেখা গেল যে, জারক ও বিজারক দুটিকেই খুব অল্প পরিমাণে ব্যবহার করে যে পলিমার পাওয়া যায়, তা সাধারণতঃ জলের মাধ্যমে অদ্রবণীয় সূক্ষ্ম মিশ্রণ (fine colloid) হয়ে থাকে। এই মিশ্রণটির নিজস্ব স্থায়িত্ব থাকে, যেটা নির্ভর করে কতখানি মনোমার ও জারক-বিজারক নেওয়া হলো তার উপর। এটা প্রমাণিত হলো যে, এভাবে প্রস্তুত কলয়েড পলিমারের স্থায়িত্ব যত বেশী হবে, ততই প্রক্রিয়ার গতিবেগ বর্ধিত হবে। প্রথমে যদি জারক-বিজারকের পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়ানো যায়, তবে গতিবেগ বাড়তে থাকে; কারণ কলয়েড পলিমারটির স্থায়িত্ব বেড়ে যায়। কিন্তু অত্যধিক জারক-বিজারক ব্যবহার করলে কলয়েডটির স্থায়িত্ব কমে যায় ও শেষকালে দানা জমে যায়, অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভাষায় coagulation হয়। তখন আবার প্রক্রিয়ার সামগ্রিক গতিবেগটুকু কমে যায়। আবার আরো অধিক জারক-বিজারকের উপস্থিতিতে কিন্তু গতিবেগ আর একটু বাড়তে চায়। এর কারণ, মুক্ত র‍্যাডিক্যালগুলি পলিমার দানার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে। রসায়নের ভাষায় একে বলা হয়—'Trapping of free Radicals'। তার ফলে তাদের জীবনকাল বর্ধিত হয়ে যায়। উপরিউক্ত প্রত্যেকটি মনোমার কিন্তু প্রায় একই ভাবে ব্যবহার করে। স্মিথ ও এওয়ার্ডের একটা গাণিতিক মতবাদের উপর ভিত্তি করে উপরিউক্ত তথ্যাবলীকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে।

বিংশ শতকের জনজীবন বিজ্ঞানের আবিষ্কারের নিত্যনতুন বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাচ্ছে। পলিমেরিজেসন পদ্ধতিতে যে সব রাবার, রেজিন ও প্লাষ্টিক তৈরী হচ্ছে, তা দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃত্রিম রাবার শিল্পে এই জারণ-বিজারণ পলিমেরিজেসন একটা বিশেষ স্থান লাভ করেছে। ইমালসন পলিমেরিজেসন পদ্ধতিতে (Emulsion Polymerisation) কৃত্রিম রাবার তৈরী হয়। জারণ-বিজারণ প্রথায় প্রস্তুত রাবারের অনেক উন্নত গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া গেছে। সুতরাং শুধু ব্যক্তিগত গবেষণার ক্ষেত্রেই জারণ-বিজারণ পলিমেরিজেসন এক বিশেষ স্থান অধিকার করে নেই, মানুষের ব্যবহারিক জীবনেও তার অবদান কিছু কম নয়।

গ্রহ-তারকার আকৃতি ও ঘূর্ণন-বেগ

শ্রীনন্দলাল ঘোষ

ভূপৃষ্ঠের আকৃতি সম্বন্ধে এক সময়ে অনেক উদ্ভট ধারণা থাকলেও পরে প্রমাণিত হলো ভূপৃষ্ঠ প্রায় গোলাকার, তবে সম্পূর্ণ গোল নয়। এর সঠিক রূপটি বুঝতে হলে একটু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। পৃথিবী স্থির নয়, নিরন্তর চলমান। এর আছে বার্ষিক পরিক্রমা আর আহ্নিক ঘূর্ণন। আহ্নিকগতির অক্ষরেখা পৃথিবীর দেহ ফুঁড়ে যেতে বাধ্য এবং যে দুটি স্থানে এই অক্ষরেখা ভূপৃষ্ঠকে ছেদ করে, তাদের বলা হয় মেরু। এই উভয় মেরু সংযোগকারী কল্পিত সরল রেখাকে বলা চলে মেরুরেখা বা Polar axis। এমন একটি তল আছে, যা মেরুরেখার লম্ব ও পৃথিবীকে দুটি সমান ভাগে ভাগ করে। একে বলা হয় বিষুব-সমতল (Equatorial plane) বা নিরক্ষ-সমতল। এই সমতল ভূপৃষ্ঠকে যে মহাবৃত্তে (Great circle) ছেদ করে, সেটিই হচ্ছে বিষুবক্রান্তি বা নিরক্ষরেখা (Equator); পরন্তু ভূপৃষ্ঠ মেরুরেখার চতুষ্পার্শ্বে সমপ্রসারী (Symmetrical)। তাই ভূপৃষ্ঠকে বিষুব-সমতলের সমান্তরাল একটি স্তর দিয়ে ছেদ করলে পাওয়া যাবে একটি বৃত্ত, যার কেন্দ্র মেরুরেখায়.অবস্থিত। আবার মেরুরেখা সমন্বিত একটি সমতল দিয়ে ছেদ করলে পাওয়া যাবে একটি উপবৃত্ত বা ellipse, যার উপাক্ষ বা minor axis ঐ মেরুরেখার উপরে অবস্থিত। এর ফলেই ভূ-কেন্দ্র থেকে মেরুদেশের দূরত্ব বিষুব-ক্রান্তির দূরত্বের চেয়ে কিছু কম। তাই বলি, পৃথিবী 'প্রায় গোল' তবে মেরুদেশগুলি কিছু চাপা।

এই ধরণের (অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের মত আকৃতি-বিশিষ্ট) তল-কে আমরা বলি উপগোলক বা spheroid। আরও নির্দিষ্টভাবে বললে বলতে হয় oblate spheroid; অর্থাৎ 'চাপা উপ-গোলক'।

উপগোলক আরও এক রকমের হতে পারে, যার আকৃতি অনেকটা ঢোলকের মত; একে আমরা বলতে পারি prolate spheroid, অর্থাৎ 'টানা উপগোলক'।

আকাশচারীর আকৃতি ও ঘূর্ণন-বেগ

পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হবার পর পৃথিবীর আশেপাশে দ্যুলোকের আর যে সব বাসিন্দা আছে, তাদের সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল জাগ্রত হলো। চন্দ্র এবং সূর্যকে আমরা প্রত্যহই দেখতে পাই এবং এরা উভয়েই যে প্রায়-গোলাকার, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জ্যোতির্বিজ্ঞানীর গবেষণায় ধরা পড়লো, এরাও সামান্যভাবে চাপা উপগোলক এবং উভয়েই পৃথিবীর আহ্নিকগতির মত ঘূর্ণনশীল।

যে সব গ্রহ-উপগ্রহ ছোট্ট এক এক টুকরা আলোর মত জ্বল্‌জ্বল্‌ করে, দূরবীক্ষণে ধরা পড়লো, তাদেরও প্রসার কম নয়—অধিকাংশই পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। যেমন বৃহস্পতি আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে ১৩০০ গুণ বড় এবং এর মেরুদেশও পৃথিবীর মেরুদেশের চেয়ে অনেক বেশী চাপা।

দূরবীক্ষণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দ্যুলোকের অধিবাসীদের সম্বন্ধে আমরা আরও অনেক খবর পেয়েছি। এদের মধ্যে আছে সূর্যের

মত এবং সূর্যের চেয়ে আরও অনেক বড় অসংখ্য তারকা, Galaxy বা চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্র সমন্বিত আমাদের এই বিশ্ব এবং তারও বাইরে আছে, ঐ রকমেরই সংখ্যাহীন বিচিত্র জগৎ।

যে বিশ্বে (galaxy) আমরা বাস করি, সমগ্রভাবে দেখলে সেটা একটা খুব বড় চ্যাপ্টা বাতাসার মত; আর সেটিও স্বীয় অক্ষে ঘূর্ণনশীল। সূর্যমণ্ডল এর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নয় এবং এর বিভিন্ন অংশের আবর্তন-বেগও বিভিন্ন। এ-পর্যন্ত যা বোঝা যাচ্ছে, তাতে মনে হয়, সৃষ্ট জগতের ছোট এবং বড় প্রত্যেক অধিবাসীই ঘূর্ণনশীল।

প্রায় ১৮৬৪ সালে সূর্যকলঙ্ক নিরীক্ষণ করে ধরা পড়ে যে, ঘূর্ণ্যমান সূর্য ঠিক একটি কঠিন পদার্থের মত সমঘূর্ণন বেগসম্পন্ন নয়; বরং সূর্য-পৃষ্ঠের যে সব অংশ বিষুবক্রান্তির নিকটবর্তী, তাদের কৌণিক ঘূর্ণন-বেগ (angular velocity) মেরুসন্নিহিত অংশগুলির ঘূর্ণন বেগের চেয়ে বেশী। ফলে বিষুবক্রান্তির সন্নিহিত কোনও স্থানের পক্ষে অক্ষরেখাকে প্রদক্ষিণ করতে যে সময় লাগে, মেরুসন্নিহিত স্থানের পক্ষে তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগে। এই ঘটনাকে বলা হয় বিষুবত্বরণ বা বিষুব বেগবৃদ্ধি (Equatorial acceleration)।

আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন - বৃহস্পতি ও শনিপৃষ্ঠে বিষুবত্বরণের পরিচয় পাওয়া গেছে।

কারণ অনুসন্ধান

সার আইজাক নিউটন যখন বলবিদ্যার মূল সূত্রগুলি (Laws of Motion) বিধিবদ্ধ করে' জড়বস্তুর গতি-প্রকৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটনে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেন, তখন তাঁর মনে হলো, হয়তো বা জড়প্রকৃতি সম্বন্ধে এমন একটা মূল সত্য আছে, যা থেকে গ্রহাপুঞ্জের কেপ্‌লার আবিষ্কৃত সূর্য-পরিক্রমার নিয়মগুলি নিছক গাণিতিক সিদ্ধান্ত হিসাবে বেরিয়ে আসবে। এই চিন্তার ফলই আজ বিশ্বব্যাপী মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব (Universal law of Gravitation) নামে পরিচিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই আবিষ্কারের স্থান যে কত উচ্চে, সভ্যতার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে যাঁরা দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন, তাঁদের পক্ষেই তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। শুনেছি টয়েনবি নাকি তাঁর বিশ্ব-ইতিহাসে একে বিশেষ আমল দেন নি ভাবছি, দুর্ভাগ্যটা কার? নিউটনের না টয়েনবির ?

ব্যাপার হলো, মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধির এমন একটা সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিল, যাতে মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে, মানুষের হাতে একটা শক্তি এসেছে, যা জড়জগতের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহু তথ্যের ব্যাখ্যা ও আবিষ্কারে সক্ষম হবে। গ্রহ-তারকার বহিরাকৃতির গাণিতিক বিশ্লেষণ ও সমাধান এই প্রচেষ্টারই একটি অঙ্গ। গ্রহ-নক্ষত্রের পারস্পরিক দূরত্ব এত বেশী যে, যে কোনও গ্রহের আঙ্গিক গঠন মোটামুটি স্বকীয় আকর্ষণেই স্থিরীকৃত হয়। এই আকর্ষণের পরিমাণ ও প্রকৃতি আবার আকৃতির উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া ঘূর্ণন-বেগ ও ঘনত্বের স্তরবিন্যাসও এই বিষয়ে কার্যকরী হবে। কাজেই আকৃতি নির্ণয়ের সমস্যাটি অনেক কারণেই খুব জটিল।

সব কিছু জটিলতা বাদ দিয়ে সমস্যাটিকে সহজভাবে চিন্তা করে ১৭৩৪ সালে ম্যাকলাউরিস এর এক গাণিতিক সমাধান দেন। তাতে বোঝা গেল যে, যদি সর্বত্র সমঘনত্ব-বিশিষ্ট (homogeneous) একটি তরল বস্তু একটি স্থির অক্ষ রেখায় সমপ্রসারীভাবে (symmetrically) ঘূর্ণনশীল হয় এবং সে ঘূর্ণন-বেগ যদি সর্বত্র এক হয়, তাহলে স্বীয় মাধ্যাকর্ষণে তার পক্ষে একটি চাপা উপগোলকের রূপ নেওয়া সম্ভব। পরের ১০০ বছরে এর চেয়ে বেশী কিছু

তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। ১৮৪৪ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী ক্লেয়ারেণ্ট দেখালেন, ঘূর্ণন-বেগ যদি মোটামুটি প্রায় সর্বত্র এক থাকে, অর্থাৎ ঘূর্ণন-বেগের পরিবর্তন যদি সামান্যই হয়, তাহলে ঘনত্বের পরিমাণ কেন্দ্রের দিকে ক্রমশঃ বেশী হলেও ঐরূপ আকৃতি সম্ভব হতে পারে। এর পরবর্তী এক শত বছর এই বিষয়ে অনেক আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। Darwin, Paicare, Veronnet, Jeans, Milue প্রভৃতি মনীষীরা অনেক সময় অতিবাহিত করে কিছু কিছু সংবাদ আহরণ করেছেন বটে, কিন্তু মূল সমস্যা খুব বেশী দূর এগোয় নি।

একটি কথা অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, এই রকম স্বীয় অক্ষে ঘূর্ণায়মান বস্তুপিণ্ড সেই অক্ষের চতুষ্পার্শ্বে সমপ্রসারী হবে। আর সম্পূর্ণ সমঘন (homogeneous) না হলে সমঘনত্ব-বিশিষ্ট স্তরগুলিকেও সেই অক্ষের সমপ্রসারী হতে হবে। যদি ভরদেহে ঘনত্বের হঠাৎ পরিবর্তন কোথাও না থাকে, তবে সমঘনত্ব-বিশিষ্ট স্তরগুলিকে তল হিসাবেই ভাগ করা যাবে। আমরা ঐগুলিকে ঘন তল বা সমঘন তল বলবো।

এর পর ১৯৩০ সালে Pierre Duic নামে এক ফরাসী ছাত্রের গবেষণায় প্রমাণিত হলো যে, যদি সমঘনত্বের স্তরগুলি বহিরাকৃতির সদৃশ অথবা সমফোকাসীয় (similar or con-focal) চাপা উপগোলক হয়, তাহলেও আপন মাধ্যাকর্ষণে ঐ আকৃতি রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশের ঘূর্ণন-বেগের ক্ষমতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তবে ভরপৃষ্ঠে যে ঘূর্ণন-বেগ দেখা যাবে, তা যদি সর্বত্র সমান না হয়, তবে বিষুবক্রান্তির কাছে হবে কম, আর মেরুদেশের কাছে হবে বেশী; অর্থাৎ সূর্য-পৃষ্ঠে যে বিষুব-বেগের ত্বরণ দেখা যায়, তার ঠিক বিপরীত ব্যাপার ঘটবে।

১৯৪৪ সালে প্রবন্ধকার এই বিষয়ে কিছু গবেষণা করেন। তিনি প্রথমে উপরিউক্ত এই প্রকার ঘনতল-বিশিষ্ট এক-একটি পূর্ণ মডেল (Exact mathematical solution) গঠনে সক্ষম হন, যাতে ভরপৃষ্ঠের ঘূর্ণন-বেগ সম্পর্কে Dine-এর মত সমর্থিত হয়। পরে আরও ব্যাপক একটি সমাধান তৈরী করবার পরে ইনি দেখেন যে, যদি ঘন তলগুলি উল্লিখিত দুই প্রকারের না হয়ে ভরপৃষ্ঠের আকৃতির চেয়ে বেশী চ্যাপ্টা উপগোলক হয়, তাহলে ঐ ঘূর্ণায়মান ভরে বিষুব-বেগ ত্বরণ বা Equatorial acceleration পরিলক্ষিত হবে। পরন্তু যদি ঐ স্তরগুলি ভরপৃষ্ঠের সদৃশাকার অথবা ওর চেয়েও বেশী, 'টানা', অর্থাৎ prolate হয় তাহলে ঐ ভরে দেখা যাবে, বিষুব-বেগের ক্ষয় বা Equatorial retardation.

মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন

শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

যে কোনও বস্তু তাহার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা অন্য বস্তুকে আকৃষ্ট করে—একথা কাহারও অজানা নয়। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর নিম্নগামী হওয়া ও পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণ এই আকর্ষণের কারণেই ঘটিয়া থাকে। মাধ্যাকর্ষণ ছাড়া অন্য-প্রকার আকর্ষণের কথাও আমাদের জানা আছে, যেমন—বৈদ্যুতিক আকর্ষণ। অবশ্য অন্যান্য আরও আকর্ষণ আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাহাদের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। বৈদ্যুতিক আকর্ষণের নিয়ম সর্বজনবিদিত। দুই প্রকার বৈদ্যুতিক কণার কথা জানা আছে; যেমন—ধনাত্মক (positive) ও ঋণাত্মক (negative)। ধনাত্মক গুণবিশিষ্ট বৈদ্যুতিক পদার্থ ঋণাত্মক গুণবিশিষ্ট বস্তুকে আকর্ষণ করে। অনুরূপভাবে ঋণাত্মকও ধনাত্মককে আকর্ষণ করে। কিন্তু ঋণাত্মক ঋণাত্মককে এবং ধনাত্মক ধনাত্মককে বিকর্ষণ করে।

এই দুই প্রকার আকর্ষণের (বা বিকর্ষণের) ভিতর একটি ধর্ম বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। মাধ্যাকর্ষণে এক ভিন্ন দ্বিতীয় প্রকার কিছু নাই; অর্থাৎ ক, খ, গ তিনটি বস্তু-কণিকার কথা যদি চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে—ইহারা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে আকর্ষণ করে। বৈদ্যুতিক আকর্ষণের ক্ষেত্রে নিয়ম অন্য রকমের। ক যদি খ ও গ উভয়কে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে খ ও গ সমগোত্রীয়; অর্থাৎ ক ধনাত্মক হইলে খ ও গ উভয়েই ঋণাত্মক এবং ক ঋণাত্মক হইলে খ ও গ উভয়েই ধনাত্মক। সুতরাং খ ও গ পরস্পরকে বিকর্ষণ করিবে। আমরা এখন যে প্রশ্নের অবতারণা করিব, তাহার আলোচনার জন্য মাধ্যাকর্ষণ ও বৈদ্যুতিক আকর্ষণের এই তফাৎটুকু বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রশ্ন এই যে, মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপারে দুই প্রকার বস্তু নাই কেন? এই প্রশ্নের একটা মোটামুটি জবাব কিছু দিন পূর্বে 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচারে' দেওয়া হইয়াছে (বন্দ্যোপাধ্যায়—১৯৫৯)। কিন্তু এই মোটামুটি উত্তরের পরেও কয়েকটা সূক্ষ্ম প্রশ্ন থাকিয়া যায়। সেই প্রশ্নগুলির অবতারণা করা, তাহাদের উত্তর দেওয়া বা দিতে চেষ্টা করা এবং উত্তরের পরেও কয়েকটা প্রশ্নের অবতারণা করাই এই প্রবন্ধের মৌলিক অংশ।

প্রবন্ধটির সম্পূর্ণতার জন্য মৌলিক অংশ ছাড়াও কিছু পূর্বে প্রকাশিত কথার পুনরুক্তি ও জানা বিষয়ের অবতারণা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িয়াছে। এই প্রবন্ধের কতটা অংশ মৌলিক, তাহা যথাস্থানে স্পষ্টভাবে বলা আছে।

মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে বিপরীতধর্মী বস্তু না থাকিবার যে মোটামুটি কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে (বন্দ্যোপাধ্যায়—১৯৫৯), তাহার সারমর্ম এই :—

যদি মাধ্যাকর্ষণেও বিপরীতধর্মী বস্তু থাকিত, তাহা হইলে এই বিপরীতধর্মী বস্তুগুলি (এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে এই কাল্পনিক বস্তুগুলিকে আমরা 'বিপরীত' বস্তু বলিয়া অভিহিত করিব) পরস্পরকে আকর্ষণ করিত এবং 'সাধারণ' বস্তুকে, অর্থাৎ যে একই প্রকার বস্তু আমরা দেখিতে পাই, তাহাকে বিকর্ষণ করিত। সুতরাং বৈদ্যুতিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের নিয়মে সমগোত্রের বিদ্যুৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ ও বিপরীত গোত্রকে আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু

মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে 'বিপরীত' বস্তু (যদি থাকিত) ও 'সাধারণ' বস্তুর আকর্ষণ-বিকর্ষণের ধারাটা ভিন্ন প্রকৃতির (এখানে সমগোত্রের পরস্পর আকর্ষণ এবং ভিন্ন গোত্রের বিকর্ষণ দেখা যাইত) ধরা যায়, তাহা হইলে 'সাধারণ' বস্তুনিচয় পরস্পরের আকর্ষণে একত্রিত হইত এবং 'বিপরীত' বস্তুগুলিও ঐ একই কারণে একত্রিত হইত। অতঃপর 'সাধারণ' বস্তুর সমষ্টি ও 'বিপরীত' বস্তুর সমষ্টি পরস্পরকে ঠেলিয়া দুটিকে পরস্পর হইতে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিত। সুতরাং জগতের যে অংশে সাধারণ বস্তু দেখা যায়, সে অংশে 'বিপরীত' বস্তু আদৌ থাকিতে পারে না।

এইবার প্রশ্নটির সূক্ষ্মতর বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। প্রশ্নটি বলিবার পূর্বে একটি তথ্য স্মরণ করা প্রয়োজন। দুইটি বস্তু যদি পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে স্বভাবতঃই তাহারা যে অত্যন্ত নিকটে আসিয়া মিলিত হইবে, তাহা নহে। সূর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কোনও গ্রহই সূর্যের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িতেছে না—তাহারা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, ধূমকেতুগুলি সূর্যের আকর্ষণ সত্ত্বেও তাহার নিকটে (কখনও অত্যন্ত নিকটে) আসিয়া পুনরায় দূরে চলিয়া যায়। এই সকল ব্যাপারের কারণ দর্শাইতে চেষ্টা করিব না, যেহেতু প্রথমতঃ বিষয়টি খুব ভালভাবে জানা জিনিষ; দ্বিতীয়তঃ গাণিতিক সূক্ষ্ম যুক্তি ছাড়া এর প্রমাণ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। শুধু এটুকু বলা যায় যে, যাঁহারা বিজ্ঞানকে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বলিবার কাজে দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার কারণ দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। (রায়, ১৯২৫) যাহা হউক, এই তথ্য স্মরণ রাখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, 'বিপরীত' বস্তু না থাকিবার যে কারণটি কিছু পূর্বে দেওয়া হইল, তাহা আপাতদৃষ্টিতে ঠিক হইলেও ইহার সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর প্রশ্নের অবতারণা করা যাইতে পারে।• উপরিউক্ত তথ্যটি জানিবার পর যে প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়, তাহা এই যে, একটি সাধারণ বস্তুও তো ধূমকেতুর মত অন্য সাধারণ বস্তুসমূহ হইতে (তাহাদের আকর্ষণ সত্ত্বেও) দূরে চলিয়া গিয়া 'বিপরীত' বস্তুর সহিত মিলিত হইতে পারে। অপরপক্ষে ঐ একই কারণে একটি 'বিপরীত' বস্তুও তো সাধারণ বস্তুর নিকটে আসিতে পারে! তাহা হইলে 'বিপরীত' বস্তুর (যদি থাকে) আমাদের মধ্যে থাকা অসম্ভব কি?

এই প্রশ্নটি উত্থাপন ও তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনাই এই প্রবন্ধের মৌলিক অংশ।

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে আরও জানা তথ্যের কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। যদিও আকর্ষণের ফলে একটি বস্তু অন্য বস্তুকে প্রদক্ষিণ করিতে পারে অথবা ধূমকেতুর মত দূর হইতে নিকটে আসিয়া পুনরায় দূরে চলিয়া যাইতে পারে—এমন কি, ক্ষেত্রবিশেষে একটি অন্যটির সহিত মিলিত হইতেও পারে, কিন্তু বিকর্ষণের ফলে পরস্পরের গতি ধূমকেতুর মত হইবেই। দুইটি বস্তু, যাহারা পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, তাহারা কখনই একে অপরকে প্রদক্ষিণ করিতে পারে না অথবা একটি আসিয়া অন্যটির সহিত মিলিত হইতে পারে না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, সকল সাধারণ বস্তু যে একত্র থাকিবে তাহার স্থিরতা নাই বটে, কিন্তু সাধারণ বস্তুর নিকট 'বিপরীত' বস্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং আমরা যে আমাদের নিকট 'বিপরীত' বস্তু দেখি না, তাহার কারণ কতকটা বুঝিতে পারা গেল।

ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা যাউক, আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম এবং তাহা অপেক্ষা আরও কিছু অধিক সিদ্ধান্ত আমরা নির্ভুলভাবে করিতে পারি কিনা। উপরের যুক্তি হইতে শুধু এইটুকুই সিদ্ধান্ত করা যায় যে,

একটি মাত্র সাধারণ বস্তুর অতি নিকটে অন্য কোন 'বিপরীত' বস্তু স্থায়ী হইতে পারে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে 'সাধারণ' বস্তুটির কথা আমরা বলিতেছি, সেটি ভিন্ন অন্য 'সাধারণ' বস্তুগুলির বিকর্ষণ আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনিতেছি না। ইহা কি ঠিক? ইহা বিশেষ ক্ষেত্রে ঠিক, কিন্তু প্রমাণ-সাপেক্ষ। ইহা প্রমাণ করা শক্ত নয় যে, যে কোনও ভারী বস্তুর অতি নিকটে এমন স্থান আছে, যেখানে অন্যান্য সবকিছু (দূরস্থিত) বস্তুসমূহে সংযুক্ত অভিকর্ষ অপেক্ষা বস্তুটির নিজের অভিকর্ষের পরিমাপই অধিক। শুধু অধিক নহে, বস্তুটির যথেষ্ট নিকটে আসিয়া এই আধিক্যকে ইচ্ছামত বড় করা যায়। ইহা প্রমাণ করিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শূন্য স্থানে অন্যান্য বস্তুনিচয়ে সংযুক্ত অভিকর্ষের একটা সীমা আছে, অর্থাৎ যে কোনও বস্তুর নিকট এমন একটি সংখ্যা আছে, অন্যান্য বস্তুর সংযুক্ত অভিকর্ষ যাহা হইতে অধিক হইবে না। আবার বস্তুটির নিজের অভিকর্ষ তাহার যতদূর সম্ভব নিকটে আনিয়া (যদি বস্তুটির পরিধিতে ইহা সম্ভব হয়) যত বড় ইচ্ছা করা যায়, অর্থাৎ উক্ত সীমার যতগুণ ইচ্ছা বেশী করা যায়। সুতরাং নির্ভুলভাবে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি—**যে কোনও ভারী কিন্তু যথেষ্ট ক্ষুদ্র বস্তুর অতি নিকটে 'বিপরীত' বস্তুর স্থায়ী হওয়া সম্ভব নহে।**

এইবার আমরা আরও একটি প্রশ্নের অবতারণা করিব। এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না, কিন্তু এই সম্বন্ধে আমাদের অনুমানটুকু (অনুমানের কারণ না দেখাইয়া) বলিব মাত্র। প্রশ্নটি এই—একটি যথেষ্ট ক্ষুদ্র বস্তুর কাছে 'বিপরীত' বস্তু স্থায়ী হইতে পারে না বটে, কিন্তু একটা বস্তুসমষ্টির কাছে বা ভিতরে তাহার স্থায়ী হওয়া সম্ভব কি? প্রশ্নটা আরও একটু বিশদ করা প্রয়োজন। ক, খ; গ তিনটি সাধারণ বস্তু পরস্পর হইতে কিছুদূরে অবস্থিত। একটি 'বিপরীত' বস্তু 'ক'-এর বিকর্ষণে 'খ'-এর দিকে গেল—'খ'-এর নিকটে গিয়া তাহার বিকর্ষণে পথ পরিবর্তন করিয়া 'গ'-এর দিকে গেল এবং 'গ'-এর বিকর্ষণে পুনরায় 'ক'-এর দিকেই ফিরিয়া আসিল এবং ক্রমান্বয়ে এইরূপ গতিতে চলিতে থাকিল। আমাদের প্রশ্ন এই যে, এরূপ হওয়া সম্ভব কি? ইহার অনুমিত উত্তর খুব সম্ভব—না। এখানে 'খুব সম্ভব' কথাটি আমরা একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছি। বিশেষ অর্থটি এই যে—ক, খ, গ-এর যতপ্রকার অবস্থান সম্ভব, তাহার অধিকাংশ অবস্থাতেই ইহাদের সুযুক্ত বিকর্ষণ 'বিপরীত' বস্তুটিকে ইহাদের সকলের নিকট হইতেই দূরে সরাইয়া দিবে। ইহা অবশ্য আমাদের অনুমান মাত্র। পরন্তু ক, খ, গ-এর অবস্থান বা আরও অধিক বস্তুনিচয়ের অবস্থান এমন হইতে পারে যে, 'বিপরীত' বস্তু এই সমষ্টির ভিতরেই রহিয়া গেল।

আমাদের আলোচ্য বিষয় এখানেই শেষ হইল, তবে ইহার সহিত জড়িত দুই-একটা কথা বলা প্রয়োজন।

এই প্রবন্ধে আলোচিত মূল চিন্তাটি যদিও ১৯৫১ সন হইতে আমাদের মনে আছে, তথাপি ১৯৫৯ সনের পূর্বে এই সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হয় নাই। **ইতিমধ্যে সমধর্মীর আকর্ষণ ও বিপরীতধর্মীর বিকর্ষণ যে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে, এইটুকু** তথ্য (অন্যান্য কারণে—আমাদের প্রশ্নের বিচারে নহে) অন্য বৈজ্ঞানিকগণও ব্যবহার করিয়াছেন (যথা—ডাইসন, ১৯৫২)। তবে যে সূক্ষ্ম বিচারটুকুর অবতারণা এই প্রবন্ধে আছে, সেটা ওখানে (ডাইসন, ১৯৫২) নাই।

যদিও আমরা সমস্ত বিচারটা মহাকর্ষণের কথা মনে রাখিয়াই করিলাম, তথাপি যেখানেই

বিপরীত ধর্মীর মধ্যে বিকর্ষণ হইবে, সেখানেই অনুরূপ যুক্তি খাটিবে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ নানাপ্রকার নূতন ধরণের বস্তু-কণিকার (যথা—K-মেসন, Λ-পার্টিক্‌ল, অ্যাণ্টিপ্রোটন ইত্যাদি) আবিষ্কার ও নূতন ধরণের আকর্ষণ ইত্যাদির কথা আমরা জানিতে পারিতেছি (যথা—মিডিয়াম স্ট্রং ইন্টারয়্যাক্‌শন)। সুতরাং এই প্রকার চিন্তার একটা বিশেষ স্থান আছে। জগতে আমরা এমন অংশে আছি, যেখানে একটা বিশেষ প্রকার বস্তু-কণিকার প্রাধান্যের সম্ভাবনাও কোন কোন বৈজ্ঞানিক অনুমান করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, হয়তো বা অধুনা আবিষ্কৃত প্যারিটি ননকনজারভেসন এই প্রশ্নের সহিত যুক্ত। আমাদের প্রশ্নের সহিত হয়তো এই সকলের একটা যোগসূত্র আছে।

এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কিছু কিছু আলোচনার জন্য বন্ধুবর শ্রীসুধাংশু দত্ত মজুমদার মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

নির্ঘণ্ট

ডাইসন, এফ. জে, Divergence of Perturbation Theory in Quantum Electrodynamics. ফিসিক্যাল রিভিউ, ৮৫তম খণ্ড, ৬৩১ পৃষ্ঠা, ১৯৫২

বন্দ্যোপাধ্যায় গগনবিহারী, Why there are two kinds of charge but only one kind of mass. সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার, ২৫শ খণ্ড, ২২১ পৃষ্ঠা, ১৯৫৯

রায়, জগদানন্দ, গ্রহনক্ষত্র, ৩য় সংস্করণ, ১৮ পৃষ্ঠা ১৯২৫

Feronia Elephantum Corr-এর রাসায়নিক পরীক্ষা

ডি. পি. চক্রবর্তী

কদবেল গাছ ভারতীয় বনৌষধির অন্যতম। এই গাছের বিভিন্ন অংশ (১) ভেষজ গুণসম্পন্ন। ভারতীয় বনৌষধি থেকে কুমারিন গোষ্ঠীর যৌগিকের পরিক্রমার সময় এই গাছের পাতা, কাণ্ডের বাকল এবং কাঁচা ফলের রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে তার ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে। ইতিপূর্বে এই গাছের শিকড় থেকে গোবিন্দচারী (২) প্রমুখ রসায়নবিদেরা ফেরোনিয়া ল্যাকটোন নামক একটি কুমারিন পৃথক করেছেন। এই যৌগিকটি মাথসুনো (৩) কর্তৃক পৃথকীকৃত অরগেটিনের সঙ্গে অভিন্ন।

পাতা ও কাঁচা ফল থেকে ষ্টিগ্‌মাষ্টেরল পাওয়া গেছে (০.০১২%)। পাতার ষ্টিগ্‌মাষ্টেরল চর্বি-জাতীয় পদার্থের সঙ্গে সংলগ্ন ভাবেও পৃথক করা হয়েছে। পাতা থেকে বার্গাপটিন (০.০১%) এবং বাকল থেকে মারমেশিন (০.০১৬%) পৃথক করা হয়েছে। পাতার নিষ্কাশনের অ্যাসিড-দ্রবণীয় অংশে উপক্ষার আছে, কারণ তা ড্রাগের্ডফ বিকারকের সঙ্গে হলুদে অধঃক্ষেপ দেয়। তবে স্ফটিকাকারের কোনও উপক্ষার পৃথক করা সম্ভব হয় নি।

বাকল থেকে মারমেশিন পৃথকীকরণ

ফেরোনিয়া এলিফ্যাণ্টাম-এর শুক্‌নো বাকলের গুঁড়া (১২০০ গ্রাম) ঈথার নিষ্কাশনের পর

ঠাণ্ডায় রেখে দিলে হল্‌দে রঙের কঠিন পদার্থ জমা হয়। পদার্থের অ্যাসিড-অদ্রবণীয় অংশ থেকে বর্ণহীন স্ফটিকাকারের যৌগিক পদার্থ (২০০ মিলিগ্র্যাম, গলনাঙ্ক ১৮৯.৫°) ব্রকম্যানের অ্যালুমিনার স্তম্ভের উপর (৩০ × ১.৬ সেঃ মিঃ) ক্রোম্যাটোগ্রাফি করে আলাদা করা হলো। এই যৌগিক (প্রাপ্ত C ৬৭.৯, H ৫.৮% ; $C_{14}H_{14}O_4$-এর জন্যে প্রয়োজন C ৬৭.২, H ৫.৬৯%)। সুরাসার কষ্টিক পটাসের সঙ্গে বিক্রিয়ায় যৌগিকটি কুমারিনের নির্দিষ্ট হল্‌দে রং দিল। ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় মারমেশিনের (৪) মত হল্‌দে রং দিল। অতিবেগুনী শোষক বর্ণালীতে মারমেশিনের ন্যায় ২৩২ mμ (log t ৩.৯৬), ২৪৮ mμ (log t ৩.৫৫), ২৫০ mμ (log t ৩.৪৫), ৩৩৫ mμ (log t ৩.৪৫)-তে λ সর্বোচ্চ দেখায় (চক্রবর্তী, ডি. পি. এবং চক্রবর্তী, এস. কে. অপ্রকাশিত উপাত্ত)। এই যৌগিকের সঙ্গে বিশুদ্ধ মারমেশিন মিশিয়ে গলনাঙ্কের কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। ঊর্ধ্ব পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফির সাহায্যে (৫) যৌগিকটির সমসত্ত্বতা এবং মারমেশিনের সঙ্গে অভিন্নতা প্রমাণিত হয়েছে (অতিবেগুনী আলোতে ০.৬৬ Rf-বিশিষ্ট নীল প্রতিপ্রভ বিন্দু)।

পাতা থেকে ষ্টিগ্‌মাষ্টেরল পৃথকীকরণ

ফেরোনিয়া এলিফ্যান্টাম-এর শুকনো পাতার গুঁড়া (২০০ গ্র্যাম) পেট্রোলিয়াম ঈথার নিষ্কাশন ঠাণ্ডায় রেখে দিয়ে একটি কঠিন পদার্থ পাওয়া গেল। এই পদার্থের অ্যাসিড-অদ্রবণীয় অংশ ব্রকম্যানের অ্যালুমিনা স্তম্ভের উপর (২৩ × ১.৬ সেঃ মিঃ) ক্রোম্যাটোগ্রাফি করবার পর একটি চর্বিজাতীয় পদার্থ (গলনাঙ্ক ৮৫°—৯০°) এবং একটি স্ফটিকাকারের যৌগিক পদার্থ পৃথক করা হলো। এই দুটি উপাদানই লিবারম্যান-বুরসার্ড বিক্রিয়ায় গোলাপী-লাল্‌চে সবুজ রং দেয়। বার বার কেলাসনের পর ১৫৫° গলনাঙ্কের যৌগিক পদার্থ ১৬৮° ডিগ্রিতে গলে চলে গেল। এর অ্যাসিটেট ১৪৪° ডিগ্রিতে গলে গেল। বিশুদ্ধ ষ্টিগ্‌মাষ্টেরল অ্যাসিটেটের সঙ্গে মিশিয়েও উক্ত অ্যাসিটেটের গলনাঙ্কের পরিবর্তন হলো না। চর্বি-জাতীয় পদার্থের আর্দ্র বিশ্লেষণেও উক্ত ১৫৫° গলনাঙ্কের যৌগিক পদার্থ পাওয়া গেল।

পাতা থেকে বার্গাপটেন পৃথকীকরণ

পেট্রোল ঈথার দিয়ে নিষ্কাশনের পর পাতার যে অংশ রয়ে গেল, তাকে ঈথার দিয়ে নিষ্কাশনের পর একটি কঠিন পদার্থ পাওয়া গেল; এর অ্যাসিড-অদ্রবণীয় অংশ থেকে একটি কুমারিন পাওয়া গেল, যার গলনাঙ্ক ১৮৯° (২০ মিলি-গ্র্যাম)। এই যৌগিক পদার্থ (প্রাপ্ত C ৬৬.৬২, H ৪.০৩, $C_{12}H_8O_4$-এর জন্যে প্রয়োজন C ৬৬.৬, H ৩.৭০%)। উক্ত যৌগিকের অতিবেগুনী বর্ণালীতে ২২১ mμ (log t ৪.৩৯), ২৫১ mμ (log t ৪.২৪), ২৬০ mμ (log t ৪.২২), ২৬৩ mμ (log t ৪.১৮), ৩১৮ mμ log t ৪.১৬)-তে λ সর্বোচ্চ পাওয়া গেল। এটি বার্গাপটেনের সঙ্গে অভিন্ন (৬)। বিশুদ্ধ বার্গাপটিনের সঙ্গে মিশিয়ে এই যৌগিকের গলনাঙ্ক অপরিবর্তিত রইলো। ঊর্ধ্ব পেপার ক্রোম্যাটো-গ্রাফিক পদ্ধতির দ্বারা যৌগিকটির সমসত্ত্বতা এবং বার্গাপটেনের সঙ্গে অভিন্নতা প্রমাণিত হলো (অতিবেগুনী আলোতে ০.১৮ Rf-বিশিষ্ট হল্‌দে-নীল প্রতিপ্রভ বিন্দু)।

কাঁচা ফল থেকে ষ্টিগ্‌মাষ্টেরল পৃথকীকরণ

শুক্‌নো কাঁচা ফলের ঈথার নিষ্কাশিত অংশের অ্যাসিড অদ্রবণীয় ভাগ থেকে ক্রোম্যাটোগ্রাফিক পদ্ধতির সাহায্যে বর্ণহীন কেলাস পৃথক করা হলো। কয়েকবার মেথানল থেকে কেলাসনের

পর যৌগিকটি ১৬৮°-তে দ্রবীভূত হলো। এর অ্যাসিটেট (প্রাপ্ত C ৮১.৭২, H ১১.৪৮, C_{31} H_{50} O_2-এর জন্যে প্রয়োজন C ৮১.৯৪, H ১১.০১%) ১৪৪°-তে দ্রবীভূত হলো এবং বিশুদ্ধ ষ্টিগ্‌মাষ্টেরলের সঙ্গে মিশিয়েও একই বিন্দুতে দ্রবীভূত হলো।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা ডাঃ ডি. এম. বসু এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ পি. কে. বসু এই গবেষণায় লেখককে উৎসাহিত করেছেন। এজন্যে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ডাঃ আর এন চক্রবর্তী এবং ডাঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের নিকট লেখক বিশেষভাবে ঋণী; কারণ তাঁরা যথাক্রমে বিশুদ্ধ ষ্টিগ্‌মাস্টেরল অ্যাসিটেট এবং মারমেশিন দিয়ে সাহায্য করেছেন। শ্রীযুক্তা ছবি দত্তের বিশ্লেষণের কাজ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। এছাড়া, একটি জুনিয়ার ফেলোশিপের জন্যে লেখক ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস্ অব ইণ্ডিয়ার নিকট কৃতজ্ঞ।

(১) Kirtikar, K. R. and Basu, B. D.—Indian Medicinal Plants, Vol I (L. M. Basu, Allahabad), 1905, 49 p.

(২) Govindachari, T. R. Narasingham, N. S. & Thyagarajan, B. S., Ber. dtsch. Chem. Ges. 91 (1958) 34.

(৩) Kariyone, T and Matsano—T, Pharm. Bull (Japan), I (1956), 119.

(৪) Chatterjee, A and Mitra, S S. J.—Amer. Chem. Soc. 71 (1949), 606.

(৫) Chakraborty, D. P. and Bose, P. K; J.—Indian Chem. Soc., 33 (1955), 901.

(৬) Chatterjee, A and Choudhury, A.—Naturnissen Schafter, 19 (1955), 335.

সেণ্টেলা এশিয়াটিকা (লিন্) আরবান-এর রাসায়নিক অনুসন্ধান

সুনীলকুমার রায়, অসিতকুমার রায় ও সত্যেশচন্দ্র পাকড়াশী

বস্তু সত্তা:

সেণ্টেলা এশিয়াটিকা (ভারতীয় উৎস)-এর নির্যাসের প্রশমিত অংশ হইতে স্টিগ্‌মাস্টেরল পৃথক করা হইয়াছে।

প্রাচীন ভেষজশাস্ত্রে সেণ্টেলা এশিয়াটিকা[৪] বা থোলকুড়ির বহু ব্যাধিতে ব্যবহারের উল্লেখ আছে। চর্ম, ধমনী ও রক্তকণিকা সংক্রান্ত ব্যাধিতে, বিশেষ করিয়া কুষ্ঠরোগ ও ক্ষয়রোগে এই উদ্ভিদের ব্যবহার সুবিদিত ও পরীক্ষিত সত্য। ব্রাহ্মীশাকের ন্যায় থোলকুড়িও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির সহায়তা করে। সমগ্র উদ্ভিদটি, বিশেষ করিয়া ইহার পাতা ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পূর্বতন গবেষক (১-৩,৫) এই উদ্ভিদ হইতে জৈবক্ষার ও ট্রাইটারপিন গ্লাইকোসাইড্ পৃথক করিয়াছিলেন। বর্তমানে ইহার পুনরনুসন্ধান কালে পূর্বে অনুল্লিখিত স্টিগ্‌মাস্টেরল স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব হইয়াছে।

পরীক্ষণ

বিশুষ্ক ও চূর্ণীকৃত থোলকুড়ি (এক কিলোগ্রাম)-এর কোহল-নিষ্কাশন সম্পূর্ণরূপে দ্রবণমুক্ত করিয়া ইথারের সাহায্যে নিষ্কাশিত করা হইল। ইথার দ্রবণকে কষ্টিক পটাসের জলীয় দ্রবণের (১০%) দ্বারা ধৌত করিবার পর জলে ধৌত করিয়া অনার্দ্র সোডিয়াম সালফেট সহযোগে আর্দ্রতা মুক্ত করিয়া দ্রবণ-মুক্ত করা হইল। অতঃপর হরিৎবর্ণের কল্ককে বেঞ্জিনে দ্রবীভূত করিয়া ব্রকম্যান নির্ধারিত অ্যালুমিনা স্তম্ভে (১৮ × ১'৮ সেন্টিমিটার) ক্রোম্যাটোগ্রাফির সাহায্যে পরিশোধন করা হইল।

তালিকা-১

দ্রাবক	দ্রাবকাংশ ও দ্রাবকায়তন	কল্ক এবং গলনাঙ্ক
বেঞ্জিন	১-৫ (২০০ সিসি.)	হরিদ্রাভ তৈল-জাতীয় পদার্থ
ঐ	৬-১০ (১০০ সিসি)	ঐ
ঐ	১১ (২০ সিসি)	শূন্য
ক্লোরোফরম	১২-২০ (১৮০ সিসি)	হরিদ্রাভ কেলাসিত পদার্থ, ১৫০-১৬৫°
ঐ	২১ (২০ সিসি.)	শূন্য

মিশ্রিত দ্রাবকাংশ (১২-২০) পুনরায় অনুরূপ ভাবে পরিশোধন করিয়া যে শ্বেতবর্ণের পদার্থ পাওয়া গেল, উহাকে মিশ্রিত বেঞ্জিন ও মিথাইল-কোহল দ্রাবক হইতে কেলাসিত করা হইল। গলনাঙ্ক ১৬৯—৭০°, $[\alpha]_d = \pm$ ৫১৭°। এই কেলাসিত পদার্থ লিবারম্যান-বুরখার্ড নির্দেশিত রং-নির্দেশক পরীক্ষায় স্টেরল বলিয়া প্রতীয়মান হইল। বৈশ্লেষিক উপাত্ত হইতে ইহার আণবিক সঙ্কেত $C_{২৯}H_{৪৮}O$ নির্ধারিত হইল। যথারীতি ইহার অ্যাসিটেট প্রস্তুত করা হইয়াছে—গলণাঙ্ক ১৪১°। এই স্টেরল ও উহার অ্যাসিটেটের গলনাঙ্ক যথাক্রমে প্রামাণ্য স্টিগ্‌মাস্টেরল ও তাহার অ্যাসিটেটের সহিত মিশ্রণেও অপরিবর্তিত থাকায় ইহা নিশ্চিতরূপে স্টিগ্‌মাস্টেরলরূপে চিহ্নিত হইল।

গবেষণায় অর্থ সাহায্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য সংস্থা (ক্রমিক নং এচ্ ৪৩২০), গবেষণাগারের সুযোগদানের জন্য ডাঃ জে. সি. রায়., ডিরেক্টর, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট ফর বাইওকেমিষ্ট্রি অ্যাণ্ড এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন এবং মৌলিক বিশ্লেষণের জন্য ডাব্লিউ. এচ্. মান্‌সের গবেষকেরা ধন্যবাদার্হ।

প্রসঙ্গ সূত্র ঃ

(১) বাসু, এন্. কে. ও পি. পি. ল্যান্‌স্যাল, ফার্ম. ফার্মাকল্, **২০,** ১৩৫ (১৯৪৭)

(২) ভট্টাচার্য, এস. সি. ও বি. লাইথগো, নেচার **১৬৩,** ২৫৯ (১৯৪৯)

(ক) ভট্টাচার্য, এস. সি., জে. ইণ্ড্. কেম্, সক্., **৩৩,** ৮৯৩ (১৯৫৬)

(৩) বন্‌টেম্পস্, জে. ই., গেজ্. মেড্. ম্যাডাগ্যাস্কার, **৫,** ২৯ (১৯৪২)

(৪) চোপরা, আর. এন্., আই. সি. চোপ্‌রা, কে. এল্. হাণ্ডা ও এল্. ডি. কাপুর, ইণ্ডিজেনাস্ ড্রাগস্ অব ইণ্ডিয়া, ৩২৬ পৃঃ ৩৫২, (১৯৫৮)

(৫) গ্রাইসেস্, সি ও পি. বইট্যু, এইট্‌থ. অ্যান. রিপ. অব বট্. অ্যাণ্ড জ্যু., পার্ক অব ট্যামানারিড, ম্যাডাগাস্কার (১৯৪৭)

একটি আশু শীতকালীন ধানের জীবনে সংক্ষিপ্ত দিনের দৈর্ঘ্যের প্রভাব

তুষাররঞ্জন দত্ত ও নলিনীকান্ত চক্রবর্তী

সূচনা

উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন ক্রিয়ার সঙ্গে আলোকের বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। দিবাভাগের দৈর্ঘ্য অনেক গাছের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে থাকে। দ্রুত-ফলন[৩], প্রায় দ্রুত-ফলন[৪], বসন্তকালীন[১] প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের উত্তর প্রদেশের ধান; বিহারের বিভিন্ন জাতের ধান[৬], বাংলা দেশের বিভিন্ন জাতের ধান[৫] এবং উড়িষ্যার চার প্রকার শীতকালীন ধানের[২] উপর দিয়ে দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রভাব আলোচনা করে দেখা যায় যে, বিভিন্ন জাতের ধানে এর প্রভাব বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

বর্তমান ক্ষেত্রে একটি আশু শীতকালীন ধানকে তার বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরে দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে আলোকে উন্মুক্ত রেখে তার ফলাফল দেখা হয়েছে।

উপকরণ ও কার্য-প্রণালী

সম্বলপুর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে একটি আশু শীতকালীন ধানের অবিমিশ্র নমুনা (Pure strain T 1145) সংগ্রহ করা হয়। ১৯৫৫ সালের ২রা জুলাই সেগুলি থেকে একই প্রকারের কতকগুলি পরিপুষ্ট বীজ টবে বপন করা হয়। ১৬ই জুলাই চারাগুলিকে বীজতলা থেকে উঠিয়ে নিয়ে কতকগুলি টবে রোপন করা হয়। অবশ্য টবগুলি ইতিপূর্বে ৭ ভাগ গুঁড়ামাটি ও ৩ ভাগ গোবর সারের মিশ্রণ দিয়ে ভরতি করে রাখা হয়েছিল। কিছুদিন পরে প্রতি টবে মাত্র ৪টি হিসেবে গাছ রেখে বাকী গাছগুলি তুলে ফেলা হয় এবং প্রতি টবে ০'৫ গ্র্যাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে প্রয়োজন অনুযায়ী টবের মাটি নিড়িয়ে, আগাছা পরিষ্কার করে তাতে জল দেওয়া হতো।

পরীক্ষাধীন টবগুলি প্রতি সেটে ৬টি করে মোট ৬টি সেটে ভাগ করা হয়েছিল। এক সেট টবকে কণ্ট্রোল হিসেবে বাইরে এমন ভাবে রাখা হয়েছিল, যাতে গাছগুলি সারাদিন সূর্যালোক পেতে পারে। বাকী ৫ সেটের ১ম সেটকে চারাগুলি রোপনের ১০ দিনের পর থেকে দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে (সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা) সূর্যালোকে উন্মুক্ত রাখা হয়। এভাবে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম সেটকে, চারাগুলি রোপণের পর যথাক্রমে ২০, ৩০, ৪০ ও ৫০ দিন ধরে দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে সূর্যালোকে উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল। প্রত্যেক সেটের এরূপ সর্ট-ডে চিকিৎসা (দৈনিক ৮ ঘণ্টা সূর্যালোকে উন্মুক্ত রাখা) ৩০ দিনব্যাপী চালানো হয়। আর তাহাদের কণ্ট্রোল সেটের সঙ্গে একই স্থানে রাখা হয়, যাতে সবাই সমভাবে সাধারণ দিবালোক উপভোগ করতে পারে।

১ম তালিকা

বপন থেকে পুষ্প-বিকাশ পর্যন্ত সময় (১৬টি গাছের গড়)

পরীক্ষাধীন বিভিন্ন গাছ	মূল গাছ	প্রথম চারা (Tiller)	দ্বিতীয় চারা
কণ্ট্রোল	৯৯·৪০	১০২·১৬	১০৩·৫৩
৮ ঘণ্টা আলোক-প্রাপ্ত গাছ			
১ম সেট	৫৪·৬৩	৫৬·২৯	৫৭·০০
২য় সেট	৫৭·৬৯	৫৯·৪৩	৬০·২৫
৩য় সেট	৭১·০০	৭২·৪১	৭৪·০০
৪র্থ সেট	৭৮·৪১	৮০·৬২	৮১·৭৫
৫ম সেট	৮৫·০৫	৮৬·২৭	৮৬·৭৫

২য় তালিকা

বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরে চারার সংখ্যা ও গাছের দৈর্ঘ্য (১৬টি গাছের গড়)

পরীক্ষাধীন বিভিন্ন গাছ	১৬-৭-৫৫	৩১-৭-৫৫	১৪-৮-৫৫	২৯-৮-৫৫	১৩-৯-৫৫	২৮-৯-৫৫
			প্রতি গাছের চারার সংখ্যা			
কণ্ট্রোল	১·০০	৩·৯০	৪·৩১	৪·৩১	৪·৫০	৪·৫০
১ম সেট	১·০০	২·১৩	২·২০	২·৩০	২·৩০	২·৩০
২য় সেট	১·০০	৩·২৬	৪·৪৩	৬·৫০	৬·৫০	৬·৫০
৩য় সেট	১·০০	৩·৭৯	৪·৩১	৪·৩৬	৪·৫৬	৪·৫৬
৪র্থ সেট	১·০০	২·৯৩	২·৯১	৩·১০	৩·১০	৩·১০
৫ম সেট	১·০০	৩·৫১	৩·৯৭	৪·২২	৪·৫৬	৪·৫৬
			প্রতি গাছের দৈর্ঘ্য (সেন্টিমিটারে)			
কণ্ট্রোল	২৫·১২	৪৮·৭০	৫১·৮০	৫৫·৩০	৬৩·৩০	৬৮·৬০
১ম সেট	২১·৪৬	৫৪·৬০	৬২·৪০	৬৮·৯০	৭৯·৯০	—
২য় সেট	২১·৫৮	৪৯·২০	৫৭·৩০	৬৩·৩০	৮৯·২০	—
৩য় সেট	২০·৬৩	৪৭·৯০	৫৭·৫০	৬২·৮০	৬৭·৮০	—
৪র্থ সেট	২৩·৪৫	৪৭·৫০	৫১·৩০	৫৪·৫০	৬২·১০	৭৭·২০
৫ম সেট	২২·২৬	৪৮·১০	৫২·১০	৫৯·৬০	৬৭·০০	৭৮·৯০

৩য় তালিকা

মূল গাছের গর্ভপত্রের (flag-leaf) দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ (১৬টি গাছের গড়)

পরীক্ষাধীন বিভিন্ন গাছ	দৈর্ঘ্য (সেন্টিমিটারে)	প্রস্থ (সেন্টিমিটারে)
কণ্ট্রোল	১৭·৩০	০·৬৫
১ম সেট	২৫·৮০	১·১৭
২য় সেট	২০·১৯	০·৭৮
৩য় সেট	১৯·৯০	০·৭২
৪র্থ সেট	২৩·১৪	০·৯৭
৫ম সেট	১৯·৮০	০·৭০

৪র্থ তালিকা

প্রতি গাছে ফলনের পরিমাণ (১৬টি গাছের গড়)

পরীক্ষাধীন বিভিন্ন গাছ	ফলনের পরিমাণ (গ্র্যামে)
কণ্ট্রোল	১·৭৯
১ম সেট	০·২১
২য় সেট	০·৪৩
৩য় সেট	০·২৬
৪র্থ সেট	০·৩০
৫ম সেট	১·৭০

৫ম তালিকা

ফলনের উপাদান (১৬টি গাছের গড়)

পরীক্ষাধীন বিভিন্ন গাছ	প্রতি গাছে পেনিকেলের সংখ্যা	প্রতি পেনিকেলে স্পাইকলেটের সংখ্যা	প্রতি পেনিকেলে শস্যের সংখ্যা	প্রতি পেনিকেলে শস্যের শতকরা হার	১০০০ শস্যের ওজন (গ্র্যামে)
কণ্ট্রোল	৮·০০	৭১·৯১	৪৮·১৬	৬৬ ৯৭	১৮·৫০
১ম সেট	৭·০০	২৭·৯০	৮·৮৮	৩১·৭১	১৪ ৭০
২য় সেট	৮·২১	৬৩ ৮৮	১৫·০০	৩৬·৬৩	১৩·৭১
৩য় সেট	১০·২১	৩৪ ৮৬	১৫·১০	৪৩·৩৪	৬·৭০
৪র্থ সেট	৭·০০	৪১·৭০	২২·৬০	৫৩ ৯৫	৭·৭৫
৫ম সেট	১১·২৫	৫৯ ২৯	৩২·৯১	৫৫·৫০	১৭·৬৫

পরীক্ষার ফল

পুষ্প-বিকাশের সময় :—১ম তালিকায় ধানের বপন থেকে পুষ্প-বিকাশ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। এই তালিকা থেকে দেখা যায় যে, স্বল্পালোকিত গাছে পুষ্প-বিকাশের সময় কণ্ট্রোল গাছ অপেক্ষা অনেক কম। ১ম সেটে, অর্থাৎ দশদিন বয়সে স্বল্পালোকপ্রাপ্ত গাছে এই সময় সবচেয়ে কম। ২য়, ৩য় ইত্যাদি সেটে এই সময় ক্রমশঃ দীর্ঘায়িত হয়েছে। অঙ্গসাংস্থানিক পরিবর্তন :—১ম ও ৪র্থ সেটের গাছে টিলারের সংখ্যা কম, কিন্তু ২য়-৩য় সেটে তা অপেক্ষাকৃত বেশী। (তালিকা ২) স্বল্পালোকিত গাছগুলি সাধারণতঃ কণ্ট্রোল গাছ অপেক্ষা দীর্ঘতর। গর্ভপত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থও কণ্ট্রোলের গাছ অপেক্ষা অন্যান্য গাছে বেশী এবং প্রথম সেটের গাছেই এই সংখ্যা সর্বাধিক (তালিকা ৩)।

ফলন

স্বল্পালোকিত গাছে ফলনের পরিমাণ খুবই কম এবং প্রথম সেটের গাছে এই সংখ্যা সর্বাপেক্ষা নিম্নতম (তালিকা ৪)।

ফলনের উপাদান

স্বল্পালোকিত গাছে পেনিকেলের পরিমাণ কম, বিশেষ করে ১ম ও ৪র্থ সেটের গাছে। প্রতি পেনিকেলে স্পাইকলেটের সংখ্যা এবং শস্যের সংখ্যাও কণ্ট্রোল গাছের তুলনায় অন্যান্য গাছে কম এবং ১ম সেটের গাছে এই সংখ্যা সবচেয়ে

কম, প্রতি পেনিকেলে শস্যের শতকরা হার কণ্ট্রোল গাছেই সবচেয়ে বেশী। তৃতীয় ও চতুর্থ সেটের গাছের শস্যের ওজন অন্যান্য সেটের গাছ থেকে কম (তালিকা ৫)।

আলোচনা

পরীক্ষায় প্রাপ্ত বিভিন্ন ফল থেকে পরীক্ষাধীন ধানের (T1145) উদ্ভিজ্জ বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেছে। স্বল্পালোকিত সব গাছেই পুষ্প-বিকাশের সময় ত্বরান্বিত হয়েছে এবং যে গাছ যত কম বয়সে স্বল্পালোক পেয়েছে, তার পুষ্প-বিকাশও হয়েছে তত তাড়াতাড়ি। গাছের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দীর্ঘায়িত হয়েছে। স্বল্পালোকিত গাছ কণ্ট্রোল গাছের তুলনায় দীর্ঘতর এবং তাদের পাতা বেশী চওড়া; তবে পুষ্প-বিকাশ ত্বরান্বিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের ফলনের পরিমাণ কমে যায়।

সংক্ষিপ্ত সার

একটি আশু শীতকালীন ধানের জীবনে (T 1145) দৈনিক ৮ ঘণ্টা আলোর প্রভাবে উদ্ভিজ্জ বৃদ্ধি ও ফসলের উপাদানে যে পরিবর্তন হয়, তা দেখান হয়েছে। যে সব গাছ সবচেয়ে অল্প বয়সে দৈনিক ৮ ঘণ্টা আলো পেয়েছে, তাতে পুষ্প-বিকাশও হয়েছে সর্বাগ্রে। স্বল্পালোকিত গাছ কণ্ট্রোল গাছের তুলনায় দীর্ঘতর এবং এদের পাতাও বেশী চওড়া, তবে এতে ফলনের পরিমাণ খুব কম।

Summary

The effect of 8-hour short photo-period was studied on the vegetative growth and yield characters of an early winter variety of rice, T1145. Earliness of flowering was more pronounced in seedlings which received the short days at their youngest age. Plants treated with short days were Taller with large sized leaves, low grain settings, lesser number of spikelets and grains per panicle compared with the controls.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমাদের গবেষণা কার্যের পরিচালক কটকের র‍্যাভেন-স কলেজের উদ্ভিদ-বিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ গদাধর মিশ্রের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রমাণ পঞ্জী

১। মিশ্র, জি. (১৯৫৪-এ) বুল. টরি. বট. ক্লাব ৮১, ৩২৩-৩২৮ পৃঃ।

২। ——— (১৯৫৪-বি) প্রসি. ইন্ডি. অ্যাকাড. সাইন্স. ৪০, ১৭৩-১৮২ পৃঃ।

৩। ——— (১৯৫৫-এ) নিউ. ফাইটল. ৫৪, ২৯-৩৮ পৃঃ।

৪। ——— (১৯৫৫-বি) প্রসি. বট. ইন্‌ষ্ট. সাইন্স. ইণ্ডিয়া. ২১, ১৯ পৃঃ।

৫। সরকার, এস. এম. (১৯৪৮) লট সংখ্যা ১, ১২১-১২৮ পৃঃ।

৬। সারণ, এ. বি. (১৯৪৫) জা. ইণ্ডিয়ান. বট. সো:, ২৪, ১৫৩-১৬১ পৃঃ।

তত্ত্বীয় তাপ-গতিবিদ্যায় সম্ভাবনা বণ্টন

শ্রীমহাদেব দত্ত

তাপ-গতিবিদ্যার সমস্যাগুলির নানাভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সাধারণতঃ পরিচিত বস্তুর তাপ-গতীয় ধর্ম ব্যাখ্যা করিতে বস্তুকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের (অণু, পরমাণু, ঢেউ) সমষ্টি হিসাবে ধরা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এক লিটার বায়বীয় পদার্থে (বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপ ও শূন্য ডিগ্রি উষ্ণতায়) $6\cdot06\times10^{23}$ অণু থাকে। সুতরাং সাধারণ তাপ-গতিবিদ্যার সাহায্যে এরূপ বস্তুর আলোচনা করিতে হইলে প্রায় $6\cdot06\times10^{23}\times6$টি সমীকরণের সমাধান করিতে হইবে। কার্যতঃ ইহা অসম্ভব। উপরন্তু আলোচ্য বস্তুর অণু-পরমাণুগুলির সঠিক প্রারম্ভিক অবস্থা জানা না থাকায় সমীকরণগুলির সম্পূর্ণ সঠিক সমাধান করিয়া বস্তুটির সঠিক অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। এই তাপ-গতিবিদ্যার তত্ত্বীয় আলোচনায় গতি-বিদ্যার ধারণা ও পদ্ধতির সহিত সাংখ্যায়নিক যুক্তি ও গণনা ব্যবহার করা হয়। পূর্বের সকল আলোচনায় গতিবিদ্যার ধারণাগুলি ভিত্তি হিসাবে লওয়া হয়। কতকগুলি চ্যুতি-মাপক প্রক্রিয়ায় দেখা যায়, গড় ধর্ম হইতে চ্যুতি, বস্তুর একটি মূল ধর্ম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 1925 সালে প্রখ্যাত জার্মান পদার্থবিদ্ সিলার্ড[1] বস্তুর গড় ধর্ম ও উহা হইতে চ্যুতি উভয়েরই মূল বস্তুধর্ম ধরিয়া লইয়া তাপ-গতিবিদ্যার একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সকল বিবেচনায় সম্পূর্ণ সাংখ্যায়নিক দিক হইতে তাপ-গতিবিদ্যার আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

কয়েকটি প্রবন্ধে[2] সম্পূর্ণ সাংখ্যায়নিক দিক হইতে গতিবিদ্যার কয়েকটি মূল সমস্যার আলোচনা করিয়া সাধারণ পরিচিত নিয়ম ও সূত্রগুলি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল আলোচনার সুরুতেই আলোচ্য বস্তুর বিভিন্ন অবস্থাগুলির সম্ভাবনা-বণ্টনের একটি রূপ ধরিয়া লওয়া হয়। পরে সম্পূর্ণ সাংখ্যায়নিক গণনা হইতে সাধারণ নিয়মগুলি প্রতিপন্ন করা হয়। সম্পূর্ণ সাংখ্যায়নিক দিক হইতে জেয়নেস[3] ও রাম-কৃষ্ণন[4] এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

অবগতি-বিদ্যায়[5] প্রত্যেক সম্ভাব্যঘটনা সমুচ্চয়ের সহিত অনিশ্চয়তা-মাপক ব্যবহার করা হয় এবং তাহাকে 'এনট্রপি' বলে। সংজ্ঞানুযায়ী এই এনট্রপিকে নিম্নরূপে লেখা হয়—

$$H=-\Sigma p(A)\log p(A)\ldots\ldots(1)$$

এখানে A একটি সম্ভাব্য ঘটনা এবং p (A) ঐ A ঘটনাটি ঘটিবার সম্ভাবনা। Σ-এর দ্বারা সমস্ত ঘটনাগুলির জন্য p(A)-এর যোগ সূচিত হইতেছে। তবে যদি ঘটনা-সমুচ্চয়টি নিরবচ্ছিন্ন হয়, তবে সাধারণ যোগের স্থানে সমাকলন লইতে হইবে। সাংখ্যায়নিক পদার্থ-বিদ্যায় বোল্টজ্‌ম্যানের H-উপপাদ্যের উপর ভিত্তি করিয়া আলোচনা করিতে এনট্রপি যে রূপ গ্রহণ করে, (1) সূত্র তাহারই অনুরূপ। p(A) যে রূপের জন্য এনট্রপি[1] চরম হইবে, তাহাকেই অবগতি-বিদ্যায় p(A)-এর প্রকৃত রূপ বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

এই প্রবন্ধে অবগতি-বিদ্যার উপরিউক্ত প্রণালীতে তাপগতি-বিদ্যার সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনা-বণ্টন নির্ণীত হইবে। এইভাবে পূর্বে নির্ণীত সম্ভাবনা-বণ্টনের[1] মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

আলোচ্য বস্তুর বিবরণ

আলোচ্য বস্তুটি নির্দিষ্ট পারিপার্শ্বিকে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত কিছু পরিমাণ জড় ও শক্তি। যেহেতু বস্তুটির পারিপার্শ্বিকের সহিত জড় ও শক্তির বিনিময় হইতে পারে এবং সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া হইতে জানা আছে যে, ঐ বস্তুর জড় ও শক্তির পরিমাণ চ্যুতিবিশিষ্ট রাশি, সেহেতু এই পরিমাণ দুইটি সম্ভব চল। এখানে এই সম্ভব চলগুলির সম্ভাবনা-বণ্টন নির্ণয় করা আমাদের এই আলোচনার লক্ষ্য।

আলোচ্য বস্তুটিতে জড় ও শক্তির সংস্থান নানাভাবে হইতে পারে। এক-এক বস্তুকে এক-এক অবস্থা বলিয়া ধরা হইবে। বস্তুটির জড় ও শক্তির পরিমাণ বিভিন্ন হইলে বস্তুটির অবস্থা অবশ্যই ভিন্ন হইবে। কিন্তু বস্তুটির জড় ও শক্তির পরিমাণ এক হইলেও বিভিন্ন রূপে সংস্থানের জন্য উহার অবস্থা ভিন্ন হইবে।

সম্ভাবনা-বণ্টন নিরূপণ

অবগতি-বিদ্যার ন্যায় এখানেও ধরা হইবে যে, প্রকৃত সম্ভাবনা-বণ্টনের জন্য H চরম হইবে, অর্থাৎ

$$H = -\Sigma p(A_{E,M}) \log p(A_{E,M}) \rightarrow \text{চরম} \qquad (2)$$

$A_{E,M}$ বস্তুর একটি অবস্থা, যখন জড় ও শক্তির পরিমাণ E ও M

যেহেতু $p(A_{E,M})$, একটি সম্ভাবনা

সেহেতু $\Sigma p(A_{E,M}) = 1 \qquad (3)$

আমাদের প্রকাশ অনুযায়ী

$$\Sigma M p(A_{E,M}) = \bar{M} = M_o \qquad (4)$$

$$\Sigma E p(A_{E,M}) = \bar{E} = E_o \qquad (5)$$

E_o, M_o প্রত্যক্ষলব্ধ জড় ও শক্তির পরিমাণ। ইহাদের গড়ের সহিত সমান করিয়া লওয়া হইয়াছে।

সাধারণ ভেদের নিয়মানুসারে

$$\Sigma \delta p(A_{E,M}) [\log p(A_{E,M}) + 1] = 0$$

$$\Sigma \delta p(A_{E,M}) = 0$$

$$\Sigma M \delta p(A_{E,M}) = 0$$

$$\Sigma E \delta p(A_{E,M}) = 0$$

উপরিউক্ত ভেদে E_o, M_o-কে ধ্রুবক হিসাবে লওয়া হইয়াছে। লাগ্রাঞ্জের নিয়মানুসারে ইহা হইতে পাওয়া যাইবে

$$p(A_{E,M}) = Kt^M z^E$$

এখানে K একটি ধ্রুবক t ও z বণ্টক-নির্দেশক সংখ্যা। (3) নং সম্বন্ধ ব্যবহার করিলে পাওয়া যাইবে—

$$p(A_{E,M}) = \frac{t^M z^E}{\Sigma t^M z^E} = \frac{t^M z^E}{F(t,z)} \ldots\ldots \quad (6)$$

(4) ও (5) সম্বন্ধ হইতে যথানিয়মে পাওয়া যাইবে—

$$M_o = t\frac{d}{dt}\{\log \log F(t,z)\} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (7)$$

$$E_o = z\frac{d}{dt}\{\log F(t,z)\} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (8)$$

এইভাবে পূর্বে প্রাপ্ত (1) সমস্ত মৌলিক সম্বন্ধ পাওয়া যাইবে।

মন্তব্য—সাধারণ ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, যদি বর্তমান প্রণালী ও পূর্বের প্রণালীতে একই সম্বন্ধ পাওয়া যায়, তবে উহাদের নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ ?

প্রমাণ পঞ্জী

(1) Szilard, L (1925): Z. f. Phys **32**, S. 753

(2) Dutta, M (1953) : Proc. Nat. Inst. of Sc. Ind., **19**, p. 109. (1945) Proc. Nat. Inst. of Sc. Ind., **21**, p. 373.

(1959) Studies in Theoretical Phys. Proc. Summer School of T. P, Part 2, p. 313

(3) Jaynes E, T. (1957), Phys. Rev. **106**, p. 602, 1957, Phys. Rev. **108**, p. 171

(4) Ramakrishnan Alladi (1955): Handbuch d. Phys. ch. III /2/. p. 540

Goldman, S (1953). Information Theory, Prentical Hall Inc. N. Y.

Khinchin, A. I (1957): Mathematical Foundation of Information Theory, Dover Publication, N. Y.

বিশেষ পরিভাষা

Dynamics—গতিবিদ্যা।
Thermod-ynamics—তাপ-গতিবিদ্যা
Statistics—সাংখ্যায়ন
Fluctuation—চ্যুতি
Probability—সম্ভাবতা
Information Theory—অবগতি-বিদ্যা
Form—রূপ
Statistical Physics—সাংখ্যায়নিক পদার্থ-বিদ্যা
Distribution—বণ্টন।

তীব্র ইলেক্‌ট্রোলাইট

শ্রীসুবোধনাথ বাগচী

সংজ্ঞা:

শর্করাজাতীয় বস্তুকে জলে দ্রবীভূত করলে দেখা যায় যে, এই দ্রবণের মাধ্যমে তড়িৎ পরিচালনা করা কষ্টকর। এরূপ বস্তুকে আমরা নন-ইলেকট্রোলাইট বলবো। অপর পক্ষে, লবণজাতীয় বস্তুকে জলে গুলে দিলে যে লবণাক্ত জল তৈরী হয়, তা সহজেই তড়িৎ পরিবহন করে এবং তড়িৎ পরিচালনার ফলে লবণের অণুকণাগুলি ভেঙ্গে গিয়ে দুটি ইলেকট্রোডে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নের সৃষ্টি হয়। এই জাতীয় বস্তুকে ইলেক্‌ট্রোলাইট সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

ইলেক্‌ট্রোলাইট ও নন-ইলেক্‌ট্রোলাইট

উপরিউক্ত উদাহরণে শর্করা বা লবণজাতীয় বস্তুকে দ্রাব্য (Solute), জলীয় মাধ্যমকে দ্রাবক (Solvent) এবং এই দুটির মিশ্রণে যে বস্তুর সৃষ্টি হয়, তাকে দ্রব (Solution) বলা হয়। মিশ্রণ যদি এমন সম্পূর্ণ হয় যে, দ্রবকে মাত্র একটি বস্তু বলে ভ্রম জন্মে, তাহলে তাকে বলা হয় সম-দ্রব (homogeneous solution), নচেৎ বিষম-দ্রব (heterogeneous solution) বলা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য- দ্রাব্য, দ্রাবক ও দ্রব—প্রত্যেকটিই কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়, যে কোন অবস্থাতেই থাকতে পারে।

দ্রাব্য, দ্রাবক ও দ্রব

ইলেক্‌ট্রোলাইটগুলিকে মোটামুটি দু-ভাবে ভাগ করা যায়। এক জাতীয় বস্তু, যেগুলি স্বল্প (তড়িৎ) পরিবাহী, সেগুলি হলো ক্ষীণ ইলেক্‌ট্রোলাইট, অপর জাতীয় বস্তুকে তীব্র ইলেক্‌ট্রোলাইট বলা হয়। ক্ষীণ ইলেক্‌ট্রোলাইটের ধর্মগুলিকে Arrhenius এবং Ostwald-এর তত্ত্বের

ক্ষীণ ও তীব্র ইলেক্‌ট্রোলাইট

সাহায্যে বেশ বোঝা যায়; কিন্তু তীব্র ইলেক্‌ট্রোলাইটের প্রায় সব ধর্মই বেশ ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। কারণ, উপরিউক্ত মূল তত্ত্ব দুটির সাহায্যে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এই জাতীয় পদার্থের ধর্ম বহুদিন ধরে একটা হেঁয়ালী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকেই অনেকের ধারণা হয় যে, তীব্র ইলেক্‌ট্রোলাইটের দ্রবে অণুকণাগুলি স্বাভাবিক অবস্থাতেই সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে গিয়ে আয়নে পরিণত হয়।

মূল সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন প্রচেষ্টা

র‍্যাণ্টগেনরশ্মির দ্বারা লবণজাতীয় পদার্থের গঠন বিশ্লেষণ করে W. H. এবং তাঁর পুত্র W. L Bragg দেখান যে, এসব পদার্থ কঠিন অবস্থাতেও আয়নরূপে অবস্থান করে। সুতরাং পূর্বের অনুমান Bragg-এর গবেষণার পর সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন প্রশ্ন ওঠে, তবে দ্রবকে পাত্‌লা করলে তার বিশেষ কতকগুলি ধর্মের তফাৎ হবে কেন?

দ্রবের বিশুদ্ধ গুণাবলী দেখা যায়, যখন বস্তুকণাগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করে না। এদের তাপজনিত গতিবেগের ফলস্বরূপ আমরা পাই, আদর্শ দ্রবের ধর্মগুলি। কিন্তু তীব্র ইলেক্‌ট্রোলাইটে তড়িতের আকর্ষণের জন্যে আয়নগুলি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়, পরস্পরকে দূরে সরিয়ে নিতে হলে কিছু শক্তি ব্যয় করা প্রয়োজন।

1912 সালে S. R. Milner সর্বপ্রথম এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। তিনি সুপরিচিত Virial প্রকল্পের সাহায্যে দ্রবের বিভব (potential) অঙ্ক কষে বের করতে চেষ্টা করেন। আয়নের মধ্যে শুধু Coulomb বলের প্রভাব ধরা হয়। সমবতন (Polarisation) বা অন্য কোনরূপ অতি সীমিত (short range) বলের প্রভাবকে হিসাবে ধরা হয় নি এবং দ্রাবককে বিশেষ প্রকারের অণুকণার সমষ্টি মনে না করে, তাকে একটা অবিচ্ছিন্ন মাধ্যম কল্পনা করা হয়, যার একটা বিশেষ ডায়েলেক্‌ট্রিক (dielectric) ধ্রুবক D আছে। এমন কি, আয়নের সান্নিধ্যে যে ডায়েলেক্‌ট্রিক ধ্রুবক বদ্‌লে যায়, তাও হিসাবে ধরা হয় না। Milner সমস্যাটাকে প্রথম সঠিকভাবে ছকে ফেলেছিলেন, কিন্তু গাণিতিক দুরূহতাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। সুতরাং তাঁর গবেষণা প্রকৃতপক্ষে বিশেষ কোন সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা যায় নি। তবুও তাঁর গবেষণার মূল্য সর্বজন স্বীকৃত।

তারপর 1918 সালে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এক অভিনব সরল উপায়ে এই দ্রবের বিভব অঙ্ক কষে বের করতে সচেষ্ট হন। ঘোষের মতে—শুধু সেই সব আয়নই তড়িৎ-পরিবাহী হবে, যাদের বেগ এত বেশী যে, তারা পরস্পরের বৈদ্যুতিক Coulomb আকর্ষণী শক্তিকে পরাভূত করতে পারে। এসব অতিচঞ্চল আয়নের সংখ্যা Maxwell-Boltzmann পরিসংখ্যানের সাহায্যে সহজেই গণনা করা যায়। মুক্ত আয়নের সংখ্যা তাহলে দাঁড়াবে

$$nNe^{-\frac{A}{nRT}}$$

N = অণুর সংখ্যা; n = একটা অণু থেকে যতগুলি আয়ন পাওয়া যায়, তার সংখ্যা।

$A = (\frac{1}{2} m v_0^2)$ = বিভব শক্তি।

m = আয়নের ভর।

v_0 = আয়নের সর্বনিম্ন গতি, যা বৈদ্যুতিক আকর্ষণী শক্তিকে পরাভূত করবার পক্ষে যথেষ্ট।

R = বিখ্যাত গ্যাসের ধ্রুবক = 1·987 ক্যালরী/ডিগ্রী/মোল।

T = নিরপেক্ষ (Absolute) তাপমাত্রা।

Ohm-এর নিয়ম এখানে প্রযোজ্য; সুতরাং আমরা বিদ্যুৎ-পরিবাহী শক্তি (Conducti-

vity) থেকে বিভব বের করতে পারি। যথা,

$$\frac{\mu_v}{\mu_\infty} = e^{-A/nRT}$$

অথবা,

$$A = nRT \ln \frac{\mu_\infty}{\mu_v}$$

μ_∞ = সমতুল বিদ্যুৎ-পরিবাহী শক্তি (equivalent conductivity), যখন দ্রবের আয়তন (volume) অসীম ; (সুতরাং এই অবস্থায় আয়নগুলি পরস্পরকে কোনরূপ আকর্ষণী শক্তির দ্বারা প্রভাবিত করতে সক্ষম থাকে না।)

μ_v = ঐ, যখন দ্রবের আয়তন v।

এখন যদি ধরি যে, কেলাসিত অবস্থায় আয়নগুলি যে ভাবে সাজানো থাকে, দ্রবের মধ্যেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে সহজেই আমরা দুটি আয়নের মধ্যে গড় দূরত্ব বের করতে পারবো। যথা : KCl-এর মত কিউবিক (cubic) 1 – 1 ইলেক্‌ট্রোলাইটের বেলায় আমরা পাব :

$$r = \sqrt[3]{v/2N}$$

সুতরাং,

$$A = \frac{\epsilon^2}{Dr} = \frac{N\epsilon^2 \sqrt[3]{2N}}{D\sqrt[3]{v}}$$

$\pm\ \epsilon$ = আয়নের তড়িতের পরিমাণ।

এ-থেকে প্রমাণ করা যায় যে, তড়িৎ-পরিবাহী শক্তি সম্পৃক্ততার (concentration) তৃতীয় বর্গমূলের অনুপাতে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। ঘোষের তত্ত্ব প্রথমে সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ; যদিও Kohlrausch-এর বর্গমূলের নিয়ম এ-থেকে পাওয়া যায় নি। 1924 সালে Debye এবং Hückel তাঁদের তত্ত্ব উত্থাপন করেন যার থেকে Kohlrausch-এর নিয়ম এবং তীব্র ইলেক্‌ট্রোলাইটের অনেক ধর্মের মূলনীতি সম্পর্কে আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং ঐ সময় থেকে অন্যান্য তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। Milner-এর পথে না গিয়ে Debye ঘোষকেই অনুসরণ করেন। তবে বিভব বের করবার জন্যে তিনি ঘোষের ত্রুটিপূর্ণ পন্থা না নিয়ে এক চমৎকার অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেন।

Debye-এর মতে, যেহেতু আয়নগুলি তড়িৎযুক্ত, সেহেতু যে কোন সময়ে একটি ধনাত্মক আয়নের চতুর্দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব যে, তার পরিবেশে একটা ঋণাত্মক তড়িতের মেঘ তৈরী হয়েছে, যার ঘনত্ব ধীরে ধীরে কমে কিছুদূরে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। ঋণাত্মক কেন্দ্রের বেলায় পরিবেশে থাকবে ধনাত্মক তড়িতের আধিক্য।

ধরা যাক, আমরা একটি ধনাত্মক আয়নকে কেন্দ্রে রেখেছি, যার তড়িতের পরিমাণ ϵ^+। Boltzmann পরিসংখ্যানের সাহায্যে r দূরত্বে কতকগুলি ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন থাকবে তা আমরা জানতে পারি। দ্রবের বিভব যদি $\Psi(r)$ হয়, তবে

$$\overset{+}{n}_r\, dv = n_0 e^{-\epsilon_+\Psi/kT} dv = n_0 e^{-\epsilon\Psi/kT} dv$$

$$\overset{-}{n}_r\, dv = n_0 e^{\epsilon_-/kT} dv = n_0 e^{+\epsilon/kT} dv$$

$\overset{+}{n}_r, \overset{-}{n}_r$ = কেন্দ্রে থেকে r দূরে dv আয়তনের মধ্যে ধনাত্মক (+)ও ঋণাত্মক (–) আয়নের সংখ্যা

n_0 = ঐ, কেন্দ্র থেকে অসীম দূরে

$\epsilon_\pm = \pm\epsilon$ = আয়নের তড়িতের পরিমাণ

k = Boltzmann ধ্রুবক = $1{\cdot}380 \times 10^{-16}$ আর্গ / ডিগ্রী

তা হলে, কেন্দ্র থেকে r দূরে তড়িতের ঘনত্ব হবে—

$$\rho = -2n\epsilon dv \sinh \frac{\epsilon\Psi}{kT}$$

এ থেকে Poisson-এর সমীকরণ

$$\Delta\Psi - \frac{4\pi}{D}\rho$$

ব্যবহার করে আমরা বিভব বের করতে পারি

এবং এই Ψ থেকে দ্রবের প্রযোজ্য শক্তি (Free energy) সুতরাং, তাপগতীয় অন্যান্য গুণাবলীও পাওয়া যাবে।

এখন প্রধান অসুবিধা হলো যে, ঐ সমীকরণের সঠিক সমাধান জানা নেই, সুতরাং যে সমন্বয় আমরা পাই, তার ফলাফল বাস্তব ক্ষেত্রে প্রায় প্রযোজ্য নয় বলা চলে। তবে অতি-মাত্রায় পাতলা দ্রবের বেলায় দেখা যায় যে, Debye-এর তত্ত্ব প্রযোজ্য। উপরন্তু Debye-এর কল্পনা (assumption), যথা—একটি আয়নের বিশেষ পরিবেশ আছে, যার তড়িতমান বিপরীত-ধর্মী, তার সত্যতা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে; অথচ তবুও Debye-এর তত্ত্ব বাস্তব ক্ষেত্রে একেবারেই খাটে না কেন? গত ৩০ বছর ধরে এই নিয়ে পণ্ডিতেরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পান নি।

সমাধান:

প্রথমে ভেবে দেখা যেতে পারে যে, কি কি কারণে Debye-এর তত্ত্ব কাজে লাগানো যায় না। Debye-এর কল্পনা যে ঠিক বাস্তবমুখী তা বলা যায় না, তবে গড়ের কথা ধরলে এরূপ পরিবেশের অবস্থিত খুবই সম্ভব। Fowler, Kirkwood প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, Debye-এর তত্ত্ব 'গড়-তত্ত্ব' হিসেবে গ্রহণ করলে মূলনীতিগতভাবে বিশেষ কোন বাধা থাকে না এবং তখন দ্রবে Poisson-সমীকরণ ব্যবহার করা যায়।

মূল সমস্যার সমাধান

গাঢ় দ্রবে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা আয়নের সান্নিধ্যে dielectric ধ্রুবকের পরিবর্তনের দ্বারাও বোঝা যায় না; আর আমরা আয়নের সন্নিহিত dielectric ধ্রুবক যে কি, তাও সঠিক জানি না।

সব কিছু বিচার করে দেখলে এ-কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তীব্র ইলেক্ট্রোলাইটের দ্রবে Boltzmann-পরিসংখ্যান ব্যবহার করা উচিত নয়। আমরা জানি যে, আণবিক বা পারমাণবিক পর্যায়ে হয় বসু-পরিসংখ্যান নতুবা ফের্মি-পরিসংখ্যান কার্যকরী।

যদিও এরূপ দ্রব কোয়াণ্টাম তত্ত্বের সীমায় আসে না, তবুও চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে যে, ইলেকট্রনের বেলায় প্রযোজ্য ফের্মি-পরিসংখ্যান এখানে প্রয়োগ করলে কেমন হয়! কিন্তু এতেও বাধা আছে। ফের্মি-পরিসংখ্যান Boltzmann-পরিসংখ্যানের ন্যায় শুধু বিভব শক্তি নিয়ে লেখা চলে না। অতএব প্রথম প্রচেষ্টায় ফের্মি-পরিসংখ্যানের অনুরূপ একটা পরিসংখ্যান, যথা—

$$n_r^+ = \frac{A_+}{B_+ e^{\epsilon\Psi/kT} + 1}$$

$$n_r^- = \frac{A_-}{B_- e^{-\epsilon\Psi/kT} + 1}$$

($A_\pm$, $B_\pm$: ধ্রুবক, যা জানতে হবে।)

ধরে নিয়ে ফলাফল কিরূপ হয়, দেখা যেতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, Debye-এর তত্ত্বে Boltzmnn পরিসংখ্যানের পরিবর্তে শুধু উপরের পরিসংখ্যান ব্যবহার করলেই বিভিন্ন বাস্তব ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করা যায়। সুতরাং এ-থেকে স্বভাবতঃই একথা মনে হয় যে, উপরিউক্ত পরিসংখ্যান আপাতদৃষ্টিতে যদিও একটা ভিত্তিহীন কল্পনা (hypothesis) মনে হবে, তবুও এর মূলে নিশ্চয়ই সত্য নিহিত আছে এবং আয়নের যথার্থ পরিসংখ্যান ঠিক ঐরূপ না হলেও ঐ রকমেরই একটা কিছু হবে। সুখের বিষয় এই যে, অনতিবিলম্বে দেখা যায় যে, ঐরূপ পরিসংখ্যান ধরে নেবার প্রয়োজন নেই। যদি আমরা ভাবি যে, আয়নগুলির একটা বিশেষ বিশেষ আয়তন আছে এবং একটি খোপের ভিতর মাত্র একটি আয়নই স্থান পেতে পারে—তাহলে

অঙ্ক কষে 'পরিসংখ্যান বলবিদ্যা'র (Statistical mechanics) সাহায্যে এটা দেখানো যায় যে, দ্রবের ভিতর আয়নের পরিসংখ্যান এমন হবে, যাকে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রকাশ করা যায়—

$$n_r^{+}(1+n_r^{-}b_{+-}) = \frac{1/b_+}{B_+e^{\epsilon\Psi/kT}+1}$$

$$n_r^{-}(+n_r^{+}b_{+-}) = \frac{1/b_-}{B_-e^{-\epsilon\Psi/kT}+1}$$

b_+, b_-, b_{+-} : যথাক্রমে দুটি ঋণাত্মক, দুটি ধনাত্মক এবং একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক আয়নের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে প্রতিটি আয়ন বাস্তবে যেটুকু পরিবেশের স্থান একেলা অধিকার করে তার পরিমাপ (volume of exclusion)। এটা সহজেই দেখানো যায় যে, পাতলা দ্রবে এই পরিসংখ্যান Boltzmann-পরিসংখ্যানেই দাঁড়ায়। এই নতুন পরিসংখ্যান গত ৫/৭ বছরে পৃথিবীর বহু বিজ্ঞানীর দ্বারা তীব্র ইলেক্‌ট্রোলাইটের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজিত হয়েছে এবং সান্দ্রতা (viscosity) ব্যতীত প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তত্ত্ব ও পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ভিতর আশাতীত সঙ্গতি পাওয়া যায়, যা কিছুদিন পূর্বে বিজ্ঞানীরা কল্পনাও করতে পারেন নি।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বলা যেতে পারে যে, তীব্র ইলেক্‌ট্রোলাইটের মূল তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন যে অসঙ্গতি রয়েছে, তা নিশ্চয়ই গৌণ এবং এর কারণ এই যে, আমরা সমবর্তন ও অতি সীমিত বলকে উপেক্ষা করেছি। আরও একটা ব্যাপার আমরা উপেক্ষা করেছি—যথা, দ্রাবককে একটা অবিচ্ছিন্ন মাধ্যম হিসেবে কল্পনা করেছি। দ্রাবকের প্রতি অণুকণার বিশেষ ধর্ম বিশেষতঃ আয়নের অতি সান্নিধ্যে তাদের যে পরিবর্তন হয়, তার প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি নি। তা সত্ত্বেও আমরা আজ নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, উপরিউক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রভাব গৌণ এবং তীব্র ইলেক্‌ট্রোলাইটের বহু ধর্মের ব্যাখ্যায় এদের উপেক্ষা করলে তেমন ক্ষতি হয় না; তবে সান্দ্রতার বেলায় খুব সম্ভব এদের প্রভাব গ্রাহ্য করতে হবে। এরূপ অবস্থায়, উপরন্তু দ্রাবকের অণুকণা, দ্রাবক এবং দ্রাব্যের অণু-পরিবেশের বিস্তৃত ও সঠিক (quantitative) আইন-কানুন জানা প্রয়োজন।

এই নতুন তত্ত্বের প্রয়োগে প্রধান বাধা হলো এই যে, এ-থেকে যে সমীকরণ পাওয়া যায়, আমরা তার সমাধান করতে পারি না।* এই সমীকরণের যথাযথ সমাধান করতে পারলে আমরা তীব্র ইলেক্‌ট্রোলাইট সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারবো। যা পড়ে থাকবে, তা অনেকাংশেই গৌণ এবং তা সমাধানের জন্যে যে সঠিক (quantitative) আইন-কানুনের জ্ঞান প্রয়োজন, তা আজও আমাদের আয়ত্তে আসে নি।

তবে একথা বলা যেতে পারে যে, গত ৭৫ বছর ধরে তীব্র ইলেক্‌ট্রোলাইটের প্রধান সমস্যাগুলি যেরূপ একটা বিরাট হেঁয়ালী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার একটা সুষ্ঠু সমাধান হয়েছে। অবশ্য উপরিউক্ত নির্দেশ মত একে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে হবে। কিন্তু মোদ্দা কথাটা যে ধরা পড়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই দীর্ঘদিন স্থায়ী একটা বিরাট সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় বিশ্বের বহু বিজ্ঞানীর সাধনা রয়েছে; তবে সুখের বিষয় এই যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দানও এতে কম নয়! শেষোক্ত তত্ত্বের উদ্ভব হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে এবং বর্তমানে এই তত্ত্বানুযায়ী পৃথিবীতে সর্বত্রই কাজ হচ্ছে এবং বিশেষ সাফল্য লাভও করা গেছে।

* সম্প্রতি এই সমীকরণের একটা সুষ্ঠু সমাধান পাওয়া গেছে, যার বিশ্লেষণে বিজ্ঞান কলেজের কয়েকজন কর্মী এখন পর্যন্ত ব্যস্ত আছেন।

বর্ন বিচ্ছুরণ-সূত্রের প্রথম আসন্ন-মান সম্পর্কে

(On the first approximation of Born scattering formula)

পরিমলকান্তি ঘোষ

এখানে আমরা অক্ষমূলে ($r=0$) অবস্থিত একটি বিচ্ছুরক কেন্দ্রের দ্বারা একটি সমান্তরাল কণিকা-স্রোতের বিচ্ছুরণ সম্পর্কে আলোচনা করিব। মনে করা যাউক যে, এস্থলে একটী কণিকার বিভব $V(r)$। এই আলোচনার জন্য আমাদিগকে নিম্নলিখিত তরঙ্গ-সমীকরণের সমাধান করিতে হইবে :—

$$\nabla^2\psi+[k^2-U(r)]\psi=0 \qquad (1)$$

এখানে $k^2=8\pi^2 mE/h^2$, $U(r)=8\pi m\times V(r)/h^2$, $m=$একটি কণিকার ভর, $E=$উহার গতীয় তেজ (K.E.) এবং $h=$প্লাংকের ধ্রুবক। এই ক্ষেত্রে বিচ্ছুরক হইতে বহুদূরে তরঙ্গ-ফাংশনের রূপ হইবে—

$$\psi\sim e^{ikz}+\ e^{ikz}f(\theta) \qquad (2)$$

অর্থাৎ বিচ্ছুরক হইতে বহুদূরে ψ আপতিত তরঙ্গ e^{ikz} এবং $e^{ikr}f(\theta)$—এই দুইয়ের উপপাতন হইবে।

তরঙ্গ-ফাংশন ψ নিম্নলিখিত সমাকলনিক সম্পর্ক (integral relation) অনুসরণ করে—

$$\psi\sim e^{ikz}-\frac{e^{ikr}}{4\pi r}\int\exp[-ik(\mathbf{n}.\mathbf{r}')]\times U(r')\psi(r')d\tau' \qquad (3)$$

এখানে n r এর দিক্ অনুসারী একক লম্ব :

$$\mathbf{n}=(\sin\theta\cos\phi,\ \sin\theta\sin\phi,\ \cos\theta)\ \text{।}\ (4)$$

$f(\theta)$-এর প্রথম আসন্ন-মান বাহির করিবার জন্য আমরা মনে করি যে, আপতিত তরঙ্গটি বিচ্ছুরক দ্বারা অত্যধিক বিচ্ছুরিত হয় নাই। এখন আমরা সমীকরণ (3) এর দক্ষিণ পক্ষে $\psi(r')$ স্থলে অবিচলিত তরঙ্গ-ফাংশন e^{ikz} বসাইতে পারি। কেবল মাত্র দ্রুতগামী কণিকার পক্ষে এই আসন্ন-মান নির্ণয় বৈধ। এইরূপে (2) এবং (3) সংখ্যক সমীকরণ হইতে আমরা পাই

$$f(\theta)=-\frac{1}{4\pi}\int\exp[ik(\mathbf{n}_0-\mathbf{n}).\mathbf{r}]\times U(r)\ d\tau\ ; \qquad (5)$$

এখানে $\mathbf{n}_0$ z-অক্ষের দিক-অনুসারী একক ভেক্টর।

সমীকরণ (5)-এর দক্ষিণ পক্ষ অন্যরূপেও লেখা যাইতে পারে যথা :—

$$-\frac{1}{4\pi}\int\exp\ [-2\pi i\ \mathbf{q}.\mathbf{r}\ ]\ U(r)d\tau\ ;\ (6)$$

এখানে $2\pi q=k(\mathbf{n}-\mathbf{n}_0)$। সে জন্য $2\pi q=k|\mathbf{n}-\mathbf{n}_0|=4\pi\ \sin\frac{1}{2}\theta/\lambda$; λ যে কোন একটি কণিকার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য : $\lambda=h/mv$, $\lambda=2\pi/k$, $v=$ কণিকার গতিবেগ।

এখন

$$\int\exp[-2\pi i\ \mathbf{q}.\mathbf{r}]U(r)d\tau$$

এই সমাকলিতটি (integral) $U(r)$-এর ফুরিয়ে রূপান্তর (Fourier transformation), $\mathbf{F}(Ur)$। এখানে $\mathbf{F}U(r)$কে অর্থ দিবার জন্য শোয়ার্তস্-এর ডিষ্ট্রিবিউশন তত্ত্বের (Schwartz's theory of distributions) বা সামান্যীকৃত ফাংশন তত্ত্বের (Theory of generalized functions) অবতারণা প্রয়োজন। কুলোঁক্ষেত্রের (Coulomb field) মত সাধারণ ক্ষেত্রেও এই

$\mathbf{F}U(r)$-এর সাধারণতঃ চলিত মতে কোন সঙ্গত অর্থ করা যায় না। ভেন্‌ত্‌জেল (Wentzel) এবং বেতে (Bethe) অতিরিক্ত ভৌত কল্পনার (Physical hypothesis) সাহায্যে উহার অর্থ করেন। অবশ্য লেখক অন্য একটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, ঐরূপ কোন কল্পনা না করিয়াই সম্পূর্ণ গাণিতিক ভাবে অপসারী সমাকলিতের তত্ত্ব (Theory of divergent integrals) হইতেও উপরি লিখিত সমাকলিতটির অর্থ নির্ণয় করা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধে আমরা সমীকরণ (5)-এর দক্ষিণ পক্ষকে ডিষ্ট্রিবিউশন হিসাবে দেখিব। $f(\theta)$ একটি ডিষ্ট্রিবিউশন হইলে সাধারণতঃ $|f(\theta)|^2$ অর্থ নাও হইতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন $|f(\theta)|^2$ অর্থ থাকা। এই জন্য আমাদিগকে এইরূপ $U(r)$ লইতে হইবে যাহাতে $|f(\theta)|^2$ অর্থহীন না হয়।

এখন n যদি $2p$ বা $-3-2p$ (p একটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা,) না হয় তবে শোয়ার্তসের তত্ত্বানুসারে $\mathbf{F}r^n$ এইরূপ হয় যে $|f(\theta)|^2$ ফাংশন রূপে অর্থযুক্ত থাকে; যদি $U(r) = C\ln r$ (C-ধ্রুবক) হয় তবে $\mathbf{F}U(r)$এ δ-ফাংশন থাকিবে এবং $|f(\theta)|^2$ এর অর্থ থাকিবে না। বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, যদি

$$U(r) = C/r^2$$

হয়, তথাপি প্রথম আসন্ন-মান নির্ণয়ের কোন অসুবিধা ঘটে না, যদিও এই ক্ষেত্রে সাধারণ সমাধান নির্ণয়ের প্রতিবন্ধক আছে।

আবার ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, $U(r)$ স্থলে যদি আমরা এমন একটি ডিষ্ট্রিবিউশন লই, যাহার ফুরিয়ে রূপান্তর একটি সাধারণ ফাংশন তাহা হইলে ও $|f(\theta)|^2$ অর্থযুক্ত থাকিবে। $U(r) = \delta^{(2p)}(r)$ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ; $U(r) = \delta(r)$, $(p = 0)$-এর নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যায় বিশেষ প্রয়োগ আছে।

এই প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়ের যথাযথ প্রমাণোল্লেখ লেখকের অন্যত্র প্রকাশিত প্রবন্ধে (Ghosh, 1959) দ্রষ্টব্য।

প্রমাণোল্লেখ।

Ghosh, P. K. (1959). *Bull. Cal. Math Soc.*, **51**, 190.

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর—১৯৬০

১৩শ বর্ষ ঃ ১২শ সংখ্যা
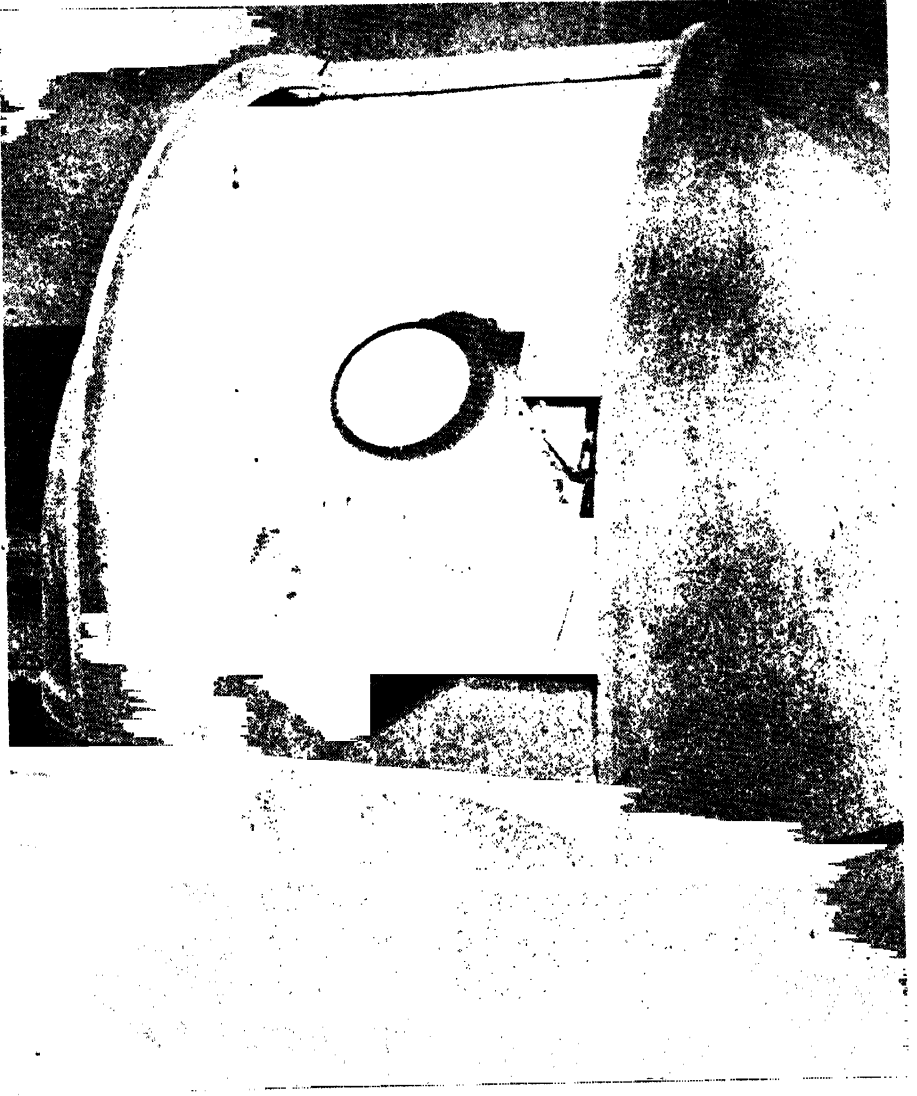
আমেরিকার বিমান-বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত বিরাট আকৃতির 'রটি' নামক ক্যামেরা।
ইহার সাহায্যে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত দূরপাল্লার যন্ত্রাদির ছবি গৃহীত হয়।

মনঃসংযোগ

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মনঃসংযোগের প্রয়োজন।

ছাত্রের ধর্ম লেখাপড়া করা। লেখাপড়ায় যদি সে মনঃসংযোগ করতে না পারে, তবে পাঠ্য বিষয়ের ধারণা তার কাছে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হবে না। ফলে পাঠে তার সাফল্য আসবে না। কিন্তু মনঃসংযোগ করতে পারলে লেখাপড়া কেন, সব কাজেই আসবে সাফল্য।

বিরাট একটা হলঘর।

রাত্রে ঐ ঘরের মধ্যে একটা আলো জ্বলছে।

সে আলোয় কাছের জিনিষকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দূরের জিনিষ অস্পষ্ট। মনের বেলায়ও তাই। যে ব্যাপারে আমি মনঃসংযোগ করেছি, তার ধারণা আমার কাছে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। কিন্তু যে ব্যাপারে আমি মনঃসংযোগ করতে পারি নি, তার ধারণা আমার কাছে অস্পষ্ট।

একই সময়ে একের অধিক বস্তুতে তুমি মনঃসংযোগ করতে পারবে না। একটিকে না ছাড়লে অপরটির দিকে মন যাবে না। কিন্তু যদি তুমি কোন বিষয়ে মনঃ-সংযোগ করতে পার, তবে তোমার যোগ্যতা বাড়বে, স্মৃতিশক্তি বাড়বে।

লেখাপড়ার কথা না হয় বাদ দিলাম। কলা-কৌশল আয়ত্ত করতে হলেও তীব্র মনঃসংযোগ চাই। টাইপ করা, সাইকেল চড়া, টেনিস খেলা—এ-সবে যখনই তুমি মনঃসংযোগ করবে, তখনই বিষয়-বিশেষে তোমার ইন্দ্রিয়ের সজাগ ও সতর্ক ক্রিয়া আরম্ভ হবে। আর তারই ফলে তুমি কৌশল আয়ত্ত করতে পারবে।

মনঃসংযোগের কতকটা নির্ভর করে বিষয়ের উপর, আর কতকটা ব্যক্তির উপর; অর্থাৎ মনঃসংযোগ ব্যাপারটা বিষয়-সাপেক্ষ ও বস্তু-সাপেক্ষ।

গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে পথ দিয়ে চলেছে ছেলেটি। ওদিকে তোমার মন সহজে আকৃষ্ট হবে না। কিন্তু ছেলেটি যদি হঠাৎ বিকট চিৎকার করে ওঠে, তবে সেই উচ্চ শব্দে তোমার কান খাড়া হয়ে উঠবে। তাই নয় কি? এর কারণ—মনোযোগ আকর্ষণের বিষয়টি (শব্দ) এক্ষেত্রে উগ্র।

আবার রাস্তা ধরে যখন চলি, তখন পথের দু-ধারের ছোটখাটো ঘর-বাড়ীগুলি তেমন নজরে পড়ে না। কিন্তু যদি এক বিরাট সাত-তলা বাড়ী থাকে? নিশ্চয়ই তা নজরে পড়বে। এই নজরে পড়বার মধ্যেও আছে মনঃসংযোগ। মনঃসংযোগ না হলে জিনিষটি নজরে পড়ে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যার আয়তন বেশী তা মনোযোগ বেশী আকর্ষণ করে। খবরের কাগজে জোরদার খবরগুলির 'হেডিং' তাই বড় বড় অক্ষরে লেখা হয়। উদ্দেশ্য তোমাদের দৃষ্টি—পরোক্ষভাবে তোমাদের মনকে আকৃষ্ট করা।

আমার ঘরের দেয়াল ঘড়িটায় একদিন দম দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। ওটা

যতক্ষণ টক্ টক্ করছিল, ততক্ষণ ওদিকে মন যায় নি। কিন্তু যখনই ওর ওই আওয়াজ গেল থেমে, তখনই আমার সেটা খেয়াল হলো, অর্থাৎ ওর দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হলো। কারণ? কারণ—হঠাৎ পরিবর্তন। হঠাৎ পরিবর্তন মনঃসংযোগ ঘটায়।

আবার একই বস্তু যদি মনের দুয়ারে বার বার আঘাত করতে থাকে, তবে তাতেও মন লাগে। শুধু তাই নয়—অভিনব জিনিষও মনঃসংযোগ ঘটায়। আমার ঘরের আসবাবপত্র আমার অতি পরিচিত। বন্ধুর বাড়ী গেলাম বেড়াতে। তার ড্রয়িং রুমের আসবাবপত্রগুলি বেশ নতুন ধরণের—অভিনবত্ব আছে বলা চলে। কাজেই বন্ধুর ঐ আসবাবপত্রগুলির দিকে আমায় মন সহজেই আকৃষ্ট হলো।

এতক্ষণ যা বললাম, তা সবই হচ্ছে মনঃসংযোগের বিষয়-সাপেক্ষ দিকের কথা। মনঃসংযোগ কি ভাবে ব্যক্তি-সাপেক্ষ হয়ে থাকে, সে কথা এখন বলি।

যে জিনিষে যার যত আগ্রহ অথবা রসবোধ, সে জিনিসে তার তত গভীর মনঃসংযোগ ঘটে। আর এই আগ্রহ জিনিষটা ব্যক্তি-সাপেক্ষ। বিষয় একই—অথচ তাতে বিভিন্ন লোকের আগ্রহ বিভিন্ন রকমের। যেমন ধরা যাক, একটি লাইব্রেরী। নানা রকমের বই সেখানে। শিশু থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই সেখানে উপস্থিত। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, শিশু ঘাঁটছে রং-বেরঙের ছবির বই। এক অধ্যাপক—তিনি ঘাঁটছেন গবেষণার উপযোগী বই। আবার এক ছাত্র—কলেজে পড়ে। সে খুঁজছে এমন বই, যা তার পরীক্ষা পাশে সাহায্য করে।

অনেকেই পথ ধরে চলেছে। পথের ধারে নানান্ দোকান। বিভিন্ন পথিকের মন আকৃষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন দোকানের উপর। নরসুন্দর দেখছে, কোন্ চুল ছাঁটার দোকানটি ভাল। মুচি দেখছে, কোথায় ভাল জুতার দোকান আছে আর ফলওয়ালা দেখছে, কোন্ ফলের দোকানটি কেমন। কাজেই দেখ—ব্যক্তি-বিশেষের বয়স, শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী মনঃসংযোগ নিয়ন্ত্রিত হয়।

মনঃসংযোগ আবার দু'রকমের—ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক। ঐচ্ছিক মনঃসংযোগের জন্যে চেষ্টা ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দরকার। অর্থাৎ ঐচ্ছিক মনঃসংযোগের পেছনে আছে যত্ন ও উদ্যম। একটি ছাত্র গণিতের জটিল প্রশ্নের সমাধানে ব্যস্ত। এক্ষেত্রে তার ঐচ্ছিক মনঃসংযোগ ঘটেছে। ঐচ্ছিক মনঃসংযোগ ক্লান্তিজনক।

খুব ভাল একজন বক্তা বক্তৃতা দিচ্ছেন। সে বক্তৃতায় আমার মন নেই। কিন্তু বক্তার বাক্চাতুর্য এমনই যে, অজ্ঞাতসারে আমার মনের দরজা খুলে গেল। আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হলো সে বক্তৃতায়। এ হচ্ছে অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগ। অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগে ক্লান্তি অত্যন্ত কম।

পরীক্ষার পড়া তৈরী করছ তুমি। পাঠ আয়ত্ত করতে তোমাকে যথেষ্ট চেষ্টা ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হচ্ছে। এ তোমার ঐচ্ছিক মনঃসংযোগ। কিন্তু পরীক্ষায় ভাল

ফল দেখানো তোমার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যেই তুমি পড়ছ। পড়তে ভাল লাগছে। সহজেই মনোনিবেশ করতে পারছ। ঐচ্ছিক মনঃসংযোগ তখন অনৈচ্ছিকে রূপান্তরিত হলো।

কোন বিশেষ বিষয়—ধর, বিজ্ঞানের উপর তোমার ঝোঁক আছে। তাই বলে, নিরবচ্ছিন্নভাবে তুমি যে বিজ্ঞানে মনোনিবেশ করতে পারবে—তা নয়। কারণ, মন সাধারণতঃ কোনও একটি বিষয়ে পাঁচ-ছয় সেকেণ্ড মাত্র কেন্দ্রীভূত হয়। তারপর সাময়িকভাবে মন চলে যায় অন্যান্য বিষয়ে। শেষে আবার ফিরে আসে মূল বিষয়ে। যাঁদের মন কোন বিষয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাঁচ-ছয় সেকেণ্ডের অধিককাল কেন্দ্রীভূত হয়, তাঁদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা সহজসাধ্য হয়ে থাকে। তুমি হয়তো ভাবছ যে, সারাক্ষণই খুব মন দিয়ে পড়ে চলেছ। আসলে তা নয়। ঐ সময়ের মধ্যেই মন তোমার অনেক বার অনেক বিষয়কেই স্পর্শ করে এসেছে। কাজেই সেটা তো তোমার নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ হলো না! নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ ঘটা খুবই কঠিন ব্যাপার।

আমাদের মন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে বলেই মনঃসংযোগ বিঘ্নিত হয়। মনের এই বিক্ষিপ্ত অবস্থা বা চিত্তবিক্ষেপ কিসে ঘটে, তা দেখা যাক।

সাধারণতঃ হৈ-হট্টগোলে মনঃসংযোগ নষ্ট হয়। অসহ্য গরম অথবা ঠাণ্ডায়, অপরিমিত আলোয়, শোওয়া-বসার ব্যাঘাতে, শরীর ও মন খারাপ হলে অথবা ক্লান্তি ও বিরক্তি এলে স্বভাবতঃই চিত্তবিক্ষোভ ঘটে থাকে। হৈ-চৈ-এ যেমন মনোযোগ নষ্ট হয়, তেমনি আবার নিঝুম নিস্তব্ধতায় কাজে অনেকের মন লাগে না।

অমরনাথ রায়

জানবার কথা

১। বহুদিন থেকেই ভূ-বিজ্ঞানীরা জানতেন যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠে ফাটল আছে।
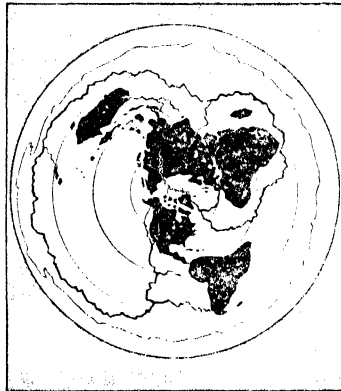
১নং চিত্র

সম্প্রতি ভূ-বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন—৪৫,০০০ মাইল লম্বা একটা ফাটল বৃত্তাকারে পৃথিবী-পৃষ্ঠকে বেষ্টন করে আছে। সুদীর্ঘ এই ফাটলটির তাৎপর্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত সঠিক কিছু তথ্য জানতে পারেন নি। তবে তাঁদের ধারণা পৃথিবীব্যাপী যে ভূকম্প-বলয় আছে—এই ফাটলটি সেই বলয় অনুযায়ী বিস্তৃত হয়েছে।

২। জার্মেনীর কক্সহাভেনের জেলেরা অদ্ভুত কায়দায় মাছ ধরে। এখানেই এল্‌ব্‌ নদী উত্তর সাগরে মিশেছে। জেলেরা সমুদ্রের তীরে মাছ ধরবার জন্যে ফাঁদ পেতে রাখে। ফাঁদগুলি হলো বিশেষ কায়দায় তৈরী এক ধরণের ঝুড়ি। জোয়ারের সময়
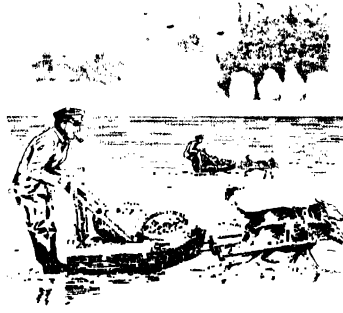
২নং চিত্র

নানারকমের মাছ ঢেউয়ের সঙ্গে সমুদ্রের পাড়ে চলে আসে এবং অনেক মাছ ঝুড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। জল কমতে সুরু করলেই মাছগুলি ঝুড়িতে আট্‌কা পড়ে—আর বেরোতে পারে না। দিনে দুবার করে জেলেরা কুকুর-টানা কাঠের স্লেজ গাড়ীতে বোঝাই করে ঝুড়িগুলি নিয়ে আসে।

৩। শামুক তোমরা সবাই দেখেছ। পৃথিবীতে প্রায় ৮০,০০০ বিভিন্ন জাতের শামুকের খোঁজ পাওয়া গেছে। এদের কেউ কেউ সাঁতার কাটতে পারে, কোন কোন জাতের শামুক লাফাতে পারে, কেউ বা গুড়ি গুড়ি চলতে পারে। কোন কোন জাতের শামুক মাটির নীচে সুড়ঙ্গের মধ্যে, সমুদ্রের তলদেশে বা গাছে বাস করে। এদের দেহাকৃতিও

৩নং চিত্র

বিভিন্ন রকমের—প্রায় দু-ফুট লম্বা অশ্ব-শঙ্খ (Horse Conch) থেকে সুরু করে ছোট্ট একটা চিনির দানার মতও হয়।